সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৩৯শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৬

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মুল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

तृणावर्त्त दिस श्रीकृस्नजी नै लेनै आकास उडी गयो बायरे करे नै धुलो कांकरा उडाया अं
खौ ओतणी पीलो गारा नै त्र आधा कि ग थां

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৬

১ম সংখ্যা

"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাকুড়তলীর মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদ্যিকালের ঠাকুরমায়ের আসমানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগ্নি সোনা দিক্-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে,
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে :—
"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।"
সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।

বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
তুঃসহ দিন তুঃখেতে বিক্ষত
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
হু হুঃ শব্দে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,—
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে :—
"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।"

জমিদারের বুড়ো হাতী হেলে ছলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢংঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেল বেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
খোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টনটনানি,
পাঁজরগুলোর তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে,—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম
সামান্য তার দাম।
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার আনিটা।

ঐ যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি,--
ক'দিন হোলো জানি নে কোন্ খুনী
সমর্থ তার নাৎনীটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবন তার দলে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুকফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা বিশ্বাস যায় ধুলোর সঙ্গে উড়ে
উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে,
"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে॥"

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়
ঢংঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়॥

শান্তিনিকেতন
২৮।৩।৩৯

প্রজাপতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি এ কী
আমার লেখার ঘরে
শেল্‌ফের 'পরে
মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা,—
রেশমি সবুজ রং তার 'পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারা রাত
কী ভেবেছে কে জানে তা।
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণগন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা সমস্ত বৃথাই।
বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্বমাঝে।
প্রজাপতি ব'সে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা, তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।

ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ,
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়,
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।
আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হ'তে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে।
কী আছে বা নাই কী এ
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
যার কাছে স্পষ্ট তাহা হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে,
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহু দূরে
রূপের অন্তর দেশে অপরূপ পুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর॥

শ্যামলী
শান্তিনিকেতন
১০।৩।৩৯

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শান্তিনিকেতন

ডাক্তার অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

ছোটোখাটো অনাহূত কাজগুলো আলোতে বাদলা রাতের পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে, তারা কোনোটাই বেশি ক্ষণ থাকবার মতো নয়—কিন্তু আলোর যথার্থ উদ্দেশ্যটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। তুচ্ছ যত দাবি আমার অবকাশের উপর চারি দিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আমার ভাবনা যায় এলোমেলো হয়ে। নিজের সময়ের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে কারো সামান্য দরবার ঠেকিয়ে রাখা এদেশে দুঃসাধ্য। কেন না আমাদের সমাজটা অত্যন্ত সস্তাদামী সময়ের বারোয়ারি সমাজ, সবার সময় সকলেরই। পরের অবকাশের তহবিল-ভাঙা দাবির জন্যে কোনো বিশেষ যোগ্যতার অধিকারভেদ নেই। একই জাজিম পাতা, অনিমন্ত্রণে সকলেই সেখানে খুশি বসবার গুমর করে। অনায়াসে বলতে পারে, আমি সামান্য লোক ব'লেই কি আমাকে উপেক্ষা করতে হবে। ভাবতেই পারে না যে জগতে সামান্য লোকের স্থান যদি সামান্য পরিমাণেই না হয় তাহলে অসামান্যদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় সদর রাস্তায়।

মাঝে মাঝে নানা খেয়াল মাথায় চাপে। প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে। তাছাড়া প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না; চিঠি চ'লে যায় বিনা-বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্‌লের মতো। চিঠির সেই হালকা চাকায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক। কিছু দিন থেকেই ভাবছি তোমাকে একখানি চিঠি লিখি—হয়ে উঠছে না। আমাদের দেশে গোধূলির এক রকম সিঁদুরে রঙের আলোকে বলে কনে-দেখা আলো, সেই আলোতেই কনের রূপ খোলে। সেই রকম এক জাতের অবকাশ আছে যাকে বলা যেতে পারে চিঠি-লেখা অবকাশ। সেটা ঘটে সময়ের সান্ধ্যক্ষণে, অর্থাৎ মানসিক দুপুর রোদ্দুরেও নয়, অন্ধকার রাত্রেও নয়, যে প্রদোষের আলোর উপর কাজ-কামাইয়ের ম্লান রং লাগে।

আজ সকালবেলায় জমেছে ঘন মেঘের ছায়া, গত রাত্রির বর্ষণস্মৃতিভারে বাতাস মন্থর, থেকে থেকে বিদ্যুতের ঘোষণা অনুসরণ ক'রে ডেকে উঠছে মেঘ। এই রকম সকালবেলাকার নিবিড় বাদলা সমস্ত দিনের নিষ্কর্মতার ভূমিকা বিছিয়ে দেয়। যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা স্বভাবতই মধুর অর্থাৎ লিরিক-জাতীয় তুমি যদি তাই হোতে তাহলে আজকের এই চিঠিতে মেঘমল্লারের সুর লাগত। লিরিকের পর্ব শেষ হয়ে গেছে, ঠিক মনের দিক থেকে যে তা নয়, বাইরের দিক থেকে। অর্থাৎ অবকাশের দেবতা এই অকেজো সকালে যে-সুরেই তাঁর বীণার তার বাঁধুন আমার এ চিঠি সুরালো হবে না, কেননা আধুনিকতার যুগলক্ষ্মীর সভায় মাধুরী-মদের পেয়ালায় টানাটানি, সাকীই বা কোথায়।

তাহলে লাগা যাক সাবধানে যথাসাধ্য ভুলকি চালে থট্-এর চালনায়। কী বলব থট্-কে। চিন্তা? অশ্রদ্ধেয়। মনন? নৈব নৈব। বোদ্ধ বিষয়? সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোকে বলেছে, চিতা এবং চিন্তার মধ্যে চিন্তাটাই বেশি ক'রে জ্বালিয়ে মারে। এই অলক্ষুণে শব্দটা বাংলা ভাষায় বিনা চিন্তায় অস্থানে প্রবেশ করেছে। "মনন" শব্দটা ব্যবহার করতে বাধে, কেননা মনন মনের একটা ক্রিয়া, অর্থাৎ thinking—এই ক্রিয়ার পরিণামকেই সাধারণত thought বলে, সে-রকম শব্দ হচ্ছে "মত," কিন্তু ওটা চলেছে থিওরি এবং

ওপিনিয়নের প্রতিশব্দ রূপে। মননের বিষয় বা মননের যোগ্য হিসাবে আপাততঃ মন্তব্য কথাটা চালানো যেতে পারে। কিন্তু thoughtful শব্দের জায়গায় মন্তব্যবান বলা চলবে না। কেননা যাদের মননের শক্তি বা অভ্যাস আছে তারাই thoughtful। সে-হিসাবে সে-স্থলে মননশীল বা মননশক্তিমান বলাই সংগত হবে। চৈঠিক সাহিত্যের সুবিধে এই যে ভাষান্তর-সাধনার সুগভীর দায়িত্ব সে না নিলেও নিতে পারে, এ ভার রইল তাঁদেরই পরে এ কাজটাকে যাঁরা বলেন "বাধ্যতামূলক"।

আমি থট্-কে আপাতত বলব মন্তব্য। যদিও মন্তব্য কথাটা অন্য অর্থে চলে গেছে। যদি বলি সুধীন্দ্রের "স্বগত" বইখানি মন্তব্যে ঠাসা, তাহলে এই বাক্যটা সুধীন্দ্রের ভাষার চেয়েও বেশি দুরূহ হবে ব'লে মনে করি নে। "কোনো কোনো কাব্য মন্তব্যভারাক্রান্ত, তাতে রসের অংশ কম," বললে বুঝতে বাধবে না। কিন্তু যদি বলি চিন্তাভারাক্রান্ত। তাহলে বোঝাবে দেউলে হবার পথে। মন্তব্যমন্থর ভাষা স্বভাবত আমার নয়—ফলের মধ্যে যেটুকু প্রোটীন খাদ্য থাকে আমার ভাষায় মন্তব্য অংশ সেইটুকু, আমার ভাষা কোনো দিন প্রোটীন-ঘন পাঁঠার প্রতিযোগিতা করতে পারবে না—অন্তত নিজের বিচারে আমি এটা ঠিক করেছি।

যাক্, যে-কথাটা কিছু দিন থেকে ভাবছি সেটা হচ্ছে এই:—মানুষের মনে একটা প্রবল জোয়ার-ভাঁটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, নেশনগত মানুষ। প্রথম বয়সে যে নেশনের সংস্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন ভরা জোয়ার, তার উদার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই। মনে স্থির করেছিলুম এই প্রসারণ কেবলি ব্যাপ্ত হোতে থাকবে, এই প্রসারণই পাশ্চাত্য সভ্যতার নিত্য স্বভাব। মনের ও হৃদয়ের সকল প্রকার রিপুগত বুদ্ধিগত সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস। এই জন্যই তখনকার পাশ্চাত্য সাহিত্য এত সহজে আমাদের মনকে অধিকার করেছে—তার বাণী স্বতই সর্বজনের অভিমুখী। এই প্রেরণার অনুকূলেই আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হয়েছিলুম। তখনকার তরুণের দল ধর্মমত ও সমাজনীতির বাঁধনগুলি ভাঙবার জন্য চঞ্চল হোলো, সেই সঙ্গে সঙ্গেই জাগল রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার সাধনা আমি জানি, আমার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির যে উৎসাহ উন্মুখ হয়েছিল তাতে সেই সম্প্রসারণ-যুগের চরণপাতের ছন্দ লেগেছিল। ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগশাসনের শিকল নিঃসংকোচে ছিঁড়ে ফেলবার ভরসা পেয়েছিলুম তখনকার সেই আবেগের আনন্দে।

ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে। আমাদের এই কোণের দেশের ছোটো এলেকাতেও অকস্মাৎ তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলে। নবীনবয়সীরাও আচার-বিচারের সনাতনত্ব নিয়ে স্পর্ধা করতে লাগল—ক্রমে ক্রমে উল্‌টে গেল হাওয়া। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা অচলায়তনের প্রাকারশ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল। এ'কে উত্তরে হাওয়া বলতে পারি এই জন্যে যে ওটা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই। কেননা তখন উত্তর-পশ্চিমের মনোরাজ্যে শীতের সংকোচন দেখা দিতে শুরু করেছে। বুদ্ধি-প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে। তাই আমাদের দেশেও সহজ হোলো বুদ্ধিকে অমান্য ক'রে সংস্কারকে শিরোধার্য ক'রে নিতে, বিচারের স্বাধীনতা চার দিকে হোতে লাগল অবরুদ্ধ। ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হোলো চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ। দেখতে দেখতে চার দিকে নানাবিধ নমুনার গুরুমূর্তির আবির্ভাব সংক্রামক হয়ে উঠল। পরলোক-পথের পাথেয় মন্ত্রের জন্যে, ইহলোক-পথের চালনার জন্যে যে-কোনো কর্ণধারের হাতে নিজের কান সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছেয়ে ফেললে সমস্ত দেশকে।

এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে। বড়ো বড়ো নেশন, বুদ্ধি বিদ্যা ও বীর্যে যারা অসামান্যতা দেখিয়েছে, যাদের জয়দৃপ্ত ইতিহাসের শিক্ষাকে

অনুসরণ ক'রে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বুদ্ধি অনুশীলনে স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে আমরা এত কাল একান্ত শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছি তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট ক'রে দিয়ে এক-একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল। এই নিঃসাড় জড়ত্ব সজীব মাংসকে পাথর-ক'রে-তোলা বীভৎস ব্যাধির মতো মানব-জগতের সর্বত্র সঞ্চারিত হোতে চলল। দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত। সেই তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনার অন্ত নেই। তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে আত্মসম্মানকে স্বকৃত ও পরকৃত পীড়নে দ'লে দ'লে করছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অবশেষে আজ, এমন কি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ ফোঁস ক'রে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম, **Proud power tries to keep truth safe in its own exclusive hand with a grip that kills it**। ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধ'রে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা ক'রে রাখবার উপায়। তুমি তো জানো আমাদের দেশে এক দল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে, সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিকে তারা বিশ্বাস করে না। ফাসিস্ট-দলপতি দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা যখন শূদ্রদের একেশ্বর অধিনেতা ছিলেন তখন সর্বাগ্রে তাদের বুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন—হুকুম ছিল পদধূলি পাবে, কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ভেবে চলবে না। পৃথিবীতে বোধ হয় সেই সব প্রথম ফাসিস্ট-নীতির প্রবর্তনা। কোনো রাষ্ট্রিক শক্তির অক্ষুণ্ণতা যদি নির্ভর করে অধিকাংশের বুদ্ধি-পঙ্গুতার পৃষ্ঠে স্বল্পাংশের বুদ্ধি-স্বাধীনতার নিরাপদে অধিরোহণ তাহলে—থাকগে ও সব কথা, আমরা অন্য কালের লোক।

বাঁধা পথ নেই চিঠির, ও রেলগাড়ি নয়, ও চলে খোলা মাঠের মধ্যে। একটা সাহিত্যের তর্ক তুলব তোমার সঙ্গে, এই কথা মনে ক'রেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভূমিকাটাই চার পা তুলে বেড়া ডিঙিয়ে দৌড়ে চলেছে আপন খেয়ালে। তার হাঁফ ধরেছে তবেই এবার আসল কথাটার সুযোগ পাওয়া গেল। তবে শোনো। ডিক্টেটরি বুদ্ধি যতই গরম হয়ে ওঠে ততই একেশ্বর নেতারা ভুলে যায় যে, বিধাতার অন্যমনস্কতায় তারা সর্বজ্ঞ হয়ে জন্মায় নি। মানুষকে চালনা করবার নেশা এমনি তাদের পেয়ে বসে যে সকল বিষয়েই মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উগ্রভাবে উদ্যত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধানে নয়, সাহিত্যে আর্টেও আপন শাসন রুদ্ররীতিতে প্রচার করছে। মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই, পালোয়ানদের হাতে নয়। আকবর বাদশাও গানের আসরে তানসেনকে মেনে চলেছেন, সেখানে যদি তিনি বাদশাহী করতেন তাহলে সে হোত সাংগীতিক ভূতের কীর্তন।

তোমার মনে আছে কি না জানি নে, যখন মস্কোতে গিয়েছিলুম তখন প্রসঙ্গক্রমে চেকভ-এর প্রতি সমাদর প্রকাশ করেছিলুম। তখনি দেখা গেল সেটা স্থানকাল-পাত্রোচিত হয় নি। চেকভ আধুনিক রুশ-বিদ্রোহ-কালের পূর্বকার লেখক। তিনি বুর্জোয়া, তাঁর রচনা প্রোলিটেরিয়েট যুগের সম্মানের পংক্তিতে বসতে পারে কি না বোধ করি এই সংশয় প্রবল ছিল। আমার আশা ছিল তাঁর চেরি অর্চর্ড নাটকখানির অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটবে। সেটা সম্ভব হোলো না। হিটলারি শাসনেও শুনতে পাই ভালো ভালো বই জাতের ছুতো তুলে তিরস্কৃত। ছবি প্রভৃতিরও সেই দশা। হিটলারই মেলবন্ধন করেন। নাজি-নীতি অনুসারে সাহিত্যের কে কুলীন কে অন্ত্যজ, তার উপরেই তার নিষ্পত্তির নির্ভর। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত হাস্যকর, সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে এর শোচনীয়তার তলে।

সেদিন কোনো এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই, তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়, জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট এই নিয়ে। সেদিন কাগজে দেখলুম—সত্যমিথ্যা জানি নে,—কোনো বিভাগে হিন্দুর চাকরি দুর্লভ হওয়াতে কোনো হিন্দু উমেদার মুসলমান ধর্ম নিয়েছিল। আধুনিকতার বাজারে আন্তরিকতা বা ভালোমন্দ বিচার না ক'রে রচনাকে প্রোলিটেরিয়েট সাজে সাজানো হয়তো কালক্রমে দায়ে পড়ে চলতি হোতে পারে। আমাদের সন্তোষ এক কালে কতকগুলি সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানি নে সে গান বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে, সেগুলি বুর্জোয়া। যখন ময়মনসিংহ গীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রেণীওয়ালাদের মতে এসব কবিতা হয়তো বা প্রোলিটেরিয়েট, কিন্তু আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভালো লাগতে একটুও বাধে নি। ভাঁটার দিনে যখন উপরকার প্রবাহের প্রবল ঐশ্বর্যের চেয়ে তলাকার নুড়িপাথর-পাঁকের প্রাধান্য জোর পেয়ে ওঠে তখন প্রোলিটেরিয়েট নুড়ি-বালির আদর্শেই কি নদীর শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে। মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে জন্মগত শ্রেণীগত আকস্মিকতা বেশি অভ্যর্থনা পায় সমাজের দুর্দিনে। সে দুর্দিন সকল সমাজে সকল সময়েই দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে নি—এখন পাশ্চাত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি জাত-ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব।

আমাদের সামাজিক বৈঠক কি এত কাল জাত-যাচনদারি নিয়ে যথেষ্ট সরগরম ছিল না—শেষকালে কি জাত-মানা মত্ত হস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে। আমি বুঝতে পারি এর আন্তরিক কারণটা। নতুন যুগে সাহিত্য আপন রচনায় আপন কালের বিশেষ সাক্ষ্য দেবে, সময়ের এই দাবিটা মনকে চঞ্চল করেছে। যুগে যুগে গুটি কেটে বেরোয় সাহিত্যের প্রজাপতি, বাণীর ডানায় নূতন রঙের ছাপ লাগিয়ে। কিন্তু সেটা লাগে সহজে প্রাণধর্মের তাগিদে। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে তেমনি ক'রেই কি এক দিন নব জীবনের রং লাগে নি। এমন কি অল্পকাল আগে হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন তাঁদের কাব্যে যে প্রসাধন নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন সে কি আজ সম্পূর্ণ বদলে গেল না। তা নিয়ে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে জাতবদলের কি কোনো তর্ক উঠেছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বিদ্যাপতি কিছু মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, "শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল"। এ তো মিলেই থাকে—এ নিয়ে তো সমাজে শৈশব এবং যৌবনের দুই বিরুদ্ধ দলে হাতাহাতি করে না। তার পরে স্বভাবের নিয়মে প্রৌঢ় বয়সও আসে, তখন সাজগোজ আপনি ঘুচে যায়, আগেকার মতো সংকোচ ক'রে সামলে কথা কওয়াটা'র প্রয়োজন থাকে না। ভাষাটা স্পষ্ট হয়, তার মধ্যে বুদ্ধির পরিণতি দেখা দেয়—কিন্তু তাই ব'লে যে সেটা বেহায়াগিরি আকারে তা নয়—তার ভাষার অকুণ্ঠিত তেজটা সহজ; সহজেই সে ভাষা অশ্লীল হয় না যদি সে ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। সাহিত্যও আয়ুর পর্বে পর্বে বয়ঃসন্ধি ঘটে। যদি সত্যই ঘটে তাহলে সেটাকে নিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে গলা চড়াবার দরকার হয় না—দাবি বুঝে দরজি এসে আপনিই মাপের এবং ছাঁটকাটের বদল ক'রে থাকে।

আমাদের সাহিত্যে সেই আন্তরিক পরিণতি স্বভাবত ঘটে নি। প্রকাশে নতুনত্ব হওয়া উচিত এই ব্যগ্রতা মনকে অস্থির করেছে। নকল নতুনত্ব দেখলেই চিনতে পারি কোন্ দোকান থেকে তার আমদানি। কেননা যে-সব স্বকীয় রীতি বা মুদ্রাভঙ্গী ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক তারও অনুকরণ দেখলে বোঝা যায় এটা আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সাজ। এক বয়সে মোলায়েম মুখে গোঁফ ওঠাবার জন্যে কিশোরদের অধৈর্য দেখা যায় এও তেমনি। এ ক্ষেত্রে এই উপদেশ মানতে হবে যে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে গোঁফ আপনিই উঠবে।

যদি প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে গোঁফ একেবারেই না ওঠে তাহলে মেয়েলি মুখের উপর বার বার ক্ষুর বোলাতে থাকো, হয়তো ফল পাবে, হয়তো পাবে না। উপায় কী।

ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রোলিটেরিয়েট-বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও ঐ একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষ্যে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নূতনতম রুদ্রমূর্তি ধরল তার উপরে সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো যায় যদি তাহলে তো নৌকাডুবি হবে। সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশবিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে। তাহলে সাম্প্রদায়িক শাসনকর্তারা এক দিন ইংরেজি সাহিত্যকেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দেবেন— কেননা ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টানের সাহিত্য হোলেও পৌত্তলিক দেবদেবীদের নামে ও ভাবরসে সমাকীর্ণ, অভিষিক্ত। অবশেষে কোনো এক ভবিষ্যতে যদি দেশে বল্‌শেভিক নীতি ও ব্যবস্থার প্রাধান্য ঘটে তাহলে? এখন তো কর্তাদের আমলে আমার রচনা এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়, তার নাকের সামনে তর্জনীও ওঠে। মার্ক্‌সিজ্‌মের কোন্ গোরস্থান সামনে আছে?

এখনো ঘন মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। ইতি ১৭।৩।৩৯

অকাল-শরৎ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অশথ-শাখে নতুন কচি পাতায়
রূপালী রোদ আল্‌তো পায়ে নামে,
খামখেয়ালী বাতাস খালি মাতায়
খুশির তালে সবুজ আমে জামে।

আকাশ আছে হয়ত স্ফটিক-সাদা
ঠিক্‌রে পড়ে দিক্‌বিদিকে আলো,
হঠাৎ কখন লাগিয়ে ধুলোকাদা
দুষ্টু ছেলে মুখ করেছে কালো।

পাখীর সুরে পাগলামি আজ ভরা
কাকের গলা তাও কী নতুন লাগে।
চম্‌কে শুনি—যায় না মোটে ধরা,
শিস্ জেগেছে চড়ুই-টুনির ডাকে।

দেবদারু বন হাল্কা হাসি জানে
বল্‌লে পরে করবে কি বিশ্বাস?
রেশ্‌মী পাতার ওড়্‌না সে-ও টানে,
গন্ধে ভরা আজ তারো নিঃশ্বাস।

তেঁতুল-তলে টিনের চালাঘরে—
এমন মায়া স্বপ্নে ভেবেছি কি!
পেঁজা তুলোর মতন আলো ঝরে
দেয়াল-দাওয়া আলোয় ঝিকিমিকি।

দস্যি যত ছেলের পালে জোটে
দীঘির জলে ওই মেতেছে গিয়ে,
একলা বধূ ত্রস্তে ঘাটে ওঠে,
ঘট ভরে নেয় তরল আলো দিয়ে।

কাঁচা আলোয় আল্‌গা মেলে পাখা
চিল ওড়ে দূর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে;
নীল আকাশে শ্যামল আভা মাখা,—
সাগর-জলে জলছবি কে আঁকে।

ঋতুর হারে হারিয়েছে খেই যেন
খেয়াল কিছুর নেইক ক'দিন আর,
বকের-পাখা-হাল্কা শরৎ কেন
চৈত্রশেষে আভাস দিলে তার!

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর ওপারে একটা চর দেখা দিয়াছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী—ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ওপারে চর জাগিয়াছে। পূর্ব্বে, এখন যেখানে চর উঠিয়াছে, ঐখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি, এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ঐ চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল রায়হাট প্রাচীন গ্রাম, এখানকার প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখায়-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত; এই বহুবিভক্ত রায়বংশের প্রায় সকল শরিকেই চরটার স্বামিত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুয়েক মহাজন এবং জন কয়েক চাষী প্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনরয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি, চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুই জনের প্রত্যেকের দাবি, তাঁহার নিকট আবদ্ধীয় জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহাদের নিকট 'আবদ্ধীয়' সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং না কি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েক জনের দাবি, কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।

রায়-বংশের বর্ত্তমানে এক শত পাঁচ জন শরিক, বাকী খাজনার মোকদ্দমায় জমিদারপক্ষীয়গণের নাম লিখিতে তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে যোগ দিয়াছেন এক শত দুই জন। বাকী তিনপক্ষের মধ্যে এক পক্ষের মালিক নিতান্তই সঙ্গতিহীন নাবালক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ কিন্তু এখানকার বহুকালের দুইটি বিবদমান পক্ষ। এক পক্ষ রায়বংশের দৌহিত্র বংশ, অপর পক্ষ রায়বংশেরই সর্ব্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ব্যক্তি কূট কৌশলী ইন্দ্র রায়। গরুড়ের তীক্ষ্ণ নখরের মত ইন্দ্র রায়ের হাত প্রসারিত হইলে কখনও শূন্য মুষ্টিতে ফেরে না, ভূখণ্ডও বোধ করি উপড়াইয়া উঠিয়া আসে। এই ইন্দ্র রায়ের অপেক্ষাতেই বিবদমান পক্ষগণের সকলেরই উদ্যত হস্ত এখনও স্তব্ধ হইয়া আছে, অন্যথায় এত দিন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইত।

অপর পক্ষ ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তিনিও এক কালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন; কূট বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁহার বড়, দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। ইন্দ্র রায়ের সহিত দ্বন্দ্বে ইন্দ্র রায়কেই তিনি অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী মানিতেন ইন্দ্র রায়কে। ইন্দ্র রায় মিথ্যা বলিলে তিনি হাসিয়া তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া বলিতেন—তোমার সাক্ষী দেওয়ার ফী দিলাম ইন্দ্র। মিছেই খরচ ক'রে সাক্ষীদের তুমি জুতো কিনে দিলে। বাড়ী ফিরিয়া তিনি গ্রামে বড় একটা খাওয়া-দাওয়া জুড়িয়া দিতেন।

কিন্তু যে-কালের গতিতে যদুপতি যান, তাঁহার মথুরাপুরীও গৌরব হারায়, সেই কালের প্রভাবেই বোধ করি সে রামেশ্বর আজ আর নাই। তিনি নাকি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধকার ঘরে বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত। চোখে নাকি আলো একেবারে সহ্য হয় না, আর মস্তিষ্কও নাকি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সম্পত্তি পরিচালনা করে প্রাচীন নায়েব যোগেশ মজুমদার; যোগেশ মজুমদারের অন্তরালে আছেন একটি শান্ত বিষাদপ্রতিমার মত নারীমূর্ত্তি—রামেশ্বরের দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রী. সুনীতি দেবী। দুইটি পুত্র; বড়টির বয়স আঠারো, ছোটটি সবে পনরয় পা দিয়াছে। সম্প্রতি মজুমদার সুনীতি দেবীকে অনেক বলিয়া কহিয়া বড়টিকে পড়া ছাড়াইয়া বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছে। অবশ্য লেখা-পড়াতেও তাহার অনুরাগ বলিয়া কিছু ছিল না। এই বিবাদ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মজুমদার এবং রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহীন্দ্র এখানে নাই—তাহারা দূর মহালে গিয়াছে মহাল পরিদর্শনে। লোকে বুঝিল, হয় ইন্দ্র রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় আছেন, অথবা সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, উপযুক্ত সময়ে ছোঁ মারিয়া বসিবেন।

চাষী প্রজারা এতটা বোঝে নাই, তাহারা সেদিন আসিয়া ইন্দ্র রায়কেই ধরিয়া বসিল, হুজুর আপনি একটা বিচার ক'রে দ্যান।

অতি মৃদু হাস্যের সহিত অল্প একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন—কিসের রে? যেন তিনি কিছুই জানেন না;—কার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল তোদের?

উৎসাহিত হইয়া প্রজারা বলিল—আজ্ঞে ওই লদীর উ-পারের চরাটার কথা বলছি। ই-পারে আমাদের জমি খেয়ে তবে তো লদী উ-পারে উগরেছে, আমাদের জমি যে পয়োস্তি হ'ল—তার খাজনা তো আমরা কমি পাই নাই, আমরা তো বছর বছর লোকসান গুণে যাচ্ছি।

বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে রায় বলিলেন—বেশ তো, লোকসান দিয়ে দরকার কি তোদের? লোকসানী জমা ইস্তফা দিলেই পারিস। বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়া রায়ের একটা অভ্যাস। লোকে বলে, ঐ সঙ্গে তিনি মনে মনে বুদ্ধিতে নাকি পাক মারেন।

প্রজারা হতভম্বের মত রায়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আজ্ঞে—ই—তাহ'লে বিচার কি করলেন আপনি!

হাসিয়া ইন্দ্র রায় বলিলেন—তোরা যা বলবি তাতে সায় দেওয়ার নামই তো বিচার নয় রে। বিচারের তো একটা আইন আছে, সেই আইন মতেই তো জজকে রায় দিতে হয়।

প্রজারা হতাশ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পথে তাহারা পরামর্শ করিয়া উঠিল গিয়া রামেশ্বর বাবুর বাড়ী। কাছারিতে মালিক কেহ নাই, চাকরটা বলিল—বড়বাবুও নাই, নায়েব বাবুও নাই. কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে তো দেখা হবে না।

প্রজারা গ্রামেরই লোক, তাহারা সকল সংবাদই রাখে, তাহারা জানে এখন এ-বাড়ীর সর্ব্ব কর্ম্মের অন্তরালে একটি অদৃশ্য শক্তি কাজ করে, পরমাশক্তির মত তিনিও নারী-রূপিণী; তাহারা বলিল, আমরা মায়ের সঙ্গে দেখা করব।

চাকরটা অবাক হইয়া গেল, এমনধারার কথা সে কখনও শোনে নাই। সে বলিল, তোমরা কি ক্ষেপেছ না কি?

রামেশ্বর বাবুর ছোট ছেলে অহীন্দ্র পাশেই একখানা ঘরে পড়িতেছিল—সে এবার বাহির হইয়া আসিল। খাপখোলা তলোয়ারের মত রূপ—ঈষৎ দীর্ঘ পাতলা দেহ উগ্র গৌর দেহবর্ণ, পিঙ্গল চোখ, মাথার চুল পর্য্যন্ত পিঙ্গলাভ। তাহাকে দেখিয়া প্রজারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল; এ বাড়ীর বড় ছেলে মহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহাদের ভয় হয়, দশটা কথার পর মহীন্দ্র একটা জবাব দেয়, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত সে কখনও কথা বলে না; আর এই ছোট দাদাবাবুটির রূপ যতই কেন উগ্র হোক না—এমন নিঃসঙ্কোচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার মিষ্টকথা তাহারা কাহারও কাছে পায় না। গল্প লইয়া তাহাদের সহিত তাহার মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চাষীদের কাছে সে সাঁওতাল-বিদ্রোহের গল্প শুনিতে যায়, আর সে নিজে বলে দেশ-বিদেশের কত গল্প। সমুদ্রের ধারে সোমনাথ শিবমন্দির লুটের কথা, আমেরিকায় সাহেবদের সঙ্গে সে-দেশের সাহেবদের লড়াইয়ের কথা—তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শোনে। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহারা পরম উৎসাহের সহিত বলিল—ছোট দাদাবাবু কবে এলেন?

অহীন্দ্র এখান হইতে দশ মাইল দূরে শহরের স্কুলে পড়ে। অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছি, চারদিন ছুটি আছে। তার পর তোমরা এসেছ কোথায়? দাদাও বাড়ী নেই, নায়েব-কাকাও নেই।

তাহারা বলিল—আপনি তো আছেন দাদাবাবু, আপনি আমাদের বিচার ক'রে দেন।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি বিচার করতে পারি নাকি, দূর, দূর!

তাহারা ধরিয়া বসিল—না দাদাবাবু, আপনাকে আমাদের এ দুঃখের কথা শুনতেই হবে। না শুনলে আমরা দাঁড়াব কার কাছে! নইলে নিয়ে চলুন আমাদের মায়ের দরবারে। আমরা না খেয়ে পড়ে থাকব এইখানে।

অহীন্দ্র মায়ের কাছে গেল। সুনীতি স্বামীর জন্য আহার প্রস্তত করিতেছিলেন। অহীন্দ্র আসিয়া দাঁড়াতেই বলিলেন—কি রে অহি!

মা ও ছেলের এক রূপ, তফাৎ শুধু চুল ও চোখের। মুখ রং দেহের গঠনে অহি যেন মায়ের প্রতিবিম্ব—কেবল পিঙ্গল চুল ও চোখ তাহার পিতৃবংশের বৈশিষ্ট্য। সুনীতির বড় বড় কালো চোখ, চুলও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। বরং তাঁহার বড় ছেলে মহীর সহিতই তাঁহার কোন সাদৃশ্যই নাই, সর্ব্ব অবয়বে সে তাহার পিতার অনুরূপ

অহি সকল কথা মাকে বলিয়া বলিল—ওরা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মা। কি বলব ওদের? ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—সে ক কখনও হয় অহি? আমি কেন দেখা করব ওদের সঙ্গে? তুই একথা বলতে এলি কি ব'লে?

অহি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। মা হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন—অমনি চললি যে!

অহি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই বলিল—বলি গে ওদের সেই কথা।

—কই এক বার মুখখানা দেখি!

ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মা তাহার চিবুকখানি স্পর্শ করিয়া বলিলেন—এমন 'ফুলটুস' ছেলে আমি কোথাও দেখি নি। একে বারে ফুলের ঘায়েও রাগ হয়ে যায়!

সত্য কথা, মায়ের সামান্য কথাতেই অহির অভিমান হইয়া যায়। এ-সংসারে তাহার সকল আবদার একমাত্র মায়ের উপর। শৈশব হইতেই সে বাপের কাছে বড় ঘেঁষে না, তাহার বড় ভাই মহীন্দ্র বরং পিতার কাছে কাছে ফিরিয়া থাকে। দুই ভাই প্রকৃতিতে যেন বিপরীত। মহীন্দ্র অভিমান জানে না, সে জানে দুর্দ্দান্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আঘাত করিতে, শক্তিবলে আপনার ঈপ্সিত বস্তু মানুষের কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইস্পাতের মত সে ভাঙিয়া পড়ে তবু নত কোনমতে হয় না। আর অহি খাঁটি সোনার মত নমনীয়, আঘাতে ভাঙে না—অভিমানে বাঁকিয়া যায়।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, রাগ হ'ল তো অমনি?

—না।

—না কেন? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই বুঝি ওদের বলেছিস মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি।

অহি বলিল—বলি নি, কিন্তু দেখা করলে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নেই—বলিস কি তুই? রায়-বাবুরা যে হাসবে, বলবে বাড়ীর বউ হয়ে চাষা প্রজাদের সঙ্গে কথা কইলে।

—বলুক গে। তাই ব'লে ওরা ওদের দুঃখের কথা বলতে এলে শুনবে না? আর, এমনধারা মুসলমান নবাববাড়ীর মত পর্দ্দার দরকারই বা কি? আজকাল মেয়েরা দেশের কাজ করছে। ইউরোপে—এই যুদ্ধে—

বাধা দিয়া মা হাসিয়া বলিলেন—তোর মাষ্টারীতে আর আমি পারি নে অহি। তা' তুই শুনে যা বলতে হয় বল না; সেইটেই আমার বলা হবে! আমি মহীকে বলব আমিই বলেছি এ কথা।

ছেলে জেদ ধরিল—না, সে হবে না, তোমাকেই শুনতে হবে। আমি বরং দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। ওরা বাইরে থাকবে, তুমি ঘরে থাকবে।

শেষে তাহাই হইল। অহীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া সুনীতি প্রজাদের অভিযোগ শুনিতে বসিলেন। তাহারা আপনাদের যুক্তিমত দাবি জানাইয়া সমস্ত বৃত্তান্তই নিবেদন করিল, প্রকাশ করিল না শুধু ইন্দ্র রায়ের নিকট শরণ লইতে যাওয়ার কথা—এবং রায়-মহাশয়ের সুকৌশলে প্রত্যাখানের কথা। তাহারা বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল—আপনার চরণে আমরা আশ্চয় নিলাম মা, আপনি ইয়ের ধম্ম বিচার ক'রে দেন। কালীর গেরাসে আমাদের সবই গিয়েছে মা, আমাদের আলু লাগাবার জমি নাই, আখ লাগাবার জমি নাই, আর কি বলব মা—চাষার

বাড়ীতে ছোলার ঝাড় ওঠে না, গম ওঠে না! আমরা তবু তো কখনও খাজনা না-দেওয়া হই নাই।

সুনীতি বলিলেন—তোমরা বরং ও-বাড়ীর দাদার কাছে যাও। অহিকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ও-বাড়ীর দাদা অর্থে ইন্দ্র রায় মহাশয়। প্রজারা ইন্দ্র রায়ের নাম শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। রংলাল চট্ করিয়া বুদ্ধি করিয়া বলিল—আজ্ঞে না মা, উনি জমিদার বটেন—কিন্তু বুদ্ধিতে উনি জেলাপীর পাক। যা করতে হয় আপুনি করে দেন।

সুনীতি বলিলেন—ছি বাবা, এমন কথা কি বলতে হয়! তিনিই হলেন এখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ বাড়ীর মালিকের অসুখের কথা তোমরা তো জান। মহী হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ। আমি স্ত্রীলোক। সমস্ত গ্রামের জমিদার নিয়ে যে বিবাদ, তার মীমাংসা কি আমার দ্বারা হয় বাবা? যদি কখনও ভগবান মুখ তুলে চান, মহী অহি উপযুক্ত হয়, তবেই আবার তোমাদের অভাব-অভিযোগের বিচার এ-বাড়ীতে হ'তে পারবে। এখন তোমরা ও-বাড়ীর দাদার কাছেই যাও। অহি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রজাদের মধ্যে রংলালই আবার বলিল—আজ্ঞে মা, তিনিও থামচ তুলেছেন। সেই তো আমাদের ভয়, নইলে অন্য জমিদারের সঙ্গে লড়তে আমাদের সাহস আছে। না হয় দশ টাকা খরচ হবে।

সুনীতি বলিলেন—তিনিও কি চরটা দাবি করেছেন না কি?

—মুখে বলেন নাই, কিন্তু ভঙ্গি সে রকমই বটে। গাঁসুদ্ধ জমিদারই দাবি করছে মা, আমরাও দাবি করছি, আবার মহাজনরাও এসে জুটেছে, দাবি করেন নাই শুধু আপনারা। অথচ—।

-কি অথচ মোড়ল? ওতে কি আমাদেরও অংশ আছে?

বার বার হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া রংলাল বলিল—কি আর বলি মা! আর বলবই বা কাকে! আইনে তো বলছে চর যে-গায়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, গায়ের মালিক পাবে। তা চরখানি তো রায়হাটের সঙ্গে লেগে নাই! লেগে আছে উ-পারের চক আফজলপুরের সঙ্গে। তা আফজলপুর তো আপনাদেরই ষোল আনা। আর ই পারে হ'লেও তো, তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক!

অন্য প্রজারা রংলালের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মানুষ বৃদ্ধ হইলে ভীমরথী হয়, নহিলে দাবি জানাইতে আসিয়া এ কি বলিতেছে বুড়া! সুনীতি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—দেখ বাবা, তোমার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি না। তোমরা দাবি করছ—চর তোমাদের প্রাপ্য, এপারে কালী নদীতে জমি তোমাদের গেছে, ওপারের চরে সেটা তোমাদের পেতে হবে। আবার···

মধ্যপথেই বাধা দিয়া লজ্জিত ভাবে রংলাল বলিল—বলছি বইকি মা, সেটা হ'ল ধম্মবিচারের কথা। আপনিই বলেন, ধম্ম অনুসারে আমাদের পাওনা বটে কি না?

সুনীতি নীরবেই কথাটা ভাবিতেছিলেন, পাওয়া উচিত বইকি! দরিদ্র চাষী প্রজা—আহা-হা!

রংলাল আবার বলিল—আর আমি যা বলছি—ই হ'ল আইনের কথা। আইন তো আর ধম্মের ধার ধারে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানই হ'ল আইনের কাজ!

সুনীতি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন—আচ্ছা আজই আমি মহীকে আর মজুমদার-ঠাকুরপোকে আসতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তারা এখানে আসুন; তার পর তোমরা এস। তবে এ-কথা ঠিক, তোমাদের উপর কোন অবিচার হবে না।

রংলাল আবার বলিল—শুধু যেন আইনই দেখবেন না মা, ধম্ম পানেও একটুকুন তাকাবেন।

সুনীতি বলিলেন—ধম্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায়! কোন ভয় নেই তোমাদের। প্রজারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সুনীতি বলিলেন, তুই ওবেলা একবার ও-বাড়ীর দাদার কাছে যাবি, অহি!

সুনীতি রায়-বংশের ছোট বাড়ীর মালিক ইন্দ্র রায়কে বলেন দাদা। কিন্তু ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে সুনীতি দেবীর

কোন সম্পর্ক নাই। ইন্দ্র রায় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর প্রথমা পত্নী রাধারাণীর সহোদর। চক্রবর্ত্তী-বংশের সহিত রায়-বংশের বিরোধ আজ তিন পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। রায়-বংশের সকলেই চক্রবর্ত্তীদের প্রতি বিরূপ, কিন্তু এই ছোট বাড়ীর সহিতই বিরোধ যেন বেশী। তবুও আশ্চর্য্যের কথা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ছোট বাড়ীর রায়-বংশের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রায়েরা শ্রোত্রিয় এবং চক্রবর্ত্তী-বংশ কুলীন। সেকালে শ্রোত্রিয়গণ কন্যাসম্প্রদান করিতেন কুলীনের ঘরে। রামেশ্বরের পিতামহ পরমেশ্বর রায়-বংশের মাঝের বাড়ীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি শ্বশুর বর্ত্তমানে কখনও স্থায়ী ভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করেন নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি যেদিন এখানে আসিয়া মালিক হইয়া বসিলেন, রায়েদের সহিত তাহার বিবাদও বাধিল সেই দিনই। সেদিনও রায়েদের মুখপাত্র ছিলেন ঐ ছোট বাড়ীরই কর্ত্তা—এই ইন্দ্র রায়ের পিতামহ রাজচন্দ্র রায়। সেদিন পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শ্বশুরের অর্থাৎ রায়-বংশের মাঝের বাড়ীর কর্ত্তার শ্রাদ্ধবাসর। রাজচন্দ্র রায়ের উপরেই শ্রাদ্ধের সকল বন্দোবস্তের ভার ন্যস্ত ছিল। মজলিসে বসিয়া রাজচন্দ্র গড়গড়ার নল টানিয়া পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পরমেশ্বর নলটি না টানিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী রায়-বংশধরের হাতে সমর্পণ করিলেন। তার পর নিজের ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকা ও কল্কে বাহির করিয়া এক জন চাকরকে বলিলেন—কোন ব্রাহ্মণকে দে, জল সেজে—এই কল্কেতে আগুন দিয়ে দিক। তিনি ছিলেন পরম তেজস্বী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

রাজচন্দ্র সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শ্যালক, তিনি বলিলেন—ভণ্ডামিটুকু খুব আছে কুলীনদের!

হাসিয়া পরমেশ্বর বলিলেন—গুণ্ডামির চেয়ে ভণ্ডামি অনেক ভাল রায় মশায়!

রাজচন্দ্র উত্তর দিলেন, গুণ্ডামির অর্জ্জিত ভূ-সম্পত্তি কিন্তু বড়ই উপাদেয়। কথাটা শুনিয়া রায়-বংশের সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরমেশ্বর কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, শুধু ভূমি-সম্পত্তিই নয় রায় মশায়, গুণ্ডাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা; যদিও দুষ্কুলাৎ।

এবার মজলিসে যে যেখানে ছিল—সকলেই হাসিয়া উঠিল—হাসিলেন না কেবল রায়েরা। ফলে গোলও বাধিল। শ্রাদ্ধ অন্তে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় রায়েরা এক জোট হইয়া বলিলেন, পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তী আমাদের সঙ্গে এক গড়গড়ায় তামাক না খেলে আমরাও অন্ন গ্রহণ করব না।

পরমেশ্বর আপনার ছোট হুঁকাটিতে তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন, তাতে চক্রবর্ত্তী-বংশের কোন পুরুষের অধোগতি হবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অভাবে অধোগতি হ'তে রায়-বংশেরই হবে।

অতঃপর রায়দের মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিতে হইল। কিন্তু উভয় বংশের মনোজগতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিরোধের একটি ক্ষুদ্র পরিখা খনিত হইল সেই দিন।

পরমেশ্বর ও রাজচন্দ্রের সময়ে বিরোধের যে-পরিখা খনিত হইয়াছিল তাহা শুধু দুই বংশের মিলনের পক্ষে বাধা হইয়াই প্রবাহিত হইত, গ্রাস কিছুই করে নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তটগ্রাসিনী তটিনী; সে তট ভাঙিয়া কালী নদীর মত সম্পত্তি গ্রাস করিতে সুরু করিল। মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইল। রাজচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্রই প্রথমটা ঘায়েল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সোমেশ্বরের একটা সুবিধা ছিল, সমগ্র সম্পত্তিরই মালিক ছিলেন সোমেশ্বরের জননী। সোমেশ্বরের মাতামহ দলিল করিয়া সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন কন্যাকে, কাজেই সোমেশ্বরের দায়ে তাহার সম্পত্তি স্পর্শ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এই সময়ে বীরভূমের ইতিহাস-বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। সোমেশ্বর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাঁওতালদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া তিনি না কি সাঁওতাল-বাহিনী পরিচালনাও করিয়াছিলেন। এই লইয়া মাতা-পুত্রে বচসা হয়, পুত্র তখন বিদ্রোহের

উন্মত্ততায় উন্মত্ত, সে মাকে বলিয়া বসিল, তুমি বুঝবে না এর মূল্য, শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদভোজী, সেই দাসত্বের রক্তই তো তোমার শরীরে।

মা সর্পিণীর মত ফণা তুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কি বললি? এত বড় কথা তোর? তা তোর দোষ কি, পরের অন্নে যারা মানুষ হয় তাদের কথাটা চিরকাল বড় বড় হয়, সুর পঞ্চমে উঠেই থাকে।

সোমেশ্বর বলিলেন—তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেই দিলে, কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হয়, সুর তার পঞ্চমে ওঠে, সেটা তার জাতের গুণ; কাক তাতে চিরকাল ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।

ওদিকে তখন তেজচন্দ্র সদরে সাহেবদের নিকট হরদম লোক পাঠাইতেছেন। সে-সংবাদ সোমেশ্বরও শুনিলেন, তাঁহার মাও শুনিলেন। সোমেশ্বর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—রায়হাটি ভূমিসাৎ করে দেব, রায়-বংশ নির্ব্বংশ ক'রে দেব আমি।

সত্য বলিতে গেলে, সে গর্জ্জন তাঁহার শূন্যগর্ভ কাংস পাত্রের নিনাদ নয়, তাঁহার অধীনে তখন হাজারে হাজারে সাঁওতাল উন্মত্ত শক্তি লইয়া ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, বলিত রাঙা-ঠাকুর। সোমেশ্বরের মা পিতৃবংশের মমতায় বিহ্বল হইয়া পুত্রের পা দুইটা চাপিয়া ধরিলেন। সোমেশ্বর সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া সরিয়া আসিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—তুমি করলে কি মা, এ তুমি করলে কি? বাপের বংশের মমতায় আমার মাথায় বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে!

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া লক্ষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, ছেলে তাহাতে বুঝিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সোমেশ্বর বলিলেন—এ-পাপের স্খালন নেই মা, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রায়-বংশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না।

সেই রাত্রেই তিনি নীরবে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়, হাতে শুধু এক উলঙ্গ তলোয়ার। ঘর ছাড়িয়া সাঁওতালদের আস্তানা শাল-জঙ্গলের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, পিছন হইতে কে বলিল—এত জোরে হাঁটতে যে আমি পারছি না গো! একটু আস্তে চল।

চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া সোমেশ্বর দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী শৈবলিনী তাঁহার পিছন পিছন আসিতেছেন। তিনি স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—তুমি কোথায় যাবে?

শৈবলিনী প্রশ্ন করিল—আমি কোথায় থাকব?

—কেন, ঘরে মায়ের কাছে।

—তার পর যখন সাহেবরা আসবে! তোমায় জব্দ করতে আমায় ধ'রে নিয়ে যাবে!

—হুঁ। কথাটা সোমেশ্বরের মনে হয় নাই। সম্মুখেই গ্রামের সিদ্ধপীঠ সর্ব্বরক্ষার আশ্রম। সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন—দাঁড়াও ভেবে দেখি। খোকাকে রেখে এলে। যেন সেটাও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

শৈবলিনী বলিলেন—সে তো মায়ের কাছে আছে। মাকে তো জাগাতে পারলাম না।

বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন—হয়েছে! মায়ের কাছ ছাড়া আর রক্ষা পাবার স্থান নাই। এইখানেই তুমি থাকবে।

বিস্মিত হইয়া শৈবলিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—এখানে লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা আছে না কি?

—আছে! ভক্তিভরে মাকে প্রণাম কর—আশ্রয় ভিক্ষা কর। মাকে অবিশ্বাস ক'রো না।

হিন্দুর মেয়ে—প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বের হিন্দুর মেয়ে এ-কথা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করিত। শৈবলিনী পরম ভক্তিভরে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতা হইল।

পরমুহূর্ত্তে রক্তাক্ত অসি উদ্যত করিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া নীরব স্তব্ধ নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সোমেশ্বর শাল-জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। শাল-জঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ডনিবিড় বনশ্রী—

মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জালিয়া সিন্দুরে চিত্রিত মুখ, রক্তমুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল। এক সঙ্গে প্রায় শতাধিক মাদল বাজিতেছে—ধিতাং ধিতাং ; ধিতাং ধিতাং ! থাকিয়া থাকিয়া হাজার সাঁওতাল একসঙ্গে উল্লাস করিয়া কুক্ দিয়া উঠিতেছে—উ—র—র—উ—র—র !

সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন ; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারীদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েক জন ইংরেজ নরনারীকে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথে ময়ূরাক্ষী নদী। নদীর ওপারে বন্দুকধারী ইংরেজের ফৌজ। সোমেশ্বর আদেশ করিলেন, আর এগোস না সেন, গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়া।

ওদিক হইতে ইতিমধ্যে ইংরেজের ফৌজ ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ আরম্ভ করিল। সাঁওতালরা সবিস্ময়ে দেখিল—তাহারা অক্ষতই আছে—কাহারও গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই। সেই হইল কাল। —গুলি আমরা খেয়ে নিলাম। বলিয়া উন্মত্ত সাঁওতালের দল ভরা ময়ূরাক্ষীর বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে ওপারে আবার বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল ; ভরা ময়ূরাক্ষীর গৈরিক জলস্রোত রাঙা হইয়া গেল—মৃতদেহ ভাসিয়া গেল কুটার মত। সোমেশ্বর চিত্রার্পিতের মতই তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও এক সময় তটচ্যুত বৃক্ষের মত ময়ূরাক্ষীর জলে পড়িয়া গেলেন—বুকে বিঁধিয়া রাইফেলের গুলি পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর সোমেশ্বরের মা পৌত্র রামেশ্বরকে লইয়া লড়াই করিতে বসিলেন—সরকার বাহাদুরের সঙ্গে। সরকার সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। সোমেশ্বরের মা মোকদ্দমা করিলেন—সম্পত্তি তাঁহার, সোমেশ্বরের নয়। আর, সরকার-বিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই ; সুতরাং সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না।

সরকার হইতে তলব হইল রায়বাবুদের, তাহার মধ্যে তেজচন্দ্র প্রধান। তাঁহাদের কাছে জানিতে চাহিলেন সোমেশ্বরের মায়ের কথা সত্য কিনা। বিদ্রোহী সোমেশ্বরের সহিত সত্যই তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, কি না!

বাড়ী হইতে বাহির হইবার মুখে তেজচন্দ্রের মা বলিলেন—ও-বাড়ীর ঠাকুরঝি রায়-বংশকে বাঁচাবার জন্যে সোমেশ্বরের পায়ে ধরেছিলেন। আমাকেও কি—।

তাড়াতাড়ি মায়ের পদধূলি লইয়া তেজচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে তো তোমার ঠাকুরঝির পাতানো সম্বন্ধ মা, আমার সঙ্গে যে ওঁর রক্তের সম্বন্ধ।

মা বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি সেই সুমতিই হোক তোমাদের। কিন্তু কি জান—রায়বাবুদের বোনকে ভালবাসা—কংসের ভালবাসা।

তেজচন্দ্র বলিলেন—চক্রবর্ত্তী জয়দ্রথের গুষ্ঠি মা, শ্যালক-বংশ নাশ করতে ব্যূহমুখে সর্ব্বাগ্রে থাকেন ওঁরা। যাকগে—ফিরে আসি, তার পর বিচার ক'রে যা করতে হয় ক'রো, যা বলতে হয় ব'লো

সেখানে রায়-বংশীয়েরা একবাক্যে রায়-বংশের কন্যাকে সমর্থন করিয়া আসিলেন। তেজচন্দ্রের জননীকে কিছু বলিতে বা করিতে হইল না—যাহা বলিবার এবং যাহা করিবার, বলিতে ও করিতে স্বয়ং সোমেশ্বরের জননী পৌত্র রামেশ্বরের হাত ধরিয়া রায়-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিতে তিনি কিছু পারিলেন না, কিন্তু প্রতি জনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তেজচন্দ্র রামেশ্বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার মা-ননদের হাত ধরিয়া বলিলেন—বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া তেজচন্দ্রের মা বলিলেন—রাধি, আসন নিয়ে আয়।

রাধি রাধারাণী—তেজচন্দ্রের সাত বৎসরের কন্যা। সে

একটা কি করিতেছিল, সে জবাব দিল—আমি কি তোমার ঝি না কি? বল না ঝিকে।

কঠোর স্বরে ঠাকুরমা বলিলেন—উঠে আয় বলছি হারামজাদী।

হাসিয়া সোমেশ্বরের মা বলিলেন—কেন ঘাঁটাচ্ছ ভাই-বউ; আমাদের বংশের মেয়ের ধারাই ওই। আমরাও তাই—রায়-বাড়ীর মেয়ে চিরকেলে জাঁহাবাজ।

তেজচন্দ্রের মা বলিলেন—শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের যে কি হাল হবে, তাই আমি ভেবে মরি। ও মেয়ে স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাবে বসাবে, আর নয়তো শ্বশুরবাড়ীর অন্ন ওর কপালে নেই।

সোমেশ্বরের মা এবার রাধারাণীকে ডাকিলেন—ও নাতনী এখানে এক বার এস না, এক বার তোমায় দেখি, আমিও তোমার ঠাকুমা হই।

সোমেশ্বরের মা রাধারাণীর অপরিচিতা নহেন। কিন্তু এ সংসারে ইষ্টের পর শত্রুই নাকি মানুষের আরাধ্য বস্তু। সময় সময় ইষ্টকে ছাপাইয়াও শত্রু মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। সেই হেতু সোমেশ্বরের মা, গ্রামের লোক এবং এই বংশের মেয়ে হইয়াও, রায়-পরিবারের সকলেরই সম্ভ্রমের পাত্রী। তাঁহাকে দেখিয়া রাধারাণী নিতান্ত ভালমানুষের মত ঝির হাত হইতে আসনখানা টানিয়া লইয়া আগাইয়া আসিল এবং সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া টিপ করিয়া প্রণাম করিয়া নীরবে যেন আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোমেশ্বরের মা পরম স্নেহে আদর করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—তোমরা মিথ্যে নিন্দে কর বউ; এমন সুন্দর আর এমন ভাল মেয়ে তো আমি দেখি নি! এ্যাঁ, এ যে বড় ভাল মেয়ে গো।

তেজচন্দ্রের মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—রাধুকে তাহ'লে তোমাকে পায়ে ঠাঁই দিতে হবে। আমরা আর কোথায় যাব? রামেশ্বরের সঙ্গে রাধির বিয়ে দেবে, তুমি বল।

সোমেশ্বরের মা এমনটা ঘটিবে প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়েই রামেশ্বরের হাত ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন তেজচন্দ্র।

তাহার মা বলিলেন—তেজু ধর পিসিমার পায়ে ধর। ধর বলছি ধর। খবরদার, 'হ্যাঁ' যত ক্ষণ না-বলবেন, ছাড়বি না। আমি ধরেছি, রামেশ্বরের সঙ্গে রাধুর বিয়ের জন্যে।

তেজচন্দ্র পিসীমার পাদস্পর্শ করিয়াই বসিয়াছিল। একথাটা শুনিয়া তাহারও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। রামেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহার উপর আজিকার এই প্রণাম-আশীর্ব্বাদের বিনিময়ের ফলে মন হইয়াছিল মিলনাকাঙ্ক্ষী; কথাটা শুনিবামাত্র তেজচন্দ্র সত্যই সোমেশ্বরের মায়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

তেজচন্দ্রের মা বলিলেন—আমি তোমায় মিনতি করছি ঠাকুরঝি—'না' তুমি বলো না। এ সর্ব্বনেশে ঝগড়ার শেষ হোক, সেতু একটা বাঁধ।

সোমেশ্বরের মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি নিজে রায়-বংশের কন্যা, আপনার পিতৃকুলের সহিত এই আক্রোশ-ভরা দ্বন্দ্ব তাঁহারও ভাল লাগে না। চক্রবর্ত্তীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রায়দের পরাজয় ঘটিলে, অন্তরালে লোকে তাঁহাকে বংশনাশিনী কন্যা বলিয়া অভিহিত করে, সে সংবাদও তাঁহার অজানা নয়। আর, রামেশ্বর সবেমাত্র দশ বৎসরের বালক, এদিকে তাঁহার জীবন-প্রদীপেও তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; তাঁহার অন্তে রামেশ্বরকে এই রায়-জনাকীর্ণ রায়হাটে দেখিবে কে, এ-ভাবনাও তাঁহার কম নয়। তিনি আর দ্বিধা করিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন—তাই হোক বউ, রামেশ্বরকে তেজচন্দ্রের হাতেই দিলাম। বলিয়া তিনি রাধারাণীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাহার কানে কানে বলিলেন—কি ভাই বর পছন্দ তো?

রাধারাণী রামেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার সোমেশ্বরের মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল—বাবা কি কটা চোখ!

সোমেশ্বরের মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—রায়-বংশের মেয়ে জব্দ করিতে চক্রবর্ত্তী-বংশ সিদ্ধহস্ত। তখন তেজচন্দ্রের বাড়ীখানা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া

সেতুবন্ধ রচিত হইল।

তেজচন্দ্র যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন সেতুর উপর লোক-চলাচলের বিরাম ছিল না। রাধারাণী এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী যাইত আসিত, রামেশ্বর আসিতেন যাইতেন, তেজচন্দ্র স্বয়ং এক বেলা রামেশ্বরের কাছারিতে বসিয়া হিসাব-নিকাশ কাগজপত্র দেখিতেন, অন্দরে রাধারাণীর মা করিতেন গৃহস্থালীর তদারক।

সেকালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, কিন্তু তেজচন্দ্র পুত্র-জামাতার শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছিলেন; পুঁথি-বই সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত ও মৌলবী দুই জন শিক্ষক তিনি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র ফারসীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, আইনের বইয়ে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। রামেশ্বর পড়িতেন কাব্য।

ইন্দ্রচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন—কাব্য আর প'ড়ো না; জ্ঞান তো রসাধিক্য হ'লে বিকার হয়।

রামেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন—আহা বন্ধু, তোমার বাক্য সফল হোক—হোক আমার রসবিকার। রায়-বংশের 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'রা ঘিরে বসুক আমাকে, পদ্মপত্র দিয়ে বীজন করুক, চন্দনরসে অভিষিক্ত ক'রে দিক আমার অঙ্গ—

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিতেন—থাম ফক্কড় কোথাকার!

রামেশ্বর আপন মনেই আওড়াইতেন—শ্রোণীভারাদল-সগমনা—স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং—।

ইহার ফলে, সত্যসত্যই রামেশ্বর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। বাড়ীর মধ্যে রাধারাণী, রায়-বাড়ীর স্বভাব-মুখরা মেয়ে কঠোর কলহপরায়ণা হইয়া উঠিল। তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের পরে রায়-বংশের মেয়ে ও চক্রবর্ত্তী-বংশের ছেলের কলহ আবার ঘটনাচক্রে উভয় বংশে সংক্রামিত হইয়া দাঁড়াইল।

সেদিন রাধারাণী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। সন্ধ্যায় রামেশ্বর একগাছি বেলফুলের মালা গলায় দিয়া চারি দিকে আতরের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে সম্ভাষণও করিলেন না, রামেশ্বর নিজেই আসন পরিগ্রহ করিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন—নমস্তভ্যং শ্যালক-প্রবরং কঠোরং কুম্ভবদনং—;

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন—তুমি অতি ইতর!

রামেশ্বর বলিলেন, শ্রেষ্ঠ রস যেহেতু মিষ্ট এবং মিষ্টান্নে যেহেতু ইতরেরই একচেটিয়া অধিকার, সেই হেতু ইতর আখ্যায় ধন্যোহং। তাহ'লে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

ইন্দ্র রায় আদরের ভগ্নী রাধারাণীর মনোবেদনার হেতু রামেশ্বরকে ইহাতেও মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না, তিনি আর কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রামেশ্বরও আর অপেক্ষা করিলেন না, তিনি উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—নাঃ, অরসিকেষু রস নিবেদনটা নিতান্তই মূর্খতা। চল্‌লাম অন্দরে।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ডাকিলেন—কই, সখি মদলেখা কই?

শ্যালক ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী হেমাঙ্গিনীকে তিনি বলিতেন সখি মদলেখা। তাঁহাদের কথোপকথন হইত মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর ভাষায়। স্বয়ং রামেশ্বর তাঁহাদিগকে কাদম্বরী পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনী আদর করিয়া রাধারাণীর নামকরণ করিয়া-ছিলেন কাদম্বরী। রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন—তা হ'লে রায়গিন্নীকে যে নর্ম্মসহচরী 'মদলেখা' হ'তে হয়।

হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন—তা হ'লে আপনি আমাদের 'চন্দ্রাপীড়' হলেন তো?

—কাদম্বরীর সম্বন্ধনির্ণয়-সূত্রানুসারে অবশ্যই হ'তে হয়; না হয়ে উপায় কি? আর আমার জন্মকুণ্ডলীতেও না কি লগ্নে আছেন চন্দ্রদেবতা—সুতরাং মিলেও নাকি যাচ্ছে খানিকটা!

—খানিকটা! বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন—খানিকটা! বিনয় প্রকাশ করছেন যে! রূপে গুণে ষোল আনা মিল যে। রূপের কথা দর্পণেই দেখতে পাবেন। আর গুণেও ঠিক তাই। দিবসে সমস্ত দিনটাই নিদ্রা—উদয় হয় সন্ধ্যার সময়; আর চন্দ্রদেবতার তো সাতাশটি প্রেয়সী, আপনার কথা আপনি জানেন—তবে হার মানবেন না এটা হলফ ক'রেই বলতে পারি।

সেদিন, অর্থাৎ এই নামকরণের দিন, রাধারাণীর অভিমান রামেশ্বর সন্ধ্যাতেই ভাঙাইয়াছিলেন—কাজেই রাধারাণী এ কথায় উগ্র না হইয়া শ্লেষভরে বলিয়াছিল—আমাদের দেশের কুলীনের ছেলেরা সবাই চন্দ্রলগ্ন পুরুষ—কারু এক-শ বিয়ে, কারু এক-শ ঘাট! কপালে আগুন কুলীনের!

যোড় হাত করিয়া রামেশ্বর বলিয়াছিলেন, দেবি, সে অপরাধে তো অপরাধী নয় এ দাস! আর আজ থেকে—এই নবচন্দ্রাপীড় জন্মে—চন্দ্রাপীড় দাসখত লিখে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, রাধারাণী কাদম্বরী ছাড়া আর সে কাউকে জানবে না!

রাধারাণী তর্জ্জনী তুলিয়া শাসন করিয়া বলিয়াছিল—দেখো মনে থাকবে তো!

আজ রামেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—আসুন, দেবতা আসুন।

চাপা গলায় সশঙ্ক ভঙ্গিতে রামেশ্বর বলিলেন—আপনার দেবী কাদম্বরী কই?

আসন পাতিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বসুন। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—না রায় মশায়, এবার আপনার নিজেকে শোধরান উচিত হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রামেশ্বর বলিলেন—চেষ্টা আমি করি রায়-গিন্নী, কিন্তু পারি না।

—পারি না বললে চলবে কেন? আপনার ব্যবহারে বিতৃষ্ণায় রাধুর চিত্তেই যদি বিকার উপস্থিত হয়—তখন কি করবেন বলুন তো?

রামেশ্বর একদৃষ্টে শ্যালক-পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—হুঁ, কেমন মনে হচ্ছে? তার চেয়ে সাবধান হোন এখন থেকে! রাধুর মন আজ যা দেখলাম, তাতে আত্মহত্যা করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সময় থেকে সাবধান হোন।

রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র; তিনি হেমাঙ্গিনীর 'বিকার' শব্দের এই নূতন বিশ্লেষণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বিকার শব্দের যে অর্থ তিনি গ্রহণ করিলেন—শাস্ত্র সেই অর্থই অনুমোদন করে, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রের মত ক্ষেত্রে সেই বিকার হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত—মনে মনে তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন—রায়-গিন্নী, হয় নিজেকে সংশোধন করব, নয় ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ করব।

হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া এইবার হাসিমুখে বলিলেন—তবে চলুন চন্দ্রাপীড়, দেবী কাদম্বরী মান ও বিরহ তাপিতা হয়ে হিমগৃহে অবস্থান করছেন। আসুন, অধিনী মদলেখা এখনি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

দোতালার লম্বা দরদালানের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই মায়ের ঘরে রাধারাণী শুইয়াছিল। মায়ের মৃত্যুর পর ঘরখানি বন্ধই থাকে—রাধারাণী আসিলে সে-ই ব্যবহার করে। দরদালানে প্রবেশ করিয়াই রামেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাধারাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি তরুণকান্তি যুবক কি একখানা বই পড়িয়া রাধারাণীকে শুনাইতেছে।

—ওটি কে, রায়-গিন্নী?

রামেশ্বরের সচকিত ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কৌতুক-প্রবণা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেব, উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি এই তরুণ-কান্তি কেয়ূরককে আমরা নিযুক্ত করেছি।

ছেলেটি রাধারাণীর পিসতুত ভাই। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে মামার বাড়ীতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে আজই।

ইহার পর ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও রহস্যের আবরণে আবৃত, এবং সেই জন্যই সংক্ষিপ্ত। জানেন একমাত্র রামেশ্বর আর জানিত রাধারাণী। তবে ইহার পর দিন হইতে সেতুতে যেন ফাট ধরিল। রাধারাণীর পিত্রালয় আগা বন্ধ হইয়া গেল। রামেশ্বর নিজে হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, অন্য দিক দিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয়ানুরাগী। বাল্যকালে রামেশ্বরের যে পিঙ্গল চোখ দেখিয়া রাধারাণী ভয় পাইয়াছিল, সে-চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে রাধারাণী ভয় না করিয়া পারিল না। ওদিকে রায়-বংশের সহিত আবার খুঁটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল। পরস্পরের যাওয়া-আসা সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট রহিল

কেবল লৌকিকতাটুকু। ইহার বৎসর খানেক পরে রাধারাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু মাস খানেক পর অকস্মাৎ সন্তানটি মারা গেল; কয়েক দিন পরই এক দিন রাত্রে রাধারাণীও হইল নিরুদিষ্টা। প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল, রাধারাণী, বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে, ইন্দ্র রায় সন্দেহ করিয়াছিলেন, রাধুকে হত্যা করিয়াছে রামেশ্বর। কিন্তু রাধারাণীর সন্ধান পাওয়া গেল দশ মাইল দূরবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

লজ্জায় রায়-বংশের মাথা কাটা গেল। রামেশ্বর আবার বিবাহ করিলেন পশ্চিম-প্রবাসী এক শিক্ষক-কন্যা সুনীতিকে। মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র দুইটি সন্তান সুনীতির। তার পর রামেশ্বর এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আজ দুই বৎসর একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বসিয়াছেন। আপনার মনে মৃদুস্বরে কথা বলেন, আর চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন।

এই হইল রায়-বংশ এবং চক্রবর্ত্তী-বংশের ইতিহাস। এই সম্বন্ধেই সুনীতি ইন্দ্র রায়কে বলেন—ও-বাড়ীর দাদা।

* * *

সুনীতি সেদিন অপরাহ্নে অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুই যাবি একবার ওবাড়ীর দাদার কাছে।

অহি বলিল—কি বলব?

—বলবি। সুনীতি খানিকটা চিন্তা করিয়া লইলেন। তার পর বলিলেন—নাঃ থাক অহি, মজুমদার-ঠাকুরপো আর মহী ফিরেই আসুক। আবার কি বলবেন রায়-বাবুরা, তার চেয়ে থাক্।

অহি বলিল—ঐ তোমাদের এক ভয়। মানুষকে বিনা কারণে অপমান করা কি এতই সোজা মা? মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকায় কি করেছিলেন জান? সেখানে ইংরেজরা রাস্তায় যে-ধারে যেত, রাস্তার সে-ধারে কালা আদমীকে যেতে দিত না। গেলে অপমান করত, জেল পর্য্যন্ত হ'ত। মহাত্মাজী সমস্ত অপমান নির্য্যাতন সহ্য করে সেই রাস্তাতেই যেতে আরম্ভ করলেন। অপমানের ভয়ে ব'সে থাকলে কি কখনও সেই অধিকার পেত কালা আদমী? বল কি বলতে হবে!

সুনীতি দেবী শিক্ষকের কন্যা, তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা। তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ, তবে যা, গিয়ে বলবি, এই যে এত বড় গ্রাম জুড়ে বিবাদ, এটা কি ভাল? আপনিই এখন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, আপনিই এটা মিটিয়ে দেন। তবে গরিব প্রজা যেন কোনমতেই মারা না পড়ে, সেইটে দেখবেন—এই কথাটা মা বিশেষ করে ব'লে দিয়েছেন।

ইন্দ্র রায় তখন কাছারি-ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছেন এক জন মহাজনের সঙ্গে। ঐ চর লইয়াই কথা। মহাজনের বক্তব্য—পাঁচ শত টাকা নজরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রায়-মহাশয় মহাজনের দাবি স্বীকার করুন।

ইন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন—চরটা অন্ততঃ পাঁচ-শ বিঘে, দশ টাকা বিঘে সেলামী নিয়ে বন্দোবস্ত করলেও যে পাঁচ হাজার টাকা হবে দস্তুর, আর এক টাকা বিঘে খাজনা হ'লেও বছরে পাঁচ-শ টাকা খাজনা।

—কিন্তু সে তো মামলা-মোকদ্দমার কথা হুজুর।

—ডিগ্রী তো আমি পাবই, আর ডিগ্রী হ'লে খরচাও পাব। সুতরাং লোকসান করতে যাবার কোন কারণ নেই আমার।

মহাজন চিন্তা করিয়া বলিল—আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব, আর খাজনা ওই পাঁচ-শ টাকা। অগ্রিম বরং আমি পাঁচ-শ টাকা দিচ্ছি। চার দিন পর আসব আমি।

নিস্পৃহতার সহিত রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, ভাল, এস।

লোকটা চলিয়া যাইতেই রায় বাহিরে আসিলেন। অহীন্দ্র তাঁহার অপেক্ষাতে বাহিরেই বসিয়া ছিল। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অহি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমার মা আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—তুমি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছেলে, না? রায়েরা চক্রবর্ত্তীদের কখনও বাবু বলেন না।

—হ্যাঁ।

—হুঁ, চোখ আর চুল দেখেই চেনা যায়। রামেশ্বরের

কোন্ ছেলে তুমি? রায়ের সকল কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের একটি সুর তীক্ষ্ণ সূচিকার মত মানুষকে যেন বিদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া স্বচ্ছন্দে সরল-ভঙ্গিতে অহি উত্তর দিল—আমি তাঁর ছোট ছেলে।

—কি কর তুমি? পড়—না পড়া ছেড়ে দিয়েছ?

—না, আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি শহরের স্কুলে।

রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ফার্ষ্ট ক্লাসে পড় তুমি? কিন্তু—বয়স যে তোমার অত্যন্ত কম! বাঃ—ভাল ছেলে তুমি। তা তোমার বাপও যে খুব বুদ্ধিমান ছিল! কিন্তু তোমার বড় ভাই, কি নাম তার?—সে তো শুনেছি পড়াশুনো কিছু করে নি। স্কুলে তো তার খারাপ ছেলে ব'লে অখ্যাতিই ছিল; মাষ্টার বলেছিলেন আমাকে।

অহি স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমার কথাগুলো একবার শুনে নিন।

হাসিয়া রায় বলিলেন—তুমি তো বলবে ঐ চরটার কথা?

—হ্যাঁ।

—দেখ, ও-চরটা আমার। অবশ্য আমার জ্ঞান-বুদ্ধিমত। এই কথাই বলবে তোমার মাকে।

—বেশ, তাই বলব। তবে মায়ের অনুরোধ ছিল যেন প্রজাদের উপর কোন অবিচার না-হয়, সেইটে আপনি দেখবেন।

রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। অহীন্দ্রও আর অপেক্ষা না করিয়া গমনোদ্যত হইয়া বলিল—তা হ'লে আমি আসি।

—সে কি? একটু জল খেয়ে যাও।

—না, জল আমি খেয়েই বেরিয়েছি, চরের দিকটায় একটু বেড়াতে যাব।

রায় বলিলেন—শোন। তখন অহীন্দ্র কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অহীন্দ্র দাঁড়াইল, রায় বলিলেন—দেখ, চরের উপরটায় শুনেছি বড় সাপের উপদ্রব। ওদিকটায় তোমার না যাওয়াই ভাল।

অহীন্দ্র সবিনয়ে বলিল—আচ্ছা।—আমি ভিতরে যাব না। [ক্রমশঃ]

বিয়োগিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

তেমনি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আজও দ্বিপ্রহরে,
কিন্তু কোথা সে চাঞ্চল্য? সেই ক্ষিপ্র করে
সেবালুব্ধ ব্যগ্রতায় সেই পাখা-করা?
কোথায় সে ভাষাহীন শত প্রশ্নভরা
কোমল করুণকান্ত সেই মুগ্ধ আঁখি?
কোথা তুমি? নিঃসহায় আমি যে একাকী!

বৈকালে বৈশাখী মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
হু হু ক'রে হানে বায়ু উতলা নিঃশ্বাস!
—ওগো, ওগো, এক বার ছাতের উপরে
এস, এস—দেখ, দেখ—একান্ত অন্তরে
কোথা সেই উচ্ছ্বসিত অন্তরের ডাক?
ডাক, ডাক—একা আমি, এল যে বৈশাখ!
ডাক, ডাক,—ডাকে মেঘ, নামে বৃষ্টিধারা,
বড় নিঃসহায় আমি, সর্ব্বসঙ্গহারা!

চৈতন্য-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন তথ্য

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

চৈতন্য-যুগ লইয়া ইতিপূর্বে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ-গুলি হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে উড়িয়া ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি আলোচিত হইবে। প্রাচীন উড়িয়া গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। তাহার কারণ:-

(১) লোকের ঔদাসীন্যের ফলে অনেক মূল্যবান্ পুঁথি লোপ পাইয়াছে ও অনেক পুঁথি লোপ পাইতে বসিয়াছে।

(২) আথরিয়ারা ইচ্ছামত লিখিয়া যাওয়ায় পুঁথিগুলির পাঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

(৩) বাজারে ছাপা বইগুলির প্রকাশকেরা দাম অনুযায়ী বইয়ের কলেবর হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে। শূন্যসংহিতা একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। তিনটি ছাপা বই মিলাইয়া ইহার পাঠ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বোঝা কঠিন। উড়িষ্যায় প্রচলিত চৈতন্য-পূর্ব ধর্মতত্ত্ব না বুঝিলে অনেক পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কারণে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের *Modern Buddhism in Orissa* গ্রন্থের অনেক স্থানে উড়িয়া ভাষা হইতে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তির বিকৃত অর্থ দেখিতে পাই।

বাংলা প্রবন্ধে উড়িয়া কোটেশন্ দিলে বিস্তর মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিয়া যায় ও প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যায়। সুতরাং কেবল গ্রন্থ-সূচী দেওয়া হইল।

চৈতন্য-ভাগবত [সংক্ষেপে ঈ. ভা]-লেখক ঈশ্বর দাস। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচনা সমাপ্তি হয়, কারণ গ্রন্থরচনার পরেও চৈতন্যদেবের তিরোভাব-প্রসঙ্গে লোকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ ও রায় রামানন্দের তিরোভাবেরও উল্লেখ আছে। ঈশ্বর দাসের ভাগবতের সহিত বৃন্দাবন দাসের বইয়ের কোন সম্পর্ক নাই। এটি একটি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ পুঁথি।

যশোবন্ত দাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞা—যশোবন্ত দাসের শিষ্য সুদর্শন দাস বিরচিত। সংক্ষেপে এই পুঁথিটিকে চৌ. আ. বলিব।

ভক্তি জ্ঞান ব্রহ্ম যোগ—অচ্যুতানন্দ দাস এই পুঁথির লেখক।

রাস—অনন্ত দাস পুঁথিটি লিখিয়াছেন।

শূন্যসংহিতা [সংক্ষেপে শূ স]—অচ্যুতানন্দ দাস।

বেদান্তসার গুপ্ত গীতা—বলরাম দাস।

জগন্নাথ (দাস) চরিতামৃত [সংক্ষেপে জ চ.]-লেখক দিবাকর দাস জগন্নাথ দাসের জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

নিত্যগুপ্ত মণি—বোধ হয় দিবাকর দাস এই সংস্কৃত বইখানি লিখিয়াছেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

গুরুভক্তি গীতা—অচ্যুতানন্দের শিষ্যদের রচনা। জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস [মহাপাত্র] অচ্যুতানন্দ দাস [খুন্টিয়া] যশোবন্ত দাস [মল্লিক] ও অনন্ত দাস [মহান্তি] মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার সহিত কীর্তনে যোগ দিতেন [শূ স. ১ম অধ্যায়]। তাঁহারা "পঞ্চ সখা" নামে অভিহিত হইতেন। উড়িষ্যার চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব ধর্মের তাঁহারা নেতা ছিলেন। চৈতন্যদেবকে তাঁহারা জগন্নাথের সচল বিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ভক্তি করিতেন। মহাপ্রভুও সকলের সহিত তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন [শূ. স. ১]। রাস পুঁথিতে প্রভু পঞ্চসখাদের জ্ঞান ও ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। জগন্নাথ দাসের গভীর ধর্মজ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে "অতিবড়" উপাধি দিয়াছিলেন [রাস ও জ. চ. ৩]।

"অতিবড়" জগন্নাথ দাস উড়িয়া ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ উড়িষ্যায় তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভগবান দাস পুরাণ পাণ্ডার তিনি পুত্র। আঠার বৎসর বয়সে প্রভুর সহিত প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জগন্নাথ মন্দির-প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, এই সময় মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন ও ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন [জ. চ ২৪]। তাহার পর ছয় বৎসর কাল তিনি নিরন্তর প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথ দাস প্রতাপরুদ্রের মহিষী গৌরী পট্টমহাদেবীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন [নিত্যগুপ্ত মণি, ২০]। এক কাহ্ন খুণ্টিয়া জগন্নাথ দাসের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন [জ চ ১]। তিনিই বোধ হয় সুপরিচিত কানাই খুণ্টিয়া।

যশোবন্ত দাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞায় [৪২শ অধ্যায়] দেখি চৈতন্যদেব, রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ও পঞ্চসখার সহিত মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া আছেন। মহাপ্রভু কহিলেন যে পঞ্চসখা যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। পঞ্চসখার মুখপাত্রস্বরূপ যশোবন্ত বলিলেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য নামে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও তাঁহার আজ্ঞায় পঞ্চসখা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শূন্যসংহিতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছেন।

যশোবন্ত মহাপ্রভুকে তাঁহার দীক্ষাগুরু বলিয়াছিলেন [চৌ. আ. ৪২]। গুরুভক্তি গীতা [২য় খণ্ড, ৪০] অনুসারে চৈতন্যদেব জগন্নাথকে ষোল নাম মহামন্ত্র, যশোবন্তকে শ্যাম মন্ত্র, বলরামকে তারকব্রহ্ম নাম, অনন্তকে একাক্ষর ও অচ্যুতানন্দকে অনাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

বলরাম দাস দ্বাপর যুগে সুবল-সখা ছিলেন বলিয়া পরিচিত [ঈ. ভা. ৪৬ ও চৌ. আ. ৪২]। মহাপ্রভু তাঁহাকে তারকব্রহ্ম নামে দীক্ষা দিয়াছিলেন [গুরুভক্তি গীতা ও ঈ. ভা. ৪৬]। বলরাম এক মত্ত হস্তীকে হরিনাম শুনাইয়া শান্ত করায় প্রভু তাঁহাকে "মত্ত" উপাধি প্রদান করেন [ঈ. ভা. ৪৭]। মত্ত বলরাম গৌরীদাস পণ্ডিতেরও শিষ্য ছিলেন [জ. চ. ৭]।

মহাপ্রভু যখন পুরীতে শুভাগমন করেন, অচ্যুতানন্দের তখন বাল্যাবস্থা। কিশোর-জীবনে তিনি পুরীতে অবস্থান করেন। প্রভু তাঁহার হস্তে খোল করতাল প্রদান করিয়া কীর্তন করিতে বলিলেন [শূ. স. ১]। কিছু দিন তীর্থ পর্যটন করিয়া অচ্যুতানন্দ পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া আসেন। তিনি ও অন্য চার সখা মহাপ্রভুর সহিত কীর্তন-রসে যোগ দিয়া হরিধ্বনিতে জগৎ মুখরিত করিতে লাগিলেন [শূ. স. ১]।

এই বর্ণনার পরেই প্রভুর তিরোভাব বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় পঞ্চ সখা মহাপ্রভুর শেষ জীবনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্ত দাসের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কোনার্কে। অনন্তকে দীক্ষা দিতে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে আদেশ দিলেন [ঈ. ভা. ৪৬]।

গৌড়ীয় লেখকদের মধ্যে কেবল জয়কৃষ্ণ দাস ও দেবকীনন্দন তাঁহাদের বৈষ্ণব-বন্দনায় জগন্নাথ ও বলরাম দাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এতগুলি উড়িয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে পঞ্চ সখার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে মিথ্যা কি করিয়া বলিব? বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিকদের জন্য লিখিত হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাষ্ঠকাটা, তীর্থ, আচার্য্য ও মহান্তি জগন্নাথের নাম চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব অতিবড় জগন্নাথ সম্বন্ধে তিনি নীরব। সেইরূপ পরমা বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর নাম কোন উড়িয়া অ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে খুঁজিয়া পাই না।

চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব ধর্মমতে মহাপ্রভু "বুদ্ধ-অবতার" রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন [শূ. স. ১০, ১৩, ঈ. ভা. ৩, ৪৬, ৫৩, ৬৫]। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা আদিবুদ্ধ জগন্নাথ বিগ্রহ রূপে নীলাচলে আবির্ভূত হইলেন [দারুব্রহ্ম গীতা —জগন্নাথ দাস; দেউল তোলা—কৃষ্ণদাস; শূ. স. ২৭, ২৯]। তিনি দুষ্টদের বিনাশ করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা আগাছার মত আবার দেখা দিল। কাজেই বার'বার বুদ্ধ-অবতারের প্রয়োজন হইতে লাগিল। গৌতম-বুদ্ধ জগন্নাথ-বুদ্ধের শাখা অবতার। জগন্নাথের তুলনায় তিনি সেদিনের মানুষ। তিনি কিছু কাল বাঁচিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন। সুতরাং পরে চৈতন্যরূপে পুনরায়

বুদ্ধ-অবতারের আবির্ভাব হইল [শূ. স. ১০]। তিনি "ত্মা বিনাশি তত্ত্বজ্ঞান বুঝাই" জগন্নাথ-বিগ্রহমধ্যে লীন হইলেন [শূ. স. ১]।

চৈতন্যদেব ভাবাবেশে জগন্নাথ-বিগ্রহ সমীপে অপ্রকট হওয়ায় তিনি বুদ্ধাবতার ছিলেন—লোকের মনে এ ধারণা জন্মিল।

ঈশ্বর দাসের ভাগবতে, "বউধাবতারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বর্গারোহণে সর্বগুচিনাম পঞ্চষঠি অধ্যায়", শূন্যসংহিতা প্রথম অধ্যায় ও জগন্নাথচরিতামৃত সপ্তম অধ্যায় অনুসারে মহাপ্রভু ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হইলেন। ঈশান নাগর শ্রীমন্দির মধ্যে অপ্রকট হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। লোচন দাসও জগন্নাথ-বিগ্রহে কিন্তু গুণ্ডিচা বাড়ীতে তিরোভাবের কথা লিখিয়াছেন। তিনি ও জয়ানন্দ আষাঢ় শুক্লা-সপ্তমী তিরোভাবের সময় দিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর দাস সুস্পষ্ট ভাবে ও অচ্যুতানন্দ পরোক্ষ ভাবে বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়ার দিন মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিরোভাবের সময় বাছিয়া লওয়া আরও প্রমাণসাপেক্ষ। তবে জয়ানন্দ-বর্ণিত পায়ে ইঁট ফুটা বা তোটায় বিশ্রাম ও লীলাসঙ্গোপন যে কাল্পনিক তাহা বুঝা যাইতেছে।

চৈতন্যদেব যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, এ-কথা তাঁহার সমসাময়িক ও ভক্ত অচ্যুতানন্দ রচিত "ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান" হইতে জানা যায়।

উড়িয়া বইগুলি হইতে জানা যায় যে রাজা প্রতাপরুদ্র পঞ্চ সখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের ধর্মজ্ঞান ও তন্ত্র-মন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন [শূ. স. ১, ৯; বেদান্তসার গুপ্ত গীতা ১, ২৪ ও চৌ. আ. ৩৯, ৪২]।

এই সকল বিবরণের ফলে জানা গেল :—(১) চৈতন্যদেবের সকল উড়িয়া ভক্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন না। দিবাকর দাস এ-কথাও লিখিয়াছেন যে দুই দল ভক্তের মধ্যে মতবিদ্বেষ প্রবল ছিল ও জগন্নাথকে মহাপ্রভু "অতিবড়" উপাধি দেওয়ায় ঈর্ষান্বিত হইয়া অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান [জ. চ ৩]। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও ইহাতে সত্যের আভাস আছে বলিয়া মনে হয়।

(২) প্রতাপরুদ্র ও মহাপ্রভু অ-গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন। প্রভু তাঁহাদের জ্ঞানবত্তার প্রশংসা করিতেন ও জগন্নাথ দাসকে "অতিবড়" উপাধি দিয়াছিলেন।

(৩) মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে নূতন তথ্য পাওয়া গেল। ঈশ্বর দাসের মতে তাঁহার দেহ প্রাচী নদীতে [পুরী হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে] বিসর্জিত হয়। কারণ বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়ার দিন গঙ্গা প্রাচী নদীতে স্নান করিতে আসেন!

চৈতন্য-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে। আমাদের মনে হয়, নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ না করিতে পারিলে কেবল পুরাতন বহু-আলোচিত তথ্যের চর্বিত-চর্বণ করিয়া লাভ নাই। কারণ উড়িয়া সাহিত্য হইতে পর্য্যাপ্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিলে চৈতন্য-যুগের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

মুক্তি ?

সম্বুদ্ধ

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হস্তিনাপুরীর প্রাসাদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। চতুর্দিকে প্রাসাদ-হর্ম্যরাজি আলোকোজ্জ্বল। সেই আলোকের প্রতিচ্ছায়া পাষাণ-চত্বরে প্রতিফলিত হইয়া কক্ষের অন্ধকারকে তরল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অস্পষ্ট আলোকে চক্ষে পড়ে শয্যার উপরে মাতা ও পুত্র। পুত্র উপাধানে মুখ রাখিয়া শুইয়া আছে, অসম নিঃশ্বাসের শব্দে তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দন-বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পৃষ্ঠে একখানি হাত রাখিয়া মাতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুর নিঃশব্দ ধারা পুত্র দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব তাহার অজ্ঞাত নহে। তাহার পাঁচ বৎসরের জীবনে মাতার চক্ষে এই অশ্রু সে কখনও শুকাইতে দেখে নাই।

বহুক্ষণ পরে বালক কহিল, মা।

মাতা কহিলেন, বাবা।

বালক কহিল, মা, এমন কেন হইল ?

মাতা কহিলেন, অদৃষ্ট। রাত্রি অনেক হইয়াছে ধ্রুব, ঘুমাও।

ধ্রুব কহিল, কেন পিতা এমন করিলেন ? আমি তো তাহার ক্রোড়ে উঠিতে চাহি নাই।

সুনীতি কহিলেন, ছি ধ্রুব। তিনি তোমার পরমগুরু, তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিও না। ঘুমাও

ধ্রুব নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিল।

মুহূর্ত পরে এক দাসী কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল, দেবি, মহর্ষি আসিয়াছেন।

সুনীতি সত্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া আইস। আর একটি প্রদীপ আনিয়া দাও।

অনতিবিলম্বে দীপহস্তা দাসীর পশ্চাতে মহর্ষি নারদ প্রবেশ করিলেন। মাতা ও পুত্র তাঁহার পদবন্দনা করিলে ঋষি আসন গ্রহণ করিলেন। দাসী দীপ রাখিয়া চলিয়া গেল।

নারদ কহিলেন, মাতা, কুশল ?

সুনীতি কহিলেন, আর কুশল, দেব। সকলই তো শুনিয়াছেন।

নারদ কহিলেন, হাঁ। সেইজন্যই একবার সংবাদ লইতে আসিলাম। ধ্রুবকে সস্নেহে অঙ্কে টানিয়া লইয়া নারদ কহিলেন, ধ্রুব, বল তো বৎস, কি কি হইয়াছিল ?

ধ্রুব ম্লান নয়নে মাতার দিকে চাহিল।

সুনীতি কহিলেন, বল, ধ্রুব। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উঁহাকে বলিতে দোষ নাই।

মাতার অনুজ্ঞা পাইয়া ধ্রুব প্রভাতের বৃত্তান্ত ঋষির নিকটে বিবৃত করিল।

প্রভাতে ধ্রুব তাহার একমাত্র ক্রীড়াসঙ্গী শশক শাবককে লইয়া খেলিতেছিল। সহসা শশক দৌড়িয়া রাজসভায় প্রবেশ করে। শশকের পশ্চাতে আত্মবিস্মৃত ধ্রুবও সভামণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হয়। মলিন বস্ত্রপরিহিত অনাদৃত রাজপুত্রকে দেখিয়া সভামধ্যে মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হয়। অপ্রতিভ রাজা উত্তানপাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি সিংহাসনে বসিলে সভাসদ্‌গণ বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। অতর্কিত কোলাহল শুনিয়া রাজ্ঞী সুরুচি অন্তরালস্থ আসন ত্যাগ করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হন। সুরুচির চক্ষে বহ্নির আভাস পাইয়া ত্রস্ত রাজা ধ্রুবকে নামাইয়া দিতে যান। তাড়াতাড়িতে তাঁহার হাতের ঠেলা লাগিয়া ধ্রুব সিংহাসন হইতে একেবারে নিম্নে শিলাস্তরণে পড়িয়া গিয়াছে, বাম কফোণিতে আঘাত পাইয়াছে।

বলিতে বলিতে ধ্রুবের চক্ষে জলের ধারা বহিতে লাগিল। নারদ সস্নেহে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, বৎস, সকলই নিয়তির খেলা। কাঁদিয়া কি

হইবে ? কাঁদিও না। মাতা তোমার হস্তে জলসিক্ত পট্টিক বাঁধিয়া দিবেন, তাহা হইলেই ব্যথা সারিয়া যাইবে।

ধ্রুব কহিল, আমি হাতের ব্যথায় কাঁদি নাই। সভামণ্ডপে সকলের সম্মুখে আছাড় খাইবার লজ্জা আমি ভুলিতে পারিতেছি না। মহর্ষি, পিতা আমাকে কেন অমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেন ? আমি তো তাঁহার ক্রোড়ে থাকিতে চাহি নাই। আমি আপনিই নামিয়া যাইতেছিলাম।

নারদ কহিলেন, বৎস, বলিলাম তো, সকলই নিয়তি। নহিলে বিশ্বে কে কাহাকে ঠেলিয়া ফেলে ?

সুনীতি কহিলেন, ধ্রুব, তোমাকে না বলিলাম গুরুনিন্দা করিতে নাই ? কে বলিল তোমাকে, মহারাজ তোমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন ? হয়ত তিনি তোমাকে ধরিয়া রাখিতেই চাহিয়াছিলেন, তুমিই টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

ধ্রুব কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তার পর আবার কহিল, মহর্ষি, আমি পড়িয়া গেলাম কেন ?

সুনীতি কহিলেন, কি মূর্খের মত প্রশ্ন করিতেছ তুমি! টাল সামলাইতে না পারিলে সকলেই পড়িয়া যায়। তুমিও গিয়াছ। ইহার আবার 'কেন' কি ?

নারদ কহিলেন, না বৎসে, বারণ করিও না। শিশুর মনে যে অনুসন্ধিৎসা জাগে তাহা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষেরই পরিচায়ক। তাহার সেই জ্ঞানস্পৃহাকে কখনও বাধা দিতে নাই। বল ধ্রুব, তুমি কি প্রশ্ন করিতেছিলে।

ধ্রুব কহিল, আমি হয়ত পিতার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া সিংহাসন হইতে নিম্নে মাটিতে পড়িয়া গেলাম কেন ?

সুনীতি কহিলেন, আবার মূর্খের মত প্রশ্ন। সিংহাসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, মাটিতে পড়িবে না তো কোথায় পড়িবে শুনি ?

নারদ ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, ধ্রুব সঙ্গত প্রশ্নই করিয়াছে। বস্তুত ইহা জগতের অন্যতম আদিম ও শাশ্বত প্রশ্ন, মানবের বহু প্রশ্ন বহু সমস্যা ইহাকে ঘিরিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। উচ্চস্থান হইতে স্খলিত মানব নিম্নে পতিত হয়। মানবের অধঃপতনের কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলিতেছি ধ্রুব, শ্রবণ কর। মাতা, তুমিও অবধান কর।

অনন্ত অসীম জগৎমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ এক আদিম ও শাশ্বত আকর্ষণে পরস্পরে সংলগ্ন ও সম্পৃক্ত রহিয়াছে। এই আকর্ষণ সমগ্র সংসারের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বিশ্বস্থ চরাচর সজীব নির্জীব সকল বস্তু অপরাপর বস্তুনিচয়কে স্বতই নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অপরকে নিকটে টানিয়া আনিবার, নিজের সহিত সংলগ্ন, মিলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই মহা আকর্ষণ বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বস্থিতির প্রধান কারণ। জ্ঞানিগণ ইহাকে মায়া বলেন, বৈজ্ঞানিকরা ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মহাশক্তির তাড়নায় গ্রহনক্ষত্র স্ব স্ব কক্ষে সতত ধাবিত হয় ; ইহারই প্রেরণায় মাতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, বন্ধু বন্ধুকে একান্ত আপনার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে ; ইহারই মোহে পুরুষ নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, ব্যাঘ্র মনুষ্যকে ভক্ষণ করে, রাজা পার্শ্ববর্তী রাজার রাজ্য আপনার করায়ত্ত করিতে চাহেন। ইহারই পাশে বদ্ধ বলিয়া আত্মা পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ব্যথিত হয় ; ইহারই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। স্থান কাল ও পাত্র বিশেষে এই আকর্ষণ নব নব রূপ ও নব নব নামে আত্মপ্রকাশ করে ; কোথাও ইহার নাম চৌম্বক আকর্ষণ, কোথাও বাৎসল্য, কোথাও হিংসা, কোথাও চিচুরিষা, কোথাও প্রেম, কোথাও বিজিগীষা। বৎস, এই আকর্ষণ, এই মায়ার পাশে জীব পৃথিবীর সহিত বদ্ধ থাকে, নিয়ত ধরিত্রীবক্ষের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, উচ্চস্থান হইতে স্খলিত হইবামাত্র বেগে ভূতলে পতিত হয়। চলিত ভাষায় তাহাকেই বলে আছাড় খাওয়া। এই মোহকে ছিন্ন করিতে পারিলে তাহাকে বলে মুক্তি। তাহার জন্য ঋষিরা যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করেন।

ধ্রুব কহিল, মহর্ষি, এই মায়া বা মাধ্যাকর্ষণ, ইহার পাশ কেহ ছিন্ন করিতে পারিলে তাহার কি হয় ?

নারদ কহিলেন, মুক্তি হয়। মুক্ত বিহঙ্গম যেমন যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে, মুক্ত জীবও তাহাই পারিবে।

সেই মুক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া ঋষিরা জ্যোতিপথে গতায়াত করিয়া থাকেন।

ধ্রুব কহিল, তাহারা আছাড় খান না?

নারদ কহিলেন, না। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার আছাড়েরই তাঁহারা উর্দ্ধে চলিয়া যান।

ধ্রুব কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিল। তার পর কহিল, মুক্তি কিরূপে হয়?

নারদ কহিলেন, সাধনা দ্বারা। কিন্তু ইহা সহজলভ্য নহে। যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া ঋষিগণ ও যোগিগণ ইহার আস্বাদমাত্র লাভ করেন, সেই কণিকারও স্থায়িত্ব অতি সামান্য।

ধ্রুব কহিল, আমি তপস্যা করিব

সুনীতি কহিলেন, কী যা-তা বকিতেছ তুমি, ধ্রুব। তপস্যার বয়স তোমার হইয়াছে নাকি!

নারদ কহিলেন, মাতা ঠিকই বলিয়াছেন, ধ্রুব। তোমার এখনও তপস্যা করিবার বয়স হয় নাই।

মনে গাম্ভীর্য ও মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রুর সঞ্চার না হইলে তপস্যায় অধিকার জন্মে না।

ধ্রুব কহিল, কিন্তু আপনি যে বলিলেন যোগীরা মুক্তির আস্বাদমাত্র পাইয়া থাকেন, সম্পূর্ণ মুক্তি কি কেহই লাভ করিতে পারে না?

নারদ কহিলেন, পারে না বলিতে পারি না, কিন্তু কাহাকেও পারিতে দেখি নাই। পূর্ণ মুক্তি দুর্লভ্য বস্তু, সাধনা ও সিদ্ধির যে স্তরে পৌছিলে ইহার নাগাল পাওয়া যায় তাহা একমাত্র ভগবান নারায়ণের কৃপাতেই সম্ভব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ইহা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধ্রুব কহিল, নারায়ণ কে?

নারদ কহিলেন, নারায়ণ সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা। গোলোকে তাঁহার বাস।

ধ্রুব কহিল, গোলোক কোথায়?

নারদ কহিলেন, কোথাও নহে। গোলোক সর্বত্র। 'গো' শব্দের অর্থ রশ্মি। নারায়ণের কৃপার রশ্মি যেখানে পতিত হয়, মানবের চিত্তে ভক্তির রশ্মি, সংধর্মের রশ্মি যেখানে প্রজলিত হয়, সেইখানেই গোলোক, সেইখানেই নারায়ণের বাস।

ধ্রুব কহিল, কিন্তু সর্বত্রই যদি তিনি থাকেন, তবে কেন ঋষিরা গভীর বনের মধ্যে গিয়া তপস্যা করেন?

নারদ কহিলেন, মনঃসংযোগের জন্য। লোকালয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, দুরাত্মা প্রতিবেশীদিগের গাত্রঘর্ষণে তপস্যায় একাগ্রচিত্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। বনে সাধনার নিভৃত অবসর মেলে।

ধ্রুব কহিল, তপস্যা কিরূপে করিতে হয়?

নারদ কহিলেন, তপস্যার প্রথা ও প্রক্রিয়া বহুবিধ, কিন্তু মূলে সকল তপস্যাই এক। তোমাকে একে একে আমি সকল কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সুনীতি নীরবে শুনিতেছিলেন। তিনি ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষি, করিতেছেন কি, সর্বনাশ ঘটাইবেন না। এই বালককে তপস্যাবিধি বলিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন; সে-বিধি শিখিলে কি আর আমি ইহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব?

নারদ কহিলেন, মাতা, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার ও-কথাটা মনে হয় নাই। বৃদ্ধ হইয়াছি; বার্দ্ধক্যের সহিত স্বতই অমিতভাষিতা আসিয়া পড়ে। ধ্রুব, তোমার এখন তপস্যাবিধি শিখিবার সময় নহে। তুমি রাজপুত্র, এখন তোমার শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে রাজধর্ম, বীরোচিত ক্ষাত্রধর্ম। যৌবনের অন্তে সংসার ত্যাগ করিয়া যখন তোমার বানপ্রস্থে যাইবার সময় হইবে, তখন আমি স্বয়ং তোমাকে সকল প্রকার তপস্যার রীতি শিখাইয়া দিব। আজ আমি আর বসিব না, রাত্রি অনেক হইয়াছে।

মহর্ষি চলিয়া গেলেন।

সুনীতি কহিলেন, ঘুমাও, ধ্রুব। তপস্যার চিন্তাকে তুমি মনে স্থান দিও না। আমার একমাত্র অবলম্বন তুমি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার কি অবস্থা হইবে?

অন্যমনস্ক ধ্রুব উত্তর দিল না।

রাত্রি গভীর। সমস্ত রাজপুরী সুপ্তিতে অচেতন। চিন্তাভারে শ্রান্তা সুনীতি নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছেন।

আহত কফোণিতে তীব্র ব্যথার অনুভূতি পাইয়া

ধ্রুবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেহে শীতস্পর্শ শিলাতল লাগিতেছে। ঘুমের ঘোরে ধ্রুব খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

মাধ্যাকর্ষণ। অচ্ছেদ্য। অজেয়। অমোঘ।

ধ্রুব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুপ্তা মাতার মুখের দিকে একবার চাহিল। তার পর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

সে তপস্যা করিবে। মাধ্যাকর্ষণকে জয় করিবে।

ঘোর অরণ্য। বৃক্ষতলে একাসনে উপবিষ্ট ধ্রুব।

অরণ্যের ব্যাঘ্র আসিল, কহিল, ধ্রুব, তোমাকে খাইব।

ধ্রুব কহিল, মূঢ়, মোহকে প্রশ্রয় দিও না, তাহাকে জয় কর।

জলৌকা কহিল, ধ্রুব, তোমাকে ধরিলাম।

ধ্রুব কহিল, আমার শিরাস্থ শোণিত বিকর্ষক, তোমাকে সে আকর্ষণ করিবে না।

উর্বশী মেনকা রম্ভা আসিয়া কহিল, ধ্রুব, এই দেখ আমরা নাচিতেছি।

ধ্রুব চক্ষু খুলিল না, কহিল, আমার এখন নাচ দেখিবার সময় নাই।

ঐশ্বরী মায়া সুনীতির বেশ ধরিয়া আসিল, কহিল, ধ্রুব, তোমার জন্য সন্দেশ আনিয়াছি খাও।

ধ্রুব কহিল, না। সন্দেশ খাইলেই আবার খাইতে ইচ্ছা করে, অন্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

অবশেষে তপস্যামগ্ন ধ্রুবের সম্মুখে নারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধ আলোকে বনপথ উদ্ভাসিত হইল।

নারায়ণ ডাকিলেন, ধ্রুব।

ধ্রুব কহিল, কে আপনি?

নারায়ণ কহিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখ। আমি নারায়ণ। তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। ধ্রুব চরণ বন্দনা করিল।

নারায়ণ কহিলেন, তুমি এই কঠোর তপস্যা করিতেছ কেন? বল, কি তুমি চাও?

ধ্রুব কহিল আগে বলুন, যাহা চাই দিবেন?

অসতর্ক নারায়ণ কহিলেন, দিব।

তখন ধ্রুব কহিল, আমি চাই মুক্তি। বিশ্বচরাচরে আপনি মুক্তির বিঘ্নস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সেই মাধ্যাকর্ষণের আমি উচ্ছেদ করিব।

নারায়ণ সবিস্ময়ে কহিলেন, সে কি। মাধ্যাকর্ষণের উপর তুমি চটিলে কেন?

ধ্রুব উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন! মানুষের দুর্গতির, মানুষের অধঃপতনের মূল মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণের মোহে ব্যাঘ্র ও জলৌকা মনুষ্যকে আক্রমণ করে। মাধ্যাকর্ষণের প্রেরণায় মানুষ পরস্ব অপহরণ করে। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তো আমি আছাড় খাইয়াছি, দুই দুই বার।

নারায়ণ কহিলেন, যত দুর্গতির মূল মাধ্যাকর্ষণ, একথা তোমাকে কে শিখাইয়াছে, ধ্রুব?

ধ্রুব কহিল, যেই শিখাক। ইহার সত্যতা তো আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না?

নারায়ণ কহিলেন, পারিব। ধ্রুব, তোমাকে কেহ মিথ্যা বুঝাইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ কেবল পতনের মূল নহে, উন্নতিরও মূল। সকল প্রকার গতিই মাধ্যার্ষণের সৃষ্টি; সেই গতি যে-ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হয়, তাহার জন্য দায়ী তত্রস্থ ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। মূর্খের ও বিকৃতবুদ্ধির হস্তে ইহার অপব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এই শক্তিটাকেই মন্দ বা আবর্জনীয় তুমি বলিতে পার না। মাধ্যাকষণের কুফল তোমার চক্ষে পড়িয়াছে; ইহার উপকারিতার কথ. তুমি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ?

ধ্রুব কহিল, কি আবার ইহার উপকারিতা?

নারায়ণ কহিলেন, শ্রবণ কর। বিশ্বসংসার আমার বিরাট্ ও বিচিত্র সৃষ্টি। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বস্তুকে একত্রে বাঁধিবার, এক সুসমঞ্জস বিধানে চালাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মাধ্যাযণ সেই বন্ধন। মহামায়ার এই অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘ্য বন্ধনে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি একত্র গ্রথিত, সুসংবদ্ধ। মাধ্যাকর্ষণ ব্যাঘ্রের মধ্যে হিংসার রূপে আত্মপ্রকাশ করে ইহাই তুমি জানিয়াছ ধ্রুব, তোমার জন্য তোমার

মাতার হৃদয়ে যে বাৎসল্যের মধুভাণ্ডার সঞ্চিত আছে তাহাও সেই মাধ্যাকর্ষণেরই আত্মপ্রকাশ, এ-কথা তোমার কখনও মনে হইয়াছে? মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তুমি মুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ; মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তোমার তপস্যা আমাকে বাঁধিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তবু কি বলিবে মাধ্যাকর্ষণ কেবল অমঙ্গলেরই মূল, মঙ্গলের মূল নয়?

ধ্রুব কহিল, এত কথা আমি শুনিতে চাহি না। আমার কথা, বিশ্বসংসার হইতে মাধ্যাকর্ষণকে আমি বিলুপ্ত করিব।

নারায়ণ কহিলেন, অসম্ভব। বিশ্বসংসারের সৃষ্টি ও স্থিতির মূল মাধ্যাকর্ষণ। ইহার উচ্ছেদ অর্থ সৃষ্টির বিলোপ। তাহার জন্য তুমি তপস্যা করিতে পার না। অশুভ উদ্দেশ্যে তপস্যার অপব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই।

ধ্রুব কহিল, আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান। যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইব না।

নারায়ণের ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যরঞ্জিত হইল। কহিলেন, ধ্রুব, জান কি, ইহাও মাধ্যাকর্ষণেরই খেলা।

ধ্রুব কহিল, জানিতে চাহি না। আপনি আমার প্রার্থিত বর দিতে প্রতিশ্রুত। এখন যদি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে চাহেন, তবে আমার বলিবার কিছু নাই।

নারায়ণের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। কহিলেন, ধ্রুব, বালক তুমি। অথচ যে কথা আমাকে বলিলে, ত্রিসংসারে কেহ কোনদিন আমাকে তাহা বলিতে সাহস করে নাই তুমি বলিলে, বেশ, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখিব। মাধ্যাকর্ষণের উচ্ছেদ চাহিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি কেবল তোমার ব্যক্তিগত প্রার্থনাই করিতে পার। তুমি যদি চাও, তোমার উপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আমি রহিত করিয়া দিব। আর একথাও সত্য, তোমার মত নির্বোধ ও একগামী বালককে নিজের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া বিশ্বসংসারের কোন উপকার নাই। বালকবয়সেই তুমি এতখানি দুর্বিনীত, বড় হইয়া তুমি কি হইবে?

ধ্রুব মুখ গোঁজ করিয়া কহিল, বক্তৃতা রাখিয়া দিন। আমার নিজের মুক্তিই আমি চাই।

নারায়ণ কহিলেন, ধ্রুব, এখনও ভাবিয়া দেখ। এক বার ইহার বাহিরে গেলে পরে হাজার চাহিয়াও আর বিশ্বশৃঙ্খলার প্রবাহে ফিরিতে পারিবে না। এক বার মাধ্যাকর্ষণ-রহিত হইলে আর কখনও ডাকিয়া আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।

ধ্রুব কহিল, চাহিবও না। আপনি আমাকে মাধ্যাকর্ষণ-রহিত করিয়া দিন, আপনার বিশ্বসৃষ্টিতে আমার প্রয়োজন নাই।

নারায়ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তথাস্তু।

অসীম শূন্যে বন্ধনমুক্ত ধ্রুব ঝুলিয়া আছে। তাহাকে কেহ নিকটে টানে না, তাহার আকষণ কেহ অনুভব করে না। চতুর্দিকে সৌরজগৎ গ্রহনক্ষত্রেরা পরস্পরের প্রীতি ও আকর্ষণে ছুটিয়া বেড়ায়, নিশ্চল নিস্পন্দ ধ্রুব চাহিয়া দেখে। তাহার গতি নাই,—দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্ধ্বে, নিম্নে—তাহাকে আকর্ষণ করিবার, তাহাকে কাছে টানিয়া লইবার কেহ নাই। পাশ দিয়া গ্রহনক্ষত্র উল্কা-ধূমকেতুরা ছুটিয়া চলিয়া যায়, ধ্রুবের দিকে কেহ ফিরিয়া চাহে না, বিচ্ছুরিত আলোকধারার, বিস্ফুরিত উল্কাখণ্ডের একটি কণা পাঠাইয়াও কেহ তাহাকে স্পর্শ করে না। অনন্ত অসীম চরাচরে ধ্রুব একাকী। সে বন্ধনহীন, সে অনাকৃষ্ট, অনাত্মীয়, অবান্ধব।

রাত্রির পর রাত্রি নিঃসীম শূন্যে বিনিদ্র চক্ষু মেলিয়া সে চাহিয়া থাকে—সতৃষ্ণনেত্রে একদা পরিচিত পৃথিবীর দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতে কি তাহার নয়নকোণে অলক্ষিত একবিন্দু অশ্রু জমিয়া উঠে? জানি না। কেহ জানে না। জগৎ বহিয়া চলে, ধ্রুবের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। কেবল সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিরাট প্রশ্নচিহ্নটা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আকাশে ঘুরিতে থাকে। লব্ধমুক্তি ধ্রুবের দিকে চাহিয়া কি যেন এক অন্তহীন মূক প্রশ্ন সপ্তর্ষির মধ্যে জাগিয়া থাকে—কিন্তু কে বলিবে সে প্রশ্নটা কি?

জাপানে নববর্ষ

শ্রীচারুবালা মিত্র

"সিন্‌নেননি ওমেদেতো গোজাইমাস"—"নববর্ষে তোমাকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি, তোমার জীবন আনন্দময় হউক"—নববর্ষের দিনে জাপানে সকলের মুখে এই কথা। সমস্ত জাপানে এই দিন মহা উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। নববর্ষকে আবাহন করতে বিপুল তাদের সমারোহ ও আয়োজন। ২৫৯৭ বর্ষ পূর্ব্বে রাজা জিম্মু টেন্নোর সময় থেকে এই উৎসবের আরম্ভ। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নববর্ষে এত জাঁকজমক ও আনন্দের সাড়া পড়ে কি না জানি না। সমস্ত বৎসর ধরে এই দিনটির জন্য যেন এরা অপেক্ষা ক'রে থাকে। বর্ষশেষের রাত্রিতে মন্দিরে মন্দিরে বারোটার সময় যখন ১০৮টি ঘণ্টাধ্বনি হয়—যাকে এরা বলে অমঙ্গলকে বিদায় করবার ঘণ্টাধ্বনি—তখন থেকে এরা গত বৎসরের দুঃখকষ্ট দূর ক'রে দিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রথমে রাজা খুব ভোরে স্নান ক'রে নিজেকে পবিত্র করেন, কারণ তিনিই জাতির প্রধান পুরোহিত, তার পর রাজকীয় মন্দিরে দেবতাদের উদ্দেশে পূজা করেন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাপানে সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতার পূজা সুরু হয়। প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি কাঠের তৈরি ছোট মন্দির আছে। পূর্ব্বপুরুষদের প্রিয় নানা রকম খাবার, মোচি (চালের পিঠে), জল, সাকে (চালের তৈরি এক রকম মদ) ইত্যাদি দেবতাদের উদ্দেশে এই সকল মন্দিরে উৎসর্গ করা হয়। তার পর সবাই যায় মেইজী-মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। রাজা মেইজীর সময়ে (১৮৬৮-১৯১২) জাপানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অনেক উন্নতি হয়েছিল। সেজন্য জাপানীরা রাজা মেইজীকে দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁরই স্মরণার্থে এই মন্দির স্থাপিত। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সারা রাত ধরে এখানে বাস ও ট্রাম চলাচল করে। অন্য কোন বৌদ্ধ বা সিণ্টো মন্দিরে না গিয়ে দেশের যত নরনারী সব মেইজীর পায়ে অঞ্জলি দিতে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী মন্দিরে প্রবেশ করছে কিন্তু চারি দিক নিস্তব্ধ নীরব, প্রত্যেকের মুখে গাম্ভীর্য্য ও সংযম, প্রতি পদক্ষেপ সশ্রদ্ধ ও ধীর; কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা বা অসঙ্গত উচ্ছ্বাস নেই। বাস্তবিক পূজা করতে এমনি ক'রেই যেতে হয়। আমাদের দেশে যেখানে এ-রকম লক্ষ লক্ষ নরনারীর মেলা, সেখানে চীৎকার-গোলমালে মানুষ তো দূরের কথা, পরম ক্ষমাশীল দেবতাও বোধ হয় তাঁর আসন ছেড়ে পালাতে চান।

পূজার কাজ শেষ হ'লে সবাই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। প্রত্যেকের বাড়ীর ভিতরে দরজার সামনে একটি ট্রে-তে একটি গোল মোচি ও তার উপর একটি কমলালেবু রাখা থাকে, এই দুটি অতি পবিত্র মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। যারা দেখা করতে আসে তারা ট্রে-তে নামের কার্ড বা নিজের নাম বা ছবি-আঁকা রুমাল রেখে যায়। আর বেশী আত্মীয়তা থাকলে পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে যায় ও সকলকে এক বার ক'রে নমস্কার করে আর বলে,"সিন্‌নেননি ওমেদেতো গোজাইমাস"—"নববর্ষে তোমাকে অভিনন্দন করি, নূতন বৎসরে তোমার গৃহ সুখ শান্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ হউক—গত বৎসর তুমি যে আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছ সেজন্য ধন্যবাদ।" এক বার ক'রে একটি ক'রে কথা বলে ও নমস্কার করে। অভিবাদনের পালা শেষ হ'লে ছোট বাটিতে সাকে পান করে। এর অর্থ, গত বৎসরের দোষত্রুটি ভুলে যাওয়া। ব্যবসায়ীরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বাড়ী যায় ও গত বৎসরের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানায় ও আগামী বৎসরেও সাহায্য পাবার জন্য অনুরোধ করে।

দুপুরে বাড়ী ফিরে এসে সবাই নানা রকম আহার্য্য গ্রহণান্তে বিশ্রাম করে। বেলা পড়ে এলে ছেলেমেয়ের দল সুন্দর চিত্রবিচিত্র কিমোনো প'রে খেলা করতে বেরিয়ে

পড়ে। ছেলেরা ওড়ায় ঘুড়ি আর মেয়েরা খেলে ব্যাটল-ডোর ও শাটল্-কক। এদেশের ঘুড়ি ঠিক আমাদের দেশের মত নয়, একটু লম্বা ধরণের আর তাতে নানা রকম মুখ আঁকা থাকে, অল্প সুতো হাতে নিয়ে উড়ায়। মেয়েদের ব্যাটল-ডোর বড় চমৎকার দেখতে। কাঠের তৈরি ব্যাট এক দিকে সাদা, অন্য দিকে রংবেরঙের কাপড় দিয়ে সামুরাই বা জাপানী ছেলেমেয়ের নানা রকম মূর্ত্তি, বা ফুল-লতাপাতা তৈরি করা। শাটল-কক্ হচ্ছে একটি ছোট গোল লোহার বল, সঙ্গে কাগজের ফুল লাগান। এই ব্যাট ও বল দিয়ে অনেকটা ব্যাডমিণ্টনের মত খেলা করে।

সান্ধ্যভোজনের পর সবাই মিলে 'হায়াকুনিন ইসু' বা নববর্ষের শত কবিতার কার্ড খেলা করে। কয়েক জন মিলে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে এই খেলা হয়। প্রতি কার্ডে কবিতার শেষের লাইন লেখা থাকে। যে ভাল কবিতা পড়তে পারে সে একটার পর একটা কবিতা পড়ে যায়। কার্ডগুলি দুটি ভাগ ক'রে দুই দলের সামনে লেখাগুলি উপরের দিকে ক'রে রাখা হয়। তার পর যেই কবিতা পড়া সুরু হ'ল অমনি দু-দলে যে কার্ডগুলি পড়া হ'ল তার শেষের লাইন বের করবার চেষ্টা করে। যে দল যত বেশী কার্ড নিতে পারে তারাই জেতে। কার্ড সাজানোই হচ্ছে এ-খেলার বাহাদুরি। কোন কোন খেলোয়াড় এই খেলাতে এত পটু হয় যে, কবিতা পড়া হবার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডটি বের করতে পারে। কবিতাগুলি অনেক দিন আগে থেকেই মুখস্থ করতে আরম্ভ করে যাতে নববর্ষের শত কবিতার খেলার পরাজয় না হয়। খেলা ও শিক্ষার এই মনোরম সমন্বয় আমাদের অনুকরণযোগ্য ব'লে মনে হয়।

নববর্ষের প্রথম তিন দিন কেউ কোন কাজ করে না; দোকানপাট, ব্যাঙ্ক-আপিস, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ। কর্ম্মব্যস্ত লক্ষ লক্ষ সাইকেল, লরী, সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, জীবনের প্রচণ্ড গতিকে কে যেন মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছে।

সকলে গত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে ও নূতন বৎসরের জন্য অনেক আশা উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে নিজেকে তৈরি করে। যাদের বেশী দিনের ছুটি থাকে তারা সব যায় বিদেশে, কেউ কেউ যায় সমুদ্রের ধারে, কেউবা পাহাড়ে। যুবার দল পিঠে হ্যাভারসক্ (খাবারের থলি) বেঁধে বরফের দেশে খেলা করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ছুটির কয় দিন ঘরে আর কেউ বন্ধ হয়ে থাকে না, সঙ্গে 'বেন্তো' (টিফিন) বাক্স ও ছেলেমেয়ে নিয়ে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। পার্ক-বাগান, চিড়িয়াখানা, সমুদ্রের তীর, নদীর ধার, থিয়েটার-বায়স্কোপ, যেখানে যা কিছু দর্শনীয় আছে সব জায়গায় যেন রঙের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। সুন্দর সুন্দর কিমোনো প'রে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সর্ব্বত্র ভীড় করছে—সারা বৎসরের পর কর্ম্মশৃঙ্খল থেকে যেন হঠাৎ এরা মুক্তি পেয়েছে। এত যে আনন্দের মেলা, এত যে উৎসব, কিন্তু সংযমের বাঁধ কোথাও ভাঙে না। সবাই সুশৃঙ্খল সংযত ভাবে উৎসব করছে, কোথাও অট্টহাস্য, বিকট উল্লাস বা জনতার কোলাহল নেই। অথচ আনন্দেরও কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা নেই।

বৎসরের প্রথম দিনটিতে এদের সবাই নানা রকম প্রথা মেনে চলে। আধুনিক প্রগতিশীল দেশ জাপান এখন অনেক বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করলেও আবহমান কাল থেকে প্রচলিত সামাজিক জীবনের নানা অনুষ্ঠান, পূজার্চ্চনা, উৎসব প্রভৃতি সবই ধনীদরিদ্র সকলে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এখনও পালন ক'রে চলেছে। বহির্জগতে এদের যতই বিবর্ত্তন ঘটুক, অন্তর্জগতে এরা এখনও রক্ষণশীল। তাই এরা এদের নানা রকম উৎসবে শুধু ফূর্ত্তি ও আমোদ-প্রমোদ ক'রে কাটায় না, সকল উৎসবকেই প্রধানত: একটা ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে দেখে। নববর্ষে এরা তাই প্রথমেই দেবতার পূজা দেয় ও মোচি উৎসর্গ করে। এই মোচি তৈরির কাজ নববর্ষের কয় দিন আগেই সম্পন্ন হয়, এটা একটি অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। অনেকে দু-চার মণ চালেরও মোচি তৈরি করে। প্রথমে চালগুলি বাষ্পে সিদ্ধ ক'রে কাঠের হামানদিস্তায় ফেলে পিটিয়ে কাই-এর মত ক'রে, তার পর কাঠের ট্রে-তে ঢেলে বরফির আকারে কাটে আর যেগুলি দিয়ে পূজা হয় সেগুলি গোল ক'রে তৈরি করে। মোচিকে এরা এত পবিত্র মনে করে যে প্রত্যেক দোকান ও বাড়ীর সামনে

জাপানে নববর্ষ

জাপানী মেয়েদের ব্যাট্‌লডোর ও শাট্‌ল্‌কক্‌ খেলা

নববর্ষে 'শত কবিতা'র খেলা
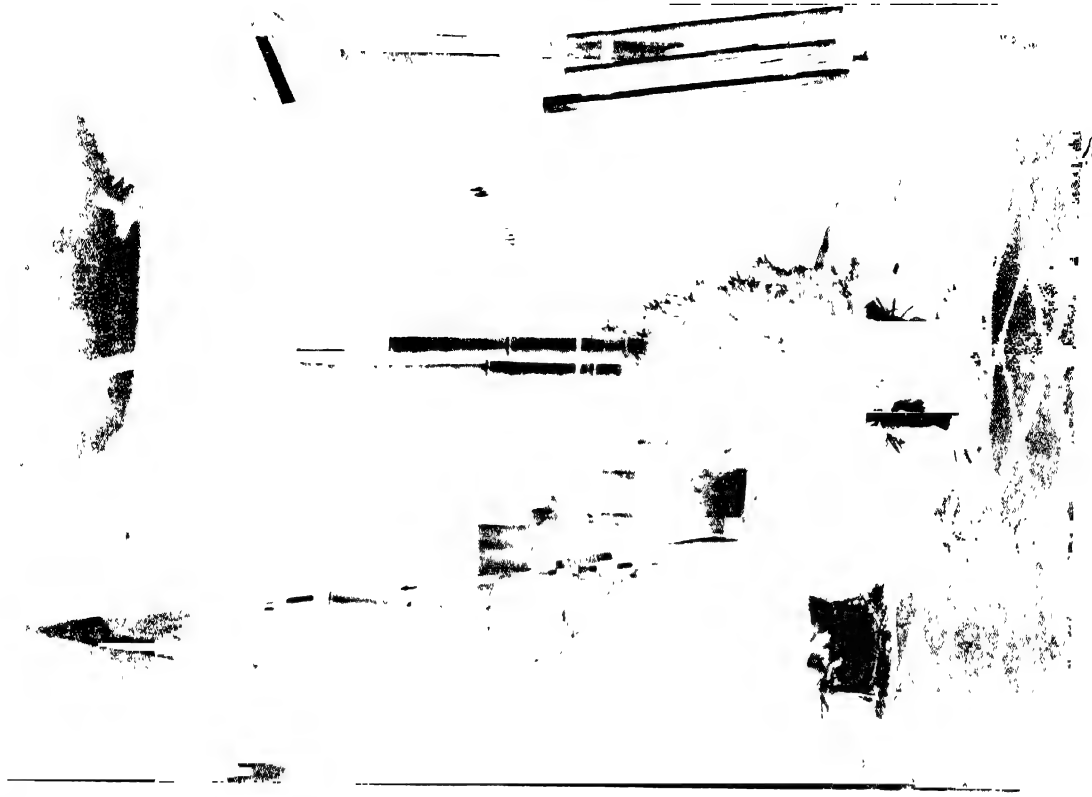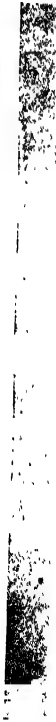
নববর্ষে পবিত্র 'মোচি' সাজিয়ে রাখা হয়েছে—দেয়ালে টাঙানো ছবির সামনে।

নববর্ষে বাড়ীর সামনে মঙ্গল-প্রতীক বাঁশ, পাইন ও পাম গাছ একত্র পুঁতে দিয়েছে।
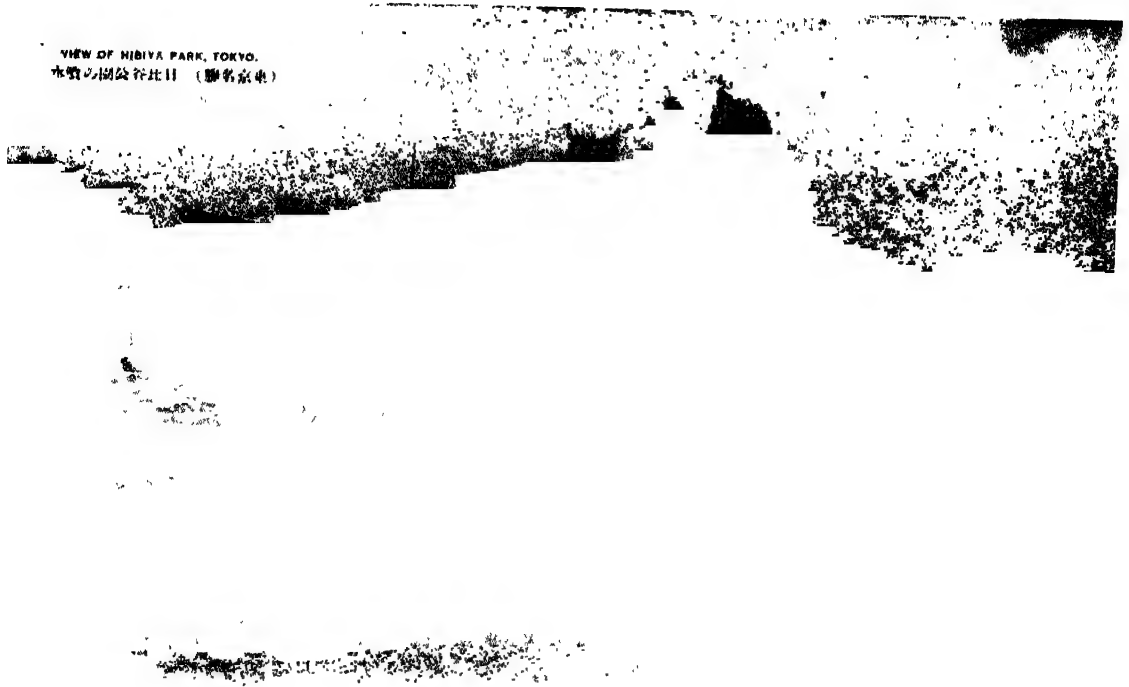
হিবিয়া পার্ক, টোকিয়ো। নববর্ষের ছুটিতে 'বেন্তো' বাক্স নিয়ে সারাদিনের জন্য সকলে বেড়াতে এসেছে।
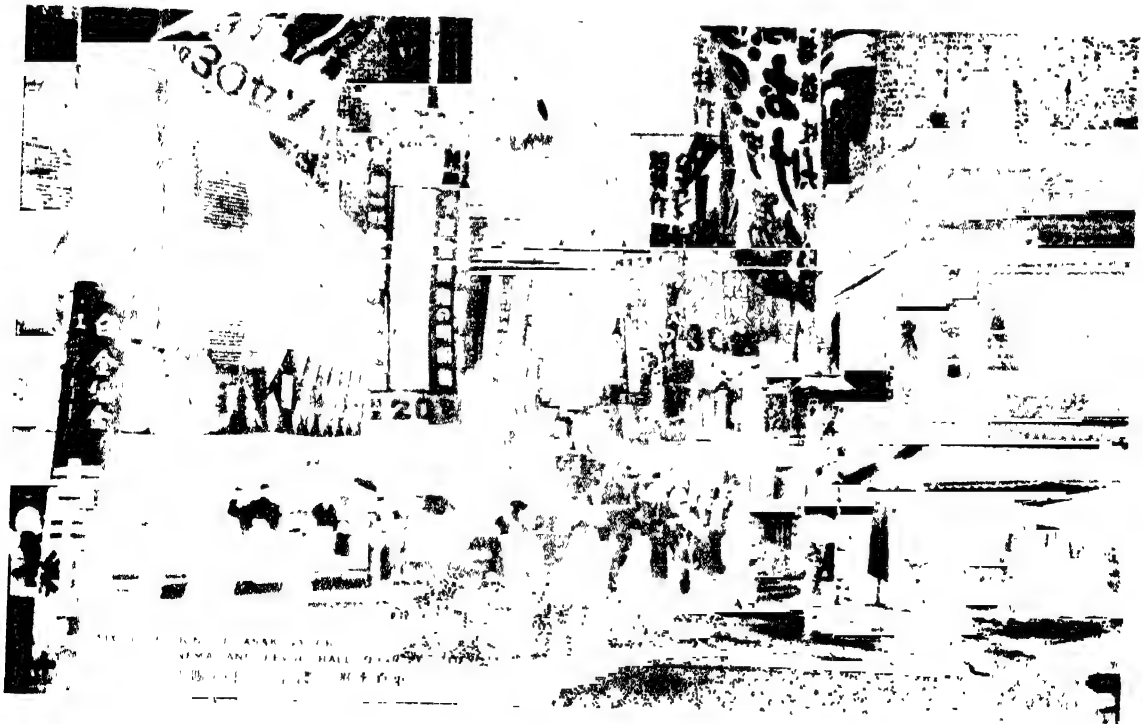
টোকিয়োর সিনেমা-ঘরগুলির সম্মুখে নববর্ষের জনতা

পাথরের তৈয়ারি অস্ত্র আবিষ্কারের স্থান
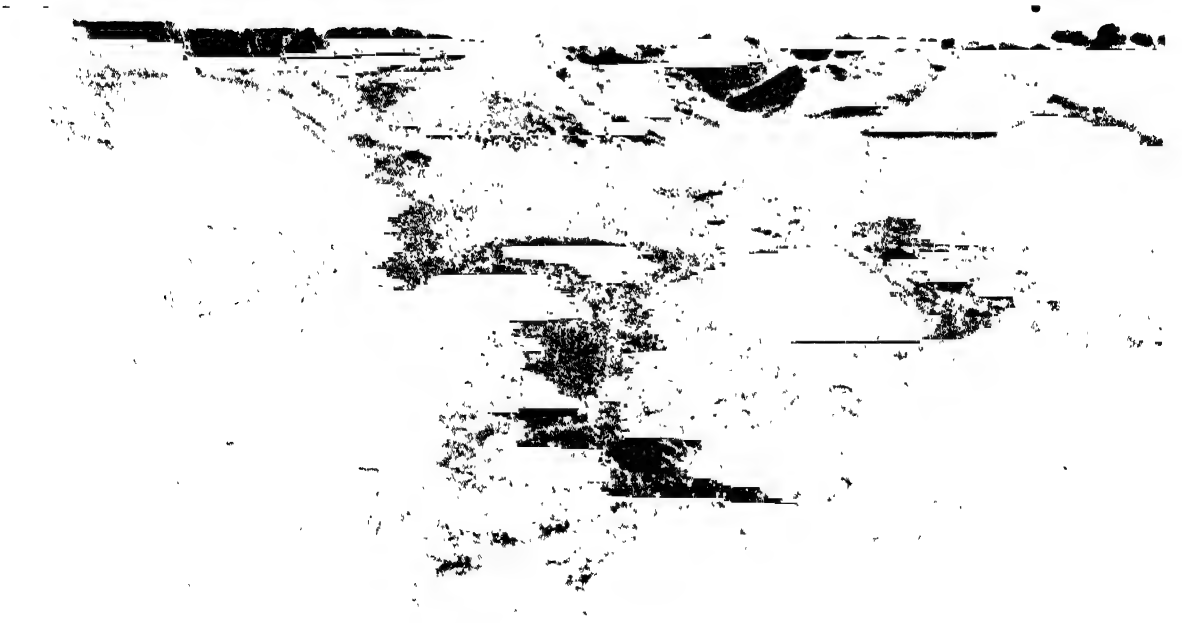
সঞ্জয় নদীর পাশে পার্বত্য ভূমির দৃশ্য
("সিংহভূম জেলায় প্রাচীন কালের মানব" দ্রষ্টব্য)

একটি ট্রেতে এই মোচি ও ...কগুলি কাগজের তৈরি জিনিষ দিয়ে সাজায়, ঠিক আমাদের দেশের গণেশ বা কালীর মূর্ত্তির মত দেখায়,—অনেকে শুধু মোচির উপর একটি কমলালেবু রেখে দেয়। এক সপ্তাহ পরে এই মোচিটি ভেঙে সবাই খায়।

নববর্ষে 'ব্যাট্‌লডোর' বিক্রি হচ্ছে

নববর্ষে প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় পাইন ও বাঁশ গাছ পুঁতে দেয়। তাকে 'কাদোমাৎসু' বলে। চিরসবুজ পাইন গাছ দীর্ঘজীবন এবং সোজা ও সরল বাঁশ গাছ সাধু ব্যবহারের নিদর্শন ব'লে, এ দুটি গাছ মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। পাইন গাছকে এরা এত পবিত্র মনে করে যে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গে পাইন-পাতা বেঁধে দেয়। এ ছাড়া, দরজার সামনে বা সাইকেল, ট্রাম, বাস, লরী প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র "সিমেনাওয়া" ব'লে খড়ের তৈরি একটি জিনিষ ঝোলায়। এর সঙ্গে ধানের শিষ, সিন্টো ধর্ম্মের প্রতীক চারকোণা সাদা কাগজ, ফার্ণ-পাতা, দুটি বেরীফল, একটি কমলালেবু, একটি চিংড়ি মাছ, সমুদ্রজ উদ্ভিদ ইত্যাদি বেঁধে দেয়—এগুলি সবই সুখসম্পদপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের নিদর্শন।

নববর্ষের এই সব বিচিত্র আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাপানীদের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয় যে তাদের গৃহ সুখ, সৌভাগ্য ও সম্পদে, ধনে ধান্যে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বাড়ীর ভিতরে একটি ট্রে-তে ছোট জাতের পাইন, বাঁশ ও প্লাম গাছ পুঁতে দেয়। এই ট্রে-টি অতি পবিত্র ও মনোরম উপহার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সুখসৌভাগ্য-সম্পদের বার্ত্তাবহ।

আগে বসন্তকালে যখন চারি দিক্ ফুলেফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, তখন ছিল এদের নববর্ষ-উৎসব। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে নববর্ষের উৎসব হয় পয়লা জানুয়ারীতে। সেই সময় প্রচণ্ড শীতে কোন গাছে প্রায় পাতা থাকে না, মঙ্গলচিহ্নরূপে স্বীকৃত বাঁশ ও পাইন গাছে মাত্র পাতা থাকে। এই দুটি দিয়েই বাড়ীঘর সাজানো হয়। কি ছোট কি বড় সকল দোকানই নানা রকম কাগজের ফুল লতাপাতা দিয়ে এক রকম ক'রে সাজায়। দোকানের জিনিষগুলি এমন সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখে যে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। ছেলেমেয়েদের মন ভোলাবার জন্য কত রকমের শোভন উপহার চিত্তাকর্ষক ক'রে সাজানো যে ছেলেমেয়েরা তো দূরের কথা বুড়োদেরই লোভ লাগে। নববর্ষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেলেমেয়ে সকলকে উপহার দেওয়া এদের একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের উপযোগী নানা রকম উপহার রঙীন কাগজে মনোরম ক'রে বাঁধা থাকে। সামান্য সামান্য জিনিষকেও যত্ন ক'রে সাজিয়ে সুন্দর ক'রে তোলে। এই সাজসজ্জা, এই সমারোহ, নববর্ষের উৎসব-অনুষ্ঠানের এই বিরাট্ আয়োজন ডিসেম্বর মাসের পয়লা থেকেই আরম্ভ হয়। পনর-ষোল তারিখ থেকে শহরের প্রত্যেক পল্লীতেই দু-দিন ক'রে মেলা বসে যাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাড়ীর কাছে মনোমত জিনিষ-পত্র কিনতে পারে। এই সব মেলাতে সস্তা দামের
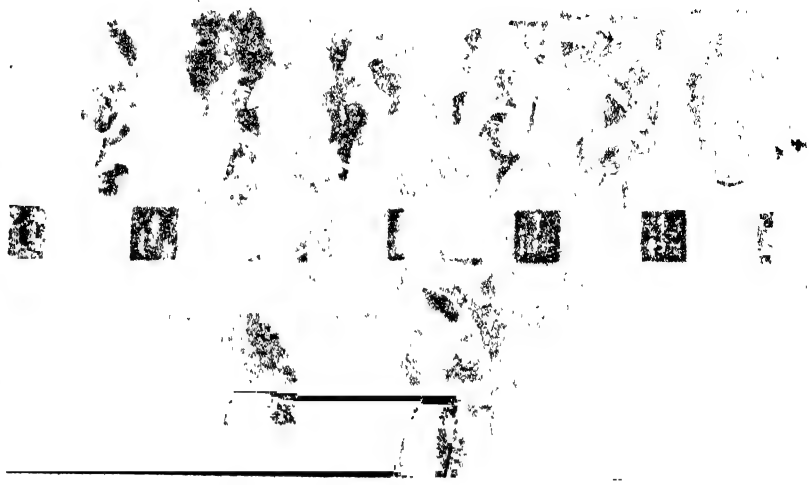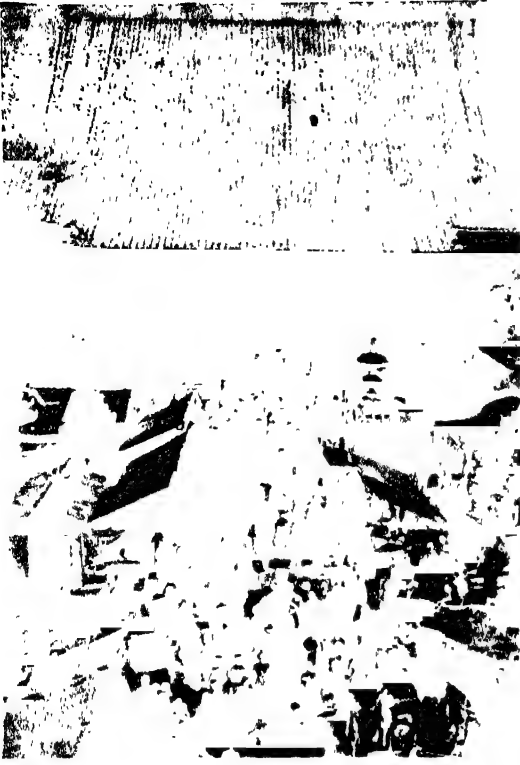
আসাকুসাতে কোওনান মন্দিরের সামনে নববর্ষের মেলা

কাপড়চোপড়, খেলনা, সাংসারিক কাজের সরঞ্জাম, ছোট ছোট কাঠের মন্দির, পিঠে তৈরি করবার কাঠের হামানদিস্তা, মেয়েদের ব্যাটল-ডোর, ছেলেদের ঘুড়ি, এবং নববর্ষের উপহার ও প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। শহরের বড় বড় দোকান ও ডিপার্টমেণ্ট-ষ্টোরগুলি ও নানা রকম জিনিষে ভরে যায়। সকাল থেকে রাত অবধি এই সব দোকানে এত ভীড় হয় যে তিলধারণের জায়গা থাকে না।

আমাদের যেমন হালখাতার আগে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতে হয় এরাও তেমনি নূতন বৎসরের উৎসবের আগে সারা বৎসরের কাজকর্ম হিসাব-নিকাশ দেনা-পাওনা সব মিটিয়ে ফেলে। ছেলেরা সব সারা বৎসরের কাজকর্ম ধার শোধ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে, আর মায়েরা ছেলেমেয়েদের জন্যে পোষাক তৈরি, আত্মীয়স্বজনের জন্যে উপহার কেনা ও নূতন ক'রে সংসারটিকে সাজাবার কাজে ব্যস্ত থাকে। মেয়েদের এই ব্যস্ততাকে জাপানী ভাষায় 'সিওয়াসি' বলে—'সি'=পুরোহিত, 'ওয়াসি'=দৌড়ান; আগেকার দিনে পুরোহিতরা যদিও ধীর স্থির ছিলেন, কিন্তু বৎসর শেষ হবার আগে চাঁদা আদায় করবার জন্যে অত্যন্ত দৌড়াদৌড়ি ক'রে বেড়াতেন। আজকালকার গিন্নীরাও তেমনি স্বভাবতঃ ধীরস্থির হলেও নববর্ষের উপহার ও অন্যান্য জিনিষ কেনবার জন্যে দৌড়াদৌড়ি সুরু করেন।

নববর্ষের পূর্ব্বে প্রত্যেকের বাড়ী সংস্কার করা হয়। কাঠের দেওয়ালে যে কাগজ লাগান থাকে তা আগাগোড়া বদলে ফেলে। মেজেতে খড়ের গদির উপর যে মাদুর ('তাতামি') মোড়া থাকে তাও সব বদল করে। সাংসারিক ব্যবহারের যাবতীয় জিনিষ সব নূতন ক'রে করা হয়। সমস্ত বাড়ীটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ঝকঝকে ক'রে তোলে। এই ভাবে ঘরে বাইরে, সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও পবিত্র হয়ে এরা নববর্ষকে আবাহন করে। এই নববর্ষের উৎসব চলে পনর দিন ধ'রে। দ্বিতীয় দিন হচ্ছে এদের 'হাটস্তবুরো' অর্থাৎ প্রথম স্নান। প্রথম দিন নানা কাজে সবাই ব্যস্ত থাকায় স্নান করা হয়ে ওঠে না, দ্বিতীয় দিনে নানা রকম অনুষ্ঠান ক'রে স্নানের পর্ব্ব সারা হয়। সব স্নানাগার ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে সাজায়। এই দিনই রাত্রে 'হাটস্ত ইমে' বা প্রথম স্বপ্ন দেখা হয়। এটি একটি মজার প্রথা। নিয়ম এই যে, সেদিন রাত্রে শোবার সময় একটি কাগজে দুটি পদ এমন ভাবে লেখা হবে যা প্রথম ও শেষ দিক্ থেকে পড়লে একই হয়। পদগুলির অর্থ হচ্ছে, দীর্ঘ রজনীর নিদ্রার পর সকলে জেগেছে, পরম আনন্দ ও মধুময় এ মুহূর্ত্তটি। ভাল স্বপ্ন দেখলে এদের ধারণা যে সমস্ত বৎসর সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভ হবে। সবচেয়ে মঙ্গলকর মনে করে যদি 'ফুজিয়ামা'কে স্বপ্ন দেখে, তার পর বাজপাখী, তার পর বেগুনের স্বপ্ন দেখা ভাল। তৃতীয় দিনও নববর্ষের ছুটি থাকে।

চতুর্থ দিন সমস্ত শহর যেন নূতন শ্রী ধারণ করে। আজ থেকে নববর্ষে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ হ'ল। গত কয়েক দিনের ছুটির পর আজ চার দিক্ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ফুটপাথগুলি দোকানের নূতন আমদানী জিনিষপত্রে ভরে গিয়েছে, লরী ভরে ভরে জিনিষ সব দোকানে যাচ্ছে।

গাড়ী, সাইকেল, মোটর-সাইকেল প্রভৃতিতে বহু পতাকা তাতে নানা রকম বাণী লেখা, ঘোড়া ও গাড়ী-গুলিকেও সুন্দর ক'রে সাজিয়েছে।

৫ই তারিখে রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহে প্যারেড সম্পন্ন হয়। এই স্বাধীন জাতির সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন প্রকারের সাজসজ্জা ও কুচকাওয়াজ দেখবার জিনিষ। ৬ই তারিখে ফায়ার বিগ্রেডের উৎসব, প্রতি শহরে এটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। প্রথমে ফায়ারম্যানদের প্যারেড হয়, পরে কি ক'রে আগুন নেবায় তা দেখানো হয়। তার পর খুব উঁচু বাঁশের মইয়ে নানা রকম ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে দর্শককে স্তম্ভিত করে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড়গণকে পুরস্কার দেওয়া হয় ও বিগত বৎসরে যারা সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হয়। এই দিন ব্যাঙ্ক, আপিস প্রভৃতি খোলে আর সকলে সরকারী পোষাক প'রে রাজার বাড়ীর পরিখার কাছে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে রাজার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে প্রথম কাজ আরম্ভ করে। ৭ই তারিখে হয় 'নানাকুসা', 'নানা' – সাত, 'কুসা' – ঘাস – অর্থাৎ সপ্ত শাকান্নের উৎসব। এই দিনে এরা ভাতের সঙ্গে সাত রকম শাক সিদ্ধ ক'রে দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে সেই শাকান্ন আহার করে। এটা অতি প্রাচীন প্রথা। এদের বিশ্বাস এই যে, শাকান্ন খেলে সয়তানের সৃষ্ট নানারূপ রোগ দূর হয়ে যায়।

এই মাসে 'তোকাএবিসু' 'কাউ-মাইরি,' 'দোন্দো', 'উসোকাইয়ে' প্রভৃতি উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

নববর্ষে গৃহকর্ত্রী অভ্যাগতকে সাকে পান করতে দিচ্ছেন

জাপানীদের বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। সামান্য অনুষ্ঠানেও এরা সকলে যোগ দিয়ে আমোদ-প্রমোদে সজীব ক'রে তোলে। আমাদের দেশেও উৎসবের ব্যবস্থা কিছু কম ছিল না, বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, কিন্তু নানা কারণে সেগুলি এখন প্রাণহীন—বিদেশের বিচিত্র উৎসবের মধ্যে বার-বার আমাদের দেশের নীরস, আনন্দহীনতার কথা স্মরণ ক'রে মন ভারাক্রান্ত হয়।

সিংহভূম জেলায় প্রাচীন কালের মানব

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ছোটনাগপুরের মধ্যে সিংহভূম জেলায় অনেকগুলি ছোট-খাটো নদী আছে। তাহার মধ্যে একটির নাম সঞ্জয়, আর একটি বিঞ্জয়। বিঞ্জয় সঞ্জয় নদীতে পড়িয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া সড়ইকলা রাজ্যে খড়কাই নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের ভূভাগ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি জমিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু ছোটনাগপুরের যে-অংশের কথা বলিতেছি সেখানে মাটি নদীর পলি জমিয়া উৎপন্ন হয় নাই। লক্ষ লক্ষ বছরের পুরান পাথরে দেশ ভরা, তাহারই বুক চিরিয়া নদীগুলি বহিয়া গিয়াছে, এবং এই সকল নদীর আশপাশে হয়ত সুবিধামত স্থানে কোথাও কোথাও সামান্য পলি জমিয়া অনতিবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশের দক্ষিণাংশে যেমন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব ছিল না, ছোট-নাগপুরে কিন্তু সেরূপ নহে। খাঁটি বাংলার পলিমাটির মধ্যে কোথাও অতি প্রাচীন মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সিংহভূম জেলায় সেরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে চক্রধরপুর শহরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীতে এণ্ডারসন নামে জনৈক ইংরেজ কাজ করিতেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার মতি ছিল। তিনি সঞ্জয় ও বিঞ্জয় নদীর ধারে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত কতকগুলি অস্ত্র আবিষ্কার করেন। যে-যুগে ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই তখন মানুষ পাথর দিয়া অস্ত্র রচনা করিত। পাথরের কুঠার হইত, পাথরের ছেনি ও বাটালি নির্ম্মিত হইত, তীরের ফলা অথবা ছুরির মত বস্তুও মানুষে পাথর দিয়াই নির্ম্মাণ করিত। এণ্ডারসন সাহেব এইরূপ কতক-গুলি জিনিষ দুইটি নদীর কূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব-বিভাগে সেগুলি এখন সংরক্ষিত আছে। কিছু দিন হইতে নৃতত্ত্ব-বিভাগ এই সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে সামান্য যাহা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সঞ্জয়ের পাড়ে শুষ্ক পলিমাটির মধ্যে কাঠির মত ঘুটিং জমিয়া আছে

চক্রধরপুর শহরের প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে বরদা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহার পাশ দিয়া সঞ্জয় নদী বহিয়া গিয়াছে। সঞ্জয়ের পাড় খুব উচ্চ। শীতকালে জল সামান্যই থাকে, কিন্তু বর্ষার সময়ে জল প্রায় ৪০।৪৫ ফুট বাড়িয়া দুই পাশের কূল ভাসাইয়া দেয়। পাড়ের জমি আংশিকভাবে পলিমাটির তৈয়ারী। এই পলির মধ্যে চুনের ভাগ বেশী। ফলতঃ গ্রীষ্মের তাপে মাটি যখন

শুকাইতে আরম্ভ করে তখন মাটির ভিতরের চুন জায়গায় জায়গায় শুকাইয়া ঘুটিঙে পরিণত হয়। সিংহভূমের পুরাতন ও নূতন উভয় পলির মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ঘুটিঙ পাওয়া যায়। অথচ এখানে ঘুটিঙ পুড়াইবার চূনের ভাটা কোথাও দেখিলাম না।

বৃদ্ধা কোল রমণী

যাহাই হউক, উচ্চ পাড়ের উপরে এক স্থানে বিস্তর ভাঙা পাথর জমিয়া আছে। বরদা গ্রামের কিছু দক্ষিণে একটি স্বল্পকায় পাহাড় আছে। তাহার নীচেই বাইক্কা নামে গ্রাম। এই পাহাড় হইতে বর্ষার প্লাবনে অসংখ্য পাথরের কুচি মাটির সহিত মিশিয়া নদীর পাড়ে একটি অনতিউচ্চ সমতল ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। তাহার নিম্নে নদীর আরও নিকটে শুধু পলিমাটির দ্বারা নির্ম্মিত একটি ক্ষেত্র আছে। সেখানে মানুষের তৈয়ারী অস্ত্র একখানিও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উপরের ক্ষেত্রটিতে ভাঙা পাথরের মধ্যে হঠাৎ এমন দুই-এক খণ্ড পাথর পাওয়া যায় যাহাতে মানুষের কারিগরির প্রমাণ আছে। প্রাচীন কালে মানুষ একখণ্ড পাথর কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে অপর একখণ্ড পাথরের সাহায্যে ঠুকিয়া ঠুকিয়া কুঠারের আকার দিত। যে-ধার দিয়া কাটা হইবে তাহাকে ঘসিয়া ঘসিয়া শান দিত, এমনও দেখা যায়। মানুষ কিন্তু যে-কোনও পাথর দিয়া কুঠার রচনা করিত না। সিংহভূমে এই কাজের জন্য ঈষৎ নীলাভ এক প্রকার আগ্নেয় প্রস্তরের ব্যবহার হইত। বরদা গ্রামের কাছে কুঠারগুলি ঐ প্রস্তরে তৈয়ারী, অথচ নিকটে সেরূপ প্রস্তরের খনি নাই। আশপাশে অন্যবিধ পাথরের খণ্ডের মধ্যে ঈষৎ নীলাভ পাথরে তৈয়ারী কুঠার দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু অস্ত্রশস্ত্র নহে, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মাটির পাত্রের অনেক ভগ্নাংশ এখানে পাওয়া গিয়াছে। আজকাল

ভাঙা পাথরের মধ্যে মানুষের তৈয়ারি পাথরের কুঠার

এদেশে কুমারেরা চাকে মাটির বাসন গড়ে। তাহারা মাটি ভাল করিয়া বাছিয়া লয়, প্রয়োজন হইলে কিছু বালিও মেশায়। কিন্তু কখনও মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের জন্য

তমড়িয়া তেলিদের ঘানি

পাওয়া যায়। কতকগুলির নির্ম্মাণকার্য হয়ত শেষ হয় নাই, এমনও হইতে পারে।

একটি স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে, মাত্র দশ-বার বিঘা জমির মধ্যে দেড় শত কুঠার ও মাটির ভাঙা পাত্র আবিষ্কৃত হওয়া কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মনে হয় এই স্থানে বহু দিন ধরিয়া প্রাচীন মানুষের বসবাস ছিল, তাহার পর যে-কারণেই হউক ইহা পরিত্যক্ত হয় ও অবশেষে আংশিক-ভাবে শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানকার মাটি খুঁড়িলে হয়ত নীচের স্তরে আমরা প্রাচীন মানবের বসবাসের আরও প্রমাণ পাইব। হয়ত সেরূপ প্রমাণ পাওয়া না-ও যাইতে পারে। যাহাই হউক, খুঁজিয়া দেখিতে দোষ নাই।
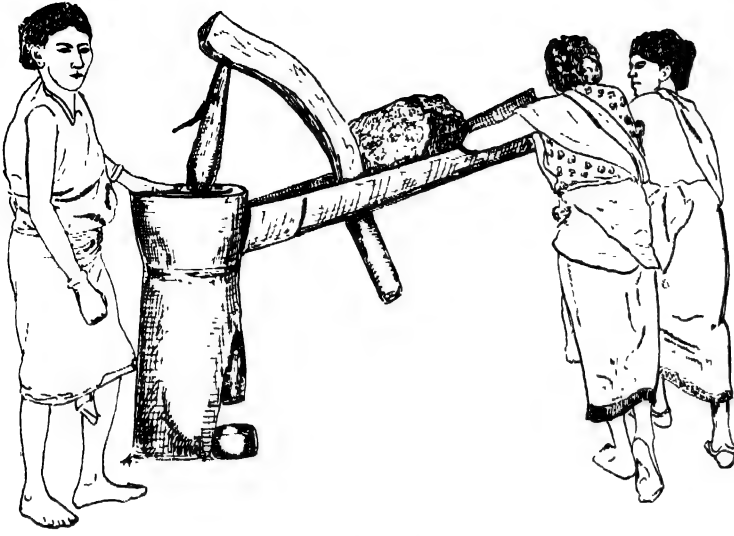
মাটিতে তুঁষ মেশায় না। বরদা গ্রামের নিকট যেখানে প্রস্তর-যুগের কুঠার পাওয়া যায় সেখানে আজকালকার চাকে-গড়া মাটির পাত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধরণের মোটা তুঁষ-মেশান পোড়া মাটির টুকরাও দেখিতে পাওয়া যায়। বেলারি জেলায় পাথরের কুঠারের সঙ্গে এরূপ মাটি পাওয়া গিয়াছে, অজন্তায় এরূপ মাটি দেখিয়াছি এবং মোহেন-জো-দড়োর সর্ব্বোচ্চ স্তরে যে-সব ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন আছে সেখানে তুঁষ-মেশানো পোড়ামাটির কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া যায়।

বরদার নিকট মাটির উপর আরও একটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। লৌহনিষ্কাশনের পরে যে মল (slag) পড়িয়া থাকে তাহার ছোট ছোট স্তূপ ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি কিন্তু প্রাচীন হইতে পারে, নবীনও হইতে পারে। ইহাদের কথা পরে বলিব। যে-স্থানটির কথা আলোচনা হইতেছে সেখান হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক গবেষণারত শিক্ষক প্রায় দেড়শত কুঠার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার সহিত বাটালি ও এক প্রকার গোলাকার অস্ত্র ও নানাবিধ মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ সংগৃহীত হইয়াছে। কুঠারগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে ব্যবহারের চিহ্ন আছে। দু-একটির ধার পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর আবার ঘসিয়া শান দেওয়া হইয়াছে, এমন প্রমাণও

লৌহমল এবং মৃৎপাত্রের বিষয়ে সন্ধান লইবার জন্য আমরা চক্রধরপুরের চারি পাশে ঘুরিতে লাগিলাম, তাহাতে ক্রমে এদেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের সম্বন্ধে নূতন কতকগুলি সংবাদ সংগৃহীত হইল। এদেশে কুমারেরা আজকাল মাটিতে আদৌ তুঁষ মেশায় না, পূর্ব্বকালে অথবা অন্যদেশে মেশান হয় কিনা তাহাও ইহারা বলিতে পারিল না। প্রসঙ্গক্রমে চক্রধরপুরের কুমারেরা অপর একটি সংবাদ দিল, তাহার মূল্য আছে। ইহারা বলিল, কুমারদের এক শ্রেণী আছে যাহারা বাসন গড়িবার সময়ে কাঠের ছাঁচ ব্যবহার করে, ইহারা কিন্তু সেরূপ কখনও করে না। দুই কুমার দুই শ্রেণীর অন্তর্গত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বা সামাজিক সম্বন্ধ নাই।

কুমারগণকে ছাড়িয়া আমরা কামারের কাছে লৌহমলের বিদ্যা শিখিতে গেলাম। লোহকারদের মধ্যেও মোটামুটি দুই ভাগ আছে। এক হইল স্থানীয় লোহার, অপর আগন্তুক লোহার। স্থানীয় লোহারেরা নিজেদের রাজওয়াড়ি লুহার বলে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে

ইহাদিগকে চাপুয়া কমার নামে পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। চক্রধরপুরের রাজওয়াড়ি লুহারেরা আজকাল অন্য দেশের মত হাপর ব্যবহার করিতেছে বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তাহারা এখনও পূর্ব্বের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একপ্রকার হাপর ব্যবহার করিয়া থাকে। দুইটি কাঠের জামবাটির মত বস্তু রচনা করা হয়। তাহার নিম্নদেশে ফুটা থাকে এবং ফুটায় চোঙা লাগান হয়। কাঠের বাটির উপরে গরুর চামড়া বাঁধা হয়। চামড়ার মধ্যদেশে ছিদ্র থাকে। নিকটে দুইখণ্ড বাঁশ পুতিয়া তাহাতে দড়ি ও ছোটো কাঠি বাঁধিয়া সেই ছিদ্রের সহিত যুক্ত করা হয়। একজন স্ত্রীলোক অথবা বালক হাপরের উপরে দাঁড়াইয়া এক বার এ-পা দিয়া একটিতে চাপ দেয় এক বার ও-পা দিয়া অপরটিতে চাপ দেয়। বাঁশের টানে হাপরের চামড়া সর্ব্বদা উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করে। পায়ে চাপিবার সময়ে মাঝখানে ছিদ্রটি বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া হাপরের হাওয়া শুধু চোঙার পথেই বাহির হইতে পারে। চক্রধরপুরে অল্প দিন আগেও চাপুয়ার ব্যবহার ছিল, এখন কেবল গ্রামাঞ্চলে আছে। লুহারেরা বলিল যে তাহারা এখনও পাথর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিতে পারে। খরসনা রাজ্যে ও সিংহভূম জেলার মধ্যে উত্তর দিকে বনাঞ্চলে লোহা তৈয়ারী করিবার লোক এখনও আছে। ইহারা কাঠকয়লা এবং সোহাগার মত এক প্রকার পদার্থ মিশাইয়া লৌহ নিষ্কাশন করে। একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, তাহার পিতা এদেশে লোহার ব্যবসায় করিতেন। পাথর কাঠকয়লা প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিতেন। দুই জন কামারকে দুই আনা হারে খোরাকি দিতেন। তাহারা সারাদিন খাটিয়া যে লৌহ প্রস্তুত করিত তাহাতে চার খানা লাঙলের ফাল হইত। সেই চার খানা ফাল অন্ততঃ দেড়টাকা দুই টাকায় বিক্রয় হইত। কামার খোরাকির বেশী আর কিছু পাইত না। তখন খুব লাভের দিন ছিল, আজকাল আর সেদিন নাই।

বিক্রম নামে এক জন রাজওয়াড়ি লুহার আরও কতকগুলি সংবাদ দিল। ইহাদের জল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে

এক জন চাপুয়া কামার

গ্রহণ করিত না। কারণ স্ত্রীলোকেরা চাপুয়াতে গরুর চামড়া ছুঁইয়া সেই পায়ে রান্নাঘরে যাইত। ইহা ভাল নহে। সেইজন্য ইহারা চাপুয়ার ব্যবহার ছাড়িয়া অন্যবিধ হাপরের সাহায্যে লইয়াছে, ব্রাহ্মণেরাও নাকি আর জল গ্রহণ করিতে আপত্তি করে না। তাহা ছাড়া নূতন হাপরে আরও এক প্রকার সুবিধা আছে। চাপুয়া চালাইতে হইলে অন্ততঃ দুই জন লোকের দরকার। এক জন চাপুয়া চালাইবে, আর এক জন লোহার কাজ করিবে। কিন্তু বিহারের ভাতিতে বা হাপরে কামার নিজেই লাঠা টানিয়া হাপর চালাইতে পারে, তাহার লাভ বেশী হয়। এইরূপে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ কারণে চাপুয়ার ব্যবহার চক্রধরপুর অঞ্চল হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

শুধু লোহা কেন, অন্যান্য ব্যাপারেও যে কত সূক্ষ্ম কারণে মানুষের সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চক্রধরপুর, সড়াইকলা প্রভৃতি অঞ্চলে তৈলনিষ্কাশনের জন্য নানাবিধ যন্ত্র প্রচলিত

চাপুয়া কামারদের হাপর

আছে।* তৈলনিষ্কাশকগণের মধ্যে কাহারও জল চল, কাহারও অচল। যাহারা প্রথমে ঘানি লইয়া এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের জল অচল। তাহারা জাতিতে কলু। তৈল অনেকেরই প্রয়োজন, অথচ সকল গ্রামে কলু পাওয়া যায় না। জঙ্গলে ভরা পথঘাট, অতএব কলুরা সকল গ্রামে যাইতেও চাহিত না। ফলতঃ এদেশের অধিবাসী কোল জাতি নিজেরাই ঘানির বিদ্যা শিখিয়া লইল। কিন্তু পাছে তাহাদের কলুদের মত অবনত শ্রেণীতে পড়িতে হয় এই ভয়ে তাহারা ঘানি চালাইল বটে, কিন্তু চালানোর ব্যাপারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লইল। কলুরা ঘানিতে একটি বলদ যোতে, তাহার চোখে ঠুলি বাঁধে। কোল জাতি যখন ঘানি চালাইল তখন তাহারা বলদটিকে একেবারে বাদ দিল। ঘানির পাটাটিকে একটু উচ্চ করিয়া তাহারা মানুষের সাহায্যেই ঘানি চালাইতে লাগিল। অথচ তাহাদের বলদ ছিল না এমন নহে। চাষের কাজে, গরুরগাড়ীতে তাহারা নিত্য গরু মহিষ যুতিয়া থাকে। কিন্তু পতিত হইবার ভয়ে তাহারা ঘানিতে বলদ যুতিল না। ঘানি চালাইল বটে কিন্তু সখের কলু সাজিল, নিজের জাত খোয়াইল না। এইরূপে শুধু সামাজিক কারণেই সিংহভূম তথা ছোটনাগপুরের অন্যত্র তেলের ঘানিতে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। রাঁচি জেলায় তামাড় নামে এক পরগণা আছে, সেখানেও কোল জাতির বাস। যে তেলিদের কথা বলিতেছি, তাহারা নিজেদের তমড়িয়া তেলি বলে। ঘরে কোল ভাষায় কথা বলে এবং অন্যান্য কোলেদের সঙ্গে সামাজিক আচার-ব্যবহারে সম্বন্ধ রাখে। ইহারা স্বতন্ত্র একটি জাতিতে পরিণত হয় নাই।

এইরূপে ছোটনাগপুরের বর্ত্তমান ও প্রাচীন অধিবাসিগণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা চক্রধরপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তাহা হইলে প্রস্তর-যুগের উল্লিখিত ক্ষেত্রটি খুঁড়িয়া প্রাচীন কালের আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা আছে।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় "সটইকলা রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১২

বাড়ী ঢুকিবার মুখেই এক জন স্থূলকায় প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিশ্বজিতের দেখা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এই যে বিশ্বজিৎ বাবু, আর যে বড় ক্লাবে দেখতে পাই না?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "সময় ক'রে উঠতে পারি না, নলিন-দা।"

নলিন-দা বলিলেন, "আরে রাখ তোমার বাজে কথা, সময় ক'রে উঠতে পারি না! জান আমার বাড়ীতে তিনটে রুগী, তবু সখ এমনি জিনিষ এক দিনও হাজিরা দিতে ভুল করি না। জান না বুঝি এবার কি প্লে হচ্ছে?"

"ক্ষত্রবীর বুঝি?"

মাথা নাড়িয়া নলিন-দা বলিলেন, "আরে রামঃ বল—ও-সব সেকেলে বই কি আজকালকার দিনে চলে? এবার রবিবাবুর 'চিরকুমার সভা' ধরা হয়েছে।"

"বলেন কি দাদা? এতটা উন্নতি হয়েছে ক্লাবের?"

"উন্নতি কি সাধ করে হ'ল—ঠেলায় প'ড়ে, বুঝলে। 'পাণ্ডব-গৌরবে' আমার ভীমের পার্ট দেখেছিলে তো—কমসে কম হাজার নাইট নেমেছি ওতে—বইখানা ধর, আগাগোড়া মুখস্থ ব'লে দেব। চল্লিশখানা রূপোর মেডেল—একখানা সোনার অথচ—আশুবাবু ওই ভীমের পার্ট দেখে কাগজে বার করলেন নিন্দে! ছ্যাঃ—কোথাকার এক চোতা কাগজ পড়ে কে বল তো ভাই, মনে মনে বললুম, জীতা রহ। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখ নি। আসুক আবার নতুন বই সিলেক্‌সনের সময়—তোমায় যদি কাত না করি তো···কেমন, ভোটের জোরে দাঁড় করালুম তো 'চিরকুমার সভা।'

বিশ্বজিৎ বলিল, "আচ্ছা দাদা, নমস্কার।"

খপ করিয়া তিনি বিশ্বজিতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মানে? সরে পড়তে চাও? ওটি হচ্ছে না। চল সঙ্গে।"

বিশ্বজিৎ বিব্রত হইয়া বলিল, "দেখছেন না, ইনি সঙ্গে রয়েছেন

নলিন-দা বলিলেন, "তাতে কি, ওঁকেও নিয়ে চল না কেন? কে উনি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "উনি সম্প্রতি আমাদের আপিসে ঢুকেছেন।"

নলিন-দা লাফাইয়া উঠিলেন, "আপিস ষ্টাফ্! বাঃ, এতক্ষণ বলতে হয়। ওঁকে বেশ চমৎকার মানাবে ফিমেল পার্ট। নিয়ে চল, নিয়ে চল।"

অমিয়র মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নলিন-দা বলিলেন, "এই ফিমেল পার্ট নিয়ে কি মারামারি ক্লাবে। একটাও কি জুৎসই চেহারা মেলে। গাল-চড়ানো, সাড়ে চার হাত লম্বা, গড়নের নেই শ্রীছাঁদ, যেন বাখারিতে কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হ'ল! আবার চেহারা মেলে তো হয় মুখ দিয়ে রা বেরোয় না, না-হয় গলার স্বরটি কর্কশ। তাদেরই খোসামোদ করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত!" হঠাৎ অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার পার্ট টার্ট আসে তো? গান?"

অমিয় মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

নলিন-দা বলিলেন, "কুছ পরোয়া নেই, উপযুক্ত কাটারি পেলে শান দিয়ে নিতে কতক্ষণ? বুঝলে, বিশ্বজিৎ ভাই, তোমার এই নলিন-দার হাত দিয়ে আজ অবধি পাঁচ-ছ-শ ফিমেল পার্ট তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। এক-একটিকে রত্ন বললেও বেশী বলা হয় না। পরশু ষ্টারে রিপন কলেজের যে 'চাঁদবিবি' প্লে হ'ল—তার চাঁদবিবি আর যোশী দুইই এই অধীনের হাতের তৈরি। কেমন করল বল দেখি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "চমৎকার।"

নলিন-দা বলিলেন, "এঁকে পেলে ওদের নামও চাপা

পড়িয়ে দিতে পারি। হরেন—আমাদের হরেন গো, আজকাল বলে কি জান? বলে ফিমেল পার্ট আর করব না। আরে মর, তোর ওই শুঁট্‌কো চেহারা, আর মিহি গলা নিয়ে তুই করবি মেল পার্ট! দিয়েছিলুম নৃপবালার পার্ট, ওর টাক পূর্ণর পার্ট। নিলে না। না নিলি নাই নিলি—আমি চেষ্টা করলে অমন এক-শ-টা নৃপবালা এনে হাজির করতে পারি। তবে কি জান, আপিস ষ্টাফ ছাড়া বাইরের লোক দিয়ে প্লে করানোতে মাঝে মাঝে আপত্তি হয়, তাই। নইলে হ্যাঁ—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনি এগোন নলিন-দা, আমি একটু জিরিয়ে জলটল খেয়ে—"

নলিন-দা বলিলেন, "তোমরা ছোকরার দল দিন দিন বড় আয়েসী হয়ে উঠছ। সেখানেও জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, জিরোবার জন্য ফরাস পাতা আছে। তবে যদি বৌমার মুখখানি না দেখলে শান্তি না-হয় তো আলাদা কথা।" কথা শেষে নলিন-দা সরবে হাসিতে হাসিতেই চলিয়া গেলেন।

বিশ্বজিৎ অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "যাবে—আমাদের ক্লাবে?"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি। আজ একা একা থাকতে ভাল লাগছে না। একটু গোলমাল, হৈ চৈ করে সময়টা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, হোম-সিক্‌নেস্।

বিশ্বজিতের স্ত্রী সুপর্ণা আজ ঘরের এক কোণে বসিয়াই ষ্টোভ জ্বালিল, ঘোমটার শালীনতা বজায় রাখিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই চা তৈয়ারী করিল এবং প্লেটে বিস্কুট রাখিয়া চা পরিবেশন করিল।

বিশ্বজিতের মত স্বাস্থ্যসম্পদে সুপর্ণা সম্পদশালিনী নহে। খাটো সওয়া তিন হাত ক্ষয়া গোছের চেহারাটির মধ্যে একটি ক্লান্তির ভঙ্গিমা পরিস্ফুট। গায়ের বর্ণ বা অলঙ্কার কোনটাই প্রচার করিবার মত নহে, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আবদ্ধ বেণীতে হয়তো কেশ-সৌন্দর্য্যের নমুনা কিছু মিলিতে পারে, হাতের ক্ষয়প্রাপ্ত আটগাছি বরফি চুড়ির মধ্যে ফ্যাশানের এতটুকু নমুনা নাই। যে কাপড়খানি সে পরিয়াছে তাহার পাড়ের বিশেষত্বও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এমন সাদাসিধা ধরণের স্ত্রী না হইলে কেরানীর সংসারে মানাইবে কেন? সে-সংসারে শান্তিই বা আসিবে কোথা হইতে?

বিশ্বজিৎ সুপর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আজ সিনেমায় যাবে?"

"না" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুপর্ণা বাহির হইয়া গেল।

অমিয় বলিল, "আপনারা সিনেমায় প্রায়ই যান বুঝি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "হ্যাঁ, ঐ আমার একটা বদ নেশা। মানুষকে যেমন ভূতে পায় আমায় তেমনি দেশভ্রমণের নেশায় পেয়ে আছে। প্রথম যখন রেলের চাকরিতে ঢুকি তখন মনটা খুশীতে ভরে উঠেছিল—বইয়ের পাতায় যে-সব বর্ণনা পড়ে মনে আনন্দ পেয়েছি—এখন সেই সব দেশ চোখে দেখবার সুযোগ পাব। পয়সা লাগবে না, পাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। তখন সংসার ছিল না ঘাড়ে—ছিলাম স্বাধীন—পাঁচটা বছর ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। ভারতবর্ষের বাইরে পা দেবার সুযোগ তো জীবনে হবে না, কাজেই সিনেমা দেখে সাধ মিটাই।"

অমিয় বলিল, "ভারতবর্ষকে আপনি তবু চোখে দেখেছেন—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "হয়তো চোখে না দেখলেই ভাল করতাম! দিল্লী-আগ্রায় গিয়ে যা দেখেছি তাতে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে, বৃন্দাবন, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা বা কাশীতে যা দেখেছি তাতে ভক্তি-শ্রদ্ধাগুলি হারিয়েছি, পুরাণ-কথায় অবিশ্বাস জন্মেছে আর মাদ্রাজের ওদিকে বেড়িয়ে রবিবাবুর সেই কবিতার শেষ লাইন মনে পড়ে,

"পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

বাহির হইতে কে ডাকিল, "বিশ্বজিৎ দা, আছেন?"

"কে?"

"আমি রমেন। একটু আসবেন এদিকে, একটা কথা ছিল।"

বিশ্বজিৎ উঠিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সিনেমায় আজ আর যাওয়া হ'ল না ভাই।"

"কেন?"

"হাতে মোটে গোটা দুই টাকা ছিল, একটি তো গেল বেরিয়ে। যে ডাকছিল ও কে জান? আর এক দিন বলেছিলাম না, প্রেসে কাজ করেন অথচ রোজ পার্কে হাওয়া না খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, সেই সুখী দম্পতি। একটি টাকা না হ'লে ওদের লেকে যাবার বাস-ভাড়ার অনটন!"

অমিয় বলিল, "পয়সা নেই, তবু বেড়াবার সখ আছে?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কেন থাকবে না? জীবন যখন উপভোগের জিনিষ—তখন অর্থের অনটনে কি যায় আসে? এমন শনিবারের সন্ধ্যা জীবনে আর কত বার আসবে কে বলতে পারে!"

অমিয় বলিল, "আপনার মনেও—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমার মনেও সখ প্রচুর, অমিয়। দিন আসছে, চলে যাচ্ছে, প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তনই হচ্ছে, কিন্তু আমরা তার কতটুকু উপভোগ করতে পারি? একটি প্রবল দুঃখে অভিভূত হয়ে অনেক কিছুই আমরা হারাচ্ছি। ওদের দেখে এক-এক সময় হিংসে হয়। ওরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া, খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদে ওদের হিসাব নেই, পরের দুয়ারে হাত পাততেও লজ্জা বোধ করে না। ওরা জানে সুনাম-দুর্নাম, লাভক্ষতি—জীবনের মেয়াদ যত দিন—মাত্র তত দিনই! নিজের বংশধরদের জন্য সঞ্চয় মূর্খেরাই করে থাকে।"

অমিয় বলিল, "আপনারও কি সেই মত?"

বিশ্বজিৎ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, "যে-সভ্যতার স্রোতে আমরা ভাসছি তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। এক সময়ে মনে হয় বইকি—ওরাই সুখী—কিন্তু যখন ওদের ঘরে পোলাওয়ের পর দিনই হাঁড়ি চড়ে না, শুকনো মুখে দু-আনা পয়সা ধার ক'রে মুড়ি চিবিয়ে ক্ষিদে মেটায়, তখন মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ওরাই বলতে পারে, 'ইট, ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি।' সত্যিই ওতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না আমার সন্দেহ হয়।"

অমিয় বলিল, "আমারও মনে হয়, আনন্দের ষ্ট্যাণ্ডার্ড তো সকলের এক নয়, কাজেই অনুভূতিহীন মনের ওগুলিও মস্ত খোরাক। খানিক হৈহৈ ক'রে কাটান, মন্দ কি! আজ আমারই ইচ্ছে করছে অমনি হৈহৈ খানিক করি, কেননা, মনের মধ্যে আপনার জনের সান্নিধ্য-লাভ না করতে পারার দুঃখ আমায় পাগল ক'রে তুলেছে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "চল তাহলে নলিন বাবুর ক্লাবে যাওয়া যাক্।"

অমিয় বলিল, "তার চেয়ে এই ঘরখানি তো মন্দ লাগছে না, বিশ্বজিৎ-দা! আপনার ছেলেটি বেশ শান্ত ভাবেই ঘুমুচ্ছে, বাপ-মায়ের মনে কিসের দুশ্চিন্তা ও অবোধ তা জানে না। বাল্যকাল সত্যই সুখের।" একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় গুটানো বিছানার উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "কি জানি, কোন্ কালটা আমাদের জীবনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল বলতে পারি না। যখন চিন্তার জট ছাড়াতে প্রাণান্ত হয় তখন শিশুকালের কথা স্মরণ করি, যখন শক্তি হারাই তখনি যৌবনের জন্য অনুতাপ জাগে—আসলে যা আমরা সৌভাগ্য ও সম্ভ্রমে অতিক্রম করে যাই, তাই হয়তো ভালবাসি।"

অমিয় বলিল, "জীবন নিয়ে এমন একটা সুন্দর কাব্য লেখা যায় না, বিশ্বজিৎ-দা?

বিশ্বজিৎ বলিল, "যায় বইকি—কিন্তু তার পৃষ্ঠা ওল্টাবে কে! আমি সংসারী লোক, আমার সময় কম। তুমি সন্ন্যাসী, তোমারই বা কাব্যচর্চ্চার সময় কোথায়? খোলা ছাদের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কখনো কখনো বিস্তীর্ণ আকাশ দেখে আর অসংখ্য নক্ষত্র দেখে কারও কারও মনে আত্মার রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তা তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু নীচের কোলাহলভরা সংসারে চোখ কান সঁপে দিলে, সে চিন্তার বুদ্‌বুদ্ কতক্ষণ বল? এমনি সংসারের আবর্ত্ত যে বাঁধা সড়ক ছাড়া পাশ কাটিয়ে চলার ক্ষমতা নেই। তোমার জীবন-কাব্যের একখানি পাতাও হয়তো কেউ উল্টে দেখবে না।

অমিয় বলিল, "না দেখুক। আমি লিখব নিজের আনন্দে। অর্থ উপার্জ্জন আমার লক্ষ্য নয় যে পাঠক

ভোলাবার কৌশল আয়ত্ত করতে যাব। যাঁরা আর্ট-ক্রিটিক তাঁদের মতামতের ভরসাও আমি রাখি নে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "তাহলে সে-লেখার নাম কাব্য দিও না, আর কিছু বল। ভাল কথা, জীবনকে তোমার কি মনে হয়? বন্ধন, না মুক্তি?"

অমিয় বলিল, "বন্ধনের বেদনা ও মুক্তির আনন্দ দুই-ই আছে এতে। আমি তিরিশ টাকা মাইনের কেরানী—আমি আকাশের পানে চেয়ে আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা যখন করি, তখন আমার ক্ষুদ্রত্ব কোথায় থাকে? জগতের যে-কোন মনীষী বা মহাঋষির আসনের পাশে তখন আমার স্থান, সেই তো আমার মুক্তির ক্ষেত্র। আবার এই ঘরখানির মধ্যে স্ত্রীপুত্রের রোগ বা দুঃখ দেখে যখন বিচলিত হই, আপিসের কশাঘাতে মন বিকল হয়ে ওঠে তখন বন্ধনের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, তখনই তো আমার ক্ষুদ্রত্ব ধরা পড়ে।"

"তাহলে তুমি কে?"

"আমি কে—সেই জিজ্ঞাসাই আমার প্রথম ও পরম প্রশ্ন; আমি কি—সেই স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টাই তো আমার সব চেয়ে বড় কাজ। অথচ অসংখ্য মেঘের মধ্যে একটি মেঘের মত, সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত আমি নাম-গোত্রহীন। আমাকে জানবার সত্যকার চেষ্টা তো কোন দিন করি না—এই তো আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ!"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "তোমার দার্শনিকত্ব রাখ, ওর সীমা নেই, সংখ্যা নেই—জান কি অমিয়, এ জগতে যে যত বেশী চিন্তাশীল তার অশান্তি তত বেশী।"

"কেন বিশ্বজিৎ-দা?"

"কি জানি কেন, ঘুম যারা ভালবাসে—মাঝে মাঝে জাগা তারা পছন্দ করে না হয়তো। আর তর্ক চলবে না অমিয়—তোমার বৌদিদি কড়া নেড়ে থামতে ইঙ্গিত করছেন—দুষ্টু খোকাটাও বিছানায় উঠে বসেছে।"

অমিয় হাত বাড়াইয়া বলিল, "খোকাকে আমার কোলে দিন।"

"নাও" বলিয়া অমিয়র কোলে দিতেই খোকা কাঁদিয়া উঠিল। অমিয় আনাড়ীর মত গুন্‌গুন্ করিয়া কি ছড়া বলিতে গেল তাহাতে খোকার চীৎকার সপ্তমে উঠিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "ওরা কোল চেনে। তোমার আড়ষ্ট হাতের ধরা বুঝতে পেরেছে দুষ্টু, দাও।"

বিশ্বজিতের কোলে উঠিয়া খোকা শান্ত হইল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "আর নয়, যার ধন তাকে গচ্ছিত ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি চল। নলিন-দা নইলে রাগ করবেন।"

কলিকাতার মধ্যে এতখানি ফাঁকা জমির কল্পনা করা যায় না। কর্ম্মচারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রেলওয়ে বিভাগ কয়েক বিঘা জমি প্রাচীর ঘিরিয়া দান করিয়াছেন। প্রকাণ্ড লৌহ-গেটের পাদমূল হইতেই লাল সুরকির শোভন পথটি আরম্ভ হইয়া পাঠাগার ও রঙ্গমঞ্চের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া পশ্চাতের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। পথের দু-ধারে যে-সব খণ্ড জমি পড়িয়া আছে তাহার কোনটিতে মরসুমী ফুলের গালিচা পাতা, কোন খণ্ড সবুজ তৃণাস্তৃত, কোন খণ্ডে যুঁই-গোলাপের ঝাড়। সবুজ জমির কোল হইতে বিজলী-স্তম্ভের সারি পশ্চাতে ফুটবল খেলার মাঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। গাড়ী-বারান্দার নীচে যাহাতে বৃষ্টির দিনে অফিসারদের মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা হলে প্রবেশ করিল। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও এমন প্রশস্ত হল আছে কিনা সন্দেহ। হলে চেয়ারের সারি, অতিকায় থামের উপর প্রকাণ্ড লোহার জয়েষ্ট দিয়া হলের ছাদটি তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রত্যেক থামের গায়ে ইনষ্টিট্যুট-সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উচ্চ ইংরেজ অফিসারের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রকাণ্ড হলকে সাজাইবার উদ্যম কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই, কেবল তাহার স্থায়িত্বের দিকেই কড়া রকমের নজর দেওয়া হইয়াছে।

হলের এক ধারে চার-পাঁচখানি তক্তাপোষ জুড়িয়া এক একটি আসর তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রত্যেক আসরে প্রকাণ্ড একটি সতরঞ্চ, তাহার উপর সাদা চাদর ও গোটা কয়েক আধময়লা তাকিয়া পড়িয়া আছে। গড়গড়াও দু-

একটি দেখা যায়। সেখানে কোন দল বসিয়া তাস খেলিতেছেন, কাহারা বা পাশার আড্ডা বসাইয়াছেন, দাবার ছক সম্মুখে রাখিয়া কয়েকজন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওপাশে লাইব্রেরির আপিস-ঘরে এখানকার সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। পাশের নাতিপ্রশস্ত ঘরে স্বাস্থ্যচর্চ্চায় কয়েকটি ছেলে মনোনিবেশ করিয়াছে। ব্যায়ামাগারের পাশ দিয়া একটি সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়াছে। দোতলায় উঠিলেই পাঠাগারের প্রকাণ্ড ঘরটি সম্মুখে পড়ে। গোটা ষাটেক বড় আলমারি এবং কাঠের র‍্যাকে ঠাসা বই, টেবিল পাতিয়া দুইজন লাইব্রেরিয়ান মোটা লেজার খুলিয়া বসিয়া আছেন—একজন চাপরাসী বাবুদের হুকুম মত আলমারি হইতে বই বাহির করিয়া দিতেছে।

বিশ্বজিৎ বইখানি টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "এক খানা ভাল দেখে বই দিন তো। এখানা তো মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।"

লাইব্রেরিয়ান হাসিয়া বলিল, "অনেকেই ঐ 'কমপ্লেন' করেন, কিন্তু উপায় কি বলুন। আপ-টু-ডেট যা কিছু নভেল বাংলায় বেরয় সবই আমাদের রাখতে হয়, সব বই তো আমাদের পড়া নেই, লিষ্ট দেখে আপনারা বেছে নিতে পারেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "নভেল ছাড়া অন্য বই বড় কম এখানে।"

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "এই আমার খাতা দেখুন, ডেলি পাচ-সাত-শ বই ইস্যু হয়, এর মধ্যে নাইনটি-নাইন্ পারসেণ্ট নভেল। কাজেই কেনার সময় নভেলের ভালমন্দ বাছতে গেলে চলে না, যা বেরয় তাই কিনতে হয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বাংলা দেশের পাঠকরা যে লম্বকর্ণের মত একথা রবিঠাকুর মিথ্যে বলেন নি। যাই হোক, আপনাদের উচিত অন্য বই কিনে লোকের টেষ্ট জন্মিয়ে দেওয়া।

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "আমরা তো আপনাদের হুকুমের চাকর—যা বলবেন তাই দিতে বাধ্য। যাঁদের বাড়ীতে বুড়ো বাপখুড়ো আছে তাঁদেরই কখনও সখনও দু-একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ নিতে দেখি, আর সব নভেল—স্রেফ নভেল। ছোট গল্পের বই হ'লেও পছন্দ হয় না। বই হাতে নিয়ে পাতা উল্‌টিয়ে দেখে বলেন, 'এ-সব ছোট ছোট গল্প চলবে না মশাই, ভাল দেখে বড় দেখে একখানা নভেল দিন।' তাই দিতে হয়। যে বই আজ ফিরিয়ে দিলেন, পনর দিন পরে সেই বইখানিই ভাল এবং বড় ব'লে আমাকে ইস্যু করতে হয়। আপনারাও হাসিমুখে নিয়ে যান। মা-লক্ষ্মীরা খুব বেশী নভেল পড়েন ব'লেই হয়তো কোন গল্পটাই মনে রাখতে পারেন না, কাজেই একই বই পনর দিন পরে দিলেও 'পড়া-বই' ব'লে অভিযোগ খুব কমই আসে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "মজা মন্দ নয়। আমাদের দেশে ভাল সাহিত্য যে গড়ে ওঠে না, এও তার একটা কারণ, অমিয়।"

লাইব্রেরিয়ান বলিল, "সাহিত্যের কথা দু-একজনের কাছে ছাড়া তো শুনি না মশায়। সবাই বলে, কম্‌পল্‌সারি চাঁদা ব'লেই লাইব্রেরির বই নেওয়া, নইলে কে সাধ ক'রে মেম্বার হত মশায়? সংসারের কাজ করব, না বই পড়ব? ও-সব আলসেমি আমাদের গেরস্থ-ঘরে পোষায় না।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "শোন, অমিয়, শোন।"

অমিয় লুব্ধ দৃষ্টিতে বই-ভর্ত্তি আলমারিগুলির পানে চাহিয়া ছিল। সংগ্রহ এখানকার প্রচুর। সাজাইবার বিশৃঙ্খলায় ভাল জিনিষগুলি চোখে পড়ে না। বইয়ের লিষ্ট বাহির করিয়া নাম-জানা ভাল বই বাহির করা চলে, কিন্তু বই সম্বন্ধে লাইব্রেরিয়ানের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। পাঠকের মন বুঝিয়া রস-পরিবেশনের ভার তো তাহারই উপর; ফুলকে ফুটাইতে যেমন স্রষ্টার একাগ্রতা ও সৌন্দর্য্য বোধের সাধনা দরকার, তেমনি ভাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব এই লাইব্রেরিয়ানদের। যেখানে পয়সার সঙ্গে সম্বন্ধ, পড়ার সঙ্গে নহে, সেখানে সাহিত্যের স্বাদ লইতে যাওয়া সত্যই বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশ্বজিতের বই লওয়া হইলে উভয়ে নীচে নামিল। রঙ্গমঞ্চের দু-পাশে দু-খানি ঘর। একটিতে ঐকতান-বাদন সুরু হইয়াছে, অন্যটিতে নাটকের মহলা চলিতেছে। নলিন-দা তাকিয়া ঠেস দিয়া আধশোয়া অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া

গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়াছেন, পাশে চৌকির উপর দাঁড়াইয়া একজন আধাবয়সী লোক ও একটি ছোকরা আবৃত্তি করিতেছে, বেঞ্চে বসিয়া প্রম্‌টার প্রম্‌ট্ করিতেছে।

নলিন-দা গড়গড়া টানা বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়াই বলিলেন, "উঁহু হ'ল না, আর একটু সেণ্টিমেণ্ট দিয়ে—" বলিয়া চক্ষু চাহিতেই বিশ্বজিতের উপর নজর পড়িল। মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া বসিয়া কোমরের কাপড় কসিতে কসিতে বলিলেন, "আরে এস, এস। ওহে চারু, এই ছোকরার কথাই বলছিলাম, ইনি আমাদের আপিসের লোক, মানাবে না ফিমেল পার্ট ?"

চারুবাবু একদৃষ্টে বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটু লম্বা হবে না ?"

নলিন-দা তাকিয়ায় একটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, "উনি নন—উনি নন। ও, বিশ্বজিৎকেও দেখ নি তুমি ? ঐ বিশ্বজিতের পাশে দাঁড়িয়ে—কি নাম আপনার ?"

চারুবাবু অমিয়র পানে চাহিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "খাসা মানাবে—চমৎকার।"

চারুবাবু লোকটি খর্ব্বকায়, মাথায় টাক, মুখখানি ও চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র, গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী মালা, হাত পা লোমশ—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকটি সর্ব্বদাই হাসিমুখে ঘাড় দোলাইয়া গল্প করিতে ভালবাসেন। তামাক টানিতে ভালবাসেন, পান মুখে দেন না। পাঁচ জনের ছোঁয়া চায়ের কাপে তিনি চা পান করেন না, আলাদা একটি কাচের গ্লাসে তাঁহার চা পরিবেষিত হয়।

উষ্ণ চায়ের গ্লাসে সন্তর্পণে চুমুক দিয়া তিনি অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "বসুন না, এই যে এইখানে।" বলিয়া পাশে বসাইলেন।

"কি নাম আপনার ? অমিয়, বা, খাসা নাম। বাড়ী ? বটে, একেবারে খাস শ্রীগৌরাঙ্গ দেশের লোক ?··· কোন্ সেক্‌শনে—কত দিন হ'ল ?"

অমিয়র লোকটিকে মন্দ লাগিতেছিল না। কুড়ি বৎসর আপিসে কাজ করিয়াও আচারে-ব্যবহারে কোথাও তাঁহার শহরের বা আপিসের ছাপ পড়ে নাই। যে সব প্রশ্ন ভদ্রতার খাতিরে শিক্ষিত লোকের মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত নহে, চারুবাবু আপন গ্রাম্য স্বভাব-সুলভ অভ্যাস বশতঃ অসঙ্কোচে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং উত্তর দিতে গিয়া অমিয় একটুও মনঃক্ষুণ্ণ হইল না।

অমিয়র পরিচয় লওয়া হইলে নিজের পরিচয়ও দিলেন, "আর ভাই আপিসের গো-খাটুনির পরে এই ক্লাবে ব'সে একটু জুড়ুতে পাই। পাই তো আশী টাকা মাইনে, তিন ছেলে, চার মেয়ে; তাদের পড়াশোনার খরচ, এখানর মেসভাড়া, বাড়ীতে মস্ত সংসার—মন্দ কি এই ক্লাব। এখানে এসে বসলে সব ভুলে যাই। ওরা বলে কি জান—বলে, চারুদা, পার্টের কাঙাল! হব না কেন বল, নিজেরা সব কমিটির মেম্বার হয়ে ভাল ভাল পার্টগুলি নিবি বেছে, নতুন লোককে দিবি না জায়গা—এটা তো মনোপলি বিজিনেসের জায়গা নয়। কি বল ভায়া!"

অমিয় হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল।

চারুদা বলিলেন, "আমার ব্রজখুড়োর পার্ট দেখনি বুঝি? ষ্টারের বোস পর্য্যন্ত সুখ্যাত ক'রে ছিলেন। আচ্ছা তুমিই বল তো ভায়া, আমায় রসিকের পার্ট মানায় না? ফরসা নই এবং মোটা নই বলেই কি মহা দোষ করেছি? অপরেশবাবু ঐ পার্ট করেছিলেন বলেই কি তাঁর মত চেহারা না হ'লে ও-পার্ট হবে না?" একটু কাসিয়া বলিলেন, "নলিন-দা আমাদের আলাভোলা, হতেন একটু শক্ত—তো সব ঠিক হয়ে যেত।"

এমন সময় নলিন-দা ও-পাশের কোটপ্যাণ্টধারী একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ললিত এক বার ওঠ তো দেখি। তোমার দ্বারা কেমন বিপিনের পার্ট হয় দেখা যাক।"

যুবক শ্যামবর্ণ—মুখ চোখের শ্রী আছে। মাথায় চুল ব্যাকব্রাস করা ও লাইমজুস গ্লিসারিনের কল্যাণে চকচকে। সুট, টাই এবং জুতার পারিপাট্য দেখিয়া লোকটিকে বিলাসী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়াই বোধ হয়। মুখে চুরুট ধরিবার ভঙ্গীটি বাঁকা—এবং চক্ষু দুটিতে গর্ব্বিত প্রসন্ন হাস্যরেখা। নলিনদার কথায়

তিনি উঠিবার ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "আমরা কি পারব ও পার্ট? আমাদের না আছে সেন্টিমেণ্ট না আছে কণ্ডিমেণ্ট।"

ঘরের সমস্ত লোকই হাসিয়া উঠিল।

নলিন-দা ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আর পাকামি করতে হবে না, বল।"

ললিত গর্ব্বিত ভাবে গাত্রোত্থান করিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বা তাচ্ছিল্যভরে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

নলিন-দা পুনরায় চক্ষু মুদিয়া গড়গড়ায় টান দিলেন ও ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, ঠিক হচ্ছে না।"

ললিত বলিল, "এখনই যদি সব বলতে পারব রিহার্স্যেলে দরকার কি? কালই বই নামিয়ে দিন না।"

ঘরের সকলের মুখেই চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

চারুবাবু অমিয়কে নিম্নস্বরে বলিলেন, "দেখলে তো ঠাট্টা। অথচ ওদের ডেকে ডেকে খোসামোদ ক'রে পার্ট দেওয়া চাই। কিনা চেহারা ভাল! আরে বাপু, আমাদের চেহারা নিয়ে—এই বাঙালীর চেহারা নিয়ে কেমন হিষ্টরিক্যাল বই তো তা হ'লে করা চলে না! যস্মিন দেশে যদাচার—। খোট্টাই গালপাট্টা আর বুকের ছাতি যদি খুঁজতে চাস তো দরোয়ান ধরে ধরে পার্ট দে—"

কে এক জন বলিল, "চুপ, চুপ, আস্তে কথা বলুন।"

চারুবাবুর পাশে যে ভদ্রলোক বসিয়া পান চিবাইতে-ছিলেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চারুবাবু বলিলেন, "তুমি কি কাল আস নি রতন?"

রতন হাসিয়া বলিল, "কালও একটা টাল গেল কিনা, জামা গায়ে দিয়ে আবার খুলে ফেলতে হ'ল।"

চারুবাবু বলিলেন, "বড় ভোগাচ্ছে তো? টি বির একমাত্র ওষুধ চেঞ্জে যাওয়া। তাই কেন নিয়ে যাও না।"

রতন বলিল, "কেরানীর স্ত্রী যাবে চেঞ্জে! সংসার তো ছোট নয় তোমার চারুদা, বোঝ তো সব—ডাইনে আনতে যাদের বাঁয়ে টান ধরে তারা করবে যক্ষ্মা রুগীর চিকিৎসে—রাজারাজড়ার রোগের সেবা!"

চারুবাবু বলিলেন, "ভোগান্তি তো!"

"সে তো বটেই। কতগুলো কাক মরে কেরাণী হয় জানেন? এক-শটার কম নয়। তারা ভুগবে না তো ভুগবে কে?"

চারুবাবু বলিলেন, "তোমরা যে কেন চাকরির লাইন ধরলে বুঝতে পারি নে। তোমাদের তো দিব্যি সোনা-রূপোর দোকান ছিল—কাজ-কারবার ছিল?"

রতন বলিল, "সেকেলে স্যাকরার দোকান ব'লে খদ্দের হয় না। প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া নিয়ে কাচের শো-কেসের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে হরেক রকমের গহনা যদি সাজিয়ে রাখতে পারতাম তো দোকান আমাদেরও চলত হয়তো। আমার বাড়ীর বাইরের চুনবালি-খসা ঘরে, গলির মধ্যে, রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে আর পুরোনো যন্ত্রপাতি আর মান্ধাতার আমলের সিঁদুর-লেপা লোহার সিন্ধুক নিয়ে কি খদ্দের ভোলান যায়? বাবা বুঝেছিলেন দিন খারাপ আসছে, তেমন ধারা পুঁজি তো নেই যে জাঁকিয়ে দোকান খুলতে পারি—তাই এই তালপাতার ছাউনিটুকু তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন।"

চারুদা বলিলেন, "কিন্তু বাড়ীতে তুমি থাক কতক্ষণ! আপিস আর ক্লাব—এই তো দেখি সারাক্ষণ।"

রতন বলিল, "তোমাদের পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে থাকি ভাল। দু-বেলা যাদের কোন রকমে দু-মুঠো জোটে তারা জরির পোষাক প'রে রাজা সেজে যখন বড় বড় বুলি আওড়ায় তখন ভাব দিকি ব্যাপারখানা। সে আনন্দের তুলনা আছে, দাদা।"

রতনের পাশ হইতে আর একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, "একটা নেশা তো চাই মানুষের। হয় বিড়ি সিগ্রেট, নয় গাঁজা আফিং চণ্ডু চরস মদ; নিদেন পক্ষে জরদা—কিংবা চা।"

রতন বলিল, "ঠিক বলেছেন, ভাই, নিদেন পক্ষে পান আর চা। বল তো আর এক কাপ চা দিতে।"

ছোকরাটি বলিল, "আপনি তো সিনিয়রমোষ্ট্ ম্যান—সুপারিণ্টেডেণ্ট্ আপনাদের ভাল, গ্রেড পেলেন না কেন?"

রতন হাসিয়া বলিল, "সমস্ত যোগাযোগ হয়েও একটির জন্য সব আপসেট্ হয়ে গেল, ভাই।"

"কি ?"

"অনেক খুঁজেপেতেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক পর্য্যন্ত বার করতে পারলাম না—ধান সম্পর্কে পিসেমশাই হলেও চলতো!"

যাহারা রতনের কথা শুনিল, তাহারাই হাসিয়া উঠিল।

আবার চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল, "চুপ, চুপ।"

অবশেষে খাবারের প্লেট লইয়া চাপরাশি দেখা দিল। ঘরে যে কয়জন লোক আছেন, সকলের জন্য প্লেট সাজানো হইয়াছে, তথাপি প্রথমে খাবার লইবার জন্য সে কি কাড়াকাড়ি। স্কুল-কলেজেও সতীর্থবৃন্দের মধ্যে খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি হয়, কিন্তু তাহাতে খেলার আনন্দ আছে, মাধুর্য্য আছে। এ যেন নিতান্ত খাইবার জন্যই যাজ্ঞা করা। নয়টায় ভাত খাইয়া যে কেরানী শুষ্কমুখে বৈকাল পাঁচটায় খাবারের জন্য আগ্রহে হাত বাড়ায় এবং খাবার হাতে আসিবামাত্র গোগ্রাসে গিলিতে থাকে, তাহার লোলুপতার কুশ্রী প্রকাশকে ঢাকা দিবার কোন পন্থাই নাই।

ও-পাশ হইতে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ কি ভিক্ষে নাকি ? রীতিমত চাঁদা দিই মাস মাস—জ্ঞানে কচুরি খাই না, তার বদলি কিছু দে, তা না সেই একটি রসগোল্লা! কেন ভিক্ষে নাকি ?"

গোলযোগ বাড়িয়া উঠিল এবং সেক্রেটারীর সুব্যবস্থায় আর একটি রসগোল্লা পাইয়া ভদ্রলোক অবশেষে সুস্থির হইলেন।

বিশ্বজিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অমিয় হ্যারিসন রোড ধরিয়া সোজা গঙ্গার দিকে চলিল। কোলাহল, হৈচৈ সে চাহিয়াছিল, কিন্তু আনন্দের নামে যাহারা নিরানন্দের বেসাতি করিতেছেন, তাঁহাদের হট্টগোল কে কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে। প্রাসাদে বসিয়াও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া ও ভিক্ষার বুলি মুখে আওড়াইয়া ইহারা দিন কাটাইতেছে। যাহারা রঙ্গমঞ্চের সাজানো রাজা—চালচলনে, জরির পোষাক গায়ে জড়াইয়াও যথার্থ পরিচয় তাহারা ঢাকিতে পারে কি ?

এত শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া লাভ নাই, যে-গঙ্গা প্রান্তর-বর্ত্তিনী হইয়া তাহাদের দেশ ঘুরিয়া আসিয়া শহরের প্রাসাদে মাথা কুটিয়া মরিতেছে, তাহারই তীরে বসিয়া খানিক দেশের কথা ভাবা যাক না কেন ?

কিন্তু শহরের গঙ্গা ও পল্লীর গঙ্গায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেখানে বালুচর গঙ্গার স্রোত বিদীর্ণ করিয়া মাথা তুলিতেছে—দু-দিন পরে নদী মজিয়া মাঠের রূপ পাইবে; এখানে ড্রেজারের সবল আঘাতে সেই বালুস্তূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। সেখানে জনবিরল উচ্ছে-পটলের ক্ষেতের ধার দিয়া বন-ঝাউকে পাশ কাটাইয়া বক্রগামিনী গঙ্গা এক কূল ভাঙ্গিয়া অন্য কূল গড়িয়া অত্যন্ত আলস্যভরে চলিয়াছেন—এখানে দু-পাশের বাঁধা ঘাটে তরঙ্গ-ঝঙ্কার তুলিয়া তিনি প্রখরা হইয়া উঠিয়াছেন। সেখানে কাচস্বচ্ছ জলে শুভ্র পাল তুলিয়া বাঁশের দাঁড় বাহিয়া দু-একখানি রুগ্ন নৌকা গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটিতেছে, এখানকার ঘোলা জলের উপর বড় বড় জাহাজ, নৌকা, ষ্টীমলঞ্চ, বড় পানসী প্রভৃতি ভাসিতেছে; জল ভাল চোখে পড়ে না, বিদ্যুতের আলোয়, বাঁশীর শব্দে গঙ্গার কলধ্বনি ডুবিয়া গিয়াছে। সেখানে প্রভাতবেলায় গঙ্গার বালুচরের ধারে বসিলে যে সুমিষ্ট তরঙ্গধ্বনি অন্তর-বীণার তারের সঙ্গে একতানে বাজিয়া উঠে, কিংবা ঘনায়মান সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ঢেউ ভাঙিয়া কুচি কুচি কাচের মত জ্বলিতে থাকে, উপরের গাঢ় নীল আকাশ সেই বিরাট মহিমায় রূপ দান করে, আর্দ্র বায়ুতে ও অন্ধকারে বন-ঝাউয়ের ঈষৎ গুঞ্জনধ্বনি গঙ্গার স্তবগান গাহিতে থাকে, উপরের ঝিকিমিকি নক্ষত্র, নৌকা টানিবার ঝপ ঝপ শব্দ, কখনও বা ওপারে কৃষকবধূর ঘাটে জল ভরিবার শব্দ এবং নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর একটি রূপলোক ও মায়ালোককে পৃথিবীতে নামাইয়া আনে—সেই কল্পলোক কি এই শব্দকোলাহলময়ী বিদ্যুৎ-আলোক-বিদীর্ণা ষ্টীমার-নৌকা-জাহাজ-কণ্টকিতা অস্পষ্টনক্ষত্রখচিত বিবর্ণ আকাশের পটভূমিতে দুটি কূলের পাষাণচত্বরবন্দিনী গৈরিকবসনা গঙ্গার কূলে গড়িয়া উঠিতে পারে ?

হাওড়া-সেতু হইতে যেদিকে দৃষ্টি ফিরাইবে সেই দিকে আলোর মালা সাজান।

বিপুল ঘর্ঘর নাদে গঙ্গাবক্ষ সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে, পোলের পথ দিয়া পঙ্গপালের মত নরস্রোত এবং নীচে দিয়া পিঁপড়ার মত নৌকার সারি চলিয়াছে। আলো আর অন্ধকারে মিশিয়া অজানা রহস্যের পরিবর্ত্তে গভীর ভয়ের সৃষ্টি করিতেছে।

পাড়াগাঁয়ের সরল কৃষক শহরের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া ও শহরের সাহচর্য্যে বাস করিয়া যেমন না শহরের মার্জ্জিত রুচি না পাড়াগাঁর মিষ্ট স্বভাব সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে, তেমনিই এই গঙ্গা। ইহার কূলে বসিয়া বা জলস্পর্শ করিয়া সেই চক্ষু-অগোচরীভূতা দ্রবময়ীর কল্পনা করাও বাতুলতা। এখানে তিনি ভাগীরথী, ওখানে গঙ্গা।

ষ্ট্র্যাণ্ডের পথ ধরিয়া অমিয় ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল।

[ক্রমশঃ]

মান্দ্রাজ শিল্প-বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী

জ্যোৎস্নারাত্রে
শ্রীকে. সি. এস. পানিকর

ঘুমের দেশে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

স্বপ্নাতুরা — শ্রীমতী এ. অলগাকোন

রহস্যময়ী — শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

রূপান্তর

শ্রীআশালতা সিংহ

স্বামী ছিলেন প্রফেসর। কিন্তু জ্ঞানের নেশা সত্যই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল; কেবল সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, তাহার প্রমাণ তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মনে তাঁহার প্রভাব গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির কবোষ্ণ পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগের গুরুত্ব দেশবাসীকে সহজ সরল আন্তরিক ভাষায় বুঝাইলেন। আমার স্বামী মনে-প্রাণে বুঝিলেন এবং ইহাতেই সারা প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। আমাদের বাড়ী বীরভূমের কোন এক অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামে। পূর্ব্বে কালেভদ্রে কদাচিৎ সেখানে যাইতাম। যাইবার প্রয়োজনও হইত না, প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু এখন বছরের মধ্যে গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার বন্ধ, ক্রীসমাসের ছুটি—সব কয়টা সুরু হইতেই পল্লীভবনের পানে রওয়ানা হইতে হইত। ছেলেরাও অনেকে প্রফেসরের সহিত যোগ দিল এবং নব উৎসাহে গ্রামসংস্কারের কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহারা খানাডোবা বুজাইতে, কুইনাইন বিতরণ করিতে এবং ঝোপঝাড় পরিষ্কার করিতে করিতে একটা দিকের দৃশ্য এড়াইয়া গেল, সেটা পল্লীবাসীদের মন। আমিই সেটা দুই চোখ ভরিয়া দেখিলাম, অনুভব করিলাম। করিয়া কখনো ক্ষুব্ধ কখনো ব্যথিত হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বলিলাম। স্নেহ দিয়া শ্রদ্ধা দিয়া উদারতার স্পর্শ দিয়া এ-মনের সঙ্কীর্ণতা যদি এতটুকু ঘুচাইতে পারি তবে জানিব হাজারটা খানাডোবা বুজাইবার চেয়ে বড় কাজ করিয়াছি।

সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে আমরা আসিয়াছি। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। সকালে উঠিয়া কাপড় কাচিবার জন্য রায়েদের ভিটার পাশ দিয়া যে-পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নীল সায়রের দিকে গিয়াছে সেই পথে যাইতেছি। গ্রাম সম্পর্কে খুড়িমা হন, অন্নদা-ঠাকুরাণী সঙ্গ লইলেন। যাইতে যাইতে কহিলেন, সুনীতি একবার রায়েদের বাড়ী হয়ে চল না মা। কতক্ষণই বা যাবে। অমনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার চলে আসব। খুড়িমা এ-গ্রামের এক জন প্রধান পাণ্ডা। তাঁহার বিরাগ এবং অনুরাগকে গ্রাহ্য করে না এত বড় বুকের পাটা এখানে খুব কম লোকেরই আছে। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া রায়েদের বাড়ী হইয়াই চলিলাম। আসলে ব্যাপারটা হইতেছে, পূর্ব্বদিন মাঝের গাঁ হইতে রায়-বাড়ীর একটি মেয়েকে কনে দেখিতে আসিয়াছিল। দেখিতে আসিয়া কি সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছে, পছন্দ হইয়াছে না অপছন্দ হইয়াছে এত বড় খবরটা সংগ্রহ না-করা অবধি খুড়িমার বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

রায়েদের বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখি তখনও তাহাদের বাসি পাট সারা হয় নাই। এক পাশে গতরাত্রির উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি একটি মেয়ে পরিষ্কার করিতেছে। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, বছর পনর বয়স। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে একটা অযত্ন-অবহেলার ভাব। পরনের কাপড়খানি ময়লা। স্থানে স্থানে ছেঁড়া, চুলগুলিতে কত দিন ধরিয়া অযত্নবদ্ধ জটা জমিয়াছে। না জানি কত দিন তেল পড়ে নাই, এমনই রুক্ষ হইয়া আছে। খুড়িমা উঠানে ঢুকিয়া হাঁক দিলেন, কই গো বড়-বৌ, মেজ-বৌমা, তোমরা সব কোথায় গো!

বড় ও মেজ-বৌ সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই পক্ষের কুশল-বিনিময়াদি হইবার পর খুড়িমা শুধাইলেন, তা, হ্যাঁ গো, সুনীলার বিয়ের দিন কবে করলে? এই তো খরার সময়, রাস্তাঘাট ভাল, কাদা নেই। এখন বিয়ে দাও, হ্যাঁ, দশটা গাঁয়ের লোক খাওয়ালেও কষ্ট পাবে না। বড় বৌ একটা সহানুভূতি ও শ্লেষ মিশানো অব্যক্ত শব্দ করিয়া কহিলেন, কোথা পাবে বিয়ে; তুমিও যেমন খুড়িমা! তাদের বলে পছন্দই

হ'ল না মেয়ে। বলে, মেয়ের তেমন জৌলুষ নেই। না জানে একটা কুরুশ-কাঁটার সেলাই, না জানে ইংরেজী, এ তাদের পছন্দ নয়। অন্নদা ঠাকুরাণী গ্রাম সুবাদে সকলেরই খুড়িমা। তিনি এই রসালো প্রসঙ্গের স্বাদ পাইয়া উঠানের এক পাশে বসিয়া পড়িয়া অদূরবর্ত্তিনী মেয়েটির দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকাইয়া কহিলেন, কিন্তু তারাও তো আর মিছে বলে নি বৌমা, মেয়ের তোমাদের জৌলুষ কই? কেমন যেন একটা কাঠপানা ভাব। যুগ্যি সব মামীরা রয়েছ, দু-দিন খাওয়াও, মাখাও, তাউত কর। তবে তো মেয়ে পার হবে। যে-মেয়েটি নিঃশব্দে এঁটো বাসন মুক্ত করিতেছিল সে নিজের সম্বন্ধে এবম্বিধ আলোচনা শুনিয়া যারপরনাই সঙ্কুচিত হইয়া একগোছা বাসন হাতে করিয়া খিড়কির ডোবাটায় মাজিতে গেল। বুঝিলাম, এই মেয়েটির নামই সুনীলা। খুব সম্ভব এটা তাহার মামার বাড়ী এবং এখানে সে পরাশ্রিতা। গতকাল তাহাকে দেখিতে আসিয়া পাত্রপক্ষেরা অপছন্দ করিয়া ফেরত গিয়াছে। অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী। ঘোরালো কিছুই নয়, নূতনত্বও কোথাও নাই। তথাপি ঐ মেয়েটির অপরাধীর মত সন্ত্রস্ত ভাব, লজ্জিত পলায়ন, শুষ্ক ম্লান মুখ—সমস্তটা মিলিয়া মনের মধ্যে একটা করুণ সুরের গুঞ্জন তুলিল। পথে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, বিবাহ হওয়াটাই কি স্ত্রীজাতির চরম এবং পরম পরিণতি? ইহারই মানদণ্ডে কি তাহার জীবনের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে? এমন ভাবনা পূর্ব্বেও অনেক ভাবিয়াছি, এখনও ভাবিতেছিলাম, নূতন কিছু নাই। কিন্তু সমাজ হাতে তুলিয়া যেটুকু মর্য্যাদা দিয়াছে, সেই মর্য্যাদায় মহিমময়ী হওয়া ছাড়াও যে বিবাহের মধ্যে আরও কিছু আছে সে তত্ত্বটা সেদিন আমার উত্তপ্ত মনের কাছে কোনমতে ধরা দেয় নাই। এক জনের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভালবাসার আলোতে মানুষের আগাগোড়া প্রকৃতিই যে বদলাইয়া যায়। তাহাতে শ্যামশ্রী আসিয়া লাগে, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ছন্নছাড়া জীবনে একটা লাবণ্যের আভা সঞ্চারিত হয়, তাহাই সুনীলার জীবন-নাট্যের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম। অনেক কথা স্পষ্ট হইল।

ছোট পাড়াগাঁ, পোষ্ট আপিস নাই, রেলওয়ে ষ্টেশন নাই, দোকান-পসরা নাই। সপ্তাহে এক বার করিয়া হাট বসে। সে হাটে লাউ-বেগুন পাওয়া যায়, আর কিছু মেলে না। এমন স্থানে মাঝে মাঝে কলিকাতা-অঞ্চল হইতে যখন ফেরিওয়ালা শস্তা দামের ছিটের সায়া সেমিজ ব্লাউস ও রঙিন মিলের কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে আনে তখন একটা সাড়া পড়িয়া যায়। সেদিন অপরাহ্নে বোসেদের আটচালাতে জন-দুই ফেরিওয়ালা তাহাদের পণ্যসম্ভার সাজাইয়া বসিয়াছিল। আর গোটা গাঁয়ের ছেলেপিলে এবং তরুণী কিশোরীরা লুব্ধচিত্তে চারি দিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেহ সত্যই কিনিতেছিল, কেহ শুধু কেনাবেচা দেখিয়াই তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সুনীলাও ভীড়ের মধ্যে চুপটি করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে কহিল, আমাকে গোটাকতক সেমিজ দাও তো ফেরিওয়ালা, বাড়ীর ভিতর থেকে দেখিয়ে পছন্দ ক'রে আনি। ফেরিওয়ালা তাহার হাতে একগোছা জামা তুলিয়া দিল। মিনিট কুড়ি পরে সুনীলা জামাগুলি আনিয়া তাহাদের প্রত্যর্পণ করিয়া নিরুৎসাহ ভাবে জানাইল, না পছন্দ হইতেছে না। দু-একটা যদি বা পছন্দ হইতেছে গায়ে হইতেছে না।

জামা ফিরাইয়া দিয়া সে চলিয়া আসিতেছিল, পিছন হইতে এক জন ফেরিওয়ালা কর্কশ সুরে কহিল, এই, সাতটা জামা গুনে দিয়েছি। ছ'টা দেখছি কেন? আর একটা কোথা গেল? এনে দাও।

সুনীলাও প্রত্যুত্তরে কর্কশ এবং কদর্য্যভাষায় জ্ঞাপন করিল, যাহা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই সে ফেরত দিয়াছে। আর সে জানে না।

দুই পক্ষে খুব খানিকক্ষণ বচসা হইল। একজন ভদ্রঘরের বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলা যে ইতর শ্রেণীর ফেরিওয়ালার সহিত এমন বচসা এমন গালিগালাজ করিতে পারে কানে না শুনিলে সহসা তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত করিতে পারিতাম না। আমি একটা সায়া কিনিতে আসিয়াছিলাম,

কিন্তু মনটা এত খারাপ হইয়া গেল যে, নিঃশব্দে তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, কিছুই কেনা হইল না।

বাড়ীতে আসিয়া দেখি কলিকাতা হইতে এক দল গ্রাম-সংস্কারক সমিতির ছেলে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহারা এই গ্রীষ্মের ছুটিটার অপব্যবহার না করিয়া কোমর বাঁধিয়া সংকাজে লাগিবে দৃঢ় পণ করিয়াছে। দলের মুখপাত্র ফণী কহিল, "সুনীতি-দি, ধর যদি আমরা এক জনেরও নিরক্ষরতা দূর করতে পারি, যদি একটা পুকুরেরও পানা তুলতে পারি তাহলে কত কাজ হবে। আদর্শের আলো তীব্ররূপে জ্বেলে দাও, সব সংশয়, সব দ্বিধা ঘুচে যাবে।" এ ধরণের বড় বড় কথা শুনিতে আমি অহরহ অভ্যস্ত। কারণ আমার স্বামী প্রফেসরীও করেন এবং সেই সঙ্গে এই সব বলিয়া ও শিখাইয়া ভাল ছেলেগুলিকে বখাইয়া দেন। আজ কিন্তু 'আদর্শের তীব্র জ্যোতি'র উপর ততটা মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সুনীলার কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহার অমল শুভ্র নারীচিত্ত কোন্ শিক্ষায়, কোন্ পরিবেশে এবং কি অশ্রদ্ধায় এমন পঙ্কিল এমন উৎসাদিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে অবিরত ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কারণটাই মনে মনে হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিলাম। দলের মধ্যে বিনয় ছিল অত্যন্ত লাজুক এবং নম্র স্বভাবের। তাহার বাবা কলিকাতায় ব্যারিষ্টারি করিয়া বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছেন। আগে সাহেবিয়ানায় সে নিজেও বড় কম ছিল না। ইদানীং আমার স্বামীর প্রভাবে পড়িয়া স্বদেশী হইয়াছে। তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিলাম, "বিনয়, বিয়ে করবে? মেয়েটি খাঁটি স্বদেশী। ইংরিজীও জানে না, ক্রুশ-কাঁটার সেলাইও জানে না। সে-সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া যেতে পারে। কোন ভেজাল নেই

বিনয় প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আমার পানে চাহিল। আমি পুনশ্চ কহিলাম, "এক জনের নিরক্ষরতা দূর ক'রে কিংবা একটা পানাপুকুরের পঙ্কোদ্ধার ক'রে যা না করতে পারবে, একটা মানবাত্মাকে তিল তিল অধোগতি থেকে রক্ষা করতে পারলে তার চেয়ে ঢের পুণ্য হবে। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।"

এতক্ষণ আমার মনে যে ভাব জমা হইয়াছিল, আন্তরিক ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। সমস্তটা বলা হইলে বিনয় কহিল, "বিয়ে করব। কারণ আমার বাধা নেই। পণও আমি নেব না, মাথার উপরে আমার কোন রক্তচক্ষু অভিভাবক নেই। তাছাড়া মেয়েটি আমাদের স্বজাতি, করণীয় ঘর।"

আমারই মধ্যস্থতায় জ্যৈষ্ঠের স্নিগ্ধ রমণীয় গোধূলি-লগ্নে বিনয়ের সহিত সুনীলার বিবাহ হইয়া গেল। পরের দিন নবদম্পতি কলিকাতা যাত্রা করিল। এ-যাত্রা বিনয়ের কচুরিপানা ধ্বংস বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রোগ্রাম বাদ পড়িল।

তাহার পর বছর দুই হইয়া গিয়াছে, সে-বছরটায় গ্রীষ্মের বন্ধে উৎকট গরম পড়িয়াছে। আমার স্বামীর শরীর ভাল যাইতেছিল না বলিয়া তাঁহাকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাইতেছিলাম। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুমে সুনীলার সঙ্গে দেখা। আর চেনা যায় না। সৌভাগ্যে সৌন্দর্য্যে সরমে সম্ভ্রমে যে-তরুণীটি একটি এক বছরের খোকা কোলে লইয়া ওয়েটিং-রুমের চেয়ারে বসিয়া আছে, সে যে সেই সুনীলা সে-কথা কাহার সাধ্য বলে। আমাকে দেখিয়া একটুখানি লজ্জিত হাসি হাসিয়া কহিল, "দেখুন না ভাই সুনীতি-দি, ওঁর কাণ্ড। একটু শরীর খারাপ হয়েছে কি অমনই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতার গরম সইবে না, চল দার্জ্জিলিং।" ওয়েটিং-রুমে প্রায় এক ঘণ্টা তাহার সহিত কাটাইলাম। স্বামীর গল্প ও স্বামীর কথা তাহার আর ফুরাইতে চায় না। দুরন্ত ছেলেকে সামলাইয়া রাখিতেও উহারই মধ্যে বেশ খানিকটা সময় লাগিতেছে। কথায়-কথায় বিনয়ের আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিল। এসব কথা তাহার অন্তরকেও স্পর্শ করিয়াছে। এমন আন্তরিক দরদের সহিত সে বলিতে লাগিল যে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম স্বামীর হৃদয়ের সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ সাধিত হইয়াছে। তাই এ সকল কথা আর কেবলমাত্র কথার কোঠাতে নাই, কোন মন্ত্র-শক্তিতে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। চোখের সামনে দু-বছর আগেকার সুনীলাকে মনে পড়িল। জগতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয় জানি। রূপ হইতে

রূপান্তরে সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন লীলা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই সুনীলা আর এই সুনীলা! এত বড় প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল এত শীঘ্র, ভাবিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম এক হাজার বার লেকচার দিলেও যাহা হইত না, প্রেমের দ্বারা অতি অল্প সময়েই অবলীলাক্রমে তাহা হইয়াছে। ষ্টেশনের জনসমাগমের দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল; আমার স্বামীর শিষ্য এবং ছাত্রদলের কথা। তাহারা খুব বড় রকম একটা কর্ত্তব্যের নিশান টাঙাইয়া রাতারাতি পল্লীর রূপান্তরে লাগিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তব্যের দোহাই যত বড়ই হোক, হৃদয়ের উত্তাপে তাহাকে বিগলিত করিতে না পারিলে বন্ধ দরজায় বৃথা ঘা পড়িবে, দুয়ার খুলিবে না। বিনয় এতক্ষণ ওয়েটিং-রুমের দুয়ারের ঠিক বাহিরে পায়চারি করিতেছিল। ভিতরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী তাহার স্ত্রীর দিকে বঙ্কিম কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, "তোমার কাছে কিন্তু আমি চিরঋণী রইলুম সুনীতি-দি। তোমার কথা শুনে কোমর বেঁধে পরের উপকার করতে গিয়ে নিজেরই যে কী ভীষণ উপকার ক'রে ফেলেছি, তা যত দিন যাচ্ছে ক্রমশ টের পাচ্ছি।"

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সাম্প্রতিক

মনের মানুষ হয়ে র'বে কালে কালে ;
হে কবি, মানুষ হয়ে গৌরব বাড়ালে
যত সব মানুষের, এ পৃথিবী ভ'রে
ছিল যারা, আছে যারা, র'বে যারা পরে।
আজিকার মোরা ভাবি তুমি আমাদেরি।
তোমার মাঝারে এক শোভাযাত্রা হেরি :—
সুখে দুঃখে দোষেগুণে গড়া চিরকেলে
নরনারী চলিয়াছে হেসে কেঁদে খেলে।
তাহাদেরি মতো তুমি হয়ে এক জনা
বুঝিয়াছ তাহাদের বিচিত্র বেদনা।
তাহাদের ঘরে ঘরে নিত্য যাহা ঘটে
রেখে দিলে এঁকে তাহা বিশ্বস্মৃতিপটে।
এই তো পেয়েছি পুরে' প্রাণ যাহা চায়
প্রাণের অন্তম কথা তোমার কথায়।
জগতের যত ক্ষুদ্র যা-কিছু সে হোক
ব্যগ্র তব সহজাত প্রীতির আলোক
সদামুক্ত আলিঙ্গনে করে তা বরণ
অসামান্য হয়ে ওঠে যাহা সাধারণ।
তোমার আলোতে জাগি' নিত্য এই ভাবি,-
এই তো রয়েছি সর্বদেশকালপ্লাবী
এক চিরন্তন সত্য প্রাণস্রোতে ডুবে।
পুব হ'তে পশ্চিমে, পশ্চিম হ'তে পুবে
চলে সেই একই সঙ্গে চির গতিলীলা
দিন পরে প্রতিদিন।—তুমিও বাঁধিলা
একই সেই লীলাসূত্রে জীবন মোদের।
পূর্ণ থেকে যাত্রা আরো-পূর্ণতা বোধের
এই তো জীবন। কবি, দেখিলে তোমায়
তাহারি শাশ্বত ক্রীড়াচ্ছবি চমকায়
বিশ্বাসের পটে। মিলি একই বেদনাতে
বুঝি সবে এক, আছি এক তব সাথে।
তোমাতে নিরখি এই নিখিল সংগম
সত্তার বিচিত্র স্ফূর্ত্তি বীর্যে মহত্তম,
তোমাতে লভিয়া এই মহা আপনারে
তাহারি প্রণতি রাখি তব অর্ঘ্যভারে।
আর তুমি মরদেহে যেবা আজিকার
যত দাবি, যত সুখদুঃখ-সমাচার
তাঁর কাছে ধরে দেই। সম্বন্ধ পাতাই
গুরুদেব, প্রিয়, বন্ধু, দাদু, দাদা, ভাই
যে ভাবে যে পেতে পারি রাখি সে প্রিয়েরে
আপন আপন নিত্য জীবনেরে ঘেরে।
দেখা চাই, লেখা চাই, চাই কেহ নাম,
সে-তোমার যোগে ভাবি—এই লভিলাম
মানুষের ধ্রুব স্পর্শ, জ্যান্ত, কালজয়ী।
ক্ষমা কোরো, আমরা যে প্রেমেও বিষয়ী
যেমন বিষয়ী তুমি কৌশলী মানুষ
কালহস্তে থেকে যেতে চাও নিরঙ্কুশ
সবাতে মিশিয়া সব হয়ে স্মৃতিতলে।
মোরা ফিরি একই আরো সহজ কৌশলে :—
তোমার স্মৃতিটি রাখি মিশায়ে জীবনে
সব কাল বাঁধা পড়ে এক স্মৃতি সনে।
বটে তুমি বিশ্বচিত্তে চিরদীপ্ত রবি,
তবু গর্ব, তুমি আজ আমাদেরি কবি॥

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকমলা দেবী

"যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

গূঢ় ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক কারণ-পরম্পরায় একটা জাতির অভ্যুদয়কালে সেই জাতির মধ্যে বহু শক্তিমান্ মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাবে সমস্ত জাতিটাই সৌভাগ্যের সমুচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে এবং রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংরেজের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে এইরূপ প্রতিভার বান ডাকিয়া যায়।

ইংরেজী সভ্যতার সংঘাতে পরাধীন ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তে পলিমাটির দেশে বাঙালী জাতির অন্তরলোকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় ঐরূপ একটি গোপন নির্ঝরের প্রবাহ বহিতে থাকে। উহাই এক দিন অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমি—তথা ভারতভূমিকে নব-ভাব-বন্যায় প্লাবিত করে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩৮ সালের জুন মাসে নব-মন্বন্তরের নূতন মনু সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র শুভ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারই কয়েক দশক পূর্ব্বে রামমোহনের আবির্ভাব হয়। এবং এই উনবিংশ শতকেই, বঙ্কিম-জন্মের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ও পরে, [বহু মহাসত্ত্ব পুরুষশ্রেষ্ঠের জন্ম হয়। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রভা বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিভা-রশ্মি বঙ্গের এমন কি ভারতের আকাশও অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিগন্তকেও উদ্‌ভাসিত করিয়াছে। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি জাতীয় সাধনার বিভিন্ন বিভাগ ইঁহাদের গৌরবময় পুণ্য দানে সমুজ্জ্বল। ইঁহারা দেশকে বহু সুষুপ্তির পর নবজীবনের, নবজাগরণের, নবযৌবনের আনন্দ-বেগ সঞ্চারণে চঞ্চল করিয়া দিয়াছেন। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই উনবিংশ শতাব্দী অপূর্ব্ব গৌরবময়—ইহা অতুলনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট মহিমান্বিত পুরুষ ছিলেন। বঙ্কিম-জননী সম্বন্ধে তদীয় পৌত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র লিখিয়াছেন, "তাঁহার বদনে যা কিছু দেখিয়াছি, সমস্তই পবিত্র।" বঙ্কিমচন্দ্র পিতার দৈহিক সৌন্দর্য্য, মানসিক শক্তি, স্বভাবের ঋজুতা এবং কর্ম্মপটুতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এই সকলের সমবায় এবং সর্ব্বোপরি প্রতিভার দীপ্তি তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তদীয় স্মৃতিতর্পণ সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া, যেদিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করেন সেদিনের স্মৃতি সম্বন্ধে বলেন,

"সেদিন সেখানে (এক মিলন-সভায়) আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী এক জন।"

সুদীর্ঘ কাল পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে বঙ্কিম-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে * * * এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। * * * বঙ্কিম-বাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। * * * তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। * * * তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"

এই দূরকালের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ধারণা করিতে না পারিলেও এই সকল বর্ণনা হইতে একটা চিত্র কল্পনা করা যাইতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে পাঁচ বৎসর বয়সে এক দিনেই বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া ফেলেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয় তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। তখন জুনিয়ার সীনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা ছিল। কাঁঠালপাড়ায় অল্প দিন এবং মেদিনীপুরে কিছু দিন শিক্ষালাভের পর হুগলী কলেজে তাঁহার শিক্ষা চলিতে থাকে। তাঁহার তীব্র জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলেজ-গ্রন্থাগারের প্রায় সকল পুস্তকই তিনি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়া শেষ করেন। এই সময়েই (১৮৫৩-৫৬) তিনি তাঁহার স্বগ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়-বাগীশের নিকট সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অধ্যয়নেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইতেন—উহা তাঁহার ব্যসন ছিল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ঠিক এমনই সময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। নগরের প্রায় সকলেই দারুণ উদ্বেগে ভীত ভাবে দিনযাপন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল এবং নিয়মিত ভাবে আইনের ক্লাসে উপস্থিত হইতেছেন। এই সময়ে (খ্রীঃ ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি এনট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কয়েক মাস পরেই বি. এ. পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হন। অতি অল্প সময়ে বি. এ.-র পাঠ্যগ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিয়া সেই একান্ত অপরিচিত প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অতিশয় মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও অসাধ্যপ্রায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের জ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ও প্রত্যয়শীল ছিলেন্ বলিয়াই এরূপ দুঃসাহস করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের জীবিকার্জ্জনের পথ একালের তুলনায় আরও অধিক সংকীর্ণ ছিল। বঙ্কিম সম্পন্ন পিতার পুত্র হইলেও ধনী-সন্তান ছিলেন না; সুতরাং জীবিকা-সংগ্রহের প্রয়োজন তাঁহার ছিল। এখন এদেশে সাহিত্যসেবার দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশে তেমন অবস্থা আসে নাই যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসেবাকেই জীবনোপায়রূপে অবলম্বন করেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে জীবিকার জন্য সরকারের চাকুরি গ্রহণ করিতে হইল। বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার অনতিকাল পরেই (২৩শে আগস্ট, ১৮৫৮) তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। বঙ্কিমের ন্যায় দুর্লভ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণকেও যে জীবিকা-সংগ্রহে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশের অতি মূল্যবান্ সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতে হয় ইহা মানবজাতির দুর্ভাগ্য। এই শ্রেণীর মহামানবের আবির্ভাব সর্ব্বদাই হয় না। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে এমন দুই-এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকল শক্তি ও সময় দেবদত্ত প্রতিভার স্ফুরণে যথোচিত ভাবে নিয়োজিত হইতে পারিলে মানব-সভ্যতা অধিকতর অধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ হইতে পারিত বলিয়াই মনে হয়।

বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের কৃপায় বাংলার কাব্যসাহিত্য অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ হইলেও গদ্য-সাহিত্য তখনও অতি দরিদ্র। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন তখনও তাঁহাদের পুষ্পপাত্র সাজাইয়া বঙ্গবাণীর উটজ প্রাঙ্গণে পূজারম্ভের আয়োজন মাত্র করিতেছেন। দেশের পুরাতন বিদ্যা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারী, ধারক ও বাহক

আচার্য্য-অধ্যাপকবৃন্দের অনাদৃতা উপেক্ষিতা বঙ্গভাষা গদ্য-সাহিত্যে সাতিশয় দীনা। রাজা রামমোহন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি দুই-চারি জন সুধী অল্পস্বল্প রচনায় দ্বারা বাংলা-গদ্যের পুষ্টিসাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। উহাকে বাংলা-গদ্যের উষাকালীন মৃদু কাকলী বলা যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বাহ্নে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর তাঁহার অনুপম প্রতিভা ও অকৃত্রিম দেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকের কথা-অবলম্বনে উদাত্ত-গম্ভীর অথচ সরস প্রাঞ্জল ভাষায়, 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহাতে বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং প্রসাদগুণ প্রকাশিত হইল। পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' আঁকিয়া ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার আর এক দিক উদ্‌ঘাটিত করিলেন। কিন্তু 'রাজকন্যা'র ঘুম ভাঙাইতে 'রাজপুত্রে'র সোনার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষা ছিল। 'রাজপুত্র' বঙ্কিমের 'নবীনা প্রতিভা'র সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে সহসা 'রাজকন্যা' বঙ্গভাষা জাগিয়া উঠিলেন।

কর্ম্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের পূরাপূরি সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হইল। এই সময় (১৮৬৪) একটি ইংরেজী পত্রিকায় (Indian Field) Rajmohan's Wife নামে একখানি ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এই ইংরেজী উপন্যাসের কয়েক অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মেঘমন্দ্র বাংলা পদ্য-সাহিত্য যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। মহাকবি মধুসূদনও প্রথমে ইঙ্গ-ভারতীর আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় নাই। সেকালে ইংরেজী-শিক্ষিতগণ ইংরেজী ভাষাতেই তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিতেন। ইহাতে যেমন আকাশকুসুম-চয়নের ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁহারা সকল শক্তির ব্যর্থতা ঘটাইতেন অপর দিকে তেমনই দেশের প্রাকৃত জনকে তাঁহাদের আহৃত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে চিরবঞ্চিত করিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধানকে সুদূরতর করিতেছিলেন। বাঙালীর মহাভাগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র অচিরেই তাঁহার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া, ইংরেজী বিদ্যায় সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও সহজ খ্যাতির লোভ সম্বরণ করিলেন, এবং পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবায় তাঁহার সকল শক্তি ও অবসর সমর্পণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁহার দুর্লভ প্রতিভা, তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত মনীষা, বহু-আয়াস-অর্জ্জিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবিধ শাস্ত্রে অপরিমেয় পাণ্ডিত্য ইংরেজীতে প্রকাশের চেষ্টা করিয়া মরুনদীর বিপুল ব্যর্থতায় অবসিত হইতে দেন নাই, সেজন্য সমস্ত বাঙালী জাতি তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিবে। এই কালে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকের উচ্চশ্রেণীর পাঠক একান্ত বিরল—এমন কি, ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার একমাত্র দায়িত্ব ছিল কেবল লেখকেরই। সে জন্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে অনাগত ভাবী কালের জন্য স্বকীয় প্রতিভার প্রতি মর্য্যাদাবোধেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির মহোচ্চ আদর্শ রক্ষায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় সদা-জাগ্রত থাকিতে হইয়াছে। তাই, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার আদ্যন্ত কোথাও তিনি অণুমাত্র আলস্য, শৈথিল্য, অনুগ্রহ, অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বিপুল সাহিত্য-কীর্ত্তির সর্ব্বত্রই তাঁহার নিরলস আয়াস, সযত্ন আহরণ এবং সশ্রদ্ধ সংযত ব্যবহারের পরিচয় দেদীপ্যমান।

খ্রীঃ ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভিতর একটা বিস্ময়মিশ্রিত অপূর্ব্ব আনন্দকোলাহল জাগিয়া উঠিল। ইহার পর 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৭) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৮) প্রকাশিত হইল। খ্রীঃ ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের এক পরম প্রভাতে মধ্যযুগীয় অমানিশার অবসান করিয়া যেন আধুনিকতার অরুণোদয় হইল। ইহার পূর্ব্বেই 'সমাচার দর্পণ,' 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'সংবাদ প্রভাকর,' 'সংবাদ ভাস্কর,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' 'এডুকেশন গেজেট', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও কোথায় কি যেন একটা অভাব ছিল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' সেই অভাব দূর করিল। উহার আবির্ভাবমাত্রেই

"আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার * * * মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন; তিনি মনীষার আভিজাত্যগৌরবে প্রখর ব্যক্তিত্বের দুরারোহ নির্জ্জন শৈলশিখরে একাকী অবস্থান করিতেন। লোকে সহসা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করিত না। অক্ষয়-চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা বঙ্কিম-প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ঈর্ষাকাতর এবং অল্পবুদ্ধি লোকে এজন্য তাঁহাকে গর্ব্বিত, দাম্ভিক ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিত। কিন্তু তাঁহার এই প্রকৃতিগত একাকীত্ব তাঁহাকে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ উপদ্রব-অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনাকে বহুল পরিমাণে বাধামুক্ত করিয়াছে। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-চরিত্রের এই দিকটাতে একটি উজ্জ্বল রশ্মি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দীনসত্ত্ব ব্যক্তিকে অযথা প্রশ্রয় দিয়া তিনি কখনও তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া যে আমাদের মহদুপকারই করিয়াছেন ইহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়। এই কালে বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়া একটি লেখক-মণ্ডলী গড়িয়া উঠে। সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ (বসু), চন্দ্রশেখর (মুখোপাধ্যায়), রাজকৃষ্ণ (মুখোপাধ্যায়), রামদাস (সেন), রমেশচন্দ্র (দত্ত), হরপ্রসাদ প্রভৃতি মনস্বী ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিত-লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। ইঁহাদের অনেকেই বঙ্কিমের সস্নেহ উৎসাহে, উপদেশে ও সাহচর্য্যে প্রচুর প্রেরণা লাভ করিয়া মাতৃভাষার সেবায় তাঁহাদের সকল শক্তি নিযুক্ত করেন।

রাজকর্ম্মচারীর গুরু কর্ম্মভার বহনের পর তাঁহার যে অবসরটুকু মিলিত, তাহা অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থরচনা ও বঙ্গদর্শন-সম্পাদনে যাপন করিয়া তিনি যেন বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেন। ইহাতে তাঁহার মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ ছিল না। প্রতিভার লক্ষণই এই। পাশ্চাত্য মনীষী কার্লাইল অসীম শ্রমস্বীকারের সীমাহীন সামর্থ্যকে প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি' বলিতে যে প্রতিভাকে বুঝায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অধিকারী তো ছিলেনই। কার্লাইলের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিভারও যে তিনি সম্যক্ দৃষ্টান্তস্থল তাহাও দেখিতে পাই। তাঁহার যে অপরিসীম শ্রমসামর্থ্য ছিল, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী হইতে, সরকারী কার্য্যে যে সকল মূল্যবান্ প্রতিবেদন (Report), মন্তব্য (Notes), বিবরণী (minutes) এবং বিচারকালীন রায় লিখিয়াছেন তাহা হইতে, এবং সেনেট সভায় তাঁহার বিতর্ক হইতে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত কয়েকখানি উপন্যাস এবং তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তর' যদিচ কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তাঁহার সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, বিশেষতঃ কৃষ্ণচরিত্র, গীতা, ধর্ম্মতত্ত্ব, অনুশীলন, সাম্য, বিজ্ঞানরহস্য, বিবিধ সমালোচন, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং On the Origin of Hindu Festivals, A Popular Literature for Bengal, Bengali Literature, Buddhism and the Sankhya Philosophy The Study of Hindu Philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি ইংরেজী রচনা অসীম অধ্যবসায়ে দেশী-বিদেশী বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, গভীর গবেষণা ও মননের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

প্রতিভার প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে থাকেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে রসাত্ম বাক্যকে কাব্য বলা হয়। সে-অর্থে গদ্যে রচিত এবং উপন্যাস হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসকে বিশুদ্ধ কাব্য বলিতে হয়। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর এক এক-খানি খণ্ডকাব্য-বিশেষ—যেন এক-একটি গজমুক্তা—সংযত সংহত নিটোল পরিপূর্ণ শুভ্র সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার প্রথম উপন্যাসগুলি যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত। গল্প বলিবার নির্ম্মল আনন্দ-বেগেই এগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। রচনামাত্রেই লেখকের শিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিগত সংস্কারের পরিচয় থাকে; বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল লেখাতেও তাহা আছে;

কিন্তু উহাদের পশ্চাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কবি বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখরের ন্যায় নব-নব রস পরিবেশনে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদেশকালের কাব্যরসপিপাসু রসিক জনকে বঞ্চিত করিলেন এবং প্রবল স্বজাতিপ্রীতি ও তীব্র স্বধর্ম্মানুরাগের অপরাজেয় প্রেরণাবশে তাঁহার অপেক্ষা অল্প শক্তিমান্ ব্যক্তি যে-কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই কর্ম্মে—অনাদৃত উপেক্ষিত ও বিস্মৃতপ্রায় পিতৃসম্পদকে তাঁহার অম্লান প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নয়নগোচর করিতে জীবনপণ করিলেন। জাতিগঠনকর্ম্মে সকল সামর্থ্য নিযুক্ত করিলেও সৌন্দর্য্যপ্রেমিক শিল্পী বঙ্কিম একেবারে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রচনায়—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, এবং আংশিকভাবে দেবীচৌধুরাণীতে—বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কতকগুলি সমস্যার অবতারণা আছে; এবং আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ এবং দেবীচৌধুরাণীর কিয়দংশে স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশভক্তি ও স্বধর্ম্মপ্রচারই মূল সুর ও প্রধান প্রেরণা। কিন্তু সকল পুস্তকেই সৌন্দর্য্যের চিরন্তন পূজারী কলাবিদ্ বঙ্কিম প্রসন্নমূর্ত্তিতে বারম্বার দেখা দিয়াছেন। জ্যোৎস্না-প্লাবিত বর্ষাবারিস্ফীত পরিপূর্ণ ত্রিস্রোতা বক্ষের, 'সন্তান'গণের দুর্ভেদ্য আশ্রয় ঘনান্ধকার গহন গম্ভীর মহারণ্যের, কিংবা অগণিত পুরাকীর্ত্তিসমন্বিত অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্পসম্পদসমৃদ্ধ উদয়গিরি ললিতগিরি এবং উহার চারি দিকে দিগন্তবিস্তৃত বনানী ও হরিৎ প্রান্তরের অজস্র সৌন্দর্য্যের যে অত্যুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা কোথায়!

স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিখুঁত চিত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতেই লিখিত রহিয়াছে। তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির মহত্তম কল্পনা করিয়া তাঁহার বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি বলিতে তিনি ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট দেশের মাটি ও জলকেই বুঝেন নাই, মানুষকে বুঝিয়াছেন—কিন্তু দেশের মাটিকেও কণামাত্র অবহেলা করেন নাই। তিনি জন্মভূমির সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, কুসুমিত দ্রুমদলশোভিতা, সুখদা, বরদা মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়াছেন। কল্যাণময়ী গৌরবময়ী জন্মভূমিকে মানুষের মত জীবের যোগ্য বাসভূমি মাতৃভূমি করিতে হইলে মানুষকে যাহা করিতে হয়, হইতে হয়, তাহার চিন্তাই তিনি সমধিক করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসী দেহের শক্তিতে, চরিত্রের বীর্য্যে, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্য নামের যোগ্য হইবে এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতি বর্ণে প্রতি মাত্রায় সুপ্রকাশ। তিনি যে বাঙালী জাতির প্রতি ব্যক্তিটিকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া অনুভব করিয়াছেন 'বন্দে মাতরম্'-এর 'সপ্তকোটি' শব্দটিই তাহার প্রমাণ; শুধু হিন্দুকেই তিনি আপনার জন মনে করেন নাই; বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের 'সপ্তকোটি কণ্ঠ নিনাদে' দেশের সুপ্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছেন। বাংলার অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই মুঘল সম্রাটগণের উপর তাঁহার ক্রোধ। তিনি পাঠান-রাজত্বকালীন বাংলাকে পরাধীন মনে করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

> রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।

এবং আর একটি উক্তিতে তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন,

> পরাধীনতার একটা প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিভিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।

অন্যত্র লিখিয়াছেন,

> মোগলজয়ের পর বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল, বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ স্বাধীন না থাকিয়া পরাধীন বিভাগ মাত্র হইয়াছিল।

সুতরাং পাঠান-শাসনাধীন বঙ্গদেশকে তিনি স্বাধীন বলিয়া মনে করিয়াছেন। যদি 'মুসলমান'কে তিনি পর, বাংলার শত্রু মনে করিতেন তবে 'মুসলমান' পাঠান-রাজ-শাসিত বাংলাকে তিনি 'স্বাধীন বাংলা' বলিতে পারিতেন না। আর এক স্থানে বাঙালী জাতির উৎপত্তি-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

বাস্তবিক আমরা এক্ষণে যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলি, তাহাদের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।

তাঁহারই রচনা হইতে উদ্ধৃত এই সকল উক্তি হইতেও বাঙালী জাতি বলিতে তিনি বঙ্গভাষাভাষী জাতিকেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদী প্রমাণ রহিয়াছে। অবান্তর হইলেও একথা স্মরণ করিতে বেদনা বোধ করি যে, একই জননীর স্তন্যপীযূষপুষ্ট আমাদেরই স্বদেশীয় কয়েক ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া 'আনন্দমঠে'র বহ্নি-উৎসব করিয়া নির্লজ্জ বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই মুসলমান-চরিত্রগুলির উপর আক্রমণ আছে সত্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রয়োগে প্রমাণ করিয়াছেন যে সকল দেশেই ঔপন্যাসিকগণ এরূপ করিয়া থাকেন এবং উহা বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই করেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন না তাহার একটি অবিসম্বাদী প্রমাণ তাঁহার সৃষ্ট আয়েষা-চরিত্র। নবাব-নন্দিনী আয়েষায় আমরা একই কালে যে মৃদু কুসুম-কোমল স্বভাবের নম্র মাধুর্য্য এবং স্নিগ্ধ সেবাপরায়ণ হৃদয় অথচ সাধ্বী বীরাঙ্গনার পবিত্র একনিষ্ঠ প্রেমে অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিতে পাই, তাহার তুলনা বঙ্কিমের সৃষ্ট অপরাপর নারীচরিত্রগুলিতে সুবিরল। চরিত্রের মহত্ত্বে ও মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল এই মহীয়সী নারীর পার্শ্বে আর সকলকেই অনুজ্জ্বল ম্লান বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে। তাঁহাকে মনে পড়িলেই আমাদের হৃদয় একটি সকরুণ বেদনায় কাতর হয়, চক্ষু বাষ্পাকুল হয় এবং মস্তক সসম্ভ্রম শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে। এই আয়েষা তো মুসলমান রাজকুমারী ছিলেন। কোন মুসলমান-বিদ্বেষীর পক্ষে এমন শুভ্র-শুচি অনবদ্য মহিমান্বিত চরিত্র অঙ্কিত করা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে কি?

বঙ্কিমের স্বদেশানুরাগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে সঙ্কীর্ণ অনুদারতার স্থান নাই; অন্যের ধন লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার স্বজাতি (বাঙালী) ধনী হইবে, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতিপ্রীতি উদার ধর্ম্মবুদ্ধির অগ্নি-স্নানে পরিশুদ্ধ নির্ম্মল। তাই তিনি স্বদেশানুরাগ-ধর্ম্মের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বাঙালী জাতি যে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি তাহার অন্যতম প্রমাণ। যে জাতির অতীত ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎও নাই, এমন একটা ধারণা আছে। বাঙালীর ইতিহাস নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের এ আফশোষের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বাংলার একখানি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন, এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিরদিনই ছিল। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহার বহু সাধনায়ত্ত জ্ঞান, পরিপক্ক পরিণত চিন্তা এবং অখণ্ড অবকাশ এই মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন ঠিক তেমনই সময়ে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তিনি অন্যের দুঃসাধ্য সেই অনারব্ধ কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া নরদেহ ত্যাগ করিলেন।

গঠনকার্য্যে অধিক মনোনিবেশ করায় তাঁহার সৃজনী প্রতিভা যে যথোচিত স্ফূর্ত্তির পর্য্যাপ্ত অবকাশ পায় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেশানুরাগ, সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রেরণাবশে লিখিত হইলেও মনীষী বঙ্কিমের কবি-হৃদয় সর্ব্বদাই সক্রিয় ছিল। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি গ্রন্থের কাব্য-সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ, অন্ততঃ, অধিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কৃষ্ণকান্তের উইলকেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া মনে করিতেন, এমন শুনা যায়।

তিনি যখন গীতা, ধর্ম্মতত্ত্ব, অনুশীলন প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনায় এবং হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম-কথার ব্যাখ্যা ও প্রচারে নিযুক্ত, তখন শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ও বাগ্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম এই ধর্মপ্রচারক পণ্ডিত মহাশয়কে লোকসমাজে পরিচিত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার মত ও পথ যে পণ্ডিত মহাশয়ের মত ও পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা অল্পকাল মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সাহায্য করিতে বিরত হন। বঙ্কিমের মনীষা ও বাণী কেবল প্রিয়বাদিনী ছিল না; তিনি মূঢ়তা ও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়া লোকের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পান নাই। তিনি তাঁহার স্বজাতির চিত্তকে জ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ করিতে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত শাণিত মননশীল করিতে এবং হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করিতে চাহেন। সেজন্য তিনি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা, দূরবগাহ বিদ্যা, অশেষ ভূয়োদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং অসামান্য শ্রম-শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; কোন ক্ষতিকে ক্ষতি, কোন শ্রমকে শ্রম বলিয়া গণ্য করেন নাই। পণ্ডিত মহাশয় হিন্দুসমাজের প্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত বাক্য মাত্রেরই এক অভিনব—কখনও বা হাস্যকর—ব্যাখ্যানের দ্বারা বহুদিন-সঞ্চিত জড়ত্বপুঞ্জকে সমর্থন করিয়া লোকরঞ্জনের সহজ পন্থা গ্রহণ করেন। এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতা-বিষজর্জ্জরিত বৃদ্ধ সমাজের সকল রকমের মূঢ় সংস্কার এবং "চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচারের" উপর নির্ম্মম আঘাত করিতে থাকেন। তাঁহার এই আঘাতে অপ্রেম, অশ্রদ্ধা ছিল না; তিনি অশেষ যত্নের সহিত প্রাচীন শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, বিচারের দ্বারা উহার আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিয়া উহার অন্তর্নিহিত সার সত্যকে আহরণ করেন এবং তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুক্তহস্তে বিতরণ করেন। বিজয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকচ্ছটায় ঝলসিত-দৃষ্টি যে-সকল 'ইয়ং বেঙ্গল' পিতামহগণের পরিত্যক্ত অমূল্য প্রাচীন শাস্ত্র-সম্পদ ও সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছেন, সেই মোহমুগ্ধদের দৃষ্টিবিভ্রম দূর করিতে তিনি প্রাণপণে প্রয়াসী হন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তাহা দেশপ্রচলিত লৌকিক ধর্ম্ম নহে। দেবীচৌধুরাণীতে, ধর্ম্মতত্ত্বে, গীতার ব্যাখ্যায়, অনুশীলনে সে ধর্ম্ম তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ কি তাহা স্পষ্ট করিয়াই 'চিকিৎসকে'র মুখ দিয়া বলিয়াছেন।*

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতির যে ইয়ত্তা ছিল না, তাহা তাঁহার ন্যায় শক্তিধর পুরুষের ইংরেজী ভাষায় যশঃ অর্জ্জনের পথকে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করাতেই স্বতঃপ্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার এই পরম প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি কাহারও অবজ্ঞা বা অবহেলা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ভাষা-জননীর পবিত্র মন্দিরে অনধিকারীর অশুচি প্রবেশ তিনি কখনও ক্ষমা করেন নাই। একদা তাঁহার কোন সাহিত্য-সুহৃদ্‌কে তিনি বলেন,

> বাঙ্গালার এই শিশুকাল, সমালোচনায়ও আমি খুব কঠোর বটে; কিন্তু যেখানে প্রতিভা বা মৌলিকতার একটুমাত্রও গন্ধ পাই, সেখানে আমি লেখককে কোল দিই। তবে যাহাদের কস্মিনকালে কিছুই হইবে না, সুতরাং এ পথও যাহাদের নয় বুঝিতে পারি তাহাদিগকে অকারণে প্রশ্রয় দিই কেন? গোড়ায় জল না মারিলে অতঃপর উহাদিগকে আঁটিয়া উঠা ভার হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে তাঁহার মানস-উদ্যান হইতে কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান সমালোচন প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা গন্ধের বিচিত্র পুষ্প চয়ন করিয়া বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, আর এক দিকে জ্বালাময়ী সমালোচনা-শতমুখী-সঞ্চালনে সকল অশুচি জঞ্জাল দূর করিয়া বাণী-মন্দিরের অঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'সব্যসাচী বঙ্কিম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে আজিকার দিনে

* "মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে"।—'আনন্দমঠ', বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা।

অনেক স্বয়ম্ভু নেতা দরিদ্রের দুঃখে বিগলিতাশ্রু হইয়া বক্তৃতামঞ্চ কাঁপাইয়া কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের সম্বন্ধে এই সকল নেতৃবৃন্দের অনেকেরই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট জ্ঞান যে নাস্তির কোঠায় তাহা তাঁহাদের (সংবাদপত্রে প্রকাশিত) বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃস্বার্থভাবে এই দরিদ্রদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন, এবং নিজের সুস্পষ্ট অভিমত ও হৃদয়-বেদনা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে নির্ভীক লেখনীমুখে বীর্য্যের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিতে হইবে তখন এদেশের লোক 'সোশ্যালিজ্‌ম্' 'কম্যুনিজ্‌ম্'-এর স্বপ্নও দেখেন নাই—পশ্চিম মহাদেশেও উহার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই

বঙ্কিম-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, ইহা সত্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনেই উনবিংশ শতকের বাঙালী মনস্বীগণের চিত্তক্ষেত্রে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব ভাব-বন্যা বহিয়া যায়, যাহার ফলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই বাংলা দেশেই নব জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হয়। মধুসূদন বহু পাশ্চাত্য প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। বঙ্কিমের জ্ঞান-তৃষ্ণা তাঁহার প্রতিভারই মত বহুমুখী ছিল। সুতরাং তাঁহার জীবনে ও তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব না থাকিলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। কারণ, প্রতিভার এবং জাগ্রত চিত্তের ধর্ম্মই এই যে পূর্ব্বতন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া উহাকে আত্মসাৎ করা। সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই পূর্ব্বতন সূরীদের নিকট এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের কবি রামায়ণের কবির নিকট ঋণী। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র পূর্ব্বতন লেখকদের নিকট কম ঋণী নহেন। বঙ্কিমচন্দ্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, এবং ইহাই স্বাভাবিক। জীবন-চঞ্চল পাশ্চাত্য সভ্যতা, অনুসন্ধানী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং সুবিস্তৃত পাশ্চাত্য বিদ্যা তাঁহার মন, বুদ্ধি ও মনীষাকে মার্জ্জিত ও নিশিত করে, কিন্তু অভিভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রথমার্দ্ধে কোম্‌ৎ, মিল, বেন্থামের প্রভাব প্রবল, কিন্তু শেষার্দ্ধে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব প্রবলতর। সেই সঙ্গে তাঁহার উন্নতচরিত্র ধার্ম্মিক পিতার সাধু জীবনের এবং তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পুণ্য প্রভাব তাঁহার জীবনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

> এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। * * * তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।

—একথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন। পবিত্র-স্বভাব ভূদেবের সংসর্গও তাঁহার চরিত্রকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলে, তাঁহার অন্তর-লোকে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহার পরিণত বয়সের রচনায় তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। এক সন্ন্যাসীর কৃপায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেবের প্রাণ রক্ষা হয়। উক্ত সন্ন্যাসী তাঁহার পিতার জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই প্রভাবের অধীনে ছিলেন এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। যদিও তিনি আদর্শ মানব-চরিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য দেবীচৌধুরাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসেই কোন-না-কোন রূপে এক-এক জন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। অভিরাম স্বামী হইতে চন্দ্রচূড় পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-গুলির জীবন- ও ঘটনা- সংঘাতকে গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এমন কি গোবিন্দলালকেও আমরা সন্ন্যাসী-বেশেই শেষবার দেখিতে পাই। বঙ্কিম-সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই বিষয়টির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগে লঘু আস্ফালনের স্থান নাই। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুরাগী ছিলেন না। উহার যাহা শ্রেয়স্কর, মহনীয়, বরণীয় তাহারই প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন—যাহা খাদ-মিশ্রিত, অসার, তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন।* কৃষ্ণচরিত্র-

* To return to my definition of Hinduism. It will exclude, as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by Hindus themselves. That, however, is not and ought not to be an objection against the definition. It is precisely popular

রচনায়, কিংবা ঐতিহাসিক গবেষণায়, অথবা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের (Indologist) আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ভ্রান্ত মত খণ্ডনে তাঁহার অপ্রমত্ত ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধিরই ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও কুতর্কের কুজ্ঝটিকায় কিংবা উপমার তন্তুজালে বিষয়কে বাষ্পাচ্ছন্ন বা জটিল হইতে দেন নাই। তাঁহার সত্যান্বেষী বুদ্ধি ও ন্যায়পর চিত্ত কখনও ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ন হইতে দেয় নাই। সুরসিক বঙ্কিমের সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ স্থানে স্থানে মর্ম্মভেদী হইয়াছে কিন্তু চর্ম্মভেদী হয় নাই—তাহাতে ক্ষুদ্র চিত্তের ইতরতা নাই। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সমালোচন কালে তাঁহার সূক্ষ্ম সুকুমার রসবোধের যেমন পরিচয় আছে, তেমনই তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রদর্শনে, দোষ উদ্‌ঘাটনে দ্বিধা বা সঙ্কোচের স্থান নাই।

এক শেল্‌ফ্ ইংরেজী পুস্তক সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই মত যেকালে শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকের নিকট শ্রদ্ধেয়, ইংরেজের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বেশভূষা সবই শ্রেষ্ঠ এবং দেশীয় যাহা কিছু সকলই নিকৃষ্ট বিবেচনায় অনেকে তাহার প্রতি বিমুখ, তেমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসীর চিত্তকে দেশাভিমুখে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রবল অভিযান করেন। তৎপূর্ব্বে রামমোহন এই চেষ্টা করিয়া যান। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মনস্বী ভূদেব ও রাজনারায়ণ ভারতীয় ধর্ম্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার ইন্দ্রজাল-প্রভাবে জন-গণ-মনকে যতটা অধিকার করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অপেক্ষাও অহিতকর এই আধ্যাত্মিক পরাজয় তাঁহার চিত্তকে অনুক্ষণ পীড়িত করিত। তাঁহার স্বজাতির এই হীন পরানুবাদ পরানুকরণ-প্রবৃত্তির নিদারুণ গ্লানি ও সুগভীর লজ্জা দূর করিবার জন্য তাঁহার সকল শক্তি দিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার সৃজনী প্রতিভাকেও ক্ষুণ্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার মানসিক দীপ্তিকে নির্ব্বাপিত, এমন কি ম্লানও করিতে পারে নাই। তিনি ইংরেজ-রাজের চাকরি করিয়াছেন, তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতৃগণও ইংরেজ-রাজের চাকুরি করিয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে নাই। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে inferiority complex বলে, বঙ্কিম-চরিত্রে —কি তাঁহার জীবনকাহিনীতে, কি তাঁহার বিরাট্ সাহিত্যে —কোথাও তাহার লেশমাত্র অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মৃত্যুভয় অনেকের থাকে না, কিন্তু অন্যবিধ ভয় হইতে সকলেই মুক্ত নহে। কোনরূপ ভয়ের সঙ্গে তাঁহার যে কোন পরিচয় ছিল, এমন তো দেখিতে পাই না। সন্তরণ-অনভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র নৌকাতে গঙ্গাবক্ষে ঝটিকাবর্ত্তের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইতেন এমন দেখিতে পাই। বহুবার উৰ্দ্ধতন রাজপুরুষের সহিত তাঁহার কঠিন সংঘর্ষ হইয়াছে, কদাচ তাঁহার ঋজুদেহ এতটুকুও অবনমিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্কিম-সম্পর্কে বলা যায়,

> "এমন যেন না হয় মতি
> ভয়েতে কারে করিব নতি
> —জানি নে কভু ভয় ডর।"

বঙ্কিমের রচনা তাঁহার মনের দর্পণ-স্বরূপ। কল্পনা ও ভাষার সংযম সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য তাঁহার রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা হইতে 'মানুষ' বঙ্কিমের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিভায় যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সে তাঁহার বলিষ্ঠ পৌরুষ এবং সুদৃঢ় ঋজুতা। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার যে পরিচয় রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়া, তাহার সহিত বঙ্কিম-প্রতিভার এই বিষয়ে বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই ওজোগুণ আমাদের বঙ্গভাষার লেখকগণের মধ্যে অতিশয় দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সমগ্র রচনার সর্ব্বত্র সুকঠিন পৌরুষের জয়গান ধ্বনিত হইতেছে। মজ্জাহীন মেরুহীন নমনীয় ক্লৈব্যকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত করিতে তিনি দয়া-

---

delusions of this sort that have encrusted Hinduism with the rubbish of ages—with superstitions and absurdities which subvert its higher purposes; and which it is the duty of every true Hindu actively to assail and destroy. The noxious parasitic growth must be exterminated before Hinduism can hope further to carry on the education of the human race."—Bankim Chandra's *Letters on Hinduism*, page 13.

প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার স্বদেশবাসীকে মনুষ্যত্বের বন্ধুর কণ্টকাস্তৃত বাধাবিঘ্নসংকুল দুর্গম পথে যাত্রা করিতে উদাত্ত কণ্ঠে বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। স্বদেশের শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতির বেদনা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলকে দিবসে নিশীথে পীড়া দিয়াছে। সেই অন্তর্গূঢ় বেদনাই স্বদেশপ্রেমের স্বচ্ছ মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় তাঁহার অধিকাংশ রচনায়, বিশেষতঃ আনন্দমঠ ও কমলাকান্তের দপ্তরে, প্রবাহিত হইয়াছে। অন্য কোন ভাষার সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাকুল ও তীব্র স্বদেশপ্রেমের অনুরূপ প্রকাশের তুলনা আছে কিনা জানি না। ঋষি-কবি ও প্রেমিক বঙ্কিম তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে মাতৃযজ্ঞের যে অনির্ব্বাণ হোম-হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, যেন তাহারই প্রচণ্ড দাহ আমাদের সকল প্রকার ক্ষুদ্রতাকে দগ্ধ এবং তাহারই দীপ্তি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করিতে থাকে।

কোন ব্যক্তির যথার্থ জীবনচরিত লিখিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কেবল মহৎ ও বৃহৎ নহে বরং তুচ্ছতম ঘটনাসমূহের যথাযথ ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়। যাহা আমরা সহজেই উপেক্ষা করিয়া থাকি এমন সব ছোটখাট সামান্য তুচ্ছ কথাবার্ত্তায় কাজকর্ম্মে মানুষের অন্তর্লোকের পরিচয়, খাঁটি মানুষটির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দূরদৃষ্টক্রমে বঙ্গের কোনও মহামনীষীর জীবনচরিতের তেমন উপাদানের একান্ত অসদ্ভাব। 'শ্রীম' লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং ভগিনী নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থ দুইটিতে এই দুই লোকোত্তর পুরুষের (পরমহংসদেব ও স্বামীজী) অন্তর্জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, জগদীশ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মহামানবগণের যথার্থ জীবনালেখ্য লিখিবার যথাযোগ্য উপাদান আছে বলিয়া জানা নাই। কীর্ত্তির ভিতর দিয়া তাঁহাদের যে পরিচয় পাই সে তো তাঁহাদের প্রকাশের দিক্, বাহিরের দিক্। তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ পরিচয় তো নাই। সে তো বনস্পতির পুষ্পপল্লবের পরিচয়; তাহার কাণ্ডের, শাখা-প্রশাখার, মূলের পরিচয় তো অগোচরেই রহিয়া যায়; তাহার অখণ্ড সমগ্র জীবনের সহিত তো আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয় না! এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় পঞ্চম পাদে রবীন্দ্রনাথেরও এক জন 'বস্‌ওএল' মিলিল না।*

* "মানুষ রবীন্দ্রনাথ" পুস্তকটি এই প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত, এবং তাহাও বস্‌ওএলী রীতিতে লিখিত নহে।

তাঁহার জীবনী দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকে official biography বলা চলে; 'ব্যক্তি' রবীন্দ্রনাথকে আমরা উহার মধ্যে দেখিতে পাই না। বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবতঃ একমাত্র সম্পদ্ তাহার মাতৃভাষা। সেই "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া গিয়াছেন" এবং যাঁহার নিকট বাঙালী জাতি নিরন্তর ঋণী, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনের কোন সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত নাই। তাঁহার জীবনী ও চরিতকথা বলিতে গিয়া সকল লেখককেই 'গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা' করিতে হইয়াছে। তাঁহারই রচিত গ্রন্থাবলী এবং তাহার সমকালীন দুই-এক জন সাহিত্যিকের অতি কৃপণ বিবরণই তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার একমাত্র সম্বল। যাঁহারা বঙ্কিমের ব্যক্তি-সত্তাকে জানিতে ও বুঝিতে বাঙালী জাতির জন্য রাজসূয়ের আয়োজন রাখিয়া যাইতে পারিতেন—যাঁহারা বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জানিবার শুনিবার এবং একান্ত আপনার করিয়া পাইবার অশেষ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র, কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র, গেহিনী রাজলক্ষ্মী, সুহৃদ্ দীনবন্ধু ও রাজকৃষ্ণ, শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র এবং চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তণ্ডুলকণা মাত্র দিয়া আমাদিগকে চিরবঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বর্ত্তমান অবস্থায় যত দূর সম্ভব উত্তমরূপে জানিবার ও বুঝিবার জন্য যেমন তাহার সুমগ্র গ্রন্থাবলীর একটি নির্ভুল কালানুক্রমিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন, তেমনই তাঁহার রচনার সমালোচনা করিয়া, তাঁহার জীবনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসমূহ বর্ণনা করিয়া এবং তাঁহার চরিতচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিও যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা সাবধানে সংগৃহীত এবং সযত্ন সম্পাদনায় একত্রে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাতে বঙ্কিম-সাহিত্যের চর্চ্চা সহজ হইবে, তাঁহার প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং বাঙালী মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের সাধনায় প্রবুদ্ধ হইবে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রবন্ধটির জন্য লেখিকাকে ১৯৩৮ সালে মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ, রায় বাহাদুর, ইহা প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রবন্ধটির দৈর্ঘ্য কিছু কমাইবার নিমিত্ত লেখিকার সম্মতিক্রমে ইহার কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসরের মধ্যে "বাংলা বানানের নিয়মে"র পর পর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙ্গালা বানান-সংস্কারের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, একথা অবশ্য তাঁহারা বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন না। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদেরও দু-চারিটি কথা বলিবার অবকাশ আছে মনে করি।

বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে না। উদাহরণ দিয়া বুঝাই—ইংরেজীতে knee, know, knife, knave ইত্যাদি শব্দে k উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ব্যুৎপত্তির জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত বানানে k রাখা ঠিকই; কিন্তু যদি ধ্বনিসঙ্গত বানান চালাইতে হয় তবে k অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। এইরূপ folk, chalk, calf ইত্যাদি শব্দে l উচ্চারিত না হইলেও ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইংরেজীর ধ্বনিসঙ্গত বানান সংস্কার করিতে হইলে এই k, l সবই বাদ দিতে হয়। কিন্তু যদি কতকগুলি শব্দে এই অনুচ্চারিত বর্ণ রাখি আর কতকগুলিতে না রাখি কিংবা কেবল k বর্জন করি, l রাখিয়া দিই বা কেবল l বর্জন করি, k রাখিয়া দিই, তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে। ইহা আমি দেখাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ১০ নং নিয়মে বলিতেছেন, "মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য)" ইত্যাদি। ইহা বুৎপত্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু ৭ নং নিয়মে তাঁহারা বলেন, "অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—কান, সোনা" ইত্যাদি। অথচ ব্যুৎপত্তির জন্য কাণ (কর্ণ), সোণা (স্বর্ণ) এইরূপ বানানই সঙ্গত। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বলিয়া শ, ষ, স চলিবে, অথচ ণ চলিবে না—এ কি নিয়ম? হয় উভয় ক্ষেত্রেই বানান ধ্বনিসঙ্গত হইবে, না হয় ব্যুৎপত্তিসঙ্গত হইবে।

আরও মজার কথা, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় "এ-ও হয়, ও-ও হয়" এই রকম স্বেচ্ছাচারের নিয়ম বা অনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহারা ৫ নং নিয়মে বলেন, "যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব।" ইহারও আবার ব্যতিক্রম (exception) আছে।

৬ নং নিয়মটি বেশ কৌতূহলজনক। তাহাতে আছে—"এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।" এই বানানগুলি ধ্বনিসঙ্গত। ব্যুৎপত্তি ধরিলে য লেখা উচিত হয়। কিন্তু সর্ব্বনাম যদ্—(যা) শব্দ, যা-ধাতু, যাতৃ (দেবরের স্ত্রী) প্রভৃতি শব্দগুলি হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দে জ কেন হইবে না? যদি জাউ, জাঁতা প্রভৃতি বিধেয় হয়, তবে জে, জায়, জা, জোগান, জোগাড় ইত্যাদি কেন অবিধেয় হইবে? তাহার উত্তরে তাঁহারা হয়ত বলিবেন, অধিকাংশ লেখক এখানে য-ই রাখিতে চান। তাঁহারা কি ভোট লইয়া বানান সংস্কার করিতে চান? তবে কোন নিয়মেরই প্রয়োজন নাই, কেন-না পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর অধিকাংশই বানান ভুল করে।

তাঁহারা তো ঈ, ঊ স্থানে বিকল্পে ই, উ ব্যবস্থা করিলেন, অথচ ১ নং নিয়মে বলিতেছেন,—"রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।" এখানে পাণিনি

প্রভৃতি সমস্ত বৈয়াকরণ বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করেন। ফলে দাড়াইতেছে অর্চ্চনা, কর্ত্তা প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের নিকট অচল!

চলিত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদের বানান সম্বন্ধে তাঁহারা ১১ নং নিয়মে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। এখানে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা হব বা হবো, শোব বা শোবো, লিখব বা লিখবো, উঠব বা উঠবো দুই রকমই বিধান দিয়াছেন; কিন্তু হ'ল, শুল, উঠল, হ'ত, শুত, উঠত প্রভৃতি স্থলে অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইলেও বিকল্পে ও-কারের বিধান দেন নাই। ইহার কারণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাঁহারা বলেন—"-লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে"; অর্থাৎ হ'লাম, হ'লুম, হ'লেম তিন রূপই হইতে পারে। যদি সকল বাঙ্গালাভাষীর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ বিকল্পের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে করছে, কচ্চে, করতেছে, কর্‌তে আছে এই রূপগুলি কেন বিকল্পে ব্যবহার্য্য হইবে না? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তো "কচ্চে"-ই লেখেন।

তাঁহারা "তুমি কর, লেখ, ওঠ" ইত্যাদি স্থানে ক্রিয়াপদের শেষে ওকার দেন না; কিন্তু ক'রো, লিখো, উঠো ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য ওকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে লেখ=প্রাচীন লিখহ এবং লিখো=প্রাচীন লিখিহ। কাজেই ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতেই হউক বা উচ্চারণের দিক্ হইতেই হউক, লেখ, লিখো—উভয় স্থানেই অন্ত্যস্বর একরূপেই বানান করা উচিত।

"করাইও" প্রভৃতি পদের চল্‌তি রূপে তাঁহারা "করিও" বানানের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ধ্বনিবিদ্ জানেন যে সাধু বাঙ্গালার "তুমি করিও" এবং চল্‌তি বাঙ্গালার "তুমি করিও" ("তুমি করাইও" স্থানে) উচ্চারণগত ভেদ আছে। সাধু বাঙ্গালার "করিও" পদে তিন স্বর (syllable) আছে— ক—রি—ও; কিন্তু চল্‌তি বাঙ্গালার "করিও" পদে দুই স্বর আছে— কর্‌-(ই)য়ো, যেমন চল্‌তি বাঙ্গালার "করিয়ে" পদে দুই স্বর আছে। স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দের জন্য এই ভেদ মনে রাখা খুবই দরকার। আমাদের মতে চল্‌তি বাঙ্গালায় "করিয়ো" (করাইও সাধু) বানান হওয়া উচিত।

যে সকল ধাতুর অন্তে বা উপান্তে ইকার বা উকার আছে, কথ্য ভাষায় কোন কোন স্থলে একার বা ওকার হয়, যথা—লেখে, লেখেন, লেখ, লেখ্, লেখা, লেখানো, এইরূপ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, ওঠ্ ওঠা, ওঠানো; ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিধান খুবই সঙ্গত। এখানে আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, সাধু ভাষাতেও এইরূপ বানান হওয়া উচিত; কারণ ইহা বাঙ্গালা ভাষার স্বরসঙ্গতির (vowel harmony) নিয়মসম্মত

উপান্তে একারযুক্ত দেখ্, বেচ্ প্রভৃতি ধাতুর কথ্য ভাষার রূপ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন নিয়ম করেন নাই। আমাদের মতে দ্যাখে, দ্যাখেন, দ্যাখো, দ্যাখ্, দ্যাখা, দ্যাখানো এইরূপ হওয়া উচিত। যে কারণে উপান্ত ই, উ পরিবর্ত্তিত হইয়া এ, ও হয়, ঠিক সেই কারণেই উপান্ত এ পরিবর্ত্তিত হইয়া অ্যা হয়। কাজেই একার ও ওকারের ন্যায় এই অ্যাকারও বানানে দেখানো আবশ্যক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসিড, হ্যাট ইত্যাদি বিদেশী শব্দে এই অ্যাকার স্বীকার করিয়াছেন। দেশী শব্দের বেলা কেন আপত্তি হইবে? সে দেখে, সে দেখে এল— এই দুই বাক্যের "দে"-অক্ষরের দুই পৃথক্ উচ্চারণ, অথচ তাহাদের একই বানান, ইহা কখনই বৈজ্ঞানিক নয়।

কাটিয়া, খাইয়া ইত্যাদি পদের চল্‌তি রূপে কেটে, খেয়ে ইত্যাদি হয়। এস্থলে আদি স্বরের বিকৃতি বানানে দেখানো হইয়াছে। ঠিক এই কারণেই করিয়া, বলিয়া, হইয়া ইত্যাদি পদের চল্‌তি রূপে কোরে, বোলে, হোয়ে লেখা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় অন্যত্র যেখানে অভিশ্রুতির (umlaut) জন্য আদ্য স্বরে ওকার উচ্চারণ হয়, বানানে উর্দ্ধ কমা ব্যবহার না করিয়া সোজাসুজি ওকার ব্যবহার করা উচিত। প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত), ঘ'রো জ'লো ইত্যাদি বানান অপেক্ষা পোড়ো, ঘোরো, জোলো ইত্যাদি বানান অধিক সঙ্গত। আদ্য স্বরের বিকৃতি হেটো, গেছো, মেছুনী, অকেজো প্রভৃতি শব্দের বানানে যদি
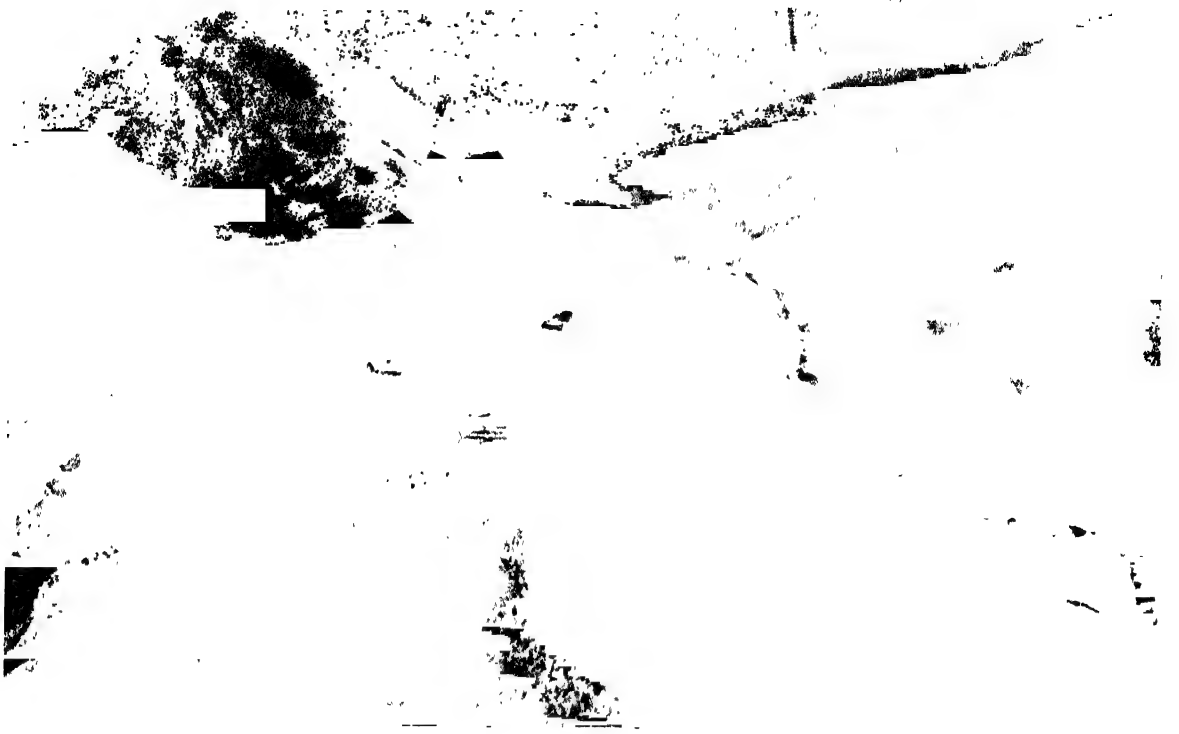
চীনের শেষ আশ্রয়।   য়ুনানের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পর্ব্বতচূড়ায় চীনের প্রাচীন স্তূপরাজি

আক্রমণবিধ্বস্ত মাদ্রিদ।   দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে স্পেন ফাঙ্কোর পদানত হইল

সান ফ্রান্সিস্কোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। এই বিরাট দ্বীপটি মনুষ্য-নির্ম্মিত
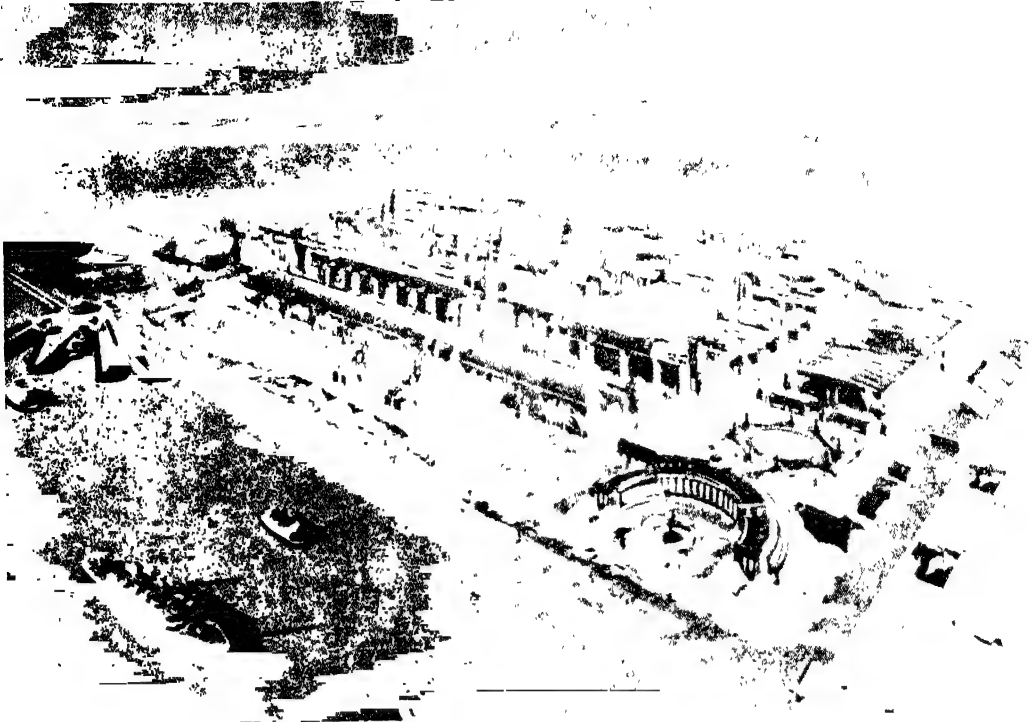
সান ফ্রান্সিস্কো বন্দর ও প্রদর্শনী. দক্ষিণে পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু।

দেখানো দোষের না হয়, তবে আদ্য অকারের বিকৃতিতে বানানে ওকার লিখিলেই বা কেন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে? আমাদের জিজ্ঞাস্য, বুনো, কুনো (কোণে থাকে যে) ইত্যাদি বানান কি অশুদ্ধ? সাধারণ ভাবে আমাদের প্রস্তাব এই যে, অভিশ্রুতিতে উৎপন্ন ওকার দেখাইবার জন্য কোন স্থানেই ঊর্দ্ধ কমা ব্যবহার করা হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে ওকার ব্যবহার করিতে হইবে।

আমরা সংস্কৃতের ক্ষ অক্ষরের বিকৃতিতে সর্ব্বত্র ছ লিখি, যথা—ছুরি (ক্ষুরিকা), মাছি (মক্ষিকা)। কিন্তু ক্ষ অক্ষরের বিকৃতিতে যেখানে খ হয়, সেখানে আদিতে ক্ষ-ই লিখি, যথা ক্ষেত; কিন্তু পাখী। ইহারও ব্যত্যয় আছে, যথা—খুদ (ক্ষুদ্র), খুদে (* ক্ষুদ্রিক), খুঁত (* ক্ষুত্ত)। আদিতে ছ এর ন্যায় খ লিখিতে কেন আপত্তি হইবে, জানি না। পালি ও প্রাকৃতে এইরূপই বানান হয়, যথা—খীর (ক্ষীর), খেত্ত (ক্ষেত্র)। এমন কি সংস্কৃতেও কোন কোন শব্দে বিকল্পে ক্ষ ও খ দুই-ই চলে। যথা—ক্ষুর, খুর; ক্ষুল্লতাত, খুল্লতাত; ক্ষেল্, খেল্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নং নিয়মে বিকল্পে কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো ইত্যাদি লেখার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)—এইরূপ বানানের বিধান করিয়াছেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে,—কাল (সময়), কাল (কল্য), কাল (কৃষ্ণ) এই তিনটি পৃথক্ শব্দ, এবং ইহাদের উচ্চারণও পৃথক্। এই জন্য ধ্বনিগত বানান কর্ত্তব্য, যথা—কাল (সময়), কা'ল (কল্য), কালো (কৃষ্ণ)। এইরূপ চাল (ছাদ, গতি), চা'ল (চাউল); ডাল (শাখা), ডা'ল (দাইল)। বলা হইয়াছে যে কলিকাতা অঞ্চলে কাল (সময়) এবং কাল (কল্য) ইত্যাদি শব্দযুগলের উচ্চারণে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্ব স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে, এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তিও ভিন্ন। এজন্য আমরা এস্থলে কলিকাতার উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারি না। কলিকাতায় অনেকে ঘোঁড়া, ঘাঁস, ঝ্যাঁটা, কাঁ্যাকড়া বলেন, প্রায় সকলেই করলুম, খেলুম বলেন। আমরা কিন্তু এই উচ্চারণ বা বানান মাথা পাতিয়া লইতে পারি না। বাস্তবিক কা'ল, চা'ল, ডা'ল, ইত্যাদি উচ্চারণে অভিশ্রুতির জন্য আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বানানেও এই পরিবর্ত্তন দেখানো উচিত মনে করি। এইরূপ ক'নে (কন্যা), খ'ল (খইল) প্রভৃতি শব্দে অকারের উচ্চারণ জার্ম্মান Schön Höll প্রভৃতি শব্দের অভিশ্রুত ওকারের উচ্চারণের সমান। "ক'নে ঘরের কোণে ব'সে আছে"—এই বাক্যে ক'নে ও কোণে এই দুই শব্দের উচ্চারণ আমার কাছে এক নয়। কাজেই ব'সে (বসিয়া) স্থানে বোসে লেখা চলে; কিন্তু ক'নে স্থানে কোনে লেখা চলিবে না। এই সকল স্থানে ঊর্দ্ধ কমার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে। ইহা আমার প্রস্তাব মাত্র। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রার্থনা করি।

বিদেশী শব্দের বানান সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। বিদেশী শব্দের অন্ত অকার যখন উচ্চারিত হয়, তাহা বানানে দেখাইবার জন্য কোন বিধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করেন নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। ধরুন, Thibaw শব্দটি, আমাদের মতে এখানে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার আবশ্যক, যথা—থিব'।

তাঁহারা z উচ্চারণের জন্য জ এর নীচে রেখা বা ফুটকি দিতে বলেন। সকল প্রেসে এই অক্ষর পাওয়া যাইবে না। এই জন্য যদি বিদেশী শব্দে zএর জন্য য ব্যবহার হয়, তবে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে Azes স্থানে অযস পাওয়া যায়। আপত্তি হইবে যে যকারের প্রকৃত উচ্চারণ z নয়। আমি বলিয়াছি সুবিধার জন্য য ব্যবহার করিতে। ইহার দৃষ্টান্ত অন্য বিদেশী ভাষাতেও আছে। আরবী বড় কাফের জন্য ইংরেজীতে q লেখা হয়, যথা Qur-an, qazi; অথচ ইংরেজীতে k ও qএর উচ্চারণে কোন তফাৎ নাই। ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি অধিকাংশ দেশে ল্যাটিন অক্ষর প্রচলিত। ল্যাটিনের j উচ্চারণ সংস্কৃতের য়এর ন্যায়; কিন্তু ফরাসী ও ইংরেজীতে j এই দুই ভাষায় দুই পৃথক্ উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কেবল জার্ম্মানী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় ল্যাটিনের jএর উচ্চারণ রক্ষিত হয়। তৈয়ারি হরফ পাইলে অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রস্তাবিত রেখা বা ফুটকিযুক্ত জ ব্যবহারে আমাদের আপত্তি নাই। বরং হিন্দীর অনুকরণে আমরা নীচে ফুটকিযুক্ত জ-ই অনুমোদন করি।

"বাংলা বানানের নিয়মে"র প্রথম সংস্করণে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার নিয়মের প্রয়োজন আছে। মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিক বর্ণ আছে, তাহা হইতে বুৎপন্ন শব্দে চন্দ্রবিন্দু অবশ্য দিতে হইবে, যথা—পাঁক (পঙ্ক), পাঁচ (পঞ্চ), কাঁটা (কণ্টক), দাঁত (দন্ত), কাঁপ (কম্প), হাঁস (হংস)। এতদ্ভিন্ন ভাষাতত্ত্ব ও উচ্চারণের অনুরোধে বাঁকা (প্রাকৃত বঙ্ক), খাঁটি (প্রাচীন বাং খাণ্টি), খুঁটি (প্রাচীন বাং খুণ্টি), ইঁট (হিন্দী ইঁটা), উঁট (হিন্দী উঁঠ) প্রভৃতি শব্দেও চন্দ্রবিন্দুর বিধান আবশ্যক।

"গণ" শব্দের সহিত যুক্ত চাঁদাদাতাগণ বিদ্বান্‌গণ, পক্ষিগণ, মহাত্মাগণ প্রভৃতি শব্দরূপ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ কোনই অভিমত প্রকাশ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় এখানে সম্বন্ধ তৎপুরুষ না মানিয়া "সকল" শব্দের ন্যায় "গণ" বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যেমন—চাঁদাদাতা গণ, বিদ্বান্ গণ, পক্ষী গণ, মহাত্মা গণ।

আশা করি বিশেষজ্ঞগণ আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল্যবান্ মতামত প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আপেক্ষিকতাবাদ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্-এ

সেদিন পর্য্যন্ত দেশ ও কাল স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য হইত। আকাশে মেঘ, নক্ষত্র ইত্যাদি কোন বস্তু নাই, অর্থাৎ আকাশ সম্পূর্ণ খালি আছে, বলিয়া কল্পনা করিলেও আকাশের ধারণায় কোন বাধা পড়িত না। কালের স্বতন্ত্র ধারণাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, দ্রব্য, দেশ ও কালের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা নাই—তাহারা অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত। একের পরিবর্ত্তনে অন্য দুইটির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। দ্রব্য, দেশ ও কালের সমবায় সম্বন্ধকে আপেক্ষিকতা বলে, এবং এই মতবাদকে আপেক্ষিকতাবাদ বলে। এই আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্ত্তক আইন্‌স্টাইন্। এই মতবাদের প্রবর্ত্তনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃতির কোন বস্তুরই স্বাধীন সত্তা নাই—কোন কার্য্যই নিরপেক্ষ নয়।

এ পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কেবল দেশ বা আকাশই আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, অর্থাৎ আমরা দেশের মধ্যে নিমজ্জিত আছি, এবং সময় আমাদের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে—দেশ ও কালে কোন সম্বন্ধ নাই—তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। দেশে আমরা যেমন অগ্রবর্ত্তী হইতে পারি, তেমনি পশ্চাদ্বর্ত্তীও হইতে পারি। কিন্তু সময়ে আমাদের পশ্চাদপসরণ অসম্ভব। আমরা দ্রুত বা মন্থর গতিতে চলিতে পারি অথবা আমরা গতিশূন্য হইতে পারি, কিন্তু সময় হিসাবে পিছাইয়া যাইতে পারি না। দেশ আমাদের আয়ত্তাধীন কিন্তু সময় আয়ত্তাধীন নয়। সময় সকলের পক্ষে সমান ভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সময় কাহারও খাতির করে না। সময়কে কেহ পিছাইয়া দিতে পারে না। ঘড়ির কাঁটা পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া দিলেও সময় পিছাইয়া যায় না। কোন কার্য্যই, আপেক্ষিকতাবাদের মতে, দেশ ও কালের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ধরিয়া সংঘটিত হইতেছে না—সকল ব্যাপারই সমবায়-সম্বন্ধে-জড়িত দেশ-কালে সম্পন্ন হইতেছে।

কোন বিন্দু যেটুকু দেশ অধিকার করে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু ঐ বিন্দুটিকে যদি কোন সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তবে ঐ বিন্দু দ্বারা একটি রেখা অঙ্কিত হইবে। ঐ রেখাটির কেবল এক দিকে বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আছে বলিয়া উহার মান বা মাত্রা এক বলিয়া ধরা হয়, এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় রেখাটিকে একমাত্রিক বলে। রেখাটিকে যদি সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া কতক দূর ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তবে উহা দ্বারা একটি আয়তক্ষেত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই আছে বলিয়া উহার মান বা মাত্রা দুই বলিয়া ধরা হয়, এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় ক্ষেত্রটিকে দ্বৈমাত্রিক বলা হয়। আবার ঐ আয়ত-ক্ষেত্রটিকে যদি ক্রমশঃ সমভাবে উপর বা নীচের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যায়, তবে একটি ঘনক্ষেত্র নির্মিত হইবে। ঐ ঘনক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে বলিয়া উহার মান বা মাত্রা তিন বলিয়া ধরা হয়, এবং ঘনক্ষেত্রটিকে ত্রৈমাত্রিক বলা হয়।

প্রকৃতিতে সকল বস্তুই সচল। যদি কোন বস্তু অচল বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা আপেক্ষিক ভাবে অচল—অন্য কোন সচল বস্তুর তুলনায় অচল। সচল বস্তু অচল বস্তুর তুলনায় সচল। যদি দুটি বস্তু এক স্থান হইতে সমান বেগে ধাবিত হয়—চলিতে চলিতে তাহাদের বেগের সামান্য মাত্র হ্রাসবৃদ্ধি না হয়—তবে কিছু দূর যাইবার পর তাহারা পরস্পরের তুলনায় অচল বলিয়া বোধ হইবে, কারণ পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান উৎপন্ন হইবে না। ট্রেনে যাইবার সময় কখনও কখনও রেলের পাশের বাড়ী, ঘর, দুয়ার, গাছপালা সচল বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে আমরা যে-গাড়ীতে বসিয়া আছি তাহাকে অন্যমনস্ক ভাবে অচল ভাবি। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, কিন্তু আমরা পৃথিবীকে অচল বোধ করিয়া ভাবি যে ঐ সময়ে সূর্য পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করিতেছে।

মনে কর, তুমি চাটগাঁ মেলে চড়িয়া কলিকাতা হইতে রাণাঘাট যাইতেছ। চাটগাঁ মেল সকাল ৮ টায় কলিকাতা ছাড়ে, এবং ৯টা ১৪ মিনিটে রাণাঘাটে পৌছে। কলিকাতা হইতে রাণাঘাটের দূরত্ব ৪৬ মাইল। ঐ ট্রেন ৮টা ৩৮ মিনিটে নৈহাটীতে পৌছে। কলিকাতা হইতে নৈহাটি ২৪ মাইল।

কলিকাতা ও রাণাঘাটের মধ্যে ৪৬ মাইল ব্যবধান অতিক্রম করিতে ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট লাগে। এই দৈশিক ও কালিক একমাত্রিক দৈর্ঘ্য দুইটিকে কি করিয়া সংযুক্ত করা যাইতে পারে? এই সংযোগ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটি আয়তক্ষেত্রের মানসিক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। ইহার ৪৬ মাইল দৈর্ঘ্য একটি সরল রেখা দ্বারা, এবং ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট সময় পূর্ব রেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত আর একটি সরল রেখা দ্বারা ব্যক্ত করিতে হইবে।

পরপৃষ্ঠার চিত্রটি দেখ। ইহার ভূমি-লগ্ন রেখাটি দ্বারা কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্যন্ত পথ ব্যক্ত হইতেছে বলিয়া ধর, এবং বাম দিকের লম্ব রেখাটি দ্বারা ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট সময় ব্যক্ত হইতেছে বলিয়া ধর।

কোণাকুণি মোটা রেখাটি ট্রেনের গতি ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া ধর। ক বিন্দুটি লম্ব রেখাস্থ ৮টা ৩৮ মিনিট সূচক স্থানের ঠিক সম্মুখে, এবং সমতল রেখাস্থ নৈহাটি সূচক বিন্দুর ঠিক উপরে থাকাতে বোঝা যাইতেছে যে ট্রেনখানি ৮টা ৩৮ মিনিটের সময় নৈহাটি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে। আবার আর একটি বিন্দু 'খ' ঐ সময়ে মদনপুরের নিকটস্থ কোন স্থান নির্দেশ করিতেছে। 'খ' বিন্দুটি স্থূল রেখার অন্তর্গত নয়, কারণ তখনও ট্রেনখানি মদনপুরে পৌছে নাই। চিত্রের সমগ্র ক্ষেত্রটি ৮টা হইতে ৯টা ১৪ মিনিটের মধ্যে কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্যন্ত যত স্থান আছে তাহা নির্দেশ করিতেছে। এইরূপে ৪৬ মাইল পরিমিত দৈর্ঘ্যবাচক একটি রেখার সহিত ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট পরিমিত একটি প্রস্থবাচক রেখার সংযোগে একটি দ্বৈমাত্রিক ক্ষেত্র পাওয়া গেল যাহার একটি মান দেশবাচক এবং একটি মান কালবাচক।

এই প্রকারে দেশবাচক তিনটি মানের সহিত যদি কালবাচক একটি মান সংযুক্ত করা যায়, তবে একটি চাতুর্মাত্রিক ঘনায়ত পাওয়া যায়, যাহাকে বৈজ্ঞানিক
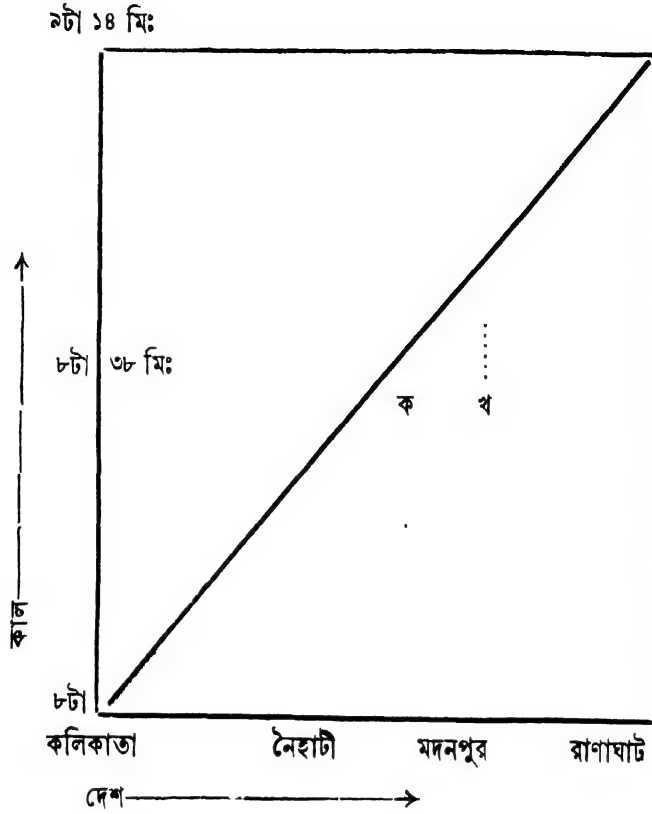
ভাষায় 'কণ্টিনিয়ম্‌' (continuum) নামে অভিহিত করা হয়।

পাঠকগণ বলিবেন যে, উপরের চিত্রের দ্বারা কণ্টিনিয়মের উপলব্ধি-সম্বন্ধে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। উহা চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ উহা সত্যকার দেশ ও কালের সংযোগ ব্যক্ত করে না। আমরা বলি, দেশ ও কালের যথার্থ সংযোগ মনের মধ্যে, (subjective)—উহা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, উহা বস্তু-সাহায্যে ব্যক্ত বা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সাঙ্কেতিক উপায় দ্বারা উহা ব্যক্ত করা ছাড়া, উহা সম্যক্‌ ব্যক্ত করার অন্য উপায় নাই।

পাঠকগণ যদি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে ঘটনার পারম্পর্যই কাল। পেণ্ডুলমের দোলনের ফলে ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করিয়া সরিতে থাকে। কাঁটার এই গতি হইতে সময় পরিজ্ঞাত হয়। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডকে ২৪ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্যকে ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর এই দুইটি গতি হইতে আমাদের দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসরের জ্ঞান হয়। সব গতিই (বা ঘটনাই) ত্রৈমাত্রিক দেশকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হয়, এবং কার্যাবলীর পরম্পরা হইতে কাল অনুভূত হয়। অতএব দেশের সহিত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

আবার, বস্তু ভিন্ন কোন কাজই হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বস্তু, দেশ ও কাল পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ। ইহাই আপেক্ষিকতাবাদের মূলসূত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বাংলা ভাষা

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

পূজনীয় 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকার বিগত চৈত্র সংখ্যার ৯০৬ পৃষ্ঠায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দটি তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মের শতবার্ষিকের বৎসর, এবং ঐ সভা এক যুগে বঙ্গের সাহিত্যিক জীবনের ও জাতীয় জীবনের অনেক বিভাগের উপরে স্বীয় কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীমান্ যোগানন্দ দাস ঐ সংখ্যায় একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রভাব ও কার্য্য কত বিশাল ছিল। ঐ সভার পরিকল্পনা ও জন্মদিন, উহার লক্ষ্য ও কার্য্যক্রম নিরূপণ, উহার কোন্ লক্ষ্যটি প্রধান ও কোন্‌টি অপ্রধান হইবে, তদ্বিষয়ে পদে পদে নির্দ্দেশ, আজীবন উহার পরিচালন, এবং অবশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করিয়া ফেলা,—এই সমুদয় ব্যাপারের মূলীভূত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একটি সুমহৎ কার্য্য। এই সভা কুড়ি বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। কালের দৈর্ঘ্য হিসাবে ইহা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের বিশালতম কর্ম্ম না হইলেও, তৎকালীন বঙ্গসমাজের উপরে ফলাফল বিচার করিলে হয়তো বলিতে হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। বঙ্গসমাজে হিন্দু কলেজের প্রভাব এবং তাহার সুফল ও কুফল সম্বন্ধে আমি বিগত ১৩৪৫ সালের 'প্রবাসী'তে (বিশেষতঃ অগ্রহায়ণ সংখ্যার ২০৯-২১৩ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে হিন্দু কলেজের যুগের পরেই আসে তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ।

তত্ত্ববোধিনী সভার যুগের বহুমুখীন প্রভাবের সম্বন্ধে নানা দিক্ হইতে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলা ভাষার উপরে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাবের বিষয়ে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের তারিখ ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর। সভাটি দেশমধ্যে একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরই দেবেন্দ্রনাথ একটি মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করিতে থাকেন। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট) মাস হইতে ঐ পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম কয়েক সংখ্যার 'সম্পাদক' কে ছিলেন, তাহা এখন নিরূপণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এ কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানির জন্য এক জন ভাল সম্পাদক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন; কিন্তু তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনী সভার আফিসের কাজও করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার সৌষ্ঠব দেখিয়া তাঁহাকে মাসিক ৬০৲ বেতনে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের অনেকের রচনা পরীক্ষা করিয়া অক্ষয়কুমার দত্তকে মনোনীত করেন। অক্ষয়কুমারের সেই রচনাতে "জটাজুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা" ছিল, ইহা দেবেন্দ্রনাথের ভাল লাগে নাই। অক্ষয়কুমার এ সময়ে যেরূপ যুক্তিবাদী ও লোকহিতপ্রিয় মানুষ ছিলেন, তাহাতে আমাদের অনুমান হয় এই প্রবন্ধটি তাঁহার আরও অপরিণত বয়সের রচনা, অথবা তাহাতে কেবল রচনার খাতিরেই তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসামূলক বাক্যাবলী বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, যত দিন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের লেখনী ধারণের শক্তি ছিল, তত দিন তিনি স্বয়ং মনোমতভাবে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন না করিয়া

পত্রিকাতে কাহারও রচনা প্রকাশিত হইতে দিতেন না। সম্পাদক যিনিই থাকুন, প্রবন্ধ যিনিই লিখুন, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি প্রস্তাবের মত, ভাব ও ভাষা, সমুদয়ের উপরেই দেবেন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদকরূপে নির্ব্বাচনের বর্ণনাসূত্রে কেবল তাঁহার রচনাসৌষ্ঠবেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রধান গুণ ছিল, সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁহার বিপুল উৎসাহ ও আশ্চর্য্য অধিকার। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই গুণও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তিনি এজন্য তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের হাতে পড়িবার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর কেবল ধর্ম্মতত্ত্বে আবদ্ধ রহিল না; বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, জীবন-চরিত, পুরাবৃত্ত, দেশের প্রজাকুলের অবস্থা, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা, রাজনীতি, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের লেখনী-নিঃসৃত চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'চারুপাঠ' তিন ভাগ, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুই ভাগ, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', দুই খণ্ড, 'পদার্থ বিদ্যা', 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ এক যুগের বাঙ্গালী-সমাজে জ্ঞানালোক-বিস্তারের প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল, সে সমুদয়ই প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। তখন বঙ্গদেশে ঐ পত্রিকার ন্যায় য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের এত বড় প্রচারক আর কেহ ছিল না।[১]

এই সকল গম্ভীর বিষয় মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার তখন বাংলা ভাষায় ছিল না। অক্ষয়কুমার অনেক বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করেন। বাংলা ভাষার তৎকালে প্রচলিত রচনারীতিও এ কার্য্যের উপযুক্ত ছিল না। এই উভয় বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা বাংলা ভাষায় এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিলেন। হিন্দু কলেজের যে-সকল ছাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসাদিতেই মুগ্ধ ছিলেন, যাঁহারা বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক-পত্রিকাদি অবজ্ঞাভরে স্পর্শও করিতেন না, তাঁহারাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব বিষয় জানিবার জন্য এই পত্রিকার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইতেন। তৎকালে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের প্রধান নেতা ও সর্ব্বাপেক্ষা বাগ্মী ইংরেজী বক্তা রামগোপাল ঘোষ একখণ্ড এই পত্রিকা হাতে লইয়া মহা উৎসাহে রামতনু লাহিড়ীর নিকটে গেলেন, এবং বলিলেন, "রামতনু, রামতনু, বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ!"[২]

"বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা" দেখিয়া রামগোপাল ঘোষ এত বিস্মিত হইয়াছিলেন কেন? "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পুস্তকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,[৩]

"তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা যখন স্মরণ করি, তখন তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'রসরাজ' 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও, 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না।"

এই নব রুচি প্রবর্ত্তন ব্যতীত অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গভাষায় নূতন রচনারীতিও প্রবর্ত্তিত করেন। বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারেই ভাষায় নব নব রচনারীতি প্রবর্ত্তিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাতে জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, অথবা লঘু আমোদ-প্রমোদ-মূলক রচনার প্রয়োজন অনুভব করিতেন, তত দিন বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ পদ্যই লিখিত হইত। অক্ষয়কুমারের সময়েও পদ্য রচনার বাহুল্য ছিল[৪]।

যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে

বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইল, তখন লেখকগণের সম্মুখে কোনও আদর্শ ছিল না বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃত রচনার 'গৌড়ী রীতি' অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "সেই এক দিন আর এই এক দিন" নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—

"গৌড়ী ডম্বরবদ্ধা স্যাৎ,—আড়ম্বরযুক্তা সমাসবহুলা রচনা 'গৌড়ী'। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সংস্কৃত রচনাতে দীর্ঘসমাস ও অনুপ্রাসযুক্ত দেড়গজী বাক্য প্রয়োগ করা রোগ ছিল। বাঙ্গলা ভাষাতেও সে রোগ প্রথমে সংক্রামিত হইয়াছিল।···প্রথম প্রথম সমাসবহুল দুর্ব্বোধ লম্বা লম্বা বাক্যসকল লিখিত হইত। তৎকালে, (১) 'তাহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো-বনভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া···সুন্দরেন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখ মনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণীতটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমনপ্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন', (২) 'কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে', এইরূপ রচনারই সমধিক গৌরব হইত।"৬

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যরূপে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক; কিন্তু তাঁহার এই পুস্তকখানি রামমোহন রায়ের কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই লণ্ডনে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীরা বাংলা ভাষার কি স্বাদ পাইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ইংরেজ গ্রন্থকারগণ নিজেরাও বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পণ্ডিতী বাংলা পরিত্যাগ করিয়া ঘরোয়া বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদের রচিত পুস্তকগুলি অনেক স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট ও প্রয়োগরীতিবিরুদ্ধ হইলেও, মোটের উপর তাহা মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা অপেক্ষা সহজবোধ্য হইত। উত্তরকালে যাহা 'আলালী ভাষা' রূপে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সাহেবেরাই তাহা মুদ্রিত পুস্তকে প্রথম ব্যবহার করেন।

১৮০১ সালে সহজে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার সাহায্যের জন্য শ্রীরামপুরের মিশনরী সাহেবেরা কথোপ-কথন সংবলিত একখানি পুস্তক রচনা করেন; তাহার নাম "Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language." এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। তাহাতে আছে, এক জন সাহেব বাংলা ভাষা শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন:—

"বটে। তবে তুমি আমাকে প্রথম বাঙ্গালি কথা ও কার্য-কর্ম্মের লেখা পড়া শিক্ষা করাও। তুমি আজি অবধি আমার মুনসিগিরিতে প্রবর্ত্ত হইলা। তোমার মাহিনা কি হবে?

সাহেব, আমার মাহিনার বরাওর্দ্দ একটা ঠেকানা নাই। ত্রিশ টাকা চলন। তবে মনিবে মেহেরবানি করিয়া জেয়াদাও দেন।"

দুই জন গ্রামবাসী হাটে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে:—

"আইস হে, হাটে যাবা তো চল।

ওহে ভাই, আর চলে না। উপার্জ্জন কিছুই নাই। প্রতি হাটে কড়ি চাই, কোথা হইতে হবে। এই সম্প্রতি আজি তৈল নাই, লবণ নাই, চাউল নাই, কি করিব ভাবিছি পুঁজি আছে কেবল এক টাকা। চল তো যাই, না হয় দোকানে দেনিটেনি করে আনিব।

হাটে তোমার কি লীতে হবে। আমার ভাই চাউল টাউল যেন আছে, কেবল শাক মাচ তরি তরকারি আর বৌর জন্যে একখান সাড়ী কিনিতে হবে। এই সে দিন একখান কিনিয়া দিয়াছি, ইহার মধ্যে তা চিরে ফেলিল। আর যা হউক তা হউক কাপড়েই মোরে আঁধার দেখালে।"

রামমোহন রায় যখন ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাকে গম্ভীর বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বাদ-প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত বাংলা ভাষা গড়িয়া লইতে হইল। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষাই হউক, কিংবা উপরে উদ্ধৃত ঘরোয়া ভাষাই হউক, এই দুইয়ের কোনটিই রামমোহন রায়ের কার্য্যের উপযোগী ছিল না। তিনি নিজ প্রয়োজনের উপযোগী যে ভাষা উদ্ভাবন করিয়া লইলেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তক (১৮১৮ সালে মুদ্রিত "সহমরণ বিষয়, প্রবর্ত্তক ও

নিবর্ত্তকের সম্বাদ") হইতে[৭] এই কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"প্রবর্ত্তক।—তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ পুনঃ কহিতেছ যে নির্দ্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত্ত হই। এ অতি অযোগ্য, যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্ম্মের মূল হয়, এবং অতিথি সেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে।

নিবর্ত্তক।— অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, যথার্থ বটে। কিন্তু বালক কাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসির ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে, তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে। এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণ-কালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না; যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"

দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায়ের ভাষা তাঁহার অভিপ্রায়ের, অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা লোকমত গঠনের, বিশেষ উপযোগী। এ ভাষা সমাসবহুল নয়, সংস্কৃত-ঘেঁষা নয়; ইহা সরল ও অনাড়ম্বর। রচনারীতিতে এমন স্বচ্ছতা আছে যে সহজেই অর্থ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ ভাষাতে পদলালিত্য ফোটে নাই।

রামমোহন রায়ের কাল এবং অক্ষয়-দেবেন্দ্রের কাল, এই উভয় কালের ব্যবধান-সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাব কাল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের ন্যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতেন। তাঁহার রচনারীতিকে রামমোহন রায়ের অনুকরণ বলা চলে; কিন্তু তাঁহার লেখা সর্ব্বত্র রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রাঞ্জল হইত না। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত তাঁহার ব্যাখ্যান হইতে[৮] দুইটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

(১) "মনুষ্যজাতির এক অসাধারণ ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে যে, উত্তম ক্রিয়োৎপাদন করিলে ভূরি কাল বিশেষ প্রফুল্লতায় থাকেন। তদ্বিপরীতে অধম অযোগ্য ক্রিয়োৎপাদন করিলে বহুকাল ব্যাপিয়া মনস্তাপ করেন, কেহ বা উৎকট মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ক্রিয়ার উত্তমতা কিম্বা অধমতার পশ্চাৎ শোচনা মনুষ্যজাতীয়েতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়।" (চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান, ডিসেম্বর ১৮২৮)।

(২) [মনুষ্য] "কোন কাষ্ঠ বিশেষকে জলে ভাসিতে দেখিয়া অনুমান করে যে, এই প্রকার কাষ্ঠবিশেষ জলে ডুবে না। পরে প্রত্যক্ষসিদ্ধ যখন হয় যে, ব্যক্তির ভার অপেক্ষা করিয়া কাষ্ঠের ভার অল্প হইলে ব্যক্তির সহিত কাষ্ঠ ডুবে, কিন্তু কাষ্ঠের ভার অতিশয় ন্যূন হইলে ডুবে না, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনুমানাধীন নিশ্চয় করিয়া নৌকাদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়।" (নবম ব্যাখ্যান, ২৫ অক্টোবর, ১৮২৮)।

দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি ঈষৎ অধিক প্রাঞ্জল। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ভাষা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা, এবং তাঁহার শব্দচয়ন রামমোহন রায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্মুখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ন্যায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না; সাহিত্যের দ্বারা চিত্ত-বিনোদন মাত্র তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এজন্য তিনি 'গৌড়ী রীতি'কেই আদর্শ করিলেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার দোষগুলি এড়াইতে পারিলেন না; বরং তৎকালীন বাংলা পদ্যের একটি দোষ, অর্থাৎ অনুপ্রাসের ঘটা, গৌড়ী রীতির দোষগুলির সহিত যুক্ত করিলেন। তাঁহার গদ্য হইতেও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে :—

(১) "তুমি এই কালে নব নব নয়নবল্লভ-পল্লবমঞ্জরীমণ্ডল মণ্ডিত নব নব সুচারুসুন্দর সুরভিফুল্লফুলদলসুশোভিত মৃদু মৃদু মলয়ানিলসেবিত মধুপান মত্ত-মধুকরনিকর-গুঞ্জিত কোকিল-কুলকলকূজিত কমনীয় কুঞ্জকাননে···বিহারসুখে সুখী হইতে ইচ্ছা কর।"

(২) "জগতের শোভা দর্শন কর,—কি বিনোদব্যাপারব্যূহ বিলোকিত হইতেছে। কিন্তু এই অদ্ভুত ভূতের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ভূতে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না। যিনি সকল ভূতের কর্ত্তা, ভূতাতীত ভূতনাথ, তাঁহারই ভাবে অভিভূত হও। রত্নাকর সমুদ্রে এবং এই রত্নময়ী বসুধাগর্ভে যে সকল রত্নরাজি রাজিত আছে, তৎসমুদয় একত্র করিয়া সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমাত্র যথার্থ সুখের সঞ্চার হইতে পারে না।

এই দুইটি স্থান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (সম্ভবতঃ ১৮৫০ সালে রচিত) 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক পুস্তক হইতে

গৃহীত।[৯] এ দুটিতে তাঁহার এমন যে চমৎকার পদলালিত্য, তাহাও সমাসের ও অনুপ্রাসের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকাতে বর্ত্তমান যুগের পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে না। পাঠক এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির সহিত ক্ষণকাল পরে উদ্ধৃত অক্ষয়কুমার দত্তের বাক্যাবলীর তুলনা করিয়া দেখুন। উভয়ের বিষয় এক,—সৃষ্টিতে স্রষ্টার মহিমা দর্শন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাটির অনুপ্রাসঝঙ্কার পাঠকের মনকে বিরক্ত করিয়া তোলে; অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাটি হৃদয়কে ভক্তিরসে পূর্ণ করে।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৯ সালেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন এবং তখন হইতেই অক্ষয়-দেবেন্দ্রের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ১৮৫০ সালের ঐ রচনাটিতে এই সাহচর্য্যের ফলের কোনও চিহ্নই নাই। সাহিত্য হিসাবে তিনি রামমোহন-রামচন্দ্র-দেবেন্দ্র-অক্ষয়ের রাজ্যে বাস করিতেন না; তিনি স্বতন্ত্র এক রাজ্যে বাস করিতেন, সেখানে মৃত্যুঞ্জয়ের ও শব্দঝঙ্কারপ্রিয় লেখকদের বাক্যই আদৃত হইত। সংক্ষেপে বলা যায়, রামমোহন-রামচন্দ্র-দেবেন্দ্র-অক্ষয়ের নিকটে বাক্যের অর্থই প্রধান ছিল; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকটে বাক্যের ধ্বনিই প্রধান ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও অক্ষয়কুমারের ভাষা, উভয়ই রামমোহন-রামচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা প্রাঞ্জল ও লালিত্যময়। উভয়ই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরসে স্নিগ্ধ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের শব্দচয়ন অপেক্ষাকৃত সরল; অক্ষয়কুমারের ভাষা একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা। নিম্নে উভয়ের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে :—

[দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৪৩] "আমাদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে যিনি নানাবিধ সুখের উপযোগী সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইবেক, এ নিমিত্ত তিনি মাতার মনে সুখজনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায়, তাহার প্রতি স্নেহ করা দূরে থাকুক, তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎপ্রতিফল ততোধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মাতার মনের ভাব এ স্থানে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। দশ মাস পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা সমূহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন, এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন জীবনের আশা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা দেওয়া দূরে থাকুক, মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার পীড়া হয়, এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ শরীর হয়। সুতরাং সেই বালক অতি পরিপাটী রূপে রক্ষিত হয়।"[১০]

[অক্ষয়কুমার, ১৮৫১] "হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্বরূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে! সকলেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। সকলেই তাঁহার যশঃ প্রচার করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশিরসিক্ত সরস তরুশাখাসকল উষাকালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া শর শর শব্দ করত তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছে। উদ্যানবিহারী বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমাগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে মনের সুখে তাঁহারই গুণগান করিতেছে। বন ও উপবন সকল তাঁহারই সূর্য্যদ্বারা বর্দ্ধিত, তাঁহারই মেঘাম্বু দ্বারা পালিত, এবং তাঁহারই তুলিকা দ্বারা চিত্রিত বর্ণে চিত্রিত হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুচ্ছায় সুললিত লতাকুঞ্জ বিহঙ্গকূজিত ও ভ্রমরগুঞ্জিত হইয়া তাঁহারই সৌরভ বিস্তার করিতেছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতস্থিত উন্নত বৃক্ষশাখাসকল বায়ুবেগে অবনত হইয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত করিতেছে। মনোহর মাধবিকা লতা অশ্বত্থবটাদি বৃক্ষ আরোহণ ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহার শাখাবলম্বিত কম্পিত কুসুমগুচ্ছের সৌগন্ধ প্রচার দ্বারা তাঁহাকেই গন্ধ দান করিতেছে; এবং তাঁহার করুণা বুঝি মূর্ত্তিমতী হইয়া যূথী জাতী মল্লিকা নবমল্লিকা গোলাব ও গন্ধরাজ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই যশঃসৌরভে জগৎ আমোদিত করিতেছে। গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, ভূধরস্থিত ভয়ানক জলপ্রপাত, এবং পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট বিস্তৃত সমুদ্র, সকলেই নিজ নিজ নাদ নিঃসারণ পূর্ব্বক তাঁহারই ধন্যবাদ করিতেছে।...আমাদের প্রিয়তম পরম পিতার মহিমা-চন্দ্রমার অমৃতরসে জগৎ কিরূপ প্লাবিত হইয়াছে! তাঁহার সুকোমল করুণাকমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে! তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে!"[১১]

অক্ষয়কুমারের এই উদ্ধৃত বাক্যগুলির ভাষা কেমন মধুর, কেমন প্রাঞ্জল, অথচ কেমন গাঢ়! যতগুলি গুণের

দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠকগণের মনোহরণ করিত, এই ভাষার গুণও তন্মধ্যে অন্যতম।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত যেরূপ একাগ্র পরিশ্রম ও যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয়-মন উন্নত হয়। অক্ষয়কুমারের গুণমুগ্ধ লোকেরা তাঁহাকে বহুবার অধিক বেতনে অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারের দ্বারা স্বদেশবাসীর সেবা করা অক্ষয়কুমার জীবনের ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল; তিনি ঐ সমুদয় কর্ম্মের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার পরিচর্য্যা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি কিছু কাল মেডিক্যাল কলেজে গিয়া অতিরিক্ত ছাত্ররূপে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ববিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তৎকালে তত্ত্ববোধিনী সভা সংসৃষ্ট লোকদিগের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। বঙ্গভাষার রচনাদর্শ সম্বন্ধে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ লিখিবার সময় ভাষাগত সংশয় উপস্থিত হইলে অক্ষয়-কুমারের নিকট হইতে তাহার মীমাংসা করিয়া লইতেন। তদুপরি পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চার সহিত নম্রতা সৌজন্য ও পরোপকারবৃত্তি মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে সর্ব্বজনপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাষায় ভাবে বিষয়গৌরবে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের চিত্তক্ষেত্র জয় করিয়া লইল। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের ছাত্র হওয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল, এখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হওয়া ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করা পরম গৌরবের বিষয় হইল। পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা ৭০০ পর্য্যন্ত উঠিল। যে-ব্রাহ্মসমাজকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে এখন সকলে 'তত্ত্ববোধিনী সভার দল' বলিয়া চিনিতে লাগিল।

মন্তব্য

(১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ১৮৫১ সালে আরব্ধ হয়।

(২) শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', ৩য় সংস্করণ ২০০ পৃঃ।

(৩) ঐ ১৯৯ ও ২০০পৃঃ।

(৪) দর্জ্জিটোলায় নবনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে একটি 'বাঙ্গলা ভাষানুশীলনী সভা' ছিল। সেই সভায় প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় ও ক্রমে বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। তখনও বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে হইলে সাধারণতঃ পদ্যেই তাহা লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল; তদনুসারে অক্ষয়কুমারও মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনা করিতেন। একবার প্রভাকর পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক পীড়িত হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুরোধ করেন যে পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজী প্রবন্ধ যেন অক্ষয়কুমার বাংলাতে অনুবাদ করিয়া দেন। প্রথমতঃ অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, "আমি তো কখনও গদ্য লিখি নাই; আমি কি পারিব?" কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখাটি এত ভাল হইল যে, তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বাংলা গদ্যে নানা প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত করেন।—মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত ৪০, ৪১ পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত।

(৫) কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্র, ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

(৬) উক্ত পুস্তকের ২৬ পৃঃ।

(৭) রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি", ১৭৯৫ শক; ১৭৫, ১৭৬ পৃঃ।

(৮) ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত, ঈশান চন্দ্র বসু সম্পাদিত, ১৮৯৭; ৮৬ ও ৫৪ পৃঃ।

(৯) R. C. Dutt, Literature of Bengal, pp. 158, 159.

(১০) শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত, ৭২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

(১১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত, ২০০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

শিল্পী ভবেশচন্দ্র

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ., পিএইচ. ডি.

ভারতীয় শিল্পের নূতন উদ্যোগে আমরা রবিবর্ম্মার ভয় হ'তে অজন্তার ভয় পর্য্যন্ত এগিয়েছি—এর মধ্যে রুচির সচেতনতার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শিল্পের চরম অধোগতির কালে রবিবর্ম্মা নিকৃষ্ট বিলিতী চিত্রের

নিরাশা — ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

অনুকরণে মাংসবহুলতাকে রঙীন তৈলে ভঙ্গীতে উৎকট ক'রে তুলেছিলেন; তখনকার নকলনবীশ সম্প্রদায় বাহবা দিতে ত্রুটি করেন নি। আজকের দিনে ভাল সাবানের বাক্সে বা তেলের বিজ্ঞাপনেও সে ছবি চলবে না। হাওয়া ফিরল মধ্য যুগ প্রাচীন যুগের দিকে; অবনীন্দ্রনাথ আন্‌লেন ভারত-উৎকর্ষের জীবনীধারাকে, চিরন্তনকে নূতন পটে ফুটিয়ে তুললেন। সস্তা থিয়েটারি ছবি আমাদের চক্ষে বিভীষিকা হয়ে উঠল; পানের দোকানে, বনেদি ব্যবসায়ী, জমিদারের ঘরে বা অধম মাসিক পত্রের পাতায় তার ভূত বিতাড়িত হ'ল।

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রতিভাবান শিল্প-সহযোগীরা সমস্ত ভারতের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন; দেশী বিদেশী নানা প্রভাবকে কারুসাধনার অন্তর্গত ক'রে নিতে বাধা রইল না। তবু মোটের উপর আঙ্গিকের বিশিষ্ট ছাঁচ সর্ব্বত্র রয়ে গেল। অজন্তার রেখাভঙ্গী শিল্পপ্রসাধনে অনেকখানি জায়গা নিয়েছে। লালিত্যের সুলভ সংস্করণ আজ প্রাচীন গুহাচিত্রের আঙুল, চোখ, দাঁড়াবার ঠাটকে আশ্রয় ক'রে প্রাচীনের সহজ মর্য্যাদাকে নষ্ট করেছে। ধূপের ধোঁয়া পর্য্যন্ত বঙ্কিম গ্রীবার বিশিষ্ট বাঁকা রেখায় বাঁধা; গরিব চাষী ময়ূরপঙ্খী নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে অত্যধিক ভাবালু চোখে ত্রিভঙ্গ হয়ে ছবিতে দেখা দিচ্ছে। আশ্চর্য্য নয় যে, রূপকারের চোখে আজ ভয় দেখা দিয়েছে; জোর

অবগুণ্ঠিতা — ক্রেয়ন্ ড্রয়িং

অসমাপ্ত গান

মূর্ত্তিতে কল্পনার ঋজুতা প্রবলতা উপভোগ্য। "অসমাপ্ত গান" পুরনো ছাঁদে অথচ ভঙ্গিমায় দাসত্ব নেই।

এখন পালা আসছে আধুনিকতার কুৎসিত-পূজাকে ভয় করবার। অজন্তার বিরুদ্ধে সচেষ্ট অভিযানের এই পর্য্যায়কে সুস্থ মনে মানা চলে না। এর মূল্য শিল্পে নয়, ইতিহাসে। য়ুরোপে যুদ্ধের নানান্ বিভীষিকার মধ্যে আর্টের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধও কম নয়; রাতারাতি সেখানে অদ্ভুত, স্বপ্নভূত, কাপালিক কাঙ্কালিকের দল আকৃতি এবং রেখার আক্রমণে দেখা দিচ্ছেন আবার সহসা জর্জ্জরিত কল্পনার অঙ্গনে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। অনুকরণবিলাসী ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্য অসঙ্গতির পূজায় রুচি এবং শিল্পবোধকে বলি দিতে উদ্যত। অথচ য়ুরোপীয় সাহিত্য-শিল্প আজ যেখানে বীর্য্যবান, সেই তার জীবনের স্বীকৃতিকে আমরা সব সময়ে দেখতে পাই না—তার মধ্যে নিশাচরবৃত্তি নেই, দিনের

ক'রে কুৎসিতকে পূজা করার দ্বারা অজন্তার সৌখীন ভূত তাড়ানোর ইচ্ছা জাগল। শিল্পরসিক জনসাধারণের পক্ষে এটা মস্ত পরীক্ষার যুগ।

প্রাচীন ছাঁদকে সস্তা করবার দায়িত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পগোষ্ঠীর উপর চাপানো চলবে না। সাধনার অনিবার্য্য বেগে তাঁরা বিলিতী নকলের মোহ ভেঙেছিলেন, তাঁদেরই অনেকে আজ প্রাচীন ভারতীয়তার মোহকে ভেঙে শিল্পকে জাগ্রত জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের জীবন-সত্যে শিল্পী সাড়া দিয়েছেন; কংগ্রেস অলঙ্করণের কাজে নন্দলালকে আহ্বান এবং তাঁর জাগ্রত তুলির উত্তর ভারত-শিল্পের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা ব'লে মনে করি।

শিল্পী ভবেশচন্দ্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি কোনো ভয়ের তাড়নায় অতিচেতন হয়ে ওঠেন নি। কষ্টকল্পনার পথ তাঁর নয়; সহজ প্রতিভায় তিনি বহু দেশের বিচিত্র পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আপন সৃষ্টির কাজ ফলিয়ে তুলছেন। তাঁর ছবিতে, পাথরের মূর্ত্তি রচনায়, গালা-লোহা-কাঠের কাজে তাই শিল্পের প্রাণীন পদার্থ আছে যা মনকে চোখকে তৃপ্তি দেয়, বাঁচিয়ে রাখে। দেশী বিদেশী ভূতের দৌরাত্ম্য নেই, না আছে ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট আধুনিকতার পরিচয় তাঁর শিল্পে। "নিরাশা" নামক ব্রোঞ্জের

ভীত ও চকিত লোহার কাজ

ধর্ম্ম আছে। মানুষের জীবন্ত সমাজকে ছবিতে কবিতায় স্পষ্ট ক'রে পাওয়ার প্রতিভা সহজাত শক্তির কঠিন সাধনায় লাভ করা যায়। এর পিছনে অনেকখানি অভিজ্ঞতা চাই, জীবনের এবং আঙ্গিক-চর্চ্চার। তাছাড়া বিশেষ একটি দৃষ্টির প্রয়োজন যেটাকে নববিজ্ঞানবোধের আধ্যাত্মিকতা বলা যেতে পারে। সত্যকে সর্ব্বদিকে স্বীকার করবার সাহস, তারই জয়ঘোষণায় সুন্দরকে কুৎসিতকে জীবনের যোগে মিলিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেখা এবং দেখানোর শক্তিতেই যথার্থ আধুনিকতার প্রকাশ। আমার বিশ্বাস ভবেশবাবুর নূতন রেখা-ছবিগুলিতে এই আধুনিকতা দেখা দিচ্ছে। সে-ছবিগুলিতে শিল্পীর প্রাণদৃষ্টির পরিচয় মনকে নাড়া দেয়। ভবেশচন্দ্র নানা প্রদর্শনীতে সম্মান এবং পুরস্কার পেয়েছেন; মনে হচ্ছে তাঁর সামনে নূতন কৃতিত্বের আয়তন উন্মুক্ত হ'তে চলেছে।

দার্জ্জিলিঙের পার্ব্বত্য জাতি

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম. এস্‌সি., বি. এল.

দার্জ্জিলিং সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ব'লে সিকিমের আদিম জাতি লেপ্‌চারা এই জেলায় বহু সংখ্যায় বাস ক'রে আসছে। কিন্তু নেপালের খুব নিকটে অবস্থিত ব'লে দার্জ্জিলিং শহরে জনসংখ্যার শতকরা ৫০জন নেপালী, স্থায়ী-অস্থায়ী সকল রকম জাতি-উপজাতির মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক লোক নেপাল থেকে এসে এই শহরে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। যে কয়টা পাহাড়ী জাতি-উপজাতি এখানে বাস করে তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল, বুদ্ধিমান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত এই নেপালীরা। ইংরেজরা যখন এই স্থানটিকে গ্রীষ্মাবাস এবং শেষ পর্য্যন্ত বাংলা-সরকারের অস্থায়ী রাজধানী রূপে গড়ে তুলছিল, সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবিকার আকর্ষণে ঘুম-এর পথ দিয়ে এইখানে নেপাল থেকে লোক আসতে লাগল। আদি বাসিন্দা লেপ্‌চা এবং ভুটিয়ারা তেমন সুসভ্য ও সুচতুর ছিল না, তাই সহজেই নেপালীরা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সাহেব এবং বাঙালীবাবুদের কাছে সর্ব্ববিধ কর্ম্মে নিয়োগ লাভ করে। আজ শত বৎসরে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০। তাও নেপাল-সরকার মাঝে এই নিষ্ক্রমণ বন্ধ করবার জন্য মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসা বন্ধ ক'রে দেন, নইলে এদের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যেত।

নেপালী স্ত্রীলোকেরা বর্ত্তমানে ভুটিয়া স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে সাধারণ ভ্রমণকারীরা সহসা এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন না। এই
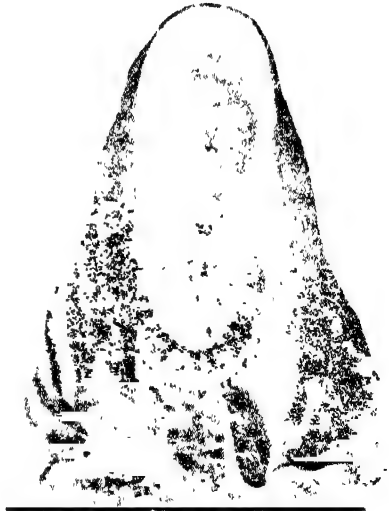
দার্জ্জিলিংবাসী নেপালী রমণী

পাহাড়ী মেয়েরা দেহগঠন ও সৌন্দর্য্যে অনেকটা খাসিয়া মেয়েদের মত যদিও রঙের ঔজ্জ্বল্য কিছু কম। নেপালের

তিব্বতী-ভুটিয়া রমণী

সম্রান্ত সমাজের মেয়েরা সংখ্যায় এখানে খুব কম, হিন্দু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বংশীয় কয়েক ঘর আছেন, তাঁরা বেশীর ভাগ স্বামী বা গৃহকর্ত্তার ব্যবসা বা বড় চাকুরির খাঁতিরে থাকেন। সাধারণ ভাবে নেপালীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—গুর্খা, নেওয়ার এবং লিম্বু। কেবলমাত্র দার্জ্জিলিং জেলায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার নেওয়ার এবং প্রায় আটাশ হাজার (সিকিম সমেত) লিম্বু বাস করে (১৯৩১)।

নেপালের সকলেই হিন্দু, সেজন্য বর্ণবিভাগের অস্তিত্ব ও দ্বন্দ্ব কম নয়। সকল শ্রেণীর লোকই দার্জ্জিলিঙে আছে; তবে গুর্খাদের সংখ্যা সিপাহী সৈন্যদের মধ্যে ভিন্ন বেশী দেখা যায় না। তাও উচ্চশ্রেণীর চেয়ে ঠাকুর খাস, মাগর, মুম্মি, গুরুম্ প্রভৃতির লোকই গুর্খা-রেজিমেণ্টে বেশী যোগদান করে। শিল্পকার্য্যে, কৃষিবিদ্যায়, গৃহনির্ম্মাণে নেওয়ার জাতির লোকই বেশী ওস্তাদ। নেপালের মাঝখানটাতে এই নেওয়ার জাতির বাস—ওরা বলে ওরা নেপালের আদি বাসিন্দা। রাজমিস্ত্রী ও ছুতারের কাজ ভাল পারে ব'লে দার্জ্জিলিং শহরের বেশীর ভাগ বাড়ীঘরদোর, আসবাবপত্র নেওয়ার জাতির লোকই ক'রে থাকে। লিম্বু ও লেপ্চারা এবং ভুটিয়ারা এদেরই কাছ থেকেই চাষবাস করতে শিখেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে বৌদ্ধমিশ্রণ ঘটার ফলে হিন্দু-দেবতা, শিবের সঙ্গে বুদ্ধদেবকেও নেওয়ারগণ পূজা ক'রে থাকে।

লিম্বুরা দার্জ্জিলিঙে সংখ্যায় প্রায় বিশ হাজার হবে, যদিও এরা লেপ্চাদের সঙ্গে এক রকম মিশে গেছে। তার প্রধান কারণ অশিক্ষা এবং আর্থিক অবনতি। কিন্তু লেপ্চাদের মত লিম্বুরা মোটেই সরল, আনন্দপ্রিয় এবং ধীরপ্রকৃতি নয়। ওরা অপেক্ষাকৃত যুদ্ধপ্রিয় এবং হিংস্র। গুর্খা-সৈন্যদলে বহু লিম্বু আছে। নেপালীদের উচ্চশ্রেণী বা নেওয়ারদের মধ্যে মঙ্গোলীয় মুখাবয়ব ও দেহাকৃতিতে হিন্দু-ছাপ বর্ত্তমান, কিন্তু লিম্বুদের মধ্যে মঙ্গোল-ছাপ বর্ত্তমান, রং পীতাভ, ক্ষুদ্র চক্ষু বক্ররেখায় অধিষ্ঠিত।

ভুটিয়া বলতে পাহাড়ীদেরই বোঝায় (যদিও ভুটান বা ভুটানী শব্দ থেকে ভুটিয়া শব্দের উৎপত্তি), কারণ ভুটিয়া পার্ব্বত্য জাতির বাস শুধু ভুটানে নয়, তিব্বতে এবং সিকিমেও। শুধু ভুটিয়া বলতে আমরা সিকিম বা দার্জ্জিলিঙের আদি ভুটিয়াদের বুঝি। ভুটানী-ভুটিয়াদের ভুটানী বললেই চলবে কিন্তু তিব্বতী-ভুটিয়াদের উপজাতিত্ব বজায় রাখতে হ'লে পুরো নামে পরিচয় দিতে হবে সাধারণ তিব্বতীদের সঙ্গে পার্থক্য রেখে।

মোট ভুটিয়াদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ২৭,২৪৭ জন, ১৯৩১ সালে ২৯,৫০৪ এবং বর্ত্তমানে বোধ করি ৩১ হাজার হবে। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সর্ব্বসমেত প্রায় পনর-ষোল হাজার ভুটিয়া আছে (১৯৩১)। দার্জ্জিলিং শহরে মোট পাঁচ-ছয় হাজার ভুটিয়া বাস করে। আশেপাশে ভুটিয়া-বস্তি অনেক আছে—এরা সকলেই প্রায় সিকিমী-ভুটিয়া বা ধর্ম্মা-ভুটিয়া। দ্রাকপা-ভুটিয়া বা ভুটানীরা সংখ্যায় কম। তিব্বতী-ভুটিয়ারা স্থায়ী ভাবে বাস করে না—প্রতিবৎসর যথাসময়ে বাজার-হাটে বেচাকেনা করতে আসে। সিকিমের ভুটিয়া জাতি, যাদের আমরা মাত্র ভুটিয়া ব'লে জানি তাদের স্থানীয় নাম লোহপা-ভোটিয়া। শার্পা-

দার্জ্জিলিংবাসী তিব্বতী রমণী

ভূটিয়া বা খাস ভূটিয়া সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে—কেউ বলেন, এরা নেপালের বাসিন্দা, আবার কেহ বলেন এরা তিব্বতী-ভূটিয়া ও লেপ্‌চাদের মধ্যে মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত নূতন জাতি। এই দুটি ভূটিয়া শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এত অল্প যে সহসা সেটা ধরা যায় না। দুই জাতিই একই ভূটিয়া ভাষা ব্যবহার করে যদিও স্থানীয় সাধারণ ভাষা নেপালী এরা দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার ক'রে থাকে।

ভূটিয়া স্ত্রীপুরুষের চওড়া মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু, উন্নত হনুদেশ, মধ্যমাকৃতি (mesocephalic) মাথা এবং অল্প গুম্ফকেশ। ভূটিয়া মেয়েদের দেহ সুন্দর এবং এরা সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা ফরসা এবং সুগঠিত সুন্দর দেহের অধিকারী। কানে, নাকে, গলায়, হাতে পায়ে সোনা-রূপার গহনা এবং বিচিত্র বর্ণের জামা, ঘাঘরা, ওড়না প্রভৃতি মেয়েরা ব্যবহার করে। কিন্তু ভূটিয়া পুরুষ একটি আজানুলম্বিত ঢিলে চাপকান-ধরণের একরঙা কিমোনো ব্যবহার করে, কোমরে একটি কুকরী গোঁজা। ভূটিয়া পুরুষদের অবস্থা লেপ্‌চাদের মত অনুন্নত নয়—বরং তারা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমী এবং তন্তুশিল্পে কিঞ্চিৎ উন্নত।*

* *Pearson's Notes on Darjeeling, 1839.*

নেপালের মত ভূটানও দার্জ্জিলিঙের পাশেই, সেজন্য ভূটান থেকেও জীবিকার্জ্জন করতে ভূটিয়ারা এখানে বড় কম আসে নি। তবে নেপালীদের তুলনায় ভূটানীরা সংখ্যায় অনেক কম। এরা সাধারণতঃ ধর্ম্মা-ভূটিয়া ব'লে পরিচিত। কুলিগিরি থেকে আরম্ভ ক'রে সব রকম কাজই এরা করে থাকে। ভূটানীরা সংখ্যায় কালিম্পঙেই বেশী, কারণ এই শহরটি ভূটানের নিকটে।

তিব্বতী ভূটিয়া মেয়ে-পুরুষরা বারো মাস দার্জ্জিলিঙে থাকে না। প্রতি বৎসর যে-সময় লোকজনের ভিড় বাড়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মরসুম পড়ে তখন এরা দলে দলে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আসে তিব্বত থেকে। এরা খুব শক্তিশালী এবং সহনশীল সুগঠিতদেহ জাতি—শীতের আধিক্যও যেমন সহ্য করতে পারে মে মাসের গরমও তেমনি সহ্য করতে পারে। ভূটিয়াদের মধ্যে এরাই সর্ব্বাপেক্ষা

ধর্ম্মা-ভূটিয়া বা ভূটানী রমণী

সুশ্রী যদিও স্নানাভাবে দেহলাবণ্য ফুটে উঠতে পারে না। এদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, বেশভূষা, ধর্ম্ম-সমাজ-ব্যবস্থা সবই প্রায় তিব্বতীদের মত, তবে পরিশ্রমাধিক্যে মুখাবয়ব কঠিন ও রুক্ষ—ময়লা ময়লা চওড়া মুখ। কিন্তু তিব্বতের

তিব্বতী-লেপ্‌চা পরিবার

অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরনারী উভয়ের দেহেই একটা কমনীয়তা বর্ত্তমান। দেহের রংও ফরসা বা উজ্জ্বল পীতাভ। তিব্বতী-ভুটিয়াদের দেহবর্ণ বাদামী, গণ্ডদেশ অবশ্য রক্তাভ।

ভুটিয়ারা সকলেই বৌদ্ধ। দার্জ্জিলিঙের আশেপাশে ভুটিয়া বস্তিগুলিতে এবং মহাকাল প্রভৃতি দেবস্থানে এদের বৌদ্ধধর্ম্মাচার পরিলক্ষিত হয়।

তিব্বত-ভারতবর্ষের আনাগোনার পথ সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের মধ্য দিয়ে, সেজন্য বাণিজ্যের খাতিরে আগত তিব্বতের লোকও কিছু কিছু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এরা খাঁটি মঙ্গোলীয় জাতি—দেহের ও মাথার আকার মাঝামাঝি, চক্ষে epicanthic fold—তলার পল্লবে ভাঁজ এদের মধ্যেই বেশী স্পষ্ট—চওড়া মুখ, চাপা নাক, তিব্বতী দেহের সকল বৈশিষ্ট্যের এরা অধিকারী। তিব্বতের মেয়েরা অলঙ্কার পরতে এবং বেশবিন্যাস করতে খুব ভালবাসে। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত ছবিগুলিতে তার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। তিব্বতে নানা রকম সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়, তিব্বতী মেয়েরা সেগুলির প্রস্তুত ক'রে পরে।

তিব্বতী ভুটিয়াদের সাধারণ ভুটিয়া লেপ্‌চা বা নেপালীদের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়:—প্রথমতঃ, এরা একটু কঠিন ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি দেহের অধিকারী। জামাকাপড় অপরিচ্ছন্ন, তামাকুপানের বিশেষ ভক্ত। মেয়েপুরুষ সকলেই আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরে। তিব্বতী ভুটিয়াদের মেয়েরা নেপালী মেয়েদের মত নাকে মাথায় কোন গহনা প্রায় পরে না। তিব্বতী মেয়েরা ভেলভেট্‌ ও সিল্কের ভাল ভাল জামা পরে, শীতনিবারণের জন্য পশমের জামা তো পরেই। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা নানা রকম মণিমুক্তা এবং স্বর্ণালঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। তবে নেপালী অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা মণিমুক্তা, অ্যাম্বার, গোল্ডষ্টোনের চেয়ে সোনারূপার গহনাই বেশী ব্যবহার ক'রে থাকে দেখেছি।

দার্জ্জিলিঙের অনুন্নত আদিম জাতি লেপ্‌চাদের অবস্থা ক্রমশই দরিদ্রতর হয়ে আসছে। এই জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদের মধ্যে অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পেরেছে। বাকী লেপ্‌চারা খাঁটি বৌদ্ধ না হ'লেও বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত ও বৌদ্ধভাবে প্রভাবান্বিত। তার কারণ লেপ্‌চাদের মধ্যে লামাদের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার। দার্জ্জিলিং ও সিকিমের মোট লেপ্‌চাদের সংখ্যা আগামী লোকগণনায় প্রায় ত্রিশ হাজার হবে মনে হয়। ১৯৩১ সালের গণনায় এদের সংখ্যা ছিল ২৫,১৬১, ১৯২১ সালে ছিল ১৮,৬৯০। নেপালী এবং ভুটিয়াদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আদিম লেপ্‌চা জাতি জীবন-সংগ্রামে হটে যাচ্ছে—কি মেয়ে কি পুরুষ কুলিগিরি করা ছাড়া উপায় নেই।

লেপ্‌চারা দেখতে ভুটিয়াদের চেয়ে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট। অন্যান্য পাহাড়ীদের তুলনায় এরা দেহগঠনে হ্রস্বাকৃতি, গড়ে পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। মেয়েরাও বেঁটে ধরণের। এই জাতির সঙ্গে তিব্বতী এবং ভুটিয়াদের মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে দার্জ্জিলিঙে এদের মৌলিক আচার-ব্যবহার বড় দেখতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে এদের বেশীর ভাগ লোক থাকে সিকিমে যদিও চা-বাগানের কুলিরা বেশীর ভাগ লেপ্‌চা।

লেপ্‌চারা আদিম জাতি হ'লেও এদের লিখিত ভাষা

আছে, যদিও তাতে তিব্বতী শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এজন্য ওরা বলে ওদের আদি নিবাস তিব্বতে। কিন্তু ওরা খাঁটি বৌদ্ধ ছিল না তিব্বতীদের মত। সিকিমই এদের দেশ—দার্জ্জিলিং-অংশ ব্রিটিশ রাজ্যসীমানায় চলে আসাতে লেপ্‌চারা উপর দিকে সিকিমে বেশী চ'লে গেছে।

পাহাড়ীরা নেপাল ও ভূটানের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড সিকিমকে লোহপ ব'লে থাকে; সেই থেকে আদিম বাসিন্দাদের নাম লোহপচু, যেটা বর্ত্তমানে লেপ্‌চা শব্দে দাঁড়িয়েছে। নেপালীরা এদের লেপ্‌চা নামে পরিচয় দেওয়াতে আমাদের নিকট ওরা এই নামেই পরিচিত হয়ে আসছে যদিও ওরা নিজেদের ভাষায় রোংপা ব'লে অভিহিত। রোং=নদী, পা=লোক, অর্থাৎ নদীতীরের অধিবাসী। সম্ভবতঃ রঙ্গীত নদীর দেশের লোক বলে ওরা রোংপা নামে নিজেদের মধ্যে পরিচিত। তিব্বতের লোকেরা ওদের বলে মোন্‌বা (নিম্ন-হিমালয়ের লোক)।

এই সকল পার্ব্বত্য জাতি বাদে দার্জ্জিলিং জেলায় টেরাই অঞ্চলে কয়েকটি আদিম জাতি বাস করে, যেমন, আকা, ধিমল, মেচ্চি, উরাভা। চা-বাগানের কুলির চাহিদার ফলে এদের কেউ কেউ বড় জোর তিনদরিয়া পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে; এরা হিমালয়ের পাদদেশেই থাকতে অভ্যস্ত। নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্‌চা এবং তিব্বতী এই চারটি পার্ব্বত্য জাতি দার্জ্জিলিঙে বাস করলেও, দার্জ্জিলিং বাংলা-সরকারের গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্র হওয়াতে সমগ্র লোক-সংখ্যার পঞ্চমাংশ বাঙালী এবং বাঙালীদের সঙ্গে এই পাহাড়ী জাতিদের যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। এদের অনেকেই বেশ পরিষ্কার বাংলা কথা বলতে পারে। হিন্দী এবং নেপালী এই দুটি ভাষা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত।

শনিবারের বৈকালে

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

শনিবার; দুটার সময় ছুটি, আড়াইটায় ট্রেন, সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী—ব্যস্‌!

শরতের মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল আনন্দে। গৃহে নববধূ হয়ত তখন শঙ্খধ্বনি করিতেছে, উঠানে মা হয়ত তখন প্রণাম করিতেছেন তুলসীতলায়—শরৎ বাড়ীতে গিয়া পৌছিবে। কেহ ভাবেও নাই যে আজই যাইবে সে! বধূর তো আনন্দ কল্পনাতীত হইয়া উঠিবে—লুকাইয়া দেখিবে শরৎ কতখানি মোটা হইয়াছে।

হাঁ, মোটা সে একটু হইয়াছে, কিন্তু মা কিংবা বৌ কেহই ইহা স্বীকার করিবে না—শরৎ তাহা বেশ জানে। স্বীকার তাহারা মুখে না করুক, মনে মনে নিশ্চয়ই খুশী হইবে শরতের স্বাস্থ্য দেখিয়া।

আর কতক্ষণ! একটা তো বাজিয়া গেল। ঘণ্টা চার পরেই বাড়ী—আঃ

শরৎ একটা ভাল ক্যামেরা কিনিয়াছে, ফটো তুলিতেও শিখিয়াছে মন্দ নয়। এবার আর শৈলকে বাহিরের ফটোগ্রাফারের সম্মুখে সসঙ্কোচে দাঁড়াইতে হইবে না। বসতবাড়ীর পাশেই যে শরৎদের প্রকাণ্ড খামার বাড়ীটা পড়িয়া রহিয়াছে, ঐখানেই শৈলকে দাঁড় করাইয়া ছবি তুলিবে। বিস্তর গাছ আছে সেই বাড়ীটায়; আতাবনের ঘন পাতার মাঝে শৈলকে কি সুন্দর মানাইবে! ও-পাশের বাঁশঝাড়টাতেও খুব ভাল হইবে ছবি। শৈল একটা বাঁশের আগা নোয়াইয়া ধরিবে, বাঁশের শ্যামল পত্রদল শৈলর সুগৌর তনুখানি যবনিকার মত আড়াল করিয়া রহিবে, শরৎ তুলিবে তার ছবি। ঐখানেই ছোট ডোবাটাতে শৈলকে নামাইয়া দিয়া শালুক ফুল তোলার ছবি লইলে কেমন হয়! চমৎকার হইবে—তার পর শৈলর সাঁতার কাটার আর একখান ছবি। কিন্তু

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছবি হইবে সেইটি যেটিতে তাহার শৈলরাণী এমনি সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছে। শরৎ কত রকম ছবি যে তুলিবে!

ভাবনার আর শেষ নাই। বর্ষার জলে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে, রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলিলেই বন্যাপীড়িতের হাহাকার যেন মর্ম্ম ছিঁড়িয়া দেয়। শরৎ তো বেশ বাড়ী যাইতেছে। কিন্তু কিই বা করিতে পারে সে ঐ বন্যাপীড়িতদের জন্য! মহাকাল যাহার উপর বিরূপ, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার কি সাহায্য করিতে পারে। শরতের দুর্দ্দিনে কেহই তো সাহায্য করিতে পারে নাই। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হয় নাই কত হিতৈষী। শরতের বেশ মনে আছে যে, সক্ষম সমস্ত আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ই তাহাকে সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল। আবার ভাগ্য যখন তাহার অনুকূল হইল তখন কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইল না, শরৎ স্থিত হইয়া গেল। শরৎ সেই দিন হইতেই ভাগ্যবাদী। পুরুষকারকে সে বিশ্বাস করে না। মানবশক্তি বিরাট্ ঐশী শক্তির নিকট নগণ্য—শরতের এই বিশ্বাস। তাহা না হইলে শরতের মত লক্ষপতি লোকের ছেলে আজ এই সামান্য চাকরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কেন! সবই ভাগ্য।

তবু শরৎ ভাগ্যবান্। কত লোক যে অনাহারে আত্মহত্যা করিতেছে তাহাদের তুলনায় শরৎ তো যথেষ্ট সুখে আছে। এমন কি, অনেক মোটা বেতনের চাকুরে হইতেও সুখে আছে। কারণ তাহার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, কাজেই দুশ্চিন্তা নাই। যেটুকু-বা সংসারের জন্য ভাবিতে হয় তাহা মা-ই ভাবিয়া থাকেন। শরৎ শুধু মাসের প্রথমে কয়েকটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াই খালাস।

মার কথা মনে পড়িয়া গেল। এমন মা আর হয় না। পিতার মৃত্যুর পর শিশু শরৎকে মা যেন পক্ষপুটে আবরিত করিয়া রাখিয়াছেন। সংসারের এতটুকু আঁচ তাহাকে লাগিতে দেন নাই। গৃহবিবাদে ধনসম্পত্তি নষ্ট হইল, জ্ঞাতিরা বহু বিষয় আত্মসাৎ করিল, কিন্তু মা শরৎকে কোন আঘাত জানিতে দিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শরতের মত শিশু এ-সকল এখন রক্ষা করিতে পারিবে না—করিতে গেলে একূল ওকূল দুই কূল যাইবে, অর্থাৎ সম্পত্তিও রক্ষা হইবে না, শরৎও মানুষ হইবে না। মা তাই শরৎকে মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। মানুষ সে হইয়াছে কি না কে জানে, তবে মার মুখে হাসি সে ফুটাইয়াছে। যাহা যাইবার, গিয়াছে, শরৎ তাহার জন্য কোন দুঃখ করিবে না। জীবনের বর্ত্তমান দিনগুলিকে সে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায়।

শরৎ স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি ফাইল ইত্যাদি গুটাইয়া সেও ষ্টেশনের পথে বাহির হইয়া পড়িল। ছোট একটা সুটকেস মাত্র হাতে, এইটুকু তো পথ, বাসে আর নাইবা উঠিল সে! শরৎ হাঁটিয়াই চলিতে লাগিল। দু-একটা বাস প্রায় তার ঘাড়ের কাছে আসিয়া পড়িতেছিল। অন্যমনস্ক শরৎ তখন বাড়ীর কথা ভাবিতেছে। গাড়ীর চালকরা কয়েক বার তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়া গেল। শরৎ বিরক্ত হইয়া ফুটপাত ধরিল। ট্রেনের দেরি আছে এখনও। ঐ মোড়ের দোকান হইতে এক শিশি আল্‌তা কেনা দরকার, গত বার শৈল চাহিয়াছিল। শরৎ দোকানে আসিল। আলতা লইয়া ভাবিল একটা গন্ধ কিছু নিলে ভাল হয়, অল্প পয়সায় যাহা হয় একটা দেখিয়া কিনিয়া ফেলিল। শৈলর গায়ে ইহার সমস্তটা সে ঢালিয়া দিবে, পরদিন সকালে মার কাছে শৈল লজ্জায় বাহির হইতে পারিবে না—সে বেশ হইবে, বেশ জব্দ হইবে শৈল। শরৎ আপন মনে হাসিল খানিক।

ট্রেনে উঠিয়াই শরতের মনে পড়িল, মার জন্য এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা আনার কথা ছিল, কিন্তু আর তো কোন উপায় নাই। ছিঃ ছিঃ, বড় অন্যায় হইয়া গেল। বউয়ের জন্য আল্‌তা কিনিতে তো ভুল হইল না, আর মার জন্য সামান্য এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, শরৎ সেইটাই ভুলিয়া গেল। মা অবশ্য কিছুই বলিবেন না, কিন্তু শরতের এ ভুল ক্ষমার্হ নহে।

একটা ষ্টেশন আসিয়া পড়িল। কয়েক জন উঠানামা করিতেছে। জানালার ধারে বসিয়া শরৎ দেখিতে লাগিল, ষ্টেশন হইতে যে গরুর গাড়ীর পথটি দূরগ্রামের বৃক্ষান্তরালে

লুকাইয়াছে তাহাই ধরিয়া যাত্রীরা চলিতে লাগিল। কত লোক কত রকম মনোভাব লইয়া যে যাইতেছে! হয়ত উহাদের মধ্যে শরতের মতই কেহ আছে, যে বাড়ীতে গিয়া স্নেহশীলা মা ও প্রীতিময়ী পত্নীকে দেখিবে। হয়ত কোন হতভাগার কেহই নাই—প্রতিবেশীর গৃহে রাত্রিটা কোনরূপে কাটাইয়া সকালে ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে।

শরতের মনটা অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল। তাহারও যদি অমনি কেহ না থাকে, ঠিক ঐ রকম প্রতিবেশীর গৃহে রাত্রিটা কাটাইয়া সকালেই চিরদিনের মত জন্মভূমির নিকট বিদায় লইতে হয়! ছিঃ ছি, এসব কি সে ভাবিতেছে—ছিঃ!

শরৎ চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত করিল। পশ্চিমে দিক্‌চক্রবালে দিনদেব অদৃশ্য হইতেছেন। আকাশ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ষ্টেশন আসিয়া পড়িল বলিয়া। আর কতক্ষণ! ষ্টেশনে নামিয়া কতটুকুই বা পথ, তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার নামিবে না, শরৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছিবে।

কিন্তু একি—গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া গেল কেন? কি হইয়াছে। শরৎ অন্য যাত্রীদের সহিত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল। এক মিনিট দেরি তাহার অসহ্য বোধ হইতেছে। রেল-কোম্পানীর কি অব্যবস্থা—"লাইন ক্লিয়ার" কেন দেয় না উহারা? দিনের শেষ আলোটুকু একেবারে নিবিয়া গেলে যে আর ফটো তোলা হইবে না! না, এখনও সময় আছে—ক্যামেরাটা ঠিক করিয়া রাখা যাক। শরৎ ক্যামেরা বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ফিল্ম ভরিল। গাড়ীও ধীরে ধীরে চলিয়া তাহার গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

ছোট ষ্টেশন—একমাত্র শরৎ ছাড়া আর কেহই নামিল না। শরৎ ত্বরিতপদে গেটের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পরিচিত ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "একি শরৎ যে—আজ এলে যে বাবা—ভাল তো!"

"হাঁ ভাল—আপনি ভাল আছেন?" শরৎ পরম খুশী হইয়া উত্তর দিল। মাষ্টার মহাশয় তাহার পানে এক সেকেণ্ড চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ভালই আছি কিন্তু তোমার মা-ঠাকুরুণ, বৌমা, সবাই তো কাল ত্রিবেণী গিয়েছেন গঙ্গাস্নান করতে, মঙ্গলবারের আগে তো ফিরতে পারবেন না! গ্রামের আরও অনেকেই গিয়েছেন; তুমি কি আজ চিঠি পাও নি বাবা?"

শরৎ একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। চিঠি যাইবে তাহার মেসের ঠিকানায় আর সে আসিয়াছে সোজা আপিস হইতে। কি এখন সে করিবে?

কথা কহিবার জন্য শরৎ যখন চোখ তুলিল, মাষ্টার বাবু তখন গার্ডের সহিত কার্য্য চুকাইবার জন্য সরিয়া গিয়াছেন। শরৎ ধীরে ধীরে ষ্টেশনের অপর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে তাহাদের গ্রাম দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যার আবছা আলোতে তাহার দৃশ্য মনোরম। যে-সব পাখী আহারান্বেষণে স্থানান্তরে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে কলকাকলি করিয়া। শরৎ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল সেই দিকে; তখনও পর্য্যন্ত শরতের হাতে ক্যামেরাটা খোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ঐখানে দাঁড়াইয়াই সে গ্রামের একটা ছবি তুলিল, তার পর তুলিল ষ্টেশন-ঘরটার ছবি, তার পর রেল-লাইনের ছবি, তার পর—তার পর শরৎ করিবে কি!

ঐ যে,—ঐ তো তাহাদের গ্রামের কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব ভিক্ষান্তে বাড়ী ফিরিতেছে। হাতে একতারা, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি। শরৎ ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে, বলিল, "ভাল আছ কেষ্টদা!"

কৃষ্ণদাস অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "শরৎ যে, কখন এলে ভাই?"

"আসি নি—ফিরে যাচ্ছি," বলিয়া শরৎ কৃষ্ণদাসের ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরার ছিদ্রে চোখ লাগাইল। যদিও সে জানে, দিনের আলো না-থাকার জন্য একটা ছবিও উঠিবে কি না সন্দেহ তথাপি সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে, পশ্চাৎ হইতে ছবি তুলিয়া শরৎ তাহার বাকি পাঁচখানা "এক্সপোজার"ই শেষ করিয়া দিল। তার পর বলিল, "কলকাতা থেকে ডাকে তোমার ছবি পাঠিয়ে দেব কেষ্টদা, আমার বৈষ্ণবী বৌদি ভাল আছে তো?"

কলিকাতাগামী ট্রেনটা তখন প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিয়াছে। কৃষ্ণদাস শরতের কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, ভাল আছে, তোমার ট্রেন এল, যাও, উঠে পড়।"

শরৎ ফিরিতেছিল, অকস্মাৎ কি মনে পড়ায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাগ খুলিয়া আলতার মোড়কটা লইয়া কৃষ্ণদাসের ঝোলায় ফেলিয়া দিল ও গন্ধসারের শিশিটা খুলিয়া তাহার চূড়াবাঁধা কুঞ্চিত কেশে ঢালিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া গাড়ীর পা-দানে উঠিল এবং কৃষ্ণদাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া "বাড়ী যাও কেষ্টদা—বৌদি যে পথ চেয়ে আছে"—বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

গাড়ী তখন চলিতে সুরু করিয়াছে আর বিস্ময়াহত কৃষ্ণদাস ভাবিতেছে—ছেলেটার হইল কি? পাগল হইয়া যায় নাই তো!

নিশি-পাওয়া

কল্পিতা দেবী

জানালার বাইরে
খামখেয়ালি আলো।
ভিতরের বস্তু,
কিছু চোখে পড়ে
কিছু পড়ে না।
কাঁপে দীপের শিখা,
কাঁপে লম্বা ছায়া।
ঘরের কোণে
কাঁসার বাসনে,
ঠিকরে পড়ে
সোনালি ঝকমকানি।
দোলনায় শিশুর মুখে
দেয়ালার খেলা যেন
মরীচিকার ছলা।
নিশ্চিন্ত কুকুর ঘুমোয়
নিশ্বেসের ওঠা-পড়ার ধাপে
যা পেয়েছে যা পায় নি তারি ক্ষীণ সাড়া
ঢেউ লাগছে আর এক প্রাণের ধারায়।

সরসরিয়ে কী গেল
চলতি প্রাণের আলো,
টিকটিকির গলা
শিকারী নাড়ীর থমথমে চলা।
আলনায় সাজানো
আটপৌরে শাড়ী
দেহের ছাপ,
এখনো আছে ঘিরে।
ওষুধের খোলা শিশি,
ঝকঝকে ডাক্তারি যন্ত্র।
বিজ্ঞানের আয়োজনে
অন্ধকার মুচকে হাসছে।

মধুমালতীর গন্ধে
বারাণ্ডার বাতাস ঘন।
স্ফূর্তির মিঠে নেশা
রসনার স্বাদে রসিয়ে তুলেছে
গন্ধে গাঁজানো তৃষা।

নীল বুটিদার উড়নি
গায়ে ঢাকা।
বড়ো বড়ো চোখ দুটো
ফাঁকা মনের জানলা।
তার শূন্য গর্তের ভাষায়
গা কেমন করে।

হরিবোল হরিবোল
বাহির ফটকে।
নিয়ে চলে কার দেহ
ঘর খালি ক'রে।

লক লক জ্বলে চিতা
মিটিয়ে সে নেয়
লেহন করার আগ্রহ।

নিশি-পাওয়া প্রহর
ঘুমে-চলা কা'কে নিয়ে চলেছে
গুহার দিকে।

চলেছে সকল কাজ।
যার প্রাণের গতি গেছে থেমে
তার ভাবের সত্তা
শূন্য ঘরের পর্দার আড়ালে
চাপা নিশ্বাস ফেলছে ॥

দারা শুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পিএইচ-ডি

শাহজাদা দারা শুকোর কান্দাহার-অভিযান

কান্দাহার নামটি প্রাচীন গন্ধার শব্দের অপভ্রংশ। উহা একটি জনপদের নাম। বৌদ্ধ যুগে আটকের নিম্নবর্ত্তী সিন্ধুর উভয় তীর এবং সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান গন্ধার জনপদ নামে পরিচিত ছিল। উহার তদানীন্তন রাজধানী তক্ষশিলা নগরী। বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বে গন্ধার-বংশ বর্ত্তমান কান্দাহার প্রদেশে বাস করিত—যাহা এখন দুরানী আফগান-বংশের আবাসস্থান। গন্ধার, পারদ (কাবুল) ও বাহ্লীক (বল্‌খ্) তখন আর্য্যভূমির অন্তর্গত ছিল। এই গন্ধার বোধ হয় শকুনি মামার রাজ্য। এই জনপদ স্মরণাতীত কাল হইতে দেবাসুর-দ্বন্দের বিষয়ীভূত ছিল। কেননা এই গন্ধার 'আহুর-মজদা'র উপাসক ইরাণীয় অসুরগণের আর্য্যভূমি প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। দরায়ুস-জরক্‌সিস বর্ত্তমান আফগানিস্থান অধিকার করিয়া সমগ্র পঞ্জাব গ্রাস করিয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ইহার পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, প্রাচীন কান্দাহার-দুর্গ বিজয়ী আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এজন্য সেকেন্দরের নাম-অনুসারে কান্দাহার নামে পরিচিত। এই অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কান্দাহারের বুকে সম্ভবতঃ গন্ধার জনপদের ঐতিহাসিক স্মৃতি লুকাইয়া আছে। যে অজেয় দুর্গ ষোড়শ ও সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দব্যাপী ইরাণের সফবী শাহ ও মোগল বাদশাহগণের শক্তিপরীক্ষার রঙ্গভূমি ছিল, উহা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার কিছু দূরে নাদির শাহ নাদিরাবাদ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আহমদ শাহ আবদালী নাদিরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান কান্দাহার স্থাপন করিয়াছিলেন। আফগানিস্থান পর্ব্বতসঙ্কুল ও অনুর্ব্বর হইলেও কান্দাহার প্রদেশ হেলমন্দ নদী ও উহার উপনদী-সমূহের প্রসাদে সুজলা ও সুফলা। উদ্যানশ্রী অপেক্ষা কান্দাহারের বাণিজ্যসম্পদ্ ও ভারতবর্ষ-আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে উহার সামরিক গুরুত্বের জন্যই এই স্থান অধিকার ও পুনরধিকার করিবার জন্য মোগল ও সফবী সম্রাট্‌গণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। কান্দাহার ও ভারতবর্ষের মধ্যে থল-চোটিয়ালী পর্ব্বতশ্রেণী; দক্ষিণে বেলুচিস্থানের মরুভূমি, পশ্চিমে দশ্‌ৎ-ই-মার্গো ও সিস্তানের বহুযোজন-ব্যাপী উত্তপ্ত ঊষর ভূমি; উত্তরে কাবুল ও গজনীর পাহাড়, হাজরা কালাৎ-ই-ঘিলজাই; উত্তর-পশ্চিমে হিরাত শহর। কান্দাহার শহর পারস্য, মধ্য-এশিয়া, কাবুল ও ভারতবর্ষের পণ্য-বিনিময়ের বাণিজ্যকেন্দ্র। কান্দাহার শত্রুর হাতে থাকিলে কাবুল-গজনী ও হিন্দুস্থানের মালিক মোগল-সম্রাট্‌গণকে সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। সামরিক নির্বিঘ্নতার জন্য পারস্য অপেক্ষা ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের পক্ষে কান্দাহার দখলে রাখা অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর যখন নাবালক ছিলেন তখন পারস্য-সম্রাট্ কান্দাহার-দুর্গ অধিকার করেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা মুজঃফর হোসেন মীর্জ্জা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উহা স্বেচ্ছায় আকবর বাদশাহকে অর্পণ করিয়া মোগল-দরবারে উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। কান্দাহার বন্ধুভাবে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রথম-শাহ আব্বাস মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরকে একাধিক বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই মোলায়েম ইশারার অর্থ জাহাঙ্গীর বুঝিতে পারিয়াও ভাবী বিপদের প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। যিনি কয়েক পেয়ালা শরাব ও দু-বেলা রুটির বদলে সুন্দরী নূরজাহানকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী বিকাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে রেহানী বন্ধক দিয়া বাকী জীবন নাবালকের ন্যায় নিরুদ্বেগ খেয়ালে

কাটাইয়াছিলেন পরাক্রান্ত পারস্য-সম্রাটের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কান্দাহার রক্ষা করা তাঁহার কর্ম্ম ছিল না। নূরজাহান বাদশাহী ও বাদশাহকে শেষ পয্যন্ত সামলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরোক্ষতঃ তাঁহারই বুদ্ধির দোষে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার হস্তচ্যুত হইল। শাহজাদা খুর্‌রম ১৬১১ হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূরজাহানের হাতে নাটাই-বাঁধা ঘুড়ির মত সৌভাগ্যাকাশে যদৃচ্ছা উড়িতেছিলেন; দাক্ষিণাত্যের তিন সুবার মালিক হইয়া হঠাৎ তিনি পিতার উপর বাজপক্ষীর মত ছোঁ মারিবার মতলব করিতেছিলেন। আভ্যন্তরীণ গোলমাল বাহিরেও অজানা ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া প্রথম-শাহ আব্বাস পঁয়তাল্লিশ দিন অবরোধের পর কান্দাহার অধিকার করিয়া লইলেন।

পনর বৎসর পরে, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনাযুদ্ধে কান্দাহার আবার দিল্লীশ্বর শাহজাহানের হস্তগত হইল। উহার শাসনকর্ত্তা আলী মর্দ্দান খাঁ নিজ প্রভুর অভিসন্ধিতে সন্দিহান হইয়া কান্দাহার প্রত্যর্পণপূর্ব্বক মোগল-দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল-সম্রাট্ কান্দাহার ও উহার উপদুর্গ বস্ত ও জমিন্‌দবার অজস্র অর্থব্যয়ে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়া একটি স্বতন্ত্র কান্দাহার সুবা বা প্রদেশ কায়েম করিলেন। শাহজাহানের দরবারী ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, কান্দাহার হারাইয়া শাহ সফীর দিনে আরাম রাত্রে ঘুম ছিল না ("রোজ্ বে-তাব্ ও শব্ বে-খাব্") কিন্তু স্বয়ং দিল্লীশ্বরের মনেও সদা হারাই-হারাই আশঙ্কা। কান্দাহার-দুর্গ হস্তগত হওয়ার পর-বৎসর গুজব রটিল, ইরাণী সৈন্য আসিতেছে। সম্রাট্ শাহজাহান তাড়াতাড়ি লাহোর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র দারার অধিনায়কত্বে সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন (১৬৩৯ খ্রীঃ, ৮ই ফেব্রুয়ারি)। শাহজাদা কাবুল হইয়া গজনী পৌছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই জানা গেল, গুজবটা মিথ্যা। প্রকৃত পক্ষে এ সময় শাহ-সফী তুর্কী সৈন্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সুলতান চতুর্থ-মোরাদ এ সময় বাগ্‌দাদ দখল করেন। যাহা হউক, কিলিচ খাঁ এক দল সেনা সহ গজনী হইতে কান্দাহার পৌছিয়া ইরাণীদের গতিবিধির উপর নজর রাখিবার হুকুম পাইলেন। শাহজাদা গজনী হইতে বিজয়গৌরবে কাবুলের পথে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া ৯ই অক্টোবর দরবারে হাজির হইলেন। শাহজাহান যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন—দারাকে ইহার পূর্ব্বে বাদশাহ কখনও চোখের আড়াল করেন নাই।

শাহ সফী ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক ও আর্ম্মিনিয়া হইতে তুর্কীদিগকে বিতাড়িত করিবার পর সত্য সত্যই কান্দাহার অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রুস্তম খাঁ জুর্জীর অধীনে অগ্রগামী সৈন্যদল খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে পৌছিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষার জন্য আদিষ্ট হইল। এদিকে হিন্দুস্থানেও যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া গেল। স্বয়ং সম্রাট এ সময়ে লাহোরে ছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও তিনি শাহজাদা দারাকে মোগল-বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মনোনীত করিলেন। কিন্তু শাহজাদা পূর্ব্বে কোন যুদ্ধ তো করেনই নাই, লড়াইয়ের ময়দানেও উপস্থিত ছিলেন না। এজন্য তিনি সৈদ খাঁ বাহাদুর, রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গ, আম্বের-পতি মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে শাহজাদার সঙ্গে পাঠাইলেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল শাহজাদা সসৈন্যে কান্দাহার যাত্রা করিলেন্। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না। ইরাণের শাহ সফীকে নিশাপুর পর্য্যন্ত পৌছিতে হইল না; এই বৎসরের মে মাসে পারস্যের কাশান্ শহরেই তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয়-শাহ আব্বাস নাবালক শিশু; সুতরাং ইরাণ-সেনানীরা কান্দাহার-আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করাতে দারার আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ উপস্থিত হইল। পারস্যের সিস্তান, ফরাহ্ ও হিরাত শহর অধিকার করিয়া কাবুল-কান্দাহার ও হিন্দুস্থানকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করিবার ইহাই ছিল উপযুক্ত অবসর। কিন্তু শাহজাদার এই আগ বাড়াইয়া থাকিবার নীতি (forward policy) সম্রাটের মনঃপূত হইল না। পাছে কান্দাহার পর্য্যন্ত পৌছিলে শাহজাদা পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া অকারণ যুদ্ধ বাধাইয়া বসেন সেজন্য শাহজাদাকে গজনী হইতে ফিরিয়া আসিবার জরুরি আদেশ প্রেরিত হইল। তবে রুস্তম খাঁ বাহাদুর ও সৈদ

খাঁ বাহাদুর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সহ দুর্গরক্ষক মোগল-সৈন্য ও আক্রমণ-ভয়াতুর অধিবাসিগণকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কান্দাহার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার আদেশ পাইলেন। শাহজাদা দারা শুকো (২রা সেপ্টেম্বর, ১৬৪২ খ্রীঃ) লাহোরে উপস্থিত হইলে সম্রাট্ যুদ্ধজয়ী সেনানীর ন্যায় তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

শাহ সফীর মৃত্যু ও পারস্য-রাজ্যের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ অবহেলা করিয়া দিল্লীশ্বর সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কাবুল-কান্দাহার নিরাপদ করিতে হইলে সিস্তান না হউক, অন্ততঃ পারস্য ও খোরাসানের দিক্ হইতে শত্রুর সুগম প্রবেশদ্বার স্বরূপ হিরাত নগর অধিকার করা সম্রাট্ শাহজাহানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পরধন কিংবা পররাজ্যে তাঁহার যে অরুচি ছিল তাহাও নয়। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান ও পরবর্ত্তী ব্যবহার ইহার প্রমাণ। জুঝার সিংহ বুন্দেলা চৌরাগড় লুটের ভাগ দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিলেন (১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)। সমগ্র ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাশোকের মত শাহজাহান যে যুদ্ধ ও রক্তপাতে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন, ইতিহাস এ কথা বলে না। দারার দ্বিতীয় অভিযানের মাত্র চারি বৎসর পরে সম্রাট্ শাহজাহান বিজিগীষা-বৃত্তি এবং বাবর-তৈমুরের জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবাতিশয্যের প্রেরণায় শাহজাদা মুরাদ ও তৎপশ্চাৎ আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে বল্‌খ্-অভিযান প্রেরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। দশ সহস্র লোকের জীবন ও চারি কোটি টাকা নগদ—এই খরচে তিনি অনায়াসে হিরাত দখল করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। এ যুদ্ধে সেনাপতি-পদের জন্য দারার যোগ্যতা না থাকিলেও তিনি আওরঙ্গজেবকে পাঠাইতে পারিতেন কিংবা নিজে নেতৃত্ব করিতে পারিতেন। আসল কথা, সম্রাট্ শাহজাহান আকবরের মত সামরিক কিংবা রাজনৈতিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; পুত্র আওরঙ্গজেবের মত সামরিক দূরদৃষ্টি, মানসিক শক্তি কিংবা শ্রমসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য শাহজাহানের ছিল না। প্রথম বয়সে তাঁহার এ সকল গুণ কিছু কিছু থাকিলেও মমতাজমহলের মৃত্যুর পর অতি দ্রুত শারীরিক বার্দ্ধক্য ও বুদ্ধিবৃত্তির দুর্ব্বলতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল।

শাহজাহানের অবিবেচনার ফল হাতে হাতে ফলিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বলিয়া যে-শত্রুকে তিনি অবহেলা করিয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয়-শাহ আব্বাস কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই কান্দাহার পুনরধিকারের জন্য হিরাত শহরে যুদ্ধসম্ভার ও সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল-সম্রাট্ এ সময়ে দিল্লীতে ছিলেন। তিনি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন স্বয়ং কাবুলে গিয়া যুদ্ধের ভার লইবেন। সুবাদারেরা সসৈন্যে দিল্লীতে হাজির হইতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার আরামপ্রিয় আমীরদের মধ্যে অনেকেই দারুণ শীতে কাবুল যাইবার কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বাদশাহকে বুঝাইলেন, ইরাণীরা শীতকালে কিছুতেই লড়াই করিতে আসিবে না; আলা-হজরত অনর্থক কষ্টস্বীকার করিবেন; হিন্দুস্থানী ফৌজ অকারণ হয়রান-পেরেশান হইবে। মাস দুই পরে গেলে কোন ক্ষতি নাই, বরং আসা-যাওয়ায় আরাম ও কাবুলের দিল-ফেরেব বাহার দেখার নসিব হইবে। বাদশার মত বদ্‌লাইয়া গেল। কাবুলের সুবাদারকে কান্দাহার-দুর্গে পাচ হাজার সিপাহী ও পাচ লাখ টাকা পাঠাইবার হুকুম পাঠাইয়া তিনি দিল্লীর শীত উপভোগ করাই স্থির করিলেন। লেপের আরাম কিংবা শরতের জ্যোৎস্না উপভোগ বিধাতা গরিব ও বাদশাহের ভাগ্যে লিখেন নাই। রাজমুকুট ফুলের টোপর নহে।

দশ জনে যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করে না কিংবা যে-কাজে পিছু হটে, সেই কাজ করিয়াই মানুষ সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নীত হইয়া অনন্যসাধারণ পদবী লাভ করিয়া থাকেন। তৎকালীন ইউরোপের গতানুগতিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া শীতকালে সৈন্যচালনাপূর্ব্বক এবং শত্রু-মিত্র দুই পক্ষকে ফাঁকি দিয়া ব্লেনহিম-যুদ্ধ জয় করিতে না পারিলে মার্লবরো বড়-জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর যোদ্ধা ও রূপসী স্ত্রীর স্বামী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত হইতেন।

পারস্য-পতি দ্বিতীয়-শাহ আব্বাস ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর কান্দাহার অবরোধ করিলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ দৌলৎ খাঁর বয়স ষাটের উপর ; সাহসের অভাব না থাকিলেও তিনি ঢিলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কান্দাহার-দুর্গের রন্ধ্রতুল্য "চেহেল জিনা" পাহাড়ের ঘাঁটি ও সান্ত্রী-গৃহে অল্পসংখ্যক প্রহরী রাখিয়া তিনি অন্য সমস্ত সৈন্যসহ দুর্গপ্রাচীরের ভিতরেই হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইরাণীরা সেখানে কামান বসাইয়া অন্দর-কেল্লা ও বাজারের উপর গোলা ফেলিতে লাগিল। এদিকে দুর্গমধ্যে নবনিযুক্ত দুই জন বিশ্বাসঘাতক তাতার-সর্দ্দার দল পাকাইয়া বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিল। দৌলৎ খাঁ সরাসরি ইহাদের মাথা না কাটিয়া তাহাদিগকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ সিপাহীরা তাহার হুকুমের বাহির হইয়া পড়িল। ছাপ্পান্ন দিন অবরোধের পর দৌলৎ খাঁ আত্মসমর্পণ করিলেন ; মোগল-সৈন্যেরা চিরদিনের মত কান্দাহার হইতে শেষ বিদায় লইয়া হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিল (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৪৯)। ইহার পুরা তিন মাস পরে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও উজীর সাদুল্লা খাঁ পরিচালিত মোগল-বাহিনী কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কার্য্য সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মে হইতে আগস্ট মাস পর্য্যন্ত তাহারা কান্দাহার অবরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে ভারী তোপ ও অবরোধের সরঞ্জাম ছিল না। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা আওরঙ্গজেব দ্বিতীয় বার কান্দাহার-অভিযানে প্রেরিত হইলেন। মানুষের বুদ্ধি, সাহস ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যাহা সম্ভব, আওরঙ্গজেব সমস্তই করিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরাজেয় যোদ্ধা; তবুও কান্দাহার-দুর্গে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। এই অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব নন্ ; স্বয়ং দিল্লীশ্বর এজন্য সম্পূর্ণ দোষী। তিনি আওরঙ্গজেবকে যুদ্ধচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। কাবুলে থাকিয়া উজীর সাদুল্লার মারফৎ চিঠিপত্রদ্বারা তিনিই এ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আওরঙ্গজেব সৈন্যক্ষয় অগ্রাহ্য এবং প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তলোয়ার-হাতে দুর্গপ্রাচীর দখল করিবার অনুমতি চাহিলেন। ইহা অনুমোদন করা দূরে থাক, আরও কিছু দিন অবরোধ চালাইবার প্রার্থনা তিনি না-মঞ্জুর করিলেন। ইহার উপর আবার বেচারা আওরঙ্গজেবকে উল্টা গালাগালি। শাহজাদার প্রতি এক্ষেত্রে তাঁহার আচরণ, পিতা ও অপক্ষপাত রাজ-রাজেশ্বরের উপযুক্ত হয় নাই। আওরঙ্গজেব শেষ ভিক্ষা চাহিলেন—পরবর্ত্তী অভিযানে তিনি অন্যের অধীনে সাধারণ মনসব্দার হিসাবে কাজ করিতে প্রস্তুত ; দিল্লীশ্বর যেন তাঁহাকে আর এক বার যুদ্ধ করিবার সুযোগ দেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে পিতার নিকট হইতে তিনি পাইলেন শুধু মর্ম্মচ্ছেদী বাক্যবাণ, বিদ্রূপ ও শ্লেষ এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে সরাসরি বদলি হওয়ার শাস্তি। এই পরাজয়ে তিনি অকর্ম্মণ্য দারার উপহাসের পাত্র হইলেন—ইহাই আওরঙ্গজেবের বুকে শল্যস্বরূপ বিঁধিয়া রহিল। এই সময় হইতে আওরঙ্গজেব যদি শাহজাহানকে পিতার ন্যায় ভক্তি না দেখাইয়া থাকেন, সে-দোষ পুত্রের নয় ; উহা পুত্রের প্রতি পিতার অবিচারের প্রতিক্রিয়া। যে-কান্দাহার-দুর্গে হিন্দুস্থানের পৌরুষ ও মোগলের পুরুষকার দুই-দুই বার প্রতিহত হইল, আওরঙ্গজেব-সাদুল্লার শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা নিষ্ফল হইল, উহার বিরুদ্ধে শাহজাহান কোন্ বুদ্ধিতে দারাকে পর-বৎসর সেনাচালনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন বুঝা কঠিন নয়। বাদশাহ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজাকে সুবে বাংলা হইতে কান্দাহার-অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য হুজুরে তলব করিয়াছিলেন। কিন্তু শুজা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি বাংলায় ফিরিয়া যাইবার হুকুম হইল। পাছে শুজা দারার বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে কোন কুপরামর্শ করে সেই জন্য শাহজাদা-দ্বয়ের প্রতি হুকুম হইল, কুচ করিবার সময় বরাবর যেন দুই-তিন মঞ্জিল রাস্তা ব্যবধান থাকে। পিতা ও পুত্রদের এইরূপ পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাব এই সময় হইতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আওরঙ্গজেব ও শুজা সমস্ত পথ দূরে দূরে থাকিয়া অবশেষে দিল্লীতে যেন দৈবাৎ পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় (নবেম্বর, ১৬৫২ খ্রীঃ) শুজার কন্যা গুলরুক্ বানুর সহিত আওরঙ্গজেবের

পুত্র সুলতান মহম্মদের বাক্‌দান সম্পন্ন হইল। দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় মালবের পথে গুজরাটের সুবাদার মোরাদ বক্‌শ আসিয়া দাদা আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই ভাবে তিন ভ্রাতা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী স্থির করিয়া লইলেন; দারার ভাগ্যাকাশে কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘনাইয়া উঠিল।

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই হিন্দুস্থানের ফৌজ কান্দাহার হইতে কাবুল ফিরিয়া আসিল। স্থির হইল, আগামী শীতের শেষে শাহজাদা দারা শুকো কান্দাহার যাত্রা করিবেন। সুবা কাবুল ও মুলতানের শাসনভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। দারার নায়েব-সুবাদার রূপে সুলেমান শুকো কাবুল এবং মহম্মদ আলি খাঁ মুলতানে থাকিবেন। দারা স্বয়ং লাহোরে গিয়া আগামী যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও সৈন্যাদির ব্যবস্থা করিবেন। এ-সময় নূতন দিল্লী শাহজাহানাবাদের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছিল; সম্রাট্ দারাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। শাহজাহানের ভাবী উত্তরাধিকারী দারা এত দিন পর্য্যন্ত সুফী ধ্যান-ধারণা, তত্ত্বজ্ঞানবোধিনী যোগপ্রদীপ ইত্যাদি ধরণের মুসলমানী ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক রচনা এবং রাজ্যের সাধু-ফকির-দরবেশ, লইয়া মশগুল ছিলেন। সুকুমার কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও অধ্যাত্ম-বিদ্যানুরাগী বলিয়া শাহজাদা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হইলেও তিনি লড়াইয়ের ময়দানে বাহাদুরি দেখাইবার সুযোগ পান নাই; তিনি ছিলেন পিতার সুবোধ বালক; গায়ে আঁচড় লাগিবার ভয়ে শাহজাহান পুত্রকে চোখের আড়াল হইতে দেন নাই। পিতার এই দুর্ব্বলতা দারার সহজাত ক্ষমতা ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পরিপন্থী হইয়াছিল। আশৈশব যুদ্ধ ও শাসনকার্য্যে অসীম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াও আওরঙ্গজেবের মনসব বিশ-হাজারীর উপরে উঠিল না। অথচ কোমরের কিরিচ না খুলিয়াই দারার মনসব সকলকে ছাড়াইয়া ত্রিশ-হাজারী হইয়া গেল। এ সম্মান পিতার অন্ধ স্নেহের আত্মতৃপ্তির নিদর্শন মাত্র; যোগ্যতার পুরস্কার কিংবা তাঁহার কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠতার পরিমাপ নহে—এই জ্ঞান দারার ছিল না।

শাহজাহান আজীবন পুত্রকে ঠোঁটে করিয়াই আহার জোগাইয়াছিলেন; স্বাধীনভাবে উড়িয়া বেড়াইবার শিক্ষা দেন নাই। দারাও কোনদিন আত্মনির্ভরতার আবশ্যক বোধ করেন নাই; পিতার ডানার আড়ালে থাকিয়া শুধু পাখা ঝাড়িয়াছেন। অপ্রধৃষ্য রাজশক্তি-রক্ষিত সৌভাগ্য-শৈলের উচ্চতম শৃঙ্গে সুখোপবিষ্ট শাহজাদা দারা মনে করিতেন, তিনিই হিন্দুস্থানের ভাবী ভাগ্যবিধাতা "হুমা" পাখী; বীর্য্য ও সাহসে তিনি শাহ-বাজ এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিতে হীরামন তোতা।

ভ্রাতাদের তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কাঠ-মোল্লা কপট আওরঙ্গজেব একটা ধূর্ত্ত দাঁড়কাক; কায়দা-দোরস্ত গর্ব্বিত আয়েসী শুজা সেই চটক-ঝুঁটিদার শাহী কাকাতুয়া; এবং সদা রক্তচক্ষু, একগুঁয়ে মোরাদ বক্‌শ বুনো তিতির—ইহার বেশী তাহারা আর কিছুই নয়; ইহাই ছিল তাঁহার ভাব। আওরঙ্গজেবের পরাজয়ে তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি, এবং তাঁহার মোসাহেবগণ ততোধিক নানা রকম নিন্দা-বিদ্রূপ করিয়া আওরঙ্গজেবের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়াছিলেন।

কান্দাহার-অভিযানের সেনাপতি মনোনীত হইবার পর দিন হইতেই দারা সেই দুর্গজয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ হইল; গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, একটি বড় রকমের দুর্গ এবং সেই দুর্গ সাত দিনে দখল করিয়া তিনি কাবুল ফিরিয়াছেন। ইহার পর হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, কান্দাহার ফতে হইয়া গিয়াছে; সেখানে পৌঁছিতে যা কিছু বিলম্ব। কিন্তু কি ভাবে দুর্গটি এত সহজে তাঁহার হস্তগত হইবে এ-বিষয়ে "গায়েবী দুনিয়া" হইতে কোন ইশারা মিলে কি না ইহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক দিন দুই জন সুফী দরবেশ গম্ভীর ভাবে সোজা শাহজাদার খাস বৈঠকখানায় ঢুকিয়া তাহাদের শতচ্ছিদ্র সহস্রতালিযুক্ত লম্বা জোব্বা

মুড়ি দিয়া ধ্যানস্থ হইল। ইহা এক রকম শাহজাদার দৌলৎখানায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সাত-হাজারী মন্‌সবদার আসিলে হয়ত প্রবেশের অনুমতির জন্য ঘড়ি দেড় ঘড়ি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, কিন্তু ঠিকমত ভেখ্‌ থাকিলে সাধু-ফকিরদের জন্য কোন হুকুম আবশ্যক ছিল না। ফকিরের খবর পাইলেই শাহজাদা আনন্দে অজ্ঞান হইতেন; ছুটিয়া আসিয়া সালাম-খুশ-আমদ করিতেন। বাহ্যতঃ মৃতকল্প গভীরধ্যানমগ্ন হইলেও, ফকিরদ্বয় শাহজাদা কখন বৈঠকখানায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন সেটা ঠিকমত টের পাইয়াছিল। কিছু ক্ষণ পরে উহাদের মধ্যে এক জন হঠাৎ আনমনা ভাবে মাথা তুলিয়া বলিল, "আমি এখন ইরাণে পৌঁছিয়া সেখানকার হাল প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইরাণের শাহের তুনিয়াদারী খতম!" দ্বিতীয় দরবেশ মাথা না তুলিয়াই বলিল, "হাঁ ঠিক তাই; আমি কিন্তু শাহকে কবর না দিয়া আসিতেছি না।" দারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমিও স্বপ্নে দেখিয়াছি, সাত দিনের বেশী আমাকে কান্দাহারে থাকিতে হইবে না; শাহ আব্বাস মারা যাওয়া বিচিত্র নয়।" বৈজ্ঞানিকের টেলিস্কোপ সাধু-ফকিরদের টেলিভিশ্যনের কাছে কোথায় লাগে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আলম-ই-নাসুত (প্রত্যক্ষ জগৎ) অর্থাৎ মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া শাহজাদার ন্যায় বাস্তবতার বহু ঊর্দ্ধে আলম-ই-মালাকুৎ বা স্বপ্নজগতে ঘোরাফেরা করিবার অধিকার ঐতিহাসিকের নাই।

ছত্রপতি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

বৃষ্টি নামিতে তাড়াতাড়ি একটু পা চালাইয়া একটা দোতলা বাড়ীর নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে ফুটপাথটা খানিকটা ঢাকা। আশ্রয় মিলিল।

মনটা বিষণ্ণ হইয়া আছে। বাড়ী হইতে বাহির হইতেই ভাইপোটা টুকিয়া দিয়াছিল, "কাকা, ছাতা নিলে না?"

সেই থেকে মনটা খিঁচড়াইয়া আছে। ঠিক যাত্রার মুখে পিছনে ডাকা আমার সয় না; খুব একচোট বকাবকি করিলাম। যাত্রাটা শোধরাইয়া লইবার জন্য একটু বসিয়া গেলাম। তাহার পর আবার যেন পিছনে না-ডাকে সেজন্য সতর্ক করিয়া দিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। আবার যে ছাতাটা না লইয়াই উঠিয়াছি, ছেলেটা সেটুকু আর মনে করিয়া দিতে সাহস পায় নাই।

পাশেই বারান্দাটার মধ্যে গায়ে গায়ে তিনটি দোকান। একটি চায়ের, একটি হোমিওপ্যাথির, একটি ছাতার,—ছাতার সঙ্গে কিছু কাটা কাপড়ও আছে।

সমাবেশটা একটু অদ্ভুত,—চা, হোমিওপ্যাথি, ছাতা। অন্য সময়ে নজর পড়ে না বটে, কিন্তু বর্ষার এই রকম জোর করা অবসরের মধ্যে এই সামান্য অসামঞ্জস্যগুলাও মনকে যেন অভিভূত করিয়া বসে।

চিন্তার মধ্যে একবার ফিরিয়া দেখিতেই চক্ষে পড়িল—ছাতার দোকানীটা আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, চোখ সরাইয়া লইতে গিয়া দৃষ্টিটা চায়ের দোকানে গিয়া পড়িল; সেখানেও সেই অবস্থা—দোকানীর দুইটি লোলুপ চক্ষু আমার উপর নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। জামাকাপড় একটু একটু ভিজিয়া গিয়াছে, বর্ষার ছাটে বেশ একটু শৈত্যভাব—অসময় হইলেও বর্ষাটা যে শীঘ্র থামিবে এমন ভরসা নাই। এ অবস্থায় একটু চা পান না-করা, অথবা সামনেই ছাতার দোকান থাকিতে একটা ছাতা কিনিয়া না-লওয়া কেমন যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চা আমি পান করি না; বাড়ীতে একটা ছাতা আছেই, এই সেদিন

কিনিয়াছি। আমি দোকান হইতে সবলে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাস্তার পানে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু মাথার পিছনে যে চারিটি লুব্ধ চক্ষুর দৃষ্টি আসিয়া পড়িতেছে, তাহাদের হাত হইতে কোন মতেই পরিত্রাণ পাইলাম না। সম্মোহকেরা শুনিয়াছি চোখের উপর চোখ রাখিয়াই বশীভূত করিতে পারে, এদের দৃষ্টি আমার মাথা ফুঁড়িয়া আমার মস্তিষ্ককে যেন বিবশ করিয়া ফেলিতে লাগিল।…কেবলই মনে হইতে লাগিল আমার মত এমন নিদারুণ অবস্থাতে পড়িয়াও যদি কেহ ইহাদের ফাঁকি দেয় তো কেনই বা এদের এই এত কষ্ট করিয়া পাঁচ জনের জন্য হাতের এত কাছে প্রয়োজনের সম্ভার সব জোগাইয়া রাখা? আরও কি সব আত্মধিক্কারের কথা মনে উদয় হইল, এখন ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া বসিয়া মনে পড়িতেছে না।…মোট কথা ছাতার দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আকার-প্রকারে মনে হইল খুব পুরান দোকান। প্রবেশ করিতেই "এই যে আসুন" বলিয়া দোকানী ছোট্ট দোকানটির ভিতরে সরিয়া গিয়া হাত দিয়া আমার বসিবার জায়গাটুকু ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। বলিল, "বিশ্রী বর্ষা পড়েছে মশাই। এবারের নূতন পাঁজিতে বর্ষফল দেখেছেন তো?"

বলিলাম, "না।"

চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিল, "দেখেন নি! বোশেখ মাস থেকেই যে বর্ষা প'ড়ে যাবে বলছে। আর যে-রকম সে-রকম বর্ষা নয়—বলছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি এ রকম বর্ষা দেখে নি কেউ।…কি, ছেলেমেয়েদের জামা চাই নাকি—কত বয়েস?…হুঁঃ, দেখুন! আপনার ছাতারই তো দরকার—আমার দেখেই বোঝা উচিত ছিল। এই বুদ্ধি নিয়ে কি দোকান করা চলে মশাই, তাই করতেও পারলাম না কিছু।…কি রকম ছাতা দেখাই বলুন দেখি?"

সামনে কয়েক রকমের ছাতা একটা তারে টাঙানো ছিল। মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। মিছামিছি পয়সাটা খরচ করিব? ওদিকে বৃষ্টিটাও যেন একটু ধরিয়া আসিতেছে। বলিলাম, "একটু ভাল আর মজবুত হ'লে বেশ হয়, এগুলো যেন নেহাৎ সৌখীন আর‥"

দোকানী তর্জনী উচাইয়া গম্ভীর ভাবে আমার মুখের কথাটা পূরণ করিয়া দিল "—আর পলকা। ঠিক। তা এ যে সৌখীন, ফাঁকি আর পলকার যুগ মশাই। সব চেহারা দেখুন, চুল ছাঁটা দেখুন, জামা দেখুন, জুতো দেখুন—সব যেন উড়ছে।‥ তা দোব আপনাকে, এমন ছাতা দোব যে এ-যুগে পাওয়াই যায় না। আমার নিজের যে সব সে-যুগের, এই দেখুন এগুলো কি এই সব ছোকরাদের যুগের ব'লে ভুল হবার জো আছে?"—বলিয়া নিজের মাথার এক খামচা অবিন্যস্ত শুভ্র কেশ তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিল।

ছাতা আসিল। বাস্তবিক অমন ছাতা আমি কলিকাতা শহরে পূর্বে কখনও দেখি নাই। যেমন দীর্ঘ, তেমনি আড়ে। সাধারণ ছাতায় আটটা করিয়া শিক থাকে, দোকানী এক এক করিয়া চৌদ্দটা গুনিয়া দিল। শিকের মাথাগুলা এক-একটা মটরের মত। মোটা অ-মসৃণ একটা বাঁশের বাঁট—নিজের চবিতে যেন মাথার কাছটা ফাটিয়া গিয়াছে। দোকানী একবার হাতে তৌল করিয়া সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "নিন্, একবার ওজনটা দেখুন; ঘণ্টাখানেক বইলে আজকালকার রগকামানো ছোকরা-বাবুদের হাঁপ ধরে যাবে না!…এই একটি ছিল, এর পরে আপনার মত খদ্দের এলে আর দিতে পারব না।…এ-জিনিষ আর করে না; বইবার লোক নেই তো আর করবে কেন মশাই? আপনার মত শক্তিমান লোক কটা চোখে পড়ে?"

মনটা বেশ একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল; কিন্তু আধুনিক ছাতাকে বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিয়াছি, তবুও যা একটু দ্বিধা ছিল দোকানী 'শক্তিমান' করিয়া দিয়া সেটুকুও প্রকাশ করিবার আর সামর্থ্য রাখিল না। বছর-দশেকের মধ্যে যাহাকে কেহ শক্তিমান বলিয়া ভ্রম করে নাই, ঐ মন্ত্রটুকু শুনিলে তাহার মনের অবস্থা কেমন হয়? একবার খুলিয়া দেখিতে যাইতেছিলাম, দোকানী তাড়াতাড়ি হাত হইতে এক রকম কাড়িয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "তা ব'লে কি খুলতেও গা-জুরি চলবে

বাবু? এ যে হাসালেন আপনি। শক্তিমান লোকের দোষই ওই"—বলিয়া সন্তর্পণে আঙুলের টিপ দিয়া দিয়া ছাতা খুলিয়া ধরিয়া আমার মুখের পানে স্মিতহাস্তে চাহিল। ছাতায় সমস্ত ঘরটি যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ভরিয়া গেল।

দাম তিন টাকা। কিন্তু দোকানী বলিল, "তবে আপনি ভাববেন—জিনিষটা পছন্দ হয়েছে, তাতে এই দুর্যোগ, আর পাজিতে যেমন লিখছে—ছাতাটা হাতছাড়া করাও মুখ্যুমি—তাই দোকানী বেটা দাঁও হাঁকড়াচ্ছে। না, মশাই, আপনি আড়াই টাকাই দিন। খদ্দেরের সঙ্গে তো এক দিনের সম্পর্ক নয়।"

যে তিন টাকা হইতে এতটা বিবেচনার সঙ্গে এক কথাতেই আড়াই টাকায় নামিয়া আসিতে পারে তাহার সহিত দরকষাকষি চলে না। ছাতাটা কিনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

বৃষ্টিটা ধরিয়া আসিয়াছে, তবে তখনও গুঁড়িগুঁড়ি পড়িতেছে। ছাতাটা কিন্তু সেইখানেই খুলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইল। একটু সরিয়া গিয়া আঙুল টিপিয়া টিপিয়া খুলিতে হইবে। ছাতা লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। চায়ের দোকানী কি করিতেছে জানি না, খুব মনের জোর দিয়া ওদিক হইতে দৃষ্টিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছি। এর উপর ছাতা খুলিয়া আর বাড়াবাড়ি করিব'র ভরসা হয় না।

পাক দিয়া যতটা সম্ভব ছাতাটার আকার সঙ্কুচিত করিয়া কোলের কাছে লইয়া অগ্রসর হইলাম এবং একটা মোড় ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিলাম। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল এবং মনের সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিলে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী—যতগুলি গালাগাল জানা আছে সমস্তগুলি দোকানীটার উপর উজাড় করিলাম। কি প্রবঞ্চক! মান্ধাতার আমলের কবেকার একটা ছাতা কিনিয়া রাখিয়াছে, খদ্দের নাই,—জো বুঝিয়া ঠিক আমায় গছাইয়া দিল! আচার্য্য রায় এই জাতকে দোকান করিতে উৎসাহিত করেন!

এ ছাতা লইয়া বাড়ী ফেরা চলিবে না। এমনি আমি কিছু সওদা করিয়া বাড়ী ফিরিলে সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায় নানাবিধ মন্তব্য লইয়া। তাহার উপর যদি এই ছাতা দেখে···

এক জায়গায় বারান্দার উপর একটি মাড়োয়ারী ঘণ্টি বাজাইয়া ছিটের টুকরা নিলাম করিতেছিল। একটু ভীড় হইয়াছে। ছাতাটা কোলের কাছে লইয়া দাঁড়াইলাম।··· বৃষ্টিটা নিতান্ত আর গুঁড়িগুঁড়ি পড়িতেছে না, একটু জোর হইয়াছে, কিন্তু নিলাম দেখায় এত তল্লীন হইয়া গিয়াছি—বৃষ্টির কথাটা যেন মনেই নাই। একটি ফতুয়া-পরা বখাটে-গোছের ছোকরা মনে করাইয়া দিল। মুখের দিকে দুই-তিন বার চাহিয়া বলিল, "ভিজচেন যে মশাই, ছাতাটা খুলুন না।" আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিল।

বলিলাম, "তাই তো!—খেয়ালই ছিল না।"

ভুলটা হঠাৎ জানিতে পারিলে তাড়াতাড়ি যেমন শোধরাইয়া লয় লোকে—লওয়া উচিত যেমন, সেই ভাবে ছাতাটা মাথার উপর তুলিয়া শিকের গোড়ায় জোরে একটা ঠেলা দিলাম।

বাঁটের ঠিক এক-তৃতীয়াংশ গিয়া আটকাইয়া গেল। না নীচে নামে না ওপরে যায়। একটু চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দিয়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া নিলামে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছোকরাও বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিরক্তি এবং বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "আচ্ছা কিপটে তো মশাই আপনি। তেরপলের মত একটা ছাতা কিনেছেন—ঠিক আদ্ধেকটি খুলে নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ইচ্ছে করলে তো মাড়োয়ারীটাকে পর্য্যন্ত এর মধ্যে টেনে নিতে পারেন।"

আরও দু-এক জন প্রত্যাশী তাহার সঙ্গে যোগ দিল। বলিলাম, "না, কি রকম আটকে গেছে খানিকটা উঠে।"

"দেবার ইচ্ছে না থাকলে ও-রকম আটকায়, মশাই।··· কই দেখি, কি রকম আটকেছে?"

হাত থেকে ছাতাটা লইয়া উপরে ঠেলিবার চেষ্টা করিল। একেবারে অনড়। দাঁত মুখ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ কুব্জ হইয়া নীচের দিকে টানিল। অতিকষ্টে আধ ইঞ্চিটাক নীচে নামিয়া সেই যে কাপে-কাপ বসিয়া গেল, আর না উপরে যায়, না নীচে নামে। কসরতের চোটে শিকের ডগাগুলা খটাখট করিয়া আশেপাশের মাথাগুলির উপর ঠোক্কর দিতে লাগিল। অচিরেই নিলামের ভিড়ের একটা মোটা অংশ ছাতার চারিদিক ঘেরিয়া মারমুখো হইয়া উঠিল। ছোকরার হাতেই ছাতাটা, আমি দর্শক সাজিয়া গিয়া অনেকটা নিরাপদ ছিলাম। ব্যাপার খুব ঘোরাল হইয়া উঠিতে ছোকরা বলিল, "এই এঁর ছাতা।…পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন নাকি মশাই। নিন্, টুপি ক'রে প'রে থাকুন।" বলিয়া ছাতাটা আমার হাতে দিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সেই স্বল্প-উদ্ঘাটিত ছাতায় যতটা সম্ভব চারি দিকের বিদ্রূপবাণ হইতে আত্মগোপন করিয়া সেখান থেকে সরিয়া পড়িলাম।

কিন্তু সরিয়া যাইব কোথায়? বৃষ্টি পড়িতেছে একটু একটু করিয়া। মাথায় আধখোলা বিরাট্ ছাতা। কোথায় লোক কম আছে এই রকম গলিঘুঁজি দেখিয়া বেড়াইতে হইবে। দাঁড়াইলেই সেখানে লোক জুটিয়া যাইবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, বিদ্রূপ, মন্তব্য।

কয়েকটা গলি ঘুরিয়া মাথায় একটু বুদ্ধি আসিল। ছোট মণিহারী দোকানে গিয়া একটা ছুরি কিনিলাম। আর একটু গিয়া রেলিঙে-ঘেরা একটি ছোট পার্কের মত দেখা গেল। গোটা-তিনেক বেঞ্চ পাতা আছে। একটির মাথায় কাঠের এক ফালি ছাপ্পর, একটু জল আটকায়। সেই বেঞ্চটিতে বসিয়া ছাতার বাঁটটা চাঁচিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

উপর আর নীচের অংশটা চাঁচিতে সময় লাগিল না, কিন্তু যেখানটা আটকাইয়াছে ছুরির ছোট ফালির কোণ সাঁদ করাইয়া কুরিয়া কুরিয়া কাটিতে অনেক বিলম্ব লাগিল। যাহা হউক, ফল হইল। হঠাৎ আমার বাঁ হাতের বুড়া আঙুলটা খামচাইয়া দিয়া ছাতাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইব, দেখি উপদ্রব অন্য দিক্ দিয়া মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে!

ছাতাটা শুধু আকারের দিক্ দিয়াই প্রাচীন নয়, সরঞ্জামের দিক্ দিয়াও একেবারে পচা। পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টায় শিকের গোড়ায় তারের বাঁধুনিটা কখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে টের পাই নাই; ছাতাটা হঠাৎ মুড়িয়া যাইতেই একসঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয় শিকের মুখ কাপড় ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। হতাশ দৃষ্টিতে সেই ভগ্নাবশেষের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

আড়াইটা টাকা গিয়াছে, কপালে লোকসান লেখা ছিল কি আর হইবে? এখন কথা হইতেছে, এই ছাতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাই কি করিয়া? এই বস্তু বহন করিয়া কি করিয়া ফিরি? একটি ছাতা-মেরামতের দোকান নাই—'ছাতা মেরামৎ' করিয়া লোকও হাঁকে না। প্রায় ঘণ্টা দুই-আড়াই ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ পাড়ায় যে আসিয়া পড়িয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

বৃষ্টিটা বেশ ছাড়িয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ছোট পার্কটিতে একটি চাকর তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া প্রবেশ করিল। আমি উঠিলাম, মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়াছে।

চাকরটাকে প্রশ্ন করিলাম, "এখান থেকে ট্রামের রাস্তা কতটা? কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?"

"কোথায় যাবেন আপনি?"

আমার ট্রামের দরকার, কোথায় যাই সেটা অবান্তর।

বলিলাম, "বৌবাজারের ট্রাম পাওয়া যাবে?"

উত্তর করিল—"গ্রে ষ্ট্রীটের ট্রাম লাইন কাছে পাবেন।"

বলিলাম, "তাতেও চলবে।"

চাকরটা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর হাত দেখাইয়া বলিল, "তাহলে সোজা গিয়ে একটু মোড় ফিরেই সিদে পশ্চিমে চলে যান।"

কয়েকটা শিকের মাঝখানটা বাঁকিয়া গিয়া ছাতার

পেটটা ফুলিয়া গিয়াছে, যথাসম্ভব গুছাইয়া লইয়া যাত্রা করিলাম।

গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া একটা চিৎপুরগামী ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়িলাম। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। ট্রামের এক কোণে দুই জন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক পরস্পরের কাছে মুখ সরাইয়া লইয়া কি একটা পরামর্শে লাগিয়া আছে। এদেরই খুঁজিতেছি। গিয়া ঠিক তাহাদের সামনের সীটটিতে বসিলাম এবং তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধাই না হয় সেই জন্য ছাতাটা নিজের সামনে না রাখিয়া বেঞ্চটার পিঠে ঠিক তাহাদের হাতের কাছে টাঙাইয়া রাখিলাম।

সামনে লম্বালম্বি করিয়া বসানো একটা বেঞ্চে কতকগুলি পাড়াগেঁয়ে-গোছের বাঙালী বসিয়া তর্ক করিতেছিল। বসিতেই সামনের লোকটি আমার ছাতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে মাথা নোয়াইয়া খুব ভক্তিভরে বলিল, "প্রণাম হই।"

তাহার পর সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কেন এত তর্ক বাপু তোমাদের? এই এঁকেই জিজ্ঞাসা কর না, আমাদের ভাগ্যে যখন এসে পড়েছেন।...এরা বলছে আজ বারটা একচল্লিশ মিনিট গতে অমাবস্যা পড়বে, অথচ আমার যেন মনে হচ্ছে পাঁজিতে দেখে এলাম...।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কিন্তু তখনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল।—ইহারা ছাতা দেখিয়া আমায় নিশ্চয় গুরু-পুরোহিতগোছের কিছু একটা ঠাহর করিয়া থাকিবে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেহারাতেও নিশ্চয় একটা পরিব্রাজক-গোছের ছাপ পড়িয়াছে। তাহার উপর মুণ্ডিত মুখমণ্ডল, পায়ে একটু পুরাতন-গোছের স্যাণ্ডাল—এ-সবের সাক্ষ্য তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় নিদর্শন ঐ ছাতা। নির্ঘাত শিষ্যবাড়ীর জিনিষ—মেদিনীপুর-ঘাঁটাল অথবা একেবারে সুন্দরবন ঘেঁষিয়া কোন শিষ্যবাড়ী হইতে আমদানি—কলিকাতার বহু দূরে এবং এ-যুগের ছোঁয়াচ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন শিষ্যবাড়ী।

লোকগুলা চিৎপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় নামিয়া গেল। পিছনের সেই লোক দুইটা বসিয়া আছে। কান ঐদিকেই পাতিয়া রাখিয়াছি। না, যতটা বুঝা যাইতেছে খাঁটি লোক। ইহারা আমায় ছাতা-সমস্যা হইতে মুক্ত করিবেই। হ্যারিসন রোডের কাছে আসিয়া ভিড়টা চাপ বাঁধিয়া উঠিল। এই সুযোগ। আমি উঠিয়া পড়িলাম এবং ছাতাটা ভুলিয়া, ভিড় ঠেলিয়া ট্রামের ফুট-বোর্ডের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। নামিতে যাইব, কাঁধে একটি রুক্ষ হস্তের স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি আমার পিছনের সঙ্গীদের মধ্যে এক জন। একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠাকুর-মশায়, আপনকার ছাতা।"

"ও ভুলেই গেছলাম, দেখ তো!" বলিয়া ছাতাটা লইয়া নামিয়া ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কি করা যায়? চোর-গুণ্ডাকেও সাধু করিয়া তোলে এ কি পাপ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল? বাড়ী যাই কি করিয়া? শিবপুরে রামরাজাতলা—এখানে তো নয়। ট্রাম, বাস অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, তা ভিন্ন উঠিই বা কি করিয়া বাড়ীতে এ-জিনিষ লইয়া!...ওদিকে ছাতা ক্রমেই অঙ্গবিস্তার করিতেছে।

আবার একটু বুদ্ধি আসিল। বুদ্ধি তো আসিতেছে, কিন্তু ফলিতেছে কই?

লোয়ার-চিৎপুর ট্রাম হইয়া এস্‌প্লানেডে আসিলাম এবং সেখান হইতে একেবারে ইডেন গার্ডেনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পথের বিড়ম্বনাটা আর লিপিবদ্ধ করিতেছি না।

খুব ঝোপঝাড় দেখিয়া একটি নিভৃত স্থানে গিয়া বসিলাম। তখন বেলা গিয়া বেশ একটু গা-ঢাকা হইয়া আসিয়াছে।

পরে বুঝিলাম, অত বেশী নিভৃত স্থান খুঁজিতে যাওয়াই ভুল হইয়াছিল।

বেঞ্চে একটু বসিয়া ছাতা ভুলিয়া একটু বাহিরে ফাঁকায় আসিয়া পড়িয়াছি। একটা উড়ে মালী আসিয়া বাঁ-হাতে ছাতাটা লইয়া হাসিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "ছাতাটা ভুলে যাচ্ছিলেন—বখশিশ দেবেন বাবু।"

চূড়ান্ত অবস্থা হইয়া আসিয়াছে। স্খলিত কণ্ঠে বলিলাম, "ঠিক, ভুলে গেছলাম বটে।"

একটু চিন্তা করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলাম, "গরিব মালী হয়েও যেরকম সাধু লোক—নে, তুই ছাতাটাই নিয়ে নে।"

মালীও একটু চিন্তা করিল, একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে ছাতাটার পানে চাহিল বটে, কিন্তু বুঝিলাম কি একটা প্রবল দ্বিধায় পড়িয়াছে।—উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "এই নে চারটে পয়সা বরং, মেরামৎ ক'রে নিস। আহা, গরিব লোক···।"

মালী ভীত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিল, জায়গাটার নিভৃত ভাবটাও একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর হঠাৎ যেন একটা অজানা বিপদের ইঙ্গিত পাইয়া নিজের লোভ সংযত করিয়া বলিল, "না, বাবু; থাক্‌, বখশিশ চাই না; সেলাম।"

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

* * *

এই জীবন,—এতটুকু একটা তুচ্ছতায় যাতে এতবড় একটা বিপর্য্যয় আনিয়া ফেলিতে পারে—একেও এত করিয়া চায় মানুষ? একটা সামান্য ছাতা—না-হয় অসামান্যই, কিন্তু মাত্র ছাতাই তো?···

শেষকালে মা-গঙ্গাকে আশ্রয় করিতে হইল।

ষ্ট্রাণ্ড রোড পার হইয়া ধার দিয়া খানিকটা দক্ষিণে গিয়া খুব একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলাম। চরণ ক্লান্ত, মন অবসন্ন। পূর্ণ জোয়ারে ভরা গঙ্গা—মা যেন কোল পাতিয়া আছেন।

নৌকার কাছি-ছেঁড়া খানিকটা দড়ি পাওয়া গেল। কাছে একটা গোল পাথরের বড় চাঁই কেমন করিয়া ঠিক এই জায়গাটিতেই আসিয়া পড়িয়াছিল জানি না। মা বোধ হয় এই বিড়ম্বনার অবসান করিবেন বলিয়াই।

পাথরটা দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিলাম, পনর-কুড়ি সের হইবে। তার পর?—তার পর মায়া;—হ্যাঁ,—নশ্বর জীবনে এত দুঃখ-দুর্গতির পাশেও কোথা হইতে এত মায়া আসিয়া জমা হয় কি করিয়া বলি? সেহই বল কিংবা অন্য কিছুই বল—যা লইয়া এত নির্যাতন—তাহাকেই আবার বিদায়ের সময় প্রাণ এমন করিয়া জড়াইয়া ধরে কেন?

ছাতাটিতে দড়িটা বাঁধিয়া পাথরটা ধীরে ধীরে গঙ্গার গর্ভে ঠেলিয়া দিলাম।

এপ্রিলের ফুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী নলিনী দেবী কর্ত্তৃক বহুবর্ষ পূর্ব্বে
পয়লা এপ্রিলে প্রেরিত স-পুষ্প একটি কৌতুক-কবিতার উত্তরে

বসন্তের ফুল তোরই
সুধাস্পর্শে লেপা
আমারে করিল আজি
এপ্রিলের ক্ষেপা।
পাকা চুল কেঁচে গেল,
বুদ্ধি গেল ফেঁসে
যে দেখে আমার দশা
সেই যায় হেসে।
বিনা বাক্যে ঘটাইলি
এমন প্রমাদ,
তারি সঙ্গে আছে আরো
বচনের ফাঁদ।
আমি যে মেনেছি হার
নিজেরেই ছলি',
অবোধ সেজেছি কেন
কারণটা বলি।
বিপাকের সেতু একা
নহে তরিবার,
পাশে এসে ধরো হাত
জোড়ে হব পার॥

—বঙ্গলক্ষ্মী

আলোচনা

দুই জন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

যোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতার) সমকালে তাঁহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক আর এক জন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটার) বর্ত্তমান ছিলেন। এই দুই জনের উল্লেখ করিয়া শ্রীমান্ যোগানন্দ দাস গত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীর ৮৩৯ পৃষ্ঠায় '১৯৩৯ : তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে প্রথমোক্ত দেবেন্দ্রনাথের "হিন্দুকলেজে না পড়ার অনুমান সুদৃঢ় হবার কারণ আছে।"

ঐরূপ অনুমান সুদৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, একান্ত ভিত্তিহীন। (১) প্রথম দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কোথাও রামমোহন রায়ের স্কুল ও হিন্দু কলেজ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বিদ্যালয়ে তাঁহার পাঠের কোনও উল্লেখ, অনুমান বা জনশ্রুতি নাই। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৭ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে স্বীয় ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।" যোড়াসাঁকো হইতে হেদুয়ার ধারে অবস্থিত রামমোহন রায়ের স্কুলে যাইবার পথে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির পড়ে না; হিন্দু কলেজে যাইবার পথেই পড়ে। (২) শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থের ১ম ভাগের (১২শ সংস্করণ, ১৩৩৬ সাল) ২০৯, ২১০ পৃষ্ঠায় পরমহংসদেবের উক্তিতে রহিয়াছে যে, তিনি যোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে "সেজোবাবু" [অর্থাৎ রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস] "বল্লে, 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে'।"

উক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস ব্যতীত, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রমাপ্রসাদ রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের কাহারও স্বকীয় উক্তি অন্বেষণ করিলে হয়ত কেহ এ বিষয়ে আরও তথ্য পাইতে পারিবেন।

"The Tagore Family, A Memoir, by G. W. Furrell, Second Edition, Thacker, Spink & Co., 1892" নামক পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে এই কথাগুলি আছে,—

"After studying first at Ram Mohun Roy's School and subsequently at the Hindoo College, was placed for a time in his father's firm of Carr, Tagore & Co." কার ঠাকুর কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক,—দ্বারকানাথের এই দুই কারবার পরস্পরের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে এই লেখকের পক্ষে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র স্থানে 'কার ঠাকুর কোম্পানী' ভুল করা স্বাভাবিক। পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিত আছে যে, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে।

"দেবেন্দ্রনাথ যদি হিন্দু কলেজে পড়িয়া থাকিবেন, তবে ডিরোজিওর কোন প্রভাবের চিহ্ন কেন দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নাই," এই অভাবাত্মক সংশয়ও অযৌক্তিক। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পরে (অর্থাৎ ১৮৩০ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৩১ সালের প্রথম ভাগে) দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ২৫শে এপ্রিল (১৮৩১) তারিখে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই ন্যূনাধিক চারি মাস কালও দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর ক্লাসে পড়েন নাই; তাঁহার নীচের ক্লাসে পড়িতেন।

সম্প্রতি ইতালী কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত আলবানিয়ার রাজা জোগ ও রাণী জেরাল্ডাইন—বিবাহের বেশে গৃহীত চিত্র।

জার্ম্মানীর দিগ্বিজয়ের পথে অন্যতম রাজ্য রুমানিয়ার রাজা কেরল; তাঁহার বামে ফরাসী মন্ত্রী দেল্‌বো। সম্প্রতি জার্ম্মানীর সহিত রুমানিয়ার অর্থ নৈতিক চুক্তি হইয়াছে।

চীনের কর্ণধারদ্বয়—মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার পত্নী

পোপ দ্বাদশ পায়স্

বালুকা-বাসর

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তোমার সাথে জ্যোৎস্নারাতে সেই যে দেখা নদীর চরে,
সেই কথাটি পড়ছে মনে আজ্‌কে অনেক দিনের পরে ;
নদী তখন উঠ্‌ছে ফুলে' জোয়ার-জলে কানায়-কানায়,
সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি বল দেখি কেমন মানায় !

গাঙের কূলে মনের ভুলে বসেছিলাম তোমার পাশে,
ওপার হ'তে বাঁশির উদাস সুরখানি কার হাওয়ায় ভাসে !
চেয়েছিলাম তোমার মুখে, তুমি ছিলে অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়েছিলে নীলাম্বরী শাড়ীর কোণা।

ঠোঁট দুখানি কাঁপ্‌ল না ত', চুলের ছায়া চোখ যে ঢাকে ;
মনটি বুঝি উধাও তখন উদাস-করা বাঁশির ডাকে ?
মুখের কথা, চোখের দিঠি—পেলাম না ত' কোনই সাড়া,
মনে হ'ল সেদিন রাতের যা-কিছু সব সৃষ্টিছাড়া !

শেষ-খেয়ার সে তরীখানি ছাড়্‌ল যখন এপার থেকে,
উঠ্‌লে তুমি—তাহার 'পরে, আমায় গেলে একলা রেখে ;
যাবার বেলায় বল্‌লে শুধু—'রাত্রি হ'ল, চাই যে ঘর—
এ পারেতে আছে কেবল ভাঙন-ধরা নদীর চর।'

বাব্‌লা-বনের ফাঁকে ফাঁকে, বুনো ঝাউয়ের ঝোপের ধারে,
ঘুরে বেড়াই পথ-বিপথে, প্রাণের বিজন অন্ধকারে।
জ্যোৎস্না যত আঁধার তত, গাইনু তবু আলোর গান ;
নদীর জোয়ার থাম্‌ল শেষে—পূর্ণশশী অস্তমান।

* * *

বালির 'পরে শয়ন পাতি' মুখটি গুঁজে পড়ব শুয়ে—
ভাঁটার 'পরে জোয়ার এসে দেবে সে ঠাঁই আবার ধুয়ে ;
এমন সময় চম্‌কে দেখি, পাশেই এ কার চুলের গোছা—
চুলের মাঝে মুখটি তোমার—নয়ন দুটি সদ্য মোছা !

জ্যোৎস্না তখন ফুরিয়ে গেছে, নেই ক' জলের কলধ্বনি,
জিজ্ঞাসিনু—কেমন ক'রে ডুব্‌ল তোমার সেই তরণী ?
ফিরলে তুমি কেমন ক'রে সেই পুরাতন বালুর চরে,
খেয়ার মাঝি পারল না কি পৌঁছে দিতে গ্রামের 'পরে ?

শুকতারাটি উঠ্‌ল জলে'—মুখে তোমার ফুটল হাসি,
ঠোঁট দুখানি নড়ল শেষে, বল্‌লে—বল, 'ভালবাসি' !
জোয়ার-জলে তলিয়ে গিয়ে, ভাঁটায় ভেসে ওঠার পরে
এ কি কথা তোমার মুখে বালুচরের বাসর-ঘরে !

টুট্‌ল যখন সুখের নেশা, থাম্‌ল কানে গানের সুর,
ঝড়ের ঝাপট ঢেউয়ের দোলায় পড়্‌ল খসে পা'র নূপুর,
ফুলের মালায় বাঁধন খুলে' এলিয়ে প'ল চুলের রাশ—
সর্ব্বনাশের সেই লগনে ব্যাকুল হ'ল বাহুর পাশ !

তোমার চোখে কিসের আলো ?—আমার চোখে
ঘুমের ঘোর ;
মরে' তুমি বাঁচ্‌বে আবার ; আমার প্রাণের নেই
সে জোর।
ভালবাসা ?—হাসির কথা !—উড়িয়ে দিছি অনেক দিন,
বালুর উপর ঝাউয়ের ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন !

* * *

সেই ছায়ার ও মায়ার মোহ ঘুচ্‌বে এবার—আশায় তারি
শয়ন বিছাই গাঙের কূলে, চোখের পাতা হয় যে ভারি।
এখন আমায় আর ডেকো না—রাত-পথিকের দিনেই ভয়,
তুমি যে গো দিনের পাখী, এ জন তোমার কেউ যে নয় !

তবু যদি রাতের মায়া, ঝাউয়ের ছায়া, বালুর চর
মন কখনো উদাস করে, শূন্য লাগে বদ্ধ ঘর—
এইখানে এই নদীর বাঁকে, ভাঙন যেথায় ভাসিয়ে নেবে
আমার শেষের শয্যাখানি—সেথায় তোমার চরণ দেবে ?

আবার তুমি তেম্‌নি ক'রে বসবে হেথায় অন্যমনা,
আঙুলটিতে জড়িয়ে তোমার নীলাম্বরী শাড়ীর কোণা ?
ঠোঁট দুখানি কাঁপবে সেবার ? পড়্‌বে চোখে কিসের ছায়া ?
জ্যোৎস্না-রাতে বালুর চরে ভুল্‌বে ক্ষণেক ঘরের মায়া ?

রসকলি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প বাংলার পাঠকসমাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে, এবং সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা স্বীকার করিতেছেন। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসই সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহাতেই যাহা কিছু প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে, এবং জনগণের সাহিত্যরস-পিপাসা উহাতেই চরিতার্থ হয়। বর্ত্তমানে কাব্যের ক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্য-সম্রাটের পদ কোনও কবির প্রাপ্য হয় নাই। এই গল্পলেখকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান কে—এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে, তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি। এই গল্পগুলির সম্বন্ধেই পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই—তারাশঙ্করের রচনার সহিত যাহারা পরিচিত তাঁহারা যেমন আশা করেন, এই গল্পগুলিতে সেই দৃষ্টি ও সেই সৃষ্টিশক্তি আছে, যাহারা এখনও এই প্রতিভাবান্ লেখকের রচনার সহিত তেমন পরিচিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য, এবং উপরে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি তাহার কারণ হিসাবে, এই নূতন বহিখানির প্রসঙ্গে দুই-চারিটি কথা বলিব।

তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-দৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রস-রূপ আবিষ্কার করার যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবিমানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থির রস-কল্পনার অধীন করিতে পারে; পশু ও মানুষ, বন্য ও সভ্য, সুরূপ ও বিরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং রুক্ষ ও কোমল, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত সুনীতি—এই সকলের মধ্যে তিনি জীবনের যে সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহার কারণ, তারাশঙ্কর অতি-আধুনিক মনোব্যাধি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া, এক দিকে অতি সূক্ষ্ম মনোবিলাস বা সেন্টিমেন্ট এবং অপর দিকে অতিপাণ্ডিত্যের মস্তিষ্ক-কণ্ডূয়ন বা প্রগতিবাদ, এই দুইকেই দূরে রাখিয়া—জীবনের জবানীতেই জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সাধনা করিয়াছেন। জীবনের উপরে তাঁহার নিজেরই মনগড়া কোন মত বা নীতিবাদ আরোপ করিয়া অথবা রঙ্গীন ভাবাবেগের মসৃণ মাধুরী বিস্তার করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে, কিংবা প্রগতিবাদী সাহিত্যের নেতৃত্ব করিতে উৎসুক নহেন। যে জীবন-রহস্য মানুষের ধারণা-ভাবনা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কার, বিদ্যা ও বিচক্ষণতারও বহু ঊর্দ্ধে বিরাজ করিয়া থাকে, তাহার নিকটে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াই কবির কল্পনা যে আশ্চর্য্য দৈবীশক্তি লাভ করে, এবং তাহার বলে যাহা প্রত্যক্ষ তাহার মধ্যেই পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হয়—সেই রহস্যই তারাশঙ্করকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার গল্পগুলিতে রসসৃষ্টির মৌলিকতার কারণ ইহাই। শুধু রসকলির কথাই বলিতেছি না,—পূর্ব্বপ্রকাশিত 'ছলনাময়ী' এবং 'জলসাঘরে'র গল্পগুলিও এই সঙ্গে স্মরণ করিতেছি—'প্রবাসী'র পাঠকবর্গ তাহার কোন-কোনটি 'প্রবাসী'তেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। আমাদের এই গ্রামসমাজ ও সংকীর্ণ জীবন-যাত্রার পরিসরে, এবং বাংলা দেশের একটি অতিশয় বিশিষ্ট প্রকৃতি-প্রতিবেশের মধ্যে, তিনি মানবচরিত্রের যে-সকল নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা যেমন বহু-বিচিত্র তেমনই সজীব, তাহাদের ব্যক্তিত্ব যেমন বিলক্ষণ, মনুষ্যত্বও তেমনই অকৃত্রিম। তাঁহার কবি-শক্তির আর একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, জীবনের যে রঙ্গভূমিতে এই সকল নটনটী অভিনয় করিতেছে তাহার দৃশ্যপটও কোথাও অবান্তর নহে—বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই সুরে বাঁধা। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে মানব-জীবন-কাব্যের এমন রস-ঘন চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে পারেন ("রসকলি"র প্রথম ও শেষ গল্পটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি) তাঁহার প্রতিভার নিকট বাংলা সাহিত্য আজিকার এই দুর্দ্দিনে অনেক কিছু আশা করিয়া থাকিবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৪৬—৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গণিত ও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' ১৩৪৬ সালে পঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নানা অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল ইহা কেবল মাত্র যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে তাহা নহে, বর্ষে বর্ষে ইহা নিজের সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা বাড়াইয়া চলিয়াছে।

চ.

ভালুকের দেশে—(যোড়া-কথাবিহীন ছোটদের বই) শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। প্রকাশক: বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই গল্পের বইখানির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে একটিও যুক্ত অক্ষর নাই। ইহাতে সুবিধা এই যে, যে-সব ছেলেমেয়েরা এখনও বর্ণমালার দ্বিতীয় ভাগ পার হয় নাই তাহারাও গল্পটি পড়িয়া আনন্দ পাইবে। গল্পটি সুলিখিত, ভাষা সুমিষ্ট। লেখক তাঁহার কাজটি সুচারুরূপে করিয়াছেন। ছবি আছে। ছাপা বাঁধা পরিষ্কার।

অ..

বঙ্গীয় মহাকোষ—দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। কলিকাতার ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল, এম্-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹। ২৪ সংখ্যায় এক এক খণ্ড হয়। এক এক সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত। ২২ খণ্ডে এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইবে।

এই মহাকোষের বিষয় প্রশংসার সহিত আগে অনেক বার প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছে।

ভারতের পণ্য—তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার। প্রথম খণ্ড। লেখক শ্রীকালীচরণ ঘোষ, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমার্শিয়াল মিউজিয়মের কিউরেটর। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

এই গ্রন্থের আলোচ্য এই প্রথম খণ্ডে ভারতীয় দুই শ্রেণীর পণ্যের বিবরণ আছে; যথা—তণ্ডুল ও দ্বিদল এবং তৈলবীজ ও নানাবিধ তৈল। প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত শস্যগুলির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ধান, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, জই, ছোলা, ডাল, মসুর, মুগ, অড়হর, খেসারি, মটর, কলাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে—চীনা বাদাম, তিসি বা মসিনা, নারিকেল, কাপাস, এরণ্ড বা রেড়ী, সরিষা, তিল, জীরা, ধনে, মেথী, সোরগুজা, যোয়ান, সোলফা বা সুলফা, রাঁধুনী, পোস্ত, মৌরি, মহুয়া, চালমুগরা, ভাঙ্গ বা সিদ্ধিবীজ, চা-বীজ, চন্দনকাঠ ও তাহার তৈল, ধন্বন্তরি তৃণ-তৈল, ষ্টার্চ ও গ্লিসারিণ।

এই সকল জিনিষ কোন্ দেশে কত উৎপন্ন হয়, তাহার আমদানি রপ্তানি, কোথায় কত টাকার বিক্রী হয়, এবং এই সব জিনিষ হইতে অন্য কি কি পণ্য প্রস্তুত হয় ও হইতে পারে, তাহার বৃত্তান্ত এই পুস্তকটিতে আছে।

ইহার প্রত্যেকটির ব্যবসাবাণিজ্য লাভজনক। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান—এবং বাঙালীদের মধ্যে অনেকেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের এই বহিটি পাঠ ও ব্যবহার করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব ছাত্র অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে পরীক্ষা দেন, ইহা তাঁহাদের পাঠযোগ্য। তদ্ভিন্ন সাংবাদিক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য এবং সকল প্রকার জনহিতকর্মীদিগেরও ইহা কাজে লাগিবে।

লেখক পরবর্ত্তী খণ্ডে বা খণ্ডসমূহে তুলা রেশম পশম প্রভৃতি উদ্ভিজ ও প্রাণিজাত তন্তু চা কফি প্রভৃতি আবাদী ফসল, নানারূপ মশলা, নানারূপ মূল, বনস্পতিজাত দ্রব্য, খনিজাত দ্রব্য, এবং পশ্বাদি হইতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডটির আদর হইলে তাহা করিতে তাঁহার উৎসাহ বাড়িবে।

ত্রিপুরীর মন্ত্র

শ্রীগোপাল হালদার

শবরীর প্রতীক্ষা সফল হইল। শেঠজী গোবিন্দদাস জানাইয়াছেন, মহাকোশলে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার এই প্রথম অধিবেশন—জাতীয় মহাত্রাতার এই আবির্ভাবের অপেক্ষায় ত্রিপুরীর পর্ব্বত ও বনানী শবরীর মতই কত দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যুগপ্রভাবে অবতারেরও রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তিরূপ আর তাঁহার নাই, এবার তাঁহার সঙ্ঘরূপ। সহস্র সহস্র নরনারী তাই ত্রিপুরীর অজানা পল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, না-জানিয়াও একটি মন্ত্র মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। এ-যুগে আমাদের ত্রিশরণ মন্ত্র তো এই—"কংগ্রেসং শরণং গচ্ছামি"।

কিন্তু ত্রিপুরীতে বুঝা গেল, মানুষ যতই বদলায় ততই সে পূর্ব্বের মত থাকিয়া যায়। অবতারবাদ সঙ্ঘরূপ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের ব্যক্তিরূপকেই আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। ত্রিপুরীর এই তত্ত্বটিই বুঝাইয়া দিয়াছে সঙ্ঘ আর ব্যক্তি একই কথা। কিম্বা তাহাও নয়, শাস্তাই সব, সঙ্ঘ তাহার দেহ মাত্র—The Church is only the body of the Christ। এই পরমগুহ্য গভীর তত্ত্ব দিনের পর দিন যে উপায়ে, যে নূতন পদ্ধতিতে, যে কূটকৌশলে ত্রিপুরীতে স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহা বাস্তবিক দেখিবার মত, সত্যই কৌতুককর।

বিবৃতির বান

ত্রিপুরী ছিল এবার জাতির মন্ত্রণাগার। দু-এক

পশলা বিবৃতি-বৃষ্টি পূর্ব্বেই হইয়াছিল—সুভাষবাবু রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইলে ডাকিল বিবৃতির বান। কে জানিত যে এ-বানে নর্ম্মদা-তীরের মন্ত্রণাগার ভাসিয়া যাইবে? অহার মধ্যে দুই-একটি ঢেউ মনে না রাখিলে এই ত্রিপুরীর তট-সীমানাই চিনা যাইবে না। প্রধান কথা এই, মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা, সর্দার বল্লভভাই পটেল তারযোগে জানাইয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন 'দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে।' তৃতীয় কথা, সুভাষবাবু বিবৃতি-সূত্রে বলিলেন—অনেকেই মনে করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের অনুকূলে মত আছে; তাঁহারা চান না যে, এবার বামপন্থী কেহ রাষ্ট্রপতি হইয়া তাঁহাদের আপোষ-রফার পথে কাঁটা হইয়া উঠে। কথাটায় নূতন কিছু ছিল বলিয়া তখন কেহ মনে করে নাই। নির্ব্বাচক-মণ্ডলী একটা নূতন কাণ্ড করিল—পটেলী পরোয়ানা বাতিল করিয়া সুভাষচন্দ্রকেই করিল রাষ্ট্রপতি। তার পর—কিন্তু তার পরের অধ্যায়ই নাটকীয় সম্ভাবনায় সুসমৃদ্ধ। নেপথ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাত্মাজী বলিলেন—"এ আমার পরাজয়", শুধু তাহাই নয়—"নিজ সহযোগীদের সম্বন্ধে সুভাষবাবুর উক্তি অযথার্থ ও অশোভন", "যাহা হউক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নহেন।" জনসাধারণ একটু চমকিত হইল—মহাত্মারাও তাহা হইলে মানুষই। কিন্তু সুভাষবাবুর পক্ষে ভোট দেওয়ার অর্থ কি মহাত্মাজীর বিপক্ষে ভোট দেওয়াই? কে বুঝিয়াছিল যে, দ্বন্দ্বটা সুভাষচন্দ্র ও পট্টভী-পটেলের মধ্যে নয়, দ্বন্দ্বটা সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মাজীর মধ্যে! জলপাইগুড়ির প্রস্তাবিত কার্য্যধারা পকেটে পুরিয়া, সমবেত সমর্থকদের সম্মতি লইয়া সুভাষচন্দ্র বাহির হইলেন প্রয়াগের ও ওয়ার্দ্ধার পথে। ফিরিলেন হৃষ্টচিত্তেই—তবে সুস্থ দেহে নহে। তিনি কংগ্রেসী (পার্লিয়ামেণ্টারী) মন্ত্রি-নীতিতে জোর করিয়া ছেদ টানিতে চান না, তিনি চান মাত্র একটু গতিবেগ বাড়াইতে—তাও কংগ্রেসের পুরাতন পথেই, চিরাচরিত নীতিতে অব্যাহত থাকিয়া। ভাবিয়াছিলেন হয়ত এই কথায় অনেক সংশয় ঘুচিয়া যাইবে। যেটুকু রহিল—যেমন জওাহরলালজীর আপত্তি—তাহাও কার্য্যক্রমের আলোচনায় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিলেই হইবে।

কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না, জওাহরলালজীর আপত্তি খণ্ডিত হইল না। এলাহাবাদে সুভাষ-সমর্থক কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন—তাই তো জওাহরলালজী না সুভাষ? অভিজ্ঞ নেতৃবর্গ না নির্বাচিত রাষ্ট্রনেতা? ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি মিলিত হইল, দ্বাদশ রথী বলিলেন—আমরা পদত্যাগ করিলাম; ত্রয়োদশ মহারথী কহিলেন—এবার বিদায়। পটেল-পন্থীদের মতে,—সুভাষবাবু শুধু একমতাবলম্বীদের লইয়া কংগ্রেস চালান; জওাহরলালজীর মত—আপন 'সহকর্ম্মীদের' প্রতি সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচনকালীন বিবৃতিতে যে দোষারোপ করিয়াছেন, সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করেন না কেন? তর্কের তুফান বহিল, বিবৃতির বন্যা নামিল। ভরসা জওাহরলাল। 'বিশ্লেষণের' বায়ুস্ফীত পাল তুলিয়া পণ্ডিতজী কোথায় যে পাড়ি জমাইলেন ব্যাকুল জনসাধারণ তাহার ঠিকানাই পাইল না।

ত্রিপুরীর পূর্ব্বে যাত্রীরা মনে মনে স্থির জানিত, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র এবার সম্প্রসারিত হইবে নিশ্চয়; আন্দোলনও এবার আর বিধি-মাফিক চাপা দেওয়া থাকিবে না। তাহাদের মনে মনে ধারণা—পুরাতনে নবীনে একটা বুঝাপড়া হইবে, সংগ্রামাত্মক কার্য্যক্রম স্থির হইবে, জলপাইগুড়ি প্রস্তাবাবলম্বনে। তাহাদের বিশ্বাস—এবার বলপরীক্ষা—বামপন্থীতে ও দক্ষিণপন্থীতে। তাঁহাদের আশঙ্কা—বুঝি কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়! সমাজতন্ত্রী ও সাম্য-বাদীরা বলিলেন—ভয় নাই। আমরাই এই ভেদ রোধ করিব, ঐক্য ঘটাইব আমরা—আমরা যাহারা সংগ্রাম চাই। 'বামব্যূহ' (Left Bloc) 'সম্মিলিত জাতীয় বাহিনী'কে (United National Front) খণ্ডিত হইতে দিবে না, তাহারা আনিবে ঐক্য, আনিবে সংগ্রাম। তাহাদের মন্ত্র হইল দুটি—"সংগ্রাম" ও "সংহতি"। বুঝা গেল, ত্রিপুরীক্ষেত্রে ভারতভাগ্যবিধাতা হইবে "মহাত্মাজী"।

ঠিক এমনি সময়ে বান্‌চাল কংগ্রেসের উপর হইতে শঙ্কিত দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়া শ্রীযমুনালাল বাজাজ চলিলেন

জয়পুরে আর মহাত্মাজী উপস্থিত হইলেন রাজকোটে। প্রমাণ করা চলিল, 'তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরা' কাজ করিতে জানে—হরিপুরার নিরপেক্ষতা-নীতি প্রয়োজনমত উড়াইয়া দিতেও পারে। ত্রিবাঙ্কুর হইতে তালচের পর্য্যন্ত ইতিহাসটা এক দিনে ঢাকিয়া দিয়া মহাত্মাজী তাঁহার অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কোথায় গেল কংগ্রেসের সঙ্কট? মহাত্মাজীরই জীবন যে সঙ্কটাপন্ন। জওাহরলালজী বলিলেন, আজ ভারতবর্ষের চক্ষে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন রাজকোট।

ত্রিপুরীক্ষেত্র

ত্রিপুরীতে জয়পরাজয়ের খেলা সুরু হইল। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীরা পূর্ব্বেই আসিয়া জুটিয়াছেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সাধনা চলিল। জলপাইগুড়ির সংগ্রামাত্মক প্রস্তাব পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া শ্রীজওাহরলাল নেহ্রুর নিকট তাঁহারা তাহা পেশ করিলেন—সংগ্রাম চাই, তবে চরমপত্র না দেওয়াই স্থির। জওাহরলালজীরও অনেকটা এইরূপই অভিমত নয় কি? আর সুভাষবাবুর পক্ষে তাঁহার সেই আপত্তিকর বিবৃতিটিও প্রত্যাহার করা প্রয়োজন—কারণ, সংহতি চাই। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীদের সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, কাজের মত কাজ হইতেছে, ত্রিপুরীক্ষেত্রে তাঁহাদেরই এই সংগ্রামাত্মক প্রস্তাব সমস্ত স্থান জুড়িয়া রহিবে। তাই, অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গেও তাঁহাদের এই প্রস্তাব লইয়াই আলোচনা চলিল—আর আলোচনা চলিল মিলন-সূত্র লইয়া। সেই সূত্র কি? পণ্ডিত জওাহরলাল তাহাই দক্ষিণপন্থীদের নিকট হইতে স্থির করিয়া সমাজতান্ত্রিকদের ও রোগশয্যাশায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। আলোচনা চলিল গভীর রাত্রিতে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে। অপরাহ্ণে জানা গেল, প্রস্তাব তৈয়ারী হইয়া আছে; রাষ্ট্রপতির না জানা থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার দপ্তরখানার সে নোটিশও আসিয়াছে, তাহাতে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস সদস্যদের উপস্থিত ৩৫০ জনের মধ্যে ১৬০ জন স্বাক্ষর করিয়াও দিয়াছেন—তাঁহাদের প্রার্থনা এই প্রস্তাবই যেন প্রথম আলোচিত হয়।

ইহাই পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব। প্রস্তাব ন—শুধু উঠিল কেন?—তাহার পর হইতে আর অন্য প্রস্তাবই রহিল না। ত্রিপুরীক্ষেত্রে আসন জুড়িয়া বসিলেন এবার দক্ষিণপন্থীরা। বিজয়ী বামপন্থীদের হাত হইতে একটি নিমেষে আলোচনার চাবিকাঠি আসিয়া গেল দক্ষিণপন্থীদের হাতে—কোথায় রহিল সংগ্রামাত্মক জাতীয় দাবির প্রস্তাব? কে যাচাই করে কংগ্রেস গঠন-নীতি-পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের অভাবনীয়তা? কে-ই বা আর প্রশ্ন তুলিবে দেশী-রাজ্যের আন্দোলন সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবে?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে এই প্রস্তাবেরই স্বপক্ষে বা ইহার সংশোধনের স্বপক্ষে বক্তৃতা চলিল—নির্লিপ্ত স্থির দৃষ্টিতে প্রাক্তন নেতৃবর্গ বসিয়া আছেন, দৃঢ়, কঠিন জওাহরলালজীর মুখমণ্ডল, আর বক্তৃতা-মঞ্চের উপর হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল আবেদন, নিবেদন, বিনয়, বিচার—এবং 'মহাত্মাজী'।

বামপন্থী বনাম নামপন্থী

'মহাত্মাজী'—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ ৪৫ মিনিটের প্রাঞ্জল হিন্দীতে মাত্র ১৮১ বার 'মহাত্মাজী'র উল্লেখ করেন, মাত্র বার পনর বলেন 'তাঁহার উপর 'বিসোয়াস' (বিশ্বাস) রাখিতেই হইবে, আর তাহা রাখিতে হইলে এই প্রস্তাবের কমে চলিবে না। ইহার কমে চলিবে না—', 'একটি কমাও পরিবর্ত্তিত হইবে না'—'হয় গ্রহণ কর নয় ত্যাগ কর'—'একমাত্র মহাত্মাজীই পরিত্রাতা'; তাঁহার মূলনীতি ও তদনুসৃত কার্য্যক্রমই গ্রাহ্য; আর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দের সম্পূর্ণ আস্থা ঘোষণা প্রয়োজন, প্রয়োজন তাঁহাদের প্রতি দোষারোপের জন্য দুঃখপ্রকাশ।—লিপিকুশলতায় এ প্রস্তাব অনিন্দ্যনীয়। একই সূত্রে, 'মহাত্মাজী পর বিসোয়াস' (বিশ্বাস) এবং তাঁহার নীতি ও কার্য্যকরী সমিতির প্রতি 'বিসোয়াস' অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হইয়া আছে; সাধ্য নাই ইহার গ্রন্থি খসানোর, 'একটি কমাও পরিবর্ত্তিত হইবে না।' এ প্রস্তাব নয়, এ চরমপত্র, নন্-কো-অপারেশনের পূর্ব্বাভাস।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের বামপন্থীদের মধ্যে মিলনের সূত্র শিথিল। দৃঢ় করিয়া বাঁধিবার মত স্বাস্থ্য ও সুযোগ তাঁহার নাই। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের কলহ, আবার সকলেরই সন্দেহ সুভাষচন্দ্রের পার্শ্বচর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, আণে, শঙ্করলাল প্রভৃতির উপর। সমাজতন্ত্রীদের ভয়, সুভাষচন্দ্র উঁহাদের পরামর্শমতই চলিবেন; তাঁহাদের আপত্তি, সুভাষচন্দ্র পুরাতন নেতৃমণ্ডলের সহিত মিলনের পথ-সন্ধানে ব্যগ্র নহেন, তাঁহাদের ক্ষোভ, তিনি তাঁহার বিবৃতি তখনও প্রত্যাহার করেন নাই। প্রকাশ্য সভায় রাষ্ট্রপতি এক বার জানাইলেন, তাঁহার বিবৃতির মর্ম্ম এ নহে যে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থাই ছিল। কিন্তু গোবিন্দবল্লভ পন্থ এই কথা যথেষ্ট মনে করিলেন না, সমাজতন্ত্রীরাও ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না। বিভিন্ন বামপন্থীর দূরত্ব রহিয়া গেল বরাবর যেমন ছিল। অবশ্য, সমাজতন্ত্রীরা কোন সময়েই বামব্যূহতে স্বীকৃত ছিলেন না; এবার ঘটনাস্রোতে শুধু এক সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এই ঘটনাসূত্রেই এবার তাঁহাদের সাম্যবাদীদেরও সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছে, একটা নীতির সূত্রও জুটিয়াছে "সংগ্রাম" ও "সংহতি"।

কিন্তু "সংহতির" অবস্থাটা কি? দক্ষিণপন্থীরা প্রথমে পদত্যাগকালে জানাইয়াছেন—সুভাষবাবু ইচ্ছামতই একমতাবলম্বীদের লইয়া কাজ করুন, বহুমতের মিলন আর চলিবে না। তখন হইতেই এই মিলনের জন্য বামপন্থীরা ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা রহিলেন নিশ্চল। তাঁহাদের এই জন্য তাড়া নাই। তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিতেও চান না। কথাটা দুই দিনের অধিবেশনে সভার পিছনে বসিয়া স্পষ্ট ক'রতেও তাঁহারা ছাড়িলেন না। মিলন যে চাহে সে-ই ইঁহাদের কথা মানিবে—গরজ তাহারই। বলা বাহুল্য, ইহা ভারতীয়-মুসলমান-সুলভ মনোভাব, মিঃ জিন্নার কৌশল, কিন্তু বেশ কার্য্যকরী।

ততক্ষণ সভাস্থল ছাপাইয়া ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল প্রতিনিধি-নিবাসে। মহাত্মাজী না সুভাষচন্দ্র—সাতটি মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিনিধিরা গৃহে গৃহে হানা দিতেছেন, সভাক্ষেত্রের উদাসীন পদত্যাগী নেতৃমণ্ডলী দিনে-রাত্রে নিশীথে-দ্বিপ্রহরে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন। মন্ত্রীমণ্ডলী বলিতেছেন—'মনে কর কত বড় বড় সংগঠনাত্মক কাজে বিভিন্ন প্রদেশে আমরা হস্তার্পণ করিয়াছি; তোমরা কংগ্রেসসেবীরাই তো নিরক্ষরতা-দূরীকরণ-প্রভৃতি কার্য্যে মন্ত্রীদের চেষ্টায় আজ নিয়মিত দক্ষিণায় কত বড় কাজ সুরু করিয়া দিয়াছ, এখন যদি এই কাজ বন্ধ করিতে হয়—।' নেতৃগণ বলিতেছেন—'আমরা কে? মহাত্মাজী বলিয়াছেন তিনি পরাজিত হইয়াছেন। তোমরা যদি তাঁহার পরাজয় না চাও।' মুদ্রিত হিন্দী প্রচারপত্র পাড়ায় পাড়ায় বিলি হইল। অমুদ্রিত প্রচার-বাণী আরও কৌতুককর। 'পীড়া, রাষ্ট্রপতির পীড়া? সে পলিটিকাল ব্যাপার, সিনেমা-শো'। নানা সূত্রে উচ্চবাক্ যন্ত্রে বিভিন্ন নেতৃমণ্ডলী ক্রমাগত শুনাইতেছেন 'মহাত্মাজী' 'মহাত্মাজী'। আর প্রশ্নটি দাঁড়াইল এই—মহাত্মাজী না সুভাষ? মহাত্মাজী না সিনেমা?

"সম্মিলিত ব্যাক্"

অতএব, 'মহাত্মাজী কী জয়' মন্ত্রণার আর প্রয়োজন নাই, মন্ত্র লাভ করা গিয়াছে, 'মহাত্মাজী'। কিন্তু এই নাটকের মধ্যে প্রহসনাংশ আপনাদের অজ্ঞাতসারে জোগাইলেন বামপন্থীরাই—তাঁহারা সমাজতন্ত্রী। কৃষ্ণ প্রতিনিধিদের পক্ষে মূঢ়তা হইয়াছিল কংগ্রেসের 'প্রদর্শনী'তে (ইহাই ইংরেজী demonstration কথাটির রাষ্ট্রভাষাসম্মত অনুবাদ) অকস্মাৎ মাতিয়া উঠা, মূঢ়তা হইয়াছিল প্রতিপক্ষের স্বেচ্ছাচারে তাল হারানো।—ফলে জওাহরলালজী ক্ষুব্ধ হইলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের 'গুণ্ডা' আখ্যা দিবার সুযোগ লাভ করিলেন। ক্রোধ জওাহরলালজীর নূতন নয়—কিন্তু তাঁহার একটি কথা ছিল অযথার্থ—'এ হট্টগোল বাঙালীর কাজ।' সে ধুয়াটি তুলিতে অতঃপর অন্যান্য নেতৃবর্গের আর বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু বামপন্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভুল হইল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'জাতীয় দাবি'র প্রস্তাবের বিরোধিতা। জলপাইগুড়ি-প্রস্তাব তিনি নোটিস না

দেওয়ায় আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশ্য নোটিস ভিন্নই মূল প্রস্তাব ও অন্যান্য সকল প্রস্তাব এবার কংগ্রেসে উত্থাপিত হয়, শ্রীযুক্ত বসুর বেলা হঠাৎ নিয়মের কড়াকড়ি কেন বাড়িল বুঝা দুঃসাধ্য। সেই কারণেই বুঝা অসাধ্য নয়, কেন উষ্মাবশে শরৎবাবু 'জাতীয় দাবি'র বিরোধিতা করেন। কাজটি স্বাভাবিক কিন্তু রাজনৈতিক নয়, বিশেষত তখন বামপন্থীদের মধ্যে যখন ভেদ বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে নিশীথরাত্রে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের মধ্যে আত্মপরীক্ষা বাড়িয়া গেল, 'বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ' ঘনায়িত হইল, 'ডায়েলকৃটিকে'র দাবি নূতন 'বাস্তব পরিস্থিতি'তে নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। পথটা একেবারে নূতনও নয়—গান্ধীপন্থার কোল ঘেঁসিয়াই তো গিয়াছে মার্ক্‌স্‌পন্থীর এই নিরপেক্ষতার নিরুপদ্রব পথ, নিশিশেষে ইহাই আবিষ্কার করিলেন সমাজতন্ত্রীরা। পথ-পরিবর্ত্তনে সাধারণ সমাজতন্ত্রীদের মতামত গ্রহণ করার কথাও তাঁহাদের মনে উঠিল না। ভালই হইল, কারণ সেই উপায় অবলম্বন করিতে গিয়াই সাম্যবাদী নেতারা তাঁহাদের 'শিশুসম সাধারণ সদস্যদের' মতকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, নূতন পথে পা বাড়াইতে পারিলেন না। উভয় দলই একমত হইলেন—বামপন্থীর ঐক্য নয়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ফ্রণ্টকে পাকা করাই দরকার—কারণ, সংগ্রাম সম্মুখে।

কথার মুখে ভাবিবার প্রয়োজন হইল না—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্ট কি গণতন্ত্রবিরোধী নীতির সমর্থক হইতে পারে? বিচার হইল না, যে দারুণ পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র আপনার মূলনীতিকে কিছু কালের মত খর্ব্ব করিয়াও অপরের সঙ্গে মিলন যাজ্ঞা করিতে পারে, সে পরিস্থিতি, সে নিমেষ আমাদের দেশে সমাগত কি না? বুঝিতে চাহিল না, এই অসহযোগের ধমকে যদি যে-কোন শক্তিশালী উপদল সমাজতন্ত্রীদের সম্মিলিত ফ্রণ্টের নামে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিতে পারে, তবে ইহা সম্মিলিত ব্যাক ছাড়া আর কি? তলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা রহিল না, সত্য সত্যই যে-সংগ্রাম সমাজতন্ত্রীরা চাহে, 'জাতীয় দাবি'তে তাহার কথা স্বীকৃত হইয়াছে কি না।

তবে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সেই 'জাতীয় দাবি' উত্থাপন করিলেন কি কারণে? শুধু 'দেশব্যাপী সংগ্রাম' কথাটির মোহে, অথচ এই প্রস্তাবের সংশোধনে যে মূল দুইটি কথা ছিল, স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী গঠন এবং কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত করা—জওাহরলালজী তাহা ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই—উহার উল্লেখও প্রস্তাবে নাই। সমাজতন্ত্রীর নিকট এই 'জাতীয় দাবি'তে কোন্ বিশেষ আনন্দের কথাটি ছিল? সংগ্রাম? সে তো রাজকোটের সংগ্রামের মত, জয়পুরের সংগ্রামের মত, ব্যক্তিবিশেষের বা যূথবিশেষের সংগ্রামে গিয়াই ঠেকিবার সম্ভাবনা, দেশীয় রাজ্যগুলির সংগ্রাম তো স্পষ্টই বুঝা যায় স্থানীয় সংগ্রামে শেষ হইবে। কিন্তু এই সংগ্রাম কথাটির মোহেই জয়প্রকাশ নারায়ণ পন্থ-প্রস্তাবে নিরপেক্ষ হইলেন,—দক্ষিণপন্থীর জয় সুনিশ্চিত করিয়া দিলেন—মার্ক্‌স্‌পন্থীর সহিত গান্ধীপন্থীর মিলন ঘটাইয়া ফেলিলেন।

আসলে যে-কারণে ইহা সম্ভব হইল তাহা এই:—সম্মিলিত ফ্রণ্ট সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রীমহলে চিন্তার স্পষ্টতা নাই; তাই তাঁহারা যুক্তির দ্বারা চালিত হন নাই, চালিত হইয়াছেন সহজ বৃত্তির দ্বারা। দেখা গেল, এই সহজ বৃত্তি 'কার্য্যক্ষেত্রে' মার্ক্‌সীয় উগ্রতা অপেক্ষা গান্ধীর নিরুপদ্রবতার পক্ষপাতী। 'মহাত্মাজী না সুভাষ'; 'জওাহরলাল না সুভাষ', 'বামপন্থীর ঐক্য না সম্মিলিত ফ্রণ্ট,' এই যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন-কণ্টকিত পরিস্থিতি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিল,—মার্ক্‌সীয় যুক্তি নয়—উদ্বেলিত জনসমুদ্রের বিভীষিকা, ভারতীয় চিত্তের নিরুপদ্রব গতি-প্রিয়তা, ত্রিপুরীর মন্ত্র—'মহাত্মাজী কী জয়।'

ত্রিপুরীর দান

ত্রিপুরীতে প্রমাণ হইল—বাক্য ও কার্য্য, দাবি ও দায়িত্বের মধ্যে যে দূরত্ব আছে বামপন্থীরা তাহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। ত্রিপুরীতে প্রমাণ হইল—ভারতীয় দক্ষিণপন্থীদের পুঁজি নিঃশেষ, আজ তাঁহাদের মহাত্মার নাম ভাঙাইয়া না খাইলে চলিবে না। ত্রিপুরীতে প্রমাণ

হইল—দক্ষিণপন্থীরা সুচতুর রণকৌশলী; আর সে কৌশলের প্রধান নীতি হইল—'নাম'। প্রমাণ হইল—'মহাত্মাজীই কংগ্রেস, কংগ্রেস মহাত্মা'—সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এক; খ্রীষ্ট ও চর্চ্চ এক,—'মহাত্মাজী দেবতার অধিক', 'মহাত্মাজী কংগ্রেসের অপেক্ষা বড়', তিনিই সর্ব্বনায়ক, আমাদের হিট্‌লার, মুসোলিনি, ষ্টালিন,—আমরা চাই সর্ব্বনায়ক—"তমেকং শরণং ব্রজ'। এই পবিত্র ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পণ্ডিত জওাহরলাল যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতিকে 'গণতন্ত্র হত্যার জন্য ইতিহাসের নিকট অভিযুক্ত করিতেছিলেন—ইতিহাসের দেবতা তখন কি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি হাতে লইয়া হাস্য করিতেছিলেন? তাঁহার কানে কি পরক্ষণেই বিধ্বনিত হয় নাই—পঞ্জাব-প্রতিনিধিদের বিদায়ধ্বনি—'মহাত্মাজী কী জয়! হিন্দুস্থানকী হিটলারকী জয়!'

ইহাই ত্রিপুরীর দান—মন্ত্রণা নয়, মন্ত্র!

ত্রিপুরীর পর

বাংলা দেশও 'নামে' বিশ্বাসী। কিন্তু সে নাম এখন "সুভাষ'। এক মাস যাবৎ বাঙালী ক্ষেপিয়া গিয়াছে—"বংলার সুভাষের অপমান', 'বাংলার অপমান'। চিন্তা ও কর্ম্মে বাঙালী যে ভারতীয় অন্যান্য প্রান্তীয়দের সঙ্গে পা মিলাইতে পারিল না, তাহার কারণ যদি এই হয়, তবে একটু দুশ্চিন্তার কথা; কারণ, বর্ত্তমান যুগের রাজনীতিতে প্রাদেশিকতার পূজা, গুরুবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার সাধনার অপেক্ষা বেশী, চিন্তার পরিচ্ছন্নতার বা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। বাঙালীত্বের একটা স্থান সংস্কৃতি-জগতে থাকিতে পারে; কিন্তু, "আমাদের পলিটিক্‌স্‌ ভারতীয় আর হিন্দুস্থানীই তাহার বাহন" অন্ততপক্ষে এই বাস্তব সত্য দুইটি মানিতেই হইবে। শুধু বাঙালী হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা নেতৃত্ব করিবার দাবি করিলে ভুলও করিব, অন্যায়ও করিব—ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তৎক্ষণাৎ আমাদের এ দাবিকে অস্বীকার করিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। আমরা যখন 'বাংলার অপমান' বলিয়া আজ গর্জ্জিতেছি ও কাঁদিতেছি, তখন গুজরাটের সেই পাঁচ জন, অন্ধ্রের সেই আঠাশ জন, শতাধিক সংযুক্তপ্রদেশবাসী, আমাদের সহযাত্রী পঞ্জাবী ও পেশোয়ারী, কর্ণাট, তামিল নাড়ুর সেই বন্ধুগণ কি আর আমাদের সঙ্গে স্বর মিলাইতে পারিবেন? কোন কোন ভারতীয় নেতা বাংলার প্রতি বিরূপ তাহা হয়ত সত্য; কিন্তু সে অবিচার বাঙালী ঘোষণা করিলে ব্যাপারটা লজ্জাকর, হাস্যকর এবং তদপেক্ষাও গুরুতর, বাংলার পক্ষেই অনিষ্টকর হইবে। বাংলা-হিসাবেও ভাবিলে আর একটু স্থির-চিত্তে ভাবা উচিত। ত্রিপুরীর ক্ষেত্র হইতে নিখিল-ভারতীয় নেতৃ-মহীরুহ ও ক্রমায়মান নেতৃবৃন্দকে দেখিয়া যাহা মনে হইয়াছে—তাহা এই;—বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, বিশেষ করিয়া তেজস্বিতায়, এই সব উচ্চকীর্ত্তিত নায়কবৃন্দের সমতুল্য অখ্যাত কর্ম্মী বাংলায় প্রচুর আছে। তাহারা যে অখ্যাত তাহার কারণ অন্য প্রদেশের চক্রান্ত নয়—বাংলার অনপনেয় দুর্ভাগ্য। এই কর্ম্মীসমাজের পিছনে বাংলার জনসমাজ নাই—শতকরা ৫৪ জনই বিমুখ। শীঘ্র বাংলার এই দুর্ভাগ্য দূরও হইবে না। তত দিন বাঙালী যদি রাজনীতিতে চিন্তার স্বচ্ছতা ও তেজস্বিতা দান করিতে পারে, তাহাই যথেষ্ট।
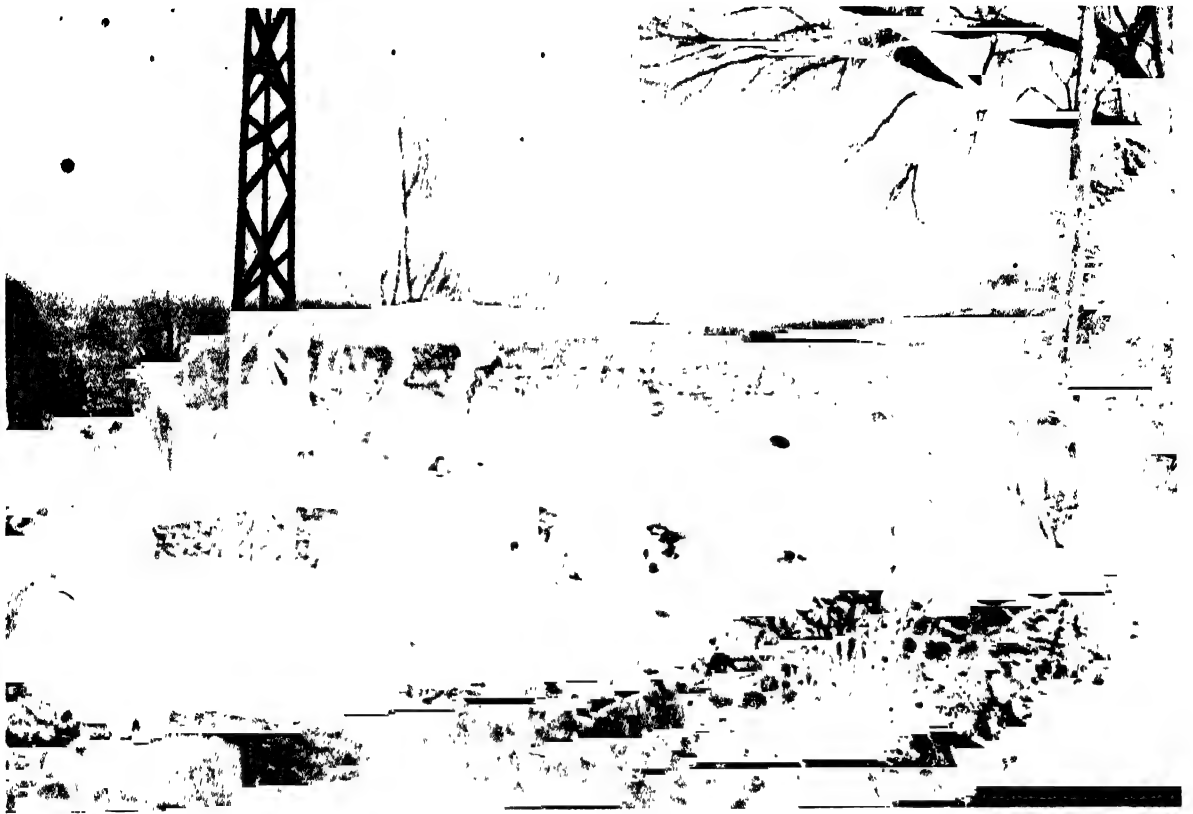
স্পেনের গণতন্ত্রবাদীদের "মহাপ্রস্থান"
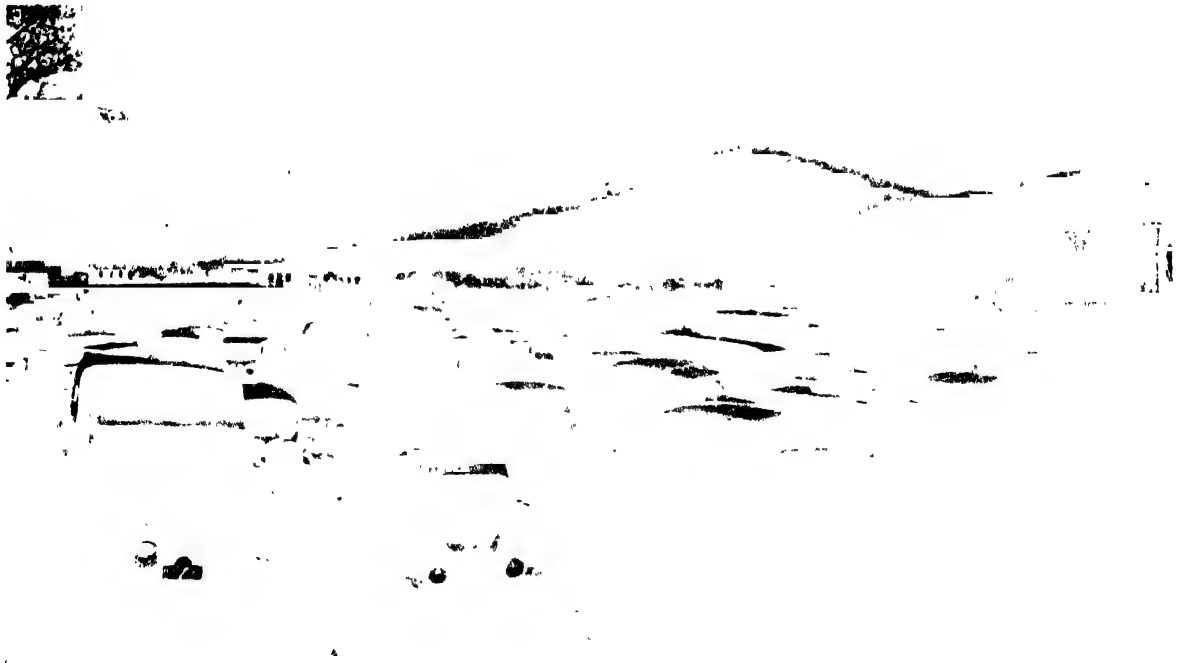
ফরাসী সীমান্তে স্পেনের গণতন্ত্রবাদীদের যানবাহন আটক করা হইয়াছে
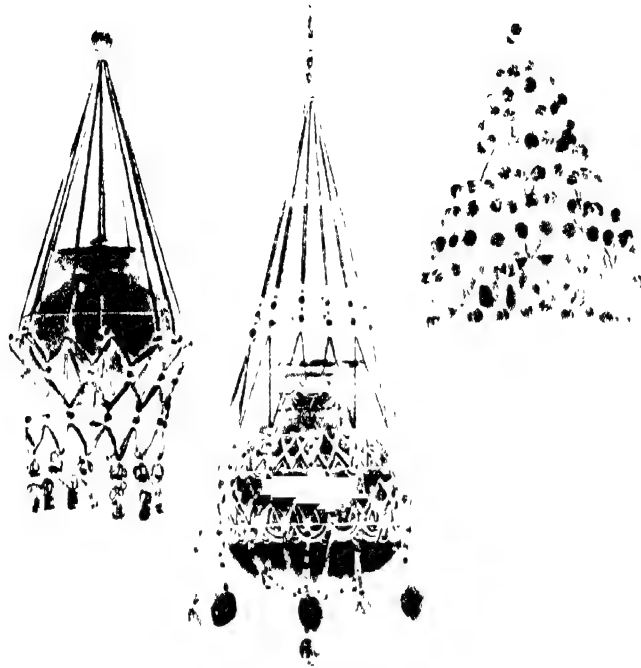
একহারা শিকা।   অনেকগুলি সুপারি রঙীন সুতায় বেষ্টন করিয়া প্রস্তুত শিকাটি লক্ষণীয়
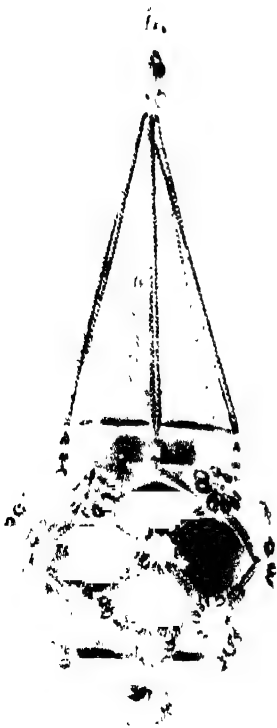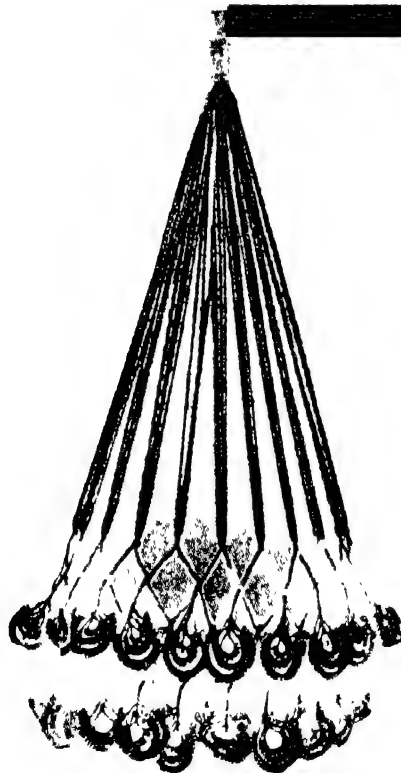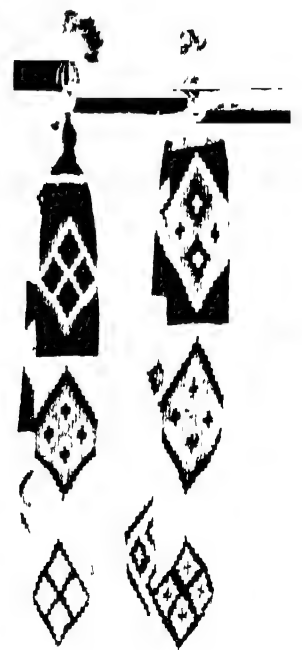
রঙীন কারুকার্যময় শিকা   শিকার মনোরম ঝুমকা   রঙীন আলনা

বাংলার মেয়েদের শিকা-শিল্প

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

বাংলার জাতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত বাঙালীর একটি আত্মদৈন্যের ভাব আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। একমাত্র বাংলা ভাষার বিষয় ছাড়া বাংলার সবপ্রকারের লোকশিল্পের সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এর ব্যত্যয় হয়েছিল শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাংলার ব্রত" বইতে, যাতে তিনি বাংলার সাধারণ জীবনের শিল্প-সৌন্দর্য্যের রসগ্রহণ ক'রে তার ব্যাখ্যা দেশের সামনে ধরেছেন। কিন্তু অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে এই দীনতার গ্লানি আমার মনে জাগে বিশেষ ভাবে এবং তার ফলে ১৯২৯ সালে বাংলার পল্লীর নৃত্য ও গীতির সংগ্রহ ও পুনশ্চর্চ্চার জন্য একটি সমিতি ময়মনসিংহ জেলায় স্থাপন করি। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে সেই সমিতির পরিণতি হয় "বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ্-রক্ষা সমিতি"র অনুষ্ঠানে। এই সমিতির কাজ ছিল কেবল বাংলার লোকনৃত্য ও লোকগীতির সংগ্রহ, পুনশ্চর্চ্চা ও তাদের সরসতার ও মূল্যের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ নয়;—বাংলার অন্যান্য লোকশিল্পের সংগ্রহ ও পুনশ্চর্চ্চা এবং তাদের যথার্থ মূল্যের ও জাতির জীবনে তাদের স্থান-নিরূপণের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করাও। ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাসে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কলিকাতায় ভারতীয় প্রাচ্যকলা-সমিতির আনুকূল্যে আমার সংগৃহীত বাংলার লোকশিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। বাংলার সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনে যে অনুপম শিল্পপ্রতিভার অভিব্যক্তি আছে, তার প্রতি আমি তখন দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করি। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে আমাকে পত্র লিখে তাঁর শুভকামনা জ্ঞাপন করেন। সেই আশীর্ব্বাণীতে তিনি লিখেছিলেন—

বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েচে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ নেই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ বল্‌তে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যে-গীতে কাব্যকলায় অজস্র ভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেচে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডের মতো এখনো তার অবশেষ দেখা যায়, কিছু দিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা
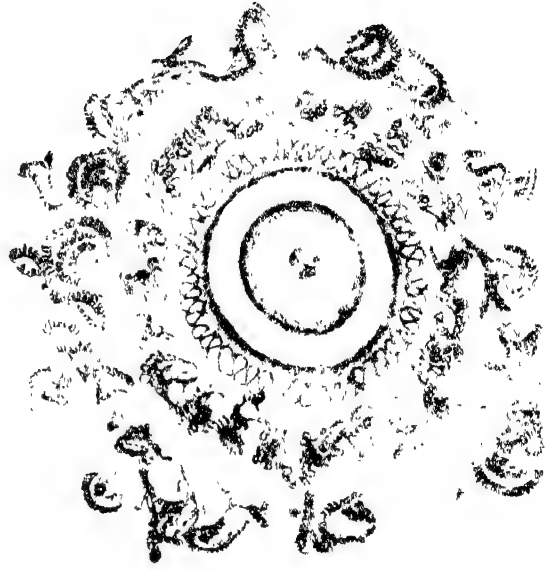
একটি শিকার বহুবর্ণ নিম্নাংশ—দেখিলে মনে হয় একটি বিচিত্র আল্‌পনা শূন্যে ঝুলিতেছে

আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজী স্কুলের "ইস্কুল বয়"—সেই জন্যে পুঁথির নজীর অনুসরণ করে' বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে-সব সৌন্দর্য্য-প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি। * * * জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আবডালে কিছু কিছু আছে
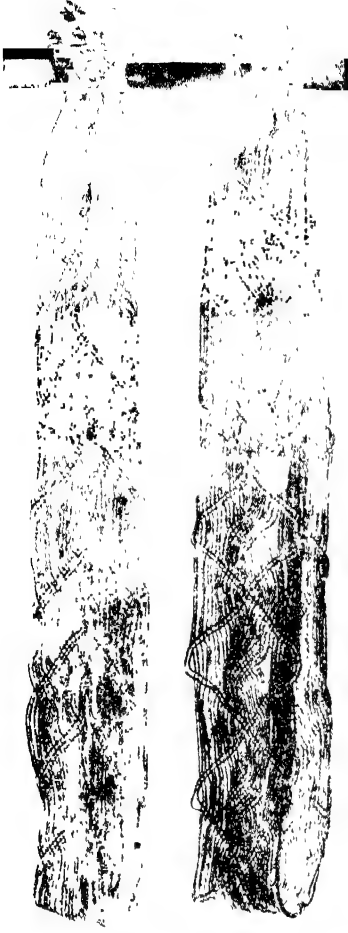
একবর্ণ আলনা

সসঙ্কোচে—আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত ক'রে সর্ব্বজনের মধ্যে তার আসন ক'রে দেবার চেষ্টা করেছেন, এ একটা বড়ো কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণ-শক্তিকে জাগরূক ক'রে রাখে; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। * * * তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক [illegible] সার্থক হোক্।"

রবীন্দ্রনাথের বাণী বিশেষ ক'রে বাংলার লোকনৃত্যের প্রচলনের চেষ্টার বিষয়ে হ'লেও বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ-রক্ষা অনুষ্ঠিত বাংলার সকল লোকশিল্পের পুনশ্চর্চ্চার চেষ্টার বিষয়েই খাটে। আমার সংগৃহীত লোকশিল্পের পূর্ব্বোক্ত প্রদর্শনীতে ও তৎসম্পর্কিত বক্তৃতায় আমি বাংলার পল্লীর মেয়েদের আলপনা-শিল্পের ও কাঁথা-শিল্পের সবিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করেছিলাম। আজ বাংলার মেয়েদের তৈরি শিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। আমার ধারণা, বাংলা দেশের কলারসিকগণ ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় এখনও এই শিল্পকে সমুচিত সমাদরের সঙ্গে দেখতে শেখেন নি।

বনিয়াদী বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে শিকা-শিল্পের একটি উচ্চ স্থান ছিল ও এখনও আছে। বিদেশীয় আদর্শে বিবর্ত্তিতরুচি বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে দেরাজ, আলমারি, শেল্‌ফ্‌ ইত্যাদির যে স্থান, বনিয়াদী বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে শিকা ও আলনা সেই স্থান পূরণ করে। কুটীর-জীবনের সঙ্গে শিকা- ও আলনা- শিল্পের একটি সুন্দর অঙ্গাঙ্গী ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ঘরের আড়বাঁশের সঙ্গে শিকা ও আলনাগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শিকার ভিতরে মাটির নানা প্রকারের ভাঁড়, কলসী, বোয়েম প্রভৃতি থাকে। এই সকল ভাঁড় বা কলসী গৃহস্থালীর নানা প্রকার জিনিষে পূর্ণ থাকে; যেমন, গুড়, পাটালি, চিড়া, সরষে, কলাই ইত্যাদি। লেপ, তোষক, বালিশ প্রভৃতি রাখবার জন্য অবশ্য শিকা ব্যবহার করা হয় না, তার বদলে এক প্রকার টানা ব্যবহার করা হয়। এগুলির এক দিকে ফাঁস থাকে, অন্য দিকে একটা গিঁট থাকে। দরকার-মত গিঁটটিকে ফাঁসে বেঁধে দেওয়া চলে, আবার খুলে দেওয়াও চলে। এগুলিরই নাম আল্‌না।

বিশেষ ক'রে বিড়াল ও ইঁদুরের উৎপাত থেকে খাদ্য-সামগ্রী সংরক্ষিত করে রাখাতেই শিকা-শিল্পের ব্যবহারের অন্যতম সার্থকতা। "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়েছে" এই কিম্বদন্তীটি গার্হস্থ্য জীবনে শিকার বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তার কথা নির্দ্দেশ করে—শিকা-শিল্পে মেয়েরা এমন কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দেন ও শিকাগুলি এত মজবুত ও ভারসহ ক'রে তৈরি করা হয় যে বিড়াল-সম্প্রদায়ের একান্ত ইচ্ছা-প্রয়োগ সত্ত্বেও শিকা ছেঁড়া অতি বিরল ব্যাপার।

সর্ব্বপ্রকার কারুশিল্পে বাঙালী যে এক দিন সিদ্ধহস্ত ছিল, বাংলার আপামরসাধারণ মেয়েদের রচিত শিকাগুলি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, হাতের নিপুণতা, কারিগরি-প্রতিভার ব্যবহারিক প্রয়োগ, খুঁটিনাটির প্রতি সতর্ক মনোযোগ, মজবুতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য এবং সর্ব্বোপরি, সিদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্য্যের ও সুসমঞ্জসতার অঙ্গাঙ্গী সমাবেশ,—এই সকল শ্রেষ্ঠ গুণ-গুলির একাধারে সমাবেশ হয়েছে শিকাগুলির মধ্যে।

আজকাল ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে পল্লীর বনিয়াদী শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তা কেবল চরকা ও তাঁতে আবদ্ধ থাকলে বাংলার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হবে না। অন্যান্য নানা বিস্মৃত কারুশিল্পের মত শিকা-শিল্পের পুনশ্চর্চ্চাও জাতীয় শিল্প-শিক্ষার সংস্কারে সহায়তা করবে।

শিকা দুই রকমের হয়ে থাকে—একহারা শিকা ও ঝাড়-শিকা। একহারা শিকায় কেবল মাত্র একহারা ভাবে একটির উপর আর একটি ক'রে কয়েকটি পাত্র বা ভাণ্ড রাখা যায়। ঝাড়-শিকাতে মূল শিকার চার দিকে ও নীচে অনেকগুলি শাখা-শিকা রচনা করা হয়, তাতে নানা আকারের অনেক পাত্র ও ভাণ্ড ঝুলিয়ে রাখা যায়।

শিকা সাধারণতঃ পাট বা কাপড়ের ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। পাটের সুতোতে রং দিয়ে অথবা শাড়ীর রঙীন পাড়ের সুতোর সুনিপুণ ব্যবহার ক'রে মেয়েরা শিকা-গুলিতে অতি সুন্দর রঙীন পরিকল্পনা রচনা করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুটি আল্‌নার এবং পাঁচটি একহারা শিকার ছবি দেওয়া হ'ল। এর মধ্যে একটি শিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—সেটির নীচে দুই সারি বিনানো জালের ঝুমকার অলঙ্কার অতি মনোরম (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ১০৯ পৃষ্ঠায় শিকার বহুবর্ণ নিম্নাংশের চিত্র দ্রষ্টব্য; মনে হয় রঙীন সুতোর তৈরি একটি আলপনা শূন্যে ঝুলছে। একটি শিকা রচনা করা হয়েছে অনেকগুলি সুপারিকে রঙীন সুতোর আবেষ্টনীর মধ্যে বেষ্টিত ক'রে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বাংলার পল্লীর অন্যান্য কারু- ও গৃহ- শিল্পের মত শিকা-শিল্পেও যে শিল্পনিপুণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ ফুটে উঠেছে, তা আমাদের একটি বিশিষ্ট সম্পদ, তাকে রক্ষা ও পুনঃ-প্রচলন করতে আমাদের ব্রতী হ'তে হবে।

দেশের যাবতীয় বনিয়াদী শিল্পচর্চ্চাকে ও নিষ্ঠাযুক্ত কর্ম্মযোগকে ভিত্তিভূমি ক'রে আনন্দের পরিস্ফুরণ ও প্রগতির অভিযানকেই আমরা ব্রতচারীর ব্রত বলি। অন্যান্য পল্লীশিল্পের মত শিকা-শিল্পের পুনর্জ্জীবন দান করাও জাতীয় শিক্ষায় বাংলার ব্রতচারী-সাধনার অঙ্গস্বরূপ হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ এবং তাহার বিশ্লেষণ—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

শ্রীকিরণকুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল, এল-এল-এম (লণ্ডন), বার-এট-ল

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, এক সম্প্রদায় ইংরেজ ভাবেন যে কেবল ইংলণ্ডের উপর ভারতের বিদ্বেষ-ভাবই তাহার মূলে আছে। উইন্‌ষ্টন্ চার্চ্চিল, পেজ ক্রফ্‌ট্ প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারতশাসন বিলের বিরুদ্ধে ১৯৩৫ সালে পার্লেমেণ্টে বহু বার বক্তৃতা দিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ এই আইনের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তাহাতে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই সংরক্ষিত হইয়াছে। ১১১ হইতে ১১৮ ধারা পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে এই আইনের দ্বারা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ক্ষমতা হোয়াইট হলের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বড় বড় চাকরোদের উপর আমাদের হাত থাকিবে না, যথা, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় পুলিস সার্ভিস ও ভারতীয় মেডিকেল সাভিস। তাহাদের বেতন-বৃদ্ধি, পেন্সন ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ভারতসচিব করিয়া দিবেন এবং গভর্ণর-জেনারেল নিজে তাহাদের বিষয় বিশেষভাবে তদারক করিবেন। এমত অবস্থায় তাহাদের উপর মন্ত্রীদের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় নৃপতিবর্গ যেরূপ বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তাহা

সহজেই অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষের শতকরা ৩৩ জন সদস্য এবং উচ্চ কক্ষের শতকরা ৪০ জন সদস্য তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যগুলি হইতে মনোনীত হইবে। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীল ও ভারতের প্রকৃত উন্নতিশীল আইন-কানুনগুলি রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের জন্য একেবারে কোন মতে পাস হইতে, এমন কি কখন কখন পেশ হইতেও পারিবে না। বস্তুতঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় আইনের সরকারের মনোনীত সদস্যদিগের স্থানগুলি এই রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত হইবে।

লর্ড সামুয়েল, লর্ড লোথিয়ান এবং আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট এই যুক্তরাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতের ঐক্যসাধন করিতে হইলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাঁহারা জানেন যে, এক বার যদি এই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতবাসীদের কাঁধে চড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইংরেজদের ভারতবর্ষ হইতে ধন আহরণের সুবিধা, কর্ম্ম এবং নৃপতিবর্গের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যাইবে। ভারতবাসীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে থাকিবে।

দেশীয় রাজ্যগুলির ৮ কোটি লোকের কথা ব্রিটিশ গভর্ণমণ্টে একবারও ভাবেন নাই। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতের ঐক্য কি করিয়া সাধিত হইল? এক দিকে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীদিগকে কিছু দায়িত্বভার দেওয়া হইয়াছে, অপর দিকে দেশীয় রাজার রাজ্যগুলিতে প্রজাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত দেশীয় নৃপতির প্রজাগণ তাহাদের মনোনীত সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পারিবেন না। তাহার উপর ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Excluded Areas) দায়িত্বশূন্য ভাবে শাসিত হইবে। দেশী রাজ্যগুলির উপর ব্রিটেনের সার্ব্বভৌম শক্তি (Paramountcy) বড়লাট (Viceroy) ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে নিজে ব্যবহার করিবেন। তাহার জন্য তিনি ভারত-সচিবের কাছে দায়ী থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের ইহাতে কোন হাত থাকিবে না। বাটলার কমীটির রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতে ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টও কখনও হইতে পারে না।

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় রাজা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তখন তাহাতে এই কথাই ছিল যে, নৃপতিবর্গ শুধু ইংলণ্ডের রাজার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিবেন। একটু দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পার্লেমেণ্ট ব্রিটেন-রাজের সার্ব্বভৌম শক্তিটি (প্যারা-মাউণ্টসী) যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থাৎ তাহার মন্ত্রীদের হাতে দিতে পারে। কারণ, আইনতঃ ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের রাজার প্রত্যেক বিশেষ অধিকার (prerogative) পার্লেমেণ্ট বর্দ্ধিত, সঙ্কুচিত কিংবা একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে। অতএব পার্লেমেণ্ট এই বিশেষ অধিকার একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বজেটের শতকরা ৮০ টাকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের কোন হাত থাকিবে না।

বাকী শতকরা ২০ টাকার উপর বড়লাট বাহাদুরের ক্ষমতা আছে। এমন অবস্থায় দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি যথা, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, কৃষিকার্য্য, বেকার-সমস্যা সমাধান প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য আবশ্যক কার্য্যগুলি অর্থাভাবে অবহেলিত থাকিবে; তাহার পরিবর্ত্তে রাজস্বের শতকরা মোটামুটি ৫৭ টাকা সৈন্যবিভাগে ব্যয় হইবে। "দেশরক্ষা"-কার্য্যের উপর যুক্তরাষ্ট্রের কোন হাত থাকিবে না।

বড় বড় চাকুরি যাহা কিছু হইবে সবই ভারতসচিবের হাতে কিংবা বড়লাটের হাতে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয়দের পক্ষে বিষবৃক্ষ। আমরা যদি এক বার এই আইন মাথায় করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। দাসত্ব নির্ম্মম ভাবে আমাদের উপর চিরকালের জন্য চাপিয়া বসিবে।

এখন কথা হইতেছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যদি বলেন গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাগুলির

ব্যবহারে মন্ত্রীবর্গের উপদেশ দ্বারা চালিত হইবে, তাহা হইলে আমরা কি যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে পারি? আমার মতে তথাপি কখনও উহা গ্রহণীয় নহে। কারণ তাহা হইলেও কতকগুলি বিষয়ে দ্বৈরাজ্যের (ডায়ার্কির) কুফল রহিয়া যাইবে। তাহার উপর বহির্ভূত অঞ্চল-গুলিতে এবং বৈদেশিক সমুদয় ব্যাপারে ক্ষমতা একেবারে লাট বাহাদুরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

অতএব এগারটি প্রদেশে যে আশ্বাসবাণী ব্রিটিশ গভর্ণ-মেণ্ট দিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে সেই আশ্বাসবাণী গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রটি চালাইবার জন্য যদি দেন, তথাপি আমরা যুক্তরাষ্ট্র কোনও মতে স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, এগারটি প্রদেশে ইংরেজদের কোন নিজস্ব স্বার্থ (vested interests) সংরক্ষিত নাই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সমস্তগুলি উহারা পূরাপুরি নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়াছে। অতএব "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" গ্রহণ করা আর যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করা এক কথা নহে! দুটিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

একটি গণপরিষদ্ আহ্বান আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রবিধি প্রস্তুত হইবে। প্রত্যেক জাতির নিজেদের দেশের জন্য রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করা জন্মগত অধিকার, ইহা হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। এক-আধটুকু বদল করিলে যুক্তরাষ্ট্র-সমস্যার সমাধান হইবে না। কয়েক জন কংগ্রেসী লোক মনে করেন এবং বক্তৃতায় মনের এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের জায়গায় যদি ঐ সমস্ত রাজ্য হইতে প্রজাদের মনোনীত লোক আসে তাহা হইলেই যুক্তরাষ্ট্র-যন্ত্র চালাইতে কংগ্রেসের মত দেওয়া উচিত। জানি না কেন তাঁহারা এরূপ বলিতেছেন।

আয়ারলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৯২১-২২ সালে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আয়ারলণ্ডকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের রাষ্ট্রবিধি প্রস্তুত করিয়া লও" এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সেই রাষ্ট্রবিধি একটুও পরিবর্ত্তিত না করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ১৯২১-২২ সালে যাহা আয়ারলণ্ডের জন্য করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে করুন। ইহাতে ভারতে শান্তি বিরাজ করিবে। আমার মনে হয় শান্তির আশা সুদূরপরাহত। ভারত শান্তি চায়, কিন্তু সে শান্তি ন্যায্য দাবির উপর স্থাপিত হইবে, এই তাহার স্পষ্ট দাবি।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, "তোমাদের প্রতিনিধি লইয়া গিয়া আমরা গোলটেবিল বৈঠকে বসাইয়া তো এই আইন প্রণয়ন করিয়াছি।" ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, যে-সমস্ত 'প্রতিনিধি' মনোনীত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ভারতীয়দের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত লোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের নাম হইতেই বোঝা যায় যে আমরা ঐরূপ সদস্য কখনই পাঠাইতাম না। দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে লওয়া হইয়াছিল শুধু কতকগুলি নরপতি ও তাঁহাদের মন্ত্রীদের এবং প্রদেশগুলি হইতে লওয়া হইয়াছিল কতকগুলি লোক যাহারা সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ। দুই-চারি জন ছাড়া অধিকাংশ লোককেই দেশের প্রতিনিধি বলা যায় না। বস্তুত যখন তাঁহাদের নাম সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল তখন স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, তাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের ও সাম্প্রদায়িকতার সংরক্ষণ ছাড়া আর কোন উচ্চজাতীয় কথা ভাবিতে বা ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী এবং দুই-চার জন লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই ছোট ছোট কথা লইয়া দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ কংগ্রেসের দলপতিরা যদি ঐ বৈঠকে যাইতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই আইন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস করিতেন কি না জানি না। করিলেও গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে দেশের প্রতিনিধিদের কথা শুনিতে পাইতেন এবং বুঝিতে পারিতেন যে, যে-আইনের খসড়া তাঁহারা করিতেছেন তাহা ভারতবর্ষ কখনই লইবে না।

তখনকার ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোর বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের শক্তি নাই; তাই তিনি কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এখন বোধ হয় তাঁহার চৈতন্য উদয় হইয়াছে। এগারটির মধ্যে এখন আটটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন করিতেছে।

আমার বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০-৩২ সালে যে ভুল করিয়াছিলেন, সে ভুল তাঁহারা যেন আর না করেন। তাঁহাদের মনে যেন সর্ব্বদা এই ধারণা থাকে যে, কংগ্রেস একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান—লক্ষ লক্ষ নরনারী, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান, পার্সি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। যখন এই মহাপ্রতিষ্ঠানের দাবি হইতেছে যে গণপরিষদ দ্বারা আমাদের শাসন-প্রণালী প্রস্তুত করা হইবে, সে দাবি অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অত্যন্ত অল্পবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র হয় আমাদের দ্বারা গণপরিষদ আহূত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তৎপর হওয়া উচিত।

লক্ষ্মী

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সরস্বতী

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
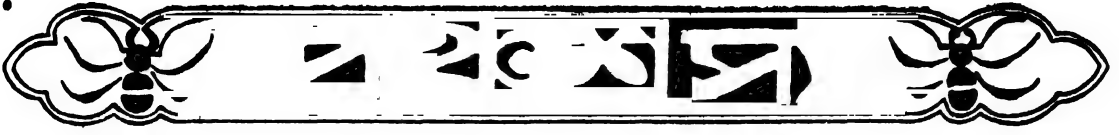
ব্যোম-রশ্মি বা 'কস্‌মিক-রে'
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুগের পদার্থতত্ত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিকেরা স্থূল জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতেছেন। জড় পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য উপাদান লইয়াই তাঁহাদের কারবার। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবেও তাঁহাদের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে না। পরোক্ষ প্রমাণের সহায়তায় তাঁহারা সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম এবং অতিসূক্ষ্ম হইতে মহাসূক্ষ্মে উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করিতে করিতে যেখানে অদৃশ্য পরমাণুতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগের মনীষীরা সেখানেই আবার বৈচিত্র্যের খেলা দেখিতে পাইতেছেন। এই বৈচিত্র্য যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জড়বস্তুর মৌলিক উপাদানের রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতেই আর এক অদ্ভুত ঘটনা পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঘটনাটা সাধারণ দৃষ্টিতে তেমন কিছুই নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত সাধারণ দৃষ্টির তফাৎ ঐখানে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা হইতে তাঁহারা জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা তুচ্ছ ঘটনাটার কারণ অনুসন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ঘটনাটা এই:—

অতি সামান্য মাত্রায় হইলেও কোন বস্তুতে তড়িতাবেশ আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহু দিন হইতেই 'গোল্ড-লিফ ইলেক্‌ট্রোস্কোপ' নামে অতি সাদাসিধা এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ধাতুনির্ম্মিত একটি চতুষ্কোণ বাক্সের উপরিভাগে বড় ছিদ্র করিয়া তাহাকে অ্যাম্বার অথবা গন্ধক-জাতীয় কোন তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থের ছিপি দিয়া বন্ধ করা হয়। ঐ ছিপির মধ্যস্থলে একটি ছোট ছিদ্রের মধ্যে একটি পিতলের দণ্ড চাপিয়া বসানো থাকে। দণ্ডের এক প্রান্ত বাক্সের বাহিরে এবং অপর প্রান্ত বাক্সের মধ্যে ঝুলানো অবস্থায় থাকে। এই ঝুলানো অংশের প্রান্ত ভাগে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি চওড়া খুব পাতলা এক জোড়া সোনার পাত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। অ্যাম্বার, গালা অথবা কাচ নির্ম্মিত কোন পদার্থকে পশমী বস্ত্রের সাহায্যে বার বার ঘর্ষণ করিলে তাহাতে এক প্রকার তড়িৎ-শক্তির উন্মেষ ঘটে। ঘর্ষণের পর গালা বা অ্যাম্বার নির্ম্মিত পদার্থকে বাক্সের পিতলের দণ্ডটির সহিত স্পর্শ করাইবা মাত্রই তড়িৎশক্তি তাহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্বর্ণপত্র দুইখানির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তড়িতের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ধনাত্মক তড়িৎ ঋণাত্মক তড়িৎকে অথবা ঋণাত্মক তড়িৎ ধনাত্মক তড়িৎকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সমধর্ম্মী তড়িতাবিষ্ট পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। কাজেই এক জাতীয় তড়িৎ উভয় স্বর্ণপত্রের মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। স্বর্ণপত্রের এই
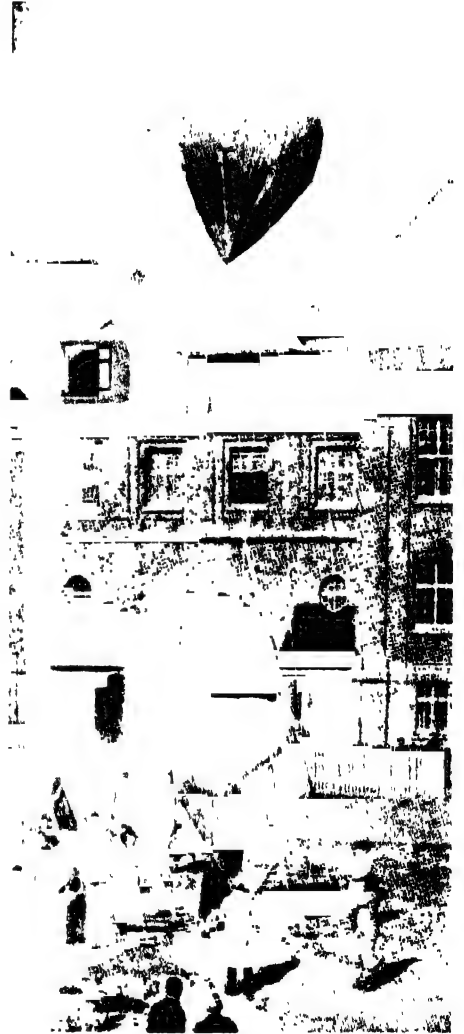
প্রোফেসর রিজেনারের বেলুন পরীক্ষা। তিনি প্রায় ১৭ মাইল ঊর্দ্ধে বেলুন উড়াইয়া 'কস্‌মিক-রে'র তীব্রতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যন্ত্রের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া যে বাতাস বহিয়াছে বা অন্য কোন পদার্থ থাকিলে তাহার তড়িৎ-পরিচালনক্ষমতা
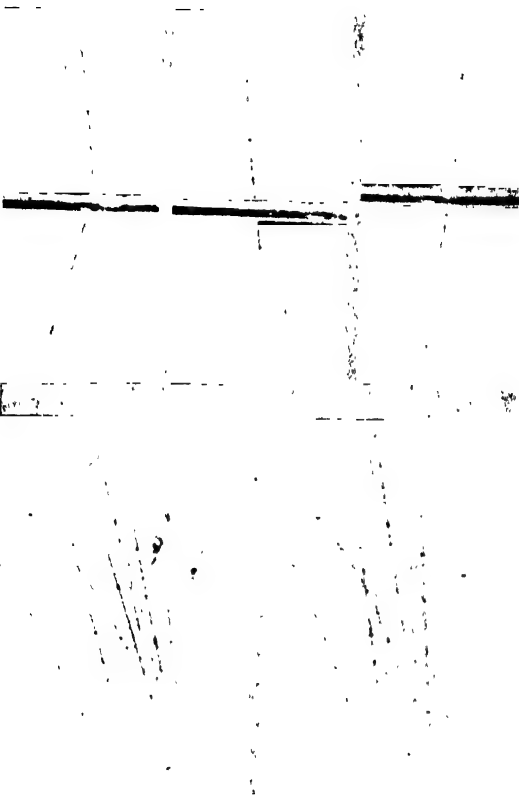
প্রোফেসর ব্ল্যাকেট ও অক্সিয়ালিনি কর্তৃক 'কস্‌মিক-রে' স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে গৃহীত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের ফটোগ্রাফ

পরীক্ষা করা যাইতে পারে। মৃত্তিকাসংলগ্ন কোন ধাতব তার ঐ পিতলের দণ্ডে ঠেকাইবা মাত্রই স্বর্ণপত্রের তড়িতাবেশ তৎক্ষণাৎ মাটিতে চলিয়া যাইবে। তড়িতাবেশ চলিয়া গেলেই স্বর্ণপত্র দুইটি পুনরায় একত্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহা জানা কথা, বাতাসের মধ্য দিয়া তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না, কারণ বাতাস তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থ। বাতাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকিলে তাহা তড়িৎ পরিচালন করিতে পারে। প্রজ্বলিত দীপশিখার নিকট হইতে যন্ত্রের পিতলের দণ্ডের আশেপাশে ফুঁ দিয়া বাতাস প্রবাহিত করাইলেও বিচ্ছিন্ন স্বর্ণপত্র দুইটি অতি ধীরে ধীরে একত্র হইয়া থাকে। কারণ প্রদীপের দহন ও উত্তাপের ফলে বাতাসের পরমাণুগুলি এক অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে তড়িৎ-পরিচালন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। রঞ্জন-রশ্মি বা রেডিয়াম-জাতীয় স্বতোবিকিরণকারী পদার্থের রশ্মি প্রয়োগ করিলেও বাতাস তড়িৎ-পরিচালক হইয়া পড়ে। কারণ এই সকল ভেদকারী অদৃশ্য রশ্মির সংঘাতে বাতাসের অণুপরমাণুগুলি বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের চতুর্দ্দিকে ঋণ-তড়িতাবেশযুক্ত 'ইলেকট্রন' কণিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কক্ষস্থিত ঋণ-কণিকাগুলির তড়িতাবেশ একত্রযোগে অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীনের ধনতড়িতাবেশের সমান হওয়ার ফলেই অণুগুলি তাড়িতিক সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। যখন কোন পরমাণু বা তাহাদের কোন অংশ ভীমবেগে ছুটিয়া আসিয়া অপর কোন পরমাণুকে ধাক্কা দেয়, তখন পরমাণুর কক্ষস্থিত এক বা একাধিক ইলেকট্রন-কণিকা কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে। রঞ্জন-রশ্মি বা রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থের রশ্মি-কণিকার সংঘাতেও পরমাণুর ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ঋণ-তড়িতাবেশ কমিয়া যাওয়ায় পরমাণুটি তাড়িতিক সাম্যাবস্থায় না থাকিয়া ধন-তড়িৎ-প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। কক্ষচ্যুত এক বা একাধিক ইলেকট্রন কণিকা নিকটবর্ত্তী অপর যে-কোন একটি অণু বা পরমাণুর স্কন্ধে ভর করে। ইলেকট্রন-কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি হেতু সেই পরমাণুটি তখন ঋণ-তড়িৎ-প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইলেকট্রন-কণিকার সংযোগ ও বিয়োগে যে দুইটি পরমাণু তাড়িতিক অসাম্য অবস্থায় উপনীত হইল, ইহাদিগকেই 'আয়ন' বলা হয়। পরমাণু এইরূপে আয়ন-কণিকায় পরিণত হইলেই তাহাদের উপর অন্য শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ তাহারা অন্য শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয় অথবা দূরে সরিয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইলেকট্রোস্কোপের স্বর্ণপত্রে তড়িৎ সঞ্চারিত হইলেই তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিবে। যন্ত্রের পিতলের দণ্ডটির সহিত কোন ধাতব তার, জল বা অন্য কোন প্রকার তড়িৎ-পরিচালক পদার্থের সংস্পর্শ না থাকিলে ঐ বিচ্ছিন্ন স্বর্ণপত্র বরাবরই বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিবে। কারণ প্রবাহিত হইবার কোন রাস্তা না পাওয়ায় তড়িৎশক্তি বাহিরে গিয়া অথবা বাহির হইতে বিপরীতধর্ম্মী শক্তি আহরণ করিয়া সাম্যাবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে না। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-পরমাণুগুলি সাধারণতঃ তাড়িতিক সাম্যাবস্থায় থাকিবারই কথা—কাজেই তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু ইলেকট্রোস্কোপের বিবিধ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যন্ত্রটি সর্ব্বপ্রকার সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তড়িতাবিষ্ট স্বর্ণপত্র দুইটি ধীরে ধীরে একত্র হইয়া পড়ে। কেন এমন হয়? বৈজ্ঞানিক গাইটেলের মনে এইরূপ সংশয় জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং এই তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াই পরবর্ত্তী কালে 'কস্‌মিক-রে'র মত এক অভাবনীয় বিরাট্ শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯০০ সালে গাইটেল এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি দেখাইলেন, সাধারণ অবস্থায় বাতাস প্রায় সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-অপরিচালক হইলেও, কোন বায়ুশূন্য পাত্রের
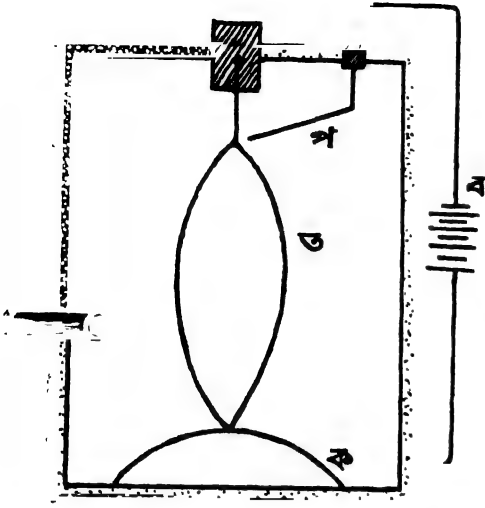
'কস্‌মিক-রে'র আগমনবার্ত্তানির্দ্দেশক ইলেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রের নমুনা

মধ্যে নূতন বাতাস প্রবেশ করাইয়া সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় পাত্রের বাতাস অতি সামান্য পরিমাণে পরিচালকত্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং চার পাঁচ দিন পরে এই পরিচালন-ক্ষমতা চরমে উঠে।

১৯০১ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি. টি. আর. উইলসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া একটি প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, বাতাসকে যেরূপ সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থরূপে ধরা হয় তাহা ঠিক নহে, কারণ পরীক্ষায় দেখা যায় ইহার সামান্য তড়িৎ-পরিচালন ক্ষমতা রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন কলোম্ব ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবেষকেরা অনেকেই এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই ভাবিয়াছিলেন যন্ত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন বিশেষ গুণের ফলেই হউক অথবা যন্ত্রনির্ম্মাণের কোন দোষ-ত্রুটি বশতঃই হউক এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বয়েজ ও এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড বোধ হয় গাইটেল ও উইলসনের গবেষণার বিষয় না জানিয়াই এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষার ফলে তিনিও দেখিতে পাইলেন—বাতাস সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-অপরিচালক নহে।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই রঞ্জন-রশ্মি ও স্বতোবিকিরণকারী পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছিল। এক্স-রে বা রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে হাজার গুণ ছোট। ইহা মাংস, চামড়া ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। রেডিয়াম-রশ্মিরও এরূপ ভেদকারী ক্ষমতা দেখিয়া এক্স-রের মতই এক প্রকার রশ্মি বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। বহুবিধ পরীক্ষার ফলে পরে দেখা গেল, রেডিয়াম হইতে আলফা, বিটা ও গামা নামক তিন প্রকার বিভিন্ন রশ্মি নির্গত হয়। ইহাদের মধ্যে গামা-রশ্মির প্রকৃতি সাধারণ আলোকরশ্মির মত। কিন্তু গামা-রশ্মি সাধারণ আলোক-রশ্মির মত হইলেও ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে বহুগুণ কম, এমন কি উহারা এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতেও ছোট। অন্য দুই প্রকারের রশ্মির প্রকৃতি সাধারণ আলোর মত নহে। ইহারা তড়িতাবেশযুক্ত কণিকার সমষ্টিমাত্র। ধনতড়িতাবেশ-যুক্ত হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের স্রোতই আলফা-রশ্মি নামে পরিচিত। রেডিয়াম হইতে ইহারা সেকেণ্ডে কয়েক হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। বিটা-রশ্মিগুলি ঋণ-তড়িতাবেশযুক্ত
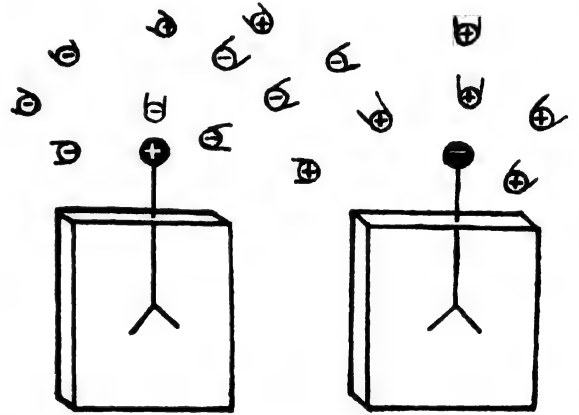
স্বর্ণ-পত্র-সংযুক্ত ইলেক্‌ট্রোস্কোপ ও আয়ন-কণিকার নমুনা

কণিকা বা ইলেকট্রন। ইহারা আলোর সমান গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। রঞ্জন-রশ্মি অথবা রেডিয়াম-রশ্মি প্রয়োগে বায়ুর অণু-পরমাণুগুলি আয়নে রূপান্তরিত হইয়া বাতাসকে তড়িৎ-পরিচালনক্ষম করিয়া তোলে, ইলেকট্রোস্কোপ-সম্পর্কীয় গবেষণার পূর্ব্বেও ইহা জানা ছিল। কাজেই ইলেক্‌ট্রোস্কোপের তড়িৎপ্রভাবান্বিত স্বর্ণপত্র দুইটি বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে কেন ধীরে ধীরে সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকদের নজর স্বভাবতই রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থের উপর নিপতিত হইল। রঞ্জন-রশ্মি নিকটে না থাকিলেও যখন ইলেক্‌ট্রোস্কোপের এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ-নিঃসৃত রশ্মিই বায়ু-পরমাণুর এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা তখন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার ন্যায় ভাসমান অবস্থায় অথবা অন্য কোন
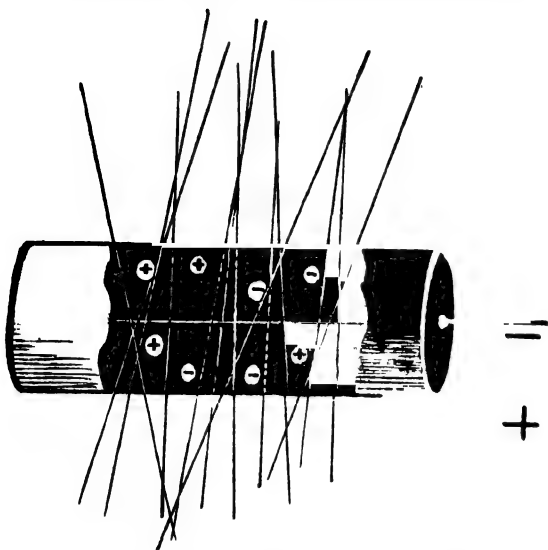
কস্‌মিক রে'র আগমনবার্ত্তানির্দ্দেশক 'গাইগার-কাউণ্টার' নামক যন্ত্রের নমুনা

ভাবে রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থ হইতে অথবা যন্ত্রের ধাতবপত্র মধ্যে নিহিত অতি সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া বায়ু-কণিকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। ইলেক্‌ট্রোস্কোপে ধনাত্মক তড়িতাবেশ থাকিলে, বাতাসের অণু হইতে বিচ্ছিন্ন ঋণাত্মক তড়িতাবেশযুক্ত কণিকা বা ইলেক্‌ট্রনগুলিকে পিতলের দণ্ডটির সাহায্যে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া স্বর্ণপত্র দুইটি ধীরে ধীরে সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় অথবা ঋণ-তড়িতাবেশ থাকিলে বাতাসের ধনাত্মক কণিকাগুলিকে আকর্ষণ করিয়া স্বর্ণপত্র দুইখানি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে।

১৯০৪ সালেও ম্যাকলেনান ও রাদারফোর্ড এবং তৎপরে উড, বার্টন, রিখি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বাতাসের এই তড়িৎ-পরিচালন ব্যাপারটাকে রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থের রশ্মি কর্ত্তৃক উৎপন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এস. পি. টমসন কিন্তু বায়ুকণিকার এইরূপ আয়নে পরিবর্ত্তিত হইবার এক অদ্ভুত কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলিলেন—সূর্য্য-দেহ হইতে আলোর অভাবনীয় চাপে পদার্থের চরম কণিকাগুলি অসম্ভব দ্রুতগতিতে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িতেছে। তাহাদের ধাক্কায় বাতাসের অণুপরমাণুগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎ-পরিচালক হইয়া পড়িতেছে। কস্‌মিক-রশ্মির যে কোন পদার্থ ভেদ করিয়া যাইবার যে অপরিসীম ক্ষমতা রহিয়াছে অথবা ইহা যে পৃথিবীর বাহিরের কোন স্থান হইতে আসিতেছে, এই কথা পরীক্ষামূলক কোন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া না বলিলেও টমসনের পূর্ব্বে আর কেহ অনুমান করেন নাই।

১৯০৫ সালে নর্ম্যান ক্যাম্বেল রেডিও-অ্যাক্‌টিভ মতবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বিভিন্ন ধাতুর পরিবেষ্টনী সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন যন্ত্রে সামান্য তফাৎ হইলেও মোটের উপর তিনি দেখিতে পাইলেন বাতাসের পরিচালন-ক্ষমতা সর্ব্বত্রই প্রায় এক ভাবে বাড়িয়া থাকে। ইহা হইতে তিনি রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে-শক্তি বায়ুর এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে তাহা পৃথিবীর বাহিরের কোন স্থান হইতেই আসিতেছে। কিন্তু সেই বৎসরেই বোর্ডম্যান, ইভ, কুক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ রেডিয়াম-রশ্মিই বাতাসের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রকৃত কারণ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। অগত্যা ক্যাম্বেলও সেই মতে সায় দিলেন।

কালিফোর্নিয়ার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক রবার্ট মিলিকান বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-পরিচালনক্ষমতা সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য অতি সরল গঠনের একটি ইলেকট্রোস্কোপ নির্ম্মাণ করেন। চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে আবদ্ধ একটি ধাতুনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বাক্সের মধ্যে 'ত' চিহ্নিত দুইটি তন্তু বাক্সের উপরিভাগে স্থাপিত একটি তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থ হইতে ঝুলিয়া আছে। এই ঝুলানো তন্তুযুগলের নিম্নপ্রান্ত 'ক' চিহ্নিত কোয়ার্টজের ধনুকের টানে একত্র অবস্থায় থাকে। যখন 'প' চিহ্নিত তারটিকে মুহূর্ত্তের জন্য ঘুরাইয়া উক্ত 'ত'-চিহ্নিত তন্তুযুগলকে 'ব'-চিহ্নিত ব্যাটারী হইতে তড়িৎ-প্রভাবান্বিত করা হয়, তখনই তাহারা ধনুকের আকারে বাঁকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থায় এই তড়িৎ-প্রভাবের হ্রাস ঘটিতে পারে না। কাজেই একবার তড়িৎ-প্রভাবান্বিত হইলে তন্তু দুইটির বরাবরই একই ভাবে থাকিবার কথা; কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ফলই দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে আবদ্ধ থাকায় বাহিরের আয়ন-কণিকা আসিয়া তাড়িতিক সাম্য ঘটাইতে পারে না। কিন্তু তথাপি বাক্সটির মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর পরমাণুগুলি আয়নে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে এবং তন্তুর বিপরীতধর্ম্মী তড়িতাবেশ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। সঙ্গে সঙ্গে তন্তু দুইটি 'ক'-চিহ্নিত ধনুকের টানে একত্র হইয়া যায়। তন্তু দুইটি কিরূপ গতিতে সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় তাহা পার্শ্বস্থিত মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রেডিয়াম-রশ্মি ছাড়া এমন কোন ভেদকারী রশ্মি জানা নাই যাহা পাত্রের ধাতু-বেষ্টনী ভেদ করিয়া ভিতরের বাতাসের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। কিন্তু রেডিয়াম রশ্মিই যদি ইহার কারণ হয়, তবে বিভিন্ন ধাতুর বেষ্টনী ব্যবহারে একই ফল পাওয়া যায় কেন?

ইহার পর গাইটেল আবার ইলেকট্রোস্কোপ লইয়া খনির

অভ্যন্তরে পরীক্ষা শুরু করিলেন। দেখা গেল সেখানে এই ভেদকারী রশ্মির তীব্রতা শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ কমিয়া যায়। বিবিধ পরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত রেডিয়ামের প্রাথমিক রশ্মিদ্বারা বায়ুকণিকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; প্রাথমিক রশ্মিকণিকার সংঘাতে পুনরায় যেসব কণিকার উৎপত্তি হয় তাহারাই বায়ুপরমাণুর এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। ১৯০৮ সালে রেডিও-অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ইভ বিবিধ পরীক্ষার সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখাইলেন—পাহাড় পর্ব্বত বা বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ রেডিয়াম বা র‍্যাডন্ থাকা সম্ভব তাহা হইতে রশ্মি বিকিরণের ফলে বায়ুকণিকার এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। তিনি পাহাড়-পর্ব্বত হইতে বহুদূরে সমুদ্রের মধ্যে ইলেকট্রোস্কোপ লইয়া গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনুমানই যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পাহাড়-পর্ব্বতের সন্নিকটে ইলেকট্রোস্কোপের তড়িতাবেশ যেরূপ গতিতে হ্রাস পায়, সমুদ্রবক্ষেও তদনুরূপ হ্রাস পাইতেই দেখা যায়। রেডিয়াম-রশ্মিই যদি এই ঘটনার প্রকৃত কারণ হইত, তবে পর্ব্বতের সান্নিধ্য হইতে সমুদ্রবক্ষে বিপরীত ফলই পাওয়া যাইত। সমুদ্রজল এবং অন্যান্য স্থানে যে-পরিমাণ রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ থাকা সম্ভব তাহা হিসাব করিলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, বাতাসের তড়িৎ-পরিচালন-ক্ষমতা পরিচিত কোন রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ হইতে উদ্ভূত রশ্মির সাহায্যে সংসাধিত হয় না। তবে কি বাতাসের মধ্যে নূতন রকমের কোন রশ্মি-বিকিরণকারী পদার্থের অস্তিত্ব আছে?

ইভ অতঃপর তাঁহার ইলেকট্রোস্কোপকে পুরু সীসার পাতে মুড়িয়া এবং অবশেষে জলে ডুবাইয়া দেখিলেন কোন অবস্থাতেই তড়িতাবেশের হ্রাস বন্ধ করা যায় না। তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল—বাতাসের মধ্যেই স্বতোবিকিরণকারী কোন নূতন পদার্থ রহিয়াছে। ইহার ভেদকারী শক্তি পরিচিত রেডিয়াম-রশ্মি হইতে বহুগুণ অধিক। স্ম্যাটারলি কিন্তু এ মত-বাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কিন্তু ইভ, গোকেল, উলফ, কুরজ্, প্রভৃতি রেডিও-অ্যাকটিভিটি-সমর্থনকারী পণ্ডিতবৃন্দের দ্বারা শীঘ্রই নিরস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা সত্ত্বেও প্রায় বছর-পাঁচেকের মধ্যেই বিবিধ পরীক্ষার ফলে রেডিও-অ্যাকটিভিটি-মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৭ সালে ম্যাক্‌লেনানের পরীক্ষায় রেডিও-অ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে প্রায় সমুদয় সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছিল। কারণ তিনি বিভিন্ন ধাতুপত্রে ইলেকট্রোস্কোপ নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষাগারে, বাহিরে, সমুদ্রবক্ষে, পর্ব্বতগহ্বরে এমন কি তুষারাবৃত অন্টেরিও হ্রদে পরীক্ষা করিয়া প্রায় একই রকম ফল লাভ করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল—কোন ধূমকেতু হইতে হয়ত অদৃশ্য বেগবান্ রশ্মি নির্গত হইয়া বাতাসের মধ্যে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। কিন্তু ১৯১০
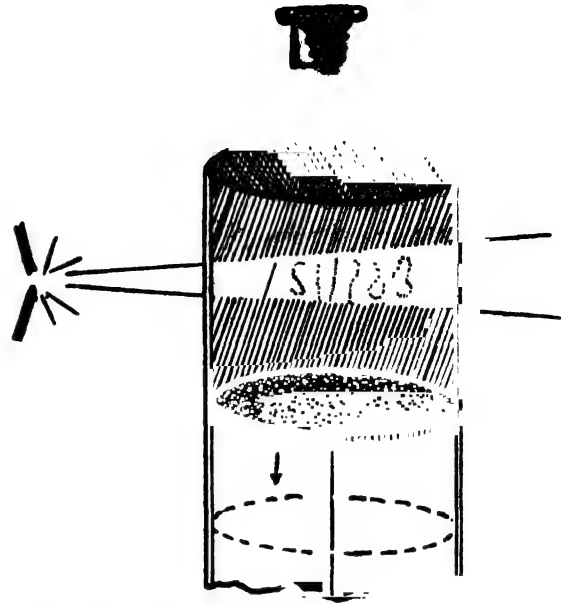
উইলসন ক্লাউড-চেম্বার, উপর ও নীচের মুখবন্ধ কাচের পাত্রের গায়ে বাম দিকের আর্ক হইতে আলো পড়িতেছে। উপরে—ক্যামেরা

হইতে ১৯১১ সালের হ্যালির ধূমকেতু আগমনের সময় এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল।

অতঃপর গোকেল এক অভিনব পন্থায় এ-বিষয়ে পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এত দিন পৃথিবীর বুকের উপর জলে স্থলে এই অজ্ঞাত রশ্মিসম্বন্ধে নানা উপায়ে পরীক্ষা চলিতেছিল। তিনি ঊর্দ্ধাকাশে এই অজ্ঞাত রশ্মির তত্ত্বনিরূপণকল্পে ১৯০৯, ১০ ও ১১ সালে যথাক্রমে তিন বার বেলুন উড়াইয়া অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ হইতে এই ভেদকারী রশ্মির উৎপত্তি হইয়া থাকিলে যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যাইবে ততই ইহার তীব্রতা হ্রাস পাইবার কথা। কিন্তু বেলুনের পরীক্ষায় ইহার বিপরীত ঘটনাই পরিলক্ষিত হইল। গোকেলের একটি বেলুন ১৪০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং ইহাতেই এই রশ্মির সর্ব্বাধিক তীব্রতা অনুভূত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক হেস্‌ও এই ধরণের বেলুন-পরীক্ষায় গোকেলের কথাই সমর্থন করিলেন। হেস্ অন্ততঃ সাত বার বেলুনে উঠিয়া এই রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যতই ঊর্দ্ধে উঠা যায়, হ্রাস দূরের কথা তীব্রতার বৃদ্ধিই ঘটিতে থাকে। ১৯১১ সালে তিনি দৃঢ়ভাবে এ কথা প্রচার করিলেন যে, এই অদ্ভুত ভেদকারী রশ্মি পৃথিবীর বাহিরে মহাশূন্য হইতে আসিতেছে। তিনি অবশ্য তারকারাশির মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী সূর্য্যকেই ইহার উৎপত্তিস্থল বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডি ব্রগ্‌লি ১৯১২ সালে সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণের সময় পরীক্ষা করিয়া এই রশ্মির তীব্রতার কোনই হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাইলেন না। গ্রহণের পূর্ব্বে
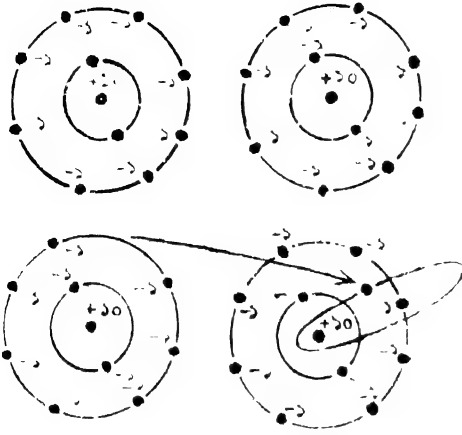
পরমাণু কিরূপে যুগ্ম আয়ন-কণিকায় রূপান্তরিত হয় তাহার নমুনা

যেরূপ দেখা গিয়াছিল, গ্রহণের সময়ে সেইরূপ ফলই পাওয়া গেল। এই পরীক্ষায় পরিষ্কার প্রমাণিত হইল যে, সূর্য্য হইতে এরূপ কোন অজ্ঞাত রশ্মি নির্গত হইতেছে না।

১৯১৩ সালে হেস্ পুনরায় বেলুন-পরীক্ষার ফলাফল হইতে তাঁহার পূর্ব্ব মতই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিলেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিং তাঁহার (হেসের) পরীক্ষালব্ধ ফল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বেলুন উর্দ্ধে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ-কণিকা সংগ্রহ করিয়া হাজার হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎশক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়; তাহার ফলেই হয়ত বেলুন-অভ্যন্তরস্থ বাতাসের তড়িৎ-পরিচালনা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু কিঙের প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উত্তমরূপে আবদ্ধ পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশিই কোন অজ্ঞাত রশ্মির প্রভাবে আয়নে পরিবর্ত্তিত হইয়া যন্ত্রের সাম্যাবস্থা ঘটাইয়া থাকে। ভেদকারী রেডিয়াম-রশ্মির মত অপর কোন অধিকতর শক্তিশালী রশ্মি না হইলে সুরক্ষিত দেওয়াল ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই সময়েই ম্যাক্লেনান একই যন্ত্র লইয়া টরোন্টো হইতে ইংলণ্ড এবং তথা হইতে স্কটল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই অজ্ঞাত রশ্মির প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান সর্ব্বত্র প্রায় একই অনুপাতে এই রশ্মির আগমন হইতেছে। এক ঘন-সেন্টিমিটার বায়ুর অণু-সংখ্যা $১.^{১৯}$; অর্থাৎ একের পিঠে ১৯টি শূন্য বসাইলে যতটা হয় ততটা অণু আছে। স্থলভাগে এই এক ঘন-সেন্টিমিটার পরিমিত বায়ুর মধ্যে সেকেণ্ডে মোটের উপর ৯টি, সমুদ্রপৃষ্ঠে ৬টি এবং বরফের উপর ৪টি যুগ্ম আয়ন-কণিকা গঠিত হয়। রেডিও-অ্যাকটিভিটি ইহার কারণ হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই বৎসরেই কোলহষ্টার যন্ত্র লইয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি হেসের সিদ্ধান্তই সমর্থন করিলেন। গোকেল পর্ব্বতগাত্র হইতে বহু দূরে তুষারক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া কোলহষ্টারের মতই ফললাভ করিলেন। এইরূপ বিভিন্ন পরীক্ষার ফল হইতে অনেকেই মানিয়া লইলেন—এই রশ্মি রেডিয়াম-জাতীয় কোন পরিজ্ঞাত পদার্থ হইতে উদ্ভূত নহে। কিন্তু সকলেই একথা একবাক্যে মানিয়া লইলেন না। এই মতবাদ লইয়া চতুর্দ্দিকে বিষম বাদানুবাদ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন উদ্যমে পরীক্ষাও সুরু হইয়া গেল। এই রশ্মির 'কস্‌মিক অরিজিন' সম্বন্ধে তাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, যদি ইহা সূর্য্য বা তারকামণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইত তবে পৃথিবীর দিনরাত্রিভেদে অবশ্যই ইহার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইহার কোনই তারতম্য লক্ষিত হইতেছে না। বহুদূরস্থিত তারকারাজির ব্যবধানের মহাশূন্য হইতে এই রশ্মি ভীমবেগে ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকে পড়িতেছে বলিয়া পৃথিবীর দিবারাত্রিভেদে এই রশ্মির কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না—এই মতবাদের দ্বারা ঐরূপ আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। এই মতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া অজ্ঞাত রশ্মি 'কস্‌মিক্-রে' নামে পরিচিত হইয়াছে। এক সময়ে 'কস্‌মিক' শব্দে সূর্য্য ও তাহার নিকটবর্ত্তী তারকামণ্ডল অথবা বেশীর ভাগ ছায়াপথ পর্য্যন্ত বুঝা যাইত। বিশ্ববিশ্রুত মহিলা বৈজ্ঞানিক ম্যাডাম কুরিই এই শব্দটি অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নাই। ১৯২৫ সালে মিলিকান নূতন উদ্যমে আবার কস্‌মিক্-রের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কস্‌মিক্-রে যে কিরূপ পদার্থ তাহা চোখে দেখিবার উপায় নাই। যন্ত্রসহযোগে পরোক্ষ ভাবে আমরা ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতে পারি। তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থের পরিচালন-ক্ষমতা লাভ করিতে দেখিয়া ইহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্য উপায়ে ইহার অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে। সকল উপায়ের মূলেই কিন্তু পদার্থের—বিশেষতঃ বাতাসের অণুপরমাণুর আয়নে পরিবর্ত্তিত হওয়ার ব্যাপার রহিয়াছে।

রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থের রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক গাইগার এবং মুলার এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। যন্ত্রটি "গাইগার-মুলার কাউণ্টার" নামে পরিচিত। যন্ত্রের গঠন-প্রণালী অতি সরল, কিন্তু কার্য্যপ্রণালী বিস্ময়কর। ধাতুনির্ম্মিত একটি লম্বা ফাঁপা চোঙের মধ্যস্থলে লম্বালম্বি একটি
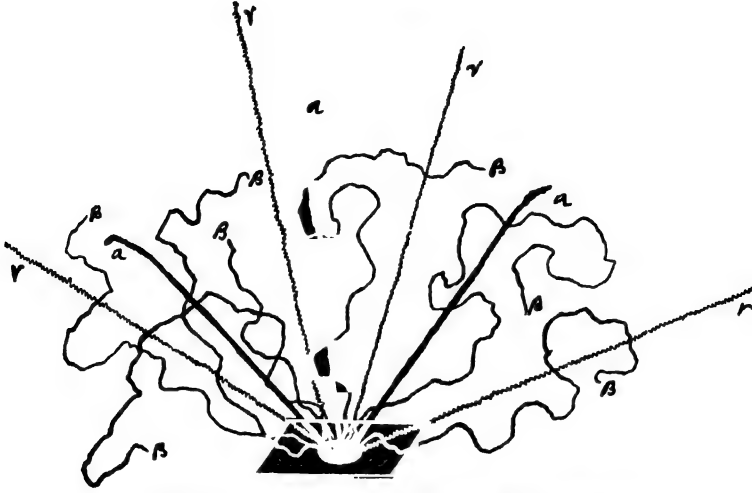
রেডিও-অ্যাক্টিভিটি-শক্তিশালী পদার্থ হইতে আল্‌ফা, বিটা, গামা রশ্মি নির্গমন

সূক্ষ্ম তার বসান আছে। তারটি তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থের দ্বারা উক্ত চোঙ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকে। চোঙ এবং তারটি ধন ও ঋণ তড়িৎশক্তি দ্বারা এমন ভাবে পরিপূর্ণ থাকে যে সামান্য একটু কিছুতেই উভয় জাতীয় তড়িৎ একত্র মিলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য তড়িতালোকের স্ফুরণ ঘটে। যদি বাহির হইতে উক্ত চোঙের উপর রঞ্জন-রশ্মি, রেডিয়াম-রশ্মি, অথবা কস্‌মিক্-রশ্মি পতিত হয়, তবে তাহারা চোঙ ভেদ করিয়া ভিতরে উপস্থিত হইয়া বায়ু-পরমাণুর কতকগুলিকে আয়নে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। আয়নের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণিকাগুলি চোঙ ও তারের বিপরীতধর্ম্মী তড়িৎ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের মধ্যে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইবার পথ সুগম করিয়া দেয়, এবং মুহূর্ত্তের জন্য একটি স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়।

এই ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ তড়িৎ-পরিবর্দ্ধক যন্ত্রের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ব্যাটারীর সুইচের মত কাজ করে। প্রত্যেকটি রশ্মি-কণিকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাটারী-সংলগ্ন মাইক্রোফোনে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা ব্যাটারী-সংলগ্ন নিয়ন ল্যাম্প মুহূর্ত্তের জন্য প্রজ্বলিত হওয়া কস্‌মিক-রশ্মির আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিতে পারে। ব্যাটারীর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া কস্‌মিক-রের আগমনবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও হইতে পারে।

অজ্ঞাত রশ্মির পথ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উইলসন আর এক প্রকার অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসের তাপের মাত্রা হঠাৎ কমাইয়া দিলে বাষ্পরাশি জলকণার আকারে জমা হইয়া মেঘ অথবা কুয়াশার সৃষ্টি করে। বাষ্প জলকণার আকার ধারণ করিবার সময় যে-কোন একটা কেন্দ্রীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই কেন্দ্রীয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বাষ্প জমা হইয়া জলকণার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাই এই কেন্দ্রীয় পদার্থের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে ধূলিকণা না থাকিয়া আয়ন-কণিকা থাকিলেও তাহার চতুর্দ্দিকে বাষ্প জমা হইয়া থাকে। একটি আবদ্ধ কাচপাত্র আংশিক জলপূর্ণ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলেই বাতাসের ভাসমান ধূলিকণাগুলি ধীরে ধীরে জলে পড়িয়া যায়, এদিকে জলের সংস্পর্শে পাত্রে বাতাস ও বাষ্প পূর্ণ হইয়া উঠে। কাচপাত্রের নীচের দিকে পিচকিরির দণ্ডের মুখের চাকতির মত একখানি চাকতি বসানো থাকে। পিচ্‌কিরির দণ্ডের মতই ইহা উপরে নীচে উঠা-নামা করিতে পারে। যন্ত্র-কৌশলে এই চাকতিখানাকে উপরের দিকে কিছু দূর চাপিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলেই আকস্মিক প্রসারণের ফলে বাতাসের তাপের মাত্রা কমিয়া যায়। ধূলিকণা না থাকিলে জলবিন্দু গঠিত হইতে পারিত না। কিন্তু অনবরত কসমিক-রের সংঘাতের ফলে বায়ু-কণিকা অনবরত আয়নে রূপান্তরিত হইতেছে। কাচ-পাত্রের তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই কস্‌মিক-রের আগমনে যে যে স্থানে আয়ন-কণিকার সৃষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া জলবিন্দু গড়িয়া উঠে এবং মুহূর্ত্তের জন্য একটি রেখা ফুটিয়া ওঠে। এই সময় পাত্রের মধ্য দিয়া তীব্র আলোক রশ্মি প্রেরণ করা হয়, নচেৎ ঐ ক্ষুদ্র রেখা নয়নগোচর হইত না। প্রয়োজন মত এই রেখার ফটোগ্রাফও লওয়া যাইতে পারে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। উদ্ভাবকের নামানুসারে এই যন্ত্রের নাম 'উইলসন ক্লাউড চেম্বার' হইয়াছে।

ফটোগ্রাফির প্লেটেও কসমিক-রের গতি-প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কস্‌মিক-রের ভেদকারী-

শক্তি অসাধারণ, ফটোপ্লেটে পড়িলে তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কাজেই কোন প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় না। সেজন্য সাধারণ ফটোপ্লেটের উপর সামারিয়াম নামক গুরুভার পদার্থের প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হয়। কস্‌মিক রশ্মির সংঘাতে তাহা হইতে 'প্রোটন' বিক্ষিপ্ত হইয়া যে যে স্থানের উপর দিয়া ছুটিয়া চলে, ফটোপ্লেটের সেই সেই স্থানের রৌপ্যকণিকার পরিবর্তন সাধন করে। প্লেট ডেভেলপ করিলেই ভিন্ন ভিন্ন লাইনে সজ্জিত কালো বিন্দুগুলি দেখিয়া পূর্বোক্ত ভাবে কস্‌মিক-রের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা যায়।

কস্‌মিক-রের ভেদকারী-শক্তি অসাধারণ। এক ফুট পুরু সীসা পাত শতকরা নব্বই ভাগ গামা-রশ্মি প্রতিহত করিতে পারে। কিন্তু শতকরা দশ ভাগ রঞ্জন-রশ্মিও এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ পুরু সীসার পাতের ভিতর দিয়া যাইতে পারে কি না সন্দেহ, সেই তুলনায় দেখা যায় কস্‌মিক-রের কঠিন রশ্মিগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইলে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ ফুট পুরু সীসার পাতের দরকার।

কোলহর্ষ্টার, মিলিকান, রিজেনার, পিকাড, কজিন্‌স্‌, কম্প্‌টন, ষ্টিফেনসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গভীর জলতলের ও বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতন স্তরের পরীক্ষার ফলে ইহাই দেখা গিয়াছে যে, কস্‌মিক-রে অবিমিশ্র রশ্মি নহে, ইহাতে তিন জাতীয় বিভিন্ন রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়। ভেদকারী শক্তির তারতম্যানুসারে কম্প্‌টন ইহাদিগকে এ, বি, সি—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি এই রশ্মির উপাদানকে 'ফটোন' না হইলেও এক জাতীয় শক্তি-কণিকা বলিয়াই মনে করেন। পৃথিবী হইতে ৫০,০০০ ফুট উর্দ্ধে যে রশ্মিগুলিকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে তিনি 'এ' শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এগুলিই কস্‌মিক-রশ্মির কোমল কণিকা। 'বি' শ্রেণীভুক্ত কণিকাগুলির কতকাংশ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে 'পজিট্রন' ও 'ইলেকট্রন' এই দুই জাতীয় কণিকাই রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভেদকারী শক্তিবিশিষ্ট কঠিন রশ্মিগুলিকে 'সি' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

কস্‌মিক-রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে বহুগুণ ক্ষুদ্র। সরল গঠনের পরমাণু একটি জটিল গঠনের পরমাণুর সহিত মিলিত হইবার সময় এরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান মতবাদানুসারে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, মহাশূন্যে সুবিধামত অবস্থায় চারিটি হাইড্রোজেন-পরমাণু মিলিয়া একটি হিলিয়াম-পরমাণু তৈয়ারী হইবার সময় কিছু শক্তি বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই বিচ্ছিন্ন শক্তিটুকুই কস্‌মিক-রশ্মির নরম শক্তি-তরঙ্গের আকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। তাহা হইলে কঠিন রশ্মিগুলির উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া? মিলিকান ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—সিলিকন অথবা লৌহ-পরমাণুর গঠনকালে কঠিন রশ্মির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহাও বুঝা শক্ত যে মহাশূন্যের কোন স্থানটায় প্রতিনিয়ত এরূপ পরমাণুর সংগঠন চলিতেছে যাহার ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনবরত কস্‌মিক-রশ্মির খেলা দেখা যাইতে পারে? হইতে পারে বহুদূরবর্ত্তী কোন তারকার অভ্যন্তরে তাহার অপরিমিত উত্তাপের ফলে পরমাণুর ভাঙাগড়া চলিতেছে। কিন্তু তাহা সত্য হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এই রশ্মি অনবরত সমানভাবে আসিতেছে কেমন করিয়া?

অনেকের মতে এইগুলি তড়িতাবিষ্ট কণিকা—'ইলেক্‌ট্রন' অথবা 'প্রোটন' হইতে পারে। তাহারা ভীমবেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই রশ্মি তড়িতাবিষ্ট কণিকার সমষ্টি হইলে ভৌগোলিক ব্যবধানানুসারে পরীক্ষা করিলে সত্য নিরূপিত হইতে পারে। কারণ যে-সকল কণিকার তড়িতাবেশ আছে, পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে তাহাদের গতিপথ বাঁকিয়া যাইবে। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই চৌম্বক আকর্ষণের ফলে কণিকাগুলি পৃথিবীর নিরপেক্ষ চৌম্বক-রেখা হইতে উভয় দিকে দূরে সরিয়া যাইবে। পৃথিবীর এই নিরপেক্ষ চৌম্বক-রেখা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যমাংশ, আফ্রিকার মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিক্‌, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত, শ্যামদেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কম্প্‌টন ১৯৩০ সালে এই নিরপেক্ষ চৌম্বক-রেখার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কস্‌মিক-রে পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় বাস্তবিকই এই নিরপেক্ষ রেখার উভয় পার্শ্বের ২০ ডিগ্রির মধ্যে এই রশ্মি খুবই কম। হিসাবে দেখা যায়—হয় এগুলি অসম্ভব গতিবিশিষ্ট ইলেকট্রন নয় ঈথর-তরঙ্গ। ঈথর-তরঙ্গের উপর চৌম্বক আকর্ষণের কোনই ক্রিয়া নাই। ইহা হইতে মনে হয় কস্‌মিক রশ্মি তাড়িতাবিষ্ট কণিকা ও অতি ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গের মিশ্রণ হওয়াই সম্ভব।

বঙ্গে নারীনিগ্রহের মর্ম্মন্তুদ লজ্জাকর হিসাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খ্বাজা সর্ নাজিমুদ্দিন বঙ্গে নারীনিগ্রহের পাঁচ বৎসরের নিম্নলিখিত হিসাব সম্প্রতি দিয়াছেন।

সাল	অত্যাচরিতা নারী হিন্দু	অত্যাচরিতা নারী মুসলমান	মোট অত্যাচরিতা	অভিযুক্ত হিন্দু	অভিযুক্ত মুসলমান	মোট অভিযুক্ত	কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত ঘটনা	দণ্ডিতের সংখ্যা
১৯৩৪	৩৯৪	৪২৫	৮১৯	৪৭৭	১০২৬	১৪০৩	৮২৫	২৯৭
১৯৩৫	৩৭৫	৪৪০	৮১৫	৪৩৯	৯৩৬	১৪০২	৮৫৬	২৯৪
১৯৩৬	৪২৮	৪২৫	৮৫৩	৫২৭	৯০৭	১৪৩৪	৮৬৭	৩০৭
১৯৩৭	৩৯৩	৪৮৫	৮৭৮	৫১২	৯৫৩	১৪৬৫	৮৯৩	৩২৫
১৯৩৮	৪৮২	৫১৫	৯৯৭	৫৬৫	১২৭৮	১৮৪৩	১০১৫	২৭৩
মোট—	২০৭২	২২৯০	৪৩৬২	২৫২০	৫১০০	৭৫৪৭	৪৪৫৬	১৪৯৬

নারীর উপর অত্যাচার যত হয়, তাহার সমস্ত ঘটনা পুলিসের গোচর হয় না। লোকলজ্জাভয়ে, কিংবা গুণ্ডাদের ভয়ে, কিংবা মোকদ্দমা চালাইবার আর্থিক সামর্থ্য না-থাকায়, অনেক অত্যাচরিতা নারী ও তাঁহাদের আত্মীয়েরা পুলিসে ঘটনার খবর দেন না। অনেক সময় খবর দিলেও পুলিস কিছুই করে না। সুতরাং যতগুলা অত্যাচারের হিসাব পাওয়া যায়, তাহাই সব নয়। হয়ত যতগুলির হিসাব পাওয়া যায় না, সেইগুলাই সংখ্যায় বেশী।

অনেক অপহৃতা ও অত্যাচরিতা নারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের অনেকে ফেরার থাকিয়া যায়। পুলিসের ও হাকিমদের অবহেলা বা অকর্ম্মণ্যতায় এরূপ ঘটে।

যতগুলা ঘটনা কর্তৃপক্ষের গোচর হইয়াছে, তাহাদেরই সংখ্যা ৪৪৫৬। এই ঘটনাগুলাতে অভিযুক্ত হয় ৭৫৪৭ জন। তাহাদের মধ্যে শাস্তি পাইয়াছে ১৪৯৬ জন, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশেরও কম। অভিযুক্তদের মধ্যে শতকরা কুড়ি জন দণ্ডিত হইয়াছে, শতকরা ৮০ জন খালাস পাইয়াছে। ইহা প্রথমতঃ পুলিসের অবহেলা, অমনোযোগ বা অকর্ম্মণ্যতার ফল; দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদেরও অযোগ্যতার বা অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফল। তৃতীয়তঃ, আইনেরও দোষ আছে। কতকগুলা মোকদ্দমার হাইকোর্টে কোন কোন জজের কাছে আপীল হইলে অভিযুক্তদের খালাস পাইবার সম্ভাবনা কিছু বেশী হয়, ইহা সংবাদপত্র-পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন।

যে-সকল স্থলে দুর্বৃত্তেরা শাস্তি পায়, সে-সকল স্থলেও অত্যাচরিতারা আমরণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। যে-সকল স্থলে দুর্বৃত্তেরা শাস্তি পায় না, কিংবা তাহারা শাস্তি পাইলেও অত্যাচরিতারা পরিবার ও সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা হন, সে-সকল স্থলে তাঁহাদের যন্ত্রণার সীমা কে নির্ণয় করিতে পারে? আবার যে-সকল স্থলে পুলিসে খবর দিলেও পুলিস কিছু করে না, এবং যে-সকল স্থলে পুলিসে খবরও দেওয়া হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে নির্যাতিতা নারীরা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিদারুণ অপমান ও যন্ত্রণার দুঃসহ ভার বহন করিতে থাকেন।

যে-সব বাঙালী পাশবিকতায় পশুর অধম ও পিশাচ-প্রকৃতি, এবং তাহাদের চেয়ে অধিকসংখ্যক যে-সব বাঙালী কাপুরুষ ও নারীর অপমান সম্বন্ধে উদাসীন, তাহারা বঙ্গের এই লজ্জাকর অবস্থার জন্য দায়ী। পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতির বাঙালী দায়ী। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক দায়ী।

হিন্দু আসামীদের সংখ্যা হইতে বুঝা যায় হিন্দু সমাজে পিশাচপ্রকৃতির লোক অনেক আছে।

হিন্দু অত্যাচরিতাদের চেয়ে মুসলমান অত্যাচরিতাদের সংখ্যা অধিক। মুসলমানদের মধ্যে ভদ্র কোন ব্যক্তি নাই এমন নহে। কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য যে, মুসলমান সমাজ দেশের ও তাহার নিজের এই অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন। তাহা বলিলেও অনেক মুসলমানকে যথেষ্ট দোষ দেওয়া হয় না। কারণ তাহারা মনে করে ও বলে, এই সমস্ত মোকদ্দমাই হিন্দুদের সাজান মিথ্যা

মোকদ্দমা। তাহা সত্য নহে। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া কল্পনা করিলেও, যে-সব স্থলে অত্যাচরিতারা মুসলমান, সে-সকল স্থলে হিন্দুদের মোকদ্দমা সাজাইবার কোন কারণ নাই। ইহা মুসলমানদের বুঝা উচিত।

মুসলমান অত্যাচরিতার সংখ্যা ২২৯০। মুসলমান অভিযুক্তের সংখ্যা ৫১০০। মোট দণ্ডিত ১৪৯৬ জনের মধ্যে কয় জন হিন্দু ও কয় জন মুসলমান, এবং কয় জন হিন্দু-নারীর নিগ্রহের জন্য ও কয় জন মুসলমান-নারীর নিগ্রহের জন্য দণ্ডিত, হিসাবে তাহা দেখান হয় নাই। কিন্তু যদি সকল দণ্ডিত ব্যক্তিকেই মুসলমান এবং মুসলমান-নারীর নিগ্রহের জন্য দণ্ডিত বলিয়া ধরা যায় (যাহা সত্য নহে), তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, ২২৯০ জন অত্যাচরিতা মুসলমান-নারীর সকলের অভিযোগের কোন প্রতিকার হয় নাই। অথচ, মুসলমান সমাজে এরূপ কোন সমিতির অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি নারীনিগ্রহের জন্য দুর্বৃত্তদিগকে শাস্তি দেওয়ান যাহার উদ্দেশ্য ও কাজ।

আমরা শুনিয়াছি, এরূপ অনেক কাঠমোল্লা ও তাহাদের অনুচর আছে যাহারা হিন্দুনারী-হরণ একটা বাহাদুরি ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহা সত্য না হইলেই ভাল। কিন্তু যদি ইহা কোন কোন স্থলেও লজ্জাকর সত্যই হয়, তাহা হইলেও মুসলমান-নারী-হরণ ত এই কাঠ মোল্লাদের ও তাহাদের অনুচরদিগের বিবেচনায় গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। কোন কোন মুসলমান তর্কস্থলে বলিয়া থাকেন যে, কোরানে ব্যভিচারী নারীধর্ষকের উপর প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা তাহাদের প্রাণবধের ব্যবস্থা আছে। ইহা সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে পারুন বা না-পারুন, তাহাদের সমাজে নারী-নিগ্রহের সংখ্যা হ্রাসের ও নিগ্রাহকদিগের সামাজিক শাসনের চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারেন।

অত্যাচরিতাদের মধ্যে মুসলমান-নারীর সংখ্যা বেশী তাহা আগে বলিয়াছি। কোন কোন মুসলমান সাংবাদিকের এরূপ মন্তব্য পড়িয়াছি যে, হিন্দুসমাজে বালবিধবাদেরও অধিকাংশের চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা বলবৎ থাকায়, আলোচ্য বহু ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান সমাজে ত কোন বয়সের বিধবারই চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা নাই। তবে মুসলমানদের মধ্যে এত অধিকসংখ্যক নারীর উপর অত্যাচার কেন হয়?—অন্ততঃ অত্যাচারের অভিযোগ কেন এত হয়?

অত্যাচরিতাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ বেশী, দুর্বৃত্ত অত্যাচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী। মোট হিন্দু অভিযুক্তের সংখ্যা যে ২৫২০ এবং মোট মুসলমান অভিযুক্তের সংখ্যা যে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক—৫১০০, ইহা হইতেই এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের আচরণগত ভিন্নতার ও নিকৃষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্বসমাজহিতৈষী মুসলমান মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের স্বসমাজে এই আদর্শের আচরণগত উন্নতির চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা"র ফলে বঙ্গে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" ও মুসলমান রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের আমলে ১৯৩৮ সালে নারীনির্যাতন আগেকার চারি বৎসরের চেয়ে খুব বেশী বাড়িয়াছে, মুসলমান আসামীর সংখ্যাও খুব বেশী বাড়িয়াছে, **কিন্তু শাস্তি হইয়াছে আগেকার চারি বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের চেয়ে অল্পসংখ্যক দুর্বৃত্তের।** "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বে"র ও বঙ্গে মুসলমান প্রাধান্যের আরম্ভ-বৎসর ১৯৩৭ সালেও নারীনিগ্রহের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে।

এই কেরামতির কারণ নির্দ্ধারণ করা মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ মনে করেন, অত্যধিক নারীনিগ্রহ কেবল বঙ্গেরই দুরপনেয় কলঙ্ক। তাহা সত্য নহে। কিন্তু এই কলঙ্ক অন্য কোন কোন প্রদেশে থাকিলেও, ইহা কলঙ্কই। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে, পৌরুষ ও নারীত্ব রক্ষা করিতে হইলে, সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, নারীর সম্মান, নারীর সতীত্ব, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাদের মত আমরাও উহাকে সাতিশয় মূল্যবান মনে করি। অধিকন্তু কিন্তু আমরা সমাজরক্ষা আরও অধিক মূল্যবান মনে করি; কারণ তাহা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়বিধ দেশের পক্ষেই আবশ্যক এবং নারীরক্ষা ব্যতিরেকে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না।

কোন কোন পরাধীন দেশে এবং কোন কোন দেশের পরাধীন অবস্থার কোন কোন যুগে কেবল বিজেতাদিগকে বা প্রধানতঃ তাহাদিগকেই নারীনিগ্রহের জন্য দায়ী মনে করা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু ভারতবর্ষের (ও বঙ্গের) সাম্প্রতিক যে নারীনির্যাতন কলঙ্ক, তাহার জন্য বিজেতারা দায়ী নহে—নারীনির্যাতক নারীধর্ষক প্রধানতঃ তাহারা নহে; এই দুর্বৃত্তেরা আমাদেরই স্বদেশবাসী মুসলমান ও হিন্দু। অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজরা চলিয়া গেলেই বা তাড়িত হইলেই নারীনিগ্রহ থামিবে, ইহা মনে করা মহা ভ্রম। দেশ স্বাধীন হইবার আগেই নারীনিগ্রহের প্রতিকার করা যায় এবং করা আবশ্যক।

অতএব বঙ্গের কলঙ্ক মোচন করিতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ও সকল রাজনৈতিক দলের লোকেরা—মহিলারা ও পুরুষেরা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বদ্ধপরিকর হউন।

নারীদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দিবার মুখ আমাদের নাই। কিন্তু কিছু নিবেদন করিতে পারি। নেত্রীরা স্বয়ং শক্ত সমর্থ শুচি ত হইবেনই; বিশেষ করিয়া পল্লীবাসিনীরা যাহাতে শিক্ষিতা শুচি সপ্রতিভ শক্ত সমর্থ হইতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টা তাঁহারা করুন, তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনা।

—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নূতন সুবিধা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের টেস্ট পরীক্ষার পর মনোনীত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে। অন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা, অর্থাৎ যাহারা কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পড়ে নাই এবং উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যও করে নাই, তাহাদিগকে স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর কর্ত্তৃক গৃহীত টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়। তাহাতে মনোনীত হইলে তবে তাহাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া চলে। এ পর্য্যন্ত নিয়ম ঐরূপ ছিল। সম্প্রতি নিখিল-বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে,

> "বঙ্গদেশের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাহাতে টেস্ট পরীক্ষা না দিয়াই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সুযোগ লাভ করেন, সেই নিমিত্ত নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত পত্রব্যবহার করিতেছিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয় সমিতিকে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশ ও আসামের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল কর্ম্মরত শিক্ষকগণ প্রাইভেট ছাত্ররূপে টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সুযোগ লাভ করিবেন।"

প্রাথমিক ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের এই সুবিধা করিয়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের ও সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের (বোধ করি অধিকাংশ শিক্ষকের) মাসিক বেতন গড়ে পাঁচ টাকার অধিক হইবে না। অর্থাৎ তাঁহারা গৃহভৃত্যদের চেয়েও কম বেতন পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের প্রথম ও নিশ্চিত লাভ কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ও কিছু বাড়িতে পারে। যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলেও কখন কখন পরীক্ষিতেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও উপার্জ্জিত জ্ঞান হইতে কেহ তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। সে লাভ থাকিয়াই যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহের যে-সকল শিক্ষক অন্যূন তিন বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই এই সুবিধা দিয়াছেন। কার্য্যকালের দৈর্ঘ্য তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে দুই বৎসর করিলেও বোধ হয় চলিতে পারে।

ত্রিপুরীতে হিট্‌লারের গুণগান

মহাত্মা গান্ধীর সহিত হিট্‌লারের কোন আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য নাই। অথচ ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস হিট্‌লারের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং পরে যুক্ত-প্রদেশদ্বয়ের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্তও তাঁহার এক বক্তৃতায় হিট্‌লারের প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই উভয় কংগ্রেস-নেতার নাম বৈষ্ণবোচিত, এবং মহাত্মা গান্ধীও বৈষ্ণব-প্রকৃতির মানুষ। প্রশ্ন এই যে, বৈষ্ণবপ্রকৃতি মহাত্মাজীর দুই জন বৈষ্ণব-নামধারী প্রধান শিষ্য দুর্দ্ধর্ষ হিট্‌লারের গুণগান কেন করিলেন? একটা উত্তর পাওয়া গিয়াছে। হিট্‌লার অহিংস সংগ্রাম দ্বারা জামেনীর রাজ্যবিস্তার করিতেছেন। তিনি রক্তপাত না করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করিয়াছেন, মেমেল দখল করিয়াছেন, এবং পরে আরও কোন কোন দেশ এই প্রকারে দখল করিতে পারেন। মহাত্মাজী ও তাঁহার শিষ্যেরা অহিংসাপন্থী, হিট্‌লারও বিদেশ-দখলে অহিংসাপন্থী।

অবশ্য সামান্য একটু প্রভেদও আছে। মহাত্মাজী বিনা রক্তপাতে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, হিট্‌লার বিনা রক্তপাতে কোন কোন পরদেশের স্বাধীনতা নষ্ট করিতেছেন।

—

"জাতীয় সপ্তাহ"

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত "জাতীয় সপ্তাহ" পালন করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু অনুরোধ প্রচার করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান গত দুই দশক ধরিয়া ভারতের সকল প্রদেশে কংগ্রেসপন্থীরা করিয়া আসিতেছেন। এই সপ্তাহের শেষ দিন ১৩ই এপ্রিল সেই দিন যেদিনে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে শত শত নির্দ্দোষ নিরস্ত্র নরনারী ও শিশু নিহত হইয়াছিল। সেই জাতীয় অপমান ও অধোগতির দিন স্মরণে কোন গৌরব নাই, কোন আনন্দ নাই। যদি আমরা সেই দিন স্মরণ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হই এবং তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায় সর্ব্বপ্রযত্নে অবলম্বন করি, তাহা হইলেই তাহার স্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হয়।

সুভাষবাবু সকলকে এই সপ্তাহে স্বাজাতিকতা উদ্বোধিত করিতে এবং স্ব-স্ব ও সমগ্র জাতির চারিত্রিক উন্নতি সাধন দ্বারা আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি "গঠন-মূলক" কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। যথা, খদ্দর উৎপাদন, ক্রয় ও ব্যবহার, কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা নিবারণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী খদ্দর উৎপাদন বা ক্রয় করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সমুদয় কাজই ভাল ও আবশ্যক।

আমাদের আশঙ্কা, এতগুলি ফরমাশ একসঙ্গে হওয়ায় প্রধানতঃ পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা, পতাকা উত্তোলন এবং সভার অধিবেশন ও তাহাতে বক্তৃতাই হইবে, এমন কোন কাজ হইবে না যাহা ও যাহার ফল স্থায়ী এবং যাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার আবশ্যক বটে, কিন্তু যাহা ধরাছোঁআ যায় এরূপ ফলও চাই। যাহা হউক, যদি স্বাধীনতালাভে স্থায়ী আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে, তাহাও কম লাভ নয়।

—

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

কংগ্রেস-শাসিত কয়েকটি প্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গে সেরূপ চেষ্টা হইতেছে না। অন্য কোন প্রদেশে এরূপ কোন চেষ্টা না-হইলেও বঙ্গে ইহা হওয়া উচিত হইত। মানুষ হইবার নিমিত্ত জ্ঞানলাভ আবশ্যক; আবার যে-কেহ যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায় তাহাতে সাফল্য লাভের নিমিত্ত তদ্বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। লিখিতে পড়িতে জানা জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গের সকল বয়সের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী নিরক্ষর বলিয়া তাহারা জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। তজ্জন্য দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞ। অজ্ঞ লোকদের দ্বারা

দেশের উন্নতি হইতে পারে না, অজ্ঞ জাতি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা করিতে পারে না। শুধু রাষ্ট্রীয় প্রগতিচেষ্টাই যে নিরক্ষরতা-হেতু ব্যর্থ হয় তাহা নহে, সকল রকম সংস্কার ও প্রগতিচেষ্টাই নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা-হেতু ব্যর্থ হয়। ধার্ম্মিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে-কোন বিষয়ে সংস্কার ও উন্নতি বাঞ্ছিত, সকল বিষয়েই লিখনপঠনক্ষমতা আবশ্যক। এই কারণে, আমাদের বিবেচনায় "জাতীয় সপ্তাহে" বঙ্গের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের মহিলা ও পুরুষ সভ্যেরা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ও কার্য্যতঃ অভিযান আরম্ভ করিলে ভাল হইত এবং ফল কিছু পাওয়া যাইত। এখনও ইহা আরব্ধ হইতে পারে।

গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীদিগকে দেশের দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকদের সহিত পরিচিত হইতে এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দিতে আমরা কত বৎসর আগে হইতে যে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি, তাহা ঠিক্ মনে নাই। বোধ হয় যৌবনকাল হইতেই এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া থাকিব। কাজ তাহার আগেই আরম্ভ করিয়াছিলাম।

—

. সুভাষবাবুর ইস্তফার গুজব ও তাহার প্রতিবাদ

খবরের কাগজে দেখিয়াছি এবং লোকমুখে শুনিয়াছি, গুজব এই যে, সুভাষবাবু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেন। এই গুজব যে ভিত্তিহীন এরূপ মন্তব্যের বিষয়ও অবগত আছি।

তিনি ইস্তফা দিবেন কি দিবেন না, জানি না। কংগ্রেসের কোন দলেরই লোক আমরা নহি বলিয়া এ বিষয়ে কোন খোঁজ লইবার সুবিধা আমাদের নাই, খোঁজ লইবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। সুভাষবাবুকে আমরা গায়ে পড়িয়া কোন পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি না। আমাদের কেবল এই মনে হয় যে, কংগ্রেসের প্রবলতম নেতাদের নিষেধ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন তিনি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই এবং নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থও হইয়াছিলেন এবং তাহার পরও ঘৃণ্য এই মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিয়াছিলেন যে তিনি ব্যাধিগ্রস্ততার ভান করিতেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি সহজে হাল ছাড়িয়া দিবেন একবার বুঝিয়া দেখিবেন সভাপতি থা দেশের কোন কল্যাণ পারেন কি না।

উপরে যে অপবাদটার কথা বলিলাম, তাহা এপ্রিলের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত তাঁহার "আমার অদ্ভুত পীড়া" ("মাই স্ট্রেঞ্জ ইল্‌নেস") শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে-সব তথ্য ও ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত (১০ই এপ্রিল) তাহার কোন প্রতিবাদ দেখি নাই। কথাগুলা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাঁহার বিরোধীরা প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নির্ব্বাক আছেন।

—

কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

অনেক জায়গায় কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রদর্শনী হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাঁকুড়ায় ও বেহালায় এইরূপ দুটি প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলাম। সেই উপলক্ষ্যে কৃষি ও শিল্পের সহিত স্বাস্থ্যের একটি সম্পর্ক আমাদের মনে পড়িয়াছিল।

অনেক সভ্য দেশের জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় সাংখ্যিক তথ্য হইতে সেই সেই দেশে পুরুষজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় শিশুরা ভূমিষ্ঠ হইবার সময় গড়ে কত বৎসর বাঁচিবার আশা ("expectation of life") পোষণ করিতে পারে তাহার তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। ১৯৩১ সালের ভারতীয় সেন্সস রিপোর্টের ১ম ভল্যুমের ১ম খণ্ডের ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা হইতে কতকগুলি দেশের শিশুদের ভূমিষ্ঠ হইবার দিনে বাঁচিবার আশার বৎসর-সংখ্যাগুলি দিতেছি।

দেশ	পুরুষশিশু	স্ত্রীশিশু
অষ্ট্রেলিয়া	৫৫.২০	৫৮.৮৪
ডেন্মার্ক	৫৪.৯	৫৭ ৯
ইংলণ্ড	৪৮.৫৩	৫২ ৩৮
ফ্রান্স	৪৫.৭৪	৪৯.১৩
জার্মেনী	৪৪.৮২	৪৮.৩৩
হল্যাণ্ড	৫১.০	৫৩.৪
ভারতবর্ষ	২২ ৫৯	২৩.৩১
ইটালী	৪৪.২৪	৪৪.৮৩
জাপান	৪৩.৯৭	৪৪.৮৫
নরওএ	৫৪·৮৪	৫৭.৭২
সুইডেন	৫৪.৫৩	৫৬ ৯৮
সুইজারল্যাণ্ড	৪৯.২৫	৫২.১৫
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪৯.৩২	৫২.৫৪

যে সকল সভ্য দেশের উল্লেখ উপরের তালিকাতে আছে, ভারতবর্ষের শিশুদের গড় সম্ভাবিত আয়ু সেই সব দেশের কোনটিরই শিশুদের গড় সম্ভাবিত আয়ুর অর্দ্ধেকের বেশী নহে, অনেকগুলিরই অর্দ্ধেকেরও কম। ভারতবর্ষের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বশতঃ ভারতবর্ষের লোকদের সূতিকাগারের এবং প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা ও জ্ঞান নাই; যতটুকু আছে অর্থাভাবে তদনুসারেও কাজ হয় না। প্রসূতি ও শিশু যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, পীড়িত হইলে চিকিৎসিত হয় না। শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে অনেক প্রসূতি ও শিশু প্রসবের পূর্ব্বে পরে বা প্রসবকালে মারা পড়ে। যে-সব শিশু ও প্রসূতি বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও অনেকে পরে যথেষ্ট খাদ্যের ও রোগের সময় চিকিৎসার অভাবে স্বল্পায়ু হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাও অর্থাভাবে ঐ কারণে স্বল্পায়ু হয়। দরিদ্রতা ও জ্ঞানাভাব বশতঃ আমাদের গ্রাম ও নগরগুলির এবং বাসগৃহসমূহের বন্দোবস্ত স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত ধন-বৃদ্ধি আবশ্যক। শিল্পবাণিজ্য ও কৃষি ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়।

ইহা হইতে কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী একসঙ্গে করিবার যুক্তিযুক্ততা বুঝা যাইবে।

—

শিল্পপ্রদর্শনী এবং বাঙালীর বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্য

অনেক শিল্পপ্রদর্শনীতে ইহা চোখে পড়ে যে, বাঙালীরা বুদ্ধি খাটাইয়া অনেক ছোটখাট শিল্পের কারখানা ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা চালাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা নিজে নূতন কল উদ্ভাবন বা নির্ম্মাণ নিজেই করিয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় যে, বাঙালীদের বুদ্ধি ও শিল্পনৈপুণ্যের অভাব নাই, কিন্তু তাহারা টাকার অভাবে বড় বড় ব্যবসা ও কারখানা চালাইতে পারে না। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙালীদের টাকার অভাব দূর করিতে হইবে। তাহা নানা উপায়ে হইতে পারে।

ইহা সত্য যে, নগদ টাকা ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন জাতির যত লোকের হাতে যত আছে, বাঙালীদের তত লোকের হাতে তত নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে যে, বাঙালীদের মধ্যে নগদ টাকাওআলা ধনী নাই বা খুবই কম। যে-সব ধনী বাঙালীর টাকা আছে, তাঁহারা যদি তাহার কতক অংশ শিল্পবাণিজ্যে খাটান, তাহা হইলে ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙালীর অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে। যে-সব বাঙালী ধনশালী নহেন, কিন্তু একেবারে নিঃস্ব বেকারও নহেন, তাঁহারা যদি মিতব্যয়িতার দ্বারা পুঁজি করিবার অভ্যাস করেন এবং তাঁহারা ও মধ্যবিত্ত লোকেরা যৌথ কারবারের অংশী হন, তাহা হইলে তাহার দ্বারাও ব্যবসা-ক্ষেত্রে অনেক টাকা জুটিতে ও খাটিতে পারে।

—

মরালে আপত্তি

শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্রদের য়ুনিয়ন দিবসের উৎসবে মুসলমান ছাত্রেরা যোগ দেয় নাই। কাগজে দেখিলাম তাহার কারণ, য়ুনিয়নের ব্যাজে (badgeএ) মরালের বা রাজহংসের মূর্ত্তি আছে। আপত্তিটা ছবিতে বা রাজহংসে, তাহা বুঝা গেল না। যদি ছবিতে হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সরকারী কাগজপত্রে, শীলমোহরে, মুদ্রায়, ডাকমাশুলের ও রসীদের ষ্ট্যাম্পেও ত নানাবিধ ছবি থাকে। তাহাতে মুসলমান ছাত্র বা অছাত্র কাহারও আপত্তি হয় না। আপত্তি না হইবার কারণ বোধ হয় এই যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট প্রবল পক্ষ, এবং আপত্তি করিলে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয় ও সাংসারিক ক্ষতি হয়। হিন্দুরা দুর্ব্বল পক্ষ, এবং তাহাদের কিছুতে আপত্তি করিলে অর্থ-হানি হয় না, সুতরাং আপত্তি করা চলিতে পারে।

আপত্তিটার কারণ যদি ছবি না হয়, মরালই হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রতীক যে সিংহ, তাহাতে আপত্তি হয় না কেন? যদি বলেন, রাজ-হংসের সহিত হিন্দুর দেবী সরস্বতীর সম্পর্ক আছে, রাজহংস সরস্বতীর বাহন, এই জন্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, সিংহ হিন্দুর দেবী দুর্গার বাহন অথচ তাহাতে আপত্তি হয় না কেন?

রাজহংস মুসলমান মানুষদের ও অন্য অনেক মানুষের খাদ্য এবং রাজহংস মানুষকে মারিয়া ভক্ষণ করে না; এরূপ

দুর্ব্বল জীবের ছবি সম্মানচিহ্ন ব্যাজে থাকা উচিত নয়। অন্য দিকে সিংহ মুসলমানদের বা অন্য মানুষদের খাদ্য নহে, বরং পশুরাজ সুবিধা পাইলেই জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে যে-কোন মানুষকে মারিয়া খাইতে পারেন; অতএব তাঁহার ছবিতে আপত্তি করা অনুচিত—এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে কি?

বঙ্গে বাঙালীকে অস্থায়ী গবর্ণর না-করা

পঞ্জাবে সর্ সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, যুক্তপ্রদেশদ্বয়ে ছত্তরীর নবাব, মধ্যপ্রদেশে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও, এবং মান্দ্রাজেও এক জন ভারতীয় অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গে দুই দুই বার অস্থায়ী গবর্ণর নিয়োগ করা আবশ্যক হইলেও প্রবীণতম কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত না করিয়া শ্বেতকায় অধস্তন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

একবার যখন বঙ্গে অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তখন সর্ আবদর্ রহীমকে নিযুক্ত না করিয়া আসামের গবর্ণরকে বঙ্গে আনা হয় এবং বঙ্গের চীফ সেক্রেটরীকে আসামের গবর্ণর নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি লর্ড ব্রাবোর্ণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গের প্রবীণতম সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তকে বঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত করা হয় নাই, আসামের গবর্ণরকে বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি দত্ত মহাশয়কে আসামের অস্থায়ী গবর্ণর করা হইত, তাহা হইলেও কতকটা সুবিচার হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া মিঃ টোয়াইনামকে আসামের অস্থায়ী গবর্ণর করা হইয়াছে। অথচ মিঃ দত্ত রাজকার্য্য করিতেছেন ৩৩ বৎসর, মিঃ টোয়াইনাম ২৮ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে আরও একবার মিঃ দত্তকে আসামের অস্থায়ী গবর্ণর করা উচিত ছিল, কিন্তু তখনও করা হয় নাই।

অন্য কয়েকটি প্রদেশে বে-সরকারী ভারতীয় লোক অস্থায়ী গবর্ণর হইয়াছেন, কিন্তু বঙ্গে বাঙালী সিবিলিয়ানকেও অস্থায়ী গবর্ণর করা হয় নাই।

হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারীর দাবী উপেক্ষা

বঙ্গে অনেক সরকারী বিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারীদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চপদ দেওয়া হইতেছে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে ডিঙাইয়া এক জন মুসলমান ডাক্তারকে মেডিক্যাল কলেজে অস্থায়ী প্রথম চক্ষুচিকিৎসক নিয়োগ ইহার আধুনিকতম দৃষ্টান্ত। মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডল এই অন্যায় কার্য্যের যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা বাজে।

কচুরী পানা বিনাশ সপ্তাহ

বঙ্গের অনেক জেলায় চাষের জমিতে কচুরী পানা জন্মিয়া চাষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতির জল তাহাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহা অব্যবহার্য্য হইয়াছে, এবং নদী ও খালে তাহার অত্যধিক বৃদ্ধিতে জলপথে যাতায়াত দুঃসাধ্য এবং কোথাও কোথাও অসাধ্য হইয়াছে। কচুরী পানার উচ্ছেদ না হইলে বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। আগামী ২৩শে এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ ইহার উচ্ছেদে বিশেষ ভাবে মন দিবার নিমিত্ত সরকারী অনুরোধ প্রচারিত হইয়াছে। যাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীরাও এই কাজে যোগ দিতে পারেন সেই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ঐ সপ্তাহের কোন কোন দিন গবর্ন্মেণ্ট ছুটি দিবার আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে অনেক উপকার হইবে।

—

আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা

বঙ্গের সকল গ্রামে ও অনেক ছোট শহরে পাকা বাড়ীর সংখ্যা কম। সেখানে খড়ের ও গোলপাতার চালের ঘর এবং অন্যবিধ কাঁচা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। এই জন্য এইরূপ কোন গ্রামে বা শহরে কোথাও আগুন লাগিলে তাহা সহজেই সমুদয় গ্রামে বা পাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বত্র জলের অভাব লক্ষিত হয়।

সেই কারণে এবং আগুন নিবাইবার সুশৃঙ্খল আয়োজন না-থাকায় অগ্নিদাহে অনেক ঘর পুড়িয়া যায়। তাহাতে যে শুধু সম্পত্তিনাশ হয় তাহা নহে, কখন কখন মানুষেরও প্রাণ যায় এবং গবাদি পশুও মারা পড়ে।

আজকাল দমকলের (পম্পের) দাম সস্তা। বাঙালীর কারখানায় বাঙালীর মূলধনে ও বাঙালী কারিকরদের তৈরি সস্তা দমকল পাওয়া যায়। ঐরূপ বালতি এবং জলের পাইপও পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা যদি দমকল বালতি ও পাইপ কিনিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদা আবশ্যকমত জলসংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামে আগুন লাগিলে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে নিবাইতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে কিছু ব্যয় আছে বটে। কিন্তু সকলে সাধ্যমত চাঁদা দিলে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা সোজা হয়, এবং তদ্দ্বারা অগ্নিদাহে সম্ভাবিত অধিকতর ক্ষতি নিবারিত হয়।

প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে আগুন নিবাইবার নিমিত্ত এক একটি স্বেচ্ছাসেবকদল অনায়াসে গঠিত হইতে পারে। তাহাদিগকে সৈনিকদের মত ড্রিল শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা বাঁকুড়ায় বাল্যকালে এইরূপ ড্রিল শিখিয়াছিলাম এবং কোথাও আগুন লাগিলে দমকল প্রভৃতির সাহায্যে আগুন নিবাইতাম।

—

ফেডারেশ্যনের একটি অঙ্গ পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে কি না

রাজকোটের ঠাকুর সাহেব এবং সর্দার বল্লভভাই পটেলের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার ঠিক অর্থ সম্বন্ধে এক দিকে ঠাকুর সাহেব এবং অন্য দিকে মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই পটেলের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় ঠাকুর সাহেবের হৃদয় দ্রবীভূত করিবার নিমিত্ত মহাত্মাজী উপবাস আরম্ভ করেন। গত ১৩ই মার্চ পার্লেমেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব বলেন যে, "উপবাস আরম্ভ করিবার পরদিন মিঃ গান্ধী রাজকোটের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে লেখেন যে রাজকোটের [তাৎকালিক] অবস্থা সার্ব্বভৌম শক্তির হস্তক্ষেপ আবশ্যক করিয়াছে" ("Mr. Gandhi addressed the Resident alleging that the condition in Rajkot made intervention by the Paramount Power necessary")।

অতঃপর বড়লাট এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া প্রস্তাব করেন যে, ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠাকুর সাহেবের সহিত সর্দার পটেলের চুক্তির যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে রাজী হন। প্রবাসীর গত চৈত্র সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে যখন এই বিষয়ে (২৫শে ফাল্গুন ১৩৪৫) কিছু লিখি, তখন ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গোআয়ার তাঁহার ব্যাখ্যা বা রায় দেন নাই।

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের প্রস্তাবটিতে রাজী হওয়ায় আমরা চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম :—

> "এখানে ইহা লক্ষিতব্য যে, মহাত্মাজীকে ফেডারেশ্যনের একটা অঙ্গ ফেডার‍্যাল কোর্ট পরোক্ষভাবে অগ্রিম মানাইয়া লওয়া হইল।"

এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে আমাদের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছি। নাগপুরের ডেলি নিউসের এবং বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হইয়াছে যে, আমাদের এই মন্তব্য ভ্রান্ত। তাঁহাদের মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস্ গোআয়ার প্রধান-বিচারপতিরূপে তাঁহার ব্যাখ্যা দেন নাই, এক জন আইনজ্ঞ প্রাইভেট ব্যক্তি হিসাবে মত দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আইনজ্ঞ লোক ত আরও আছেন। ভারতীয় আইনজ্ঞদের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁহাদের আইন-জ্ঞান সর্ মরিসের চেয়ে কম নয়। তাঁহাদের কাহাকেও ব্যাখ্যাকর্ত্তা না মানিয়া সর্ মরিসকে মানিবার অর্থ কি এই ছিল না যে, ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান-বিচারপতিরূপে তাঁহার পদমর্য্যাদা হেতু, এবং ফেডার‍্যাল কোর্টের পশ্চাতে বড়লাটের ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রভাব ও শক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া, ঠাকুর সাহেব তাঁহার ব্যাখ্যা মানিতে বাধ্য হইবেন? কোন বে-সরকারী প্রবীণতর ও অভিজ্ঞতর ভারতীয় আইনজ্ঞের পশ্চাতে এই প্রভাব ও শক্তি নাই।

সর্ মরিস্ প্রধান বিচারপতি হিসাবে মত প্রকাশ করেন নাই, ব্যক্তিগত হিসাবে করিয়াছেন—এইরূপ কথা মহাত্মাজীও বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহা কথার মারপেঁচ মাত্র। অন্য বহু আইনজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মত যে চাওয়া হইয়াছিল, তাহার কারণই এই যে, তিনি ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলিয়া তাঁহার কথা খুব মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার গুরুত্ব অধিক হইবে, বড়লাটের ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রভাব তাঁহার পশ্চাতে থাকায় ঠাকুর সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

আমরা জানিতাম যে, আমাদের মন্তব্যের চুলচেরা সমালোচনা হইবে। এই জন্য আমরা লিখিয়াছিলাম, "**পরোক্ষ ভাবে** অগ্রিম মানাইয়া লওয়া হইল—" সাক্ষাৎ ভাবে নহে। সেইরূপ এখন লিখিতে পারি, "ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতির মত **পরোক্ষ ভাবে** শিরোধার্য্য হইল, সাক্ষাৎ ভাবে নহে"।

ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সর্ মরিস্ গোআয়ার দুটি আলাদা মানুষ নহেন, একই মানুষ, এবং বিচার্য্য বিষয়টিও ছিল ব্যবহারজ্ঞের এলাকাভুক্ত।

অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ব্যক্তিগত ভাবে, সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে নহে, ভোজ দিলে, কংগ্রেস-নেতাদের তাহাতে উপস্থিত থাকিতে বাধা নাই শুনা যায়। এই ব্যাপারটি ঠিক সেই প্রকার নহে। সর্ মরিস্‌কে যদি বিশেষ কোন রকমের চা, কফি, চুরুট, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট ইত্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে বলা হইত, তাহা হইলে তাঁহার বিচারপতিত্ব ও সাধারণ ব্যক্তিত্বের চুলচেরা পার্থক্য নির্দ্দেশ কেবল চুলচেরা তর্ক হইত না। কিন্তু যে-বিষয়ে তাঁহার মত চাওয়া হইয়াছিল, তাহা জজেরই বিচার্য্য। সুতরাং জজ-রূপী সর্ মরিস মত প্রকাশ করেন নাই, সাধারণ মানুষ বা সাধারণ আইনজ্ঞ রূপে সর্ মরিস্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিলে কথাটা ন্যায়ের ফাঁকি বলিয়াই মনে হয়।

সুচতুর বড়লাট, শুধু গান্ধীজীকে নহে, একটি দেশী রাজ্যের নৃপতিকেও প্রকারান্তরে ফেডারেশ্যনের একটি অঙ্গ পরোক্ষ ভাবে মানাইয়া লইলেন!

—

রাজকোট অঙ্গীকারের ব্যাখ্যা

ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস্ গোআয়ার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতির অর্থ সর্দার বল্লভভাই পটেল ও মহাত্মা গান্ধী যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক্। অতএব সর্দার বল্লভভাই পটেল যাঁহাদিগকে রাজকোটের শাসন-বিধি প্রণয়ন কমীটির সভ্য মনোনীত করিয়া দিবেন, ঠাকুর সাহেবকে তাঁহাদের সমষ্টিকেই কমীটি মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহারা যে শাসনবিধি প্রণয়ন করিবেন, তাহা ঠাকুর সাহেব মানিয়া লইবেন কি না, তাহা পরের কথা। এ বিষয়ে যে গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সন্তোষের বিষয়।

লক্ষ্ণৌতে শিয়া-সুন্নি বিরোধ

লক্ষ্ণৌতে মুসলমান সমাজের শিয়া-সুন্নি দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ হইতে রক্তপাত ও নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়েরই বিস্তর লোককে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠান হইয়াছে। আবার অনেককে ছাড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে।

এই দুই সম্প্রদায়ের বিবাদের কারণ শুনিয়াছি এইরূপ :—

শিয়ারা মহরমের সময় তাবার্‌রা পাঠ করেন। তাবার্‌রা পাঠ তাঁহাদের ধর্ম্মমতের অঙ্গীভূত। শিয়ারা হজরত আলীকে বিশেষ ভক্তি করেন। তাঁহারা তাবার্‌রাতে হজরত আলীর পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগের দোষোদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। শিয়াগণ ইহা করায় লক্ষ্ণৌয়ের সুন্নিরা প্রতিবাদস্বরূপ মাদ্‌হে সাহেবা পাঠ করেন। তাহাতে হজরত আলীর পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগের প্রশস্তি আছে। সুন্নিরা মহরমের দশ দিন ধরিয়া উহা পাঠ করা স্থির করেন। এইরূপ পাঠ লইয়া ক্রমে বিবাদ

বিরোধ রক্তারক্তি খুনাখুনি হইয়াছে। ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

হিন্দু-মুসলমান একতা ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য একতা

বিহার প্রাদেশিক হিন্দুসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি মুঙ্গেরে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত শিবনন্দন প্রসাদ বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানের একতা উৎপাদনের নিমিত্ত যে সময় শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেক যদি অস্পৃশ্যদিগকে উন্নত ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে হিন্দুরা এত দিনে অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী হইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে পারিত। ইহা সত্য কথা।

আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই না, এমন নয়। হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষের শক্তি কত যে বাড়িতে পারে এবং দেশে কত যে শান্তি বিরাজ করে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী এবং তাঁহাদের ব্যবহার হইতে ইহাই মনে হয় যে, তাঁহারা এখনও আপনাদিগকে একদা-বিজেতা আগন্তুকদের প্রতিনিধি মনে করিয়া অহঙ্কৃত, এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে হিন্দুদিগকেই সর্ব্বদা করজোড়ে তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। এক দিকে ক্রমাগত "দাও দাও", এবং অন্য দিকে কেবল দিবার ব্যগ্রতা—ইহা কখনও মিলনের ভিত্তি হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, তথাকথিত অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় হিন্দুদিগের প্রকৃতি ওরূপ নহে। "স্পৃশ্য" ও "অস্পৃশ্যে"র মিলনের জন্য স্পৃশ্যদের পক্ষে "অস্পৃশ্য"দের প্রতি আন্তরিক সৌজন্য ও তাহাদের মানবিক অধিকার স্বীকার যথেষ্ট। হিন্দুদের এই উভয় শ্রেণীর ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এক। সেদিক্ দিয়া কোন ঝগড়ার সম্ভাবনা নাই। "স্পৃশ্য" হিন্দুদের অনেকে খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতির নিকট প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত হাতজোড় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তপসিলভুক্ত হিন্দুদের কাছে তাঁহারা হইয়া থাকিতে চান ভূদেবতা, পদধূলি ও পাদোদক দিতে প্রস্তুত।

এক ভদ্রলোক একখানি সাপ্তাহিক কাগজে লিখিয়াছেন, তপসিলভুক্ত জাতিদের কেহ এ পর্য্যন্ত হিন্দু মহাসভার বা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন নাই। ইহা সত্য কথা। মুসলমান কয়েক বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। এক বার এক জন বর্ম্মী বৌদ্ধকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি করা হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার আগামী অধিবেশনের নিমিত্ত এক জন তপসিলভুক্ত হিন্দুকে সভাপতি মনোনীত করা উচিত।

—

রাজকোট-অঙ্গীকারের ব্যাখ্যা কি ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতির নহে ?

রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের অঙ্গীকারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যটি লিখিবার পর ৮ই এপ্রিলের সাপ্তাহিক ইংরেজী "হরিজন" হস্তগত হইল। এই কাগজটি মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই সম্পাদন করেন, এবং ইহাতে মহাত্মাজীর নানাবিষয়ক প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

কাগজটির ৮ই এপ্রিলের সংখ্যাতে রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতির সর্ মরিস্ গোআয়ার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা "The Rajkot Award" শিরোনামা দিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। য়্যাওআর্ড কথাটির মানে "রায়", "সালিশের বা সালিশদিগের নিষ্পত্তিপত্র"।

রায়টির শিরোনামার নীচে মুদ্রিত আছে—

From The Hon'ble Sir Maurice Gwyer, K.C.B., K.C.S.I., Chief Justice of India.

To

The Secretary to His Excellency the Crown Representative,

New Delhi.

রায়টির শেষে দস্তখত আছে—

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Sd. Maurice Gwyer,
Chief Justice of India.

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা উচিত যে, সর্ মরিস্ গোআয়ার ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতিরূপেই রায় দিয়াছেন, এক জন আইনজ্ঞ প্রাইভেট জেণ্টল্‌ম্যান রূপে মত ব্যক্ত

করেন নাই। এবং তিনি লর্ড লিনলিথগো নামক এক জন প্রাইভেট অভিজাত ব্যক্তির নিকট রায়টি পাঠান নাই, ব্রিটেনের রাজার প্রতিনিধির ("Crown Representative"এর) নিকট পাঠাইয়াছেন।

সুতরাং গান্ধীজীকে এবং রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে ফেডারেশ্যনের অন্যতম অঙ্গ ফেডার্যাল কোর্টটি পরোক্ষ ভাবে মানাইয়া লওয়া হইয়াছে।

সন্তোষের মহারাজা

সন্তোষের মহারাজা সর্ মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। নানা বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা ছিল, এবং জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিলেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে বলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি কয়েক বার উঠিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায় ও মৃত্যু হয়।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি লাহোর কংগ্রেসে বাগ্মিতার সহিত বক্তৃতা করেন।

তিনি তিন বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত তাহার কার্য্য পরিচালন করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নানা প্রকার ক্রীড়ার উৎসাহদাতা বলিয়া এবং ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশ্যনের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আরও অনেক ক্রীড়া-সমিতি ও ব্যায়াম-সমিতির এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কলিকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্ম্মাণের তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহা পূর্ণ হয় নাই।

ইঙ্গভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি

যদি দুটি প্রকৃত স্বাধীন দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি হয়, তাহা হইলে উভয় দেশের লোকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা আপোষে এমন একটা চুক্তি করিতে পারেন, যাহাতে উভয় দেশেরই স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নহে। যে-দেশের সহিত তাহার তথাকথিত বাণিজ্যচুক্তি হইল, ভারতবর্ষ তাহারই অধীন। ভারতবর্ষের গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অধীন। এ অবস্থায় চুক্তি যেরূপ হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। বিলাতী কাপড় ভারতবর্ষে আমদানী হইলে তাহার উপর যে শুল্ক বসিত, তাহা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে বিলাতী কাপড় এদেশে আগেকার চেয়ে সস্তায় আসিবে। তাহাতে ভারতীয় মিলসকলের কাপড়ের কাট্‌তি কমিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই চুক্তি হইবার আগে পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে ইংরেজরা যত কাপড় এদেশে রপ্তানি করিতে পারিত, আলোচ্য চুক্তিতে তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটা সর্ত্ত আছে বটে যে, বিলাতী সুতা ও কাপড় উৎপাদকেরা নির্দ্দিষ্টপরিমাণ ভারতীয় তুলা কিনিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু পরিমাণের সীমা যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী তুলা স্বভাবতঃই বিনা সর্ত্তে তাহারা নিজেদের গরজে ও দাম সস্তা বলিয়া কিনিত। যদি সর্ত্ত এই হইত যে তাহারা ভারতীয় তুলা দশ লক্ষ গাঁট কিনিতে বাধ্য থাকিবে, তাহা হইলে ঠিক্ হইত এবং বুঝা যাইত যে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে এদেশে বেশী পরিমাণ কাপড় চালান দিবার অধিকার দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহাকে অধিক পরিমাণে তুলা বিক্রী করিবার অধিকার পাইল। বৎসরে দশ লক্ষ গাঁট ভারতবর্ষীয় তুলা ব্রিটেনের মিলগুলির প্রয়োজনাতিরিক্ত নহে।

এই চুক্তির আগে এবারকার ভারতীয় বজেটে রাজস্ব-সচিব বিদেশ (আমেরিকা) হইতে আমদানী তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে এদেশে ঐ তুলা হইতে প্রস্তুত কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িবে, সুতরাং তাহা বিদেশাগত কাপড়ের সহিত দামে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।

কলিকাতার রাস্তার নাম পরিবর্ত্তন

প্রসিদ্ধ লোকদিগকে সম্মান দেখাইবার নিমিত্ত ও তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের নাম অনুসারে রাস্তার নামকরণ একটি সহজ ও সস্তা উপায়। সহজ ও সস্তা বলিয়া তাহা নিন্দনীয় বা বর্জ্জনীয় নহে। কিন্তু পুরাতন যে-সব রাস্তার নামের সহিত ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে, সেগুলি বদলাইয়া নূতন নামকরণ করা উচিত নয়; নূতন যে-সব রাস্তা হইতেছে, প্রসিদ্ধ লোকদের নাম অনুসারে সেইগুলির নাম রাখাই ভাল। যেমন নূতন কতকগুলি রাস্তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লোকেরা যে-রাস্তায় বাস করিতেন, তাহার বা তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তার নামই যে তাঁহাদের নাম অনুসারে রাখিতে হইবে বা সব স্থলে রাখা হয়, এমন নহে। প্রতাপাদিত্য, বসন্ত রায়, জনক প্রভৃতি তাঁহাদের নাম অনুসারে নামিত অঞ্চলে বাস করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অনুসারে কোন রাস্তার নাম রাখা অবশ্যই উচিত। কিন্তু কলেজ স্কোয়্যার নামটির সহিত বঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়ের এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কয়েক অধ্যায়ের স্মৃতি জড়িত। ঐ নামটি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কোন বড় নূতন রাস্তার নাম বঙ্কিমচন্দ্রের নামাঙ্কিত করা উচিত। সেইরূপ, ক্রীক রো একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত নাম। তাহা বদলাইয়া রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড না করিয়া তাঁহার নাম অনুসারে অন্য রাস্তার, সম্ভবতঃ কোন নূতন রাস্তার ঐ নাম রাখিলে ভাল হয়।

—

ভারতশাসন-আইনের পরিবর্ত্তন

যদি ব্রিটেনকে কোন বৃহৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক হইবে, এই ওজুহাতে ভারতশাসন-আইন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে সংশোধিত হইতেছে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রিক যে-যে বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন্ কোন্‌টি যুদ্ধের সময় ভারত-গবর্ন্মেণ্টের হাতে লওয়া আবশ্যক হইতে পারে, তাহার সম্যক্ আলোচনা সংক্ষেপে হইতে পারে না এবং আমাদের আলোচনা ও আপত্তি কর্ত্তাদের কানে পৌছিবেও না—যদি পৌছিত, তাহা হইলেও তাহার আগেই আইন সংশোধিত হইয়া যাইবে। সেই জন্য কোন বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া পাঠকদিগকে পরাধীনতার এই অপমানকর ও অনিষ্টকর অসুবিধা লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে, আইন সংশোধিত হইতেছে যাহাদের দেশের নিমিত্ত, তাহাদের মতামতের কোন অপেক্ষাই রাখা হইতেছে না। ইহা অবশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে-আইনটার সংশোধন হইতেছে, তাহাও ভারতবর্ষের লোকদের মতানুযায়ী নহে। স্বাধীনতা যে কত আবশ্যক, তাহা রাষ্ট্রিক প্রত্যেক ব্যাপার হইতে বুঝা যায় ও বুঝান যায়।

যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলির হাত হইতে কতকগুলি ক্ষমতা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নিজের হাতে লওয়া আবশ্যক, বিনা তর্কে ইহা মানিয়া লইলেও, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের হাত হইতে বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধীয় আইন-প্রণয়নাদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট-গুলিকে দেওয়ার সঙ্গে যুদ্ধের কি সম্পর্ক আছে বুঝা যায় না। ভারতশাসন-আইনটা এখন এরূপ ভাবে সংশোধিত হইতেছে যে, কেবল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের থাকিবে, অন্যগুলি যে-যে প্রদেশে অবস্থিত সেই সেই প্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবে। যেমন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাংলা দেশে স্থিত, উহার সম্বন্ধে নূতন আইন করা, পুরাতন আইন পরিবর্ত্তন করা—এসব অতঃপর প্রাদেশিক মন্ত্রীরা করিতে পারিবেন। বঙ্গের সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা বিশ্ববিদ্যালয়টি দখল করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আইনে বাধা থাকায় তাহারা এ-পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারে নাই। এখন তাহা পারিবে। যে বিদ্যাপীঠের জন্য অর্থ ও মানসিক শক্তি প্রধানতঃ হিন্দুরা দিয়াছে এবং যাহার খুব বেশী অংশ ছাত্র হিন্দু, তাহাতে হিন্দুরা শক্তিহীন হইবে। যদি মানবজাতির জ্ঞান-বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং দেশে জ্ঞানবিস্তারের নিমিত্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দুদিগকে ক্ষমতাশূন্য করা আবশ্যক হইত,

তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত ও হিতকর হইত। কিন্তু যে-কারণে ও উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গ করা হইবে, বিদ্যাবিবর্দ্ধন ও বিদ্যোৎসাহিতার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

যুদ্ধের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের হাতে সঁপিয়া দেওয়ার কোন সম্বন্ধ নাই, ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু এক রকম যুদ্ধের সহিত সম্পর্ক আছে। সে যুদ্ধ স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজ্‌মের) সহিত সাম্রাজ্যাসক্তির (ইম্পীরিয়্যালিজ্‌মের) যুদ্ধ। বঙ্গে হিন্দুরা কিছু সংখ্যালঘু হইলেও ন্যাশন্যালিজ্‌মের পক্ষে ও ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তাহারাই লড়িয়া আসিতেছে। ইংরেজী শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, তাহাদিগকে এই যুদ্ধে প্রেরণা দিয়াছে ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়াছে। অতএব শিক্ষায়তনগুলিতে তাহাদিগকে শক্তিহীন করা, শিক্ষায়তনগুলিকে তাহাদের প্রভাবমুক্ত করা এবং শিক্ষাকে স্বাজাতিকতার প্রেরণাশূন্য করা চাই। আইন সংশোধিত হইলে এই উদ্দেশ্যসাধন সহজ হইবে। বঙ্গের সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রায় সমুদয় উচ্চপদ হয় সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজের নয় তাহার তাবেদার সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের হাতে গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থা এইরূপ হইলেই কর্ত্তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

—

বঙ্গের অধ্যাপকদের কন্‌ফারেন্স

দৌলতপুরে সম্প্রতি বঙ্গের অধ্যাপকদিগের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল, তাহার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বঙ্গের শিক্ষার উপরে বর্ণিত বিপদ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অভিভাষণটি মননশীল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পঠনীয়।

—

নিখিলভারত কৃষক কন্‌ফারেন্স

গয়াতে নিখিলভারত কৃষক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গেল। সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব তাহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, তাহার কারণ, এবং তাহার উচ্ছেদের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কৃষকেরা যে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন ধন প্রধানতঃ অন্যেরা ভোগ করে, ইহাও সত্য। তাহাদের দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য শক্তি ও অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। তাহারা দেশকে ও জগৎকে এ পর্য্যন্ত যাহা দিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহারা দিতে পারিবে যদি রাষ্ট্রে ও সমাজে ন্যায্য স্থান তাহারা পায়। দেশ পরাধীন থাকিতে থাকিতেও তাহাদের অবস্থার আংশিক উন্নতি এবং কিছু শক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে। কৃষকপ্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই যতটা শক্তিশালী হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় ইহা আরও কত শক্তি লাভ করিতে পারিবে।

দেশের পরাধীন অবস্থাতেও যদিও কৃষকদের আর্থিক উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি অনেকটা হইতে পারে, তথাপি দেশ স্বাধীন না হইলে তাহাদের সচ্ছলতা ও শক্তি যথাসম্ভব বাড়িবে না। এই নিমিত্ত স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে। দেশের অন্য সমুদয় সমিতি অপেক্ষা কংগ্রেসই স্বাধীনতার চেষ্টা অধিক করিতেছেন। অতএব কৃষকদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে হইবে। হইতে পারে যে, কৃষকদের দাবী অনুযায়ী সব কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়া উচিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সংঘ ও প্রচেষ্টার পরস্পর ঝগড়া বিবাদে যাহাতে স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা দুর্ব্বল ও মন্দীভূত না হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত।

মিশরের স্বাজাতিক ওআফদ দলের প্রতিনিধিরা বলিয়া গিয়াছেন, "আমাদের দেশে কেবল একটি মাত্র প্রচেষ্টা আছে—তাহা স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা"। ভারতবর্ষের সামাজিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা মিশর হইতে অনেকটা ভিন্ন রকমের। তাহা হইলেও যাহাতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাই সকলের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী প্রচেষ্টা থাকে, ভারতীয় মাত্রেরই সেদিকে রাখা কর্ত্তব্য।

—

নিখিলভারতীয় জমিদার কন্‌ফারেন্স

গয়াতে যেমন কৃষকদের, লক্ষ্ণৌতে তেমনি জমিদারদের কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল। কৃষকদের উন্নতি করিতে হইলে জমিদারদের সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা কিছু কমান অনিবার্য্য। সমাজতন্ত্রীরা ও কৃষকনেতারা জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চান। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহারা কিছু ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জমিদারীর উচ্ছেদ চান। আমরা ইহা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। এখন যাঁহারা জমিদার, তাঁহারা জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা অতীতের উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা পাইয়াছেন। অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এই প্রথাজনিত সমুদয় অকল্যাণের জন্য তাঁহাদিগকে দায়ী করিয়া সমস্ত শাস্তিটা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান ন্যায়সঙ্গত নহে। অনেক জমিদার বা তাঁহাদের পিতা বা পিতামহ অন্য প্রকার বৃত্তি অনুসরণ করিয়া নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে টাকা রোজগার করিয়া জমিদারী কিনিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল বাজেয়াপ্ত করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

জমিদারী প্রথার পক্ষে ওকালতী করিবার নিমিত্ত আমরা এসব কথা বলিতেছি না। হইতে পারে যে, জমিদারী প্রথা টিকিবে না। তাহা হইলেও নানা বিষয় বিবেচ্য। যথা—দেশের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় জমিদারী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে খাসমহলের ব্যবস্থা ভাল হইবে কি? আর, যদি প্রত্যেক কৃষক-পরিবারকে কিছু জমির মালিক করা হয়, তাহা হইলে এক-একটা জোত কত বড় হওয়া উচিত? বর্ত্তমান জমিদারদিগের সকলকেই কি বিনা ক্ষতিপূরণে তাঁহাদের সম্পত্তিচ্যুত করা উচিত? যদি না হয়, তাহা হইলে কাহাদিগকে কিরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, কাহাদিগকে দেওয়া উচিত নয়, সে বিষয়ে সুবিবেচনা আবশ্যক। কেহ স্বয়ং দেশদ্রোহিতা করিয়া জায়গীর পাইয়া থাকিলে তাঁহার কোন ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার নাই। জমিদারীর উচ্ছেদ বৈপ্লবিক প্রণালীতে অবিলম্বে করা উচিত, না ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগ প্রণালীতে ক্রমে ক্রমে করা উচিত?

লক্ষ্ণৌয়ের কন্‌ফারেন্সে জমিদারেরা কংগ্রেসের সহিত একটা বুঝাপড়া ও রফা করিবার নিমিত্ত একটি কমীটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা ভাল। কৃষক-নেতাদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার নিমিত্তও এইরূপ কমীটি নিযুক্ত করিলে ভাল হইত।

জমিদারদের মধ্যে কোন কোন বক্তা যে স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় যোগ দিবার ঔচিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা সমীচীন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী আমলাতন্ত্রের সহিত সন্ধিবন্ধনের যে অনেকে বিরোধী, তাহাতেও তাঁহাদের দেশভক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মুদ্রা-হার আঠার পেনি=এক টাকা আছে। জমিদার কন্‌ফারেন্স ইহা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কৃষিজীবীদের, পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াছেন এবং এই হারের সংশোধন চাহিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুরোধ ঠিক।

তাঁহারা কম্যুনিষ্ট মত প্রচারের বিরোধিতা-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষি হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর বিহারে যে ইনকম ট্যাক্স বসান হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ইঙ্গিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অন্যতম ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনু সুবেদার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য। তিনি সম্প্রতি তথায় এই মর্ম্মের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "গবন্মেণ্ট কি এইরূপ গুজবের সত্যতা সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন যে, কংগ্রেসের গত সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় বিদেশী টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল?" সরকার পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হয়, "না"। হয়ত মিঃ সুবেদারের এক জনও চর নাই; থাকিলেও তাঁহার চেয়ে গবন্মেণ্টের চর অনেক বেশী আছে। গবন্মেণ্ট যখন এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তখন এরূপ গুজব যদি রটিয়া থাকে (সে-বিষয়ে আমরা সন্দিহান), তাহা হইলে তাহা ভিত্তিহীন। হয়ত ইহা সুভাষবাবুর বিরোধী দলের কোন অন্ধ পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত, অথচ এক জন পদস্থ ব্যক্তি ইহা রটাইলেন। মিঃ সুবেদারের বুঝা উচিত ছিল যে, ইহার জন্য সেই কংগ্রেসকে, সেই

কংগ্রেসের সভাপতিকে, এবং তাহার অনেক সভ্যকে লোক-চক্ষে হেয় হইতে হইতে পারে যাহার তিনিও এক জন সভ্য।

সুভাষবাবুর নামে বঙ্গের বাহিরের কোনও প্রদেশে এইরূপ আরও অপবাদ বিনা-প্রমাণে প্রচারিত হইতেছে যাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

—

শিয়া-সম্প্রদায় ও গোবধ

মুসলমানদিগের শিয়া-সম্প্রদায়ের তাজিম উল মোমিনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গত ২৯শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে এক বিশেষ অধিবেশনে শিয়া-সম্প্রদায়কে গোহত্যার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিতে ও গোমাংস ভক্ষণ না করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যে প্রস্তাবে এই অনুরোধ আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের শিয়ারা বরাবর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি শান্তিপূর্ণ মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে; তাহারা পরমতসহিষ্ণু। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তাহারা কখনও গোহত্যার সমর্থক এবং মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্যের বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে নাই। এই সব কথা বলিয়া শিয়াদের উক্ত সমিতি বলিতেছেন যে, গোহত্যার সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই।

—

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশন

গত ২৬শে চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে কুমিল্লায় নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে:

(১) এই সম্মেলন যুক্তপ্রদেশের বোর্ড অফ হাই স্কুল এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার করিবার সম্বন্ধে যে নূতন বিধান প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন। সেই নিয়মানুসারে যাহাতে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের বাঙ্গালা ভাষাই হিন্দী ও উর্দ্দুর ন্যায় মাতৃভাষারূপে শিক্ষার বাহন হয়, তজ্জন্য নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য উক্ত বোর্ডকে অনুরোধ করিতেছেন।

(২) এই সম্মেলন যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগকে হাই স্কুল সমূহে উর্দ্দু ও হিন্দীর ন্যায় বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাহাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) ভারতের যে-সমস্ত প্রদেশে যথেষ্টসংখ্যক বাঙ্গালী আছেন সেই সমস্ত প্রদেশে বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনস্বরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে স্থান দিবার জন্য ঐ সমস্ত প্রদেশের সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৪) এই সম্মেলন দাবী করিতেছেন যে, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে মাতৃভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) এই সম্মেলনের মতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্ধারণের চেষ্টা বর্ত্তমানে কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং সেই সময়ে বাঙ্গালীর দাবীও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। "রাষ্ট্র ভাষারূপে" প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার অতিরিক্ত কোনও ভাষাকে ছাত্রছাত্রী ও অন্য ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, এই সম্মেলন তাহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছেন।

(৬) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বাঙ্গালার মিনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং স্কুল-কলেজের পাঠাগারে সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৭) বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষিকথা, ব্রতকথা, উপকথা, প্রাদেশিক শব্দ, হস্তলিখিত পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করা হউক।

(৮) এই সম্মেলন বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচার ও ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করেন:—

(ক) বাঙ্গালী মাত্রেই দৈনন্দিন কার্য্যে এবং পত্রালাপে যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিবেন।

(খ) বাঙ্গালা দেশে প্রবাসী অন্য প্রদেশের ব্যক্তিগণের সহিত যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করা কর্ত্তব্য।

(গ) অ-বাঙ্গালীর মধ্যে ও বাঙ্গালার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য:— পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণ, বাঙ্গলা সাহিত্য আলোচনাকল্পে নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

এই সম্মেলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে উহার পরিপুষ্টির জন্য বঙ্গদেশের সাহিত্যানুরাগিবৃন্দকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(১০) এই সম্মেলন আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক এবং ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগীকে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিলেন।

(১১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অথবা অন্য সাধারণ অধিবেশনে সমগ্র বঙ্গ-ভাষাভাষী জাতির প্রতিনিধিবর্গের পূর্ণ সম্মেলন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশে বা বাঙ্গালার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনার জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, সেইগুলিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অথবা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবগুলি সমস্তই সুবিবেচিত এবং বাঙালীমাত্রেরই সমর্থনযোগ্য।

তৃতীয় প্রস্তাবের, "ভারতের যে-সমস্ত প্রদেশে যথেষ্ট-সংখ্যক বাঙালী আছেন," এই কথাগুলির দ্বারা উড়িষ্যা, আসাম, এবং খাস্ বিহারও বুঝায়। যখন পরবর্ত্তী প্রস্তাবে আসাম ও উড়িষ্যার স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন তাহাতে খাস্ বিহারেরও উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

উড়িষ্যা এবং আসামে বাঙালী ছেলেমেয়েদের নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনও বাংলাই করা উচিত, এবং তাহার দাবী হওয়া উচিত।

পঞ্চম প্রস্তাবটির গুরুত্ব খুব অধিক; একটা রাষ্ট্রভাষা এখনই সদ্য সদ্য খাড়া করা যে অনাবশ্যক, তাহা আমরা, বিশেষ করিয়া মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে, বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছি।

বাংলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রয়াস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বাংলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রয়াসের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন, পাণ্ডিত্যপূণ এবং বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী। তাঁহার অভিভাষণটি যেমন দীর্ঘ, তাহার উপযোগী দৈর্ঘ্য এই অংশটিরও আছে। কিন্তু অভিভাষণটি এবং তাহার এই অংশটি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন দ্বারা কিংবা বাজে অনাবশ্যক কথা ঠাসিয়া দিয়া দীর্ঘ করা হয় নাই। অভিভাষণটিতে অনাবশ্যক কথা কিছুই নাই, এবং মোটের উপর সমস্তটি সমর্থনযোগ্য। তিনি তাহাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বাংলা ভাষা দ্বিখণ্ডীকরণ চেষ্টা সম্বন্ধেই তাঁহার বক্তব্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার অভিভাষণ হস্তগত না-হওয়ায় খবরের কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন অপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার হইতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে নূতনভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যমান—বাঙ্গালা ভাষার প্রারম্ভ হইতে এখন পর্য্যন্ত শত শত বঙ্গদেশীয় কবি, মনীষী ও সুলেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া বিরাট্ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

অন্য পাঁচটি প্রাকৃতজাত ভাষার মত, বাঙ্গালা ভাষা তাহার প্রাকৃতজাত শব্দাবলী অবলম্বন করিয়া রূপগ্রহণ করিয়াছিল, সেই শ্রেণীর প্রাকৃতজ শব্দ এখনও বাঙ্গালায় বিদ্যমান থাকায় বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গালাত্ব। বাঙ্গালা ভাষার পিছনে আছে তাহার মাতামহী সংস্কৃত ভাষা; যেন সংস্কৃতের কোলেই বাঙ্গালার জন্ম ও পরিপুষ্টি এবং তদনন্তর সব বিষয়ে অনুপ্রাণনা লাভ। প্রাকৃত যুগ হইতেই যখনই নূতন শব্দের আবশ্যক হইয়াছে, যেখানে খাঁটি প্রাকৃত ধাতু প্রত্যয় দ্বারা শব্দ-গঠন সুষ্ঠু হয় নাই, বিনা দ্বিধায় সংস্কৃত হইতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার আদি যুগ হইতে সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার চিরকালই বাঙ্গালার নিকট উন্মুক্ত; সংস্কৃত যে একটা পৃথক্ ভাষা, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার যে বাঙ্গালার শব্দসম্ভার হইতে ভিন্ন, এ ধারণা সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষীর মনে উদিত হয় নাই—এখনও অনেক বাঙ্গালীর মনে এ ধারণা স্থান পায় নাই। চর্য্যাপদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সমস্ত লেখক, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া, সহজভাবে, মাতৃভাষা বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের নাড়ীর টান মানিয়া লইয়া,—সংস্কৃতের বিকারে বাঙ্গালা, অতএব বাঙ্গালার শুদ্ধতর পূর্ণতর রূপই হইতেছে সংস্কৃত এই বিচারে এবং সংস্কৃতের শব্দসম্পৎ উত্তরাধিকারসূত্রে নিঃসংশয়ে বাঙ্গালারই, এই বোধে,—বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে হয়ত বাঙ্গালা ভাষার একটু হানি হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যশালী সংস্কৃতের উপর শব্দ দানের ভার অর্পণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ততটা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার কথা মনে রাখে নাই, বাঙ্গালা অনেকটা পরমুখাপেক্ষী, সংস্কৃতের প্রসাদপুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান তাবৎ কবিদের দ্বারা এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

অতঃপর সুনীতিবাবু বলিতেছেন :—

চর্য্যাপদের সিদ্ধা কবিরা, বড়ু চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস, মালাধর বিপ্রদাসাদি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কবিগণ; বৈষ্ণব-চরিত রচয়িতৃগণ, মহাজন পদকারগণ; কবিকঙ্কণ; কাশীরাম, আলাওল, মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়, ভবানী-প্রসাদ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব; গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল; রবীন্দ্রনাথ; শরৎচন্দ্র; আধুনিক মুসলমান লেখকগণের মধ্যে মীর মশার্‌রফ হোসেন, মৌলানা আকরাম খাঁ এবং অন্যান্য গদ্যলেখক ও কবি—বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখক, ইঁহাদের কেহ বাঙ্গালা ভাষার শব্দস্রোতের স্বাভাবিক উৎসকে বিস্মৃত হন নাই; হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এতাবৎ মিলিতভাবে একই মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে।

'প্রবাসী' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন হিসাবে এখনও মোটের উপর তুল্যমূল্য। এই ভাষাসাম্য, ইহা হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে বাঙ্গালী জাতির প্রতি ভগবানের এক বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি। উত্তর-ভারতে একই হিন্দুস্থানী ভাষা কেবল বর্ণমালা এবং ভাষান্তর হইতে আনীত শব্দাবলীর পার্থক্য হেতু, এক ব্যাকরণ এবং এক সাধারণ প্রকৃতি ও সাধারণ শব্দসম্ভার সত্ত্বেও, হিন্দী ও উর্দু এই দুই প্রতিস্পর্ধী-রূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইজন্য এই সাহিত্যে বাঙ্গালার হিন্দু সংস্কৃতির অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতির ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছে। মুসলমান লেখক যাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা না করিলে বিদেশী শব্দের আমদানি করিতেন না। বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো বদলাইতে কেহ কখনও চেষ্টা করে নাই, তাহার উপরে সাজস্বরূপ শব্দাবলীরও ব্যাপক-ভাবে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এতাবৎ হয় নাই।

ভারতীয় ভাষার সংস্কৃত শব্দাবলীতে কখনও কোন প্রাচীন মুসলমান লেখকের আপত্তি হয় নাই। আরবী ফারসী শব্দ যাহা আসিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে আসিয়াছে, সাহিত্যের উপরে জবরদস্তী করিয়া আনা হয় নাই।

অতঃপর বক্তা আধুনিক কতকগুলি বাঙালী মুসলমান লেখকের চেষ্টার কথা বলিয়াছেন ; যথা—

বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি মুসলমান লেখক এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে 'ইসলামীয়' করিতে চাহিতেছেন। উর্দু ভাষায় যে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য বর্ত্তমানে দেখা যায় তাহা ইহাদের কাহারও কাহারও কাছে বাঙ্গালা ভাষাতেও কাম্য এবং অনুকরণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইঁহারা দুইটি কথা ভুলিয়া যান। প্রথমতঃ ভাষার শব্দ হইতেছে বস্তু, ক্রিয়া বা ভাবের প্রতীক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা আমাদের ভাব উন্নত বা বিশুদ্ধ অথবা কোন ঈপ্সিত মতবাদের অনুসারী হইয়া দাঁড়াইলে শব্দ পুরাতন হইলেও নূতন ভাবকে গ্রহণ করে। ইংরেজী God শব্দ মূলত সংস্কৃত 'হুত' শব্দেরই প্রতিরূপ—God এবং 'হুত' উভয় শব্দ আদিম আর্য্য (ইন্দো ইউরোপীয়) ghuto শব্দ হইতে জাত, ইহার অর্থ 'যাঁহার জন্য আহুতি দেওয়া হয়'; এক্ষণে ইংরেজীতে God শব্দের এই মৌলিক অর্থ কোথায় তলাইয়া গিয়াছে—যিনি আহুতির অপেক্ষা রাখেন না এমন খৃষ্টান ঈশ্বরের ভাব এই God শব্দ এখন প্রকাশ করে। ফারসীর 'খোদা' শব্দ মূলতঃ সংস্কৃতের 'স্বধা' শব্দের ইরানীয় প্রতিরূপ হইতে জাত—ইহার অর্থ, 'যিনি নিজে কার্য করেন বা শক্তি প্রকাশ করেন'; ইহা আরবী 'আল্লাহ' শব্দের ফারসী প্রতিশব্দ হইয়া গিয়াছে; আবার কলিকাতায় চীনাদের মুখে যে 'বাজারু' হিন্দুস্থানী প্রচলিত তাহাতে 'খোদা' শব্দ 'যে কোনও দেবতা ঠাকুর বা মূর্ত্তি' অর্থে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—হিন্দুর কালীমূর্ত্তি কলিকাতার চীনার কাছে 'খোদা' আবার তাহার নিজের ধর্ম্মের দেবতা বা মূর্ত্তিও 'খোদা'। ইংরেজের God, মুসলমানের খোদাকেও ঐ নামে সে অভিহিত করে।

ফরমাশ অনুসারে তাড়াতাড়ি ভিন্নপ্রকৃতির বিদেশী ভাষা হইতে নূতন নূতন শব্দ আমদানি করিলে কিরূপ বিভ্রাট ঘটে বক্তা তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

নানা ভাষা হইতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো যায়, প্রচলিত একটা ভাষায় তাহার পুরাতন শব্দের রূপ না বদলাইয়া, ভাব বদলাইতে পারা যায়; এবং তাহা সহজ ভাবেই ঘটিয়া থাকে। অন্যথা ফরমাইশ-মতন তাড়াতাড়ি কিছু করিতে গেলে, নানা রকমের বিভ্রাট সৃষ্টি হয়; শব্দ নূতন হইলেও, লোকের মনের সংস্কৃতি বা চিন্তা-প্রণালী পূর্ববৎ থাকিলে, নূতন শব্দেরই অর্থ বিকৃত হয়। 'গুরু' বা 'শিক্ষক' স্থানে 'ওস্তাদ', 'মারা গেলেন' বা 'দেহত্যাগ করিলেন' স্থলে 'এন্তেকাল ফরমাইলেন', 'বিচার' স্থলে 'এন্সাফ', 'সেবক' স্থলে 'খাদেম', মানুষ স্থলে 'এন্‌ছান' অর্থাৎ 'ইন্‌সান', 'মাতা পিতা' স্থলে 'ওয়ালিদায়েন', 'গুরুজন' স্থলে 'বুজুর্গান্', 'ঈশ্বর-দত্ত' বা 'ভগবানের দেওয়া' স্থলে 'খোদাদাদ', 'কবিত্ব' স্থলে 'শাইরী'—এইরূপ বিদেশী শব্দ প্রয়োগে, ভাষা অর্দ্ধেকের উপর বাঙ্গালীর কাছে দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাকে আরবী ফারসী শব্দে ভরপুর করিয়া না দিলে সেই ভাষা যাহারা বলে তাহাদের ইসলামী পাকাপোক্ত হয় না এইরূপ এক অনৈতিহাসিক এবং হানিকর ধারণার বশবর্তী ইঁহারা হইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ সংস্কৃত শব্দ বুঝে, অনেক স্থলে আরবী ফারসী শব্দের অর্থ তাহাকে বাঙ্গালী হিন্দুর মতই জানিয়া লইয়া তবে বুঝিতে হয়। এই জন্যই সহজে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানগণ তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমিতির ফারসী নাম-করণ করেন নাই—'আঞ্জুমান-এ-ইসলামিয়া বরায় তরক্কী-এ-আদব-এ-বঙ্গলা'।

অতীতের মুসলমান বিজেতা ও মুসলমান নৃপতিদের ভারতীয় ভাষার প্রতি মনের ভাব এখন যাঁহারা বাংলাকে "ইসলামীয়" করিতে চান তাঁহাদের মত ছিল না।

প্রথম তুর্কী-বিজয়ের যুগে গজনার সুলতান মহমুদ প্রমুখ তুর্কী রাজারা ভারতবর্ষে অনেক বার বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন, পাঞ্জাবকে তাঁহারা গজনার সাম্রাজ্যের অংশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহারা 'বুৎ-শিকন' বা 'মূর্তি-ধ্বংসী' ছিলেন, কিন্তু 'জবান-শিকন্' বা ভাষা-ধ্বংসী হন নাই। গজনার সুলতানেরা ভারতীয় প্রজাদের জন্য প্রথম যে-সকল মুদ্রা জাহির করেন, সেগুলির মধ্যে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম-বীজ কলমা-মন্ত্র 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ বা উপাস্য নাই, মুহম্মদ অল্লাহের রসুল, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত), ইহার সংস্কৃত অনুবাদ করাইয়া ভারতীয় মুদ্রায় দিয়াছিলেন—'অব্যক্তম্ একম্', মুহম্মদ অবতার'; তারিখ দিয়াছেন হিজিরার অব্দে, কিন্তু 'হিজিরা' অর্থাৎ মক্কা হইতে নবী মুহম্মদের পলায়নের বৎসর হইতে যে সংবতের উৎপত্তি তাহার ভারতীয় অনুবাদ করেন 'জিনায়ন'—অর্থাৎ মুহম্মদ, যেন

বুদ্ধ ও মহাবীরের দরের 'জিন' বা জেতা—তাঁহার 'অয়ন' বা গমনের তারিখ। এখন 'হিজিরা'কে কোনও ভারতীয় মুসলমান 'জিনায়ন' বলিতে চাহিবেন কি? 'অব্যক্ত এক, মুহম্মদ অবতার' —ইহা অবশ্য কলমার ঠিক অনুবাদ নহে, কিন্তু এই অনুবাদের চেষ্টা হইতে তখনকার মনোভাব বুঝা যায়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র রাজকুমার আজম পিতার নিকটে কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট আম পাঠাইয়া দেন, পিতাকে অনুরোধ করেন ঐ জাতীয় আমের যেন একটি করিয়া নাম তিনি ঠিক করিয়া দেন; ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে রাজর্ষিরূপে সম্মানিত ঔরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ এই আমের নাম রাখেন, ভারতের সকলের বোধ্য সংস্কৃত শব্দ দিয়া—'সুধারস' এবং 'রসনা-বিলাস' ('রোক্কা-আৎ-এ-আলমগীরী', নয়ের সংখ্যার চিঠি)।

গান্ধীজীর প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার বিধি প্রবর্তিত করিবার জন্য যে-সব স্কুল স্থাপিত করা হইতেছে সেগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিদ্যামন্দির'—'বিদ্যা' এবং 'মন্দির' এই দুইটি শব্দ উর্দু'ওয়ালারাও বুঝিবেন, কিন্তু এই নাম সংস্কৃত ভাষার শব্দে গঠিত বলিয়া কতকগুলি মুসলমান আপত্তি করিলেন—তাঁহারা আরবী নাম 'বৈতু-ল্‌-'ইল্‌ম্‌' না হইলে প্রস্তাবিত বিধির বিরোধিতা করিবেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের বাহিরে স্বাধীন মুসলমান দেশ তুরস্ক ও ইরানে ভাষা সম্বন্ধে যে চেষ্টা হইতেছে, এবং নবীন অনেক উর্দু লেখক যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিবেচ্য :—

ওদিকে ভারতের বাহিরে তুর্কীস্থানে ও পারস্যদেশে মুসলমান সাহিত্যিক মহলে চেষ্টা চলিতেছে, তুর্কী ও ফারসী ভাষাদ্বয়কে খাঁটি তুর্কী ও ফারসী ভাষা করিয়া তুলা—তুর্কী হইতে আরবী ফারসীর, এবং ফারসী হইতে আরবীর শব্দ বহিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। পারস্যের রাজধানী তেহ্‌রান-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নাম ছিল আরবী ভাষায়—'দারু-ল-উলূম', এখন এই নাম বদলাইয়া ফারসী আর্য-ভাষার শব্দ দিয়া নূতন নাম হইয়াছে, 'দানিশ-গাহ্‌'। তুর্কীস্থান ও ইরান এতদিন ধরিয়া বিদেশী শব্দের সাধনা করিতেছিল, এখন তাহার মোহ হইতে নিজকে মুক্ত করিতেছে। ভারতে মুসলমান শাসনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় প্রথম যুগে, এবং মোগল-যুগে, এই মোহ ভারতীয় মুসলমানদের ততটা আবিষ্ট করে নাই; অবস্থাগতিকে ফারসী খুব বেশী করিয়া উত্তর-ভারতে রাজ-ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা, দপ্তরের ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষা থাকায়, ফারসীর প্রভাব 'মুসলমানী হিন্দী' বা উর্দু'তে গভীরভাবে পড়িয়াছে। কিন্তু এখন উর্দু ভাষাতেই নবীন কতকগুলি মুসলমান লেখক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা উর্দু'র বিদেশী আরবী-ফারসী শব্দাবলী কমাইয়া দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

যুগোপযোগী প্রচেষ্টা বাঙ্গালার বাহিরে আরম্ভ হইয়াছে; পশ্চিমের মুসলমান লেখকগণের মধ্যে ভাষা-বিষয়ে নির্বিচারে আরবী-ফারসী শব্দ গ্রহণের রীতিকে বর্জন করিবার কথাও উঠিয়াছে; কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই কি সেই রীতি নূতন করিয়া গৃহীত হইয়া, বাঙ্গালী জনসাধারণকে ধাঁধায় ফেলা হইবে, এবং পাঁচ কোটির উপর লোকের দুর্লভ ভাষা-গত ঐক্যকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে?

বাংলা ভাষার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বক্তার মতে ভীষণ জুলুম :—

বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গেলে, এই ভাষার উপরে ভীষণ এক জুলুম হইবে—এবং এই পরিবর্তন দুই এক পুরুষে সম্ভব হইবে না। পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন এক ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেরূপ নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মত কল্পনা ও শক্তি, এবং মানসিক প্রবণতা, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিয়া ফেলিতে হইবে' এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের আছে কি না জানি না; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যেখানে laissez faire অর্থাৎ 'যা-খুশী তাই করো' নীতি অবাধে চলিতেছে, সেখানে এই প্রকার মানসিক শক্তি এবং কল্পনার পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় কেহ এখনও দেখান নাই। আরবী-ফারসী-বহুল বাঙ্গালায় যেখানেই শক্তিশালী মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার সমাদর হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর নিকটেই হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর কাছেও তাঁহার জনপ্রিয় হইতে বাধা ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত কাজী ইমদাদুল-হক সাহেবের 'আবদুল্লাহ'-এর মত উপাদেয় সামাজিক উপন্যাসে স্থানে স্থানে যে আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনও হানি হয় নাই, বরঞ্চ তাহার দ্বারা বাস্তবের যথার্থ অনুকরণ হইয়া রস-সৃষ্টিতে সহায়তা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা কবি প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সে সম্পর্কে তিনি যে অভিমত দিয়াছেন তাহা সকল সাহিত্যিক মানিয়া লইবেন—'যে হৌক সে হৌক ভাষা—কাব্য রস লয়ে।'

অতঃপর সুনীতিবাবু মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন।

বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যে যে একটা খিচুড়ী বাঙ্গালা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাঙ্গালা দেশের কোনও অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোনও সংযোগ নাই, যাহার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতার সঙ্গে অনাবশ্যক ভাবে উর্দু'র শব্দ ও বাক্যরীতির প্রযোজন করা হয় (যথা—'তেরা পাও' অর্থাৎ 'তোমার পা,' 'দেলের বিচেতে' = 'মনের মাঝে,' 'পয়দা করে জাহান' = 'জগৎ সৃজন করে', 'ওয়াস্তে খোদার' = 'ঈশ্বরের জন্য', 'এছা, জেছা, তেছা' = 'এমন, যেমন, তেমন', ইত্যাদি)—সেই কেচ্ছা-সাহিত্যের ভাষাকে কেহ কেহ মুসলমান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে, হিন্দু এবং মুসলমানের লেখা পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই, যাঁহাদের প্রধান সম্বল অল্পস্বল্প আরবী ফারসী ও উর্দু এহেন শক্তিহীন

পেশাদার লেখকের হাতে এই আরবী-ফারসী-মিশ্র কেচ্ছা-সাহিত্যের বাংলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা খাঁটি বাংলাও নহে, শুদ্ধ উর্দুও নহে—'ন ঘরকা, ন ঘাটকা'।

কেচ্ছা-সাহিত্যের বাহিরে, মুসলমান ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুস্তক এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে—তাহাতে আরবী ফারসী শব্দের অবাধ প্রবেশের ওজুহাত অনেকে দেখিয়াছেন।

বাংলা ভাষার এই সঙীন সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে বক্তা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন।

এক্ষেত্রে অনুযোগ অভিযোগ উপরোধে কিছু কার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয় না—বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবে এই রকম একটা বোঝাপড়ায় বোধ হয় সুবিধার দিক্ হইতে সকলেই স্বীকৃত হইবেন—বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত হইবে, বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রগণের পাঠ্য হইবে, তাহাতে বাংলা সাধু-ভাষায় যে রীতি অধুনা প্রচলিত আছে সেই রীতিই আপাততঃ বহাল থাকুক। মুসলমান ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ শব্দ আবশ্যক হইলে আরবী ফারসী হইতে বাংলায় লইতে হইবে—এ-বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু যদি বাংলা শব্দ (ইহার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দও ধরিতে হইবে) অনুরূপ অর্থে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, মৌলানা আকরাম খাঁ, অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিক, যাঁহারা বাংলা ভাষা ভাল জানেন এবং যাঁহারা আরবী-ফারসীতেও প্রবীণ, আরবী-ফারসী-জানা কয়েক জন হিন্দু সাহিত্যিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সমগ্র বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমানগণের বোধগম্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বাংলা ভাষার ঐক্য-সংরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া, এ-বিষয়ে বাঙালী-জাতিকে যথাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।

বাংলা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গসন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মহান অনর্থ হইবে। আমার মনে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণ ছায়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে, আশা করি এ-বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমায় দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মনোভাব ও আচরণ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত সুনীতিবাবু তাহা দেখাইয়াছেন:

বাঙালী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, কি রোমান-কাথলিক কি প্রটেষ্টাণ্ট, সম্প্রতি যে ভাবে তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর বাংলা করিতেছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা ইউরোপীয় (গ্রীক) শব্দ বাংলা ভাষায় চালাইবার পক্ষে তো নহেন, বরঞ্চ সহজ ভাবে বাংলা ভাষার খাঁটি বাংলা অথবা বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দ এবং ধাতু ও প্রত্যয় সাহায্যে, বাংলার প্রকৃতির অনুযায়ী শব্দ গ্রহণ করিতেছেন বা গঠন করিতেছেন। Baptism অর্থে 'দীক্ষা-স্নান', Eucharist অর্থে 'খ্রীষ্টপ্রসাদ', Confession = 'পাপ-স্বীকার', Extreme Unction = 'অন্তিম লেপন', Sacred Heart of Jesus অর্থে 'যীশুর শ্রীহৃদয়', Mass = 'খ্রীষ্ট-যাগ', Sacrament = 'সংস্কার', প্রভৃতি অনুবাদ, 'হিজিরা' অর্থে 'জিনায়ন'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার দ্বারা খ্রীষ্টান মতবাদ বিপন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ইঁহারা করেন না। ইহার সুফল এই হইবে যে, আমাদের সাধারণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া অখ্রীষ্টান বাঙালী, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী, খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন, এবং খ্রীষ্টান আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

—

ইটালীর আলবানিয়া দখল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্মিত যানবাহন এখন এরূপ হইয়াছে যে, পৃথিবী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে। ভাল এরোপ্লেন থাকিলে এখন দূরতম স্থানেও সপ্তাহের মধ্যে যাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংবাদের আদান-প্রদান দীর্ঘতম ব্যবধান সত্ত্বেও এক মিনিটের মধ্যে হইতে পারে। এইরূপ নানা বৈজ্ঞানিক কারণে ও ব্যবস্থায় পৃথিবীর নানা দেশের ভাগ্য ও মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরের সহিত জড়িত। সেই হেতু সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতি না থাকিলেও, প্রত্যেক দেশের লোককে স্বার্থের খাতিরেও অন্য দেশের কথা ভাবিতে হয়, এবং বিদেশের সংবাদ রাখিতে হয়। ভারতবর্ষকে নিজের স্বার্থের খাতিরেই ভাবিতে হয়, এশিয়ায় কোন জাতি এরূপ প্রবল হইতেছে কিনা, যাহার শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে, কিংবা ইয়োরোপে কাহারও শক্তি এরূপ হইতেছে কিনা যাহাতে ব্রিটেনের শক্তির আপেক্ষিক হ্রাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিতে পারে।

কিন্তু ইয়োরোপের রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি আজকাল রাতারাতি এরূপ বদলাইতেছে যে, মাসিক কাগজে ইয়োরোপীয় সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির আলোচনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম তাহা

হয়ত কাগজ প্রকাশিত হইবার দিন প্রত্নতত্ত্বের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে!

তথাপি ইটালীর আলবানিয়া অধিকারের কথা লিখিতেছি। (তাহার আগে স্পেনে বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর জয়ের কথাও উল্লেখ্য।) ইটালীর আলবানিয়া-গ্রাস 'জোর যার মুলুক তার' নীতির দৃষ্টান্ত। আলবানিয়া ইয়োরোপের একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইহার আয়তন ১০৬২৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১০,০৩,১২৪। ইহার রাজা ছিলেন জোগ (Zog)। তিনি মুসলমান। অধিবাসীদের মধ্যে ৬,৮৮,২৮০ মুসলমান; বাকী খ্রীষ্টিয়ান।

১৯২৭ সালের ২২শে নবেম্বর ইটালী ও আলবানিয়ার মধ্যে পরস্পর-রক্ষার সর্ত্তে ২০ বৎসরের জন্য একটা সন্ধি হইয়াছিল! অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত কেহ আলবানিয়া আক্রমণ করিলে ইটালী এই সন্ধি অনুসারে আলবানিয়াকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিল! কিন্তু ইটালী স্বয়ং যদি ভক্ষক হয় তাহা হইলে রক্ষকও সে-ই হইবে, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? পরস্পর বিপরীত কাজ ত যুগপৎ করা যায় না। সুতরাং ইটালী আলবানিয়া আক্রমণ করিলে ইটালীই তাহাকে রক্ষা করিবে এরূপ আজগুবি সর্ত্ত ঐ সন্ধিটাতে ছিল না। ইটালীর সাফাই কি এই?

এরূপ ছোট রাজ্যের ইটালীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সাফল্য লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তথাকার লোকেরা যে লড়িয়াছিল, ইহা তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার ও বীরত্বের পরিচায়ক।

জার্ম্মেনী ইয়োরোপে অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, মেমেল লইয়াছে, আরও কিছু লইবার চেষ্টায় আছে; এখন ইটালীর পালা। অবশ্য ইয়োরোপের বাহিরে সে আগেই আবিসীনিয়া লইয়াছিল।

ব্রিটেন এখন মানুষের মত কিছু একটা করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু এখন হয়ত বা "সময় নাহি রে"। জাপান যখন চীন আক্রমণ করিয়াছিল, ইটালী যখন আবিসীনিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, ফ্রাঙ্কো যখন বিদ্রোহী হইয়া স্পেনের গবর্মেণ্টকে আক্রমণ করিয়াছিল, জার্ম্মেনী যখন চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাসে উদ্যত..., তখন ব্রিটেন বা[জ] নিজের কর্ত্তব্য করিলে এখন হয়ত অবস্থা সঙ্গীন [হই]ত না।

—

বঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুদের বিষম পরীক্ষা

বঙ্গের কৃষিঋণ সালিসীর আইনে এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত হিন্দুর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। মহাজনদের সম্বন্ধে যে আইন হইতেছে, তাহাতে আরও অধিক ক্ষতি হইবে। বার বৎসর আগে যে ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মহাজন যদি খাতকের কাছ হইতে মোট সুদ বেশী পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অনেকটা অংশ এখন ফেরত দিতে হইবে—এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। অতিলোভী মহাজনদের অত্যাচার বন্ধ করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু আইন এমন করা উচিত নহে যাহাতে চাষীদের দরকারের সময় ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়।

বৎসরে যাহাদের ২০০০৲ বা তাহা অপেক্ষা অধিক আয়, তাহাদের উপর, ইন্‌কম্ ট্যাক্স ছাড়া, অতিরিক্ত বাৎসরিক ৩০৲ টাকা ট্যাক্স বসান অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইবে।

সরকারী "গোপনীয়" দলিল প্রকাশ সম্বন্ধে যে আইন হইতেছে, তাহাতে খবরের কাগজওয়ালারা ও জনসভার বক্তারা বিপন্ন হইবে। তাহারা অধিকাংশ স্থলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই প্রকারে মুদ্রযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দান সাতিশয় নিন্দনীয়।

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের যে-সব সংশোধন হইতেছে, সেই সব সংশোধন আইনে পরিণত হইলে, এই সংশোধিত আইনের নজীরে বঙ্গের যে-সব মিউনিসিপালিটিতে, জেলায়, মহকুমায় ও ইউনিয়নে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক, সেখানেও তাহাদিগকে ক্ষমতাহীন করা চলিবে। স্থানীয়-স্বায়ত্তশাসন-বিধায়ক সকল সমিতিতে হিন্দু প্রতিনিধিরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাহারা ক্ষমতাহীন হইবে।

—

হিন্দুদিগের আত্মরক্ষা অসম্ভব নহে

বর্ত্তমান সময়ে দুইটি লোকসমষ্টির মধ্যে হিন্দুবিরোধিতা দেখা যাইতেছে। এক সাম্রাজ্যভক্ত (ইম্পীরিয়্যালিষ্ট) ইংরেজ, আর এক সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমান। ব্রিটেনের সমুদয় অধিবাসীর সংখ্যা পাঁচ কোটির কম। ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা ২৩,৯১,৯৫,১৪৯। ভারতবর্ষের

বাহিরেও কিছু হিন্দু আছে। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদিগকে ইহার মধ্যে ধরিলাম না। ব্রিটেনের ইংরেজীভাষী লোকেরা ছাড়া অন্য ইংরেজীভাষী লোকেরা (যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা) ইংরেজদের সহিত মিলিয়া হিন্দুদের বিরোধিতা করিবার সম্ভাবনা কম। তাহা করিলেও পৃথিবীতে মোট ইংরেজী-ভাষীর সংখ্যা কুড়ি কোটি। তাহা হিন্দুদের সংখ্যা অপেক্ষা কম। হিন্দুরা বুদ্ধিতে ও সাহসে ইংরেজদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। শিক্ষায় ও দলবদ্ধতায় নিকৃষ্ট বটে। তাহার প্রতিকার হইতে পারে ও হইতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা ৭,৭৬,৭৭,৫৪৫। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী হইবার সম্ভাবনা কম। তাহা হইলেও তাহাদের সংখ্যা হুইটেকার্স য়্যালম্যানাক অনুসারে ২০,৯০,২০,০০০—ভারতের হিন্দুদের চেয়ে কম। হিন্দুরা কেবল দলবদ্ধতায় মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট। সে-বিষয়ে হিন্দুদের উন্নতি হইতে পারে; সম্ভবতঃ হইতেছে।

ব্রিটেনের ইংরেজ ও ভারতবর্ষের মুসলমানের সমষ্টি ভারতীয় হিন্দুর সমষ্টির চেয়ে কম।

গান্ধী-বসু সাক্ষাৎকার আবশ্যক

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনিশ্চয়ে এবং সংবাদপত্রে নানাবিধ গুজব ও বাদ-প্রতিবাদের প্রকাশে দেশের ক্ষতি হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সুভাষবাবুর শীঘ্র সাক্ষাৎকার ও বুঝাপড়া হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

জলধর সেন

যাঁহাকে বিস্তর বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী "জলধর-দা" বলিয়া আন্তরিক প্রীতির সহিত সম্বোধন করিতেন ও "জলধর-দা" বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করিতেন, এবং যিনি তাঁহাদের সহিত দাদার মত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, সেই জলধর সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু নহে, এবং তিনি অনেকগুলি পুত্র-কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কিছুকাল পূর্ব্বেই পরলোক যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহাকে বৈধব্য সহ্য করিতে হইল না।

জলধর সেন

সচরাচর যে-সকল কারণে মানুষের মৃত্যু শোকাবহ হয়, জলধরবাবুর মৃত্যুতে শোকের সেরূপ কোন কারণ নাই। তথাপি যিনি এত আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোভাবে আন্তরিক বেদনা অনুভূত হইবে।

তিনি অল্প বয়স হইতেই সংবাদপত্রের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন "সোমপ্রকাশে" ও "গ্রামবার্ত্তা"য় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। পরে তিনি "বসুমতী" ও "হিতবাদী"র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। শেষ বয়সে তিনি বহু বৎসর ধরিয়া মাসিক "ভারতবর্ষ" সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

লেখক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যখন "সাহিত্য" পত্রিকায় মাসে মাসে বাহির হইত, তখন আমাদের মত বহু পাঠক তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। পরে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে বাহির হয়।

তিনি অনেক মনোরঞ্জক ছোট গল্প এবং কয়েকটি উপন্যাসের লেখক।

সাহিত্যিকদের "রবিবাসর" নামক সমিতি ও মিলন-ক্ষেত্রের তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। নিতান্ত উত্থানশক্তি-রহিত না হইলে তিনি "রবিবাসরে"র কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিতেন না। ইহার পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যখন শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেন, তখন তিনি পরম উৎসাহে ও আনন্দে দলবলসহ সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি রাণাঘাটে পাল চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রাসাদে রবিবাসরের অধিবেশনে ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালীকে পরিহাস করিয়া 'দাদাতন্ত্র' বলিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু সত্য কথা। সাহিত্যের সহিত কোন-না-কোন রকমের সম্পর্ক রাখেন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ও প্রকৃতির এরূপ অনেকগুলি মানুষকে সংঘবদ্ধ রাখিয়াছিল তাঁহার আন্তরিক দাদাত্ব। "রবিবাসর" হইতে এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহু ব্যক্তির এই "দাদা"র তিরোভাব হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে ও সাংবাদিক মহলে তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লোক আছেন, কিন্তু "দাদা" হইবার মত আপাততঃ কাহাকেও দেখিতেছি না। তাঁহার আসনটি কত দিন খালি থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না।

লালা হরদয়াল

আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে নিদ্রিতাবস্থায় হৃদ্‌রোগে সুবিখ্যাত লালা হরদয়ালের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি পঞ্জাবী। যখন তিনি ছাত্র, তখন হইতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন। স্বপ্ন দেখিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই বা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা এত প্রবল ছিল যে, বিশেষ মেধাবী ও বিদ্বান্ ছাত্র বলিয়া যে রাষ্ট্রিক বৃত্তি (State scholarship) লইয়া তিনি অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিদেশী গবর্মেণ্ট-প্রদত্ত বলিয়া ত্যাগ করেন।

পরে তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইবার নিমিত্ত গোপনীয় পরামর্শ ও চেষ্টার মধ্যেও ছিলেন। এই প্রকার বিদ্রোহী ভাব ও চেষ্টার ফলে তাঁহার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে যেমন ব্রিটেনের শত্রু সেইরূপ জার্ম্মেনীর পক্ষপাতী ছিলেন। পরে এ বিষয়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়।

তিনি যাহাতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এদেশে চেষ্টা হইয়াছিল। সে বিষয়ে সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রুর তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আমেরিকায় কিছু দিন থাকিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয়।

তিনি বহুভাষাবিৎ ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইয়োরোপে ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও মত সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনি স্বাধীন গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত বৌদ্ধমতের সদৃশ ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

তিনি ভারতবর্ষীয় ও বৈদেশিক বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি মডার্ণ রিভিয়ুতে হিন্দু জাতির সামাজিক বিজিতত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা বহুসংখ্যক পাঠকের মনকে আলোড়িত করিয়াছিল।

তাঁহার যৌবনকালে একবার এলাহাবাদে তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ও চালচলন তখন অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। বিলাসের প্রতি বিরাগ তাঁহার এত বেশী ছিল যে, তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন বলিলেও চলে। শুনিয়াছি বিলাতেও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে থাকিতেন। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার আর্থিক অবস্থার হয়ত কিছু উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নরওয়েতে থাকিতে একটি নরুইজিয়ান্ মহিলাকে বিবাহ করেন। আমেরিকায় তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ যে সভা হয় ও যাহাতে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বক্তৃতা

লালা হরদয়াল

প্রার্থনা করেন, তাহাতে এই মহিলা তাঁহার সম্বন্ধে অনেকগুলি মর্ম্মস্পর্শী কথা বলেন।

যৌবনকালে রাজপুতানার জয়পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দবিহারী লাল তাঁহার এক জন অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। এই গোবিন্দবিহারী লাল আমেরিকা গিয়া তথাকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ সায়েন্স পদবী লাভ করেন এবং এখন তিনি আমেরিকার একটি সর্ব্বদেশিক বৈজ্ঞানিকসংবাদ-সমিতির প্রধান লেখক ও প্রসিদ্ধ হার্‌স্ট কাগজগুলির বৈজ্ঞানিক সম্পাদক। তিনি মধ্যে মধ্যে মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রবন্ধ লেখেন। কয়েক সপ্তাহ আগে একটি প্রবন্ধের সহিত তাঁহার যে চিঠি পাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি লালা হরদয়ালের ও নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "We are alive and kicking", "আমরা বেঁচে আছি ও স্ফূর্ত্তিতে আছি।" ডক্টর হরদয়ালের মৃত্যু হঠাৎ হইয়াছে। গোবিন্দবিহারী লাল আমাদিগকে উক্ত চিঠি লেখার সময় ভাবেন নাই যে বন্ধু হরদয়ালকে এত হারাইবেন।

রাজকোট-সমস্যা পুনরায় জটিল

রাজকোট, ১১ই এপ্রিল

রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শাসন-সংস্কার কমিটির সদস্য মনোনয়ন সমস্যার এখনও মীমাংসা হয় নাই। এই সম্পর্কে পুনরায় গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি, স্যর মরিস গায়ার তাঁহার রায়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঠাকুর সাহেবকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মনোনীত সাতজন প্রতিনিধিকে শাসন-সংস্কার কমিটিতে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, মুসলমান এবং গিরাসিয়া কিংবা ভায়াত সম্প্রদায়ের দাবী লইয়া। সেই সঙ্গে পরিষদ প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমস্যা সমাধানের উপায় এখন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। ঠাকুর সাহেব শাসন সংস্কার কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কিংবা সংস্কার কমিটির সরকারী সদস্যগণকে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব এবং পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা সম্পর্কে মাত্র এই দুইটি প্রস্তাবই এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে।—এ. পি.

কলিকাতায় মহিলাদের জন্য নূতন কলেজ

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য পুরুষদের সমান সুযোগ পাওয়ার আবশ্যকতা যাহারা অনুভব করেন না, আমরা তাঁহাদের মতাবলম্বী নহি। এই জন্য দক্ষিণ-কলিকাতায় ছাত্রীদের জন্য নূতন একটি কলেজ স্থাপনের কথা শুনিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিদুষী শ্রীযুক্তা শকুন্তলা শাস্ত্রী এই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় কলেজটি সুপরিচালিত হইবে আশা করা যায়। কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাইয়াছে, সুতরাং গবর্নমেণ্টের অনুমোদন পাইতেও কোন বাধা হইবে না অনুমান করি।

সাইবিরিয়ায় বাঘ শিকার

আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যে বনে জঙ্গলে বাঘের রাজত্ব তাহা নয়—মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সাইবিরিয়ার ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে (মেরুপ্রদেশের নিকটে) বাঘ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায় না। ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে শীতের প্রকোপ অত্যধিক—কোন কোন সময় উত্তাপ শূন্যেরও ৪৬ ডিগ্রি নীচে চলিয়া যায়—বারো মাসই এখানে শীতকাল বলিলে চলে। এই অঞ্চলে কিন্তু দীর্ঘ বিস্তৃত অরণ্যের অভাব নাই—এই অরণ্যগুলিই এ দেশের বাঘের আস্তানা—এই অরণ্যে বন্য শূকর, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া ইহারা প্রাণধারণ করে।

এই অঞ্চলের চীনা ও মঙ্গোলীয় অধিবাসীরা বাঘকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে ভয়ভক্তি করিয়া থাকে—তাহাদের মতে বাঘ পর্ব্বত-দেবতার প্রতীকস্বরূপ—ব্যাঘ্রদেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির স্তম্ভ ইত্যাদি রচনা করিতেও ইহাদের দেখা যায়।

প্রচণ্ড শীতকালই এই সব বাঘ শিকারের সময়। এই সময়ে বরফের জন্য ইহারা ইচ্ছামত দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তাহাদের গতিপথের চিহ্নও সহজে ধরা পড়ে। বাঘের নিজ আস্তানা হইতে বনের পথে এক রকম ফাঁদ (gun-trap) পাতিয়া ইহাদের ধরা হয়—কিন্তু এই ব্যাপারটি সহজ নয়, বিশেষ বিপজ্জনক। বাঘের চামড়া চড়া দামে বিক্রী হয় বলিয়া এই অঞ্চলের লোকেরা সমূহ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও বাঘ শিকার করিয়া থাকে।

বরফের মধ্যে বাঘকে তাড়া করিয়া অবশেষে উহাকে বল্লম দিয়া চাপিয়া ধরা হইয়াছে

মৃত বাঘের চামড়া ছাড়া, জ্যান্ত বাঘ ধরিতে পারিলেও বিদেশে চিড়িয়াখানা প্রভৃতিতে চড়া দামে বিক্রী করা

যায়। এই লোভে, চীনা, মঙ্গোল প্রভৃতিরা অনেক সময় প্রাণসংশয় করিয়াও জীবন্ত বাঘ ধরিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বরফ যখন গলিতে আরম্ভ হয় এই সময় কোনও একটি বাঘকে কোন রকমে দল-বিচ্যুত করিয়া ফেলিয়া এই গলিত বরফের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিলে জীবন্ত বাঘ শিকারের সুবিধা হয়। শিকারীদের সঙ্গে রাইফেল থাকে, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহা ব্যবহার করে না, বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য একরূপ বল্লম ব্যবহার করে। শিকারীদের পরনে বরফের উপযোগী বস্ত্রাদি এবং জুতা প্রভৃতি থাকে, বরফের মধ্যে দ্রুত চলিতে ফিরিতে তাহাদের তেমন অসুবিধা হয় না—কিন্তু বাঘের পক্ষে গলিতপ্রায় বরফের মধ্যে দ্রুত নড়াচড়া সম্ভব হয় না; ক্রমশঃ তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও বরফের মধ্যে আটকাইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত বন্দী হয়।
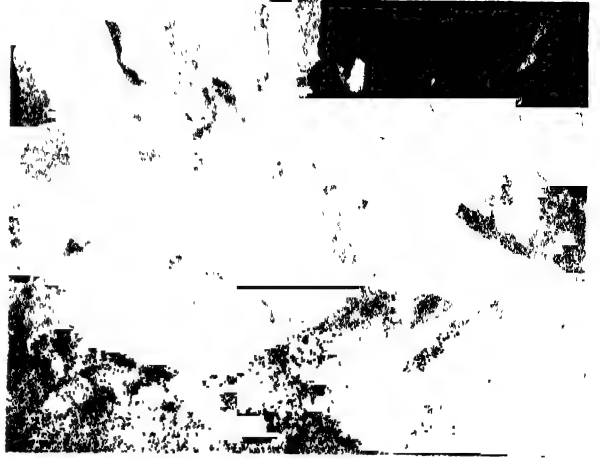
ক.

জীবন্ত বাঘকে ধরিয়া বাঁধা হইতেছে

পিরামিডের ছায়ায়

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

শ্রীগোপাল হালদার

ব্রিটেনের নূতন অধ্যায়

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি কি আর এক বার মোড় ঘুরিল? মাস-চৌদ্দ পূর্ব্বে পররাষ্ট্রসচিব এন্থনি ইডেনের বিদায়ের সঙ্গে ব্রিটেন আপন পররাষ্ট্রনীতির একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে—সে অধ্যায়ের

চেকোস্লোভাকিয়ার মোরাভিয়া অঞ্চলের মোরাভস্কা অষ্ট্রাভা নগরের বাজার

সূত্র হয়—এ্যাপিজমেণ্ট ও আরমামেণ্ট,—সন্তোষবিধান ও অস্ত্রসজ্জা; আর তাহার লক্ষ্য হয়—এক দিকে মুসোলিনী ও হিট্‌লারের তৃপ্তিসাধন করিয়া ইউরোপে কোনরূপে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, অন্য দিকে ব্রিটেনের অস্ত্রদৈন্য ঘুচাইয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রমঞ্চে তাহার স্থান ও মান সংরক্ষণ করা। সেই দিনের পর ইউরোপের শান্তি অবশ্য অক্ষুণ্ণই আছে, অক্ষুণ্ণ নাই অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা, চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা, স্পেনের গণতন্ত্র।

গত ৩১শে মার্চ চেম্বারলেন আবার তাঁহার পররাষ্ট্র নীতিতে নূতনতর অধ্যায় সংযোজন করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। মেমেল তখন হের হিট্‌লার কবলিত করিয়াছেন, পোলাণ্ডের ভাগ্যও অনিশ্চিত,—চেম্বারলেন কহিলেন :—

"কোন প্রকার মতভেদ উপস্থিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে আলোচনার দ্বারাই তাহার সমাধান করা উচিত, ইহাই হইল গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতি। কাজেই বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন, আলোচনার পদ্ধতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

"অন্যান্য কয়েকটি গবর্ণমেণ্টের সহিত গুরুতর বিষয়ে আমাদের পরামর্শ চলিতেছে। এই আলোচনা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যদি এমন কিছু ঘটে যাহার ফলে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং পোল গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জাতীয় বাহিনী লইয়া বাধা দেওয়া অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে পোলাণ্ডকে যথাসাধ্য সমর্থন করিতে বাধ্য থাকিবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পোল গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে

প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই আমি এই উক্তি করিতেছি।

"ফরাসী গবর্ণমেণ্টও যে এই ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আমাকে তাহা ঘোষণা করিবার অনুমতি দিয়াছেন।"

চেম্বারলেনের এমন আত্মপ্রসাদ, এমন আত্মবিশ্বাস, অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা, নিঃশেষ হইল কিরূপে? নিঃশেষ হইল এক পক্ষ কালের ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার বিস্ময়কর পরিণতিতে।

চেক্ ধ্বংস

১৫ই মার্চ, প্রত্যুষ হইতে প্রাগ বেতার-কেন্দ্র চেক্ নবনারী-দের জানাইল:

"চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসিগণ! প্রত্যুষ ৬টার সময় জার্মান সৈন্যগণ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অধিকার আরম্ভ করিবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা জগৎকে দেখাইব যে, আমরা কত নিয়মানুবর্ত্তী ও শান্ত।

"তোমরা সকলেই কাজ করিতে যাও। কারণ কাজের মধ্যে আমাদের শক্তি নিহিত। কোন অবস্থাতেই যেন কোন কিছু ঘটান না হয়। রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম্ম স্বাভাবিকভাবে চলিবে। জার্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রত্যেককেই শুনিতে হইবে।"

স্বাধীন চেক্-নেতৃবৃন্দের এই শেষ আদেশ অবনত শিরে প্রাগের অধিবাসীরা মানিয়া চলিল—স্বদেশের এই ভাগ্যলিপি যেন তাহাদের জানাই ছিল।

মিউনিকের পরেই মৃত্যু ঘনাইতেছিল, তবু চেকোস্লো-ভাকিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বৃদ্ধ ডাক্তার হাচা এক বার চেষ্টা দেখিলেন রাষ্ট্রের সে বিপদ প্রতিহত করা যায় কি না। স্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী হের টিসোর স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস রোধ করিবার জন্য তিনি টিসোকে পদচ্যুত করিলেন। অমনি স্লোভাক স্বাতন্ত্র্যবাদীরা একটা বিদ্রোহের চেষ্টা করিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে হিটলারের সকাশে চেক্‌দের বিরুদ্ধে আবেদন গেল। বেলিনের আদেশ—যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন স্লোভাকিয়া গঠিত হইবে। অমনি জার্মান-'রক্ষিত' নূতন স্লোভাকিয়া জন্ম লইল। হের টিসো স্লোভাক রাজধানী ব্রাটিস্লাভায় পুনরাবির্ভূত হইলেন—জার্মান ঝটিকা-বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে স্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করিল।

স্লোভাকিয়ার সঙ্গেই রুমেনিয়া বা কার্পেথো-উক্রেইনও 'স্বাধীন' হইল—সেখানে অমনি আবির্ভূত হইল হাঙ্গেরীর বাহিনী, চেক সৈনিকদের সঙ্গে ও স্লোভাক-সীমান্তে স্লোভাকদের সঙ্গে হাঙ্গেরীয় বাহিনীর যুদ্ধও বাধিল; কিন্তু অনতিবিলম্বেই চুস্ত নগর দখল করিয়া হাঙ্গেরী পোলাণ্ডের সীমান্তে গিয়া পৌঁছিল। দুই দেশের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এই সংযোগ, মিউনিখের পরেও তাহা সম্ভব

হয় নাই। ইতিমধ্যে কমিণ্টর্ণ-বিরোধ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিয়া হাঙ্গেরী তো জার্ম্মানদের দলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বাভিযানে সে বাধা হইবে না;—অতএব, রুথেনিয়া অধিকারে হিট্‌লারের ভ্রূকুটি তো দেখাই গেল না, আপত্তির কথাও শোনা গেল না। রুথেনিয়ারই কি আপত্তি ছিল? থাকিলেও ক্রমবর্দ্ধিত কোলাহলের মধ্যে তাহা তলাইয়া গিয়াছে—কাহারও শুনিবার মত সময় ছিল না।

স্লোভাক 'স্বাধীনতা'র সঙ্গে সঙ্গেই চেকোস্লোভাক যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার হাচার তলব পড়িল হিটলারের দরবারে। এমনি করিয়াই এক বৎসর পূর্ব্বে পতনোন্মুখ অষ্ট্রিয়ার নায়ক শুশনিগেরও ডাক পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ হাচার জন্যও চুক্তিপত্র তৈয়ারীই ছিল। বেশী বুঝিবার সময়ও নাই—জার্ম্মান-বাহিনী ততক্ষণে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় সশস্ত্র অগ্রসর হইতেছে, জার্ম্মান বিমান-বহর তৈয়ারী;—ডাক্তার হাচা রাত্রির মধ্যে স্বাক্ষর না করিলে প্রাগের নরনারী জার্ম্মান-বিমানের জার্ম্মান বোমার শব্দেই জাগিয়া উঠিবে—অর্থাৎ শত শত প্রাগ-বাসী আর জাগিবে না। শ্রান্ত, অবসন্ন হাচা কথাটা বুঝিলেন, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—চেক রাষ্ট্র আর নাই, রহিল "আশ্রিত চেক"। অবশ্য হিটলার বলিয়াছেন—'চেকিয়া'ও নিজ জীবনযাত্রা নিজেরাই থাকিবে—জার্ম্মান রাইখের প্রয়োজন মিটাইয়া জীবনের যে উচ্ছিষ্টটুকু রহিবে তাহা তাহারই।

প্রভাতেই নিদ্রাহীন প্রাগ সব শুনিল, তার পর দেখা দিল জার্ম্মান-বাহিনী, বেতার-কেন্দ্রে এবার ধ্বনি উঠিল—'হাইল হিটলর'। সন্ধ্যায় প্রাগের বুকে পদার্পণ করিলেন হিটলার স্বয়ং।

সেই রাত্রিতেই ফাসিস্ত চেক-নেতা জেনারেল রুড্‌লফ গাজদাকে চেকদের ফ্যুহ্রার বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৯২৯ সালে সামরিক বিচারে তিনি সৈন্যদল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অধিকারের ফলে জার্ম্মানী সমাসন্ন অর্থসঙ্কটের হাত হইতে কিছু পরিমাণে উদ্ধার পাইল। ৩২১০০ বর্গমাইল স্থান, ৭৬ লক্ষ অধিবাসী (তন্মধ্যে ৩ লক্ষ জার্ম্মান) আজ তাহার অধিকারে আসিয়াছে: আর স্কোডার (Skoda) লৌহযন্ত্রাদি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণের একটা বিরাট কারখানা তাহার হস্তগত হইয়াছে—জার্ম্মানীতে মোট যে অস্ত্রশস্ত্রাদি তৈরি হয় তাহার প্রায় শতকরা ৫০।৬০ ভাগ এই কারখানাতে তৈরি হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে ইহার নির্ম্মাণের পরিমাণ আরও বাড়ান যায়। চেক সৈন্যদের সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা তাহাদের হাতে আসিয়াছে।

চিলির ভূমিকম্পের দৃশ্য

বহু কয়লার খনি, কাপড়ের কারখানা, বনভূমি, জুতা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, চামড়া, দস্তানা তৈয়ারীর কারখানাগুলি, পিলসেন ও অন্যান্য স্থানের মদের কারখানা, চিনি, চকোলেট ও অন্যান্য মিঠাই তৈয়ারীর কারখানাও

তাহাদের হস্তগত হইল। তাহা ছাড়া শস্যসমৃদ্ধ বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের অধিকারে আসিল। আর আসিল সচ্ছল রাষ্ট্রের ও তাহা ব্যাঙ্কগুলির প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

রুমেনিয়ার সন্ধ্যা

হতবুদ্ধি মন্ত্রী চেম্বারলেন কহিলেন—কিন্তু এই রূপ তো কথা ছিল না।—কথা যে কি ছিল তাহা তখনও বলা অসম্ভব, তখনও হের হিট্‌লার পূর্ব্ব-ইউরোপকে ঢালিয়া সাজা এবারের মতও শেষ করেন নাই। প্রাগ হইতে ফিরিতে-না-ফিরিতেই রুমেনিয়ার সর্ব্বনায়ক নৃপতি কেরল তাঁহার পত্র পাইলেন—অবশ্য চরমপত্র ছাড়া এখন আর অন্য পত্র ফ্যুহ্রার লেখেন না—রুমেনিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার জার্মানদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে—আর শিল্পোন্নতির স্বপ্ন ছাড়িয়া কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবেই হইবে রুমেনিয়াকে বাঁচিতে। কিন্তু কেবল প্রথমে অঙ্গীকৃত হইলেন, পরে নীরবে রুমেনিয়ার রক্ষার পথ নিজেই খুঁজিয়া লইলেন। একটা 'অর্থনৈতিক চুক্তিতে' বুখারেষ্ট কতকটা বাঁচিয়া গেল—জার্মান-রুমেনিয়ান সহযোগিতায় রুমেনিয়ার কৃষি হইতে কেরোসিন পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ খনিজ দ্রব্য, অস্ত্র-কারখানা এবং শিল্প সংগঠিত ও পরিচালিত হইবে—জার্মান কলকব্জা, কর্ম্মকুশলতার সুযোগ এবার রুমেনিয়া মানিয়া লইল, তাই নিশ্বাস ফেলিতে পারিল।

"শান্তি-বাহিনী"

তখনও ফ্রান্স ও ব্রিটেন কল্পনা করিতেছেন, এই যুদ্ধচ্ছায়ার ও পররাজ্যাপহরণের দিনে একটি শান্তির সম্মিলিত বাহিনী বা 'পীস্ ফ্রণ্ট' গড়া প্রয়োজন। তাহাতে জার্মানীর ক্ষুধাত্রস্ত রুমেনিয়া, পোলাণ্ড, রুশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি স্বভাবতই যোগদান করিবে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতিও আকর্ষণ করা অধিকতর পরিমাণে সম্ভব হইবে। কথাটার আলোচনা চলিতে লাগিল—পোলাণ্ডের নিকট নিমন্ত্রণ গেল, রুশিয়া পর্য্যন্ত এবার আহূত হইল; কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, চেকোস্লোভাকিয়া নিজ রক্ত দিয়াই তাহা প্রমাণ করিয়াছে, পোলাণ্ডের কি তাহাতেও শিক্ষা হয় নাই? সোভিয়েট রুশিয়া চেম্বারলেনের এই নূতন প্রীতি প্রদর্শনে খুব উৎসাহিত বোধ করিল না।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি

এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সোভিয়েট নীতি কি, সম্প্রতি ষ্টালিন তাহা কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে অতি স্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করিয়া জানাইয়াছেন :

"প্রথমতঃ, ভবিষ্যতেও শান্তি-নীতি অনুসরণ করা এবং সমস্ত দেশের সহিত ব্যবসা-সম্পর্ক দৃঢ় করা।

"দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের প্ররোচকগণ যাহাতে আমাদের দেশকে যুদ্ধে ঠেলিয়া না দিতে পারে সেজন্য হুঁশিয়ার থাকা ; ঐ সব ভদ্রলোকের অভ্যাস হইতেছে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়া।

"তৃতীয়তঃ, আমাদের লাল ফৌজ ও লাল নৌ-বহরের শক্তি চরমে বৃদ্ধি করা।

"চতুর্থতঃ, শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের সহিত আমাদের সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে।"

সোভিয়েট তাই এই 'পীস্ ফ্রণ্টের' উত্তরে জানাইল—পীস্ কন্‌ফারেন্স আহ্বান কর। মিউনিখের পরেও সে এই বলিয়াছে—ব্রিটেন ও ফ্রান্স একটু চিন্তায় পড়িল। সম্মেলন তো দূরে—'আপাততঃ' একটা কিছু চাই যে।

মেমেল

ততক্ষণ হিট্‌লার আর এক কদম অগ্রসর হইয়া গেলেন। লিথুয়ানিয়ার নিকটে একখানি চরম পত্র পৌঁছিল—মেমেল প্রাগের মতই অহিংস উপায়ে করতলগত হইল।

মেমেল জার্মানদেরই শহর; জার্মান দুর্ভাগ্যের দিনে (১৯২৩) লিথুয়ানিয়া তাহার একটি সমুদ্র-দ্বার চাই বলিয়া উহা সবলে অধিকার করে—হিট্‌লারের মেমেল-অধিকারে মূলতঃ তাই দাবি আছে—কিন্তু সে-দাবি না থাকিলেই বা কি? প্রাগ, ব্রাটিস্লাভা তো তাহার স্বভূমি নয় যে জার্মান-জাতীয় সংহতি নাৎসি-নীতির মূলসূত্র তাহাতে চেক বা স্লোভাকিয়া সে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করাও চলে না—অবশ্য মিউনিখের পূর্ব্বের ও পরের বহু বহু হিটলারি প্রতিশ্রুতির কথা তোলাই মূঢ়তা। কিন্তু জার্মান-প্রসারের প্রয়োজনের নিকটে ঐসব বাধা বাধাই নয়। মেমেলও তাই হিট্‌লারি উপায়েই হস্তগত হইল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখনও পীস্-ফ্রণ্ট সম্বন্ধে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই।

ইহার পরেই পোলাণ্ডের পালা—ডানৎসিতোর গৃহাঙ্গনে এবার নিশ্চয়ই ফ্যুহ্রার আবির্ভূত হইবেন, তাহাও মেমেলের মতই জার্মান-ভূমি—পোলাণ্ডের সীমান্তে এখানে সেখানে কলহের চিহ্নও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ব্রিটেনের অভ্যন্তরেও পররাষ্ট্রনীতির ক্রমপরাজয়ে ঘনায়মান অসন্তোষ আর চেম্বারলেনকে সহিয়া উঠিতে পারিবে না—এবার ইতস্তত করিবারও আর সময় নাই। তাই একটু বিস্ময় উদ্রেক করিয়াই চেম্বারলেন জানাইলেন, পোলাণ্ডের পিছনে আমরা দাঁড়াইব, ফাসিস্ত-পোষণ নীতি এবার পরিবর্ত্তিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান গেল পোলিশ-সচিব কর্ণেল বেকের নিকট।

নূতন নীতির অর্থ

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির এই পরিবর্ত্তনের পিছনে যে ঘটনাগত পরিপ্রেক্ষিত রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু ঘটনার গতি পূর্ব্বাপরই যে এদিকে ছিল তাহাও আমরা জানি। চেম্বারলেন এক বৎসর পূর্ব্বে যখন ফাসিস্ত-পোষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি তাহার কি ফল হইবে তাহা উপলব্ধি করেন নাই? তাহা হইলে সে নীতি গ্রহণের কি কারণ ছিল? কারণগুলি এই—প্রথমত, নববলদৃপ্ত এই সব সামুদ্রিক শক্তির তুলনায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স অস্ত্রবলে দুর্ব্বল—তাই শক্তিসঞ্চয়ের মত তাহার অবকাশ চাই (সে-অবকাশে যে ফাসিস্ত শক্তি তাহাদের ক্ষুধা মিটাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই); দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বগ্রাসী শক্তিরা যতক্ষণ অপর রাজ্য অপহরণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করে, ততক্ষণ ব্রিটেনের আপত্তি নাই; তৃতীয়ত, কোনরূপ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে দেশে শ্রমিক-বিপ্লব ও ধনিকতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের সম্ভাবনা; চতুর্থত, একথা চেম্বারলেন-পন্থীরা বেশ বুঝিতেছিলেন যে, ফাসিস্ত শক্তিরা মূলত তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজরক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প, ধনিক-স্বার্থের প্রধান পরিত্রাতা, জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ গণ-চেতনাকে দাবাইয়া না রাখিয়া আজ ধনিকতান্ত্রিক শ্রেণীবিন্যাস রক্ষা করিবার উপায়

নাই, আর তাহা রক্ষা করিতে হইলে চাই প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী কোন রূপ ফাসিজম, চাই, সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা মিলন। ইহাই ছিল চেম্বারলেনীয় ১৯৩৮এর নীতির পশ্চাতের মনোভাব—গণ-জাগরণ ও তাহারই প্রতীক সোভিয়েট শক্তির প্রতি বিরূপতা, ইউরোপে ফরাসী-ইতালী-জার্মান-ব্রিটেনের একটা চতুঃশক্তির চুক্তি। মিউনিখের পরে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য বুঝি সিদ্ধ হইতে চলিল। কিন্তু ব্রিটেন নিরাশ হইল—দিনে দিনে কেবলই সে নিরাশ হইতে লাগিল—চতুঃশক্তির চুক্তিতে জুটে বা ফ্যুহ্রার কান দিলেন না, স্পেনে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র-পথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে তেমনি বিপন্ন রহিয়া গেল, আর নিরাপদ করিবার আশাও রহিল না, বরং ইতালী ফ্রান্সের অধিকার হইতে টুনিসিয়া ছিনাইয়া লইয়া, সুয়েজে ভাগ বসাইয়া, ভূমধ্যসাগরকে ইতালীয় হ্রদেই পরিণত করিতে চায়,—এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এতই দূরে সরিয়া যাইতেছে যে সঙ্কটকালে তাহার কোন সহায়তাই সুলভ হইবে না, আর সর্ব্বোপরি সবল কণ্ঠে জার্মানী জানাইল আমাদের অপহৃত উপনিবেশগুলি ব্রিটেনের প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে। ব্রিটিশ রাজ্য শাসকদের শ্রেণীস্বার্থ যেমন ফাসিজমের প্রসার কামনা করে, তেমনি তাহা সাম্রাজ্য ও উপনিবেশাদি রক্ষণ-বিষয়েও অমনোযোগী হইতে পারে না। সাম্রাজ্যের অতিস্ফীত মুনাফাই তাহাদের সৌভাগ্য ও সভ্যতার প্রাণরস জোগায়। অতএব সেই মূল স্বার্থেই ফাসিস্ত-প্রসার গিয়া আঘাত করিল—'অবজাভারে' গার্ভিন ও 'টাইম্‌সে' ডসনও তাই সুর বদলাইতে বাধ্য হইলেন। তবু কিছুদিন পর্য্যন্ত দুই বিরোধী চিন্তায় সঙ্ঘর্ষ চলিল—এখনও তাহা শেষ হয় নাই,—কিন্তু এবার চেম্বারলেনও মানিলেন না, ফাসিস্ত-পোষণ আর নয়।

ফাসিস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা যে চিরদিন এক সঙ্গে চলিতে পারিবেন না, তাহা বুঝা সহজ। কারণ, ধনিকতান্ত্রিকতার মূলেই এই স্বার্থগত দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, শুধু যত দিন পর্য্যন্ত পররাজ্য বলি দিয়া আত্মরক্ষা করা যায় তত দিন এই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদের মিল থাকিবে। কিন্তু সেই দিনও শেষ হইয়া আসিতেছে; তাই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীতে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম' আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—ষ্টালিনের ভাষায় ইহাই বলা চলে—আর ইহাই সত্য কথাও।

[এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে ইতালী আল্‌বেনিয়া আক্রমণ ও অধিকার করিয়া আদ্রিয়াতিক উপকূলে নিজ আসন পাকা এবং যুগোস্লাভিয়া ও বল্‌কান অঞ্চলে অধিকার-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়াছে।—লেখক]

—

রায় সাহেব হরিচরণ গাঙ্গুলী

রায় সাহেব হরিচরণ গাঙ্গুলী সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কানপুরের বাঙালী-সমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বাঙালীদের অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় বার এসোসিয়েশ্যন, দেওয়ানী আদালতসমূহ ও আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় সেই দিনের জন্য বন্ধ ছিল।

রায় সাহেব হরিচরণ গাঙ্গুলী

হরিচরণবাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, ও ওকালতি পাস করিবার পর কানপুরে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন ও তাহাতে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বহুদিন কানপুরে প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন

—

রাঁচির হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবের রজত-জয়ন্তী

সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে যে-সকল বাঙালী কর্ম্মোপলক্ষে রাঁচিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টায় ও উৎসাহে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাঁচির হিন্দু পল্লীতে 'হিন্দু

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সিংহবাহিনী
শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

...স্ ইউনিয়ন ক্লাব' স্থাপিত হয়। এই ক্লাবের অঙ্গীভূত পুস্তকাগার, পাঠাগার, সভা-সমিতি, নাট্যকলা, সাহিত্য-সম্মেলন, গৃহাভ্যন্তরস্থ খেলাধূলা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ আছে। এই ক্লাবটি বাঙালীদের প্রচেষ্টায় এবং বাঙালীদের দ্বারাই স্থাপিত হইলেও সকল সম্প্রদায়ের ভদ্রসন্তানেরই ইহাতে প্রবেশাধিকার আছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এই ক্লাব পঞ্চবিংশতিবর্ষ কার্য্যকাল অতিক্রম করিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে গত ৮, ৯ ও ১০ই এপ্রিল ইহার রজত-জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে সভা-সমিতি, বিবিধ আলোচনা, মহিলা-সম্মেলন, শিশু-সম্মেলন, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া-কৌতুকাদি বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রবাসী বাঙালীদের এই উৎসবে বাংলা দেশ হইতে যে প্রীতি-অভিনন্দন প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল

প্রবাস-বাসের বেদনার স্নেহধারে
মানস-ভূমিতে যে বীজ মেলিল দল,
পুষ্প-তরু সে, ফুলদল-সম্ভারে
আকাশ-বাতাস করিতেছে চঞ্চল।
দেখিতেছি আজ শতাব্দী-পাদশেষে,
সেই তরুতলে মিলেছে প্রবাসী সবে,
স্বদেশে থাকিয়া তাহাদের উদ্দেশে
ছুটে যায় মন, মাতিতে মহোৎসবে।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর ভালবাসা
মরুতে রচনা করেছে বৃন্দাবন,
গিরি-মন্দিরে ভারতী বাঁধুন বাসা,
সার্থক হোক এ মধু-সম্মেলন।

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ

শিল্পী শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্ণৌ সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পৌরাণিক চিত্র অঙ্কন করিয়া শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন ("এক জন উদীয়মান চিত্রশিল্পী",—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪২)। প্রবাসীর পাঠকগণ তাঁহার চিত্রের সহিত পরিচিত। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁহার চিত্র পুরস্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি শিল্প আলোচনার জন্য ইউরোপে গিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত তিনখানি পৌরাণিক চিত্রের একবর্ণ প্রতিলিপি বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ

রাজশেখর বিরচিত কর্পূরমঞ্জরী সটীক সম্পাদনার দ্বারা শ্রীমনোমোহন ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পদবীসম্মান-বিতরণ সভায় ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ১৯০১ সালে প্রকাশিত, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ষ্টেন কোনোর সম্পাদিত কর্পূরমঞ্জরীর সংস্করণের বিশেষ বিচার ও আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা দ্বারা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেহ এই উপাধি লাভ করেন নাই।

আসানসোলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সপ্তাহের ব্যবস্থাপকবর্গ ও প্রবাসী-সম্পাদক

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
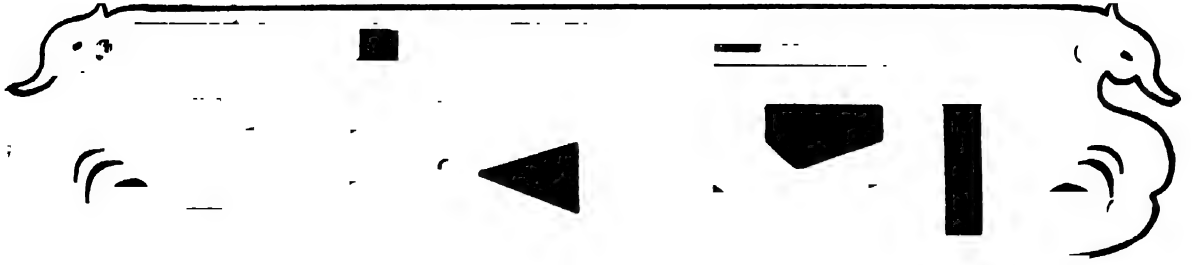
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

২য় সংখ্যা

অদেয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা,
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,
যৌবন-ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান।
সে লাঞ্ছনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।
ধেয়ান-মগ্ন ক্ষণে
নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায়
অবসন্ন পল্লী চেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে বলা মৃদু ভাষার ধারা,-
প্রথম রাতের তারা

অবাক চেয়ে থাকে,
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কা'কে ;
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে,
কে দেয় দুয়ার রুধে',
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে।
সময় হোলে রাজার মতো এসে
জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবি।
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি
ধুলার 'পরে মাথা আমার দিতেম লুটায়ে
গর্ব আমার অর্ঘ্য হোত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে,
তোমার পানে উদ্দেশেতে ঊর্ধ্বে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান।
তোমার অভিমান
আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ।

১৮।৬।৩৮
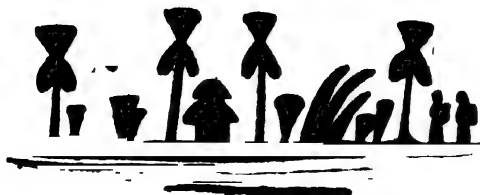
নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ বর্ষারম্ভের দিনে এখানে তোমরা যারা এসেছ তারা এসেছ মনের মধ্যে পথ-চলার পাথেয় সংগ্রহ ক'রে, যেমন ক'রে যাত্রীরা আসে খেয়াঘাটে চলবার সঞ্চয় সংগ্রহ ক'রে—যার ফসল কাটা আছে সে আসে ফসল নিয়ে, যার বস্ত্র বোনা আছে সে তাই নিয়ে আসে। নূতন ক'রে আজ তোমরা যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছ। তোমাদের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস কারু জানা নেই, সে জানেন শুধু অন্তর্যামী—কত বিচিত্র ভালোবাসা আনন্দ-বেদনার উপকরণে তোমাদের জীবন গঠিত—সে-সমস্তকেই বহন ক'রে আজ তোমরা সামনের দিকে নূতন যাত্রার পথে প্রবৃত্ত হবে—নিশ্চল উদাসীন ভাবে ঘরের কোণে পড়ে থাকবার দুঃখ তোমাদের জন্য নয়—সুদীর্ঘ জীবন তোমাদের সামনে—সকল সুখদুঃখের ইতিহাস নিয়ে তোমাদের জীবন অগ্রসর হোক তোমাদের জন্য এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার কথা স্বতন্ত্র—আমি তো এসে পৌঁছেছি পথের শেষে, আমার সম্মুখে সংসারযাত্রার পথ আজ আর বিস্তৃত বিচিত্র নয়। তাই আমি এখন পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, জীবনের আশ্চর্য রহস্য, জীবনের অর্থ কি তাই বুঝবার চেষ্টা করি; আজ আমার স্থির হয়ে বসবার সময় এসেছে। এই প্রশ্নটাই আমার মনে কিছু দিন থেকে জাগছে, কি পেয়েছ জীবনে, সব চেয়ে কি বড় কথা তোমার অভিজ্ঞতায়? সব চেয়ে যা আমার চোখে পড়ে, সে হচ্ছে পরম বিস্ময়—আরম্ভ থেকে পদে পদে বিস্ময়ের অন্ত নেই। অন্য জীবজন্তুরা শুধু তাদের খাদ্যাহরণে তাদের বাঁধা জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট, তাদের তো বিস্ময় নেই। আমাদের ভালো লাগে, সে ভালো লাগবার উপকরণের কোনো সাংসারিক মূল্য নেই, তা প্রয়োজনের অতীত। মনে পড়ে ছোটবেলার কথা, আমাদের বাগানে নারকেল গাছে শিশিরকণা আলোতে ঝলমল করত, আমি তাই দেখতে ছুটতুম—মনে হোত, একটি দিনও যেন নষ্ট না হয়। এই পরম বিস্ময়ের অর্থ গুহাহিতং, এর গভীরে আরো কিছু আছে, সেটা আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখি নে, কিন্তু অন্তঃকরণের মধ্যে বুঝতে পারি এর অন্তরে আছে আনন্দের উৎস, সুন্দরের বেদী। তন্ময় হয়ে বিশ্বকে তাকিয়ে দেখেছি—সে-বিস্ময় আজো যায় নি। এই বিস্ময়ের আবেগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দিক থেকে দেখলে এর কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ করতে পারলে এর রহস্য হয়তো স্পর্শ করতে পারব, একরকম করে হাৎড়িয়ে পাব, জ্যোৎস্নারাত্রের যে বিস্ময়, প্রিয়সম্মিলনের যে আনন্দ কোথায় তার উৎস।

আরেকটা কথা আমার মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে—যখন কিছু রচনা করেছি, গান গেয়েছি, তার মধ্যেও একটা বিরাট বিস্ময় আছে। আত্মপ্রকাশের আনন্দ-তরঙ্গ আমার মনকে একান্ত ভাবে দোলা দিয়েছে। রূপকারদের রচনার মধ্যে যখন ঠিক সুরটি লাগে তখন তা বিশ্বসৃষ্টির ছন্দরহস্যের আনন্দের সঙ্গে এক পর্যায়ে পড়ে।

তার পর জীবনে আর এক গভীর বিস্ময়—গভীর ভাবে ভালোবেসেছি জীবনে, কত নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেছি, তার মধ্যে অনির্বচনীয়তার আনন্দ—সেই আনন্দ আমাদের নিয়ে যায় অসীমের দিকে। প্রিয়জনকে ভালো-বাসার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের ছোট সীমানার মধ্যে স্পর্শ পাই সেই বিশ্বের মূলতত্ত্বের যার সম্বন্ধে বলেছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

এই প্রসঙ্গেই মানুষের জীবনের আরেকটি বিস্ময়ের কথা মনে পড়ে—সেটি কল্যাণের সূত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। মানুষের জন্য মানুষ কেন ত্যাগস্বীকার

করেছে? মানুষ যখন স্বার্থের জন্য, উপার্জ্জনের জন্য ক্ষমতালাভের জন্য শ্রমস্বীকার করে তার অর্থ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু কেন মানুষ প্রাণ দিয়েছে যুগে যুগে এমন কারো জন্য যে তার আপন নয়? এই ত্যাগের অর্থ সকলে খুঁজে পায় না। মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহামানবদেবতা, তিনি তো সুদূর নক্ষত্রলোকের দেবতা নন যিনি আমাদের জানার অতীত—সেই মানব-দেবতার দাবী মানুষের 'পরে, তিনি মানুষকে বলেন যে যার যত সাধ্য আছে আমাকে দান করো, তিনি প্রার্থী মানুষের কাছে। সেই দেওয়ার মধ্যেই মানুষের মহত্ত্ব, মানুষের মহত্ত্ব তার ঘরকন্নার মধ্যে তার উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে নয়—মহৎকে মহৎ অর্ঘ্য দিতে হবে, সমগ্র মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁকে বন্দনা করতে হবে—এ ছাড়া আর কোনো দেবতা যদি থাকেন তিনি আমাদের জানার অতীত, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দূরবর্তী। এই মানব-দেবতাকে যদি কিছু অর্ঘ্য এই জীবনে জুগিয়ে থাকতে পারি তবে জীবন সার্থক হয়েছে ব'লে মানব।

একটা কথা আজকের দিনে অনেকের মনকে আলোড়ন করছে—এই যে আজ মানুষের প্রচণ্ড দুঃখ, এই অমানুষিকতার মধ্যে মঙ্গলময়ের প্রকাশ কোথায়? মনে হ'তে পারে যেন শয়তানের লীলা চলেছে, দেবতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এ প্রশ্নের উত্তর আমি যা ভেবেছি তা বলি।

মানুষ স্বাধীনতার মধ্যে ছাড়া পেয়েছে—তাকে তো প্রকৃতি কান মলে চালাতে পারে না, যেমন চালায় সে পশুকে। পশুর সব অভাব প্রকৃতিই পূর্ণ ক'রে রেখেছে, যেমন শীতের থেকে সে রক্ষা পায় নিজের রোমের সাহায্যে; বিধাতা মানুষকে পাঠিয়েছেন বিবস্ত্র ক'রে, কিন্তু তাকে দিয়েছেন শক্তি যা দিয়ে সে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে—সে স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করবে, ভিক্ষা করবে না। এই স্বাধীনতা দ্বারা আমরা তাঁর শরিক হবার ক্ষমতা পেয়েছি, তাঁর বেদীতলে বসবার অধিকার পেয়েছি। মানুষের এই স্বাধীন শক্তির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা নিষ্ঠুরতা অন্যায় প্রবেশ করলে তার শোধন মানুষকেই করতে হবে আপন শ্রেয়োবুদ্ধি দিয়ে। মানুষ তো শিশু নয়, তাকে বলতে হবে, এই নিষ্ঠুরতাকে বাধা দেব আমি আমার স্বাধীন অধিকারে—মনুষ্যত্বের বড় দুঃখের এই অধিকার। মানুষকে বলতে হবে, আমরা সর্বনাশ হোতে দেব না, আমরা এর প্রতিকার করব। মানুষকে নিজের ইতিহাস নিজে রচনা করতে হবে, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি যদি আমাদের সকল কল্যাণ সাধন ক'রে দেবেন তবে তিনি আমাদের শ্রেয়ঃশক্তি দিয়েছেন কেন। মানুষের এই অধিকারের জন্য যুগে যুগে সত্যসাধকেরা প্রাণপাত করেছেন, যাঁরা জেনেছিলেন আমি ও তিনি এক।

এই কথার মূলে আছে এই তত্ত্ব যে মানুষ একলা সম্পূর্ণ নয়, সকল মনের সঙ্গে প্রীতির যোগেই তার সার্থকতা—তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, খ্রীষ্টও তাই বলেছেন। এই মানবসত্যকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের উপাসনা সার্থক হয়। এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে ব'লেই মানুষ অন্যের জন্য প্রাণবিসর্জন করতে পেরেছে, তার মনে প্রশ্ন জাগে নি যে এই ত্যাগের ফল সে নিজে লাভ করতে পারবে না; সে জেনেছে যে তার ত্যাগের অর্ঘ্য মহামানবের ভাণ্ডারে সমর্পিত হ'ল; যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা জানেন যে এই ভাণ্ডার অক্ষয় অসীম। আশ্চর্য এই উপলব্ধির রহস্য।

আমার নিজের জীবনে অহমিকার ক্ষুদ্র সীমা উত্তীর্ণ হয়ে ছোট কোনো দ্বার দিয়েও ত্যাগের ক্ষেত্রে যদি প্রবেশ করতে পেরে থাকি, আমার কর্মে যদি এই সত্য কখনো কিছুমাত্র প্রকাশ পেয়ে থাকে জীবনের সার্থকতা একলা নিজের মধ্যে নয় সকলের মধ্যে, তবেই এই দীর্ঘপথের শেষে বলতে পারব আমার জীবন হয়েছে সম্পূর্ণ।

শান্তিনিকেতন

১ বৈশাখ ১৩৪৬

[শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-উৎসবে আচার্য্যের অভিভাষণ]

পত্রালাপ*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই বলেছি গদ্য প্রবন্ধের ভার বইতে আমার মন চায় না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ ক'রে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পথে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের। তখন বৈঠকে-বসা মেজাজ তাকিয়া হেলান দিয়ে গোঁফে তা দেওয়া শুরু করে নি। দেহের কথা বলছি নে, মনের দিকে দেয় নি তখনো গোঁফের রেখা। সেদিন চিঠিগুলো উঠত অজস্র ফেনিয়ে বাইরের দিকের চলাচলের মন্থনবেগে। ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ। বুদ্ধির দোষে ওগুলোকে আস্ত রাখি নি। তখন জানতুম না চিঠি চাষের ফসলের জন্যে নয়, ও আপনি গজিয়ে ওঠে রাস্তার ধারে, চিহ্নিত করে দেয় পথচলার ইতিহাসকে, কেবল শস্যটুকু ঝাড়াই-বাছাই ক'রে নিয়ে ডালপালা সব বাদ দিলে ওর মানে যায় চলে।

তার পরে এল প্রবন্ধের মাল বোঝাই করার পালা। প্রধানত এই পর্ব দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে। মন ভারাক্রান্ত ছিল কর্তব্যবুদ্ধিতে। সেই ভার চেপেছিল গদ্যের স্কন্ধে। ফিরে যখন তাকাই তখন কলমটাকে মনে হয় আদিম যুগের অতিকায় জন্তুর দলে। কিছু কাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না, কিন্তু যে আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তির মুখে তার ল্যাজ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তার জোর কমেছে। বাহুল্যে তার আর রুচি নেই।

এখন লিখি লিখতে যদি মন যায়। লেখার পায়ে-চলার পথে চলি আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে। তার দায়িত্ব বহু লোকের কাছে নয়। যাকে ভালো ক'রে চিনি তার সামনে ব'সে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে। যুগ্ম তারা চলে পরস্পরের কাছ থেকে অলক্ষ্য টান ধার ক'রে নিয়ে, চিঠির চাল সেই অলক্ষ্য লেনাদেনার চাল।

আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ্য হোলো সুধীন্দ্র দত্তর স্বগত বইখানি পড়ে। পড়তে কিছু কাল ইতস্তত করেছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবে না। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যুক্তির দিকে চলে। সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে। তাহলেও সংস্কারটার একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারি নে। হয়তো তাঁর গদ্য চলতে চলতে আপন পথ পাকা ক'রে নিয়েছে, গোড়ায় সে চলত বন্ধুর পথে। তা হোক কিন্তু তাঁর গদ্য কেন যে জলের মতো সহজ কখনোই হোতে পারে না তার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আগেকার চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছিলুম বাংলায় "চিন্তা" শব্দটাকে ইংরেজি "থট্" শব্দের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারব না। সুধীন্দ্র ওকে "মনন" বলেছেন যে অর্থে ওতে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া বোঝায়। কিন্তু যে বিষয়টাকে নিয়ে মনন করা যায় এবং যা মননের পরিণতি তাকে বাংলায় "মত" বললেই ভালো হোত, সে সুযোগ আর নেই। তাই আমি মনে করি "মন্তব্য" শব্দটাতে কাজ চলতে পারবে।

সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে তাকে বলা যেতে পারে

---

* স্বগত—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই। তাই সুধীন্দ্র অনায়াসে বলতে পেরেছেন এ বইয়ে তাঁর অনেক পুরোনো মতের সঙ্গে তাঁর এখনকার মত মেলে না অথচ তাই ব'লে তাঁর কাছে সেগুলো পরিত্যাজ্য ব'লে মনে হয় নি, কেননা তিনি মনন-বিলাসী। গীতার সঙ্গে এই ভাবটার সুর মেলে, যে গীতা বলেন ফলের দিকে দৃষ্টি রেখো না। যে সাধনার মূল্য সাধনাতেই প্রকাশ পায় বিশেষভাবে সিদ্ধিতে নয় তার এই দশা। কিন্তু তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি "আর্ট ফর্ আর্ট্‌স্ সেক" মতটাকে বুঝি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই নি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর দান। আর্টিস্ট মাত্রেরই চরম শক্তি, প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট। তার একটা পরিচয় পাই ভাষার শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে। যারা যথার্থ সাহিত্যিক, শব্দে তাদের নেশা। এই নেশার মৌতাৎ দুই জাতের। রসসাহিত্যে ধ্বনি আর রূপকের ব্যঞ্জনা প্রধান উপকরণ, মনন-সাহিত্যে যাথার্থ্যের সূক্ষ্মবোধ। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দে তার অর্থটা আভিধানিক চাপে কঠিন দানা বেঁধে গেছে, সে অর্থ ব্যবহারের দ্বারা স্বীকৃত, চেহারার দ্বারা পরিচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তর নতুন শব্দ চালিয়েছেন যাদের অর্থগুলি সজীব। তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিস্ট। তাঁর মননের আনন্দ বাছাই-করা শব্দের খেয়ায় চেপে বসেছে। শব্দগুলি অপরিচিত সুতরাং সাধারণ পাঠককে বুঝতে বাধা দেবে এ দুশ্চিন্তা তাঁকে ঠেকায় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি গৌণত পাঠকদের দিকে। কেননা পাঠক-সম্প্রদায়টা স্থাণু নয় সে সচল—সে কোনো এক বিশেষ যুগের শিকলে বাঁধা জীব নয়—না আধুনিকের না সনাতনের। যে লোক বাঁধা যুগের বেতনে লোভ রাখে তার লেখা ঋতু-পরিবর্তনের বিদায়-হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে। কিন্তু জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কোন্ রচনা যে চলতি যুগের রথে চলেছে চিরন্তনের গম্যস্থানে তার নিশ্চিত পরিচয় পাব কার কাছ থেকে। "সময়হারা" ব'লে একটা কবিতা লিখেছিলুম তার মূলকথাটা এই, বর্তমানে আমরা সময় হারাতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের সুস্বপ্নের পথ হারাই নে, হতভাগার শেষ সম্বল ঐটে, চেম্বরলেনের শান্তির আশার মতো।

ও কথা যাক। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভরদণ্ড তার সাহস। তার লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকদের কাছে পাওনা হিসাব ক'রে দমে যান নি। তাঁর লেখা পড়ে অল্প লোক। রসসাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না। এই বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার বাংলা দেশের মনকে অলস ক'রে দিয়েছে, এখানে অযোগ্যের অহংকারে কোনো বাধা নেই। মনন-সাহিত্যে অনুশীলনের অপেক্ষা আছে, সেটা কুঁড়ে মনের কর্ম নয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে ঐ বিভাগে বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

সুধীন্দ্রনাথের এই বইখানিতে জমেছে তাঁর মনন-সাধনার ফসল। তাঁর এই সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিতে হবে। চিঠির কোণটুকুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দায়িত্বের আয়তন খাটো করা সহজ। বিচারকের সঙ্গে লেখকের স্বাজাত্য থাকা চাই, সুধীন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে অনেকখানি। যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, কোনো এক কালে হয়তো আমি সেখানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম, কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আমার চলার পথে ঘাস উঠে গেছে। অনেক দিন থেকে আমাকে অন্য রাস্তায় টেনেছে সে তুমি জানো। কর্তব্যসাধনার কাছে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে তার মধ্যে বইপড়াটাই সর্বপ্রধান। সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা

সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন—মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চলায় তাঁর শখ,—সে শখ নিছক আরামে মেটাবার নয় ব'লেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প। আমার জানাশোনার মধ্যে আর এক জন লোক জানি যিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি মননবিলাসী, তিনিও গ্রন্থবিহারী। তিনি অনেক ভাবেন, অনেক পড়েন, অল্প বয়সেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি নি। তাঁর লেখা যখন পড়ি মনকে বলি,—মন তুমি কৃষিকাজ বোঝো না—চাষ-আবাদ করা হয় নি, সোনা যদি পেয়ে থাকি সে পড়ে-পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রমথর রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাঁর লেখায় কেবল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় প্রাণের সরস প্রবাহ প্রবল।

সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে। যদি উনি শঙ্করাচার্য বা বার্গসঁ-র মতের দুরূহ ভিত্তিতে পাথরের স্থায়ী দেয়াল গেঁথে বসতেন, এমন কি ফ্রয়েডের মনোবিকলন-শাস্ত্রের সব ক'টা চারিত্রগ্রন্থির কুটিল তত্ত্ব পারিভাষিক সমেত মুখস্থ ক'রে বৈজ্ঞানিক লাইসেন্স পাওয়া কুৎসাপ্রয়োগের যথেষ্ট দাবি করতে পারতেন, তাহলে মাথা হেঁট করে ওঁর পাশ কাটিয়ে চলতুম। যাঁদের বচনে ও ব্যবহারে আছে সব-জান্তার সুগোচর বা অগোচর ঔদ্ধত্য তাঁদের পাণ্ডিত্যকে বরাবর ভয় ক'রে এসেছি, অধিকাংশ সময় অন্ধ শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু আপন লোক ব'লে মেনেছি মাননিক পথের পথিকদের, দুর্গম যাত্রী হোলেও। ভ্রমণের শখ ভ্রমণকারীর সংসর্গে অনেকখানি মেটে।

স্বগত বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথা নিয়মে করতে পারি নে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে-সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়ি নি। সেটা আমার শরীরের ক্লান্তিতে, কাজের ব্যস্ততায়। প্রথম বয়সে যখন ইংরেজি সাহিত্যের রস-সত্রে প্রবেশ পেলুম তখন মেতে ছিলুম দিনরাত্রি। সেই ব্যগ্রতার চাঞ্চল্যে মনের সৃষ্টি চলেছিল এগিয়ে। বিষয়বস্তু যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে বেশি ক'রে নাড়া দিয়েছিল চিত্তের মন্থনবেগ। ক্রমে সেটা নিজের ভিতরকার অজানা সম্পদকে তীরে তুলে এনেছিল। বাইরের পাওয়ার আবেগেই নিজেকে পাওয়ার পালা শুরু হয়। বাইরে থেকে সঞ্চয়টা এর প্রধান জিনিষ নয়, তার চেয়ে ভিতর থেকে নিজের পরিচয়টি আরো বড়ো। সেই আত্মপরিচয়ের এলেকায় এসেছি। এখন সেই আপনাকে পাওয়ার ভূমিকাতেই সকল পাওনাকে আত্মসাৎ করবার সময়। যদি এখনকার কালে জন্মাতুম মনের কী চেহারা তৈরী হয়ে উঠত কেমন ক'রে বলব। সভ্যতার নানা অধ্যায়েই বিচিত্রের মিশ্রণ সৃষ্টির কাজ করতে থাকে।

যে সভ্যতায় মিশ্রণের বাধা ঘটে সেখানে আদিম মালমসলা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির দৈন্য প্রকাশ করে। তাই যে-সব তরুণ দলের চিত্ত এখনকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নবজীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবালদ্বীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকো বেয়ে সেখানে কিছুদিনের মতো সায়ের করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিন্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিন্ধবাদের দলের একজন। এই "স্বগত" বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য ক'রে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলেরই কামিংস এজরা পৌণ্ড ঈডিথ সিটওয়েল এলিয়ট অডেন স্পেণ্ডর সম্প্রদায়ের সভাস্থলে অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই তাঁর এই অংশের সাহিত্যালোচনায় সমজদারদের মধ্যে মাথা-নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো শুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্ভোগ করতে পারি এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে-সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন বিষ্ণু দের চোরাবালি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য। ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর ক'রে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম।

একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম

পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়। তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই। তা নিয়ে লজ্জা করব না কিন্তু এখনকার দিনের সম্বন্ধে লজ্জা করবার কারণ আছে দেখতে পাচ্চি। অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না। বিষ্ণু দের কবিতার সৌন্দয সুধীন্দ্র যথাযোগ্য ভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু স্বভাবগত বিশেষত্ববশত বিষ্ণু দের লেখায় একটা কারণে আমাকে খটকা লাগে। আমরা য়ুরোপীয় সাহিত্য এক সময়ে গভীর আনন্দ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই পড়েছিলুম। মনটা তার সঙ্গে ভাবের কারবার করেছিল কিন্তু বিদেশী নামগুলো স্বভাবতই রচনার মধ্যে এসে পড়ল না। ভাষার মধ্যে তাদের প্রসন্নতা সহজ হয় নি, জীবনের ব্যবসায়ে তাদের চলন নেই। পড়া বই থেকে গায়ে পড়ে লেখার মধ্যে নামগুলো টেনে আনতে পারি কিন্তু সেটা হয় অন্তঃপুরে মেমসাহেবের আগমনের মতো, অন্য মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রেসিডা পাশ্চাত্য পুরাণের তর্জমা সাহায্যে আমাদের কাছে বাহির মহলে পরিচিত, তার সঙ্গে মনের এত বেশি মাখামাখি হয় নি যে ভাবের অন্তরঙ্গ মহলে যখন-তখন সে আপনি এসে চেনা জায়গা নিতে পারে। এলিয়ট-এর কবিতায় ভাষার আত্মীয়মহলে অসংকোচে বিদেশী নামের বা পুরাণের ঢুকে-পড়া দেখেছি, তাঁর সেই বিশেষত্ব এত স্বকীয় যে অন্য কারো পক্ষে এটা অনুকরণের সুস্পষ্ট মুদ্রাদোষ হয়ে পড়ে। এ-রকম স্খলন যদি দৈবাৎ হয় তবে সেটাতে লজ্জিত হওয়া প্রত্যাশা করি কিন্তু বারবার যদি হয় তবে সেটাকে কী বলব। বিশেষত তুলনা ক'রে দেখলে দেখা যাবে স্বদেশীয় পুরাণ থেকে সুপরিচিত নাম কবির কাব্যে পথ পায় না। সহজ ব'লেই কি? যাই হোক, বিষ্ণু দের কবিতা থেকে সুধীন্দ্র যে টুকরোগুলি তুলে দিয়েছেন, আমার উপভোগের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগল।

গদ্যকাব্যে আমার ছন্দোমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাছে ভৎর্সনা পেয়েছি। আমার কৈফিয়ৎ এই, গদ্যকাব্যে যে বিশেষ জাতীয় রসরচনার অবকাশ পাওয়া যায় তার থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

আমাদের দেশে যোগী সন্ন্যাসী যাঁরা, বিশেষ সাজ ও বিশেষ আচরণের দ্বারা সাধারণের থেকে তাঁরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তাই ভেকধারণের সাহায্যে তাঁদের চেনা সহজ। কিন্তু যে যোগী সংসারের মধ্যেই আছেন তিনি যথার্থ মুক্ত, সাজের দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমের আচারের দ্বারা বদ্ধ নন। প্রথাগত দৃষ্টিতেই যারা দেখতে অভ্যস্ত তিনি তাদের চোখে পড়েন না। অথচ তাঁর মধ্যে সাধনার যে সত্য আছে সেটা প্রচলিত পরিচয় ও পদ্ধতির বাইরে ব'লেই তার মধ্যে থেকে একটা গভীর নিজকীয়তা জেগে ওঠে, সেটা মূল্যবান,—সংসারের সঙ্গে সংসারাতীতের সামঞ্জস্য ঘটিয়েই সেই মূল্য প্রকাশ পায়। গদ্যকাব্য ভেকধারী নয়, তাই তার মধ্যে সাহিত্যের হরিজন ও জাতকুলীন সহজে মিলে গিয়ে কবিত্বের সম্মান পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমার মতের সমর্থন এই বাহ্য, কোনো বিশেষ পরিবেষ থেকে আন্তরিক স্বভাবের প্রেরণায় কাব্য দেখা দিল কি না-দিল সেটা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। সলোমনের গীতিকে রসিকেরা জাতে ঠেলেন না সে প্রচলিত ছন্দের সাজে সভাস্থলে আসে নি ব'লেই। মনে পড়ছে যেন কোনো চীন জ্ঞানী বলেছেন যে, যে-রাজ্যে রাজত্বকে অতিশয় দেখা যায় না শ্রেষ্ঠতা সেই রাজ্যেরই। ছন্দ সম্বন্ধে অত বড়ো কথা বলতে মুখে বাধে, কেননা তার সঙ্গে আমার মনের মেলামেশা বাল্যকাল থেকেই কিন্তু একথা জোর ক'রে বলতে পারি যে, যে-ছন্দ বাইরে থেকে অতিপ্রত্যক্ষ নয়, আসন যার কাব্যের গূঢ় অন্তরে, শাসন তার নেই ব'লেই তার গৌরব। যে হারুন-অল্‌-রসীদ আমির-ওমরাওদের মধ্যে সিংহাসনে বসেন তাঁকে তো সেলাম দিয়েই থাকি, রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে অগোচরে যিনি সাধারণ প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মনে মনে তাঁকে যদি মান দিতে না পারি তবে সেটাতে আপনাকেই খর্ব করি বাদশাকে নয়।

চিঠি লিখে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বভার হালকা করলুম তার একটা কারণের আভাস দিয়েছি পূর্বেই, অর্থাৎ এই বইখানি সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো আয়োজন আমার ভাণ্ডারে নেই, আর একটা কারণ এই যে আমার বর্তমান অবস্থায় আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ, দশ জনের কাছে জবাবদিহির সতর্কতাটা সর্বদা মনে রাখতে হয় না। ইতি

১১।৪।৩৯

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্র রায় সত্যই বলিয়াছিলেন, চরটা কীটপতঙ্গ-সরীসৃপে পরিপূর্ণ। গ্রামের কোলেই কালী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি—তার পর খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, তার পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যু-দূতের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরণের বিষধর সাপ।

প্রৌঢ় রংলাল মণ্ডল বলিল, এই তো ক-বছর হ'ল গো বাবুমাশায়—একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি—ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে, দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচীর মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হ'ল না যে এগিয়ে যাই!

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আগে নাকি ঐ চরের উপরেই ছিল কালী নদী?

—হ্যাঁ গো। ঠিক ওই চরের মাঝখানে। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল এক পো রাস্তার ওপর। বোশেখ-মাসে দুপুর বেলায় নদীর ঘাটে আসতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত।

—তুমি দেখেছ?

অহীন্দ্রের ছেলেমানুষিতে কৌতুক অনুভব করিয়াই যেন রংলাল বলিল, এ্যাই দেখেন, দাদাবাবু আবার বলেন কি দেখ। কালী নদীর ধারেই—ওই দেখেন, চরের পরই যেখানে চোরাবালি—ওইখানে আমাদের পঁচিশ কাঠা আওয়ল জমি ছিল—তার পর ওই চর যেখানে আরম্ভ হয়েছে—ওইখানে ছিল—গো-চর, নদীর ওলা। ছেলে-বেলায় আমি ওইখানে গরু চরিয়েছি; ওই জমিতে আমি নিজে লাঙল চষেছি। তখন আমাদের গরু ছিল কি মাশায়—এই হাতীর মত বলদ—আর রতন কামারের গড়া ফাল! এক হাত মাটি একবারে দু-ফাঁক হয়ে যেত। অঃ—সে মাটিরই বা কি রঙ—একবারে লাল—সেরাক্!

বৃদ্ধ চাষী মনের আবেগে পুরাতন স্মৃতিকথা বলিয়া যায়, অহীন্দ্র কালী নদীর তটভূমিতে চরের প্রান্তভাগে বসিয়া চরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিয়া যায়। বৃদ্ধ বলে—কালীনদীর একেবারে তটভূমিতে সে কি নধর কচি ঘাস গালিচার মত পুরু হইয়া থাকিত—সারা গ্রামের গরু খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার পর ছিল তরীর জমি। সে আমলে তুঁতপাতার চাষ ছিল একটা প্রধান চাষ। জবা গাছের পাতার মত তুঁতের পাতা। চাষীরা বাড়ীতে গুটি পোকা পালন করিত,—গুটিপোকার খাদ্য এই তুঁতপাতা। যে চাষী গুটিপোকা পালন করিত না, সেও তুঁতগাছের চাষ করিত, তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়া সেও দশ টাকা রোজকার করিত। তখন গ্রামেরই বা শোভা কি! বাবুরাই বা কি সব, এক এক জন দিক্‌পাল যেন—ছাতি কি বুকের! রংলাল বলিল—আপনকার কত্তাবাবা, বাপ রে বাপ রে—রংলাল ব'লে হেঁকেছেন তো জান এক বারে খাঁচাছাড়া হ'য়ে যেত!

অহীন্দ্র চরের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোন্ বছর কালী প্রথম এ কূল ভাঙলে, তোমার মনে আছে?

পিতামহ-প্রপিতামহের ইতিহাস সে বহুবার শুনিয়াছে, আজ ঐ চরটাই তাহার মন অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীতে নাকি ব-দ্বীপগুলি এবং নদী ও সাগর সঙ্গমের মুখে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি হাজার হাজার বৎসর

ধরিয়া পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে, এবং উঠিবে! বাংলার নিম্নাংশটা গোটাই না কি এমনি করিয়া জলতল হইতে উঠিয়াছে। কত প্রবালকীট, কত শুক্তি-শামুকের দেহ পলির স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া আছে! ভূগোলের মাষ্টার কৃষ্ণবাবু কি চমৎকারই না কথাগুলি বলেন!

রংলাল বলিল, কালী তো আমাদের সামান্য নদী নয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। কবে থেকে যে উনি রায়হাটের কূল তলে তলে খেতে আরম্ভ করেছেন, তা কে বলবে বলেন! তবে উনি যে-কালে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আপনার রায়হাট উনি আর রাখবেন না। বললাম যে যমের ভগ্নী উনি। বুঝলেন, কালী যাকে নিলে—কার সাধ্যি তাকে বাঁচায়! কত গেরাম যে উনি খেয়েছেন তার আর ঠিক-ঠিকেনা নাই। ফি বছর দেখবেন, কত চাল, কত কাঠ, কত গরু, কত মানুষ কালীর বানে ভেসে চলেছে যমের বাড়ী। একবার সাক্ষাৎ পেত্যক্ষ করেছি আমি, তখন আমার জোয়ান বয়েস। দেখলাম, একখানা ঘরের চালের ওপর ব'সে ভেসে যেছে একটি মেয়ে—কোলে তার কচি ছেলে। উঃ কি তার কান্না—সে কান্নায় গাছপাথর কাঁদে দাদাবাবু! আমি মাশায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমাদের সরু লৌকো নিয়ে—সঙ্গে নিলাম কাছি। একে সোতের মুখে, তার ওপর কষে ঠেল মারলাম দাঁড়ের। সোঁ-সোঁ ক'রে গিয়ে পড়লাম চালের কাছে। আঃ তখন মেয়েটির কি মুখের হাসি। সে বুঝলে আমি বাঁচলাম। মাশায়, বলব কি—ঠিক সেই সময়েই উঠল একটি ঘুরণচাকী আর বাস, বোঁ ক'রে ঘুরপাক মেরে নিলে একেবারে চাল সুদ্ধ পেটের ভেতর ভরে। কল কল করে জল যেন ডেকে উঠল—বলব কি দাদাবাবু, ঠিক যেন খল খল করে হেসে উঠলেন কালী—সে হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে কালীকে প্রণাম করিল—এ্যাই সেই বছরেই দেখলাম কালী মা এই কূল দিয়ে চলেছেন।

সে বলিল, সেই বৎসরেই শীতকালে দেখা গেল কালীর অগভীর জলস্রোত ওপারের দিকে বালি ঠেলিয়া দিয়া রায়হাটের কোল দিয়া ঘেঁষিয়া আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তার পর বৎসরের পর বৎসর ওপাশে জমিতে আরম্ভ করিল বালি আর এদিক হইল গভীর। বর্ষায় যখন কালী হইত দুকূলপ্লাবী তখন কিন্তু এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত জল ছাড়া কিছুই দেখা যাইত না। তখন ওপারটা ছিল ছয় মাস জল আর ছয় মাস বালির স্তূপ। তার পর প্রথমেই কালী গ্রাস করিল এপারের গো-চারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট তৃণশ্যামল তটভূমিটুকু। ওপারে তখন হইতে বর্ষার শেষে বালির উপর পাতলা পলির স্তর জমিতে আরম্ভ করিল।

রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, শুধু কি পলি; রাজ্যের জিনিষ—এই আপনার খড়কুটো ঘাসপাতা—আর মরা মানুষ, গরু-ছাগল তার ওপর সাপ-ব্যাঙের তো সংখ্যা হয় না। এই, ওপরে যা খেতেন কালী, এসে উগ্‌রে দিতেন ওই চরের ওপর। আর তার ওপর দিতেন মাটি আর বালি চাপা।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চাষীর মনে যেন দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, কালী ঠিক যেন বালিকার মত খেলাঘর পাতিয়াছিল ঐখানে। বালিকার মত যেখানে যাহা পাইত আনিয়া ঐখানে জড়ো করিয়া রাখিত। আর তার উপর চাপা দিত বালি আর পলি।

—এই আমাদের মেয়েগুলো খেলে দেখেন না, ভিজে বালির ভেতর পা পুরে তার ওপর বালি চাপিয়ে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে, পা-টি বার করে নেয়, কেমন ঘর হয়! আবার মনে হ'লে লাথি মেরে ভাঙে, আর বলে, হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম! কালীর আমাদের তাই, ভাঙতে যেমন আবার গড়তেও তেমন। উঃ কত কি যে এসে জমা হ'ত দাদাবাবু, শামুক-গুগলি-ঝিনুক সে-সব কত রকমের, বাহার কি সব! খরার সময় যখন সব সেঁতানী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তখন সব ছেলেমেয়েরা চরের ধারে ধারে ঝিনুক কুড়োতে যেত। ছোট ছোট ঝিনুকে ঘামাচি মারত সব পুটপাট ক'রে। কেউ কেউ লক্ষ্মী বেদীতে বসিয়ে বসিয়ে আল্‌পনার মত লতাপাতা তৈরি করত। তখন আপনার জলথল পড়লে খুদি খুদি ঘাস হ'ত এই আপনার গরুর রোঁয়ার মত।

অহীন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা তোমরা সব তখন এই চর কার তা মীমাংসা ক'রে নাও নি কেন?

রংলাল অহীন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতায় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, এ্যাই দেখেন, দাদাবাবু কি বলেন দেখেন! তখন উ চর নিয়ে লোকে করবে কি? এই এখানে খানিক খাল, চোরাবালি, ওখানে খানিক বালির ঢিপি; আর যে পোকার ধুম! ছোটলোকের মেয়েরা পর্য্যন্ত কাঠকুটো কুড়োতে চরের ভেতরে যেত না। বুঝলেন, খুদি খুদি পোকায় একবারে অষ্টাঙ্গ ছেঁকে ধরত। তার আবার জ্বালা কি, ফুলে উঠত শরীর।

চৈত্রমাসের অপরাহ্ণ; সূর্য্য পশ্চিমাকাশে রক্তাভ হইয়া অস্তাচলের সমীপবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে। কালীর এপারে রায়হাটে তটভূমিতে বড় বড় গাছ—শিমুল গাছই বেশী, শিমুলের নিঃশেষে-পত্রহীন শাখা-প্রশাখার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া রক্ত-রাঙা ফুলের সমারোহ। পালদে গাছগুলিরও তাই—পত্ররিক্ত এবং শিমুলের চেয়েও গাঢ় রক্তবর্ণের পুষ্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ। বসন্তের বাতাসে কোথা হইতে একটি অতি মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া শ্বাসযন্ত্র ভরিয়া দিল।

অহীন্দ্র বারবার গন্ধটি গ্রহণ করিয়া বলিল, কি ফুলের গন্ধ বল তো?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত রংলাল বলিল, উ ওই চরের মধ্যে কোন ফুলটুল ফুটে থাকবে! ওর কি কেউ নাম জানে! কোথা থেকে কি এনে কালী যে লাগান ওখানে, সেএক ওই কালীই জানেন। বুঝলেন, এই প্রথম বার যেবার ঘাস বেশ ভাল রকমের হ'ল, আমরা গরু চরাব ব'লে দেখতে এসেছিলাম।

বলিতে বলিতে রংলালের মুখে সেই দিনের সেই বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, সে বলিয়া যায়, কত রকমের নাম-না-জানা চোখে-না-দেখা ছোট ছোট লতা-গাছ-ঘাস ওই চরের উপর তখন যে জন্মিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর ঘাসে পা দিলেই লাফাইয়া উঠিত ফড়িং-জাতীয় শত শত কীট, উপরে উড়িয়া বেড়াইত হাজারো রকমের প্রজাপতি-ফড়িং। তার পর জন্মিয়াছে ওই বেনাঘাস আর কাশগুল্ম। কিন্তু উহার ভিতরে ভিতরে কত যে গাছ, কত যে লতা আত্মগোপন করিয়া আছে তাহার সংখ্যা কি কেহ জানে? আর ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়া আছে কত বিষধর—বলিতে বলিতে রংলাল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, খবরদার দাদাবাবু, কখনও যেন গন্ধের লোভে ভেতরে ঢুকবেন না। বরং ওই সাঁওতাল বেটাদের বলবেন, ওরা ঠিক জানে সব কোথা কি আছে। ফুলের ওপর ওদের খুব ঝোঁক তো।

অকস্মাৎ বৃদ্ধ রংলাল মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, যাবেন দাদাবাবু সাঁওতালপাড়ায়? আ-হা-হা, কি ফসলই সব লাগিয়েছে—অঃ আলু কি হয়েছে, ইয়া মোটা মোটা; বরবটির সুঁটি আপনার আধ হাত করে লম্বা! সাধে কি আর গাঁসুদ্ধ নোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠল দাদাবাবু!

অহি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এখানে সাঁওতাল কোথায়? ওরা তো থাকে অনেক দূরে পাহাড়ের উপর!

ঘাড় নাড়িয়া রংলাল বলিল, এ্যাই দেখেন, আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো! উই দেখেন—ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে। ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি—এই বন কেটে আর ওই সব জন্তুজানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল কেউ জানে না; ওরা আপনার এসেছে আপন মগজেই খানিকটা জায়গা জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করেছে—এইবার সব ঘর তুলছে। গাঁয়ের নোক তো হঠাৎ জানলে ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হচ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটল সব। বাস্, আর যায় কোথা, লেগে গেল ফাটাফাটি! জমিদার বলছে চর আমাদের, আমরা চাষীরা বলছি ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারে চর উঠেছে—চর আমাদের। আসল ব্যাপার হ'ল ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা ফলাচ্ছে, বুঝলেন!

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল—চল যাব। কোন্ দিকে?

—ওই দেখেন, বেনার ঝোঁপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে নদীতে জল আনতে।

অহীন্দ্র দেখিল, গাঢ় সবুজ বেনাবনের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে আট-দশটি কালো মেয়ের একটি সারি,

মাথায় কলসী লইয়া একটানা সুরে গান গাহিতে গাহিতে তাহারা নদীর দিকে চলিয়াছে।

দুই পাশে এক বুক উঁচু ঘন কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গল। তাহারই মধ্য দিয়া স্বল্পপরিসর পরিচ্ছন্ন একটি পথ সর্পিল ভঙ্গিতে চরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ঘাসের বনের মধ্যে নানা ধরণের অসংখ্য লতা ও গাছ জন্মিয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ বেনাঘাস অবলম্বন করিয়া লতাগুলি লতাইয়া লতাইয়া ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। সাপের ফণার মত উদ্যত বঙ্কিম ডগাগুলি মধ্যে মধ্যে একেবারে পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের গায়ে ঠেকিয়া সেগুলি দোল খায়। মাঝে মাঝে চৈত্রের উতলা বাতাস আসিয়া ঘাসের জঙ্গলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত অবনত করিয়া দিয়া যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সর্‌সর্‌ সন্‌সন্‌ শব্দ।

রংলাল একটা লতার ডগা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, অঃ অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি! কত যে লতা আছে!

অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া এই পথটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সাঁওতালদের কথা ভাবিতেছিল—এমন কালো জাতি অথচ কি পরিচ্ছন্নতা ইহাদের! কোথায় যেন বনান্তরালে কোলাহল শুনা যাইতেছে। চারিদিকে চাহিয়া অহীন্দ্র দেখিল, একেবারে ডান দিকে কতকগুলি কুঁড়েঘরের মাথা জাগিয়া আছে। পথের একটা বাঁক পার হইয়াই সহসা যেন তাহারা পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণ ভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহারই মধ্যে ঘর দশ-বার আদিম অর্দ্ধউলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে। ঘর এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সাময়িক ভাবে চালা বাঁধিয়া, চারি দিকে বেড়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ বুলাইয়া তাহারই মধ্যে এখন তাহারা বাস করিতেছে। আশেপাশে মাটির দেওয়াল দিয়া স্থায়ী ঘরের পত্তনও সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠান। উঠানের পাশে পৃথক্ পৃথক্ আটিতে বাঁধা নানা প্রকারের শস্যের বোঝা। বরবটির লতা, আলুগুলি ছাড়াইয়া লইয়া সেই গাছগুলি, মসুরীর ঝাড়, ছোলার ঝাড় সবই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত; দেখিয়া অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল।

রংলাল ডাকিয়া বলিল, কই, মোড়ল মাঝি কই রে? কে এসেছে দেখ।

—কে বেটে? তু কে বটিস? বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল এক কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তরখণ্ড। আকৃতির চেয়ে আকারটাই তাহার বড় এবং সেইটাই চোখে পড়িয়া মানুষকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পেশীর পুষ্টিতে এবং দৃঢ়তায় ও বিপুলতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে; লোকটি সবিস্ময়ে উগ্র গৌরবর্ণের কৃশকায় দীর্ঘতনু বালকটিকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, তোর তো অনেক বয়েস হ'ল, তোদের রাঙাঠাকুরের নাম জানিস? তোদের সাঁওতালী হাঙ্গামার সময়—।

রংলালকে আর বলিতে হইল না, বিশাল বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন অগস্ত্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রংলাল বলিল, ইনি তাঁর নাতি। ছেলের ছেলে, বেটার বেটা।

মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল—চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগ্‌গির!

ছোট্ট টুলের আকারের দড়ি দিয়া বোনা বসিবার আসনে অহীন্দ্রকে বসাইয়া মাঝি তাহার সম্মুখে মাটির উপর উবু হইয়া হাত দুইটি যোড় করিয়া বসিয়া অহীন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে বলিল, হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রং, তেমুনি চোখ—হুঁ ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল!

রংলাল হাসিয়া বলিল, তুই তাকে দেখেছিস মাঝি?

—হুঁ, দেখলম বইকি গো! সাল জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বেটে; দেখলম সি—সেই আগুনের আলোতে—রাঙাঠাকুর এলো।

অহীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—তোমার বয়স কত হবে মাঝি?

অনেক চিন্তা করিয়া মাঝি বলিল, সি অনেক হ'ল বইকি গো, তা তুর ছুকুড়ি হবে।

রংলাল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল, ওদের হিসেব অমুনি বটে। তা, ওর বয়েস পঁচাত্তর আশী হবে দাদাবাবু।

পঁচাত্তর, আশী! অহীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ! ইতিমধ্যে পাড়ার যত সাঁওতাল এবং ছেলেমেয়ে অহীন্দ্রের চারি পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে রাঙাঠাকুরের বেটার বেটা আসিয়াছেন, আর তিনি নাকি ঠিক রাঙাঠাকুরেরই মত দেখিতে—আগুনের মত গায়ের রং। ভিড়ের সম্মুখেই ছিল মেয়েদের দল। কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির মত দেহ, এমনি নিটোল এবং দৃঢ়—তৈলমসৃণ কষ্টির মত উজ্জ্বল কালো। পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথার চুলে তেল দিয়া পরিপাটি করিয়া আঁচড়াইয়া এলো খোঁপা বাঁধিয়াছে, সিঁথি উহারা কাটে না। কানে খোপায় নানা ধরণের পাতা সমেত সদ্যফোটা বনফুলের স্তবক। অহীন্দ্র অনুভব করিল, সেই গন্ধ এখানে যেন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিতেছে।

সে প্রশ্ন করিল, এ কোন্ ফুলের গন্ধ মাঝি?

মাঝি মেয়েদের মুখের দিকে চাহিল। চার-পাঁচ জনে কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিয়া আপন খোঁপা হইতে ফুলের স্তবক খুলিয়া ফেলিল। অহীন্দ্র দেখিল, লবঙ্গের মত ক্ষুদ্র আকারের ফুল, একটি স্তবকে কদম্ব-কেশরের মত গোল হইয়া অসংখ্য ফুটিয়া আছে। কিন্তু মোড়ল মাঝি গম্ভীর ভাবে কি বলিল। মেয়েগুলি ফুলের স্তবক আবার খোপায় গুঁজিয়া সারি বাঁধিয়া ঐ দমকা বাতাসের মত বেনাবন ঠেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

রংলাল বলিল—কি হ'ল? কোথা গেল সব?

—ফুল আনতে, রাঙাবাবুর লেগে।

—কেনে, ওই ফুল দিলেই তো হ'ত।

—ধ্যৎ—রাঙাঠাকুরের নাতিকে ওই ফুল দিতে আছে? তুরা দিস্?

অহীন্দ্র বলিল, না গেলেই হ'ত মাঝি, কত সাপ আছে চরে; নেই?

তাচ্ছিল্যের সহিত মাঝি বলিল, উ সব সরে যাবে, কুন দিকে পালাবে তার ঠিক নাই।

অহীন্দ্র বলিল, এখানে নাকি খুব বড় বড় সাপ আছে?

অহীন্দ্রের কথাকে ঢাকিয়া দিয়া মেয়ের ও ছেলের দল কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, আজই একটা মেরেছি আমরা, দেখবি বাবু? ইয়া চিতি!

উৎসাহে আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া অহীন্দ্র বলিল, কোথায়? কই? সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে মাঝির দল আগাইয়া চলিল, সর্ব্বাগ্রে ছেলেমেয়েরা যেন নাচিয়া চলিয়াছে। পল্লীর এক প্রান্তে এক বিশাল অজগর ক্ষত-বিক্ষতদেহে মরিয়া •তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে চিত্রিত মাংসস্তূপের মত। অহীন্দ্র, রংলাল শিহরিয়া উঠিল। অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, কোথায় ছিল?

মাঝি পরম উৎসাহভরে বিকৃত ভাষায় বকিয়া গেল অনেক—সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি; মোটমাট ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই: একটা নিতান্ত কচি ছাগলের ছানা—আপনার মনেই নাকি লাফাইয়া লাফাইয়া বেনা-বনের কোল ঘেঁষিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। নিকটেই এক জন মাঝি বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, আর কাছে ছিল তাহার কুকুর। কুকুরটা সহসা সভয়ে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেই মাঝি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশা সাপ বেনাবন হইতে হাত খানেক মুখ বাহির করিয়া নিমেষহীন লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ঐ নর্ত্তনরত ছাগ-শিশুটিকে! সাঁওতালের ছেলে বাঁশীটি রাখিয়া দিয়া তুলিয়া লইল ধনুক আর কাঁড় তীর। তার পর অব্যর্থ লক্ষ্যে সাপের মাথাটাই বিঁধিয়া দিল একেবারে মাটির সঙ্গে, তার পর চীৎকার করিয়া ডাকিল পাড়ার লোককে। তখন বিদ্ধমস্তক অজগর দীর্ঘ নমনীয় দেহ আছড়াইয়া ঘাসের বনে যেন তুফান তুলিয়া

দিয়াছে! কিন্তু পাঁচ-সাতটা ধনুক হইতে সুতীক্ষ্ণ শর-বর্ষণের মুখে সে বীর্য্য কতক্ষণ।

সাপ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই একটি প্রৌঢ়া সাঁওতাল রমণী একটি বাটিতে সদ্যদোহা দুধ আনিয়া নামাইয়া দিল, দুধের উপর ফেনা তখনও ভাঙে নাই। মেয়েটি সম্ভ্রম করিয়া বলিল, বাবু তুমি খান।

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল, মাঝি বলিল, ই আমার মাঝিন বেটে বাবু! লে, গড় কর রাঙাবাবুকে, আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।

রংলাল গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল, সে অকস্মাৎ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, এ্যাঁ—একেই বলে ইঁদুরে গর্ত্ত করে, সাপে ভোগ করে!

দুধের বাটিটা নামাইয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া রংলাল বলিল—কেনে আবার, চর উঠল লদীতে, সাপ-খোপের ভয়ে কেউ ই-দিক দিয়ে আসত না। মাঝিরা এল, সাফ করছে, চাষ করছে, উ-দিকে জমিদার সাজছে লাঠি নিয়ে।—কি? না—চর আমাদের। আমরা যত সব চাষী-প্রজা বলছি চর আমাদের। এর পর মাঝিদিগে তাড়িয়ে দিয়ে সবাই বসবে জেঁকে। মাঝি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেনে, আমরাও খাজনা দিব। তাড়াবে কেনে আমাদিগে?

রংলাল বলিল—তাই শুধো গা গিয়ে বাবুদিগে। অ'র খাজনা দিবি কাকে? সবাই বলবে আমাকে দে ষোল আনা খাজনা।

—কেনে, আমরা খাজনা দিব আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতিকে, এই রাঙা বাবুকে।

অহীন্দ্র বলিল, না না মাঝি, চর যদি আমাদের না হয় তো আমাদের খাজনা দিলে হবে কেন? যার চর হবে, তাকেই খাজনা দেবে তোমরা।

—তবে আমরা তুকেই খাজনা দিব, যাকে দিতে হয় তু দিস।

রংলাল হুঁসিয়ার লোক, প্রবীণ চাষী, ভূমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন সে অনেকটাই বোঝে, আর এও সে বোঝে যে, চরের উপর চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর স্বত্ব যদি কোন রূপে সাব্যস্ত হয় তবে অন্য বাড়ীর মত অন্যায় অবিচার হইবে না, তাহাদেরও অনেক আশা থাকিবে। অন্ততঃ মায়ের কথার কখনও খেলাপ হয় না। সে অহীন্দ্রের গা টিপিয়া বলিল, বাবু ছেলেমানুষ, উনি জানেন না মাঝি। চর ওদেরই বটে!

মাঝি বলিল—আমরা সোবাই বলব আমাদের রাঙা বাবুর চর।

কথাটা কিন্তু চাপা পড়িয়া গেল; সেই মেয়ে কয়টি—যেমন ছুটিতে ছুটিতে গিয়াছিল তেমনি ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া রাঙাবাবুর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সকলেরই কোঁচড়ভরা ঐ ফুলের স্তবক। একে একে তাহারা আঁচল উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল ফুলের রাশি। অতি সুমধুর গন্ধে স্থানটার বায়ুস্তর পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল।

মাঝি একটি দীর্ঘাঙ্গী কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, এই দেখ রাঙাবাবু, ই আমার লাতিন বেটে। ওই যি আজ সাঁপ মেরেছে—উয়ার সাথে ইয়ার বিয়া হবে।

লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহারই দিকে চাহিয়াছিল চাহিয়াই রহিল। অহীন্দ্র বলিল—আজ যাই মাঝি।

মেয়েরা সকলে মিলিয়া কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, ছেলেগুলা বলছে, উয়ারা নাচবে সব, তুকে দেখতে হবে।

—কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে মাঝি।

মাঝি বলিল—মশাল জ্বেলে আমি তুকে কাঁধে করে রেখে আসব।

অহীন্দ্র আর 'না' বলিতে পারিল না। আর এমন সুন্দর ইহারা নাচে—আর এত সুন্দর ইহাদের একঘেয়ে সুরের সুকণ্ঠের গান! সে বলিল—তবে একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির মাঝি।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে কলরব করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল—সিরিং—সিরিং অর্থাৎ গান—গান! মরং বাবু রাঙাবাবু অর্থাৎ তাহাদের মালিক রাজা রাঙাবাবু দেখিবেন।

মাদল বাজিতে লাগিল—ধিতাং ধিতাং, বাঁশের বাঁশীতে গানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

রাঙাবাবুকে বেষ্টন করিয়া বসন্ত-বাতাসের দোলায় মত হিল্লোলিত দেহে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, সাঁওতাল তরুণীরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান। বৃদ্ধ মাঝি বসিয়াছিল অহীন্দ্রের পাশে, অহীন্দ্র তাহাকে প্রশ্ন করিল—গানে কি বলছে মাঝি?

—বলছে উয়ারা—রাজার আমাদের বিয়া হবে; তাথেই রাণী সাজ করে ব'সে আছে, রাজা তাকে লাল জবাফুল এনে দিবে।

পরক্ষণেই অশীতিপর বৃদ্ধ প্রায় লাফ দিয়া উঠিয়া একটা মাদল লইয়া বাদক পুরুষদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

* * *

রাত্রি প্রায় আটটার সময়, রায়বাবুদের কাছারির সম্মুখ দিয়া কাহারা যাইতেছিল মশালের আলো জ্বালাইয়া। মশাল একালে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার; ইন্দ্র রায় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কে যায়?

শুষ্ক বেনাঘাসের আঁটি বাঁধিয়া তাহাতে মহুয়ার তেল দিয়া জ্বালাইয়া বৃদ্ধ মাঝি তাহাদের রাঙাবাবুকে পৌঁছাইয়া দিতে চলিয়াছিল। সে উত্তর দিল—আমি বেটে, উ-পারের চরের কমলা মাঝি।

বিস্মিত হইয়া রায় প্রশ্ন করিলেন—এত রাত্রে এমন আলো জেলে কোথায় যাবি তোরা?

—আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি মাশায়, আমাদের রাঙাবাবুকে বাড়ীতে দিতে যেছি গো। রাঙাঠাকুর? সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী! রায়ের মনে পড়িয়া গেল অতীত কাহিনী।

৪

সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিয়া সুনীতি গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিলেন। গনগনে আগুন ভরিয়া ঝি ধূপদানী হাতে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপ-দানীটি তাহার হাত হইতে লইয়া সুনীতি আগুনের উপর ধূপ ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধূপগন্ধে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে সুনীতি বলিলেন—তুলসীমন্দিরে আর ঠাকুরবাড়ীতে প্রদীপ আজ বামুন-ঠাকরুণকে দিতে বল মানদা। আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাবু হয়তো এখনি রেগে উঠবেন।

তাড়াতাড়ি তিলের তেলের বোতলটি লইয়া তিনি উপরে রামেশ্বরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরের ঘরের দরজা জানালা অহরহ বন্ধ থাকে, দিনরাত্রিই ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলে, সে প্রদীপে পোড়ে তিলের তেল উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখে একেবারে সহ্য হয় না। আলোর মধ্যে তিনি নাকি একেবারে দেখিতে পান না! অন্ধকারে বরং তিনি দেখিতে পান। তেলের বোতল হাতে সুনীতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বড় ঘরখানির মধ্যে ক্ষীণ শিখায় একটি মাত্র প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। এত বড় ঘরের সর্ব্বাংশে তাহার জ্যোতি প্রসারিত হইতে পারে নাই, চারি কোণের অন্ধকার অসীমের মত সীমাবদ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে সে যেন এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে ঘরের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর নিস্তব্ধ হইয়া রামেশ্বর বসিয়াছিলেন।

ঘরের দরজা খুলিতেই রামেশ্বর অতি ধীর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন—সুনীতি?

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিলেন, হাঁ আমি। তেল দিয়ে দিই প্রদীপে। জানালাগুলো খুলে দিই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

—দাও।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঘরের জানালা খোলা হয়। কখনও কখনও রামেশ্বর তখন খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহির্জ্জগতের সহিত পরিচয় করেন। জানালা খুলিয়া দিতেই বদ্ধ ঘরে বাহিরের বাতাস অপেক্ষাকৃত জোরেই প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটা নিবিয়া গেল। রামেশ্বর বাহিরের নির্ম্মল শীতল বাতাসে নিশ্বাস লইয়া বলিলেন, আঃ।

সুনীতি বলিলেন—আলোটা নিবে গেল যে।

রামেশ্বর বলিলেন—বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল তো?

—চৈত্র মাস। তার পর চিন্তিত ভাবে স্নুনীতি আবার বলিলেন—প্রদীপ তো এ বাতাসে থাকবে না।

রামেশ্বর বলিতেছিলেন—'ললিত লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল-মলয় সমীরে!'

—হ্যাঁ গা বাতি দিয়ে একটা সেজ জ্বেলে দেব?

—সেজ?

—হ্যাঁ, বাতির আলোও তো খুব ঠাণ্ডা। এ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না।

—তাই দাও। বলিয়া আবার আপন মনে আবৃত্তি করিলেন, 'মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥'

ঘরে সেজ ও বাতি ঠিক করাই থাকে, মধ্যে মধ্যে জ্বালিতেও হয়। বাতাসের জন্যও হয়, আবার মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরবাবুর ইচ্ছাও হয়। স্নুনীতি বাতি জ্বালিয়া সেজের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, তার পর কতকগুলি ধূপ-শলাকা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন—কাপড় ছাড় সন্ধ্যের জায়গা ক'রে দি।

—হুঁ। করতে হবে বই কি। না করলেই পাপ। করলে কিছুই না। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না!

স্নুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন—ও কি বলছ? রামেশ্বর মধ্যে মধ্যে এমনি করিয়া বকিতে আরম্ভ করেন, তখন বাধা দিতে হয়। অন্যথায় সেই একটা কথাই তিনি কয়েক দিন ধরিয়াই এমনি করিয়া বকিয়া যান।

বাধা পাইয়া রামেশ্বর চুপ করিলেন। স্নুনীতি আবার বলিলেন—কাপড় ছাড়, সন্ধ্যে কর। আর এমন করে বকছ?

—না, না, না, আমি বকি নি তো। বকব কেন? কই কাপড় দাও। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিয়া আসিলেন। স্বামীকে সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া স্নুনীতি বলিলেন—সন্ধ্যে করে ফেল, আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।

স্নুনীতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রামেশ্বর সন্ধ্যা শেষ করিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। স্নুনীতিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন—কি বাজছে বল তো?

দূরে ওই চরটার উপরে তখন অহীন্দ্রকে ঘিরিয়া সাঁওতালেরা মাদল ও বাঁশী বাজাইতেছিল, মেয়েরা নাচিতেছিল—শব্দটা সেই শব্দ। স্নুনীতি বলিলেন—সাঁওতালরা মাদল বাজাচ্ছে।

—বাঁশী শুনছ, বাঁশী!

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় তো! মাঝিরা মাদল বাজাচ্ছে—বাঁশী বাজাচ্ছে—মেয়েরা নাচছে! ওদের ওই আনন্দ।

—তুমি কবিরাজ গোস্বামী শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছ? 'করতলতালতরলবলয়াবলি কলিত কলস্বন বংশে। রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥" যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির সঙ্গে তাল দিয়ে গোপবালারাও একদিন নাচত! গীতগোবিন্দ তুমি পড় নি?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তুমি তো কখনও পড়ে শোনাও নি; আমি নিজে তো সংস্কৃত জানি না।

—আজ তোমাকে শোনাব, হ্যাঁ—শোনাব, আমার মুখস্থ আছে।

—বেশ এখন দুধটা খেয়ে নাও দেখি। বলিয়া সম্মুখে দুধের বাটি আগাইয়া দিলেন। পান করিয়া বাটি স্নুনীতির হাতে দিতেই স্নুনীতি জলের গ্লাস ও গামছা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। হাতমুখ ধুইয়া রামেশ্বর আবার বলিলেন—কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন কি জান? "যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং। মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥" শোনাব, তোমাকে আজ শোনাব।

আনন্দে স্নুনীতির বুকখানি যেন ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—তা হ'লে তাড়াতাড়ি আমি কাজগুলো সেরে আসি। পরমুহূর্ত্তেই স্নুনীতি যেন স্তিমিত হইয়া গেলেন—কতক্ষণ, এ রূপ কতক্ষণের জন্য!

—হ্যাঁ এস। বাতাস আজ বড় মিষ্টি মিষ্টি বইছে। বসন্তকাল কি না!···আচ্ছা স্নুনীতি, দোল-পূর্ণিমা চলে গেছে?

—হ্যাঁ। আজ কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী।

—কই আমাকে তো আবীর দিলে না!

সুনীতি অপরাধিনীর মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—এনো, এনো, আবীর থাকে তো নিয়ে এস এক মুঠো আজ।

সুনীতি এ কথারও উত্তর দিলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

—আর শোন। জয়দেব সরস্বতীর পদাবলী যদি শুনবে, তবে অতি সুন্দর একখানি কাপড় পরবে। সুন্দর ক'রে বেণী রচনা করবে। তার পর রসরাজের মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ করে, লীলাবিভোর মন নিয়ে সে শুনতে হবে।

সুনীতি ভাল করিয়াই জানেন যে ফিরিয়া আসিতে আসিতে স্বামীর এ রূপ আর থাকিবে না। কিন্তু তিনি কখনও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন না, তাই ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—তাই আসব।

—চুলটা যেন বেঁধে ফেলো!

—বাঁধব।

—হ্যাঁ। ঘরে আতর নেই—আতর?

—আছে, তাও আনব।

—আমায় এখুনি একটু দিতে পার?

—দিচ্ছি। সুনীতি সঙ্গে সঙ্গে বাক্স খুলিয়া একটি সুদৃশ্য আতরদান বাহির করিলেন। তুলায় আতর মাখাইয়া স্বামীর হাতে দিয়া, ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ফিরিলেন। কিন্তু রামেশ্বর ডাকিলেন—শোন!

সুনীতি বলিলেন—বল।

—ঐ আলোর সম্মুখে তুমি এক বার দাঁড়াও তো। অন্ধকারের মধ্যে আমার বাস, অনেক দিন তোমাকে যেন আমি ভাল ক'রে দেখি নি!

সুনীতি স্থির ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাড়াইলেন। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দৃষ্টি যাওয়ার চেয়ে মানুষের বড় দুঃখ আর নাই। ভীষণ পাপ, অভিসম্পাত না হ'লে মানুষের চোখ যায় না!

সুনীতি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু চোখ তো তোমার খারাপ হয়নি, তিন-চার বার ডাক্তার দেখান হ'ল—তাঁরা তো তা বলেন না!

তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন—জানে না, তারা কিছুই জানে না, তুমিও জান না। দিনের আলোর মধ্যে চোখ আমার আপনি বন্ধ হয়ে যায়, কে যেন ধরে চোখে সুচ ফুটিয়ে দেয়। নিবিয়ে দাও সুনীতি—ও আলোটাও নিবিয়ে দাও। নয় আড়ালে সরিয়ে দাও।

আলোটি অন্তরালে সরাইয়া দিয়া সুনীতি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে-আমলের চকমিলান বাড়ী, নীচের তলায় চারি দিকেই ঘর, একেবারে অবরুদ্ধ বলিলেই হয়। বাহিরে এমন মিষ্ট বাতাস অথচ এ-বাড়ীর নীচের তলায় বেশ যেন গরম পড়িয়া গিয়াছে। সুনীতি স্বামীর জন্য খাবার নিজের হাতেই প্রস্তুত করেন, খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে তিনি ঘামিয়া যেন স্নান করিয়া উঠিলেন।

পাচিকা বলিল—ওরে বাপরে, মা যে ঘেমে নেয়ে উঠলেন একবারে। আমি যে এত ক্ষণ আগুনের আঁচে রয়েছি, আমি এত ঘামি নি।

মানদা ঝি বলিল—পাখাটা নিয়ে আসি আমি।

অত্যন্ত লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত ভাবে সুনীতি বলিলেন—না রে, না, থাক। এই তো হয়ে গেছে আমার। এমন ভাবে ঘামিয়া ওঠাটা তাঁহার কাছেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার খাবার তৈয়ারীও শেষ হইয়াছিল, তিনি খাবারগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। খাবার রাখিয়া দিয়া বলিলেন—দু-বালতি জল তুলে দে তো মানদা, গা ধুয়ে ফেলি একটু।

মানদা পুরানো ঝি, সে বলিল—এই যে সন্ধ্যেয় গা ধুলেন মা। আবার গা ধোবেন কি গো! এই দো-রসার সময়। ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন বরং।

—না রে, সমস্ত শরীর যেন ঘিন্ ঘিন্ করছে আমার। তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আমার কি কখনও মরণ হয় রে মানী, তা হ'লে সংসারে ভুগবে কে?

মানদা আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া গামছা আনিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। আপনার হাত দুইখানি নাকের কাছে আনিয়া শুঁকিয়া সুনীতি

বলিলেন—নাঃ এ ধোঁয়ার গন্ধ সাবান না দিলে যাবে না। তুই কার কাছে ঘুঁটে নিস মানদা—ঘুঁটে ভিজে থাকে!

বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সাবান বাহির করিয়া লইয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তোলা কাপড় একখানা বাহির করিলে হয়, কিন্তু—। আবার তিনি এক গা ঘামিয়া উঠিলেন। মনের মধ্যে একটা দারুণ সঙ্কোচ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।

মানদা ডাকিল—মা! আসুন।

সুনীতি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—বাক্স খুলে দেখলাম—কাপড়গুলো সব পুরনো হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম—কি হবে রেখে, প'রে ফেলি। কিন্তু তোরা হাসবি ব'লে আর পারলাম না।

মানদা ও পাচিকা একসঙ্গে দু-জনেই হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—না মা না, আপনি পরুন; একটু ভাল কাপড় পরলে আপনাকে যা সুন্দর লাগে দেখতে! পরুন মা পরুন।

—পরব?

—হ্যাঁ মা পরুন, পরবেন বইকি!

—বুড়ো মেয়ের সখ দেখে তোরা হাসবি তো?

—হেই মা, তাই হাসতে পারি? আর আপনি বুড়ো হলেন কি ক'রে মা? বড় দাদাবাবু এই আঠারোতে পড়লেন; আমি তো জানি, আপনার পনেরো বছরে দাদাবাবু কোলে হয়। তা হলে কত হয়—এই তো মোটে চৌত্রিশ বছর বয়েস আপনার।

সুনীতির সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি আবার বাক্স খুলিয়া বাছিয়া একখানি ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া আনিলেন। গা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, গরমের দিন এল, আর আমার এই চুলের বোঝা নিয়ে হ'ল মরণ।

মানদা বলিল, উঠুন আপনি গা ধুয়ে, আপনার চুলটা বেঁধে দেব আজ। চুল বাঁধতে বললেই আপনি বলেন, ছেলে বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কত কি! দেখুন গিয়ে ছোট-তরফের রায়-গিন্নীকে, আপনার চেয়ে কত বড়, চুলে পাক ধরেছে, তবু রোজ চুল বাঁধবেন।

হাতে মুখে সাবান দিয়া গা ধোয়া শেষ করিয়া সুনীতি বলিলেন—দে, তাই চুলগুলো বিনুনি ক'রে দে তো! এলো চুল খুলে পিঠে পড়ে এমন সুড় সুড় করে পিঠে!

সুনীতির চুলগুলি ভ্রমরের মত কালো আর কোঁকড়ানো। হাতের মুঠিতে চুলগুলি ধরিয়া মানদা বলিল—বাহারের চুল বটে মা! আ-হা-হা, কি নরম! ছোট দাদাবাবু ঠিক তোমার মত দেখতে কিন্তু চুলগুলিনও পায় নাই—এমন বাহারের চোখও পায় নাই!

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কই অহীন্দ্র তো এখনও ফিরিল না! তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—তাই তো রে, অহি তো এখনও ফিরল না! বেরিয়েছে সেই কখন্!

মানদা বলিল—বেশ, দেখুন গিয়ে তিনি ব'সে ব'সে রংলাল মোড়লের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি দেখে এসেছি তাদের দু-জনকে জল আনতে গিয়ে নদীর ধারে মোড়ল এই হাত ছুড়ছে, এই হাত ছুড়ছে, যেন বক্তৃতে করছে।

সুনীতি বলিলেন—ওই ওর এক নেশা। যত চাষী-ভূষির সঙ্গে বসে গল্প করবে। রায়েরা নিন্দে করে, মহী তো আমার উপরেই তাল ঝাড়বে। তবু তো বাবুর কানে ওঠে না।

মানদা বলিল—রায়েদের কথা ছাড়ান দেন মা, ওরা এ বাড়ীর নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না! আর ছোট দাদাবাবুর মত ছেলে তোমার হাজারে একটা নাই। আমি তো দেখি নাই! দেখে এস গিয়ে রায়বাড়ীর ছেলেদিগে, কথা কি সব, যেন ছুঁচে বিঁধছে! তুই-তুকারি, চোপরাও, হারামজাদা-হারামজাদী তো ঠোঁটে লেগে আছে।...নেন মা এইবার সিঁথেতে সিন্দুর নেন কপালেও নেবেন, নিতে হয়।

সুনীতি স্থির দৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে একতলার ছাদের উপর দিয়া ওপারের শূন্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়াছিলেন। ও-পাশে কাছারি-বাড়ীর প্রাঙ্গণে এত আলো কিসের? শূন্যমণ্ডলটা পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—দেখ তো বেরিয়ে মানদা, বাইরে এত আলো কিসের?

মানদা সশঙ্কচিত্তে সন্তর্পণে বাহিরে গিয়া কিছু ক্ষণ

পরই ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।—ওগো মা, এক দল সাঁওতাল, এই সব মশাল জেলে দাদাবাবুকে পৌছে দিতে এসেছে! এই সব ঠকাঠক পেনাম করছে। দাদাবাবুকে বলছে রাঙাবাবু!

রাঙাবাবু! সুনীতি শিহরিয়া উঠিলেন। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুর, তাঁহার শ্বশুরের কাহিনী তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। পরক্ষণেই আবার তাঁহার মন তাঁহার শ্বশুরকুলের গৌরবে ভরিয়া উঠিল। আর ঐ আদিম বর্ব্বর জাতির সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতিও মমতার সীমা রহিল না। এ-বাড়ীকে সাঁওতালেরা কোন দিন ভোলে নাই, সরকারের সহিত মোকদ্দমার পর হইতে এই বাড়ীই সযত্নে সাঁওতালদের সহিত সংস্রব পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। বহু দিন ধরিয়া সরকার-পক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্বামীর উপর!

হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র; তাহার পিছনে পিছনে রংলাল আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

—আজ ওই চরটা দেখে এলাম মা! সাঁওতালরা যে খাতির করলে, আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু। একটা যা অজগর চিতি ওরা মেরেছে, প্রকাণ্ড বড়। অহীন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছিল, একেবারে সকল কথা এক মুহূর্ত্তে জানাইয়া দেয়।

মা বলিলেন—ওই সাপখোপ-ভরা চর, ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—'সাতকোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি'। গেলাম তো হ'ল কি? ভয় কিসের?

বাহির দরজায় রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সে ডাকিল—দাদাবাবু! তাহার গামছায় ছিল সেই ফুলগুলি।

সুনীতি চকিত হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন—মাঝিরা চলে গেল না কি! মানদা দাঁড়াতে বল তো মাঝিদের। মুড়কি আর নাড়ু দিতে হবে ওদের।

রংলাল বলিল, ওগো মানদা, এইগুলো বরং নাও তুমি, আমি যাই, মাঝিদের আটক করি। যে বোঙা জাত, হয়তো তোমার কথা বুঝবেই না।

মানদা ফুলগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল—তাই বলি, দাদাবাবু এলেন আর এমন গন্ধ কোথা থেকে উঠল! আহা-হা—এ কি ফুল গো? কি ফুল দাদাবাবু?

ফুলের গন্ধে ও কদম্ব ফুলের মত পুষ্পগুচ্ছগুলির গঠন-ভঙ্গী দেখিয়া সুনীতিও আকৃষ্ট হইলেন, তিনিও কয়েকটি পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া বলিলেন—ভারী সুন্দর ফুল তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল—ঐ ফুলের গন্ধেই তো চরের ভিতরে গেলাম। রংলাল বললে—মাঝিরা ঠিক সন্ধান জানে। গেলাম যদি তো, আমাকে দেখেই কমল মাঝি, ওদের মোড়ল,—উঃ কি চেহারা তার মা, ঠিক যেন একটা পাহাড়ের মত—আমাকে দেখেই ঠিক চিনে ফেল্‌লে, বললে—হুঁ ঠিক তেমনি পারা, তেমনি আগুনের মত রঙ, তেমনি চোখ তেমনি চুল! ঠিক আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি! সেখানে মেয়েরা সব গোছায় গোছায় এই ফুল খোঁপায় প'রে আছে। সেই মেয়েরা এনে দিলে এত ফুল। সবাই নিয়ে এল এক-এক আঁচল ভরে। যার না নিই সেই রাগ করে! রংলাল বললে সবারই নোব দাদাবাবু, চল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

সুনীতি বলিলেন—যা, তুই কতকগুলো নিয়ে বাবুর ঘরে দিয়ে আয়। ভারী খুশী হবেন উনি। শুনেছিস তো উনি নাকি সেকালে রোজ সন্ধ্যেতে ফুলের মালা পরতেন। যা, নিয়ে যা।

অহীন্দ্র বলিল—না, তুমি গিয়ে দিয়ে এস।

—সে কি? এবার এসে এক বারও তো তুই বাবুর সঙ্গে দেখা করিস নি! না, না, এ তো ভাল নয় অহি!

—আমার বড় কষ্ট হয় মা! তিনি কেমন হয়ে গেছেন! অথচ এত বড় পণ্ডিত, কি সুন্দর সংস্কৃত বলেন! আমার কান্না পায়।

সুনীতিরও চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই ফুল লইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি করব বল, তোদের অদৃষ্ট আর আমার অদৃষ্ট! আচ্ছা আমিই দিয়ে আসছি। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ওগো বামুন-মেয়ে, মাঝিদের মুড়কি আর নাড়ু দিয়ো সকলকে।

এত ক্ষণে অহীন্দ্র মাকে দেখিয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর

লাগছে মা তোমাকে আজ! অথচ কেন তুমি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গরিব-গরিব সেজে থাক!

সুনীতি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন, তবুও চট্ করিয়া আপন লজ্জা ঢাকিয়া বলিলেন—আজ আমি রাঙাবাবুর মা হয়েছি কি না তাই! আর বেয়াই আসবে ব'লে সেজেছি এমন, তোর ওই সাঁওতালদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব!

ছেলে লজ্জিত হইয়া পড়িল, মাও দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই মাঝিদের লইয়া রংলাল আসিয়া অন্দরের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—দাদাবাবু!

মানদা বলিল—এস মোড়ল, ভেতরে নিয়ে এস ওদের, মা উপরে আছেন।

* * *

সুনীতি দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার, বাতিটা বোধ হয় নিবিয়া গিয়াছে। তিনি দরজাটা আবার খুলিয়া অহিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—একটা প্রদীপ নিয়ে আয় তো অহি!

অন্ধকার কক্ষের মধ্য হইতে রামেশ্বর বলিলেন—কে সুনীতি? তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উত্তেজিত এবং মৃদু চাপা ভঙ্গির মধ্যে আশঙ্কার আভাস সুপরিস্ফুট।

সুনীতি বুঝিলেন, আলো নিবিয়া যাওয়ায় রামেশ্বর উত্তেজিত হইয়াছেন। চোখে তাঁহার আলো সহ্য হয় না কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একা থাকিতেও তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। সুনীতি বলিলেন—এই এক্ষুনি আলো নিয়ে আসছে। কিন্তু আমি কি এনেছি বল তো? খুব একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ?

সুনীতির কথার উত্তর তিনি দিলেন না, উত্তেজিত ভাবেই তেমনি চাপা গলায় বলিলেন, এত আলো কেন কাছারি-বাড়ীতে, সুনীতি? এত লোক? আমাকে কি ওরা ধ'রে নিয়ে যাবে? তাই আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি।

সুনীতির সকল আনন্দ ম্লান হইয়া গেল, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—না, না। ওরা সব সাঁওতাল, অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।

—অহিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল? সাঁওতাল?

—হ্যাঁ, কালীর ওপারে যে চরটা উঠেছে, অহি আজ সেই চরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সাঁওতালরা এসে বাস করেছে; রাত্রি হ'তে তারা সব মশাল জ্বেলে অহিকে পৌঁছে দিয়ে গেল। অহি তোমার জন্যে খুব চমৎকার ফুল এনেছে। গন্ধ পাচ্ছ না?

-ফুল? তাই তো, চমৎকার গন্ধ উঠেছে তো! অহি এনেছে আমার জন্যে?

—হ্যাঁ

অহি আলো লইয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সুনীতি আলোর ছটায় ফুলের স্তবকটি রামেশ্বরের সম্মুখে ধরিলেন। রামেশ্বর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, কুটজ কুসুম। বনবালারা, পর্ব্বত-দুহিতারা সেকালে কানে চুলে আভরণ স্বরূপ ব্যবহার করতেন। আমরা বলি কুর্চি ফুল।

অহি বলিয়া উঠিল, সাঁওতালদের মেয়েরা দেখলাম থরে থরে সাজিয়ে খোঁপায় প'রেছে।

সুনীতি বলিলেন, অহিকে না কি সাঁওতালরা দেবতার মত খাতির করেছে, শ্বশুরের নাম ক'রে বলেছে তুই বাবু আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি, দেখতেও ঠিক তেমনি। এক বুড়ো সাঁওতাল তাঁকে দেখেছিল, সে বলেছে অহি নাকি ঠিক আমার শ্বশুরের মত দেখতে। ওর নাম দিয়েছে রাঙাবাবু!

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া অহির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোল তো, আলোটা তোল তো সুনীতি দেখি।

সুনীতি আলো তুলিয়া অহীন্দ্রের মুখের পাশে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, হুঁ। কণ্ঠস্বরের একটি সকরুণ বিষণ্ণ সুর সুনীতি অহীন্দ্র দুইজনকেই স্পর্শ করিল। হয়তো কোনও অবান্তর অসম্ভব কথা এইবার তিনি বলিয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া সুনীতি বলিলেন, অহি, যা বাবা, তুই খেয়ে নিগে। আমি আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসছি।

অহি চলিয়া গেল। সুনীতি আলোটি জ্বালিয়া দিয়া একটি শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফুলগুলি সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখ, খুব সুন্দর কাপড় পরেছি আজ, চুলও বেঁধেছি। গীতগোবিন্দ শোনাবে তো!

রামেশ্বরের কানে সে কথা প্রবেশই করিল না, তিনি যেন কোন গভীর চিন্তার মধ্যে আত্মহারার মত মগ্ন হইয়া আছেন। সুনীতি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, কি ভাবছ ?

—ভাবছি, অহি যদি সাঁওতালদের নিয়ে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে !

—না না না, অহি সে-রকম ছেলে নয়; খুব ভাল ছেলে, প্রত্যেক বার স্কুলে ফার্ষ্ট হয়। তুমি তো ডেকে কথাবার্ত্তা বল না; কথা ব'লে দেখো, ভাল সংস্কৃত শিখেছে, কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে !

রামেশ্বরের দুর্ভাবনা ইহাতে গেল না, তিনি বারবার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সাঁওতালেরা চিনেছে যে! আবার নাম দিয়েছে বলছ রাঙাবাবু। আর ঠিক সেই রকম দেখতে !

সুনীতির এক-এক সময় ইচ্ছা হয় কঠিন একটা পাথরের আঘাতে আঘাতে আপনার কপালখানাকে ভাঙিয়া ললাটলিপিকে ধুলার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। নীচে মানদা ও বামুন-ঠাকরুণ বসিয়া সাঁওতালদের কথা আলোচনা করিতেছিল; মানদা বলিতেছিল, আমার সব চেয়ে ভাল লাগে ওদের বাঁশী। শুনছ, বাড়ী ফিরতে ফিরতে বাঁশী বাজাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ

সুনীতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এখনও তোমাদের গল্প হচ্ছে মা ? ছি ! [ক্রমশঃ]

নিমন্ত্রণ

শ্রীসতীশ রায়

তোমার আনন্দ-যজ্ঞ হ'তে আমার কি চির নির্ব্বাসন ?
জগতের সৌন্দর্য্যসভায় মোর তরে নাহিক আসন !
ফোটে ফুল প্রভাত-অঙ্গনে, সে আমার কেউ নয় আর ?
সুন্দরের বন্দনা-সঙ্গীতে আমার কি নাই অধিকার ?
প্রাণপূর্ণ আনন্দ-আবেগে উচ্ছ্বলিত নৃত্যগীতধারা
উজ্জ্বলিত সভাগৃহ মাঝে, আমি চির যৌবরাজ্যহারা !
গ্রহতারা জগত-মেলায় রূপের দীপালি-মহোৎসবে
অনির্ব্বাণ দীপশিখা জ্বলে !—মোর আলো কবে জ্বালা হবে ?
যদি যাই অতৃপ্ত ক্ষুধায় লজ্জা পাবে তব নিমন্ত্রণ,
পুষ্পবনে লতাকুঞ্জ মাঝে ক্ষুণ্ণ হবে পূর্ণ আয়োজন।
নীলকান্ত নভপাত্র ভরা রবিদীপ্তি মত্ত সোমরস
না মিটালে তপ্ত তৃষ্ণা মোর, যজ্ঞেশ্বর, তব অপযশ !
তোমার আনন্দ-যজ্ঞশালে অতিথি এসেছে কত জন,
সন্ধ্যাবেলা তা' সবার সাথে আমার কি নাই নিমন্ত্রণ ?

দারা শুকোর কান্দাহার-অভিযানের উদ্যোগ-পর্ব্ব

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পিএইচ-ডি

শাহজাদা দারা ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে কাবুল হইতে লাহোর চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিন মাস ধরিয়া উদ্যোগ-পর্ব্বের ধুমধাম চলিল; দারা লেখাপড়া ছাড়িয়া যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন। সব কাজেই তাঁহার উৎসাহ, ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল, তবে তিনি ঝোঁকের মাথায় কাজ করিতেন। বিচক্ষণ সেনাপতির মত সুস্থির বুদ্ধি ও চারি দিকে কড়া নজর রাখিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনানুযায়ী ছোটখাট জিনিষের বন্দোবস্ত করিতে তিনি পটু ছিলেন না; বিশেষতঃ লড়াইয়ের কাজে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। দরবারী ঐতিহাসিক ওয়ারেস্ লিখিয়াছেন, এক বৎসরে যে আয়োজন অন্য কেহ করিতে পারে নাই শাহজাদা লাহোরে থাকিয়া তিন মাস নয় দিনে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কান্দাহার-দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর ধ্বংস করার জন্য সর্ব্বপ্রথমে দরকার বড় বড় কামান, ভারী তোপখানা ও উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ। পূর্ব্বে দুইবারই দেখা গিয়াছে ইরাণী গোলন্দাজ ও তোপখানার সামনে হিন্দুস্থানী তোপখানা জোরে পাল্টা জবাব দিতে পারে না। তুর্কীদের সহিত অবিরাম সংঘর্ষের ফলে ইরাণীরা তোপের লড়াইয়ে সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কামানের পাল্লা হিন্দুস্থানী তোপখানার পাল্লার চেয়ে অনেক বেশী এবং নিশানাও প্রায় অব্যর্থ। ভারতবর্ষের লোকেরা তোপখানার কাজে বরাবরই কাঁচা। এজন্য বেশী বেতন দিয়া বাদশাহী তোপখানায় রুমী বা ইস্তাম্বুলের তুর্কী ও ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ ভর্ত্তি করা হইত। ঠিক জায়গায় কামান বসান, গোলাবারুদ-ভরা সলিতায় আগুন দেওয়া, তোপ ফাটিয়া মারা যাওয়া ইত্যাদি বিপদের ঝুঁকি ও মোটা কাজ সব হিন্দুস্থানী "খালাসী"রা করিত; রুমী ও ফিরিঙ্গীরা শুধু নিশানা ঠিক ও কামান দাগিবার হুকুম দিত। শাহজাদা এবার মোটা বেতনে ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ ও কয়েক জন তোপখানার এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিলেন। লাহোরে কামানের কারখানায় তিনটি ভারী কামান ও সাতটি হাল্কা (তোপ তোপ-ই-হাওয়াই) তৈয়ার করা হইল; বড়গুলির নাম "ফতে মোবারক","কিশোয়ার-কুশা" ও "গড়-ভঞ্জন"। প্রথম দুটি ৪৫ সের ও ৩২ সের ভারী গোলা ছুঁড়িবার মত মজবুত ছিল, ইহার চেয়েও ভারী একটি শাহী তোপ ছিল, নাম "কিলা-কুশা"; তাকত্ ৫২ সেরী গোলা। কান্দাহারের ভাবী সুনিশ্চিত পতনের স্বপ্নে বিভোর শাহজাদা নিজের বাহাদুরি কামানগুলির গায়ে আগেই খোদাইয়া নিলেন। "ফতে মোবারক" তোপের উপর ফারসী কবিতায় লেখা হইল—

> "তোপ্-ই-দারা শুকো শাহ্-ই-জাহান্
> মি-কুনদ্ "কান্দাহার"-রা বৈয়রান্"

"কিলা-কুশা" তোপ :—

> তোপ-ই-দারা শুকো "কিলা-কুশা"
> সর্-ই-গর্জাস্প মি-বুরদ বে-হাওয়া।

এই অভিযানের জন্য মোট সাতটি ভারী কামান, সতরটি দুব-পাল্লাবিশিষ্ট হাল্কা তোপ (তোপ্-ই-হাওয়াই), ত্রিশটি ছোট তোপ এবং এইগুলির খোরাক বাবদ ত্রিশ হাজার গোলা এবং ইহার উপযুক্ত পরিমাণ বারুদ, চৌদ্দ হাজার "হাওয়াই" আতসবাজী এবং বন্দুকের গুলি তৈয়ার করিবার জন্য ১৫০০ মান্ (প্রত্যেক মান্ প্রায় ৩½ সের; ৪০ সেরী মণ নয়*)

* ফার্সি "মান"কে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এবং আমি স্বয়ং এ যাবৎ ৪০ সেরী মণ বলিয়া ভুল করিয়া আসিয়াছি। বিভিন্ন বস্তুর মানের ওজন—যথা, সোনা ও লোহা বিভিন্ন ছিল।

সীসা বারুদখানায় জমা করা হইল। ইহা অবশ্য সরকারী কাগজপত্রের হিসাব; কিছু বাদসাদ দিয়া লইতে হইবে। সেকালে শক্ত পাথর গোল করিয়া কাটিয়া গোলা তৈয়ার হইত; শুধু বড় বড় কামানে লোহার গোলা ব্যবহৃত হইত। তাঁহার এক দারোগা আসিয়া বলিল, "হুজুর! লাহোর হইতে খামকা কান্দাহারে পাথরের গোলা বোঝা করিয়া লইয়া ফায়দা কি? ঐখানে বিস্তর শক্ত পাথর পাওয়া যায়। মিস্ত্রিরা সেখানে বসিয়া গোলা তৈয়ারী করিলে মেহনত কম হইবে। দারাকে চাটুকার ঠকবাজ কর্ম্মচারীরা যাহা বুঝাইত তাহাতেই সায় দেওয়া ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তাহাদের দ্বারাই এই ভাবে তাঁহার সব কাজ পণ্ড হইত। এক্ষেত্রে তাহাই হইল। তোপের ঠিক মত গোলা সঙ্গে না লইলেও শাহজাদা ৬০০০ বাঁশ পূর্ব্বেই মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; প্রত্যেকটি বাঁশ দশ গজ (৪২ আঙুলে এক গজ) লম্বা ছিল। দেওয়াল চড়াও করিবার সময় অনেক বাঁশের মই দরকার হইবে, এই জন্য বাঁশের ব্যবস্থা।

সরকারী দপ্তরের হিসাবে কান্দাহার-অভিযানের মন্সবদারী ফৌজ ৭০,০০০ সওয়ার ও ১৭০টি হাতী ছিল। প্রকৃত পক্ষে এই সওয়ারের অন্ততঃ তিন ভাগের এক ভাগ ছিল পায়দল সিপাহী। স্বয়ং শাহজাদা (ত্রিশ হাজারী মন্সবদার) এবং ১১০ জন মুসলমান ও ৫৮ জন রাজপুত মনসবদারের সওয়ার একত্র করিয়া এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। পাঁচ-হাজারী হইতে পাঁচ-শতী মন্সবদারকেই শুধু এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই সমস্ত মন্সবদারী ফৌজ ব্যতীত হুজুর রিসালার পাঁচ হাজার বন্দুকধারী ও তিন হাজার তীরন্দাজ অশ্বারোহী আহদী সৈন্য, খাস তৈনাতী পদাতিক বাহিনীর দশ হাজার বন্দুকধারী বরকন্দাজ সিপাহী এবং বাদশাহী পিলখানার ষাটটি হাতী বাদ্‌শাহের হুকুমে এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য লাহোরে পৌঁছিল। পথঘাট মেরামত, বনজঙ্গল পরিষ্কার ও আশ্রয়-পরিখা খননের জন্য ৬০০০ বেলদার, পাঁচ হাজার পাথর-কাটা মিস্ত্রী ও পাঁচ হাজার ভিস্তি কান্দাহার যাইবার জন্য ভর্ত্তি করা হইল।

এই সমস্ত লোকের রসদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা শাহজাদা যথোপযুক্ত ভাবেই করিয়াছিলেন। আধুনিক সমর-বিভাগের কমিসারিয়েট্ বাদশাহী আমলে ছিল না। এখনকার দিনে ফৌজী ঠিকাদারেরা রসদ জোগায়; টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হয়। সরকার প্রত্যেক সিপাহীর বেতন হইতে ছয়-সাত টাকা নির্দ্দিষ্ট নিরিখে কাটিয়া রাখেন। প্রত্যেক কোম্পানী ও রিসালার সঙ্গে-সঙ্গে পাচক, ধোপা ইত্যাদি থাকে। মাথাপিছু রসদ সরকারী ভাণ্ডার হইতে মাপিয়া দেওয়া হয়। খাওয়া এমন কি দাড়ি কামাইবার কোন ভাবনাও সিপাহীর থাকে না; ঘোড়া, খচ্চর এবং বলদের খোরাক ও খেদমৎ সরকারী লোকেরাই করিয়া থাকে। সেকালে ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম। সিপাহীরা সকলেই আপ্-খোরাকী; কাপড় পোষাক হাতিয়ার (বন্দুক গোলাগুলি বাদ) ঘোড়া জিন লাগাম সবই সিপাহীর। নিজের ও ঘোড়ার খোরাকের বন্দোবস্ত প্রত্যেককেই করিতে হইত। তবে সরকারী তরফ হইতে এই ব্যবস্থা করা হইত যে, সিপাহীরা যেখানেই থাকুক ন্যায্য দামে উর্দ্দু-বাজার হইতে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ঘাস-দানা প্রয়োজন-অনুসারে খরিদ করিতে পারে। শহরের প্রায় সকল রকম আরাম, খাদ্যদ্রব্য ও জিনিষপত্র স্বাভাবিক অবস্থায় সফর ও লড়াইয়ের ছাউনীতে পাওয়া যাইত। যে যাহার ভড্ডু চড়াইয়া খিচুড়ি পাক করিয়া কিংবা রুটি সেঁকিয়া লইত। লোটা কম্বল বদনা পিঠে কিংবা জিনের পিছনে বাঁধিয়া পথ চলিত। পাকের সুবিধা না হইলে হয়ত ইংরেজের কনোজিয়া সিপাহীর মত চানা চিবাইয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত।

সে-যুগে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র "বন্জারা" (বণিজ্‌য়ারা) নামক এক জাতির লোক ছিল, তাহারা যুদ্ধের সময় উর্দ্দু-বাজারে এবং শহর ইত্যাদিতে সর্ব্বদা খাদ্যশস্য জোগাইত। দলবদ্ধভাবে বন্জারাগণ বলদ কিংবা খচ্চরের পিঠে যব গম ডাল চালের থলি বোঝাই করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত; স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এক-এক দলে হাজার দুই হাজার ব্যবসায়ী, আট-দশ হাজার বলদ ও খচ্চর থাকিত। তাহাদের সঙ্গে ভীষণ প্রকৃতির কুকুর ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। মহারাষ্ট্র ও উত্তর-ভারতে ইহারা এখন ছোটখাট ব্যবসা চালাইয়া

থাকে। ইহাদের অগম্য কোন স্থান ছিল না। যুদ্ধাদিতে খাদ্য-সরবরাহের ঠিকাদারী ইহারাই লইত; এবং এজন্য সরকার হইতে টাকা দাদন লইত। শাহজাদা দারা শুকো লাহোরের বনজারাদিগকে এই অভিযানে খাদ্যদ্রব্য জোগাইবার ভার দিলেন; বনজারা চৌধুরীদের পরিবারবর্গকে জামিন-স্বরূপ শহরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইত।

শাহজাদা দারার যুদ্ধায়োজনে একটু রকমারি ছিল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হয়ত ধারণা ছিল এই সব সিপাহী তোপ গোলা বারুদ কিছুই দরকার হইবে না; হয়ত ফকিরেরা যে-রকম বলিয়াছে কান্দাহার পৌঁছিবা মাত্রই শুনিবেন ইরাণের শাহ্ দ্বিতীয়-আব্বাস মরিয়া গিয়াছে এবং সাত দিনের মধ্যেই কান্দাহার খালি করিয়া ইরাণীরা পলাইয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পুরুষকারের অবলম্বন মাত্র; কিন্তু আসলে দৈবই শ্রেয়। আওরংজেবের পুরুষকার যেখানে দুই বার ব্যর্থ হইয়াছে, দুই বার দিল্লীর ফৌজ ও তোপখানা যেখানে হার মানিয়াছে, সেখানে তোপের ভরসায় বসিয়া থাকা চলে না। এজন্য তিনি জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইলেন। সন্ন্যাসীর নাম ইন্দ্রগীর গোঁসাই; মন্ত্রের জোরে চল্লিশটি "দেও" তাঁহার হুকুম তামিল করে। ইন্দ্রগীর শাহজাদাকে বলিয়াছিলেন, কান্দাহারে তোপের কোন দরকারই হইবে না। তিনি নিজের চোখেই দেখিবেন তাঁহার এই "দেও"গুলি রাতারাতি কান্দাহারের দেওয়াল খন্দকের ভিতর টানিয়া ফেলিয়া শাহী ফৌজের জন্য একেবারে সিধা সরকারী রাস্তা করিয়া দিয়াছে।

অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত কিছু দারা কোন দিন অবিশ্বাস করেন নাই। ইন্দ্রগীরের জন্য দুই বেলা ভোজন ও দৈনিক এক সুরাই মদ সরকারী রসদখানা হইতে বরাদ্দ হইল। কয়েক জন যাদুকরও ফৌজের সঙ্গে কান্দাহার চলিল। ইহারা বলিয়াছিল, কান্দাহারে ইরাণীরা যে-সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জমা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের তুকতাকের জোরে ঐগুলিতে পোকা কিলবিল করিবে; কম-বখ্ত ইরাণীরা না খাইয়া মরিবে। গুণী জ্ঞানী মোল্লা ও কোরাণ-শরীফের উপরও দারার বিশ্বাস ছিল অসীম। খোদার ফজল ছাড়া মানুষের কাজ হাসিল হয় না, এজন্য শাহজাদা ব্যবস্থা করিলেন এক দল মোল্লা দোয়া-দরুদ পড়িতে পড়িতে শাহী ফৌজের সহিত কান্দাহার যাইবে এবং সেখানে নিত্য-স্বস্ত্যয়ন করিবে। যেমন প্রভু তেমনই ভৃত্য; শাহজাদার তোপখানার মীর-আতশ জাফরও চুপি চুপি এই ভরসায় এক জন বামমার্গী ফকীর সঙ্গে লইল—যেন যাদুর সাহায্যে সেও সকলের সেরা বাহাদুরি দেখাইয়া সাত-হাজারী মনসবদার হইতে পারে।

এক জন সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এক দিন লাহোরে শাহজাদার মাথায় খেয়াল চাপিল তিনি নকল কান্দাহার-দুর্গ অধিকারের কৃত্রিম অভিনয় দেখিবেন। কান্দাহার-দুর্গের নক্‌শানুযায়ী লাহোরের বাহিরে এক নকল গড় নির্ম্মিত হইল। নকল-দুর্গের ভিতর গারদী সিপাহী কিংবা কামান ইত্যাদি কিছুই বসান হইল না। এই দুর্গের বাহিরে দুইটি কামানের মোর্চ্চা (battery) খাড়া করা হইল; এক মোর্চ্চা হইতে হিন্দুস্থানী এবং অন্যটি হইতে ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণ তোপ দাগিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিবে; ঢুকিবার রাস্তা হওয়ামাত্র এক পল্টন সিপাহী দুর্গ হাতাহাতি চড়াও করিয়া দখল করিবে। কান্দাহার-দুর্গ কি ভাবে আক্রমণ করা হইবে শাহজাদা ফিরিঙ্গী এঞ্জিনিয়ারগণকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের কাছে নাকি কতকগুলি কেতাব ছিল। ঐগুলিতে যত রকম দুর্গ মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিতে তৈয়ারী করা সম্ভব সবগুলির নক্‌শা আঁকা ছিল এবং কোন্ রকম দুর্গ অধিকার করিতে হইলে কি উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে সবই লেখা ছিল। ফিরিঙ্গীরা ঐ সমস্ত নক্‌শা দেখাইয়া শাহজাদাকে আক্রমণ-কৌশল হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিবার জন্য শাহজাদা ময়দানে উপস্থিত হইলেন। অবরোধ-কার্য্য ও তোপ দাগা আরম্ভ হইল; কয়েক ঘড়ীর মধ্যেই হাতাহাতি হামলা ও কিল্লা ফতে সবই শেষ। তিনি হিন্দুস্থানীদের তোপের মোর্চ্চার চেয়ে ফিরিঙ্গীদের তোপের মোর্চ্চা ভাল বলিয়া তাহাদিগকে খুব প্রশংসা করিলেন। কথাটা সত্য হইলে খোলাখুলি বলা সেনাপতির পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইল না। এই উপলক্ষে শাহজাদাকে মনসবদারগণ যথারীতি মোবারক-

বাদ জানাইল এবং এই নকল কান্দাহার-বিজয়ের আক্ষরিক তারিখও (chronogram) পুরাদস্তুর উদ্ভাবিত হইল— ফতে আওয়াল-ই- দারা শুকো—অর্থাৎ দারা শুকোর প্রথম বিজয়! ছেলেমানুষী আর কাহাকে বলে?

এই ভাবে উদ্যোগ-পর্ব্ব শেষ হইল। দারার নিজ তাবিনের সিপাহী ও সর্দ্দারগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ততোধিক ছিল তাহাদের বাগাড়ম্বর। কোন দিন লড়াইয়ে মশা-মাছি না মারিলেও তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল তাহারা এক-এক জন এই জমানার রুস্তম আফ্রাসিয়াব্। যাঁহারা আজীবন লড়াই করিয়া চুল পাকাইয়াছেন, তাঁহারাও শাহজাদার তালপাতার সিপাহী ও নিধিরাম সর্দ্দারদের দাপটে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, শাহজাদা যদি কোন গতিকে এবার কান্দাহার ফতে করিতে পারেন তাহা হইলে ডিমের খোলস হইতে সদ্যোনির্গত এই মুরগীর বাচ্চাগুলিই তাঁহাদের দাড়ি ঠোক্‌রাইবে। যাহা হউক, এবার যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত গণনার ধুম পড়িয়া গেল। হজরত রসুলাল্লা মুসলমানদিগকে যোগিনী-দিক্‌শূল মঘা-অশ্লেষার পা-বন্দী হইতে আজাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু খলিফা মনসুরের সময় হইতে এগুলি আবার মুসলমানদিগকে পাইয়া বসিল। দারার পিতামহ জাহাঙ্গীর লিখিয়া গিয়াছেন—জীবনে একবার মাত্র তিনি ফলিত-জ্যোতিষ বিচার না করিয়া পা ফেলিয়াছিলেন। সে-বারের ফল অশুভ না হইলেও তিনি দ্বিতীয় বার ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করেন নাই। গোঁড়া মুসলমান হইলেও শাহজাহান এ বিষয়ে আরও সাবধানী ছিলেন। কোন মুহূর্ত্ত-বিচারে হিন্দু জ্যোতিষী ও ইউনানী নজুমী সম্পূর্ণ একমত না হইলে বাদশাহ মুহূর্ত্ত বা "ছায়াত্" কবুল করিতেন না। দারা লাহোর হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন দৈবজ্ঞেরা ১১ই ফেব্রুয়ারি যাত্রা এবং ২৫শে এপ্রিল কান্দাহার-অবরোধের দিন ধার্য্য করিয়াছে। সম্রাট্ উক্ত বিচার অনুমোদন করিয়া শাহজাদাকে রোখসতের ফরমান্ পাঠাইলেন। এই উপলক্ষে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের হাতী, ঘোড়া, জহরত ও হাতিয়ার শাহজাদা বাদশার তরফ হইতে খেলাত-স্বরূপ পাইয়া অনুগৃহীত হইলেন। মনসবদারগণের খেলাত ও রাহা-খরচ এবং সিপাহীদিগকে অগ্রিম বেতন ও বকশিশ ইত্যাদির বাবদ আরও বিশ লক্ষ টাকা যাত্রার পূর্ব্বেই খরচ হইল। অধিকন্তু ফৌজী তহবিলে নগদ এক লাখ আসরফী ও এক কোটি টাকা শাহজাদার সঙ্গে লওয়ার জন্য মঞ্জুর হইল। সম্রাট্ হুকুম দিলেন শাহী ফৌজ এবার মুলতান হইয়া থল-চোটিয়ালীর পথে অগ্রসর হইবে; এ রাস্তায় রসদ-সংগ্রহের সুবিধা বেশী। এ রাস্তা দিয়া আওরংজেব দ্বিতীয় বার কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই রাস্তায় কান্দাহার হইতে ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লার সেনাপতি নাদির খাঁ (পরে যিনি নাদির শাহ হইয়াছিলেন) এই পথে সীমান্ত অতিক্রম পূর্ব্বক তৃতীয় আফগান-যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। এখনও এই বিজয়ের বাৎসরিক উৎসবে ইংরেজ-প্রতিনিধি কাবুলের রাজপতাকায় দেখিতে পান পোষা কুকুরের মত সিংহের গলায় শিকল লাগাইয়া এক জন কাবুলী সদম্ভে উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি দিবা তিন প্রহর (? ঘড়ী) গতে শাহজাদা দারা লাহোর ত্যাগ করিয়া শহরের বাহিরে তাঁবুতে পদার্পণ করিলেন। দুই দিন পরে দারা-চালিত বিরাট্ বাহিনী সঞ্চরমানা দিল্লী নগরীর মত মুলতানের পথ ধরিয়া ধীর মন্থর গতিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল। ভারী তোপ গোলা লোহা-লক্কড় বোঝাই বড় বড় নৌকা রাবী নদী দিয়া সিন্ধু-তীরাভিমুখে ভাঁটি চলিল।*

* সেকালে লাহোর হইতে মুলতান হইয়া রোরী সক্কর পর্য্যন্ত যে বাদশাহী রাস্তা ছিল ভীম-কর্ম্মা পাঠান-সম্রাট্ শের শাহ্ উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রাস্তা কোন কোন স্থানে দিক-পরিবর্ত্তিত হইয়া আজও বিদ্যমান; আমিও এ রাস্তায় কিছু দূর চলিয়াছি। মণ্টোগোমারী জেলার ভিতর দিয়া ইহার যে অংশ গিয়াছে স্থানীয় লোকেরা উহাকে "কাকা-ওয়ালী সড়ক্" বলে। শের শাহ্‌র আমল হইতে সরকারী হুকুম ছিল রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামের বাসিন্দাগণ এই রাস্তার উপর "কাক" বা নল-খাগড়ার আটি বিছাইয়া রাখিবে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে এ রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়া, সিপাহী চলা অসম্ভব হইত। এই সরকারী রাস্তার "পরাও" বা বিশ্রাম-মঞ্জিলগুলির নাম পাঠক সর্ যদুনাথ সরকারের *India of Aurangzib* পুস্তকে পাইবেন।

শাহী ফৌজ ২৩শে এপ্রিল "পঞ্জমুন্দ্রা" গিরিসঙ্কট পার হইয়া ২৫শে এপ্রিল কান্দাহার হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে "মরদ্-ই-কিলা" নামক স্থানে উপস্থিত হইল। রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ অগ্রগামী সৈন্যদলসহ ইতিপূর্ব্বেই কান্দাহার পৌঁছিয়াছিলেন, এবং উভয় পক্ষে গোলাগুলিও চলিয়াছিল। যে তারিখ অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল দৈবজ্ঞেরা অবরোধ-কার্য্যারম্ভের দিন ধার্য্য করিয়াছিল, সে তারিখ গত হওয়ায় শাহজাদার মীর-আতশ ও ফৌজ বক্শী আবদুল্লা বেগ গোঁ ধরিল—আমাদের জন্য আর একটা শুভদিন চাই। এজন্য সৈন্যেরা পরের দিন কান্দাহার ঘেরাও না করিয়া পথে আরও দিন দুই দেরি করিল। কান্দাহারের দুর্গ-পরিখার কিছু দূরে সম্রাট্ হুমায়ুনের অকৃতজ্ঞ ভ্রাতা কামরান্ মীর্জ্জা এক সুবিস্তৃত মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেখানে শাহজাদার তাঁবু পড়িয়াছিল। তিনি বোধ হয় আর এক শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় অবরোধ-আরম্ভের সাত দিন পরে ৩রা কি ৪ঠা মে বাগ্-ই-কামরানে পৌঁছিলেন। ইহার পর কান্দাহারে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সমসাময়িক চাক্ষুষ ও সুবিস্তৃত বর্ণনা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

কলঙ্কিনী

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

মালিনীর স্বামী কি একটা কলঙ্ক দিয়া মালিনীকে ত্যাগ করিয়াছিল। সেই অবধি মালিনী পিতৃগৃহেই থাকে।

প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে কি কাজ করিতেন। স্বভাব অত্যন্ত নিরীহ। দেশে সামান্য বিষয়-আশয় আছে, কাশীতে বসিয়াই তদ্বির করিতেন। তাছাড়া সামান্য ছোট একখানা বাড়ীও এই কাশীতেই আছে; উপরের দোতলায় নিজেরাই থাকেন, নীচের তলাটা ভাড়া খাটে। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে আর চারটি মেয়ে। ছেলেটির সবে চাকরি হইয়াছে মির্জ্জাপুরে ক্যানাল অফিসে। ছেলে বিবাহিত। চারটি মেয়েই সুন্দরী—সাধারণে সুন্দরী বলিতে যা বোঝে। রংটা কটা, চোখগুলি ডাগর ডাগর, একমাথা চুল, ছোট্ট চিবুকটির উপর পাপড়ির মত এক জোড়া ঠোঁট। ব্যস, আবার কি। চারটিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এক রকম করিয়া।

মালিনী সবার ছোট, আবার মালিনীই সবার অধিক রূপবতী। রূপবতী বলিতে সত্যই যা বুঝায় তাই। সবার চক্ষের উপর সে যেন একটা বিস্ময়, কি রূপে, কি গুণে! প্রসন্নকুমারের সবার অধিক আদরিণী এই মালিনী। মা সরযূও এই কোলপোছা মেয়েটিকেই ভাল বাসিতেন সবার বেশী। ভালবাসা পাওয়া যেন মালিনীর একটা সহজ দাবি ছিল। তাহার রূপের জৌলসে, তাহার গুণের দক্ষতায় তাহাকে ভালবাসিত না এমন জনটি নাই।

এই মালিনীর বিবাহের দিনেই কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল অদ্ভুত। এমন কাণ্ড কাশীতে কেহ বড়-একটা দেখে নাই।

ছাই ফেলিতে যাইতে হয় রাস্তা ডিঙাইয়া। মালিনী রাস্তার এদিক-ওদিক চাহিয়া ষাঁড়ের ভয় হইতে সাবধান হইয়া একছুটে জঞ্জালখানাটায় ছাই ফেলিয়া ফিরিবে। চাহিয়া দেখে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া সুন্দর সুঠাম যুবক, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মালিনীর মন গর্ব্বে ও পুলকে দোল খাইয়া উঠে। বন্দনার দৃষ্টি দেবতা যেমন সহজেই চিনিয়া লন তেমনি এই যুবকটির দৃষ্টি মালিনী চিনিল।

বৈকালেই একটি বিধবা আসিলেন মেয়ের সম্বন্ধ

করিতে। পাত্র ভাল। রাজশাহীতে বাড়ী। রাজশাহী শহরের উপর তিনখানা বাড়ী আছে। কলিকাতায় বি. এ. পড়ে। কেহ নাই। বছর-তিনেক হইল বাপ-মা মারা গিয়াছেন। এক কাকা আছেন। তবে নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয় তদারক করিতে গিয়া বিঘা কতক আবাদী জমী যেদিন তলাইয়া গেল রাশি রাশি হিসাবের সমুদ্রে, সেই দিন হইতেই খুড়া-ভাইপোর মুখদেখাদেখি বন্ধ। ভাইপো আর কাছারি করে নাই। লোকে উপদেশ দিতে আসিলে বলিয়াছে, "কাকার লজ্জা না থাক্ আমার আছে। আমি পারব না ওঁকে হলফ করিয়ে মিথ্যে বলাতে।" তাহার পর নাবালক সাবালক হইয়া ভার যেদিন পাইল, সেদিন সম্পত্তির অনেকটাই কম। তাই কাকার ঠিকানা বিশেষ কাজের হইবে না। তবু পাত্রের খোঁজখবরের জন্য দু-চারটি ঠিকানা পাওয়া গেল।

প্রসন্নকুমারের আনন্দের সীমা নাই—মালিনী এমন পাত্রে পড়িবে! হে বাবা বিশ্বনাথ, এমন করিয়া চোখ তুলিয়া তুমি কি চাহিবে?

সরযূ বলিলেন, "হাঁ গো, মেয়ে দেখতে আসবে কবে?"

প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ে তার দেখা। ছেলে নিজেই দেখেছে।"

বিস্মিতা সরযূ প্রশ্ন করিলেন, "কেমন ক'রে দেখলে সে?"

"ও ছাই ফেলতে গিয়েছিল, পথে দেখেছে। যিনি এসেছিলেন তিনি ওর দেশের সম্পর্কে মাসী হন। ওঁর বাড়ীতেই থাকে। কাশীতে এসেছিল বেড়াতে। কাশ্মীর গিয়েছিল, এ-পথে সব দেখতে দেখতে যাচ্ছে।"

কর্ত্তা ও গৃহিণীতে এই মালিনীকে লইয়া কত কথাই হয় দিনে রাত্রে—প্রিয়তমা কন্যাটির বিবাহ হইবে এমন সুপাত্রে! পিতামাতা যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠেন।

ওদিকে মালিনীর মনে স্বপ্ন ঘনাইয়া উঠে। দিবসে নিশীথে তাহার মনের দুয়ার জুড়িয়া দিব্য নয়নে চাহিয়া আছে সেই আয়ত সহাস্য দুইটি চক্ষু। সে চক্ষু কি ভুলিবার! সেই প্রভাতের প্রথম বিস্ময়, সেই অনিন্দ্যকান্তি দেহ, সেই প্রশংসামুখর ভঙ্গীর কথা স্মরণ করিয়া মালিনী আকাশের দিকে চাহিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিতে থাকে।

বিবাহের আয়োজন সবই স্থির। প্রসন্নর তিন কন্যা আসিয়াছে। বড় চন্দ্রিকার বিবাহ কাশীতেই হইয়াছে। স্বামীর ষ্টেশনারী দোকান আছে। মেজ কৌমুদীর বিবাহ হইয়াছে কানপুরে। তাহার স্বামী মিলের ক্লার্ক। সেজ জ্যোৎস্না, বিধবা, তাহার একটি ছেলে একটি মেয়ে;—বিবাহ হইয়াছিল কলিকাতায়, স্বামী পাটের দালালি করিত। মেয়েদের সকলেই মালিনীর সৌভাগ্য দেখিয়া বিস্মিত। আনন্দ তাহাদেরও হয়ত হইয়াছিল, তবে নিজেদের অনাবশ্যক ভাবে ছোট মনে হইতেছিল বলিয়া মনের কোণে কোথায় যেন একটু অস্বস্তির লঘু মেঘ লাগিয়া ছিল।

ভ্রাতৃবধূ বাসন্তী বলিল, "ছোটঠাকুরঝি আর হয়ত কথাই কবে না আমাদের সঙ্গে।"

মালিনী এই ধরণের কথা এই কয় দিনে এত শুনিয়াছে যে, এখন আর তাহার এ-সব ভাল লাগে না। সে ঈষৎ উষ্মার ভাবটা গোপন রাখিয়া বলে, "কেন ভাই তোমরা সবাই মিলে ক'দিন ধরে আমায় ঐ কথা নিয়ে জ্বালাতন করছ? আর কি তোমাদের কথা নেই?"

জ্যোৎস্না বাসন্তীকে বলিল, "কেন ভাই ওকে আর ঠাট্টা করিস? আমাদের ঠাট্টা শোনার মত মেজাজ এখন ওর আছে?"

মালিনী বলিল, "ভাগ ক'রে দেবার জিনিষ নয় যে ভাগ ক'রে দিই। ফেলে দেবার জিনিষ নয় যে বলি 'থাক গে চাই না আমি।'"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চন্দ্রিকা বলিল, "ওমা! সে কি কথা! ফেলে দিবি কি লো! বর, তায় নূতন বর!"

নানা কথার স্রোত ঠেলিয়া, মান-অভিমানের শত ঘূর্ণিপাককে অতিক্রম করিয়া দিনটি যেদিন পৌঁছিল, মাঙ্গলিকীর বিজয়তিলকে ললাট পবিত্র করিয়া সেদিনকার হাস্যোজ্জ্বলতার মধ্যে সকলেই ছিল প্রসন্ন—অভ্যাগতদের যাতায়াত, ময়রার হিসাবের গোলমাল, বাজার করার গোল, ভিয়ানে রসুইকরদের কলরব,—শানাইয়ের শব্দে প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ইটপাটকেলগুলি যেন সব একসঙ্গে হৈ হৈ করিয়া উঠিল।

আজিকার এই বিরাট্ আয়োজনের মূল প্রতিমা সে নিজে। তাহার সান্নিধ্য আজ বহু নারীর প্রেয় বস্তু—সখীবৃন্দের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত মালিনীর সহিত তাহার সখ্যটাই নিকটতম ও নিবিড়তম। মালিনী উপবাস করিয়া থাকিবে। মা বলিতেছেন দুধ-জল খাইতে, গঙ্গাজলে নাকি দোষ নাই। কিন্তু দোষগুণ মালিনী জানে না। সে জানে সেই অপরূপ দুটি চোখে অপলক সেই দৃষ্টি। তাহাকে আজ সে মন্ত্রের মধ্য দিয়া বরণ করিয়া লইবে। উপবাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া সে সকল দৈব আচার নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। আজিকার এই পুণ্যবাসরে তাহার কুমারী-জীবন সার্থক হইবে। সে জলস্পর্শও করিবে না, সে উপবাস, একেবারে উপবাস করিবে।

সরযূ যখন জেদ করিয়া বলিলেন, "আমি বলছি মা, গঙ্গাজলে দুধে কোন দোষ নেই। চোপর দিন ঠায় উপোস দিলে পিত্তি পড়ে আবার একখানা হবে।"

তখন মালিনী হাসিয়া বলিল, "কি একখানা হবে মা? তোমার তো সারাদিনে এক ফোঁটা জল গলায় যাবে না। তুমি মেয়ের মা ব'লে তোমায় খেতে নেই—অথচ গঙ্গাজল তোমার বেলায় কাজ দেবে না তোমার পেটে বুঝি পড়বার মত পিত্তি নেই মা?"

চোখভরা জল লইয়া সরযূ বলিলেন, "আমি আর তুই? খাবি নে তো?"

সরযূ চলিয়া গেলেন।

বোনেরা ঠাট্টা করিতে লাগিল, "ও বরকে বেশী করে পাবে ব'লে এত নিয়ম-নিষ্ঠে।"

চিবুকে হাত দিয়া বাসন্তী বলিল, "বলি এ যে একেবারে তপস্যার বর গো!"

হাসি, ঠাট্টা, রঙ্গ,—সব তাতেই! এদের যেন আজ সব কি হইয়াছে।

অপরাহ্ণ বেলায় সতরঞ্চি, গ্যাস, মালা ইত্যাদির জন্য হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়িয়া গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক প্রসন্নর পুত্র বিরাম নিজে। উহাদেরই মধ্যে যাহারা আবার একটু বড় তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছে, "ও বিরাম, শুনছ? মস্‌নন্দ এসেছে? বর বসবে কিসে?"

"আনতে গেছে রায়-কাকার বাড়ী।"

"রায়-কাকার বাড়ী মস্‌নন্দ আছে নাকি?"

"না, সেই ভাল কার্পেটখানা আর শাদা মোটা তাকিয়া গোটা-চারেক দিয়ে দেব।"

"দূর পাগলা। এই চিঠি লিখে দিচ্ছি। কবুতর-বাজারের সেই দোকানটায় যা। চিঠিতেই কাজ হবে। অমনি দুটো সেজের কথা—আর কি?—এই বেলা বল্—"

"ফুলদান আছে?—নেই?—আচ্ছা, আর আতরদান গোলাপ-পাশ্—আছে? বেশ! তবে এই মস্‌নন্দ পুরো, তাকিয়া সমেত, সেজ এক জোড়া আর ফুলদান এক জোড়া। একটা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দে। ঝপ্ করে এসে পড়বে।"

গোলমালে বাড়ী সরগরম। পিয়ন চিঠি দিয়া গেল বৈকালের ডাকে।

প্রসন্ন চিঠি খুলিতে খুলিতে হঠাৎ ডাকিলেন, "বিরাম, এদিকে শোন্।'

পিতার কণ্ঠস্বরে মুখের পানে চাহিয়া বিরাম বলিল, "কি হয়েছে বাবা?"

হাতের চিঠিখানি পুত্রের দিকে বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্ন বলিলেন, "পড়ে শিগ্‌গির দেখ। আমায় ধর, আমি বসতে পাচ্ছি না। শরীর কেমন করছে।"

বিরাম পড়িয়া অবাক্! সর্ব্বনাশ, এখন উপায়?

প্রসন্ন বলিলেন, "উপায়?"

বিরাম বলিল, "আগে সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করা ভাল, হাজার হ'লেও চিঠি।" সন্তোষ পাত্রের নাম।

দুই জনে সন্তোষের বাড়ী দৌড়িয়া গেল।

সন্তোষ বলিল, "আপনারা বিশ্বাস করুন এ একেবারে মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা। আমার পিতামাতার আমি একমাত্র সন্তান। আমার কোন বোন ছিল না। এ আমার কাকার কারসাজি। আপনারা এ বিষয়ে ব্যস্ত হবেন না। আমার পানে চেয়ে দেখুন। সহজেই বুঝতে পারবেন মিথ্যা আমি বলি না। আমায় বিশ্বাস ক'রে কেউ কোন দিন ঠকে নি।"

বিরাম বলিল, "সব বুঝলাম ভাই। কিন্তু বিপদ কি জান? তোমায় আমরা কেউই ভাল ক'রে জানি না।

কাশীতে তোমার কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আত্মীয় নেই, যার কাছ থেকে তোমার সঠিক খবর আমরা পাব। তোমার দেওয়া ঠিকানায় পত্র দেওয়া হয়েছে, সন্তোষজনক উত্তরও আমরা পেয়েছি। কিন্তু বিবাহ-বাসরে তাঁদের যে দু-এক জন উপস্থিত থাকবেন ব'লে তুমি কথা দিয়েছিলে তাঁরা কেউ আসেন নি। তবুও যে আমরা এ বিবাহ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম সে কেবল তোমার জন্যেই ভাই। কিন্তু এর পরে এই ধরণের পত্র পেলে কি ক'রে আমরা এগোই বল তো ?"

অত্যন্ত কাতর স্বরে সন্তোষ বলিল, "কিন্তু আমিই বা কি করিব লুন তো ? আমার কথা মিথ্যা হ'লে সে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য আমি সব আয়োজন ক'রে রাখতাম। কিন্তু যা সত্য সে সম্বন্ধে কোন বিপৎপাত হ'তে পারে এ আশঙ্কা আমি করতে পারি নি। সত্যকে সত্য প্রমাণ করার মত কি ব্যবস্থা আমি এখন করতে পারি বলুন তো ?"

প্রসন্ন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমার আজ কি বিপদ ভাব তো। আজ মেয়ের বিবাহ আমায় দিতেই হবে। অথচ এই চিঠির পরেও তোমার হাতে বিবাহ দেওয়ার মানে আমায় সমাজচ্যুত হওয়া। আমার কি বিপদ বল তো ?"

সন্তোষ বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। বিরাম পিতার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিল, "আমি আর অপেক্ষা করব না। বাবাকে নিয়ে আমি চললাম। জ্যেঠামশাই, জামাইবাবু আর পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে আমরা পরামর্শ করছি। আমাদের বিপদ আজ সবার বড়, ভাই। সে তো তুমি বুঝছ। যদি তোমার কাছে কোন উপায় থাকে তুমি তা নিয়ে এস। আমরা তোমার অপেক্ষা করব।"

বিরাম তাহার পিতাকে লইয়া নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই পণ্ডিত মহাশয়, চন্দ্রিকার স্বামী, বিশ্বম্ভরনাথ ও প্রসন্নর অগ্রজপ্রতিম বন্ধু অনাদি মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া পাঠাইল। সময় অল্প, সমস্যা গুরুতর। বিরাম ভাবিয়া পাইতেছিল না কি করা যায়। প্রসন্ন নিজে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মালিনী তাঁহার বড় সাধের মেয়ে। উপযুক্ত পাত্র পাইয়া উল্লাসে তিনি যেমন নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছিলেন, তেমনই এই নিতান্ত অসম্ভাব্য ভবিতব্যের হাতে পড়িয়া তাঁহার অন্তর-বাহির অপ্রকাশ্য যাতনায় নিষ্পীড়িত হইতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয়, বিশ্বম্ভরনাথ, অনাদি মুখোপাধ্যায় ও প্রসন্ন—কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই এই আকস্মিক বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ই অবশেষে ম্লানমুখে কহিলেন, "প্রসন্ন, এ বিবাহ অসম্ভব। তোমায় আজ লগ্নের পূর্ব্বেই অন্য পাত্র সন্ধান করতে হবে!"

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সকলেই চাহিয়া রহিল, শুধু প্রসন্নর জরাকুটিল গণ্ড প্লাবিত করিয়া নীরব অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিশ্বম্ভরনাথ বলিল, "কেন পণ্ডিত মশাই এ বিবাহ অসম্ভব, পাত্রের কি দোষ ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "পাত্রের কোন দোষ নেই সত্য, কিন্তু তার ভগ্নী যদি সত্যই কুলত্যাগিনী হয়ে থাকে তবে সে সমাজে পতিত। তোমরা যদি সমাজে পতিতের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চাও, আমার কিছু আপত্তি নেই। শুধু আমি সে-বিবাহে মন্ত্র পড়াব না।"

সন্তোষ ম্লানমুখে আসিয়া পৌঁছিল। সে একাকী আসিয়াছিল; অতিসাধারণের ন্যায় তাহার উপস্থিতিতে সকলেই যেন একটু কুণ্ঠায় ভরিয়া গেল। কুণ্ঠার কোনও কারণ নাই—এই মহাবিপ্লবের মূল সে-ই—সে-ই দোষী এবং ইহারাই বিচারক। তথাপি ইহার মুখের পানে চাহিলে প্রত্যেকেই বোঝে যে ইহার মধ্যে কোথাও শঠতা বা ক্রূর অভিসন্ধি নাই, এ ব্যক্তিটি সকল হীনতার ঊর্দ্ধে। আপনার বিমলত্বের বাষ্পে লঘুত্ব লাভ করিয়া এই ব্যক্তিটি অন্যায়ের ভার হইতে বহু উচ্চে বিচরণ করে।

সে শুধু বলিল, "আপনারা কি স্থির করলেন ?"

পণ্ডিত মহাশয়ই কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "তুমি কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছ কি ?"

সন্তোষ বলিল, "আমি বিদেশী, আপনারা জানেন আমি কয়েক দিনের অবকাশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। বিবাহ করবার কোন ইচ্ছে ছিল না। সহসা

এ-কল্যাণীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আমার গৃহলক্ষ্মী করবার বাসনা হ'ল। অভদ্র বা অসৌম্য ভাবে কোন ব্যবহার না ক'রে আমি আমার মাসীমার সাহায্যে উপযুক্ত প্রথায় এই বিবাহে অগ্রসর হই। নইলে আমারও এমন বন্ধু ও আত্মীয় আছেন যাঁদের বাদ দিয়ে কোনও প্রকার উৎসব করাই আমি অসম্পূর্ণ বোধ করি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সময় এত অল্প ও ঘটনা এমন যে আমি অন্য কোনও প্রমাণ পাচ্ছি নে। আমি শুধু এই বলতে পারি যে আমার কোন বোন নেই। এই ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

পণ্ডিত মহাশয় এই যুবকটির কথাবার্ত্তায় একটি সবল মনের উদার পরিচয় লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপরে গুরুভার ন্যস্ত। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "এ মিথ্যা ব'লে আমারও মনে হয়। কিন্তু বাবা রাগ ক'রো না, এ স্থান কাশী, তুমিও বিদেশী,—এখানে এই জাতীয় ব্যাপার এত ঘটে যে তোমায় বিনা-প্রমাণে বিশ্বাস করা আমাদের অত্যন্ত অন্যায় হবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি আমরাও ভেবে উঠতে পারছি নে।"

বাতাসের নাকি কান আছে। গোপন করিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কথাটা কি ভাবে সরযূর কানে গিয়াছে, কথা গিয়াছে তিন বোনের কানে, কথা গিয়াছে বৌদিদি বাসন্তীর কানে—আর কথা গিয়াছে মালিনীর কানে। আর কাহারও কথা বলিব না, শুধু মালিনীর কথাটাই বলি।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মালিনীকে কে যেন কনে-চন্দন পরাইয়া দিতেছিল। শাড়ী পরা তখনও হয় নাই। সকালে গায়ে-হলুদের পর অধিবাসের লালপাড় শাড়ীখানিই পরনে ছিল। গায়ে মাত্র একটা সেমিজ। এদিকে অন্যান্য প্রসাধন প্রায় সবই শেষ—লাল ও জরি দুই প্রকার ফিতা জড়াইয়া প্রকাণ্ড একটা খোঁপা বাঁধা হইয়াছে। মাথায় গুঁজিয়া রাখা রূপার কাজললতা। কপালে কুঙ্কুমের একটি ছোট টিপ ও শাদা চন্দনের তিলক। পান খায় নাই, উপবাসমলিন মুখখানির মধ্যে সংহত একটি আনন্দোজ্জলতায় ঢল ঢল, অথচ প্রার্থিত বিস্ময়ের সান্নিধ্যে সলজ্জ ত্রাসে চমকিত। সারা গায়ে নবনির্ম্মিত অলঙ্কার, লোকে দেখিয়া বলিয়াছে, "অনন্ত অনেকে পরে কিন্তু মানায় এমন কাকে? সোনার রং বেড়েছে না গায়ের রং বেড়েছে বলা দায়।" কানে দুটি গালে ঠেকে আর চিক্ চিক্ করিয়া উঠে। শাড়ী পরানো লইয়া মেয়েমহলে কথা উঠিয়াছিল, কে ভাল শাড়ী পরিতে জানে, সে-ই পরাইবে। আবার কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, "পরতে জানলেই পরানো যায় না বাছা। পরাবার কায়দা আবার আলাদা হয়।"

মালিনী ভাবিতেছিল শাড়ী সে নিজেই পরিবে। রবিবর্ম্মার গঙ্গাবতরণের ছবিতে পার্ব্বতী যেমন করিয়া শাড়ী পরিয়া আছে, ঠিক তেমনটি করিয়া। মাথায় শুধু ঘোমটা থাকিবে। শাড়ী হাতে লইয়া সে ভাবিতেছে এমন সময়ে সংবাদটা তাহার কানে গেল।

তাহার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু কথা বলিবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইয়াছে।

তাহার শুধু মনে হইতেছিল সে নিজে ছুটিয়া গিয়া ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিয়া আসে। কিন্তু আসন্ন বিবাহের ক্ষণে কুমারী-মনের উত্তেজনা তাহার সকল স্নায়ু-গ্রন্থিগুলিকে শিথিল করিয়া দিতেছে, সামাজিক লজ্জার প্রয়োজনীয়তা তাহাকে দেহ-মনে বাঁধিয়া রাখিতেছে।

মালিনী দেখিল, সরযূ অদূরে দাঁড়াইয়া বাসন্তীকে কি বলিয়া নামিয়া গেলেন। একটু পরেই অমন কোলাহল-মুখরিত আনন্দভবন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মালিনীর ভগ্নীরা সকলে কোথায় চলিয়া গেল, যে-ঘর মালিনীর বধূসজ্জায় অলঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল, সে-ঘর জনহীন হইয়া গেল—একাকিনী মালিনী অর্দ্ধ-সজ্জিতা অবস্থায় স্খলিত বসনাঞ্চল মুঠিতে চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারও ইচ্ছা হইতেছিল সেও নিজে ছুটিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বাসন্তীর সহিত দেখা।

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "কোথায় যাচ্ছ ছোট-ঠাকুরঝি?"

কি ভাবিয়া বাসন্তী মালিনীর মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। "কোথায় চলেছ এ অবস্থায় ?"

অর্দ্ধসমাপ্তপ্রসাধনা, নূতন অলঙ্কারে ভূষিতা, ক্ষৌমবাস-পরিহিতা, উপবাসম্লান মালিনী ত্রস্ত চক্ষে স্খলিত পদক্ষেপে চলিয়াছে।

"আমায় ছাড় বৌদি। আমি যাব"—ভিতরের সহস্র বেদনা ভাঙিয়া পড়িতে চায় তাহার কণ্ঠস্বরে।

"ক্ষেপলে নাকি ? কোথায় যাবে ?"

"ঐ ওখানে।"

"কোথায় ?"

স্থিরচক্ষে চাহিয়া মালিনী বলিল, "ঐ যে বাবা দাদা সবাই যেখানে আছেন। ঐ যে যেখানে আমার ভাগ্য গড়া হচ্ছে।" কাঁদিয়া ফেলিয়া বাসন্তী বলিল, "ছি ভাই ঠাকুরঝি ওখানে যে তোমার যেতে নেই ভাই।"

মালিনী কাঁদিল না, সে বলিল, "আমি জানি নে কি করতে আছে, কি করতে নেই। আমি যাবই। আমায় ধরে রাখিস্ নে তোর দুটি পায়ে পড়ি।" বাসন্তীর হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল।

সে-ঘরটা অন্ধকার। আবশ্যক-অনাবশ্যকের স্তূপ সে ঘরটায় জমা। ঘরটার একটা দুয়ার একটু ফাঁক করিলেই বৈঠকের সবটা চোখে পড়ে। এই অন্ধকারে সকলের অগোচরে আসিয়া দাঁড়াইল মালিনী।

চিকের আড়ালে সরযূ প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইয়া দূর হইতে সব দেখিতেছিল।

ছেলেটি তখন বলিতেছিল, "দেখুন, আমার এই অনাবশ্যক আগ্রহ যে কেন তা আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না। তবে আমার শুধু যে বোন নেই তা নয়, কিন্তু একটা কথা আমি বলি,—যদি আমার বোনই থাকে তবুও পত্রে তো লেখা আছে যে তিনি কুলত্যাগিনী। তাঁকে আমি আবার সামাজিক জীবনে স্থান দিয়েছি একথা তো নেই। তা যদি নেই তবে বিবাহিতা ভগ্নীর কুলত্যাগ নিয়ে আমি কি ক'রে দূষণীয় হ'তে পারি ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোমার সকল কথা আমি বুঝেছি। দেখ বাবা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কে শঠ আর কে ভদ্র সত্যবাদী তা বুঝতে পারি। আমি অন্তর থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করি। কারণ তোমার কথা আমি যতই শুনছি ততই আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান বিচলিত হচ্ছে। কিন্তু এই পত্রের পরেও যদি এ বিবাহ হ'তে দিই, তবে আমার ও প্রসন্নর উভয়তঃ বিশেষ ক্ষতি হ'তে পারে। সামাজিক জীবনে সে-ক্ষতি আমরা সহ্য করতে পারব না।"

সন্তোষ বলিল, "আপনাদের ক্ষতির দিকটাই শুধু দেখছেন ? সেই কল্যাণী কিশোরীটির সমগ্র জীবন-ব্যাপী যে ক্ষতি আজ আপনারা করবেন—"

ভেজানো দুয়ারটার পিছনে কিসের শব্দ শুনিতেই বিরাম ছুটিয়া গেল।

একটু পরেই বিরামের কণ্ঠ শোনা গেল, "মা—চন্দ্রা—কে আছিস্—একটু জল আর একটা আলো নিয়ে

জ্ঞান হইলে মালিনীর শুধু মনে হইল সন্তোষের সেই কথাগুলি···অল্পক্ষণেই সে বুঝিল বিবাহ স্থির হইয়াছে, পরবর্ত্তী লগ্নেই বিবাহ হইবে। আর কিছুই সে জানে নাই।

সন্তোষ বিফলমনোরথ হইয়া সেই রাত্রেই কাশী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দ্দেশ, সেই রাত্রেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। বিরাম শুধু বলিয়াছিল, "এ আপনাদের কি নির্দ্দেশ পণ্ডিত-মশাই ? বুঝলাম যে অপাত্র বিবেচনায় আপনারা এক জনকে ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সেই লগ্নেই কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে সমাজচ্যুত হ'তে হবে এ কোন্ নিষ্ঠুর নিয়ম ? এখন এ-রাত্রে পাত্র কোথায় পাই ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "নিয়ম মানেই নিষ্ঠুরতা বিরাম। প্রত্যেক নিয়ম সময়-বিশেষে ভয়ঙ্কর নির্ম্মম ব'লে বোধ হয়। কঠোরতা নিয়মের একটা আঙ্গিক ধর্ম্ম। তবে সমাজ তোমাদের নিয়ে। আমাদের নিয়ম সেই সমাজকে নিয়ে। যেদিন তোমাদের অন্তরের সত্যের বলে তোমরা অন্যায়ের শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে ধর্ম্ম ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করবে সেদিন সমাজ বদলাবে, সমাজ তার

নিয়ম বদলাবে, আমরা সেই নিয়মানুবর্ত্তী হব। যুগে যুগে সংস্কারক জন্মেছেন তোমাদের মধ্যে। আমরা চিরকাল পুরাতনকে ধরে থাকার জন্যেই রইলাম। হিন্দুসমাজ তোমাদের মুখ চেয়ে রয়েছে।"

বিরামের মুখ চাহিয়া হিন্দুসমাজ রহিয়াই গেল, কিন্তু মালিনীর বিবাহ বাকী রহিল না।

অনেক সন্ধান করিয়া দেখা গেল, নারদঘাটে থাকে পার্ব্বতী সাংখ্যবাগীশের পুত্র বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য, সে ছাড়া আর পাত্র নাই। সাংখ্যবাগীশের বংশ বিখ্যাত বংশ। সাংখ্যবাগীশ মারা গিয়াছেন, বিদ্যাপতি এখন ঘাটে কীর্ত্তনীয়া দলের দোহারকি করিয়া নিত্য কিছু উপার্জ্জন করে। নেশাভাঙ করে, চরিত্র সম্বন্ধে অখ্যাতিও আছে। কিন্তু আর পাত্র মিলিল না। কিন্তু সবার বড় আপত্তি, বিদ্যাপতির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ।

বিপর্য্যয়ের ফলে সরযূ বার-বার মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। প্রসন্ন কন্যাসম্প্রদান করিতে গিয়া দুই বার মূর্চ্ছা গেলেন। বিবাহ-বাসরের উৎসব-কল্লোল শুদ্ধ স্তিমিত হইয়া শোকাচ্ছন্ন পরিবারের স্থবিরত্ব লাভ করিল।

আশ্চর্য্য, স্থির রহিল শুধু মালিনী। তাহার না হইল মূর্চ্ছা, না হইল শোক, সে প্রতিমার ন্যায় সৌন্দর্য্য লইয়া আলোকে মন্ত্রে গন্ধে অর্চ্চনায় জনগণের বিমুগ্ধ দৃষ্টির বিস্ময় হইয়া নীরবে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল।

বাসরের সময় আর বড় ছিল না। তবু বাসরে বসিতে হয়। বাসন্তী বলিল, "ভাই ছোট-ঠাকুরঝি, একটি বার বাসরে তোমায় যেতে হবে ভাই।"

মালিনী হাসিয়া বলিল, আবার বাসর! চল্ কোথায় যাবি।"

চন্দ্রিকা, কৌমুদী, জ্যোৎস্না, বাসন্তী—পাড়ার দু-একটি আরও মেয়ে,—সকলে মিলিয়া বাসর করিল। কেন যেন বিদ্যাপতিও নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। বাসরে গীতবাদ্য হইল না, হাসি-তামাশা হইল না,—তবু একটু হাসি দেখা গেল মালিনীর মুখে। থাকিয়া থাকিয়া মালিনী কেন যেন হাসিতেছিল।

বিদ্যাপতি মনে মনে জলিয়া [illegible], ভাবিতে-ছিল—"মেয়েটা কি নির্লজ্জ!"

ফুলশয্যার দিনেই বিচ্ছেদ হইল

অমন অসামান্য রূপ দেখিয়া বিদ্যাপতির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। পরম স্নেহভরে সে যখন মালিনীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মালিনী ভীতা হরিণীর ন্যায় পিছাইয়া যাইতেছিল। অবশেষে সে জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না!"

বিস্মিত বিদ্যাপতি কহিল, "কেন মালিনী? তুমি ভয় পাচ্ছ?"

মালিনীর চক্ষে মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিল সেই আয়ত বিস্ময়শুদ্ধ অর্চ্চনারত দুইটি নয়ন, সন্তোষের কণ্ঠের বাণী তাহার কানে যেন বাজিয়া উঠিল।

সে আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "না না, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না; আমার স্বামী আছেন।" মালিনীর পায়ের তলে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

বিদ্যাপতি বলিল, "অ্যাঁ? কি বললে? তবে—তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?"

মালিনী খাটের কোণ দুই মুঠায় চাপিয়া বলিতে লাগিল, "কেউ জানে না,—আমার স্বামী আছেন। আমার তাঁকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব। তিনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন। আমায় আপনি ছেড়ে দিন, আমি আজই চলে যাচ্ছি

গোলমালে লোকজন ছুটিয়া আসিল। মালিনীর সন্ধান করা গেল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

সরযূ এত রাত্রে মালিনীকে একাকিনী দেখিয়া চীৎকার করিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। প্রসন্ন প্রতিজ্ঞা করিলেন, অমন মেয়ের মুখও তিনি দেখিবেন না। বোনেরা বলিল—"এ বাড়াবাড়ি।"

শুধু বাসন্তী ও বিরাম ভোরের গাড়ীতে চলিয়া গেল বিরামের ছুটি ছিল না।

মালিনী সেই অবধি পিতৃগৃহে থাকে। বিদ্যাপতি তাহার কলঙ্কের কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে। আর ইতিমধ্যে মালিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিবাহও করিয়াছে।

শুধু মালিনীর জীবনব্যাপী এক মিথ্যা ইতিহাস রচিত হইয়া রহিল,—সে কলঙ্কিনী।

সোদপুরে প্রথম দিন গান্ধী-সুভাষ সাক্ষাৎকার ও আলোচনান্তে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

গান্ধী-সুভাষ আলোচনার ফল জানিতে উৎসুক সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ বেষ্টিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

সোদপুরে মহাত্মা গান্ধী

সোদপুরে সান্ধ্যকালীন উপাসনায় মহাত্মা গান্ধী ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

বন্ধু শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন সে সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে সমালোচনা পড়ে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করছি। আসল বক্তব্য বলবার পূর্বে এটা ব'লে রাখা অবশ্যকর্তব্য মনে করি কাননবাবুর বইতে বিচার-বিভ্রম থাকলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

জীবনের নানা পর্ব-পর্বান্তর অতিক্রম ক'রে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কবি আজ আশি বছর বয়সের ধারে এসে পৌঁছেছেন। গ্রন্থকার যাকে **মানুষ** রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন তাকে চিনতে গেলে প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষণী, বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি, বহুবিস্তৃত প্রভূত তথ্য সংগ্রহে ও তার বিশ্লেষণে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। অতি অল্প কয়েক দিন মাত্র কাননবিহারী শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর এই অল্পকালের কটাক্ষপাতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কালের চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখকের যে অনায়াসে লিখিত মত ব্যক্ত হয়েছে সে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাহসের বিষয় হ'ত। যে ব্যাপারটি নানা ডালে পালায় ও শিকড়ে জটিল ও দূর-প্রসারিত এবং গ্রন্থকারের বয়ঃক্রমের চেয়েও বহু দীর্ঘ কালের বহু কর্মীর সমবেত চেষ্টায় নানা অভাব ও ত্রুটির ভিতর দিয়েও পরিণতির পথে চলেছে সেটাকে যথাযথভাবে দেখা ও দেখানো ধৈর্য- ও শক্তি- সাপেক্ষ। পাঠকদের কাছে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেবার দায় গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তার সময় হয় নি ব'লে আমাদের মনে হয়।

পদ্যে গদ্যে গানে চিত্রে শিক্ষকতায় নাট্যে নাট্যাভিনয়ে হাস্যকৌতুকে রাষ্ট্রিক প্রয়াসে পল্লীসংস্কারে বিচিত্র চিত্ত-প্রকাশের যে উৎস তাঁর জীবনের কেন্দ্রস্থলে নানা শাখায় উৎসারিত, তাদের গুরু লঘু সব কিছুর ঐক্য দিয়ে আছেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ। বাক্যালাপের বৈঠকেও তাঁকে কোনো কোনো অংশে পাওয়া যায় কিন্তু সে আলাপ এমন কারো সঙ্গে হওয়া চাই যাঁর মনের সংঘাতে তাঁর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে, যেমন ছিলেন তাঁর সহচর অমিয়চন্দ্র। বাউলের গানে শুনেছি—"মনের মানুষ যেখানে, বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে।" হয়তো যাওয়া ঘটবে না, কিন্তু যথোচিত অধ্যবসায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্ধান করা হয়েছে তার প্রমাণ আবশ্যক। এই কারণেই বন্ধু প্রভাতকুমারকে নমস্কার করি, তিনি ফাঁকি দেন নি—তাড়াতাড়ি বাজারে চলনসই একখানা বই বের করেন নি। হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু চেষ্টার অগভীরতা বা শৈথিল্য দেখি নি।

গভীর ও ব্যাপক ভাবে এই মানুষকে দেখতে হ'লে তাঁর তিরোধানের অপেক্ষা করতে হবে এবং এও মনে রাখতে হবে যে জীবনীলেখা অতি দুরূহ সাহিত্যিক ক্ষমতাসাধ্য। যদি কাননবিহারী তাঁর রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কবিকে পাঠকসমাজে সাহিত্যিকরূপে পরিচিত করবার চেষ্টা করতেন সেটা স্বীকার করা যেতেও পারত, কেননা অনেকেই এ কাজ নিশ্চিন্ত মনেই করেন। কিন্তু মানুষ-রূপে ও কর্মীরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত চেনেন এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। কবিকে যাঁরা তাঁর সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে কর্মসাধনার নানা কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতে নানা বাধার সঙ্গে সংগ্রামে এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে তাঁর বহুব্যাপী ঘনিষ্ঠ যোগের পর্বে পর্বে তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং দূরে থেকে সংবাদলাভের অবকাশ পেয়েছেন তাঁদের অনেকে বর্তমান আছেন, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার ভার নিতে তাঁরা সাহস করেন নি। আমার বন্ধু

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু যত্নে ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ছোটো-বড়ো দলিলগুলি প্রায় নিঃশেষে সংগ্রহ করেছেন, যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা এর থেকে জীবনী লেখবার সুযোগ পাবেন। কেউ কেউ যাঁরা বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন তাঁরাও তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে গল্পের মতো সাজাতে পারেন। কিন্তু যাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিত্তপরিণতির উপাদান যথেষ্ট সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি ও সুদীর্ঘ কালের সাহচর্যের ভিতর দিয়ে অংশে অংশে তাঁর চরিত্রস্বরূপ দেখবার প্রায় কোনো সুযোগই ঘটে নি, মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের ভার নেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সংগত নয়। মানুষ চেনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অল্প বয়স থেকে আশ্রমের কাজে যুক্ত হয়ে আমি দীর্ঘ দিন ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে এসেছি, কিন্তু আমি যে তাঁকে যথার্থ চিনি এমন কথা মনে করতে পারি নে এবং তাঁর এখানকার কর্মোদ্যমের অন্তর বাহিরের রহস্য আমি যে যথার্থ জেনেছি এ কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই, বন্ধু কাননবাবুর গ্রন্থে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের মুখের বাণী যা তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার ভাষাটা আমার কানে বেখাপ ঠেকাতে আমি কবিকে প্রশ্ন করেছিলুম। তিনি উত্তরে লিখেছেন, "এই কথাবার্তার ভাষার ছাঁদ যে আমার স্বভাব-সংগত নয় সে কথা তোমাদের কাছে বলাই বাহুল্য; তথাপি হয়তো বা স্থানে স্থানে যথাযথ হয় নি। শ্রোতার অনবধানের শৈথিল্য ও রিপোর্টারের ব্যক্তিগত সংস্কারের নিজত্ববশত এ রকম দুর্ঘটনা আমার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ

শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

২৫শে বৈশাখ দেশের নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে কবির জন্ম-তারিখ নিয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা দিয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ "গোল্ডেন বুক্ অব্ টাগোর"-এ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ লিখছেন—বাংলা ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, ইংরেজী ৬ই মে, ১৮৬১ ("গোল্ডেন বুক্ অব টাগোর" ৩৬৫ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "রবীন্দ্রজীবনী"তে লিখছেন—২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, ইংরেজী ৭ই মে, ১৮৬১ সাল ("রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম ভাগ, ২১ পৃষ্ঠা)। আর সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "রবিরশ্মি"তে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ জন্মলাভ করেন বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, সোমবার, ইংরেজী ১৮৬২ সালের ৮ই মে তারিখে।" যে তিন জন লেখকের লেখা উল্লেখ করলাম এঁদের কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হওয়া উচিত; কিন্তু এঁদের মধ্যেই যখন এতখানি মত বিরোধ তখন অন্যে পরে কা কথা। আমি এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তার জবাব যা লিখেছিলেন ভবিষ্যৎ চরিতকারদের কাজে আসতে পারে ভেবে সেটি এই সঙ্গে পত্রস্থ করা গেল।

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong

কল্যাণীয়েষু,

রোসো, আগে তোমার সঙ্গে জন্ম-তারিখের হিসেব নিকেশ করা যাক তুমি হলে হিসেবী মানুষ। যে বছরের ২৫শে বৈশাখে আমার জন্ম, সে বছরে ইংরেজি পাঁজি মেলাতে গেলে চোখে ঠেকবে ৬ই মে। কিন্তু ইংরেজের অদ্ভুত রীতি অনুসারে রাত দুপুরের পরে ওদের তারিখ বদল হয় অতএব সেই গণনায় আমার জন্ম ৭ই।—তর্কের শেষ এখানেই নয়, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্তে বাংলা পাঁজির দিন ইংরেজি পাঁজির সঙ্গে তাল রেখে চলবে না—ওরা প্রাগ্রসর জাত, পঁচিশে বৈশাখকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে—কয়েক বছর ধরে তোলো ৭ই, তার পরে দাঁড়িয়েছে ৮ই। তোমরা ঐ তিন দিনই যদি আমাকে অর্ঘ্য নিবেদন করো, ফিরিয়ে দেব না, কোনোটাই বেআইনী হবে না। এ কথাটা মনে রেখো। ইতি ২৬ বৈশাখ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

অতএব দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৬ই মে ছিল কিন্তু তিনি রাত্রি ১২টার পর জন্মগ্রহণ করেন বলে ইংরেজি হিসাব অনুসারে তারিখ হবে ৭ই মে।

সন্ধ্যা-স্বপ্ন

শ্রীপারুল দেবী

সন্ধ্যায় স্তিমিতপ্রায় আলোকে ঘর আধ-অন্ধকার। দেয়ালের ঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ করিতেছে—আর কোথাও সাড়াশব্দ নাই। পশ্চিমের জানালা খোলা, মৃদু মৃদু বাতাস আসিতেছে। কান পাতিয়া থাকিলে জানালার অদূরের নিমগাছটার ঝিরঝির শব্দ অল্প যেন শোনা যায়।

ম্লানমুখী মলিনবসনা সুধা আসিয়া সরোজের বিছানায় বসিল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

সরোজ উত্তর দিল না।

সুধার ঐ এক রোগ—কেবল পাচ মিনিট অন্তর প্রশ্ন করিবে, "ওগো কেমন আছ? এখন কেমন বোধ হচ্ছে?" সরোজের বিরক্তি বোধ হয়। আজ তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ভুগিতেছে—কখনও পেটব্যথা, কখনও বুক-ব্যথা, কখনও মাথাব্যথা, এ তো তাহার জীবনের সাথী। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি অবধি প্রতিদিন একই রকম বোধ হয়—ইহার মধ্যে পাচ মিনিট অন্তর সুধাকে সে কি নূতন কথা বলিবে? সুধা কি কিছুই বোঝে না? বার-বার, বার-বার একই প্রশ্ন কেন করে?

সরোজ চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, শুইয়াই রহিল। সুধা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া মনে মনে উৎকণ্ঠা বোধ করিল। ম্লান, বিবর্ণ, শীর্ণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন বেদনায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। ভগবান্ কি নিষ্ঠুর! সে দিনের পর দিন কত দেবতার চরণে কত পূজা জানাইতেছে—দিবারাত্রি যে একই প্রার্থনা তাহার মনে ধ্বনিত হইতেছে, বধির দেবতা কি কানের মাথা খাইয়া বসিয়া আছেন, না এ-কলিযুগে দেবতাদের মন হইতেও দয়ামায়া সব অন্তর্হিত হইয়াছে যে তাহার এত আবেদন-নিবেদন কিছুই আর ঠাকুরের কানে যায় না? তাহার স্বামীর কষ্ট দেখিয়া, তাহার এত পূজার প্রতিশ্রুতি পাইয়া, কিছুতেই কি পোড়া ঠাকুরের মন টলে না?

সুধা স্বামীর কপালে নিজের সুন্দর হাতখানি রাখিল। একটি ইংরেজী 'এস্' লেখা আংটি—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুধা ভাবিল—কি চক্ চক্ করছে আংটিটা! কত কাল হ'ল বারো মাস প'রে আছি, পালিশ তো যায় নি।

কত বৎসর আগে, তাহার বিবাহের সময়ে তাহার এক কাকীমা তাহাকে এই আংটিটি যৌতুক-স্বরূপ দিয়াছিলেন। 'এস্' অক্ষরটি সরোজের নামের আদ্যক্ষর হিসাবে আংটিতে বসান হইয়াছে, কি সুধার নামের প্রথম অক্ষর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই লইয়া আগে আগে উহাদের প্রায়ই তর্ক হইত। সরোজ বলিত, "আজকাল 'পতি পরম গুরু'-লেখা চিরুণী মাথায় পরা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, অথচ পতিসম্পর্কীয় কোনও একটা কথা অঙ্গে ধারণ করা সতী স্ত্রী মাত্রেরই উচিত, তাই কাকীমা ভেবেচিন্তে এই আংটিটি দান করেছেন—জান?" সুধা জোর আপত্তি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিত, "কখখনো না। তোমার নাম যদি নিবারণ হ'ত তাহলেও কাকীমা আমাকে 'এস্' লেখা আংটিই দিতেন। ওটা আমার নামের গোড়ার অক্ষর—মোটেই তোমার নয়।"

স্বামীর ললাটে রক্ষিত নিজের শুভ্র হাতখানিতে পুরাতন আংটিটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুধার সেই কথা মনে পড়িয়া গেল।

কত দিন, কত মাস, বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহারা তর্ক করে নাই, হাসে নাই—এমন কি ঝগড়াও করে নাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা কপালে হাত বুলাইতে

বুলাইতে কোমল কণ্ঠে স্বামীকে আবার সেই একই প্রশ্ন করিল, "হ্যাগা, কেমন আছ এখন?"

বিকালের দিক্ হইতে সরোজের শরীর খারাপ বোধ হইতেছিল—এমন প্রায় প্রত্যই হয়। দুর্ব্বল, ভিতরটা বড়ই দুর্ব্বল; মাথার মধ্যে যেন সব ভাবনাগুলা কেমন এলোমেলো হইয়া যায়—বিশেষ এই ভাবে জাগরণ ও তন্দ্রার মাঝে শুইয়া থাকিলে। এ-সময়ে কথা বলিতে তাহার মোটেই ভাল লাগে না—কোনও শব্দই যেন এ-সময়ে সে সহ্য করিতে পারে না। চোখ বুজিয়া অন্ধকার ঘরে সে চুপ করিয়া শুধু শুইয়া থাকিতে চায়। এ সময়ে বার-বার স্ত্রীর একই প্রশ্ন তাহাকে হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল। কপালটা নাড়া দিয়া স্ত্রীর হাতটা সরাইয়া লইতে ইঙ্গিত করিয়া বিরক্ত ভাবে উত্তর দিল, "কেমন আর থাকব? দেখতেই তো পাচ্ছ যে ভাল নেই—না হ'লে কি আর এ-সময়ে এমনি ক'রে শুয়ে থাকি?"

কি প্রশ্নের কি উত্তর! এক মুহূর্ত্তে সুধার বুকে অশ্রুর সমুদ্র যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে হাতখানি সরোজের কপাল হইতে সরাইয়া লইল।

কিন্তু আজকাল প্রায়ই এই রকম হইয়া থাকে। কি যে হইয়াছে সুধা জানে না। এইটুকুমাত্র সে আজকাল বুঝিতে পারে যে, স্নেহ দিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, সেবা দিয়া—কিছু দিয়াই স্বামীর এ রোগের যন্ত্রণা কমাইবার সাধ্য তো তাহার নাই-ই বরং সে বেশী ভাবিলে, কেমন আছে বার-বার জানিতে চাহিলে, সরোজ যেন বিরক্তই হয়। এ কি হইল? সরোজের মাথা ধরিলে আগে আগে সরোজ যে তাহার ঠাণ্ডা হাতখানি কপালে টানিয়া লইয়া বলিত, "তুমি হাত বুলিয়ে দিলেই এখুনি সব সেরে যাবে"—সে কি মিথ্যা কথা? না তাহার হাতের সে মোহিনী শক্তি সে এখন হারাইয়া ফেলিয়াছে?

সে-বার সেই ছাপরায়—সেই নলিনীবাবুদের বাড়ী। পূজার ছুটিতে সেখানে তাহারা দুই জনে বেড়াইতে গিয়াছিল। হঠাৎ নলিনীবাবুর ভীষণ অসুখ করিল—ডাক্তার বলিল কলেরা। সুধা তো ভয়ে আড়ষ্ট—স্বামীকে গিয়া বলিল, "ওগো পালিয়ে চল। শুনেছি নাকি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—সকলে মিলে জড়িয়ে পড়ে লাভ কি?" কিন্তু সরোজ শুনিল না। পূজার ছুটিতে আমোদ করিতে বন্ধুর কথা মনে পড়িয়াছিল—এখন বিপদ দেখিয়াই ফেলিয়া পলাইবে? তাও কি হয়? সুধার ভয় করে, সুধাকে না-হয় পাঠাইবার বন্দোবস্ত সে করিয়া দিতেছে। বিকাল পাচটায় একটা ট্রেন আছে, যাক্ না সুধা—সরোজের নিজের যাওয়া হইবে না। নলিনী কি ভাবিবে? তাহার স্ত্রী কি মনে করিবে? ছিঃ!

কাজেই সুধাও ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিয়া গেল।

নলিনীবাবুর স্ত্রী সুবর্ণের সে কি সেবা। ডাক্তাররা যখন প্রায় আশা ছাড়িয়াছে, তখন সেই যে সুবর্ণ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল, দুই দিন দুই রাত্রি তাহাকে কেহ সেখান হইতে উঠাইতে পারে নাই। এক বিন্দু জল অবধি কেহ তাহার মুখে দেওয়াইতে পারে নাই। দুইটি বিনিদ্র দিবা রজনী অনাহারে কাটাইয়া সুবর্ণ যখন শুনিল যে তাহার স্বামীর এবার জীবনের আশা হইয়াছে, তখন সে উঠিয়া স্নান করিয়া তাহার পূজার ঘরে গিয়া ঢুকিল। হাতে সামান্য ফল ও সরবৎ লইয়া সুধা পূজার ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সখী পূজার ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে কিছু খাওয়াইবে। কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুইটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সুবর্ণ উঠিল না। তাহার সেই ধ্যানমগ্ন, ভক্তি-আপ্লুত মুখের দিকে চাহিয়া সুধার এমন সাহস হইল না যে সে তাহাকে ডাকিয়া কিছু খাইতে অনুরোধ করে।

সুবর্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার নিজের মনও যেন তখন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে মনে মনে সুবর্ণের চরণে মাথা ঠেকাইয়া বলিয়াছিল, "যদি আমারও কখনও এমন দিন আসে তো আমিও ভয় পাব না—আমিও তোমারই মত একান্ত মনে সেবা ক'রে আমার স্বামীকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনব।"

আজ যখন সেই দিন আসিয়াছে, তখন কোথায় সেই তাহার দৃঢ়তা—কোথায় সেই বিশ্বাস? কোথায় সেই বিনিদ্র দিনরজনীর সর্ব্বভোলা ঐকান্তিক সেবা? সুধা পাঁচটা এ-কথা সে-কথা ভাবে, ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, নিদ্রায় চোখ ভরিয়া আসে যে! সুবর্ণের সেই দুই দিন দুই

রাত্রির অপূর্ব্ব বিশ্বাস, আশ্চর্য্য নিষ্ঠাকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও তাহা হয় কই ?

কিন্তু এ যে সুদীর্ঘ তিন বৎসরের প্রতি দিন প্রতি রাত্রির কথা। আজ প্রতিজ্ঞা করিলে দশ দিন পরে তাহা যে শিকল বলিয়া মনে হয়, প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। ভগবান্ জানেন, দুই দিন দুই রাত্রির পরীক্ষা হইলে সুধাও সুবর্ণের মত সগর্ব্বে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিত। কিন্তু তিন বৎসর ধরিয়া এ কঠিন পরীক্ষায় তাহার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায় বুঝি।

তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম সরোজের অসুখ আরম্ভ হয়, তখন শুধু দুই দিন, দুই রাত্রি নয়—বহু দিন সুধা বড় বিশ্বাসে যাহা করিবার সবই করিয়াছিল। দিনরাত্রি ধরিয়া স্বামীর সেবা করা ছাড়া কিছুই আর সে করে নাই। একমাত্র সরোজের রোগমুক্তি ব্যতীত আর কোনও কামনা তাহার মনে ছিল না। সরোজ অস্থির হইয়া উঠিত—"সুধার মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে, ওঠ, ওঠ—কতক্ষণ রুগীর ঘরে এ-রকম বদ্ধ হয়ে থাকবে? তোমার নিজের যে অসুখ করবে। যাও, একটুখানি বাইরে যাও—একটু কিছু খাও না সুধা—আমার সামনে ব'সে খাও, আমি দেখি।"

গভীর রাত্রে হয়ত সুধা ক্লান্ত হইয়া সরোজের পার্শ্বে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কি একটা শব্দে এক মুহূর্ত্তে সুধার ঘুম ছুটিয়া গেল—পাশে সরোজ নাই। সরোজ উঠিয়া নিকটের টেবিলে রক্ষিত বার্লি'র গ্লাসে চিনি মিশাইয়া খাইতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সুধা স্বামীর হাত হইতে গ্লাস কাড়িয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে বিছানায় শোওয়াইল—অনুযোগ করিয়া বলিল, "আমাকে ডাক নি কেন? নিজে হাতে রাত্তিরবেলা উঠে বার্লি নিয়ে খাচ্ছ, আর আমি দিব্যি ঘুমচ্ছি? ছি ছি—পোড়া চোখে যে এত ঘুম কোথা থেকে এসে যায় জানি না। ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল শুনেছিলাম, তার পর তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কিছুই মনে নেই। ডাকতে হয় আমাকে।"

সরোজ হাসিল। বলিল, "কেন সুধা তুমি এত ব্যস্ত হও? আমি কি এমন দুর্ব্বল যে এই বিছানার পাশ থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে মুখে দিতে পারি না? তুমি বেচারী সারা দিন ঠায় ব'সে থাক, রাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়েছ, তাও কি আমার জন্যে ঘুমতে পাবে না? সত্যি, কি যে ভুগতে লাগলাম—নিজের তো সাজা-ই, তোমার সুদ্ধ কি দুর্ভোগ বল তো? তুমি এই ক' মাসে কি রোগা যে হয়ে গেছ!" বলিতে বলিতে পরম স্নেহে সরোজ তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "ভেবো না ভেবো না সুধা, আমি ভাল হয়ে যাব। দিনে খাও না, রাত্রে ঘুমোও না, তুমি যে অসুখে পড়বে।"

গভীর রাত্রে রুগ্ন স্বামীর সেই পরম স্নেহস্পর্শ তাহার চোখে সেদিন জল আনিয়াছিল—আজও সে-কথা স্মরণ করিয়া সুধার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

কিন্তু সুদীর্ঘ তিন বৎসরে সুধার সেবার সে ঐকান্তিকতাও হয়ত আজ শিথিল—স্বামীর সে আদর, সে উৎকণ্ঠাই বা আজ কোথায় গেল?

সুধার চোখ দিয়া এবার জল পড়িতে লাগিল। সরোজ ওপাশ ফিরিয়া। শুইয়াছিল, দেখিতে পাইল না। জানালা খোলা, বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ভাল করিয়া জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই। নিমগাছটা বাতাসে নড়িতেছে, কয়েকটি বালক আঁকশি দিয়া গাছ হইতে কিছু একটা পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকে সুধা তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কত মাস ধরিয়া প্রতিটি সন্ধ্যা এই বিছানার উপর বসিয়া এই একই দৃশ্য দেখিয়া তাহার কাটিয়া চলিয়াছে। ঐ নিমগাছটা, ঐ সম্মুখের বাঁকা পথটা, তাহার পর মাঠ। মাঠটার মাঝামাঝি কয়েকটা চালাঘর আছে ওদিকে—সন্ধ্যার পর কিন্তু তাহা আর চোখে পড়ে না।

সুধা শূন্যপানে চাহিয়া থাকে।

বুধবার সন্ধ্যাটি কিন্তু কেমন সুন্দর কাটিয়াছিল। সত্য, 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ফিল্‌মটা কিন্তু খুব চমৎকার। কত লোকের মুখে সুধা ইহার প্রশংসা শুনিয়াছে, কিন্তু এ পোড়া দেশে যে আবার কখনও বাংলা ছবি দেখিতে পাইবে তাহা তো সুধা কখনও আশাও করে নাই।

সেদিন হঠাৎ ছবিটা কেমন এখানে আসিয়া পড়িল। ভাগ্যে সেদিন বিজ্ঞাপনটা সুধার নজরে পড়িয়াছিল, না হইলে হয়ত সুধার ভাগ্যে ওটা আর দেখাই হইত না। সরোজ তো প্রথমে রাজীই হয় নাই—"বাপ্ রে, আড়াই ঘণ্টা ধরে কে সেই কাঠের চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকবে বলো? এই ক'টা দিন সবে একটু ভাল আছি, আবার ঐ সিনেমার বন্ধ ঘরে ঢুকে ব'সে থেকে পেটের ব্যথাকে টেনে আনি আর কি। তুমি যাও না অমলাদের সঙ্গে—আমি না-হয় সুধীর বাবুকে ব'লে রাখব এখন।"

না, তা কিন্তু সুধা যাইবে না। সরোজ যদি না দেখে তো সুধারও দেখিয়া কাজ নাই। থাক্ গে, সে দেখিতে চায় না। বিজ্ঞাপনের গাড়ীখানা ঘটা করিয়া দুপুরবেলা বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গেল—তাই! না হইলে তো সুধা জানিতেও পারিত না। থাক্, দেখিয়া কাজ নাই।

বিজ্ঞাপনের গাড়ীতে কাননবালা হাল-ফ্যাশানের কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সত্য সত্যই কাননবালা নয়, ছবিতে আর কি—বেশ সুন্দর দেখিতে লাগিতেছিল কিন্তু। সরোজের কিন্তু গেলে ভালই লাগিত—রাত্রিদিন কেবল অসুখের ভাবনা ভাবা কি ভাল? বেশ তো, সিনেমা দেখিলে তবু খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিবে। সুধা না-হয় একটা নরম বালিশ লইয়া যাইবে, সেটা পাতিয়া বসিলে আর সরোজের কষ্ট হইবে না। সুন্দর গান করে কাননবালা—সরোজের ভাল লাগে না গান শুনিতে? সরোজ না গেলে সুধাও যাইবে না—গেলে দুই জনে একসঙ্গেই যাইবে।

শেষ অবধি যাওয়া হইল। সরোজের কেমন লাগিয়াছিল কে জানে, কিন্তু সুধার আড়াই ঘণ্টা যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। চারি দিকে লোকজন, ঘরের ভিতরটা গম্‌গম্ করিতেছে, সম্মুখে কাননবালা গান করিতেছে,—অসুখের ভাবনা-ভোলা দুইটি ঘণ্টা।

ছবি শেষ হইয়া গেল। পথে সুধার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যের উত্তরে কোনও কথা না বলিয়া বাড়ী আসিয়া নীরবে শুইয়া পড়িয়া একটু পরে সরোজ বলিল, "যা ক'রে আড়াইটা ঘণ্টা কাটিয়েছি সে আমিই জানি। বললাম নিজে দেখবে দেখ। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি? পেট থেকে বুক অবধি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ব'সে ব'সে।"

লজ্জায় সঙ্কোচে সুধা যেন এতটুকু হইয়া গেল। কুণ্ঠিত ম্লান স্বরে বলিল, "আমাকে বললে না কেন যে তোমার কষ্ট? তখুনি আমি উঠে আসতাম।"

সরোজ বলিল, "কি আর বলব সুধা? জানই তো বেশীক্ষণ বসতে পারি না আমি—কষ্ট হয়। জেনেশুনেই তো জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলে।"

সেই যে সরোজ বুধবার হইতে শুইয়াছে, এ দুই দিন আর একবারও বিছানা ছাড়িয়া উঠে নাই। সুধা কি তখন জানিত যে সরোজের সিনেমায় গিয়া এত কষ্ট হইবে? তাহা হইলে কি সে কখনও যাইত? সে তো সরোজের অসুখে এই তিন বৎসর ধরিয়া সব সাধ সব আহ্লাদই বিসর্জ্জন দিয়াছে—সামান্য এক দিন সিনেমা দেখা সুধা কি আর ত্যাগ করিতে পারিত না? কত দিন সে কোথাও যায় না, হাসে না, গল্প করে না—সাধ করিয়া কিছু জিনিষ কেনা তো সে কত দিন ছাড়িয়াই দিয়াছে—সব ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব সুখ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে কেবল এই রোগীর ঘরটিতে দিবারাত্রি আপনাকে বন্ধ করিয়া রাখে। যাহার নিজের অসুখ করে, সে তো সেই চিন্তা, সেই কষ্ট লইয়াই দিন কাটায়—কিন্তু যে মানুষ সুস্থদেহে রোগীর সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ দেহের সুস্থ মনের সকল দাবি অস্বীকার করিয়া রোগীর ন্যায় সকল কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহার কষ্টও তো কম নহে। সরোজ তো সে-কথা আজকাল ভুলিয়াই গিয়াছে, কিন্তু সুধা যে নিজেকে ভুলিতে পারে না।

সুধা প্রতিদিনই বসিয়া বসিয়া ভাবে, আজও ভাবিতে লাগিল, সরোজের এই অসুখটা না হইয়া যদি তাহার অসুখ হইত! ক্লান্ত দেহ শয্যায় এলাইয়া দিয়া দিনের পর দিন সে নীরবে শুইয়া থাকিত; কাহারও নিকট কোনও নালিশ করিত না। ভগবান্ জানেন সে রোজ প্রার্থনা করে, একান্তমনে প্রতিদিন ভগবান্‌কে বলে, "হে ঠাকুর, ওঁর অসুখটা তুলে নিয়ে আমাকে দিয়ে দাও। আমি

কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব—হে মা কালী, ওঁর অসুখ সেরে আমার অসুখ হোক্।"

আহা, তাই যদি হয়। এমন কি হয় না? হয়ত বার-বার শুনিতে শুনিতে মা কালীর মনে দয়া হইতেও পারে। এমন তো সে কত গল্প শুনিয়াছে। ঐ তো তাহাদের সেই রামগোপাল বাবুর ছেলেটি। কি জানি কি হইল, ছেলের জ্বর আর যায় না। কত বৈদ্য, কত ডাক্তার, কত ঔষধপত্র, পূজা-স্বস্ত্যয়ন—বড়মানুষের একমাত্র ছেলে, তাহার চিকিৎসার ঘটা কত। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। ডাক্তার-বৈদ্য হার মানিল—ছেলে ক্রমে ক্রমে হাড়সার হইয়া যেন বিছানায় মিলাইয়া গেল, জ্বর আর ছাড়ে না। ছেলেটির মা তো পাগল হইবার জোগাড়। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও না খাইয়া দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে বিছানা লইল। তাহার তো মুখের বুলিই হইয়াছিল, "হে মা কালী, আমার বাছাকে ভাল ক'রে দাও, আমি ওর হয়ে মরি।" বছর ঘুরিয়া যায়, কোন ফলই হয় না, শেষে ভাবিতে ভাবিতে সুধার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—সত্য সত্যই এক দিন মায়ের জ্বর হইল। এদিকে ছেলে সারিয়া উঠিতে লাগিল। ছয় মাস ভুগিয়া মা মরিয়া গেল, ছেলে বাঁচিয়া উঠিল—সে ছেলে আজ স্বাস্থ্যে টলমল করিতেছে।

এমনও তো হয়। গল্প-কথা নয়, কানে শোনা কথা নয়, এ তো সুধার নিজের চোখে দেখা সত্য ঘটনা। তাহা হইলে তাহার বেলাতেই বা কেন এরূপ হইবে না? রামগোপাল বাবুর স্ত্রীর প্রার্থনা যদি ভগবান্ শুনিয়া থাকেন তো সুধার মনের প্রতিনিয়তকার এই প্রার্থনা কি তিনি শুনিবেন না?

যদি সত্যই তা-ই হয়, সে বিশীর্ণ দেহখানি বিছানায় এলাইয়া নীরবে শুইয়া থাকিবে—হাসিমুখে দিনের পর দিন মাসের পর মাস। সরোজ যদি বলে—তোমার পেটে এত ব্যথা, একাটি শুয়ে থাকবে, আমি না-হয় কাছে থাকি—সুধা শুনিবে না। জোর করিয়া সরোজকে দোকানে পাঠাইয়া দিবে। সরোজ দোকানে না গেলে টাকার কত ক্ষতি সেটাও দেখিতে হইবে তো! সুধা বুঝাইবে, "না, একা কেন? ঝি তো রয়েছে। তাকে না হয় ব'লে দেব সে আজ আর বাড়ী যাবে না, এই-খানেই উনুনে দুটি রেঁধে খেয়ে আমার কাছেই থাকবে সারাদিন। ও বসবে কাছে, তুমি কেন আটকে থাকবে? না না, সে হয় না, তুমি কাজে যাও আমি বেশ আছি।"

কিন্তু সুধা বেশ নাই—তাহার পেটে অসহ্য ব্যথা। তবু কিন্তু সে কিছু বলিবে না—হাসিমুখে নীরবে ব্যথা সহ্য করিবে।

তাহার পর বিকালের দিকে সরোজ বাড়ী ফিরিবে। ঝিকে দিয়া তাহার জলখাবার সুধা আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সরোজ মুখ হাত পা ধুইয়া আসিলেই ঝিকে ইঙ্গিত করিবে—খাবার এনে দাও। খাবারের রেকাবিতে শিঙাড়া, নারিকেলের সন্দেশ, ফল। সরোজ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিবে, "এ কি সুধা? এ-সব কে করলে? কোথা থেকে এল? তুমি কি এই শরীরে বিছানা ছেড়ে উঠেছিলে নাকি?"

সুধা টিপিটিপি হাসিবে। সে উঠিয়াছিলই তো। ঐ বারান্দায় লোহার উনুন আনাইয়াছিল, সম্মুখে ঝিকে বসাইয়া তাহাকে দিয়া করাইয়াছে। নিজে হাতে করিতে পারে নাই—বড় দুর্ব্বল সে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সরোজের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হইবে, আর সে তাহার পোড়া শরীর লইয়া শুইয়া শুইয়া তাহাই দেখিবে? তা-ও কি কখনও হয়?

সরোজ রাগ করিবে, বকিবে, কিন্তু সত্যকারের বিরক্ত হইবে না। এখন অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া সরোজ খিটখিটে হইয়া গিয়াছে—কথায় কথায় এখন সে বিরক্ত হইয়া উঠে, রাগিয়া যায়—কিন্তু সরোজ তো এরূপ ছিল না কখনও। বিবাহিত জীবনের একটি দিনও সুধা মনে করিতে পারে না যে সরোজ কখনও সত্যসত্যই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। ঝগড়া করিয়াছে বটে; কিন্তু সে আলাদা। এখন সরোজ রাগ করিলে আর যেন সামলাইতে পারে না, আর কিসে সুধার কষ্ট হইবে, না হইবে অত দেখেও না। না হইলে প্রতিদিন এই দুঃসহ চিন্তায় কাটাইয়া সুধার মুখের হাসি যে কবে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখের নীচে গাঢ় কালি—কই, সরোজ তো আর কখনও

চাহিয়াও দেখে না। কত দিন পরে এক দিন একটুখানির জন্য সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল, তাহার জন্য সরোজ কি রকম বলিল যে সুধা তো জানেই তাহার কষ্ট হইবে, তবু সুধা জোর করিয়া তাহাকে লইয়া গেল—যেন সুধার নিজের সামান্য আমোদের কাছে সরোজের রোগ তুচ্ছ। সুধার কি মনে কম কষ্ট হইয়াছে? সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর কখনও আমোদ-আহ্লাদের কথা মুখেও আনিবে না।

কিন্তু যদি সুধার অসুখ করিত, তাহা হইলে সুধা কি সরোজের যাহাতে মন একটু প্রফুল্ল থাকে তাহা দেখিত না! নিশ্চয় দেখিত। বিকালে সরোজের জলখাবার খাওয়া হইলেই সে আবদার ধরিত, "ওগো যাও না, একটুখানি বেড়িয়ে এস না। ঘরে ব'সে ব'সে তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেল যে। আমার অসুখ করেছে, তাই শুয়ে আছি—তাই ব'লে তুমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে রুগীর মত ঘরে বন্ধ থাকবে? না না, সে হবে না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

সুধা জোর করিয়া সরোজকে সিনেমা দেখিতে পাঠাইয়া দিবে। সে নিজে সিনেমা দেখিতে ভয়ানক ভালবাসে—তাই সরোজ হয়ত প্রথমে একা যাইতে চাহিবে না। "বাঃ, তুমি একা শুয়ে থাকবে, আর আমি মজা ক'রে সিনেমা দেখে আসব? না, না, সে হয় না সুধা—আমার বড় মন কেমন করবে তোমার জন্যে—ভালই লাগবে না দেখতে। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তার পর দু-জনে একসঙ্গে দেখে আসব—এখন থাক্।"

স্বামীর হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া, চোখ বুজিয়া অন্ধকার ঘরে, ক্লান্ত দেহে ক্লান্ত মনে শুইয়া থাকিতে হয়ত সুধার খুব ভালই লাগিবে, কিন্তু জোর করিয়া সে ঐ স্বার্থপরতাটুকু মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে। হাসি-মুখে বলিবে, "আমি আজ খুব ভাল আছি গো। আর ক'দিন পরেই ভাল হয়ে যাব, তখন আবার দু-জনে যাব—এখন এটা তুমি একাই দেখে এস। এসে আমাকে সব খুঁটিয়ে গল্প ব'লো—খুব ভাল লাগে আমার সিনেমার গল্প শুনতে। তুমি না গেলে তো আমি গল্পও শুনতে পাব না। যাও, লক্ষ্মীটি—মন কেমন আবার কি? আমি তো কত দেখেছি আগে আগে—আবার ভাল হয়ে কত দেখব। আর আজ আমি সত্যি খুব ভাল আছি।"

কিন্তু সত্য সত্যই সুধা ভাল নাই। জোর করিয়া সরোজকে সিনেমায় পাঠাইয়া দিয়া ব্যথাকাতর মুখে সুধা ঝিকে ডাকিয়া বলিবে, "গরম জল ক'রে আন তো শীগ্‌গির কামিনী—বড় জোর ব্যথা করছে পেটে।"

কি হইতে পারিত—কি হইয়াছে। সামান্য শরীরের রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণা সুধার, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিবার নাই। কত দিন চলিয়া যায়, সরোজ নিয়মিত আর দোকানে যায় না—আয় যাহা ছিল, কমিতে কমিতে এখন যেন তাহা বন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে। স্বামীর ঔষধ, স্বামীর পথ্য জোগাইবার দুশ্চিন্তায় সুধার ঘুম হয় না—কিন্তু কাহাকে কি বলিবে? লুকাইয়া লুকাইয়া সুধা নিজের দুইখানি গহনা কামিনী ঝিকে দিয়া বিক্রয় করিয়াছে—ইহার পর কি হইবে, ভগবান্‌ই জানেন। সুধা তো ভাবিতে পারে না। নিরাশ মনকে বার-বার আশায় বাঁধিতে চেষ্টা করে—"এমন ক'রে আর কত দিন চলবে? উনি এইবার ভাল হয়ে উঠবেন, সব ভাবনা আমার ঘুচবে। বিনোদ ডাক্তারের ঐ নূতন দামী লাল রঙের বড় শিশির ওষুধটায় নিশ্চয় এবার ফল হবে। হে হরি, শীগ্‌গির সেদিন দাও, মুখ তুলে চাও, আমি একলা আর ভাবতে পারি না।"

রোগ-যন্ত্রণায় কাতর সরোজ এ-সকল কথা চিন্তাও করে না। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞাসা করে, "দোকান থেকে টাকা কিছু কিছু বেহারী দিয়ে যায় তো? টাকা আছে তো?"

সুধা ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ আছে।"

সরোজ বলে, "ডাক্তার বাবু ব'লে গেছেন আর একটা নতুন ওষুধ আনতে—নামটা ঐ কাগজে লেখা আছে—একেবারে নূতন বেরিয়েছে, খুব ভাল ওষুধ, সাড়ে চার টাকা দাম। যদি টাকা থাকে তো আজ আনতে দিও সুধা।"

টাকার ভাবনা, অসুখের ভাবনা—তাহার উপর এই অত্যন্ত একঘেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়া চলিয়াছে। কোথাও যাইবার নাই, কোনও

বাউল

শারদীন্দুভূষণ গুপ্ত

আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—এই দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত মনটাকে একটু বৈচিত্র্য একটু আনন্দ দিবার কোনও উপায় নাই—কিছু আশা করিবার নাই—শুধু সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা এই ঘরটিতে বসিয়া কখনও অন্ধকার কখনও জ্যোৎস্না-প্লাবিত ঐ আকাশের টুক্‌রার দিকে চাহিয়া ভাবিতে থাকে। সে-ভাবনারও আর শেষ নাই। সরোজ তো চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে—বড়জোর ভাবিতেছে, পেটের ব্যথাটা একটু কমলে বাঁচি। পেটের ব্যথাটার কথা ছাড়া সরোজ আর কিছু ভাবিতেছে না, ভাবিবার তাহার ক্ষমতা নাই—পেটের ব্যথাটা কমিলেই সরোজ তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িবে। সুধা যদি তাহাই পারিত!

কিন্তু সুধার অসুখ আর সরোজের অসুখ? কিসে আর কিসে তুলনা! সরোজের জীবনের কত মূল্য সুধা কি তাহা জানে না? সুধা যদি আজ এখনই মরিয়া যায়, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? সরোজের এই সংসার যেমন চলিতেছিল তাহাই চলিবে। এই বাড়ী, এই আসবাব-পত্র, কামিনী ঝি, সব তেমনই থাকিবে। কিন্তু সরোজের যদি কিছু হয়, তাহা হইলে সুধার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? কোথায় থাকিবে তাহার এই অভিমান, তাহার এই কল্পিত দুঃখ-বেদনা লইয়া নাড়াচাড়া? কামিনী ঝিয়ের যাহা আছে, সুধার যে তাহাও থাকিবে না। মা নাই, বাপ নাই, ভাইবোন নাই—বিবাহ হইবার আগে দূরসম্পর্কের কাকার বাড়ীতে তাহার কেমন করিয়া দিন কাটিত সুধা কি তাহা কখনও ভুলিবে?

কিন্তু এ কি ভাবিতেছে সে? ছি ছি, এ-সব কি অমঙ্গল চিন্তা! সুধা কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, দোষ নিও না। ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে—কি ভাবতে কি ভাবি। ওঁকে ভাল ক'রে দাও ঠাকুর—আমাকে ওঁর অসুখটা দিয়ে দাও—আরও অনেক গুণ বেশী ক'রে দিয়ে দাও—ওঁকে সুস্থ ক'রে দাও। আমার প্রাণটা নিয়ে ওঁর প্রাণটা রাখ ঠাকুর।"

মনে মনে শিহরিয়া সুধা আস্তে আস্তে সরোজের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

কিন্তু চিরদিন কি এইরূপ যাইবে? ভগবান্ কি কখনও এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন? তাহার মা খুব ছোটবেলায় তাহাকে বলিতেন মনে আছে—"তেমন ক'রে ডাকতে পারলে পাথর জলে ভাসে, মরা মানুষ প্রাণ পায়—" তা এ তো তাহার সামান্য প্রার্থনা। ভগবান্ কি শুনিবেন না? বিনোদ ডাক্তারের ঐ নূতন লাল ঔষধটা ঠাকুরের চরণামৃতের কাজ করিবে না কি? "হে হরি ভাল ক'রে দাও—আমি ওঁর হয়ে ভুগি সে ঢের ভাল। কত দিন আর কষ্ট দেবে ঠাকুর? ভাল ক'রে দাও এবার। শীগ্‌গির সব রোগবালাই কেটে যাক্।"

বলিতে বলিতে ভাবিতে ভাবিতে সহসা সুধার মন যেন আশায় ভরিয়া উঠিল। নিশ্চয় কাটিবে—দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়া নিশ্চয় সুদিন আসিবে—এ-দিন কিন্তু চিরদিন ধরিয়া বসিয়া থাকিবে না—থাকিতে পারে না। সরোজের এই কষ্ট, তাহার এই ঘোর দুশ্চিন্তা সব এক দিন কাটিয়া যাইবে। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্ত সেই শুভদিনটিকে নিকটতর করিতেছে যে। কি আনন্দের দিন সে—কি উৎসবের দিন! ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কষ্ট নাই; এই নিত্য রোগ, নিত্য অভাব যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হইবে সেদিন। আবার তাহারা হাসিবে, গল্প করিবে—পাঁচটা এ-কথা সে-কথা লইয়া ভুলিয়া যাইবে যে কোনও দিন সরোজের এরূপ অসুখ হইয়াছিল। কবে আসিবে সে আনন্দের দিন? সরোজ ভাল হইয়া উঠিলে সুধা খুব ধুমধাম করিবে। লোকজন নিমন্ত্রণ করিবে, ভিখারীদের খাওয়াইবে, বস্ত্র দিবে, পয়সা দিবে—সাধ মিটাইয়া শুভ উৎসব করিবে সুধা।

ঐ বাহিরের মাঠটা—ঐখানে সামিয়ানা খাটাইবে—সেই বারোয়ারি পূজায় যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ। রঙীন সামিয়ানা—চারি দিকে ঝালর ঝুলিতেছে। গ্যাসের বাতি চাই—রাত্রের খাওয়া করিবে কি না। সারাদিন ধরিয়া ভিখারী-বিদায় চলিবে যে—দিনের বেলা ভদ্রলোকদের খাওয়াইবার সময় পাওয়া যাইবে না তো। আর ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রাত্রেই ভাল। এখানে তো আর কলিকাতার মত ইলেকট্রিক আলোবাতির বন্দোবস্ত নাই যে পাঁচ-সাতটা পাখা ভাড়া করিয়া আনিয়া খাটাইয়া দিবে। গরমে সকলের প্রাণ যাইবে যে এক দিন সুধার

বাড়ী খাইতে আসিয়া। নাঃ, সে ভাল নয়, রাত্রের নিমন্ত্রণই ভাল।…অবশ্য ভিখারী-খাওয়ান সকাল হইতেই চলিবে। ভাত, ডাল, একটা নিরামিষ তরকারি, একটা মাছের তরকারি, দই ও এক রকম কিছু মিষ্টান্ন। জিলাপীই ভাল—সন্দেশ রসগোল্লার অনেক দাম পড়িয়া যাইবে। সে বরং রাত্রিকার খাওয়ানর জন্য রাখিবে।… আচ্ছা, জিলাপী যে ভিখারীদের দিবে, তা কত জিলাপী চাই? এক মণ, দেড় মণ, দুই মণ?…কি মুস্কিল, এ আন্দাজ করা তো বড় শক্ত। আচ্ছা, সে সরোজের দোকানের ঐ বেহারীকে ডাকিয়া লইবে—ও লোকটা এ-সকল কাজে খুব দক্ষ। সেবার সেই রামবাবুদের বাড়ী ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে একা কি খাটুনীটাই খাটিল। রামবাবু তো গো-বেচারা ভাল মানুষ—কিছুই পারেন না।… "বেহারী, দই কত আসবে? মাছ, মাছ ক'মণ? মিষ্টি? মিষ্টি মোটে ২০ সের? ২০ সেরে কি হবে? কম হবে—লজ্জায় পড়তে হবে শেষটা—এই আমি ব'লে দিলাম দেখে নিও।" কিন্তু কিছু কমও হইল না বেশীও হইল না—নির্ঝঞ্ঝাটে অতগুলি লোকের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেল এবং সেই হইতে বেহারীর দক্ষতার ও আন্দাজের নির্ভুল ধারণায় সকলের এমন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে কাহারও বাড়ীর কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম হইলেই খাওয়ানর ভার লইতে বেহারীর ডাক পড়ে। আর সুধার তো নিজের দোকানের লোক বেহারী—প্রাণপণে করিবে। কোনও ভাবনা নাই সুধার—ও সকল ভার বেহারীর হাতে সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়িয়া দিয়া সুধা বরং এদিকটায় ভাল করিয়া মন দিবে। কানা, খোঁড়া, পঙ্গু ভিখারীদের জন্য খান-পঞ্চাশ নূতন কাপড় রাখা চাই, সকলকে দেওয়া তো অসম্ভব কথা, বড় বেশী খরচ। অবশ্য সরোজ ভাল হইয়া উঠিলে সুধার আর টাকাকড়ির ভাবনা কিসের—যত ইচ্ছা খরচ করুক না কেন? কিন্তু তবু একটু ভাবিতে হয় বইকি—দুই হাতে উড়াইয়া দেওয়া তো আর ভাল নয়। পঞ্চাশখানা কাপড়েই চলিবে। সকলের খাওয়া হইলে কাপড় পাইবার যোগ্য ভিখারীদের বেহারী আলাদা করিয়া এই বাড়ীর উঠানের দরজায় পাঠাইয়া দিবে। এইখানে সুধা সেই কাপড় পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া। অমলা আসিয়াছে, তারিণীবাবুদের বাড়ীর দুই জ্যেঠিমা, বৌদিদি, নীহার সকলে আসিয়াছে। তাহার পর প্রতিভা, পুষ্পী, করুণাদি, করুণাদির পিসীমারা, রামশরণ সিং-এর হিন্দুস্থানী বৌ, সকলে আসিয়াছে। সুধা সেদিন সকাল হইতে খাইবে না—ভিখারীদের খাওয়াইয়া, সরোজকে খাওয়াইয়া, পূজার ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া তবে সে সেদিন জল গ্রহণ করিবে। তুচ্ছ খাওয়া-দাওয়া—সেদিনকার আনন্দ-উৎসবের কাজের ভিড়ে কি আর সুধার নিজের খাওয়ার কথা মনে পড়িবে? শুধু জলতৃষ্ণা পাইতে পারে কিন্তু পাইলেও সুধা সেদিন কিছুই মুখে দিবে না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিখারীদের হাতে এক-একটি করিয়া নূতন বস্ত্র তুলিয়া দিবে। ভিখারীরা বলিবে, "মা তোর ভাল হোক, তোর স্বামী জিতা থাক্, তুই রাণী হবি মা। গরীব-দুঃখীদের খেতে দিলি, কাপড়া দিলি, তোর স্বামী রাজা হবে মা।" এখানে ভিখারীরা বেশীর ভাগই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। উহাদের সেই ভাঙা বাংলার অন্তরের আশীর্ব্বচনে সরোজ চিরদিনের মত সর্ব্বরোগমুক্ত হইবে।

সুধার দেহ উপবাসক্লান্ত, কিন্তু মন অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ। করুণাদির পিসীমারা বলিলেন, "মেজবৌ, ছোট বৌমা, সুধার পায়ের ধূলা নাও সব। সতীলক্ষ্মী মেয়ে, সাবিত্রীর মত স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে মৃত্যুর দ্বার থেকে। সরোজের কি বাঁচবার কিছু ছিল? আমাদের তো সব চোখে দেখা। ইষ্টিশানের নলিনী ডাক্তার অবধি এলে দিয়েছিল, হার মেনে গেল যত বড় বড় শহরের ডাক্তার সব, কত ডাক্তারই দেখিয়েছে সুধা, আমরা জানি তো সব। টাকাকে টাকা ব'লে মানে নি। তা কোনও ডাক্তার কি করতে পারলে কিছু? যা করেছে এই আমাদের সুধা। এ তিন বছর মেয়ে আমাদের নিজের শরীরকে শরীর ব'লে মানে নি—অমন দুর্গাপ্রতিমার মত চেহারা একেবারে কালিবর্ণ হাড়সার হয়ে গিয়েছিল দিনরাত কেবল ভেবে ভেবে আর রাত জেগে সরোজের সেবা ক'রে করে। এ-কালের সাবিত্রী আমাদের সুধা।… প্রতিভা, ও প্রতিভা, কোথা গেলি? পায়ের ধুলো নে সুধাদির—পুষ্পীকেও ডাক্। সুধা আশীর্ব্বাদ করিস মা, ওদেরও যেন এমনি সব ভাগ্যের জোর থাকে।

তারিণীবাবুর জ্যাঠাইমা বলিলেন, "আহা বেঁচে থাক্, মাথার সিঁদুর অক্ষয় হোক, এবার একটি রাঙা খোকা কোলে হোক্—স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর কর মা, দেখে আমাদের চোখ জুড়োক্। ঘরে ঘরে সব অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে ভয়ে যেন প্রাণ শিউরে ওঠে। হরিনাথের অমন ছেলে, সংসারের মাথা, এই ফাল্গুনে মোটে তিনটি বছর হ'ল বিয়ে করেছে গা—বৌটার কোলে একটা ছয় মাসের কচি—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ছেলের জ্বর আর গায়ে ব্যথা। বৌ সেবা করবে কি, ভয়ে যেন কাঠ। নড়ে না, চড়ে না, খায় না, ছোট্ট বাচ্চাটাকে চোখ মেলে দেখে না—যেন কাঠের পুতুল। আট দিন গেল না, অমনধারা জোয়ান ছেলে, ঠিক যেন উপে চলে গেল কোথায়। আহা বৌটার দিকে কি তাকান যায়? এই বয়েসে আমাদের দশা বৌটার। তাই বলছি ভাগ্যের জোর কি আর সবার সমান থাকে বাছা? সুধা আমাদের সতী-সাবিত্রী, ওর ভাগ্য যেন সবাই পায়। ও-ই তো সরোজকে বাঁচিয়ে তুলেছে। ছাইয়ের ডাক্তার ওরা কি কিছু করতে পারে? ওরা যদি করতেই পারবে তাহলে কি আর হরিনাথের অমন ছেলে যায়? কলকাতা থেকে সায়েব-ডাক্তার আনলে ওর বাপ—কি করতে পারলে সে? সবার চোখের সামনে যে সে চলে গেল—কে রাখতে পারলে?··· হ্যা, রাখতে যদি কেউ পারত তো ঐ বৌটার কপালেই পারত। তা সে কপাল যে ছাইয়ে ভরা। সুধার আমাদের সতী-সাবিত্রীর কপাল যে! আহা দেখলেও চোখ জুড়োয়।"

লজ্জায়, আনন্দে, গর্ব্বে সুধার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। রাঙাপাড় গরদের নূতন শাড়ী পরিয়াছে সে; গহনা পরিয়াছে গলায়, হাতে, কানে। সরোজ ভাল হইয়া উঠিলে যখন আর টাকার ভাবনা থাকিবে না তখন প্রথমেই সুধা এক গোছা চুড়ী ও অমলার মত ঐরূপ একটা নেকলেস গড়াইবে। বেশ নেকলেসের প্যাটার্ণটা—তুমি যদি বারো মাস ত্রিশ দিনও পরিয়া থাক তো নষ্ট হইবে না। সেই রকম সুধা কলিকাতা হইতে গড়াইয়া আনিবে। সকলেই তো বলে সুধার কেমন গোলগাল গড়ন, হাতে গলায় গহনা পরিলে সুধাকে বড় মানায়। কেন, এই তো সেদিনই রামশরণ সিংয়ের বৌ বলিতেছিল, বহিন্, তোমার মত সুন্দর হাত হইলে দু-গাছা কাচের চুড়িতেও রাজরাণীর মত দেখায়।···কিন্তু সরোজ ভাল হইলে শুধু কাচের চুড়ি কেন—এক গোছা সোনার চুড়িতে, নেকলেসে, রাঙা-পাড় নূতন গরদের শাড়ীতে সেদিন সুধা ঝলমল করিবে। করুণাদি আসিয়া তাহার গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিবে, "দেখ দেখ, পিসীমা, আমাদের সুধাকে আজ কেমন মানিয়েছে। ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি।"

সুধা করুণাদির হাত সরাইয়া দিয়া লজ্জিত হাসিমুখে বলিবে, "করুণাদি কি যে বলে। নাও—আর অত ঠাট্টা করতে হবে না।"

কিন্তু সুধা জানে—মনের নিভৃত কোণটিতে খুব ভাল করিয়াই জানে যে করুণাদি ঠাট্টা করিতেছে না। সতী-সাবিত্রীর মুখে যে আভা কবিরা কল্পনা করিয়া থাকেন, সুধার মুখে আজ সেই অপূর্ব্ব আভা—সেই নলিনীবাবুর স্ত্রী সুবর্ণের মুখে সুধা যাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

নিস্তব্ধ ঘরে জোরে জোরে শব্দ করিয়া ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে আটটা বাজিল।

সরোজ এ-পাশ ফিরিয়া বলিল, "আটটা বাজল, আমায় এবার ওষুধ দেবে না?"

সুধার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

দিবে বইকি, এইবার সুধা সরোজকে সেই নূতন সাড়ে চার টাকা দামের মিক্শ্চারটা দিবে। উনানে বোধ হয় এতক্ষণে গরম জলটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সরোজের পেটে গরম জলের সেঁক দিতে হইবে। তাহার পর সাড়ে আটটার সময়ে কবিরাজী তেল দিয়া সরোজের বুকে ও পিঠে আধ ঘণ্টা মালিশ করিবার কথা ও-পাড়ার বৃদ্ধ নিবারণ ভট্টাচায্য আজ বার-বার বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার কোন এক বন্ধুপুত্রের কি-এক দুরারোগ্য ব্যাধি নাকি এই তেল দেড় বৎসর প্রতিদিন নিয়মিত মালিশ করিবার পর নির্দ্দোষ ভাবে সারিয়া গিয়াছিল—সেটাও আজ হইতে মালিশ করিবার কথা। তাহার পর সুধা সরোজকে খাওয়াইবে, আস্তে আস্তে মাথায়, পায়ে, হাত বুলাইয়া বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইবে—অনেক কাজ সুধার।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া স্বপ্নোত্থিতের মত সুধা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার এত ক্ষণের স্বপ্নালোকে উজ্জ্বল মুখখানি যে হঠাৎ একান্ত মলিন হইয়া গেল, সরোজের রোগক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িল না।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

শ্রীসীতা দেবী

ফাল্গুন মাসের ভোরবেলা। একটুখানি পাৎলা কুয়াশা তখনও গঙ্গার ধারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, চারিদিক্ পরিষ্কার দেখা যায় না। হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ছোট ছোট অসংখ্য শহর ও গ্রাম, কোন্‌টি কোথায় শেষ, কোন্‌টি কোথায় আরম্ভ ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশন, দূর হইতে নাম পড়া যায়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটি মহা অজগরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কোথাও মানুষের দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া, কোথাও বা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া কত দূর চলিয়া গিয়াছে, কল্পনাও যেন তাহার নাগাল পায় না।

ইটের গাঁথা, ভাঙা-চোরা একটি বাড়ী, দেখিলে মনে হয় বর্ত্তমান বাসিন্দার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। প্রাচীরের ইট অসংখ্য জায়গায় খসিয়া পড়িয়াছে, সে-সব আর সারানো হয় নাই। তিন-চারখানি ঘর, শেষ কবে চূণকাম করা হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই, রং এমনই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দরজা-জানালারও অবস্থা অতি শোচনীয়, রং চটিয়া গিয়াছে, কাঠ ফাটিয়া গিয়াছে, দুই-একটা কপাট কব্জা ছাড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রাস্তার পাশে যেখানে দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে বাঁশের বেড়া দিয়া পথিকের চোখে গৃহস্থ নিজের আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়াছেন। বাস্তুভিটা পিছন দিকে অনেকখানি বিস্তৃত, তাহার পর গঙ্গার উদার স্রোত। নৌকারোহী যাত্রীর কৌতূহলী দৃষ্টিকে বাধা দিবার জন্য কিন্তু সেদিকে কোনও বেড়া নাই। ঝোপঝাড়ে যতখানি আব্রু রক্ষা হয় তাহাই যথেষ্ট বোধ করা হয়। এক কালে বাড়ীর পিছনে বাগান ছিল মনে হয়, এখনও গোটা-দুই চাঁপাফুলের গাছ ও একটি গন্ধরাজের গাছ পুষ্পিত মাথা তুলিয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। গঙ্গার একেবারে ধারে একটি বেলগাছ ও একটি আমগাছ। বাকি সবই বন্য লতাপাতার রাজ্য।

শ্যামাদাস মিত্রের পিতামহের আমলের বাড়ী এটি। তিনি বিষয়-সম্পত্তি মন্দ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু শ্যামাদাসের পিতা তারাদাস নিজের ওজন বুঝিতেন না। আয় তাঁহার যাহা ছিল, ব্যয় করিতেন তাহার চার গুণ। ফলে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন জীর্ণপ্রায় ভদ্রাসন-বাড়ী ছাড়া বড় বেশী কিছু রাখিয়া গেলেন না। তারাদাসের দুই ছেলে, এক মেয়ে।

বড় ছেলে শ্যামাদাস হিসাবী মানুষ। কলিকাতার একটি বড় সওদাগরী আপিসে তিনি কাজ করিতেন, মাহিনা পাইতেন এক শত টাকা। এই টাকা হইতে গোটা কুড়ি-পঁচিশের বেশী সংসারে ব্যয় করিতেন না। তাঁহার উপর মা ষষ্ঠীর কৃপা খুব প্রবল ছিল না, একটি মাত্র পুত্র তাঁহার। বাড়ীতে ঝি-চাকর রাখিবার জো ছিল না, তিনটা মানুষের তো সংসার, তাহার আবার ঝি-চাকর কি? গৃহিণী সগর্জ্জনে কোনও বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেই কর্ত্তা বলিতেন, "এমন করলে ঘরে লক্ষ্মী থাকবে কেন? যা না পারবে তা আমায় ব'লো, আমি ক'রে দেব। কৃপাটা যদি মানুষের মত হ'ত, তাহলে কি আর তোমার সাহায্যের অভাব হয়? বেটা নবাব-পুত্তুর ঠিক ঠাকুর্দ্দার ধাত পেয়েছে।"

কালীতারা গালে হাত দিয়া বলিতেন, "শোন এক বার কথা। পুরুষ বেটাছেলে, সে কি ধান ভানবে না ভাত রাঁধবে? বলি কার জন্যে এত আণ্ডিল বাঁধছ? স্ত্রী সন্তানই যদি খেতে পরতে না পেল, তবে টাকা নিয়ে হবে কি? গয়ায় আমার পিণ্ডি দেবে ব'লে কি সব গুছিয়ে রাখছ? মা ষষ্ঠীর কাছে কি অপরাধ করেছি জানি না, একটা মেয়েও যদি দিতেন, তাহলে হাড় ক-খানা একটু জুড়োত।"

শ্যামাদাস আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। গৃহিণীর । এমন কিছু বেশী নয়, মা ষষ্ঠী যদি হঠাৎ কৃপা করিয়া একটি কন্যা দান করিয়া বসেন তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি!

শ্যামাদাসের ছোট ভাই শক্তিদাস দাদার মত অত হিসাবী ছিলেন না। ছেলেপিলেও তাঁহার চার-পাঁচটি, অনেক কষ্টে তাঁহার দিন কাটিত। পৈত্রিক ভদ্রাসন-বাড়ী দুই ভাগ করিয়া দুই ভাই পাশাপাশি বাস করিতেন। শক্তিদাসও হাবড়ায় কাজ করিতেন কোন এক জুট মিলের আপিসে। মাহিনার টাকায় তাঁহার চলিত না, প্রায়ই এর ওর কাছে হাত পাতিতে হইত।

তারাদাস মেয়ে ষোড়শীর খুব খরচ করিয়া কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শীর স্বামীর কৌলীন্য যতখানি ছিল অর্থ ততখানি ছিল না। তাঁহাকেও মাঝে মাঝে ভাইদের কাছে হাত পাতিতে হইত, তবে হাতে বিশেষ কিছু যে আসিয়া পড়িত তাহা নহে। তাঁহার দুইটি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল। ছেলে চিন্ময় যখন চৌদ্দ বৎসরের এবং মেয়ে অন্নপূর্ণা যখন বারো বৎসরের তখন ষোড়শী হঠাৎ মারা গেলেন।

তাঁহার স্বামী সংসার সম্বন্ধে কখনও কোনও ভাবনা করেন নাই। তাস-পাশা খেলিয়া, তামাক খাইয়া, নিজের কৌলীন্যের গর্ব্ব করিয়া বেশ তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কোথা হইতে যে সংসার চলে তাহা জানিতেনও না। হঠাৎ স্ত্রীকে হারাইয়া তিনি যেন বিশ বাঁও জলের তলায় পড়িয়া গেলেন। মাসখানিক দারুণ দুর্ভাবনায় কাটিয়া গেল, তাহার পর স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি শেষ হইতেই রাতারাতি কোথায় যে তিনি সরিয়া পড়িলেন, তাঁহার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

অগত্যা ছেলেমেয়ে-দুটি মামার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাদাস বিপদ্ গণিলেন। তাঁহারই অবস্থা ভাল, এখন এ আপদ্ দুইটা আসিয়া তাঁহারই ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে না তো? শক্তিদাসের কাছে তিনি প্রস্তাব করিলেন, "বেচারারা সবে মা-বাপ হারিয়ে বড় ঘাবড়ে গেছে, এখন আর ওদের দু-জনকে দু-ঠাঁই ক'রে কাজ নেই। তোমার পাঁচটা ছেলেপিলের ঘর, তোমার কাছেই ওরা থাক, আমার বাড়ী গিয়ে ওদের ভাল লাগবে না। দরকার হয় তো আমি কিছু কিছু সাহায্য করব।"

বাদ সাধিলেন তাঁহার গৃহিণী কালীতারা। তিনি একেবারে ধনুর টঙ্কারের মত বাজিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আহা, তা আর না? হাড়-কিপ্পন মিন্‌সের টাকা খাবে কে? অনুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, তবু মরতে বসলে জল ঘটিটা এগিয়ে দেবে। ছোট বউয়ের পাঁচটার ঘর, ওর ঘাড়ে সব চাপালে চলবে কেন? দু-জন দু-ঠাঁই আবার কোথায় হচ্ছে; পাশাপাশিই তো ঘর? ও নাকি আবার হাত তুলে টাকা দিয়ে সাহায্যি করবে, আমি আর ওকে চিনি না, এই পঁচিশ বছর ঘর করছি।"

কাজেই অনু বড় মামীমার হাত ধরিয়া তাঁহারই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাদাস মর্ম্মান্তিক আপত্তি সত্ত্বেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, পাঁচ জনের কাছে মুখ রক্ষা করিতে হইবে তো? ঘরের স্ত্রীই যার দুঃখ বুঝিল না, অন্য লোকে কি আর তাহার দুঃখ বুঝিতে আসিবে?

ভোরের ঝাপ্‌সা আলোয় যে মেয়েটি শ্যামাদাসের বাড়ীর পিছনের গন্ধরাজ গাছটা হইতে ফুল পাড়িতেছে, এই মেয়েই সেই অন্নপূর্ণা। দেহটি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় চুল একরাশ। বড় মামার ঘরে খাইবার পরিবার কোনও সুখই নাই, অথচ মেয়ের এত শ্রী।

অন্নপূর্ণার বড় মামীমা বলিতেন, মেয়ের বয়স তেরো, কাজেই প্রতিবেশিনীরা তাঁহার ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিতেন কুড়ি। তাহার বয়স আসলে সতেরো। বারো বৎসর বয়সে সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, সুখে দুঃখে এতগুলি দিন তাহার এই বাড়ীতে কাটিয়া গিয়াছে।

খাওয়ারও দুঃখ, পরারও দুঃখ, খাটিতেও হয় সারা দিনরাত, তবে সুখ তাহার কোথায়? বড় মামীমা তাহাকে ঠিক নিজের মেয়ের মত দেখেন, তাঁহাকে পাইয়া সে নিজের মায়ের দুঃখও যেন ভুলিয়াছে, এই তাহার এক সুখ। দাদা চিন্ময় বোনকে বড় ভালবাসে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণার মন শান্তিতে ভরিয়া যায়। বাড়ীর সম্মুখের সুদূরবিস্তৃত পথটির দিকে চাহিয়া মন তাহার

কোথায় উধাও হইয়া যায়, অন্নপূর্ণা নিজেকে দুঃখিনী মনে করে না।

কিন্তু আজ ভোরের বেলা তাহাকে বড় বিষণ্ণ ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। ভোরেই স্নান করিয়া সে পূজার ফুল তুলিতেছে, বড় মামার আবার পূজা-আহ্নিকের ঘটা খুব। কিন্তু মুখে তাহার সরসতা নাই, চোখ দুটি কাতর। নদীর দিকেও আজ তাহার তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।

পিছন দিকে ঝুপ্‌ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। অন্নপূর্ণা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দাদা চিন্ময়। কে আবার সদর রাস্তা দিয়া অতটা ঘুরিয়া আসে, সে দুই বাড়ীর মাঝের ভাঙা পাঁচিল ডিঙাইয়াই পথ করিয়া লয়।

বোনের কাছে আসিয়া সে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কাল সত্যিই তোকে দেখতে এসেছিল নাকি ?"

অন্নপূর্ণা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহারা আসিয়াছিল। চিন্ময় ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল, "ইচ্ছে করে হতভাগা বুড়োর মুণ্ডুটা একেবারে ছাতু ক'রে দিই। কি বললে রে ওরা ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "আমার সামনে তো কোন কথা হয় নি, আমি শুধু পান দিয়ে চ'লে এলাম। তবে রাত্তিরে মামীমাতে মামাবাবুতে খুব বকাবকি হচ্ছিল, তাই শুনলাম যে ওরা বৈশাখের গোড়াতেই বিয়ে দিতে চায়। এক হাজার টাকার গহনা দেবে বলেছে, আর রুপা-দাদার সঙ্গে বুড়োর ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক ক'রে দেবে বলেছে। তারা খুব বড় লোক, আর ঐ একটি মাত্র মেয়ে ওদের।"

চিন্ময় বলিল, "কক্ষনো এ বিয়ে আমি হ'তে দেব না। তুই চ'লে আয় দেখি আমার সঙ্গে, আমি মুটেগিরি ক'রে তোকে খাওয়াব

অন্নপূর্ণা বলিল, "হাতে তোমার একটি পয়সা নেই, কোথায় কি ক'রে তুমি চালাবে ? তোমার পড়াশুনো সব মাটি হবে। মামীমা এত রুগ্ন তাকেই বা কে দেখবে ?"

চিন্ময় বলিল, "তাই ব'লে তোকে এমন ক'রে জলে ভাসিয়ে দেবে, তাই আমি দাঁড়িয়ে দেখব না। চল্ আমরা পিসিমার কাছে চ'লে যাই। খোঁজখবর না নিক, এক বার গিয়ে হাজির হলে তখুনি তাড়িয়ে দিতে পারবে না। সময় হাতে পেলে আমি যেমন ক'রে হোক গুছিয়ে নেব।"

এমন সময় খড়মের খট্ খট্ শব্দ তুলিয়া শ্যামাদাস বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "এখনও ফুল তোলা হ'ল না মা ? সূয্যি ওঠে যে প্রায় ? কে ওখানে ? চিনে নাকি ? খুব ভোরে উঠেছিস্ তো দেখি ?"

চিন্ময় তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা ফুলের সাজি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। শ্যামাদাস বলিলেন, "কি বলছিল রে তোর দাদা ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "এমনি পিসীমাদের কথা হচ্ছিল।"

শ্যামাদাস সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "কেন তারা চিঠিপত্র লিখেছে নাকি কিছু ? এত কাল পরে দরদ উথলে উঠল যে বড় ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "না, চিঠিপত্র কিছু লেখেন নি, পিসে-মশায় তো চান না মোটে যে পিসীমা আমাদের খবর নেন। মামীমা আমাকে ডাকছেন আমি যাই।"

সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

কালীতারারও ঘুম ভাঙিয়াছিল, নিজে তো কেহ সাহায্য না করিলে নড়িতেও পারেন না, তাই শুইয়া শুইয়াই অন্নপূর্ণাকে ডাকিতেছিলেন। স্বামী বা পুত্র কেহ আর এখন পারতপক্ষে তাঁহার কাছে আসেন না। ছেলে বলে, "অনিই তো রয়েছে।" স্বামী বলেন, "মেয়ে-মানুষের দেখাশুনো মেয়েতে যেমন পারে পুরুষে কি আর তা পারে ?"

অন্নপূর্ণা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল। তাহার পর প্রাতঃকৃত্যের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলেন, "তোর মামা আহ্নিকে বসেছে রে ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "হ্যাঁ।"

গৃহিণী বলিলেন, "বুড়োর মরলে নরকেও ঠাঁই হবে না। টাকাই শুধু চিনল। দেখ্, তোকে তো নিজের চেয়ে আট বছরের বড় ঐ বাণেশ্বর ঘোষের হাতে দিয়ে সুবিধে করতে চাচ্ছে। তারা নাকি রুপার সঙ্গে বড়-

লোকের মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে দেবে, অনেক টাকা দেবে তারা। ঝাঁটা মারি আমি অমন টাকার মুখে, অধম্মের টাকা ভোগে আসে না। বল্ দেখি তোর ছোটমামাবাবুকে, কোন উপায় যদিকরতে পারে।"

অন্নপূর্ণা মামীমার জন্য খই বাছিতে বাছিতে বলিল, "দাদা তো বলেছিল, তিনি বলেন, 'আমার তো এক কানাকড়ির ক্ষমতা নেই, আমি কোন্ ভরসায় দাদার উপর কথা কইব? তিনি মানুষ করেছেন, বিয়ে তিনি যেখানে দেবেন সেখানে হবে'।"

মামীমা বলিলেন, "তা আর বলবে না, সব শেয়ালের এক রা। এক মায়ের পেটে জন্ম তো? চিনেটা যদি মানুষ হয়ে উঠত, তাহলেও বা জোর করতে পারত, তাও সেও ত পরের ভাত খাচ্ছে। তোর বাপ থাকতেও নেই, কার মুখ চাইবি? অথচ এমন ক'রে তোকে জলে ফে'লে দেবে মিন্‌সে, ভাবতেও বুকের ভিতরটা কর্ কর্ করে। এমন জানলে তোকে এবাড়ী আনতাম না।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "উপায় যখন নেই তখন আর কি করবে? যা হয় হবে।" সে মামীমার দুধ, খই, জলের ঘটি সব গুছাইয়া তাঁহার হাতের কাছে আনিয়া রাখিল।

তিনি দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া বলিলেন, "দেখ্, এক কাজ কর্, ভাইবোনে মিলে পিসীর কাছে দিন কতকের জন্যে পালিয়ে যা। এ হাড়হাবাতে বুড়োর অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাক, তার পর ফিরে আসিস্।"

অন্নপূর্ণা ম্লান মুখে বলিল, "সেখানে পিসেমশাই আবার কি বলবেন কে জানে? পিসীমা তো কখনও এক লাইন চিঠি লিখেও খবর নেন্ না। আর যাবই বা অত দূরে কি ক'রে? তিনি থাকেন সেই রাণীগঞ্জে, দু-জন মিলে যেতে হ'লে অন্ততঃ গোটা-দশ টাকা হাতে থাকা চাই তো?"

কালীতারা বলিলেন, "পিসেমশাই আবার কি ঘোড়ার ডিম বলবে? দু-দিনের জন্যে মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটো যাচ্ছে, তা কি তাড়িয়ে দেবে? এমনি পিশেচ আর না। গোটা-দশ টাকায় যদি হয় তা সে আমি দেব এখন। তোরা বরং আগেভাগে একখানা চিঠি দিয়ে তোর পিসীকে জানিয়ে রাখ্।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তুমি কোথায় টাকা পাবে মামীমা? মামাবাবু তো তোমায় এক পয়সাও দেন না।"

মামীমা বলিলেন, "না দিল তো বয়েই গেল, কেন আমি কি হাঘরের মেয়ে নাকি, আমার নিজের কিছু নেই? জানিস্ আমি ঠাকুরমার বড় আদরের নাতনী ছিলাম, আমাকে নিজের সব ক'খানি গহনা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। পাছে তোর মামার চোখে পড়ে, তাই সে গহনা এবাড়ীতে রাখিই না মোটে। আমার বড় ভাজের কাছে সব আছে। আজ চিঠি দিয়ে দেব একখানা, ছোটমোট একটা কিছু বাঁধা রেখে গোটা-কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দেবে এখন।"

শ্যামাদাস পাশের ঘর হইতে হাঁক দিয়া উঠিলেন, "কি এত গল্প হচ্ছে? রান্নাবান্না চড়বে কখন? আমি অতটা পথ এই গরমে হেঁটে যাব, তার খেয়াল আছে?"

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি এঁটো বাটি-গেলাস তুলিয়া লইয়া কলতলার দিকে চলিয়া গেল। দশটা এগারোটা অবধি তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না। শ্যামাদাস নয়টার মধ্যে খাইয়া দাইয়া বাহির হইয়া যান। ট্রামে চড়িতে গেলে মাসে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা তাঁহার বাহির হইয়া যায়, অতখানি খরচ করিবার লোক তিনি নন। পঞ্চাশ বৎসর বয়স এমন কিছু বেশী নয়, তিনি শক্ত সমর্থও আছেন, অতএব হাঁটিতে বাধা কি? হাবড়ার পুল ছাড়াইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে পড়িলেই তো আপিস? তিনি হাঁটিয়াই মারিয়া দেন।

তাহার পর মামীকে নাওয়ানো খাওয়ানো আছে। কৃপাদাস সকাল আটটার আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠে না, তাহাকে গরম গরম চা জলখাবার সব করিয়া দিতে হয়। বাপের মত খই-মুড়ি খাইবার ছেলে সে নয়। চা খাইয়া সে পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। আবার সাড়ে দশটায় আসিয়া খাইয়া কাজে যায়। নিকটেই এক কাপড়ের দোকানে কাজ, খাটিতে বিশেষ হয় না, মাহিনা পনর টাকা। তা ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, আর একটি ছোক্‌রা আছে, গল্পগুজবে দিনটা মন্দ কাটে না। তাই কৃপাদাস কাজে যাইতে বিশেষ আপত্তি করে না।

তাহার পর অন্নপূর্ণা নিজে স্নান করে খায়। পাড়ার

কোনও সঙ্গিনী পাইলে মধ্যে মধ্যে গঙ্গায় গিয়া স্নানও করে, পিতলের ঘড়ায় করিয়া পূজার জন্য জলও লইয়া আসে। বাড়ীতে জলের কল আছে, কিন্তু নদীতে স্নান করিতে সে বড় আনন্দ পায়। দুপুর বেলা বিশেষ কিছু করিবার নাই, বিকালেও খুব বেশী কাজ থাকে না। দুই বেলা কয়লা পুড়াইয়া রাঁধিতে দেখিলে মামাবাবু বড় বকাবকি করেন। শীতকালে সমস্ত রান্নাই সকালে করিয়া রাখা হয়, গ্রীষ্মের দিনে গুলের জ্বালে সন্ধ্যায় শুধু ভাতটা হয়, ডাল-তরকারি সকালে রাঁধিয়া অন্নপূর্ণা জলের গামলায় বসাইয়া রাখে। বিকালে ঝাঁটপাট দিয়া, বিছানা করিয়া সে মামীমার সঙ্গে গল্প করে, নয় তো ছোটমামার বাড়ী যায়। মামাবাবু আপিস হইতে ফেরেন একেবারে রাস্তার আলো জ্বলিবার পর, তখন সে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে খাইতে দেয়। জলখাবার খাওয়ায় তিনি বিশ্বাস করেন না। পুত্র যে খালি দুই বেলা জলখাবার খাইতে চায় ইহাতে তিন দুঃখিত। বাড়ীতে একটা গাই আছে, সের দুই দুধ দেয়, কাজেই রাত্রে তিনি একটু দুধ খান এবং রুগ্না গৃহিণীও খানিকটা খান।

অন্নপূর্ণা উনানে আগুন দিয়া তাড়াতাড়ি তরকারি কুটিতে লাগিল। মামীমার কথায় তাহার মনে একটু যেন আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিয়াছিল, হয়ত বা সে পরিত্রাণ পাইতেও পারে। কাল সারাদিনটা তাহার বড় দুঃখে কাটিয়াছে।

দুপুরবেলা দাদা পড়িতে চলিয়া যায়, তাহাকে পাইবার উপায় নাই। বিকালেই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিবে বলিয়া অন্নপূর্ণা স্থির করিয়া রাখিল।

বড় মামীমার যে কথা সেই কাজ, দুপুরেই তিনি বড় ভাজের কাছে কুড়িটা টাকা পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা আজ তাড়াতাড়ি সব কাজ সারিয়া ফেলিল, কারণ দাদার কাছে গিয়া পরামর্শ করিতে হইবে। কাপড় রোদ হইতে তুলিয়া কুঁচাইয়া রাখিল, ঘর ঝাঁটপাট দিল, মামীমার চুল আঁচড়াইয়া দিল, নিজেরও চুল বাঁধিল। তাহার পর গুলের আগুন করিয়া হাঁড়িতে জল চাল দিয়া সে ছোট মামাবাবুর বাড়ী চলিল। ভাত হইতে-না-হইতেই সে ফিরিয়া আসিবে।

চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, একটু জলযোগ ও বিশ্রাম করিয়া সে আবার ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যায়, না হইলে তাহার পড়ার খরচ চলে না। সুতরাং ঠিক এই সময়টি ছাড়া তাহাকে পাইবার আর সুযোগ থাকে না।

চিন্ময় বাহিরের বৈঠকখানা ঘরেই থাকে, রাত্রেও এই ঘরেই শোয়। সবে কলেজ হইতে আসিয়া সে স্নানের চেষ্টায় চলিয়াছে, এমন সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিন্ময় বলিল, "কি রে, কি খবর ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, একটু ঘরে বসবে চল তো! অনেক কথা আছে, এমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না।"

চিন্ময় তখন গরমে ঘামিয়া সারা হইতেছে, সে বলিল, "বড় গরম লাগছে, তুই পাঁচটা মিনিট সবুর কর্, আমি গায়ে দু-ঘটি জল ঢেলেই চ'লে আসছি," বলিয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দাদার বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার লেখাপড়া বিশেষ করা হয় নাই, শ্যামাদাস স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা কিছুই দেখিতে পারেন না। সাধারণ বাংলা লেখাপড়া সে জানে, তাও লিখিবার বা পড়িবার সুযোগ কিছুই নাই। বাড়ীতে পুরাতন রামায়ণ মহাভারত ও গীতা ভিন্ন কোন বই নাই, এবং একালের সকল লেখকেরই উপর মামা খড়্গহস্ত, সুতরাং চাহিয়া আনিয়াও কোনও বই পড়িবার উপায় নাই। অথচ অন্নপূর্ণার পড়ার সখ খুব আছে।

দাদার বইগুলি বেশীর ভাগই ইংরেজী, সুতরাং বেশী কিছু সে বুঝিল না। ইতিমধ্যে চিন্ময়ও স্নান করিয়া গা মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিল। তক্তপোষের এক দিকে বসিয়া, ভিজা গামছাটা দড়ির উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "কি বলছিলি ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "বড় মামীমাও বলছেন পিসীমার কাছে কিছুদিনের জন্যে পালিয়ে যেতে। এ উৎপাত চুকে গেলে পর আবার না হয় ফিরে আসব।"

পারস্যের মসজিদ ও উদ্যান

অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত মাদ্রিদ। শিল্পী ভেলাজকেজের মূর্তি

সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক ট্যাঙ্কের কৌশল প্রদর্শন
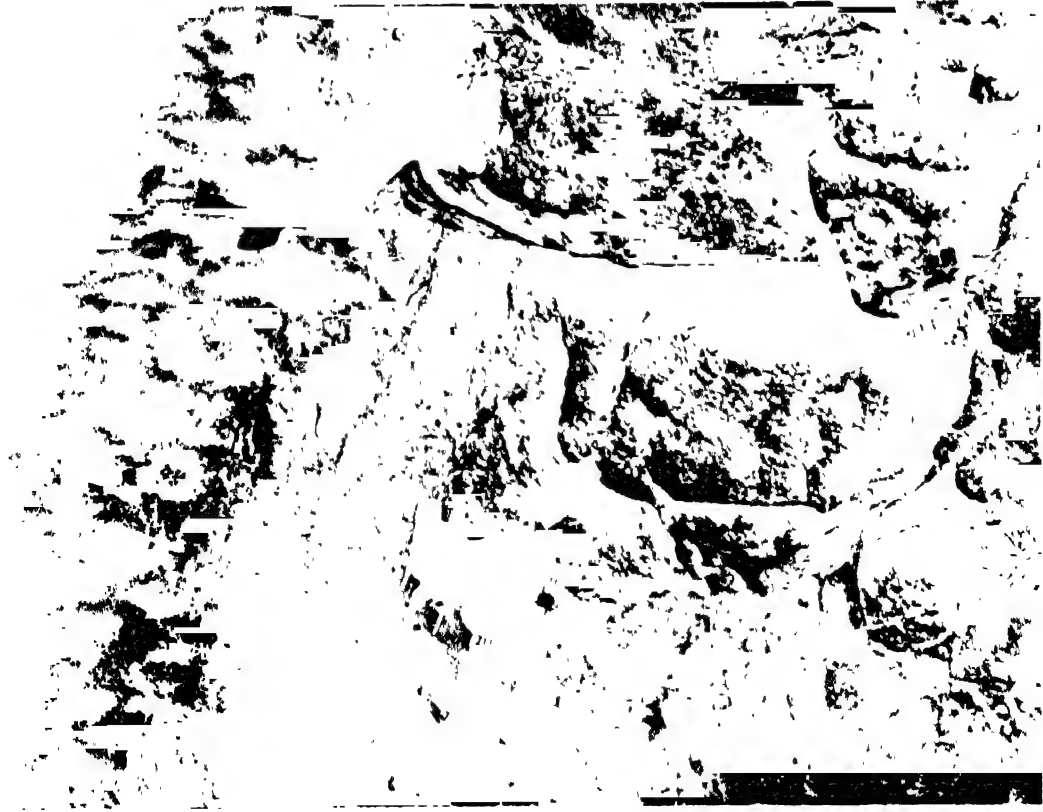
ইংলণ্ড-রাজের সমভিব্যাহারে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির লণ্ডন পরিদর্শন

চিন্ময় বলিল, "আমিও ভেবে দেখলাম, এ ছাড়া আর কিছু করবার এখন নেই। ছোট মামাবাবু ওঁর উপর কোনও কথাই বলবেন না। আমার কলেজও পরশু থেকে বন্ধ হবে, ছাত্রটিও যাচ্ছে চ'লে দেশ বেড়াতে। এই সময় পালানো দরকার।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "বড় মামীমা টাকা কিছু দেবেন বলেছেন, সেটা পেলেই আমরা যেতে পারব। তিনি বলছিলেন পিসীমাকে আগে থাকতে একখানা চিঠি লিখে খবর দিয়ে রাখতে।"

চিন্ময় বলিল, "সে-সবে কাজ নেই বাপু, তিনি আবার কি জবাব দেবেন কে জানে? পিসেমশায়কে তো চিনিস্? একেবারে গিয়ে হাজির হওয়া দরকার। তাছাড়া চিঠিপত্র কখন্ কার হাতে পড়ে ঠিক কি? সব জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের সব প্ল্যান মাটি হবে।"

অন্নপূর্ণা স্ত্রীজাতি, কাজেই বেশী সাবধানী, বেশী আট-ঘাট বাঁধার ভক্ত। সে বলিল, "তার পর গিয়ে যদি দেখ যে তারা মোটে রাণীগঞ্জেই নেই? আমরা সদাসর্ব্বদা তাঁদের খবর পাই না তো? হ'তেও তো পারে যে আজকাল আর তাঁরা সেখানে থাকেন না?"

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, "তুইও যেমন। একেবারে কিছু না জেনেই কি আর আমি সেখানে যেতে চাচ্ছি? আমাদের ক্লাসের হরিপদর বাড়ী ঐখানেই যে? পিসে-মশাইয়ের সঙ্গে তার বাবার যথেষ্ট জানাশোনা আছে। এই ক'দিন আগেই হরিপদর কাছে চিঠি এল, তাতে লিখেছেন যে তোর পিসেমশাইরা নূতন বাড়ীতে উঠে গেলেন।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তাহলে থাক, চিঠি দিয়ে কাজ নেই। তবে কি ক'রে একেবারে ওঁদের চোখ এড়িয়ে যাব তাই ভাবছি। কেউ না কেউ দে'খেই ফেলবে, একটা হাঙ্গাম না বাধে।"

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, "সে ব্যবস্থা আমি করব এখন। তুই মামার তো সারাটা দিন যায় আপিসে কেটে, রূপাদাও ঘরে থাকে না। বড় মামী দেখলে কোন ক্ষতি নেই, ছোট মামী বা ছেলেপিলেরা দেখলেও তখনই কিছু বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যাতে কেউ দেখতেই না পায় এমন ভাবে আর এমন সময় পালাব।"

অন্নপূর্ণা বড় বড় চোখে বিস্ময় ভরিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ক'রে যাবে? কখন্?"

চিন্ময় এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল, "সুকান্ত আর তার দুই বন্ধু মোটরে দেশভ্রমণে চলেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। আমাদের দু-জনকে সঙ্গে নিতে রাজী আছে। রাণীগঞ্জ ঐ পথেই পড়ে, আসানসোলের কাছাকাছি এসে আর একটা পথ ধরতে হয় কয়েক মাইলের জন্যে। সেটুকু আমরা একটা গরুর গাড়ীটাড়ি ভাড়া ক'রে পার হয়ে যাব। তুই সময় মত দু-চারখানা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখিস্, তারা তিন-চার দিনের মধ্যেই যাবে।"

অন্নপূর্ণার মন আনন্দে বিস্ময়ে দুলিয়া উঠিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া দুই পাশের মাঠ, বন, নদী, গ্রাম সব দেখিতে দেখিতে কত দূরে তাহারা চলিয়া যাইবে! তাহার আজীবনের স্বপ্ন বুঝি আজ সার্থক হইতে চলিল। এই জন্যই ঐ পথটা তাহাকে চিরদিন এমন করিয়া ডাক দেয়। আজ সে-ই দুর্দ্দিনে বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছে। অবাঞ্ছিত বিভীষিকাময় বিবাহের কবল হইতে সে আজ অন্নপূর্ণাকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে।

কিন্তু বেশী ক্ষণ বসিয়া গল্প করিবারও সময় নাই। কখন ভাত ধরিয়া উঠিবে, তাহা হইলে বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। শ্যামাদাস নিজের হাতে চাল, ডাল, তেল, চিনি সব মাপিয়া রাখেন, এক ছটাক জিনিষ এদিক্ ওদিক্ হইলে তখনই তাঁহার কাছে ধরা পড়িতে হয়। অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া চলিল, চিন্ময়ও জলখাবারের সন্ধানে রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

ভাত নামাইয়া অন্নপূর্ণা বড় মামীমার কাছে গিয়া বসিল। তিনিই তাহার একমাত্র পরামর্শদাত্রী, তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে তো? মামীমা সব শুনিয়া বলিলেন, "ভালই, ট্রেন-ভাড়া লাগবে না, টাকা ক'টা হাতে থাকবে। বিদেশে খালি হাতে যেতে নেই। তা যাদের সঙ্গে যাবি তারা মানুষ ভাল তো? তোর দাদা চেনে ভাল ক'রে?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "হ্যাঁ, সুকান্তের সঙ্গে তো ও স্কুল থেকে পড়ছে, আর এক জন তার মামাতো ভাই, আর এক জন কে বন্ধু।"

মামীমা বলিলেন, "দেখ্, ঐ যে ছোট টিনের তোরঙ্গ আছে না, ওতে খান-কয়েক কাপড়-জামা আমার বাক্স থেকে বার ক'রে সাজিয়ে রাখ্। সাত জন্মে ওসব পরিও না, পরতে আর হবেও না, শুয়েই বাকি দিন-ক'টা কেটে যাবে। তোর নিজের তো ঐ ছেঁড়া কাপড় দুখানা ছাড়া কিছুই নেই। টাকাটা কালই এসে যাবে এখন। আমার হাতের বালা-জোড়াও পরিয়ে দিলে হ'ত, তা মিন্সের তখুনি চোখে পড়বে।"

অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কাজ নেই মামীমা, এই কাচের চুড়িই আমার ভাল। আচ্ছা আমি চ'লে গেলে কে তোমাকে দেখবে? তোমার তো বড় কষ্ট হবে।"

মামীমা বলিলেন, "তোর বিয়ে দিয়ে বিদায়ের ব্যবস্থা যেখানে করেছে, সেখানে আমার ব্যবস্থা কি কিছু করে নি? আমার বিধবা বোনঝি হিরণকে এনে রাখবে ঠিক করা আছে। দু-একটা দিন কষ্ট হ'লেও হতে পারে, তার পর সে এসে পড়বে, তোর কোনও ভাবনা নেই। পিসীর বাড়ী চেপে ব'সে থাক, ছ-মাসের মধ্যে এদিকে পা বাড়াস নে।"

কর্ত্তা আসিয়া পৌছিয়াছেন, কৃপাদাসেরও সাড়া পাওয়া গেল। অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে। সেই রাত্রেই সে মামীমার নির্দ্দেশমত কাপড়চোপড় গুছাইয়া রাখিয়া দিল।

পরদিন দুপুরে মামীমার টাকা আসিয়া পড়িল। তখন বাড়ীতে কেহ নাই, তিনি টাকা-কুড়িটা ভাগ্নীর হাতে দিয়া বলিলেন, "বাক্সে তুলে রেখে দে, কত কাজে লাগবে, ভালই হ'ল রেলভাড়া লাগল না।"

সন্ধ্যার সময় চিন্ময় আসিয়া বলিয়া গেল, "কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে ওরা বেরবে, সজাগ হয়ে থাকিস্। জিনিষপত্র যা সঙ্গে নিবি গুছিয়ে রাখিস্। আমি এসে দরজায় টোকা মারলেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসিস্।"

অন্নপূর্ণার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। সত্যই এবার তাহাকে অজানায় পাড়ি দিতে হইবে। না জানি পথের শেষে কি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে

মামীমা চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ্, তোর মামা খেয়ে দেয়ে যখন ঘোষেদের আড্ডায় যাবে, তখন খান-কয়েক লুচি তাড়াতাড়ি ভেজে নিবি, আর বেগুনভাজা। গোটা কয়েক নারকেল-নাড়ুও নিবি। ঐ বড় বিস্কুটের বাক্সটা আছে না, যাতে খই রাখিস তাইতে পুরে, বেশ ক'রে ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে নিবি। কিছু খাবার না নিয়ে পথে বেরতে নেই, কতক্ষণে রাণীগঞ্জে পৌছবি তা কে জানে? তুই তো আর ছোঁড়াদের মত হোটেলে জল খেতে পারবি না?"

অন্নপূর্ণা খাবার করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া লুকাইয়া রাখিল। মামাবাবু ও তাহার পুত্র নিজ নিজ আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। মামীমাও খাইয়া দাইয়া বোধ হয় নিদ্রিতাই হইলেন। শুধু অন্নপূর্ণার চোখে ঘুম নাই, উত্তেজনায় তাহার মন অস্থির হইয়াছে। সংশয়ের দোলায় তাহার চিত্ত দুলিতেছে। ভাল করিতেছে কি না কে জানে? কিন্তু না পলাইয়া উপায়ই বা কি? এখানে থাকিলে ত রক্ষা পাইবার কোনও উপায়ই নাই।

রাত্রি গভীরতর হইতে লাগিল। শুইয়া থাকা বৃথা, অন্নপূর্ণা উঠিয়া বসিল। তাহার শয্যা বলিতে দুইখানি নিজের হাতে শেলাই কাঁথা ও একটি বালিশ। কি ভাবিয়া কাঁথা বালিশও সে বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা গুণিতে গুণিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। দাদা আসে না কেন? হঠাৎ শব্দ হইল ঠক্ ঠক্। অন্নপূর্ণা দরজা খুলিয়া দিল। চিন্ময় আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি জিনিষ নিচ্ছিস?"

অন্নপূর্ণা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জিনিষ দেখাইয়া দিল, চিন্ময় সেগুলি তুলিয়া লইয়া বাহিরের দিকে চলিল। হঠাৎ মামীমার ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল, তিনি জাগিয়াই আছেন। ভাই-বোন দুই জন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল, তিনি অস্ফুটস্বরে কি যেন আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বাড়ী ছাড়াইয়া কিছুদূরে মস্ত একটা গাছের ছায়ায় কালো রঙের একখানা মোটরকার যেন অন্ধকারে অর্দ্ধেক মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আরোহী তিন জনের ভিতর দুই জন নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছে,

এক জন ষ্টিয়ারিং হুইল্ ধরিয়া ভিতরে বসিয়া আছে, সে-ই সুকান্ত।

তাহাদের দেখিয়া সে বলিল, "চট্ ক'রে উঠে পড়, এখানে আর দেরি করতে চাই না, এরই মধ্যে একটু যেন ফরশা দেখাচ্ছে।"

যে দুই জন গাড়ীর বাহিরে ছিল তাহারাও উঠিয়া বসিল। এক জন বসিল সুকান্তের পাশে, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, চোখে মস্ত বড বড় কালো চশমা, বয়সটা কত তাহা অন্নপূর্ণা অনুমান করিতে পারিল না। আর এক জন ভিতরে তাহাদের সঙ্গেই বসিল, সে বালক বলিলেও হয়, বড় জোর চিন্ময়ের বয়সী হইতে পারে।

জিনিষপত্র পিছনে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, শুধু খাবারের বাক্সটা অন্নপূর্ণা কোলে করিয়া বসিল। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি?"

অন্নপূর্ণা লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "ও কিছু না।" খাবারের উল্লেখ কি আর করা যায়?

সুকান্ত গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে বলিল, "এক কুঁজো জল নিলে হ'ত।"

তাহার সঙ্গী ভদ্রলোক বলিলেন, "এক ফ্লাস্ক্ চা ত রয়েছে, সেটা আগে খালি হোক, তার পর কোন একটা ষ্টেশন থেকে খাবার জল ভ'রে নেব। অনেক জায়গায়ই ভাল টিউব-ওয়েলের জল পাওয়া যায়।

গলার স্বরটা বেশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত। অন্নপূর্ণা ভাবিল ইনি আবার এ ছেলে-ছোক্‌রার দলে জুটিলেন কোথা হইতে?

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। অন্নপূর্ণা দুই চোখে আগ্রহ ভরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। এখনও অস্পষ্ট আলোয় একেবারে কাছের জিনিষ ছাড়া কিছু ভাল দেখা যায় না, তবু গঙ্গা বেশ দেখা যাইতেছে। কত নৌকা তাহার বুকে, ঘুমে এখন অচল হইয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে পুকুর, মাঠ, বাগান দেখা যায়, কিন্তু এখনও পথ বেশীর ভাগ চলিয়াছে দুই সারি বাড়ীর ভিতর দিয়া, ভাঙাচোরা পুরাকালের বাড়ী সব। যাহাদের নূতন বাড়ী করার সখ আছে, টাকা আছে, তাহারা কলিকাতায় বাড়ী করে, এখানে কেন করিবে?

সুকান্ত গাড়ী চালাইতে চালাইতে বলিল, "পথটা ভাল না। সুকুমারদা, আপনি না বলছিলেন সুন্দর পথ?"

সুকুমার নামধারী ভদ্রলোক বলিলেন, "গোড়ার দিক্‌টা ভাল না, বর্দ্ধমানের কিছু আগে বেশ লাগে। চন্দননগর অবধি এমনি যাবে। তোর ভাল না লাগে আমায় দে।"

সুকান্ত বলিল, "না, আপনি তো বারো মাসই চালাচ্ছেন, আমি একটু চালাই। এখন বেশ নিরিবিলি রাস্তা। যখন ট্রাফিক্ বাড়বে তখন আপনাকে দিয়ে দেব।"

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা চন্দননগরে আসিয়া পড়িল। সুকান্ত গাড়ীর গতি কমাইয়া বলিল, "এক-এক পেয়ালা চা খেয়ে নিলে হ'ত।"

কাহারও তাতে আপত্তি নাই। গাড়ী রাস্তার ধারে রাখিয়া অন্নপূর্ণা ছাড়া সকলে নামিয়া পড়িল, সে বলিল, "আমি চা খাই না।"

সুকুমারবাবু এতক্ষণে চশমা খুলিলেন। সঙ্গীদের চেয়ে অনেক বড়ই বটে, বছর ত্রিশ বয়স হইবে। অন্নপূর্ণা তাঁহাকে এই প্রথম ভাল করিয়া দেখিল, তিনি ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছেন। ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া সকলে চা খাওয়া শেষ করিল। সুকুমার বলিলেন চিন্ময়কে, "আপনার বোন তো কিছুই খেলেন না।"

চিন্ময় বলিল, "এত সকালে ও খায় না, কিছু পরে দেখা যাবে।"

সুকুমার বলিলেন, "ফ্লাস্ক্‌টা দে তো, ঐ বাড়ীর লোকেরা উঠেছে বোধ হচ্ছে, খাবার জল যোগাড় ক'রে আনি।"

অন্নপূর্ণা ভাবিল লোকটি বেশ কাজের। জল অবিলম্বে সংগ্রহ করা হইয়া গেল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বাপের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী আসিয়াছিল, তাহার পর আর বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। তাহার চোখে সবই বড় সুন্দর লাগিতে লাগিল, বড় নূতন ঠেকিল। বিশেষ চন্দননগরের গঙ্গার ধারটি বড় সুন্দর।

সুকান্ত বলিল, "সুকুমারদা এবার আপনি সারথি হোন, আমার যা বিদ্যে তাতে দিনে গাড়ী চালানো চলে না,

রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া বাস্ সব দেখা দিচ্ছে।" সে ষ্টিয়ারিং হুইল ছাড়িয়া দিল। স্কুমার তাহার স্থানে গিয়া বসিলেন, আবার গাড়ী চলিল।

সূর্য্য উঠিয়া পড়িল। স্কুকান্ত বলিল, "খানিক বাদেই গরমে প্রাণ আইঢাই করবে। এখনও তো দোকানের রাজ্যে রয়েছি, কিছু জলযোগ ক'রে নিলে ভাল না? তোদের রাণীগঞ্জ পৌছতে বেলা হয়ে যাবে।"

চিন্ময় বলিল, "আচ্ছা, তারই চেষ্টা দেখা যাক্। খাবারের দোকান ত বোধ হচ্ছে ছাড়িয়ে এলাম, না?"

স্কুমার বলিলেন, "তা আবার পিছিয়ে যেতে বাধা নেই।"

অন্নপূর্ণা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে অনেকগুলো খাবার আছে, কিনতে হবে না।"

বড একটা গাছের ছায়ায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া সবাই নামিয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা খাবারের পুঁটুলি খুলিতে লাগিল, চিন্ময় বলিল, "খাবার তো আছে কিন্তু খাব কিসে?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "এই যে কলাপাতা রয়েছে টিনের বাক্সের মধ্যে, ওতে ক'রে লুচি আর ভাজা মুড়ে নিয়েছিলাম কিনা? এইটা বেশ তিন চার টুকরো করা যাবে।"

স্কুমার বাবু একটা খবরের কাগজ যোগাড় করিলেন, বলিলেন, "এর উপর ঢাই করা যাক।" তাহাই করা হইল, অন্নপূর্ণা নিপুণ হাতে সকলকে লুচি ভাজা ও নারিকেল-নাড়ু পরিবেশন করিতে লাগিল। ভয় হইতে-ছিল পাছে কম পড়ে, কিন্তু ভগবান্ তাহার মুখরক্ষা করিলেন, এমন কি তাহার নিজেরও কম পড়িল না। সে অবশ্য তখনই খাইতে বসিল না। এত লোকের সামনে খাইতে লজ্জা করে।

স্কুমারবাবু লোকটি অতি সপ্রতিভ, এরই মধ্যে তাহার সঙ্গে দিব্য কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "সবাইকে বেশ ক'রে খাইয়ে তো নিজের নাম সার্থক করলেন, এখন নিজে কিছু খান? চা-ও তো খান নি সকালে।"

অন্নপূর্ণা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার দাদা বলিল, "তোর এখানে খেতে লজ্জা করে তো গাড়ীর ভিতর চল্, সেখানে খেয়ে নিবি। আমরা তত ক্ষণ এখানে বসি।"

অন্নপূর্ণা তাহাই করিল। লুচি খাইয়া তো গলা শুকাইয়া গেল, এখন জল চাহিবে কাহার কাছে? দাদাও তো বেশ খানিক দূরে, সবাই মিলিয়া ফ্লাস্কের জল শেষ করিতেছে। কিন্তু স্কুমারবাবু লোকটি সত্যই কাজের, আবার কোথা হইতে ফ্লাস্ক ভর্ত্তি করিয়া আনিয়া বলিলেন, "এই নিন জল, নিজের জন্যে খাবার কিছু রেখেছিলেন?"

কথা না বলিয়া আর অন্নপূর্ণা কি করে? বলিল "হ্যাঁ, অনেক খাবার ছিল।"

চিন্ময় বলিল, "বাবাঃ, এরই মধ্যে গরম লাগছে, রাণীগঞ্জ পৌছতে পৌছতে ভাজা হয়ে যাব বোধ হয়।"

স্কুমার বলিলেন, "আর দেরি নয়, চলা যাক্।" তিনি উঠিয়া পড়িলেন, অন্যরাও আসিয়া জুটিল।

গাড়ী এবার দ্রুতবেগে ছুটিল। দুধারের দৃশ্য ক্রমেই সুন্দর হইতেছে, ছোট নদী, মাঠ, গ্রাম, পুকুর সব হু হু শব্দে পার হইয়া চলিয়াছে। বেশ রোদ উঠিয়া পড়িয়াছে, হাওয়া ঈষৎ গরম। রাস্তার দু-ধারে শ্রেণীবদ্ধ গাছ, আমগাছগুলি বোলের দীপালিতে শ্যামল দেহ সাজাইয়া পথিকের মনোহরণ করিতেছে। মাঝে মাঝে রেলওয়ে লাইন পড়ে, লেভেল ক্রসিংএর কাছে দাঁড়াইতে হয়। অল্পক্ষণের ভিতরেই বিপুল গর্জ্জন করিয়া ট্রেন আসিয়া পড়ে, মাটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে ট্রেন পার হইয়া যায়, তাহাদের মোটর আবার চলিতে আরম্ভ করে।

রোদ ক্রমেই বাড়িতেছে। অন্নপূর্ণার শ্যামল মুখশ্রী ক্রমে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছে। গাড়ী যখন একটু দাঁড়ায় তখন সে খবরের কাগজ পাট করিয়া হাওয়া খায়। স্কুমার বাবু একবার চিন্ময়কে বলিলেন, "আপনার বোনের বড় কষ্ট হচ্ছে। গরম সব মানুষের সহ্য হয় না। তাও আবার চলেছেন এমন স্থানে যেটি বাংলা দেশের মধ্যে সব চেয়ে গরম।"

চিন্ময় বলিল, "উপায় যে আর কিছু ছিল না। জানেনই তো সব।"

অন্নপূর্ণার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। ইঁহাকে সব

কথা দাদা বলিয়া দিয়াছে নাকি? তা না বলিলেই বা চলে কই? ইঁহারই তো গাড়ী, না জানিয়া শুনিয়া ইনি কেনই বা অচেনা লোকদের বহিয়া লইয়া যাইবেন?

রাস্তার একটুখানি দূরে সুন্দর পুকুর, গাছের সার দিয়া ঘেরা। বেশ ঘাট রহিয়াছে, এক দিকে একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে, পুরুষদের ঘাটে কয়েকটি বালক উদ্দাম জলক্রীড়ায় মাতিয়াছে। সুকান্ত বলিল, "ভারি লোভ হচ্ছে চান করতে।"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। গাড়ী থামানো যাক্।"

সবাই নামিয়া পড়িল। চালক বলিলেন, "সবাই একসঙ্গে গেলে চলবে না। আমি এখন গাড়ী আগলাই, তোমরা সেরে এস, তোমরা ফিরলে আমি যাব।"

ছেলেরা তাড়াতাড়ি কাপড় গামছা সাবান বাহির করিল। গরমে অন্নপূর্ণার প্রাণ আইঢাই করিতেছিল, চিন্ময় তাহাকে নামিতে বলিবামাত্র সে দ্বিরুক্তি না করিয়া নামিয়া পড়িল এবং শাড়ী জামা গামছা লইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। গঙ্গায় স্নান করা তাহার অভ্যাসই আছে, কাজেই বিশেষ অসুবিধা বোধ করিল না।

জল ছাড়িয়া আর উঠিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু দাদার তাড়ায় উঠিতে হইল। মামীমার চওড়া লালপেড়ে শাড়ীখানি পরিয়া ভিজা চুল খুলিয়া সে আবার গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

সুকুমারবাবু তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এবার আমার পালা।" তিনি দ্রুতপদে পুকুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

স্নান সারিয়া আসিয়া বলিলেন, "গরম যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে আর বেশীক্ষণ গাড়ী চালানো যাবে না। আমি বলি বর্দ্ধমান ওয়েটিং-রুমে দুপুরের মত থামা যাক। খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই হবে। রোদ পড়লে আবার বেরনো যাবে। রাত্রিটা আমার আসানসোলের বাড়ীতেই কাটানোর কথা ছিল। রাত দশটার মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাব।"

চিন্ময় বলিল, "তাই তো, অত রাতে পৌঁছলে পিসেমশাই কি ভাববেন কে জানে? সুবিধের লোক তো নয়?"

কথা হইতেছিল গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া। সুকুমার বাবু এক বার অন্নপূর্ণার দিকে তাকাইয়া চিন্ময়কে বলিলেন, "নাই বা গেলেন সেখানে, সোজা আমার ওখানেই চলুন।"

চিন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, "তা যেন গেলাম আজকের মত, কিন্তু তার পর?"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "আপনার এবং শ্রীমতী অন্নপূর্ণার যদি আপত্তি না থাকে তো তার পরের ব্যবস্থাও ওখানেই করা যেতে পারে। সুকান্তকে জিজ্ঞাসা করুন, সে মোটামুটি সুপাত্র ব'লেই আমাকে সার্টিফিকেট দেবে।"

অন্নপূর্ণা লজ্জায় লাল হইয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড।

লালগড়ের বাজার মাণিকপাল ফার্মে উৎপন্ন ২ নং ঢাকা-কার্পাস। গাছগুলি ৪ ফুট উঁচু হইয়াছে, ও প্রত্যেকটি গাছে ৫০টির বেশী গুটি ধরিয়াছে। এই তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য ৭/৮ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

বঙ্গে কার্পাস-চাষ

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য, এম-এ

বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ চলিতেছে। রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রসর জাতিসমূহ জাতীয়তার ভিত্তিতে রচিত যে-সকল সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। তবে আর্থিক সঙ্কটের সময় ঐ সকল পরিকল্পনা যে অন্তত সাময়িক ভাবে সুফলপ্রসূ হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। সে যাহাই হউক, পরাধীন ভারতের পক্ষে উক্ত জাতিসমূহের উদাহরণ বিশেষ কোনও সাহায্যে আসিবার কথা নয়, যেহেতু দেশের মুদ্রানীতি, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তি প্রভৃতি পরিচালনার ভার সত্যকার গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে না-আসা পর্যন্ত ভারতবর্ষের জন্য কোনও ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বা গ্রহণের সম্ভাবনা নাই।

তবে এ-কথা সর্ববাদিসম্মত যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের ফলে যে সামান্য ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে আসিয়াছে তাহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রযোজিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর। অন্তত যে-সকল কৃষি ও শিল্প বিষয়ক সম্ভাবনা কেবল মাত্র উদ্যম ও দূরদৃষ্টির অভাবে উপেক্ষিত হইয়া আছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়া সেগুলি পরিস্ফুরণের ব্যবস্থা করিলে দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

বাংলায় উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষের ব্যবস্থা এই শ্রেণীর একটি প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, কার্পাস চাষ বাংলায় নূতন নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গে কার্পাস-চাষের প্রচলন ছিল এবং ঢাকা, শান্তিপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, ধামরাই, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু শতাব্দী যাবৎ যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত তাহা এই প্রদেশে উৎপন্ন তুলা হইতেই হইত। মিল-জাত বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা,

মেদিনীপুরে তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল অফিসারের গৃহে উৎপন্ন ১ নং ঢাকা-কার্পাস গাছগুলি ৭ ফুটেরও অধিক উঁচু, প্রত্যেকটি গাছে দেড় শতের অধিক গুটি ধরিয়াছে। আঁশের দৈর্ঘ্য ১¼ ইঞ্চি হইতে ১½ ইঞ্চি পর্যন্ত। চিত্রে ঢাকেশ্বরী মিলের কার্পাস-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তীকে দেখা যাইতেছে—ইঁহার চেষ্টায় ঢাকেশ্বরী মিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না।

বাংলার তদানীন্তন অরাজক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু কারণে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্রশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর হইতেই বাংলা দেশে তুলার চাষ বন্ধ হইয়া যায় ও ক্রমে বীজ পর্যন্ত দুর্লভ হয়। বর্ত্তমানে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ও আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও হ্রস্ব আঁশ-যুক্ত। এদেশে তাহা-দ্বারা লেপ, তোষক ইত্যাদি হয়, সামান্য অংশ চরকায় সুতা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং অধিকাংশ পশমের সহিত মিশ্রণের জন্য বিদেশে চালান হইয়া যায়। সুতরাং এই নিকৃষ্ট-শ্রেণীর তুলা কলে ব্যবহারের অযোগ্য হইলেও ইহারও ব্যবসায়িক উপযোগিতা আছে। তবে ইহার আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত। এ স্থলে কেবল মাত্র সূক্ষ্ম আঁশ যুক্ত উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হইবে।

বাংলায় এই শ্রেণীর তুলাচাষের প্রয়োজনীয়তা অশেষবিধ—প্রথমতঃ, বিলম্বে হইলেও, বাংলা দেশ বর্ত্তমান কালোপযোগী বস্ত্র-কল-শিল্পের প্রসারে মনোযোগী হইয়াছে। এই প্রদেশে ২৫টি কাপড়ের কল চলিতেছে ও আরও ২৫টি রেজেষ্ট্রী-কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বস্ত্র-শিল্পের প্রসারের পথে সর্বপ্রধান বাধা—প্রদেশ-মধ্যে উপযুক্ত

বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির পরিকল্পনানুযায়ী মেদিনীপুরে উৎপন্ন ২৮৯ এফ. পাঞ্জাব আমেরিকান কার্পাস। এই কার্পাস কাপড়ের কলে সমাদরের সহিত ব্যবহারের যোগ্য।

শ্রেণীর তুলার অভাব। বাংলার কলগুলিকে প্রয়োজনীয় তুলা পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, মান্দ্রাজ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে অথবা আমেরিকা, মিশর, পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ক্রয় করিতে হয়। ইহাতে রেল ষ্টীমার ইত্যাদির ভাড়া বাবদ বহু টাকা ব্যয় হয় ও পড়তা অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যায়। বিশেষ করিয়া রেল কোম্পানীর পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা, আমদানী তুলার উপর করবৃদ্ধি ও ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির অনিষ্টকর ধারাগুলির কুফল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বাংলায় উৎকৃষ্ট তুলার চাষ প্রচলন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলার কাপড়ের কলগুলির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে, এবং বস্ত্র-শিল্প বিপন্ন হইলে এই প্রদেশের বেকার-সমস্যাও তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলার চাষীর পক্ষেও ধান ও পাট ব্যতীত এইরূপ একটি লাভজনক তৃতীয় প্রকার শস্য উৎপাদন করা বিশেষ হিতকর। ইহা যে কেবল অর্থকরী শস্য (cash crop) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা নয়, অবসর সময় সুতা কাটিয়া ও বস্ত্রবয়ন করিয়া চাষীদের সবিশেষ আর্থিক সাশ্রয় হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তুলা-চাষ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসায়-সংক্রান্ত বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে যাহাতে বহু সহস্র লোকের অন্নের সংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা।

এই স্থানে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। তুলার আঁশ ⅞ ইঞ্চির কম হইলে বা শক্ত ও পরিষ্কার না হইলে কাপড়ের কলে তাহা গৃহীত হয় না। অতএব এই প্রকার উৎকৃষ্ট তুলা বাংলায় উৎপন্ন হয় কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়, যেহেতু কেবল মাত্র বাংলার কলগুলিতেই বাৎসরিক অন্যূন ত্রিশ লক্ষ মণ তুলা ব্যবহৃত হয় এবং তুলার এত অধিক চাহিদা অন্য কোনও কার্যের জন্যই হয় না। বাংলায় এই জাতীয় তুলা উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর কি-না তাহাই নির্ণয় করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর নহে। অবশ্য শতাধিক বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে "এগ্রিকালচার্যাল সোসাইটি" আমেরিকান তুলাচাষের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফল সব দিক্ দিয়া সন্তোষজনক না হইলেও তুলা খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছিল এবং ফোর্ট গ্লষ্টার মিলের (বর্তমান বাউড়িয়া কটন মিল) ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ তুলা ব্যবহার করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর আর এ-বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার সংবাদ পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তুলার আঁশ

ঢাকেশ্বরী মিলের জমিতে রবিশস্য হিসাবে উৎপন্ন ১ নং ঢাকা-কার্পাস। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোনা হইয়াছে। তাহার চার মাস পরের ছবি—ফুল ও গুটি ধরিয়াছে।
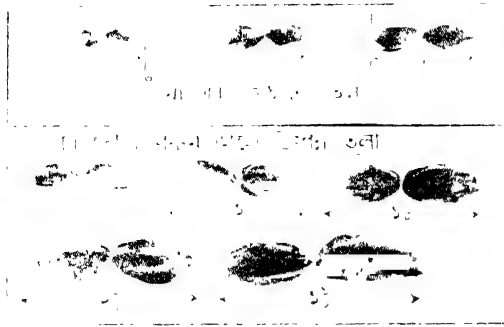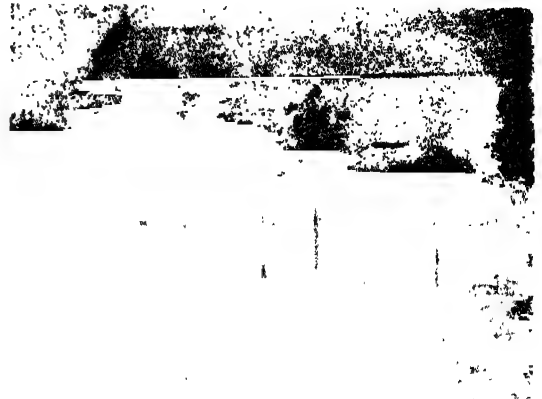
গত সাত-আট বৎসর যাবৎ প্রথমে কেশোরাম কটন মিলের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলা-গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত সাত হাজার টাকা দ্বারা ও পরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের পক্ষ হইতে বাংলা দেশের কোনও কোনও স্থানে উৎকৃষ্ট তুলা চাষের পরীক্ষামূলক চেষ্টা হয়। সুচিন্তিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য-পদ্ধতি না থাকায় প্রথম প্রচেষ্টার ফলাফল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তবে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রচেষ্টা সকল দিক্ দিয়া অতীব সন্তোষজনক বলা চলে। উক্ত মিলের কার্পাস-চায-বিশেষজ্ঞ কর্মচারী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্তী ঢাকায় এক প্রকার তুলা উৎপন্ন করিয়াছেন যাহার সূক্ষ্ম শক্ত আঁশ ১॥ ইঞ্চি লম্বা। বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষের কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তুলা হইতে পারে বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না। ঢাকেশ্বরী মিলে গত তিন বৎসর যাবৎ যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় তাহার ফলন যেমন অধিক, তাহার উৎকর্ষতাও বিশেষজ্ঞদের মতে যে-দেশের বীজ হইতে ঐ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সাফল্যে ও উৎসাহে বঙ্গীয় মিল-মালিক-সমিতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের সহিত সম্মিলিত ভাবে গত বৎসর একটি তুলা-চাষের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। তদনুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে এই ছয়টি জেলায় পঞ্চাশ বিঘা করিয়া জমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা-চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনায় বাৎসরিক মাত্র চারি হাজার টাকা এই বাবদ বরাদ্দ হইয়াছে—ইহার অর্ধেক মিল-মালিক সমিতি ও অর্ধেক গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। বলা বাহুল্য, পরিকল্পনার গুরুত্বের তুলনায় এই অর্থ অতীব অকিঞ্চিৎকর। এ-বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকতর মনোযোগ ও অর্থ বিনিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, অবস্থাপন্ন শিক্ষিত জনসাধারণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় যোগ দিলে বাংলার সকল জেলায় উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে কি-না, জন্মিলে ফলনের পরিমাণ, উৎপাদনের ব্যয়, কোন্ কোন্ জেলায় ইহার সম্ভাবনা সমধিক—ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহজে নির্ণীত হইতে পারে। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ যদি বিভিন্ন জেলায় স্বল্প পরিমাণ (এক আধ বিঘা) জমিতে উৎকৃষ্ট তুলা চাষ করিয়া দেখেন কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশে একটি অতীব লাভজনক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি সর্বদা সর্বপ্রকারে (অর্থাৎ বীজ ও উপদেশাদি দিয়া) সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং ভবিষ্যতে বহুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন

লালগড়ের রাজার মাণিকপাল গ্রামে উৎপন্ন ১ নং ঢাকা-কার্পাস গাছটি ৭ ফুট উঁচু—ইহাতে ২০০টি ফুটি ধরিয়াছে। ইহার তুলার আঁশ ১⅛ ইঞ্চি হইতে ১¼ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

হইতে থাকিলে তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে তাহা ক্রয় করিতেও প্রস্তুত। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক, সুতরাং সকলের সহযোগিতা ব্যতীত এই নূতন পণ্যটির চাষ প্রচলনের জন্য যে-সকল তথ্যাদি অত্যাবশ্যক তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। গত বৎসর মেদিনীপুরের অন্তর্গত লালগড় জমিদারীতে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির উৎসাহে রাজা বাহাদুর যোগেন্দ্রনারায়ণ সহাস রায় যে তুলা উৎপাদন করিয়াছেন তাহা ঢাকেশ্বরী মিলের ১ নং তুলা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। বিগত বৎসরের আবহাওয়া তুলাচাষের অনুকূল ছিল না, তত্রাচ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে আশানুরূপ ফল লাভ করা গিয়াছে। বর্তমান বৎসরে ব্যাপকতর পরীক্ষাদ্বারা এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এই বিষয়ে দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

গত বৎসর হইতে কৃষি-বিভাগের সেকেণ্ড ইকনমিক বোটানিষ্ট শ্রীযুক্ত এস্. জি. শার্ঙ্গপানির তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনার কায আরম্ভ হইয়াছে। এক জন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এত কাজ চালান কঠিন বলিয়া মিল-মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতির নিকট (Indian Central Cotton Committee) এক জন তত্ত্বাবধায়কের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। এই কমিটি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তুলাচাষের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাংলার মিল-মালিকগণ কটন-সেস বাবদ এই কমিটিকে প্রতি বৎসর বহু টাকা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কেন্দ্রীয় তুলা-কমিটির নিকট হইতে এ-যাবং কোন সাহায্য পান নাই। ইহার কারণ সত্যই দুর্বোধ্য। অতিরিক্ত বর্ষার জন্য গত বৎসর আশানুরূপ ফল না পাইলেও এদেশে যে বস্ত্রশিল্প-উপযোগী প্রচুর তুলা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর উৎসাহ থাকিলে এই প্রকার একটি লাভজনক চাষ ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া বাংলা দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। ইতিমধ্যেই বহু লোক ইহার কৃষি-প্রণালী জানিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আমদানী তুলার উপর শুল্ক বাড়াইবার প্রস্তাব করা অবধি এ-প্রকার অনুসন্ধান অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য ঢাকেশ্বরী কটন মিলসের কৃষি-বিভাগের সুযোগ্য কর্মচারী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রদত্ত কৃষি-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কার্পাস-চাষের জমি

বর্ষায় জল দাঁড়ায় না এ-প্রকার দোআঁশ মাটি (sandy loam) তুলা-উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী।

চাষ-প্রণালী, বপনের নিয়ম ও সময়

শীতের পর বৃষ্টি হইলেই মাঝে মাঝে চাষ ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত আরম্ভ করিতে হইবে। দুই-তিন চাষ

শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১ নং) ইহাতে ২০,০০০ টাকু ও ৫০০ শত তাঁত চলে।

দেওয়ার পর বিঘা-প্রতি তিন-চার গাড়ী গোবর-সার ও চার-পাঁচ মণ ছাই ছিটাইয়া দিয়া চষিলে ভাল হয়। এ সময়ে সবুজ সারও দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ধঞ্চে, বরবটি, শণ প্রভৃতি যাহা হয় ছিটাইয়া ঐ সকল গাছ কিছু বড় হইলে মই দিয়া ভাঙিয়া চষিয়া জমিতে মিশাইয়া দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার উষর জমিতে সবুজ সার না দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হইবে না। সাধারণতঃ নাইট্রোজেন সার গাছের অবয়ব বৃদ্ধি করে। ফস্ফেট্-জাতীয় সার নিয়মিত সময়ে দিলে ফলন বৃদ্ধি হয়। পোটাস্-জাতীয় সারে তুলার গুণ বৃদ্ধি করে। বাংলা দেশের আবহাওয়া ও মাটির গুণে এখানে স্বভাবতঃই গাছ অন্যান্য স্থানের তুলনায় বড় হয়। এজন্য নাইট্রোজেন-জাতীয় সার প্রয়োগে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গাছ ছোট হইতেছে দেখিলেই তাহা প্রয়োগ করিবেন। কৃত্রিম সার যথা—Amo Phos, Nisi Phos, Superphosphate প্রভৃতি কখনও বিঘা-প্রতি আধ মণের অধিক দেওয়া উচিত হইবে না। এ প্রকার সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে না জানিয়া দিলে ইষ্ট হইতে অনিষ্ট বেশী হইবে। সার এক শত গুণ জলের সহিত মিশাইয়া গাছের চারি দিকে দেওয়া শ্রেয়। ইহার পরেও যথেষ্ট জল দিতে পারিলে ভাল হয়। হাড়ের গুঁড়া বীজ পুঁতিবার সময় দিলে ভাল হয়। পরিমাণ বিঘা-প্রতি আধ মণ হইতে এক মণ। পোটাশ তিন মণ হইতে পাঁচ মণ চাষের সময় দেওয়া যায়, কচুরী পানার ছাই এজন্য প্রশস্ত।

নিয়মিত বর্ষার প্রাক্কালে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বপন করা হইতে গাছে গুটি পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তিন চার মাস জমিতে রস থাকা আবশ্যক। বাংলার সর্ব্বত্র নিয়মিত বৃষ্টি হওয়াতে বিনা খরচে এই সাহায্য পাওয়া যায়। তুলা হইতে আরম্ভ হইলে, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি না থাকাতে পোকার উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না।

যাহাদের জল দিবার সুবিধা আছে, তাঁহারা বৎসরের যে-কোন সময়ে বীজ বপন করিতে পারেন। তুলা বপন হইতে ফসল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ নয় মাস সময় লাগে। কোন জমিতে বার-বার এক ফসল করিলে পরবর্ত্তী বৎসর হইতে ফসলের ক্রমে অবনতি হওয়া স্বাভাবিক। জমির স্বল্পতা হেতু ঢাকেশ্বরী মিল তাঁহাদের তুলার লাইনের খালি স্থানে সার ও সবুজ সারের সাহায্যে একই জমিতে বৎসরে দুই বার করিয়া তুলা উৎপন্ন করিতেছেন। তুলা ফলিতে আরম্ভ করিলেই খালি স্থানে বীজ পোতা হয় এবং ফসল সংগ্রহ শেষ হইলেই ঐ সকল গাছ তুলিয়া ফেলিলে মাঝের চারাগুলি জোর দিয়া বড় হইয়া উঠে। একই জমিতে বহু দিন তুলাগাছ থাকিলে নানা রকম পোকার উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে। এজন্য সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত যত্ন লইতে হয়। ফসল শেষ হইলে গাছ কাটিয়া ক্ষেতে আগুন দিতে পারিলে পোকার উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না। ঢাকেশ্বরী মিল রবিশস্য হিসাবে এবার যে ১ নং ঢাকা-কার্পাস উৎপন্ন করিতেছেন তাহার একটি ছবি দেওয়া হইল।

জমি হইলে বর্ষার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে চারি ফুট অন্তর লাইন করিয়া লাইনে এক ফুট দেড় ফুট অন্তর দুই-তিনটি করিয়া বীজ দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি মাটির নীচে পুঁতিতে হয়। এভাবে বিঘা-প্রতি দেড় হইতে দুই সের বীজের আবশ্যক হয়। বীজ পুঁতিবার পূর্বে ঐ সকল লাইনে বিঘা-প্রতি আধ মণ হাড়ের গুঁড়া, এক মণ খৈল ও চার-পাঁচ মণ ছাই মিশাইতে পারিলে ফলন ভাল হয়। যাহারা চাষের সময় এ সকল দিয়াছেন তাহাদের এ সময়ে আর দিতে হইবে না।

তুলার বীজ কখন এবং কতটা দূরে বুনিতে হইবে তাহা অনেকটা স্থানীয় অবস্থা ও মাটির উর্বরতা এবং চাষের গভীরতার উপর নির্ভর করে। সকল রকম তুলার গাছ লম্বায় সমান হয় না এবং বোনার পর ফসল হইতে সমান সময় লয় না। একই জাতীয় তুলাগাছও জমির অবস্থা বিবেচনায় দুই হইতে আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছে রৌদ্রবাতাস না পাইলে তুলার ফলন ভাল হয় না। গাছ পাঁচ-ছয় ফুটের উপর লম্বা হইবে মনে হইলে অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহার বেশী লম্বা হইলে খুঁটি দিয়া সোজা রাখিতে হয়। বপনের সময়— বর্ষার প্রাক্কালে কি তাহারও দুই-এক মাস পরে হইবে তাহাও স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় ঠিক করিতে হইবে। বীজ পুঁতিবার চার-পাঁচ মাসের মধ্যে তুলা ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ষা সর্বত্র সমান স্থায়ী হয় না। বর্ষা শেষ হইলে যাহাতে তুলা ফলিতে আরম্ভ করে সেই ভাবে বীজ বপন করিতে হইবে।

বীজ পুঁতিবার দশ-বার দিনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হয়। চারা ছয় ইঞ্চি বড় হইলে নিড়াইয়া দিতে হয়। এক ফুট আন্দাজ লম্বা হইলে খুঁড়িয়া গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং একটি করিয়া সতেজ চারা এক স্থানে রাখিয়া বাকী চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দুই ফুট উপরে অনেকে ডগা ছাঁটিয়া দেয়। নিয়মিত বর্ষা আরম্ভের পূর্বে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া আলবাঁধা শেষ করিতে হইবে।

গাছের যত্ন

মাটি আলগা ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে ডান ও খুঁড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ষার জল যাহাতে জমিতে না জমে তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জমিতে কাদা থাকিলে মাটি ঝরঝরে না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে কোন কাজ করা অনুচিত। গাছের লাইনের মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকিলে তাহাতে শীতকালের উপযোগী কফি, শালগম, ওলকপি, বীট, মূলা, মটর, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, পটল প্রভৃতি তরকারি কিংবা অন্য রবিশস্য দেওয়া যাইতে পারে।

ফসল সংগ্রহ

কাপাস ফলিতে আরম্ভ করিলে তাহা গুটি হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসিলে পক্কাবস্থায় পরিষ্কার রূপে ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে। কার্পাসের সহিত যাহাতে কোন রকম শুষ্ক পত্র কিংবা অন্য ময়লা না থাকে সে-বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া প্রায় তিন মাস পর্যন্ত কার্পাস সংগ্রহ করিতে হয়। প্রথমে যে কার্পাস হয় তাহা পরবর্তী কার্পাস হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কাজেই তাহা পৃথক্ রাখিলে ভাল হয়। যে-সকল কার্পাস পরিপুষ্ট হয় নাই কিংবা রোগ-গ্রস্ত তাহাও পৃথক রাখিতে হইবে। তিন-চার মাস পর্যন্ত কার্পাস হইতে থাকে।

ফসলের পোকা ও প্রতিকার

বিছা-জাতীয় এবং এক রকম ছোট লাল উড়ো গোল পোকা গাছের পাতার বিশেষ অনিষ্ট করে। হুকার জল, তামাক-পাতা-ভিজান জল, কেরোসিন সলিউশন অর্থাৎ সাবানের জল ও কেরোসিন একত্রে বোতলে ভরিয়া ঝাঁকিয়া তাহা ১০০ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া, অথবা বরডো মিক্‌শ্চার অর্থাৎ তুঁতে ও চুনে মিশ্রিত জল ১০০ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া,—ইহার যে-কোনটি পিচ্‌কারী দিয়া কিংবা চূণ ও গন্ধকের গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ফ্লিটের সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দিলে এ সকল পোকা নিবারণ হয়। কার্পাস ফলিতে আরম্ভ করিলে, বিশেষ সে সময়ে বৃষ্টি থাকিলে এক প্রকার লম্বা লাল উড়ো পোকা দেখা দেয়। সিগারেটের খোলা কৌটা কিংবা ঐরূপ কোন পাত্রে কতক জল ভরিয়া তাহাতে দু-চার ফোঁটা

কেরোসিন মিশাইতে হয়। ঐ সকল পোকা ধরিয়া ঐ কৌটার জলে ছাড়িয়া দিলে কিংবা যেখানে ঐ সকল পোকা বিচ্ছিন্ন বা মিলিত ভাবে দেখা দেয় কেরোসিনমিশ্রিত জলপূর্ণ কৌটাটি নীচে রাখিয়া ডালে টোকা মারিলে, ডাল নড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোকাও ঐ জলে পড়িয়া মরিয়া যায়। এই সকল পোকা সাধারণতঃ তুলার গুটিতে ডিম পাড়ে। ঐ গুটির রসই পোকাগুলির খাদ্য। কাজেই এ প্রকার গুটির কার্পাস ভাল হয় না। সূচনাতে ইহার প্রতিকার না করিলে সম্পূর্ণ ফসলই নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। পোকা দেখা দেওয়া মাত্রই অবিলম্বে এই উপদ্রব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আয়ব্যয় ও সুবিধা

বিঘা-প্রতি সাধারণতঃ চার-পাঁচ মণ কার্পাস অথবা সওয়া মণ দেড় মণ তুলা হইয়া থাকে। সরকারী কৃষি-বিভাগের Second Economic Botanist, Bengal, P. O. Tejgaon, Dacca অথবা Secretary, Bengal Millowners' Associationকে লিখিলেই তাঁহারা কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান দেন। অল্প পরিমাণে হইলে তাঁহারা নাম মাত্র মূল্যে বীজ সরবরাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বীজ হইতে তুলা উৎপন্ন করিলে এবং এ-সকল তুলা ভাল হইলে মিল-মালিকগণ অন্যূন পঁচিশ টাকা মণ হিসাবে সেই তুলা খরিদ করেন। সাধারণতঃ কার্পাসে ৭ ভাগের ২ ভাগ তুলা, ৪॥ ভাগ বীজ এবং আধ ভাগ আবর্জনা থাকে। বীজের মূল্য প্রতি-মণ দেড় টাকার কম হয় না। কাজেই বিঘা-প্রতি পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়। তুলার বীজ পরিমিত ভাবে খাওয়াইলে গো-মহিষাদির শরীর সবল ও স্নিগ্ধ থাকে। তুলার বীজ থেঁতলাইয়া সিদ্ধ করিয়া দু-বেলায় দুই হইতে চার পাউণ্ড হিসাবে দৈনিক খাইতে দেওয়া হয়। সকাল বেলার সিদ্ধ বীজ বৈকালে এবং রাত্রের সিদ্ধ বীজ সকালে খাইতে দেওয়া সাধারণ নিয়ম। বীজে যে সামান্য তুলা লাগিয়া থাকে তাহা কিংবা মাঝে মাঝে সিদ্ধ না করিয়া কাঁচা খাওয়াইলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সংগৃহীত কার্পাসের বীজ হাতে চালান কেকুরির (hand ginning machine) সাহায্যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অনায়াসে পৃথক্ করিতে পারে। চাষীরা অবসরকালে এই ফসল উৎপন্ন করিতে পারে। যেখানে সব কাজ খরচ দিয়া করাইতে হয় সেখানে বিঘা-প্রতি পনর হইতে কুড়ি টাকা খরচ হয়। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে সাত হইতে দশ টাকা খরচ হইতেছে। তুলার সহিত অন্য ফসল করিলে তাহাতেও কিছু আয় হইবে। ইক্ষু, পাট প্রভৃতি হইতে তুলার চাষ কম লাভজনক হয় না। বিশেষ যে-সকল উঁচু জমিতে পাট কিংবা ইক্ষু তেমন লাভজনক হয় না, সেখানে তুলাচাষ বিশেষ লাভজনক। বাংলার বহু স্থানে তুলাচাষোপযোগী বহু জমি পাওয়া যায়। উৎপন্ন তুলা বিক্রীর কোন অসুবিধা নাই। শিক্ষিত যুবকগণ বিস্তৃত ভাবে ইহার চাষ করিয়া অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। এদেশে ইহার চাষ প্রচলন হইলে বীজ-ছাড়ান ও গাঁট-বাঁধা কল (Ginning & Pressing Factory), পাটের মত খরিদ বিক্রীর ব্যবস্থা, বীজ হইতে তেল প্রস্তুত করা, প্রভৃতি কাযে বহু লোক নিযুক্ত হইয়া বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে আশা করা যায়।

লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন বিষয়ে উপরিউক্ত বিবরণ ঢাকেশ্বরী মিলের, সরকারী কৃষি ফার্ম্মের এবং গত বৎসরে ছয়টি জেলায় আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত হইল। এমতাবস্থায় ইহার চাষ সম্পূর্ণ নূতন বলিলেই চলে। বাংলা দেশে যাঁহারা লম্বা আঁশের তুলার চাষ করিতেছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, আয়ব্যয় হিসাব, সুবিধা-অসুবিধার বিষয় অনুগ্রহ করিয়া সেকেণ্ড ইকনমিক বোটানিষ্ট, বেঙ্গল, কিংবা বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতিকে (Bengal Millowners' Association) জানাইলে এ-বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হইবে। বলা বাহুলা, এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে বাংলা দেশের চাষী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নব-প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলগুলি সমভাবে উপকৃত হইবে। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১৯০৮ সাল, আষাঢ় মাস। শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আসিয়া রাত্রে বোলপুর ষ্টেশনে নামিলাম। ভয়ঙ্কর বৃষ্টি, তখনকার দিনে গো গাড়ী ছাড়া আর যান ছিল না। পরদিন সকালে পদব্রজেই আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। বোলপুরে তখন এত বাড়ীঘর ছিল না। ষ্টেশন হইতে পথে নামিয়াই শুনিলাম কবি গাহিতেছেন, "তুমি আপনি জাগাও মোরে।" কী শক্তি তখন তাঁহার কণ্ঠে ছিল! শান্তিনিকেতনে তাঁহার দেহলী নামক গৃহের দোতলায় তিনি দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন আর বোলপুরে তাহা শুনা যাইতেছে! অবশ্য তখন বোলপুরের পথ বড় নির্জ্জন ও শান্ত ছিল।

তখন আশ্রম ছিল অনেক ছোট। অধ্যাপকরা সকলেই থাকিতেন ছাত্রদের সঙ্গে। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পত্নী পরলোকগমন করায় একমাত্র তিনি ছেলেপিলে লইয়া একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিতেন। সেই বাড়ী আর এখন নাই। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন তাঁহার দেহলী নামক ছোট বাড়ীটির দোতলায়।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম আমার পুরাতন বন্ধু কাশীর সতীর্থ শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যকে ও দাদা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যালকে। কাশীতে সকলেই আমাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফাঁস করিয়া দিলেন।

আশ্রমে তখন লোকসংখ্যাও খুব কম। প্রতি বেলায় ছাত্র ও অধ্যাপকে মেলিয়া জন পঞ্চাশেকের পাত পড়ে। ভূপেন্দ্রদাদা আশ্রমের আয়ব্যয় দেখেন ও হিসাবপত্র রাখেন। আলাদা কোনো আপিস নাই। অধ্যাপকদের মধ্যে এক-এক জন রান্নাঘরের সব ব্যবস্থার তদারক করেন।

কবির দেহলী বাড়ীটি অতিশয় ক্ষুদ্র। ছোট বাড়ীই তাঁহার পছন্দ। বড় বাড়ীতে নাকি মানুষ আপনাকে হারাইয়া ফেলে। ছোট জিনিষের প্রতি কখনও তাঁহার অশ্রদ্ধা দেখি নাই। তাই শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না এবং ক্ষুদ্র আরম্ভকে তিনি কোনো দিন অবজ্ঞা করেন নাই।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে আশ্রম তখন ভরপুর। এমন প্রতিভা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এখনকার দিনে দুর্লভ। যে "গুরুদেব" নামে কবি এখন সর্ব্বত্র পরিচিত সেই নামটি সতীশচন্দ্রই রাখিয়া গিয়াছেন। হয়ত সতীশ-চন্দ্র এই নামটি পাইয়াছিলেন পরলোকগত আচার্য্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হইতে। কিন্তু আশ্রমের সকলের কাছে শুনিয়াছি তাঁহারা ইহা পাইয়াছেন সতীশচন্দ্রের কাছে। যাঁহারা সতীশচন্দ্রের "গুরুদক্ষিণা" বইখানি পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন সতীশচন্দ্র কি মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত অকালে তিনি হঠাৎ মারা যান।

এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই দেশের প্রাচীন সাধনার প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। তাঁহার গভীর দেশপ্রীতির কথা বলা আমার নিষ্প্রয়োজন। বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষার আয়োজনে, শিবাজী-উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, স্বদেশী গানে, 'স্বদেশ ও সঙ্কল্প' 'নৈবেদ্য' 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি রচনায় 'অত্যুক্তি' 'অপমানের প্রতিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধে, 'মেঘ ও রৌদ্র' 'রাজটীকা' প্রভৃতি গল্পে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। গোরার যুক্তিগুলি তো অনেকেরই স্বদেশনিষ্ঠার খোরাক ও বক্তব্য জোগাইয়াছে। এই সব লেখা লিখিয়াও তাহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না। তিনি প্রাচীন কালের আদর্শে দেশের ভবিষ্যৎ মানুষদের গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রাচীন ভারতে তপোবনে শিশুরা স্নেহে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবৃত হইয়া বৃহৎ আদর্শের মধ্যে দিনে দিনে মানুষ হইয়া উঠিত।
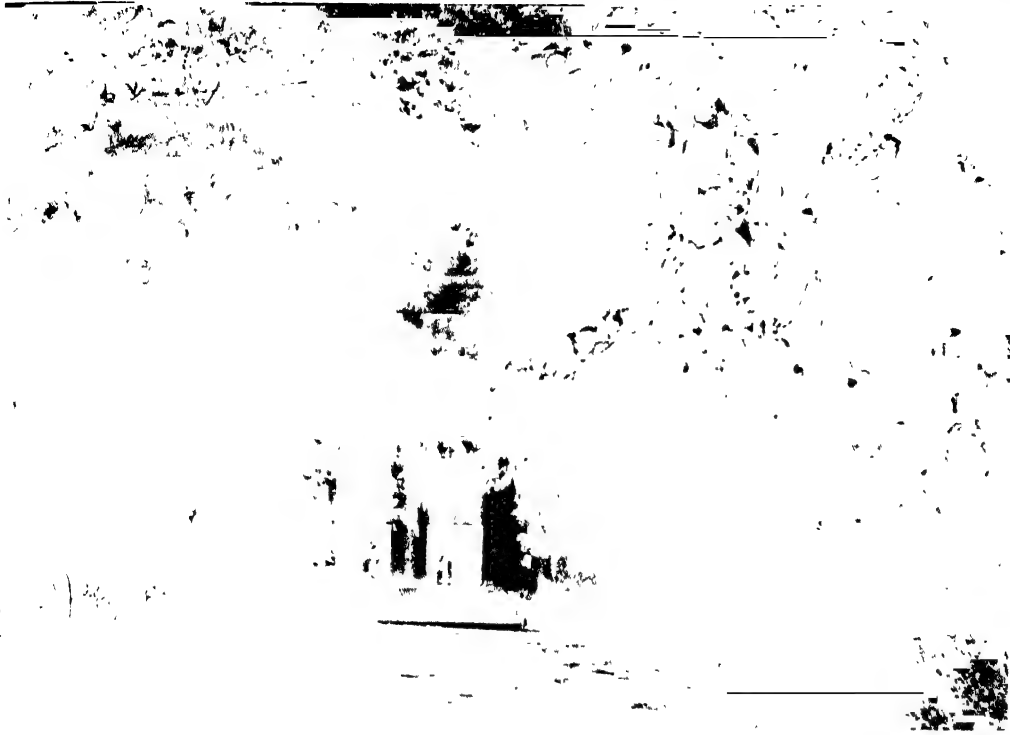
শান্তিনিকেতনের প্রধান প্রবেশদ্বারে আমলকী-বীথি। চিত্রে শান্তিনিকেতনের প্রথমতম গৃহ ও বর্ত্তমান অতিথিশালা দেখা যাইতেছে।

সাধারণ বিদ্যালয়ের শুষ্ক প্রাণহীন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সুকুমার শিশুরা যে দুঃখ পায়, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য গুরুগৃহবাসী শিষ্যদের আদর্শে শিশুগণের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। বোলপুরের নিকট বিশাল নির্জ্জন প্রান্তরে মহর্ষি-দেবের যে একটি শান্ত তপস্যার ক্ষেত্র ছিল সেইখানে তিনি দুইটি মাত্র ছাত্রকে লইয়া কাজে হাত দিলেন। তখন তিনি নিঃসম্বল এবং বাহিরে বাধা-বিঘ্নের অন্ত নাই। এমন লঘু আরম্ভকে খুব অল্প লোকেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার দিব্যদৃষ্টির কাছে এই সামান্য অঙ্কুরের মধ্যেই ভবিষ্যৎ মহাবনস্পতির সূচনা দেখা দিয়াছিল। ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা এবং ক্ষুদ্র বলিয়া কিছুকে অবজ্ঞা না করার মধ্যে যে একটি বিরাট মহত্ত্ব আছে তাহা সকলে ধরিতে পারেন না।

তাঁহার কবিতায়ও দেখি—

বীর্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে না করিতে হীন জ্ঞান

—নৈবেদ্য, ৯৯

তাঁহার বীর্য্যবান চরিত্রের মধ্যে এই হীনতা কখনও দেখা যায় নাই। কবি তাঁহার জমিদারীর তথাকথিত ছোটলোক প্রজাদের এত স্নেহ করিতেন যে অনেকে তাহা মনে করিতেন তাহাদিগকে বৃথা প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। প্রজারাও তাঁহাকে অসামান্য শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে জেলার সরকারী জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা মহত্তর মনে করিত। একবার মফস্বলে এক জমিদারী কাজে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহাকে যাইতে হইবে। তাঁহার এক দুর্দ্ধর্ষ প্রজা তাঁহার জন্য একখানা মাত্র পালকী জোগাড় করিল। ভাবখানা এই, ম্যাজিষ্ট্রেট তো চাকর-মাত্র, সে হাঁটিয়া যাউক না কেন? বাহিরে দুর্দ্ধর্ষ হইলেও

শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর বাসের স্মারকরূপে তথায় প্রতি বৎসর গান্ধী-দিবস প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ঐ দিন বিদ্যালয়ের ভৃত্যদের ছুটি দিয়া অধ্যাপক ও ছাত্রগণ রন্ধন, সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা পরিষ্করণ ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকেন। বাম দিকের চিত্রে শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়কে আবর্জ্জনা পরিষ্করণে নিযুক্ত দেখা যাইতেছে।

ইহারা অন্তরে ছিল শিশুর মতই সরল, এবং কবির প্রতি তাহাদের অতুলনীয় ভালবাসা।

আশ্রমে আসিয়া দেখি এখানকার চাকর অনেকেই তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি। আশ্রমের দুই-চার জন "নিষ্ঠাবান" লোক ছাড়া আর সবাই তাহাদের হাতে শুধু জল কেন, অন্নও খান। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে এবং ইহার মূলে সেই সময়ে কোনো রাজনৈতিক হেতু থাকিবার কথা ছিল না। তাঁহার বলিষ্ঠ মানবপ্রেমের মধ্যে কোনো দিনই কাহারও প্রতি অকারণ ঘৃণার কোনো স্থান ছিল না।

ছোট শিশুদের প্রতিও দেখিলাম তাঁহার শুধু স্নেহ নহে, তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা বিরাজিত। তাই তিনি শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে বা তাহাদের শিক্ষায় দীক্ষায় কোথাও অনাদর সহিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য নামে পরিচিত জোলো সাহিত্য তাঁহার অসহ্য, কারণ তাহাতে শিশুজীবনের প্রতি দুঃসহ অপমান প্রকটিত। শিশুদের সঙ্গে কবির অপূর্ব্ব সখ্য (intimacy)। শিশুদের পড়াইবার প্রণালীও তাঁহার চমৎকার। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তখনই অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থও রচিত হইয়াছে। শিশুদের লইয়া তিনি তখন পশুপাখী তরুলতা প্রভৃতির সেবা করেন। সন্ধ্যায় তাহাদের লইয়া কত আমোদ-প্রমোদের মজলিস জমাইয়া তোলেন।

"মীটিং" জিনিষটা আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছি। সেটা এখনও আমাদের দেহ-মন-প্রাণের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশ খায় নাই। কিন্তু "মজলিস" আমাদের পুরাতন। আমাদের দেশের আনন্দময় মজলিসগুলি সব গেল কোথায়? আমাদের দেশে আনন্দ-উৎসবের যে সব ধারা অন্তহিত হইয়া আসিতেছে, দেখিলাম তাহার জন্য কবির চিত্তে খেদের অন্ত নাই। আনন্দ-উৎসবের জন্য তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা পরবর্ত্তী কালে তাঁহার Philosophy of Leisure নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কানাডাতে তিনি এই বক্তৃতাটি দেন। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে তাঁহাদের একটি মজলিস ছিল। গীতিরচয়িতা কবি স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি তাহাতে যুক্ত ছিলেন। 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'বিনি পয়সায় ভোজ' প্রভৃতি রচনা করিয়া কবি বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ আনন্দ-রসের জন্য একটি প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঠাট্টা তামাশা তীব্র বিদ্রূপ satire প্রভৃতিতেও কবি অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের মজলিস ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। দিবসের কর্ম্মের অবসানে সন্ধ্যাকালে শিশুদের লইয়া তিনি বসিতেন। তাহাদের জন্য চমৎকার সব গল্প রচনা করিয়া তিনি বলিতেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি হেঁয়ালি-নাট্যও রচিত হয়। এই হেঁয়ালি-নাট্য প্রথা বিদেশ হইতে আমদানি করা। তাহার নাম Charade।

লাসার সমভূমি হইতে চারি শত ফুট উচ্চে দলাই লামার প্রাসাদ

চীনের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী হাইনান দ্বীপের হাই-হো নগরী। বর্ত্তমানে এই দ্বীপ জাপানের অধিকারে।

শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য এই নির্দ্দোষ আনন্দের আয়োজন তিনি বাংলাতে প্রবর্ত্তিত করেন। শিশুরা এই সব নাট্য সুন্দর ভাবে অভিনয় করিত। তাহা ছাড়া তাহাদের আবৃত্তি, পাঠ, গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। তখনও তিনি নৃত্যশিক্ষায় হাত দেন নাই। ছেলেদের জন্য 'মুকুট', 'বাল্মীকিপ্রতিভা', মেয়েদের জন্য 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রভৃতি অভিনয়ে যে-রসটি ফুটিয়া উঠিত তাহা অনবদ্য। সারাদিনব্যাপী কাজের মধ্যে শিশুরা এই সব আনন্দে ভরপুর সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে চলিত কবির গান রচনা ও শিশুদিগকে গান শেখান। তাঁহার এই কাজে কবির প্রধান সহায় ছিলেন স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও এই সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। আশ্রমের সন্ধ্যাগুলি গল্পে অভিনয়ে আবৃত্তিতে গানে ভরপুর হইয়া উঠিত।

এই সব উৎসবসভা বসিত কখনও বা ঘরে কখনও বা বাহিরে আশ্রমের শালবীথির তলে। কখনও দল বাঁধিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেরা আশ্রমসমীপে পারুল-ডাঙ্গায় শালবনে বা খোয়াইর পাথুরিয়া ময়দানে গিয়া উৎসব জমাইত। তাহার মধ্যে যখন হঠাৎ কবি স্বয়ং গিয়া যোগ দিতেন তখন উৎসব আরও জমিয়া উঠিত। জ্যোৎস্নার আলোকে ছেলেরা ফিরিবার পথে কবির সঙ্গে হাঁটিবার পাল্লা দিত। প্রাণপণে দৌড়িয়াও ছেলেরা তাঁহাকে হারাইতে পারিত না। কবি তখন রীতিমত হাঁটা-চলা করিতেন। বোলপুর ষ্টেশন হইতে তখন আশ্রমে যাইবার একমাত্র উপায় ছিল গো-যান। দ্রব্যাদি গো-গাড়ীতে রাখিয়া কবি ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়াই আসিতেন, এক-এক সময় ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া এমন দ্রুত চলিয়া আসিতেন যে ছেলেদের হার মানিতে হইত। তবু তাহাদের আনন্দের অবধি ছিল না।

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের বন্ধু। সতীশ রায় তখন পরলোকগত। তখনকার দিনে কবির খুব গভীর সাহিত্যালাপ চলিত অজিতকুমারের সঙ্গে। সকালে রাত্রিতে শীতকালের মধ্যাহ্নে শাল-বীথির পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদের আলোচনা চলিতে থাকিত। এক একদিন রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছে তবু আলোচনার বিশ্রাম নাই।

আমার পুরাতন বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা ছাড়া তখন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখক বিখ্যাত জগদানন্দ রায় ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যরসিক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অধ্যাপক আশ্রমকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। আমি আসিবার প্রায় এক বৎসর কাল পরে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় আসিয়া আশ্রমে যোগ দেন। অজিত চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহার ছাত্র। ইংরেজি অধ্যাপকের কাজে প্রয়োজনবশতঃ অল্প দিনের জন্য নেপালবাবুকে তাঁহার ছাত্র অজিতবাবুই ধরিয়া আনেন। রাজনৈতিক কারণে অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া নেপালবাবু যাইতেছিলেন ওকালতী ব্যবসায়ে যোগ দিতে। এইখানে আসিয়া তাঁহার ওকালতী গেল ভাসিয়া। তাঁহার বাকি কর্ম্মময় জীবন তিনি আশ্রমেই কাটাইয়া দিলেন। তখন আশ্রমের পরিচয় দেশের সীমাতেই বদ্ধ। শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বিদেশী সুহৃদ্‌গণ তখনও এখানে আসিয়া যোগ দেন নাই।

কবির গানের ভাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। যেমন ছিল তাঁহার গাহিবার শক্তি তেমনি ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব সুর-ধারণার শক্তি। তাঁহাকে পাইয়া যেন কবির সুরের প্রবাহ মুক্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল। এমন সহৃদয় গীতময় মানুষ এই সংসারে বিরল। গাহিতে বলিলে তাঁহার আর আপত্তি ছিল না। যোগ্য অযোগ্য কাহাকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না। সুরের দানসত্র খুলিয়া দিয়া উৎসবের আনন্দে আশ্রমকে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছিলেন। কবির যখন নূতন নূতন গান ও সুরের তাগিদ আসিত তখন সময়ে অসময়ে ডাক পড়িত দিনেন্দ্রনাথের। এক-এক সময় দিনের মধ্যে ও রাত্রিতে সাত-আট বার নূতন সুরের জন্য ডাক আসিয়াছে; কিন্তু দিনুবাবুর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, সব সময়েই প্রসন্নমুখে তিনি উপস্থিত। কবির অফুরন্ত সুরগঙ্গাকে মহাদেবের মত ধারণ করিতে পারেন এমন একমাত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

আমি আশ্রমে আসিলাম বর্ষাকালে। কবির অন্তরের

মধ্যে যে ঋতু-উৎসবের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা আমাদিগকে জানাইয়া কয়েক দিনের জন্য প্রয়োজনবশতঃ তিনি বাহিরে গেলেন। কাজেই কি করিয়া বর্ষা-উৎসব করা যায় সেই সমস্যা সবার মনে উপস্থিত হইল। দিনুবাবু লইলেন বর্ষা-সঙ্গীতের ভার, অজিতবাবু রবীন্দ্র-কাব্য হইতে ভাল ভাল সব কবিতা আবৃত্তির জন্য লাগিয়া গেলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ হইতে বর্ষার ভাল ভাল সূক্ত আমরা সংগ্রহ করিলাম। বর্ষাকালের উপযুক্ত করিয়া প্রাচীন কালের মত উৎসব-বেদী সাজান হইল। নীল বস্ত্রে প্রাচীন কালের মত সহজ গম্ভীর-নেপথ্যে বর্ষার উৎসবটি সমাপ্ত হইল। গুরুদেব আসিয়া উৎসবের সাফল্যের কথা শুনিয়া খুব খুশী হইলেন।

১৯০৮, বর্ষা গেল। খুব ভাল করিয়া শারদ-উৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন বেদ হইতে ভাল শারদ শোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটা নাট্য-সূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার পর তৈরি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক। এই গানগুলির মধ্যে দুই-একটি পুরাতন গানও আছে। "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে" গানটি ১৮৯৪ সালের পত্রে উল্লিখিত (ছিন্নপত্র, পৃঃ ২০১)।

আশ্রমেও আমার ঠাকুরদাদা নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি মনে ভাবিয়াছিলেন আমি ভাল গাহিতে পারি। তাই 'শারদোৎসবে' ঠাকুরদাদার ভূমিকাটি আমাকেই দেওয়া হইবে ঠিক করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম গান আমার দ্বারা চলিবে না তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার উপর সন্ন্যাসীর পার্ট করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়া ভারি বিপদ বাধিল। অগত্যা ঠিক হইল সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব; তাহাতে গান থাকিলেও, গানের সংখ্যা অনেক কম। তাই কথা হইল গানের সময়ে বাহিরে আমার অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে কবিই গান করিবেন। শারদোৎসব নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, "এত দিনে এমন এক জন লোক দেখা গেল যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন।" সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে এই জন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছে। যেখানেই যাইতাম লোকে গানের জন্য করিতেন পীড়াপীড়ি। "পারি না" বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার স্বকর্ণকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবেন। বহুদিন পর্য্যন্ত আমার দুর্গতির আর অন্ত ছিল না।

ইহার পর আশ্রমে নানা সময়ে 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বেকার রচনা 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মুকুট' প্রভৃতি নাটক ছেলেরা অভিনয় করিয়াছে, মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' করিয়াছে, 'রাজা ও রাণী', 'তপতী' প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই নাট্যগুরু ছিলেন কবি স্বয়ং, অনেক সময়ে প্রধান অভিনেতাও তিনিই। অভিনয় করিবার ও শিক্ষা দিবার শক্তি যে তাঁহার কিরূপ অসাধারণ তাহা আর আমার এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। এই সব অভিনয় ব্যাপারেও তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

শারদোৎসবের পর পূজার ছুটিতে আশ্রমের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া আমরা এলাহাবাদ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, ফতেপুরশিকরী, দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে বাহির হই। যাত্রা করিবার সময় একটি এস্রাজ হাতে দিয়া দিনুবাবুকে কবি বলিলেন, "এই যন্ত্রটা সঙ্গে রাখিস্। যখন আর উপায় থাকিবে না তখন দেখিস এই যন্ত্রের সুরে গান গাহিয়া তোরা পথ পাইবি।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী পরে আমাদের বড় কাজে লাগিয়াছিল।

আশ্রমের দৈনিক জীবনের মধ্যে দেখিতাম কবি সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে কাজ করিতেন। কেবল

ইংরেজিতে কিছু লিখিলে তিনি তাহা "পাস করা" সব অধ্যাপকদের না দেখাইলে ভরসা পাইতেন না। বলিতেন, "আমি বিদ্যালয়ে কখনও লেখাপড়া করি নাই, ইংরেজি লিখিব কেমন করিয়া?"

তাঁহার ইংরেজি চমৎকার ইহা বলিলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। 'গীতাঞ্জলি' রচনার পরে যিনি ইংরেজি রচনার জন্যও সারা জগতে বিখ্যাত হইলেন তখনকার দিনে তাঁহার এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব মনে হইলে এখন হাসি পায়।

দেহলী নামে কবির বাড়িটি ছিল অতি ক্ষুদ্র, তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল ততোধিক সাদাসিধা। তাঁহার একটি মাত্র ভৃত্য ছিল, উমাচরণ। ভৃত্যের সঙ্গে কবির খুব হাস্যপরিহাস চলিত। উমাচরণ ছিল বেশ সমজদার রসিক লোক। উমাচরণের অকালে মৃত্যু হইল। তার পর তাঁহার আর ঠিক যোগ্য সমজদার রসিক ভৃত্য জোটে নাই। তার পর সাধু নামে তাঁহার এক ওড়িয়া ভৃত্য বহুদিন ছিল, সে ছিল বেজায় গম্ভীর প্রকৃতির। কবি বলিতেন, "ওকে দেখিলে আমারও সমীহ হয়, ও যেন আমার গার্জেন (guardian), বাপ্‌রে ও কি গম্ভীর।" বহুদিন পরে সাধু বিদায় লইলে ভৃত্য আসিল বনমালী। তাহাকে কবি আদর করিয়া ডাকেন নীলমণি বা লীলমণি। সেই নীলমণিও এখন বুড়া হইয়াছে, সে অতি সাদাসিধা মানুষ। কবির কোনো কোনো গানে এইসব ভৃত্যদেরও একটু স্মৃতি জড়িত আছে। একবার বনমালী অর্থাৎ নীলমণি কবির জন্য এক গ্লাস সরবৎ লইয়া আসিয়া দেখে তাঁহার কাছে বাহিরের কেহ কেহ বসিয়া আছেন। সে-বৎসর তখন শীতকাল যায়-যায়, বসন্ত আসি-আসি করিতেছে। বনমালীও সরবৎ-হস্তে ঢুকিবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া একটু ইতস্তত: করিতেছিল। বনমালীর ভাব দেখিয়া কবির মনে হইল যেন বসন্তের সেই ইতস্তত: ভাব। মাধবী ফুল তখন এক-এক বার দুই-একটি ফুটিতেছে আবার এক-এক বার প্রচণ্ড শীতে যাইতেছে মরিয়া। কবির চিত্ত ছিল সেই ভাবে ভরপুর। বনমালীর এই ইতস্তত: ভাব দেখিয়া কবি হাসিয়া গান ধরিলেন,

> হে মাধবী দ্বিধা কেন,
> আসিবে কি ফিরিবে কি?
> আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি?
> বাতাসে লুকায়ে থেকে, কে যে তোরে গেছে ডেকে,
> পাতায় পাতায় তোরে পত্র যে সে গেছে লেখি।
> যখন দখিন হ'তে কে দিল দুয়ার ঠেলি
> চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি
> বকুল পেয়েছে ছাড়া, কামিনী দিয়েছে সাড়া
> শিরীষ শিহরি উঠে দূর হ'তে কারে দেখি।

নিজের প্রায় সব কাজই তখন তিনি আপন হাতে করিতেন। সহজে কাহাকেও আপন টেবিলটা গুছাইতে দিতেন না। কাপড়চোপড় তখন তাঁহার খুব বেশি ছিল না। কিন্তু তাহাই নিজে এমন ভাবে ধুইয়া গুছাইয়া ব্যবহার করিতেন যে মনে হইত যেন তাঁহার অনেক আছে। এইখানে তাঁহার "গল্পগুচ্ছের" নয়ানজোড়ের বাবু "ঠাকুরদাদা"কে মনে পড়ে।

দূর হইতে তাঁহাকে জানিতাম শুধু কবি বলিয়া, এখানে আসিয়া দেখি তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগীসেবা প্রভৃতি সবই তিনি নিপুণ ভাবে চালনা করিতেন। তখন আশ্রমে একজন বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছাত্রদের দেখিতেন। কিন্তু কবি নিজেই ছিলেন যথার্থ চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের বহু পুস্তক তাঁহার ছিল, এবং সেগুলি তিনি অতিশয় যত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্য, পথ্য, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে তিনি বিস্তর পুস্তক পড়িতেন।

আমাদের দেশ দরিদ্র, লোকের খাদ্য জোটে না। রান্নার দোষে যে আবার তাহারও অপচয় হয় ইহা তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিত। তাঁহার পর আবার রুচির দোষে আমরা ফেন ফেলিয়া দিই, তরকারির খোসা বাদ দিই, ঝালমশলাদির আতিশয্যে খাদ্যকে প্রাণহীন করিয়া তাহার আসল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ করি ইহাতে তাঁহার অতিশয় দুঃখ হইত। এই সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কোন ও বিচার বা সিদ্ধান্তকেই তিনি উপেক্ষা করিতেন না। দরিদ্র দেশে এই সব বিচার না করিলে

উপায় নাই। তিনি বলিতেন, "আমাদিগকে পার হইতে হইবে ঝড়ের সাগর—নৌকা জীর্ণ, বোঝাই অতিরিক্ত, ইহার পর যদি আবার তলায় ফুটার দিকে লক্ষ্য না রাখি তবে মৃত্যু অবধারিত।"

খাদ্য সম্বন্ধে তিনি চিরদিন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী। যাহাতে শরীরের কল্যাণ হয় সেই ভাবেই যেন আমাদের রুচি গড়িয়া উঠে ইহাই তাঁহার মত। একবার আশ্রমে চিন্তামণি শাস্ত্রী নামে এক দক্ষিণী পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, নিম্বপত্র খাইলে শরীরের উপকার হয়। তার পর কবি বহু দিন নিম্বপত্র খাইয়াই প্রায় দিনপাত করিতেন। নিমপাতা বাঁটিয়া তার সরবৎ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে পান করিতেন। ভাইটামিন-বাদ চলিত হইবার পর তিনি শাকপাতা কাঁচাই খাইতে চান। চিরদিনই তিনি চিনি হইতে গুড় ভালবাসেন এখন ভাইটামিন-সিদ্ধান্তের পর তাঁর গুড়ের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

বিরাট আদর্শ ও সত্য তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়, ইহা সবাই জানেন। কিন্তু সেই আদর্শসিদ্ধির পূর্ণতার জন্য কত খুঁটিনাটি (detail) বিষয় তিনি ভাবিতে পারিতেন তাহা সবাই হয়তো জানেন না। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রচালনার নিয়মাবলী পরে পরে যেমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার সেই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। "স্বদেশী সমাজে"র যুগে দেশ ও জনপদ চালনার জন্য সকল খুঁটিনাটি ধরিয়া চমৎকার একটি scheme অর্থাৎ পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাহা আর এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে লোকে বুঝিতে পারিতেন এই দিকে তাঁহার কি শক্তি ছিল। 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রবাবুর মুখে, বা গোরার মুখে যে-সব সমস্যা তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের অন্তরের সব ব্যথা ধরা পড়ে। অনেক স্থানে তিনি আপন গভীর ব্যথাকেই লঘু ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

চালনায় যেমন শক্তি তাঁহার ছিল চালিত হইবার শক্তিও তাঁহার ছিল অসাধারণ। আশ্রম-চালনার জন্য অধ্যাপকসভাতে তিনি কখনও আপন মতের দ্বারা অন্যদের মতকে চাপা দিতে চাহেন নাই। আশ্রমে ছোট শিশুরাও আপন বিচার আপনাদের বিচারসভায় নিজেরা নিষ্পন্ন করিত। এই সব বিষয়ে সকলের বিচারবুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও নির্ভর ছিল। কাহাকেও কোনও ভার দিলে তাঁহাকে তিনি সেই বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। বার বার বৃথা হস্তক্ষেপ করিতেন না। আপন মহত্ত্বের দ্বারা সকলের কাছে তিনি বড় দাবি করিতে পারিতেন।

তখন বিদ্যালয় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। সম্বল সামান্য বলিয়া আপিস বলিয়া কিছুই ছিল না। ক্রমে সর্ব্বাধ্যক্ষের পক্ষে এক জন কেরাণীর প্রয়োজন হইল। অর্থাভাবে লোক নিয়োগ অসম্ভব। সকলেই ভাবিতেছেন কি উপায় করা যায়। কবি বলিলেন, "আমি প্রতিদিন আসিয়া সেই কাজ করিব।" সকলেই বিপদে পড়িলেন। অনেক দিন কবি এই কাজ যথারীতি করিয়া গিয়াছেন, তার পর অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হয়।

সত্য ও আদর্শের প্রতি ধৈর্য্য থাকায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিবার শক্তিও ছিল অপরিসীম। আশ্রমে সময়ে সময়ে এমন অনেকে আসিয়াছেন মনে প্রাণে এখানকার আদর্শের সঙ্গে যাঁহাদের মিল নাই, তাঁহার কাছে হয়ত সেই সব বিষয়ে বহু অভিযোগ গিয়াছে, কিন্তু ধীর ভাবে তিনি আশ্রমের অন্তর্নিহিত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছেন এবং অনেক সময় দেখা গিয়াছে তাঁহার পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এইরূপ এক ক্ষেত্রে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "এক বার আমার মতামত লইয়া আমার পিতৃদেবের কাছে অভিযোগ গিয়াছিল। ধীর ভাবে পিতৃদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'কোনও ভয় নাই, যিনি পরম সত্য তিনি আছেন, সবই ক্রমে ঠিক হইয়া যাইবে।' জীবনে যেই শিক্ষা তাঁহার কাছে পাইয়াছি, তাহার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।"

শুধু ছোট ছেলেদের বা অসহায় প্রজাদের জন্য নহে সকল সুকুমার ও দুর্ব্বল প্রাণের প্রতি ছিল তাঁহার সহজ একটি প্রেম ও দরদ। অসহায় প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য নিজ জমিদারীতে তিনি বহু পূর্ব্বেই পল্লীসেবার কাজ পত্তন করিয়াছিলেন। সেই যুগে পল্লীসেবার কথা বলায় অনেক বিজ্ঞজনের কাছে তিনি উপহাসাস্পদ হন। চারি দিকের লোকের দৃষ্টি হইতে যাঁহাদের দৃষ্টি আগে চলে তাঁহাদের এই

দুঃখদুর্গতি অনিবার্য্য। শিশুদের জন্য আশ্রম-রচনার প্রস্তাবে তিনি চারি দিক হইতে তখনকার দিনে সহায়তার বদলে অনেক বাধাই পাইয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যখন সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলেন তখন কবি তাহাতে বাধা দিতে গিয়া সবারই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। অথচ তখন যে-সব স্বদেশভক্তগণ তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন আজ তাঁহারাই অনায়াসে তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে চলিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনে তাহা বলিয়া তিনি নিষ্কৃতি পান নাই।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে কবি তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন এবং তাহার পরেই নাটকটি একাধিকবার আশ্রমে অভিনীত হয়। সেই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র কবির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অবাঙালী কেহ কেহ তখন এই দুঃখ করিতেন, "অহিংস উপায়ে অন্যায়ের প্রতিকারের কথা যদি কবি তাঁহার কবি-জনোচিত ভাষায় প্রকাশ করিতেন তবে বড়ই ভাল হইত।" আমি ইঁহাদিগকে বলিলাম, "বার বৎসর পূর্ব্বে, কবি এই সব কথাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত নাটকে লিখিয়াছেন, কাজেই এখন তাহার পুনরুক্তি না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহা এক বার দেখিতে পারেন।" তাঁহাদের মধ্যে এক জন বাংলা ভালই জানিতেন। তিনি বইখানা দেখিতে চাহিলেন। কলিকাতায় এই কথাবার্ত্তা হয়। বাজারে বইটা না পাওয়ায় শ্রীযুত রামানন্দবাবুর কাছ হইতে বইখানা আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি পড়িয়া খুব খুশী হইলেন। বলিলেন, "বইখানা অবিলম্বে নানা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে।" বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তার পর অনেক দিন পরে বইখানা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই বইখানার অনুবাদ হয় ইহা অনেকের অভিপ্রেত নহে।" অনুবাদ করা আর হইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুকুমার দুর্ব্বল প্রাণের জন্য কবির চিত্তে নিরতিশয় একটি দরদ ছিল। তাই তিনি তখন ছেলেদের আশ্রমের মত মেয়েদের জন্যও একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে চাহেন। ১৯০৮।৯ সালের কথা। তখন বালকদের একটি আশ্রমের জন্যই ঋণভারে তিনি হাবুডুবু খাইতেছেন। তার পর মেয়েদের চালনার জন্য যোগ্য লোক পাওয়াও সহজ নয়। তবু তিনি দুই-তিনটি মেয়েকে লইয়া পরীক্ষাধীনভাবে কাজ সুরু করিয়া দিলেন। স্থান কোথায়? তাই তিনি নিজ বাসগৃহ দেহলীটি মেয়েদের জন্য দিয়া নিজে অন্যত্র সরিয়া গেলেন। নিজের কন্যাদেরও ঐ মেয়েদের সঙ্গেই থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

দেহলীর সংলগ্ন নূতন বাড়ীতে তাঁহার দুই কন্যা তাঁহাদের এক দিদিমার সঙ্গে বাস করিতেন। কবির তিন কন্যা ছিলেন, কিন্তু মধ্যম কন্যা তখন পরলোকগত। কবির ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে মুঙ্গেরে বেড়াইতে গিয়া কলেরায় মারা যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ তখন শিক্ষার জন্য আমেরিকায় ছিলেন। কবির পত্নী ইহার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন। এই সব নানা শোক পর পর কবির জীবনকে আঘাত করিয়াছিল, তবু তাঁহাকে কখনও বিচলিত দেখি নাই। তাঁহার অন্তরের দুঃখশোক তিনি চিরদিন অন্তরেই বহন করিয়াছেন। এই দৃঢ়তার কথা সকলকে বুঝান অসম্ভব। এই আদর্শেই কবি যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই দৃঢ়তায় শিক্ষা পাইয়াছিলেন তিনি উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে। মহর্ষির জীবন ও সাধনা তিনি যে চিরদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাতেও এই আদর্শটি তাঁহার জীবনে দিন দিন গভীর হইয়া অধিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই উপনিষদের পরবর্ত্তী কালে নানা সময়ে যে সব ভাবোচ্ছ্বাস-ময় অসংযত আদর্শ ও সাধনাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার দিকে তিনি আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল তপোবনের ব্রহ্মনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ঋষিদের আদর্শ। বিজ্ঞানে জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহচন্দ্রতারার গতিতে একটি অপূর্ব্ব সংযম ও ছন্দ আছে বলিয়াই তাহা তাঁহার কাছে ছিল এত প্রিয়।

উপনিষদের ভাষা গদ্য, তবু তার মধ্যে কি অপূর্ব্ব 'ব্যালান্স' অর্থাৎ ছন্দের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যটি তাঁর জীবনে তিনি পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার শিক্ষায় কাব্য ও বিজ্ঞানের অপরূপ সামঞ্জস্য। গ্রামের সরল জীবনযাত্রা ও নগরের শিক্ষাদীক্ষাকে যুক্ত করিয়া যে তপোবনের আদর্শ তাহাই তাঁহার ধ্যেয় বস্তু। তাঁহার জাতীয়তা সার্ব্বভৌম ভাবের বিচ্ছেদ সহিতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

তাঁহার কাছে হরগৌরীর মত প্রেমযোগে যুক্ত। তাই তিনি বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি না পাইয়া সেই মুক্তি খুঁজিয়াছেন প্রেমে।

এই জন্য তাঁহার কর্ম্মজীবনের মধ্যেও বৈচিত্র্যের আর অন্ত নাই। যখন কোন একটি বিশেষ ভাবে ও রীতিতে তাঁহার কাব্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তখনই কবি তাঁহার অন্তরস্থিত এই সহজ ছন্দবোধের দ্বারা সচেতন হইয়া উঠিয়া রেশমের কোষকীটের মত নিজের চারি দিকের বন্ধন এক সময় নিজেই কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। এইরূপে তাঁহার জীবনে কত বার কত ভাবে তিনি আপন অন্তরস্থিত প্রাণবস্তুটিকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আবার কত বার সেই সেই পুরাতন প্রকাশ-পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই দেখি বিরুদ্ধতাকে তিনি এই যোগদৃষ্টির বলে হরগৌরীর মত "বাগর্থাবিব" করিয়া যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাবের সঙ্গে সেবা ও জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্ম যুক্ত। নিজের জীবনে যখন ভাবে ও সেবায় বিচ্ছেদ দেখিলেন তখন তাঁহার বিখ্যাত কবিতা—"এবার ফিরাও মোরে"। সীমার ও অসীমের মধ্যে বিরোধকে তিনি মানেন নাই। "প্রকৃতি"র স্থিতি ও "পুরুষে"র মুক্ত ভাবের কথাই সাংখ্যাদি শাস্ত্রে দেখি—কিন্তু এই বেদনা তিনি অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার "কচ ও দেবযানী"তে অথবা তাঁহার "যেতে নাহি দিব" কবিতায়। পুরুষকে নারী নানা ভাবে চাহিতেছে বাঁধিতে। বাঁধিতে না পারিয়া যে তাহার ব্যথা তাহাই বিশ্বচরাচরকে করিতেছে ব্যথিত। এই ব্যথা বিশ্বানুভূতির মূলে বিরাজিত।

রাজনীতিতেও কোনও দিন তিনি না ছিলেন মডারেট, না ছিলেন এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট। কোনও দলেই তিনি নাম লেখাইতে পারেন নাই বলিয়া ক্রমাগত সকল দিকের সর্ব্বপ্রকার নিন্দা ও আঘাত তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। অথচ সেই কারণেই পাবনা কনফারেন্সে দুই দলকে সামলাইবার কাজে একমাত্র তিনিই কর্ণধার হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার আদর্শ নারী ভোগ্যাও নহেন দেবীও নহেন। "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতার এবং চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে তাঁহার এই আদর্শটি স্পষ্ট হইয়াছে। "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন এই সংসারের মধ্যেই স্বর্গ বিরাজিত। "বৈষ্ণব কবিতা"য় তিনি দেবতাকে প্রিয় করিয়া প্রিয়কে দেবতা করিয়াছেন।

"শান্তিনিকেতন" উপদেশগুলি যে প্রেমময় চিত্ত হইতে নিষ্যন্দিত সেই প্রেমরসসিক্ত চিত্ত হইতেই তাঁহার নাটক অভিনয় চিত্র নৃত্য প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত। তাই সকলে তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম।

উপনিষদের ছন্দোময় গদ্য হইতেই তাঁহার বাংলা গদ্যে ছন্দের ঐশ্বর্য্য। তাঁহার "জয়পরাজয়" প্রভৃতি রচনা গদ্য-ছন্দের অপূর্ব্ব নমুনা। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে এই ছন্দই তিনি ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লেখাতে ও চিত্রশিল্পে একই নটরাজের ছন্দোময় যোগানন্দের নৃত্য। বাংলা গানের মধ্যে ভাষা ও সুরে যে যোগ চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল তাহাই তিনি আপন গীত-রচনার মধ্যে আরও ফুটাইয়া তুলিলেন। এই কারণেই নৃত্য ও গীতকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

বাল্যকালে তাঁহার চিত্রে যে অনুরাগ ছিল তাহার পরিচয় আবার মিলিল তাঁহার শেষ বয়সে। বৃদ্ধ বয়সে তাহাকেই তিনি তুলিয়াছেন জাগাইয়া। এই সব নানা উপকরণ তাঁহার জীবনকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষাতে ছন্দোময় করিয়া তুলিয়াছে—"আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে।"

এত দিকে কবির প্রতিভা এত বিচিত্র ভাবে খেলিয়াছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাই তাঁহার যোগ্য জীবনী-লেখক পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার প্রতিভাকে খণ্ডিত করিতে গেলেও দোষ হয়, অথচ সকল দিকের প্রতি সমান ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন এমন যোগ্য লোকও দুর্লভ।

জীবনে কোথাও তিনি অসুন্দর বা বেসুর সহিতে পারেন না। তাঁহার এক বয়স্য আত্মীয় এই বিষয়ে আমাদিগকে চমৎকার একটি গল্প বলিয়াছেন। "রবি কাকা যখন বিলাত হইতে ফিরিলেন তখন তাঁহার সব দামী দামী বিলাতী সুট বৃথা ঘরে পড়িয়া রহিল। তাই সেগুলি এক দিন তাঁহার কাছে চাহিলাম। কিন্তু তা দিতে তিনি রাজি হইলেন না। আর কোন উপায়ে আদায় করিতে না পারিয়া এক উপায় ঠাওরাইলাম। তাঁহার সব প্রিয় গান আমার কণ্ঠের দারুণ বেসুরে গাহিতে লাগিলাম। তিনি একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাধ্য হইয়া আমাকে সবগুলি সুট দিয়া নিবৃত্ত করিলেন।"

তাঁহার সমস্ত জীবনের মূলসূত্রই হইল সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগের ও সৌন্দর্য্যের ছন্দ।

সেই ছন্দ ও সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার শত-ধারাময়ী কলাগঙ্গায় সাগরসঙ্গমে।

[প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্র তিনখানি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১২

শনিবার যদি বা কাটিয়া গেল—রবিবারের সুদীর্ঘ অবসর দেখিয়া অমিয় ভীত হইয়া পড়িল। আহার সারিয়া কি করিবে সে? সারা দুপুর নিরবচ্ছিন্ন অবসর, গল্প করিবার লোক নাই, কাজ করিবার হেতু নাই, হাতের কাছে পড়িবার মত বইও নাই। আবার কি সে বিশ্বজিতের সন্ধানে ছুটিবে? তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে হানা দিয়া, আর একটি প্রাণীকে বঞ্চিত করিয়া নিজের ফাঁকা মুহূর্ত্তগুলিকে হাসি-গল্পের দ্বারা পূরণ করিয়া লইবে? তাহার চেয়ে, কলিকাতার পথে পথে ঘুরিলেও তো অনায়াসে সময় কাটিয়া যায়। চক্ষুর কার্য্যকরী শক্তি এখানে সহস্রগুণ—যা কিছু নূতন দেখাইয়াই তো মনকে সে ভুলাইতে পারে। মানুষের হাতের রচনা বিশ্বশিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে। যেখানে যেটি রাখিলে মানায় সেইখানেই সেটি রাখা হইয়াছে—শিথিল ভঙ্গীর কোন চিহ্নই নাই। প্রথম দর্শনে মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে বই কি!

ঘুরিতে ঘুরিতে অমিয় ময়দানে আসিয়া পড়িল। এখানে ভ্রাম্যমাণ নরনারীর অভাব নাই। চীনাবাদাম, ডালমুট ভাজা, সুগন্ধি গোলাপ জলে ভিজানো আক, কচি শশা দুইখানা করিয়া কাটা, আলু-কাব্‌লি ও ফুচ্‌কা কচুরি ইত্যাদির বোঝা লইয়া অক্লান্তকর্ম্মী হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা এধার ওধার ঘুরিতেছে। উহারা প্রকৃতিকে হয়ত বা বাল্যকাল হইতেই তুচ্ছ করিতে শেখে, এবং মানুষের মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারে। হাঁটিতে হাঁটিতে যে-পথিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিংবা সামান্য তৃষ্ণায় যাহার মুখকান্তির আর্দ্রতা কমিয়া আসিতেছে, তাহারই কাছ ঘেঁষিয়া মনভুলান স্বরে বিক্রেয় জিনিষের রসনারোচক নামগুলি উচ্চারণ করে কি করিয়া? হাঁটু পর্য্যন্ত ময়লা ছেঁড়া কাপড় তুলিয়া, ঈষৎ ফরসা ফতুয়াটি গায়ে চাপাইয়া এবং ময়লা একটি কাপড় বা গামছা মাথায় বাঁধিয়া মাঠের মধ্যে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কত ক্রোশই যে ইহারা অতিক্রম করিতেছে! আগেকার দিনে গিনির মালা গলায় গাঁথিয়া সঞ্চয়কে সঙ্গে লইয়াই ফিরিত, এখন সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের মহিমা ইহারা বুঝিয়াছে। ভিক্ষায় সম্মান রক্ষা করার ধাতু ইহাদের প্রকৃতিগত নহে, মরুভূমির মধ্যে জলাভাবে ও সরস খাদ্যাভাবে যাহাদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠিতে পারে, বাংলা মুলুকের সহস্র রকমের প্রলোভন তাহাদের বিলাসী করিয়া তুলিবে কোন্ পথ দিয়া। সুতরাং মন তাহাদের দৃঢ়, চক্ষু তাহাদের সেই জন্মপল্লীর বালুসমুদ্র-অভিমুখী; প্রবাসের দীর্ঘতর দিন কাটাইতে মমতা বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন অনাবশ্যক মনে করে।

অমিয় এক পয়সার চীনাবাদাম কিনিল। ময়দানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার সময় বা একা একা বেড়াইবার সময় মন এবং চক্ষু যখন তন্ময় হইয়া থাকে, তখন অজ্ঞাতসারে রসনাকে সহযোগী করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করে না। পকেট হইতে একটি একটি বাদাম বাহির করিয়া হাতে খোসা ভাঙিয়া যখন সে রসনাকে উপহার দেয় এবং দন্ত ও জিহ্বা সাহায্যে তাহা উদরসাৎ হয় তাহা হয়ত দৃশ্য-দর্শনরত চক্ষু ও কল্পনাবিভোর মনের অগোচরই থাকিয়া যায়। কোন কিছু না থাকিলে শুধু বেড়াইতে বেড়াইতে বাদাম চিবাইবার সময়টিও উপভোগ করা যায়।

রবিবারের দ্বিপ্রহর হইলেও ভ্রাম্যমাণ নরনারীর অভাব ছিল না। সূর্য্যের তাপ আছে, গাছের ছায়ায় বসিয়া কেহ গল্প, কেহ বা গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে।

কেহ পকেট হইতে আড়-বাঁশী বাহির করিয়া ফুঁ দিতেছে।

গাছতলায় না বসিয়া অমিয় মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

"অমিয়বাবু যে, নমস্কার।"

অমিয় দেখিল ফণীবাবু আধশোওয়া অবস্থায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

ফণীবাবুর সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল।

ফণীবাবু উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "শ্যামবাজার থেকে পাল্লা মেরে এসেছেন এত দূর বেড়াতে?"

অমিয় বলিল, "একা-একা বাসায় ভাল লাগল না, দিনের বেলায় ঘুমোনো অভ্যেস নেই। আপনি কেন এলেন?"

ফণীবাবু বলিলেন, "আমি তো প্রতি রবিবারই আসি। সপ্তাহে এই একটি দিন মাত্র প্রকৃত ছুটি পাই।"

অমিয় বিস্মিতনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল!

ফণীবাবু বলিলেন, "আপনি ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবেন না। আপনারা তো সুখী লোক মশায়। আপিসটুকু করলে রোজই পাঁচটার পর ছুটি, আমার অদৃষ্টে সে-সুখটুকু জোটে না।"

অমিয় বলিল, "আর কোন কাজ করেন বুঝি?"

ফণীবাবু সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড়বাবুর বাড়ীতে এটা ওটা করতে হয়। লোকটি আপিসে দেখেন এত কড়া, কিন্তু সংসারের কোন কাজ করতে হ'লেই পাঁচ বছরের ছেলের চেয়েও অবোধ। তাঁকে চালিয়ে নিতে হয়।"

"তাঁর সংসার দেখেন তো আপনার সংসার দেখেন কে?"

"দেখেন ভগবান। বউটা শক্ত—চালিয়ে নিতে পারে। বিশ্বজিৎদার ওখানেই বাসা—ওঁরাও আপনার মত দেখেন। ভাবছেন রবিবার দিনটা তো অনায়াসে··· কিন্তু মশায়, সাধ ক'রে আগুনে হাত দিলে কি পোড়ে না? পোড়ে। একেই তো বউ আমার উপর খাপ্পা হয়ে থাকে, তার উপর এমন দুপুরটুকু হাতে পেয়ে নষ্ট করি কেন?" একটু থামিয়া বলিলেন, "সে জানে না যে আমি ময়দানে আসি। জানে বড়বাবুর বাড়ীতে রবিবারের দুপুরেও কাজের ভিড়। অথচ বড়বাবুর কাছে বলা আছে—রবিবার সকালে এক বার দেশে না গেলে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা হয় না। কাছেই দেশ, বড়বাবু আপত্তি করেন না।"

অমিয় ফণীবাবুর কথায় কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, "ধরুন এই সময় বড়বাবু যদি হঠাৎ বেড়াতে এসে আপনাকে দেখতে পান?"

ফণীবাবু বলিলেন, "তা হ'লে বলব, এই মাত্র দেশ থেকে ফিরছি; এই দেখুন, গামছাটিও সঙ্গে আছে।"

"যদি আমি ব'লে দিই আপনি দেশে যান নি?"

"তা কি কেউ লাগায় নি ভাবেন? বহু বার লাগিয়েছে। স্ত্রীর হঠাৎ অসুখ করেছে বলে দেশে যেতে পারি নি—এ কৈফিয়ৎও কত বার দিতে হয়েছে।"

অমিয়র কৌতুক-প্রবৃত্তি কখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সে বলিল, "এই রকম মিথ্যা লুকোচুরি খেলতে আপনার ভাল লাগে?"

ফণীবাবু হাসিলেন, "আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। আপিসের খাটুনির পর বাড়ীতে নিত্যি হাঁড়িঠেলা আপনার ভাল লাগে? নিত্যি বাজার করা, এখানে ওখানে ছোটা, ফায়-ফরমাস খাটা আপনি পারেন? একাধারে চাকর ও রাঁধুনী—"

অমিয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "এই আপনার কাজ! অথচ দেশে বলছেন জমি আছে—"

ফণীবাবু বলিলেন, "জমি থাকার রস কত জানেন না তো। এক কাঁড়ি টাকা খাজনা গুণতে জিব বেরিয়ে যায়। ভাগে জমি দেওয়া, যে-বার হয় দু-এক মণ পাই, যে-বার হয় না, আপিস থেকে টাকা ধার ক'রে খাজনা মেটাই। বাপ-পিতামো যদি ঐ জমির আপদ না রেখে যেতেন কোন্ হতভাগা, মশায়, চাকরি করত?"

অমিয় বলিল, "এখনও তো জমি বেচে দিতে পারেন?"

ফণীবাবু বলিলেন, "দুটি ভাই নাবালক, কার জমি বেচব? আর এক বিঘে কিনতে পারলাম না, নষ্ট

বালিকা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসুকুমার দেউস্কর

করব ? আর সব পারি মশায়, বাপ-পিতামোর নাম ডুবোতে পারি না।"

দুই জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ফণীবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া বলিলেন, "বিড়ি খাবেন ?"

"আমি বিড়ি খাই নে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ফণীবাবু বিড়ি ধরাইলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ফণীবাবু খুশী মনে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেবেলায় যাত্রার ছড়া শুনেছিলাম,

'অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল
তার সাক্ষী দেখ দময়ন্তী নল।'

বড় বড় রাজারাজড়া যা খণ্ডাতে পারেন নি, আমরা তো কোন্ ছার।"

অমিয় বলিতে যাইতেছিল, আমাদের শিক্ষানুযায়ী আমাদের অদৃষ্ট তো আমরাই তৈয়ারী করিয়া লই, কিন্তু সে-কথা সে উচ্চারণ করিল না। সে-কথা উচ্চারণ করিয়া কোন লাভ নাই।

ফণীবাবু বলিলেন, "আপনার এই দুপুর বেলাটি কেমন লাগে ?"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি।"

ফণীবাবু বলিলেন, "সত্যি বলতে কি মশায়, এখানে শুয়ে বিড়ি টানতে, বাদাম চিবুতে, বা একটু ঘুমুতে কার না ভাল লাগে! ও কি উঠছেন যে ?"

"চলি—অনেক ক্ষণ তো হ'ল।"

"আমাদের বাসায় যাবেন ? বিশ্বজিৎদা তো বাসায় নেই।"

"কোথায় সে ?"

"হয়ত কোথাও বায়স্কোপ দেখতে গেছে। তা চলুন না, আমার বউ আছে, এক পেয়ালা চা আপনাকে খাইয়ে দিতে পারব।"

"চা আমি ভালবাসি না।"

"আহা—খান তো ? ওদের মত মিষ্টি চা তৈরি না করতে পারলেও বউয়ের হাতেও চা নেহাৎ মন্দ হয় না।"

"ফণীবাবু—" অমিয় রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "আপনি যা জানেন না, তা নিয়ে কথা কইবেন না। চা খাবার জন্য আমি ঠিক ওখানে যাই না।"

ফণীবাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "তা আমরা জানি, চা ছাড়াও—"

অমিয়র মুখে অনেকখানি রক্ত জমিয়া উঠিল; পরুষ কণ্ঠে সে বলিল, "চা ছাড়াও আর কি আছে বলুন ? বলুন—" কথার শেষে সে ফণীবাবুকে একরূপ ধমকই দিল।

ফণীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "রাগ করছেন কেন, বন্ধুত্ব না থাকলে কেউ কারও কাছে যায় না—সে তো সবাই জানে।"

অমিয়র রাগ পড়িয়া গেল, কিন্তু মনের জ্বালা মিটিল না। ফণীবাবু সরল বা নির্ব্বোধ নহেন, হাসির সঙ্গে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার মুখের ভাবকে রহস্যে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল, অমিয়র ক্রোধের মুহূর্ত্তে তাহা তিনি দমন করিয়া ফেলিলেন। না জানি এই সামান্য বন্ধুত্বের সূত্র লইয়া অসাক্ষাতে আলোচনার জের ইহারা কত দূর টানিয়া থাকেন ? সে আলোচনার মর্ম্ম কি বিশ্বজিৎ বোঝে না ? অথবা, বুঝিয়াও উপেক্ষা করে।

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া ফণীবাবু বলিলেন, "আপনারা হঠাৎ কলেজ থেকে বেরিয়ে আপিসে ঢুকেছেন, মনে করেন, সব সময়ে সত্য কথা বলাটাই নিরাপদ ? তা নয় অমিয়-বাবু। আপিস তো নীতি-শিক্ষার স্থান নয়। পরশু—হ্যাঁ, পরশুই তো, শুনলাম আপনি বিশ্বজিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন—'আচ্ছা, আপিসে এরা কথায় কথায় এত অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে কেন ?' বিশ্বজিৎ উত্তর দিলেন, 'শিক্ষার অভাব।' সেটি কিন্তু সত্য কথা নয়। এমন অনেক শিক্ষিত আছেন যাঁরা খারাপ কথা দিনরাত বলে থাকেন।"

"কেন বলেন ?"

"যে-খাটুনি তাঁরা খাটেন, তা যখন অসহ্য বোধ হয় তখনই মনে ফূর্ত্তি আনবার জন্য বলেন। যে-খাটুনি খাটেন তার তুলনায় মাইনে পান কম—তাই হয়ত বলেন।"

"তাহলে এঁরা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ?"

"তা তো বটেই। আমরা, যারা মুখে রক্ত তুলে খেটে মরি, তাদের মাইনে ত্রিশ থেকে আশী। তাদের সামান্য ভুলে মাইনে কমে, সার্ভিস-শীটে ব্যাড্ মার্ক হয়, ইন্‌ক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়; আর যাঁরা গদিয়ান হয়ে ব'সে আয়েস করতে করতে চুরুটের টানের সঙ্গে কলমের টানটি দিয়েই খালাস, তাঁদের গ্রেডের আরম্ভ আড়াই শ থেকে! বলেন কি মশায়, এত বড় অবিচার ধর্ম্ম কত দিন সইবেন?"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "ধর্ম্ম বহুকাল থেকে অনেক কিছুই সয়ে আসছেন, এটুকুও আমাদের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত হয়ত হাসিমুখেই সইবেন। কিন্তু ফণীবাবু, যখনই আমরা যোগ্যতার কথা ভাবি, তখনই হিংসার ভাবটি মনে জাগে এই বড় আশ্চর্য্য, নয় কি?"

ফণীবাবু হাঁ করিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "হিংসা! হিংসা কোথায়?"

"কোথায় যে হিংসা তাই যদি বুঝব তো যোগ্যতার বিচারে ভুল করব কেন! আমরা যখন মিথ্যা বলি,—তার পরমুহূর্ত্তে কি ভাবি কেন মিথ্যা বলছি? ভাবি না, শুধু বলার জন্যই বলি। কাজ করি, কেননা কাজ না-করলে পেট চলে না তাই; কাজের মধ্যে কোথাও ইন্‌টারেষ্ট সৃষ্টি করতে ভালবাসি না।"

ফণীবাবুর বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখিয়া অমিয় সহসা সচেতন হইল। আবেগ দমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "চলুন বাসায় গিয়ে এক দিন না-হয় স্ত্রীর কাছে সত্য কৈফিয়ৎই দেবেন। তাতে তিনি রাগ নাও করতে পারেন।"

ফণীবাবু বলিলেন, "বেশ আছেন? সে রণচণ্ডী মূর্ত্তির সামনে এই দুপুর বেলায় দাঁড়াব আমি? তার চেয়ে মিথ্যা কথা বলা ঢের সহজ।"

অমিয় উঠিয়া বলিল, "তা হলে সহজ কাজই করুন। আমি চল্‌লাম।"

বিশ্বজিৎ বায়স্কোপে যায় নাই, দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া নলিনদার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। নলিনদার মুখখানি শুষ্ক, বিশ্বজিতের চোখে উদ্বেগের ছায়া। অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "শুনেছ অমিয়, চারুদার খবর?"

"না তো!"

"কাল রাত্রিতে সার্কুলার রোড পার হতে গিয়ে হঠাৎ একখানা ট্যাক্সির সামনে গিয়ে পড়েন। ড্রাইভার ব্রেক্ কসতে কসতেই চারুদা গেলেন চাকার তলায়।"

"ইস্! তার পর?"

"তার পর আর কি—সোজা হাসপাতাল। এই মাত্র নলিনদা সেখান থেকে আসছেন। অবস্থা ভাল নয়, আজকের দিনটা টেঁকেন কি না সন্দেহ!"

অমিয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। চারুদা তাহার সঙ্গে প্রথম আলাপ-প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই-গুলি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল: 'আর ভাই, আপিসের গো-খাটুনির পর এই ক্লাবে এসে একটু জুড়োতে পাই। পাই তো আশী টাকা মাইনে, তিন ছেলে, চার মেয়ে, তাদের পড়াশুনার খরচ, এখানে বাসাভাড়া, বাড়ীতে মস্ত সংসার ··মন্দ কি এই ক্লাব!'

আজ কোথায় ক্লাব, কোথায় সংসার, আর আশী টাকা মাহিনার কেরানি চারুদাই বা কোন্ পথে পা বাড়াইয়াছেন!

অমিয় আকুল স্বরে বিশ্বজিৎকে ঠেলা দিয়া বলিল, "চল, তাঁকে দেখে আসি।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ছ-টার সময় নলিনদা আমাদের ডেকে নিয়ে যাবেন। চল একটু চা খাবে।"

নলিনদা বিদায় লইতেই অমিয় বলিল, "যদি বিধাতা থাকেন, এ তাঁর সত্যই অবিচার। কেন তিনি দুঃখের উপর মানুষকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কিন্তু তিনি যে নেই, অমিয়। আমরা আঘাত পাই, আবার আমরা এক দণ্ডে শেষ হয়ে যাই, যেমন পশুর নিয়তি, তেমনই মানুষের। এর সঙ্গে আর এক জনের মহিমাকে কেন অনর্থক খর্ব্ব কর? কাল চারুদার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, তাই আজ এ দুঃসংবাদকে মনে স্থান দিয়েছ। অজ্ঞাত রমেনের মৃত্যুর জন্য এই মুহূর্ত্তে তোমার মন কাঁদবে কি?"

"যাকে আমি জানি না, তার সম্বন্ধে—"

"তাহলেই তোমার মনের মায়ায় তুমি হাসছ, কাঁদছ। চীনে হাজার হাজার লোক জাপানীর বোমায় কীটপতঙ্গের মত প্রাণ দিয়েছে শুনে বড় জোর তুমি বিস্ময় প্রকাশ করতে পার। জাপানীদের বর্ব্বরতাকে ধিক্কার দিতে পার, কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে তোমার প্রতিবেশী কালু সেখকে টিনের চালা চাপা পড়ে মরতে দেখলে তুমি আর্ত্তনাদ করে উঠবে। দুঃখ গ্রহণ করে তোমার মন। তার গণ্ডীর মধ্যে আঁকা যে-বৃত্তগুলির উপর সে ঘুরে বেড়ায় তাদের সুখদুঃখে সে সচেতন, অন্য কোথাও নয়।"

"কিন্তু চারুদার জন্য আমার মন সত্যই কাঁদছে। অমন সরল লোক—"

"চল, চা খাবে।"

"না বিশ্বজিৎ-দা, চা এখন ভাল লাগবে না।"

"বসবে চল, পথে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে চারুদা কি তোমার ভাল হয়ে উঠবেন?"

ষ্টোভ জ্বালাইয়া সুপর্ণা কিন্তু চা তৈয়ারী করিল এবং অমিয়র সম্মুখে পেয়ালা ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চা খান ঠাকুরপো।"

অমিয় বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার প্রতিবেশীরা আমার চা খাওয়া হয়ত পছন্দ করেন না।"

সুপর্ণা সরিয়া গেলে বিশ্বজিৎ বলিল, "কেন?" একটু থামিয়াই উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলিল, "তা জানি।"

"কি জান, বিশ্বজিৎ-দা? কিছুই জান না।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "হাজার হোক তোমার দাদা আমি—বয়সে বড়। কলকাতায় এক বাসায় সাত-আট ঘর লোকের সঙ্গে পনর বছর কাটিয়ে এলাম; জানি বইকি কিছু কিছু?"

"তুমি লোকের জিবকে ভয় কর না?,"

"লোকের জিবকে শাসন করার শক্তি যখন নেই, তখন ভয় করব কেন? যারা সত্য কথা বলতে ভয় পায়, তাদের আলোচনা আড়ালেই চলে; আমার বা সুপর্ণার কানে তার বাষ্পবিন্দুও পৌঁছয় না।"

"যদি পৌঁছায় কোন দিন?"

"সুপর্ণাও হাসে, আমিও হাসি। সেদিন বাড়ীতে ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থাও করে ফেলি।"

অমিয় বলিল, "তোমার মন শক্ত হ'তে পারে, বউদিরও কি—"

"তাহলে তোমার বউদির মুখেই শোন। সু, শোন তো একবার।"

সুপর্ণা আসিলে অমিয়র মুখ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। এই কথা নাকি বিশ্বজিৎ স্ত্রীর সম্মুখে পাড়িবে?

কিন্তু অমিয়র লজ্জা অহেতুক। বিশ্বজিৎ সুপর্ণাকে রহস্য করিয়া বলিল, "চায়ে তুমি মিষ্টি কম দিয়েছ, তোমার ঠাকুরপো অনুযোগ করছেন।"

সুপর্ণা তাড়াতাড়ি চিনির টিনটা তুলিয়া অপ্রতিভ মুখে বলিল, "আমরা কম চিনি খাই, তাই—"

অমিয় বিশ্বজিতের কল্পিত অনুযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল না, দু-চামচ বেশী চিনিই লইল এবং সরবতের মত সবটুকু চা গলাধঃকরণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বিশ্বজিৎদার কমন্‌সেন্স্ আছে, কেমন বাঁচিয়ে দিলেন সিচুয়েশন্‌টা!"

পাঁচটার সময় দরজার বাহিরে নলিনদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অমিয় ও বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে সেই সঙ্কীর্ণ গলিতে দশ-বার জন লোক নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, সকলের মুখেই আসন্ন বিপদের ছায়া। কথা দূরে থাকুক, জোরে নিঃশ্বাস টানিতে ইঁহারা সঙ্কুচিত। পরস্পরের মুখের পানে নীরবে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবেই সেই দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিলেন।

বিশ্বজিৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সব শেষ বুঝি?"

নলিনদা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সব শেষ।"

পুনরায় বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কখন খবর পেলেন?"

"চারটে বত্রিশে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনারা বোধ হয় তৈরি হয়েই এসেছেন ?"

নলিনদা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, খাটিয়া নিয়ে রমেনরা কলেজে গেছে, এঁরা ফুল কিনে এইমাত্র এখানে এলেন।"

একটি ছোকরা ফুলের চুবড়িটা নলিনদার সম্মুখে রাখিল।

বাতাসে চুবড়ির মুখের কলাপাতাখানি উড়িয়া যাইতেই দেখা গেল এক রাশ গোলাপ ও গন্ধরাজের সঙ্গে একগাছি সাদা মল্লিকার গোড়ের মালা ধব্ ধব্ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে সংকীর্ণ গলিটি পর্য্যন্ত উতল হইয়া উঠিল। আশী টাকা মাহিনার কেরাণীর ভারাক্রান্ত জীবনে বিবাহের দিন ছাড়া এমন ঐশ্বর্য্য ও এতখানি সম্মান লাভ কোন শুভ মুহূর্ত্তে আর হয়ত ঘটিয়া উঠে নাই!

১৩

সোমবার বেলা দশটা হইতে পুনরায় কর্ম্মজগতের কোলাহল সুরু হইল।

দাদা বলিলেন, "শম্ভু ভাই, কাল ট্যাংরায় গিয়ে মাছ যা ধরলাম! ইয়া পাকা পাকা রুই, দু-ঘণ্টার মধ্যে গোটা চারেক।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের এক দিন নিয়ে চলুন না দাদা।"

দাদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দেখব চেষ্টা ক'রে আসছে রবিবার, এস, পান খাও।"

শম্ভুচন্দ্র পান মুখে দিয়া বলিলেন,—"শুনেছেন শনিবারের খবর ?"

"না তো! দাদা কচি ছেলের মত বিস্ময়ে আকুল হইয়া উঠিলেন

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "হরেন—ঐ রেকর্ড-কীপারের কাজ করে—এক তাড়া কাগজ পেট-কাপড়ে লুকিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। পড়বি তো পড়্ বড়বাবুর চোখে। পেটের কাছটায় উঁচু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি পিলে হয়েছে হরেন, রোজ জর হয় ?" হরেন বললে, 'কই, না তো?' 'এস তো এদিকে!' ব'লে বড়বাবু হঠাৎ তার পেটে হাত দিলেন। হরেন কেঁদে বললে, 'কি করি বড়বাবু, পঁচিশ টাকা মাইনে পাই, কাল ছেলেটা এসে কেঁদে বললে খাতা না হ'লে ইস্কুলে মাষ্টাররা বকেন।' 'তাই ব'লে চুরি করবে?'—বড়বাবু ধমকে উঠলেন।... হরেন বড়বাবুর পা জড়িয়ে ধরে কি কান্নাটাই কাঁদলে! বড়-বাবুর দয়া হ'ল—কথাটা আর সায়েবের কানে তুললেন না, শুধু বললেন, 'সব সময় মনে রেখো ভগবান সম্মুখে আছেন, আমি না হয়ে অন্য কেউ হ'লে তোমার চাকরি যাওয়া আজ ঠেকাত কে?'

দাদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বটে! হরেন নেহাৎ ভালমানুষটি—মুখ দিয়ে রা বেরোয় না, তার পেটে পেটে এত!"

পিছন হইতে কে জবাব দিল, "সে বেচারি তো দুখানা কাগজ চুরি ক'রে চাকরিটি খোয়াতে বসেছিল, আর কত বড় বড় মহাপুরুষ যে গুদাম সাবাড় ক'রে দিব্যি মাইনে বাড়িয়ে রাজত্ব করছেন! কোম্পানীর মাল—কারও দরদ আছে কি? এখানে কি রকম জান—" বলিয়া খগেনবাবু দাদার পানের ডিবা হইতে গোটা দুই পান তুলিয়া মুখে পুরিলেন এবং এক চিমটি দোক্তা গালে দিয়া আরম্ভ করিলেন, "বহু দূর ব্রাঞ্চ-লাইন খেকে খবর এল—বড় জলকষ্ট, ষ্টেশনের ধারে একটি পুকুর কাটিয়ে না দিলে যাত্রীদের প্রাণ যায় যায়। শ-খানেক সই বুকে ক'রে খানকতক দরখাস্তর কাগজ-ফাইল-জাত হয়ে হেড আপিসে এল। হুকুম হ'ল পুকুর কাটাও। দশ হাজার টাকা মঞ্জুর। বছরখানেক পরে আবার রিপোর্ট এল এবার বর্ষায় পুকুরের জল যা বেড়েছে তাতে লাইনের অবস্থা ভীতিপ্রদ—অবিলম্বে পুকুর না বোজালে লাইন টেঁকানো মুস্কিল হবে। হুকুম হ'ল, পুকুর বোজাও। বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর। আসলে কি জান, কাগজেই পুকুর কাটানো এবং পুকুর বোজানো হ'ল—আর ত্রিশ হাজার টাকা...হুঁ-হুঁ বাবা, দু-খানা কাগজ নিয়ে এত!"

দাদা বলিলেন, "তোমার নেহাৎ গল্প।"

খগেনবাবু বলিলেন, "পুকুরেরটা না হয় গল্প, কিন্তু আপিসের কপিইং পেনসিল, কাচের পেপার-ওয়েট, ভাল

কালি, ভাল কলম, মোমবাতি, ঝাড়ন, স্পিটুন, কাচের দোয়াত, এগুলির কি পাখা গজায় নাকি! তিন মাস অন্তর ইন্‌ডেণ্ট তো হয় দেখি; পেয়েছ কোন দিন ওর কোনটি?"

শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষাতে দাদা সঙ্কুচিত হইয়াই ছিলেন, বলিলেন, "যেতে দাও ও-সব কথা, কাজ করা যাক্।" শম্ভুচন্দ্র চলিয়া গেলে চোখ টিপিয়া নীচু গলায় বলিলেন, "বাজার থেকে কিনে নিব চালাচ্ছি, কলমটিও আপিসের নয়।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ইচ্ছে করে দিই ধরিয়ে চুরি! কিন্তু কার চোখ ফোটাব বল। যাঁদের মাইনে মোটা—এখানে তাঁদের কথাই বেদবাক্য! দরখাস্ত ক'রে আমরাই হয়ত শেষকালে চোর বনে যাব।

"কেন?"

"কেন আবার! উপরওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে তুমিই তখন বলবে, কেন, মাস-মাস তো আমরা কাগজ, কলম, নিব পাই।"

দাদা বলিলেন, "আমি বলব একথা! কি যে বল, খগেন ভাই!"

এমন সময় রাজেন বলিয়া একটি ছোকরা দাদার পিছনে দাঁড়াইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "হাতে ওখানা কি রাজেন?"

"আজ্ঞে প্রেস্‌ক্রিপ সন্। আমার ওয়াইফ্ আজ ছ-মাস ভুগছে। ওষুধ কিনতে কিনতে তো সব বিকিয়ে ফেললাম, মশাই।"

"কি অসুখ?"

"ডাক্তার তো বলে বেরিবেরি। প্রথম প্রথম পা ফুলত, এখন হার্ট অ্যাফেক্ট করেছে। চোখের অবস্থাও ভাল নয়।"

"বটে, তা খাওয়াচ্ছ কি?"

"ছুবেলা রুটি—টম্যাটোর জুস্, ভাল ডিম, ফলপাকুড়, আর ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে ভিটামিন এ টু জেড্।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ঐ পেটেণ্ট ছাইভস্মগুলির বদলে কিছু টাট্‌টা খাঁটি দুধ খাওয়াও—রোগী বল পাবে।"

রাজেন হাসিল, "গরুর দুধ ছেড়ে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারি—আমাদের কি, ডুবেছি, না ডুবতে আছি। আচ্ছা দাদা, আমাদের মত গরীবের ঘরেই কি যত রোগ?"

দাদা বলিলেন. "ভগবান পর্য্যন্ত শক্তর ভক্ত, তা রোগ তো রোগ! বড় লোক আর ক-টা ডাক্তারকে পোষে বল, আমরাই তো বলতে গেলে ডাক্তারের অন্ন, ঐশ্বর্য্য। যারা ভাল খায়, বছরে শরীর খারাপ না হ'লেও চেঞ্জে যায়, ঠাণ্ডায় গরম কাপড়ে শরীরকে মুড়ে রাখে, গরমে খস্‌খস্ টাঙিয়ে বা সিমলে দার্জ্জিলিঙে পালিয়ে গরম থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের সঙ্গে রোগ কোন্ দুঃখে মোলাকাৎ করবে বল তো, ভাই?"

খগেনবাবু বলিলেন, "ভগবানের রাজত্বে এ-বিধান অন্যায়। এক জন টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর হাজার জন না খেয়ে মরবে—"

বিশ্বজিতের কানে কথাটা গিয়াছিল। সে উত্তর দিল, "দাদা, এ হ'ল নিছক কম্যুনিজম্। ফ্রান্সের রাষ্ট্র-বিপ্লব, রুশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপন—এ-সব ইতিহাস-চর্চ্চা আপিসে কেন?"

খগেনবাবু রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ব'লে সত্য কথা বলব না!"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আজ আপনি যদি বড়বাবু হন, খগেনবাবু, আপনি সর্ব্বপ্রথম কি চাইবেন জানেন! নিয়ম আর শৃঙ্খলা। আপনি যোগ্যতার উদাহরণ কথায় কথায় দেবেন। যারা চিরকাল দুঃখ বহন করে আর কাঁদে—তাদের বলবেন, স্বভাবের দোষে ওরা অমন। যেমন অবস্থা তেমন ভাবে চললেই তো কোন গোল থাকে না। ক্ষমতা মদের মত, যে খায় সে তো মাতাল হয়ই, যে খায় না, তার চোখেও ঘোর লাগে। যে পায় না, তার হিংসে বাড়ে। কাজেই ভগবানকে টেনে এনে অক্ষম অভিযোগগুলি পেশ ক'রে আমরা দুর্ব্বল কম্যুনিজম প্রচার করি। আসলে আমরা বঞ্চিত, দরিদ্র এবং সঙ্কীর্ণমনা।"

খগেনবাবু টেবিলে চাপড় মারিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "তুমি আমাদের নীচ বলছ?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমি এবং আপনি, এবং আরও

অনেকে। এ তো সত্যি কথা—আমাদের ভিতরের ডিফরমিটি বাইরের সুন্দর জামা-কাপড়ে আমরা ঢেকে রেখেছি ব'লে সত্যিই কি আমরা বিকলাঙ্গ নই? আজ আপনার মাইনে বাড়লে আপনি কি মাইনে-বাড়া নিয়ে আন্দোলন করবেন, না ইকনমি পলিসিকে সাপোর্ট করবেন?"

খগেনবাবু পুনরায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্ব্বেই শম্ভুচন্দ্র ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, "এই মাত্র ডেপুটির কাছে সার্কুলার এল—টেন পার্সেণ্ট ওয়েজ-কাট!"

দেখিতে দেখিতে দাদার টেবিলের ধারে সমস্ত সেক্শন আসিয়া জড় হইল। কাহারও মুখে কথা সরিল না, বিনা বাক্যব্যয়ে ও অবনত মুখে দোষী যেমন বিচারকের মুখ হইতে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়, সকলের অবস্থা তেমনই স্থাণুবৎ।

খগেনবাবু শান্তির পানে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার চালাও তোমার আপীল!"

দাদা সনিশ্বাসে বলিলেন, "আর আপীল! ফাঁসির রায় দেবার পর—আপীল!"

শান্তি শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় বলিল, "এক বার এসোসিয়েসনের থ্রু দিয়ে—"

রাজেন বলিল, "কমাক না মাইনে, কাজও পাবে তেমন, এক ঘণ্টা টিফিন ভোগ করি, তখন এক ঘণ্টা খাটব, আর সব ঘণ্টা ফাঁকি দেব।"

শান্তি বলিল, "তাতে কোম্পানীর তো বড় লোকসান। তোমার কাটা মাইনেটা ফিরে পাবে যাতে সেই চেষ্টা কর।"

রাজেন বলিল, "ছাই চেষ্টা। সাপ যখন মাথায় কামড়েছে—তখন তাগা বাঁধা মিছে।"

বৃদ্ধ নিত্যহরি বলিলেন, "যখন লাভ হয় তখন তো বলে না গ্রেড বাড়িয়ে দাও। লোকসানের বেলায় আমরা!"

সুরেন বলিলেন, "না পোষায়, চাকরি ছেড়ে দাও।"

নিত্যহরি ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "চাকরি ছাড়ে সব মিঞা। আধা মাইনে ক'রে দিলে হাসিমুখে সুড় সুড় ক'রে চেয়ারে ব'সে কলম নাড়বেন। যাদের কলম মাত্র ভরসা তাদের কেউ গ্রাহ্য করে নাকি?"

শান্তি বলিল, "তাতেই তো লেখার জোর আসে না। আজ আমরা সবাই মিলে যদি আপিস ছাড়ি, কাল নয়, এক ঘণ্টা পরেই দেখবে সেক্শান ভর্ত্তি; খাতা কলমে কাজের কোন কদর নেই।"

সুরেন বলিল, "এই সব রেকর্ড-পত্র যদি নষ্ট করে আমরা আপিস ছাড়ি?"

শান্তি বলিল, "বড় বয়েই গেল। নূতন রেকর্ড আরম্ভ হবে। কিছু টাকা হয়ত লোকসান হবে—তাতে কোম্পানীর ভারি ক্ষতি।"

অমিয় হিসাব করিল, ত্রিশ টাকার দশ পারসেণ্ট আর কতই বা। আপিসে ঢুকিয়া প্রথম মাস হইতেই তাহাকে কাটা মাহিনা লইতে হইবে। কতই বা কম? এক জোড়া জুতা কিংবা শাড়ী এক জোড়ার দাম। জুতাটা পরের মাসে কিনিলেও চলিবে, শাড়ী নহিলে মানুষের লজ্জা নিবারণ হয় কিসে?

এমন সময় বড়বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

কাগজপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "শুনেছ সব? আসছে মাস থেকে শত করা দশ ভাগ মাইনে কমে কাজ করতে হবে।"

কে এক জন বলিল, "এ যে মার্চেণ্ট আপিসেরও অধম ক'রে তুললে। সাহেবরা কেন প্রোটেষ্ট করুক না।"

বড়বাবু বলিলেন, "প্রোটেষ্ট করবে কে? একেবারে খোদ কর্ত্তার হুকুম—কেরাণী অফিসার কেউ বাদ যাবে না। ডেপুটিকে বলতেই হেসে কি বললেন জান? বললেন—বনার্জ্জি, তোমাদের টেন পারসেণ্ট আর কতই বা, আমার পনর-শয়ে যাবে দেড়শ—। ভাব দেখি এক বার কি অবস্থা!"

ফণীবাবু সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আহা।"

বড়বাবু মুখ ভেংচাইয়া বলিলেন, "আহা! কি আমার সায়েবের উপর দরদ রে! ওদের তো ভারিই ক্ষতি তাতে। নিজের মুখেই তো বললে, একটা রেস আর গোটা দুই টি-পার্টি মাসে কমাতে হবে দেখছি। আমাদের কি ক্ষতি হবে জান?"

বিশ্বজিৎ মনে মনে হিসাব করিল, "আপনার দু'শ-র থেকে কুড়ি কমলে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বইতে কিছু কম অঙ্ক হয়ত জমা পড়বে, কিন্তু আমাদের ষাটের ছয় কমলে খোকার দুধ কমিয়ে হয়ত বার্লির ব্যবস্থা হবে, না হয় চায়ের নেশা তুলে দিতে হবে।"

মাহিনার দিন আপিসের মধ্যে কোলাহলটা বেশীই বোধ হইল। আপিসে এবং আপিসের বাহিরে অনেক রকমের অচেনা লোক দেখা গেল: পাগড়ি মাথায় লম্বা লাঠি কাঁধে গণ্ডা কয়েক কাবুলী শিকারী বিড়ালের মত ওৎ পাতিয়া পায়চারি করিতেছে, খোট্টা মহাজন লাল খেরো বাঁধান খাতা হাতে ও বাঙালী পাওনাদার নোট-বুক লইয়া এধার ওধার ঘুরিতেছে। পানওয়ালা, চাওয়ালা, খাবার-ওয়ালা, শালওয়ালা ইত্যাদি ওয়ালারাও সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে কেরাণীদের ব্যস্ততারও অন্ত নাই। মাহিনা লইয়া কেহ সুড়ুৎ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে, কেহ পাশ কাটাইয়া পানের দোকানে আড্ডা জমাইতেছে, কেহ বা কাবুলীর লাঠি ধরিয়া শুষ্ক হাসির দ্বারা রসিকতা করিয়া কিছু সময় চাহিতেছে। গালিগালাজ এবং মন-কষাকষিও এধার ওধার দেখা যাইতেছে। যে টাকা আদায় করিতেছে তাহার মুখও গম্ভীর, যে দিতেছে তাহার মুখও অপ্রসন্ন। যেখানে বন্ধুত্বের সুতা পলকা, সেখানে কথার আঘাতে সুতায় টান ধরিতেছে, যেখানে কিছু শক্ত, সেখানেও কঠিন বাক্য-বিনিময়ের ফলে মুখে আঁধার ঘনাইতেছে।

রমেন বলিল, "আচ্ছা শান্তিবাবু, জংলা শাড়ী কেমন? ছেলেমানুষ বৌকে মানাবে না?"

শান্তিবাবু বলিলেন, "খগেনবাবুর টাকা শোধ দিয়েছ তো? না দিলে কেনাবে তোমায় জংলা শাড়ী।"

রমেন বলিল, "কোত্থেকে দেব—টাকায় এক আনা ক'রে সুদ। সুদ দিতে গেলে আসল শোধ হয় না, আসল শোধ দিতে গেলে উপোষ দিতে হয়। মনে করেছি এ-মাসে আর কিছু দেব না, হাতে পায়ে ধরে—"

"পার ভাল।" বলিয়া শান্তিবাবু পিছন ফিরিলেন।

অমিয় কোঁচার খুঁটে টাকা কয়টি বাঁধিতেছিল, খাতা পেন্সিল লইয়া সুরেনবাবু আসিয়া বলিলেন, "কিছু সাহায্য করবেন?"

"কাকে?"

"ওই যে দোরগোড়ায় থান কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রীলোকটি, একটি ন-দশ বছরের ছেলের হাত ধরে—উনি কে জানেন? আমাদের সেকশানে কাজ করত অমৃত, তারই বিধবা স্ত্রী। বেচারীর দেশের ঘরবাড়ী দূরে যাক, জমিটুকু পর্য্যন্ত নেই, আজীবন কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে কাটিয়ে গেল। কোথায় যে দেশ ওরাও হয়ত জানে না। আজ অমৃত নেই, ছেলেগুলি নাবালক, ভিক্ষে ছাড়া ওর উপায় কি?"

"কেন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা কিছু পান নি?"

"যা পেয়েছেন তা দেনা শুধতেই গেছে। অমৃত বেঁচে থাকতে ফাণ্ডের টাকা উইথ্‌ড্র করেছিলেন, কো-অপারেটিভের মোটা ধার ছিল। আর এক বছরের বাড়ীভাড়া দিয়ে তবে সে-বাড়ী থেকে উঠতে দিয়েছে ওঁদের। এখন টালার ওদিকে খোলার ঘর একখানা ভাড়া করে থাকেন। প্রতি মাসে মাইনের দিন ভিক্ষে নিতে আসেন।"

রাজেন পাশ হইতে বলিল, "রোজ রোজ ভিক্ষে দেয় কে? আমাদেরই বলে হাত পাতলে ভাল হয়—তার পরকে ভিক্ষে দেওয়া?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আপনি দেবেন নাকি কিছু?"

অমিয় হয়ত সাহায্য করিতে পারিত না, কিন্তু কাল চারুবাবুর শ্মশানসহযাত্রী হইয়া মনটায় তাহার আঘাত লাগিয়াছিল। চারুবাবু বাংলায় একটিই নাই, লক্ষ লক্ষ আছেন। আজীবন ভাড়া বাড়ীতে কাটাইয়া স্ত্রীপুত্রকে পথে বসাইয়া যাইতে ইহারা তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। হয়ত অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে সম্মুখে রাখিয়া উৎসবের ক্ষেত্রে ইহারা হলচালনা করেন। হল-চালনার ফলে যে-বিষতরুর উদ্ভব হয়, তাহার ফল সপরিবারে ভোগ করিয়া ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইয়া যান। কে জানে, বীরেনের মতটির কোন মূল্য আছে কি না! ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা সোৎসাহে ধর্ম্মের নামে অশান্তি ও দুঃখকে বহুমুখীন করিয়া বাংলা দেশে

প্লাবন আনিবার আয়োজন করিতেছেন, আইনে কেন তাঁহাদের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান নাই ?

দুঃখমোচনের সংকল্প থাকিলে কি হয়, ক্ষমতা যে অত্যন্ত সীমাঘেঁষা। নিজের সংসারের তট যাহার বালুরাশি-ভরা, সে দিবে অন্য ভাঙনের মুখে বাঁধ। দুঃখমোচনের চেষ্টাতেও যে বড় দুঃখ জমা আছে—সে কথা এই অক্ষমদের উচ্চ কণ্ঠের সাহায্যে আজ বোঝাইবে কে ?

পাওনাদারের মত ভিখারীর ভিড়ও আপিসের দুয়ারে এই দিন বেশী দেখা যায়। কেহ সাজা ভিখারী, কেহ বা সত্যিকারের। কিন্তু আসল-নকলের পার্থক্য কোন দাতাই নিরূপণ করিতে পারেন না। যাহারা ধার শোধ দিতেছে, তাহারা ভিক্ষা দিতেও কার্পণ্য বোধ করিতেছে না, কিন্তু রাস্তায় পয়সা হারাইয়া গেলে যেমন ইহাদের দৃকপাত নাই, তেমনি ভিক্ষা দিবার সময়েও কাহাকে ভিক্ষা দিল বা ক-পয়সা দিল এ হিসাব দরিদ্র কেরাণী কোন্ দুঃখে রাখিতে যাইবে ? চারি দিকের ছিদ্র এক দিকে মাত্র ছাতা ধরিয়া ঢাকা যায় কি ?

ক্রমশঃ

পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের আত্মগোপন-কৌশল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাণীমাত্রেরই পদে পদে শত্রু। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা খাদ্যখাদক সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রবল দুর্ব্বলের শত্রু; দুর্ব্বল আবার তদপেক্ষা দুর্ব্বলের শত্রুতা সাধনে ব্যস্ত। অপর পক্ষে, দুর্ব্বল প্রবলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। প্রাণিজগতে অহর্নিশি এই দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যসমাজে যুদ্ধবিগ্রহে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় পক্ষই যেমন পরস্পরের নিকট হইতে আত্মগোপন করিবার নিমিত্ত বহুবিধ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রাণিজগতের সর্ব্বত্রই তেমন দুর্ব্বল প্রবলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত অথবা সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রমবিকাশের ফলে আত্মগোপন করিবার কতকগুলি অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ চেহারা বদলাইয়া, কেহ কেহ বা শরীরের রং বদলাইয়া অপরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। বাঘের গায়ের রং ও কালো ডোরাগুলি চতুর্দ্দিকস্থ নলখাগড়ার সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, সে অনায়াসে আত্মগোপন করিয়া অতর্কিতে শিকার আক্রমণ করিতে পারে। জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতির বিচিত্র গাত্রবর্ণ শত্রুর নজর হইতে আত্মগোপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার 'নাইট-জার' পাখীরা চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। এই পাখীরা নেড়া খুঁটির মাথায় অথবা অনাবৃত বৃক্ষকাণ্ডে বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে এবং শূন্যের দিকে মুখ করিয়া ডিমের উপর বসিয়া থাকে। দেখিলে বোধ হয় যেন গাছের কোন একটা কর্ত্তিত অংশ বাহির হইয়া আছে। এমনিই অদ্ভুত ইহাদের অনুকরণ-ক্ষমতা, কেহ নিকটে আসিয়া পড়িলে অতর্কিতে ঘুরিয়া বসে এবং আগন্তুক যেদিকে যায় সেই দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বাচ্চাগুলিও মায়ের অনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে। আমাদের দেশের বহুরূপীর অদ্ভুত অনুকরণশক্তি সর্ব্বজনবিদিত। ইহারা শরীরের রং বদলাইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া থাকে। কয়েক রকমের গেছো ব্যাং দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা ইচ্ছামত শরীরের রং পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যখন ইহারা গাছের পাতার মধ্যে

ম্যানিস্ নামে বাদামী রঙের এক জাতীয় নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় ইহারা গাছের গায়ে পা আঁকড়াইয়া ঠিক ডালের মত শক্ত হইয়া নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে। সহসা দেখিয়া গাছের ডাল বলিয়াই ভ্রম হয়।

অবস্থান করে তখন শরীরের রং সবুজ দেখায় কিন্তু অনাবৃত ডালের উপর থাকিলে তাহাদের শরীরের রং বাদামী হইয়া যায়। আফ্রিকার নীল নদের মধ্যে 'সাইনোডোন্টিস্' নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চিৎ হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ মাছের পেটের দিক্‌টা সাদা থাকে। কিন্তু ইহারা চিৎ হইয়া ভাসে বলিয়া পেটের দিক্ কালো ও পিঠের দিক্ সাদা। দেহের রঙের সঙ্গে জলের রঙের অদ্ভুত সামঞ্জস্য থাকায় ইহারা অনায়াসে শত্রুর দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া চলিতে পারে। চেহারা ও গায়ের রং পরিবর্তন করিয়া আত্মগোপন করিতে কয়েক জাতীয় চ্যাপ্টা মাছেরও অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় শুঁয়োপোকা ঠিক বৃক্ষপল্লবের অনুকরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদিগকে দেখিতে ঠিক এক-একটি কাঠির মত। সারাদিন তাহারা মাথার শুঁয়াগুলির সাহায্যে পল্লবের আকার ধারণ করিয়া শক্ত কাঠিটির মত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে এবং রাত্রিবেলায় আহারান্বেষণে ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। কীটপতঙ্গের মধ্যে আত্মগোপনের এরূপ ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পশুপক্ষী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্য্যায়ের প্রাণীদের মধ্যে আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণাত্মক আত্মগোপন-কৌশল পরিদৃষ্ট হইলেও নিম্নস্তরের কীটপতঙ্গাদির মধ্যেই ইহার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

আমেরিকার বনে জঙ্গলে কতকটা আমাদের দেশীয় গোসাপের মত 'ম্যানিস্' নামে এক প্রকার নিশাচর প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহ মাছের আঁশের মত বাদামী রঙের বড় বড় শল্কে আবৃত। শল্কের

কালো ডোরা-কাটা এক জাতীয় কাঠঠোকরা। পুরাতন গাছের উপর বসিয়া থাকিলে সহজে ইহাদিগকে নজরে পড়ে না।

এই দুর্ভেদ্য বর্ম্মই শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষায় ইহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে; কিন্তু বিশ্রামের সময় অতর্কিতে শত্রুহস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কা থাকায় প্রকাণ্ড

'টনি ফ্রগমাউথ' নামে অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতীয় পাখী ; ইহাদের গায়ের রং পুরাতন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া যায়। ভয় পাইলে ইহারা ঠিক মৃতের মত শক্তভাবে অবস্থান করে। তখন ইহাদিগকে গাছের একটা অংশ বলিয়াই মনে হয়।

স্থানেই অতি অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করে। দিনের বেলায় ইহারা পিছনের দুই পায়ের ধারাল নখের সাহায্যে বৃক্ষকাণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে শক্ত ভাবে পাশের দিকে বাড়াইয়া দেয় এবং সম্মুখের পা গুটাইয়া লেজের উপর ঠেসান দিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। লেজটা গাছের গায়ে লাগিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। দেখিয়া মনে হয় যেন শুষ্ক ডালের কিয়দংশ গাছের সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। সহসা দেখিয়া কিছুতেই একটা জীবন্ত প্রাণী বলিয়া মনে হয় না। উন্নত অবনত প্রায় সকল প্রাণীই সাধারণতঃ বিশ্রামকালে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করে না। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন-কিছুর আড়ালে অবস্থান করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় অথবা বিশ্রামকালে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রাণীর ঘরবাড়ী, বৃক্ষ-কোটর, গর্ত্ত, ফাটল প্রভৃতির আড়ালে অবস্থান করিবার প্রবৃত্তি বিকশিত হইয়াছে। 'ম্যানিস' উন্মুক্ত স্থানে বিশ্রাম করিতে অভ্যস্ত বলিয়া আত্মরক্ষার্থ বৃক্ষশাখার অনুকরণে আত্মগোপন প্রচেষ্টায় অপরিসীম কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশের মাথায় লাল ঝুঁটিওয়ালা কাঠঠোকরা পাখীরা যখন ডালপালার আড়ালে অবস্থান করে তখন তাহাদের গলা ও বুকের কালো ডোরাগুলি সহজেই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু আর এক জাতের সাদা অথবা ধূসর রঙের কাঠঠোকরা দেখিতে পাওয়া যায়— তাহাদের বুকের ও পালকের কালো ডোরাগুলি গাছের পুরাতন গুঁড়ির সাদা-কালো রেখার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। যখন ইহারা অনাবৃত বৃক্ষকাণ্ডের উপর জড়াইয়া বসে, তখন গাছের সঙ্গে সহসা ইহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয় না।

অষ্ট্রেলিয়ায় 'টনি ফ্রগমাউথ' নামে এক জাতীয় বিদকুটে পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পালকের রং ঠিক শুকনো পুরাতন কাঠের মত। শয়ানভাবে প্রসারিত কোন মোটা ডালের উপর ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে এবং মাথা নীচু করিয়া ডিমে তা' দেয়। বৃক্ষকাণ্ডের

হিপোলাইট-জাতীয় কুচো-চিংড়ি। ইহারা যখন যে রঙের ঘাসের মধ্যে অবস্থান করে, গায়ের রং তখন সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে।

রঙের সহিত ইহাদের গায়ের রং এমনভাবে মিলিয়া যায় যে, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিলে কিছুতেই ইহারা নজরে পড়ে না। অধিকন্তু ভয় পাইলে ইহারা মুখটি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া ঠিক মৃতের ন্যায় শক্ত ভাবে অবস্থান

এ দেশীয় এক প্রকার বৃক্ষচর কাঠি-পোকা; দেখিতে ঠিক শুষ্ক কাঠির মত। কিন্তু তাহাদেরই এক গোষ্ঠী ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সাধারণ কাঠি-পোকাকে যেমন গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালপালা বলিয়া মনে হয়, ইহাদিগকেও সেইরূপ গাছের পাতা বলিয়াই ভ্রম জন্মে।

করে। তখন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেও শুষ্ক এক টুকরা কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হইবে না। এরূপ নিখুঁৎ আত্মগোপনের কৌশল প্রাণীদের মধ্যে দু-একটা দেখা যায় না।

আমাদের দেশের খালে বিলে, পুকুরে 'হিপোলাইট' নামক এক জাতীয় কুচো-চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক ইঞ্চির বড় বেশী লম্বা হয় না। রং বদলাইয়া ইহাদের আত্মগোপন করিবার শক্তি অদ্ভুত। প্রায়ই ইহারা জলজ ঘাসপাতার মধ্যে অবস্থান করে এবং শরীরের রং ঘাসের রঙের অনুকরণে বদলাইয়া লয়। যখন সবুজ ঘাসপাতার মধ্যে থাকে তখন গায়ের রং সবুজ হইয়া যায়, কিন্তু আবার বাদামী রঙের ঘাসপাতার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে সবুজ রং পরিবর্ত্তন করিয়া বাদামী রং ধারণ করে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিনের বেলায় যেরূপ রং দেখিতে পাওয়া যায় রাত্রিবেলায় তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ঈষৎ নীল বর্ণ ধারণ করে। বড় বড় মাছ ও অন্যান্য শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া সহজে শিকার হস্তগত করিবার জন্যই ইহারা এরূপ লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে গাছপালার মধ্যে নানাজাতীয় কাঠি-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শারীরিক গঠন ও গায়ের রং দেখিয়া এক-এক খণ্ড শুষ্ক কাঠি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ভয় পাইলে হাত-পা উভয় দিকে

এক জাতীয় মাংসাশী গঙ্গা-ফড়িং। ইহাদিগকে দেখিলে সহসা গাছের পাতা বলিয়াই ভ্রম হয়। শিকার ধরা এবং শত্রুর দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য ইহারা অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

প্রসারিত করিয়া এমন ভাবে অবস্থান করে যে, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ইহা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড না জীবন্ত প্রাণী তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কাঠি-

এদেশীয় পাতা-প্রজাপতি। ইহাদিগকে দেখিয়া গাছের শুষ্ক পত্র বলিয়াই মনে হয়।

পোকারই আর এক গোষ্ঠী ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া বৃক্ষ-পত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। পাতার সঙ্গে মিলিয়া থাকিলে কিছুতেই ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। অনুকরণে এইরূপ অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জ্জনের ফলে দুই দিক হইতেই ইহাদের সুবিধা হইয়াছে—শত্রুরা ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না এবং আত্মগোপন করিয়া শিকারের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়া অতর্কিতে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে। অনেক সময়েই ইহারা পত্রপল্লবের মধ্যে এমন নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গেরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। পাতা-কাঠিও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই কমবেশী অনুকরণকারী পতঙ্গ। অনেকের গাত্রবর্ণ গাছের সবুজ পাতার মত। আবার কতকগুলি অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের রং ঠিক শুকনো পাতার মত। তাহাদের গাত্রবর্ণ ও শারীরিক গঠন দেখিয়া গাছের শুষ্ক পত্র বলিয়া ভুল না হইয়া যায় না। পৃথিবীর কোন কোন অংশে আর এক রকমের অদ্ভুত গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগকে বৃক্ষ-পত্র ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারা যায় না—এমনই নিখুঁৎ ইহাদের অনুকরণ-শক্তি। পাখীরা ইহাদিগকে অতি উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কাজেই শত্রুর ভয়ে ইহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, অথচ জীবনধারণের জন্য কীটপতঙ্গ শিকার না করিলেও চলে না। ইহারা যে-সকল গাছের উপর বিচরণ করে, ইহাদের দেহের রং ও গঠন সেই সকল গাছের পাতার মত। কাজেই শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ইহারা অনায়াসে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। আত্ম-

সুতলী পোকার কাঁড়া গাছের পাতা খাইতেছে। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই ইহারা শরীরের পিছনের পায়ের সাহায্যে গাছের গায়ে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তখন ইহাকে গাছের একটি অংশ বলিয়াই মনে হয়।

গোপনের এই কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিলে শত্রুর আক্রমণে এত দিনে হয়ত তাহারা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

প্রজাপতির অনুকরণপ্রিয়তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাইতে পারে। পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে 'মথ'-জাতীয় এক প্রকার প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ডানার রং উপরে নীচে চূণের মত সাদা। অধিকাংশ সময়ই ইহারা ছোট ছোট গাছের পাতার উপরিভাগে জড়াইয়া বসিয়া থাকে, একটুও নড়াচড়া করে না। দেখিলেই মনে হয় যেন পাতার উপর চূণের দাগের মত পাখীর পরিত্যক্ত মল শুকাইয়া রহিয়াছে। এদেশে মাঝারি আকৃতিবিশিষ্ট বাদামী রঙের কয়েক জাতীয় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ডানার নিম্নভাগের রং শুষ্ক পত্রের ন্যায়, শুষ্ক লতাপাতার মধ্যে ডানা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে মোটেই নজরে পড়ে না। বাদামী রঙের আর এক জাতীয় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের অনুকরণশক্তি আরও বিস্ময়কর। ইহাদের ডানার নিম্নভাগের রং ফিকে বাদামী, তাহার উপর বৃক্ষপত্রের শিরা-উপশিরার ন্যায় কতগুলি দাগ কাটা আছে। ডানা গুটাইয়া বসিলেই শুষ্ক পত্র বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের এই অদ্ভুত অনুকরণপ্রিয়তার বিশেষ কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না, কারণ ইহাদের শত্রুর সংখ্যা খুবই কম বলিয়া মনে হয়।

উঁচু মাচার উপর লতাপাতা জন্মাইলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম সুতার প্রান্তভাগে কাঠির মত কি যেন ঝুলিতেছে। ইহারা সুতলী পোকা নামে পরিচিত। কীড়া অবস্থায় ইহাদিগকে কাঠির মত দেখায়। পাতা খাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। খাদ্য-অন্বেষণে একটু দূরতর স্থানে যাইতে হইলে ইহারা মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে। আমাদের দেশে বহু জাতের সুতলী পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই অনুকরণক্ষমতার অধিকারী। শরীরের সম্মুখে ও পশ্চাতে কাঠির মত কয়েক জোড়া পা আছে। দেহের মধ্যস্থল সম্পূর্ণ মসৃণ। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে ইহারা জোঁকের মত হাঁটিয়া যায়। খাওয়া ছাড়া কীড়া অবস্থায় ইহাদের আর কোন কাজ নাই। পিছনের পায়ের সাহায্যে ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া জোঁকের মত মুখ উঁচু করিয়া হয়ত খাইতে ব্যস্ত; ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোন ভয়ের কারণ
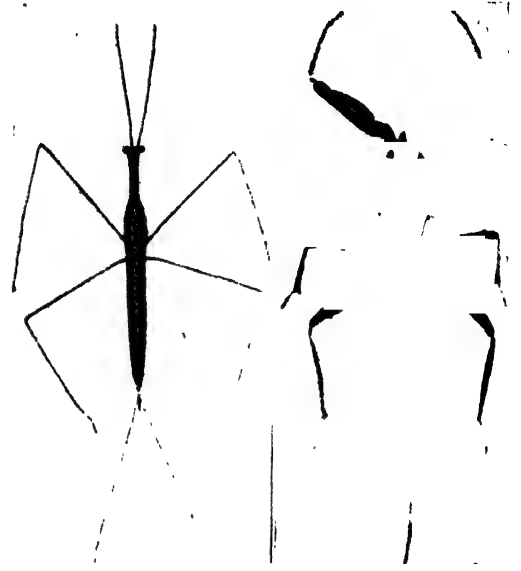
জলকাঠি শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে জলজ লতাপাতার মধ্যে হাত পা ছড়াইয়া মৃতের মত অবস্থান করে। শিকার কাছে আসিবামাত্রই চক্ষের নিমেষে সম্মুখের ক্ষুদ্র সাঁড়াশী তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

জলবিছু শিকার ধরিবার জন্য অদ্ভুত ভাবে আত্মগোপন করে। পিছনের দিক জলের উপর রাখিয়া কালো রঙের পচা পাতার মত ঘাস-পালার মধ্যে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে।

উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ শরীরটাকে খাড়া রাখিয়া চুপ করিয়া থাকে। দেখিয়া মনে হয় একটি পত্র-ছিন্ন বোঁটা গাছের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। নাড়াচাড়া দিয়া না দেখিলে ইহা যে একটি জীবন্ত প্রাণী তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। ছোট ছোট পাখীরা ইহাদের পরম শত্রু। লতাপাতার মধ্যে সর্ব্বদাই তাহারা সুতলী পোকার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। কিন্তু সুতলী পোকার আত্মগোপন-কৌশলে তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হইয়া থাকে।

'কিরবিনা সেফারডি' ও 'নেমোপটেরা' জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের আত্মগোপন-কৌশলও কম বিস্ময়কর নহে। ইহাদের উপরের ডানা দুইটি সাধারণ পতঙ্গের ডানার
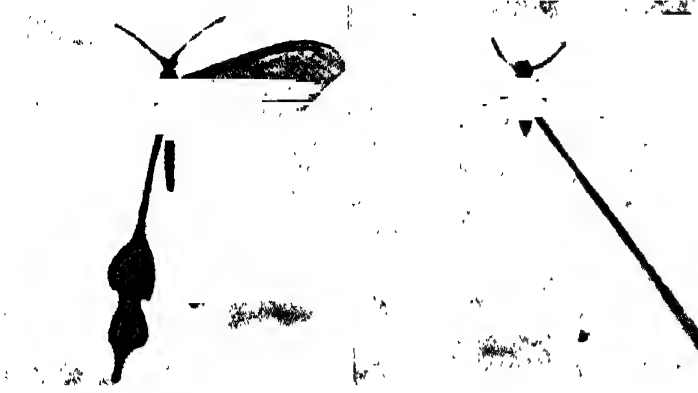
কিবকিনা নামক ক্ষুদ্র পতঙ্গ। চুপ করিয়া বসিবার সময় নীচের লম্বা ডানা দুটির জন্য ইহাদিগকে মোচড়ান শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত মনে হয়।

নেমোপ্টেরা জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ নীচের ডানাদুটি দাড়ের মত লম্বা। নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার সময় খড়কুটা বলিয়া ভ্রম হয়।

মত লম্বা লম্বা দুইটি শুঁয়ো আছে। এই শুঁয়ো দুইটি জলের উপর উঠাইয়া দিয়া ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। শিকার ধরিবার সময় জলজ লতা-পাতার মধ্যে মাথা নীচের দিকে রাখিয়া নিস্পন্দ ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকে। তখন একটা কাঠি ছাড়া ইহাকে জীবন্ত প্রাণী বলিয়া মোটেই বুঝিতে পারা যায় না। ছোট ছোট মাছ বা অন্যান্য জলজ পোকা কাছে আসিবামাত্র সাঁড়াশীর মত দাড়ার সাহায্যে ধরিয়া ফেলে এবং ধীরে ধীরে রস চুষিয়া খায়। শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যেই ইহারা আত্মগোপনের এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।

মত, কিন্তু নীচের ডানা দুইটি অসম্ভব লম্বা ও সরু। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ইহাদিগকে শুষ্ক তৃণখণ্ড বলিয়াই ভ্রম হয়।

আমাদের দেশের খাল-বিল, নালা-ডোবায় কাঠির মত সরু ও লম্বা এক প্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে উভচর প্রাণী বলা যাইতে পারে। তবে বেশীর ভাগ সময় ইহারা জলেই কাটায়। জলের মধ্যেই শিকার করিয়া উদর পূরণ করে। দেহের পশ্চাদ্ভাগে লেজের

যে-সব স্থলে জল-কাঠি দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সব স্থলে কালো রঙের আর এক জাতীয় চ্যাপ্টা পোকাও বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকেও উভচর বলা যাইতে পারে। এই উভয় পোকার মধ্যে পার্থক্য কেবল শারীরিক গঠনের। অন্যথা উভয়ের স্বভাব প্রায়ই এক। ইহারা শিকার ধরিবার সময় মৃতের মত অবস্থান করে। শিকার কাছে আসিলেই সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া ধরে। ইহারাও খাদ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই আত্মগোপন করিয়া থাকে।

হংকং ও সিঙ্গাপুর

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের জাহাজে কোথা থেকে জানি না এক জন জার্ম্মান ভদ্রলোক ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছিলেন। জাহাজে তাঁর সঙ্গী বলতে ক্যাপ্টেন ছাড়া বিশেষ কেউ ছিলেন না। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ত আর সমস্ত ক্ষণ পাওয়া যায় না। তাই সাহেবটি আমার মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব করেছিলেন। তাকে ঠাট্টা করে বলতেন, "তোমার ইংরেজী accent ত আমার চেয়ে ভাল।" আরও অনেক প্রশংসাই করতেন, তবে সেগুলো বেশীর ভাগ ছেলে-ভোলান। জাপানীদের সম্বন্ধে কথা উঠলে বলতেন, "এদেশে মেয়েরা কাজ করে, আর পুরুষরা মদ খায়।" কথাটা অবশ্য ঠিক নয়, তবে একেবারে অসত্য নয়।

এক দিন আমার সঙ্গেও তাঁর আলাপ হ'ল। তিনি বললেন, "জাপান আশ্চর্য্য সুন্দর দেশ। তবে ওসাকার মত আমেরিকান ধরণের শহর দেখলে জাপান কি তা বোঝা যায় না। গ্রামের জীবন দেখা দরকার। ইউরোপ আর আমেরিকার পাল্লায় পড়ে জাপানের সমস্যা কঠিন হয়ে উঠ্ছে।" ইত্যাদি।

এই ভদ্রলোক রাশিয়া সাইবিরিয়া সব গিয়েছেন। বলতেন, "সাইবিরিয়া ভীষণ খরচের দেশ, প্রচুর টাকা খরচ করতে না পারলে সেখানে এক দিনও থাকা যায় না। সবই অগ্নিমূল্য।"

ইনি ফরমোসাতেও গিয়েছিলেন। বলতেন, "সে-দেশটা জাপানের মত অত সুন্দর নয়। তবে ওখানে খুব বড় বড় জঙ্গল আছে। এক-একটা গাছ আকাশস্পর্শী আর মোটাও ভীষণ। দেশটা গরম দেশের মত। বোর্ণিও থেকে অনেক মালয়বাসী এখানে এসে বসবাস করে।"

ছুটিতে ইনি ফরমোসাতেই যাচ্ছিলেন। জাপানে কলেজে ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা পড়ান। ব্রঙ্কাইটিসে খুব ভোগেন, তাই প্রায়ই জাহাজে ঘোরেন। তাঁর কাছে শুন্‌লাম, জাপানীরা ইংরেজী ভাষা সব চেয়ে বেশী শেখে, তার পর জর্ম্মান। আমার ধারণা ছিল অনেক জাপানী ফ্রেঞ্চ জানে, কিন্তু তিনি বললেন, সব চেয়ে কম; "very few speak French"। এরা বিজ্ঞান ইত্যাদি শেখবার জন্যে জার্ম্মানীতেই বেশী যায়।

ক্রমে আমরা হংকঙের দিকে এগিয়ে এলাম। বন্দরে পৌছবার খানিক আগে সমুদ্রের রং ভারী সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন পরীর দেশ। নীল আকাশের গায়ে শ্যাওলায় ঢাকা বড় বড় কালো পাথরের দ্বীপ অন্ধকার মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মাঝখানে হ্রদের মত সমুদ্রের জল গলানো পান্নার মত টলটল ঝলমল করছে। কত রকমের পালতোলা নৌকা সেই জলে সারি সারি ভাসছে। আকাশ মেঘে মেঘে রহস্যময় হয়ে আছে, যেন স্বপ্ন। যতক্ষণ হংকঙের উঁচু উঁচু বাড়ীতে মোড়া পাহাড় আর ধোঁয়ার চোঙাওয়ালা প্রকাণ্ড জাহাজ-গুলো না দেখা যায় ততক্ষণ সত্যই আরব্য উপন্যাসের চীনরাজ্য ব'লে মনে হয়। ওইখানে ওই বিরাট কালো দৈত্যের মত অন্ধকার পাহাড়ের কোলে রাজকুমারী বেদুরা হয়ত ঘুমিয়েছিলেন।

আমরা আদত হংকং দ্বীপের কতকটা কাছে আস্‌তেই ছোট ছোট নৌকায় ক'রে কতকগুলো চীনা ছেলে এসে জলে পয়সা ফেল্‌বার জন্যে চীনা, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষায় চেঁচাতে লাগল। সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ যাঁরাই লেখেন তাঁদের প্রায় সকলের লেখাতেই এই জাতীয় ছেলেদের কথা আগে পড়েছি। এবার সত্যিই দেখ্‌লাম কেউ কেউ পয়সা ফেল্‌তেই এরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলিয়ে গিয়ে পয়সা তুলে আন্‌ছে। এই কন্‌কনে শীতকে গ্রাহ্যই নেই। উঠে বেশ ভিজে গায়েই খানিকক্ষণ

বসে থাকে, মাঝে মাঝে ভিজে গামছা দিয়ে মুখ আর মাথার খোঁচা খোঁচা চুলগুলো মুছে নেয়। আমাকে দেখে হিন্দীতে "পয়সা ফেঁকো" বলে অনেক চেঁচাল। আমার কাছে টাকা এবং নোট ছাড়া খুচরা কিছু ছিল না। হাত নেড়ে বল্‌লাম, 'পয়সা নেই'। ছেলেগুলো ভদ্রতার জন্য কিছুমাত্র বিখ্যাত নয়। অমনি মুখ ভেঙিয়ে আমার ব্যাগটার দিকে আঙুল দেখাতে লাগ্‌ল।

হংকঙের বন্দর দূর থেকে দেখা যাচ্ছে দেখে শিখ মেয়েরা সব নিজেদের খোপ ছেড়ে ডেকে এসে পাইচারি করতে লাগ্‌ল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সকলে হিন্দী জানে না, যারা জানে তারাই কথা বলছিল। একটি মেয়ে বললে যে সে তার স্বামীর সঙ্গে সাত বৎসর আগে সাংহাই এসেছিল। তার একটি ছেলেও ছিল। ছেলেটি জর হয়ে মারা গিয়েছে। স্বামীও মাস তিনেক আগে মারা গিয়েছে। কোথায় সিপাহীর কাজে গিয়ে আহত হয়ে এসে জর কাশিটাশি বাধিয়ে মরে গেছে। এখন সে একলা, এই দলের সঙ্গে দেশে ফিরে যাচ্ছে। জিগেস করলাম, "দেশে তোমার বাপ মা আছে?" বল্‌লে "না, তারা মারা গিয়েছে। ভাইবোনও কেউ নেই।" বল্‌লাম, "তবে বুঝি তোমার স্বামীর ভাইবোন আছে? মেয়েটি একই সুরে বল্‌লে, "ও লোকভি মরগিয়া।" পৃথিবীতে তার এক জা ছাড়া কেউ নেই, তারই কাছে ও যাচ্ছে। মেয়েটি কিন্তু বেশ হাসি-খুসী, বিশ্বসংসারে কেউ নেই, কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে একলা পরের ভরসায় চলেছে। অথচ জাহাজ, নৌকা, ঘরবাড়ী দেখে মহা উৎসাহে গল্প করছে। নিজের এক সংসার জিনিষপত্র নিয়ে চলেছে। আমাকেও হাজার রকম প্রশ্ন করছে।

দুপুর বেলা হংকঙের কাছে এসে জাহাজ মাঝজলে সিঁড়ি নামাল। দেখলাম ষ্টীম-লঞ্চে করে হোম্‌রা-চোম্‌রা কারা সব একদল আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম, আমাদেরও ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি যাত্রী, নাবিক, চাকর-বাকর সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়েছে কোয়ারাণ্টাইন ইনস্পেক্শন হবে বোধ হয়। আমি উঁকি দিয়েই আবার দৌড়ে চলে এলাম, হয়ত পাসপোর্ট দরকার হবে মনে ক'রে। কিন্তু আমার মেয়ে এসে বল্‌ল, "আমাদের হয়ে গেছে, আর যেতে হবে না।" আমাদের মুখ দেখেই ওরা সব বুঝে নিল, কিন্তু বেচারী নাবিকদের সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ল। ডেক-যাত্রীদের ত আরও যন্ত্রণা। তাদের আবার ডাক্তার পর্দার ইত্যাদি সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে এদের দল নেমে গেল।

তার পর এল পোষ্ট আপিসের বোট। তাতে শাংহাই, ফ্রান্স, শ্যাম, গ্রেট ব্রিটেন কত কি লেখা মস্ত মস্ত সব ব্যাগ উপর থেকে ঝুপঝাপ পড়তে লাগল। পোষ্ট আপিসের কর্ম্মচারী দুজনই দেখলাম ভারতবর্ষীয় লোক। এরা চলে যেতেই এক চীনা দম্পতি জলে নামানো সিঁড়ি দিয়ে নৌকো ক'রে যাবার উদ্দেশ্যে পোঁটলা-পুঁটলি বার ক'রে সিঁড়ির কাছে এনে হাজির করল। কিন্তু কর্ত্তারা সিঁড়ি তুলে নিয়ে বললেন, "এখানে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না।"

জাহাজ ঘুরে কৌলুনের ঘাটে লাগল। তখন প্রায় আড়াইটা। আমাদেরও আজ এক বার নামবার কথা ছিল। হংকঙে ডাক্তার মনোরঞ্জন দেব নামে এক জন আতিথ্যপরায়ণ বাঙালী ডাক্তার থাকেন। টোকিও থেকে মজুমদার মহাশয় তাঁকে লিখেছিলেন আমাদের একটু ডাঙায় নামিয়ে মাছ-ভাত খাওয়াতে। আমরা ডাক্তার দেবের জন্য ডেকের রেলিংএর কাছে এসে চারি ধারে তাকাচ্ছিলাম। ডাঙাতে কয়েক জন বিশালকায় সাহেব পিছনের সব মানুষদের এমন আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল যে আর কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ তাদের ঠেলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে টুপি তুলে আমাদের অভিবাদন করলেন। বুঝলাম ইনিই ডাক্তার দেব। সিঁড়ি লাগাবামাত্রই তিনি উপরে উঠে এলেন। সকাল দশটায় নাকি জাহাজ আসবার কথা ছিল। তখন থেকে এই বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন জেনে অত্যন্ত লজ্জিত হ'লাম। মনে হ'ল, এমন করে ভদ্রলোককে হয়রান্ করা বড় অন্যায় হয়েছে। যাই হোক, উপায় নেই। এখন আর ফেরান যায় না।

সাহেবরা দয়া ক'রে আমার পাসপোর্টটা হাতে ক'রেই বিনা প্রশ্নে ছাপ দিয়ে দিল। তখনও সিঁড়ি দিয়ে নামা বারণ। ভদ্রলোক বল্লেন "পোষ্ট আপিসের নৌকায় যদি লাফিয়ে নামতে পারেন ত এখুনি যাওয়া যায়।" তিনি সারাদিন অনাহারে আছেন শুনে সেই মুহূর্ত্তেই নৌকায় সকলে লাফিয়ে নামলাম। নৌকায় করে হংকঙের ঘাটে গিয়ে উঠে দেখি তাঁর গাড়ী চাবি দেওয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাঃ দেব নিজেই চালিয়ে রবিনসন রোডে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিন তলার উপরে তাঁর ফ্ল্যাট। ঘণ্টা টিপতেই সাদা জামা ও কালো পায়জামা পরা একটি চীনা ঝি মাথায় বিনুনি করে মস্ত একটা খোঁপা বেঁধে এসে দরজা খুলে দিল। আমাদের দেশে চীনা মেয়েদের গায়ে সাদা জামা প্রায় দেখি না। তার পর ডাঃ দেবের স্ত্রী এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বেচারী ভদ্রমহিলা ভাত, তরকারি, ইলিশ মাছ, মাংস কত কি রেঁধে এতক্ষণ অনাহারে বসে আছেন। একেবারে প্রাচীন ভারতীয় আতিথ্য! কিন্তু আমাকে অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গেই বলতে হ'ল যে শরীর খারাপ ব'লে আমার কিছুই খাওয়া হবে না। এত সমারোহের ভোজের সদ্ব্যবহার করল আমার মেয়েটি একলা। হংকঙে বেড়ান এবং বাংলা রান্না খাওয়া এই দুটো উদ্দেশ্যে মজুমদার মশায় আমাকে জাহাজ থেকে নামতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন এসেই এমন ভাবে শয্যা নিলাম যে কোনটাই হ'ল না।

ডাঃ দেবের মেয়েরা কাছেই কনভেণ্টে পড়ত। তারা চারটের মধ্যেই বাড়ী এল। বেশ মেয়ে দুটি। অনেক গল্প হ'ল তাদের সঙ্গে। চীনারা কাঠের কাজ কি সুন্দর করে এঁদের বাড়ীর অনেক ভাল ভাল আসবাব দেখে তা অনেকটা বোঝা গেল।

সমস্ত দিন টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে ব'সে গল্পগাছা ছাড়া কিছুই হ'ল না। দেবগৃহিণী কত যে সেবাযত্ন করলেন তা বলবার নয়। সন্ধ্যার পর জাহাজে ফিরে যাবার কথা। যাবার পথে হংকঙের পথ-ঘাটগুলো আর একবার ঘুরলাম। বৃষ্টির জন্য পথে এবার বেশী লোক নেই। সিডান চেয়ার আর রিক্স অনেক, সবাই তাতে চড়ে চলেছে। এসব জিনিষ জাপানে দেখি নি, এখানে খুব দেখলাম। যারা বৃষ্টিতে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা অনেকে মাথায় ঝুড়ির মতন টুপি আর গায়ে খড়ের বর্ষাতি পরে চলেছে। বেশ মজার দেখতে। পথে সঙ্গতিপন্ন মেয়েরা প্রায় নেই, দুই-এক জন চলেছে চুল বব্ করে। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের বড় বড় খোঁপা কিংবা সুদীর্ঘ বিলম্বিত বেণী। কেউ সিঁথি কাটে না।

হংকঙে শিখদের একটা মস্ত মন্দির আছে দেখলাম। হংকং-পাহাড়ের এপিঠে ওপিঠে রাস্তা, তাছাড়া মধ্যে মধ্যেও কেটে রাস্তা করেছে।

হংকঙে সব চেয়ে সুন্দর দৃশ্য তার বন্দরের আলো। অসংখ্য নৌকা জাহাজ ও জেটিতে যখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠে, মনে হয় সমুদ্রের বুক জুড়ে যেন দেয়ালির বিরাট সমারোহ চলছে। হঠাৎ গাছের ফাঁকে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই মনে হ'ল আকাশের সব তারা যেন ঝাঁক বেঁধে অনেক গুণ বড় হয়ে নীচে নেমে এসেছে। মাথার উপরেই সেই অসংখ্য তারার মালা জ্বল্ জ্বল্ করছে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখি মেঘলা রাতে পাহাড়ের কালো মাটি মেঘ ও আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, শুধু দেখা যাচ্ছে আঁকাবাঁকা পথের ও বাড়ীর বড় বড় আলোগুলি। তাই দৃষ্টিবিভ্রম। আলোর সমারোহ হংকঙের সমুদ্র ও পাহাড়ের ঊর্দ্ধমুখী পথে যেমন অপূর্ব্ব দেখায় এমন আর কোন বন্দরে দেখা যায় না শুনেছি।

হংকঙের ঘাট থেকে দশ মিনিট অন্তর অন্তর ফেরি ষ্টীমার ছাড়ে। আমরা ঘাটে পৌছতেই একটা ফেরি ছাড়বার সময় হ'ল, ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনের মত সারি সারি বেঞ্চি পাতা ছোট্ট ষ্টীমার। কতকগুলো সাহেব ও কিছু চীনা ব'সে আছে, দুই-এক জন ভারতীয় লোকও রয়েছে। ঘণ্টা পড়তেই নৌকা ছুটল। জাহাজ এত জোরে ছোটে জানতাম না। ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া, বাদলা রাতে আরও ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।

আমরা কৌলুনের ঘাটে নেমে আবার বৃষ্টির জলের ভিতর ছপ ছপ করতে করতে চললাম। খড়ের বর্ষাতি পরা এক দল লোক ক্রেণ থেকে বড় বড় পিপে নামাচ্ছিল। মাথার উপর পিপেগুলো এমন সজোরে দুল্‌ছে যে প্রতি

মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি একটা ঘাড়ে এসে পড়ে। এদিকে আবার সমস্ত পথটা রেল-লাইন পাতা, তার উপর দিয়ে ক্রমাগত চারি দিকে ট্রক চল্‌ছে। প্রায় জলে কুমীর ডাঙায় বাঘের অবস্থা! কোন্ দিকে যে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার উপর দেব মশায় হঠাৎ বললেন, "ব্যাগটা সাবধানে রাখবেন, এখানে 'ব্যাগ স্ন্যাচার' (bag snatcher)এর ভয় আছে।" ভাল জালা! এদিকে ত প্রাণ নিয়ে চলা শক্ত, তার উপর আবার পাসপোর্টটি যদি চুরি যায় তাহলেই ষোল কলা পূর্ণ।

জাহাজে উঠে দেবদম্পতি কিছু ক্ষণ বসলেন। আমার মেয়ে তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজি নয়, বলে, "আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলুন।" রাত্রে তাঁরা চলে যাবার পরও বলতে লাগল, "মা, বিদেশে বাঙালী দেখলে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না, সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।"

মিঃ দেব যাবার সময় বললেন, "আপনাদের জাহাজটার বেশ নাম—আনিও মারু, যাইও না।"

হংকঙে পুলিস ও ড্রাইভারের কাজে অনেক শিখ থাকে, এরা ভারতবর্ষীয় লোক দেখলে খুব সাহায্য করে।

হংকং ছাড়বার পর থেকে আবার গরম সুরু হ'ল। জাহাজে পাখা চালানো এবং আইসক্রীম খাওয়ানোর ধূম লেগেছে। দু-চার দিন না যেতেই এত গরম বাড়তে লাগল যে ডেকে ছাড়া আর কোথাও বসা যায় না। অথচ ডেকে যাওয়া মুস্কিল। থার্ড ক্লাস যাত্রীরা সব চেয়ারগুলি দখল ক'রে আরামে ব'সে আছে। শিখ মেয়েরা মাঝে মাঝে চেয়ার জোগাড় ক'রে আনত এবং নিজেদের নানা সুখদুঃখের গল্প করত। তারা থার্ড ক্লাসের ডেকে যাচ্ছে, তাদের শোওয়া বসা ঘুমনো সবেরই অসুবিধা। স্নান ত করাই মুস্কিল। কোনও পরদা নেই।

চীন রাজ্য ছাড়িয়ে যত মালয় দেশের কাছে আসা যায় ততই সবুজের প্রাচুর্য্য। হাল্কা সবুজ জলের মধ্যে ছোট ছোট গোল পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে, গাছে ভর্ত্তি; চীনদেশের মত কালো শ্যাওলা-ঢাকা পাথর আর লাল মাটি এদিকে নেই। কিছু দূর পর্য্যন্ত নীচু নীচু পাহাড় ও ছাড়া ছাড়া ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ চল্‌ল, তার পর একটানা জমি গাছে ঢাকা, কোথাও ঠিক সবুজ ক্ষেতের মত। জল ও স্থলের মিলনে দুইই সুন্দর দেখাচ্ছে। পাশে স্থল না থাক্‌লে জলের রূপ খোলে না। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়গুলি যেন সবুজ তোড়া, মাথায় লম্বা গাছ নয়, পাতার ঘনঘটাই বেশী। এখানে জমি বিরাট্ পাহাড় নয়, সহজেই জলের নাগাল পায়, তাই জলেস্থলে মিলন আরও ভাল হয়। আকাশে হাল্কা সাদা মেঘ করেছে, হাওয়া গরম, মনে হচ্ছে শরৎকালে দেশে ফিরে এসেছি।

আজ সিঙ্গাপুরে নামবার কথা। ৩॥ টায় সমুদ্রের মাঝখানে সিঁড়ি নামিয়ে কোয়ারাণ্টাইনের ডাক্তারদের তোলা হ'ল। আবার সেই ছুটোছুটি। আমাদের চোখে দেখেই 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ছেড়ে দিল। হাঙ্গাম যত ডেক-যাত্রী আর নাবিকদের নিয়ে। ডাক্তারগুলি বোধ হয় তামিল জাতীয়। এদের পর জল-পুলিসের পালা। এক দল চীনে তাদের গোলাপী রঙের ছোট ছোট পাসপোর্ট নিয়ে ফার্ষ্টক্লাসের বাহারের কার্পেট তাদের শ্রীচরণের ধূলিতে কলঙ্কিত করে দিল।

পাঁচটার সময় আমরা Tanjong Pagar নামক বড় ঘাটে এলাম। অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বলেন পূর্ব্বদেশে এত বড় জাহাজ-ঘাট আর নেই। জাহাজটা ঘাটে লাগবার একটু আগে থেকেই যাত্রীদের তীরের বন্ধুরা টুপি আর রুমাল নাড়তে আরম্ভ করলেন। এদিকেও সবাই রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল। আমাদের ত সবাই অচেনা, তারই মধ্যে মনে হ'ল দূরে যেন একজন বাঙালীর মুখ দেখতে পাচ্ছি। জাহাজ আর একটু এগতেই তিনি বাংলায় কথা ব'লে নমস্কার করলেন। দেশের এক জন মানুষ দেখে মনটা নিশ্চিন্ত ও খুশী হ'ল। এক বার তাহলে ডাঙায় পা দেওয়া যাবে। সিঁড়ি নামাতেই সমদ্দার মহাশয় উপরে এলেন। আমি বললাম, "যদি সুবিধা হয় ত একটু নামতে চাই।" তিনি খুব উৎসাহ ক'রে বললেন, "জাহাজ ত কাল ছাড়বে। আপনারা রাত্রে গরমে আর মশার কামড়ে কেন কষ্ট পাবেন। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে চলুন।" যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় দুটি বাঙালী মহিলাও জাহাজে উঠলেন। ভদ্রমহিলারা বললেন "আমরা কালকে মাত্র এসেছি, এসেই শুনলাম আপনি আসছেন,

তাই নিতে এলাম আপনাকে।" এক জন মহিলা বললেন, "মিঃ সমদ্দার আমাকে মা ব'লে ডাকেন।"

এঁরা সিঙ্গাপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ গুহর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়ে নামালেন। পথে শুনলাম মিঃ গুহর দুই স্ত্রী। বাড়ীটা খুব সুন্দর বাগান ও আসবাবে সাজানো, বাগানে একটি কৃষ্ণমন্দির, মন্দিরে কৃষ্ণের সঙ্গে ষোড়শ গোপিনী। বাড়ীতে অনেক অতিথি-অভ্যাগত জমা হয়েছে। কেউ বাংলা দেশের, কেউ পারস্য দেশের, কেউ চীন দেশের। এক সাহেব ব্যারিষ্টারের স্ত্রী চীনা দেখলাম। সাহেবটি দারুণ মাতাল, কাছ থেকে মাতাল জীবনে সেদিন প্রথম দেখ্‌লাম।

বড় মিসেস গুহ অনেক যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। তার পর আমরা সমদ্দার মহাশয়ের বাড়ী চলে গেলাম। বড় বাগানের মধ্যে ছোট্ট একটি বাড়ী। কত রকম যে গাছ! আম, জাম, কলা, নারকেল, সুপুরি, আনারস তার উপর আবার অনেক রকম ফুল। বেড়াগুলি সব জবাগাছের। পাশাপাশি সব বাড়ী ও বাগানগুলিই প্রায় এক রকম। চার ধারে চারটে থামের উপর বাড়ী দাঁড়িয়ে, এতে ঘরে সাঁতা লাগে না। রাত্রে একতলা বাড়ীতে বাগানের দিকে জানালা খুলে শুয়ে আকাশের তারা চাঁদ দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাল্যকালের এলাহাবাদে ফিরে গিয়েছি। জাপানে শীতের রাত্রে আকাশ দেখবার জো নেই। এমন আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল এদেশটা জাপানের চেয়ে অনেক সুন্দর। কয়েক দিন থাকলে কি মনে হ'ত জানিনা।

ভোরবেলা উঠে জবার বেড়ার পাশে পাশে খোলা রাস্তায় একটু বেড়ালাম। সব বাড়ীতে চীনা ঝিরা টেনে চুল বেঁধে তখন ঘরদোর ঝাঁট দিচ্ছে। গৃহকর্ত্তার খোকা তখনও ঘুমচ্ছে, ঝি হলুদ বাট্‌ছে, তার পাশে দোলায় শুয়ে ছোট্ট একটা মোটাসোটা থ্যাদা খোকা হাত-পা নাড়ছে আর হাসছে।

সামনে আর এক বাঙালী ব্যারিষ্টারের বাড়ী ছিল। গৃহকর্ত্তা আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। এবাড়ীর গৃহিণী বিদেশে এসেও একেবারে সাবেক বাংলার মেয়ের মতন। অনেক গল্প করলেন, ঘর-সংসার দেখালেন। সেখান থেকে ফিরে মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। কিন্তু করোনেশান উপলক্ষ্যে তখন সব মেরামত চলছিল, কাজেই ভাল দেখা হ'ল না। মালয় দেশের ঘরের নমুনাগুলো ভাল ক'রে দেখ্‌লাম। বাঁশের বেড়ার উপর পাতার ছাউনি, বেড়াতে গালা দিয়ে নানা রঙের ছবি আঁকা।

মালয়বাসীরা উর্দ্দু হরফে লেখে। এখানকার প্রাচীনতম উর্দ্দু শিলালিপি দেখ্‌লাম।

সমদ্দার মহাশয় সিঙ্গাপুরের সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। তাঁর স্কুলে আমাদের নিয়ে গেলেন। স্কুলে প্রাইমারী ক্লাসগুলি ছাড়া সাতটা ষ্টাণ্ডার্ড, ছেলেরা জুনিয়ার কেম্ব্রিজ, সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেয়, কারণ ওখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। নীচের ক্লাসগুলি সব মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের হাতে, তাঁরা কেউ চীনা, কেউ কেউ তামিল। উপরের ক্লাসে পুরুষ শিক্ষক সব। তার ভিতর বাঙালী এবং দক্ষিণ-ভারতীয় দেখলাম। এখানে ট্রেণিং শেখবার জন্যে অনেক মেয়ে বিনা বেতনেও শিক্ষকতা করেন। স্কুলের যে ঘরে যত জনের বেশী বসা বারণ তার চেয়ে বেশী ছাত্র সে ক্লাসে নেওয়া হয় না।

আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন একটা বাড়ীতে ছাত্র কুলোত না ব'লে স্কুলের দুটো বাড়ী নেওয়া হয়েছিল। সমদ্দার মহাশয় ১০,০০০৲ হাজার টাকা ধার ক'রে স্কুল সুরু করেন, কিন্তু এখন বেশ আয় হচ্ছে। স্কুলে ছেলে এখন ৭০০। বেশ সুনামও হয়েছে।

ইংরেজ-চালিত নয় এমন প্রাইভেট স্কুল ওখানে তখন আর একটি মাত্র ছিল। ওখানে গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী একেবারেই নয়। কলেজ যদিও আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নেই, কলেজ থেকে ডিপ্লোমা দেয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বারটি ছেলে নিয়ে সিটি স্কুল আরম্ভ হয়। এখন ৭০০ ছাত্র ও বাইশ জন শিক্ষক। অধিকাংশ শিক্ষক ভারতীয়। গত বৎসর ও দেশের শিক্ষাবিভাগ আশিটি প্রাইভেট স্কুল পরীক্ষা করে আটটিকে "গ্রেড ১" বলে স্বীকার করেন। সেই আটটির মধ্যে সিটি স্কুল অন্যতম।

সম্প্রতি স্কুলের নিজস্ব নূতন বাড়ী হয়েছে। এটি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের বাড়ীর চেয়ে সুন্দর।

স্কুল দেখবার পর হাসপাতালে সমদ্দার মহাশয়ের স্ত্রীকে দেখ্‌তে গেলাম। তিনি আমাদের যত্ন করতে পারেন নি বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

চীনা নার্স'রা সাদা জামা ও সাদা পাজামা পরে কাজ করছে। বিলাতী নার্সের পোষাক পরেনি।

ফেরবার পথে দূর থেকে সারি সারি রবার গাছ, আনারস প্যাকিংএর কারখানা, সিভিল এরোড্রোম, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি দেখ্‌লাম।

শুনলাম এখানে আনারসের ক্ষেত নাকি মাইলের পর মাইল চলে, এবং এরা সারা পৃথিবীতে আনারস পাঠায়। রবার গাছগুলি বেশ বাহারের বাগানের মত, মাঝে চওড়া রাস্তা রেখে সারি সারি বসানো।

মাঝে মাঝে দেখ্‌লাম খুব জলা জায়গায় খুঁটি পুঁতে গরীব লোকেরা বেড়ার বাড়ী করেছে। শহরে এ-রকম বাড়ী বেশী নেই। কোথাও জোলো জায়গায় গাছের গুঁড়ি সারি সারি ভেজানো রয়েছে। এখানে মোটর ও মানুষচালিত ছাড়া অন্য রকম যানবাহন নেই। White Horse Whiskyর বিজ্ঞাপন ছাড়া কোথাও ঘোড়ার চেহারা দেখ্‌লাম না!

মানুষ-বিক্রী বে-আইনী হলেও সিঙ্গাপুরে প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই ছেলেপিলে বিক্রী হয়। তার নমুনাও কিছু দেখেছি।

সন্ধ্যার অনেক আগেই জাহাজে ফিরে এলাম। জাহাজের খোলে তখন অসংখ্য বস্তা নামছে ক্রেণ থেকে। একটা সুন্দর ইউরোপীয় জাহাজ অনেক যাত্রী নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীদের কাছে কিছু বিক্রী করবার জন্যে তামিলরা ঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাজার বসিয়ে ফেলেছে। চীনা জাপানী এবং সিঙ্গাপুরী কত রকম সুন্দর জিনিষ এনে জড়ো করেছে। দাম অসম্ভব হাঁকছে কিন্তু বিদেশীয় টাকাপয়সা বাচছে না। টাকা, ডলার, পাউণ্ড, ইয়েন যে যা দেয় সব নেয়। ওদের সব জাতীয় মুদ্রার দর নখদর্পণে। মেমসাহেবরা হোয়ার্ফে দাঁড়িয়ে জরির কাজ-করা ড্রেসিং গাউন পরে পিঠ ফিরিয়ে সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের দিয়ে তারিফ করাচ্ছিলেন। জাহাজের বড় সাহেবরা সাদা ইউনিফর্মের উপরই পেথম-ধরা ময়ূর পিঠে চড়িয়ে ড্রেসিং গাউনের মাপ দিচ্ছেন।

টিনের গুদাম-ঘরগুলির গায়ে লাল নীল কালো সিল্কের বড় বড় কিমোনো, জরির ড্রাগন, ময়ূর, ফুলের বাগান পিঠে ক'রে ঝুলছে। মেঝেতে শুকনো লঙ্কার পর্ব্বতপ্রমাণ বস্তার পাশে গালার কাজের নক্সা করা কৌটা ছাতা, রেশমের বেল ঝক্‌মক করছে। দূরে সস্তা গেঞ্জি ও কাপড়েরও দোকান বসেছে। আমাদের জাহাজের শিখ সিপাহীরা গেঞ্জির দোকানে ভীড় করে ২৫ সেণ্ট দিয়ে এক-একটা গেঞ্জি কিনছে। আমিও একটু নেমে বেড়িয়ে এলাম। আমি হিন্দী বলছি দেখে তারা মহা খুশী। তারা চীনা, ইংরেজী, হিন্দী, পাঞ্জাবী সব ভাষায় অনর্গল কথা বলে।

আমরা ২০শে পেনাং পৌঁছলাম। ভারী সুন্দর দেখতে দেশটা। দূর থেকেই নিবিড় অরণ্যে ঢাকা ছোট ছোট সবুজ পাহাড় দুই ধারে দেখা যায়। এক একটা পাহাড়ের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সব সুপুরি গাছে ভর্ত্তি। কোথাও বা উপরে 'ফর্' ধরণের গাছ, নীচে তাল নারকেল সুপুরি। সরু সরু ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের নীচে একেবারে জলের ধারেই পাতার ছাউনির ছোট ছোট ঘর, তার সামনেই ছোট ছোট সাম্পান নৌকা দাঁড়িয়ে। তাতে না আছে পাল না আছে মাস্তুল। নৌকার গায়ে সুন্দর রং ক'রে ছবি আঁকা।

খানিক পরেই দুধারে নীচু জমি ও জমির ভিতরে পাহাড় দেখা যেতে লাগ্‌ল। সুন্দর স্বাভাবিক বন্দর, দুই দিকেই লাল লাল ঘর বাড়ী। জাহাজ মাঝ-জলে দাঁড়াল। চার ধার থেকে রঙীন নৌকা তৎক্ষণাৎ ছেঁকে ধরল জাহাজটা। দেশ ও নৌকা দুইই সুন্দর, কেবল মাঝিগুলি কুৎসিত এই যা দুঃখ

চেট্টিরা জাহাজে উঠে টাকা বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ বিদেশী টাকা বদলাতে চাইলে বদলে দেবে। অনেক তামিল যাত্রী উঠল; মানুষের রং কতটা কালো যে হ'তে পারে তা এখানে বোঝা যায়। রাত দশটা পর্য্যন্ত জিনিষ বোঝাই ক'রে এক পাল লোক হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাদের জন্যে ছবি-আঁকা অগুন্তি সাম্পান

নিয়ে মাঝিরা অপেক্ষা করছিল। লোকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ ব'সে নৌকার মাঝখানে একটা ক'রে লণ্ঠন জ্বেলে অন্ধকার কালো জলে ভেসে পড়ল। একের পর এক রঙীন খেয়া-নৌকা চলে গেল। দূরে ডকে সবুজ আলো জ্বলতে লাগল। সামনে একটা প্রকাণ্ড কালো জাহাজ প্রাসাদের মত আলোয় ঝলমল করছে।

পেনাঙে নামা হ'ল না বলে দুঃখ থেকে গেল। বিকালে ডেকে ব'সে দেখছিলাম লাল বাংলোগুলির পিছনে ঘন-সন্নিবিষ্ট "তমালতালীবনরাজিনীলা।" তার পিছনে কোথায় স্নেক টেম্পলে বড় বড় জীবন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আশ্চর্য্য মন্দিরের কারুকার্য্যের মধ্যে কে জানে? কত না জানি স্বপ্নময় রহস্য!

আমাদের দেশের কাছেই জল ও আকাশের রূপ খোলে। সন্ধ্যার আকাশ অনবদ্য হয়ে ওঠে। কি শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী! নিঃসীম সমুদ্রের মৃদু তরঙ্গমালার বুকে দিনের পলায়মান ম্লান আলো ঝিলিমিলি করছে। প্রতি তরঙ্গের কোলে কোলে ঘন অন্ধকার দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার জলবালা আর নাগিনী তাদের ঘন কালো চুল স্রোতের জলে ভাসিয়ে মাথা হেঁট করে অস্ত-সাগরের দিকে সাঁতরে চলেছে। তাদের মুখ দেখা যায় না, শুধু কালো চুলের পাশে কাপড়ের আঁচল ঝলমলিয়ে উঠছে।

আকাশে রঙের খেলার কি সুষমা! ঘন নীল আকাশের কপালে টিকার মত নবমীর চাঁদ জ্বলছে, তার নীচে শ্বেতাভ হাল্কা নীলের তুলি টানা, তার নীচে হাল্কা কমলা রঙের পোঁচ, তারও নীচে আগুনের মত রক্তাভ রং ক্রমে কালোর পোঁচ পড়ে পড়ে একেবারে সাগরের অন্ধকার কালির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। রক্তাভ আকাশের কালির ভিতর টুকরা টুকরা কালো মেঘ ঢেউয়ের মত ভাসছে। মনে হয় সাগর যেন শেষ হয় নি, নীল সাগরের পরে রক্ত সাগর সুরু হয়ে গিয়েছে, জলবালারা তার রঙে মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে ছুটেছে।

২৫শে কলম্বো পৌঁছলাম। কাগজের রিপোর্টাররা এসে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। এখানে আমাদের পরিচিত এক জন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁকে খবর দিলে কলম্বোতে একটু নামা যেত, মনে ক'রে ওদের একটু টেলিফোন করতে বললাম। বুদ্ধিমানরা এক অপরিচিত ব্যক্তিকে টেলিফোন ক'রে দিল। ফলে এমন একটি মানুষ এসে হাজির হ'ল যাকে তাড়াতে পারলে বাঁচি। অনেক কষ্টে তাকে বিদায় করলাম। পথে কত রকম মুস্কিলেই পড়তে হয়! তবু আমার ভাগ্যে বেশী ঘটে নি।

পরদিন সিংহল ছেড়ে চললাম। এখানকার মাঝি-মাল্লা জল-পুলিস প্রভৃতি সকলের গায়ের রং পাকা। এত কালো রং দেখে জাপানী মাল্লাগুলো খুব ঠাট্টা তামাশা করছিল। তারা আবার হাতে খায়, সেটাও জাপানীদের একটা হাস্‌বার বিষয়। নিজেদের দেশে ফিরেই মনে পড়ে গেল আমরা পৃথিবীর হাসির খোরাক জোগাই।

২৯শে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নাম্‌লাম। অনেক বন্ধু ও দেশের লোক নিতে এলেন, অনেক সাহায্য করলেন। তাঁদের এত সাহায্য না পেলে বড় অসুবিধায় পড়তাম। তার পর আতিথ্যপরায়ণ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী উঠে তাঁর গৃহিণীর যত্ন উপভোগ ক'রে আবার খাঁচার পাখী খাঁচায় ফিরলাম।

পুস্তক পরিচয়

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—সমাজ—সম্পাদকত্রয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। প্রবাসীর আকারের ৬৷৴০+৬৬৭+৷৵০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এণ্টীক কাগজে সুমুদ্রিত। ছাপার ভুল প্রায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২টি ছবি, অন্য ২টি ছবি, এবং তাঁহার হস্তাক্ষরের অনুলিপি আছে। মূল্য সাত টাকা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণের বৃত্তান্ত সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম খণ্ডের পরিচয় দিবার সময় দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে সম্পাদকত্রয় (শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীপার্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী) "বিবৃতি"তে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক মুদ্রণের বিপুল ব্যয়ভার সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ঝাড়গ্রামের জমিদার কুমার নরসিংহ মল্লদেব, বি. এ. মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহন করিয়া যে মহাপ্রাণের পরিচয় দিয়াছেন, অধুনা তাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।"

সম্পাদকত্রয় তাঁহাদের কাজ যোগ্যতার সহিত করিয়াছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জী" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা বহু শ্রম ও যত্নসহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর এই সমাজখণ্ডে আছে, "বাল্যবিবাহের দোষ", "বিধবা-বিবাহ—প্রথম প্রস্তাব", "বিধবা-বিবাহ—দ্বিতীয় প্রস্তাব", "বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তক", "বহুবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক", "অতি অল্প হইল", "আবার অতি অল্প হইল", "ব্রজবিলাস", "বিনয়পত্রিকা", "রত্নপরীক্ষা"। এইগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি পুস্তক গম্ভীরভাবে রচিত ও সুযুক্তিপূর্ণ। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক চারিখানি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিতর্কনিপুণতা এবং ধীরতারও পরিচায়ক। শেষোক্ত পাঁচখানি বহি প্রতিবাদকারীদিগের প্রতিবাদের উত্তরে লিখিত। প্রথমোক্ত বহিগুলি "সাধুভাষায়" লিখিত, শেষোক্তগুলি রচনাকালে প্রচলিত কথিত বাংলার উত্তম নমুনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ বাংলা কত ভাল লিখিতে পারিতেন এবং তাঁহার যুক্তিতর্ক ও পরিহাস উপহাস বিদ্রূপ প্রতিপক্ষদের পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক হইত, তাহা এই বহিগুলি হইতে বুঝা যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "এই সকল গ্রন্থে যে-সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সেকালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য, এবং পিতাপুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে"...। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বলিয়াছেন, "তখন কলিকাতার লোক এই বই দু-খানি পড়িয়া অস্থির হইত।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে বিধবা-বিবাহ বেশী চলে নাই। পুস্তক রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিধবাদের বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ ও পরে তাহাদের মধ্যে দুঃস্থাদের ব্যয়নির্ব্বাহ এবং সকল প্রকার সামাজিক কুৎসা ও উৎপীড়ন সহ্য করিবার ধাক্কার প্রায় সমস্তটাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ যে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাঙালী জাতির মুখরক্ষা হইয়াছিল। সম্পাদকেরা তাঁহাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছিলেন সত্য, তদানীন্তন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থনও করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিশোরচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, দুর্গামোহন দাস, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতিও এ-বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।"

হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ এখনও যথেষ্ট প্রচলিত হয় নাই। এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক বহিগুলি সমাজসংস্কারের নিমিত্ত এখনও আবশ্যক। বিধবাবিবাহ যথেষ্ট চলিবার পরও তাহাদের ভাষিক ও সাহিত্যিক মূল্য থাকিবে, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের ও পৌরুষের যে পরিচয় তাহাতে আছে, তাহাও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বহুবিবাহ সম্বন্ধে এবং হিন্দু নারীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও কোন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণীত হইয়াছে বা বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহিগুলি হইতে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তিতর্কমূলক উপকরণ পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষা অধিকতর সহৃদয় কারুণিক অথচ অনমনীয় পৌরুষসম্পন্ন কোন নারীজাতির বন্ধু বাংলা দেশে বোধ করি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে তাঁহার সহিত একসঙ্গে নাম করা যায় এক রামমোহন রায়ের। এই উভয় সংস্কারক সম্বন্ধে সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন:

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের সমাজে লজ্জাকর কুসংস্কার যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এখন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কেবল বাহিরের চাপে ও প্ররোচনায় বাঙ্গালী এই সকল কুসংস্কারের উচ্ছেদ-সাধন করে নাই; বহুল পরিমাণে বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ ভাবেই, অন্তরে অন্তরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, দৃঢ়হস্তে প্রাচীন মজ্জাগত হেয় প্রথার বিরোধিতা করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বঙ্গমাতার এই সংস্কারক সুসন্তানদের অনেকেই, বিশেষ করিয়া শ্রেষ্ঠ কয়েক জন, এই সংস্কার আন্দোলনের জন্য, ইংরেজী শিক্ষার অপেক্ষা রাখেন নাই; রাজধানীর নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত ঘরের সন্তানও তাঁহারা নহেন। শহর হইতে দূরে, নিভৃত আচারনিষ্ঠ পল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের জন্ম। দীর্ঘকালের

অভ্যাসে যে সকল সামাজিক নির্যাতন ও অনাচার আমরা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া চলিতেছিলাম, চিত্তের সহজাত ঔদার্য্যে তাঁহারা সেগুলির উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই সংস্কারক-সম্প্রদায়ের শিরোমণি রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতান্ত প্রাচীন দেশীয় প্রথায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইঁহারা উভয়ে ইংরেজীনবিশ হইয়া উঠিলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ইঁহাদিগকে বলা চলে না। হিন্দুকলেজে ডিরোজিও-রিচার্ডসনের নিকট পাঠ লইয়া 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে যে তরুণ-সম্প্রদায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে তাঁহারাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারকার্য্য মূলতঃ ভিতরের তাগিদেই হইয়াছিল, বাহিরের চাপে হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিলে, ইহাতে বিস্ময়-বোধ না করিয়া পারা যায় না।

"এই বিস্ময়ের মধ্যে পরম বিস্ময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজসংস্কার। রামমোহন অপেক্ষাকৃত ধনিগৃহের সন্তান। আরবী-পারসী শিক্ষার সাহায্যে ইস্লামী একেশ্বরবাদের আদর্শ বাল্যকালে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; ঈশ্বরচন্দ্র এ ধরণের কোনও আবেষ্টনীর মধ্যে বড় হইয়া উঠেন নাই।...বিদ্রোহ করিবার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। তথাপি তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।"

বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫২ সনে প্রথম প্রকাশিত)। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ইহার বিজ্ঞাপনে লেখক লিখিয়াছেন, "এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়; সুতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে। অপিচ বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদ্দুত্তরেই এতৎ প্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণন পুস্তকান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।"

শিল্প পরিচয়—১৫৬ খানি চিত্রসম্বলিত। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। ১৩৪৬। শ্রীআরাধ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ২ নং আশুতোষ মুখুজ্যে রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা প্রবাসীর পৃষ্ঠার সমান। পীতাভ, পুরু ও মসৃণ কাগজে ইহা সুমুদ্রিত। পাতাগুলির এক পিঠ ছাপা, অন্য পিঠ সাদা। এক একটি পাতার যে পিঠে গ্রন্থকার নিজের পাঠগুলি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার সম্মুখেই অন্য পাতার মুদ্রিত পিঠের ছবিগুলি আছে। তাহাতে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের বক্তব্য ছবির সাহায্যে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। বাঁধাই সুন্দর ও মজবুত।

চিত্র বুঝিবার ও বুঝাইবার, চিত্রের রসগ্রহণ করিবার ও করাইবার ক্ষমতার জন্য গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে শিক্ষিত সমাজ ইহা জানেন। আরও জানেন, নানা সাহিত্য-সম্মেলনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখাইয়া তিনি যে-সব বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে। তাঁহার এই ক্ষমতা তিনি এই পুস্তকে কাজে লাগাইয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার্থীদের নিমিত্ত। কিন্তু যদিও পুস্তকখানি তাহাদের জন্য লিখিত, তথাপি বৃহত্তর পাঠকপাঠিকা সমাজেরও ইহা পড়িবার যোগ্য। ইহা তাহাদের পড়া উচিত। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ছবি, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য বুঝেন না, তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে পারেন না। চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য দেখিয়া চোখের তৃপ্তি ও মনের আনন্দ কেন হয়, তাহা বলিতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা আরও কম।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য ও আমাদের মত চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ 'শিক্ষিত' লোকদের জন্য অর্দ্ধেন্দ্রবাবু সোজা ভাষায় একেবারে গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া এই উপাদেয় বহিটি লিখিয়াছেন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত: (১) চিত্রবিজ্ঞান, ইহাতে ছবি আছে ৮৩টি, (২) ভাস্কর্য্য, ইহাতে ছবি আছে ৪২টি; (৩) স্থাপত্য, ইহাতে ছবি আছে ৩১টি।

হিন্দুস্থানী উপকথা—শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী। পঞ্চম সংস্করণ। ২৮৭ নং দরগা রোডে শ্রীশান্তা দেবীর নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য দেড় টাকা। আগে মূল্য দুই টাকা ছিল।

রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব এই গল্পগুলিকে মনোহারিত্বে আরব্য উপন্যাসের সমতুল্য বলিয়াছিলেন। ইহাতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা পূর্ণ এক এক পৃষ্ঠা ব্যাপী ৩৪টি চমৎকার চিত্র আছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা—(স্বরলিপিসহ)। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কৃত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২ টাকা।

এই নাট্যটি নৃত্যনাট্য। নৃত্য ও গীতের সহিত ইহার অভিনয় দেখিলে তবে ইহার সমুদয় রস ও উপদেশ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

গ্রন্থটির সঙ্গে গানগুলির স্বরলিপি দেওয়ায় ইহা অভিনয় করিবার সুবিধা হইবে; অন্ততঃ যাঁহারা শুধু গানগুলি গাহিতে চান, তাঁহাদের সুবিধা হইবে।

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি দইওয়ালার কাছে দই কিনিতে চাহিল। একটি মেয়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল,

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি,
ওযে চণ্ডালিনীর ঝি,
নষ্ট হবে যে দই
সে কথা জানো না কি।

প্রকৃতি চুড়িওয়ালার চুড়ি লইতে হাত বাড়াইতেই মেয়েরা সাবধান করিয়া দিল,

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ,
ওযে চণ্ডালিনীর ঝি

প্রকৃতি গভীর অপমানভরে বলিল, "যে আমারে পাঠাল এই

অপমানের অন্ধকারে পূজিব না পূজিব না সেই দেবতারে, পূজিব না।"
সাংসারিক সমুদয় বিষয়ে তাহার চিত্ত উদাসীন হইল।

বুদ্ধশিষ্য আনন্দ পথশ্রান্ত, তাপিত ও পিপাসিত হইয়া প্রকৃতির নিকট জল চাহিলেন। প্রকৃতি চণ্ডালকন্যার বারি অশুচি বলিয়া জল দিতে না চাওয়ায় আনন্দ বলিলেন, "যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা। সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে যাহা তাপিত শ্রান্তেরে তৃপ্ত করে সেই তো পবিত্র বারি। জল দাও আমায় জল দাও।" প্রকৃতি জল দিল। আনন্দ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।" প্রকৃতির অন্তরের সব কালিমা ও অন্ধকার কাটিয়া গেল। সে বুঝিল আনন্দ ও সে এক জাতের মানুষ, চাহিল আনন্দকে পাইতে, তাহাকে মানবিক প্রণয়পাশে জড়াইতে। তাহার মা মায়া মন্ত্রবলে আনন্দকে আনিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। আনন্দ আসিবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল, মাকে বলিল, "ওমা, ওমা, ওমা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র, এখনি এখান এখনি। কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল শুভ্র সুনির্মল সুদূর স্বর্গের আলো। আহা কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাভব কী গভীর। যাক্ যাক্ যাক্, সব যাক্ যাক্। অপমান করিস্ নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক তাঁর জয় হোক।"

আনন্দ আসিলেন। প্রকৃতি বলিলেন—

"প্রভু এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো,
মাটিতে টেনেছি তোমারে
এসেছি নিচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।

ক্ষমা করো
জয় হোক তোমার জয় হোক।"

আনন্দ আশীর্ব্বাদ করিলেন "কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।"

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ২য় খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা। কলিকাতার ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে স্থিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল, এম্ এ, বি এল্, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য আট আনা।

বঙ্গীয় মহাকোষের বর্ত্তমান সংখ্যা অন্যান্য সংখ্যার মত সুসম্পাদিত। অদ্ভুত, অদ্ভুতাচার্য্য, অদ্বৈত, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ আছে। ৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষের প্রায় ১৩ পৃষ্ঠা অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে। বিষয়টি এ-সংখ্যায় শেষ হয় নাই। ইহার আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

ভ।

আর্য্যপ্রভা (হিন্দু সংস্কৃতির কথা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৩৪ নং সরকার লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৬২+২৮/০। মূল্য ৪৷০ আনা।

গ্রন্থকারের 'ভারত-ধারা'তে আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। 'ভারত-ধারা' একটি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতিমূলক নাটক। এই 'ভারত জীবন বেদের নাটকে' অতীত যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের [illegible] তপস্যা ও সাধন-প্রবাহ নাটকাকারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'ভারত-ধারা'য় যাহা সূত্রাকারে বিবৃত তাহাই 'আর্য্যপ্রভা'য় বিস্তৃতভাবে ভাষ্যাকারে প্রদত্ত। ইহা হিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতিবিষয়ক একটি বিশাল ও বহুমুখী গবেষণা। পাঠক ইহাতে ভারতেতিহাসের প্রকৃত রহস্যের সন্ধান পাইবেন। নবপ্রকাশিত বহু পুস্তকে ভারতাত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু অধিকাংশ প্রচেষ্টাই আংশিক, একদেশী ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। অধিকাংশ লেখকই ভারতেতিহাসের অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা ভারতেতিহাসে দিক্‌নির্ণয় করিতে গিয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। ভারতকে চেনা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সহজ নহে। ইহা সাধনসাপেক্ষ।

'আর্য্যপ্রভা'র জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ গ্রন্থকার আজীবন অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের দ্বারা সৌভাগ্যক্রমে ভারত-রহস্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা তিনি হিন্দু-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৺স্বামী প্রজ্ঞানন্দের "ভারতের সাধনা"য় ভারততত্ত্বের মূলসূত্রগুলি আমরা বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজ আজও এই পুস্তকের সমাদর করেন নাই। তাই পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন তাঁহারা যেন 'আর্য্যপ্রভা'কে উপেক্ষা না করেন।

এই গ্রন্থে বেদ, বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিজ্ঞান, হিন্দুদর্শন ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা, তন্ত্ররহস্য ও তান্ত্রিক সাধনা, পুরাণতত্ত্ব, সঙ্গীতবিদ্যা, বৈদিক যুগে শিল্পজ্ঞান, গুপ্তবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বৈশেষিক দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, বিজ্ঞান-রহস্য, জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এবং সভ্যতার কথা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক বহু মূল্যবান্ তথ্য ধ্যানলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহায়তায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুর ধর্ম্মাচার ও সংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব প্রবল বলিয়া বৌদ্ধ ও শাক্ততন্ত্রের বিশদালোচনা ইহাতে আছে। এই সমস্ত দুরবগম্য বিষয়ের পাশ্চাত্য চিন্তারাশির অরুণালোকে তুলনামূলক গবেষণাই 'আর্য্যপ্রভা'র বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই স্রোত ভারতেতর দেশে প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। জার্ম্মেনী আর্য্যসংস্কৃতির যতই বড়াই করুক না কেন, ইউরোপে আর্য্যসংস্কৃতি নাই, ইউরোপে আর্য্যরক্তও নাই। আলেক-জান্দ্রিয়া ও এথেন্স প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা-কেন্দ্রগুলির উপর ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোত জাহ্নবীর পূত প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরখণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী ও নবদ্বীপে বিশ্রাম করিয়া নবযুগে নবরূপে বাঙালীর নিকট উপস্থিত। বাঙালী অবহিত হউন। বাংলা এই দৈবসুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে জগত-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ক্ষণিকা—শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী। প্রকাশক, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, ২৩ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

সনেটে আত্মচিন্তার উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায়; তাই যিনি এক দিন

লাক্সেমবুর্গ। এই বৎসর লাক্সেমবুর্গের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী। ১৮৩৯ সালে লাক্সেমবুর্গ স্বাধীনতা পায়, সাময়িকভাবে মহাযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা হারায়। জার্মেনীতে এখন এই মত প্রচলিত যে লাক্সেমবুর্গের অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে জার্মান।
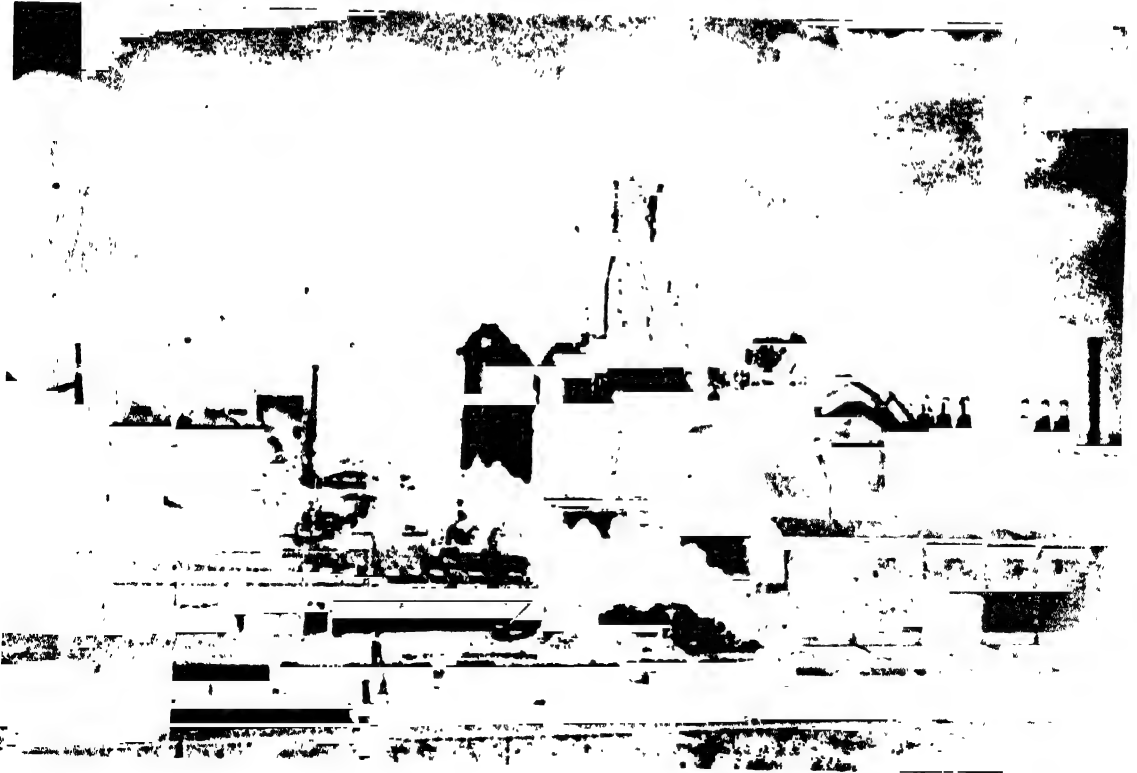
লাক্সেমবুর্গের একটি বিখ্যাত লোহনিষ্কাশন-চুল্লী। লাক্সেমবুর্গের অধিবাসীগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী হইলেও কলকারখানাতেও এই দেশ উন্নত—ইস্পাত-দ্রব্য উৎপাদনে এই অঞ্চল বিশেষ অগ্রসর।

সম্প্রতি নির্বাচিত ন্সের স তি লের পৌত্রপৌত্রীদের স

লাক্সেমবুর্গের রাষ্ট্রনেত্রী গ্র্যাণ্ড লট
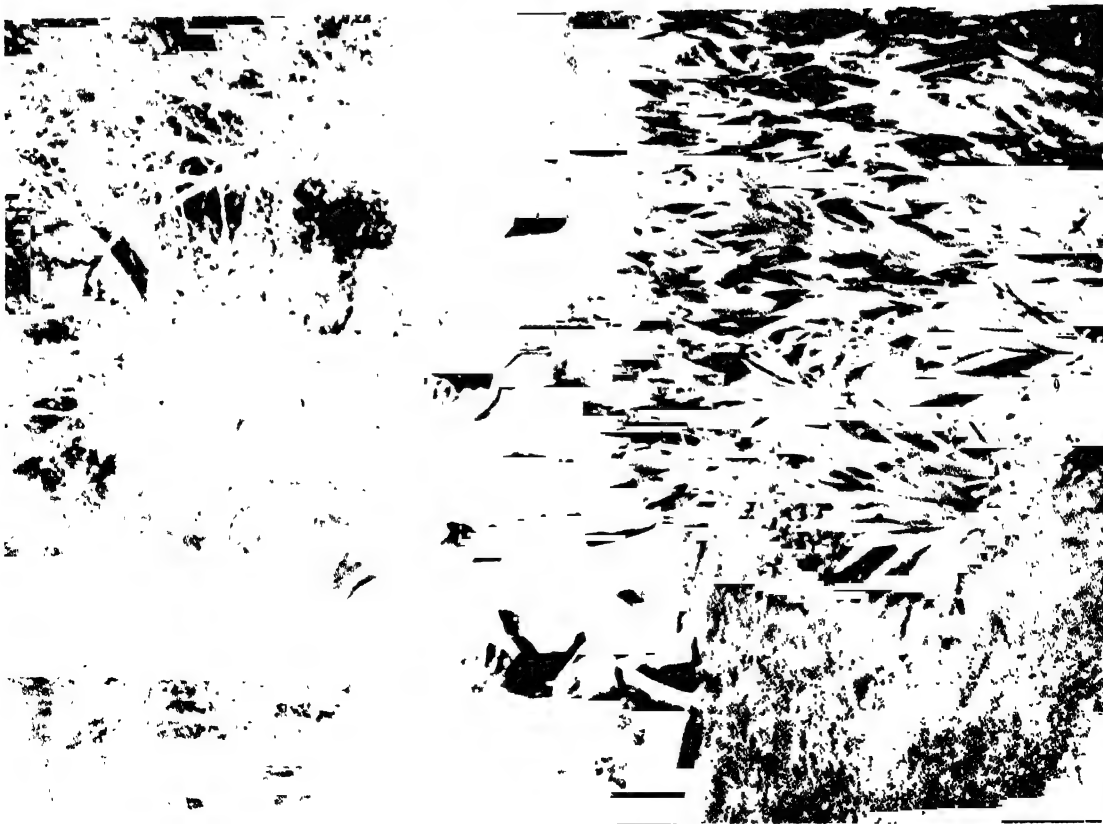
মুহূর্ত্তের জন্ম ধরা দিয়াছিলেন কবি তাঁহারই কথা উপলক্ষ্য করিয়া কিছু আত্মচিন্তা করিয়াছেন। 'ক্ষণিকা' বিশটি সনেটের সমষ্টি। তবে সর্ব্বত্র প্রকাশভঙ্গী সহজ হয় নাই। কাব্য বিষাদে ভরা, কিন্তু ছন্দ সমান ভাবে তাল রাখিতে পারে নাই। চিন্তার বাঁধুনি আছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বীরভূমের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল, সঙ্কলিত। ১৩৪৫। মূল্য ১৲, বাঁধাই ১।০। পৃঃ।০+ ১৩৬+৸০ ও ৮ খানি চিত্র।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ বীরভূমের রাজস্ব এবং সাঁওতাল-বিদ্রোহের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, অতএব অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা পাঠ করিলে লাভবান হইবেন। সময়ে সময়ে তথ্যনির্ব্বাচনে বিচার-প্রবণতা একটু শিথিল হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বইখানি মোটের উপর ভাল।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আকাশ-প্রদীপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই বহিটি পাইয়াই আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম এবং দেখিতেছি, অনেক জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগও দিয়াছিলাম—বোধ করি সেই পংক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু লিখিব মনে করিয়া। কিন্তু যদিও এই কয় দিন মাত্র আগে বহিটি পড়িয়াছিলাম, এখন দাগগুলি দেখিয়া মনে পড়িতেছে না প্রত্যেকটি দাগ কেন দিয়াছিলাম। যাহা হউক, একটি চিহ্নিত স্থান সম্বন্ধে কিছু বলি।

কিছু দিন থেকে মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখি, রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং অন্য কোন কোন কবি তাঁহার প্রভাব অনুভবই করেন নাই, কিম্বা তাহা অতিক্রম করিয়া নূতন অনুপ্রাণনায় নূতন পথে চলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমকালিক বা তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে তাঁহারই ধরণের কবিতা লিখিতেই হইবে, কিম্বা সেরূপ না লিখিলে কবিতা ভাল হইবে না, প্রকৃতির এরূপ কোন নির্দেশ নাই। সুতরাং কেহ যদি অন্য রকমের ভাল কবিতা লিখিয়া থাকেন বা এখন লিখিতেছেন, তাহা খুব সুসংবাদ। কিন্তু কেহ যদি মনে করে, রবীন্দ্রনাথ সেকেলে হইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানের সঙ্গে তিনি যোগ রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে সেটা ভ্রম। কবির মন যে শিশুদের কিশোরদের তরুণদের মনের স্বজাতীয় এই বহিটির অনেক কবিতায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঐ কবিতাগুলি ঠিক যেন কবির আভ্যন্তরীণ আত্মচরিত—কবির অল্পবয়সের কত স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা এগুলির মধ্যে রহিয়াছে।—কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম তাহা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

সেদিন প্রাগের চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেজনীর লেখা "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামক বহি পড়িতেছিলাম। তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন, বাংলা জানেন। তিনি বিদেশী হইলেও, অথবা বিদেশী বলিয়াই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি সত্য অনুভব করিয়াছেন; লিখিয়াছেন :—

"Tagore has written for the sons and grandsons of his country, not merely for his own generation, he leaves them both a rich heritage."

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের পুত্র ও পৌত্রদের জন্য লিখিয়াছেন, কেবল নিজের সমকালীনদের জন্যে নহে, এবং তিনি তাহাদিগের জন্য মূল্যবান সাহিত্যসম্পদ রাখিয়া যাইতেছেন।"

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ পুরুষপরম্পরায় বাঙালীদের উপভোগ্য সাহিত্য-সম্পদ রাখিয়া যাইতেছেন।

কবি "সময়হারা" শীর্ষক কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া,

"খবর এল, সময় আমার গেছে।"

সে সম্বন্ধে সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তাহা গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত আছে। এখানে কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

সন্ধে নামে পাতাঝরা শিমুল গাছের আগায়,
আধ ঘুমে আধ জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পসটারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে :—
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,
ওরে পুতুল-ওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম বায়না-নেওয়া
খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণলাগা ক্ষণিক কালের পাছে।
আজ চেয়ে দেখ, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ দেওয়া তার ভালে
পুরানো যে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুল-ওলা
আপন সৃষ্টি মাঝখানেতে থাকিস আপন ভোলা।"

চ

শ্রীশ্রী৺চণ্ডী—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক সুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, ৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী আনুষ্ঠানিক হিন্দুর অতি পরিচিত ও বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু। গীতার ন্যায় এই গ্রন্থেরও বিভিন্ন সংস্করণ বাজারে প্রচলিত আছে। ইহার উপাখ্যানাংশের শিশুপাঠ্য বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষায় চণ্ডীর কবিতানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও ইহার সাহায্যে এই পবিত্র গ্রন্থের রসাস্বাদন সম্ভবপর হইবে—কবিতাকারে নিবদ্ধ হওয়ায় সাধারণ পাঠকও সুরবদ্ধ ভাবে পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আলোচনা

"ভারতে রাসায়নিক গবেষণা"

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার

গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে, বহু পূর্ব্বে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত আমার "ভারতে রাসায়নিক গবেষণা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায় আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু এড়াইয়া গিয়াছেন। আমার প্রধান বক্তব্য ছিল, ভারতে পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা গণিতশাস্ত্র প্রভৃতির মত উচ্চাঙ্গের গবেষণা রসায়নশাস্ত্রে হয় নাই; কেন হয় নাই তাহার কতকগুলি কারণ আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার এই অভিযোগ 'একেবারে ভিত্তিহীন' কিংবা 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' প্রমাণিত করিবার একমাত্র সহজ উপায় ছিল—পদার্থবিজ্ঞানের রামন্ এফেক্ট, সাহা থিয়োরি, বোস ষ্ট্যাটিষ্টিক্স প্রভৃতির অনুরূপ উচ্চাঙ্গের গুটিকতক রাসায়নিক গবেষণার উল্লেখ করা—যাহা রসায়নশাস্ত্র-গঠনে সহায়তা করিয়াছে। ভবেশবাবু তাহা করেন নাই—কারণ অতি সুস্পষ্ট। রাসায়নিক মাত্রেই আমার উক্তি সমর্থন করিবেন—অগৌরবের বিষয় হইলেও না করিয়া গত্যন্তর নাই। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিগত লাহোর অধিবেশনে মূল সভাপতি রূপে অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "I must confess that the section of Phsyics and Mathematics has to its credit more far-reaching discoveries than the section of Chemistry." কেন উচ্চাঙ্গের রাসায়নিক গবেষণা এদেশে সম্ভব হইতেছে না তাহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে ভারতে কি কি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক গবেষণা হইয়াছে তাহার একটা বিশদ তালিকা দিয়াছেন। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জগতের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতীয় রাসায়নিকদের এই অতি অকিঞ্চিৎকর দানে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করিবেন না। রায়-মহাশয়কে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ভারতীয় তথা বাঙালী রাসায়নিকদের কোন্ গবেষণার ফলে জগৎসভায় ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল হইয়াছে?

নরদেহে বিস্ফোটকের অস্ত্রোপচারের মতই জাতির বিষদুষ্ট অঙ্গবিশেষে অস্ত্রচালনার প্রয়োজন আছে—বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া নয়, ধ্বংসকামনায় নয়—স্বদেশপ্রীতি হেতু জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া। বাংলার যুবকবৃন্দ জীবন-সংগ্রামে কেন হটিয়া যাইতেছে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কঠোরভাবে তাহা দেখাইয়া দেন। কে বলিবে আচার্য্যদেব স্বজাতিদ্রোহী, বাঙালীর কলঙ্ক-প্রচারক? তাঁহারই কথা, ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। আমার প্রবন্ধ ইচ্ছা করিয়াই 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত করিয়াছি, 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে করি নাই—জগতের দূরের কথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের নিকট আমার জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাই না বলিয়া। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন বৈদেশিক রাসায়নিক মহারথীদের সমক্ষে আমাদের স্থান কত নিম্নে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করিয়া বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া আমি ঐ প্রবন্ধ লিখি নাই।

ভবেশবাবু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অযথা টানিয়া আনিয়াছেন। এই ঋষিতুল্য জ্ঞানতপস্বীকে অন্য দশ জনের মত আমিও ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। আমার প্রবন্ধে আগাগোড়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে সসম্মান উক্তি করিয়াছি।

Reference পুস্তকে কিংবা বার্ষিক রিপোর্টে ছাপার অক্ষরে ভারতীয়দের নাম দেখিয়া ভবেশবাবু কেন গর্ব্বানুভব করেন বুঝা গেল না। প্রায় সকল শ্রেণীর গবেষকদেরই নাম তাঁহাদের কাজ সম্পর্কে Annual Reports of the Chemical Society, Progress of Applied Chemistry প্রভৃতিতে ছাপা হইয়া থাকে। তাহাদের সংখ্যা বিপুল। এজন্য উচ্চাঙ্গের গবেষণা করা প্রয়োজন হয় না, বলাই বাহুল্য। জানিতে ইচ্ছা হয়—Chemical Abstracts, British Chemical Abstracts, Chemische Zentral Blatt প্রভৃতিতে ভারতীয়দের নাম দেখিয়াও কি তিনি পুলকিত হন? শিক্ষিত জনসাধারণের এ তথ্য জানা না থাকিলেও বিজ্ঞানের গবেষক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। Friend, Mellor প্রভৃতি, treatise-এ প্রায় অনুরূপ কারণে দুই-চারি স্থানে ভারতীয়দের নাম থাকাটা গর্ব্বের বিষয় নয়। আমার হাতের কাছে ছোটবড় প্রায় বিশ-খানা জৈব-রসায়নের প্রামাণ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। ভারতীয়দের অধিকাংশই জৈব-রসায়নের গবেষণা করিয়া থাকেন। এই সকল পুস্তকের কোন্‌টিতে কয় জন ভারতীয় রাসায়নিকের নাম আছে ভবেশবাবু দেখাইয়া দিবেন কি?

অধ্যাপকদের মাসিক হাজার টাকা বা ততোধিক বেতনের সমর্থনে রায়-মহাশয় যে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা হাস্যোদ্দীপক। বাংলার প্রধান মন্ত্রী নিজের ও সহকর্ম্মীদের মোটা মাহিনা ঠিক এই ধরণের যুক্তির দ্বারাই সমর্থন করিয়া থাকেন।

নোবেল প্রাইজ অতি উচ্চধরণের গবেষকগণই সাধারণতঃ পাইয়া থাকেন। সমারফেল্ডের মত এক-আধ জন অবশ্য আছেন যাঁহারা বড় কাজ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহা পান নাই। তিনি যে অদূর ভবিষ্যতে পাইবেন না, কে বলিতে পারে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অধ্যাপক ঘোষের তালিকার কোন্ কাজটি ভবেশবাবু নোবেল পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট মনে করেন? সংখ্যা শক্তি-নির্দ্দেশক নয়—পরিমাণ অপেক্ষা গুণ শ্রেষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক লোক রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করে বলিয়া রাসায়নিকদের এফ. আর. এস. হইতে নাই, নোবেল প্রাইজ পাইতে নাই কেন, তাহা সহজবুদ্ধির অগম্য।

ভবেশবাবু প্রবন্ধ-লেখক সম্বন্ধে অনেক ব্যক্তিগত অথচ অবান্তর উক্তি করিয়াছেন—পাঠকবর্গ তাহার মূল্যনির্দ্ধারণ করিবেন। সবিনয়ে শুধু এইটুকু জানাইতে চাই যে, অধ্যাপকের মস্তিষ্কের সহায়তায় লেখক ডি. এসসি. উপাধি লাভ করে নাই। তাহার অধ্যাপক তাহাকে স্বাধীন ভাবে গবেষণা করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যের অধিকাংশ গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাপার অক্ষরেই প্রথম পড়িয়াছেন।

এদেশের সাধারণ এম. এসসি., ডি. এসসি. ডিগ্রির কি মূল্য, আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভবেশবাবু সে-বিষয়ে সদুত্তর পাইবেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে—ডাঃ সাহা, ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি. অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাত্র এম. এসসি. উপাধিধারী।

পিতা

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

গামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক—থর্ড ৺ভারায়াজ। সে এক দিন গ্রাম্য পুরোহিতের বাড়ী গিয়ে বললে, "আমার একটি ছেলে হয়েছে—আমি তার নামকরণ ও অভিষেক-ক্রিয়া করাতে চাই।"

"বেশ—তা তার নাম কি রাখতে চাও বল?"

"তার নাম হবে ফিন্—আমার বাবার নামে।"

"ধর্ম্ম-পিতা ও ধর্ম্ম-মাতা কারা হবে?"

থর্ড তাদের নাম বললে দেখা গেল যে তার আত্মীয়-স্বজনের ভিতর শ্রেষ্ঠ নরনারী দুজনকেই এর জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছে।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবার আছে?"

থর্ড একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, "আমি চাই যে আমার ছেলের যেদিন অভিষেক হবে, সেদিন আর কারুর অভিষেক হবে না, একা তারই হবে।"

"তার মানে রবিবারে না ক'রে অন্য কোন দিনে করাতে চাও, এই ত?"

"হ্যাঁ সামনের শনিবার বেলা বারোটার সময়।"

"বেশ তাই হবে—আর কিছু আছে?"

"না, আর কিছু না"—ব'লে থর্ড টুপি তুলে নিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

তখন পুরোহিত উঠে থর্ডের কাছে গেলেন ও তার হাত দুটি ধরে তার দিকে প্রশান্তভাবে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ, আরও কিছু আছে—ঈশ্বর করুন ছেলেটি যেন তোমার জীবনে শান্তি ও কল্যাণ এনে দেয়।"

ষোল বছর পরে থর্ড আবার পুরোহিতের বাড়ী এল। পুরোহিত বললে, "বা, তোমার ত কোনই পরিবর্ত্তন হয় নি দেখছি এত দিনে, যেমন ছিলে ঠিক তেমনই আছ—তোমাকে দেখে তোমার বয়স মোটেই বোঝা যায় না।"

থর্ড বললে, "তার কারণ আমার কোনই দুঃখকষ্ট নেই।"

এর উত্তরে পুরোহিত কোন কথাই বললেন না। কিছু ক্ষণ বাদে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তা, আজ কি মনে ক'রে?"

"আমার সেই ছেলেটির কাল দীক্ষা হবে—সেই সম্বন্ধে বলতে এসেছি।"

"তোমার ছেলেটি ত বেশ চালাক-চতুর হয়েছে—"

"আমার ছেলের দীক্ষা কখন হবে তা জানতে পারলে তার পর আমি পুরোহিতের দক্ষিণা দেব ঠিক করেছি—"

"তোমার ছেলের দীক্ষা সর্ব্বপ্রথমেই হবে।"

"তা হ'লে পুরোহিতের দক্ষিণা-স্বরূপ এই দশ ডলার রইল।"

পুরোহিত স্থিরদৃষ্টিতে থর্ডের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি কি?" থর্ড বললে, "না, আর কিছুই করবার নেই-" তার পর সে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

এর পর আরও আট বছর কেটে গেল।

এমন সময় এক দিন পুরোহিতের বাড়ীর সামনে খুব গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল—এক দল লোক হৈচৈ করতে করতে তাঁর বাড়ীর দিকে আসছিল—দলের ভিতর সবচেয়ে আগে ছিল থর্ড, সেই প্রথমে বাড়ী ঢুকল।

পুরোহিত তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, "ব্যাপার কি? আজ যে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসেছ দেখছি -"

"আমার ছেলের সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ের ঠিক হয়েছে, তারই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাতে এসেছি।"

"ও—তাই নাকি, বেশ, বেশ, এ ত দেখছি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনীর মেয়ে—"

"তাই তো সকলে বলে"—মাথায় হাত বুলোতে বুলাতে থর্ড বলল। পুরোহিত কিছুক্ষণ ধরে গভীর চিন্তা করলেন; তার পর কোন মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে খাতায় নাম লিখে নিলেন

উপস্থিত সকলের নাম সই করা হয়ে গেলে থর্ড টেবিলের উপরে তিনটি ডলার রেখে দিল।

পুরোহিত বললেন, "আমার প্রাপ্য ত মোটে একটি।"

থর্ড বলল, "সে আমি জানি, কিন্তু আমার মোটে এই একটি সন্তান, এর বিয়ে আমি খুব ঘটা ক'রে দিতে চাই" আর কোন কথা না ব'লে পুরোহিত টাকাগুলি গ্রহণ ক'রে বললেন, "থর্ড, এই নিয়ে তিন বার তুমি তোমার ছেলের জন্য আমার কাছে এলে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আর আসতে হ'বে না" এই ব'লে থর্ড পুরোহিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল, তার সঙ্গীরাও তার অনুসরণ করল।

দিন-পনর বাদে এক পরিষ্কার নির্ম্মেঘ দিনে থর্ড তার ছেলেকে নিয়ে বিয়ের আয়োজন করবার জন্য নৌকা বেয়ে হ্রদের অপর পারে যাচ্ছিল।

ছেলেটি হঠাৎ ব'লে উঠল, "এই জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয়" এই ব'লে সে উঠে দাঁড়িয়ে যেই তার বসবার জায়গাটা ঠিক করতে গেল, অমনি তার পায়ের নীচের তক্তাটা পিছলে পিছনে সরে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে সে ভীষণ চীৎকার ক'রে জলে পড়ে গেল।

থর্ড তখনই উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়টা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে "দাঁড়টা ধর, দাঁড়টা ধর" ব'লে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল।

কিন্তু দাড়টা ধরবার জন্য বার-দুই চেষ্টা করবার পর ছেলেটির সমস্ত শরীর অবশ ও শক্ত হয়ে উঠল।

"এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর" এই ব'লে থর্ড দ্রুতগতিতে নৌকা নিয়ে ছেলের কাছে এগিয়ে চলল, কিন্তু সে একবার মাত্র করুণ ভাবে বাবার দিকে তাকিয়েই ডুবে গেল।

নিজের চোখে দেখেও থর্ড ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না, যেখানটায় ছেলে ডুবে গেল সেই জায়গাটার দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল—যেন তার ছেলে আবার জলের উপর ভেসে উঠবেই উঠবে, কিন্তু সেখানে একটু পরে ধীরে ধীরে কতকগুলি বুদ্বুদের উদয় হ'ল মাত্র।

সব শেষে প্রকাণ্ড একটা বুদ্বুদ উঠে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তার পর হ্রদটা আবার যথাপূর্ব্ব স্থির ও উজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করতে লাগল।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে উন্মাদপ্রায় পিতা অনাহারে অনিদ্রায় সেই জায়গাটার চার পাশে নৌকা বেয়ে বেয়ে ঘুরে বেড়াল—সমস্ত হ্রদে সে মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তৃতীয় দিনে ভোরের দিকে শব পাওয়া গেল, থর্ড সেই শব

কোলে ক'রে পাহাড়ের অপর পারে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

এর প্রায় বছরখানেক বাদে শীতের এক গভীর রাত্রিতে পুরোহিতের মনে হ'ল তাঁর দরজার কাছে যেন মৃদু পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি উঠে দরজা খুলে দিতেই একটি দীর্ঘদেহ শীর্ণকায় ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল—তার সব চুল পেকে গেছে, শরীর নুয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখবার পর পুরোহিত চিনতে পারলেন—সে থর্ড।

"তুমি কি এত রাত্রেও ঘুরে বেড়াচ্ছ—" এই ব'লে তিনি স্থির ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে বটে," এই বলে থর্ড ব'সে পড়ল—পুরোহিতও ব'সে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ এমনি নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে কেটে গেল। অবশেষে থর্ড বললে, "দরিদ্রদের দান করবার জন্য আমি কিছু অর্থ নিয়ে এসেছি—আমার ছেলের স্মৃতিরক্ষার্থে আমি এটা দিচ্ছি—" এই ব'লে সে কতকগুলি মুদ্রা টেবিলের উপর রেখে দিল। পুরোহিত সেগুলি গুণে বললেন, "এ যে দেখি অনেক।"

"এ আমার সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেক—সম্পত্তি আমি আজ বিক্রী ক'রে ফেলেছি।"

পুরোহিত অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন—তার পর কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "থর্ড, এখন তুমি কি করতে চাও?"

"আরও ভাল কোন কাজ করতে চাই—" থর্ড মাটির দিকে এবং পুরোহিত থর্ডের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। একটু পরে পুরোহিত মৃদুস্বরে বললেন, "আমার মনে হয় তোমার ছেলে এত দিনে তোমার জীবনে প্রকৃত কল্যাণ এনে দিয়েছে—"

"হ্যাঁ, আমার নিজেরও তাই মনে হয়—" এই ব'লে মুখ তুলে থর্ড পুরোহিতের দিকে তাকাল। তার চোখের কোণে তখন প্রকাণ্ড দুই ফোঁটা জল টল-টল করছে।

[নরওয়েজীয় লেখক বিয়র্নসেনের লিখিত গল্পের অনুসরণে]

ডেরাঙে বাঘ-শিকার

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের রঙ্গিয়া জংশন থেকে মেন লাইন ছেড়ে রাঙাপাড়া শাখা লাইনে কয়েকটি ষ্টেশন পরে এক চা-বাগানে গিয়েছিলাম শিকারের নিমন্ত্রণে।

বাগানে পৌঁছে সেদিন বিকালে শিকারের জায়গা দেখতে গেলাম। বন্দুক নিয়ে এক জন পথপ্রদর্শকও সঙ্গে চলল। বাগানের পাশে একটি ছোট নদী, তাতে হাঁটুজল, একে নদী না ব'লে বোধ হয় ঝর্ণা বলাই ঠিক। ওপারে ঘন কাশ ও খাগড়া বন মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। চা-বাগানের যে সমস্ত অংশ বহু দিন পড়ে আছে অর্থাৎ পাতা ছাঁটাই হয় নি সেগুলি বেড়ে গিয়ে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে (চা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রত্যেক বাগানের বাৎসরিক উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়াতে অধিকাংশ বাগানে এইরূপ একটি পতিত আবাদ আছে)। নদী পার হয়ে ওপারে গেলাম। ঐ পরিত্যক্ত চা-বাগানের সঙ্গে কাশবন নদীর এপার থেকেই মিশেছে, এবং বাঘ, শূয়ার, হরিণ প্রভৃতির আশ্রয়দুর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্দেহ হ'তে পারে যে মাংসাশী ও তৃণাশী প্রাণী একই জঙ্গলে কি ক'রে বাস করতে পারে। এর কারণ, প্রথমতঃ তারা সকলেই মানুষকে ভয় করে ও দিনের আলোর অন্তরালে থাকতে চায়, সুতরাং একমতাবলম্বী; দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ,

ওদের চোখ, কান, নাক এত অনুভূতিসম্পন্ন যে শব্দে, গন্ধে ও স্বাভাবিক সংস্কারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের গতিবিধির সঙ্গে পুরুষানুক্রমে পরিচিত, নইলে জঙ্গলে হরিণ চলবার শব্দে আর একটা হরিণ তাকে দেখতে না পেলেও তার শত্রুপক্ষ কিংবা অনিষ্টকারী নয় বুঝে কি ক'রে নির্ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে? চেষ্টা ক'রেও সাধারণতঃ কেউ কারও অনিষ্ট করতে পারে না, তবে অতর্কিতে কদাচিৎ ব্যতিক্রমও হয়, কারণ বাগে পেলে হিংস্র খাদক নিরীহ খাদ্যকে দয়া করে না।

...সঙ্গের লোকটি বন্দুক আমার হাতে দিয়ে নিকটস্থ শিমুল গাছটিতে উঠে পড়ল। কাঁটাওয়ালা শিমুল গাছে উঠবার কায়দাটিও চমৎকার। দুহাতে গামছার দুই প্রান্ত জড়িয়ে নিয়ে ধুতির প্রান্ত বুকের উপরে বেঁধে আস্তে আস্তে উঠে গেল। ওদের পায়ে কাঁটা বেঁধে না, বরং কাঁটা থাকলে উঠতে সুবিধা হয় বললে, তবে মোটা গাছ হ'লে পারে না তাও বললে।

চার দিক ভাল ক'রে দেখে নেমে এসে বললে, প্রায় দু-শ গজ দূরে বড় শিংওয়ালা একটা হরিণ চরছে, সাবধানে নিজেদের ঢেকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে বন্দুকের আওয়াজ করলে অন্য জন্তুরা, বিশেষতঃ বাঘ, যা আমার প্রধান লক্ষ্য, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা। সে বললে, "এত বড় জঙ্গলে কে কোথায় আছে তার ঠিক নেই, আর আমরা তো প্রায় বন্দুক চালাই, তাতে তারা কিছু মনে করে না, গতি-বিধিরও কোন পরিবর্ত্তন করে না।"

প্রায় ত্রিশ গজ গিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করলাম, গুলি লেগে হরিণটা হঠাৎ চমকে উঠে আমাদের বাঁ দিকে ছুটতে লাগল, আড়াল থেকে খোলা জায়গায় এসে আবার গুলি করলাম। সে তখন প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে অনিয়মিত পদক্ষেপে কাঁচা কাশের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই লোকটিও হরিণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চীৎকার করতে লাগল। আমিও ছুটেছিলাম কিন্তু তার মত পারব কেন? ঘন কাশবনের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না, শব্দ লক্ষ্য ক'রে আরও একটু ভিতরে গিয়ে দেখি তখনও হরিণটা পালাবার জন্যে চেষ্টা করছে কিন্তু একটা গুলি পাঁজরায় আর একটা পেটে লেগেছে, কাজেই একটু দাঁড়াতেই শেষ হয়ে গেল।

আমাকে পাহারায় রেখে ও আবার ছুটল ওপারে লোক ডাকতে। বাগানে হরিণটাকে নিয়ে আসতে সকল শ্রেণীর লোকই মহা খুশী, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হল্লা ক'রে মাংস কাটা প্রভৃতি চলল। যে শিমুল গাছে চ'ড়ে প্রথম দেখেছিল তার বাহাদুরি আর দাবির অন্ত নেই। মাংস তো বেশী নিলেই, মাথাটাও নিলে, কাল সকালে শিং দুটো পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবে এই অঙ্গীকারে। শিং দুটি খুব সুন্দর ও বড় ছিল।

কুলীদের কাছে শুনলাম একটি বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে ঐ পতিত চা-বাগানের মধ্যে অনেক দিন থেকে আড্ডা গেড়েছে। মাঝে মাঝে গরু-বাছুর মারে, দু-এক বার রাত্রে গোয়াল ভেঙেও গরু নিয়ে গিয়েছে। যেমন বড়, শক্তিও তেমনি। থাবা দিয়ে টেনে বাঁশের বেড়া ফাঁক ক'রে গোয়ালে ঢুকে গরু মেরে ফেলে। এদিকে গরু-বাছুরের হুটোপাটির শব্দে লোকজন আলো নিয়ে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এলে, সে তাড়াতাড়িতে পূর্ব্ব-প্রবেশপথ ঠিক করতে না পেরে লাফ দিয়ে খড়ের চাল ভেদ ক'রেই বেরিয়ে যায়। একটা গোয়ালে তার চিহ্নও পেলাম।

এদেশে গরু পুষতে হ'লে রাত্রে ঐরূপ আক্রমণের জন্য বাড়ীওয়ালাকে প্রস্তুত থাকতে হয়, শুতে যাবার আগে শাঁখ, কেরোসিনের খালি টিন দু-এক বার বাজাতে হয়, যদিও সব সময়ে তাতে ফল হয় না। রাত্রে যাদের গরু তাদের চোখে ঘুমিয়ে কানে জেগে থাকতে হয়।

এদিকে বড় গাছের জঙ্গল খুব কম, কাশ-খাগড়া বন, মাঝে মাঝে কাঁকর-বিছানো মাঠ, কেবল বাগানের মধ্যে চা-গাছের ছায়া আর পড়া-পাতা সার দেবার জন্যে শিরীষ গাছের বাদা। তার পর থেকে তরঙ্গায়িত কাশ-খাগড়ার সমুদ্র ভুটান পাহাড়ের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। ঐ সমুদ্রের সঙ্গে চা-বাগানের যোগ না থাকে অর্থাৎ বনে আগুন লাগলে, আঁচ লেগে যাতে গাছ নষ্ট না হয় এই জন্যে পনর-ষোল ফুট চওড়া

ক'রে চা-বাগানের সীমা ঘুরিয়ে একটা fireline কাটা থাকে—দেখতে অনেকটা রাস্তার মত। ঐ রাস্তা সকাল বেলা ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করলে অনেক রকম জানোয়ারের পায়ের দাগ ও গতিবিধি বোঝা যায়। খাগড়া, নল, কাশ বা খড় বন সব জানোয়ারেরই প্রিয় বাসস্থান। উই খাবার জন্যে ভালুক এই রাস্তার স্থানে স্থানে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়ে ফেলেছে। রাস্তার পাশে মাচান বাঁধিয়ে দু-তিন বার রাত্রে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ সামনে আসে নি। কেবল মাত্র এক রাত্রে দেখতে পেয়েছিলাম, মাচান থেকে দূরে যেন ঘন অন্ধকারের একটা বস্তা খাগড়া বন থেকে রাস্তায় এসে উঠল ও গড়াতে গড়াতে বাগানের ধারে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল, বোধ হয় তাদের মধ্যে কেউ।

রোজ রাত্রেই বাঘের ডাক শুনতে পাই, রাত্রি আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। দুঃখের বিষয়, 'ঘাটে ঘাটে' মাচান তৈরি করেছি যেখানে নূতন দাগ পেয়েছি বসেছি কিন্তু কিছুতেই আমার পাল্লার মধ্যে কেউ আসছে না।

ঘাট কথাটির অর্থ, জানোয়ার চলবার পথ। সাধারণতঃ বুনো হাতী খাগড়া কিংবা অন্য কোন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলবার সময় গাছ মাড়িয়ে পথের মত তৈরি ক'রে যায়, অন্য জানোয়ারও সেইটিই চলাচলের প্রধান রাস্তা ব'লে মেনে নেয়। ঐ সদর রাস্তা থেকে খাগড়া-বনের তলায় তলায় বহু গলিপথ বেরিয়ে গিয়েছে। অবশ্য কিছু দিন পরে পরে এই সব রাস্তাঘাটের নক্সা বদলে যায়, পশ্চিম অঞ্চলে এই সব পথকে বলে ঘাট, আসাম ও জলপাইগুড়ি জেলায় বলে ঘাটা ও সুন্দরবন অঞ্চলে বলে পোইট।

বাঘিনীটির পায়ের দাগের ব্যাস প্রায় ৬ ইঞ্চি, বাচ্চাদের পায়ের দাগও প্রায় ৩ ইঞ্চি—বড় কুকুরের মত। বাচ্চারা হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারের মত মায়ের পিছু পিছু চলে না, একটু আশেপাশে থেকে চলে। এ অভ্যাস বোধ হয় সতর্কতার জন্য, কারণ পুরুষ-ব্যাঘ্রটি মাঝে মাঝে এই জঙ্গলে এসে হানা দেয়। তখন শাবকদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বাঘিনীকে স্বামীর সঙ্গে অনেক রকম ছলনা করতে হয়,—অন্য জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে সুবিধামত সেখান থেকে পালিয়ে আবার বাচ্চাদের কাছে আসতে হয়। বাচ্চা ছোট থাকলে বিড়ালের মত মুখে ক'রে ও বড় হ'লে সঙ্গে ক'রে অন্যত্র পালিয়ে যাবারও দরকার হয়।

এখানে একটি নূতন খবর শুনলাম যা শিকারীদের জেনে রাখা দরকার। আমরা চিরকাল জেনে আসছি চিতা, ভালুক জাগুয়ার প্রভৃতি জন্তুই গাছে চড়তে পারে কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল পারে না বা চড়ে না। বাগানের ম্যানেজার বাবু বললেন এক দিন সকালে কুলীরা তাঁকে খবর দিলে দুটো রয়্যাল বেঙ্গল শিমুল গাছে উঠেছে। তিনি বন্দুক নিয়ে গিয়ে দেখেন প্রায় ৪০ ফুট উঁচুতে শিমুলের ডালের উপরে দুটো বাঘ শুয়ে আছে, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ৪০ ফুট পর্য্যন্ত গাছটি সরল ভাবে উঠেছে ও সে-পর্য্যন্ত কোন ডালপালা নেই। উঠে গুলি চালাবার মত কোন গাছ নিকটে নেই দেখে, একটু দূরে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি একটা 'ফায়ার' করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ অত উঁচু থেকে বাঘ দুটো লাফিয়ে প'ড়ে কাশবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। শিকারবিষয়ে শোনা কথার বিশেষ মূল্য কখনই দেওয়া যায় না। অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম বিচিত্র খবর কানে আসে। চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস না হ'লেও জেনে রাখায় কোন ক্ষতি নেই।

প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল কোনও kill হয় নি; বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী এতদিন প্রায় চুপ ক'রে থাকে না। হয়ত অন্য কোনও দিকে গরু মারছে, আমিই খবর পাচ্ছি নে। ডাক্তারবাবু বললেন একটা হাতী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটি মাত্র হাতী দিয়ে ঐ খাগড়া-সমুদ্র মন্থন ক'রে কোন ফল হবে ব'লে মনে হয় না, সুতরাং দু-এক দিনের মধ্যেই ওখান থেকে চলে আসব ভেবে, বেলা দশটার সময় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করছি, হঠাৎ কুলী-লাইন থেকে একটা হল্লা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখি একটা কুলী ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। সে বললে, লাইনের কাছেই ছোট একটা মাঠে ক'টা গরু চরছিল বাঘে তারই একটা ধ'রে খাগড়া-বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা আর গোটাকতক গুলি নিয়ে ছুটে গেলাম।

তখনও খাগড়া-বনের মধ্যে খস্‌-খস্‌ করে গরু টেনে

নিয়ে যাবার শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলও খুব নড়ছে কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুলীরা তীর-বল্লম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে, আমি যেতেই বললে, 'ঐ গরু-টানা-রাস্তা ধ'রে গিয়ে গরুটা কেড়ে আনতে পারি, যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যান।' যদিও বিশেষ ফল হবে না জানি, তবু তাদের আগ্রহ ও বীরত্বব্যঞ্জক কাজে নিরুৎসাহ না ক'রে রাজী হলাম।

আমরাও খাগড়া-বনের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি, বাঘও গরু নিয়ে আগে আগে চলেছে। খানিক দূর গিয়ে বাঘটা বোধ হয় আমাদের এই অনুসরণ টের পেয়ে দাঁড়াল, তখন সামনে আর শব্দ নেই। দাঁড়িয়ে প'ড়ে শুনলাম একটা সর্‌সর্ শব্দ আমাদের ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে চ'লে গেল। মানুষের মাথার উপরেও তিন-চার ফুট লম্বা খাগড়ার ঘন বন, শুধু শব্দের উপরে নির্ভর ক'রেই এগিয়ে গেলাম। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম লাল রঙের ঘাড়ভাঙা একটা গরু প'ড়ে আছে ও বাঘের পায়ের দাগ ডান দিকে চলে গিয়েছে। সেখানে মাচান বাঁধবার কোন গাছ নেই। অগত্যা কুলীরা গরুটাকে টেনে মাঠে এনে ফেললে ও তখনি তার মাংস ভাগ ক'রে নিতে চাইলে। এত ক্ষণে বুঝতে পারলাম আমায় শিখণ্ডী রেখে অত আগ্রহের সঙ্গে গরু কেড়ে আনবার কারণ। তা ছাড়া এতদিনে একটাও kill-এর খবর পাই নি কেন তাও বুঝলাম। একেবারে কুলী-লাইনের গায়ে ব'লেই বোধ হয় এটা গোপন করতে সাহস পায় নি। টাকা দিয়ে গরুর মাংস কিনে খাওয়ার সামর্থ্য এদের নেই অথচ বিষম ভক্ত। সাধারণত উড়িষ্যাবাসী এক জাতের কুলীরাই গরুর মাংস খায় ও বাঘকে তাদের বন্ধু ব'লে মনে করে। Kill-এর খবর না দেওয়ার দুটো প্রধান কারণ রয়েছে, প্রথমতঃ বাবুরা যদি kill নিয়ে ক্রমাগত দু-তিন রাত্রি চেষ্টা করে তা হ'লে অতখানি মাংস অনর্থক নষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, বাঘটাকে মেরে ফেললে অথবা সে বন্দুকের আওয়াজে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেও ফল সমানই। গরু মেরে তাদের মাংস খাওয়াবে কে? শীতকাল, মাংস খারাপ হবে না, কাল সকালেই নিতে পারবে ইত্যাদি কথায় নরমে-গরমে তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। মাঠের মধ্যে একটা জিওল গাছে মাচান বাঁধিয়ে, শকুনির চোখের আড়াল করবার জন্যে গরুটাকে চাটাই দিয়ে ঢেকে বাসায় ফিরে এলাম।

এর মধ্যে একটু ঘটনা ঘটে গেল সেটিও বলা দরকার। কুলীরা মাচান বাঁধছে, আমি দাঁড়িয়ে তদারক করছি, গরুটাও পাশে পড়ে আছে, একটা কুলী আমার দৃষ্টি খাগড়া-বনের দিকে আকর্ষণ করলে; যেখানে মাঠের কাছে খাগড়া ছোট ও পাতলা হয়ে গেছে তার মধ্যে গাছের মূড়ার মত একটা বস্তু দেখালে। আমাদের দৃষ্টি একসঙ্গে সেই দিকে পড়তেই আস্তে আস্তে যখন কি-যেন-একটা সরে গেল তখন বুঝলাম তার শিকার নিয়ে আমরা কি করছি বাঘটা তাই দেখবার জন্যে সত্যই এগিয়ে এসেছিল। মাচান বাঁধাও দেখে গেল।

বলবার এই সুযোগ পেয়ে কুলীরা আবার আপত্তি জানাতে লাগল:—বাঘটা ভারি বদমায়েস, ও আর আসবে না, মাংসগুলো অনর্থক নষ্ট হবে ইত্যাদি। বাঘ দেখতে পেয়ে আমার ঝোঁক বরং বেড়ে গেল, কাজেই তাদের কথায় কান না দিয়ে চলে এলাম। যাই হোক, কুলীটার সন্ধানী চোখের তারিফ করতে হয়। বোধ হয় বাধ্যতার অভ্যাসের গুণ।

সন্ধ্যার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই শিমূল-গাছে-চড়া লোকটিকে নিয়ে মাচানে বসলাম, রাত্রি দশটার সময় খাগড়ার মধ্যে জঙ্গল নাড়ার একবার শব্দ পেলাম, একটু পরে ঘড়ঘড়ানি শব্দ পেয়ে বুঝলাম বাঘটি একা আসে নি কিন্তু জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে আসছে না। আরও দু-এক বার আওয়াজ পাওয়া গেল কিন্তু বারোটার পর থেকে আর কোন সাড়া নেই।

রাত দুটোর সময় নিরাশ হয়ে নেমে, নিকটে যে কুলীটার ঘর ছিল, তার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে ব'লে এলাম কাল সকালেই যেন গরুটা আবার চাটাই দিয়ে ঢেকে দেয়। মনে হ'ল এ শিকারের আশা ত্যাগ ক'রে বাঘেরা অন্যত্র চলে গিয়েছে—কিন্তু ওদের অসীম ধৈর্য্যের কথা জানতে তখনও আমার বাকী ছিল।

পরদিন সকালে প্রায় ন'টার সময় উঠে দেখি সেই কুলীটা বারাণ্ডায় ব'সে আছে, খবর জিজ্ঞাসা করতে বললে, আমরা চলে আসবার একটু পরেই অর্থাৎ তখনও বাসায়

পৌঁছেছি কিনা সন্দেহ, সেও আবার শুতে যাচ্ছে এমন সময়ে কড়াৎ ক'রে দড়ি ছেঁড়ার শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখে রা গরুটাকে বাঘে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুর পিছনকার পায়ে দড়ি বেঁধে গাছের শিকড়ের সঙ্গে গাঁট দিয়েছিলাম যাতে অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ এসে টেনে না নিয়ে যেতে পারে।

বুঝতে বাকী রইল না যে বাঘও খাগড়ার মধ্যে এতক্ষণ চুপচাপ ব'সে পাহারা দিয়েছে ও আমাদের মাচানে ব'সে শীতে কাঁপা বেশ উপভোগ করেছে। রাগ ও ক্ষোভ দুইই হ'ল কিন্তু উপায় কি?

হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে জায়গাটা দেখতে গেলাম। দড়ির গোড়াটা শিকড়ের গায়ে শুধুই গাঁট বাঁধা পড়ে আছে, অর্দ্ধাঙ্গ অপরে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জবরদস্তি ক'রে।

অত বড় গরুটা টেনে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু মাটিতে বাঁশ টানার মত সরু একটা দাগ খাগড়াবন পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। ছোট একটি জঙ্গলের টুকরা—একটা পায়ে চলা পথ, যাকে ঐ বিস্তীর্ণ জঙ্গল থেকে আলাদা করেছে, তারই মধ্যে গরুটাকে টেনে নিয়েছে।

কানে শুনেছি বটে কিন্তু পিঠে ক'রে গরু বয়ে নিয়ে যেতে আমি কখনও দেখি নি। চিহ্ন ও লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে যত দূর প্রমাণ পেয়েছি তাতে আমার মনে হয় রয়্যাল বেঙ্গল গরু আক্রমণ করবার সময়, ছুটে এসে মাথায় এক থাবা ও পিঠে আর এক থাবা তুলে দিয়ে প্রথমে আঁকড়ে ধ'রে ঘাড় কামড়ে চাপ দিতে থাকে, তার পর উপরে নীচে বড় বড় চারটি দাঁতের সেই চাপে ঘাড় ভেঙে দেয়, গরুও মাটিতে পড়ে যায়। ঐ সাংঘাতিক চাপে কাঠের তক্তা চিরে যেতে পারে, বন্দুকের নল চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে, গরু প'ড়ে গেলে বাঘ তাকে চিৎ ক'রে এমন কায়দায় তার দেহের দু-পাশে পা দিয়ে দাঁড়ায় যে গরুর পা-চারখানা বাঘের দু-পাশ দিয়ে আকাশমুখো খাড়া হ'য়ে যায়, আর শিরদাঁড়াটি মাটিতে ঠেকে থাকে। সেই অবস্থায় গলনলী কামড়ে ধ'রে, বহু দূর পর্য্যন্ত অতি সহজেই টেনে নিয়ে যেতে পারে। এ শিক্ষা তাদের পুরুষানুক্রমিক।

চিতাবাঘের শিকার-প্রণালী অন্যরূপ, তারা লাফ

মাচানে প্রতীক্ষাপরায়ণ শিকারী।

দিয়ে প্রথমেই শিকারের গলনলী কামড়ে ধ'রে চাপ দেয়। তখন গরুও গোঙাতে থাকে আর ঘুরতে থাকে, চিতাও ব্যাঙের মত লেগে থাকে যতক্ষণ না তার টুঁটি ছেঁদা করতে পারে। তার পরে শিকার মাটিতে প'ড়ে গেলে, তাকে টেনে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। বড় গরু হ'লে সেইখানেই রেখে নিকটস্থ জঙ্গলে ব'সে পাহারা দেয়।

পায়ের দাগ না পেলেও নিহত জন্তুর ক্ষতের দাগ দেখে বুঝতে পারা যায় তাকে কোন্ জাতীয় বাঘে মেরেছে।

কুলীরা মরা গরুটাকে বার করে আনবার জন্যে মহা ব্যস্ত হয়েছে দেখলাম। তাদের ধারণা শেষ রাত্রে আর বাঘে কতটুকুই বা মাংস খেতে পেরেছে, অবশিষ্ট মাংসটা নষ্ট হয় কেন? ধমক দিতে কুলীগুলো জনান্তিকে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, একটা বুড়ো কুলী এগিয়ে এসে বললে, বাঘ রাত্রে এক বার এই মাঠের মধ্যে বেরিয়ে

নিহত ব্যাঘ্রিনীসহ শিকারী ও তাঁহার সহচরবর্গ

আসতে পারে, ঝরণার জল খেতে গেলেও তাকে এই মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। আজ রাত্রেও এই মাঠের কোথাও বসলে তাকে পাওয়া যেতে পারে। কথাটা অসঙ্গত নয়, আর তা ছাড়া কিই বা করা যাবে, লম্বা ঝরণা কোথায় জল খাবে তার স্থিরতা নেই, তবে ও মাচাতে আর হবে না, ওতে তার দৃষ্টির ছোঁয়াচ লেগেছে।

আবার রাত্রে বসবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিকাল চারটার সময় তিন চার জন কুলী সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম, কোথায় বসব তারই আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু বসবার পূর্ব্বে দেখা দরকার গরুটা এই ছোট জঙ্গলে আছে, না, বড় জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছে।

কুলীরা বল্লম ধ'রে গরু-টেনে নেওয়া রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমি তখন পূর্ব্বোক্ত দুই জঙ্গলের মাঝে সরু পথটার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। বাঁ হাতে টর্চ্চ, ডান হাতে বন্দুক। ওরা জঙ্গলে ঢুকতেই ছপ ছপ ক'রে শব্দ হ'তে লাগল যেন কতকগুলি জানোয়ার জঙ্গল ঠেলে ছুটছে, কুলীরাও হল্লা ক'রে উঠল। পাশেই বড় জঙ্গল থাকতে অত ছোট ঝোপের মধ্যে বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে, পেট ভ'রে খেয়ে, মড়া আগ্‌লে শুয়েছিল, বুঝতে পারা যায় নি, সকলেই মনে করেছিল গরুটাকে ওখানে রেখে তারা বড় জঙ্গলেই গিয়েছে, রাত্রে আবার আসতে পারে।

যাই হোক, মাটিতে টর্চ্চ রেখে আমি তাড়াতাড়ি বন্দুকে দুটো গুলি ভ'রে ফেললাম কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে হল্‌দে রঙের বড় কুকুরের মত দুটি প্রাণী আমার সামনে দিয়েই লাফিয়ে পথ পেরিয়ে গেল, তাদের মা তখনও ঐ ছোট জঙ্গলের মধ্যে ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে ও পেরিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ঐ ঘড়ঘড়ানি হচ্ছে গর্জ্জনের নামান্তর। কুকুর যখন পরস্পর আক্রমণোদ্যত হ'য়ে টেনে টেনে গর্জ্জন করে ভাবটা অনেকটা সেই রকম কিন্তু তার চেয়ে দশ গুণ অধিক জোরালো ও গম্ভীর।

আমি তখন ভাবছি ধাড়ীটা আস্তে আস্তেই এগিয়ে আসছে, পথের উপরে উঠলে ফাঁকা জায়গায় গুলি করতে পারব। তখনও বুঝতে পারি নি যে বিভীষিকা দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে সে কত বড় ওস্তাদ।

পথের উপর এসে উঠতে আমি বন্দুক তুলে নিশানা করব এমন সময়ে সে আমায় দেখতে পেয়ে এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড করলে, কান দুটো মাথার পাশে শুইয়ে দিয়ে, প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে, হাঁড়ির মত মুখখানাকে যথাসাধ্য বিকৃত ও ভয়াবহ ক'রে, ডান থাবা তুলে হাওয়ায় দু'বার থাপড় মারলে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটি হুঙ্কার ছাড়লে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গুলি করতে ভুলে গেলাম। যখন ভুল বুঝতে পারলাম তখন সে বড় জঙ্গলের মধ্যে গর্জ্জন করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এটা আমার চঞ্চলতা না ওর ভেল্‌কি? অথবা একেই ওদের ধাপ্পা বা bluff বলে?

এত কাণ্ডের পরে আর ওখানে আসবে না মনে ক'রে কুলীদের ডেকে বাসায় ফিরে এলাম, তারা মনে করেছিল, বাঘ বাবুর দফা শেষ করে জঙ্গলে গিয়েছে, ওরা বললে, আমিও পরে বুঝলাম যে ও-অবস্থায় গুলি না করা ভালই হয়েছে। শিকারের আইনে বলে, "বাঘ যখন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তখন গুলি ক'রো না।"

আক্রমণোদ্যত আহত বাঘের বেলায় সে আইন চলে না।

অত বড় বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী, অত কাছে গুলি খেলে আহত হয়েও, হয় আমাকে নয় ঐ জঙ্গলের মধ্যে কুলীদের কাউকে আক্রমণ করত নিশ্চয়। সে ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এরূপ বিপদসঙ্কুল কাজে শিকারীর দক্ষতার উপরে যে-সকলের জীবন-মরণ নির্ভর করে, প্রকৃত শিকারীর কাছে তাদের প্রাণ নিজের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান।

চোখের উপরে বাঘটাকে দেখতে পেয়ে লোভ হ'ল খুব, জিদও বেড়ে গেল যথেষ্ট। আমাকে বেকুব বানাবার শাস্তি তাকে নিজের হাতেই দিতে হবে স্থির করলাম, বাঘে আর একটা জন্তু না-মারা পর্য্যন্ত আমার অবস্থিতির মতলব শুনে ডাক্তার বাবুও খুশী হলেন।

দিন তিনেক পরে বিকালে ৪টার কিছু পরে একটা কুলী ছুটে এসে খবর দিলে, সেই মাত্র একটা গরু, বাঘে ধরে নদীর ওপারে নিয়ে গিয়েছে। তখনই বন্দুক আর টর্চ নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

কুলীর কাঁধে চেপে নদী পেরিয়ে দেখলাম গরুটাকে উপরে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে নি। খাড়া পাড়ের নীচে ফেলে রেখে বাঘ খাগড়া-বনে উঠে গিয়েছে।

নিকটে একটি শিমুল গাছ আছে বটে, কিন্তু সেখানে বসলে নিহত গরুটাকে মড়া দেখতে পাওয়া যায় না, আর তা ছাড়া বুকে ও হাতে কাপড় জড়িয়ে কাঁটা-ওয়ালা গাছে ওঠবার ক্ষমতাও আমার নেই। অন্ধকার রাতে kill-এর যত কাছে বসতে পারা যায় ততই সুবিধা। মাটিতে বসা নিরাপদ নয়, বাঘের চোখের শক্তি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী ও অন্ধকারে অভ্যস্ত, কাজেই আমরা তাকে দেখবার আগে সে আমাদের দেখতে পাবে, কোন্ দিক থেকে আসবে তারও ঠিকানা নেই। বিশেষ কথা এই যে, উপরে থাকলে মানুষের গন্ধ উপরে উপরেই চলে যায়।

ঠিক পাড়ের উপর একটি কাঞ্চন ফুলের ছোটগাছ খাগড়া বনে লুকিয়ে আছে দেখে এগিয়ে গেলাম। দু-জন লোকের ভার সে সইতে পারবে কিনা চিন্তার বিষয় অথচ সন্ধ্যা হ'তে দেরি নেই, গাছের নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত মোটা ডালে বসব ঠিক করলাম। মাটি থেকে মোটে তিন-চার হাত উঁচুতে—তবে kill-এর সমতল থেকে প্রায় পনর-ষোল হাত উপরে, কেননা আমরা পাড়ের উপরে, kill পাড়ের নীচে।

গরু যেদিকে আছে সেইদিকের ছোট দু-এক খানা ডাল কেটে বন্দুক ও আলো চালাবার মত সাফ করে নিলাম। শীতকালের অপরাহ্ণ, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হ'তে লাগল।

গাছে উঠে দেখি ওপারে ইতিমধ্যে পঁচিশ-ত্রিশ জন কুলী গরু নিতে এসেছে। তারা গুন গুন ক'রে কথাও কইছে, জ্যান্ত গরু বাঘের মুখ থেকে আর মরা গরু এদের মুখ থেকে রাখাই মুস্কিল। টর্চ ঘুরিয়ে ওদের মুখের উপরে ফেলে বার-কতক টিপে দিলাম, বোধ হয় আমার রাগান্বিত সঙ্কেত বুঝতে পেরে চুপ করল, কিন্তু চলে গেল না।

যেখান দিয়ে বাঘটা উপরে উঠে গিয়েছে খুব সম্ভব সেই পথেই সে নেমে আসবে মনে ক'রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকার বাড়বার সঙ্গে পথটি গুহার মত বোধ হ'তে লাগল।

অন্ধকার রাত্রে মাচানে বসলে চোখের সামনের গাছ, পালা, উঁচুনীচু ঝোপ ও সেই জায়গার একটা ছাপ মনের মধ্যে ক্রমে এঁকে যায়। সর্ব্বদা এই আবছায়া দৃশ্যের উপরে চোখ বুলিয়ে যাওয়া দরকার। কোথাও কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পেলে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক এবং ঐ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

অন্ধকার রাত্রেও কিছু দিন অভ্যাস করলে এই রকম ক'রে শিকার spot করা অর্থাৎ শিকারের অবস্থান ঠিক করা যায়, অধিকাংশ জানোয়ারই অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর দেখায়, কেউ কম কেউ বেশী। বিশেষতঃ তাদের নীচের মাটিতে যদি শুকনো ঘাস, পাতা, বালির চর, কর্ষিত জমি কিংবা রাস্তা থাকে; গাছের ছায়াযুক্ত জায়গায় এ নিয়ম ঠিক খাটে না। জ্যোৎস্নারাত্রে চাঁদ পশ্চিমে ক্রমে স'রে যেতে থাকে ব'লে আলো-ছায়ার যে অনেক রকম পরিবর্ত্তন হয় তাও জানা চাই। এখানে ঐ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল তাও পরে বলব।

অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে এমন সময়ে একটি ছোট হরিণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তীরবেগে আমাদের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল, ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা দোয়েল ব'সে ঘুমুচ্ছিল হঠাৎ চেঁচামেচি ক'রে নদী পার হয়ে গেল। উত্তম লক্ষণ, বাঘ আসছে আর সন্দেহ নেই।

একটু পরে পাড় থেকে এক টুকরা মাটি ভেঙে গড়িয়ে মরা জন্তুটার উপর প'ড়ে গেল। সামান্য একটু শব্দ হ'ল। তাকিয়ে দেখি তার রূপ বদলে গিয়েছে অর্থাৎ সামনের পথ যেটা গুহার মত দেখায় বলেছি, সেই গুহামুখের দিকে ভর্ত্তি হ'য়ে গিয়েছে। গুহার মুখে গাঢ় অন্ধকারের পটভূমিকা তাই তার সামনের জানোয়ারকে অপেক্ষাকৃত ফিকে ও ঝোপের সঙ্গে এক রঙে মেশানো ব'লে মনে হচ্ছিল।

যাই হোক্, যে পরিবর্ত্তনটুকু পেয়েছি তাই যথেষ্ট। দু-তিন সেকেণ্ড চুপ করে থেকে যখন দেখলাম ছায়ার মত কিছু নড়ছে তখন আর সন্দেহ রইল না। আলোর বোতাম টিপতেই দেখি বিপুলকায় বাঘ নেমে আসছে। তখনও একবারে নামতে পারে নি, মাথা নীচু, লেজের দিকটা উঁচুতে আছে। মোটরের হেড-লাইটের মত জোড়া চোখে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

ঘাড়ের উপরে গুলি করতেই, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে আবার জঙ্গলে উঠে খাগড়া-বন ভেঙে ছুটতে লাগল।

গুলি লেগেছে বুঝতে পারলাম এই জন্যে যে জংলী জানোয়ারের গায়ে গুলি না লাগলে শব্দও করে না, জঙ্গল ভেঙেও ছোটে না। প্রথম লাফের সময় জঙ্গলের একটু শব্দ হ'লেও তার পরে পথে পথে নিঃশব্দে চলে যায়, বিশেষতঃ বাঘ।

তখনও জঙ্গল ভাঙার শব্দ পাচ্ছি কিন্তু একই জায়গায়। ক্রমে শব্দ কমে গেল, মাঝে মাঝে একটু শোনা যাচ্ছিল তাও বন্ধ হ'ল, একটা অস্পষ্ট গোঙানি দীর্ঘনিশ্বাসের মত শোনা গেল—ঐটি তার এ-জীবনের শেষ নিঃশ্বাস। মাচান থেকে নেমে নদী পার হলাম, কাল সকালে খোঁজ করা যাবে।

এর মধ্যে ছোট একটু ব্যাপার বলি। বন্দুকের আওয়াজ ও বাঘের গর্জ্জনের সঙ্গে ওপারের মাঠও যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠল, দুড় দুড় একটা আওয়াজ কানে আসতে টর্চ্চটা ঐ দিকে ফেলে দেখি, গোখাদকের দল ভোজের আশা ত্যাগ ক'রে প্রাণপণে লাইনমুখো ছুটে পালাচ্ছে। তারা বোধ করি মনে করলে, গুলি খেয়ে বাঘ যদি নদী পার হয়ে যায়, তাদের মধ্যে কার অবস্থা যে শোচনীয় হবে তার ত ঠিক নেই।

এপারে এসে অনেক ডাকাডাকির পরে তারা ফিরে এল বটে, কিন্তু ওপারে গরু আনবার জন্য যেতে কেউ রাজী হ'ল না। তাদের দেহরক্ষী হ'য়ে আমাকেই আবার নদী পার হয়ে যেতে হ'ল, আসতেও হ'ল, শীতের রাতে দুর্ভোগ আর কাকে বলে।

রাত্রি আটটার সময়ে বাসায় ফিরে এসে তখনই ডাক্তারবাবু হাতীর মালিকের কাছে সাইকেলে লোক পাঠিয়ে দিলেন, ভোরেই হাতী যেন অবশ্য পাঠানো হয়। ঘটনারও একটা আভাস লিখে দিলেন।

পরদিন সকালে উঠে দেখি হাতী নিয়ে মাহুত দাঁড়িয়ে আছে। চা খাওয়া ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আমরা হাতীতে চ'ড়ে নদী পার হ'য়ে গেলাম, কাঞ্চন গাছটার কাছে হাতী দাঁড় করিয়ে যেদিকে শেষ গোঙানী শুনেছিলাম আন্দাজ ক'রে হাতী চালাতে বললাম।

খাগড়া-বন ভাঙতে ভাঙতে হাতী এগিয়ে চলল, কিন্তু খানিক দূর গিয়ে হাতীর ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল শুঁড় সাপের ফণার মত উঁচু ক'রে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল আর এগোতেও ইতঃস্তত করতে লাগল, তখনই বুঝতে পারা গেল নিকটে কোথাও বাঘ পড়ে আছে, জঙ্গলের মধ্যে এদিকে ওদিকে ছপ্‌ছপ্‌ একটা শব্দ হ'তে লাগল। আরও এগিয়ে দেখি বাঘটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে—তার চার দিকে বিক্রমের শেষ চিহ্ন রেখে।

তবে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হ'ল কিসে ? যেখানে মরা বাঘ পড়ে আছে সেখানে অন্য কোন জন্তু এসে দাঁড়াতে পারে না। হাতী বসিয়ে বাঘের কাছে যেতে সব মীমাংসা হয়ে গেল। সেই বাঘিনী। তারই মৃতদেহের পাশে বাচ্চা দুটো সমস্ত রাত বোধ হয় কেঁদেছে, তখনও শুয়ে ছিল, আমাদের গোলমালে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

নদীর ওপারেও অনেক লোক জমেছিল। তাদের ডেকে বাঘিনীকে হাতীর পিঠে তুলে যখন বাসায় ফিরে আসা গেল তখন বেলা দশটা, তখনই মুচি ডেকে নিজে তদারক ক'রে চামড়া খুলে ফেললাম, ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা বাঘিনী, কিন্তু চামড়ার রং পুরুষ-বাঘের চেয়ে ফিকে ও চওড়ায় কম।

গুলিটি লেগেছে দেখলাম বড় চমৎকার জায়গায়, মাথার খুলি আর মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে। মেরুদণ্ডের প্রথম হাড়ের টুক্‌রাটি স্থানচ্যুত ক'রে এক পাশে ঠেলে দিয়ে তির্য্যক্ ভাবে তিন-চার ইঞ্চি ঢুকে গুলিটা মস্ত বড় mushroom হয়ে সেইখানেই ব'সে আছে।

কুলীরা গরুর মাংস খেতে যেমন অতি-আগ্রহান্বিত বাঘের বেলায়ও তাই। জিজ্ঞাসা করলে বলে দাওয়াই বানাবে, তফাৎ এইটুকু।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে কবি সংবর্দ্ধনার উত্তর দিতেছেন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ।

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লাহোরে কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোগীরা শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীর মারফৎ নূতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন, তদুপলক্ষ্যে রচিত।]

হে প্রবাসী,
আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী
অন্তরতমের ভাষা
সে করে বহন। ভালোবাসা
তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দূর।
রক্তের নিঃশব্দ সুর
সদা চলে নাড়ীতন্ত্র বেয়ে
সেই সুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে
বাণীর অতীতগামী তাহারি বাণীতে
ভালোবাসা আপনার গূঢ় রূপ পারে যে জানিতে।

হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরাণে
সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে,
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্য দান চিরসুন্দরের,—
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ,
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক্ উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক্—এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।

সুদূরের মিতা
মোর কাছে চেয়েছিলে নূতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নূতনের স্পর্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূর্ব্বতন ও নূতন কংগ্রেস-সভাপতি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি-পদের প্রার্থী হইবার পর হইতে নানা বাদানুবাদে রাজনৈতিক হাওয়া এরূপ বিষাক্ত হইয়াছে যে, সমুদয় ব্যাপারটি একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলে এবং তাহার কোন আলোচনা না করিতে হইলে স্বস্তি বোধ করা যাইত। কিন্তু তাহার জো নাই। কর্ত্তব্যবোধে কোন কোন ঘটনার আলোচনা করিতেই হইবে। ত্রিপুরীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লব পন্তের প্রস্তাবটি হইতে আরম্ভ করি। তাহার আগের কথা বলিব না।

ত্রিপুরীতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্তের প্রস্তাবে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষবাবুকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী ওআর্কিং বা কার্য্যনির্ব্বাহক কমীটি গঠন করিতে বলা হয়,—যাহাতে তাহার সভ্যেরা সকলে মহাত্মাজীর বিশ্বাসভাজন লোক হন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, যখন কার্য্যনির্ব্বাহক কমীটির সভ্যেরা পদত্যাগ করেন, তখন তাহারা তাহাদের ইস্তফাপত্রে বলিয়াছিলেন যে, সুভাষবাবুকে তাঁহার পছন্দসই ওআর্কিং কমীটি গঠন করিতে দিবার জন্য তাহারা ইস্তফা দিতেছেন। তাঁহাদের চিঠির এই কথা ও পন্তজীর প্রস্তাবে সামঞ্জস্য নাই, অথচ চিঠি এবং প্রস্তাব একই দলের লোকের! ইহাতে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িল।

"আর একবার বলিলেই খাইব।"

একটি ছেলের রাগ বা অভিমান হওয়ায় সে এক দিন আহারের সময় আহার করে নাই। মা অনেক বার বলাতেও আহার করিল না। তাহার পর যখন ক্ষুধা প্রবল হইল তখন খাবার ঘরের কপাটে খড়ি দিয়া লিখিয়া রাখিল, "আর একবার বলিলেই খাইব"!

কংগ্রেসের ব্যাপারটি একটি বা একাধিক ছেলের নয়, মাতব্বর লোকদের; এবং কংগ্রেসের পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান সভাপতি মা নহেন, পুরুষজাতীয়। কিন্তু গল্পটার সঙ্গে কংগ্রেসের ব্যাপারটার এই একটু সাদৃশ্য আছে মনে হয় যে, ওআর্কিং কমীটির সভ্যেরা ইস্তফা দিয়া হয়ত ভাবিয়াছিলেন সভাপতি ইস্তফা গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে সভ্য থাকিতে অনেক অনুরোধ সাধ্য-সাধনা করিবেন—মায়েরা যেমন অভিমানী ছেলেকে বার-বার খাইতে অনুরোধ করেন, এবং সুভাষবাবু অনুরোধ করিলেই তাহারা সভ্য থাকিবেন। কিন্তু যখন সুভাষবাবু তাঁহাদিগকে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ না করিয়া একেবারে সোজাসুজি ইস্তফা গ্রহণ করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বরূপ ভোজ ত ফস্কাইয়া যায়! যখন অবস্থা এইরূপ, যখন বার-বার অনুরোধ করা দূরে থাক সুভাষবাবু একবারও অনুরোধ করিলেন না, তখন কংগ্রেস আপিসের দরজায় একথা ত খড়ি দিয়া লেখা চলে না, "আর একবার ডাকিলেই যাইব।" সুতরাং তাঁহারা সভাপতির ডাকের অপেক্ষা রাখিলেন না, তাহারা এমন একটা প্রস্তাব পাস্ করাইলেন যাহা তাঁহাদিগকে ডাকিতে সুভাষবাবুকে বাধ্য করে।

উপবাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (?) অভিমানী ছেলের গল্প থেকে এ-পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা আমাদের অনুমান বা জল্পনা—ফ্যাক্ট হইতে পারে, না হইতেও পারে।

আমরা শুনিয়াছি, পন্তজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে যখন ভোট লওয়া হয় তখন সভ্যপদত্যাগী পূর্ব্বতন ওআর্কিং কমীটির সভ্যেরা কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। কিন্তু, তাহা সত্য হইলে, তাহাতে কি আসে যায়? কংগ্রেসী-প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আগে হইতে তদ্বির দ্বারা অধিকাংশ ভোট মুঠোর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন—বারটা ভোট অকিঞ্চিৎকর।

পন্তজীর প্রস্তাবে ত মহাত্মাজীকে ওআর্কিং কমীটি গঠনের কর্ত্তা করা হইল; কিন্তু তাহা কি তাঁহাকে

জানাইয়া তাঁহার সম্মতি ও অনুমোদনক্রমে করা হইয়াছিল? অনেক সভাসমিতিতে অনেককে কোন কোন অবৈতনিক পদে নিযুক্ত করা হয়, কোন কোন অবৈতনিক কাজের ভার দেওয়া হয়। পদ বা কাজ সামান্য হইলেও অনেক সময় প্রশ্ন হয়, যাঁহাকে নিযুক্ত করা হইতেছে, ভার দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সম্মতি লওয়া হইয়াছে কি? সম্মতি লওয়া হইয়াছে বলিলে তবে নিয়োগ ও কাজের ভার অর্পণে সভার লোকেরা মত দেন।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কিন্তু কেহ প্রশ্ন করিল না পন্তজীর প্রস্তাবে মহাত্মাজীর সম্মতি আছে কি না, তিনি ওআর্কিং কমীটির সভ্যদিগকে মনোনীত করিবেন কি না। অথচ যে কাজটির ভার মহাত্মাজীকে তদ্দ্বারা দেওয়া হয় শুধু যে তাহার গুরুত্ব খুব বেশী তাহা নহে, তাহা কংগ্রেস-বিধির বিরুদ্ধ, কেননা কংগ্রেসের কন্সটিটিউশ্যনে আছে সভাপতিকে ওআর্কিং কমীটি গঠন করিতে হইবে, ইহা তাঁহার অধিকার

পন্তজীর প্রস্তাবে মহাত্মাজীর সম্মতি আছে কি না, এই প্রশ্ন ত্রিপুরীর অধিবেশনে বিরোধীরা কেহ তুলেন নাই সম্ভবতঃ এই ভাবিয়া, যে, প্রস্তাবের উপস্থাপক ও সমর্থকেরা যখন সকলেই গান্ধীভক্ত তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মতি লইয়াছেন।

নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির কলিকাতা অধিবেশনে যখন সুভাষবাবু গান্ধীজীর চিঠি পড়িলেন, তখন বুঝা গেল গান্ধীজী ওআর্কিং কমীটির সভ্য কে কে হইবেন, তাহা স্থির করিয়া দিতে রাজী হন নাই, এবং পরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত "রাষ্ট্রবাণী"তে লিখিয়াছেন পন্তজীর প্রস্তাব মহাত্মাজীকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া কংগ্রেসে পেশ করা হয় নাই।

তাহা হইলে পন্তজীর দলের ইহা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল যে, মহাত্মাজীকে আগে না-জানাইয়া তাঁহার উপর একটা গুরু ও বিধিবিরুদ্ধ কাজের ভার তাঁহারা দিয়াছিলেন। মহাত্মাজীরও এই ত্রুটি হইয়াছে যে, তিনি যখনই জানিলেন যে, তাঁহাকে ওআর্কিং কমীটি গড়িবার ভার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি এই স্টেটমেণ্ট বাহির করেন নাই যে, তাহা তাঁহার বিনা সম্মতিতে করা হইয়াছে, তাহা তিনি করিবেন না। হয়ত তিনি নিজের ভক্ত অনুচরদের অপ্রস্তুত করিতে চান নাই। এই অনুমান সত্য হইলে গান্ধীজীর এই ভক্তবাৎসল্য মহাত্মার উপযুক্ত আচরণ হয় নাই।

সুভাষ বাবুর যে যে বক্তৃতা বা কাজ সম্বন্ধে আমরা যখন যাহা লিখিয়াছি তখন আমরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কখন কখন তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছি, কখন বা প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছি। ত্রিপুরীতে তাঁহার বক্তৃতাদি ও ব্যবহার এবং কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাঁহার বক্তৃতাদি ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও শান্তচিত্ততার পরিচায়ক হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বিরোধী দলের লোক, তাঁহারাও কেহ কেহ, মতভেদ সত্ত্বেও, তাঁহার এই প্রশংসা করিয়াছেন, এবং যে-সব বিরোধী প্রশংসা করেন নাই তাঁহারা এ বিষয়ে নিন্দা করিতেও পারেন নাই।

মহাত্মাজী ওআর্কিং কমীটি গঠনের ভার কেন লন নাই, তাহা তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন—সুভাষ বাবুর ঘাড়ে তিনি কমীটি চাপাইয়া দিতে চান নাই। কিন্তু সুভাষ বাবু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ রূপে পন্ত-প্রস্তাব অনুসারে চলিতে রাজী, মহাত্মাজীর মনোনীত ওআর্কিং কমীটি তিনি মানিয়া লইবেন। মহাত্মাজী ওআর্কিং কমীটি গঠন করিতে রাজী না-হওয়ায় সুভাষ বাবুর তাহা করিবার বৈধ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন তাহা করিলেন না, তাহা তিনি বলিয়াছেন—

> মহাত্মাজী আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, আমার নিজেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগকারী সদস্যদিগকে বাদ দিয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। কয়েকটি কারণে আমি এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। আমি উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিতেছি। আমি নিজে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে, পন্তজীর প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অমান্য করা হইবে। পন্তজীর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে এবং উহার উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা থাকিবে। আমি যদি পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি, তাহা হইলে আপনাদের নিকট বলিতে পারিব না যে কমিটির উপর গান্ধীজীর পূর্ণ আস্থা আছে।

অধিকন্তু ভারতবর্ষে ও বিদেশে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে, কাজেই

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, ওআর্কিং কমিটিতে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কংগ্রেস-সদস্যগণের আস্থা থাকিতে পারে এবং যাহাতে ওআর্কিং কমিটিতে মোটামুটি সমস্ত দলভুক্ত কংগ্রেস-সদস্যগণের মতামত প্রতিফলিত হইতে পারে, তজ্জন্য মিশ্র ওআর্কিং কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

মহাত্মাজী তাঁহাকে পূর্ব্বতন ওআর্কিং কমীটির সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ওআর্কিং কমীটি গঠন করিতে বলেন। সুভাষ বাবু আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সভ্যেরা একেবারে দলবলে মনোনীত হইলে তবে কাজ করিবেন, এইরূপ মত প্রকাশ করায় আলোচনা নিষ্ফল হয়। কারণ, সুভাষ বাবু মহাত্মাজীর দায়িত্বে গঠিত ওআর্কিং কমীটিতে রাজী থাকিলেও, স্ব-ইচ্ছায় পুরা পুরাতন কমীটিটির পুনর্নিয়োগ তাঁহার পক্ষে বিবেকবিরুদ্ধ হইত; কেন না, তাঁহার মত এই যে, কংগ্রেসের ওআর্কিং কমীটিতে কংগ্রেসের সব দলেরই যথাযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধি থাকা উচিত। আমরা এই মত ঠিক্ মনে করি।

যখন মহাত্মাজী ওআর্কিং কমীটি গঠন করিলেন না, উঁহার পূর্ব্বতন সভ্যদের সহিত আলোচনাও ব্যর্থ হইল, তখন সুভাষ বাবু অগত্যা সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু তাঁহাকে ইস্তফা প্রত্যাহার করিতে বলেন কিন্তু সেই সঙ্গে পুরাতন ওয়ার্কিং কমীটিটিকেও আপাততঃ পুরাপুরি নিযুক্ত করিতে বলেন। অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তার খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতির ইস্তফা গ্রহণ করিবার কিংবা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলিবার অধিকার নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির আছে। কিন্তু সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইস্তফা বিষয়ে কমীটির ভোটই লইলেন না। ইস্তফা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইস্তফায় একটু "দুঃখ প্রকাশ" করিয়া ইস্তফাদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মামুলী রীতির অনুসরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহাও অনুসৃত হইল না। সভানেত্রী কমীটিকে নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইয়া গেল। সভানেত্রীর এই অতিব্যস্ততা ও প্রচলিত সৌজন্যপ্রদর্শনরীতির লঙ্ঘন হইতে এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা সুভাষবাবুকে তাড়াইতে এতই ব্যগ্র ছিলেন যে, কাজটা যে-কোন প্রকারে সমাধা করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। হয়ত বা তাঁহাদের ভয় ছিল, যদি কমীটি সুভাষবাবুর ইস্তফা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না-করিয়া তাঁহাকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলিয়া বসেন ও তিনি ইস্তফা প্রত্যাহার করিয়া ফেলেন—তাহা হইলে ত বড় মুস্কিল! অতএব ইস্তফাটা ভোটে না দেওয়াই ভাল—কাজ কি অত হাঙ্গামায়, অত অনিশ্চিতের মধ্যে যাওয়ায়?

যাহা হউক, সুভাষবাবুর ইস্তফা না-হয় কমীটি কর্ত্তৃক দস্তরমোতাবেক গৃহীত হইয়াছে মানিলাম। কিন্তু নূতন সভাপতি তখনই তড়িঘড়ি নির্ব্বাচন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? সাধারণ রীতি, একটা দিন স্থির করিয়া সেই দিন সমুদয় প্রাদেশিক কমীটির প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচন। তাহা করায় কোন বাধা ছিল না। দুই সপ্তাহে তাহা হইয়া যাইত। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলিয়াছিলেন, "কংগ্রেসের এখন সভাপতি নাই, ওআর্কিং কমীটি নাই, সাধারণ সেক্রেটরী নাই—এসব এখনই নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করা চাই।" কিন্তু ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সব সভাসমিতির নিয়ম যে, কোন কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলে ও তাঁহার ইস্তফা গৃহীত হইলে যত দিন তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী নিযুক্ত না হন, তত দিন পদত্যাগী ব্যক্তিই কাজ করিতে থাকেন। সুভাষবাবু আর দুই-তিন সপ্তাহ সভাপতি-পদে থাকিলে কংগ্রেসের, ভারতবর্ষের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা পৃথিবীর কোন বিপদ ঘটিত না। ত্রিপুরীর কংগ্রেসের আগে হইতেই ওআর্কিং কমীটি না থাকাতে যখন অচল অবস্থা হয় নাই, তখন আর ২।৩ সপ্তাহে কংগ্রেস কাহিল হইয়া যাইত না। সাধারণ সম্পাদক অস্থায়ী এক জন ছিলেন। ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে তৎপূর্ব্বে তিনি সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই আহ্বানে কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির অধিবেশন বসিয়াছিল। এত বড় বড় কাজ তাঁহার দ্বারা হইল, কেহ কোন খুঁৎ ধরিলেন না, আপত্তিও হইল না; কিন্তু নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির অধিবেশনে বলা হইল তিনি উঁহার সভ্য

নহেন, সাধারণ সম্পাদকের উহার সভ্য হওয়া চাই। তাহা যদি একটা বৈধ আপত্তি হয় তাহা হইলে ঐ কমীটির অধিবেশনটা এবং ত্রিপুরীর কংগ্রেসের অধিবেশনটাও ত বাতিল!

প্রকৃত কথা বোধ হয় এই যে, কর্ত্তাব্যক্তিদের ভয় ছিল যে, সাধারণভাবে নির্ব্বাচন হইলে যদি সুভাষবাবু বা তদ্রূপ আর কোন ব্যক্তি প্রার্থী হন ও নির্ব্বাচিত হইয়া যান, তাহা হইলে ত বড় মুস্কিল! অতএব এমার্জেন্সির দোহাই দিয়া বিশেষ বিধি অনুসরণ করিয়া বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাচন করা হইল।

তিনি খুব যোগ্য লোক এবং কংগ্রেসের ও দেশের জন্য খুব ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি করিতেছি না। নির্ব্বাচনের প্রণালী ও আনুষঙ্গিক নানা ব্যাপার আপত্তিজনক। বলিতেছি। সভানেত্রী অনেক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে দেন নাই, শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণেকে, শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বলিতে দেন নাই। এই রকমের কাজগুলা ভাল হয় নাই।

—

নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির অধিবেশন উপলক্ষ্যে অভদ্রতা ও গুণ্ডামি

কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে-সকল অভদ্র ব্যবহার ও গুণ্ডামি হইয়াছে, তাহা সাতিশয় লজ্জাকর ও গর্হিত। যাহারা ইহা করিয়াছে, তাহারা সবাই কংগ্রেসী, না তাহাদের মধ্যে কতক কংগ্রেসবিরোধী লোকও ছিল, বলিতে পারি না। 'উত্তেজক চর' থাকাও অসম্ভব নয়। দোষ যাহাদেরই হউক, দোষারোপ সমগ্র বঙ্গের উপর হইতেছে।

—

বৈশাখের প্রথম দিনের উৎসব

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই বৎসরের একই দিনে নূতন বৎসর আরম্ভ করেন না। নববর্ষারম্ভ জাতি, দেশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় ভেদে অনেক ভিন্ন ভিন্ন দিনে হইয়া থাকে। আমরা বৈশাখের প্রথম দিনে নূতন বৎসর আরম্ভ করি। বণিকেরা সেই দিন নূতন খাতা আরম্ভ করেন এবং সম্বৎসর যাঁহাদের সহিত কারবার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রীতি জানাইয়া থাকেন।

কেনাবেচাই জীবনের একমাত্র কারবার নহে, যদিও উহা একটি প্রধান ব্যাপার।

জীবনের সকল বিভাগেই যদি নূতন বৎসরে নবোৎসাহে নূতন উদ্যমে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহা কল্যাণকর হয়। পুরাতন মুছিয়া ফেলা যায় না, কিন্তু তাহাতে যতটুকু দুর্বলতা ব্যর্থতা ও কালিমা লক্ষিত হইয়াছে, তাহার হ্রাস ও অপনোদনের চেষ্টা হইতে পারে।

—

বর্ষারম্ভে নবীনদের প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান

কয়েক বৎসর হইতে প্রধানতঃ কলিকাতায় ও হাবড়ায় বালক-বালিকা ও অন্য নবীনেরা একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের নেতাদের পরিচালনায় যে শোভাযাত্রা ও কুচ-কাওয়াজ করিয়া আসিতেছেন, তাহা বঙ্গের সর্ব্বত্র ও বঙ্গের বাহিরেও প্রবর্ত্তিত হইবার যোগ্য। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে সংহতি ও সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধি পায় এবং সজীবতা ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়। নানা কারণে আমাদের জাতির মধ্যে যে নির্জ্জীবতা ও অবসাদের সঞ্চার হইয়াছে, যত প্রকারে সম্ভব তাহা দূর করিতে হইবে। নববর্ষের এই অনুষ্ঠানটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, কোন জাতির, ধর্ম্মের ও রাজনৈতিক মতের লোকদের ইহাতে যোগ দিবার বাধা নাই। সকলেই যোগ দিতে পারেন।

—

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রসমাজের সুচেষ্টা

ভারতবর্ষের যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইতেছেন, সেখানে গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতেই প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্য হইতেও নিরক্ষরতা দূর করিবার ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে। বাংলা দেশে সরকারী সেরূপ চেষ্টা না-হওয়ায় বাংলা দেশ পশ্চাতে পড়িয়া যাইবার

সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে বেসরকারী চেষ্টা কিছু হইতেছে। তাহার মধ্যে ছাত্রেরা যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য পাঁচ শত ছাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদিগকে শিক্ষা কি প্রকা দিতে হইবে সে বিষয়ে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মফঃসলে নিজ নিজ গ্রামে ও শহরে গ্রীষ্মের বন্ধের সময় শিক্ষকের কাজ করিবেন।

তাঁহাদের কাজের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

এইরূপ কাজ বাংলা দেশে এই যে প্রথম হইতেছে, তাহা নহে। গত শতাব্দীতে কেশবচন্দ্র সেন, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কারকেরা শ্রমজীবীদের মধ্যে এইরূপ কাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও আগে অনেক জায়গায় পরস্পরসম্বন্ধবিহীন ভাবে এই প্রকার কাজ হইত, এখনও কোথাও কোথাও হয়। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা কেবল-মাত্র সমালোচনাসর্ব্বস্ব ও সরকারের দোষোদ্ঘাটনপরায়ণ ছিল না। জাতিকে সকল দিকে উন্নত, শক্তিশালী ও প্রগতিশীল করিবার চেষ্টা তাহার অঙ্গীভূত ছিল। স্বদেশী প্রচেষ্টা তাহারই ঐরূপ একটি শাখা। শিক্ষা-ক্ষেত্রে গবর্ন্মেণ্টের পরিচালনা ও সাহায্য না লইয়া জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আর একটি শাখা। এই চেষ্টার ফলে বঙ্গে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী প্রতিকূলতার ফলে সেগুলি লোপ পাইয়াছে। দাঁড়াইয়া আছে যাদবপুরের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। তাহাতে শিক্ষিত হইয়া অনেক ছাত্র কৃতী হইয়াছে।

নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিয়া প্রাপ্তবয়স্কদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টাও স্বদেশী যুগে হইয়াছিল। যাঁহারা চেষ্টা করিতেন, শিক্ষা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ায় নানাপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। এই অবৈতনিক স্বেচ্ছাশিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রও ছিলেন।

এখন যে-সকল ছাত্র নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার ভার লইয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদের এরূপ কোন দুর্ভোগের আশঙ্কা নাই। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে যাঁহারা তাহাদিগকে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীও ছিলেন।

[illegible] যে ৫০০ ছাত্র স্বেচ্ছাশিক্ষক হইয়াছেন তাঁহারা বঙ্গের বৃহৎ ছাত্রসমাজের সামান্য অংশ। আরও হাজার হাজার ছাত্র এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন—শুধু কলিকাতায় নহে, বঙ্গের সর্ব্বত্র। হওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়

শিক্ষাবিস্তারচেষ্টা ও "প্রবাসী"

গত বৎসর চৈত্র মাসে বর্ধমান জেলা শিক্ষক-সম্মেলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন :—

নানা প্রকার সংস্কারপ্রচেষ্টা, নানা জাতীয় বিধিবিধান, শিক্ষকের শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার বাহনের পরিবর্তন, শিক্ষণীয় বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা,—এ সকলের কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া ইহাই বিশ্বাস হয় যে আমাদের দেশের চিন্তানায়কেরা নানা ভাবে আমাদের কর্ম স্থানকালপাত্রোপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, চারি দিকের অবস্থার সঙ্গে, আমাদের কথিত বাণী ও কৃত কর্মের সঙ্গে, একটা সামঞ্জস্য থাকে। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া অন্ত কথাও আসে। আসে আমাদের দেশের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রচারের কথা। আমাদের দেশে নিরক্ষরতাদূরীকরণ ব্যাপারে যাঁহারা অগ্রণী হইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে এই প্রসঙ্গে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রশক্তিকে এ বিষয়ে প্রবুদ্ধ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ অবসরে নিরক্ষর জনসমাজে শিক্ষাবিতরণের কার্যে নিয়োজনের কথা বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রায় প্রতি বৎসর প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বলিয়া আসিতেছিলেন। এইবার শিক্ষাসংস্কারের সকল বিষয়ে অধিনায়ক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ; এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে পাঁচ শত ছাত্র এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

ইহা সত্য যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা অনেক বৎসর আগে হইতে "প্রবাসী"তে অনেক কথা লিখিয়া আসিতেছি। পুরুষসমাজে এবং নারীসমাজে বক্তৃতাও এ বিষয়ে বহু বৎসর আগে হইতে করিয়া আসিতেছি। গ্রী[illegible] সময় এবং পূজার ছুটির সময়েও এই কার্য্যে ছাত্রশক্তির প্রয়োগও প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি।

কিন্তু বর্ত্তমানে এ বিষয়ে দেশে যে সকল উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্রও প্রশংসা প্রাপ্য নহে; কারণ সেগুলি আমাদের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টা কিংবা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রভাবের ফল নহে। যে-প্রকার সরকারী বা আধা-সরকারী পদমর্য্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব, যে-প্রকার পাণ্ডিত্য বা পাণ্ডিত্যখ্যাতি, যে-প্রকার প্রতিভা, এবং যে-প্রকার নেতৃত্ব থাকিলে আমাদের দেশে মানুষকে প্রভাবিত ও কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায়, "প্রবাসী"র সম্পাদকের তাহা নাই।

লিখনপঠনক্ষমতা সার্ব্বজনিক করিবার পক্ষে আমাদের প্রথম যুক্তি বরাবর এই যে, জ্ঞানী হইবার অধিকার ও প্রয়োজন সব মানুষের আছে, এবং লিখনপঠনক্ষমতা জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়; দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যিনি জীবনের যে-ক্ষেত্রেই কৃতী হইতে চান, লিখনপঠন-ক্ষমতা তাঁহার সিদ্ধিলাভের সহায় হইবে; তৃতীয় যুক্তি এই যে, ধর্ম্মবিষয়ক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, বা অন্য যে-কোন দিকেই আমরা আমাদের জাতির উন্নতি ও প্রগতি চাই, সমগ্র জাতির লিখনপঠনক্ষমতা সেই দিকেই আমাদের চেষ্টার সৌকর্য্য ও সাফল্যসম্ভাবনা বাড়াইবে। শেষ যুক্তি এই যে, আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সার্ব্বজনিক লিখনপঠনক্ষমতা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে ছাত্রশক্তির স্বাধীন নিয়োগ আমরা নানা কারণে প্রার্থনীয় মনে করিয়া আসিতেছি। একটি কারণ, পরার্থপরতা শ্রেষ্ঠ মানুষের লক্ষণ; আমরা ছাত্রসমাজে এই লক্ষণের স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখিতে আশান্বিত—কারণ তাহারা এখনও সাংসারিকতা দ্বারা অভিভূত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, পরার্থপরতাই স্বার্থপরতার শ্রেষ্ঠ রূপ। ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে স্বার্থপরতার এই রূপের মূর্ত্তি পরিগ্রহ বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় কারণ, আমাদের অন্য সকলের মত ছাত্রদিগকেও ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সরকারী, সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলসমূহে এক একটি ছাত্রের জন্য গড়ে বার্ষিক যত খরচ হয়, কোন ছাত্রই তত বেতন দেন না। বেতন হইতে প্রাপ্ত অর্থ ভিন্ন অন্য যত টাকা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে খরচ হইয়াছে এবং সেগুলি চালাইতে যত খরচ হয়, শেষ পর্য্যন্ত সন্ধান লইলে দেখা যাইবে তাহা দেশের নিরক্ষর চাষাভূষা মুটেমজুর কারিকর শ্রেণীর নিকট হইতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত। শিক্ষাভিমানী আমরা সবাই তাহাদের নিকট ঋণী। স্বয়ং বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিয়া, কিংবা শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত দান করিয়া এই ঋণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শোধ করা যায়।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু পরিশ্রম ও কিছু অর্থদান কেবল ছাত্র ও ছাত্রীদের নহে, লিখনপঠনক্ষম অন্য প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য।

বেকার-বান্ধব সমিতি

বেকার-বান্ধব সমিতির সাহায্যকল্পে দেশবাসীর প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সর্ হরিশঙ্কর পাল, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও ডাঃ শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষের নিম্নমুদ্রিত আবেদনের আমরা সমর্থন করিতেছি।

আমরা বেকার-বান্ধব সমিতি পরিদর্শন করিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিষয় জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই সমিতি বিগত ছয় বৎসর যাবৎ দেশের বেকার যুবকদিগকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। টিটাগড়ের নিকটবর্ত্তী বন্দিপুর গ্রামে একটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কৃষি ও তাঁতের কাজ শিক্ষা দিতেছে। গো-পালন, মাছের চাষ, পোলট্রি প্রভৃতিও তথায় আরম্ভ করিবার চেষ্টা হইতেছে। উক্ত গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সমিতি পল্লী-সংস্কারকার্য্যও কিছু কিছু আরম্ভ করিয়াছে। সমিতির এই মহৎ উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য যথাসম্ভব সহায়তা করিতে দেশবাসীকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানাঃ—সম্পাদক, বেকার-বান্ধব সমিতি, ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

আমরা ইহার কৃষিক্ষেত্র ও গোপালনের স্থান এবং তাঁতশালা দেখিয়াছি। ইহা এখন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কাজ করিলেও ভাল কাজ করিতেছে। অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃততর হইবে এবং কাজের পরিমাণও বাড়িবে। বৃহৎ একটি

সমিতি ও দেশব্যাপী কার্য্যক্ষেত্র সম্ভবপর হইলে তাহা অবাঞ্ছনীয় না-হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও বাঙালীর প্রকৃতি বিবেচনা করিলে ছোট ছোট এইরূপ সমিতির দ্বারা বেকার-সমস্যার যতটুকু সমাধান হইতে পারে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

বিহারে বাংলা ভাষার দুর্গতি

বিহারে বাংলা ভাষার কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক বিহার সংস্কৃত এসোসিয়েশনের দুইটি প্রশ্নপত্র আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একটিতে নিম্নমুদ্রিত বাংলা (?) বাক্যগুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে :—

২। সমুদ্রের জল ক্ষার হইতেছে। তাহার ভীতরে কপিল মুনির আশ্রম আছে। সেখানে মকর সংক্রান্তির দিনে কপিল মুনির দেখিবার জন্য অনেক লোক যাইতেছেন। সমুদ্রে পুল বান্ধাইয়া শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা গিয়া রাবণকে মারিলেন। সেখানে হইতে বিভীষণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সীতার সঙ্গে অযোধ্যা আসিলেন। লোভ করিতে উচিত নাই, লোভই পাপের কারণ আছে। প্রত্যেকক্ষনে ভাগবানের স্মরণ কর। অন্তে এই মাত্র সঙ্গে জাইবে, এই সংসারে নিজের কেই নাই।

প্রশ্নপত্রটিতে প্রথমে কতকগুলি হিন্দী বাক্য সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। বাংলা বাক্যগুলি তাহারই বঙ্গানুবাদ। হিন্দী হইতে যিনি অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহার মাতৃভাষা সম্ভবতঃ হিন্দী, বাংলা নহে। কোন বাঙালীর দ্বারা এই অনুবাদ করাইলে এমন অদ্ভুত বাংলা হইত না। বিহারে কৃতবিদ্য হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এবং খাঁটি বাংলা লিখিতে সমর্থ বিশ্বাসযোগ্য বাঙালীর অভাব নাই। সুতরাং অ-বাঙালীর দ্বারা এরূপ অনুবাদ করান উচিত হয় নাই।

আমাদিগকে প্রেরিত দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রটি ভূগোলের। তাহার চারিটি বাংলা প্রশ্ন এই :—

১. কত ভূপ্রদেশের নাম বিহার প্রান্ত বলা জায় ?

২. ভাগলপুর জিলা কত বর্গ মাইল আছে? তাহার মানচিত্র লিখ।

মুজফরপুর জিলায় কত সবডিবীজন আছে ?

৪. সরযূ, গংগা, কৌশিকী, নদীর উৎপত্তি স্থান, প্রবাহ পথ এবং জল বায়ুর গুণ-দোষ বর্ণন কর।

প্রথম প্রশ্নপত্রটির বাংলা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা এই ভূগোলের প্রশ্নপত্রটি সম্বন্ধেও খাটে। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা জানিতে কৌতূহল হয় যে, নদীর "জলবায়ুর গুণদোষ" কিরূপ চীজ।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ যে তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর তাহা গত চৈত্রের ও বৈশাখের দুটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। পাক্ষিক তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ১৬ই বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে সভার কৃতিত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম ও তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে কয়েকটি চিন্তা অনিবার্য্য রূপে মনে উদিত হয়। প্রথমতঃ যে-তত্ত্ববোধিনী সভা উত্তর কালে ক্রমশঃ বঙ্গদেশের সমুদয় শিক্ষিত ও অগ্রসর মানুষদের মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল, তাহার সূচনা এইরূপে কেবল দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি আত্মীয়কে লইয়া, প্রায় নিভৃতেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে-তত্ত্ববোধিনী সভা উত্তর কালে ব্রহ্মবাদ প্রচার, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, সর্ব্ববিধ কুসংস্কার উন্মূলন, কয়েকটি স্বাধীন বিদ্যালয় পরিচালন, সাহিত্য প্রচার, বিজ্ঞান প্রচার, বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠতম মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন, বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ রচনারীতি প্রবর্ত্তন, বাংলাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদির সময়ে আর্ত্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ, খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের কৃত বেদান্ত-ধর্ম্মের নিন্দার প্রতিরোধ, প্রভৃতি, তৎকালীন বঙ্গসমাজের শিক্ষিত ও অগ্রসর মানুষদের অবলম্বিত প্রায় সমুদয় কল্যাণকর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন,—সেই সভার জন্ম হইল এক জন শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ মানুষের শান্ত ধর্ম্মজীবনকে ভিত্তি করিয়া। বোধ হয় ইহাই কল্যাণ-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবি ঈশ্বর গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন।

কচুরী পানা

কচুরী পানার দ্বারা অনেক চাষের জমী আচ্ছন্ন হওয়ায় মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমিয়াছে, খালে ও নদীতে

ইহার প্রাচুর্ভাবে জলপথে যাতায়াতে বাধা জন্মিয়াছে, পুষ্করিণী খাল বিল ও নদীতে ইহা দ্বারা মাছের জন্ম ও বৃদ্ধি বাধা পাইয়াছে, জলাশয়ের জল দূষিত হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে। ইহার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, বিলম্বেও যে হইতেছে, তাহা হইতেও সুফলের আশা করা যায়। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা-গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বে নানা স্থানে কচুরী পানা উচ্ছেদের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা আংশিক ভাবে ফলপ্রদ হইয়াছে।

কচুরী পানা কেবল যে অনিষ্টেরই কারণ তাহা নহে। ইহার ঝরা পচা পাতা জমীতে সারের কাজ করে, পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষায় যখন গোরুবাছুর আর কিছু খাবার পায় না তখন কচুরী পানাই তাহাদের খাদ্য, এবং রাসায়নিক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন দেখাইয়াছেন যে ইহা হইতে সুরাসার ও অন্য কোন কোন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব, যেখানে ইহার প্রয়োজন নাই সেখানে ইহা নষ্ট করিয়া ফেলা, যেখানে ইহা কাজে লাগাইতে পারা যাইবে সেখানে ইহা কাজে লাগান উচিত।

—

ছাত্রসমাজ ও আমলাতন্ত্র

সেদিন খবরের কাগজে দেখিলাম, বরিশালের কতকগুলি ছাত্র কচুরী পানা উচ্ছেদের কাজ করিয়াছিল এবং আজকালকার কোন কোন জয়ধ্বনি ও জিন্দাবাদ ("বেঁচে থাক্") ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল। স্কুল ইন্সপেক্টর মহাশয় শেষোক্ত কার্য্য আপত্তিজনক মনে করেন ও ছাত্রদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ছাত্রদের চীৎকার দুর্নীতিব্যঞ্জক বা কুরুচিপ্রসূত ছিল না, এমন কি সরকারী চাকরোদের ভীতি-উৎপাদক কোন বৈপ্লবিক রণরবও ছিল না।

ছাত্রদের প্রতি এই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ আবশ্যক। তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিব, কিন্তু তাহাদিগকে নির্দোষ স্ফূর্ত্তিও করিতে দিব না, এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ছাত্রদিগকে শাসন করিতে ও দমন করিতে হইবে, বিদেশে বা আমাদের দেশে এইরূপ মনোভাবের উৎপত্তির ইতিহাস আমরা লিখিতে চাহিতেছি না।

কিন্তু ইংরেজীতে যে আছে, "স্পেয়ার দি রড য়্যাণ্ড স্পয়েল দি চাইল্ড," ঠিক তাহার সমার্থক বাংলা বা সংস্কৃত বাক্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃতে আছে বটে, "পাঁচ বৎসর লালন করিবেক, দশ বৎসর তাড়ন করিবেক," কিন্তু তাহার পরই আছে, পুত্র ষোলয় পা দিলেই তাহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবেক। তাড়ন করিবার অর্থ এ নয় যে, ছয় হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেদিগকে কেবল ঠেঙ্গাইতে হইবে; দরকার হইলে শাসন করিতে হইবে ইহার অর্থ এই। পনর বৎসর বয়সের পর ছেলেদের সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে হইবে, এই বাক্যাংশটির দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, গড়ে ষোল বৎসরের ছেলেদিগকে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির এবং হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহের সাহায্যে জীবনপথে চালিত করা যায় ও করা উচিত। তদপেক্ষা অল্প বয়সের ছেলেদিগকেও তাহা করা যায় ও করা উচিত। মেয়েদের সম্বন্ধেও ইহা সত্য।

আমরা বাল্যকালে শুনিতাম পাঠশালায় কঠোর এবং অনেক সময় নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়া বালকদিগকে শাসন করা হইত। বাংলা ইস্কুলে এরূপ শাস্তি প্রত্যক্ষও করিয়াছি। ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে জানি না। কিন্তু টোলের অধ্যাপকেরা এরূপ শাস্তি দেন বা দিতেন বলিয়া শুনি নাই। আমাদের বংশের টোল ছিল—প্রবাসীর সম্পাদকের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের এখনও টোল আছে। এই সব টোলে কোন দৈহিক শাস্তি দেখি নাই, তাহার কোন জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তীর বিষয়ও অবগত নহি। আমাদের দেশের পাঠশালা ও বাংলা ইস্কুলগুলির চেয়ে টোলগুলি প্রাচীনতর। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর ও ছেলেদের প্রতি ব্যবহারের কিছু আভাস পাঠশালা অপেক্ষা টোলেই হয়ত অধিক পাওয়া যায়।

—

ছাত্রদের জীবনের পরিসর বৃদ্ধি

সত্তর বৎসরেরও আগে আমাদের দেশের ছেলেরা

ক্রিকেট ফুটবল হকী টেনিস খেলিত কি না, কিংবা শতকরা কয় জন খেলিত বলিতে পারি না; কিন্তু ষাট বৎসর আগেকার মফঃসলের ইস্কুলে ক্রিকেট ফুটবল খুব সামান্য চলিত, তাহা জানি। তখন সিনেমা ছিল না। তখন মফঃসলে দুর্গাপূজার সময় সখ করিয়া কেহ কেহ কখন কখন নাটক অভিনয় করিত। রাজনৈতিক আন্দোলন তখন বড়দের মধ্যেও খুব ব্যাপক আকার ধারণ করে নাই। সুতরাং তখন যে-সব ছাত্র পড়াশুনায় খুব মনোযোগী হইতে চাহিত, তাহাদের চিত্তবিক্ষেপের এখনকার মত এত কারণ ঘটিত না। নানা প্রকার ব্যায়াম ও খেলাধুলা এবং কোন কোন নির্দোষ চিত্তবিনোদন দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া ইংরেজ সরকারও এখন মানিয়াছেন—হয়ত সেই দিকে তাহা-দিগকে উৎসাহিত করিয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত।

আমরা এই সমস্তকে জীবনের পরিসর বাড়াইবার উপায় বলিয়াও আবশ্যক মনে করি। কিন্তু দেহের পুষ্টি ও জীবনধারণের নিমিত্ত খাদ্য আবশ্যক হইলেও যেমন সুবুদ্ধি কেহ ঔদরিকতা ও অতিভোজনের সমর্থন করে না, সেই-রূপ, পূর্ণ জীবন যাপনের নিমিত্ত ব্যায়াম খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন আবশ্যক হইলেও, বিজ্ঞ জনেরা তাহার আতিশয্যের বিরোধী।

ইংরেজ সরকার ও তাহার আমলাবর্গ ছাত্রদিগকে রাষ্ট্রনীতির সহিত সংস্পর্শ বিষবৎ পরিহার করিতে বলেন। তাহার কারণ স্বাধীনতা-ভীতি। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতারা ছাত্রদিগকে রাষ্ট্রনীতির সহিত সংস্পর্শ পরিহার করিতে বলেন না। তাঁহারা ছাত্রদের রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান অর্জ্জন চান এবং পরে তাহারা প্রস্তুত হইলে তাহাদিগকে কর্ম্মী রাজনীতিক হইতে বলেন।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের ছাত্রজীবন যেরূপ সংকীর্ণ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিস্তৃতি মন্দ নহে, ভাল। কিন্তু পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা হ্রাস পাইলে তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। পরিসর বৃদ্ধি পাইলে গভীরতা কমিবেই, এমন কোন কুফল অবশ্যম্ভাবী নহে। যে সময়ে পৃথিবীতে লিপির সৃষ্টি হয় নাই, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি ছিল না, মানুষের জানিবার ভাবিবার হৃদয়মন দিয়া উপভোগ করিবার, আনন্দরসাস্বাদন করিবার বিষয় ও উপায় নিতান্ত কম ছিল, সেই সকল অসভ্য যুগের তুলনায় এখন মানুষের বাহেন্দ্রিয়গোচর জগৎ কত বড় হইয়াছে এবং তাহার হৃদয়মন কিরূপ অসীম জগতে বিচরণ করে! অথচ সেই সব অসভ্য যুগের মানুষের চেয়ে পরবর্ত্তী সভ্য যুগসমূহের মানুষের জীবন যে গভীরতর হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মনঃসংযম ও অভিনিবেশের শক্তিও মানুষের বাড়িয়াছে বলিয়া মানুষের আন্তরিক জীবন প্রগাঢ়তর ও গভীরতর হইয়াছে।

অতীত যুগসমূহ অপেক্ষা এখন, মানুষের জীবনের লক্ষ্যহীন গতি স্রোতে ভাসমান তৃণের মত বা ঝড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুষ্ক পাতার মত হইবার কারণও বহুগুণে বাড়িয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আভ্যন্তরিক জীবনের গভীরতা অসম্ভব হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদের জগৎ বৃহত্তর হইয়াছে। কিন্তু সে-কারণে তাহাদের জীবনের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য কূপমণ্ডুক হওয়া আবশ্যক নহে। তাহারা প্রয়োজন মত নির্লিপ্ততা ও মনঃসংযম এবং অভিনিবেশের অভ্যাস করিলেই হইবে। ইহা সাধনাসাপেক্ষ।

—

দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা সর্ব্বত্র শিক্ষিত হওয়া উচিত

যাঁহারা হিন্দী, উর্দু, বা হিন্দুস্থানী নাম দিয়া একটি রাষ্ট্রভাষা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চালাইতে চান, তাঁহারা যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী নহে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় এই ভারতীয় ভাষাটি শিক্ষা করিতে বাধ্য করিতে চান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'বাধ্য করিতে' চান না বটে, কিন্তু সকলেই চান যে, হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে তাঁহারা যেন উহা শিখেন।

বাঙালীদের বা অন্য কোন অ-হিন্দুস্থানীভাষীদের উহা শিক্ষায় আমরা আপত্তি করি না, আমরা বরং উহা শিক্ষা করার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা কেহ মনে

করিবেন অতিরিক্ত সুবিধা লাভ ও শক্তি অর্জ্জন, কেহ বা মনে করিবেন উহা অতিরিক্ত ভারবহন। উভয় দিক হইতে বিষয়টি আলোচ্য।

আমরা চাই যে, যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী উর্দু বা হিন্দুস্থানী, তাঁহারাও মাতৃভাষা ছাড়া যেন আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। এরূপ চাহিবার কারণ দুটি। অ-হিন্দুস্থানী সকলে নিজ মাতৃভাষা ও অন্য একটি ভারতীয় ভাষা (হিন্দুস্থানী) শিখিলে, তাহারা একটি মাত্র ভারতীয় ভাষা জানা লোকদের চেয়ে ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান বিষয়ে সকল প্রদেশের লোকদের সমান হইবার ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকা উচিত। এই জন্য আমরা হিন্দুস্থানীভাষীদিগকে নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি মাতৃভাষা শিখিতে বলি।

দ্বিতীয় কারণ, অ-হিন্দুস্থানী সব ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোক যদি মাতৃভাষা ভিন্ন হিন্দুস্থানীও শিখিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনেকটা সময় ও শক্তি দুটি ভাষা শিক্ষা করিতে নিয়োজিত হইবে; কিন্তু হিন্দুস্থানীভাষী ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা যদি দ্বিতীয় কোন ভারতীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ভাষা শিখিবার জন্য আবশ্যক সময় ও শক্তি তাহাদের বাঁচিবে এবং তাহা তাহারা অন্য কাজে লাগাইতে পারিবে। এই প্রকারে তাহারা অ-হিন্দুস্থানীদের উপর অতিরিক্ত কিছু সুবিধা ভোগ করিবে, এবং অ-হিন্দুস্থানীরা হিন্দুস্থানীদের তুলনায় কিছু অসুবিধায় পড়িবে। ইহা অন্যায় এবং গণতান্ত্রিক সাম্যের বিপরীত।

অতএব, আমাদের বিবেচনায় নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির আগামী অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়া উচিত যে, হিন্দুস্থানীভাষী প্রদেশ ও দেশী রাজ্যসমূহে ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মাতৃভাষা ছাড়া আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুস্থানীভাষী লোকেরা দ্বিতীয় কোন্ ভারতীয় ভাষা শিখিবেন, তাহা তাঁহারা স্থির করিবেন। তাঁহারা তামিল, তেলুগু, মলয়ালম, কন্নাড, মরাঠী, গুজরাটী, সিন্ধী, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া, পঞ্জাবী, নেপালী, ইত্যাদি যে-কোন ভাষা শিখিতে পারেন। কোন্ ভাষাটি শিখিলে তাঁহাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ বাড়িবে এবং সাহিত্যরস-সম্ভোগের সুযোগ অধিক হইবে, তাহা তাঁহারা অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা

জনৈক ভদ্রলোক (তাঁহার নামধাম বর্ত্তমান নিবাস বলিব না) আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পাপসাহিত্যের পাপরহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ধারাবাহিক সমালোচনা যদি লিখি তবে আপনি আপনার প্রবাসী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন কিনা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।" তাঁহার মতে এরূপ সমালোচনা লেখা কেন আবশ্যক, সে-বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিব না। তিনি আত্মপরিচয়দান-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আছে যে, "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং "ভারতবর্ষ" ও "বসুমতী"তেও তাঁহার লেখা বাহির হইয়াছে।

পত্রলেখক মহাশয় আমার পরিচিত নহেন। তাঁহার চিঠি হইতে বুঝিলাম তিনি হিন্দু সমাজের লোক। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি মাসিকের কোনটিতে তিনি শরৎ-সাহিত্যের প্রতিকূল সমালোচনা পাঠাইলে তাহার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার লেখা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত মনে করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া "প্রবাসী"তেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানাইতেছি; কারণ তাহাতে এরূপ বিষয়ে আমার মত সমালোচনেচ্ছু অন্য লেখকেরাও জানিতে পারিবেন।

শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ছাপিলে, আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি, এই অপবাদ রটিত, এবং সমালোচনার সত্যতা-অসত্যতা নির্দ্ধারণে তাহাতে বাধা জন্মিত। সেই কারণে এখনও প্রতিকূল সমালোচনা ছাপিব না। উল্লিখিত পত্রলেখক

মহাশয় যখন তিনটি মাসিকে লিখিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অভিপ্রেত ধারাবাহিক সমালোচনা ঐ কাগজগুলির কোনটিতে প্রকাশ করিলে, যদি তাঁহার সমালোচনা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঠকদের সেরূপ বাধা জন্মিবে না যেরূপ বাধা জন্মিবে "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিলে।

শরৎ বাবুর কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের না-ছাপিবার আর একটি কারণ এই যে, তাঁহার যে-যে বহির নিন্দা আমরা শুনিয়াছি সে বহিগুলি বাস্তবিক নিন্দনীয় কি না প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাহা বলিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমরা পড়ি নাই।

১৩৪৪ সালের ২০শে চৈত্র তারিখের "যুগান্তর" কাগজে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটির প্রধান বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহার শেষ অনুচ্ছেদ এই :—

"কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয় নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়োদিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শরৎ বাবুর যে-যে বহির নিন্দা শোনা যায়, কবি তাহার একখানাও পড়েন নাই।

আমাদের মনে হয়, শরৎ বাবুর গ্রন্থগুলির ঠিক্ সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার কোন একখানা বহি সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা স্বয়ং তাহার কোন সমালোচনা করিব না, অন্যের সমালোচনাও ছাপিব না।

অবশ্য, তিনি কিংবা তাঁহার প্রকাশকেরা তাঁহার কোন বহি সমালোচনার জন্য যদি পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহা সমালোচিত হইত।

কৃষক-আন্দোলন

কেবল বঙ্গে নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বহু দেশী রাজ্যেও কৃষক-আন্দোলন হইতেছে। তাহা স্বাভাবিক কারণে ঘটিয়াছে—যদিও অকৃষক কৃষকনেতারা কোথাও কোথাও কৃষকদের অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইয়া থাকিবে। স্বহস্তে লাঙ্গল চালাইয়া যাহারা চাষ করে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর অসন্তোষজনক। সেই জন্য, অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। তাহাদের বাসগৃহ, তাহাদের খাদ্য, তাহাদের স্বাস্থ্য ও রুগ্ন অবস্থায় চিকিৎসা, তাহাদের শিশুদের জন্মের আগেকার ও পরবর্তী ব্যবস্থা বা ব্যবস্থাভাব, তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদিগের শিক্ষা, তাহাদের চিত্তবিনোদন ও নির্দোষ কালক্ষেপের ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনটিই ভাল নয়। যাহারা কৃষক নহে, তাহাদের মধ্যে দরিদ্র লোকদের অবস্থা যে এই সব বিষয়ে উৎকৃষ্টতর, তাহা নহে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য কৃষকদের অবস্থা।

ইহার উন্নতি শুধু কৃষকদের নহে, দেশের সমুদয় অধিবাসীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত; কারণ মানব সভ্যতার ভিত্তি কৃষি এবং ভারতবর্ষের (ও বঙ্গের) অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী।

জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাহিয়া এবং খাসমহলগুলিতে প্রজাদের উপর যে অত্যাচার হয় তাহারও অবসান চাহিয়া দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম, জমিদারী-প্রথা ও খাসমহল-প্রথা উভয়েরই উচ্ছেদ করিয়া তৃতীয় কি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে চাষীদের অবস্থা ভাল হয়, তাহা রাষ্ট্রনেতা ও কৃষকনেতাদের স্থির করা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিলে আলোচনা করিতে পারিব। স্বাধীন দেশে রাশিয়ার মত ভূমি সমগ্র জাতির সম্পত্তি ঘোষিত হইতে পারে এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক ট্রাক্টর-আদি যন্ত্রাদি দ্বারা যৌথ চাষ হইতে পারে; কৃষি ও কৃষকের উন্নতির অন্য উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা অবশ্য হওয়া উচিত এবং চাষীদেরও তাহাতে যোগদান

বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বেও চাষীদের অবস্থার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাই সত্য সত্য ভাবিয়া ঠিক্ করা আবশ্যক ; কৃষকদিগকে জমিদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেই তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না

জমিদারী-প্রথা যাক বা থাক, খাসমহল যাক বা থাক, চাষী একা একা ছোট ছোট নিজ জোত চাষ করুক বা দেশে বৃহৎ বৃহৎ জোতের যৌথচাষ প্রবর্ত্তিত হউক—চাষের প্রণালীর উন্নতি চাই, জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রভৃতির যন্ত্র উন্নততর হওয়া চাই, গোমহিষের উন্নতি চাই, বীজ ভাল চাই, সার ভাল চাই, জলসেচনের যথেষ্ট ব্যবস্থা চাই, খাদ্যশস্য ও অন্য শস্যের চাষের পরিমাণ অবস্থাভেদে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এই সমুদয় দিকে চাষীদের ও তাহাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশেষ করিয়া মন দিতে হইবে।

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বা অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহা লইয়া তর্কটা প্রধান জিনিষ নয় যাহা হইয়াছে তাহার নাম যাহাই হউক, নিরন্ন বিপন্ন লোকদের সদ্যসদ্য যে সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা অতি শীঘ্র দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য. দেশের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদেরও কর্ত্তব্য।

নিরন্ন অবস্থার সংবাদ উত্তর পূর্ব্ব মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থান হইতে খবরের কাগজের আপিসে আসিতেছে এবং প্রকাশিত হইতেছে। আমরা যখন গত চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাঁকুড়া গিয়াছিলাম, তখন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ঐ জেলায়—বিশেষ করিয়া উহার সদর মহকুমায়—অন্নকষ্ট হইয়াছে। যে-সব মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকের অবস্থা সচ্ছল নহে, অথচ যাঁহারা দৈহিক শ্রমের কাজে অনভ্যস্ত, ভিক্ষাও করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুর্গতি সাধারণতঃ মানুষের চোখে পড়ে না বলিয়া আরও চিন্তার বিষয়।

যে-বৎসর যখনই কোথাও অন্নকষ্ট হয়, এবং তাহা কোথাও না কোথাও প্রতি বৎসরই হয়, দেশের সহৃদয় লোকেরা এবং গবর্মেণ্টও নিরন্ন লোকদের সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাতে দুঃখের সাময়িক কিছু প্রতিকার হয়, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান ইহার দ্বারা হয় না। স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে, স্বাধীন সভ্য বহুদেশে এখন আর দুর্ভিক্ষ কেন হয় না, তাহা জানিয়া সেই সকল দেশে অবলম্বিত উপায় ভারতবর্ষে কতটা চালান যায় তাহা দেখিতে হইবে।

বাংলা দেশে খাদ্যশস্য যত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা সকল বৎসরই—অনাবৃষ্টির বৎসরেও জলসেচন দ্বারা—যাহাতে হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অনেক জেলায়—যেমন বাঁকুড়ায়—হাজার হাজার জলাশয় বুজিয়া গিয়াছে। সেইগুলি—স্থলবিশেষে আইনের সাহায্যে—আবার খনন করাইলে গ্রীষ্মের সময় লোকের জলকষ্ট হয় না, জলসেচনের সুবিধাও হয়।

খাদ্যশস্য ছাড়া এরূপ ফসলও জমিবিশেষে উৎপন্ন করা দরকার, যাহাতে টাকা আসে। তাহা হইলে নিজের বাড়ীর, নিজের গ্রামের, বাহিরের জেলার ও প্রদেশের খাদ্যশস্যের অভাব পূরণ করা যায় অন্যত্র হইতে ক্রয় ও আমদানী দ্বারা। কিন্তু যত রকম ফসল যত পরিমাণেই জমিতে উৎপন্ন হউক, শুধু জমির উপর নির্ভর করা চলে না ; কোন সভ্য দেশের লোকই তাহা করে না ও করিতে পারে না। ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা এবং সভ্য মানুষের নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ কারিগরের কুটীরে বা ছোটবড় কারখানায় উৎপাদন করিয়া জাতিকে ধনশালী করিলে অন্নাভাব ঘটে না। কোথাও খাদ্যশস্য না জন্মিলে বা কম জন্মিলে নগদ টাকার সাহায্যে আমদানী দ্বারা অভাব মোচন করা যায়। বৃষ্টির অভাবের সময় জলসেচনের ব্যবস্থা, অতিবৃষ্টি ও প্লাবনের সময় শীঘ্র জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য ও অন্য ফসল অধিকতম পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা, প্রদেশের লোকদের দ্বারা প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র অধিকার ও ক্ষেত্রের বিস্তার, এবং তাহাদের দ্বারা নানাবিধ কুটীরশিল্প ও কারখানাশিল্পের দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়—এই সকল

দিকে ফলপ্রদভাবে মনোযোগ বজে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের স্থায়ী প্রতিকার।

—

পহেলা মে দিবস

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্টারন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস পহেলা মে শ্রমিকদের ছুটির দিন স্থির করে। ঐদিন তাহাদের শোভাযাত্রা, বৃহৎ সভার অধিবেশন ও বক্তৃতা-আদি হয়। যে-সকল দেশে কলকারখানা অনেক বা কিছু কিছু স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে ট্রেড্ য়ুনিয়ন, সমাজতন্ত্রী দল, এবং শ্রমিকসংঘ সকল পহেলা মে দিবস পালন করিয়া থাকে। কেবল আমেরিকার য়ুনাইটেড্ স্টেটস ও কানাডায় শ্রমিক প্রভৃতির সভাসমিতির অধিবেশন ১লা মে হয় না, সেপ্টেম্বর মাসে হয়, এবং ঐ উভয় দেশে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ইটালীতে ১লা মে দিবসে অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের মত কোন কিছু করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। রোমনগর কিম্বদন্তী অনুসারে যে-দিন স্থাপিত হইয়াছিল, পহেলা মের পরিবর্ত্তে সেই দিনটিতে ইটালীতে নানাবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রাশিয়াতে ১লা মে সরকারী ছুটির দিন।

ভারতবর্ষেও কয়েক বৎসর হইতে ১লা মে লাল পতাকা উত্তোলন, শ্রমিকদের নানা ধ্বনি সমস্বরে উচ্চারণ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি হইয়া আসিতেছে। ইহাতে নানা স্থানে কৃষকেরাও যোগ দিতেছে।

—

মেদিনীপুরের—ও বঙ্গের—জিত!

গত বৈশাখে কোন কোন দিন ভারতবর্ষের সব শহরের মধ্যে উত্তাপে মেদিনীপুরই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হয়। যাহা হউক, অন্ততঃ একটা বিষয়েও এবং ২।১টা দিনেও বাংলা দেশ তাহা হইলে প্রধান স্থানীয় ছিল! বাংলা দেশ সব দিক্ দিয়া পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, ভারতময় যখন এই রব উঠিয়াছে, তখন দিনেকের উষ্ণতায় জিতও সান্ত্বনাদায়ক!

কয়েক বৎসর আগে রাষ্ট্রনৈতিক উত্তপ্ততায় মেদিনীপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সে উত্তপ্ততা এখন যে নাই তাহা দুঃখের বিষয় নহে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরে বা অন্য কোথাও শবের শীতলতা যে আসে নাই, তাহা আশার কথা।

—

ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের শাখা

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেবের বদান্যতায় ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগিতায় বিদ্যাসাগর বাণীভবনের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবন শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নারীশিক্ষা সমিতির একটি প্রতিষ্ঠান। ইহাতে হিন্দু বিধবাগণ সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকরী শিক্ষা পাইয়া থাকেন। হিন্দু বিধবাদের আরাধ্যতম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নাম অনুসারে ইহার নামকরণ যেমন যথাযোগ্য হইয়াছিল, যে মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার জন্ম তাহার অন্তর্গত একটি স্থানে তাহার শাখাস্থাপনও সেইরূপ সমীচীন ও শোভন হইয়াছে।

—

লিটভিনফের পদত্যাগ

রাশিয়াতে আগে সাম্রাজ্যিক আমলে ইহুদীদের উপর খুব অত্যাচার হইত। বলশেভিক সাম্যবাদী রাশিয়ায় তাহা হয় না। বরং ইহুদীরা রাশিয়ায় এখন আছে ভাল এবং তাহাদের অনেকের বেশ প্রভাব আছে। একটা প্রদেশও বিশেষ করিয়া তাহাদিগকে চাষবাসাদির জন্য দেওয়া হইয়াছে। স্টালিনের (ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান) পত্নী ইহুদী, এইরূপ শুনা যায়। রাশিয়ার যে পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনফ সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ইহুদী এবং তাঁহার স্ত্রী ইংরেজ। পুঁজিবাদের প্রধান বিরোধী এবং শ্রমিক-তন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তক কার্ল মার্কসের মত অনুসারে রাশিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। এই মার্কস ইহুদী ছিলেন। রাশিয়ায় ইহুদীদের অবস্থা ও মর্য্যাদা যেরূপ জার্মেনীতে তাহার ঠিক্ বিপরীত। তদ্ভিন্ন, রাশিয়া গণতন্ত্র বলিয়া বিদিত, জার্মেনী তাহার বিপরীত। অথচ জাগতিক রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা বা বিরোধ হইতে পারেই নাই যখন বলা

যায় না, তখন এ-কথাটা অবিশ্বাস্য নহে, যে, জার্মেনী ও রাশিয়ার মধ্যে কোন এক রকম সন্ধি হইয়া যাইতে পারে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দুটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং রাশিয়া যেমন বহু যুগ ধরিয়া ব্রিটেনের আতঙ্কের কারণ ছিল এবং এখনও আছে, জার্মেনীও সেইরূপ এখন বহু বৎসর হইতে ব্রিটেনের ভয়ের কারণ হইয়া আছে। ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার বন্ধুত্ব হইলে ব্রিটেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, কিন্তু সন্ধি এখনও হয় নাই। এদিকে কথা রটিয়াছে, জার্মেনীতে রাশিয়ায় মিতালীর বন্দোবস্ত ভিতরে ভিতরে হইতেছে। কথাটা পাকা হইয়া গেলে জার্মেনীর মত রাশিয়াতেও ইহুদীদের দুর্গতি হইবে। লিটভিনফের পদত্যাগ (অথবা পদচ্যুতি ?) তাহারই নাকি পূর্ব্বাভাস। রাশিয়া জার্মেনী ইটালী জাপান একজোট হইলে এশিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপ ভাগ করিয়া লইবে, এবং রাশিয়ার ভাগে পড়িবে ভারতবর্ষ। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তটা বোধ হয় এইরূপ।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

ব্রিটেন যদি কোন দেশকে নিজের অধীন করিবার জন্য বা নিজের অধীন স্বাধীনতালিপ্সু কোন দেশকে অধীন রাখিবার জন্য যুদ্ধ করে, তাহাতে ভারতবর্ষের যোগ দেওয়া বা জড়িত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। কিন্তু অন্য যে-কোন রকম যুদ্ধেই ব্রিটেন প্রবৃত্ত হউক, তাহাও কদর্থে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ, আমরা এরূপ মনে করি না। যদি ব্রিটেন আবিসীনিয়া, চীন, অষ্ট্রিয়া, স্পেন বা চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে ইটালী, জাপান, জার্মেনী, বা জেনার‍্যাল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে তাহা কদর্থে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ হইত না। এরূপ যুদ্ধ না-করায় কংগ্রেস-নেতারা ব্রিটেনকে দোষ দিয়াছিলেন। এখন যদি ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ করে, তাহা কদর্থে সাম্রাজ্যিক হইবে না। অতএব ব্রিটেনের যুদ্ধ মাত্রই কদর্থে সাম্রাজ্যিক, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। অবশ্য যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় অহিংসাবাদী, তাঁহারা সব রকম যুদ্ধেরই বিরোধী। সে প্রকার যুদ্ধবিরোধিতার কথা এখন হইতেছে না।

ব্রিটেন যদি কোন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, বা কোন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করে, তাহা হইলেও তাহাতে যোগ দিবার বা না-দিবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে ও সেই অধিকার ব্রিটেন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়া উচিত।

অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দেয় নাই ও দিতেছে না, অতএব অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সে যোগ দিতে পারে না। আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, ব্রিটেন নিজের গরজে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির বা স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত, কিংবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্ব্বল করিবার নিমিত্ত, এরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে—যদিও অবশ্য খাঁটি স্বাধীনতা-প্রিয়তাবশতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। খাঁটি স্বাধীনতা-প্রিয়তা ব্রিটেনের থাকিলে সে ভারতবর্ষকেই ত স্বাধীন হইতে দিত।

ব্রিটেনের দুর্বলতা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে ও থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে প্রধানতঃ নিজের শক্তির বলে, শুধু ব্রিটেনের দুর্বলতার সুযোগে নহে। দুর্বলতা সবলতা আপেক্ষিক কথা। ব্রিটেন যদি এখন দুর্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অন্য কোন কোন দেশের তুলনায়। ভারতবর্ষের তুলনায় ব্রিটেন এখনও সবল ও প্রবল আছে। ইহা অবশ্য অচিন্তনীয় নহে যে, ব্রিটেন এতটা দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে যে, আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে নিজের সৈন্যবল ইয়োরোপে লইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু শুধু সেরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কারণ হইবে না। সেরূপ অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষ এরূপ শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে যে, ব্রিটেনের যে প্রবল শত্রু ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবে সে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়া পদানত করিতে পারিবে না, তবেই ভারতবর্ষের রক্ষা, নতুবা নহে। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপ ও এশিয়ায় ইংরেজের অ-মিত্র এমন কোন দেশ

নাই যাহা ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে বা থাকিতে সাহায্য করিবে। ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার ইচ্ছাই সকলের প্রবল। আমেরিকা স্বাধীনতাপ্রিয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সাহায্য করিবে না।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে ও থাকিতে হইবে নিজের বলে। সে শক্তি অর্জন, সঞ্চয় ও রক্ষা কি প্রকারে করা যায়, তাহা অতি বৃহৎ ও কঠিন প্রশ্ন।

—

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার নিমিত্ত লক্ষ টাকার ফণ্ড

সুভাষবাবু কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ উপলক্ষ্যে যেরূপ দৃঢ়তা, শান্তচিত্ততা ও আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে অনেক স্থানে অভিনন্দিত হইতেছেন। ইহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। কলিকাতায় অভিনন্দন উপলক্ষ্যে স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা চালাইতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হাতে এক লক্ষ টাকার একটি ফণ্ড দিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং তাহা সংগ্রহের নিমিত্ত কমীটিও গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি খুবই ভাল। আশা করি, প্রস্তাবটি মুখের কথায় ও খবরের কাগজের পাতাতেই থাকিবে না। কংগ্রেসের আফিস লাইব্রেরী হল প্রভৃতির জন্য যে টাকা তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটি জমি দিয়াছিলেন এবং সুভাষবাবুর নাম অনুসারে যাহার নাম রাখিবার কথা হইয়াছিল, তাহা কাজে কত দূর হইল? অনেকগুলা কাজ হাতে লইয়া কোনটাই শেষ না-করা অপেক্ষা এক একটা-কাজ হাতে লইয়া শেষ করিয়া ফেলা ভাল।

—

মাধবদীতে বয়ন-শিল্পে প্রশংসনীয় উদ্যম

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

ঢাকা জেলার মাধবদী হাট শতাধিক বৎসরের বিখ্যাত। তথায় স্বদেশী যুগে ঐ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা হয়। এই জন্য তথাকার হাট কাপড়ের বাজার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তৎকালীন নেতাগণ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে স্বদেশীর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যান, তাহা আজও তেমনি আছে। কোন দিনই তাহা কমে নাই। গত বৎসরও তথাকার অধিবাসীগণ বহু টাকার বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ২০ হাজার তাঁত চলে, তাহাতে ৬০ হাজার লোকের আহারের সংস্থান হইতেছে। প্রায় এক লক্ষ পরিবার এই শিল্পে কোন না কোন রকমে লিপ্ত আছে। কুটিরশিল্প বলিয়া এই কারবারে ধর্ম্মঘটাদি নাই।

এই কুটিরশিল্প এরূপ বৃহৎ যে বাঙ্গালার যে কোন পাঁচ ছয়টি কাপড়ের কলের সমান। কিন্তু ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা নাই। এত বড় কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত উহা সংগঠিত নহে কিম্বা সেরূপ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য মাধবদী গ্রামের উক্ত যুবক জমিদার সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সকল তাঁত হাতে না চালাইয়া বিদ্যুৎ সাহায্যে চালাইবার জন্য ও তাহার কুটিরশিল্পত্ব নষ্ট না করিয়া উত্তম ব্যবস্থায় চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বস্ত্রবয়ন-কার্য্যের সুবিধার জন্য সাইজিং, কলারিং ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য যন্ত্র ক্রয় করা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় এক মাধবদী গ্রামের তাঁতীদের সুবিধা হইবে।

আমরা আশা কার সকল জেলাতেই এই প্রকার কুটির-শিল্প স্থাপন করিয়া তাঁতীদের উন্নতি করিবার জন্য জনসাধারণ চেষ্টা করিবেন ও দেশকে ধর্ম্মঘট হইতে রক্ষা করিবেন।

বাংলা দেশে বড় বড কাপড়ের কলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে-সকল গ্রামে ও ছোট শহরে অনেক ঘর তাঁতীর বাস ও অনেক তাঁত চলে বা চলিতে পারে, সেখানে সমবেত চেষ্টা দ্বারা বা কোন ধনীর উদ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাঁতগুলি চালাইলে তাঁতীদের অন্ন হয় এবং তাঁহারা মূল্যে কলের কাপড়ের সঙ্গে অনেকটা প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ধর্ম্মঘট নিবারিত ত হয়ই; তদ্ভিন্ন, বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা না-করিলে বড় কারখানার সহিত যে-সব নৈতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব হয়, ইহাতে সে-সমস্তও নিবারিত হয়।

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কতকগুলি তাঁত বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। অন্যত্রও তাহা হইতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহি এবং বিদ্যালয়পাঠ্য বহি কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ও বহু টীকাটিপ্পনী-সম্বলিত একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চান, সেই প্রকার জিজ্ঞাসু লোকদের

নিমিত্ত "ইস্ত্রীয় ধর্ম্ম" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাসী ও বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদিগের নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত হন "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক গ্রন্থ রচনা দ্বারা। এই গ্রন্থে অল্পসংখ্যক খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙালীর এবং বহুসংখ্যক অজ্ঞাতনামা প্রবাসী বাঙালীর জীবনচরিত ও তাঁহাদের কৃত জনহিতকর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বহি লিখিয়াছেন, খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, খবরের কাগজ সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সকল কাজের বৃত্তান্তও তিনি দিয়াছেন। যাঁহাদের ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের ছবিও এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থের উৎপত্তি আমাদের এখনও মনে আছে। আমরা যখন এলাহাবাদে চাকরী করিতে যাই, তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। তখন তাঁহার বয়স ২৩।২৪ হইবে। তিনি গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টভাষী সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তখন পুলিস ইন্সপেক্টর জেনার্‍্যালের আফিসে কাজ করিতেন। সেই সময়ে কিংবা তাহার কিছু পরে পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনার্‍্যালের গোপনীয় পত্র ব্যবহারাদির ভারপ্রাপ্ত কেরানী (confidential clerk) ছিলেন। ইহা তাঁহার কাজ ছিল বলিয়া তাঁহাকে ইন্সপেক্টর জেনার্‍্যালের সঙ্গে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সকল জেলায় সফর করিতে হইত। ঐ সকল জেলার নানা স্থানে যে-সকল বাঙালী তখন কাজ করিতেন বা আগে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক তথ্য জানা ছিল। কতক তাঁহার মুখে, কতক এলাহাবাদের অন্য কোন কোন বাঙালীর মুখে প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে যাহা শুনি তাহাতে আমার এই ধারণা হয় যে, বঙ্গের বাহিরে অপ্রসিদ্ধ বাঙালীরাও শুধু কেবল টাকা রোজগার ও দিন গুজরান করেন নাই, এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহাতে তত্রত্য বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয় এবং সামাজিক সংহতি বাড়ে

ঠিক্ মনে নাই, কিন্তু বোধ হয় ঐ ধারণার বশে প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতম ৪টি প্রবন্ধের নিমিত্ত ৪টি স্বর্ণপদক পুরস্কার ঘোষণা করি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি এই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার লেখাটি প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রবাসীতে বঙ্গের বাহিরের অনেক বাঙালীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত এবং অন্য বহু বৃত্তান্ত, যাহা প্রবাসীতে বা অন্য কোন কাগজে কখন বাহির হয় নাই, "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গের বাহিরে যে অনেক বাঙালী থাকেন, তাহা যে বাংলা দেশের বাঙালীরা জানিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদের সেকালে কতকটা এইরূপ ধারণা ছিল, যে, প্রবাসী এই বাঙালীরা অনেকটা "ছাতুখোর" "মেড়ুআ" শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর একটি প্রধান কীর্ত্তি এই যে, তিনি বঙ্গের বাঙালীদিগকে প্রথম জানান বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা এরূপ আত্মীয় কুটুম্ব যাঁহাদিগকে নিজের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই—অনেক স্থলে বিশেষ গৌরব বোধ করিবার কারণ আছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যেও জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় আত্মসম্মানবোধ নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

তিনি যে কেবল আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালীদের সম্বন্ধেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা নহে; ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের, সিংহলের ও ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দেশের বাঙালীদের খবরও তিনি সংকলন করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন। তিনি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে এই সকল উপকরণের সাহায্যে "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" পুস্তকের নূতন সংস্করণ বা নূতন খণ্ড বাহির হইত। কিন্তু তিনি ইহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমার এলাহাবাদ প্রবাসের তের বৎসরের জীবনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জীবনের কিছু কিছু সংস্পর্শ ছিল—ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শও ছিল। তাহা এখানে বর্ণনীয় নহে

সে কারণে নহে, কিন্তু সার্বজনিক (public) কারণে, আমি এখনও এলাহাবাদে থাকিলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের স্মৃতিসভার উদ্যোগ করিতাম। তথাকার

পুস্তকালয়, পাঠাগার, সাহিত্যসভা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার খুব যোগ ছিল।

আগে বলিয়াছি, তিনি পুলিস ইন্সপেক্টর জেনার‍্যালের কনফিডেন্‌শ্যাল কেরানী ছিলেন। এই সূত্রে তিনি গবন্মে‍ণ্টের অতি গোপনীয় অনেক ব্যাপার জানিতে পারিতেন। সেই সমস্ত তাঁহার একাধিক ডায়েরী বা অন্য খাতায় টুকা ছিল। তাঁহার পিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। তাহা হইতে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি এলাহাবাদে পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পিতার নিবাস এলাহাবাদে ছিল না, ছিল বাংলা দেশে। জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর জন্ম হয় কলিকাতায়। তাঁহার পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি যখন অবগত হইলেন যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন গবর্ন্মেণ্টের বহু অতি গোপনীয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইল পুত্র হয়ত পরে এগুলি প্রকাশ করিতে পারে। এই সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুত্রকে বলেন, গবর্ন্মেণ্ট তোমাকে সরকারী কাজ করিবার জন্য বেতন দিয়া থাকেন; সেই উপলক্ষ্যে তুমি যাহা জানিতে পারিয়াছ তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ত সরকার তোমাকে বেতন দেন না এবং সে-সব কথা জানিবার সুযোগ দেন নাই; অতএব তোমার ঐ সব জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। পিতার কথা অনুসারে জ্ঞানবাবু সেগুলি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি অল্প বয়সেই পেন্সান গ্রহণ করেন। বোধ হয় তখনই ডায়াবেটিসের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং তাহাতেই ৬৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। পেন্সান লইবার পর তিনি অনেক বহি লেখেন। চিন্তামণিবাবু তাহার অধিকাংশ প্রকাশ করেন।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থের কথা আগে লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাংলা-শিক্ষার্থী সমাজে, শিক্ষিত সমাজে, বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট পরিচিত থাকিবেন তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" দ্বারা। এ-পর্য্যন্ত বাংলা বর্ণমালার শেষ বর্ণের শেষ শব্দ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ এই অভিধানটি। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিশেষত্বগুলির-পরিচয় দিয়াছিলাম। বাংলা ভাষার ও এই অভিধানের শব্দসমৃদ্ধি ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই অভিধানে প্রায় এক লক্ষ পনর হাজার শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী শব্দসাগরে ১,০২,৫৭৫টি শব্দের অর্থ আছে। ইয়োরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় অনেক ভাষার এক একটি অভিধান পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। জ্ঞানবাবুর অভিধানটি তাঁহার একার কৃতি বলিলে অন্যায় হয় না। তাহার প্রুফও তিনি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছিলেন। চিন্তামণিবাবু ও তাঁহার ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশক না হইলে এত বড় গ্রন্থের দুই সংস্করণ বাহির হইতে পারিত না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়ে ও পরে তিনি অসুস্থ ও দুর্ব্বল ছিলেন। বুঝিয়াছিলেন তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিতে তিনি বাঁচিবেন না। কিন্তু অবিরাম অক্লান্তভাবে শব্দ সংগ্রহ করিতেছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে অভিধানের অন্ততঃ একটি পরিশিষ্ট বাহির করিয়া যাইবেন এই উদ্দেশ্যে। অভিধানখানি ন্যূনকল্পে তাঁহার ২০ বৎসর পরিশ্রমের ফল। এরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী মানুষ বিরল।

এই রকম একটি মানুষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার বাহাদুরের কথা অ-কথ্য) কেন "সম্মানিত" করেন নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি। হয়ত তাঁহার চরিত্রের কোন কোন সদ্‌গুণই তাঁহাকে "সম্মানে" বঞ্চিত রাখিয়াছিল।

—

বাংলা ছড়া ও নারীনিগ্রহের প্রাচীনতা

রবীন্দ্রনাথের "আকাশপ্রদীপ" গ্রন্থে ও তাহার পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।"
সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিটা তার ফিকে।

মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করল মেয়ে
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্ত্তমানে।

যে রকম খবরের টানে সেই মরা দিন "সজীব" বর্ত্তমানে এসে পড়ে, কবি তার একটা নমুনা এই কবিতাতেই দিয়াছেন :—

বিকেল বেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টনটনানি,
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
—কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে,—
ঝুড়ি ভরে মুড়ি আন্ত, আন্ত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আন্ত কাঁচা মিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার আনিটা।
ঐ যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি,—
ক'দিন হোলো জানিনে কোন্ গোঁয়ার খুনী
সমথ তার নাৎনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবন তার দ'লে গেছে জীবন গেছে চুকে।

বুক ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।

শাস্ত্র মানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে,—
উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ায় ছন্দে মিলে,
"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।"

"সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।"

বঙ্গে "বুক ফাটানো এমন খবর" শত শত শোনা যায়, কিন্তু সত্য সত্য "বুকে বাজে টনটনানি" কয় জনের? যাদের বা বাজে, তাঁরা শোনেন, "উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার।"

নারীনিগ্রহের প্রতিকার, নারীনিগ্রহের অন্ত কি হইবে না?

যে কবি প্রাচীন খবরের সঙ্গে নূতন খবরের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, পুরুষের পুরুষকার ও নারীর নারীত্ব যাহাতে জাগে, এমন বাণীও ত তিনি অনেক শুনাইয়াছেন। কিন্তু এখনও "সজীব বর্ত্তমানে" সচেতন হইয়াছেন অল্প লোকেই। গভীর পরিতাপের বিষয়।

রাজাজীর দড়ি ও কলসীর উপমা

মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচার্য্য কংগ্রেস মহলে রাজাজী নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তিনি কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ ফিরিয়া গিয়া সুভাষ বাবুর ইস্তফা ও রাজেন্দ্রবাবুর নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে এক বক্তৃতায় এই মর্ম্মের কথা বলেন: "আমরা একটা কূপ হইতে জল তুলিবার নিমিত্ত এক জন লোকের হাতে দড়ি ও কলসী দিয়াছিলাম। কিন্তু যখন কলসীটা কূপের অর্দ্ধেক পথে গিয়াছে, তখন ভারপ্রাপ্ত লোকটি হঠাৎ দড়ি ছাড়িয়া দেয়। যদি তৎক্ষণাৎ আর এক জন লোক দড়িটা না ধরিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আমরা জল ত পাইতামই না, দড়ি ও কলসীটাও যাইত।" উপমাটা শুনিতে বেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যবহার, তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য নাই। কংগ্রেস এমন কোন কাজে তখন ব্যাপৃত ছিল না এবং এখনও ব্যাপৃত নাই যাহাতে সুভাষ বাবুর জায়গায় রাজেন্দ্রবাবুকে তৎক্ষণাৎ না বসাইলে সর্ব্বনাশ হইত। সভাপতির কাজে ইস্তফা দেওয়ার মানে এ নয় যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর এক জন সভাপতি নির্ব্বাচিত না হইতেছেন, ততক্ষণও ইস্তফাদাতা সভাপতির কাজ করেন না বা করিতেন না। কূয়ার দড়িটা জল-উত্তোলনকারী কেহ ছাড়িয়া দিবা মাত্র সেই মুহূর্ত্তে অন্য কেহ উহা না ধরিয়া ফেলিলে দড়ি ও কলসী দুই-ই কূয়ার জলে পড়িয়া হাতছাড়া হয়। কিন্তু কোন কর্ম্মচারীর পদত্যাগ ত এরকম ব্যাপার নয়। নূতন লোক বাছাই না-হওয়া পর্য্যন্ত পুরাতন লোকটির কাজ করাই দস্তুর। অবশ্য যদি ঘটনাটা সত্যসত্যই এরূপ হইয়া থাকে যে, সুভাষ বাবুকে জল তুলিতে দড়ি ও কলসী দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি জল না তুলিয়া, জল-উত্তোলন ব্যতীত বঙ্গে সুবিদিত অন্যরূপ ব্যবহারের নিমিত্ত অন্যের জন্য দড়ি কলসী ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়।

রাজাজী ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। তিনি "It is not easy to make a simile go on all fours," "উপমান উপমেয়ের মধ্যে পূরা সাদৃশ্য রক্ষা করা সহজ নয়," সকলের এই উক্তি জানেন না কি?

—

স্বতন্ত্র মিথিলা প্রদেশের অভিলাষ

মৈথিল মহাসভার গত অধিবেশনে বিহারের অন্তর্গত মিথিলাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার প্রস্তাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি কমীটি নিযুক্ত হইয়াছে। মৈথিল মহাসভার মতে মৈথিলী একটি স্বতন্ত্র ভাষা, উহা হিন্দী নহে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বিহারের প্রধান ও সমৃদ্ধতম জমিদার। তিনি মৈথিল মহাসভার সভাপতি। সেই জন্য, বিহারের যে কাগজখানা ছোটনাগপুরকে আলাদা করিবার প্রস্তাবকে ষড়যন্ত্র (কন্সপিরেসি) বলিয়াছিল, সেটা মিথিলাকে আলাদা করার কথাকে তাহা বলিতেছে না।

—

আলাদা মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠনের কথা

নাগপুরে অনেক বিশিষ্ট লোক একটি স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র প্রদেশ গড়িবার কথা তুলিয়াছেন।

আমরা ভারতবর্ষকে আরও অধিক প্রদেশে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু একপ্রদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীরা যদি পরস্পর সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে ন্যায্য সুযোগ ও অধিকারে বঞ্চিত করিয়া দাবাইয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে আলাদা আলাদা ভাষিক প্রদেশ গঠন ভিন্ন উপায় কি?

—

মহাজাতি-সংঘে বাঙালী মহিলা

জেনিভার মহাজাতি-সংঘের (লীগ অব নেশুন্সের) সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে পরামর্শদাতা সমিতির আগামী অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্তা কিরণ বসুকে মনোনীত করা হইয়াছে। তিনি গত বৎসরও এই বিষয়ে মহাজাতি-সংঘের টেক্নিক্যাল কমীটিতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গত দেশনায়ক আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অন্যতমা পুত্রবধূ।

—

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও প্রবাসী

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় সম্বন্ধে আগে কিছু লিখিয়াছি, আরও কিছু লিখিতেছি, পরেও লেখা হইবে।

তিনি প্রবাসীতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার তালিকা এখানে দিব না। প্রবাসীর প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি চিতোরের রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রথম বৎসরের প্রবাসীতে "উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ, "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী" শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ, "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" বিষয়ে চারিটি প্রবন্ধ, এবং "বঙ্গভাষা ও বাংলা অভিধান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে বুঝা যায়, তৎকালপ্রচলিত বাংলা অভিধানগুলির দোষ ও অপূর্ণতা তিনি ১৩০৮ সালেই অর্থাৎ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বেই বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি এখনও আলোচনা ও অধ্যয়নের যোগ্য।

আমরা তাঁহার স্বর্ণপদক প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছি। পদকটা উপলক্ষ্য মাত্র, বিশেষ কিছু নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন যেরূপ দীর্ঘ, তথ্যবহুল ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় একটা স্বর্ণপদক অকিঞ্চিৎকর। ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, (ক) বিহারে বাঙালী, (খ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙালী, (গ) মধ্যভারতে বাঙালী, ও (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙালী, এই চারিটি বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চারিটি প্রবন্ধের জন্য চারিটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধগুলিতে কি কি বিষয় থাকা চাই, তাহা বিজ্ঞাপনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথা:—

"যে প্রদেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হইবে, সেন্সস্ অনুসারে তথায় বাঙালীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা, (সম্ভব হইলে) তথায় বাঙালীদের

আগমন ও বসবাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তথায় বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা, তথাকার মৃত ও জীবিত প্রসিদ্ধ বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাঙালীদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায়, বাঙালীর কার্য্যক্ষেত্র, প্রদেশের মূল অধিবাসীদিগের সহিত বাঙালীর সদ্ভাব রক্ষা ও বর্দ্ধনের উপায়, তাহাদের সাহিত্য, চরিত্র, আচার ব্যবহার প্রভৃতি হইতে বাঙালীর কি শিখিবার আছে, ইত্যাদি, প্রবন্ধে যথাসম্ভব প্রমাণ সহ লিখিতে হইবে।"

তখন আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা বলা হইত।

প্রথম বৎসরের প্রবাসীর ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়, যে, প্রবাসী পদকের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাব সম্বন্ধে দুটি, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে দুটি, ও বেহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। এই পাঁচটির মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবুর লেখাটি উৎকৃষ্ট ও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। উহা এরূপ দীর্ঘ ছিল, যে, প্রবাসীর সাতটি সংখ্যায় উহা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের সম্বন্ধে লিখিত এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে এবং জ্ঞানেন্দ্রবাবুর লেখা এতদ্বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁহার এই একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয় যে, তিনি মানুষের দোষ অপেক্ষা গুণ দেখিতেই বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে নূতন গ্রন্থ

কলিকাতা হাইকোর্ট, বাংলা সরকারের রেকর্ড আপিস, বর্দ্ধমানের রেকর্ড আপিস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত অনেক দলিল এবং রাজা রামমোহন রায়ের চিঠিপত্র সংকলন করিয়া ও তাহার সঙ্গে একটি ভূমিকা সংযোগ করিয়া একখানি বৃহৎ ইংরেজী বহি কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং ব্যারিস্টার ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার। ভূমিকাটি রমাপ্রসাদবাবু লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থটি ও ভূমিকাটি হইতে রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে।

এইরূপ আর একটি গ্রন্থ ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি তাহার জন্য কয়েক মাস নিউ দিল্লীতে থাকিয়া বিস্তর সরকারী কাগজপত্রের নকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাহা হইতে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে। গ্রন্থটি হইবে প্রধানতঃ রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে দৌত্য সম্বন্ধে। তিনি দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে যে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন ডাঃ মজুমদার তাহার আদ্যোপান্ত ইতিহাস সরকারী দপ্তরে রক্ষিত অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সম্পর্কে মোগল-সম্রাটদের শেষ আমলের কৌতূহল-উদ্দীপক ইতিবৃত্তও পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাইবে।

যে-গ্রন্থটি আগে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে। ডাঃ মজুমদার এখন যেটি প্রস্তুত করিতেছেন ও যাহা অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড। ইহা প্রকাশিত হইয়া গেলে ডাঃ মজুমদার রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন আন্দোলনের সরকারী ও অন্যান্য নথীপত্র ও ইতিহাস সমেত আর একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই ঐ সকল বিষয়ের নানা কাগজপত্র জোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় ও তাহার উপকরণ হিসাবে এইরূপ গ্রন্থসমূহ মূল্যবান্।

—

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে যাঁহারা সরকারী ও বেসরকারী হিসাবে বাঙালী মুসলমানদের নেতা বলিয়া গৃহীত হন এবং যাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক নেতা বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহারা কোন-না-কোন প্রকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা এবং সাধ্যমত তাহার পরিপুষ্টি সাধন বাঙালী মুসলমানদের কর্ত্তব্য বলিয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে নির্দেশ বা স্বীকার করেন। ইহাও তাঁহাদের কথায় ব্যক্ত হয় বা স্পষ্ট উহ্য থাকে যে, বাংলাই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা। ভারতবর্ষের মধ্যে

বঙ্গে যত মুসলমানের বাস, অন্য কোন প্রদেশে তত নহে। এই কারণে বাংলাকেই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকৃতির গুরুত্ব আছে। কারণ, অনেক অবাঙালী ও কোন কোন বাঙালী মুসলমান উর্দ্দুকে বাঙালী মুসলমানদেরও মাতৃভাষা বলিয়া চালাইতে বা বানাইতে অভিলাষী। উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। তামিল যে-সব মুসলমানের মাতৃভাষা, তাহারা যেমন উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, বাংলা যে-সকল মুসলমানের মাতৃভাষা তাঁহারাও সেইরূপ উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু মাতৃভাষা বলিয়া নহে।

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজল হক সাহেব প্রভৃতি সকলেই বঙ্গের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি যেমন প্রার্থনীয় মনে করেন, সেই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সাহিত্যিকদিগের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট বা প্রশমিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই ইচ্ছা প্রকাশ ফলপ্রসূ হইলে সুখের বিষয় হইবে।

মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনে মুসলমান মহিলা ও ভদ্র-ব্যক্তিগণ যে অভিভাষণগুলি পাঠ করিয়াছেন বা মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে লেখা না-থাকিলে **শুধু ভাষা হইতে** বুঝা যাইত না যে, সেগুলি মুসলমানদের লিখিত বা কথিত। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বাঙালীদের ও তাঁহাদের প্রতিবেশী হিন্দু বাঙালীদের ভাষা—অন্ততঃ উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের ভাষা—এক, এবং মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তকসকলে যে "মুসলমানী" বাংলা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কৃত্রিম জিনিষ। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান-সমাজে ইহার আদর নাই, তাহা সম্মেলনটির অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলির ভাষা হইতে ও তাহার অন্তর্গত কোন কোন উক্তি হইতে বুঝা যায়।

এই সম্পর্কে সম্মেলনের মূল সভাপতি সাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত আবদুল করীম মহাশয়ের অভিভাষণের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যে দিকটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ভাষাসংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে অকাজে বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত বা অল্প-প্রচলিত ফারসী বা আরবী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুলেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানীর অত্যাচারে বা সংস্কৃত ব্যাকরণের জুলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের লেখায়ও বাঙ্গালা ভাষার সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তবে আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এই জন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী—সংস্কৃত নহে। আরবী বা ফারসীর সহিত বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠববৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ।

কারণে অকারণে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন। আমার মতে এই উভয় প্রকারেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি জুলুম করা হয়। এই দুই দলের হাত হইতেই বাঙ্গালা ভাষাকে বাঁচাইতে হইবে।

হাজার হাজার এরূপ শব্দ অতীত কালের ও বর্ত্তমান কালের বাংলা বহিতে ও রচনায় আছে যাহা বাংলা বটে, সংস্কৃতও বটে। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যাহার চলন সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাংলায় নাই। বাংলা রচনায় এই রকম শব্দের আমদানী অবাঞ্ছনীয়। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা রচনায় লেখকেরা অত্যধিক পরিমাণে অনাবশ্যক ঐরূপ সংস্কৃত শব্দ চালাইতেন। ঐ প্রকার আচরণের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের তিরস্কার বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া, হিন্দুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণকেই বাংলা ব্যাকরণ মনে না-করিয়া খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হিন্দু বাঙালীরা রামমোহন রায়ের সময় হইতে মন দিয়া আসিতেছেন, এবং অনেক হিন্দু আভিধানিক ছোট ও বড় বাংলা অভিধান হইতে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়াছেন। ফলে, দেখা যাইতেছে, এখন এমন প্রসিদ্ধ বা কতকটা প্রসিদ্ধ হিন্দু বাঙালী লেখক নাই বা খুব কম আছেন যাঁহাদের লেখা সংস্কৃত-শব্দবহুল বা অকারণ সংস্কৃতশব্দবহুল। যাঁহারা বর্ত্তমানে অকারণে তাঁহাদের রচনায় অপ্রচলিত

সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিতেছেন,—যদি এরূপ সাহিত্যিক থাকেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইলে বুঝা যাইত তাঁহারা কে। সংস্কৃত দর্শন বা শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অনুবাদে বা আলোচনায় এরূপ শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, সেগুলি তাহা নহে।

বাংলা ভাষার জননী প্রাকৃত হইলেও, সংস্কৃতের সহিত যে বাংলার নিকট সম্পর্ক আছে এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত যে পরস্পরের সহিত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। একই ভূখণ্ডে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলার জন্ম; তাহারা একই ভাষাবংশে জাত। আরবীর সহিত বাংলার বা প্রাকৃতের ভাষিক কোন সম্পর্ক নাই। আরবীর জন্ম আলাদা ভূখণ্ডে পৃথক্ ভাষিক বংশে। আরবী হিব্রু প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত লাটিন গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ অন্য একটি শ্রেণীর ভাষা। এই জন্য ইহা স্বীকার্য্য নহে যে, আরবীর সহিত বাংলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও বাংলায় আমদানী করিলে তাহা বাংলার সহিত যেমন খাপ খায়, অপ্রচলিত আরবী শব্দ আমদানী করিলে তেমন খাপ খায় না। সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় আরবী ও ফারসীকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই দুটি ভাষা ভিন্নজাতীয়। যে-সকল আরবী বা অন্য বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, আমরা সেগুলি রাখার পক্ষপাতী, কিন্তু নূতন আরবী শব্দ আনার বিরোধী।

আমরা অকারণে বাংলায় সংস্কৃত শব্দের আমদানীর বিরোধী। কিন্তু ন্যায্য ও সঙ্গত "কারণে", অর্থাৎ যদি বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি পারিভাষিক নূতন শব্দের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে চাই। ইহাকে আমরা জুলুম মনে করি না, করিব না। বাংলা ভাষা সম্পর্কে সংস্কৃত ও আরবীকে একই শ্রেণী বা পর্য্যায়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহা ভাষাবিজ্ঞানসম্মতও নহে।

বঙ্গে ঝড়বৃষ্টিতে বিপৎপাত

এ-বৎসর বৈশাখ মাসে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহার পর শেষের দিকে ঝড়ে নৌকাডুবি ও অন্যবিধ দুর্ঘটনায় অনেক প্রাণহানি ও সম্পত্তিনাশ ঘটিয়াছে। বৃষ্টিতে যদিও উপকার হইয়াছে, তথাপি বিপন্ন লোকদিগের দুঃখে আমরা ব্যথিত।

—

বিষ্ণুপুরে সুতা ও কাপড়ের কারখানা

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে একটি সুতা ও কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোম্পানী রেজিষ্টরী হইয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার অনেক জমি উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের উপযোগী। কাপড়ের কলের উদ্যোক্তারা তুলা উৎপাদনের চেষ্টাও করিবেন।

—

চিনির মূল্য বৃদ্ধি

বিদেশী চিনি যদি দেশে অবাধে আসিতে পারিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে যে দেড় শতের উপর চিনির কল হইয়াছে ও অনেক কোটি টাকা ভারতীয় মূলধন যে তাহাতে খাটিতেছে এবং বহুসংখ্যক চাষী, শ্রমিক, ও শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের যে এই শিল্পদ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে অন্নসংস্থান হইতেছে, তাহা হইতে পারিত না। সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগে বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসানতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি দেশের লোকদের চেষ্টায় প্রভাবে ও সমর্থনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের ন্যায্য স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে চটাইলে দেশী ধনিকরা বেশী দিন লাভ করিতে পারিবেন না। দেশের লোকেরা দেশের টাকা দেশে রাখিবার নিমিত্ত কিছু দিন বেশী দামে চিনি কিনিতে রাজী ছিল। কিন্তু তাহাদের স্বদেশপ্রীতির সুযোগ লইয়া চিনির কারখানার মালিকরা নানা ফন্দী দ্বারা চিনির দাম খুব বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ইহাতে বাংলা দেশেরই অসুবিধা বেশী হইয়াছে। সব প্রদেশের চেয়ে ইহার লোকসংখ্যা অধিক, ইহার চিনির

ক্রেতা সংখ্যায় অধিক। কিন্তু চিনির কল বঙ্গে মোটে ৭।৮টি আছে। তাহার মধ্যে বাঙালীদের মোটে তিনটি। সুতরাং বাঙালীরা বেশী দাম দিয়া যত চিনি কেনে তাহার খুব সামান্য অংশই বাঙালীরা উৎপন্ন করে। দামটা অতি সামান্য অংশ বাঙালীরা পায়। এটা অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীদের অনগ্রসরতার ফল।

যথেষ্ট পরিমাণে গুড় চিনি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক। বাঙালী দারিদ্র্যবশতঃ তাহা খাইতে পায় না। বোম্বাই প্রদেশে লোকে জনপিছু গড়ে বৎসরে সাড়ে সাত সের চিনি খায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবে গড়ে সাত সের; বঙ্গে কিন্তু গড়ে তিন সের।

বাংলা দেশ যে কত দিকে দুঃখ ভোগ করিতেছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, বলা যায় না। কিন্তু তাহার জন্য অন্যকে দোষ না দিয়া আমাদিগকেই সকল দিকে অধিক উদ্যোগী হইতে হইবে।

—

ইয়োরোপের অবস্থা

মধ্য-ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এখন এরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যে, দৈনিক কাগজের জন্য রাত্রে তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া ও ছাপিয়া পরদিন প্রাতে প্রকাশের সময় অনেক স্থলে দেখা যায় অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। দৈনিক কাগজের প্রবন্ধ ও নিবন্ধিকার দশা যখন এই প্রকার, তখন মাসিক কাগজে একেবারে টাট্‌কা ও হাল-নাগাদ সত্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক কোন সংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের চেষ্টা না করাই ভাল।

ইংলণ্ডে নির্দ্দিষ্ট বয়সের পুরুষদিগকে সৈনিকের কাজ করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আইন পাস হইয়াছে, ইহা একটি কিঞ্চিৎ বাসী খবর। শ্রমিক দলের লোকেরা ইহাতে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, প্রধান মন্ত্রী কিছু দিন আগে কথা দিয়াছিলেন শান্তির সময়ে এরূপ আইন করা হইবে না। প্রধান মন্ত্রী জবাব দেন, ইয়োরোপে এখন শান্তি বিরাজিত ইহা ঠিক্ বলা চলে না। এই কথা-কাটাকাটির মূল্য যাহাই হউক, নূতন আইনটার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যুদ্ধ হয়ত আরও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মেনীর বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইতেও পারে। হইলে, ব্রিটেন কি পোল্যাণ্ডের পক্ষে লড়িবেন? কে জানে?

সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেনের মিতালী সম্বন্ধে ব্রিটেন এখনও (১০ই মের খবর) দর-কষাকষি করিতেছে।

সুইডেন ও নরওয়ে জার্ম্মেনীকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট হের হিটলারের কাছে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন যে, তিনি আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলি আক্রমণ করিবেন না। হিটলার তাহার একটা লম্বা জবাব দিয়াছেন। জবাবে অনেক রকমের কথা আছে, কিন্তু কোন রকম প্রতিশ্রুতি নাই।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধের যে অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে চীন অধিকাংশ স্থলে সাফল্য লাভ করিতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়।

—

প্যালেস্টাইন

প্যালেস্টাইন সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। আরব নৃপতিরা প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটেনকে প্রস্তাব ও খসড়া পাঠাইয়াছেন।

—

"দেশে বিদেশে"

বয়স্ক লোকেরা লিখিতে পড়িতে শিখিবার পর তাহাদের মনোমত পড়িবার জিনিষ না পাইলে তাহাদের আবার নিরক্ষর হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বহি অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি তাহাদের জন্য লিখিত নহে, এবং তাহারা যাহা জানিতে চায় এমন বিষয়ে সোজা ভাষায় লেখা বহি নাই বা কমই আছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে বিদেশে কি ঘটিতেছে, তাহা জানিতে এই সব সদ্য পঠন-ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের (এবং নিরক্ষর লোকদেরও) খুব কৌতূহল হয়। বাংলা খবরের কাগজ আছে বটে, কিন্তু সেগুলির ভাষা যথেষ্ট সোজা নয় এবং বড় বড় কাগজ

পড়িবার মত অবসরও পল্লীগ্রামের চাষী ও মজুরদের নাই। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশ্বভারতী স্কুলের শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন ও সংস্কার বিভাগ হইতে, "দেশে বিদেশে" নাম দিয়া বড় অক্ষরে পুরু কাগজে ছাপিয়া একটি পাক্ষিক কাগজ বাহির করিতেছেন। দাম এক পয়সা, বার্ষিক বার আনা। ইহাতে সংবাদ ছাড়া কৃষি স্বাস্থ্য কুটীর-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধও থাকে। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদক। এই কাগজটির সাফল্য কামনা করিতেছি।

—

১৮৫৭ সালের শহীদ দিবস

হিন্দু মহাসভার সভাপতির নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২৬শে বৈশাখ ১০ই মে ভারতবর্ষের নানা স্থানে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী-যুদ্ধে যাঁহারা নিহত হন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতাতেও হইয়াছিল।

এই যুদ্ধকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ম্যুটিনি অর্থাৎ সৈনিকদের দ্বারা বিদ্রোহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঠিক উৎপত্তি ও আরম্ভের সময় ইহা তাহা থাকিলেও পরে যাঁহারা এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশকে বিদেশীর পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুখ্যাতিমতী ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। যাঁহারা এই যুদ্ধে হত হন, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন শহীদ দিবসের উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে হিন্দু মুসলমান উভয়েই যোগ দিয়াছিল। সুতরাং শহীদ দিবসে উভয়েই যোগ দিতে পারেন। সশস্ত্র যুদ্ধ এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার উপায় বলিয়া নেতারা অনুমোদন করেন না, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণদানের মূল্য তাঁহারা বুঝেন।

—

লালা হরদয়াল দিবস

ঐদিন লালা হরদয়ালের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতাকামী ছিলেন এবং তাহার জন্য চেষ্টা ও দুঃখভোগ করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগের "গদর পার্টি"র (বিদ্রোহী দলের) অন্যতম নেতা ছিলেন। সশস্ত্র যুদ্ধ এই দলের লক্ষ্য ছিল। লালা হরদয়াল পরে এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করিলেও তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে "দি সোশ্যাল কংকোএস্ট অব্ দি হিন্দু রেস" ("হিন্দু জাতির সামাজিক পরাভব") শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তখন এই প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেকের টনক নড়িয়াছিল। এই প্রবন্ধটি মডার্ণ রিভিয়ুর বর্ত্তমান মে সংখ্যায় লালা হরদয়ালের স্মারক রূপে ও তাঁহার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক বলিয়া পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি—যদিও ইহার সব কথার সহিত আমরা একমত নহি। প্রবাসীর ইংরেজী-জানা পাঠকেরা ইহা পড়িলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন। এই প্রবন্ধটি হইতে কতকগুলি বাক্য নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। হরদয়াল বলিতেছেন :—

The requisites for the success of the Social Conquest

(1) The control of almost all the social activities of the subject race by the rulers, especially of such as are essential for social welfare and therefore confer special prestige on those who guide them.

(2) A common platform on which the rulers and the ruled may meet on terms of *in-equality*.

(3) The existence of a class of persons among the subject peoples who should come forward to meet the rulers on this platform.

These three things having been once secured, the ruling race is fairly on the way to success in its enterprise.

এই উপায়গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি অতঃপর বলিতেছেন :—

How does the social conquest of the Hindus by the British people proceed? Are the three factors of success present in this case?

(*a*) The *control* of all *activities*.—Schools and Colleges for general knowledge, Medical Colleges, Law Colleges, Hospitals, Post Offices, Pipes for water, etc., etc.

(*b*) *A common platform for social intercourse on terms of inequality.*—Legislative Councils, Schools and Colleges, Durbars, Courts, Municipalities, District Boards, Occasional Public Meetings, etc., etc.

(c) *A class of men ready to avail themselves of social intercourse, on terms of inequality.*—The landed gentry, the "English-educated" classes, etc., etc.

So the framework is complete. Let us examine how the machine works.

যন্ত্রটার কাজ কি প্রকারে চালান হয় এবং তাহা কেমন চলিতেছে ইহার পর তিনি তাহা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির যে আংশিক স্বাধীনতা আছে তাহা নষ্ট করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে হিন্দুদের ও বাঙালী স্বাজাতিক মুসলমানদের যে ন্যায্য প্রভাব আছে তাহার উচ্ছেদসাধনার্থ যে বিল রচিত হইয়াছে, তাহা ভোটের জোরে পাস হইয়া গিয়াছে। এখন কংগ্রেস, স্বাজাতিক মুসলমানেরা, এবং বঙ্গের হিন্দুসভাগুলি কি করিবেন, তাহা তাঁহারা স্থির করুন।

—

নূতন ইন্‌কম্‌ট্যাক্স

যাঁহারা ইন্‌কম্ ট্যাক্স দেন, তাঁহাদের উপর তাঁহাদের আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে বার্ষিক ত্রিশ টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিবে। বঙ্গের মন্ত্রীরা আগেকার চেয়ে কয়েক কোটি টাকা হাতে পাইয়াও বঙ্গদেশের একটা কোন কষ্টও দূর করিতে পারেন নাই—যেমন ধরুন জলকষ্ট; শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা না-ই বলিলাম। অথচ তাঁহারা আরও টাকা চান।

সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রুর মত আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, এই রকম আইন অবৈধ, এবং আগ্রা-অযোধ্যায় এইরূপ যে আইন হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত লড়িবেন।

দেশী রাজ্যসমূহে উপদ্রব

ভারতশাসন-আইনের প্রথম তপসিলে দেশী রাজ্যগুলিকে সতরটি ডিবিজনে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হায়দরাবাদ, মহীশূর ও কাশ্মীরে উপদ্রব হইয়াছে। চতুর্থ গোয়ালিয়রে হয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয় উহার যুবক মহারাজার প্রজাদের আর্থিক ও অন্যবিধ উন্নতির চেষ্টা ও তদর্থে এক কোটি টাকা দান। নবম ভাগে ত্রিবাঙ্কুড়ে উপদ্রব হইয়াছে, কোচিনে হয় নাই। কোচিনে কতকটা দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্ট প্রবর্ত্তন বোধ হয় ইহার কারণ। রাজপুতানার ষোলটি রাজ্য দশম ডিবিজনের অন্তর্গত। তাহার মধ্যে জয়পুর ও সিরোহীতে উপদ্রব হইয়াছে। উড়িষ্যার রাজ্যগুলি ষোড়শ ডিবিজনের মধ্যে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ও প্রগতিশীল ময়ূরভঞ্জে কোন উপদ্রব হয় নাই। প্রজাদিগকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন দান বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ। ক্ষুদ্রতর ঢেন্‌কানাল, তালচের, গাংপুর উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত হইয়াছে। যে রণপুরে উপদ্রবের পরিণামে মেজর বাজালগেট নিহত হন, তাহা এত ছোট যে তপসিলে তাহার নাম পর্য্যন্ত নাই।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ত্রিবিধ ভাতা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা একুশ মাসে রাহাখরচ, গাড়ীভাড়া, ও দৈনিক ভাতা বাবদে মোট ৪১৯৭৪৬৷৷৹ লইয়াছেন। তিন জন কিছু লন নাই। এক জন মৃত ও কয়েক জন ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া মোটামুটি ২৩৪ জনে এই টাকা লইয়াছেন। মাথাপিছু পড়ে মাসিক ৮৫ টাকা। কেহ কেহ খুব কম লইয়াছেন। দুই তিন চারি হাজার লইয়াছেন অনেকে। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কৌতূহল হয় ইঁহারা বেতনভোগী চাকর্যে হইলে কত পাইতেন।

উড়িষ্যার অতিথি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

পুরীতে এসেছি, সে খবর পূর্বেই পেয়েছ। উড়িষ্যার যাঁরা নতুন রাষ্ট্রনায়ক আমি তাঁদের নিমন্ত্রিত অতিথি। ব্যাপারটার মধ্যে নূতনত্ব আছে।

সেকালে যাঁরা রাজা বা রাষ্ট্রাধ্যক্ষ ছিলেন গুণীদের সমাদরের দ্বারা তাঁরা নিজের দেশকে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমাদৃত করতেন, এই দাক্ষিণ্যে সমস্ত মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা যোগ রক্ষা করতেন, স্বীকার করতেন মানব-চিত্তোৎকর্ষের সর্বজনীন উত্তরাধিকার

আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবহার। এই ব্যবহারের মধ্যে গুণীদের কোনো স্থান নেই। অর্থনীতি দণ্ডনীতির পরিধিতে যে শক্তির প্রতিষ্ঠা শক্তির সেই বাহ্য রূপটাকেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা চালনা ক'রে থাকেন। তার গভীরে আছে যে চিৎশক্তি তাকে চালনা করবার অধিকার রাষ্ট্রকর্তাদের থাকতে পারে না কিন্তু তাকে স্বীকার ক'রে সম্মান ক'রে রাষ্ট্রমঞ্চকে মহৎ পরিবেষ্টনী দিতে পারে। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক কিন্তু এইটেই লক্ষ্যের বিষয় যে প্রাচ্য রাষ্ট্র-ব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নি।

পারস্যে তুমি আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলে। সেখানকার রাজা বহুব্যয়ে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি আতিথ্য পেয়েছিলুম সমস্ত পারস্য দেশের, সে কথা তুমি জানো। কেবল রাজা নন রাষ্ট্রপারিষদেরাও সকলেই অভ্যর্থনার কাজে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন। আমি ছিলেম বিদেশী, আমার রচনার সঙ্গে পারস্যের পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ; আমার খ্যাতিকে পারসিকেরা কেবল বিশ্বাস ক'রে নিয়েছিলেন মাত্র। সেই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর ক'রে তাঁরা আমাকে যে-সম্মান দিয়েছিলেন, সে-সম্মান সেই মানবচিত্তের উদ্দেশে যে-চিত্ত দেশকালের আশু প্রয়োজনসীমা অতিক্রম ক'রে বিরাট্ ইতিহাসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি প্রথম যখন ইজিপ্টে গিয়ে পৌঁছলুম তখন কায়রোতে পার্লামেণ্ট অধিবেশনের কাজ চলছিল। সেই কাজের মাঝখানে অবকাশ দিয়ে সেখানকার সদস্যেরা এসেছিলেন আমার প্রত্যুদ্‌গমনে। জাপান য়ুরোপের একনিষ্ঠ চেলা। সেখানে যখন গিয়েছিলেম জনসাধারণ প্রভূত উৎসাহে আমাকে সম্মান দেখিয়েছিল। কিন্তু মিকাডোর তো কথাই নেই এক জনও রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আমার এক দিনেরও সংস্রব ঘটে নি। বোধ করি আমি তাঁদের সন্দেহদৃষ্টিতে ছিলুম। আমি যে তাঁদের সন্দেহের যোগ্য সে কথা স্বীকার করি।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির একান্ত অহমিকার পরিচয় পাওয়া যায় লীগ অফ্ নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠায়। সে বৈঠকে নেশন্‌দের একমাত্র প্রতিনিধি তাঁরাই যাঁরা রাষ্ট্রচালক শুনেছি পিতৃদেব যখন বোলপুরে প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তার অনতিকাল পূর্বে সেখানে ডাকাতের উৎপাত ছিল। তিনি এক জন দস্যুপতিকেই আশ্রমরক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। এই রক্ষাকার্যে তার সতর্কতা অবিচলিত ছিল কিন্তু শোনা যায় তার ডাকাতি মন নিরুদ্ধ থাকতে পারে নি। প্রভুর অগোচরে তার দস্যুবৃত্তির চাঞ্চল্য দূরে দূরে উপদ্রব ক'রে বেড়িয়েছে। নেশনের স্বার্থ-রক্ষার প্রতিনিধিরা একত্র জোট বাঁধলেই যে স্বার্থসমষ্টির রং বদ্‌লিয়ে সেটা পরার্থবুদ্ধির শুভ্রতা লাভ করবে তা আশা করা যায় না—এ তো সূর্যের আলো নয় যে তার সাত রশ্মি একদল হলেই শুভ্র হয়ে উঠবে। স্বার্থের মিলন ভিতরে ভিতরে ভাঙনের বুদ্ধি সঙ্গে ক'রেই আনে। লীগ্ অফ্ নেশন্‌সে তাই বাঁধন-ছেঁড়ার ইতিহাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে বেড়েই চলেছে। তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে

মানুষের ইতিহাসে ক্ষমতালোলুপ নেশনরা দেখতে দেখতে যে রকম দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে এমন আর কোনো দিন হয় নি। অথচ লীগ্ তাদের ঠেকাতে পারে নি। কেমন ক'রে ঠেকাবে? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, যে-শর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়াবে সেই শর্ষেকেই পেয়েছে ভূতে। স্বার্থের চেয়ে কল্যাণকে বড়ো ক'রে মানবার যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রপতিরা সেই মনীষীদের উপেক্ষা করে নি প্রাচীন ভারতে প্রাচীন চীনে। সেই জন্যে যুদ্ধনীতিতেও মনুষ্যত্বকে স্বীকার করেছিল ভারতবর্ষ আর চীনে সামরিক মনোবৃত্তি অত্যুচ্চ সম্মান পায় নি।

ও কথা থাক্। এখন নিজের কথা বলি। আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোনো ব্যাবসায়িক পরামর্শ দাবী করেন নি। আমার শরীরমনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষা-শীতল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যা প্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক। রাষ্ট্রিক কর্মবিধির মধ্যে এ কোনো বাধা পায় নি, একে সঙ্কুচিত করে নি বাজেট-সভার কৃপণতা। সার্কিট হৌসের দোতলায় অসঙ্কোচে ব'সে অবিমিশ্র অকর্মণ্যতায় আত্মসমর্পণ ক'রে দিয়েছি, এখানকার সচিবেরা আমার ক্লান্ত স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে প্রত্যহ এসে আমার এই অনাবশ্যক দিনযাপনকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। কঠোর কর্তব্যক্ষেত্রের মাঝখানেও মানব-সম্বন্ধের আত্মীয়তা স্বীকার করবার যে মনোবৃত্তি আমাদের দেশের নাড়ীর মধ্যে রয়ে গেছে সেই কথাটা এখানে এসে বিশেষ ক'রে অনুভব করেছি।

উড়িষ্যার বর্তমান রাষ্ট্রশাসনের ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রজাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণতা দূরের থেকে অনুমান করেছিলুম, এখন নিকটের থেকে অনুভব করছি। এই সঙ্গে মনে একটা আশঙ্কা জাগে যখন দেখি উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে একত্র করতে পারে নি। যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম তখন স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি নে। তাই দেখা গেল এখানকার এক দল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট ক'রে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না। তুমি তো য়ুরোপের বিশ্ব-বিখ্যাত বিদ্যায়তনের সঙ্গে সুপরিচিত, তার কর্মধারাকে অবরুদ্ধ করবার জন্য এ-রকম হাস্যকর বাল্যলীলা কখনো দেখেছ কি? এ-রকম উপদ্রব এদেশে আজকাল দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ছে, বিদ্যাসাধনার শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। এই কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল যখন আমাদের পোলিটিশানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তরুণের জয়ধ্বনিতে ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমন কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করেছিলুম এবং বুঝেছিলুম এতে ক'রে রাষ্ট্রতপস্যার মূলে লাগিয়ে দেবে দুর্বলতার বিনাশ-শক্তি। ছেলে-মেয়েদের আবেগপ্রবণ মনে আত্মশ্লাঘার বেগে তাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে গোড়া থেকে শিথিল ক'রে দিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রের যে হাওয়া দূষিয়ে দেওয়া হয়েছে তার থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাব না।

রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়। আজকের দিনে চেম্বরলেনি সঙ্কটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বরলেন গায়ে পড়ে ছাতা হাতে ফাসিষ্ট-ব্যূহের মধ্যে মাথা হেঁট ক'রে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত য়ুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা ক'রে দিলেন, পরক্ষণেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোস্লোভাকিয়াকে নাজি নখদন্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'তে দেখেও অনায়াসে লজ্জাসম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলণ্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাকেও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসম্বরণ ক'রে সকল মতের সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায়

সংহত করচে দেশের সমস্ত শক্তি। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্বসাধনের শিক্ষায় যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি, তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি তীব্র স্বরে দোষারোপ ক'রে কলহ করতে করতে দেশের কর্তব্যবুদ্ধিকে ভেঙে চুরে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিত। ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভুলতে জানে, রফানিষ্পত্তি করতে পারে, তর্কবিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাঁধতে এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়। আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত ক'রে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তিচালনা, যে-শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ। মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি ক'রে তোলার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। বাল্যোচিত আবদারগ্রস্ত তাদের মনোবৃত্তি, অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোষ করতে নারাজ। এরাই তেরো কাঠা বালু-জমির জন্যে তেরো হাজার টাকার মামলা চালায়।

যারা স্বভাবত অকর্মণ্য তারা অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুতাকে ভয় করি। যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্য ফল পেতে চায় তারা ভুলে যান প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা ক'রে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুব্ধ ধীরবুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত।

ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করছে ওষধি-বনস্পতি, দোহাই পাড়ছে শাখা-প্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক পড়ে যাবে পাক ধরবার পূর্বেই, একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে—যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে কাজ করবে ভিতরের থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও জানি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে নয় তার বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাবে সবাই মিলে সত্যমিথ্যার ঠেলাঠেলিতে, তবু গীতার শাসন মানতে হবে, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—ইতিহাস-বিধাতার সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে—কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টীরিয়ার হাত-পা খেঁচুনি লাগে কেন কথায় কথায়? শেষ পর্যন্ত একটু যেন হাসবার শক্তিও রাখতে পারি। বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো আঁধি লাগে—উনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সব চেয়ে দুর্বল হাওয়ার ছেলেমানুষি। দেখতে সে পালোয়ান, কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষে, তারা এর হঠাৎ হাঁসফাঁসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অব্যবস্থিত-চিত্তদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

শ্রীগোপাল হালদার

হিট্‌লারেরই দিগ্বিজয় চলিয়াছে—গত বৎসরটা তাঁহারই সৌভাগ্যের পূর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। এই বৎসরটায়, লোকে মনে করিয়াছিল, আসিবে মুসোলিনির দিন। চেকোস্লোভাকিয়া ও মেমেল যখন বিলুপ্ত হইল, তখনি মনে হইয়াছিল, মুসোলিনিরও তা সময় বহিয়া যায়। রুমেনিয়া, পোলাণ্ডের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িতেছে, আত্মপ্রতারণা-কুশল ব্রিটেন পর্য্যন্ত স্বীকার করিল, এবার একটা শান্তি-সংহতি না গড়িলেই নয়—এমনি সময় মুসোলিনি ত্বরিত গতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

জাপানী সৈন্যদল কর্ত্তৃক চীনের দক্ষিণ-উপকূলবর্ত্তী হাইনান দ্বীপ অধিকার। জাপানী সৈন্যেরা জাহাজ হইতে নামিতেছে।

প্রথম সংবাদ আসিয়াছিল, আল্‌বেনিয়ার দিকে ইতালী অগ্রসর হইতেছে। ইতালীয় সরকারী খবর অমনি তাহার প্রতিবাদ করিল; জানাইল, দুই রাজ্যে বেশ বন্ধুভাবে আলোচনা

নিকৃষ্ট ঘি

বোধ হয় আপনি শুনেছেন যে আপনার পরিচিত কোন লোকের ঘি বা ঘিয়ের জিনিষ খেয়ে অম্বল হয় ও বুক জ্বালা করে। ঘি পুরাণ হ'লেও তার এসিড্ ভ্যালু বাড়ে। ঘি তৈরী করিবার কয়েক প্রকার দোষেও এমন হয়। এই প্রকার rancid ঘি খাওয়াও অম্বল হওয়ার একটা কারণ।

ঘি তাই কেবল খাঁটি হ'লেও যথেষ্ট নয়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যে পরীক্ষিত ঘিয়ের শতকরা অন্ততঃ দশটি ঘিই এই দোষে দুষ্ট। এই সকল ঘিয়ের acid value ১১ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে এবং তা বাজারে অবাধে চল্‌ছে। সেখানে ভাল ঘিয়ের এসিড্ ১·৫ অপেক্ষা বেশী হবে না।

ঘিয়ের মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে তার জলীয় অংশ। যে ঘিয়ের জলীয় অংশ বেশী তা কড়ায় কোন কিছু ভাজার কাজে জ্বলে ও কমে যাবে বেশী। অথচ সে রকম ঘি দামে সস্তা হ'লেও, মোটের উপর সস্তা নাও হ'তে পারে। ভাল ঘিয়ের জলীয় অংশ বা moisture content ·5 অপেক্ষা বেশী হবে না, অথচ বাজারে কত ঘি এ রকম! আবার এমন ঘিও বাজারে আছে, যার জলতি হয় তো বেশী যাবে না। অথচ অন্য প্রকার দোষে তার খাদ্যপ্রাণ বা vitamin নষ্ট হয়ে গেছে।

এদেশের মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত ঘিয়ের এসিড্ ভ্যালু বা 'ময়েশ্চার কণ্টেণ্ট' কোনটির জন্যই মাথা ঘামান না। সুতরাং বাজারে যে এই দুই দোষে দুষ্ট ঘি অবাধে চলে তা বলাই বাহুল্য।

ভারতে সর্ব্বপ্রথম শ্রীঘৃতেরই প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরীতে নিয়মানুযায়ী এ সকল প্রকার পরীক্ষারও ব্যবস্থা হ'য়েছে, এবং এসকল দোষ হতেও মুক্ত থাকলে তবেই—শ্রীঘৃত বাজারে বিক্রয় করা হয়।

জাপানের আক্রমণে উদ্বাস্তু হাইনানদ্বীপবাসীদের নিষ্ক্রমণ

চলিতেছে। তার পরে খবর—আলোচনার পথে বাধা পড়িয়াছে। আর একটু পরেই আলবেনিয়ার উপর গুলি ও বোমা পড়িল, দেখিতে না-দেখিতে সস্ত্রীক রাজা জোগ গ্রীসে আশ্রয় লইলেন, আলবেনিয়া রোমের কামান, বন্দুক, যুদ্ধবিমানের সম্মুখে মাথা নত করিল,—ইতালীর রাজা আলবেনিয়ার রাজা হইলেন।

আল্‌বেনিয়া জয়

আল্‌বেনিয়া ক্ষুদ্র দেশ, লাখ-দশেক তার অধিবাসী, বেশীর ভাগই মুসলমান। কিন্তু ইস্‌লামের যাহা কিছু ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য তাহা শহরেই সীমাবদ্ধ; উপজাতিদের মধ্যে ক্যাথলিক

জাপানী সৈন্যদল কর্ত্তৃক চীনের দক্ষিণ-উপকূলবর্ত্তী হাইনান দ্বীপ অধিকার। প্রথম সৈন্যদলের প্রবেশ

আলবেনিয়া-অধিকারে ইতালীয় সৈন্যসামন্তের আগমন

...সলমান, এইরূপ পরিচয়টাই বড় কথা নয়। তাই, রাজা ...গ মুসলমান, রাণী জিরাল্ডিনা অষ্ট্রিয়ার পুরাতন অভিজাত ...বে কন্যা, তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। আর ...র রাষ্ট্রধর্মও ইস্‌লাম নয়; কারণ রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়াই কিছু ছিল ...। অবশ্য দুনিয়ার মুসলমান মুসোলিনির আলবেনিয়া অধিকারে ...লার উপর ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, এমন কি ভারতীয় মোসলেম্ লীগ্ ...একটা জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু মুসলমান-রাজ্য ...প্ত হইল বলিয়া চীৎকার না করিয়া বোধ হয় একটি স্বাধীন ...বিনষ্ট হইল বলিয়া আপত্তি করাই ছিল ন্যায়সঙ্গত। তবে, ...প্রাচ্যের আরব জাতিদের ক্ষোভের কারণ বুঝা যায়। কিছু ...ক্ষ হইতে মুসোলিনি বারির বেতার-গৃহ হইতে আরবী ...তাহাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া নিজেকেই ...মানের একমাত্র বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন—...ন কি, 'ইস্‌লামের রক্ষক' এই নামটিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...সাগরের তীরবর্ত্তী আরবেরা তাই তাঁহার এই আকস্মিক ...বেনিয়া গ্রাসে নিজেদের প্রতারিত বোধ করিল, বিক্ষুব্ধ হইয়া ...। মুসোলিনি এই ব্যাপারে পরে যে-সব ওজর দেখান তাহা ...বিশ্বাস করিল না,—ক্ষুদ্র আল্‌বেনিয়া বরাবরই ইতালীর ...ছায়ায় ছিল, মুসোলিনি যাহাই বলুন এখনও তাহার এত ...হয় নাই যে, সে প্রবাসী ইতালীদের বা তাহাদের স্বার্থের ... করে, কিম্বা যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করে।

মুসোলিনির যুক্তি

আল্‌বেনিয়া-অধিকার মুসোলিনির পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়ে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় কারণে। প্রথমত, হিটলারের এত জয়জয়কারে মুসোলিনি চাপা পড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার এমন কিছু করা দরকার যাহাতে ইতালীয়রা একটু গর্ব্ব বোধ করিতে পারে। কারণ আবিসিনিয়ার মরুতে যে কবে উদ্যান দেখা দিবে ইতালীয়রা এখন আর সে বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারিতেছে না; তদুপরি স্পেনের ভূমিও এই মে মাসেই ইতালীয়দের পক্ষে পশ্চাতে ফেলিয়া আসার কথা স্থির হইয়া ছিল। অতএব, 'ইল দুচে' তাঁহাদের এই সব স্বপ্ন-ভঙ্গের নির্দ্দয় কঠোরতা হইতে রক্ষা করিয়া একটা কিছু রোম্যান্টিক উন্মাদনার উপাদান জোগাইবেন না কি?—সে উপকরণই হইল রাজা জোগের এই পার্ব্বত্য দেশটুকু। কিন্তু বহির্দেশীয় কারণেও এই পার্বত্য ভূমিকে এইবেলা জোগের হাত হইতে মুসোলিনির নিজের হাতে লওয়া দরকার হইয়া উঠিয়াছে। ভূমধ্যসাগর 'ইতালীয় হ্রদে' পরিণত হইতেছে—তাই, আড্রিয়াতিক সমুদ্রের তীরস্থ আলবেনায় নৌঘাঁটি ও পশ্চাদ্-ভূমিতে এখন ইতালীয় অধিকার একচ্ছত্র করা চাই। তাহাতে দুইটি ফল একই সঙ্গে আয়ত্ত হইবে—এক, গ্রীসের উপর চাপ পড়িবে—সেই উপকূলেও আর ইতালীয়-বিরোধী কেহ সহজে জমিয়া বসিতে পারিবে না; দুই, ইতালী, জার্ম্মানী, হাঙ্গেরি পরিবৃত যুগোস্লাভিয়া এবার এই চাপে একেবারে জার্ম্মান-ইতালীর অঙ্কাশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে, এবং তাহারই ফলে আবার রুমেনিয়ার উপর চাপটা নূতন করিয়া বাড়িবে,—সে আর ফরাসী ও ব্রিটেনের কথা ভাবিতেও সাহস করিবে না, বুলগেরিয়াও একটু

চিন্তায় পড়িবে, এবং সমস্ত বল্‌কান-অঞ্চল জার্মান-ইতালীয় শক্তিদ্বয়ের করতলগত হইবে।

বল্‌কান্‌ দুশ্চিন্তা

দুশ্চিন্তা বল্‌কান্‌ রাজ্যগুলিতে এত দিন পর্য্যন্তই ঘনাইয়া আছে যে, আল্‌বেনিয়া-গ্রাসে তাহার আর নূতন কিছু জুটিবে না। মিউনিকের পর হইতে ফন ফুঙ্ক-এর চেষ্টায় জার্মান আর্থিক প্রভাব এই অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে; রুমেনিয়াও সেদিন বাধ্য হইয়াই তাহা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তার পরে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পোলাণ্ডের মতই সে-ও ফরাসী ও ব্রিটেনের সাহায্য পাইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি পাইল। এদিকে যুগোস্লাভিয়া চিরদিন ইতালী ও জার্মানীকে শত্রু বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট একটা ভরসা পাইলে সে-ও "অক্ষ"-চক্রান্তের বাহিরে থাকিতে পারে। এইরূপ ভরসার চেষ্টাও চলিতেছিল। এমনি সময়ে আলবেনিয়া-বিজয় তাহাকে ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিকে নূতন করিয়া নিজের অবস্থা বিবেচনা করিতে বাধ্য করিল।

আল্‌বেনিয়া-অধিকারের ফল দাঁড়াইল এই যে, গ্রীস প্রায় তৎক্ষণাৎ আপৎকালে ফরাসী-ব্রিটিশ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইল। তুরস্কের সহিতও অনুরূপ কথা চলিতে লাগিল। স্থির হইল, প্রয়োজনবোধে সে-ও দার্দ্দানালিজের দুয়ার ঐ দুই দেশের যুদ্ধ-জাহাজের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই দিকে কি মুসোলিনির বুদ্ধির পরাজয়ই ঘটিল না?—তাই, প্রত্যুত্তরে তিনি ডোডাকানিজ দ্বীপের নৌঘাঁটি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার দিকে তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইতে চলিয়াছে। প্রিন্স রিজেণ্ট পল্‌ সুচতুর লোক; রুমানিয়ার রাজা কেরলের সহিত তিনি বুদ্ধি আঁটিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহমধ্যে ক্রোট সংখ্যালঘুর সমস্যা মিটে নাই। এবার প্রধান মন্ত্রী মার্কোভিচ ও ক্রোট-নেতা ম্যাটিচাকে লইয়া তাহা মিটাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—সংখ্যালঘুর সমস্যা না মিটিলে যে তাঁহার রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি, তাহা তাঁহার বন্ধু-রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু তবু কি যুগোস্লাভিয়ার আর রোম-বার্লিন-অক্ষ-বহির্ভূত থাকা সম্ভব। মার্কোভিচ ইতালীয় পররাষ্ট্র সচিব চিয়ানোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রোম ও বার্লিন সব দিক দিয়াই তাহাকে ঘিরিয়া আসিয়াছে। অতএব, তাঁহার স্থান প্রায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আছে। বলকান অঞ্চলে বাকী আছে বুল্‌গেরিয়া। যুদ্ধশেষে তাহাকে নিরস্ত্র ও নিষ্প্রাণ করিয়া রাখাই ছিল বলকান বন্ধুদের চেষ্টা। কাজেই, সেই বন্ধুদের প্রতিও তাহার মনোভাব বুঝা সহজ। কিন্তু কিছুদিন পর্ব্বে
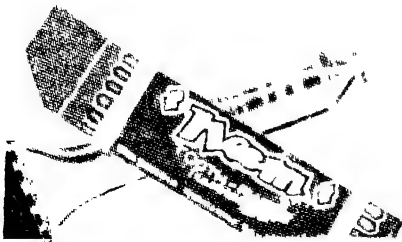
সুইয়ের সন্ধি বাতিল করিয়া তাহার অস্ত্রগ্রহণের অধিকার এই বলকান বন্ধুরা দ্বারা স্বীকার করেন; ইহাতে তাহারও বিবোধিতা এখন কমিবার কথা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে গ্রীস ও রুমেনিয়া দুইই তাহার অংশ কাড়িয়া লাভবান্ হইয়াছে—সে তাহা বুঝিয়া না পাইতে অন্য কোনও কথা এখন ভাবিতে চাহে না। এদিকে অন্যেরাও এখনো এ ব্যাপারে ত্যাগশীল হইবার প্রয়োজন বোধ করে না। এতএব, বল্কান মিলন অসম্পূর্ণই আছে। ধীরে ধীরে জার্মাণ-ইতালীয় বিভীষিকার ছায়া বলকান রাজ্যগুলির উপর গাঢ়তর হইয়াছে। ফরাসী ও ব্রিটেন সে ছায়া দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন সম্প্রতি;—তাহাও অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে, সসঙ্কোচে।

"শান্তি-সংহতি"

দ্বিধাই হইল বর্তমান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষণ। ক্রমাগত লাঞ্ছিত হইয়া চেম্বারলেন ফাসিস্ত-পন্থার নীতি পরিবর্তন করিবেন, ঘোষণা করিলেন; স্থির করিলেন 'শান্তি-সংহতি' গঠন করিবেন। কিন্তু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন হাত মিলাইতে হয় সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে—মনের দ্বিধা ঘুচিল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পোলাণ্ডকে আক্রমণকালে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া ফরাসী ও ব্রিটেন নিজেদের নিকটতর করিয়াছে। পোলিশ মন্ত্রী বেক্ লণ্ডনে আসিয়া তাহা স্পষ্ট করিয়া যান। কিন্তু ইহার বেশী যে তিনি চাহেন না, ভরসাও রাখেন না তাহাও নাকি বেক-এর কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। ব্রিটেনের কথায় আজ আর কেহ ভরসা রাখিতে পারে না—এই কথাটি সোভিয়েট রুশিয়া অন্যের অপেক্ষা বেশী করিয়া জানে বলিয়াই ব্রিটেনের সহিত মৈত্রীর নামে সে অস্থির হইয়া পড়ে নাই। সেও দেখিতেছিল,—ব্রিটেন কতটা এখনো দ্বিধাগ্রস্ত, খণ্ডিতমনা। চেম্বারলেন ভাবিতেছিলেন—দেখা যাক, রুজভেল্টের আহ্বানের কি উত্তর দেন হিট্লার ও মুসোলিনি। সে উত্তর সন্তোষজনক হইলে আর রুশ বন্ধুত্বের কাছেও ঘেঁসিতে হয় না। সোভিয়েট রুশিয়াও জানে—ব্রিটেন চাহে এই যুদ্ধটা অন্যের ঘাড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ুক, আর সাম্রাজ্য-বাদীদের এই যুদ্ধে রুশিয়াও জড়াইয়া পড়ুক। তাহা হইলে ব্রিটেন দূরে নিষ্কণ্টকে থাকিবে এবং যুদ্ধের শেষ দিকে হতবল সোভিয়েট ও অন্য শক্তির মধ্যে পড়িয়া সোভিয়েটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরদিনের মতই নিজের লাভের ব্যবসা আরও ফাঁপাইয়া তুলিবে। এই সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি সোভিয়েটের অগোচর নয়। ইহাও সে জানে যে, এই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুদ্ধে অগ্রসর হইলে উহাদের গৃহমধ্যে শ্রমিক-বিপ্লব ঘটিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা

নিজেরাও তাহা অবগত আছে, তাই যুদ্ধটা তাহারা চালান দিতে চায় অন্যের উপরে—বিশেষতঃ সোভিয়েটের উপরে। এই ফাঁদে সোভিয়েট পা দিবে না—সাম্যবাদী দলের গত অষ্টাদশ অধিবেশনে ষ্টালিন তাহা অতি বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝাইয়া দেন।

সোভিয়েটের সংহতি-সূত্র

কিন্তু পূর্বে ও পশ্চিমে সোভিয়েট শত্রুপরিবৃত। তাহাদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষার জন্য অবশ্য সোভিয়েটের প্রধান ভরসা নিজ সৈনিক দল। সম্প্রতি মে দিবস উপলক্ষে সেই ১৫ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিকদের উপলক্ষ্য করিয়া ষ্টালিন একটি ঘোষণা পাঠ করিয়াছেন—সোভিয়েট সৈনিক বিপ্লবের বাহিনী, সচেতন সৈনিক, তাই অপরাজেয়। কিন্তু মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি একটা সুপরিচিত রাজনীতি,—সোভিয়েটও তাহা অবজ্ঞা করিতে পারে না।

শ্যামদেশের বালক রাজা আনন্দ সুইটজারল্যাণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছেন। চিত্রে তাঁহাকে বাগানে জলসেচনরত দেখা যাইতেছে।

শ্যামদেশের প্রধান মন্ত্রী, লুয়াং পিবুল। ১৯৩৮ সালের শেষে তিনি এই পদে উন্নীত হন। ইঁহার নেতৃত্বে শ্যামদেশ ডিক্টেটরী শাসনের পথে চলিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিন বার ইঁহার প্রাণান্তকরণের চেষ্টা হইয়াছে, তিন বারই আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন।

তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক শক্তিদের' সঙ্গে একটা সত্যকার মিলনের সূত্র পাইলে সোভিয়েট পশ্চাৎপদ হইবে না। ব্রিটিশ রাজদূতের সঙ্গে মস্কোর যে সুদীর্ঘ আলোচনা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, এই সূত্র আবিষ্কারেরই চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু কেহই বোধ হয় অপরকে চক্ষু বুজিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। জন্মাবধি সোভিয়েটের সহিত ব্রিটেনের, বিশেষতঃ শেষ দিকে ফাসিস্ত-বন্ধু চেম্বারলেনীয় ব্রিটেনের, যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

কিন্তু এমনি সময়ে সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিট্‌ভিনফের বিদায় সকলকে চমকিত করিয়াছে। লিট্‌ভিনফ্ ছিলেন জাতি-সঙ্ঘের পক্ষপাতী, ঐকত্রিক-সংরক্ষণ নীতির প্রবক্তা। এখনো রুশিয়াই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একা এই দুই নীতিকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিল। রুশিয়া এতদিন একা বা দুই-এক জনের সহিত, যেমন ফ্রান্সের বা ব্রিটেনের সঙ্গে,'শান্তি-সংহতি' গঠন না করিয়া বলিতে-ছিল শান্তি-সম্মেলন ডাকিয়া ঐকত্রিক ঐরূপ একটা সঙ্কল্প অন্যান্য সমুদয় রাষ্ট্রের সহিত গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু মনে হয়, ব্রিটেন, ফরাসী, পোলাণ্ড, রুশিয়া, এই চারিটিকে লইয়া এখন 'শান্তি-সংহতি' গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য। ব্রিটেন সত্যই চাহিলে সোভিয়েট-ফ্রান্স-ব্রিটেনে বুঝাপড়া এখন সুসম্ভব।

হিলিয়াম গ্যাসের কাহিনী

কিছু কাল আগে যখন বিখ্যাত জার্মান ব্যোমযান হিণ্ডেনবুর্গ আগুন ধরে পুড়ে যায় তখন হিলিয়াম গ্যাসের নাম অবৈজ্ঞানিক সাধারণেরও মুখে মুখে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। আগুন ধরে যাবার কারণ বলা হয়েছিল যে এই সকল ব্যোমযানে সহজদাহ্য হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হ'ত, তার পরিবর্তে অদাহ্য হিলিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারলে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। কিন্তু আমেরিকা জার্মানীকে হিলিয়াম গ্যাস বিক্রী করতে রাজী হয় নি, কারণ খুবই সম্ভাবনা জার্মানীর পক্ষে এই গ্যাস যুদ্ধের জন্য নির্মিত জেপেলিনে ব্যবহার করবার।

অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মত হিলিয়াম গ্যাসের কাহিনীও কম বিচিত্র নয়।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ জ্যোতির্বিৎ সর্ জোসেফ নর্ম্যান লকইয়ার সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে একটা বিচিত্র পীতাভ বর্ণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। সূর্য্যের গ্রীক প্রতিশব্দ helios থেকে এর নাম তিনি দেন helium, হিলিয়াম। এর পরে ১৮৯৪ সালে আমেরিকার ভূতত্ত্ববিভাগের ডব্লু, এফ, হাইল্ডেব্র্যাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের বাইরেও এই গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিলেন—কতকগুলি মিশ্র ধাতুপদার্থ পুড়িয়ে পরীক্ষা করবার সময় তিনি অল্প পরিমাণে এই বিচিত্র গ্যাস পেয়েছিলেন। তিনি কিন্তু এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন নি, হিলিয়ামকে নাইট্রোজেন ব'লে ভুল করেছিলেন। এর তিন দিন পরেই ব্রিটিশ রাসায়নিক সর্ উইলিয়াম র‍্যামজে পুনরায় এই একই পরীক্ষা করেন এবং তার ফলে উৎপন্ন গ্যাসে হিলিয়ামের সেই বিশিষ্ট উজ্জ্বল পীতবর্ণ লক্ষ্য করেন। সূর্য্যমণ্ডলের বাইরে এই গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লেও তখন পর্য্যন্ত এটি দুষ্প্রাপ্য ব'লেই পরিগণিত হয়। কোন কোন খনিজ পদার্থে অল্প পরিমাণে এটি পাওয়া যেত—কোনটি থেকে স্বভাবতঃ, কোনটি গরম করলে এই গ্যাস পাওয়া যেত। একজন ডাচ্ পদার্থ-বিজ্ঞানী (H. K. Onnes) বহু ব্যয় করে কিয়ৎপরিমাণ এই গ্যাস সংগ্রহ করেন এবং নানা প্রক্রিয়ায় একে তরল করেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে হাইড্রোজেন বাদে এই গ্যাস লঘুতম—এর ওজন বায়ুর ওজনের এক-সপ্তমাংশ। তখনও কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই গ্যাসকে কখনও লাগানো যাবে তা কল্পনা করা যায় নি—প্রতি বর্গ-ফুট গ্যাস সংগ্রহ করতে ব্যয় পড়েছিল ১৮০০ ডলার। আর এখন আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলের খনি থেকে প্রতি বর্গ-ফুট হিলিয়াম সংগ্রহ করতে খরচ পড়ে মাত্র ২ সেণ্ট (১০০ সেণ্ট = ১ ডলার = প্রায় তিন টাকা)—এবং সম্প্রতি এক বৎসরেই ১৫০ লক্ষ বর্গ-ফুট হিলিয়াম গ্যাস আমেরিকায় সংগ্রহ করা হয়েছে। আমেরিকার বাইরে প্রায় কোথাও কিন্তু এখনো এই গ্যাস সংগ্রহ করা যায় নি, সামান্য পেলেও তাতে ব্যয় পড়ে অনেক। জেপেলিন প্রভৃতি চালনা নিরাপদ করবার পক্ষে এই গ্যাস একান্ত আবশ্যক, এবং হাঁপানি প্রভৃতি নানা শ্বাসকষ্ট ও ব্যাধিতে এর ব্যবহার একান্ত ফলপ্রদ হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে।

১৯০৩ সালে আমেরিকার কান্‌সাস অঞ্চলে এক তেলের খনির সন্ধান করতে গিয়ে কেবল গ্যাস পাওয়া যেতে থাকে। স্থানীয় কর্ত্তারা স্থির করেন খনি থেকে এই গ্যাস বাড়ীতে ও ফ্যাক্টরিতে চালান দিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এক দিন সব কাজকর্ম ছুটি দিয়ে তোড়জোড় করা হ'ল, এই গ্যাস জ্বালানোর সূচনা করা হবে, চারদিকের অনেক লোক জড়ো হ'ল। কিন্তু

এই বেলুনটি হিলিয়াম গ্যাসে পূর্ণ। এই পরিমাণ হিলিয়ামের দাম এক সময় পড়ত ৫০০০ ডলার, এখন এর দাম দেড় সেণ্ট।

কার্য্যকালে দেখা গেল, গ্যাস যতই জ্বালাতে চেষ্টা করা যায়, জ্বলা দূরে থাক তার সংস্পর্শে দেশলাই বারে বারে নিবে যায়। শেষ পর্য্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ; গ্যাস অদাহ্যই থেকে গেল এবং সেজন্য উদ্যোগীদের অনেক উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল। হিলিয়ামের এই অদাহ্যতা-গুণই কিন্তু পরে জগতের এত প্রয়োজনে লেগেছে।

আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলের হিলিয়াম-খনি। প্রকৃতির নির্দ্দেশে হিলিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত সম্পত্তি।

তার পর মহাযুদ্ধের সময় যখন জেপেলিনে ব্যবহারের জন্য সহজদাহ্য হাইড্রোজেনের পরিবর্তে অদাহ্য গ্যাসের প্রয়োজন হয় তখন থেকে আমেরিকায় হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। ১৯২৫ সালের মধ্যে আমেরিকা ১২০ লক্ষ ডলার এই জন্য ব্যয় করে, এবং ২৪০ লক্ষ বর্গ-ফুট পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়। উত্তর-আমেরিকার নানা স্থানে গ্যাস-ফিল্ড অধিকার ক'রে সেই সব স্থানে গ্যাস সংগ্রহের বিরাট কারখানা বসেছে। গত বারো বৎসরে এই ব্যাপারে আরও ২,২০০,০০০ ডলার আমেরিকা এই জন্য ব্যয় করেছে।

জেপেলিনের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য হিলিয়ামের একান্ত আবশ্যকতার কথা ছ'টা চিকিৎসায় হিলিয়ামের ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা একটু বিস্তারিত বলা যেতে পারে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতাস গ্রহণ করি তার শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন, বাকী ২১ ভাগ অক্সিজেন—এই অক্সিজেন-অংশই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ফুসফুসে গ্রহণ করি, নাইট্রোজেন-অংশ নিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করি। এক জন হাঁপানি রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে এক জন চিকিৎসকের মনে এই কথা উদয় হ'ল যে এই নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন-অংশের পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম ঐ পরিমাণে দিলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা হয় কি না? হিলিয়ামের ওজন নাইট্রোজেনের এক-সপ্তমাংশ; সুতরাং হিলিয়াম-অক্সিজেন-মিশ্র শ্বাস গ্রহণ করতে দিলে তা সাধারণ নিশ্বাস-বায়ুর (নাইট্রোজেন-অক্সিজেন) এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ লঘু হবে এবং তা গ্রহণ করা রোগীর পক্ষে সহজ হতে পারে; পরীক্ষা ক'রেও এইরূপ দেখা গেল। হাঁপানি ছাড়া শ্বাসযন্ত্রের আরও অনেক ব্যাধিতে হিলিয়াম বিশেষ উপকারী।

মার্কিন সরকারের সম্পত্তি হিলিয়াম বিক্রী একরূপ করাই হ'ত না ব'লে, হিলিয়াম-চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল, তাই আমেরিকার ডাক্তারেরা এজন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন; রোগীর জন্য অক্সিজেন ব্যবহারে যে-ক্ষেত্রে দৈনিক ৫।১০ ডলার ব্যয় হ'ত সে-ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ হিলিয়ামের দাম পূর্ব্বে দিতে হ'ত ৫০ ডলার—তা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। হিলিয়াম সংগ্রহে গবর্ন্মেণ্টের যা খরচ পড়ে চিকিৎসাকার্য্যে যদি সেই দামে কিনতে পাওয়া যায় তাহলে অনেক রোগীর কষ্ট দূর হ'তে পারে। মার্কিন-কংগ্রেসের সমিতির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে চিকিৎসকেরা বলেছেন যে নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না এ রকম মৃতপ্রায় অনেক রোগীকেও হিলিয়ামের সাহায্যে আরাম করা গেছে।

সুলভে হিলিয়াম ব্যবহার করতে পারার জন্য মার্কিন ডাক্তারদের এই দাবি পেশ করবার প্রায় সমকালেই 'হিণ্ডেনবুর্গ' দুর্ঘটনা হয়। তার পরেই মার্কিন-সরকার থেকে হিলিয়াম বিক্রয়ের আইন অনেক শিথিল করে দেওয়া হয়। যুদ্ধে ব্যবহারের ব্যোমযানের জন্য হিলিয়াম গ্যাস বিক্রয় এখনও নিষিদ্ধ; এবং যে-সব বাণিজ্যপোতের গতায়াত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, বা কেবল আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের কাছে হিলিয়াম বিক্রয় করাই নিয়ম। ব্যোমযানের গ্যাস-ব্যাগে হিলিয়াম অল্প অল্প ক'রে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়, এই জন্য কোন দেশ হিলিয়াম সংগ্রহ ক'রে সঞ্চয় করে রেখে অনভিপ্রেত কাজে ব্যবহার করবে তার সম্ভাবনা অল্প ব'লে আমেরিকার কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন।

শ্রীহিমাংশু সরকার

চীনে লোকশিক্ষাবিস্তারের অভিনব প্রণালী: চলন্ত বিদ্যালয়

অশিক্ষিত বিপুল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক চেষ্টার আমাদের দেশে সম্প্রতি সূচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে

চীনদেশের চলন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামাঞ্চলে পথিপার্শ্বে ক্লাস খুলিয়া বসিয়াছেন।

নবজাগ্রত চীনের চেষ্টার কথা মনে পড়ে। নানা দিক থেকে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থা ও সমস্যার অনেক মিল আছে—এই প্রসঙ্গে এই দুই দেশেরই অসীম দারিদ্র্য, ব্যাপক অশিক্ষা, বিরাট আয়তন ও কৃষিজীবীদের আধিক্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কারণে চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বিবেচ্য। এখানে চীনের শিক্ষাবিস্তারের প্রণালীর একটি অঙ্গ চলন্ত বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত করা গেল।

আমাদের দেশে যেমন প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অনেক অংশে আমাদের দেশের প্রয়োজনের ও অবস্থার অনুকূল নয়, চীনেও প্রথম সেই রকম ব্যয়বহুল এবং কেতাবী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। অবশেষে দেশের চিন্তানায়কেরা একথা বুঝতে পারলেন,—বিশেষ ভাবে ১৯২২ সাল থেকে—শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনানুরূপ এবং অল্পব্যয়সাধ্য হওয়া আবশ্যক। চীন গরীব দেশ, তার শিক্ষার প্রয়োজন বহুব্যাপক—শিক্ষার উপকরণেই সমস্ত সাধ্য ব্যয়িত হয়ে গেলে এই বিরাট দেশের শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো কঠিন। তারই উপায়, চলন্ত বিদ্যালয়; চার চাকার উপরে ছোট একটি বাক্স, তারই মধ্যে বিভিন্ন একান্ত আবশ্যক বিষয়ের সমাবেশ—এটি একাধারে চলন্ত বিদ্যালয়, সার্কুলেটিং লাইব্রেরি, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী এবং দোকান-ঘর, এইটিই আবার শিক্ষকের শয্যা। এই চলন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই স্বেচ্ছাব্রতী হয়েছিলেন; অনেক ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দৈনিক এক ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে পথের ধারে শিক্ষক তাঁর এই একান্ত সংক্ষিপ্ত উপকরণ নিয়ে কাজ আরম্ভ করতেন। হয়ত তাঁর চলন্ত বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী খুলে বসলেন—সেই প্রদর্শনীতে আছে এমন সব জিনিষ যা গ্রামবাসীদের একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন শস্যনাশক পোকার প্রতিষেধক ঔষধ, উৎকৃষ্ট শস্যবীজ ইত্যাদি। এই প্রদর্শনীর সাহায্যে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে তারপর পাঠচর্চ্চার
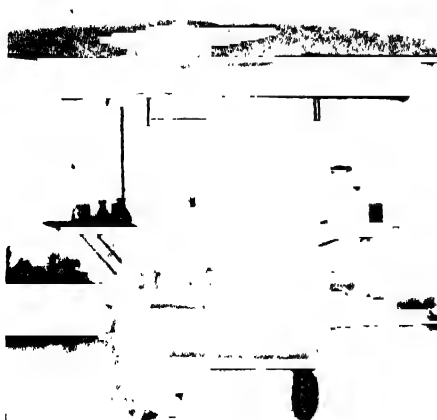
বামে: চলন্ত বিদ্যালয় দোকানে পরিণত হইয়াছে।

দক্ষিণে: চলন্ত বিদ্যালয় স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত।

আন্নামের শিশু-যুবরাজের অভিষেক-উৎসবে রাজ-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংহিতা পাঠ ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান।

আন্নামের অমাত্য অভিষেক-উৎসবে যুবরাজকে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ দিতেছেন।

কাজ সুরু। বাক্সের ডালাই ব্ল্যাকবোর্ডের কাজে লাগানো গেল, বাক্সের সঙ্গেই আছে ভাঁজ-করা বেঞ্চি তাতে চল্লিশ জন পর্য্যন্ত ছাত্র বসতে পারে, অক্ষরপরিচয়ের কাজ আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু শুধু কোন রকমে লিখনপঠনক্ষম করাই তো এই শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্য নয়। চীনের ইতিহাস ও জগতে চীনের স্থান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানপ্রচার স্বাস্থ্যতত্ত্ব, এ-সবই শিক্ষার বিষয়। চারিত্রিক বিচ্যুতি, নেশার দাসত্ব, অপরিচ্ছন্নতা, জুয়াখেলা প্রভৃতি নিবারণের অভ্যাস যাতে তাদের স্বভাবগত হ'তে পারে সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি বিশেষ সজাগ; এবং প্রত্যেক লোক যাতে কোন না কোন শিল্পকার্য্যে দক্ষ হয় সে বিষয়ে এঁরা অবহিত। স্থানীয় সমবায় ও কারুসংঘ গঠন ক'রে নিজেদের আর্থিক উন্নতি ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় (চলন্ত বিদ্যালয়ের অন্তর্গত দোকানে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা হয়) প্রভৃতিরও ব্যবস্থা শিক্ষক পরিচালনা করেন। কৃষি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তার ও উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার দ্বারা কৃষিরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই ভাবে শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োবুদ্ধির উদ্বোধন ও অমঙ্গলের মূলোচ্ছেদ পাঠচর্চ্চার মধ্য দিয়ে করতে শিক্ষক উদ্যোগী থাকেন।

লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই যে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যাপক আদর্শ চীনে প্রচলিত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল, বলা বাহুল্য চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে তার গতি প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও চীনের নায়কেরা জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হন নি, নিত্য নব উপায়ে লোকশিক্ষার আয়োজন করছেন—সে-কথা চীন থেকে প্রেরিত দৈনিক বিবরণগুলি থেকে বোঝা যায়।

শিশু-যুবরাজ

আন্নামের (ইন্দো-চীন) সম্রাটের পুত্র সম্প্রতি তিন বৎসর বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন। দেশের প্রাচীন ক্রিয়াকর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে সাড়ম্বরে এই অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, শিশু-যুবরাজ কেমন গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছেন! আন্নামের সম্রাট তাঁর প্রজাদের পার্থিব-অপার্থিব সব বিষয়ের নিয়ন্তা, প্রজাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ চিন্তার ভারই তাঁর পরে; শিশু যুবরাজের মুখভাব দেখে মনে হয়, তিনি যেন তাঁর এই গুরু দায়িত্বের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তাই বুঝি তাঁর মুখে এই গাম্ভীর্য্য!

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
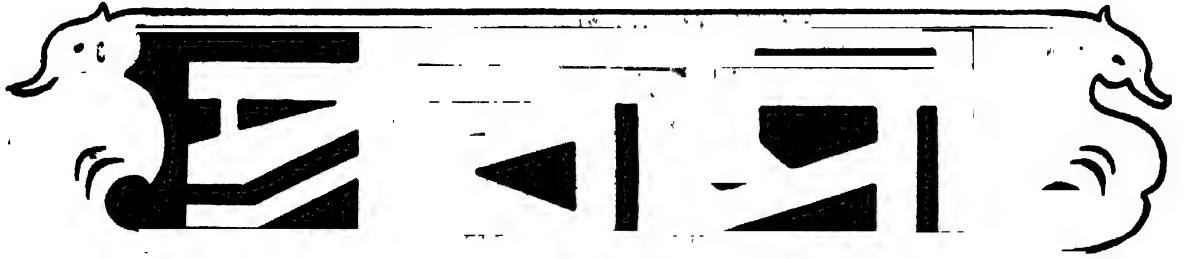
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৬

৩য় সংখ্যা

জন্মদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।

খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসার-খেলার কক্ষে তাঁর
যে-খেলনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেক তরে অমরের ভান,
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি
মুঠি কয় ধূলি রয় বাকি,
আর থাকে কালরাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে-মুছে-যে
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য র'বে ?
এ কথা কল্পনা করো যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে
সে কথাই ভাবি আজ মনে।

পুরী
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৬

কন্‌গ্রেস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

কিছু কাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়। দিগন্ত-ব্যাপী অনুর্বরতা তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ ক'রে বহু যুগকে দরিদ্র ক'রে রেখেছিল।

এমন সময় আশ্চর্য অল্পকালেই বৃহৎ শূন্যতার মাঝখানে কন্‌গ্রেস মাথা তুলে উঠল দূর ভবিষ্যতের অভিমুখে, মুক্তির প্রত্যাশা বহন ক'রে, বহুশাখান্বিত বিপুল বনস্পতির মতো। বিরাট্ জনসাধারণের মন আশ্চর্য দ্রুতবেগে বদলে গেল; সেই মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধনমোচনের সঙ্কল্প করতে তার সঙ্কোচ আর রইল না।

কিছু দিন আগেই দেশ যা অসাধ্য ব'লেই হাল ছেড়ে ব'সে ছিল এখন তা আর অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল না। ইচ্ছা করবার দৈন্য আজ ঘুচেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের এত বড়ো পরিবর্তন ঘটতে পেরেছে কেবল এক জন মাত্র মানুষের অবিচলিত ভরসার জোরে, সেই ইতিহাসের বিস্ময়করতা হয়ত ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হতেও পারবে এমনতরো অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা মনে জাগছে।

সফল ভবিতব্যতার আশ্বাস নিয়ে আজ যে কন্‌গ্রেস অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপেরই প্রতিভার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালে কালে তার সংস্কারসাধনের তার সীমা পরিবর্ধনের প্রয়োজন নিশ্চয় ঘটবে তা জানি। কিন্তু চঞ্চল হয়ে বর্তমানের সঙ্গে হঠাৎ তার সামঞ্জস্যে আঘাত ক'রে একটা নাড়াচাড়া ঘটাতে গেলে মন্দিরের ভিৎ হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড়ো রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চারিত্রশক্তি এ দেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরি সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুমি জানো আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীত কালে ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে এ কথা আমি মানি নে। বর্তমান কন্‌গ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে তাও সত্য হ'তেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এই কন্‌গ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কংগ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ এ'কে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয় এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে থেকে কাটাছেঁড়া ক'রে নয়।

ইতিপূর্বে কন্‌গ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড়-করা

দোহাই-পাড়া মুক্তি-ফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি সে তুমি জানো। হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে। নব জীবনের তপস্যার সেই প্রথম পর্ব আজো সম্পূর্ণ হয় নি, আজো এ রয়েছে তাঁরি হাতে যিনি একে প্রবর্তিত করেছেন। শিবের তপোভূমিতে নন্দী দাঁড়িয়ে ছিলেন ওষ্ঠাধরে তর্জনী তুলে, কেননা তপস্যা তখনো শেষ হয় নি, বাইরের অভিঘাতে তাকে ভাঙতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

এই তো গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের সম্বন্ধেও ভাবনার কারণ প্রবল হয়ে উঠেছে। কন্‌গ্রেস যত দিন আপন পরিণতির আরম্ভ-যুগে ছিল, তত দিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সে কালের কন্‌গ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে মরত আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত, এমন কি সেই দরবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন সম্মানকে বিষের মতো জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বলো ফাসিজ্‌ম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি ক'রে চলেছে। কন্‌গ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার ক'রে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থ ভাবে কন্‌গ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হোত তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে; এই ব্যবহার-বিকৃতির মূলে আছে শক্তি-স্পর্ধার প্রভাব। খৃষ্টান-শাস্ত্রে বলে স্ফীতকায়া সম্পদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ। কেননা ধনাভিমানী ক্ষমতা আনে তামসিকতা। কন্‌গ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করছে বন্ধুর। মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদার ভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত ক'রে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত। ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গ'ড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ ব'লে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সত্যের যজ্ঞে যে-কন্‌গ্রেসকে গ'ড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজায় নরবলি-সংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিট্‌লার যাঁদের আদর্শ। আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধধর্ম্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত ক'রে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি। এত দিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলা দরকার। গত কন্‌গ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে এই অভিযোগ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে। চার দিকে সকলেই বিরুদ্ধ চক্রান্ত করছে, সর্বদা মনের মধ্যে এই রকম সংশয়কে আলোড়িত হ'তে দেওয়া মনোবিকারের লক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলন-কেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য। যে বিচ্ছেদের বাহন স্বয়ং ধর্মমত তার মতো দুর্লঙ্ঘ্য আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়-বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য। এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের সরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল ক'রে রেখেছে। যে-দেশের আচার অন্ধ জিদ্‌ওয়ালা নয়, যে-দেশের ধর্মভেদ সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে নি সেই দেশে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্বতই সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস সেই সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীব ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা সামাজিক অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।

কারণ যাই হোক প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন এক লেখায় ছিল, যে-জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়্‌মড়্ ঢলঢল করে যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যত ক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় তত ক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা ক'রে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মুক্তিযাত্রাপথের রথখানাকে আজ কন্‌গ্রেস টেনে রাস্তায় বের করেছে। পলিটিক্সের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় চলতে যখন সুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য। কেননা সন্দিগ্ধ মন সকল প্রকার আঘাত ও অবৈধতাকে অতিমাত্র ক'রে তোলে। তাই ঘটেছে আজ। সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর অত্যাবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুণ্ণ করে এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এত দিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা ক'রে এনেছেন; সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হ'তে দিতে যদি তিনি শঙ্কিত হন তাহলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্য-প্রিয়তার লোভে। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ধ্রুব ক'রে রাখেন। মহাত্মাজীর সেই বিশ্বাস যে সার্থক মোটের উপর তার প্রমাণ পেয়েছেন গুরুতর ভুলচুক সত্ত্বেও। এবং তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করতে তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না—সেও তিনি বিশ্বাস করেন। সকল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই রকম বিশ্বাসে অধিকার আছে। বিশেষত যখন তাঁর কৃত অসমাপ্ত সৃষ্টি গড়ে উঠবার মুখে। হয়ত মহাত্মাজীর সৃজনশালায় আরো অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ধৈর্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় না ঘটে তাহলে সমগ্রেরই হবে ক্ষতি। এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে। আমি নিজের সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করব যে মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাব-সম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্য রকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্পলোকেরই। দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত

করতে পারব না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাবত্রুটির মোচন হবে এবং সেই অভাব মোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন যোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব। সামনের যে ঘাট লক্ষ্য ক'রে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মত বলব না তার উর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরো আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।

আমার মনে যে পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয় নি। সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া কিন্তু তাদের কোনটারই ভিৎ গাড়া হয় নি বালির উপরে। যখন লুব্ধ মনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিত্তের মধ্যে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।

কিছু দিন হোলো একটি বিরল-বসতি পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আছি সদ্য উন্মথিত রাষ্ট্রিক উত্তেজনা থেকে দূরে। অনেক দিন পরে ভারতবর্ষকে এবং আপনাকে শান্ত মনে দেখবার অবকাশ পাওয়া গেল। দেখচি চিন্তা ক'রে মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্‌সের ব্যবহার। একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে সেটা যন্ত্রশক্তি, আর একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি। আজ য়ুরোপের সঙ্কটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।

বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির কোনোটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষাচর্চা। বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেট ভরে অবিবেচক খাল-কাটিয়ের খরচায়। তা ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। এক দিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই। এখন এসেছে সায়াল্স, শিক্ষিত বুদ্ধির 'পরে ভর ক'রে। শুধু বুদ্ধি নয় তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল। অথচ আমাদের লড়তে হবে শূন্য তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত। যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে নয় অন্ধ হয়ে ছোটে। দেশের পলিটিক্সের আরম্ভ হয়েছিল এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে। সেই জন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেণ্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়। এই রিক্ততার সমস্যা নিয়েই এক দিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, দুঃখ সয়েছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি। বিনা যন্ত্রশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে এইটে প্রমাণ করতে তাঁর আসা। একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন, কোনোটাতে যে শেষ পর্য্যন্ত জিতেছেন তা বলতে পারি নে। কিন্তু পরাভবের মধ্যে দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করছেন। ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরী করছেন যে-মন তাঁর সংকল্পিত অস্ত্র যথাযোগ্য সংযম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরই উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা। হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়; তার সমাপ্তি সর্বনাশে।

হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ তৈরী করা সহজ, বছরখানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে। কিন্তু অহিংস্র যুদ্ধে মনকে পাকা ক'রে তুলতে সময় লাগে।

অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান, এমন কি পাশব শক্তির রীতিমতো ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। জাপানের তো কথাই নেই—বড়ো বড়ো অন্য সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষাসত্র খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্‌সকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে, স্পষ্ট বুঝতে পারি নে এ সকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্‌সে প্রবীণ নই। এ কথা জানি যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন ক'রে থাকেন। মহাত্মাজীই তার প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবেন না। সে জন্য হয়ত অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে। কন্‌গ্রেসের অভিমুখে যদি কোন কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে। কেননা দেশের জননায়কতার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ, তার ভালমন্দ ফলাফল বহুদূরব্যাপী, অনেক সময়েই তা অভাবনীয়। নিজের উপরে যাঁর স্থির বিশ্বাস আছে তিনিই তা বহন করতে পারেন, কিন্তু এ সকল পোলিটিকাল প্রয়াস আমার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লে আমি অনুভব করি নে। পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন ক'রে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা ক'রে সকলে সম্মিলিত হ'তে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধ'রে। মহাত্মাজী যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন তখন একান্তমনে কামনা করেছিলুম তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করবেন। কেননা আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।

আজ আমি জানি বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা ক'রে আসছেন সে পলিটিক্‌সের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে—সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা ক'রে আমি সুদৃঢ়-সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন ক'রে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয়

রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মংপু
২০।৫।৩৯

অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বক্তব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি। হিন্দু মুসলমানের চাকরির হার বাটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নামস্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙালীর নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক,—তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে। এই দুঃখের ধাক্কাতেই আনবে যুগান্তর। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি। তার একটি মাত্র কারণ আছে। স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্যায় বিচার দেখলে শাসনকর্তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলাফল তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অন্নবিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র ক'রে তোলা। তাকে শান্ত করবার অবকাশ থাকবে না। পৃথিবীতে হিট্‌লার-মুসোলীনির দল অন্যায় করবার অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছেন নিজের প্রবল শক্তির থেকে। তারও একটা ভীষণ মহিমা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নিচের তলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেয়েছেন, উপরতলার প্রশ্রয় থেকে—এই অবিমিশ্র অন্যায়ে পৌরুষ নেই। তাই যারা অবিচার সহ্য করতে বাধ্য হয় তাদের মনে সম্ভ্রম জাগে না, অশ্রদ্ধা জাগে। দেশশাসনের ইতিহাসে এই স্মৃতিটা হেয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা এই শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের শরিক, অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর ক'রে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না। তাই আজ যে ব্যবস্থায় মুসলমানের জমার ঘরে ভুক্ত করছে সুবিধা, দীর্ঘকালের হিসাবে সেটা রয়ে যাবে নিয়ত ক্ষতির ছিদ্র-রূপে। তা ব'লে এই চিন্তায় হিন্দুদের সান্ত্বনার কথা নেই, কেননা আমাদের ইতিহাসের তহবিল সাধারণ তহবিল।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা ইন্দ্র রায়ের চিরদিনের অভ্যাস। এক কালে ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। বয়সের সঙ্গে ব্যায়ামের অভ্যাস আর নাই কিন্তু এখনও তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত খানিকটা হাঁটিয়া আসেন।

একলাই যাইতেন। গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা—অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে একটা শাল-জঙ্গল, জঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ-অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে। ঐ টিলাটাই ছিল তাঁহার প্রাতভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট স্থান, পৃথিবীর কক্ষপথের মত নির্দ্দিষ্ট প্রাতভ্রমণের কক্ষপথ। সম্প্রতি তাঁহার এক জন সঙ্গী জুটিয়াছে। তাঁহারই সমবয়সী এক বিদেশী ভদ্রলোক ডিস্‌পেপসিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধানে এখানেই আসিয়া পড়েন—ইন্দ্র রায়েরই আশ্রয়ে। ইন্দ্র রায় বর্ত্তমানে বাড়ী-ঘর ও কিছু জমিজায়গা দিয়া তাঁহাকে এখানেই বাস করাইয়াছেন। প্রাতভ্রমণে, পথে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে সঙ্গী হন এই ভদ্রলোক।

আজ ইন্দ্র রায় বাহিরে আসিয়া বাড়ীর ফটক খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিলেন। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ মুচকুন্দ সিং কাছারির বারান্দায় চিৎ হইয়া পড়িয়া অভ্যাসমত নাক ডাকাইতেছিল, রায় তাহার স্থূল উদরের উপর হাতের ছড়িটার প্রান্ত দিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন—এই, উঠো জলদি উঠো।

সিং নড়িল না, নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া দেখিল লোকটা কে? রায়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল—চমকানোর ভঙ্গিতে; পরমুহূর্ত্তে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—

—হুজুর!

—এস আমার সঙ্গে। লাঠি নাও।

—চাপরাস আওর পাগড়ি—

ধমক দিয়া রায় বলিলেন—না, এমনি লাঠিটা নিয়ে এস তা হ'লেই হবে।

লাঠি লইয়া সিং খুঁজিতেছিল—আঃ তেরি আঙোছা কাঁহা গইল বা? অন্তত গামছাটা কাঁধে না ফেলিয়া যাইতে কোন মতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। গামছাটা কোন মতে বাহির করিয়া সেইখানেই মাথায় জড়াইয়া লইয়া মুচকুন্দ বাহির হইল।

রায়ের সঙ্গী অচিন্ত্যবাবু ততক্ষণে উঠিয়া আপনার মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে চোখের তারা দুইটি গোঁফের উপর আবদ্ধ করিয়া বোধ হয় কাঁচা চুল বাছিতেছিলেন।

রায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—কাঁচা গোঁফ আর নেই বললেই চলে রায় মশায়।

রায় হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো আয়নাতেই দেখতে পান অচিন্ত্যবাবু।

অচিন্ত্যবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উঁহু—আয়না আমি দেখি নে।

রায় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—আয়না দেখেন না? কেন?

—ও দেখলেই আমার মনে হয়, শরীরটা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে গেছে। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে বাহন যে?

—আজ একটু দিগন্তরে যাব; নদীর ওপারে একটা চর উঠেছে, সেই দিকে যাব।

অচিন্ত্যবাবু চমকিয়া উঠিলেন—ওরে বাপ্ রে! ওখানে শুনেছি ভীষণ সাপ মশাই। শেষকালে কি প্রাণ হারাবেন? না না, ও মতলব ছাড়ুন—চর-কর দেখতে

ঐ বরকন্দাজ-মরকন্দাজ ভেজে দেন, না-হয় নায়েব-গোমস্তা।

—আরে না না, ভয় নেই আপনার। ওখানে এখন সাঁওতাল এসে বসেছে, রীতিমত রাস্তা করেছে, চাষ করেছে, কুয়ো খুঁড়েছে—কুয়োর জল নাকি খুব উৎকৃষ্ট। নদীর জলটাই আবার ফিল্টার হয়ে যায় তো! চলুন—চাষের জায়গা কি রকম দেখবেন, আপনার তো অনেক রকম প্ল্যান-ট্ল্যান আছে, চলুন কোনটা যদি কাজে লাগান যায় তো দেখা যাক।

অচিন্ত্যবাবু আর আপত্তি করিলেন না, কিন্তু গতি তাঁহার অতি মন্থর হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকের বাপ ছিলেন দারোগা, নিজে এফ্-এ পাস করিয়া চাকরি পাইয়াছিলেন পোষ্টাপিসে। কিন্তু রোগের জন্য অকালে ইন্‌ভ্যালিড পেন্সন লইয়াছেন। সামান্য পেন্সনে সংসার চলিয়া যায়, পিতার ও নিজের চাকরি-জীবনের সঞ্চয় লইয়া নানা ব্যবসায়ের কথা ভাবেন—সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইয়া কাগজে-কলমে লাভ-লোকসান কষিয়া ফেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্ম্মের সময় হাত-পা গুটাইয়া বসেন। পুনরায় অন্য ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।

কালিন্দীর কূলে আসিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—বিউটিফুল সানরাইজ! আপনি বরং ঘুরে আসুন রায় মশায়, আমি ব'সে ব'সে সূর্য্যোদয় দেখি।

রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যাবেন না? কিন্তু ভয় কি মৃত্যুর গতি রোধ করতে পারে অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্যবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তবুও যথাসাধ্য সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, তা ব'লে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বাহাদুরি নয়! ধরুন, পাঁচ হাজার টাকার তোড়ার পাশে একটা ভীষণ সাপ রেখে দিয়ে যদি কেউ বলে—নিয়ে যেতে পারলে টাকাটা তোমার; যাবেন আপনি নিতে?

রায় এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয়। সাপটাকে মেরে টাকাটা নিয়ে নেব।

অচিন্ত্যবাবু সবিস্ময়ে রায়ের মুখের দিকে কিছু ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তা আপনি নেন গিয়ে মশায়, ও আমি নিতেও চাইনে—যেতেও চাইনে। কথা শেষ করিয়াই তিনি নদীর ঘাটে শ্যামল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, এই হ'ল ঠিক আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রে! জবাকুসুমসঙ্কাশং!

ইন্দ্র রায় হাসিয়া জুতা খুলিয়া নদীর জলে নামিলেন।

আসল-কথা, ইন্দ্র রায় বিগত সন্ধ্যার সেই মশালের আলো জ্বালিয়া সাঁওতালবেষ্টিত রাঙাঠাকুরের পৌত্রের ঐ শোভাযাত্রা নিতান্ত সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাঙাঠাকুরের নাতি—আমাদের রাঙাবাবু, কথাটার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থের সন্ধান যেন তিনি পাইয়াছিলেন। রাত্রির শেষ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া বসিয়া এই কথাটাই শুধু চিন্তা করিয়াছেন। একটা দুগ্ধপোষ্য বালক এক মুহূর্ত্তে হিমালয়ের মত অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল যে! সাঁওতাল জাতের প্রকৃতি তো তাঁহার অজানা নয়! আদিম বর্ব্বর জাতি যাহাকে দেবতা বলিল, তাহাকে কখনও পাথর বলিবে না। বলুক, রামেশ্বরের ঐ সুকুমার ছেলেটিকে দেবতা তাহারা বলুক, কিন্তু দেবতাটি ঐ চর প্রসঙ্গে কোন দৈববাণী করিয়াছে কি না সেইটুকুই তাঁহার জানার প্রয়োজন, আসলে সেইটুকুই আশঙ্কার কথা। সেই কথাই জানিতে তিনি আজ দিক্-পরিবর্ত্তন করিয়া চরের দিকে আসিয়াছেন।

চরের ভিতরে সাঁওতাল-পল্লীর প্রবেশ-মুখে দাঁড়াইয়া তিনি মুচকুন্দ সিংকে বলিলেন—ডাক তো মাঝিদের।

মুচকুন্দ সিং পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মোটা গলার হাঁকে ডাকে সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল একটু চুন ও খানিকটা তামাক-পাতার। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিবার সময় ওটা ভুল হইয়া গিয়াছে। পল্লীর মধ্যে পুরুষেরা কেহ নাই, এই সকালেই আপন আপন গরু মহিষ ছাগল লইয়া এই বনজঙ্গলের মধ্যেই কোথায় চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আপন আপন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, তাহারা কেহই মুচকুন্দকে উত্তর দিল না। দুই-এক জন মাটি কোপাইয়া মাটির বড় বড় চাঙড় তুলিতেছে, পরে জল দিয়া ভিজাইয়া ঘরের দেওয়াল দেওয়া হইবে। মাত্র এক জন

আধাবয়সী সাঁওতাল এক জায়গায় বসিয়া একটা কাঠের পুতুল লইয়া কি করিতেছিল। পুতুলটার কোমর হইতে বেশ বড় এক ফালি কাপড় ঘাঘরার মত পরান। সেই ঘাঘরার মধ্যে হাত পুরিয়া ভিতরে সে পুতুলটাকে ধরিয়া আছে। হাঁকডাক করিতে করিতে মুচকুন্দ সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল—আরে, চল্ বাবু আসিয়েসেন তুদের পাড়া দেখতে।

মাঝি নিবিষ্টমনে আপন কাজ করিতে করিতে বলিল—সি—তু বল্‌গা যেঁয়ে মোড়ল মাঝিকে। আমি এখন যেতে লা-রব।

কৌতূহলপরবশ হইয়া মুচকুন্দ প্রশ্ন করিল—উটা কি আসে রে? কেয়া করে গা—উ—লেকে?

মাঝি হাতটা বাড়াইয়া পুতুলটা মুচকুন্দের মুখের কাছেই ধরিল, পুতুলটা সঙ্গে সঙ্গে দুইটা হাতে তালি দিয়া দিয়া মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। মুচকুন্দ আপনার মুখটা খানিকটা সরাইয়া লইয়া মুগ্ধ ভাবেই বলিল—আ—!

কয়টা তরুণী মেয়ে আঙিনা পরিষ্কার করিতেছিল—তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কখন একটা ছেলে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল মোড়ল মাঝির নিকট, সংবাদ পাইয়া কমল মাঝি ঠিক এই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। মুচকুন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বেশ বিনয় সহকারেই বলিল—কার সিপাই বটিস গো তু? বুলছিস কি?

মুচকুন্দ বলিল—ইন্দর রায়—ছোট তরফ। চল্ বাহার মে হুজুর দাঁড়াইয়ে আসেন।

মাঝি ব্যস্ত হইয়া আদেশ করিল—চৌপায়া নিয়ে আয়।

রায় এতক্ষণ চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা চরটা পাঁচ-শ বিঘা হইবে না, তবে তিন-শ বিঘা খুব। হাতে খানিকটা মাটি তুলিয়া তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মাটির ঢেলাটা আয়তনের অনুপাতে লঘু। সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বুঝিলেন, উর্ব্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণ-প্রসবিনী ভূমি—এ তাই। আবার এক বার চারি দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি চরটার সংলগ্ন এ-পারের গ্রামখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এ-গ্রামখানা চক-আফজলপুর, চক্রবর্ত্তীদের সম্পত্তি। এটার সম্মুখীন হইলে তো চরটা হইবে চক্রবর্ত্তীদের। কিন্তু ঠিক কি চক-আফজলপুরের সম্মুখেই পড়িতেছে? আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তরুণ সূর্য্য এবং আপনার ছায়াকে এক রেখায় রাখিয়া দাঁড়াইলেন। চৈত্র মাস—আজ পনরই চৈত্র; সূর্য্য প্রায় বিষুবরেখায় অবস্থান করিতেছেন। তাহা হইলে চক-আফজলপুর একেবারে উত্তরে। অন্ততঃ বারো আনা চর আফজলপুরের সীমানাতেই পড়িবে। একেবারে পশ্চিম প্রান্তের এক-চতুর্থাংশ—ষোল আনা রায় বংশের সীমানায় পড়িতেছে। ইন্দ্র রায় হাসিলেন, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। ইহারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রাধারাণীর সন্তানের ভোগ্য বস্তু তাহার সপত্নীপুত্র ভোগ করিবে এইটাই তাঁহার কাছে মর্ম্মান্তিক!

মাঝি আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া রায়কে প্রণাম করিল, একটা ছেলে চৌপায়াটা আনিয়া নামাইয়া দিল। রায় হাতের ছড়িটাকে চৌপায়ার উপর রাখিয়া ছড়িটার উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, বসিলেন না। তার পর প্রশ্ন করিলেন—তুই এখানকার মোড়ল মাঝি?

হাত জোড় করিয়া মাঝি উত্তর দিল—হ্যাঁ, বাবুমশয়।

—হুঁ। কত দিন এসেছিস এখানে?

—তা আজ্ঞা—এক দুই তিন মাস হবে গো! সেই—কাৰ্ত্তিক মাসে; এসেই তো ইখানে আলু লাগালম গো।

হাসিয়া রায় বলিলেন—বুঝলাম ছ-মাস হ'ল এসেছিস। কিন্তু কাকে ব'লে বসলি এখানে তোরা।

—কাখে বুলব? দেখলাম জঙ্গল জমি—পড়ে রয়েছে, বসে গেলম।

সুগভীর গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রায় বলিলেন—এ চর আমার।

মাঝি বলিল—সি আমরা জানি না।

—আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হ'লে কবুলতি লিখে দিতে হবে।

মাঝি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—সিটো আবার কি বেটে গো?

—কাগজে লিখে দিতে হবে যে—আপনি আমাদের জমিদার, আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি-কিস্তি মিটিয়ে দেব। তার পর সেই কাগজে তোরা আঙুলের টিপছাপ দিবি।

মাঝি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেন কথাটা সে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রায় বলিলেন—কথাটা বুঝলি তো? কবুলতি লিখে দিতে হবে।

ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের মেয়েগুলি আসিয়া এক পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল, মৃদুস্বরে আপনাদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনাও করিতেছিল। মাঝির নাতনী এবার বলিয়া উঠিল—কেনে—তা লিখে দিবে কেনে? টিপছাপটি দিবে কেনে।

—নইলে এখানে থাকতে পাবি না।

মেয়েটিই বলিল—কেনে, পাব না কেনে?

—না, চর আমার। থাকতে হ'লে কবুলতি দিতে হবে।

এতক্ষণে মাঝি ঘাড় নাড়িয়া প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিল—উঁহু।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রায় বলিলেন—উঁহু বললে চলবে না মাঝি! প্রজা-বন্দোবস্তির এই নিয়ম, কবুলতি না দিলে চলবে না।

সেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তুরা যদি খত্ লিখে লিস, এক-শ, দু-শ টাকা পাবি লিখিস?

রায় হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—না না, সে ভয় নেই, তা লিখে নেব না। জমিদার কি তাই কখনও করে?

মেয়েটা বলিল—করে না কেনে? ঐ—উ গাঁয়ে, সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি!

মাঝি এবার বলিল, তবে সিটো আমরা শুধাবো আমাদের রাঙাবাবুকে, সি যদি বলে তো, দিবো টিপছাপ!

রায়ের মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল, তিনি গম্ভীর ভাবে শুধু বলিলেন—হুঁ! তার পর পল্লীর দিকে পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন—মূচকুন্দ সিং।

মূচকুন্দ তখন সেই পুতুল-নাচের ওস্তাদ সাঁওতালটির সহিত জমাইয়া বসিয়াছিল। সে চুন ও তামাকের পাতা সহযোগে খৈনী প্রস্তুত করিতেছিল—আর ওস্তাদ নানা ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে বোল বলিতেছিল—চিলাক্, চিলাক্; চিলাক্, চিলাক্! সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাঠের পুতুলটাও ঘাড় মাথা নাড়িয়া তালে তালে তাল দিতেছিল, খটাস্, খটাস্; খটাস্ খটাস্।

মূচকুন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া তারিফ করিতেছিল। প্রভুর ডাক শুনিয়া সে বলিল—গাঁওমে যাস্ মাঝি; রোজগার হোবে তোর!

রায়বংশ শাখায় প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। আয়ের দিক দিয়া বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার বেশী আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোট বাড়ী আজ তিন পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ইন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে আর ওদিকে মাঝের বাড়ী অর্থাৎ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী রায়েদের সম্পত্তির তিন আনা চার গণ্ডা বা এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী। তাঁহার অংশের আয় হাজার আড়াইয়েক টাকা। আয় অল্প হইলেও ইন্দ্র রায়ের প্রতাপ এ অঞ্চলে যথেষ্ট। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর মস্তিষ্কবিকৃতির পর ইন্দ্র রায়ের এখন অপ্রতিহত প্রতাপ। বাড়ী ফিরিয়া তিনি সাঁওতাল-পল্লীতে দশ জন লাঠিয়াল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আদেশ দিলেন ঠিক বেলা তিনটার সময় মাঝিদের ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে বসাইয়া রাখিবে। সেইটাই তাহাদের খাইবার সময়। সাধারণতঃ সাঁওতালেরা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি—মাটির মত উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফাটিয়া বাহিরে আসে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে এক বার হয় কি না সন্দেহ।

অপরাহ্ণের দিকে লাঠিয়ালরা গিয়া তাহাদের আনিয়া ছোট বাড়ীর কাছারিতে আটক করিল। ইন্দ্র রায় বাড়ীতে তখনও দিবানিদ্রায় মগ্ন। মোড়ল মাঝি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—কই গো—বাবু-মশায় কই গো? এক সঙ্গে সাত-আট জন লাঠিয়াল সমস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল চো—প—!

কাছারি বাড়ীর সাজসজ্জা আজ একটু বিশিষ্ট রকমের, সাধারণ অবস্থার চেয়ে জাঁকজমক অনেক বেশী। কাছারি-ঘরে প্রবেশের দরজার দুই পাশে বারান্দার দেওয়ালের গায়ে গুণ-চিহ্নের ভঙ্গীতে আড়াআড়ি ভাবে দুইখানা করিয়া চারিখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে—দুই দিকেই মাথার উপরে এক-একখানা ঢাল। ইন্দ্র রায়ের বসিবার আসন ছোট তক্তাপোষটার উপর একটা বাঘের চামড়া বিছান। মুচকুন্দ সিং প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিয়া উর্দি ও তকমা আঁটিয়া ছোট একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। সাঁওতালেরা অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। ইন্দ্র রায় কূট কৌশলী ব্যক্তি—তিনি জানেন চোখে ধাঁধা লাগাইতে না পারিলে সম্ভ্রমের যাদুতে মানুষকে অভিভূত করিতে পারা যায় না। চাপরাশী নায়েব সকলেই ফিসফাস করিয়া কথা কহিতেছিল, এতটুকু জোরে শব্দ হইলেই নায়েব ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছিলেন—উঃ—!

অচিন্ত্যবাবু প্রত্যহ অপরাহ্নে এই সময়ে ইন্দ্র রায়ের নিকট আসেন। তিনি আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নায়েবের নিকট আসিয়া চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি মিত্তির মশায়? এত লোকজন, ঢাল-তলোয়ার! কোন দাঙ্গাটাঙ্গা না কি?

মিত্তির হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—হঠাৎ বাবুর খেয়াল আর কি?

অচিন্ত্যবাবুর দৃষ্টি ততক্ষণে কমল মাঝির উপর পড়িয়াছিল—তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—সর্ব্বনাশ! সাক্ষাৎ যমদূত! আচ্ছা—আমি চললাম এখন, অন্য সময় আসব।

—বসবেন না?

—উঁহু! একটু ব্যস্ত আছি এখন। মানে ঐ চরটায় শুনেছি অনেক রকম ওষুদের গাছ আছে। তাই ভাবছি, কলকাতায় গাছগাছড়া চালানের একটা ব্যবসা করব তারই একটু প্ল্যান, হিসেব-নিকেশ করতে হবে। তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দ্র রায় কাছারিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল—দেখাদেখি সাঁওতালরাও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র রায় আসন গ্রহণ করিয়া কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অস্নাত অভুক্ত সাঁওতালের দল নীরবে জোড়হাত করিয়া বসিয়া রহিল। কাছারি-বাড়ীর দরজায় কয়টি সাঁওতালদের মেয়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আপন আপন বাপ-ভাই-স্বামীর সন্ধানে আসিয়াছে। আপন ভাষায় তাহারা কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

ইন্দ্র রায় লাঠিয়ালদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন, এক জন লাঠিয়াল অগ্রসর হইয়া গিয়া মেয়েদের বাধা দিয়া বলিল—কি দরকার তোদের এখানে? যা, এখানে গোলমাল করিস নে।

একটি মেয়ে বলিল—কেনে তোরা আমাদের লোককে সব ধ'রে এনেছিস?

বৃদ্ধ কমল মাঝি আপন ভাষায় তাহাদের বলিল—যাও যাও তোমরা বাড়ী যাও। বাবু রাগ করবেন। সে বড় খারাপ হবে।

মেয়েগুলি সভয়ে ক্ষুণ্ণ মনেই চলিয়া গেল।

এতক্ষণে বৃদ্ধ মাঝি করজোড়ে বলিল—আমরা এখুনও খা-ই নাই বাবু; ছেড়ে দে আজ আ-মা-দিগে।

ইন্দ্ররায় বলিলেন—কবুলতিতে টিপছাপ দিয়ে বাড়ী চলে যা।

মাঝি বলিল—হা বাবু, সিটি কি ক'রে দিবো? আমাদের রাঙাবাবুকে আমরা শুধাই—তবে তো দিবো।

নায়েব ধমক দিয়া উঠিলেন, রাঙাবাবু কে রে? তাকে কি জিজ্ঞেস করবি? টিপছাপ দিতে হবে।

অদ্ভুত জাত—বিদ্রোহও করে না—আবার ভয়ও করে না: মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু!

আবার সাঁওতালদের মেয়েগুলির কলরব বাহিরে ফটক-দুয়ারের সম্মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আবার উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। রায়ের মনে এবার করুণার উদ্রেক হইল, আহা কোনমতেই ইহাদের এখানে রাখিয়া যাইতে বেচারাদের মন উঠিতেছে না। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি একজন লাঠিয়ালকে বলিলেন—দরজা খুলে ওদের আসতে বল্। তিনি স্থির

করিলেন—সকলকেই এখানে আহার করাইয়া আজিকার মত অব্যাহতি দিবেন। টিপসহি উহারা স্বেচ্ছায় দিয়া যাইবে।

লাঠিয়াল অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু ফটক দরজা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল—অহীন্দ্র। তাহার পিছনে পিছনে ঐ মেয়েগুলি। রায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুকঠিন ক্রোধে বজ্রের মত তিনি উত্তপ্ত এবং উদ্যত হইয়া উঠিলেন।

অহীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, এদের মেয়েছেলেরা কাঁদছে মামাবাবু। ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। এ বেচারারা এখনও স্নান করে নি খায় নি—এখন কি এমনি করে বসিয়ে রাখতে আছে? ছেড়ে দিন এদের।

এতগুলি কথা বলিয়া গেল অহীন্দ্র, বজ্রগর্ভ অন্তরে রায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার তাঁহার অবসর হইল না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তর-লোকেই সে বিদ্যুৎশিখা এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে বর্ষণোন্মুখ করিয়া তুলিল। সহসা তাহার মনে হইল—রাধারাণীর ছেলেই যেন তাহাকে ডাকিতেছে—মামাবাবু!

অহীন্দ্র এবার সাঁওতালদের বলিল, যা তোরা বাড়ী যা এখন; আবার ডাকতে গেলেই আসবি। বুঝলি!

সাঁওতালরা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু এক জন লাঠিয়াল বলিয়া উঠিল—খবরদার বলছি, ব'স—;

এতক্ষণে বজ্রপাত হইয়া গেল, দারুণ রোষে ইন্দ্র রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—চোপরাও হারামজাদা! তার পর সাঁওতালদের বলিলেন—যা তোরা বাড়ী যা।

৬

সমস্ত গ্রামে কিন্তু রটিয়া গেল—রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র ইন্দ্র রায়ের নাক কাটিয়া ঝামা ঘষিয়া দিয়াছে; ইন্দ্র রায় সাঁওতালদের আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অহীন্দ্র জোর করিয়া তাহাদের উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। রটনার মূলে ওই অচিন্ত্যবাবুটি। তিনি একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া—দূর হইতে যতটা দেখা যায় ও শোনা যায়, দেখিয়া শুনিয়া গল্পটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এমনি একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কল্পনা করিয়া সভয়ে স্থান ত্যাগ করিয়াও নিরাপদ দূরত্বের আড়ালে থাকিয়া ব্যাপারটা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সাময়িক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্র রায়ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য সকলে তাঁহার মাথায় যে-অপমানের অপবাদ চাপাইয়া দিল, সে-অপবাদ সংশোধন করা এখন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বড় ছেলে মহীন্দ্র এবং বিচক্ষণ নায়েব যোগেশ মজুমদার আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রেই তাহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ প্রাতঃকালেই তাঁহার লোক সাঁওতাল-পাড়ায় গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নায়েব সাঁওতাল-পাড়ায় ব'সে রয়েছেন—লোকজনও অনেকগুলি রয়েছে। আমরা সাঁওতালদের ডাকলাম—তাতে ওঁদের নায়েব বললেন—আমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, বলগে বাবুকে।

ইন্দ্র রায় গম্ভীর মুখে মাথা নত করিয়া পদচারণা আরম্ভ করিলেন, মনে মনে নিজেকেই তিনি বার-বার ধিক্কার দিতেছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন ওপারের চর ও তাঁহার মধ্যে প্রবহমানা কালিন্দী অকস্মাৎ দুকূল পাথার হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার পিছন পিছন সাঁওতালেরাও আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মজুমদার রায়কে প্রণাম করিয়া বলিল—ভাল আছেন?

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ। তার পর আবার বলিলেন—কি রকম?—আবার নাকি চক্রবর্ত্তীরা সাঁওতালদের নিয়ে দেশ জয় করবে শুনছি!

তাঁহারই কথার কৌতুকে হাসিতেছে—এমনি ভঙ্গিতে হাসিয়া মজুমদার বলিল—এসে শুনলাম সব। তা আমাদের ছোটবাবু অনেকটাই ওঁর পিতামহের মত দেখতে, এটা সত্যি কথা।

রায় ঠোঁট দুইটি ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিলেন—তা, সাঁওতাল-বাহিনী নিয়ে লড়াইটা প্রথম আমার সঙ্গেই করবে না কি তোমরা?

লজ্জায় জিব কাটিয়া মজুমদার বলিয়া উঠিল—রাম রাম রাম, এই কথা কি হয়, না হ'তে পারে! তা ছাড়া

আপনার অসম্মান কি কেউ এ অঞ্চলে করতে পারে বাবু?"

রায় চুপ করিয়া রহিলেন, মজুমদার আবার বলিল, সেই কথাই হচ্ছিল কাল ও-বাড়ীর গিন্নী-ঠাকরুণের সঙ্গে। তিনি বললেন—এ-বিবাদ গ্রাম জুড়ে বিবাদ। এখনও কেউ এগোয় নি বটে, কিন্তু বিবাদ আরম্ভ হ'লে কেউ পেছিয়ে থাকবে না। আমি সেই জন্য অহিকে—ও-বাড়ীর দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কাল তুমি এক বার যাবে মজুমদার-ঠাকুরপো, বলবে, তাঁর মত লোক বর্ত্তমান থাকতে যদি এমন গ্রামনাশা বিবাদ বেধে ওঠে তবে তার চেয়ে আর আক্ষেপের বিষয় কিছু হতে পারে না।

রায় শুধু বলিলেন—হুঁ।

মজুমদার আবার বলিল, আমাদের বড়বাবু—মহীন্দ্র-বাবু একটু তেজীয়ান, অল্প বয়স তো। তিনি অবশ্য বলছিলেন, মামলা-মোকদ্দমাই হোক; যার ন্যায্য হবে সে-ই পাবে চর; আমাকেও বললেন—সাঁওতালদের কারও ডাকে যেতে নিষেধ করতে। কিন্তু গিন্নী-ঠাকরুণ বললেন—তাই কখনও হ'তে পারে! আর আমাদের অহীন্দ্রবাবু তো অন্য প্রকৃতির ছেলে, তিনি বললেন, না তা হ'তে পারে না দাদা, আমি মামাকে ব'লে তাদের ছুটি ক'রে দিয়েছি। কড়ার ক'রে ছুটি ক'রে দিয়েছি, তিনি ডাকলেই ওদের যেতে হবে। আমি নিজে ওদের ওখানে হাজির ক'রে দেব। তিনি নিজেই আসতেনও, তা আজ স্কুল খুলবে, ভোরেই চ'লে গেলেন শহরে।

রায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া উঠিলেন, এই ছেলেটি তাঁহার কাছে যেন একটি জটিল রহস্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সমস্ত সকালটাই তিনি ঐ ছেলেটির সম্পর্কে ভাবিতেছিলেন—অদ্ভুত কূট বুদ্ধি ছেলেটির। সেদিন মশালের আলো জ্বালাইয়া সে যখন যায়—সেদিনও তিনি সেই কথা ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই ছেলেটি তাঁহাকে লজ্জিত করিয়া সহাস্যমুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে!

মজুমদার বলিল, আপনার মত ব্যক্তিকে আমার বেশী বলাটা তো ধৃষ্টতা। গ্রাম জুড়ে বিবাদ হ'লে তো মঙ্গল কারু হবে না। এ দিকে কাগজপত্র, কার কি স্বত্ব—এখানকার সমস্ত হাল-হদিস আপনার নখদর্পণে, আপনি এর বিচার ক'রে দেন।

রায় বলিলেন, রামেশ্বরের ছোট ছেলেটি সত্যই বড় ভাল ছেলে! ক্ষুরের ধারের মত স্বচ্ছন্দে কেটে চলে, কোথাও ঠেকে যায় না। ছেলেটি ওদের বংশের মতও নয় ঠিক; চক্রবর্ত্তী-বংশের চুল কটা, চোখ কটা, কিন্তু গায়ের রংটা তামাটে! এ ছেলেটি বোধ হয় মায়ের রং পেয়েছে, না হে?

মজুমদার বলিল—হ্যাঁ, গিন্নী-ঠাকরুণ আমাদের রূপবতী ছিলেন এককালে, আর প্রকৃতিও বড় মধুর। ছেলেটি মায়ের মতই বটে, তবে আমাদের কর্ত্তাবাবুর বাপের রং ছিল এমনি গৌরবর্ণ।

—হ্যাঁ, সাঁওতালেরা সেই জন্যেই তাঁর নাম দিয়েছিল রাঙাঠাকুর। একেও না কি সাঁওতালেরা নাম দিয়েছে—রাঙাবাবু।

মাঝির দল এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবার সর্দ্দার কমল মাঝি বলিল—হুঁ, আমি দিলম সি নামটি। রাঙাঠাকুরের নাতি—তেমুনি আগুনের পারা গায়ের রং—আমি বললম—রাঙাবাবু!

রায় গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন; সাঁওতালের কথার উত্তর তিনি দিলেন না। সুযোগ পাইয়া মজুমদার আবার বর্ত্তমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, তা হ'লে সেই কথাই হ'ল। গ্রামের সকল সরিককে ডেকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে এর মীমাংসা হয়ে যাক। যার চর হবে সেই খাজনা নেবেন ওদের কাছে। ওরা এখন যাক। গরিব-দুঃখী লোক—যত ক্ষণে খাটবে তত ক্ষণে ওদের অন্ন।—বলিয়া রায় কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মজুমদার-মাঝিদের বলিয়া দিল—যা, তাই তোরা এখন বাড়ী গিয়ে আপন আপন কাজকর্ম্ম কর গে। আমরা সব নিজেরা ঠিক করি কে খাজনা পাবে—তাকেই তোরা কবুলতি দিবি, খাজনা দিবি।

মাঝির দল প্রণাম করিয়া তাহাদের নিজস্ব ভাষায় বোধ করি এই প্রসঙ্গ লইয়াই কল-কল করিতে করিতে চলিয়া গেল। রায় গম্ভীর মুখেই একই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন বসিয়াছিলেন বসিয়া রহিলেন। সাঁওতালের দল

বাহির হইয়া গেলে তিনি বলিলেন—সেই ভাল মজুমদার, ও বেচারাদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি, যাক ওরা। আগে এই বিবাদের মীমাংসাই হয়ে যাক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—এক দিন গ্রামের সমস্ত সরিককে ডেকে—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন—সরিকরা তো তৃতীয় পক্ষ সর্ব্বাগ্রে মীমাংসা হোক ছোটতরফ আর চক্রবর্ত্তীদের মধ্যে।

—বেশ তাই হোক এক দিন প্রমাণ-প্রয়োগ দেখে তাতে যা ব'লে দেবেন তাই হবে।

—না। এক দিন প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ ক'রে, তাতে বলে যার হবে, সেই নেবে চর। তার পর মামলা-মোকদ্দমা তো পরের কথা।

হাত জোড় করিয়া মজুমদার বলিল—না না বাবু, এ কথা কি আপনার মুখে সাজে! আপনি হলেন ও বাড়ীর মুরুব্বি ছেলেদের—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন—ও কথা ব'লো না মজুমদার। বার বার আমার আর অপমান তুমি ক'রো না। ও কথা মনে পড়লে আমার বুকের ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল; কিছুক্ষণ পর আবার সবিনয়ে বলিল, আপনি বিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তি, বড়লোক; তবে আপনাদের চাকর ব'লেই সাহস ক'রে বলছি—এ আগুন কি জ্বেলে রাখা ভাল হবে বাবু?

অস্থির হইয়া বার-বার ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিলেন—রাবণের চিতা মজুমদার, ও নিববে না, নিববার নয়।

মজুমদার আর কথা বাড়াইল না, তাহার চিত্তও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আপন প্রভুবংশের মানমর্য্যাদা আর সে খাটো করিতে পারিল না, সবিনয়ে হেঁট হইয়া রায়কে প্রণাম করিয়া এবার সে বলিল—আজ্ঞে বেশ। আপনি যেমন আদেশ করলেন তেমনি হবে।

রায় বলিলেন—ব'স। বেলা অনেক হয়েছে—একটু সরবৎ খেয়ে যাও। না খেলে আমি দুঃখ পাব মজুমদার।

মজুমদার আবার আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—আজ্ঞে, এ তো আমার চেয়ে খাবার ঘর।

মজুমদার চলিয়া গেল। রায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন। কুক্ষণে অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাধারাণীর সুপ্ত স্মৃতি সুপ্তি ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তীদের উপর দারুণ আক্রোশে ক্রোধে তিনি যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন। রামেশ্বরের মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টিলোপ হওয়ার পর তিনি শান্ত হইয়াছিলেন। আবার এই চর উপলক্ষ্য করিয়া অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে আক্রোশ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের জন্য তিনি পথ ছাড়িয়া দিবেন! আজ এই ছেলেটি যদি রাধারাণীর হইত তবে এমনি দ্বন্দ্বের অভিনয় করিয়া তিনি গোপনে হাসিতে হাসিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঘরে ঢুকিতেন। লোকে বলিত—ইন্দ্র রায় ভাগিনেয়ের কাছে পরাজিত হইল! এ ক্ষেত্রে পরাজয়ে রাধারাণীর গৃহত্যাগের লজ্জা দ্বিগুণিত হইয়া লোকসমাজে তাঁহার মাথাটা ধুলায় লুটাইয়া দিবে। আর তিনি সরিয়া দাঁড়ানোর অর্থই হইল রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেওয়া!

অচিন্ত্যবাবু রায়-বাড়ীর ভিতর হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন। রায়ের আট বৎসরের কন্যা উমাকে তিনি পড়াইয়া থাকেন। উমাকে পড়াইয়া কাছারিতে আসিয়া রায়ের সম্মুখে তক্তপোষটার উপর বসিয়া বলিলেন—চমৎকার একটা প্ল্যান করে ফেলেছি রায় মশায়। দেশী গাছ-গাছড়া সাপ্লাই এর ব্যবসা। চরটার উপর নাকি হরেক রকমের গাছ-গাছড়া আছে। যা শুনলাম, তাতে শতকরা দু-শ লাভ! দেখবেন নাকি হিসেবটা?

—থাক এখন।

—আচ্ছা থাক। আর ভাবছি পাঁচ রকম মিশিয়ে অম্বলের ওষুধ একটা বের করব। বাংলা দেশে এখন অম্বলটাই, মানে, ডিসপেপসিয়াটাই হ'ল প্রধান রোগ।

রায় ও-কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, তিনি ডাকিলেন নায়েবকে, মিত্তির! একবার ননীচোরা পালকে তলব দাও তো, বল জরুরী দরকার। আর, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি ভিতরে। রায় উঠিয়া কাছারি-ঘরের ভিতরে চলিয়া

গেলেন। নায়েবকে বলিলেন, দুখানা ডেমিতে একটা বন্দোবস্তির পাট্টা কবুলতি করে ফেল। আমরা ননী পালকে কুড়ি বিঘে চর বন্দোবস্ত করছি।

নায়েব বলিল—যে আজ্ঞে।

ননী পাল একজন সর্ব্বস্বান্ত চাষী। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, জেলও কয়েক বার খাটিয়াছে, এখন করে পান-বিড়ি, মুড়িমুড়কির দোকান, লোকে বলে চোরাই মালও নাকি সে সামলাইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া চোরাই ধান। এক বার দারোগার নাকে কিল মারিয়া সে তাহার নাকটা ভাঙিয়া দিয়াছিল, একবার দুই আনা ধারের জন্য রায়েদেরই ফুলবাড়ীর একটি ছেলের সহিত বচসা করিয়া তাহার কান দুইটা মলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—এতেই আমার দু-আনা শোধ হ'ল। এমনি প্রকৃতির লোক ননীচোরা পাল। রায় কণ্টক দিয়া কণ্টক তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন; বিশ বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে জমিদার স্বীকার করিয়া চক্রবর্ত্তীদের সহিত বিবাদ করিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

এই লইয়াই আরও দুই-চারিটা কথা বলিয়া রায় বাহিরে আসিলেন। অচিন্ত্যবাবু তখন কাছারি-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, রায় বলিলেন—চললেন যে?

অচিন্ত্যবাবু সংক্ষেপে বলিলেন—হ্যাঁ।

রায় হাসিয়া বলিলেন—বসুন, বসুন। আপনার প্ল্যানটা শোনা যাক।

—আজ্ঞে না দুর্জ্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করাটা ভাল। ননী পালটা বড় সাংঘাতিক লোক! ব্যাটা হঠাৎ মেরে বসে।

—পাগল না কি আপনি। দেখেছেন—দেওয়ালের গায়ে ক'খানা তলোয়ার ঝুলছে!

শিহরিয়া উঠিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—খুলে ফেলুন ওগুলো। ওগুলো বড় সাংঘাতিক জিনিষ। বাঙালীর হাতে অস্ত্র গভর্ণমেণ্ট অনেক বুঝেই আইন ক'রে কেড়ে নিয়েছে। ওগুলোর লাইসেন্স আছে তো আপনার?

বলিতে বলিতেই তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই কন্যা উমা আপন মনেই হারাধনের দশটি ছেলের ছড়া বলিতে বলিতে আসিয়া ঐ ছড়ার সুরেই বলিল—বাবা আপনাকে মা ডাকছেন, বেলা অনেক হয়েছে, স্নান করুন। বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার হাসি থামাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—কানে কানে একটা কথা বলি বাবা!

রায় তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া দিলেন, সে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—প—অন্তস্থ য়—দন্ত্য সয়ে আকার।

হাসিয়া রায় বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা। হচ্ছে। তুমি বাড়ীর মধ্যে চল—আমার যেতে একটু দেরি হবে তোমার মাকে বল গিয়ে।

উমা প্রশ্ন করিল—কয়ে একার দন্ত্য ন?

—কাজ আছে মা।

—না, চলুন আপনি।

—ছি! ওরকম করে না, কাজ আছে শুনছ না। ওই দেখ লোক এসেছে কাজের জন্যে।

ননী পাল আসিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বেঁটে খাটো কঠিন কাঠের মত শক্ত শরীর, লোকটার কপালের নীচেই নাকের উপর একটি অদ্ভুত খাঁজ, ওই খাঁজটা লোকটার হিংস্র মনোভাব তাহার মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রামে কিন্তু ততক্ষণে ননী পালকে জমি বন্দোবস্তের সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যবাবু গাছ-গাছড়ার ব্যবসার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। সর্ব্বনাশ, চরের উপর কোন্ দিন ব্যাটা খুন ক'রেই দেবে আমাকে!

* * *

হেমাঙ্গিনী স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। কাজ শেষ করিয়া স্নান করিয়া রায় যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। স্বামীর, পূজা-আহ্নিকের আসনের পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী কি যেন ভাবিতেছিলেন। রায়কে দেখিয়া বলিলেন—এত বেলা কি করে? খাবে আর কখন?

রায় পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্যই অকারণেই একটু

হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দেরি একটু হয়ে গেল। জরুরী কাজ ছিল একটা।

—বেশ, আহ্নিক সেরে নাও দেখি আগে। এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীর কারও খাওয়া হয় নি। উমাই কেবল খেয়েছে।

রায় আহ্নিকে বসিলেন।

আহারাদির পর রায় শয্যায় শুইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন। সমস্ত বাড়ীটা একরূপ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে চৈত্রের রৌদ্র তরুণ বহ্ন্যুত্তাপের মত অসহ্য না হইলেও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, পাখীরা এখন হইতেই এ সময়ে ঘনপল্লব গাছের মধ্যে বিশ্রাম সুরু করিয়া দিয়াছে। বাড়ীর বারান্দার মাথায় ঘুলঘুলিতে বসিয়া পায়রাগুলি গুঞ্জন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে রুদ্ধদ্বার জানালার খড়খড়ি দিয়া উত্তপ্ত এক এক দমকা বাতাস আসিতেছে—উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে বয়ড়া ও মহুয়া ফুলের উগ্র মাদক গন্ধ। ঝর ঝর সর্ সর শব্দে বাহিরে বাতাসে ঝরা পাতা উড়িয়া চলিয়াছে। সূর্য্য আর পবন দেবতার খেলা চলিতেছে বাহিরে। দুটি কিশোরের মিতালির লীলা।

হেমাঙ্গিনী ভাঁড়ারে ও লক্ষ্মীর ঘরে চাবি দিয়া আসিয়া স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। রায় প্রশ্ন করিলেন—সারা হ'ল সব?

—হ'ল।

—খুব খিদে পেয়েছিল তোমার, না?

—হ্যাঁ খুব। মনে হচ্ছিল বাড়ীর ইঁট-কাঠ ছাড়িয়ে খাই—হ'ল তো!

রায় হাসিয়া বলিলেন—রাগটুকু খুব আছে!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—দেখ একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—বলছিলাম, আর কেন?

রায় ঐটুকুতেই সব বুঝিলেন, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। রামেশ্বরের প্রতি হেমাঙ্গিনীর স্নেহের কথা তিনি জানেন। সে স্নেহ হেমাঙ্গিনী আজও ভুলিতে পারেন নাই।

হেমাঙ্গিনী একটু অপ্রতিভের মতই বলিলেন, মুখ ফিরিয়ে শুলে যে? ভাল ও কথা আর বলব না। এখন আর একটা কথা বলি, শোন! এটা আমার না বললেই নয়।

না ফিরিয়াই রায় বলিলেন—বল।

দৃঢ়তার সহিত হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বিবাদ করবে কর, কিন্তু অন্যায় অধর্ম্ম তুমি করতে পাবে না। আমার বিমল গেছে, কমল গেছে—অবশিষ্ট অমল আর উমা; ওদের অমঙ্গল আমি হ'তে দিতে পারব না।

রায় এবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বিমল ও কমল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মারা গিয়াছে। তাহাদের অকালমৃত্যুর হেতু বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া হেমাঙ্গিনী যখন তাঁহার পাপপুণ্যের হিসাব কষিতে বসেন তখন তাঁহার মাথাটা যেন মাটিতে ঠেকিয়া যায়।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বল, আমাকে ছুঁয়ে তুমি শপথ কর কোন অন্যায় অধর্ম্ম তুমি করবে না!

রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কেন তুমি প্রতি কাজে ঐ কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও বল তো?

রুদ্ধকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বিমল-কমলের মুখ যে আমার অহরহ মনে পড়ে। তুমি ভুলেছ কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না! তাই আমাকে তোমাকে মনে পড়িয়ে দিতে হয়।

রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—জানালাটা খুলে দাও দেখি! বেলা বোধ হয় পড়ে এল। হেমাঙ্গিনী জানালা খুলিয়া দিলেন, রোদ অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে, পাখীরা থাকিয়া থাকিয়া সমবেত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে, বিশ্রাম তাহাদের শেষ হইয়া গেল এ ইঙ্গিত তাহারই। রায় জানালা দিয়া নদীর ওপারে ঐ চরটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন ঐ কথাই। বিমল-কমল, রাধারাণী-রামেশ্বর, রায়বাড়ী। এ কি দ্বিধার মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করিল হেমাঙ্গিনী!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বল।

রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তাই হবে! তিনি স্থির করিলেন অপরাহ্ণেই ননীকে ডাকাইয়া পাট্টা-কবুলতি সমস্ত নাকচ করিয়া দিবেন।

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন,

বোধ করি আবেগ তাঁহার ধৈর্য্যের কূল ছাপাইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। রায় নীরবে ঐ চরের দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিলেন। মনটা কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে। দীপ্ত সূর্য্যালোকে কালীর বালি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। চরের উপরে বেনাঘাস দমকা বাতাসে হাজার হাজার সাপের ফণার মত নাচিতেছে। আকাশ ধূসর। এত বড় প্রান্তর অথচ কোথাও একটা মানুষ দেখা যায় না। অথচ মাটি লইয়া মানুষের কাড়াকাড়ি সেই কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—কোন কালেও বোধ করি এ কাড়াকাড়ির শেষ হইবে না। নাঃ ভাল বলিয়াছে হেমাঙ্গিনী; কাজ নাই; রায়হাটের সঙ্গে রায়বাড়ী না-হয় কালীর গর্ভেই যাইবে! ক্ষতি কি?

হেমাঙ্গিনী ফিরিয়া আসিলেন, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন, অমলকে টাকা পাঠিয়েছ? অমল মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়ে।

রায় অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন—পাঠিয়েছি।

—দেখ।

—বল।

—এ-দিকে ফিরেই চাও। দোষ তো কিছু করি নি আমি।

অল্প একটু হাস্যের সহিত মুখ ফিরাইয়া রায় বলিলেন—না, তুমি ভালই বলেছ। আর কি হুকুম বল।

—উমাকেও আমি দাদার ওখানে পাঠিয়ে দেব। শহরে থেকে একটু লেখাপড়া শিখবে—একটু সহবৎ শিখবে। জামাই আমি ভাল করব। এখানে থাকলে গেঁয়ো মেয়ের মত ঝগড়া শিখবে, আর যত রাজ্যের পাকামো।

রায় বলিলেন—হ্যাঁ, রায়বাড়ীর মেয়ের অখ্যাতিটা আছে বটে। তাঁহার মুখে এক বিচিত্র করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল সে-দিনের কথা, রামেশ্বরের পিতামহী বলিয়াছিলেন রাধারাণীর প্রসঙ্গে, রায়বাড়ীর মেয়ের ধারাই ঐ, চিরকেলে জাঁহাবাজ।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, স্বামী কথাটায় আহত হইয়াছেন, তিনি অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—রাগ করলে?

পত্নীর কণ্ঠে সাদরে একখানি হাত ন্যস্ত করিয়া রায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না না, তুমি সত্য কথাই বলেছ।

প্রৌঢ় দম্পতির উভয়েরই চোখে অনুরাগভরা দৃষ্টি। কিন্তু সহসা চমকিয়া উঠিয়া দুই জনেই পরস্পরকে ছাড়িয়া দিলেন। এ কি এত কলরব কিসের? গ্রামের মধ্যে কোথায় একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে? কোথাও আগুন লাগিল না কি? রায় বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া ব্যস্ত হইয়া কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

—কর্ত্তাবাবু! নীচে কে ডাকিল, নায়েব মিত্র বলিয়াই মনে হইতেছে।

—কে? মিত্তির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গোলমাল কিসের মিত্তির?

—আজ্ঞে রামেশ্বরবাবুর বড়ছেলে মহীন্দ্রবাবু ননী পালকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছেন।

রায় কাপড় পরিতেছিলেন, সহসা তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। হেমাঙ্গিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন, তুমি করলে কি? ছি!

রায় দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

দারা শুকোর কান্দাহার-অবরোধের প্রথম পর্ব

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

প্রমাণ-পঞ্জী

দারার কান্দাহার-অভিযান ও অবরোধের বিবরণ আমরা মোটামুটি তিনটি প্রামাণিক ফার্সী ইতিহাস হইতে সবিস্তার জানিতে পারি। শাহজাহানের দরবারী ইতিবৃত্ত 'বাদশাহ্-নামা'র তৃতীয় খণ্ডে (জুলুসী সন ২০ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত) মোল্লা ওয়ারেস এই অভিযানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ্-নামা সরকারী দলিল-পত্র ও সংবাদ-তালিকা দৃষ্টে লিখিত; স্বয়ং বাদশাহ্কে ইহা পড়িয়া শুনান হইত এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আবশ্যকমত সংশোধন করা হইত। সুতরাং ইহাতে তারিখ, মানুষের নাম, মোটামুটি ঘটনা নির্ভুল দেওয়া হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সঠিক এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কদাচিৎ সরকারী ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। আজকালকার দিনে যেমন কোন গুরুতর ঘটনার সরকারী ও বেসরকারী সংবাদে মাঝে মাঝে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেকালেও তাহাই ছিল। সরকারী সাফাই ও বে-সরকারী অভিযোগগুলিকে বিচারকের সূক্ষ্মদৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও সাক্ষ্য-আইনের মূলসূত্রসমূহের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু বাদশাহী আমলে—তথা যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্র-শাসিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র—বে-সরকারী সংবাদ কিংবা বিরুদ্ধ সমালোচনা বলিয়া কিছুই ছিল না। রাজা, রাজপুত্র, বা সুবেদারের বিরুদ্ধে অতি সত্য হইলেও কেহ কিছু প্রকাশ্য ভাবে লিখিতে সাহস করিত না। শত বাধা সত্ত্বেও এখনকার বে-সরকারী কাগজে সরকারের বিরুদ্ধে যাহা প্রকাশ করা সম্ভব, মধ্যযুগে উহা ছিল কল্পনার অতীত—মোগল-সরকারের বিরুদ্ধে কেহ টুঁ শব্দ করিলে তাহার রক্ষা ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে কান্দাহার-অভিযানের বে-সরকারী বিবরণ এক জন বেনামী লেখক মোগল-শিবিরে বসিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকের নাম 'লতাইফ-উল-আখ্বার'; উহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

আমি দরবারের বিশেষ অনুগ্রহভাজন অন্তরঙ্গ আমীর-উমরা কিংবা দরবারী মোসাহেব নই। সরকারী দপ্তরের কেরাণী, রাজদূত কিংবা ওয়াকীয়া-নবিস্ (সংবাদ-প্রেরক) হিসাবে চাকরি আমি করি না; সুতরাং মিথ্যা কথা বলিবার আমার প্রয়োজন হয় না; মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করা আমার উপজীব্য নহে। প্রকৃত ঘটনা গোপন, যাহা ঘটে নাই উহা ঘটিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া কিংবা কান্দাহারের খবর শুনিবার জন্য হিন্দুস্থানে যাহারা কান খাড়া করিয়া আছে তাহাদের জন্য "মজার খবর" লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। যে-ক্ষেত্রে কোন মতলব নাই কিংবা কাহারও অনুগ্রহলাভের উপর নজর নাই, সে-ক্ষেত্রে মানুষ সত্য হইতে বিচলিত হওয়ার কিংবা স্পষ্টবাদী না হওয়ার হেতু থাকিতে পারে না। লোকের কাছে অপরিচিত সামান্য ব্যক্তি হইলেও আমি বলিতে পারি খোদার কসম্—এই সফরে আমি যাহা দেখিয়াছি, অন্য কেহ তাহা দেখে নাই; কেহ যদি দেখিয়া থাকে সে দুনিয়াদারীর মতলবে উহা গোপন করিয়াছে; কিছু যদি বলিয়া থাকে সে উল্টাই বলিয়াছে। যাহারা গোশা-নশীন্, লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহারা এক কোণে পড়িয়া আছে, এই জমানার হাল তাহারাই বরং ভাল জানে।

এই বেনামী লেখকের পরিচয় সর্ব্বপ্রথম দিয়াছেন ঐতিহাসিক মহম্মদ হাশিম খাফি খাঁ। রিউ সাহেব ঠিক অনুমান করিয়াছেন 'লতাইফ্-উল্-আখবার' ও খাফি খাঁ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত 'তারিখ-ই-কান্দাহার' একই পুস্তক—ইহার লেখক মহম্মদ বদী, পুরা নাম রসীদ খাঁ ওরফে বদীউজ্জমান্-মহাবৎ-খানী। আওরঙ্গজেব-রাজত্বের চতুর্ব্বিংশ বর্ষে তিনি দেওয়ান-ই-খালিশা পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং উহার একচল্লিশ বৎসরে তাঁহার

মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথম মহাবৎ খাঁর পুত্র মির্জ্জা লোহারসপ—যিনি পিতার মহাবৎ খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—কান্দাহার-অভিযানে মহম্মদ বদীকে সম্ভবতঃ কোন অসামরিক কর্ম্মচারী হিসাবে সঙ্গে লইয়াছিলেন। 'লতাইফ্-উল্-আখবার' পড়িলে প্রথমে সন্দেহ হয়, লেখক দারার দরবারে এক জন অনাদৃত এবং শাহ্জাদার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি—যেমন আকবরী দরবারের মোল্লা বদায়ুনী। এই বেনামী লেখক যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং অন্যের কাছে শুনিয়াছেন, উহাই দৈনিক বিবরণ হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; গল্পগুজব কিছু কিছু থাকিলেও তাঁহার লিখিত যে-সমস্ত ঘটনা দারার সর্ব্বজনবিদিত দোষগুণ ও দুর্ব্বলতার উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণযোগ্য, ঐতিহাসিক ঐগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্র রাজত্বকালে সুপণ্ডিত ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মহম্মদ হাশিম—প্রচলিত নাম খাপি খাঁ তাঁহার 'মুন্তাখাব্-উল-লুবাব' নামক ইতিহাস-গ্রন্থে দারার কান্দাহার-অভিযান বর্ণনায় পূর্ব্বোক্ত বেনামী লেখকের 'লতাইফ্-উল-আখ্বার' সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, কেননা তিনি দরবারী ইতিহাস-লেখক ছিলেন না; বিশেষতঃ তখন শাহ্জাহান-দারা-আওরঙ্গজেব জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছেন। খাপি খাঁ আওরঙ্গজেবকেও রেহাই দেন নাই; বাদশাহ্র শত্রুকে ইসলামের শত্রুজ্ঞানে হিন্দুদের উপর অযথা গালিবর্ষণ করিয়া ধর্ম্মান্ধতার পরিচয়ও তিনি দেন নাই। সুতরাং দারার প্রতি কোন আক্রোশ না থাকিলেও খাপি খাঁ যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহা কখনও ভিত্তিহীন হইতে পারে না।

বাদ্শাহী ফৌজের মোর্চ্চাবন্দী ও থানা কায়েম

২৮শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদশাহী ফৌজের বিভিন্ন মনসবদারগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া কান্দাহার-দুর্গের অবরোধ-বেষ্টনী সম্পূর্ণ করিলেন। কান্দাহার-দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দরওয়াজার সামনে সেনাধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত ক্রমে তাঁবু গাড়িয়া বসিলেন,—

বাবা ওয়ালী দরওয়াজা—মহাবৎ খাঁ (পাঁচ হাজারী)
ওয়েস্ করন দরওয়াজা—কিলিচ খাঁ (পাঁচ হাজারী)
ওয়েস করণ ও খ্বাজা খিজির
দরওয়াজার মধ্যবর্ত্তী স্থান—মীর্জ্জা জাফর (দারার তোপখানার মীর-অতিশ্)
খ্বাজা খিজির দরওয়াজা—পদাতিক বাহিনী সহ শাহ্জাদার মীর-বক্শী আবদুল্লা
খ্বাজা খিজির দরওয়াজা এবং
মাশুরী দরওয়াজার মধ্যবর্ত্তী স্থান—বাদশাহী তোপখানার মীর-অতিশ্ কাসিম খাঁ (চার হাজারী)
মাশুরী দরওয়াজা—মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ (পাঁচ হাজারী)
চেহেল-জিনা বুরুজ—ইখলাস্ খাঁ (তিন হাজারী)
লাখা-উপদুর্গ—বাকী খাঁ চম্পৎ রায় বুন্দেলা, সৈয়দ মীর্জ্জা ও অন্যান্য মনসবদারগণ।

কান্দাহার-দুর্গের তিন দিকে পরিখা; অন্য দিকে উচ্চ সুরক্ষিত পাহাড়, পরিখার পরে কোথাও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর; কোন কোন স্থানে খড় ও পাথর মিশান মাটির তৈয়ারী দশ গজ চওড়া পর্দ্দা। পরিখা জলশূন্য করিয়া ভরাট না করিলে প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব, এজন্য শাহ্জাদা দারার মীর-সামান্ মোল্লা ফাজিল পরিখার জল-নিষ্কাশনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ১০৭০ খনক (sapper) এবং একদল রক্ষী-সৈন্যসহ সৈয়দ মামুদ (বারাহ্ সৈয়দ) তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। ৪ঠা মে শাহ্জাদা দারা কামরান্ মীর্জ্জার উদ্যানে নিজ তাঁবুতে পদার্পণ করিলেন। বুস্ত হইতে কান্দাহার আসিবার রাস্তায় পারস্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গ এক ভারী ফৌজ লইয়া মাটি আগলাইয়া বসিলেন। অন্যান্য থানা-গুলির ভারও সুযোগ্য মনসবদারগণের উপর অর্পিত হইল।

দুর্গরক্ষীগণ কর্ত্তৃক অতর্কিত আক্রমণ ও ছোটখাট সংঘর্ষ

অবরোধের প্রথম দিনই হঠাৎ এক দল ইরাণী সৈন্য খিজিরী দরওয়াজা খুলিয়া হিন্দুস্থানীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। খাজা খাঁ (ইয়ুজবেগ) তাহাদিগকে পরিখা

পর্য্যন্ত তাড়া করিল, কিন্তু দুর্গ-প্রাচীর হইতে বর্ষিত গুলির ঘায়ে তাহার ঘোড়াটি ধরাশায়ী হইল; নিজেও আহত হইল। ফিরিবার সময় পলাতক ইরাণীরা তাহাকে পাল্টা তাড়া করিয়া বধ করিবার উপক্রম করিল। এমন সময় তাহাদের সর্দ্দার বলিয়া উঠিলেন, "ছি! উহাকে ছাড়িয়া দাও।" এই খবর শুনিয়া শাহ্‌জাদা খ্বাজা খাঁকে একটি ঘোড়া ও খাসা খেলাৎ বকশিশ করিলেন এবং তাহার মনসবে দুই শত সওয়ার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ইরাণীরা রাত্রির অন্ধকারে হিন্দুস্থানীদের আশ্রয়-সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া সিপাহী ও বেলদার (কোদালিয়া) গুলির মাথা কাটিয়া লইয়া যাইত। এক দিন সন্ধ্যার সময় বেলদার-দারোগা ফতে মহম্মদ কালাল (শুঁড়ী) চারি জন লোক লইয়া বাদশাহী মীর-অতিশ কাসিম খাঁর আশ্রয়-পরিখার মাথায় কাজ করিতে গিয়াছিল। পর দিন সকালে দেখা গেল, ঐ জায়গায় তাহাদের ছিন্নমুণ্ড দেহগুলি পড়িয়া আছে। ঐ রাত্রিতেই ইরাণীরা মহাবৎ খাঁ ও কিলিচ্ খাঁর থানার মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক লাইনের পিছনে গিয়া তিন জন লোককে খুন ও চারিটা ঘোড়ার পায়ের রগ কাটিয়া দিয়া বেমালুম পলাইয়া গেল (২৪শে মে), এমন কি চুরি-ডাকাতিতে পাকা ওস্তাদ বুন্দেলা রাজপুতগণও ইরাণীদের অতর্কিত আক্রমণ হইতে রেহাই পায় নাই; এক দিন দুপুর বেলা পাহাড় সিং বুন্দেলার সিপাহীরা একটু অসাবধান ছিল। ইরাণীরা হঠাৎ চড়াও করিয়া তাঁহার ৮০ জন লোককে হত্যা করিল। ইহাদিগকে তাড়া করিতে গিয়া দুর্গপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলির ঘায়ে তাঁহার আরও বিশ জন সিপাহী মারা গেল। আর এক দিন লাখা-পাহাড়ের উপদুর্গ হইতে ত্রিশ জন ইরাণী বন্দুকচী চুপচাপ পাহাড় সিং বুন্দেলা ও বাকী খাঁর মোর্চ্চার মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া অগ্রসর হইল। সেখানে কয়েকটি উট ও গরু চরিতেছিল। ইরাণীরা চারিটা উট ও পাঁচটা গরু জবাই করিয়া মাংসগুলি লইয়া পলাইতেছিল, এমন সময় হিন্দুস্থানীরা তাহাদিগকে তাড়া করিল; অন্য দিক্ হইতে ইরাণীরাও তাহাদের দলকে সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়াতে উভয় পক্ষে গুলি চলিল; কিন্তু ইরাণীরা ঘায়েল হইয়াও হালালের গোশ্‌ত ছাড়িল না (১৮ই জুলাই)। ইহার পূর্ব্ব দিন ইরাণীদের সঙ্গে একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ২রা রমজান ইজ্জৎ খাঁর সিপাহীরা ফজরের নমাজ পড়িতেছিল; এমন সময় তিন শত ইরাণী হঠাৎ তাঁহার মোর্চ্চার উপর হামলা করিয়া অনেক লোককে হতাহত করিল। নজর বাহাদুর খাঁ খেশগীর পুত্রদ্বয় কুতব খাঁ ও শমস্ খাঁ ইজ্জৎ খাঁকে প্রাণপণ সাহায্য না করিলে তাঁহার রক্ষা ছিল না। ইরাণীরা পিছু হটিবার সময় মহাবৎ খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মোটের উপর এই সংঘর্ষে ইজ্জৎ খাঁর ৯০ জন, কুতব খাঁ ও শমস্ খাঁর ৩১ জন এবং মহাবৎ খাঁর ১৪ জন সিপাহী হত ও ৩১ জন আহত হইয়াছিল। ইজ্জৎ খাঁ বুঝিলেন, সত্য ঘটনা প্রকাশ হইলে শাহ্‌জাদার দরবারে তাঁহার ইজ্জৎ আর থাকিবে না; জাফরও টিট্‌কারি দিবে। তিনি তাড়াতাড়ি এক ফন্দী আঁটিলেন। তাঁহার যত সিপাহী মরিয়াছিল, তিনি তাহাদের লাসগুলি সরাসরি গায়েব করিলেন। তাঁহার লোকেরা মহাবৎ খাঁর মোর্চ্চার কাছ হইতে ইরাণীদের দুটা লাস নিজেদের পরিখার কাছে টানিয়া লইয়া আসিল। সেদিন এত বড় একটা ব্যাপার ঘটিলেও শাহ্‌জাদা স্বয়ং কিছু তদন্ত করিতে আসিলেন না; উর্দ্দুবেগী আসিয়া ইজ্জৎ খাঁর কাছে যাহা শুনিল এবং তাঁহার বাহাদুরির নিশান ইরাণী লাস দুটি দেখিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিল, উহাই লিখিয়া লইল। দারা ঐ রিপোর্ট অবলম্বনে বা কায়দা আরজ্‌দস্ত লিখিয়া দরবারে পাঠাইলেন। সে যুগে এ ধরণের মিলিটারী ডেস্‌প্যাচও গোপন থাকিত না। সংবাদ-তালিকা হিসাবে ঐগুলি প্রায়ই প্রকাশ্য দরবারে পঠিত হইত; পরে সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত এ সমস্ত আখ্‌বারাত সমূহের সাহায্যে দরবারী ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করিতেন। ওয়ারেস-লিখিত বাদশাহ্‌-নামায় দারার কান্দাহার-অভিযানের বর্ণনায় লিখিত আছে:—

দুর্গরক্ষীদের হানা খুব কম এবং প্রায়ই বিফল হইত। কিন্তু একবার মহাবৎ খাঁর সিপাহীদের অসতর্কতার দরুন ইরাণীদের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার কয়েক জন লোক হতাহত হইয়াছিল। যখন ইরাণীরা দুর্গাভিমুখে ফিরিতেছিল, ইজ্জৎ খাঁর মোর্চ্চার সিপাহীরা কয়েক জনকে বধ করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল।

বাদশাহী দরবারে প্রত্যেক বড় বড় আমীরের এক জন করিয়া "উকিল" বা প্রতিনিধি থাকিত; দরবারের সমস্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ উকিলেরা নিজ নিজ মনিবের কাছে লিখিয়া পাঠাইত। সুতরাং দারা যে মিথ্যা রিপোর্ট বাদশাহ্‌র কাছে পাঠাইয়াছেন, কয়েক দিন পরে কান্দাহার-শিবিরে উহা মুখে মুখে প্রচারিত হইল। এ সম্বন্ধে 'লতাইফ্-উল-আখ্‌বার'-রচয়িতা লিখিয়া গিয়াছেন—

এই অভিযানের প্রথম হইতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল শাহজাদার অভিপ্রায় ছিল দুর্গজয়ের চেষ্টার সমস্ত প্রশংসাটুকু যেন তাঁহার নিজ তাবিনের অফিসারগণ বিশেষতঃ জাফর ও ইজ্জৎ খাঁর ভাগেই পড়ে।......মহাবৎ খাঁর সিপাহীরা ইরাণীদিগকে তাড়া করিয়া তাহাদের মৃত সঙ্গীদের লাস লওয়ার অবসর দেয় নাই। অথচ বাদশাহ্‌র কাছে রিপোর্ট গেল ইজ্জৎ খাঁই যাহা কিছু বাহাদুরি দেখাইয়াছেন—প্রমাণ তাঁহার মোর্চ্চার কাছে দুটা ইরাণীদের লাস পড়িয়াছিল, যদিও আসলে এই মড়াগুলি মোর্চ্চার কাছ হইতে তিনি উঠাইয়া লইয়াছিলেন।......এই রিপোর্টের কোথাও কুতব খাঁ ও শমস্ খাঁর নামটুকুও উল্লেখ করা হয় নাই।

একটি ঘটনার সরকারী ও বেসরকারী বর্ণনায় কি আশমান-জমীন তফাৎ ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহাও অবশ্য অসম্ভব নয়, মহাবৎ খাঁর আশ্রিত এই বেনামী লেখক মহাবৎ খাঁর বিরুদ্ধে দারার অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য সাফাই গাহিয়াছেন। "সত্য মিথ্যা একমাত্র খোদাতালাই জানেন"—ঐতিহাসিক ইহার অধিক কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পারেন না এবং ইহাই চরম গবেষণা।

চেহেল-জিনা পাহাড় আক্রমণ

যে পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে কান্দাহারের অন্তর্দুর্গ আত্ম-গোপন করিয়া আছে, তাহার উত্তর পার্শ্বে সিকি মাইল দূরে সুকঠিন প্রস্তরময় একটি খাড়া পাহাড় কান্দাহারের রন্ধ্রপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। এই পাহাড়ের গায়ে চল্লিশটি ধাপ কাটিয়া উপরে উঠিবার একটি সংকীর্ণ পথ ছিল। এই জন্য এই পাহাড়ের ফার্সী নাম চেহেল-জিনা। অর্দ্ধেক পথে যেখানে ধাপ শেষ হইয়াছে, সেখানে ছিল একটি গুহা; গুহার ভিতরে ধনুকাকৃতি গম্বুজওয়ালা একটি ঘর। শত্রু যদি চেহেল-জিনার পাহাড়ে তোপ টানিয়া উঠাইতে পারে তবে কান্দাহারের আশা ছাড়িতে হয়। ইহার দুই দিকে দুইটি টিলা শহরের মণ্ডী (বাজার) ও অন্তর্দুর্গের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কান্দাহার যখন মোগল-অধিকারে ছিল, তখন চেহেল-জিনা পাহাড়কে সুরক্ষিত করিবার জন্য এই দুইটি টিলার উপর উন্নত ও সুদৃঢ় শাস্ত্রী-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পারস্য-সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করিয়া শহরের উপর তোপ দাগিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থান দখল করা সোজা নয়; মুষ্টিমেয় সৈন্য অসংখ্য শত্রুকে এখানে অনায়াসে বাধা দিতে পারে; অথচ হাতাহাতি যুদ্ধ না করিয়া উপায়ান্তর নাই। শাহজাদা চেহেল-জিনা দখল করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ তিনি মনে করিলেন, পাহাড়ের নীচে হইতেই "হাওয়াই" ছুঁড়িলেই ইরাণীরা চেহেল-জিনা ছাড়িয়া পলাইবে। ৭ই ও ৮ই মে ক্রমাগত দুই রাত্রি কয়েক হাজার হাওয়াই-বাজীর অগ্নিবৃষ্টি হইল। ইহাতে ইরাণীরা ভয় পাওয়া দূরের কথা বরং আতশবাজীর তামাশা বেশ উপভোগ করিতেছিল। এই সুযোগে উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষের অধীনে যদি এক দল পার্ব্বত্য সৈন্য সন্তর্পণে চেহেল-জিনায় উঠিতে পারিত, তাহা হইলে ইরাণীদের আনন্দ হয়ত নিরানন্দে পরিণত হইত। কিন্তু লড়াইয়ের ফিকিরের চেয়ে সুফীয়ানা "জিকির" (নামকীর্ত্তন) শাহ্‌জাদা দারা ভাল বুঝিতেন। তিনি এই প্রকার যুগপৎ আক্রমণের কথা ভাবিতেও পারেন নাই। যাহা হউক, যাহারা হাওয়াই ছুড়িয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে শাহ্‌জাদা বিশ টাকা হিসাবে ইনাম দিলেন এবং তাহাদের মনসবদারদ্বয়কে এক-শতী ইজাফা মঞ্জুর করা হইল।

হাওয়াই ব্যর্থ হওয়ায় শাহ্‌জাদা চেহেল-জিনার পূর্ব্ব-বুরুজ লক্ষ্য করিয়া তোপখানার মোর্চ্চা কায়েম করিলেন। প্রথমে জাফর এবং পরে কাঙ্গড়ার পাহাড়ী অঞ্চলের ডোগরা রাজপুত-সামন্ত রাজা রাজরূপকে এই মোর্চ্চার ভার দেওয়া হইয়াছিল (৬ই জুন)। শাহ্‌জাদা রাজরূপকে পাঁচ-শতী ও পাঁচ শত সওয়ার ইজাফা দিলেন।

তিনি প্রথম প্রথম তাঁহার খুব প্রশংসা করিতেন; কিন্তু দারার একটি দোষ ছিল—তিনি লোক চিনিতেন না; অধিকন্তু চাটুকারদের কান-ভাঙানি বেশী শুনিতেন। রাজরূপের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার প্রতিবেশী জন্মশত্রু রাজা মান্ গোয়ালিয়ারী কোন মতলবে শাহ্‌জাদার কান ভারী করিয়া দিলেন। এই মোর্চ্চায় রাজরূপের ৪৬ জন সিপাহী হত ও ১৪৬ জন আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাজও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি শাহ্‌জাদার ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া স্থির করিলেন, কপালে যাহা থাকে একবার চেহেল-জিনা আক্রমণ করিবেন। তাঁহার ডান ও বাঁ দিকের মোর্চ্চার সেনাধ্যক্ষগণকে জানাইলেন ২০শে জুন দিন ৫ ঘড়ী গতে হামলা স্থরু হইবে। অনুমতি পাওয়ার জন্য তিনি একথা শাহ্‌জাদাকেও জানাইলেন। শাহ্‌জাদা জ্যোতিষিগণকে ডাকাইয়া মুহূর্ত্ত-বিচার করিতে বসিলেন। জ্যোতিষীরা কান্দাহারে আসিয়া কান্দাহার ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহের রাশিচক্র ও কোষ্ঠীবিচারে তৎপর ছিল। তাহারা শাহজাদাকে বলিল, ৫ ঘড়ির পর ঐদিন চেহেল-জিনার কর্কটরাশিতে সূর্য্য অবস্থিত আছেন; সুতরাং ঐ সময় আক্রমণকারীদের পক্ষে অশুভ; ১৮ ঘড়ির (৮ ঘড়ি?) পর সময় ভাল আছে। রাজরূপ ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণকে সংবাদ দেওয়া গেল, আক্রমণ ৫ ঘড়ি গতে না হইয়া ১৮ ঘড়ি (৮ ঘড়ি?) গতে হইবে; সে সময় সকলেই যেন প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু ঐ দিনই শাহ্‌জাদার প্রিয়পাত্র জাফরের এক ভাই অনেক দিন রোগে ভুগিয়া মারা গেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দারা এই সামান্য ঘটনাকে অতি অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া আক্রমণের হুকুম সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিলেন। অগ্রগামী দলকে ফিরাইয়া আনিতে রাজরূপের আরও পাঁচ জন লোক হত ও কুড়ি জন আহত হইল।

তিন দিন পরে শাহ্‌জাদার খাস মজলিসে রাজরূপের কথা উঠিতেই তিনি বিষম চটিয়া গেলেন—নিমকহারাম বুজদিল খেঁকশিয়াল! রাজা মান্ গোয়ালিয়ারীকে উহার মোর্চ্চা সোপর্দ্দ কর। লইয়া যাও উহাকে জাফরের মোর্চ্চায়; খেদমৎ কাহাকে বলে জাফর তাহাকে ভাল রকম শিখাইবে। কাজী আফজল দৃঢ়ভাবে রাজরূপের পক্ষ সমর্থন করাতে বেচারা দারুণ অপমান হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইল। ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট শাহ্‌জাদা একবার কান মলিয়া আবার লোকের পিঠ চাপড়াইতেন, মাসখানেক পরে রাজরূপ জাফরের সহকারীরূপে অন্য মোর্চ্চায় বদলি হইলেন; তাঁহাকে নগদ ৫০০০ টাকা ইনাম দিলেন এবং "শের হাজী" বুরুজের তলদেশ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়িতে পারিলে আরও ৫০০০ টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বল্লভ চৌহান নামক রাজপুত মন্‌সবদারকে চেহেল-জিনার মোর্চ্চায় যাইবার জন্য আদেশ করাতে সে সিধা জবাব দিল—আমরা ময়দানের লোক; পাহাড়ী নই; পাহাড়ের লড়াইয়ের কায়দা আমরা জানি না। শাহজাদা ক্রোধে অধীর হইয়া হুকুম দিলেন, "নিয়ে যাও বেটা বেতমীজকে জাফরের মোর্চ্চায়।" চোবদার বল্লভ চৌহানকে জাফরের কাছে লইয়া চলিল; কিন্তু অল্পদূর যাইতে-না-যাইতেই শাহ্‌জাদার রাগ পড়িয়া গেল। ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে তিনি দেবী সিংহ বুন্দেলার থানার ভার দিলেন এবং দেবী সিংহ রাজরূপের স্থানে চেহেল-জিনা মোর্চ্চায় নিযুক্ত হইল।

প্যালেষ্টাইন

পৃষ্ঠায় 'প্যালেষ্টাইন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব
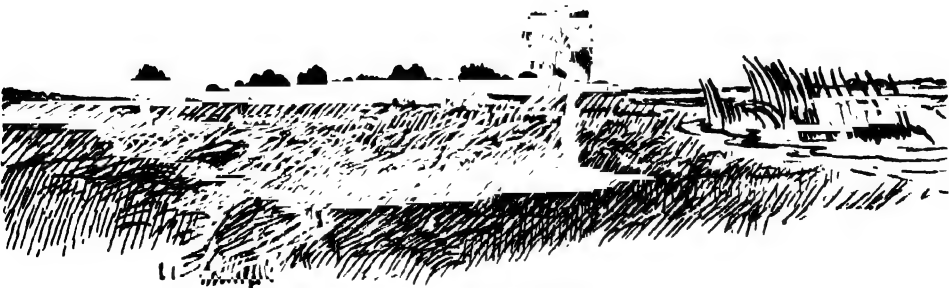
সুবিখ্যাত তীর্থ গেৎসিমানির উদ্যান। যীশু খ্রীষ্ট এইখানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন
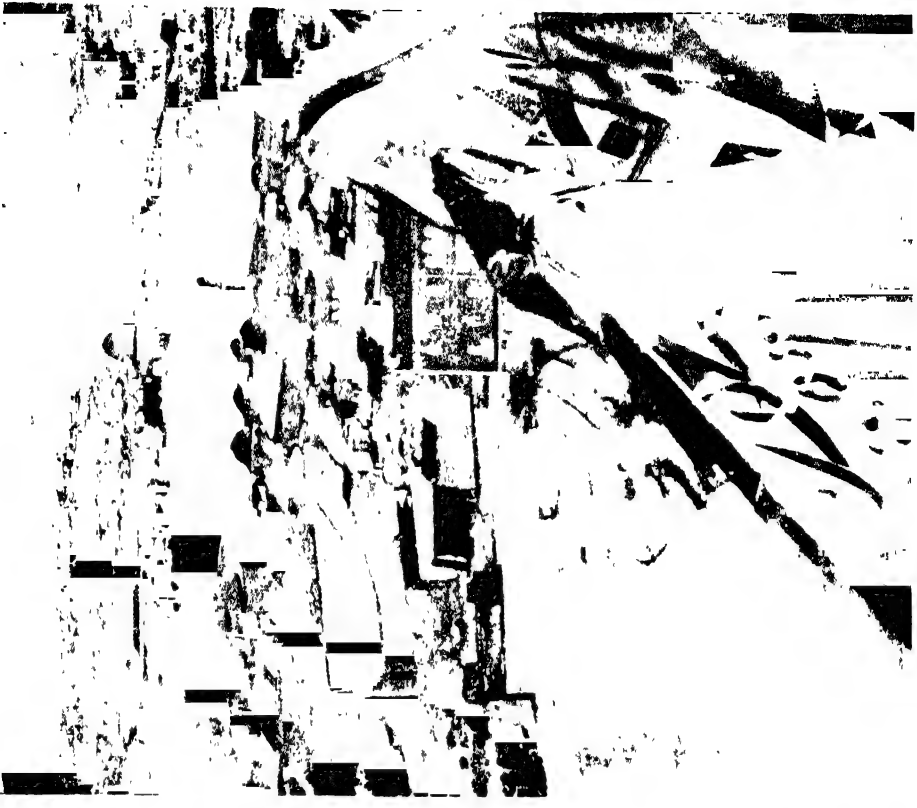
মাউন্ট অব অলিভস্ হইতে আধুনিক জেরুসালেমের দৃশ্য।

নাজারেথের এই অঞ্চলে খ্রীষ্ট তাঁহার তত্ত্বপ্রচার করিতেন

জেরুসালেমের ভিস্তিওয়ালা
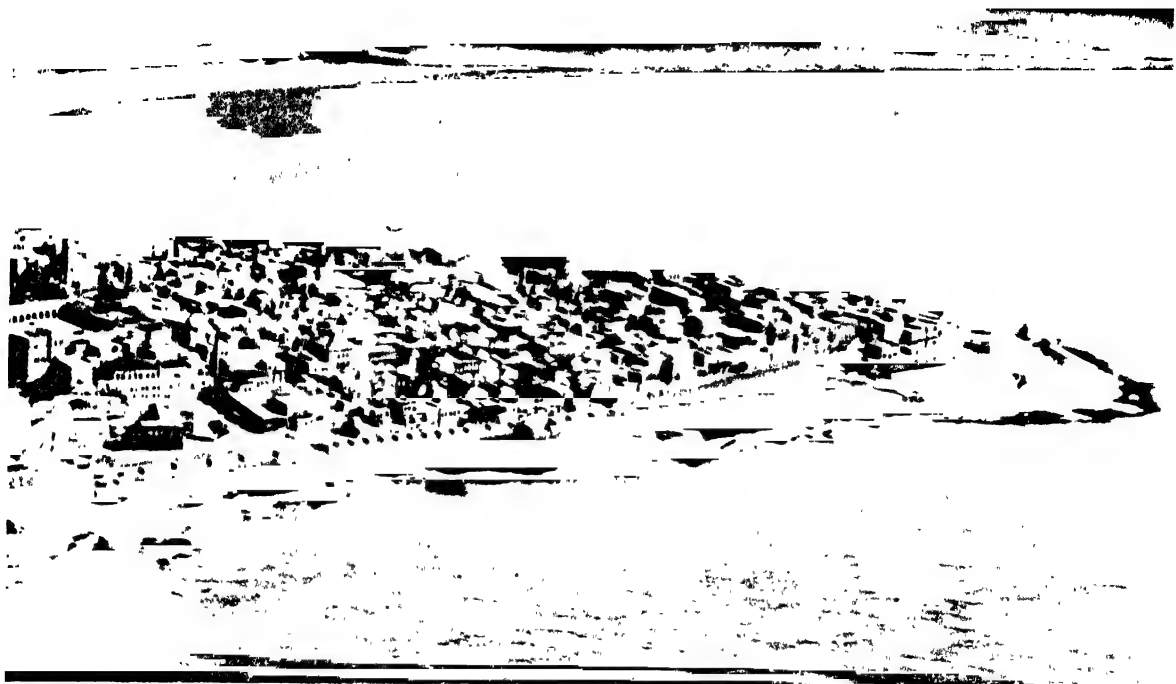
প্রাচীন একর-নগর—পূর্ব্বকালের ক্রুসেডারগণের অবতরণভূমি। এই নগর বহুবার আক্রান্ত, বিধ্বস্ত ও পুনর্গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই নগর মুসলমান-প্রধান।
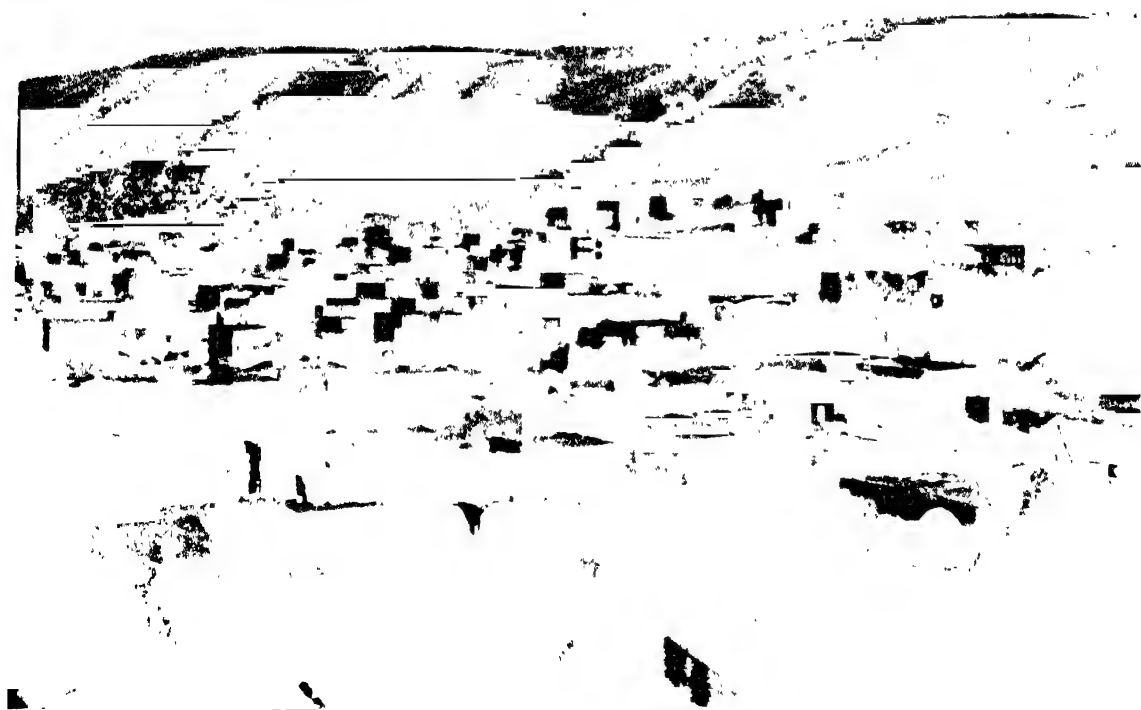
টাইবেরিয়াসে আধুনিক হিব্রু উপনিবেশ

চীনের যুনান-প্রদেশের দৃশ্য

পিকিঙের নিদাঘ-প্রাসাদ

বিজ্ঞান-দর্শনের মিলনচেষ্টা

পণ্ডিত শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

"'বিজ্ঞান' বলতে সাধারণতঃ ভৌতিক বিজ্ঞান (Physical Science) আর প্রাণী-বিজ্ঞান (Biological Science)-কেই বুঝায়। এই দু-রকম বিজ্ঞানের আবার অনেক শাখা-বিজ্ঞান আছে। আজকাল, কয়েক বছর থেকে, মনস্তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বিজ্ঞানশ্রেণী-ভুক্ত করা হচ্ছে। এ-সকল বিজ্ঞানকে বলা হচ্ছে দার্শনিক বিজ্ঞান (Philosophical Sciences)। এই দুই শ্রেণীর বিজ্ঞানকে মোটের উপর বিজ্ঞান ও দর্শন বলা যায়। দুই শ্রেণীর প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানের প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (observation and experiment); দর্শনের প্রণালী (introspection) অন্তর্দৃষ্টি, আত্মপরীক্ষা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে কতিপয় বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্মনির্ভর (over-confidence) এসেছিল। তাঁরা নিজেদের প্রণালীটাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেছিলেন, দর্শনের প্রণালীতে যে কোন মূলসত্য নির্দ্ধারিত হ'তে পারে, এমন বিশ্বাস তাঁদের ছিল না। তথাকথিত জড়শক্তিতে অচিরে প্রাণ ও আত্মা ব্যাখ্যা করা যেতে পারবে, তাঁরা এই আশা করেছিলেন। কিন্তু অন্য দিকে ঐ সময়েই জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট ও হেগেলের দার্শনিক মত ব্রিটেন দেশে বহুল ভাবে প্রচারিত হয়ে একটি নূতন দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল। এই সাহিত্য দেখাচ্ছিল যে বিজ্ঞানের প্রণালী আত্মবিস্মৃত কল্পনার উপর, abstractionএর উপর, স্থাপিত। যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আত্মার ক্রিয়া, বিজ্ঞান সেই আত্মার কোন খবর না নিয়ে চলছে। আত্মজ্ঞান যে-সকল তত্ত্বের আকারে প্রকাশ পায়, যেমন দেশ-কাল, সসীম-অসীম, কার্য্য-কারণ, একত্ব-বহুত্ব, সেই সকল তত্ত্বকে বিজ্ঞান অন্ধভাবে, অবিচারিত ভাবে, ধরে নিয়ে ব্যবহার করছিল; এ-সকলের প্রকৃত স্বরূপ, এ-সকল যে প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব, সে-বিষয় কিছুই চিন্তা করছিল না। তার ফল এই হচ্ছিল যে বিজ্ঞানের মীমাংসায় বাহ্যিক সভ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বটে, কিন্তু গভীর তত্ত্বজ্ঞান আর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হচ্ছিল না, বরঞ্চ ভোগবিলাস বাড়ছিল, আর জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিবাদ বৃদ্ধি ক'রে দুষ্পূরণীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত নূতন দার্শনিক সাহিত্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল-তর তত্ত্বালোকের সাহায্যে ব্রিটেনের পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লক্, বার্ক্‌লি ও হিউম, আর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মিল্, স্পেন্‌সার ও লিউইসের দর্শন সমালোচনা ক'রে এই সকল দর্শনতন্ত্রের অসারতা এমন দক্ষতার সহিত দেখিয়েছিল যে শতাব্দী শেষ হ'তে না-হ'তেই স্পেন্‌সারের বহুলোক-গৃহীত অজ্ঞেয়তাবাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, এ-সকল দর্শনতন্ত্রের স্থলে ইংরেজী-ভাষী জাতিদের মধ্যে নূতন নূতন দার্শনিক তন্ত্রের উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের যে অতিরিক্ত আত্মনির্ভর ও দর্শনের প্রতি অবজ্ঞার কথা বলেছি, তাতে যে কঠোর আঘাত লেগেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে কতিপয় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলন-চেষ্টা করছেন। তাঁদের মধ্যে দু-জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অল্প কাল পূর্ব্বে এদেশের বিজ্ঞান-সঙ্ঘ, Science Congressএর নিমন্ত্রণে এখানে এসেছিলেন। তাঁদের নাম সার্ জেম্‌স্ জীন্‌স্ ও সার আর্থার এডিংটন। উভয়েই জ্যোতিষ ও পদার্থবিজ্ঞানে পারদর্শী। সার্ জেম্‌স্ জীন্‌স্ বোধ হয় ইংলণ্ডের রাজকীয় সভা, রয়্যাল সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-সংঘের, সভাপতি। গত নববর্ষ দিনে তিনি 'অর্ডার অব মেরিট' (গুণী-শ্রেণী) ভুক্ত হয়েছেন। আমি তাঁদের লেখা দু-খানা বই অবলম্বন ক'রে দেখাচ্ছি তাঁরা কিরূপে

বিজ্ঞান-দর্শনের মিলন-চেষ্টা করছেন। উভয়েই দেখাচ্ছেন যে ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জড়বাদ প্রমাণ হওয়া দূরে থাক্, জড়ের অস্তিত্বেরই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দার্শনিক চিন্তাবিহীন লোক, তাঁরা শিক্ষিতই হউন্ আর অশিক্ষিতই হউন্, তাঁদের কাছে একথা একেবারেই অবোধ্য। তাঁরা বলবেন জড়ের অস্তিত্ব তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ, আমরা জড় দেখছি, শুন্‌ছি, ছুঁইছি, আঘ্রাণ করছি, আস্বাদন করছি, জড়ের অস্তিত্বের আবার কি প্রমাণ চাই? কিন্তু দার্শনিক আর অগ্রসর বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বহু দিন থেকে বুঝেছেন যে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়গুলি জড় নয়, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়বোধ, অস্থায়ী বিজ্ঞান-পরম্পরামাত্র (series of fleeting sensations)। 'জড়' বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে। স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়তাবাদ এই মতের উপরই স্থাপিত। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে আমাদের বোধপরম্পরার অজ্ঞেয় কারণ বস্তু বা শক্তির স্বরূপ আমরা জানি না বটে, কিন্তু তার অস্তিত্ব আমরা জানি। তিনি বলেছেন যে আমাদের যে বাধা দেবার প্রয়াস, (effort to resist) তা থেকেই আমরা বাহ্য শক্তির পরিচয় পাই। কিন্তু আমাদের প্রয়াস জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত। জ্ঞান ও ইচ্ছা ছেড়ে দিলে শক্তি ব'লে কোন বস্তু থাকে না, শক্তি একটা নিঃসত্তা কল্পনা (abstraction) মাত্র, হয়ে যায়। এরূপ একটা কল্পনা দ্বারা জাগতিক ব্যাপারসমূহের কোন ব্যাখ্যা হ'তে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকদের জড়শক্তি উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান থেকে অনেক কাল পূর্ব্বেই বিদায় নিয়েছে। পুরাতন বিজ্ঞানের পরমাণুও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদায় নিয়েছে। তাদের স্থানে এসেছে প্রোটন, নিউট্রন, ফোটন, আর পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেকট্রন। এগুলি বৈদ্যুতিক ক্রিয়া (electric charges) মাত্র। এগুলিকে গণিতের সূত্রে (mathematical formulaতে) পরিণত করা যায়। এই আকারে এগুলি আমাদের চিন্তামাত্র, চিন্তা বা জ্ঞানের বহির্ভূত কোনও বস্তু নয়। এখন আপনারা বুঝুন এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে তথাকথিত ভৌতিক বিজ্ঞান কিরূপ সিদ্ধান্তে এসে পড়েছে, বৈদান্তিক আত্মবাদ ও পাশ্চাত্য আইডিয়ালিজ্‌ম্-এর কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন অধ্যাপক এডিংটন্ ও জীন্সের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলে আপনারা এই কথা আরও স্পষ্টরূপে বুঝবেন। এডিংটন তাঁর "Nature of the Physical World" নামক Gifford Lecturesএ বলছেন যে আইন্‌ষ্টীন্, মিন্‌কোস্‌কি, রথারফোর্ড ও ফিট্‌জিরাল্ড্ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নিউটনের প্রাচীন জড়বিজ্ঞান এত পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে যে অধুনাতন ভৌতিক বিজ্ঞানের বিষয় একটি ছায়ারাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর উক্তি এই,—

"The frank realization that physical science is concerned with a world of shadows, is one of the most significant of recent advances." (ভূমিকা, ১৮ পৃ)

অর্থাৎ "ইদানীন্তন বিজ্ঞানোন্নতির একটি অতি প্রসিদ্ধ নিদর্শন এই যে স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হচ্ছে ভৌতিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেবল একটি ছায়া-জগতের সহিত।"

কোথায় এই উক্তি আর কোথায় অধ্যাপক টিণ্ডলের প্রসিদ্ধ বেল্‌ফাষ্ট-অভিভাষণের উক্তি—

"I find in matter the promise and potency of every form of life."

অর্থাৎ "আমি জড়ের ভিতরে সর্ব্বপ্রকার প্রাণের প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।"

যাহোক্, বর্ণবোধ ও স্পর্শবোধ দ্বারা যে আমরা বাহ্য জগতের কিছুই জানতে পারি না, তা দেখিয়ে এডিংটন্ বল্‌ছেন,—

"To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff . . . The realistic matter and fields of force of the former physical theory are altogether irrelevant—except in so far as the mind-stuff has itself spun these imaginings." (Pages 276, 277)

অর্থাৎ "স্থূলভাবে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে জগতের মূলবস্তু মানসিক বস্তু...প্রাচীন মতের বাস্তব জড় ও শক্তিরাজ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অর্থাৎ অপ্রমাণিত। তবে বলা যায় যে এ-সকল কল্পনা মানসিক বস্তুরই বোনা জিনিষ।"

এডিংটন অন্য স্থানে আরও স্পষ্ট কথা বল্‌ছেন,

"I very much doubt if any one of us has the faintest idea of anything but our own egos."

অর্থাৎ "আমাদের নিজ নিজ আত্মা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর কণামাত্র ধারণা আমাদের কারো আছে কি না, এ বিষয় আমি খুব সন্দেহ করি।"

কিঞ্চিৎ নীচেই তিনি বলছেন,—

"The only subject presented to me for study is the content of my consciousness." (P. 284).

অর্থাৎ "আমার সমক্ষে প্রকাশিত একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমার জ্ঞানের অন্তর্ভূত বস্তুনিচয়।"

এডিংটন্ আরও বলছেন যে আমরা অনেক পরিমাণে অন্যের জ্ঞানের অন্তর্ভূত বস্তুও জানি, আর এ-সকল ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় একত্র ক'রেই আমরা জগতের ধারণায় উপনীত হই। এই সমষ্টি জ্ঞান কোন এক বিশেষ মানুষের জ্ঞান হ'তে পারে না। কাজেই আমরা এই জ্ঞানসমষ্টিকে একটি সাধারণ বাহ্য জগৎ ব'লে কল্পনা করি। এডিংটনের মতে আমাদের বাহ্য জগতের ধারণা এই রূপে জন্মে; প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের অতীত স্বতন্ত্র জগতের ধারণা অসম্ভব। সমষ্টি জ্ঞানজগতের ধারণা কেমন ক'রে হয় সে বিষয় এই বেদী ও মঞ্চ থেকে অনেক বার বলা হয়েছে। সংক্ষেপে কেবল এই কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে আমাদের পরস্পরের জ্ঞানবিনিময়ে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে এমন একটি অনন্ত জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয় যা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সসীম আত্মার সাধারণ পরমাত্মা, Higher Self, এবং এই পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত ব'লেই আমরা নিজেদিগকে সসীম অর্থাৎ অসীমের অচ্ছেদ্য অংশ ব'লে বিশ্বাস করি।

যা হোক্, এখন ডাঃ জীন্সের কথা শোনা যাক্। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের প্রণালী ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের যে আত্যন্তিক আত্মনির্ভর (over-confidence) ছিল, তা এই বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠের মন থেকে একেবারে তিরোহিত হয়েছে। তিনি তাঁর "New Background of Science" নামক গ্রন্থে বলছেন যে বিজ্ঞান বরাবর নিজের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভুল ক'রে আসছে। বিজ্ঞান মনে করে আসছে যে তার আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি, নেচার, ভৌতিক জগৎ। বিজ্ঞানের আলোচ্য প্রকৃত পক্ষে তা নয়; এর আলোচ্য হচ্ছে প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ। তাঁর উক্তি এই,—

"The old science which pictured nature as a crowd of wandering atoms, claimed that it was depicting a completely objective universe, entirely outside of and detached from the mind which perceived it. Modern science makes no such claim, frankly admitting that its subject of study is primarily our own observation of nature, and not nature itself. The new picture of nature must then inevitably involve mind as well as matter,—the mind which perceives and the matter which is perceived, and so must be more mental in character than the fallacious picture which preceded it." (P. 287).

অর্থাৎ—"প্রাচীন বিজ্ঞান মনে করত যে প্রকৃতি হচ্ছে অসংখ্য পরমাণু-সমষ্টি যা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুতরাং বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে একটা একান্ত বিষয়-জগতের চিত্র অঙ্কিত করা যে জগৎ তার জ্ঞাতা আত্মার সম্পূর্ণরূপে বাইরে, আত্মা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আধুনিক বিজ্ঞান তা মনে করে না। আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টরূপে স্বীকার করে যে তার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ, স্বয়ং প্রকৃতি নয়। সুতরাং প্রকৃতির যে নূতন চিত্র অঙ্কিত হবে তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে থাকবে আত্মা এবং জড় উভয়ই, যে আত্মা জানছে আর যে জড়কে জানা হচ্ছে। সুতরাং এই চিত্র পূর্ব্বকার ভুল চিত্রের চেয়ে অধিকতর মানসিক চিত্র হবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন বিজ্ঞান যে তার বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে ভুল করেছিল, নিঃসত্তা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পর্য্যবেক্ষণকারী আত্মাকে ছেড়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল করেছিল, তা ডাঃ জীন্স্ স্পষ্ট বুঝেছেন এবং বিজ্ঞানের পটভূমি (background) প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সত্য ধারণা করতে বলছেন। সেই ধারণা বিষয়-বিষয়ীর অচ্ছেদ্যতা-বোধ, নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান। এই ধারণা নিয়ে গবেষণা ক'রে বিজ্ঞান কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তিনি তাও বলেছেন। তাঁর কথা এই,—

"The essence of the new situation in physics is not that something mental has come into the picture of nature so much as that nothing non-mental has survived from the old picture. As we have watched the gradual metamorphosis of the old picture into the new, we have not seen the addition of mind to matter so much as the complete disappearance of matter, at least of the kind out of which the older physics constructed its objective universe." (P. 288).

অর্থাৎ "ভৌতিক বিজ্ঞানের নব সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম এই:—প্রকৃতির নূতন চিত্রে যে মানসিক কিছু এসে উপস্থিত হয়েছে তা নয়, বরঞ্চ কথাটা এই যে পুরাতন চিত্রে যা কিছু অমানসিক ছিল তার কিছুই বেঁচে নেই, অর্থাৎ সমস্তই মানসিক ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। পুরাতন চিত্রের ক্রমিক নবীকরণ পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা এ দেখি নি যে জড়ের সঙ্গে আত্মা এসে যুক্ত হ'ল, বরঞ্চ এই দেখেছি যে জড় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়েছে, অন্ততঃ সেই জাতীয় জড় যা দিয়ে পুরাতন ভৌতিক বিজ্ঞান তার বিষয়জগৎ গড়েছিল।"

কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে বলছি। আধুনিক ভৌতিক

বিজ্ঞান পুরাতন বিজ্ঞানের তথাকথিত জড় পরমাণুকে প্রোটন, ইলেকট্রন্ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ক্রিয়াতে পরিণত করেছে। কিন্তু পুরাতন বিজ্ঞানের জড় পরমাণুর স্থায়িত্ব, স্থূলত্ব, দেশব্যাপিত্ব প্রভৃতি গুণ নূতন বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় নেই। এ-সকল ক্রিয়া "mathematical waves" মাত্র, বাংলায় কি বলব জানি না বোধ হয় "অঙ্ক-পরম্পরা" বলা যায়। এ বিষয়ে ডাঃ জীন্স্ বল্‌ছেন :—

"Contemporaneously with this, matter has lost its supposed solidity and space-filling capacity. It first became resolved into empty space, tenanted only here and there at rare intervals by particles of minute size. In the next stage these particles became resolved into mathematical waves. As it is found impossible to depict them as existing in space and time, it is almost impossible to picture them in forms of familiar objects, because we always think of these as existing in space and time." (Pp. 288, 289).

অর্থাৎ, "এর সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ পরমাণু প্রোটনাদি বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হবার সময় থেকেই, জড় তার কল্পিত স্থূলত্ব ও দেশব্যাপিত্ব হারিয়েছে। এ প্রথমে শূন্য দেশমাত্রে পরিণত হ'ল, যে দেশের মাঝে মাঝে, অনেক দূরে দূরে, সূক্ষ্ম-পরিমাণ অণু আছে বলে অনুমান করা হ'ত। পরবর্ত্তী চিন্তাসোপানে এই অণুগুলি অঙ্কপরম্পরায় পরিণত হ'ল। যে হেতু এগুলিকে দেশকাল ব্যাপ্ত ব'লে বর্ণনা করা যায় না, সুতরাং এগুলিকে আমাদের সুপরিচিত বস্তুসমূহের সদৃশ বলে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ এ-সকল বস্তুকে আমরা সর্ব্বদাই দেশকালব্যাপী বলে ভাবি।"

মোট কথাটা আমরা এই বুঝলাম যে দেশ-কাল-ব্যাপী বস্তুকেই লোকে জড়বস্তু বলে, আর এরূপ বস্তুকেই অনাত্মা, অমানসিক ব'লে বিশ্বাস করে। কিন্তু বস্তুতঃ দেশ-কালের ভিতর যা পাওয়া যায় তা অনাত্ম নয়, অমানসিক নয়। নূতন বিজ্ঞানে অমানসিক কোন বস্তু বেঁচে নেই। নূতন বিজ্ঞান অনাত্ম অমানসিক বস্তু খুঁজতে গিয়ে mathematical waves, mathematical formulae নানা power যুক্ত অঙ্কপরম্পরা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না, সুতরাং প্রাচীন বিজ্ঞানের কল্পিত আত্ম-নিরপেক্ষ, জ্ঞাননিরপেক্ষ জড়বস্তু এখনও প্রমাণ হয় নি, রিয়্যালিজ্‌ম্ বা মেটেরিয়্যালিজ্‌ম্ এখনও অপ্রমাণিত। কাজে কাজেই ডাঃ জীন্স্ বাধ্য হয়েই বলছেন,

"Presentday science is favourable to Idealism." (P. 307).

অর্থাৎ, "অদ্যতন বিজ্ঞান আত্মবাদের অনুকূল।"

কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত নন। তিনি অসম্ভব মনে করেন না যে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জড়ের স্থূলত্ব ও স্থায়িত্ব প্রমাণিত হ'তে পারে। সে বিষয়ে যে এখন কোন আশা পাওয়া যাচ্ছে তা নয়; তিনি স্পষ্টই বলছেন,

"So far the pendulum shows no signs of swinging back, and the law and order which we find in the universe are most clearly described —and also, I think,—most easily explained—in the language of idealism." (P. 307).

অর্থাৎ, "বিজ্ঞান-দোলক পেছিয়ে যাবার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, আর জগতে যে বিধি ও শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে তার সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট বর্ণনা, ও আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাখ্যা, আত্মবাদের ভাষায়ই হয়।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতে ছাড়লেন না,

"Yet who shall say what we may find awaiting us round the next corner?" (P. 307).

অর্থাৎ, "আবার মোড় ফিরলে কি দেখা যাবে তা কে বলতে পারে?"

এই কথাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ডাঃ জীন্স্ দর্শনের প্রণালী ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ নন। তাঁর *Mysterious Universe* নামক পুস্তকে তিনি দর্শন-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অভাব নিজেই স্বীকার করেছেন। আধুনিক দর্শনের প্রণালী অভিজ্ঞতার পরীক্ষা (Criticism of Experience); কেবল বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণ নয়, কেবল আন্তরিক পরীক্ষাও নয়, গোটা জ্ঞান ব্যাপারটার পরীক্ষা, যে পরীক্ষাতে অবিচারিত অন্ধ-বিশ্বাস (Dogmatism) থাকবে না, বহির্মুখী লোকদের অভ্যস্ত আত্যন্তিক সন্দেহপ্রবণতাও (Scepticism) থাকবে না। অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় অভিজ্ঞতাকে অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মিলিত জ্ঞানক্রিয়াকে একমাত্র সাক্ষী বা প্রমাণ ব'লে স্বীকার করা হয়। জ্ঞান কখনও জ্ঞানের বাইরের বস্তুর সাক্ষ্য দিতে পারে না। ফলতঃ জ্ঞানের বাইরের বস্তু, একটা কথার কথা মাত্র, একটা স্ববিরোধী ব্যাপার। জ্ঞান কোন দিন এরূপ স্ববিরোধী ব্যাপার প্রকাশ করবে, তা অসম্ভব। সুতরাং "মোড় ফিরলে কি দেখব, কি জানব, কে বলতে পারে?"—ডাঃ জীন্সের এই আশঙ্কা অমূলক। মোড় ফিরলে জ্ঞানের ভিতরকার, অনন্ত জ্ঞানের জ্ঞাত, সান্ত জ্ঞানের জ্ঞেয়, বস্তুই জানব,

জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই জানে না। জ্ঞানের পরীক্ষা পরস্পরকে,—অসীম সসীমকে,—ভেদাভেদ সম্বন্ধে যুক্ত জীব-ব্রহ্মকে—প্রকাশ করে,—দেখিয়ে দেয় যে সসীম জীবজ্ঞানের বাইরে বস্তু থাকতে পারে বটে, কিন্তু জীবের পরমাত্মার, Higher Selfএর, বাইরে কিছু থাকতে পারে না, থাকা অর্থহীন। জ্ঞানের স্বরূপ এই যে সে নিজে থেকে ভিন্ন (distinguishable) বস্তুকে, সসীম বস্তুকে, দেখে, কিন্তু এই দেখা দ্বারাই সেই বস্তুকে নিজের সহিত এক করে নেয়। নিজের থেকে পৃথক (separable) স্বাধীন বস্তু, সে জানে না, জানা অসম্ভব, অর্থহীন। নিজেকে, তার অন্তর্ভুক্ত বস্তু নিয়ে, সে একমাত্র অদ্বৈত বস্তু বলে জানে। দেশ-কাল তার অন্তর্ভূত, সে দেশ-কালের সীমার অতীত। বহু দিন যাঁরা বিজ্ঞানের কল্পনা, (abstractions) নিয়ে সময় কাটিয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ-সকল দার্শনিক কথা বুঝতে কিছু সময় লাগবে। আমরা এ-বিষয়ে হেগেলের গুটি কতক উক্তি উদ্ধার ক'রে বক্তব্য শেষ করি। তিনি thought, চিন্তা অর্থাৎ মৌলিক সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন,—

"It is, speaking rightly, the very essence of thought to be infinite . . . Thought is always in its own sphere; its relations are with itself and it is its own object. In having a thought for object, I am at home with myself. The thinking power, the 'I,' is therefore infinite, because, when it thinks, it is in relation to an object which is itself. Generally speakng, an object means a something else, a negative confronting me. But in the case where thought thinks itself, it has an object which is at the same time no object; in other words its objectivity is suppressed and transformed into an idea." (Wallace's translation of Hegel's *Logic*, p. 62).

অর্থাৎ, "ঠিক্ বলতে গেলে চিন্তার প্রকৃত স্বরূপ এই যে এ অনন্ত। চিন্তা সর্ব্বদা নিজের রাজ্যেই থাকে, এর সম্বন্ধ নিজেরই সঙ্গে, আর এ নিজেরই বিষয়। যখন চিন্তা আমার বিষয় হয়, আমি তখন নিজেতেই থাকি। চিন্তাশক্তি, 'অহম্', অবশ্যম্ভাবীরূপেই অসীম, কারণ যখন এ চিন্তা করে তখন এর সঙ্গে এমন এক বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে যা এ নিজেই। সাধারণতঃ 'বিষয়' বললে অন্য কিছু বুঝায়,—এমন এক বস্তু বুঝায় যা আমি নই, যা আমার সামনে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু যে স্থলে চিন্তা নিজেকে চিন্তা করে, তখন এর বিষয় হচ্ছে এমন কিছু যা বিষয় নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে এর বিষয়ত্ব পরিবর্ত্তিত হ'য়ে চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়।"

এখন বিজ্ঞান-দর্শনের মিলন-স্থান কোথায় তা আপনারা দেখুন। এডিংটন কিছু সঙ্কোচের সহিত বলছেন যে আমাদের নিজ নিজ আত্মা ছাড়া আর কোনও বস্তুর অস্পষ্টতম ধারণাও আমাদের আছে কি না তা খুব সন্দেহের বিষয়।

জীন্স্ বলছেন অমানসিক বস্তু, অর্থাৎ আত্মা ছাড়া আর কোনও বস্তু, আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাচ্ছে না। আধুনিক দার্শনিক হেগেল বলছেন আমরা 'অহম্'কে জানতে গিয়ে দেখি এ অনন্ত, এর বাইরে আর কিছু নেই। হিন্দু দর্শন তিন হাজার বছর আগে এ-কথা বলেছে আর এ-কথার উপর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন প্রতিষ্ঠিত করেছে। দার্শনিক চিন্তা ধর্ম্মে না দাঁড়ালে স্থায়ী হয় না। হেগেল-প্রভাবিত ব্রহ্মবাদ বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটেন দেশে প্রচারিত হয়ে সেখানকার বিজ্ঞানকে কেমন পরিবর্ত্তিত করেছে ও করছে তার কিছু নিদর্শন আপনারা আমার অভিভাষণে পেলেন। কিন্তু এই ব্রহ্মবাদ যোহন ও এডোয়ার্ড কেয়ার্ড এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কয়েকখানা গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও সাধনে পরিণত হয়েছে বলে বোধ হয় না। সেই জন্তেই হেগেল-প্রভাবিত ব্রহ্মবাদের স্থায়িত্ব সন্দিগ্ধ, কিন্তু বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ তিন হাজার বছর বেঁচে আছে।

রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের উপর ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবাদ দাঁড় করিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মবাদ এখনও গভীর সাধনে দাঁড়ায় নি। তাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি বাধা পাচ্ছে আর ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব, অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ব্রাহ্মত্ব, সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃত ব্রহ্মসাধন আরম্ভ হয় আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন থেকে। যাকে আমরা নিজ আত্মা বলি, সেই বস্তু মূলে অনন্ত। দেশ, কাল, রূপরসাদি বিচিত্র ইন্দ্রিয়বোধ, যা জ্ঞানের উপাদান, যাতে বিশ্বের বিশ্বত্ব, সে সবই আত্মার আশ্রিত। আত্মাকে ছেড়ে বিশ্বের জ্ঞান, বিশ্বের ভাবনা, অসম্ভব। আর যেমন বিশ্বকে তেমনই আত্মাকে আমরা এক অনন্ত বলেই জানি ও ভাবি, অন্য রূপে জানা, অন্য-রূপে ভাবা অসম্ভব। কিন্তু এই অনন্তের ভিতরে, অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় রূপে সান্তের ভাবও রয়েছে। অজ্ঞান দূর ক'রে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, বিস্মৃতি দূর ক'রে স্মৃতির উদয়

হয়, নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে পুনরায় জাগরণ আসে। এ-সব ব্যাপারে লৌকিক দ্বৈতবাদ প্রমাণ হয় না, মায়াবাদীদের একান্ত অদ্বৈতবাদও প্রমাণ হয় না। সসীম-অসীমের জীব-ব্রহ্মের, ভেদাভেদ সম্বন্ধে স্থিতি, যাকে বলা হয় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয়। প্রেম-অপ্রেমের, পুণ্য-পাপের, দ্বন্দ্ব নিশ্চিতরূপে দেখিয়ে দেয় জগৎ মায়িক নয়, উদ্দেশ্যবিহীন নয়, মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই জগতের উদ্দেশ্য। কাল-প্রবাহের মধ্যে আত্মা প্রবাহিত না হয়ে স্থির থাকে, কাল-প্রবাহ নিরীক্ষণ করে, এতে প্রমাণিত হয় আত্মা কালাতীত, নিত্য, জন্মমরণের অতীত, অনন্তের সহিত অচ্ছেদ্য, অনন্তের অমরত্বে অমর। এ-সকল দার্শনিক সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকেই উচ্চ স্থায়ী যুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞান যে দর্শনের সহিত মিলিত হচ্ছে, দর্শন যে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল হচ্ছে, এতেই জগতের উচ্চ স্থায়ী ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের আগমন সূচিত হচ্ছে। আসুন, আমরা বহির্মুখিতা ছেড়ে, বাহ্যিক কোলাহলে না ভুলে, সর্ব্বান্তঃ-করণে এই সূচনাকে অভ্যর্থনা করি, আর এই সত্যধর্ম্মের সাধনে ও প্রচারে আত্মসমর্পণ ক'রে, জীবন সফল করি, কৃতার্থ করি।

[তত্ত্ববিদ্যা সভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ]

ঘুম্

শ্রীধী[illegible] মুখোপাধ্যায়

অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছি ছায়াময় পাহাড়িয়া পথে,
দক্ষিণে নেমেছে নীচে রাশি রাশি রঙের তুফান,
পরিচ্ছন্ন গৃহমালা ছোট ছোট ছবির মতন,
দীর্ঘচূড় তরুদল, শষ্পরাজি প্রস্তর-শয়ান।

বামে কৃষ্ণ গিরিশ্রেণী রচিয়াছে উন্নত প্রাচীর,
কভু ক্ষীণ পথরেখা উঠিয়াছে বক্ষ বাহি তার,
কভু বা জলের ধারা নামিয়াছে ঊর্দ্ধদেশ হ'তে,
বিজন নিস্তব্ধ পথ, সম্মুখে ঘনায় মেঘভার।

দূরে তুষারের মত শুভ্র মেঘ আকাশে নিলীন,
সম্মুখে ধোঁয়ার মত কালো মেঘ উড়ে উড়ে যায়,
আনত বোঝার ভারে চলিয়াছে পাহাড়িয়া মেয়ে,
আমার নয়নে মনে স্বপ্নমালা মেঘসম ছায়।

সমতল ধরণীরে কোথায় এসেছি ফেলে দূরে,
উঠিয়াছি মেঘলোকে ঘুম-ছাওয়া স্বপনের দেশে,
কোলাহল কলরব খরতাপ নিবিয়া গিয়াছে,
আকাশে বাতাসে কা'রা বিমোহিয়া মিলাইছে হেসে।

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৪

১লা এপ্রিল হইতে রেলের টাইম-টেব্‌ল্‌ বদল হইয়াছে, কাজেই ইছাপুর ষ্টেশনে অমিয়দের নূতন গাড়ী থামিল না। বীরেনকে দেখিবার প্রত্যাশা অমিয় করিয়াছিল, এই কয় দিনের ঘটনার স্রোত বীরেনের মতবাদের কূলে তাহার যুক্তির তরীখানিকে ভিড়াইতে চাহিতেছিল, অথচ বীরেনের দেখা আজ পাইল না। পারিবারিক বা আপিসের গল্পের আকারকে আর কতই বা বাড়াইয়া তোলা যায়? সাহেবের বা বৌয়ের ভালবাসা লইয়া গৌরবের স্তম্ভ রচনা করিলেও মনের মধ্যে অতৃপ্তি একটুখানি থাকে বইকি! বাহিরের কল্পিত ভালবাসাকে, রঙীন ফানুষে বাতি পুরিয়া আকাশ-অভিমুখী বেলুনের মতই কিছুক্ষণ পরম বিস্ময়ের মত প্রচার করিতে পারা যায় হয়ত, মনের গোপন ভালবাসাকে রূপদান করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু আপিস এবং সংসার দুটি ক্ষেত্রের দুই প্রকারের ভালবাসা লইয়া কবি না হইয়াও প্রত্যেকের কবিত্ব করিতে সাধ জাগে না কি? নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসভবন ও আপিস, মেস এবং রুচি, ব্যয় এবং বুদ্ধিবিদ্যা লইয়া কাহার গল্পের গতি না অনায়াস হইয়া উঠে? কপির দর হইতে ক্যাবিনেটের খবর, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও রাজনীতি, ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজম, সাহিত্যের সেরা বইয়ের নাম ও প্রসিদ্ধ ফিল্ম-ষ্টারের গুণব্যাখ্যান—এক সঙ্গে স-সমারোহে চালাইয়াও কি ক্লান্ত হইয়া পড়ি! ইতিহাসের অধ্যায় যাঁহারা নূতন করিয়া সংযোগ করেন তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের চোখে বৃহৎ হইয়াই দেখা দেয়—আমরা বিজ্ঞের মত নিজের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া তাঁহাদের প্রতিভাকে খণ্ডিত ও খর্ব্বিত করিয়া আনন্দ পাই। যে ঢেউ কূলে আছড়াইয়া ভাঙিয়া পড়ে, তারই বালুতটোচ্ছ্বসিত মর্ম্মরধ্বনির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিই। ইতিহাস-রচনার শক্তি আমাদের নাই, সমালোচনায় শুধু তৎপর!

সত্যই রাণাঘাট আসিলেও অমিয় মুখ খুলিল না। পুরাতন গল্প নূতন করিয়া জমাইতে প্রবৃত্তি তাহার নাই। প্রত্যেক বার শীতের সময় শীতের প্রতাপ, গ্রীষ্মের দিনে সূর্য্যের খরতাপ ও বর্ষার মেঘে পরিমিত বা অপরিমিত বারিবর্ষণ লইয়া সংসারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিযোগ চলে। রবিশস্যের দর কমবেশীতে দরিদ্রের অল্পই যায় আসে, অসময়ের কপি সস্তা হইলেও আনন্দ তাহাদের মুখের রেখাকে উজ্জ্বল করে না। পুকুরে যদি অপর্য্যাপ্ত কলমি-লতার ফুল ফোটে ও আউশ চালের বাজার নামিয়া যায় তাহারা উপরপানে দু-হাত তুলিয়া অদৃশ্য দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

দেশের ষ্টেশন আসিলেও অমিয় ভাবিতে ভাবিতে চলিল। পকেটে তাহার টাকা আছে, প্রথম উপার্জ্জনের টাকা—কিন্তু হিসাবের খাতায় পিষিয়া সে-অর্থ পাওয়ার মুহূর্ত্তেই বিবর্ণ ও রসহীন হইয়া গিয়াছে। পকেটে যাহা বাজিতেছে তাহা টাকা নহে—হিসাব। সংসারীর কানে সংসারের আর্ত্তি বা আর্ত্তনাদ!

পুরাতন বনপথ, গাছের ডালে পাখীর কূজন, পথের ধুলা ও পথের বালিতে সপ্তাহের অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা, বাতাসের হাতছানিতে ভাঁটের পাতা দুলিতেছে—সদীর্ঘ সাদা ফুলে অন্ধকার বনে হাসির সমারোহ। কিন্তু প্রাণ কই, সুর কোথায়?

অবনী বলিল, "ওয়েজ-কাট সব গভর্ণমেণ্ট আপিসেই আরম্ভ হ'ল—তবু মন্দের ভাল। একেবারে চাকরি না গিয়ে—"

অমিয় বলিল, "একেবারে চাকরি গেলেই বা ক্ষতি কি হ'ত!"

পাঁচু বলিল, "তা সত্যি, একে তো চলে না, খরচের হাত বেড়ে গেলে কখনও কমানো যায়! তার চেয়ে চাকরি যাওয়া ছিল ভাল।"

অমিয় বলিল, "কাল গঙ্গাস্নানে যাবে?"

অবনী হাসিল, "হঠাৎ পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা কেন?"

অমিয় বলিল, "শহরে বসে শান্তি হারাতে বসেছি, রেলের পথে মাঠ দেখে আজ তৃপ্তি হ'ল না—মাঠের কোলে ব'সে ওকে ভাল ক'রে দেখব।"

"অমিয়, এখনও কি কবিতা লেখ?"

"লিখি বইকি, তবে কল্পনার নূপুর তার পায়ে আজ বাজে না, বাস্তবের রূঢ় পদাঘাতে সে উদ্দাম ভাবে নৃত্য করে। ঠিক তোমাদের গদ্য-কবিতার মত।"

"গদ্য-কবিতা লিখতে গেলে শক্তির দরকার।"

অমিয় বলিল, "সাজানোর বাহাদুরি! এবং সাহস!"

পাঁচু বলিল, "তোমরা যাই বল—ও কবিতাও আদর পেয়েছে।"

অমিয় বলিল, "পোলাওয়ের মুখে মুড়ি কি মন্দ লাগে পাঁচু? খাদ্যতালিকায় রুই মাছ আর পুঁই শাক চিরকালই পাশাপাশি থাকবে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি—আদর কেউ না কেউ দেবেন বইকি।"

পাঁচু বলিল, "তোমরা যাই বল, নূতনের ক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে কত দিন ওদের দাবিয়ে রাখবে?"

অমিয় বলিল, "আমরা রাখব দাবিয়ে ক্ষমতাকে! অভ্যুদয়কে কি পর্দ্দা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়, না ছেঁড়া চট দিয়ে সাজিয়ে তার শ্রীহরণ করা চলে? যে তারা আকাশে জ্বলে—তাকে মানুষ ফুঁ দিয়ে নেবাতে পারে? গলাবাজি ক'রে অভ্যুদয়কে প্রচার করতে হয় না—সে আপন নিয়মে আপনি জেগে ওঠে।"

"এই তো গোপালপুরে এলাম।" অবনী বলিল।

"আর ঐ নূতন পুকুর—গোরস্থান—। কালের ইঙ্গিত ওর মধ্যে আমি দেখতে পাই। এমনি আমাদের সাহিত্যেও। মহাকাল অট্টহাস্য ক'রে চলেছেন—নদীর স্রোত সৃষ্টি ক'রে, বালির রাশি ছড়িয়ে, জঞ্জাল উড়িয়ে, ঝড় বইয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে—ভাঙনের নেশায় দুটি হাতে অসুন্দর, ভঙ্গুর, অশিব ক্লেদার্দ্র সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে মহাকাল ছুটেছেন। কোথায় কাব্যগগনের শতসহস্র পিক? যে-সুরে ভারতচন্দ্র ও মাইকেল ঝঙ্কার তুলেছিলেন, সেই সুর রইল অমর হয়ে, আর সব গেল মিলিয়ে—ঋষি বঙ্কিম যা দিলেন, মহাকাল কুন্দমাল্যের মত সাদরে তা গলায় পরলেন—আর হাজার ভক্তের গাঁথা মালা নিষ্ঠার অভাবে ধুলায় গেল মিশিয়ে! বর্ত্তমান কাল প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনে বড় কাল—সুতরাং সৃষ্টির উল্লাস বা গৌরব তাঁদের মজ্জাগত সংস্কার! নিষ্ঠার বিচার করবে কালের কষ্টিপাথর।"

পাঁচু বলিল, "তোমাদের কবিরা বর্ত্তমান ফেলে কেবলই ভবিষ্যতের অন্ধকারে হাতড়ে মরেন। আমরা ওসব বুঝি না। আজ আমার ব্যক্তিগত জীবনে যে সাহিত্য সাড়া দিল, তাই আমাদের সত্যকারের পাওনা। যিনি অন্তরের বস্তু চিনিয়ে দিয়ে আমায় রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন—সেই কুশলী শিল্পীকে কেন প্রশংসা করব না?"

"নিশ্চয়ই তাঁর প্রশংসা করবে। আমরা যা আছি—সেই কথাই বা বলে কয়জন? মনস্তত্ত্বের গুহায় রশ্মিপাত করতে গিয়ে আমরা বিদেশী মনীষীর শরণাপন্ন হই বলেই হাতের নাগালে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষকে মর্য্যাদা দিতে ভুল করি। এখন সাহিত্য থাক। পথের ধুলো বেড়ে উঠল। কাল যাবে তো গঙ্গা নাইতে?"

"যাব। তোমায় ঠিক ভোর পাঁচটার সময় ডাকব কিন্তু।"

"ডেকো। বাকি সাহিত্য-আলোচনা সেই মাঠের মধ্যে চলতে চলতেই হবে।"

প্রথম সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে মাঠের মহিমা কীর্ত্তন করা চলে না, সে শুধু দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী, সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিবার মত অমৃত। কোমল আকাশ মিষ্ট বাতাস আর বাবলা-শিমুলসজ্জিত বিস্তীর্ণ মাঠ—অপ্রকাশিত দিবসের মায়াময় মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যাতীত সম্পদকেই মনে করাইয়া দেয়।

পাঁচু বলিল, "সাহিত্য-আলোচনা শুরু হোক।"

অমিয় বলিল, "না, সূর্য্যোদয় দেখব। মানুষে চিরকাল

যা নকল ক'রে চলে—তার কথা বিছানায় শুয়ে বা চেয়ারে ব'সে পড়াই ভাল।"

অবনী বলিল, "গঙ্গা আর বেশী দিন নয়।"

অমিয় বলিল, "কেন! গঙ্গা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে?"

অবনী বলিল, "যা বালির চর উঠেছে মাঝখানে—গ্রীষ্মকালে ষ্টীমার চলে না।"

সে-কথা সত্য। পটলের ক্ষেতের শেষ প্রান্তে একখানি চালাঘর ছিল। ক্ষেত্রস্বামী রাত্রিকালে ফসল চুরি যাইবার ভয়ে কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া সেই কুটীরে সজাগ পাহারা দিত। কুটীরের চালার উপর এক শিশু বাবলা তরু হেলিয়া পড়িয়া মধ্যাহ্নের খরতাপে কুটীরখানিতে ছত্রদানের কার্য্য করিত। তাহারই কোল ঘেঁসিয়া তখন গঙ্গা বহিতেন। আজ মাত্র তিনটি বৎসর পরে বাবলা গাছটি বয়সের সঙ্গে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে, কুটীর কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, আর পটলক্ষেতের প্রসার বাড়িয়াছে। গঙ্গা পোয়া মাইল পথ সরিয়া গিয়াছেন। ওপারে গুপ্তিপাড়ার সু-উচ্চ পাড় তেমনই সীমানা রক্ষা করিতেছে, গঙ্গার গর্ভ সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে, স্রোতের সে বেগ কোথায়? সত্যই কি ত্রিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দুজীবনের পরম কাম্য এই নদী লুপ্ত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মহিমা প্রচার করিবে? গঙ্গানদী লুপ্ত হইলে আর্য্যজাতির থাকিবে কি?

অবনী বলিল, "মুর্শিদাবাদের ওদিকে লোক হেঁটে গঙ্গা পার হয়, কাটোয়ার কাছেও অতি কষ্টে খেয়া চলে। এখন নবদ্বীপের পর আর ষ্টীমার যাবার উপায় নেই। তাও বর্ষাকালে নবদ্বীপে ষ্টীমার চলে, নইলে যা করেন কালনা।"

পাঁচু বলিল, "গেল বার শান্তিপুরের একটু আগে বয়রার কোলে চর জেগেছিল—দু-দিন ষ্টীমার আসতে পারে নি। কালীগঞ্জের বাঁকে প্রায়ই তো ষ্টীমার আটকায়।"

অমিয় বলিল, "গঙ্গা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে?"

অবনী বলিল, "বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর থেকে গঙ্গাজলের বীজাণুনাশক শক্তি কত বেশী। বছরখানিক কলসীতে ধরে রাখলেও এ জলে পোকা হয় না।"

পাঁচু বলিল, "তব তট নিকটে যস্য নিবাস, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস; এইবার বুঝি আমাদের বৈকুণ্ঠচ্যুত হ'তে হয়।"

অমিয় বলিল, "রহস্য নয়। চারি দিক দিয়ে আমাদের বালুচর জেগে উঠছে। স্রোত আর বইবে না—জীবন-নদী বা গঙ্গানদী কোনখানেই না।"

মৃত্যু যাহার অবশ্যম্ভাবী তাহাকে লইয়া বেশীক্ষণ দুঃখ করা চলে না। অবগাহন-স্নানে শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া 'মা' 'মা' ধ্বনিতে গঙ্গাতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া এখনও সর্ব্বজ্বালাহর অমৃতের আস্বাদ লাভ করা যায়। ইহারই কোলে কত বার চিতা সাজাইয়া কত প্রিয়জনের ভস্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছি, কাজেই এই জলস্পর্শের সঙ্গে সেই সব প্রিয়স্পর্শের ঘনীভূত আনন্দ আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। এ বুকের বেদনার উপর শীতল জলহস্তের স্পর্শ—আঃ! সর্ব্বদুঃখনাশিনী শোক-শ্রান্তিহরা গঙ্গার কোলে গভীর 'মা' 'মা' ডাক তাই তো এত মাধুর্য্যসম্পদভরা। যাহার মা নাই, তাহার গঙ্গা আছেন—হিন্দুর পক্ষে এমন সাকারা সদ্যফলপ্রদ কল্যাণদায়িনী দেবী কোন পুরাণে নাই!

মা বলিলেন, "এবারকার টাকা থেকে ঠাকুর-দেবতার পূজো দেব ব'লেই সব টাকা আমার হাতে তুলে দিলি কেন? তোর হাতখরচের জন্য কিছু রাখলি নে?"

অমিয় বলিল, "যা তোমাদের দরকার রাখ, বাকিটা আমায় দিও।"

"তুই তো বলছিস নূতন বাসা করবি।"

"হ্যাঁ, মেসে যাব। তা সেখানে এখনই নগদ টাকা কিছু লাগবে না, মাসকাবারে দিলেই চলবে।"

"তোর বিছানা-বালিশ কিছু দরকার হবে না?"

"সে সামান্যই।"

"তা হোক, এই দশটা টাকা রাখ। আর শোন, বালিশ-বিছানায় তেমন খরচ না হয়, বৌমার জন্য

এক জোড়া শাড়ী আনিস আসছে শনিবারে। কোথাও নেমন্তন্ন হ'লে বেচারা খেতে যেতে পায় না।"

"তোমারও তো কাপড় নেই।"

"বিধবার ময়লা ছেঁড়াতেই চলে যায়। ওদের তো তা চলে না।"

"তা হোক, আগে ধুতি তার পর শাড়ী।"

মা স্নেহ-কোপকটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "না, আগে শাড়ী। পূজোর সময় তোর পিসীমারা দু-খানা ধুতি দিয়েছিল, সে দু-খানা এখনও ট্রাঙ্কে পোরা আছে।"

অমিয় বলিল, "তার একখানা তো এই স্নান ক'রে পরেছি, যদিও তোমার নাম ক'রে তাঁরা দিয়েছেন, ব্যবহার করছি আমি।"

মা বলিলেন, "বেশ করেছিস, জল খাবি আয়।"

"এত সকালে আবার কি দেবে?"

"কাল একাদশী ছিল, দুধ খাইনি, তার ক্ষীর ক'রে রেখেছি, দুটো নারকেল-নাড়ুও বুঝি ফেলিরা দিয়ে গিয়েছে।"

"আচ্ছা মা, ফেলিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে ওকে নিতে আসেনি?"

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিতে আসবেও না কোন দিন। অমন দেবতুল্য স্বামী, ছুঁড়িটার কপাল।"

অমিয় বলিল, "বিয়ের সময় দেনাপাওনা নিয়ে সামান্য গোলমালে কত জীবন যে নষ্ট হয়ে যায়!"

মা বলিলেন, "দেনাপাওনার গোলমাল তো নয়, সে অন্য কথা।"

"কি কথা?" অমিয় সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

মা বলিলেন, "তা আর নাই বা শুনলি।"

"না তুমি বল। তুমি যত ক্ষণ না বলবে, আমি জল খাব না।"

"পাগল দেখ। জানতিস তো ফেলির শ্বশুর মস্ত একজন পণ্ডিত-বংশের ছেলে ছিলেন। নিজে টোল উঠিয়ে চাকরি নিয়েছিলেন বটে, বাড়ীতে পূজো-পার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, কিছু বাদ দিতেন না। রোজ গঙ্গা-স্নান ক'রে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে তবে তিনি কাছারিতে যেতেন—ছেলেকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। তিনটে পাস দিয়ে ছেলে গ্রামে এল—কত রাজা-জমিদার ওকে মেয়ে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। উনি মস্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, টাকা দেখে টললেন না। বংশ বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন। ফেলির বাপের সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে খ্যাতি আছে, মেয়েটিও দুর্গাপ্রতিমা। বংশ-গোত্রের মিল হতেই বিয়ে হয়ে গেল।"

"তার পর!"

"বছরখানেক পরে লগন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে—ফেলির বাপ উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। আর মেয়ের পানে চেয়ে চোখের জল ফেলছেন। বার বছরের মেয়ে বাপের চোখের জল দেখে হাপুস-নয়নে কাঁদছে। মা নেই, থাকলে বাপের এত মনঃকষ্ট হ'ত না। তাঁরা কাঁদছেন, এমন সময় দেখলেন হুম্ হাম্ শব্দ ক'রে বেয়ারারা একখানা পাল্কী বয়ে এনে তাঁরই দোর-গোড়ায় নামালো। পাল্কী থেকে বেরুলেন ফেলির শ্বশুর। মুখ তাঁর আষাঢ়ের আকাশের মত থমথমে, চোখে যেন আগুন জ্বলছে।"

ফেলির বাপ অভ্যর্থনা করলেন, "বসুন বেয়াই।"

গম্ভীর মুখে ফেলির শ্বশুর জবাব দিলেন, "বসব না, একটা কথার জবাব আমার চাই।"

ফেলির বাপের মুখ শুকিয়ে গেল—ঢোঁক গিলে বললেন, "কিসের জবাব?"

শ্বশুর বললেন, "মেয়ের মা কোথায়? আমার বেয়ান ঠাকরুণ?"

ফেলির বাপ মাথা নীচু করলেন।

শ্বশুর বললেন, "আপনি হয়ত বলবেন, তিনি তীর্থ করতে গিয়ে কলেরায় মারা গেছেন।"

এক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ। একটি সূচ পড়লে শব্দ শোনা যায়।

ফেলির বাবা হয়ত জবাব দিতে না পেরে মাথা তুলবেন না এই ভেবে তো সবাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

ওপাড়ার বিশু খুড়ো হঠাৎ ফেলির শ্বশুরকে প্রশ্ন করলেন, "কেন, আপনার সন্দেহ হয় নাকি?"

কটমট করে বিশু খুড়োর পানে তাকিয়ে তিনি তাঁকে

কোন উত্তর না দিয়ে ফেলির বাবাকেই বললেন, "আপনিই বলুন। সত্যবাদী ব'লে আপনার এদিকে খ্যাতি আছে, আশা করি—"

ফেলির বাবা মাথা তুললেন; চোখে তাঁর জল, আর একটা তেজ দেখা গেল। আমরা জানালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখলাম—তাঁর মুখের তেজ—যেন দু-চোখে দুটি পিদীম জ্বলে উঠল। স্পষ্ট মৃদু স্বরে বললেন, "না, তিনি দেহত্যাগ করেন নি।"

"তবে, কেন আপনি মেয়ের বিয়ের সময় সে-পরিচয় গোপন করেছিলেন?"

তেমনি নির্ভীক স্পষ্ট কণ্ঠে ফেলির বাবা বললেন, "গোপন আমি কিছুই করি নি, আপনি জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথাই বলতাম।"

"আপনি জানতেন তো এই পাপ—"

তাঁকে বাধা দিয়ে ফেলির বাবা বললেন, "আমি এখনও জানি পাপ তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারে না।" উপস্থিত জনমণ্ডলীকে দেখিয়ে বললেন, "এঁরা সবাই জানতেন সংসারে তাঁর আসক্তি ছিল না। নেহাৎ খেতে হয় তাই খেতেন, থাকতে হয় থাকতেন। আমাকে সর্ব্বদাই তীর্থদর্শনের অনুরোধ জানাতেন। তীর্থদর্শনে বেরিয়ে তাঁকে যে জন্মের মত হারাব ভাবতে পারি নি।" তাঁর চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

ফেলির শ্বশুরের মুখের ভাব বদলাল না। বললেন, "আমরা সমাজের মানুষ। তিনি সন্ন্যাসিনী হোন আর যাই হোন, গৃহত্যাগ করেছেন। এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন না।" ব'লেই পাল্কীতে গিয়ে উঠলেন।

পাড়ার লোক তাঁকে কত অনুরোধ করলে। বললে, "ওঁর স্ত্রীর কলঙ্ক হ'লে এ-গাঁয়ের সমাজই কি ক্ষমা করত!" তিনি কোন কথা না শুনে পাল্কী হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

"তার পর থেকে ফেলিদি বুঝি এইখানেই রইলেন?"

"তিন বছর পরে ফেলির শ্বশুর গেলেন বদরী নারায়ণে; সেখান থেকে ফিরে এসেই তাঁর মত বদলাল, আবার পাল্কী নিয়ে ছুটে এলেন এই গ্রামে। ফেলির বাবার হাত ধরে বললেন, "মাপ করবেন বেয়াই, আমার ভুল ভেঙেছে। বৌমাকে পাঠিয়ে দিন।"

ফেলির বাবা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আপনার ভুল ভাঙল কিসে বেয়াই?"

শ্বশুর বললেন, "যোশী মঠে মা-জীর পরিচয় পেলাম। তিনি বছর খানেক হ'ল মহানির্ব্বাণ লাভ করেছেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম সব।"—ব'লে জামার পকেট থেকে একটা শিলের আংটি বার ক'রে বেয়াইয়ের হাতে দিলেন। কোন সন্দেহ রইল না, এ দেবী আর কেউ নন, ফেলির মা।

ফেলির বাবা সেদিন যেন ফেলির মাকে নূতন করে হারালেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। ধরা গলায় বললেন, "কিন্তু বেয়াই, তোমাদের সমাজ?"

ফেলির শ্বশুর বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, সমাজকেও সন্তুষ্ট হ'তে হবে। কই, মা কোথায়?"

ফেলির বাবা বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড। মেয়ে কুয়োতলায় বসে কাঁদছে, আর কাঁচি দিয়ে কচ্ কচ্ করে সেই মেঘের মত কালো মিশমিশে চুলের গোছা কাটছে। বাবা তো থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "ও কি করছিস?"

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ওঁকে ফিরে যেতে বল বাবা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

বাবা মেয়ের মাথায় হাত রেখে কত বোঝালেন, আমরা কত বোঝালাম, মেয়ের সেই কি গোঁ, যাব না। শ্বশুর সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত ঠায় ব'সে আছেন—বৌমাকে তাঁর নিয়ে যাবেন, পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে ওদের বাড়ীতে। মেয়ের সেই এক গোঁ, যাব না।

শ্বশুর বললেন, "তিনি নাই যান, এক বার আমায় নিজের মুখে ব'লে যান এ কথা।"

একখানি আধময়লা শাড়ী পরে ফেলি এসে শ্বশুরের সামনে দাঁড়াল, নেড়া মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া, তবু শ্রী যেন ফুটে বেরুচ্ছে। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বশুরের জবাবে আস্তে আস্তে বললে, "আপনি মিথ্যে কষ্ট ক'রে এলেন, আমি তো যাব না।" ব'লে হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রেই চলে গেল। শ্বশুরের দু-চোখ দিয়ে তখন জল

গড়াচ্ছে। ধরা গলায় ফেলির বাপকে বললেন, "আজ দেবীদর্শন হ'ল। কিন্তু তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবার মত চণ্ডীমণ্ডপ আমার ছিল না, তাই ভগবান আমার কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতীকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েকে দেখে মায়ের মহিমা বোঝা যায়।"

মা চুপ করিলেন।

অমিয় রুদ্ধ নিশ্বাসে এই অপরূপ কাহিনী শুনিতেছিল। অতি সাধারণ পাড়াগাঁয়ের এক অল্পশিক্ষিতা মহিলা—অল্পবয়সে এমন মর্য্যাদাবোধ কে তাহাকে শিখাইয়া দিল! মাতৃ-অপমানের অগ্নিতে মনের কোমল বৃত্তিগুলি তাহার নিঃশেষে পুড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই চণ্ডিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল হয়ত!

আগ্রহে সে প্রশ্ন করিল, "ওঁর স্বামীও ওঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি?"

"করেছিলেন। এক বার ফেলির শ্বশুর মারা গেলে, এক বার ওর বাপ মারা গেলে। ও যায় নি।"

অমিয় বলিল, "ওর স্বামী কি করেন?"

মা বলিলেন, "বড় চাকরি করেন। ফেলিকে কয়েক বার টাকাও পাঠিয়েছিলেন, ও নেয় নি।"

"তিনি কি বিয়ে করেন নি?"

"কেন করবেন না। যেবার লণ্ডনে ফেলিকে পাঠাবার কথা, সেই বারই শ্বশুর ফিরে গিয়ে ছেলের বিয়ে দেন।"

অমিয় আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে জলখাবারের রেকাবীটা টানিয়া লইল।

দুপুরবেলায় খাওয়ার পর মা পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন, আশা পাখা হাতে করিয়া চৌকির উপর বসিল।

অমিয় বলিল, "হেঁসেল-পাট উঠল?"

"হ্যাঁ, এইবার একটু গড়িয়ে নিই।"

অমিয় রহস্য করিয়া বলিল, "তা হ'লে তোমার শাড়ীই চাই এক জোড়া! শুনি মেলাই নেমন্তন্ন হয়—আর তুমি রক্ষা করতে পার না!"

আশা হাসিল, "তাই নাকি! মা বলেছেন বুঝি?"

অমিয় বলিল, "তা কাছে-পিঠে দু-একটা নেমন্তন্ন খেয়ে এলেও তো পারতে, একটু মোটা হতে।" বলিয়া আশার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশা বলিল, "তাও পারতাম, কিন্তু কাছে নেমন্তন্ন হয় কই?"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা এবার আমায় কেমন দেখছ?"

আশা প্রত্যুত্তরে রহস্যের ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ঠিক গেল বার যেমন দেখেছিলাম।"

অমিয় বলিল, "ঠিক তেমনি! রোগাও নয়, মোটাও নয়?"

"না, গো, না, কালোও নয়, ফর্সাও নয়, তবে—" বলিয়া আশা সহসা থামিয়া গেল।

"তবে কি?"

"না, বলব না, হয়ত আমারই দেখবার ভুল।"

"না, বল।" বলিয়া অমিয় আশার হাতে চাপ দিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আশা বলিল, "চাকরি পেলে লোকের চেহারা যেমন খুশী-খুশী হয় তেমনটি নয়।"

"আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল।"

আশা পাখা থামাইয়া অমিয়র মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি দিনরাত কি ভাব বল তো? চাকরি পাওয়ার পর তোমার ভাবনাও যেন বেড়েছে।"

অমিয় রহস্যাচ্ছলে বলিল, "তোমার কাপড় কিনতে পারি নি—মা যা আনতে বলেছিলেন—"

আশা বলিল, "ঠাট্টা নয়।"

অমিয়র মুখে ছায়া নামিল। মৃদুস্বরে বলিল, "চাকরি পেয়ে অবধি আমার মনে হয়েছে কি জান, যেন ছেলেবেলার খেলাঘরে ফিরে এসেছি। আমার চার দিকে কত খাবার পরবার জিনিষ—অথচ খোলামকুচির ভাত ও কালকাশুন্দা পাতার ডালনা বেঁধে 'কয়া' 'কয়া' করে ভোজ খাওয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে। তোমাকে ভাল একখানা শাড়ী কিনে দিতে পারি নি—এ দুঃখও তো কম নয়। চার দিকে অমাবস্যার অন্ধকার ঝড়ের রাত, একটি ছোট পিদীম হাতের আড়ালে ঢেকে পথে পা বাড়িয়েছি।

পিদীমের আলোটিকে বাঁচাতে প্রাণপণ করছি—এদিকে উচুনীচু পথে কত বার যে হোঁচট খাচ্ছি—"

আশা বলিল, "যার যা আয়, তেমন ব্যয় করলেই কোন কষ্ট থাকে না।"

অমিয় বলিল, "কোন রকমে কষ্ট করে চারটি খাওয়া আর মাথা গুঁজে থাকা—এরই জন্ম কি জীবন বইতে হবে? ঠিক ঐ হাতের আড়ালে নিবু-নিবু দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখার মত? এইটুকুর জন্যই কি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মা আমায় লেখাপড়া শেখালেন?"

আশা বলিল, "সবাই তো চাকরি করছে।"

অমিয় বলিল, "সবাই করছে বইকি চাকরি। সংসার পাতছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে যাতে তারা চাকরি একটি পায়, বা চাকরিওয়ালা বর পায়। অতি কষ্টে তাদের মেয়ের বিয়ে ও ছেলের লেখাপড়া চলে।... কিন্তু তার পর? ধারের খুঁটিটি যদি হেলান দেবার জন্ম না থাকত তো চাকরো আমরা কোন্ কালে মাটিতে গড়াগড়ি খেতাম।"

আশা বলিল, "সবাই তো তোমার মত ভাবে না।"

"ভাবে আশা, নিশ্চয়ই ভাবে। তাদের মুখের হাসিতে প্রাণ নেই, বাইরের পোষাকে জৌলুষ নেই,—তবু তারা সমাজকে সাজিয়ে এবং নিজেরা সেজে সভ্যতা প্রচার করে। যারা সত্যিই ভাবে না, তাদের ভাববার ক্ষমতাই নেই। হয়ত কোন লাভ নেই ব'লেই ভাবে না।"

আশা বলিল, "সত্যিই ভেবে লাভ নেই। যা করেন ভগবান—"

"মিথ্যা কথা, ভগবান কিছু করান না, করে মানুষে। যারা সবল মানুষ, সুস্থ মানুষ, সম্পন্ন মানুষ, তারা ভগবান নিয়ে চুলচেরা বিচার করুক গে—তাদের অফুরন্ত অবসর, আমাদের ওসব দিকে মাথা ঘামানো চলে না।"

আশা বলিল, "কেন চলে না। বরং আমরাই তো ভগবানকে বেশী ক'রে ভালবাসব।"

"কেন?"

আশা বলিল, "কারণ তিনি গরিবের। দুর্য্যোধনের রাজভোগ তুচ্ছ ক'রে বিদুরের খুদ খাবার জন্ম তাঁর ঘরেই রইলেন।"

অমিয়র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "তার পর?

আশা আপন মনে বলিতে লাগিল, "তার পর কি—ভগবানের উপর নির্ভর রেখে কাজ কর দেখি, কেমন না শান্তি পাও?"

অমিয় বলিল, "হয়ত দুর্ব্বলের অক্ষম ত্যাগের মধ্যেই ভগবানের মহত্ত্ব লুকানো, আশা। মা ফলেষু কদাচন। তাই তিনি দুর্ব্বলেরই শক্ত আশ্রয়। তাঁর ভক্তদের তিনি বেশী ক'রে কষ্ট দেন, কেননা কষ্ট বইবার একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় না পেলে ভক্ত মানুষ তদ্দণ্ডেই যে বুক ফেটে মারা যেত।"

আশা ঈষৎ আহত হইয়া বলিল, "তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?"

"সত্যি না।" আগ্রহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আশার সীমা না বাঁধতে পারলে সত্যিই সুখ নেই। এত দিন বুঝতে পারি নি, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোক কেন বেঁচে থাকে, আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে কেন তারা কাজ করে, কেন অত্যাচার সয়, প্রতিবাদ করে না। কেন কাঁদে আর কপাল চাপড়ায়, অথচ বলে, ঈশ্বর তুমি দেখো।"

"তুমি ঠাট্টাই করছ—" বলিয়া অভিমানে আশা মুখ ফিরাইল।

"না, আশা, না। যদি ভগবান নাই-ই থাকেন সে তর্ক আমরা করব না। যারা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছেন তাঁদের উপর জগৎসৃষ্টির সঠিক ইতিহাস নির্ণয় করবার ভার রইল। আমরা আশাহত, স্বাস্থ্যহত; জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কেরানী—আমাদের নাস্তিক্যবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। সত্যি আশা, তিনি আছেন; আমার অক্ষমতাকে, অসাফল্যকে, পাপকে, ভীরুতাকে এবং মনের গ্লানিকে মুছে দেবার জন্য তাঁর থাকার প্রয়োজন। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

১৫

অমিয়দের নূতন যিনি অফিসার আসিয়াছেন তিনিও ঐ কথা বলেন। একবার কোন এক দুঃসাহসী কেরানী অফিসার গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

দুঃসাহস বলিলাম এই জন্ত যে, সামান্ত এক জন কেরানীর পক্ষে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎলাভ বহু বিধিনিষেধের অন্তর্গত। প্রথমতঃ বিভাগীয় যিনি বড়বাবু তাঁহার মতামত লওয়া একান্ত আবশ্যক, বড়বাবুর পর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্। সামান্ত কেরানীর ক্ষুদ্র অভিযোগের কাহিনী লইয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অমূল্য সময় পাছে অপব্যয়িত হয় এইজন্তই হয়ত কড়া আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। সে যাহা হউক, অফিসার গুপ্ত সাহেব এই বিষয়ে ছিলেন পরম উদার। আদর্শ হিন্দু প্রণালীতে তিনি আপিসের বিজাতীয় খাদ্য পরিবেশন করিয়া উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতেন। ধর্ম্মালোচনার জন্ত তাঁহার কাছে যে কোন সময়ে যে কোন কেরানীর আসিতে বাধা ছিল না। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, বিবাহ করেন নাই। চির-কুমার থাকিলেই সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল এবং গভীর রহস্যের আরোপ করিয়া অনেক মুখরোচক কাহিনীই পল্লবিত হইয়া উঠে, গুপ্ত সাহেব সম্বন্ধেও এমন অনেক হৃষ্ট গল্পের প্রচলন ছিল, এ-কাহিনীর সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। মোটের উপর লোকটির স্বাস্থ্য ভাল। অফিসার বলিয়া সুট পরিতেন। কিন্তু কপালে ফোঁটা তিলক ও মাথায় সতেজ টিকি রাখিয়া আপন নিষ্ঠাকে প্রচার করিতে ভুলিতেন না। হাজিরাটি ছিল সময়মত, এবং সেজন্য প্রত্যেক বিভাগের উপর কঠোর নিয়ম জারি করিয়াছিলেন—হাজিরা-খাতা ঠিক দশটার সময় তাঁহার টেবিলে পৌছান চাই। কয়েক মিনিট দেরিতে কোন বিভাগ হইতে খাতা যদি না আসিত তো তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম লইয়া তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেন। তিন দিন লেট হইলে তাঁহার বিধানে এক দিন ছুটি কাটিবার নিয়ম ছিল, এবং লেটের সংখ্যা বাড়িলে আইনও কঠোরতর হইত। তা বলিয়া গুপ্ত সাহেব লোকটি হৃদয়হীন নহেন। হাজিরা-খাতা আসিবার পরেই তিনি চোখে চশমা আঁটিয়া গীতা খুলিয়া বসিতেন এবং একটি অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও তাঁহার কক্ষে প্রবেশের অনুমতি মিলিত না। অতঃপর আপিসের কাজ আরম্ভ হইত; কাজ আরম্ভের প্রণালীটি ছিল একটু অদ্ভুত।

ফাইলের স্তূপ বগলে লইয়া কোন বিভাগের বড়বাবু হয়তো গুপ্ত সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলেন। গুপ্ত সাহেব মোলায়েম একটু হাসিয়া তাঁহাকে [illegible] করিয়া কহিলেন, "আপনার আজকের শ্লোকটি আগে বলুন।"

বিভাগীয় বড়বাবু ফাইলের স্তূপ টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিলেন, "কাম এব ক্রোধ এব—ইত্যাদি"

সন্তুষ্ট চিত্তে গুপ্তসাহেব বলিলেন, "ঠিক, ঠিক। দেখি আপনার ফাইল।"

একবার এক চাপরাসীর ফাইন করাতে সে বেচারী কাঁদিয়া গুপ্ত সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। গুপ্ত সাহেব নিজের পকেট হইতে সেই ছুটি টাকা দিয়া আপিস-ডিসিপ্লিন বজায় রাখিলেন, তত্রাচ কলম ভাঙিয়া হুকুম বদলাইলেন না।

যাহা হউক, এহেন গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে যে দুঃসাহসী কেরানী এক বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পরেশ। দশটি বছর একই গ্রেডে পড়িয়া থাকিয়া চারি দিকের ধারে কর্জ্জে জর্জ্জরিত হইয়াই একদা তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। আর ছুটি বৎসর পরে যে অবসর লাভ করিবে অথচ গ্রেডের আশা নাই—তাহার পক্ষে নূতন করিয়া কি ক্ষতিই বা হইতে পারে? বিশেষতঃ গুপ্ত সাহেব দয়াবান। হিন্দুর ধর্ম্ম যিনি বোঝেন, হিন্দুর ব্যথাও কি আর তিনি বুঝিবেন না!

প্রথম সাক্ষাতে অফিসারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পা-দুটি তাঁহার কাঁপিতেছিল বইকি! নমস্কার করিয়া স্থাণুর মত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুপ্ত সাহেব আপন সহাস্য মুখখানি দুঃস্থ কেরানীর শুষ্ক মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন, "কি চান?"

"সার্, আমার বড় কষ্ট।"

"কোন্ সেক্‌সানে কাজ করেন?"

পরেশবাবু সেক্‌সনের নাম বলিলেন।

"কত বছর সার্ভিস হ'ল?"

"তেত্রিশ চলছে।"

"তেত্রিশ—!" গুপ্ত সাহেব ঈষৎ বিস্ময় অনুভব

করিলেন। এক মিনিট থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কত বয়স হ'ল আপনার!

"তিপান্ন, স্যার্।"

আবার এক মিনিট নিস্তব্ধতা। গুপ্ত সাহেব অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "গীতা পড়েছেন তো?"

গীতা পাঠ না করিলে গুপ্ত সাহেবের কাছে কোন আবেদনই টিকিবে না—একথা আপিসের সামান্য চাপরাসী পর্য্যন্ত জানিত, সুতরাং পরেশবাবু অসঙ্কোচেই বলিলেন, "হ্যাঁ, সার্।"

"আচ্ছা, বলুন তো কোন অধ্যায় থেকে যে-কোন একটা শ্লোক?"

পরেশবাবুর শুষ্ক মুখ শুষ্কতর হইল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। অসঙ্কোচ মিথ্যাভাষণের ফল যে এমন হাতে হাতে ফলিবে তাহা ভাবিতেই পারেন নাই। আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন আগে এক বার পড়েছিলাম, ভাল মনে নেই।"

গুপ্ত সাহেবের মুখের প্রসন্নতা স্তিমিত হইয়া আসিল, ধীরে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "অথচ হিন্দু আপনি! এই বয়সেই আগেকার লোকেরা বানপ্রস্থ নিতেন। সাহেবরা বিদেশী বলে পঞ্চাশ পার হ'লেও আর পাচটি বছর দয়া করে চাকরিতে রাখে; হিন্দু নিয়ম জানলে কি আর রাখত? যাই হোক, আপনার উচিত প্রত্যহ গীতা পড়া—" বলিয়া ঘটাং করিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানি নাতিবৃহৎ গীতা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

পরেশবাবুর নামে গীতাখানি উৎসর্গ করিয়া গুপ্ত সাহেব বলিলেন, "ধরুন। প্রত্যহ এইখানি পড়বেন, আপনার বাড়ীতে পড়াবেন। নীচেয় বাংলা টীকা আছে, বুঝতে কষ্ট হবে না। হাঁা, আর কাল থেকে একটি করে শ্লোক আমায় শুনিয়ে যাবেন।"

পরেশবাবু গীতা গ্রহণ করিলেন।

গুপ্তসাহেব বলিলেন, "দাঁড়ান, আজই দু-ছত্র পাঠ্য আপনাকে শুনিয়ে দিই।" বলিয়া আবৃত্তি করিলেন, 'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, 'কর্ম্ম কর, ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল কামনা করে যে কর্ম্মই করা যাক না কেন, তাতেই দুঃখের উৎপত্তি। কর্ম্ম করলে ফল লাভ হ'তেও পারে না-ও পারে। যদি না হয় তোমার দুঃখের অন্ত থাকবে না। এই ধরুন না কেন, আপনার কথা। যা কাজ করেন সেইমত মাইনে পান, অথচ আশা করেন তার অনেক বেশী। কাজেই দুঃখ আপনার ঘোচে না। হিন্দু হয়ে প্রতিপদে যদি গীতাকে অনুসরণ করেন তো কোন দুঃখই আপনার থাকবে না। নমস্কার।"

পরেশবাবু বিদায় গ্রহণ করিলে গুপ্ত সাহেব তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন।

"আচ্ছা সুধীরবাবু, আপনি কি প্রত্যেক সেক্সনের প্রত্যেক কেরাণীকে গীতা দেন নি?"

'আজ্ঞে না, স্যর। সব ডিষ্ট্রিবিউট করে উঠতে পারিনি।"

"কত গীতা আপনাকে দিয়েছি?"

"হাজার কাপি দিয়েছেন।"

"আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন। প্রত্যেক ডিপার্ট-মেণ্টের বড়বাবুদের ডেকে পাঠান। তাঁদের কাছে কেরানীদের লিষ্ট নিয়ে তাঁদের হাতে আজই ওগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করে দিন। কাল সকালে নামের লিষ্ট, সেকসন ইত্যাদির একটা ফেয়ার কাপি করে আমার কাছে পাঠাবেন! আমি প্রত্যেককে ডেকে পাঠ জিজ্ঞাসা করব।"

সুতরাং অমিয়ও একখানি গীতা পাইয়াছে। পাইয়া বুঝিয়াছে দুঃস্থ জীবনে গীতার মূল্য কতখানি।

যখনই প্রত্যক্ষ অবিচারে মনের মধ্যে মালিন্য জমিয়া উঠে—সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে থাকে—

> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
> শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
> তুল্য নিন্দাস্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

ইত্যাদি।

মনের প্রশান্তি ফিরিয়া আসে।

বিক্ষুব্ধ মন অভাব-অনটনের অনলে দগ্ধ হইতে থাকিলে ভগবানের উক্তি বেশী করিয়াই মনে জাগে—

> অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
> অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।'

বৈরাগ্য নহে তো কি! ফল কামনা করিলেও যে জীবনে ফললাভ আকাশ-স্বপ্ন, দুঃখের গুরুভারে পৃষ্ঠ ন্যুব্জ বিকৃত মুখের কালিমায় পরাজয়ের গ্লানি, নিষ্প্রভ নয়নে পথহারার নৈরাশ্য পরিস্ফুট—সে-জীবন সম্বন্ধে গীতার শ্লোকগুলি কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসার এবং সর্ব্বোত্তম সান্ত্বনার বাণী বহন করিতেছে না?

কালো প্যাডের বর্ডারে সাদা বড় বড় হরফে অমিয় একদিন গীতার পরম আশ্বাস বাণী উৎকীর্ণ করিয়া দিল:

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ক্রমশঃ

অলকা-সম্ভব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আহা আভাহীন আষাঢ়ের দিন
এত কি মন্ত্র জানে,
ভ্রমরের মত গুঞ্জনরত
কবির কমল-প্রাণে।
যায় জলবেণী রম্যা সিপ্রা
বাতায়ন হ'তে দেখা,
পাণ্ডু ছায়ার খেলা চলে জলে
কবি ব'সে দেখে একা।
গগনে ধবল বলাকার শ্রেণী,
চঞ্চল করে মন,
দিগঙ্গনার অঞ্জন যেন
শ্যাম জম্বুর বন।

উদ্যান-যূথী সমীরে দুলিছে
আশায় বদ্ধ হিয়া,
কবির দৃষ্টি কি মধু আনিতে
পড়িছে তাহাতে গিয়া।
বংশীরবের মত ভেসে আসে
মালতীর পরিমল,
মেঘলা দিবস জাগিয়া ঘুমায়
স্থলপদ্মের দল।
বলিভুক-কুল ব্যাকুল করিছে
বিপুল চৈত্যগুলি,
বীণায় করিছে মুখর বধূর
সুমোহন অঙ্গুলি।

স্নিগ্ধ সজল মেঘ উঠিয়াছে
দিব্য কান্তি তার,
মেঘালোকে পেলে অপরূপ রূপ
পরিচিত চারি ধার।
মেঘোদয়ে কবি গণে উৎসব,
কবি মেঘ ভালবাসে,
ভাবে এ সুদূর-পিয়াসী অতিথি
কিসের লাগিয়া আসে?
দুঃসাহসিক খুঁজিয়া বেড়ায়
ও কি অসীমের সীমা,
কোন্ অজানার সন্ধানে করে
ভুবন-পরিক্রমা?

দু-দিনে হেথায় রূপ ঝরে যায়
পলায় সুখের ক্ষণ,
মিলনে হেথায় চির-অভিশাপ
শিথিল আলিঙ্গন;
প্রেম-প্রীতি সব রূপের বিভব
সত্য কি পায় লয়?
কোন্ কুবেরের রাজভাণ্ডারে
অক্ষয় হয়ে রয়?
উৎসবময়ী সঙ্গীতময়ী
তন্বী শ্যামার দেশ—
কোথায় রাজিছে? গম্ভীর মেঘ
চায় নাকি নির্দ্দেশ?

কোথা সে নগরী? কোন্ হিমালয়ে
অলকনন্দা তীরে,
যেথায় অশোক আনন্দ রাজে
যৌবন রয় ঘিরে।
যেখানে জীবন শুধু সুধাময়
সকল শ্রান্তিহরা,
হাস্য এবং রহস্যময়ী
যায় না কি তারে ধরা?
মৃত্যুজরার অতীত সে ঠাঁই
নয় তাহা নির্ব্বাণ
বুকের আলোকে গড়া সে অলকা
জ্যোতির্ম্ময়ের দান।

বিচিত্র জীব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যে-কোন জীবই হউক তাহা হইতে তদনুরূপ জীবেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত ঘটনা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। বাঘিনী হরিণ-শাবক প্রসব করে না, আদি জীবের বংশধরদের মধ্যে তবে বৈচিত্র্য আসিল কোথা হইতে? পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রমপরিণতির ফলেই জীবজগতে বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। জীবনের এই বিচিত্র অভিব্যক্তি অহরহই আমাদের নজরে পড়িতেছে। তন্মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিস্ময়-উদ্রেককারী জীবের সংখ্যা কম নহে।

জীবজগতের আদিযুগে কত প্রকার অ-মেরুদণ্ডী বিচিত্র প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় না

নটিলাস
ইহাদের শরীর শামুকের খোলার মত শক্ত আবরণে ঢাকা

থাকিলেও প্রস্তরীভূত [illegible] হইতে সে-সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ধারণা হইতে পারে। 'কেফালোপড্'-জাতীয় কয়েক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত। ইহাদের অনেকেই আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও 'নটিলাস' নামক তাহাদের বংশধরদিগকে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রজলে এখনও বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি অনেকটা কাটল-মাছ বা অক্টোপাসের মত, কিন্তু শরীরটা শামুকের কুণ্ডলীর মত প্রকাণ্ড শক্ত খোলায় আবৃত। ইহারা প্রায়ই শামুকের মত চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু শরীর হইতে বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া খোলের মধ্যে জমা হইলে মাঝে মাঝে জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে, তখন শুঁড়ের সাহায্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে অসুবিধা হয় না। ইহারা সাধারণতঃ কাঁকড়া-চিংড়ি জাতীয় প্রাণীদিগকে শিকার করিয়া থাকে। বাগে পাইলেই খোলার ভিতর হইতে শুঁড় বাহির করিয়া শিকারকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে এবং ধীরে ধীরে রস-রক্ত চুষিয়া লয়।

সমুদ্রের গভীর এবং অগভীর অনেক স্থলেই অক্টোপাস নামক এক প্রকার ভীষণাকৃতি হিংস্র প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের গঠন অদ্ভুত। প্রকাণ্ড একটা বলের মত গোলাকার পদার্থের এক দিকে লম্বা লম্বা কতকগুলি শুঁড় বাহির হইয়া আছে। শুঁড়গুলি মুখের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ালার মত কতকগুলি শোষণ-যন্ত্র সারবন্দী ভাবে শুঁড়ের নিম্নদেশে স্থাপিত থাকে। কোন প্রাণীকে বাগে পাইলে শুঁড়ে জড়াইয়া এই শোষণ-যন্ত্রগুলির সাহায্যে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে যে, কোনক্রমেই ইহাদের হাত এড়াইয়া পরিত্রাণ লাভের উপায় থাকে না। বড় বড় এক-একটা অক্টোপাস ওজনে প্রায় তিন-চার মণ হইয়া থাকে। ইহাদের শুঁড়গুলি প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা ও মানুষের হাতের কব্জির মত মোটা হইয়া থাকে। ইহারা অনায়াসে একটি বলবান্ মানুষকে শুঁড়ে জড়াইয়া জলের নীচে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। এক বার ইহার কবলে

অক্টোপাস

পড়িলে নিস্তার লাভ করা অসম্ভব। শুঁড়গুলি জোঁকের মত আঁটিয়া থাকে। অস্ত্রাঘাতে দুই-একটা শুঁড় ছিন্ন হইয়া গেলেও বাকীগুলার বন্ধন একটুও শিথিল হয় না। চোখ দুইটা খুব বড় বড় এবং সর্ব্বদাই এমন ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে যে, যে-কোন প্রাণীই ইহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। মাথার নীচে নলের মত একটা অদ্ভুত যন্ত্র আছে—বাহিরের দিকটা ফুঁদেলের মত চওড়া। শুঁড়ের সাহায্যে চলাফেরা করিলেও এই নলাকৃতি যন্ত্রসাহায্যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে ইহারা পিছু হটিয়া যাইতে পারে। কান্‌কোর ভিতর দিয়া যে-জল প্রবেশ করে সে-জলটাকে ইহারা অতি সহজ ভাবেই এই নল দিয়া বাহির করিয়া দেয়; কিন্তু হঠাৎ তীরবেগে পিছু হটিতে হইলে ঐ জল এত জোরে চাপ দিয়া বাহির করিয়া দেয় যে, সেই ধাক্কায় বিদ্যুৎগতিতে পিছু হটিয়া যায়। ফুঁদেলের মুখটা ঘুরাইয়া ইচ্ছামত যে কোন দিকেই যাইতে পারে। শত্রুর কবলে পড়িলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ কালির মত এক প্রকার তরল পদার্থ এই ফুঁদেলের মুখ হইতে জোরে ছুড়িয়া জল ঘোলা করিয়া দেয় এবং তাহারই আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কালো জলের মধ্যে শত্রু কিছুতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। তাহা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় শত্রুকে ধোঁকা দিবার জন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে দেহের রং বেমালুম পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে পারে। দেহের রং আচমকা পরিবর্ত্তনের ফলে শত্রুরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

কাটল-মাছও দেখিতে অনেকটা অক্টোপাসেরই মত। বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট বহুজাতীয় কাটল-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শুঁড়ের নিম্নভাগেও সারবন্দী ভাবে ছোট ছোট শোষণ-যন্ত্র সজ্জিত থাকে। চলাফেরা করা ও শিকার ধরা এই উভয় কার্য্যেই ইহারা শুঁড়ের ব্যবহার করিয়া থাকে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ইহারাও মস্তকের নিম্নে অবস্থিত নলের সাহায্যে 'সিপিয়া' নামক এক প্রকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালি ছুড়িয়া জল ঘোলা করিয়া দেয়। চিত্রকরেরা 'সিপিয়া' নামক যে কালি ব্যবহার করেন, তাহা কাটল-মাছ হইতেই সংগৃহীত হয়। ইহারা

গভীর সমুদ্রের ভীষণাকৃতি কাটল-মাছ

এত জোরে কালি ছুড়িতে পারে যে, একবার নাকি জাহাজের উপরিস্থিত এক নৌ-কর্ম্মচারীর সাদা পাজামাটিকে অত দূর হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া দিয়াছিল।

অক্টোপাস, কাটল-মাছ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য-হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাপানের মাছের বাজারে নাকি বড় বড় ঝুড়ির মধ্যে মাথাটা রাখিয়া তারকার

আকারে পাণ্ডলি চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া ওজন ও আকৃতি হিসাবে এক-একটা দেড় টাকা দুই টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রয় হয়।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে অনেক অদ্ভুতাকৃতির মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 'গাল্পার ইল' নামে অত্যন্ত সরু লিক্লিকে চেহারার এক প্রকার অদ্ভুত বাণ-মাছ গভীর জলে বাস করে। ইহাদের গায়ে আঁশ নাই। চামড়ার রং কালো। মুখের হাঁ অসম্ভব বড়। শরীরটা একটা লম্বা সরু চাবুকের মত হইলেও পেটের দিক লম্বা থলির মত ঝুলিয়া থাকে। প্রকাণ্ড মুখ ও তদপেক্ষা প্রকাণ্ড পেটের থলির জন্য ইহারা নিজের দেহের ওজন অপেক্ষা অনেক বড় বড় শিকারকে অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রের মাছ বলিয়া ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই।

আগুন মাছ

গভীর সমুদ্রের একজাতীয় বাণমাছ

প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশে আগুন-মাছ নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গায়ের রং ও পাখ্না্র গঠন অতীব মনোমুগ্ধকর। কিন্তু মুখাকৃতি কদাকার। শরীরের রং আগাগোড়া লাল এবং তাহার উপর আরও গভীর লাল রঙের ডোরা-কাটা। ইহাদের পাখ্নাগুলি অন্যান্য সাধারণ মাছের পাখ্না হইতে অসম্ভব লম্বা ও দেখিতে ঠিক পাখীর পালকের মত। এইরূপ লম্বা পাখ্নার জন্যই হয়ত পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, ইহারা উড্ডুকু মাছের মতই অন্ততঃ কিছু দূর আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কিন্তু মোটেই উড়িতে পারে না।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের স্থানে স্থানে দুই-তিন শত মাইল ব্যাপিয়া নিশ্চলভাবে জলজ ঘাসপালা ভাসিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের খালবিলে কচুরীপানা যেমন জলপথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সমুদ্রের এই ঘাসপালাও সেইরূপ পুরু ভাবে জন্মিয়া থাকে। ভুলক্রমে কোন জলযান ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে সহজে বাহির হইবার উপায় থাকে না। গভীর সমুদ্রের মধ্যে হইলেও এসব স্থলে জলের কোন স্রোত নাই। মহাসমুদ্রের এই সব স্থানকে 'সারগাসো'-সাগর বলে। সারগাসো-সাগরের জলে তীর-মাছ, তারা-মাছ, নল-মাছ, ঘোড়া-মাছ ও অন্যান্য বহু-জাতীয় বিচিত্র মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কতকটা পায়রা-চাঁদার মত দেখিতে ব্যাং-মুখো মাছ নামে এক প্রকার বিদ্ঘুটে মাছ এই জল-ঘাসের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে ইহারা পিঠ ও মাথার উপরের জঞ্জালের মত কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া ঘাসপালার আড়ালে চুপ করিয়া থাকে। দীর্ঘচঞ্চু-বিশিষ্ট ঘোড়া-মুখো নল-মাছেরা দলে দলে বিচরণ

সম্মুখে—ব্যাং-মুখো মাছ। পিছনে—তীর-মাছ ও নল-মাছ

করিবার সময় তাহাদের গায়ের কাঁটাগুলিকে অদ্ভুত কিছু ভাবিয়া কাছে যাইবামাত্রই ব্যাং-মুখো তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং একসঙ্গে কয়েকটাকে মুখে পুরিয়া দেয়। শিকার বড় হইলে মুখের বাহিরে যতটা থাকে তাহা কাটিয়া বাদ দেয় ও বাকী অংশ উদরসাৎ করে। ডিম পাড়িবার পর সেগুলি ব্যাঙের ডিমের মত হড়্‌হড়ে আঠালো পদার্থের সঙ্গে জড়িত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। দিন-দশ-পনর পরে বাচ্চা ফুটিলে ঘোড়া-মুখো নল-মাছেরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছগুলিকে ধরিয়া খাইয়া থাকে। ব্যাং-মুখো মাছের কান্‌কোর পাশের পাখ্‌না দুটি এত শক্ত যে, ইহারা অনায়াসে তাহার উপর শরীরের ভার রক্ষা করিতে পারে। এই জাতীয় কোন কোন মাছ আবার কান্‌কোর পাখ্‌নার উপর ভর দিয়া ডাঙায় লাফাইয়া বেড়াইয়া থাকে। সারগাসো-সাগরের তীর-মাছগুলিও অতীব মনোরম। ইহাদের শরীরটা সরু, লম্বা নলের মত। কান্‌কোর দুই পাশের ছোট পাখ্‌না দুটি বিস্তৃতভাবে থাকে বলিয়া হুবহু তীরের ফলার মতই দেখায়। জলের উপর লাফালাফি করিবার সময় মনে হয়, জলের ভিতর হইতে ধনুকের সাহায্যে যেন তীর ছোড়াছুড়ি চলিতেছে।

সকলেই জানেন, অভিব্যক্তির ধারায় মর্কট-জাতীয় প্রাণী ক্রমশঃ বর্ত্তমান মনুষ্যাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু মর্কট-জাতীয় কোন্ স্তন্যপায়ী হইতে এই অভিব্যক্তি সুরু হইয়াছিল? বৈজ্ঞানিকেরা মর্কট-জাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি ও অস্থি-সংস্থানের তুলনামূলক আলোচনার ফলে অবিসংবাদীরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের সহিত অধিকতর সাদৃশ্যবিশিষ্ট মর্কট-জাতীয় প্রাণীরা লেমুর নামক প্রাণীরই সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু এই লেমুর ও মর্কটের মধ্যস্থলে

বোর্ণিও-দ্বীপের 'টারসিয়াস'—লেমুর ও বানরের মাঝামাঝি এক প্রকার অদ্ভুত জীব

'টারসিয়াস' নামে আর এক জাতীয় প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে এই ক্ষুদ্রকায় বানরাকৃতি প্রাণীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথা গোলাকার; চোখ দুটিও বড় বড়। সম্মুখের পা অপেক্ষা পিছনের পা বড়। হাত ও পায়ের আঙ্গুলের প্রান্তভাগে পেয়ালার মত ছোট ছোট শোষণ-যন্ত্র আছে। ইহারা নিশাচর প্রাণী; গাছে গাছে লাফাইয়া চলে। এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইবার সময় শোষণ-যন্ত্রগুলির সাহায্যে গাছের গা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, কোন রকমেই পিছলাইয়া পড়ে না। পায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলি ছাড়া অপর প্রত্যেকটি আঙ্গুলের নখই চেপ্টা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলির নখ বিড়ালের নখের মত।

মানুষের মত ইহারা যে-কোন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখাশুনা করিতে পারে। খাবার সময় হাতের সাহায্য লইয়া থাকে। হাত-পা, নাক-মুখ ও চোখের দৃষ্টিশক্তি বা আভ্যন্তরীণ গঠন অনেকাংশে মানুষের সঙ্গে নৈকট্যের আভাস প্রদান করে; ইহা হইতেই অনুমিত হইতেছে যে, মানুষের অভিব্যক্তির সোপানে তাহার নিকটতম জাতির মধ্যস্থলে 'টারসিয়াস' অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কাজেই বৈজ্ঞানিকের নিকট জীবসমাজে ইহারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঝালরওয়ালা টিকটিকি পিছনের দুই পায়ের উপর খাড়া হইয়া ছুটিয়া যাইতেছে

অষ্ট্রেলিয়ায় এক জাতীয় অদ্ভুত টিকটিকি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 'ক্ল্যামিডোসরাস' নামে পরিচিত। চেহারা দেখিয়া ইহাদিগকে গাছে গাছে চড়িয়া বেড়াইবার উপযোগী প্রাণী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা ভূমিতেই বিচরণ করিয়া থাকে। শরীরটা নলের মত গোলাকার। লেজ অসম্ভব লম্বা। সম্মুখের পা

ঝালরওয়ালা টিকটিকি বেকায়দায় পড়িয়া ভীষণভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে

অপেক্ষা পিছনের পা অধিকতর শক্তিশালী। ইহাদের গলার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা বা ঝালরের মত ভাঁজে ভাঁজে এক-একটা গোলাকার চামড়া ঝুলিয়া থাকে। ছাতার ডাঁশার মত কোমল হাড় দিয়া সেগুলি সংরক্ষিত থাকে। যখন সাধারণ ভাবে চলাফেরা করে তখন এই চামড়াখানি ভাঁজে ভাঁজে গুটাইয়া থাকে। আক্রান্ত হইলে বা কোন রকমে ভয় পাইলে পিছনের পায়ের উপর খাড়া হইয়া সম্মুখের দিকে হেলিয়া দুই পায়ে ছুটিতে আরম্ভ করে। দৌড়াইবার সময় প্রকাণ্ড লেজটা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু বেশী দূর দৌড়াইতে পারে না, সহজেই

ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্লান্ত হইবামাত্রই ইহারা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন বিকট হাঁ করিয়া শত্রুর দিকে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং গলার চামড়াটাকে ছাতার মত মেলিয়া ধরে। ইহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির সম্মুখে কেহই এ অবস্থায় অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। ঈষৎ সবুজ রঙের ছাতাটির সম্মুখভাগে হল্‌দে রঙের মুখের গর্ত্তটা এমনই ভীষণ মনে হয় যে, সাহসী ব্যক্তিরাও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। কুকুর বড় বড় গোসাপকে আক্রমণ করিতেও ইতস্ততঃ করে না; কিন্তু ইহাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির সম্মুখে তাহারা ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না।

টিকটিকি-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে বহুরূপীর চালচলনই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। ইহারা সর্ব্বদাই বৃক্ষলতার মধ্যে অবস্থান করে; পায়ের আঙ্গুলগুলি ডালপালা আঁকড়াইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। দক্ষিণ-ভারত, আফ্রিকা, ম্যাডাগাস্কার, আরব, সিংহল প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জাতীয় বহুরূপী দেখিতে পাওয়া যায়। বহুরূপীরা সাধারণতঃ কয়েক ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না, কিন্তু ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের বহুরূপী প্রায় দুই ফুট লম্বা হইয়া থাকে। অন্যান্য সরীসৃপের মত ইহারাও অনেক দিন না-খাইয়া থাকিতে পারে। বহুরূপী প্রায় সর্ব্বসময়েই নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। ডালের উপর দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় অতি ধীরে বকের মত পা ফেলিয়া চলে। হয়ত বা এক পা তুলিয়াছে—সেই পা ফেলিতেই আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এক স্থানে মাটির পুতুলের মত অবস্থান করিবার সময় লেজটাকে বৃক্ষশাখায় উত্তমরূপে জড়াইয়া রাখে। দৌড়াইতে ইহাদিগকে কোন অবস্থায়ই দেখা যায় না। অধিকাংশ বহুরূপীই ডিম পাড়ে, কিন্তু দুই-এক জাতীয় বহুরূপী বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের চোখ ঘুরাইবার কায়দা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একই সময়ে দুইটি চোখকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুরাইতে পারে। হয়ত ডান চোখ সম্মুখের দিকে একটা জিনিষের প্রতি চাহিয়া আছে, ইত্যবসরে বাম চোখটি চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আশেপাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইতেছে। শিকার ধরিবার কৌশলও অপূর্ব্ব। এক স্থানে নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে—একটুও নড়াচড়া নাই, ঠিক যেন মাটির তৈয়ারী একটা জীব। একটু দূরে হয়ত একটা পোকামাকড় আসিয়া বসিয়াছে। অমনি মুখের মধ্য হইতে শরীরের সমান লম্বা প্রায় ছয়-সাত ইঞ্চি জিব বাহির করিয়া তাহার গায়ে ঠেকাইয়া দিল এবং চক্ষের নিমেষে তাহাকে টানিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া ফেলিল। জিবের ডগাটি মুগুরের মত এবং এক প্রকার চটচটে আঠালো পদার্থে জড়িত। বিদ্যুৎগতিতে জিবটা মুখ হইতে বাহির হইয়া পোকার গায়ে লাগিতেই সেটা জিবে আটকাইয়া যায় এবং জিব গুটাইবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতর চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এত দূর হইতে জিব বাহির করিয়া শিকার করিতে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় না। ইহাদের অনেকেরই গায়ের রং হাল্কা অথবা গাঢ় সবুজ, কিন্তু অদ্ভুত ইহাদের শরীরের রং
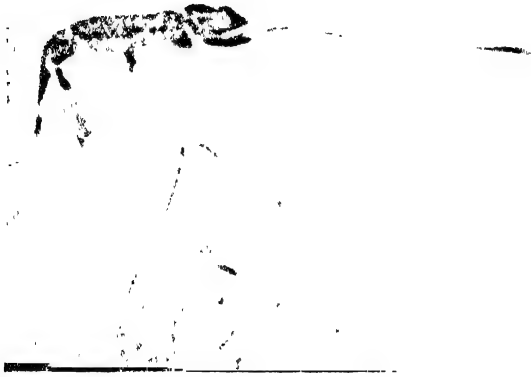
বহুরূপীর শিকার ধরা

বহুরূপীর শিকার-প্রক্রিয়া। উহার বর্ণান্তর-পরিগ্রহণও লক্ষ্য করিবার বিষয়

পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা। লাল, হলদে, কালো, সবুজ বা অন্য যে-কোন রঙের পদার্থের উপর রাখিলে শরীরের রং তৎক্ষণাৎ সেই রূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখনও বা জেব্রার মত শরীরে কালো ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া কতকগুলি হলদে দাগের উৎপত্তি হয়। কখনও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ ধারণ করে, কখনও কখনও আবার ধূসর রঙের উপর কালো দাগের আবির্ভাব ঘটে। গাছের পাতার মধ্যে থাকিবার সময় এমন ভাবে শরীরের রং পরিবর্ত্তন করে যে, সহজে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। দেহের রং পরিবর্ত্তনের এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যই ইহাদের বহুরূপী নাম হইয়াছে।

আমাদের দেশে দুই ফুট আড়াই ফুট লম্বা শূকরের মত এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর লম্বা লম্বা সূক্ষ্মাগ্র কাঁটায় আবৃত। এই অদ্ভুত প্রাণীরা সজারু নামে পরিচিত। দিনের বেলায় ইহারা মাটির নীচে দু-মুখো গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, রাত্রিতে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। সজারু ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। গাছের নরম স্থূলকায় মূলই ইহাদের পরম উপাদেয় খাদ্য। শরীরের
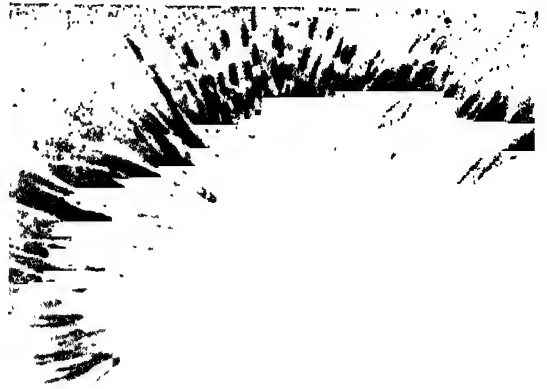
সজারুর উত্তেজিত অবস্থা

লম্বা লম্বা ধারালো কাঁটাগুলিই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাঁটাগুলি দশ-বারো ইঞ্চির বেশীও লম্বা হয়; কিন্তু সেগুলি সূক্ষ্মাগ্র হইলেও অতিশয় কোমল, পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা কাঁটাগুলি খুবই সাংঘাতিক। লোকের ধারণা, সজারু কাঁটা ছুড়িয়া মারিয়া শত্রুকে ঘায়েল করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা কাঁটা ছুড়িয়া মারিতে পারে না। কাঁটাগুলি আলতো ভাবে চামড়ার সঙ্গে আটকানো থাকে। কাহারও সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইলেই সেগুলি তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া যায়। কাহারও গায়ে এই কাঁটা ফুটিলে সহজে বাহির হইতে চায় না—নড়াচড়া করিলে ক্রমশঃ ভিতরেই প্রবেশ করিতে থাকে। সজারুর সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে অনেক সময় নেকড়ে বাঘের গায়ে মুখে কাঁটা ফুটিয়া থাকে। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে এই কাঁটা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলে কাঁটাগুলি আরও ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার ফলে যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় শারীরিক যন্ত্রণায় বা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আততায়ী নিকটে আসিলেই সজারু কাঁটা খাড়া করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং লেজের দিকে এক গোছা ছোট ছোট ভোঁতা কাঁটা ঝুমঝুমির মত শব্দ করিয়া বাজাইতে থাকে। সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে শত্রুর প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত না হইয়া পারে না। কুকুর অনেক সময় সজারুকে আক্রমণ করিতে গিয়া মুখে কাঁটা ফুটিয়া প্রদাহের ফলে

হংস-চঞ্চু নামক ডিম্ব-প্রসবকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লড়াইয়ে কাবু হইয়া পড়িলে সজারু শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকাইয়া বলের আকার ধারণ করে। শরীরের চতুর্দ্দিকে কাঁটাগুলি কদমফুলের মত খাড়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত শত্রু তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহাদের দাঁতের ভয়ানক জোর থাকা সত্ত্বেও কাহাকেও কামড়াইয়া জখম করিতে চেষ্টা করে না। কাঁটার জোরেই ইহারা শত্রুর নিকট অজেয় হইয়া থাকে। কিন্তু নাকের উপর সামান্য আঘাত পাইলেই ইহারা অসাড় হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশের লোকেরা সজারুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেকে সজারুর মাংস খাইয়া থাকে।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এমনই অদ্ভুত, মনে হয় যেন বিভিন্নজাতীয় প্রাণীর সমবায়ে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার হংস-চঞ্চু বা জল-ছুঁচো এরূপ এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী। এমনই শরীরের গঠন যে, ইহাদিগকে পশু, পাখী ও সরীসৃপ, এই তিনটি শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে, ইহাদের শরীর লম্বাটে গোলাকার। লম্বায় তেইশ-চব্বিশ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। মুখ অবিকল হাঁসের ঠোঁটের মত। গাঢ় ধূসর বর্ণের লোমে সর্ব্বশরীর আবৃত। চামড়াটা এত ঢিলা যে, অনায়াসে ইহারা ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে গলিয়া যাইতে পারে। ঢিলা চামড়ার জন্য বন্দুকের গুলিতেও ইহাদিগকে শিকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঠোঁটের সাহায্যে হাঁসেরা জল-কাদা হইতে যেরূপে খাদ্য সংগ্রহ করে, হংস-চঞ্চুর খাদ্যসংগ্রহ-প্রণালী অবিকল সেইরূপ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুক, গুগ্‌লি, পোকামাকড় প্রভৃতি খাইয়াই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঠোঁটের মূলদেশে ফুঁদেলের মত শক্ত হাড়ের মধ্যে চক্ষু দুটি সংরক্ষিত। পায়ের আঙুলগুলিও ঠিক হাঁসের পায়ের মত পাতলা চামড়ায় পরস্পর সংযুক্ত। সম্মুখের পা-দুটি পিছনের পা অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। লেজ অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও সাঁতার কাটিবার সময় বীভার-জাতীয় প্রাণীদের মত ইহাকে দাঁড়ের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। হংস-চঞ্চু অতি নিরীহ নিশাচর প্রাণী, কিছুতেই লোকালয়ে আসিতে চায় না। জলের ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট লম্বা গর্ত্ত খুঁড়িয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে তাহাতে বাস করে। গর্ত্তের এক মুখ মাটির উপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে থাকে, অপর মুখ থাকে জলের নীচে। গর্ত্তের মধ্যে এলোমেলো ভাবে ঘাসপাতা বিছাইয়া তাহার মধ্যে দুইটি কি তিনটি ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিমের খোলাগুলি অত্যন্ত নরম। স্তন্যপায়ী জীব হইয়াও ইহারা পাখী অথবা সরীসৃপের মত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহাদের ঠোঁট অত্যন্ত কোমল থাকে, এই জন্য মায়ের দুধ চুষিয়া খাইতে কোনই অসুবিধা হয় না।

মাতৃমূর্ত্তি

ইতালীয় চিত্রকর কার্লো ক্রিভেল্লি

নিশীথে

শ্রীসুকুমারী চৌধুরী

হঠাৎ কিসের একটা খুট্ শব্দে সুলেখার স্বপ্ন ভেঙে গেল। স্বামী সুব্রত খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক। এ সপ্তাহে তাঁর নাইট-ডিউটি।

গভীর রাত্রি। বাসায় কেউ নেই। পাশের ঘরে একটা বার-তের বছরের চাকর-নামধারী বালক মাত্র। এ ঘরে সুলেখা তার দুটি মেয়ে দু-পাশে নিয়ে বড় খাটের উপর ঘুমচ্ছিল। কি যে স্বপ্নটা, তা সুলেখা এখন ভুলে গেছে—তবে দুঃস্বপ্ন, কারণ সে ভয় পেয়েছিল। আবার খুট্ খুট্ শব্দ। এবার বেশ বুঝা গেল শব্দটা ঠিক তার খাটের নীচে থেকেই আসছে। ইঁদুরই বোধ হচ্ছে। পাটনায় ইঁদুর, মশা, মাছি তিনটেই সমান পাল্লা দিয়ে চলে। ভয় যে সে পাচ্ছে না তা নয়—কেন না সাহসও হচ্ছে না যে উঠে ইঁদুরটাকে তাড়িয়ে দেয়। বড় মেয়ে এই ছ-বছরের হ'তে চলেছে। সুলেখা তাকেই ডাকবে মনে করল। কারণ বয়সে সুলেখা তার চেয়ে প্রায় চার-পাচ গুণ বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহস তার সুলেখার চেয়ে ঐ পরিমাণ বেশী বলেই মনে হয়। আর যদি একবার কথারূপ বাণ নিক্ষেপ সুরু করে, তবে ভয় ত ভয়, ভূত পর্য্যন্ত কথার ফাঁকে প্রবেশের সুযোগ পাবে না।

ছোটটি এই সবে মাস সাত-আটেকের হবে। তার সম্বল কান্না। সে মার ভয় তাড়াতে তাই সুরু ক'রে ছিল। সুলেখা তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করাতে লাগল। মেয়েটি সত্যই বড় সুন্দর মনে হয় সুলেখার কাছে। আচ্ছা, এ যদি তার কোলে না-আসত, সুলেখার দিন কি ক'রে কাটত? এরা দুটি বোনে কি ক'রেই না সুলেখার মনটাকে ভরিয়ে রেখেছে। সামান্য একটুখানি ভাবনায় পর্য্যন্ত প্রবেশ-অধিকার নেই এদেরই জন্যে। এরা যখন ছিল সুলেখার পুতুলখেলায় আর প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়, তখন কি এদেরই সে ভেঙেছিল আর গড়েছিল?

ছোট মেয়ে সিপ্রা ঘুমিয়ে পড়ল, সুলেখা ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ের কচি গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে লাগল।

আর সতর-আঠার বছর পর সিপ্রা হবে যুবতী, বাংলা দেশের আধুনিকা মেয়ে। তখন সিপ্রা হবে কুমারী সিপ্রা দেবী। হয়ত তখনও কলেজে পড়বে। আর বড় মেয়ে লীলা? ওর হয়ত পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে। হয়ত সে-সময়কার মেয়ে-বেকার-দলের নেতা হয়ে গরম গরম বক্তৃতা দেবে। আর বিয়ে ক'রে ছেলেমেয়ের মাও ত হ'তে পারে? লীলার কোলের খোকাকে নিয়ে হয়ত লীলাও এমনি করে ঘুমবে। নাঃ, সে কখনও লীলাকে বিয়ে করতে দেবে না। তার নিজের জীবনের যত অপূর্ণ সাধ, সব সে তার মেয়েদের দিয়েই পূরণ করতে চায়।

আচ্ছা, রাত এখন ক'টা হবে? মাথাটা গরম হয়ে গেছে। সুলেখার মনে হচ্ছিল একবার মাথাটায় আর চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে ঘুমতে চেষ্টা করে। কিন্তু একা উঠে যেতে সাহস হচ্ছে না। চাকরটাকে ডাকলে হয়। কিন্তু বেচারি ছেলেমানুষ, সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমচ্ছে—ডাকতে মন চায় না।

সুব্রতর কি দুর্ভোগ! পৃথিবীর প্রত্যেক লোক, এমন কি জন্তু-জানোয়ারও যখন বিশ্রাম করবে, ওর তখন কাজ করতেই হবে। রাত্রিতে কাজ না করলে কি ক্ষতি? সকালে কাগজ বেরুবে না। তা নাই বেরুলো। কিন্তু সুব্রত কাজ না করলেও অন্য লোকে করবে। তার ঘরেও স্ত্রী থাকবে। হয়ত একা স্ত্রী—ছেলেমেয়ে কেউই নেই। তাদের আরও কত কষ্ট।

ঐ পেটা ঘড়িতে মাত্র দুটো বাজল। তবে আর লীলাকে না-ডেকে উপায় নেই। সুলেখা ভাবছিল হয়ত

রাত এখন শেষ হয়ে আসছে—ভোর পাঁচটাতেই ত সুব্রত এসে পড়বে। ঘুম কিছুতে আসতে চায় না। সে পাশ ফিরে চোখ বুজে ঘুমবার চেষ্টা করে—ভাবনা বেড়েই চলে···

এই ত ক'বছর আগে সে ছিল তার বাপের বাড়ীতে সকলের দিদি—এখন দাদার ছেলেমেয়ে হয়েছে—তারা ডাকে পিসিমা, সুতরাং আর সকলের কাছেও সে এখন পিসিমা। তার পর আরও এক দল আসবে, দাদার মেয়েরা হবে পিসিমায় পর্য্যবসিত। তার পর তারই পুনরাবৃত্তি। ক্রমে ও সংসার থেকে তার নাম যাবে মুছে—অনেকের নামই ত এই ভাবে গেছে। অন্যরা এসে তার জায়গা দখল ক'রে নেবে, যেমন সেও নিয়েছিল। ঐ বাড়ীতে সে জন্মেছে—ঐখানেই সে বড় হয়েছে। বাড়ীর প্রতিটি স্থান, প্রতিটি কোণ তার কাছে কত পরিচিত। কত প্রিয়ই না তার কাছে ঐ বাড়ীর প্রতিটি ধূলিকণা, সাতটি বছর সে ওখান থেকে নির্ব্বাসিত। হয়ত সারাটি জীবনই তার এই নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হবে। কারণ নিজেদের জাত না হওয়া সত্ত্বেও সুব্রতকে সে ভালবেসে সকলের অমতে বিয়ে করেছিল। এক দিন ছিল যখন সুলেখা এবং তার মা-বাবাও কল্পনা করতে পারত না, কেমন ক'রে তারা পরস্পরকে ছেড়ে থাকবে। কিন্তু কই দেখতে দেখতে ত সাত বছর কেটে গেল। সংসার ত ঠিক আগের মতই চলছে। যা ছিল কল্পনার অতীত, তা আজ রূঢ় বাস্তব। এই ত স্বাভাবিক, আর তাই হয়। হ্যাঁ, ব্যথা সে যে পায় না তা নয়। কিন্তু অনুতপ্তও সে নয়। তার এই জীবনই ছিল কাম্য। বহু সাধনার পর সে এই জীবন পেয়েছে। স্ত্রী হওয়ার, মা হওয়ার চেয়ে বড় কামনা তার আর ছিল না। এখনও নেই; অরুণা, কল্পনা, এরা ত কলেজ থেকে বেরিয়ে বিয়ে করবার অবসর নেই ব'লে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই সেদিনও কল্পনা কত দুঃখ করেই না চিঠি দিয়েছে—প্রতি ছত্রে ব্যর্থ জীবনের সুর যেন কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই রে! সব সেরেছে! আজই সন্ধ্যার পর কতকগুলো সন্দেশ ক'রে একটা টিনের কৌটায় ভ'রে এই খাটের নীচেই রেখেছিল, ইঁদুর অনাহূতের মত এসে তার সবটাই বুঝি শেষ করে যায়। আর না উঠলে প্রসাদ বল্‌তেও কিছু থাকবে না।

"লীলা, ও লীলা; ওঠ ত মণি।" সুলেখা ডাকল জড়িয়ে ধরে।

"কি মা, বাবা এসেছেন?" লীলা উত্তর দিয়েই প্রশ্ন করল নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে।

"না রে, বাবা তোর আসেন নি। চল্ একটু বাইরে যাই।"

"কেন মা, একা বুঝি ভয় করছে?"

"হ্যাঁ, একটু ত করছেই, কি আর করি বল?" মা কৌতুকভরা তরল কণ্ঠে উত্তর দিল। কিন্তু ঐটুকু মেয়েও বুঝল ভয় মার যথার্থই এবং তা ঢাকবার জন্যই এই কৌতুক।

"ভয় কি মা চল, এই যে আমি আছি।" আশ্বাস দিয়ে মেয়ে খাট থেকে নামল এবং সাহসী পুরুষের মত আগে আগে চলল, বাইরে গিয়ে মা মাথায় চোখে জল দিলে, মেয়ে তাকিয়ে দেখলে, "আচ্ছা মা এখন যদি ডাকাত আসে?" মেয়ে চায় মাকে ভয় দেখিয়ে তার অবলম্বন হ'তে।

"তাই ত মণি কি হবে?" মার কণ্ঠে ফুটে উঠল ভীরু কাতরতা।

মেয়ে উল্লসিত মুখে বললে, "ভয় কি, এই ত আমি আছি, এমন যে মারব" ব'লে তার ঘুমে-জড়ান ছোট চোখ চেষ্টা ক'রে বড় ক'রে চাইলে। মা অন্ধকারে আশ্বাসের মৃদু হাসি হাসলেন।

সুলেখা মুখে চোখে জল দিয়ে লীলার হাত ধরে ঘরে এল এবং খিল বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল।

লীলা তার কথার ভাণ্ডার খুলে দিলে। মাকে এমন ভাবে নিজের কাছে পাওয়া তার ভাগ্যে এখন আর হয় না। মা অধিকাংশ সময় নিজের কাজ করেন এবং বাকি সময়টুকু সিপ্রাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটান। লীলাকে কেবলই পড়ার জন্য বকেন। মা যখন গল্প করেন, লীলা মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে মার হাসি-গল্প কি সুন্দর, কিন্তু বেশীক্ষণ তার ভাগ্যে এ আনন্দ টেঁকে না। মা তীব্র

ভৎ'সনার সুরে বলেন, "কি দেখছ হাঁ ক'রে? যাও স্লেট নিয়ে এসে লেখ।"

লীলা তাকায় কাতর চোখে—মার মন তাতে হয়ে ওঠে আরও কঠিন। রুক্ষতা ফুটে ওঠে মুখে, বলে "যাও।"

লীলা ভাবে, মা ত এমন ছিল না। তাকে কত ভালই না বাসত। পড়া আবার কি? না পড়লে কি হয়? এত দিন ত সে পড়ে নি, তবুও ত মা তাকে কত ভালবাসত।

তাই লীলার আজ বড় আনন্দ। মা আজ আর তাকে পড়াশুনার কোনও কথাই কইছে না। সিপ্রা ঘুমিয়েছে, বাবা আপিসে। আজ শুধু সে, আর তার মা। ঠিক আগের মত। হঠাৎ সে যেন আগের দিনগুলো—যখন তার বোন হয় নি—সেই দিনগুলো ফিরে পেলে।

লীলা বকে চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। সুলেখার কানে তার কতটুকু যাচ্ছে কে জানে!

বড় নির্জ্জনতা। কলকাতায় সুলেখার এক দাদা থাকেন। তাঁর চিঠি আজ ক-দিন আসে নি। কি জানি আবার অসুখ-বিসুখ কিছু হ'ল নাকি! আর কাজ কাজ যেন একটা বাতিক। হয়ত কাজেই পড়ে গেছেন। দাদা কিন্তু মায়ের পেটের ভাই নয়। সুলেখা জানে তার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে এ দাদা কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু লোকে যখনই শোনে তখনই বলে—"রক্তের সম্পর্ক ত নয়।" তা ত নয়ই। তাতে কি? প্রথম প্রথম বড় আঘাত পেত। লোককে বুঝাতে চেষ্টা করত যে অন্যের মায়ের পেটে হওয়া সত্ত্বেও সে কেমন যেন নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মতই হয়ে গেছে। রক্তের সম্পর্কটাই কি এত বড়? কিন্তু এখন আর করে না, মিথ্যা কথা বলে, বলে "ও আমার মায়ের পেটের ভাই।" কেমন আনন্দ পায় তাই ব'লে। বুঝাতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে পারে নি, কেনই বা পারবে? সমাজের ভাবধারা বদলে দেবে সুলেখার সাধ্য কি? মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে সত্যি, কিন্তু এখনও সেই পুরাতন অসভ্য মানুষটি প্রত্যেকের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। অনেকের সে রূপটাও যে সুলেখার চোখে পড়েছিল। কি ক'রে তা সে এই ক-দিনেই ভুলে যাবে? রক্তের সম্পর্ক সুলেখার কার সঙ্গেই বা আছে? অনেকেই ত তার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কারু সঙ্গে পাঁচ-সাত বছরের, কারু সঙ্গে বা এই পাটনায় এসে দু-বছরের আলাপ। কিন্তু তাদেরও যে সুলেখা সত্যিকারেরই ভালবাসে। অন্যে না জানুক, সে নিজে ত জানে। সুব্রত তা হ'লে সে হিসাবে কেন তার ভালবাসার দাবি করবে? প্রত্যেক মেয়েই ত শ্বশুরবাড়ী যায়,—রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই সেইটাই তখন হয় তাদের নিজের বাড়ী। কারু সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে না বটে, কিন্তু তাদেরই এক জন, বড় আপন জন, বড় প্রিয়জন হয়েই সে সেখানে প্রথম যায়।

আবার ছোট মেয়ের কান্না—সুলেখা মৃদু মৃদু থাবা দিয়ে গানের সুরে ব'লে চলে "ঘুমোও মণি, ঘুমোও সোনা, ওরে আমার যাদুমণি—"

একটা মৃদু নিঃশ্বাস। সুলেখা চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে—লীলা চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। "কি রে তুই এখনও ঘুমুস্ নি?" সুলেখা জিজ্ঞাসা করল।

"না, আচ্ছা মা, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাকেও কি তুমি অম্‌নি ক'রে ঘুম পাড়াতে?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোকেও ঠিক এম্‌নি ক'রেই ঘুম পাড়াতাম মণি।"

মা গভীর স্নেহে দুই হাতে দুটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন।

আজকাল মেয়ের সবচেয়ে বড় ভাবনা, মা আর তাকে আগের মত ভালবাসে না। তাই সে পূর্ব্ব ভালবাসার স্মৃতি আঁকড়েই থাকতে চায়। তাই সব সময়ই যখন সুলেখা সিপ্রাকে নাওয়ায় খাওয়ায়, আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সে ঐ একই প্রশ্ন ক'রে জেনে নেয় তাকেও মা ঠিক ঐ রকমই করত কিনা। হয়ত বা পিছনে ফেলে আসার দিনগুলোই আবার কামনা করে। অবোধ মেয়ে। সারাটি জীবনই পিছনে ফিরে তাকাতে হবে, সারাটি জীবনই পিছনে ফেলে আসা দিনের জন্য দুঃখ করবে। সকলেই এমন দুঃখ পায়।

লীলা ঘুমিয়েছে। সুলেখা এবার মৃদু আলোতে দুটি ছোট ঘুমন্ত মেয়ের মুখ চেয়ে দেখল। ঘুমের জন্য আবার চেষ্টা ক'রে চোখ বুজল। নাঃ, না ঘুমুলে আর কোনও/

মতেই চলবে না। তিনটে বেজে গেছে। ঐ পেটা ঘড়িটাই জানিয়ে দিয়েছে। ঘরের ঘড়ি দেখা যায় না শুয়ে শুয়ে। সকালে উঠে আবার সংসারের কাজকর্ম্ম আছে। স্বামী নটা পর্য্যন্ত প্রায়ই ঘুমোন। সে না দেখলে মেয়েদের গোলমালে সাতটার আগেই উঠতে বাধ্য হন। সিপ্রাও উঠবে ভোরে, সুতরাং বিছানায় একটু শুয়ে থাকারও উপায় নেই ওর চেঁচামেচিতে। উঠতেই হবে। একটু ঘুমতেই হবে এবার।

সকলেই জানে সুলেখার জীবনে ঘুমকে সাধতে হয় নি, তার সাধা ঘুম। ঘুম তার আপনি আসে এবং যতক্ষণ ইচ্ছে সে ঘুমুতে পারে। একবার দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল, অবশ্য যত বার দরকার নাওয়া-খাওয়ার জন্য উঠতেই হয়েছিল, না হ'লে মা বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতেন। তার পরও সে ঘুমতে পারৃত, কিন্তু দাদা বেশী পরাজয়ের ভয়ে আর রাজি হন নি।

সিপ্রা হওয়ার আগে ডাক্তার কি একটা অসুখের আশঙ্কা ক'রে তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন, সে বোধ হয় তা পেরে ওঠে নি, তাই তাকে মরফিয়া দিয়ে প্রায় চার দিন ঘুম পাড়িয়েছিলেন। ঐ চারটে দিন তার বড় আনন্দেই কেটেছিল।

আচ্ছা সুব্রত এখন কি কি করছে? হয়ত সুভাষ-বাবু, ত্রিপুরী কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মহাত্মার অসন্তোষ, পাটেলের দল, অথবা ট্রেন কলিশন—আরও কত কি? বাংলা দেশের কাগজ হ'লে এর সঙ্গে থাকত নলিনী সরকার, নাজিম-উদ্দীন, হক্ সাহেবের চিঠি অথবা আরও কত কি! ওদের ভাববার বিষয় কত কি! সুলেখার আর কি? এই ছোট্ট সংসার ছাড়া তার আর কিই বা আছে? সিপ্রা, লীলা, সুব্রত, ঝণ্টু, বাজার, রান্না, ধোপা, গোয়ালা, এইটুকুর মধ্যেই তার রাজত্ব। এর সম্বন্ধেই সে ভাবে এদেরই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সে। সুব্রতর তুলনায় সুলেখার নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। কিন্তু আবার ভাবে—এ সংসারই বা কে করত? ঝণ্টু রাঁধত? তা হ'লেই হয়েছে! উপোস ক'রেই মরতে হ'ত তা হ'লে।

রাস্তার গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দ আর গরুর গলার ঘণ্টার টুংটুং আওয়াজ হ'ল। যতক্ষণ শোনা যায়, সুলেখা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল। ঠিক যেমন সুব্রতর জুতোর শব্দ তার মিষ্টি এবং চেনা মনে হয়, এও যেন কতকটা তেমনি। ক্রমে মিলিয়ে যায়।

রাত ক'টা বাজল? আর ত পেটা ঘড়িটা জানিয়ে দিল না। হয়ত বা গভীর রাত জানিয়ে দেওয়ার পরও সে ঘুমতে পারে নি ব'লে ঘড়িটা অভিমানেই চুপ করল—না সে-ই অবহেলা ক'রে তার বাজনায় কান দেয় নি! কি যে হ'ল ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। এবার সে ঘুমবেই। কিছুতেই শুধু শুধু রাত জাগবে না।

ছোট দেওর রাগ ক'রে চলে গেছে কলকাতায়। সুলেখা তার বহু দিনের ভুল ভেঙে চিঠি দিয়েছিল। সেও তার উদ্ধত স্বভাবের জন্য অনুতাপ জানিয়েছিল। মনের মধ্যে যে কি আছে, কে জানে। মেজ দেওরের বিয়ে শিগ্‌গিরই হবে। সুলেখার যাওয়া হবে না। আর হবে না সুব্রতর। তার কথা ভেবে সত্যই বড় কষ্ট হয় সুলেখার।

আঃ, কি চমৎকার গলা—রাস্তায় কে চলেছে—সেদিন সিনেমায় শোনা সেই গানটা গাইতে গাইতে। যারা সুলেখার মত একা একা থাকে, তাদের মাঝে মাঝে সিনেমা দেখা দরকার। মনের খোরাক জোগায়।

দেবিকারাণী, অশোককুমার, চার্লি চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো, কলকাতা, দেশ, দাদা, বন্ধু, সিপ্রা, মঞ্জু, লীলা, ঝর্ণা, এনা, শান্তি, ট্রাম, মাষ্টারমশায়, পরীক্ষা, পড়া, সুব্রত, বিয়ে, ডাক্তার, ঘুম, ক্লোরোফর্ম্ম—কিছুই বেশ জানা যায় না—মরলে পরে কি ঐ রকম মনে হয়? মৃত্যু, কাশী-মিত্তির, নিমতলা, হ্যাঁ, নিমতলায় ব্যথা বেদনা কান্না—সব শেষ ঐ নিমতলায়।

ঘুম ত বটেই, এবার নিশ্চয়ই সে ঘুমবে। সুলেখা উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল। আলোটা উস্কে দিল। বিছানাটা বড় নোংরা হয়েছে। কাল যদি ধোপা না আসে ত নিজেই সাবান দিয়ে সব কাচতে হবে। ঘরে ত সাবান নেই, তা কাল আনালেই চলবে।

"সু, দরজা খোল," সুব্রতর কণ্ঠ।

সুলেখা ত্রস্তে উঠে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলে, "কটা বেজেছে?"

"এই পাঁচটা হবে আর কি?" সুলেখা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। পরিশ্রান্ত স্বামীর দিকে চাইল। সুব্রত ততক্ষণ পোষাক খুলে হাত-পা ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ল। সুলেখাও আলো নিবিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। স্বামীর পরিশ্রান্ত মুখ অন্ধকারেও তার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। ধীরে স্বামীর বুকে নিজের ডান হাতখানা রাখল।

সুব্রত তার উপর মৃদু চাপ দিল হয়ত ঘুমের মধ্যেই।

শিক্ষা ও সমাজ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্তমান ভারতের দুর্দ্দশার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনেকে শিক্ষার অভাবকেই মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, কি উপায়ে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির এই প্রবল অন্তরায় দূর হইতে পারে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। সুখের কথা, দেশে শিক্ষার বিষয়ে একটা সতর্ক ভাব আন্দোলন, জাগরণ ইত্যাদি দেখা যাইতেছে। তাহার কারণ, বর্তমান কালে প্রচলিত শিক্ষার বহু গলদ আজকাল ধরা পড়িয়াছে। অনেকে রাজনৈতিক কারণেও শিক্ষার বহুল প্রসার কামনা করেন, কারণ অশিক্ষিত মন জাতিকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। তাই জাতির মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইতে সকলে সচেষ্ট। কিন্তু শিক্ষার ফলে জাতিকে কেমন দেখিতে চাহেন, শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের চক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা যত ক্ষণ না বলিতে পারেন, তত ক্ষণ সকল চেষ্টা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়াতেই গিয়া দাঁড়াইবে। প্রাচীন হিন্দুগণ শাস্ত্রের একটা সাধারণ সূত্র বলিয়া গিয়াছিলেন, "প্রয়োজন সম্বন্ধে সতর্ক না হইয়া কোনও কিছুতে হাত দিও না।" শিক্ষার ব্যাপারেও এই অনুশাসন মানা উচিত। শিক্ষা চাই, কিন্তু কেন চাই, শিক্ষা বলিতে কি বুঝি, তাহা যত ক্ষণ না পরিষ্কার হইতেছে তত ক্ষণ যে সবই ধোঁয়াটে রহিল! পরিকল্পনার অস্পষ্টতার জন্য সাধনাও ব্যর্থ হইবে। শিক্ষা সোপান, কিন্তু কোথায় যাইবার সোপান? গন্তব্য স্থান স্থির না করিলে আগাইবার চেষ্টা যে ব্যর্থ শ্রম।

শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি? এক দিন ছিল যখন রাজসরকার এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহারা বর্ণে কৃষ্ণ থাকিবে, কিন্তু রুচিতে হইবে ইংরেজ, যুক্তিধারা অনুসরণ করিবে ইংরেজের; রাজ্য চালাইতে হইলে ইস্কুল-মাষ্টার, কেরাণী, উকীল ইত্যাদির প্রয়োজন আছে, তাহারা নিত্যকার সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবে। আমাদের শিক্ষাবিধাতাগণ এসব কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, কি তাঁহাদের চাই। তার পর যখন দেখা গেল এত লোকের চাকুরী দেওয়া যাইতে পারে না, চাহিদার চেয়ে জোগান হইয়াছে বেশি, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে শিক্ষার পরিমাণ বেশি হইয়া গিয়াছে! দেখাদেখি দেশের লোকেরও আমাদের উচ্চশিক্ষার উপর বিরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে—চাকুরী যেখানে উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, সেখানে আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যাহারা উচ্চশিক্ষার গলদ ধরি, তাহারা যদি স্পষ্ট কথায় নিজেদের আদর্শ ব্যক্ত করি, তবে বলিতে হয় যে মাষ্টার কেরাণী উকীল হওয়াই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষিত বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যাহারা বিদ্যাচর্চায় আনন্দ পাইবে, অথচ কেতাবকীট হইবে না। যাহারা আদর্শবাদী হইয়াও বাস্তবতার কষ্টিপাথরে আদর্শকে যতদূর সম্ভব যাচাই করিয়া লইবে, যাহারা যৌবনেই ক্ষীণকণ্ঠ, জীর্ণদেহ না হইয়া সুস্থসবল ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে, যাহাদের অলঙ্কার হইবে বিনয় ও শিষ্টাচার। শিক্ষা হৃদয়কে প্রসারিত করিবে, আত্মম্ভরিতার দ্বারা তাহাকে সঙ্কুচিত করিবে না। আমি জানি না, আমাদের মধ্যে কয় জন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যথার্থ শিক্ষিতপদবাচ্য হইবেন।

তাই আজ যখন মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রণালীর যথেচ্ছ সমালোচনা শুনিতে পাই, তখন বুঝি যে এই আদর্শ-বিভ্রাটই তাহার কারণ। নূতন পরিকল্পনায় চায় মানুষ যাহাতে বুদ্ধিজীবী না হইয়া পরিশ্রমজীবী হয়, অর্থাৎ পরিশ্রম অবশ্য কায়িক পরিশ্রম অর্থে বুঝিতে হইবে।

সমাজের বহু লোক বুদ্ধিজীবী ও কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হইলেই তো গলদ থাকিয়া গেল, আমরা এখনও মনে করিতেছি যে ইস্কুল-মাষ্টারের ছেলে ইস্কুল-মাষ্টার বা ডাক্তার বা এমন কিছু হইবে, যাহা "learned professions"এর অন্তর্গত হইতে পারে। কিছু কাল পূর্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম উক্ত পরিকল্পনার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে "মূর্খ" বলা হইয়াছে; আদর্শ-বিভ্রাটই এজন্য দায়ী। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী চলিলে সমাজের রং বদলাইয়া যাইবে। আমরা মনে-প্রাণে তাহা চাই না—শরীরকে খাটাইতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে, তাই মূলতঃ ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার আমরা বিরোধী।

গণশিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট আপত্তি। ঝি চাকর ঠাকুর ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের শ্রেণীগত পার্থক্য আছে ও তাহা বজায় রাখিতে আমাদের চেষ্টার অন্ত নাই। এবিষয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা যতটা সহজে ও স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করিতে পারে ও করে আমাদের চক্ষে তাহা বিসদৃশ ঠেকে। আমরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারি না, করি না, করিতে চাহিও না। সুতরাং গণশিক্ষা বিষয়ে আমাদের আন্তরিকতা কত দূর তাহা সন্দেহের বিষয়। সমগ্র ভারত জুড়িয়া গণশিক্ষা বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে, এখানেও adult education-এর বা বয়স্কদের শিক্ষার জন্য সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা মুখে গণতান্ত্রিক হইলেও অন্তরে তাহা নই, আর যত দিন তাহা নই তত দিন এ সকল আন্দোলন আমাদের দেশে সফল ও সার্থক হইতে পারে না। গণতন্ত্রের ভাণ করিয়া কোনও লাভ নাই।

বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমরা গর্ব অনুভব করি যে, বাংলা দেশে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু যদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা-প্রসারের হারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখি তবে গর্বের কারণ কিছুই থাকিবে না। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলিকাতার তুলনায় কিছু কম হইবে না। প্রাদেশিক শাসনভারের কিছুটা হাতে পাওয়ার পর হইতে যুক্তপ্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেশ একটা চেষ্টা চলিয়াছে। বিহার প্রদেশেও নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য দৃঢ় আন্দোলন হইতেছে। সেখানকার যুবশক্তি এজন্য একত্র ও সংহত করা হইয়াছে। বাংলা দেশে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিনায়কত্বে সম্প্রতি এই চেষ্টা হইতেছে। আমি জানি, আমাদের দেশে একাধিক স্থানে কর্মনিষ্ঠ দেশসেবক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতেছেন, কিন্তু অন্য প্রদেশে, বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে, এই উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা হইতেছে, আমাদের মনের কোণে তাহা অনুসরণের কোন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় আমাদের সমালোচনার অধিকার নিশ্চয় আছে, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে, কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মহল হইতে, এমন কি শিক্ষা-বিভাগের কোনও প্রতিষ্ঠান হইতে, এক জনও কর্মী ওয়ার্ধা শিক্ষানীতিতে শিক্ষিত হইতে গিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। যদি বঙ্গদেশ শিক্ষানীতির উন্নতির প্রয়োজন বলিয়া মনে করিত, তবে এরূপ ত্রুটি থাকিত না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ভাল কি মন্দ, দূর হইতে তাহা গবেষণা না করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালার শিক্ষাব্রতিগণও নিশ্চয় তাহা জানিবার জন্য ওয়ার্ধায় যাত্রা করিতেন। জাতীয় শিক্ষাবিজ্ঞান-পরিষৎ আমাদের গর্বের বস্তু, কিন্তু সেখানেও শিক্ষা বিষয়ে নূতন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা তো দেখিতে পাই না, আকুল আগ্রহের একান্ত অভাবই যে চোখে পড়ে। জাতির দৃষ্টি সেদিকে নাই, যে-বিদ্যা অর্থকরী নয়, তাহার অর্জনে আমাদের মন নাই।

শিক্ষা বলিতে আমরা কলেজী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষাই সাধারণতঃ বুঝিতাম। এখন আমাদের দৃষ্টিভূমি প্রসারিত হইয়াছে, আমরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে মূল দৃঢ় না হইলে সকল শিক্ষারই শক্তি ও সারবত্তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকে। আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যত কিছু অসম্পূর্ণতা আছে তাহার অধিকাংশের জন্য দায়ী আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। গোড়ায় গলদ

থাকিলে আগায় গিয়া সে গলদ বাড়িবে বই কমিবে না। তথাপি যে পরিমাণে আমরা শিক্ষার অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকি সেই পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অবহিত নহি। দেশের দিক হইতে, জ্ঞানের দিক হইতে, উচ্চ-শিক্ষার বা জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া রাখিবার ও তাহাতে তৈল দান করিবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে, সেকথা মানি; কিন্তু ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, যত বেশী লোক শিক্ষা লাভ করিবে এবং শিক্ষার বনিয়াদ যত পাকা হইবে, উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ হইবে সেই অনুযায়ী? আমরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া কলেজ করিতে চাই,—নূতন কলেজ,—শিক্ষায়তনের নূতন দিক খুলিয়া দিতে চাই। আর এক কথা; শিক্ষার উন্নতিকল্পে যাহা কিছু করিয়া দিতে চাই তাহা হইলে টাকা সুদে খাটাইয়া তাহার আয়ে; অর্থাৎ মূলধন খরচ করিলে, যেখানে আমাদের এক শত টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা, সেখানে আমরা তিন টাকা খরচ করি, ভাবি চিরদিন ঐ তিন টাকা খরচ করিতে পারিব—শক্তির স্থায়িত্বে আমাদের বেশি বিশ্বাস। ইহা হইতে কি আমরা অনুমান করিতে পারি না যে অর্থ ব্যয় করিবার শক্তি আমরা অধিক দিন (চিরদিন!) ভোগ করিতে চাই, শিক্ষা সার্থক হইলে যে বহুফলপ্রসূ হইতে পারে এবং সে সিদ্ধির ফলে দেশময় যে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক এমন শক্তির সৃষ্টি হইতে পারে যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়,—এ সকল কথায় আমাদের বিশ্বাস নাই? আমরা কেন চার-পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত মূলধন উজাড় করিয়া দিতে চাই না, কেন মনে করি না যে আমাদের কর্মশক্তিও সেই অনুপাতে বাড়িবে, আমাদের দেশের লোকে সেই ডাকে সাড়া দিবে? শক্তির স্থায়িত্ব যেমন প্রয়োজন, তাহার ত্যাগও তেমনই কখনও কখনও প্রয়োজন হইতে পারে। সেই পরম প্রয়োজনের দিন কি আমাদের এখনও আসে নাই? তাহা কি কখনও আসিবে না?

আমি জানি, আমাদের শিক্ষার মধ্যে এখন নানা প্রশ্ন আসিয়া ব্যাপারটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। রাজনৈতিক প্রশ্ন,—কি শিখিবে, কত দূর শিখিবে? সমাজতন্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, রাশিয়ার কতটুকু শেখানো রাষ্ট্রের পক্ষে নিরাপদ? মার্ক্সের শাস্ত্র পুস্তকাগারের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি? দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞান মন্দ নহে, কিন্তু ব্রিটিশ যুগের সর্বত্র স্বাধীন অনুসন্ধান চলিতে পারে না, তাহা লইয়া লেখালেখিতেও বিপদ আছে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন,—জাতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা-ব্যাপারে বিষ উদ্গীরণ করিতেছে, এবং অন্যান্য ব্যাপার অপেক্ষা শিক্ষাতেই তাহার বিষ তীব্র ও ফল অধিক হানিকর হইবে, ইহা সহজে অনুমেয়। যাহা ঐতিহাসিক সত্য, জাতির ভাবী বংশধরেরা তাহা জানিতে বা পড়িতে পাইবে না! ইস্কুলে ভর্তি করিবার সময়ও দেখিয়া লইতে হইবে, কয় জন হিন্দু আর কয় জন মুসলমান লওয়া হয়! শিক্ষক নিয়োগের সময় কি বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের সময় অবস্থা তো বুঝিতেই পারি। শিক্ষায়তনের প্রথম ভাগে, যেখানে বৃহত্তর গণ্ডীর প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, সেখানেই যদি এরূপ সম্ভব হয়, তবে জাতীয়তা শিক্ষা হইবে কখন? যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইতে চাই, সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত রহিয়া গেল!

আবার নূতন করিয়া সমস্যা গড়িয়া উঠিবে—ধর্মশিক্ষা লইয়া। শিক্ষাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা না দিলে আর ছাত্রদের উন্নতি নাই! কে কি শিখিবে ও কত দূর শিখানো হইবে, তাহারও একটা নক্শা হইয়াছে। কিন্তু ধর্মশিক্ষার শিক্ষক যে দুর্লভ তাহা কর্তৃপক্ষ বিচার করিয়া দেখেন নাই। কেহ ভুল বুঝিবেন না; অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্মও যে শিক্ষণীয়, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ধর্মের প্রাণ আচার, সেই আচার কে শিখাইবে? কুশিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার অভাব ভাল। কৌতূহলী পাঠক এ বিষয়ে বাংলার সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের সযত্নলিখিত বিরুদ্ধ মন্তব্য পড়িয়া দেখিবেন। ইস্কুলের উপর শিক্ষার সমস্ত ভার চাপাইয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই, যেমন চাই রাষ্ট্রের উপর মানুষের সকল ব্যবস্থার ভার দিতে। কিন্তু সমাজদেহকে এ ভাবে একমুখী হইতে কেন দিই? ধর্মশিক্ষা বা শারীর-বিজ্ঞানের জ্ঞান, সকল

বিদ্যালয়ে হওয়া সম্ভব নহে। আর তাহা যে কত দূর বাঞ্ছনীয়, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে যে সকল কারণ সাধারণতঃ দর্শান হইয়া থাকে, তাহাদের অন্যতম হইল এই যে, ইহাতে পেটের ভাত হয় না। কঠোর জীবনসংগ্রামের দিনে যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে না পারিল, তাহার আবার শিক্ষার মূল্য কি? কিন্তু সকলেই জানেন, আজকালকার দিনে পেটের ভাত রোজগার করা সামান্য কথা নহে। এখন বর্ণাশ্রমধর্ম লুপ্তপ্রায়; ইস্কুল-মাষ্টারের ছেলে যে ইস্কুল-মাষ্টারই হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই; ডাক্তারের ছেলে উকীল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে চাকুরে, হয়তো বা হাকিম, অধ্যাপকের ছেলে বণিক, কবিরাজের ছেলে দারোগা—অহরহ চোখের সামনে দেখিতেছি। প্রত্যেক পুত্রের বৃত্তি অবলম্বনের সময় পিতাকে নূতন করিয়া ভাবিতে হয় যে, ইহাকে কোন্ পথে চলিতে দিব? অনেক সময় এরূপ ভাবিয়াও কোনও কূল পাওয়া যায় না। বর্ণাশ্রমধর্মে এরূপ ছিল না—পুত্র পিতার বৃত্তি অবলম্বন করিত,—বিনা বাক্যে, বিনা বিচার-বিবেচনায়। সুতরাং জীবিকা লইয়া প্রতি পদে সমস্যায় পড়িতে হইত না। এখন যেমন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্ল্যানিং, তখন তেমন ছিল না; সমাজপতিগণ একবার যে প্ল্যান করিয়া দিলেন, সকলকে তাহা মানিয়া চলিতে হইত। তবে সে নিয়মের বেশি কড়াকড়ি করিলে তাহা শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইত, দাঁড়াইয়াছেও তাহাই; আমরা তাহা ভাঙিতে গিয়া একেবারে কোনও শৃঙ্খলই মানি না, তাই জাতীয় জীবন আজ উচ্ছৃঙ্খল, আমাদের অর্থনৈতিক 'পরিস্থিতি' বিশৃঙ্খল। আমি অবশ্য এ-কথা বলি না যে, প্রাচীন কালের সেই বর্ণাশ্রমধর্মই পুনরায় প্রবর্তন করা হউক; আমার এই মাত্র বক্তব্য যে তাহার অনুরূপ আদর্শ মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করিলে আমরা অনেক দুঃখ, অনেক অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইব।

ইহা তো গেল বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার কথা। কিন্তু যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম,—আমাদের বিপুল ঔদাসীন্য দূর না হইলে ইহার কোনও প্রতিকার নাই। শিক্ষকের সমাজ হইল শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে লইয়া, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। রাষ্ট্র যদি এই ক্ষুদ্রতর সমাজকে, অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধকে হিতকর করিয়া না তোলেন, তবে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সমাজ জীবন্ত থাকিলে তাহার কাজ হইবে এই ক্ষুদ্রতর সমাজকে জীবন্ত রাখা। শিক্ষার্থী কি করিল না করিল, সে-বিষয়ে অভিভাবকের যদি দৃষ্টি না থাকে, অভিভাবকের সহিত শিক্ষকের যদি পরিচয় ও সহযোগিতা না থাকে, শিক্ষার্থী যদি জিজ্ঞাসু না হয়, তাহা হইলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে যে ব্যর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার যে কোনও আদর্শই অনুসৃত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নাই, তাহার অন্যতম কারণ হইল উপরে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বা সহযোগিতা নাই বলিয়া।

শিক্ষা যে কত দূর ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে তাহার কিছু পরিচয় আমরা পাই আমাদের আচরণ হইতে—আমাদের অবিনয় হইতে। ছেলেবেলায় শিখিয়াছিলাম, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"; কিন্তু "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—এই ভবিষ্যদ্বাণীর মত "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"-ও এ-কালের কথা নয়, কবে যে ইহা সত্য ছিল তাহাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দুই-চারি জন প্রকৃত শিক্ষকের কথা বাদ দিলেও যদি আমরা এই লক্ষণ অনুসারে বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের অধিকাংশই শিক্ষিতম্মন্য; আড়ম্বর আছে, "লম্বশাটপট" আছে, কিন্তু অবিনয়ের দ্বারা বিদ্যার মাধুর্য্য ও মহত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিনয় এখন শুধু কথার কথায় পর্যবসিত; উহা ভীরুতার চিহ্ন, দুর্বলতার লক্ষণ। সৌজন্য ও শিষ্টাচার আমরা সমাজ হইতে বিসর্জন দিয়াছি।

মোট কথা, শিক্ষা যে সাধনাবিশেষ সে কথা আমরা কি ছাত্র, কি শিক্ষক সকলেই ভুলিতে বসিয়াছি। আজকাল কলের যুগ, যন্ত্রবৎ সকলই চলিয়া যাইবে, সকল কার্যের উৎকর্ষ হইবে, এরূপ আমরা মনে করি। তাই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাণহীন, আমাদের মন্ত্রে শক্তি

নাই, আমাদের সাধনায় সাড়া পাই না। শুধু জীবিকা-নির্বাহের উপায় বলিয়া ইহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরি, আর তাহাতে জোটে সব বিপত্তি—মন বলিতে থাকে, কোনও মতে দিন চলিয়া গেলেই হইল। তাই ছাত্র প্রশ্ন করে, এই বইখানি পড়িলেই চলিবে? শিক্ষকেরও প্রশ্ন, এই বইখানি পড়াইলেই চলিবে? কোনও মতে 'দিন গত পাপ ক্ষয়' করিতে পারিলেই আমরা খুশী। এরূপ স্থলে জীবনের সঙ্গে সাধনার কোন যোগ নাই, কিরূপ ভাবে সাধনা করিতে হইবে, তাহার কোনও অস্পষ্ট ধারণাও মনে আসিতেছে না—সুতরাং সিদ্ধিলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। যেমন দাম দিব, জিনিষ তেমনই মিলিবে। সংসারে ইহার কোনও ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম নাই। আমরা কানাকড়ির বিনিময়ে অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে চাই, তাহা আর কেমন করিয়া সম্ভবে!

আদর্শ শিক্ষক বলিতে আমরা যাহা বুঝি নরেশবাবু তাঁহার একটি উপন্যাসে তাহার এক দিক ভারি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। সংসারের অবস্থা ও আবহাওয়া অনুকূল নহে; চারি দিকে অভাব-অনটন, দারিদ্র্যের নগ্নছবি, সহানুভূতি কোথাও নাই। নাই আন্তরিক স্নেহের স্পর্শ, যাহা সামান্য এক দিন ছিল তাহাও ঘটনাচক্রে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, সুকুমার বৃত্তিকে দাবাইয়া জীবনপথে চলিতে হইয়াছে। তবু তাহার মধ্যে আছে প্রকৃত শিক্ষকের জ্ঞানানুরাগের পরিচয়—প্রকৃত জ্ঞানচর্চার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, কর্মে তাহার রূপান্তর। ইহার সঙ্গে আছে আত্মমর্যাদা, আত্মম্ভরিতা নাই; বিদ্যার আদর আছে, কিন্তু অহংবুদ্ধির পুষ্টি নাই।

তাই শিক্ষকেরও শিক্ষা চাই। আধুনিক শিক্ষানীতি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে, শিক্ষাবিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসের সাহায্যে, বর্তমানের চেষ্টাকে সফল ও সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াসী। শিশু ও কিশোরের মন লইয়া যাহার কাজ, তাহার পক্ষে সেই মনের বিশেষ পরিচয় যতদূর সম্ভব লাভ করা যে কত প্রয়োজনীয় সে কথা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। এত দিন এদিকে শিক্ষকদের দৃষ্টি পড়ে নাই; কিন্তু যখন দৃষ্টি পড়িয়াছে তখন আর তাহা উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। অতীতের অভিজ্ঞতায় ও পরীক্ষায় যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহার সাহায্যে আমরা অগ্রসর হইতে পারি, জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া তুলিতে পারি। শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদানের প্রতি মন দিলে এ কথার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। সেই জন্য শিক্ষিত, অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষিত, শিক্ষকের প্রয়োজন, তাহা কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও বিপদ আছে। যন্ত্র ও নিয়ম যাহাদের একমাত্র সাধন, প্রাণের সহিত যাহাদের যোগ নাই, তাহারা শিক্ষাবিজ্ঞানও মৃতের শাস্ত্র বলিয়াই মনে করিবে, অর্থাৎ দেহমনের কথা বলিতে গিয়া কেতাবী বুলি আওড়াইবে। তাহা না-হয় না-ই আওড়াইল, শিক্ষার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লইয়াই না-হয় তাহারা বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক হইয়া প্রবেশ করিল। সেখানেও বাধা বিস্তর। তাহাদের কথায় কে কান দেয়? কে তাহাদের মতে বিশ্বাস করে? যাহারা নূতন পথের পথিক, তাহাদের ভাগ্যে অনেক যন্ত্রণা। তাই সংস্কৃত ভাষায় সাবধানী কবি বুঝি বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ"। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, সাধারণ সমাজ, অন্যান্য শিক্ষক যাঁহারা "অশিক্ষিত" (অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞান যাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই), তাঁহারা নূতন চেষ্টায় নূতন শিক্ষাদান-প্রণালী সন্দেহ ও বিদ্রূপের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদের শিক্ষিত শিক্ষকেরা যে বহু প্রতিষ্ঠানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অধীত বিদ্যা ভুলিয়া গতানুগতিক ভাবে চলেন, ইহাই তাহার কারণ। সমাজের বুদ্ধি যত ক্ষণ এ বিষয়ে জাগ্রত না হইতেছে, তত ক্ষণ মোটামুটি এই অবস্থা চলিতে থাকিবে।

জ্ঞানচর্চা জাগাইয়া রাখিবার কোনও কৌশল আমার জানা নাই। নিজের জীবনে তাহা যে পরিমাণে জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ হইব, ততই আমাদের অন্যত্র সার্থক হইবার সম্ভাবনা। এক দিকে যেমন চৌকস জীবন চাই, বহু দলে জীবনকমল যাহাতে প্রস্ফুটিত হইতে পারে তাহা চাই, তেমনই আবার সকল ভুলিয়া এক দিকে নিজেকে বিলাইয়া দিতে না পারিলেও চরম উৎকর্ষ লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না। তবে তাহার পূর্বে আবশ্যক নানা দিক দিয়া জাতির দেহমন পুষ্ট করা। শিক্ষার গণ্ডী বাড়াইয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া সমগ্র জাতির

শিক্ষাবিধানে বিশেষ যত্ন চাই, নতুবা যাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের কর্তব্যে হানি ঘটিবে। হানি যে ঘটিতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি, সকলেই বুঝিতেছি, সুতরাং অপ্রিয় মন্তব্য করিতে হইল বলিয়া কোনও সঙ্কোচ আমার নাই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাশার মধ্যেও আশার আলোক আছে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই এমন সব কর্মনিষ্ঠ দেশপ্রেমী সমাজসেবক আছেন যাঁহারা স্বার্থবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়া শিক্ষাদানে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছেন। নিন্দাস্তুতিনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারা গভীর ভাবে শিক্ষার সাধনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের চারি দিকে গড়িয়া উঠিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘ ও মণ্ডলী। অতীতেও বাঙ্গালী বুদ্ধির, সাহসের, ত্যাগের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহা আমাদের সমগ্র জাতির মূলধন। সুতরাং আমরা মনে আশা রাখিব যে বাংলা দেশেও শিক্ষার নবযুগ আসিতেছে, এবং তাহার জন্য যে তপস্যা, যে সাধনার প্রয়োজন, শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেও তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

আশা

শ্রীমনোরমা চৌধুরী

দূরে মন্দিরের ঘণ্টায় পাঁচটা বাজতেই অনুপমার ঘুম ভেঙে গেল। ছাতের এক কোণে রোদ এসে পড়েছে; আকাশে শরতের সাদা মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। অনুপমা স্কুলে যাবার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ না ক'রে বালিশটা এক টানে মাথার নীচে থেকে সরিয়ে পাশে রেখে নিশ্চিন্ত মনে মেঘের খেলা দেখতে লাগল। একটা ছোট মেঘ ভাসতে ভাসতে আর একটা মেঘের সঙ্গে ঠেকছে, আর দুটো এক হয়ে সামনে ভেসে চলেছে। আবার কখনও একটা বড় মেঘের খানিকটা টুকরো অন্য মেঘের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আলাদা হয়ে একা চলছে। কতকগুলো মেঘ পরস্পরকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। অনুপমারও কেমন যেন হালকা লাগছিল। ওর মনে হচ্ছে যে সেও মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে, যেদিকে দু-চোখ যায়—ঐ মেঘেরই মত। আজ আর কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। ঐ মেঘেরই মত সে স্বাধীন, মুক্ত, নিশ্চিন্ত।

কোয়ার্টারলি পরীক্ষার খাতা কাল রাত একটা পর্য্যন্ত জেগে সে দেখে নম্বর যোগ দিয়ে সব কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রেখেছে। বাক্স যা অল্পস্বল্প গুছাবার ছিল, তা ত সে গত মাস থেকেই আরম্ভ করেছিল। কাশ্মীর যাবার লোভ কি কম! জীবনে পাহাড় কখনও দেখে নি সে। পৃথিবীর ভূস্বর্গ দেখবার এবার সুযোগ পাচ্ছে। পূজোর সময়ে নাকি জায়গাটা অতি সুন্দর; অন্য সময়ে অত ভাল থাকে না। সেই ছোটবেলা থেকে ওর দেশভ্রমণ করার সখ, কিন্তু খুব কম বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরই সে-আশা পূর্ণ হয়। ছেলেমেয়েদের তাদের দিদিমার কাছে রেখে অনুপমার মা তার বাবাকে নিয়ে রাঁচিতে একবার বায়ুপরিবর্ত্তন করতে গিয়েছিলেন। কত দিন তার মা তাদের রাঁচি পাহাড়, মোরাবাদী পাহাড়ের গল্প করেছেন; শুনে শুনে অনুপমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবু মন খারাপ হ'লে সে মার পিঠের কাছে মুখ নিয়ে বলত, "লক্ষ্মীটি মা! রাঁচির গল্প কর না।"

...তার মা কত দিন হ'ল তাকে ছেড়ে গেছেন—এই জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরো চার বছর হয়ে গেছে। সে-বারেই অনুপমা আই-এ পরীক্ষা দিয়েছিল। ফল বেরোবার অল্প দিন পরেই মা মারা গেলেন। তার বোনেদের দেখবার জন্য মা ছটফট করছিলেন কিন্তু তারা কেউ তখনও পর্য্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে নি। তার বড়দির মেজ ছেলে তখন হাম-জ্বরে ভুগছিল, তাকে সে-অবস্থায়

ফেলে তিনি আসতে পারেন নি, তার পরেও অনেক দিন তিনি আসেন নি। মেজদির স্বামী আপিসে ছুটি পান নি, কিন্তু দু-দিন পরে এসে মেজদিকে পৌঁছে দিলেন। সে কি কান্না মেজদির! অনুপমার সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। এর পূর্ব্বে সে কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নি। সে কিছু বোঝবার পূর্ব্বেই কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল; বজ্রাহতের মত সে ব'সে রইল—চোখ দিয়ে জলও বেরোয় নি। মেজদি এসে সংসারটা ক-দিনের জন্য সামলে রেখেছিলেন। তার পর থেকে সে কি অশান্তি বাড়ীতে আরম্ভ হ'ল! তার বাবা তার ছোট ভাইকে একটি ছোটখাট দোকান খুলতে বলায় সে অপমানিত বোধ ক'রে রাগারাগি ক'রে বাড়ী থেকে চলে যায়। অনেক কষ্টে তাকে তার বাবা ফিরিয়ে আনলেন কিন্তু নিজে একেবারে ভেঙে পড়লেন। অল্প দিন পরে তিনিও মারা গেলেন। অনুপমার দুই দাদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দু-ভাজের রেষারেষি ও ঝগড়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, বাবা মারা যাবার পর কাশীতে চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে সে এক রকম পালিয়ে এসেছে।

তিন বছর দেখতে দেখতে সে কাশীতে কাটিয়ে দিলে। চল্লিশ টাকা মাইনেতে এসেছিল, কথা ছিল বছর বছর মাইনে বাড়বে, কিন্তু একে ছোট ইস্কুল, তার উপর প্রাইভেট ম্যানেজমেণ্টের অধীনে—অর্থাৎ চার দিকে অরাজকতা। কাজে কাজেই যে চল্লিশ টাকায় সে ঢুকেছিল আজও তাই পাচ্ছে। এর বেশী অনুপমা প্রত্যাশাও করে নি। বাংলা দেশ হ'লে আরও কম পেত, এই ব'লে সে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়। তার বড় ইচ্ছা যে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে গরমের ছুটিতে দিদিদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসে। মেজদির সঙ্গে তবু দেখা হয়, কিন্তু বড়দির সঙ্গে এই তিন বছরের মধ্যে আর দেখা হয় নি। বোনপো-বোনঝিদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের প্রত্যেকের নাম ক'রে জামাকাপড়, ও দিদিদের জন্য কাশীর গরদের শাড়ী নিয়ে যাবার তার বড় সখ। সে চাকরি করে ব'লে তার দিদিরা তার কাছে অনেক আশা রাখে। অনুপমা বুঝতে পারে সবই, কিন্তু সাহায্য করতে পারে না ব'লে বড় লজ্জিত। চল্লিশ টাকা শুনতে তেমন কম নয়, কিন্তু হাতে টাকা আসতে-না-আসতেই কোথায় চলে যায়। ঘরভাড়া আর খাইখরচ, জুতো-জামাকাপড়, তেল-সাবান এতেই তার মাসকাবার হবার আগেই হাত খালি হয়ে যায়। তার পর বেরিবেরি হবার পর থেকে চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে; অন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে অনুপমাকে আজকাল বেশী খরচ ক'রে খাওয়াদাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। খরচ ক্রমে বেড়েই চলেছে, কমাবার কোন উপায় সে দেখছে না।

তবে গত বছর থেকে অনেক কষ্টে প্রতি মাসে নিয়ম ক'রে দশ-বারো টাকা সে জমিয়েছে। কাশী থেকে হরিদ্বার কাছে, সে শুনেছিল; সেখানে বেড়াতে যাবার লোভে সে টাকা জমানো আরম্ভ করেছিল। গত বছর সে এক দিনও সিনেমায় যায় নি, নূতন রেশমী শাড়ীও সে কেনে নি। নীচের তলায় অন্য ভাড়াটের বৌ তাকে কৃপণ ব'লে কত ক্ষেপিয়েছে, কিন্তু অনুপমা নিজের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে ছিল। গত মাসে সে দুধ খায় নি, মাছ খায় নি, তেলের খরচ বাঁচিয়ে সিদ্ধ খেয়ে ত্রিশ টাকা জমিয়েছে—কারণ তা হলেই তার হাতে পুরো দেড়-শ টাকা জমবে। আর বছরেই সে হরিদ্বার যাবার মত টাকা জমিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু ইস্কুলের এক জন টিচার লাবণ্যদি তাকে পরামর্শ দিলেন যে, হরিদ্বার গিয়ে টাকা খরচ না ক'রে কাশ্মীর যায় যেন। মাত্র দেড়-শ টাকায় নাকি কাশ্মীরের সব দেখা হয়ে যাবে—তারা কয়েক জন মিলে যদি যায়।

অনুপমা খুশী মনে রাজী হয়েছিল তাতে। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে যাবার সুবিধা আছে অনেক, খরচ কম ও সঙ্গ ভাল। অনুপমা গত মাস অবধি নিশ্চয় ক'রে মনে করতে পারে নি ওদের সঙ্গে আমোদ ক'রে যেতে পারবে কি না। তার হাতে যত দিন না দেড়-শ টাকা জমবে, কোন্ ভরসায় সে তার সঙ্গীদের কথা দেবে? তাঁরা সবসুদ্ধ পাঁচ জন আছেন, অনুপমা থাকলে ছ-জন হয়। অনুপমা থাকলে তাঁদের দল আরও ভারী হবে ব'লে তাঁরা ওকে যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিছু দিন আগে থেকে বন্দোবস্ত ক'রে

রাখলে স্থবিধা হয়, তাই তাঁরা মাসখানেক থেকে চিঠি-লেখালেখি করছেন। ওঁরা ধরে নিয়েছেন অনুপমাকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেনই, যদিও অনুপমা এখন পর্য্যন্ত তাঁদের কথা দেয় নি। কথা দিয়ে শেষে রাখতে না পারলে লজ্জায় অনুপমার মাথা কাটা যাবে।

যতই কাশ্মীর যাবার দিন এগিয়ে আসছে, ততই অনুপমার উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে। আবার এটাও খচ্ খচ্ ক'রে তার মনে বাজছে যে, স্বার্থপরের মত সে একা হিল্লীদিল্লী সব ঘুরে আসবে, ওদিকে তার ছোট ছোট ভাইপো-বোনঝিরা শীতে হিহি ক'রে কাঁপছে। দিদিদের তো কথাই নেই। টাকার অভাবে বড়দি কখনও ভাইদের কাছে আসতে পারে না; ভাইদের এমন অবস্থা নয় যে বোনদের রাহাখরচ দিয়ে আনায়। মা বেঁচে থাকতে বড়দিকে আনাতেন। তার পর মা মারা যাবার পর, আর একবার বাবা গিয়ে বড়দিকে নিয়ে এসেছিলেন—সেই তাঁর বাপের বাড়ী শেষ আসা।

বড়দির কথা ভাবতে অনুপমার চোখ ছলছলিয়ে এল। অনেকগুলি ছেলেপিলে সামলাতে পারেন না; কাজ ক'রে ক'রে হাতের নখ ক্ষয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সংসারের সব লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেই তাঁর সারাদিন কেটে যায়। বিয়ের নামে তাঁর পরম বিতৃষ্ণা। অনুপমার এত বয়স অবধি বিয়ে হয় নি ব'লে কে এক বার ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, "আজকাল মেয়েরা কেন বিয়ে করে না তা জানা আছে। দুটো পাস দিয়েই যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে!" বড়দি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "বিয়ের নামে আমার কিন্তু ঘেন্না হয়ে গেছে। বিয়ে ক'রে আমাদের সুখ ত দেখছি। বেশ ত আছে ও। বিয়ে ক'রে আর কি হবে?" অনুপমা ভাবে, সংসারের চাপে বড়দি রুক্ষ হয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, এখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি।

কিন্তু সেই বড়দিও এখন অনুপমার উপর চটে গিয়েছেন। মা মারা যাবার পর, বাবা তার মার হাতের লোহাটা অনুপমার হাতে দিয়ে বললেন, "তুলে রাখ।" অনুপমা সেই যে সযত্নে সেটি তুলে রেখে দিয়েছিল, আর সেটা হাতছাড়া করে নি। তার বড়দি এসে বলেছিলেন, "হ্যাঁরে মার নোয়াগাছটা আমাকে দিয়ে দে, আমি পরব।" বড়দির কাছে ছোট হ'তে অনুপমার বড় খারাপ লাগছিল, কিন্তু তবু বলল, "না বড়দি, ওটা আমি রাখি। মার ত কোন চিহ্নই আমার কাছে নেই।" বড়দি কিছুতে বুঝতে পারলেন না যে, অনুপমার কাছে ও জিনিষটার কি সার্থকতা থাকতে পারে। যদি সে বিয়ে করত, তা হ'লে একটা কথা ছিল, কিন্তু এমন ভাবে নিজের কাছে ফেলে রাখার কি মানে, তা বড়দি বুঝলে না। তার পরে বড়দি আর কিছু বলেন নি, অনুপমাও তাঁকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেছে, কিন্তু তার মন থেকে বড়দিকে বড় কোমল জায়গায় আঘাত দেবার ব্যথা যায় নি।

তার কাশ্মীর যাবার ইচ্ছার কথা অনুপমা বাড়ীতে জানায় নি। তার মনে ভয় যে, তার হাতে টাকা আছে জানালে নিত্য ভাই ও বোনেদের সংসারের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে। তাদের জন্য অনেক সে করেছে, ভবিষ্যতেও করতে চায়, কিন্তু এখন তার নিজের একটু অবকাশ পাওয়া প্রয়োজন। পাছে কোন দিক থেকে তার ভ্রমণে বাধা পড়ে ব'লে সে অনেক দিন থেকে তোড়জোড় ক'রে রেখেছে। কাল শনিবারে স্কুলে ছুটি হয়ে যাবে আর পরশুদিন লাবণ্যদিরা রওনা হবে। আজ অনুপমা তাদের গিয়ে বলবে যে এবার সে যাবার জন্য যথার্থই তৈরি হয়েছে। আজ ও যাবে, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে; তবু ওর ভয়, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সদ্যোজাত ভাইপোর জন্য কিছু খেলনা ও জামা বা মেজদির জন্য একটা হাওয়া-শাড়ী কিনে ফেলে। সপ্তাহখানেক আগে বিশ্বনাথের গলিতে একটা গাঢ় নীল রঙের হাওয়া-শাড়ী সে দেখেছিল। মেজদির জন্য কিনে নিতে ভয়ানক লোভ হয়েছিল। ওটা পরলে তাঁকে বড় মানাবে, আর নীল রংটা মেজদির ভয়ানক প্রিয়। তাছাড়া মেজদিকে সে আজ পর্য্যন্ত কিছু কিনে দেয় নি। কিন্তু, না, তাহলে অনুপমার হাতে পুরো দেড়-শ টাকা আর থাকে না, কাশ্মীর যাওয়া আর ওর হয় না।

অনুপমার বড় লজ্জা করছিল ভাবতে যে, বড়দি-মেজদিরা কি ভাববে, ও কাশ্মীর গিয়ে এক গাদা টাকা খরচ ক'রে আসবে শুনে। কিন্তু এবার মরিয়া হয়ে ঠিক

ক'রে ফেলেছে যে সাহস ক'রে বেরিয়ে পড়ে দেখা যাক্— পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এত দূর অগ্রসর হয়ে আর পিছান চলে না।

অনুপমার কেবলই মনে হচ্ছিল কাশ্মীরে এখন ফুলের সময়, চারি দিকে রঙের সৌন্দর্য্য এমন যে বেশী ক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা যায় না। আর ফল ওখানে এত সস্তা নাকি যে এক আনা দিয়ে বাগানে ঢুকে যত ইচ্ছা ফল খেতে পারে। অনুপমা ভাবছে ও শুধু ফল খেয়েই দিন কাটাবে—আপেল, বেদানা, ষ্ট্রবেরী—অনুপমা আর ভাবতে পারল না। এক লাফে সে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দশটার সময়ে স্কুলে যেতে হ'লে এখনই রান্না চড়িয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু আজ ও এখন রাঁধবে না ঠিক করেছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে ব'লে আজ সকাল-সকাল স্কুল ছুটি হয়ে যাবে—প্রায় একটার সময়ে। তখন এসে ধীরে সুস্থে সে রান্না চড়িয়ে দেবে—তা হ'লে দু-বেলার খাওয়া এক বেলাতেই সারতে পারবে।

তিলভাণ্ডেশ্বরের গলিতে একটা দোতলা বাড়ীর একটা ঘর নিয়ে অনুপমা থাকে। সেখান থেকে দুর্গাচরণ গার্লস স্কুল বেশী দূরে নয়, কিন্তু ঐটুকু যেতেই অনুপমা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গেল মাস থেকে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ব'লে ও আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ আনন্দে অনুপমার শরীরে কোন গ্লানি নেই। সে কাশ্মীর যাবে—সে কি কম কথা!

২

অনুপমা স্কুলে গিয়েই বললে, "লাবণ্যদি ভাই—আমাকেও সঙ্গে নিতে ভুলো না যেন।" লাবণ্য খুশী হয়ে উঠল, "যাক্ যাবে তাহলে। তোমার রকমসকম দেখে আমার তো ভয়ই ধরে গিয়েছিল। তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত না-ধরে নিয়ে যেতাম না অবিশ্যি।" অনুপমার কানে ওসব সাধারণ কথা যাচ্ছে না; তার চোখে আজ সবই নূতন, রঙীন ঠেকছে। এক দিকে কড়কড়ে দেড়-শটি টাকা আর অন্য দিকে কাশ্মীর! আজ সে স্বপ্নে বিভোর। তাকে উন্মনা দেখে লতিকাদি ঠাট্টা করলেন, "কি অনুদি, ব্যাপার কি? কাশ্মীর থেকে রাঙা চেলি প'রে জোড়ে ফিরবার ব্যবস্থা করছেন নাকি? কি ভাবছেন অত?"

স্কুল ছুটি হয়ে গেল; অনুপমার কিন্তু বাড়ী যাবার তাড়া নেই। ও আজ ক্ষুধা-পিপাসা সব ভুলে গেছে। লাবণ্যদির সঙ্গে পরামর্শ করতে লেগে গেল যে তাদের বিছানা এক-সঙ্গে বেঁধে নিলে বেশী সুবিধা, না, আলাদা আলাদা ক'রে নিলে। কথায় কথায় লাবণ্য যখন টের পেল যে অনুপমা আজ খেয়ে আসে নি, তখন হাঁ হাঁ ক'রে উঠল, "ও মা তুমি পিত্তি পড়িয়ে ব'সে আছ। শীগ্‌গির বাড়ী যাও, বিছানা বাঁধাবাঁধি পরে করলেই হবে। এখনও তো তিন দিন বাকি—আজ কাল পরশু। আমি ত এখনও কিছু গোছাই নি। পোষ্ট আপিস থেকে আজ টাকা বার করতে যাব ভাবছি। আজ না পেলে কাল আবার ছুটতে হবে।" অনুপমার বড় খারাপ লাগল এই কথা শুনে। সত্যি লাবণ্যদির কোন বিষয়ে খেয়াল থাকে না—যদি কোন কারণে পোষ্ট আপিস থেকে আজ টাকা না পান তা হ'লে কি হবে? কাল ত আবার শনিবার। অনুপমা ত সেই দশ দিন আগে থেকে টাকা বার ক'রে রেখেছে। কোথায় যে অতগুলি নোট একসঙ্গে রাখবে তা ভেবে ওর রাত্রে ঘুম নেই। কখনও কাপড়ের বাক্সে রেখে দেয়, আবার কখনও রাখে বিছানায় সতরঞ্চি ও তোষকের মাঝখানে।

অনুপমা নেয়ে খেয়ে পরম শান্তিতে বিছানায় শুয়ে ভাবছিল যে, এই এক বার জন্মের মত আশা মিটিয়ে সে বেড়িয়ে আসবে কিন্তু তার পর আর অযথা টাকা নষ্ট করবে না। কাশ্মীর দেখে এসে সে নূতন উৎসাহে কাজ করতে পারবে। এমন সময় নীচের তলায় খট্ খট্ শব্দ হওয়ায় অনুপমা দৌড়ে গেল খুলে দিতে। দেখে পিওন এসেছে। ভাড়াটেদের চিঠির মধ্যে অনুপমারও নামে একটি চিঠি। খামের উপর বড়দির হাতের লেখা। বিজয়ার এত আগে অনুপমা চিঠির আশা করে নি। তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে ফেললে। বড়দি অনেক দিন পরে তাঁর ছোট বোনকে মনে করেছেন। তিনি বড় বিপদে প'ড়ে অনুপমার কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর

স্বামী গত তিন মাস থেকে শয্যাশায়ী। ডাক্তার বলেছে যে চেঞ্জে না পাঠালে তাঁকে আর বাঁচান যাবে না। অনুপমা তো মন্দ রোজগার করে না—এ-বিপদে যদি সে বড়দিকে সাহায্য না করে, তা হ'লে ছেলেপিলেদের নিয়ে তিনি পথে দাঁড়াবেন। ভাইদেরও এ-সময়ে টানাটানি চলছে ; কি ক'রে তাদের বলবেন। তবে অনুপমা একা মানুষ, ওর কথা আলাদা।

অনুপমা আর পড়তে পারছিল না। ওর বড়দি আরও লিখেছেন, "তোমার কাছে চাইতে আমার লজ্জা নেই ; বোন ব'লে নয়, তবে আমার প্রাপ্য জিনিষ থেকে আমায় ফাঁকি দিয়েছ ব'লে। মার বিয়ের নোয়ার উপর বড় মেয়ের, বড় ছেলের বৌয়ের অধিকার। তুই আমাকে সেটা নিতে দিস নি, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তোর কি উচিত নয় আমার নোয়া-সিঁদুর যাতে বজায় থাকে, তাই করা ? অন্ততঃ এক-শ টাকা পাঠিয়ে দে—উনি সেরে উঠলে আমি অল্প অল্প ক'রে না-হয় শোধ ক'রে দেব।"

"মার লোহা…বড়দি…জামাইবাবু—মার লোহা… এক-শ টাকা…কাশ্মীর…" অনুপমার হৃৎপিণ্ডে কে যেন ধ'রে আস্তে আস্তে মোচড় দিচ্ছে

ধীরে ধীরে উঠে সে পোষ্ট আপিসে গেল মনিঅর্ডার করতে। পোষ্টমাষ্টার বৃদ্ধ বাঙালী। তিনি বললেন, "এক সঙ্গে দেড়-শ টাকা মনিঅর্ডার করবে মা ? হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বরং দু-দিন পরে আবার পাঠিয়ে দিও। কিন্তু অনুপমার নিজের উপর বিশ্বাস নেই। সবটা টাকা বড়দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে টলতে টলতে বিছনায় শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলায় লাবণ্যদি উৎফুল্ল হয়ে বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন, "জান ভাই, আমরা যাতায়াতের জন্য কন্‌সেশন পাব, ঠিক হয়ে গেছে। কালকেই টিকিট কিনে রেখে দেওয়া যাবে।" অনুপমার কাছে থেকে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে কাছে এসে বললে, "এই ভর সন্ধ্যেবেলায় এখনও শুয়ে ? শরীর খারাপ বুঝি ?"

অনুপমা উঠে ব'সে বলল, "হ্যাঁ ভাই, শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে আমার আর কপালে লেখা নেই" ব'লে ম্লান হাসি হাসল। লাবণ্য দুঃখ করতে লাগল, তার পর অনেকক্ষণ বক্ বক্ ক'রে সে চলে গেল। রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল। অনুপমার কোন খেয়াল নেই। সে তখনও নিস্তব্ধ হয়ে বিছানায় শুয়ে কি জানি কি ভাবছে। চোখে জল নেই, মনে বেদনার চিহ্ন নেই ; সুখ বা দুঃখ ব'লে কোন প্রভেদ তার কাছে আজ নেই।

কূলে-অ-কূলে

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

অন্তরের অতি গূঢ় অতি দূর হোতে
অনাদি চেতনাধারা মৃত্তিকার টানে
বৈচিত্র্যের রঙ্গ নিয়ে অদৃষ্টের স্রোতে
তরঙ্গে তরঙ্গে এল সৃষ্টি-অভিযানে।

ভুলে গেল সেই শুদ্ধ দূরত্ব আপন,
তটের সীমায় এসে সুরু হোলো খেলা,
নানা ভালোমন্দে মেশা দিবস যাপন,
উঠিল আবিল হয়ে নিত্য দুই বেলা।

গূঢ়তার একাত্মতা অতলের সাথে
সৃষ্টির চাঞ্চল্যঘাতে চঞ্চলিয়া উঠে
অনিত্যের আবর্তের টানে দিনে রাতে
মৃত্তিকার তটপ্রান্তে মরে মাথা কুটে।

আজি সিন্ধুতীরে এসে মনে পড়ে তার
অকূলে নিমগ্ন স্মৃতি সুদূর সত্তার।

আলোচনা

"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে"

শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের "ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে" শীর্ষক যুগোপযোগী কবিতাটি নিশ্চয়ই বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত কবিতাটির আংশিক সমালোচনা করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রাচীন যুগের ছড়ার ভিতর দিয়াও যে নারী-নিগ্রহের প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উক্ত কবিতার দ্বারা তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে-ছড়াটিকে অবলম্বন করিয়া কবির এই অমূল্য কবিতাটি রচিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের নরনারীদের মধ্যে অনেকেরই জানা না থাকিতে পারে। তবে উহা যে এক সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গে প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী। তাঁহার কবিতাটি পড়িয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহাদের অঞ্চলে (পশ্চিম-বঙ্গে) প্রাচীন কালে এই ছড়াটি প্রচলিত ছিল, কিংবা হয়ত এখনও আছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার বর্ত্তমান যুগেও প্রাচীনারা উক্ত ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'ঘুমপাড়ানি গান' হিসাবে অদ্যাপি উহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই ছড়ার কথাগুলি বঙ্গের বিভিন্ন অংশে মোটামুটি একই আকারে প্রচলিত কি না তাহা জানি না। সুতরাং তাহা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াটি যে-আকারে প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

কম্‌লীলতা, কম্‌লীলতা।
জল শুকাইলে থাকৃবি কোথা।
থাকুম থাকুম মাটির তলে।
ফাল দিয়া উঠুম বর্ষাকালে।
অড়ম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতা পায়।
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই।
ঢাকা যাইয়া শ্রীফল খাই।
সেই ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে।*
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাইতের মেলে।
সুন্দরীর লো মা।
পাট-কাপড়খান পরাইয়া দিলা
দেখতে দিলা না।
আগে যদি জান্‌তাম।
ভুলি ধইর্‌য়া কান্দ্‌তাম।।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিবাসিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে এই ছড়াটি কি আকারে প্রচলিত ছিল কিংবা আছে, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

* পাঠান্তর—"ঢাকিরা ঢাক বাজায় বুন্দার খালে"।

"ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র"

শ্রীমণীন্দ্র দাস, লণ্ডন

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র" প্রবন্ধে পঞ্চমুখে ইংলণ্ডীয় ছাত্রদের প্রশংসা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের মুণ্ডপাত না করলেও বাকি কিছু রাখেন নি। তিনি লিখেছেন, এদেশীয় সভ্যতায় ও উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রায় তিনি মুগ্ধ এবং কল্পনার চোখে এদেশ সম্বন্ধে তিনি যে-স্বপ্ন দেখতেন, সে-স্বপ্ন সত্য হয়ে তাঁকে ততোধিক বিস্ময়াপন্ন ও শ্রদ্ধাশীল করেছে। বাইরে থেকে এদেশ সম্বন্ধে যে একটা উচ্চ ধারণা থাকে, এখানে এসে সে ধারণার অনেকখানি মর্য্যাদাহানি ঘটে, একথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি। তিনি যে-গুণগুলি দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর সভ্যতা ও স্বাধীনতার ফলে, সে-সব গুণের অধিকারী এঁরা হয়েছেন। ভারতবর্ষ পরাধীন শতাব্দীর উপর ; বুভুক্ষার নিষ্পেষণে আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান স্বভাবতই আংশিক লোপ পায়—পরাধীনতার প্রতিক্রিয়াশীল আবহাওয়ার মধ্যে ভারতবাসীর সভ্যতার মাপকাঠি হয়ত এঁদের চেয়ে কম নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা ভুলে গেলে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ বিচার করা কিছুতেই যায় না। যে-দেশের জনসাধারণ অর্দ্ধভুক্ত হয়ে দিন কাটায়, যে-দেশের অধিকাংশ লোকের সামান্য অক্ষরজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই, সে-দেশের সাধুতার সঙ্গে, স্বাধীন, শিক্ষিত ও পরস্বাহরণে পুষ্ট জাতির সাধুতার তুলনা করা চলে না।

দু-একটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশের ছেলেরা নাকি ষড়যন্ত্র ক'রে বর্ম্মাবৃত নোটিস-বোর্ডকে আক্রমণ ক'রে থাকে, কিন্তু এদেশে নগ্ন নোটিস-বোর্ড সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এদেশের ছাত্ররা হয়ত নোটিস-বোর্ডের উপর বিক্রম দেখায় না, কিন্তু ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপককে অধ্যাপনার সময়েই অনেক সময় এদের অশিষ্ট ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হয়। কয়েক দিন আগে এখানকার সিটি গিল্‌ড্‌স্ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্ররা মিলে এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের টেবিলের নীচে একটা পটকা রেখে দিয়েছিল "নির্দোষ আমোদ উপভোগের জন্য।" অধ্যাপক মহাশয় যখন পাঠদানে ব্যস্ত, পটকা যথাসময়ে "ডিসিপ্লিনে"র পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অপরাধীকে সনাক্ত করা অসম্ভব ব'লে নিরুপায় হয়ে অধ্যাপক মহাশয়কে হয়ত "ডিসিপ্লিনে"র সঠিক অর্থ উদ্ধারে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। আমাদের দেশের ছেলেদের ধৃষ্টতার সীমা বোধ হয় এত দূর গিয়ে আজও পৌঁছয় নি। অধুনা, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির মত সম্ভ্রান্ত বিদ্যায়তনেও ছাত্রদের মধ্যে সামান্য বস্তু চুরির এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষকে ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ ক'রে এক ছাত্র-চোরকে হাতেনাতে ধ'রে এই অশোভন উপদ্রবকে সায়েস্তা করতে হয়েছিল! এদেশের ছাত্রদের "প্রাচীর-সাহিত্যে"র প্রতি হয়ত অনুরাগ নেই, কিন্তু "কথা-সাহিত্যে"র উপর প্রচুর আসক্তি আছে। তাই অপরিচিত ছাত্রদের মাঝখানে থেকেও এদের মুখে অশ্লীল উক্তি অনর্গল বের হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত বাড়াবার জন্য নয়, একটা ঘটনাও মনে পড়ে এদের ভদ্রতার বিষয়ে। এখানে আসবার পথে জনৈক কাস্টম্‌স্ কর্ম্মচারী আমার বন্ধুর সুটকেসের কাপড়ের আবরণ স্বেচ্ছায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে অনিচ্ছাকৃত কাজ ব'লে মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে আমি বেশ দেখছিলাম, তার প্রসন্ন মুখ ব্যঙ্গ-হাসিতে উদ্ভাসিত, আর তার রসাস্বাদ পার্শ্ববর্ত্তী সহকর্ম্মীদেরও পরিবেশন করতে তার কার্পণ্য হয় নি। এরা কলেজের ছেলে নয় বটে, কিন্তু এদেশের কলেজের শিক্ষায় ও সভ্যতায় এরাই ত বর্দ্ধিত।

হয়ত একথা বলা যেতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের অশিষ্ট আচরণে একটা জাতির মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু এও ত ঠিক যে ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি। বাহ্যিক ভদ্রতা এদেশের একটা বিলাস—খেতে পরতে যাদের অভাব নেই, তাদেরই বিলাস সাজে —তাদের মুখেই "দুঃখিত ও ধন্যবাদে"র ছড়াছড়ি শোভা পায়। আমরা এখানে এসে "দুঃখিত ও ধন্যবাদে"র আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে যাই; তাদের মনের ঘৃণা আমাদের ধিক্কৃত করে না; পরাধীনতায় আমাদের পৌরুষ মরে গেছে। আমি তর্কের মারপ্যাঁচে না গিয়ে এই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই, কতটুকু আন্তরিকতা এদের সভ্যতায় আছে, আর পরাধীনতার কলঙ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ যারা করেছে, তাদের কতটুকু সামর্থ্য আছে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে।

আমি খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করব যে এখানে এসে আমরা এদেশের সব কিছুর মধ্যেই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে উৎকর্ষ দেখতে পাই। এ আমাদের অন্ধতা, নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা। হয়ত এদের সভ্যতার কিছু আমাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না, আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আমাদের গৌরবময় অতীত রয়েছে।

এদেশে ভারতবাসীর মুখে যখন দেশনিন্দা শুনতে পাই, তখন রবীন্দ্রনাথের গোরার কথায় বলতে ইচ্ছে করে, "দেশকে যারা ভালবাসতে জানে না, দেশের নিন্দা করবার অধিকারও তাদের নেই।"

দুই জন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীতিনকড়ি সুর

বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম. এ. লিখিত আলোচনায় (১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলেন, (২) ডিরোজিওর কোন প্রভাব তাঁহার জীবনের উপর কেন নাই, এই দুই বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টার-এর * শেষ অংশে যেখানে হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নাম আছে খুলিয়া দেখিলাম।

দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে উপরিউক্ত দুই বিষয়েরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। দুই দেবেন্দ্রনাথেরই উল্লেখ ঐ পুস্তকের ৪৭১ পৃষ্ঠায় আছে। আমি নিম্নে রেজিষ্টার হইতে ঐ দুইটি লিপির নকল করিয়া দিলাম।

Tagore, Debendranath, Maharshi :

Entered Hindu College, shortly after the resignation of Derozio, 1831 ; left while in the 2nd class. Religious Reformer. Founder of the "Adi Brahmo Samaj." Died January 1905.

Tagore, Debendranath :

Government Junior Scholarship, 1845. Ganganarain Das Senior Scholarship of Rs. 12, 1848.

দুই দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ থাকাতে উপরিউক্ত প্রথম বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে দ্বিতীয় বিষয়ের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়।

প্রবন্ধে বর্ণিত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রমাপ্রসাদ রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখও রেজিষ্টারে আছে। মথুরনাথ বিশ্বাসের কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য পুস্তকের সঙ্কলনকারিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের তালিকা সম্পূর্ণ নহে। রেজিষ্টারে লিখিত সাল অনুসারে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ না হইয়া দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ হওয়াই সম্ভব। বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সত্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে বর্ণিত বিষয় পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। অবশ্য রেজিষ্টারটি নির্ভুল কি না সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারিব না।

* Presidency College Register—Compiled and Edited by Surendra Chandra Majumdar, M. A. B. L. and Gokulnath Dhar, B. A. Published by the Bengal Secretariat Book Depot. Writers Building, Calcutta. Price Rs. 2-8.

"কেশবচন্দ্র সেনের জাতিগঠন-চর্চা"

বিগত অগ্রহায়ণের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত উক্ত নামধেয় প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল আছে। ইতিহাসের উপাদান যথাসম্ভব নির্ভুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেজন্ত ভুল কয়েকটির সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

১। উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তেইশ বৎসর বয়সে (কেশবচন্দ্র) ইংরেজী 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।" এই সংবাদটি ঠিক নহে। বাংলার অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ৺মনোমোহন ঘোষ ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ মার্চ্চ মাস অবধি উহার সম্পাদকতা করেন। কেশব প্রথম হইতেই মনোমোহনের সহায়ক ছিলেন এবং মনোমোহন ইংলণ্ড যাইবার সময় কেশবের উপর পত্রিকার সকল ভার অর্পণ করেন। এ সম্বন্ধে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রণীত 'নববার্ষিকী' ২২৪ পৃষ্ঠা, ৺শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ৩৪৭ পৃষ্ঠা, ও ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মহর্ষির আত্মচরিতের যে সংস্করণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টেও এই সংবাদ আছে।

২। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই সাধারণের জন্ত—বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর জন্ত কেশব বাবু নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পাদ্রী ড্যাল এবং লং-এর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির তরফে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাসভবনে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ('রামতনু' ২৬৭ পৃ.; 'নববার্ষিকী,' ২০৯ পৃ.)

কেশববাবুর এই সব প্রচেষ্টা "নিজস্ব" না হইলেও তাঁহার কৃতিত্বের কোনই হানি হয় না।

৩। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদিগের সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখা হইয়াছে যে, "তখনকার দিনে কিন্তু এরূপ কাজ নূতন ছিল" ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের ১৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় বরিশাল জিলায় জলপ্লাবনের জন্ত সাহায্য তোলার সংবাদ আছে। (এই সভায় চাঁদা-স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহন রায়, উইলিয়াম অ্যাডাম, স্যানফোর্ড আর্ণট, সিল্ক বাকিংহাম প্রভৃতির নাম আছে।) আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষের জন্ত চল্লিশ সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ, মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে সাহায্য তোলার কাহিনীও 'সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাজে কাজেই দেখিতে পাইতেছি, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে ১৮২২-২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনটি ব্যাপারে সভাসমিতি করিয়া চাঁদা তুলিয়া সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। "শ্রীযুত কাওয়ালিরাম স্বামি কর্ম্মকারী" ও পামার কোম্পানী খাজাঞ্চি নিযুক্ত হইয়াছেন।" লোকহিতার্থে লোকশ্রেয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রথম কর্ম্মারম্ভের যে দাবী রামকৃষ্ণ মিশন বা ব্রাহ্ম সমাজের তরফ হইতে করা হয়, তাহা ঠিক্ নহে। এদেশে লোকহিতের আদর্শ অতি প্রাচীন এবং সংঘবদ্ধ ভাবে সাহায্য দান (organized relief) প্রথাও ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য।—প্রভাতবাবুর চিঠিটিতে আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য ছিল। কিন্তু আমার প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ে কিছু লিখি নাই বলিয়া সেগুলি বর্ত্তমান "আলোচনা"র অপ্রাসঙ্গিক। এই জন্ত সেগুলি বাদ দিয়াছি। প্রাসঙ্গিক তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই :—

১। ডক্টর প্রশান্তকুমার সেন প্রণীত ও ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "Keshub Chunder Sen" নামক ইংরেজী বহির ৩০ পৃষ্ঠায় আছে :—

In August 1861, Keshub started the *Indian Mirror*, then a fortnightly newspaper. Among other coadjutors of Keshub in this undertaking was Monomohan Ghosh, later well known as one of the leading members of the English Bar, and one of the foremost citizens of Calcutta."

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের শতবার্ষিকী সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় আছে :—

"ইংরেজী পত্রিকা বিনা শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা যাইতে পারে না দেখিয়া, কেশবচন্দ্র (১৭৮৩ শকে ১৮ই শ্রাবণ) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে (১লা) 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা-সম্পাদনে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তৎকালে বিশেষ সাহায্য করেন।" (১৯৩৮ সালের সংস্করণ।)

এ-বিষয়ে যখন কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে দেখিতেছি, তখন কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত-লেখকেরা তথ্যটি সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করিলে ভাল হয়। অবশ্য 'প্রবাসী'তে আর নহে!

২। কেশবচন্দ্র শ্রমিক শ্রেণীর জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন ১৮৭০ সালের আগেই করিয়া থাকিলে তাহা ভাল। এটি তাঁহার "নিজস্ব" প্রচেষ্টা, তাঁহার পূর্ব্বেই এরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে বঙ্গে কেহ স্থাপিত করেন নাই, ইহা আমি কোথাও লিখি নাই। ১৮৭০ সালে যাহা তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছি, তাহার স্থাপনের বৎসর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের ও ডক্টর প্রশান্তকুমার সেনের বহিতে ১৮৭০ই আছে।

৩। দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কেশবচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমি লিখিয়াছিলাম,—

"কেশবচন্দ্র ও অন্য যুবকেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। এখন দুর্ভিক্ষ হইলে অর্থ সংগ্রহ ও সাহায্য বহু সভাসমিতি করিয়া থাকেন, ইহা সন্তোষের বিষয়। তখনকার দিনে কিন্তু এরূপ কাজ নূতন ছিল।"

এরূপ লেখায় আমার কোন ভুল হইয়াছে মনে করি না। আমি ইহা লিখি নাই যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে, মুসলমান রাজত্বে বা ইংরেজ শাসনকালের কোম্পানীর আমলে, ১৮৬১ সালের ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ কখন দুর্ভিক্ষে সাহায্য করেন নাই। আমার বক্তব্য কেবল ইহাই ছিল যে, ১৮৬১ সালে এরূপ চেষ্টা এখনকার মত বহু সভাসমিতির দ্বারা প্রায়শঃ অনুষ্ঠিত সুবিদিত কাজ ছিল না। কেশবচন্দ্র কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ বা রামকৃষ্ণ মিশন এরূপ কাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম করিয়াছেন, এমন কথা আমি লিখি নাই। ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জাগুলি ধানের ক্ষেত

শ্রীতারাপদ রাহা

রাত্রি ভোর না-হইতেই নিবারণ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া থাকিলেও সারা রাত তার ভাল ঘুম হয় নাই। খোলা জানালা-পথে শেষ রাত্রের যে আবছা আলো আসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে দেখা গেল—আমকাঠের তক্তপোষে মলিন বিছানার উপর শুইয়া মতি তার দুগ্ধহীন স্তন শলিতার মত শীর্ণ পুত্র মাণিকের মুখে তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। প্রতিদিনের অভ্যাস-মত সে কলিকাটা হাতে করিয়া তামাকের উদ্দেশে বাঁশের চোঙাটার দিকে হাত বাড়াইতে-ছিল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল, কাল থেকে তার চোঙাতে তামাকের লেশমাত্র নাই। কাল তার পেটে অন্ন পড়ে নাই, তামাক জুটিবে কি করিয়া!

নিবারণের পায়ের শব্দ শুনিয়া গোয়াল হইতে দুইটি বলদ উসখুস করিতে লাগিল। নিবারণ প্রতিদিন ভোরে উঠিয়াই ইহাদিগকে বাহিরে বাঁধিয়া দেয়,—আজ আর কাছে গেল না। অন্য দিনের মত গোয়ালের বেড়া হইতে নিড়ানি আনিতে যাইতেছিল,—কিন্তু কি ভাবিয়া তাহাও রাখিয়া দিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়—এই নির্জ্জন অন্ধকারেও পাছে কেহ তাহা টের পায় এই আশঙ্কায় সে তাহা চাপিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখে, মতি তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—কে রে—বউ, তুই উঠে এলি যে!

—এত ভোরে তুমি কোথা চললে?

নিড়ানি রাখা আর হইল না, সেটা হাতে করিয়া নিবারণ বলিল—ঘুমটা সকালেই ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম নিড়ানি হাতে এক বার মাঠের দিকেই যাই।

সেই অন্ধকারে মতি হাসিল। ঘুম ভাঙার কারণ সে নিজেও জানে, পেটে দানা না পড়িলে কারও চোখে ঘুম আসে না। মুখে সে রসিকতা করিয়া বলিল—মেয়ের আদর করতে ত রাত না-পোহাতেই মাঠে ছুটলে, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন, মাণিককেও কাল পেট পুরে দুটো খেতে দিতে পারি নি,—আমরা না-খেয়ে আরও দু-চার দিন কাটাতে পারি,…কিন্তু ও দুধের ছেলে—

নিবারণের এ যেন ভুলিবার কথা! সে বলিল—তুই থাম্ বউ, সে কথা তোর শেখাতে হবে না, বলিয়া দ্বিরুক্তি না-করিয়া নিড়ানি হাতে করিয়া গামছা-কাঁধে সে মাঠের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিল।

গো-বিলের ভাগাড় ধরিয়া দু-রশি ভুঁই গিয়া সে

একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, মতি যেন ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মতির রসিকতার কথাগুলি যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন। ধানের চারাগুলিকে সে সত্যই মেয়ের মত দেখে। এক দিন সে সে-কথা মতিকে বলিয়াছিল,—বউ, তোর যেমন মাণিক, আমার তেমন ধানের চারাগুলো, ওরা বাতাসে মাথা দুলিয়ে নাচে, আমার মনে হয় হাজার হাজার মাণিক আমার চারি দিকে নৃত্য করছে; তুই যেমন মাণিকের গা থেকে ময়লা তুলে দিয়ে সাজাস, খাওয়াস, আমিও অমনি নিড়ানি দিয়ে ওদের পাশ থেকে ঘাস-জঙ্গল ফেলে ওদের সাফ করি, ওদের গোড়া খুঁড়ে দিয়ে ওদের খাবার ব্যবস্থা করি। তাহ'লে ওরা আমার সন্তান হ'ল কি না, বল?

মতি হাসিয়া বলিয়াছিল—তা হ'লই ত। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কেমনতর হ'ল শুনি!

নিবারণ বলিয়াছিল—ঠাট্টা নয় বউ, আবার দেখ, মাণিক যেমন আমার বড় হয়ে রোজগার ক'রে খাওয়াবে, ওরাও তেমনি আমায় খাওয়াবে; মাণিকের তবু দেরি আছে, ওরা আমায় ক'দিন পরেই খেতে দেবে,—কেমন সত্যি কি না!

মতি বলিয়াছিল, সত্যি।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিবারণ ভাগাড়ের পথে চলিয়াছিল। পূবের আলোতে মাঠ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নিবারণ চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, চষা মাঠে ধান ও পাটের ছোট ছোট অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। ইহার সহিত তাহার জাওলি ধানের চারার তুলনা হয় না। ঐ—ঐ দেখা যায় তার জলকুণ্ডের জমি—আকাশের মত একখানা কালো মেঘ যেন হঠাৎ মাটিতে খসিয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্যে বর্ণে এ যেন মাঠের সকল ফসলকে হার মানাইয়াছে। নিবারণের মনে পড়িল, সেবার জন্মাষ্টমীর কাদামাটির কথা। কীর্ত্তনের পর পঞ্চবটীতলায় হাঁটু-সমান একটা গর্ত্ত খোঁড়া হইল—মথুর দাস একটা নারিকেল পেটের উপর রাখিয়া হাঁটু ভাঙিয়া বসিল, তাহার নিকট হইতে নারিকেল কে কাড়িবে? রাখাল আসিল, সীতানাথ আসিল, ঝড়ু সর্দ্দার আসিল, আরও কত কত জন—কেহ পারিল না, অবশেষে ভীম মাঝি আসিয়া এক হেঁচকায় নারিকেল কাড়িয়া লইল। মথুর দাস হারিয়া রাগিয়া বলে, এস মালাম করো আমার সঙ্গে!

ভীম হাসিয়া উঠিল, মালাম কুস্তি আপনার সঙ্গে আমি কি করব দাস মশায়! আমার ঐ ছেলে কেশব করবে।… আয় ত রে কেশব, দাস-মশায়ের সঙ্গে একটু কাদামাটির খেলা ক'রে যা।

সতর বছরের ছেলে কেশব মালকোঁচা মারিয়া বুক ফুলাইয়া আগাইয়া আসিল। নিবারণ এখনও যেন তাহার চেহারা চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে।

মথুর দাস হাঁকিল, কালি, কালি, আয় ত রে এদিকে।

কালিদাস মথুরের ভাইপো, মথুরের ডাকে মালকোঁচা মারিয়া কাদামাটির মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।

মথুর দেমাক করিয়া কহিল—আমি আবার কি লড়ব, ছেলেছোকরাতেই হোক।

এক প্যাঁচ, দুই প্যাঁচ, তিন প্যাঁচে কালিদাস চিৎ হইল।

কেশব বুক ফুলাইয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মথুর দাসের দিকে কটাক্ষ করিয়া ভীম কহিল—কেমন দাস-মশায়,—হ'ল ত?

ষোল-সতর হইতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ-পঁচিশ পর্য্যন্ত যত যুবক ছিল, সকলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; তাহারা সকলেই প্রায় দু-এক প্যাঁচ করিয়া কেশবের সঙ্গে লড়িল। জল ঢালিয়া নূতন করিয়া কাদা করা হইল। কাদা মাখিয়া সকলে ভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু ভীম মাঝির ডব্‌কা জোয়ান ছেলে কেশবের সঙ্গে [illegible] খেলায় কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, এক প্যাঁচেও কেহ তাহাকে হারাইতে পারিল না। পুত্রের বিজয়-গর্ব্বে উল্লসিত ভীম মাঝির দৃপ্ত মুখশ্রী নিবারণের বেশ মনে আছে। নিবারণ তখন ছোট; তবুও জন্মাষ্টমীর সেই আসরে দাঁড়াইয়া সারা গায়ে কাদামাখা কেশবকে দেখিয়া নিবারণের বার-বার মনে হইয়াছিল—হাঁ, ছেলে হয় ত—এমনি ছেলে!

...আজ তাহার মনে হয় তার সেদিনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। সারা মাঠের বৃষ্টির জল গড়াইয়া তার জলকুণ্ডের জমিকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর তাহারই মাঝে তার নিজের হাতে রোয়া জাগুলি ধানের চারাগুলি কাদা মাখিয়া হাজার হাজার কেশবের মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের হারাইতে কেহ পারিবে না; দেবতার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ধান-পাট বাড়িয়া উঠিবে, কিন্তু আর সবার ধান যখন হাঁটুর নীচে পড়িয়া থাকিবে, নিবারণের জাগুলি ধান তখন মানুষের মাথা ছাড়াইয়া উঠিবে।

একটা লোক পিছন হইতে শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—কেডা ও যায়?

নিবারণ ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

করিম সেখ মাথাল মাথায় দিয়া কাস্তে হাতে ছুটিয়া আসিতেছে—ও দাস-মশায় না কি?

করিম নিবারণকে ধরিয়া ফেলিল—রাত না-পোহাতেও ছুটতে লেগেছ? তা ছুটবেই ত, আসমানের কালো মেঘ জমীনে নামিয়ে নেছ তুমি, তোমার দুখ্‌খু ত ঘুচল বুলে।

নিবারণ একটু হাসিল—তুমি, তুমি কোথায় চলেছ, এত ভোরে?

করিম কাস্তে দেখাইল—চারটি ঘাস আনব, গাই গরুটাকে খাওয়াব, দু-সের দুধ দেয়—তিনটে পয়সাও ত হয়—ঐ দিয়ে চাল কিনে কচু-ঘেঁচু সিদ্ধ ক'রে—আল্লা যদি দিন দেয়—

নিবারণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার একটি দুধেল গাই থাকিলে আজ আর এ মুস্কিলে পড়িতে হইত না।

করিম বোধ হয় বুঝিল, বলিল—ভাবনা কি দাস-মশায়, পদ্মারও তীর আছে, আল্লার কুদ্‌রতে ঐ ত তোমার ডাঙা দেখা যায়—বড়জোর আর দুটো মাস, সে আর ক-দিন? যাও ভাল ক'রে নিড়োও গিয়ে—হোই ঐ মাঠে যাচ্ছি আমি, ঐখানে ঘাস জমেছে খুব—একটু বেলা হ'লে আর কাটতে দেবে না, শালারা টের পেয়ে যাবে।

করিম চলিয়া গেল।

নিবারণ যখন তার জলকুণ্ড জমির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোর হইয়াছে। ভোরের হাওয়ায় ধানের চারাগুলি একবার মাথা দোলাইয়া নিবারণের অভ্যর্থনা করিয়া গেল। নিবারণ নিড়ানি রাখিয়া গামছা পাতিয়া বসিল; আজ আর নিড়াইয়া লাভ কি? সকালে উঠিয়াই তার চক্‌কোত্তি-মশায়ের বাড়ীতে যাইবার কথা। কালো কালো ধানের চারার ভিতর দিয়া ভোরের বাতাস বহিয়া কেমন এক মধুর শব্দ করিয়া গেল, হাজার হাজার মাথা এক সঙ্গে যেন গানে তাল দিতে লাগিল। চক্‌কোত্তির বাড়ীতে সে কিছুতেই যাইবে না, কিন্তু হইলে কি হইবে,—চক্‌কোত্তি হয়ত কোমরে টাকা গুঁজিয়া কাগজ-কলম লইয়া নিজেই নিবারণের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইবে—কসাই বামুনের যদি একটুও দয়ামায়া থাকে। হাঁ টাকা সে দিয়াছে বটে,—গেল বছর চার টাকা, আর এবার দু-টাকা—সুদও কিছু হইয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে আর কিছু টাকা সে কি দিতে পারে না? আর ক-মাস,—একটা একটা করিয়া দিন গুণিলেও দু-মাস। বৈশাখ শেষ হইতে চলিল, মাঝে জ্যৈষ্ঠ মাস, আষাঢ়ের শেষেই তার ধান পাকিবে, তখন চক্‌কোত্তির টাকা নিবারণ সুদে-আসলে শোধ দিতে পারিবেই—এর নাম জাগুলি ধান, সবার আগে পাকে।

কিন্তু আসল কথা তা নয়—চক্‌কোত্তি এ জমিটা চায়। ইহার পাশেই চক্‌কোত্তির ডাঙা জমি—তাহার সহিত সে এ জমি মিশাইয়া লইতে চায়। কয়েক বৎসর ধরিয়া চক্‌কোত্তি কেবল সেই সন্ধানে রহিয়াছে, সেই আশাতেই সে নিবারণকে টাকা ধার দিয়াছে। আর বৎসরও সেই প্রস্তাব সে একবার করিয়াছিল। গত বৎসরেও এমনি কালো ভোমরার মত ধান জন্মিয়াছিল—নিবারণ কত আশা করিয়াছিল। দশ বৎসর ধরিয়া এমনি এক ক্ষেত ধানের আশায় সে বছর বছর তিন টাকা করিয়া খাজনা গণিয়া আসিয়াছে। যদি বৃষ্টিতে সারা মাঠ না ডুবাইত, তবে এই ক্ষেতের ধানেই নিবারণের সারা বছর চলিয়া আরও বাঁচিয়া যাইত। চক্‌কোত্তি তাই পাইয়া বসিয়াছে—আর বছরও ত দেখলি—ধান জন্মালেই হ'ল না? তোর ও হাতী পোষা সাজবে কেন?

নিবারণ যুক্তি দিয়াই বলিয়াছিল—ফি বছরই ত জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর-মশাই, সারা মাঠ ধুয়ে এসে আমার ভুঁয়ে লাগে—আর ক-বছর? তার পর সারা মাঠের সেরা জমি হবে আমার জলকুণ্ড।

চক্‌কোত্তি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—হবে, হবে—কিন্তু তত দিন কি তুই থাকবি নিবারণ?

নিবারণ বিনীত ভাবেই বলিয়াছিল—এত দিনই যদি থাকলাম ঠাকুর-মশাই, তাহ'লে আপনারা আশীর্ব্বাদ করলে জলকুণ্ডেতে এখন ফি বছরেই ধান ফলবে—এক রকম টিকে যাবই।

—আর বছরও ত তুই এই কথাই ভেবেছিলি, তাহ'লে আর চক্‌কোত্তি-মশায়ের পায়ে পড়লি কেন টাকার জন্যে? তা হবে না নিবারণ, এবার আমি টাকা ফেলে রাখব না, সুদে-আসলে আমার টাকা শোধ ক'রে দাও,—এবারকার টাকার দাম তুমি বুঝবে না, এবার দশ টাকা হ'লে তোমার জমির চেয়ে ঢের ভাল ভাল জমি মিলবে আমার, কিন্তু চক্‌কোত্তির দোরে আর টাকার জন্যে এস না, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি।

রাগিয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া, যুক্তি দিয়া চক্‌কোত্তি নিবারণকে কাল সন্ধ্যায় বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে তাহার এ-জমি এবার বিক্রি করাই ভাল। এই বছর ধরিয়া এগার বছর সে জমি কিনিয়াছে, এবারের কথা থাক, এবার ছাড়া মাত্র এক বছর সে ইহাতে ধান পাইয়াছে, অথচ জমিদারের খাজনা হইল ৩×১১=৩৩৲ টাকা, নিবারণ বুঝিয়া দেখুক। তাহা ছাড়া সেলামী দিতে হইয়াছে যেন কত?—পঁচিশ টাকা! তবে?—পঁচিশ টাকা ইহাতে নিবারণ যোগ করুক, হইল কত? আটান্ন টাকা, প্রায় ষাট টাকার বুঝ,—তিন কুড়ি টাকা। আরও কত টাকা যে ইহাতে খরচ হইবে তাহার ঠিক কি?...আবার নিবারণের দেনা কত দেখ—এক চক্‌কোত্তির কাছেই নিবারণ সুদে আসলে প্রায় দশ টাকা ধারে, তা ছাড়া তিন বছর মালেকের খাজনা বাকী নয় টাকা, হইল উনিশ টাকা, চক্‌কোত্তি তাহাকে মোট ত্রিশ টাকা দিতে রাজী আছে এই দুর্ব্বৎসরে। কর্জ্জ শোধ ও খাজনা দিয়াও নিবারণের এগার টাকা বাকী থাকিবে, নিবারণ খাইয়া বাঁচিবে, চক্‌কোত্তি নিবারণের ভালর জন্যই বলিতেছে, নিবারণ বুঝিয়া দেখুক।

মাণিক খাইতে না পাইয়া সারাদিন কাঁদে, শুধু তাহার কথা মনে করিয়াই নিবারণের মন নরম হইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল—এই যে ঠাকুর-মশায়, হিসেব হ'ল প্রায় ষাট টাকা খরচ হয়েছে, তা ত্রিশ টাকায় দেব?

এবার না দিলে খরচ ত আরও হ'তে থাকবে নিবারণ, সে ত আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি,—আর, এর মাঝেই তুমি ভুলে গেলে, নিবারণ,—জমি তুমি কিনেছিলে কত দিয়ে?

—পঁচিশ।

—তবে?—পঁচিশের জায়গায় ত্রিশ টাকা পাচ্ছ তুমি—পাঁচ টাকা বেশী,—তা'তে এ দুর্ব্বৎসর!

পঁচিশের জায়গায় ত্রিশ টাকা দিয়া এ দুর্ব্বৎসরে চক্‌কোত্তি-মশায় কেন এ জমি লইতে চায় নিবারণ সবই বুঝে, কিন্তু উপায় নাই, দু-মাস কেন আর দু-দিনও মাণিককে বাঁচাইয়া রাখিবার সঙ্গতি তাহার নাই। ছ-বিঘা পাটের জমি সে আবাদ করিয়াছে, কিন্তু সে জমি তার নিজের নয়, সে বরগা জমি, বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহা ছাড়া কবে পাট বিক্রি করিয়া টাকা হইবে তত দিন সে বাঁচিবে কি খাইয়া? নিবারণের স্ত্রী-পুত্র না থাকিলে সে বিদেশে বাহির হইয়া পড়িত; ইহাদের ছাড়িয়া সে বাড়ীর বাহির হইতে পারে না।

নিবারণ কাল সন্ধ্যায় তাই রাজী হইয়াছে।

ক্ষেতের সীমানার উপর ডাঙা জমিতে একটা বুনো কুলের ঝোপ, এখনই সূর্য্যোদয় হইবে। নিবারণ ঝোপের আড়ালে গামছা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। দু দিন না-খাইয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই। জাওলি ধানের ক্ষেত দেখিয়া মনে যে বল পাইত, আজ তাহাও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বউ আসিবার সময় বলিয়াছে, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন, মাণিককে কাল পেট পুরে দুটো খেতে দিতে পারি নি। নিবারণ মনে মনে হাসিল; বউ জানে না—ছেলেকে খাওয়াইবে বলিয়া মেয়েকে সে বেচিতে বসিয়াছে।

ক্ষেতের পাশে চোখ বুজিয়া শুইয়া নিবারণ কত কথা ভাবিতে লাগিল। ঘরের বউ নিজের হাতে ছেলেপিলে মানুষ করে তাই তারা বোঝে সন্তানের প্রতি কত মায়া হয়, চাষী যখন নিজের হাতে নিজের ক্ষেতে হাজার হাজার লাখো লাখো চারা সন্তানের মত যত্নে বাড়াইয়া তোলে তখন তার মায়াও কি একটুখানি কম হয়! নিবারণ যখন ছোট তখন গ্রামে ছেলে বিক্রি হইতে দেখিয়াছিল। তাহাদেরই খেলার সাথী রাখালকে রাখালের মা বিক্রি করিয়া ফেলিল—নগদ পাঁচ শত টাকা। যাহারা কিনিল তাহারা জমিদার, গড়াইয়ের ও-পারে তাদের বাড়ী—বংশে পুত্রসন্তান নাই যে জমিদারী ভোগ করিবে;—আর এদিকে রাখালের মায়ের ঘরে অন্ন নাই যে খাইবে। সেদিন নিবারণের শিশু-মন রাখালের মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; এ কেমন রাক্ষসী মা, যে নিজের পেটের জন্য ছেলে বিক্রী করে! আজ যখন তাহার মনে হইল সেও রাখালের মায়ের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার মুদ্রিত চক্ষুর পাশ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এগার বছর আগে বউয়ের বাঁধানো চুড়ি বিক্রি করিয়া তাহার সহিত পাট বিক্রির ক'টা টাকা যোগ করিয়া সে এই জমি কিনিয়াছিল, তিন বিঘা জমি মাত্র পঁচিশ টাকা। সকলের অনাদরের জমি,—জল জমে, ফসল দেয় না। নিবারণ চাষীর ছেলে—সে বুঝিয়াছিল এক দিন এই জমি মাঠের সেরা হইবে। সকল মাঠের পচানি ধুইয়া এখানে সার জমিবে, মাঠে খাল কাটা হইলে জমির জল বাহির হইয়া যাইবে,—বছরের পর বছর বর্ষার পলিমাটিতে জমি ক্রমে ডাঙা হইয়া উঠিবে, নিবারণের তিন বিঘাতে ত্রিশ বিঘার ফসল দিবে। আজ যখন তার সেই সুদিন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনই তাহাকে হাতছাড়া করিতে হইল, ছেলে যখন উপার্জ্জনক্ষম হইল, তখনই তাহাকে বিক্রয় করিতে হইল, সে রাখালের মার চেয়েও অধম।

ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কি মিষ্ট ওর শব্দ,—যেন ঘুম পাড়াইয়া দেয়। অনেক দূরে—বোধ হয় কলমিডাঙার ভাগাড়ে—কোন রাখাল গান গাহিয়া চলিয়াছে—

ওরে ছিদেম সখা
আমি কি অভাবে—

বাতাসে গানের মিঠা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছে,—সমস্ত মাঠ জুড়িয়া কালো জাওলি ধান হাঁটু-সমান হইয়া যেন হাওয়ার তালে নাচিতেছে,—চাষার চোখে সে কত শান্তি। নিবারণের চোখে যেন ঘুম আসিতে চায়। জাওলি ধানের চারাগুলি যেন হাজার হাজার তালপাতার পাখা লইয়া ছোট ছেলের মত জাগরণ-ক্লান্ত নিবারণকে বাতাস দিতেছে।

প্রভাতের বাতাসে ক্ষেতের ধারে শুইয়া নিবারণ ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে এক স্বপ্ন দেখিল: দেখিল সমস্ত মাঠ যেন ধান, পাটের কচি কচি চারায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার মাঝে তাহার জাওলি ধানের চারা সবার সেরা,—তারা আরও কত বড় হইয়া উঠিয়াছে,—আরও ঘন, আরও কালো। সবাই বলে—নিবারণ পাহারা দে, পাহারা দে, এমন ধান ফললে তুই সারা বছর খেয়ে ফুরতে পারবি নে। দলে দলে সব গরু ছেড়ে দিচ্ছে,—ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাস না? তুই টং বাঁধ।

লোকে ভাল কথাই বলিয়াছে। লোকের কথা-মত নিবারণ এক মস্ত উঁচু মাচা বাঁধিয়াছে। তাহার উপর সে সারা দিন বসিয়া থাকে,—বসিয়া বসিয়া সে নিজের ক্ষেতের উপর কালো ধানের নৃত্য দেখে। তাহার কেশবতী কন্যা যেন সারা আঙিনা ভরিয়া কালো চুল এলাইয়া দিন-রাত নাচিয়া বেড়ায়। গরু আসিলে নিবারণ তাড়ায়—হৈই—হেঁইয়ো। গরু তাড়াইবার জন্য নিবারণ মস্ত বড় একটা বাঁশের লাঠি করিয়াছে। সবার চেয়ে বেশী ভয় নিবারণের বিশ্বাসদের সেই ধর্ম্মের ষাঁড়টার,—তাহার কাছে আগাইতে পারা যায় না, কাছে গেলে শিং নীচু করিয়া গুঁতাইতে আসে—নিবারণ তাহাকে তফাৎ হইতেই তাড়াইতে থাকে।

নিবারণ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—হঠাৎ শাপশুপ

শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল,—নিবারণ তাকাইয়া দেখে—সর্ব্বনাশ, বিশ্বাসদের সেই ষাঁড়টা তাহার ক্ষেত খাইয়া কাবার করিয়া ফেলিল,—রোষে ক্ষোভে নিবারণ লাঠি-হাতে মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িল,—সে জ্ঞানহারা হইয়া ষাঁড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। ষাঁড় হটিল না—শিঙে মাটি খুঁড়িয়া সে নিবারণের দিকে আগাইয়া আসিল,—এমন ক্ষেত ছাড়িয়া সে কিছুতেই যাইবে না। নিবারণ প্রাণপণ শক্তিতে তাহার মাথায় লাঠি মারিল। ষাঁড় এইবার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া নিবারণকে আক্রমণ করিল,—তাহাকে আর আস্ত রাখিবে না।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। নিবারণ দেখে, বৈশাখের খর রৌদ্র কুলগাছ ছাড়াইয়া তাহার মাথায় পড়িয়াছে, আর তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া চক্কোত্তি তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—তুই ত আচ্ছা লোক নিবারণ, সকালবেলা তোর লেখাপড়া মিটিয়ে ফেলবার কথা,—তা না ক'রে, তুই বাড়ী থেকে পালিয়ে মাঠে এসে ঘুমচ্ছিস,—আর ওদিকে তোর ছেলেটা বউয়ের কোলে শুয়ে ভাত ভাত ক'রে হাত-পা ছুড়ছে,—আচ্ছা কাপুরুষ ত তুই,—খেতে দিতে পারবি না ত বাপ হয়েছিলি কেন?

নিবারণের ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো চক্কোত্তির কথা শুনিয়া আরও রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল না, মাথা নীচু করিয়া নিড়ানি ও গামছা তুলিয়া লইয়া সে চক্কোত্তিকে বলিল—চলুন। ক্ষুধায় তাহারও নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছিল।

দু-এক পা আসিয়া নিবারণ তার জাগুলি ধানের ক্ষেতের দিকে একবার তাকাইল: বৈশাখের দমকা হাওয়ায় ধানের আগাগুলি মাথা কুটিয়া কুটিয়া মরিতেছে,—তাহার মনে পড়িল, রাখালকে রাখালের মা যখন পেটের দায়ে বিক্রি করিয়া দিল, তখন সেও ঠিক এমনি করিয়া মাথা কুটিয়া কাঁদিয়াছিল।

কামাল আতাতুর্ক ও নব্য তুরস্ক—শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত। অমৃত পাব্লিশিং হাউস, ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

নব্য তুরস্ক যে উন্নত, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী হইয়াছে, তাহার কারণ এই পুস্তক পড়িলে জানা যাইবে। ইহাতে, প্রাচীন তুরস্ক, নব্য তুর্কীদল, আনোয়ার পাশা, উদীয়মান কামাল, আতাতুর্ক কামাল, আধুনিক তুরস্ক ও তিনটি পরিশিষ্ট, এই কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে। কামাল আতাতুর্ক, তাঁহার জননী, তুরস্কের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ইস্‌মেৎ ইনোনু, ইস্তাম্বুল, নব্য তুরস্কের পার্লেমেণ্ট ভবনের এক অংশ—এই কয়টি ছবি ইহাতে আছে।

সাম্যবাদের গোড়ার কথা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, ৪৬এ নং বোসপাড়া লেন, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বাংলা গবর্মেণ্ট এই বহিখানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আবার বলিয়াছেন ইহা প্রকাশিত, বিক্রীত প্রচারিত পঠিত হইতে পারে!

আজকাল সাম্যবাদের বোলবোলা খুব। কিন্তু যত লোক ইহার কথা বলেন, তত লোক ইহা বুঝেন না। ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে উপক্রমিকা স্বরূপ এই বহিটি ব্যবহারের যোগ্য। নূতন পুরাতন সকল মতই বিচার করিয়া গ্রহণ অ-গ্রহণ করিতে হয়। সাম্যবাদও তাহাই।

বিজয়বাবু সোজা, মনোজ্ঞ ও জোরাল ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিতে পারেন। এই জন্য তাঁহার বহিগুলি পড়িতে কষ্ট হয় না।

মনের গভীরে—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, ৪৬এ নং বোসপাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মানুষের মনের গোপনে যে-সব ভাব ও চিন্তা থাকে, মানুষ অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে তদ্দ্বারা চালিত হয়। সেইগুলি জানা আবশ্যক। সাইকো-এনালিসিস বা মনোবিকলন-বিদ্যা এই বিষয়ের চর্চ্চা করে। মনোবিকলন-বিজ্ঞানীরা যা কিছু বলেন, সবই যে মানিতে হইবে, এমন নয়। সবই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু বিচার করিতে হইলে, তাঁহারা কি বলেন তাহা আগে জানা চাই। এই বহি তাহা জানিতে সাহায্য করিবে।

ড.

ঘরে বাইরে—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ভারতী ভবন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ. ১২৭।

অধুনালুপ্ত "উদয়ন" পত্রে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষা, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ইত্যাদি বিষয়ে যে-সব মন্তব্য বা "প্রস্তাব" প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেগুলি এই পুস্তকে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। লেখকের রচনার যে বিশিষ্ট সরসতা, লিপিচাতুর্য্য, বাক্‌দক্ষতা ও দীপ্তি—যে-দীপ্তি যতখানি আলোকিত করে হয়ত অনেক সময় তাহার চেয়ে চমকিত করে বেশী—তাহা এই রচনাগুলিতেও অক্ষুণ্ণ আছে, সুতরাং একান্ত সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে এগুলি লেখকের অনুরাগী পাঠকবর্গের আনন্দবিধান করিবে, বিশেষতঃ এই জন্য যে "এখন বাংলায় বীরবলী লেখার দুর্ভিক্ষ হয়েছে"।

বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। নিউ বুক ষ্টল, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

এই বহিটিতে বীর কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনকাহিনী বালক-পাঠকদের জন্য বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বীর-চরিত যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণধন দে, শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের উদ্দেশে লিখিত তিনটি কবিতাও এই বহিতে আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মৌচাকে ঢিল—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো। মূল্য দেড় টাকা।

মৌচাকে ঢিল একখানি ব্যঙ্গনাট্য—কিছু দিন পূর্ব্বে ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের সামাজিক, ধার্ম্মিক বা রাষ্ট্রগত জীবনের দোষত্রুটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পূর্ব্বনাট্যকারগণ রঙ্গনাট্য বা ফার্সের আশ্রয় লইতেন। প্রমথবাবু যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যে নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পদ্ধতির প্রধান উপজীব্য হাস্যরস নয়, বস্তুত সুতীব্র ব্যঙ্গ। বলা বাহুল্য, ব্যঙ্গের মধ্যেও একটা তির্য্যকে-হাসি আছে, কিন্তু সে-হাসি উচ্ছ্বসিত নয়, এবং উচ্ছ্বসিত ও শব্দিত নয় বলিয়াই তাহার নিজের উদ্দেশ্যকে ভাসাইয়া দিয়া উদ্দিষ্টকে অনাহত রাখে না।

আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু আমাদের (অথবা ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে জগতের) বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। ডেমোক্রেসীর নামে যে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা জগতের চক্ষে ধুলা দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নাট্যকার তাহার উপর নিজের সন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাত করিয়াছেন। গণতন্ত্র বেশ গালভরা নাম, সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখকের মতে বলিতে গেলে—"ভাবিবার চেষ্টা সহজ হইতে পারে, কিন্তু ভাবিবার শক্তি সহজ নয়···লক্ষ জনের মধ্যেও এক জনে চিন্তা করিতে পারে কি না সন্দেহ" এবং "সেই জন্যই ডিক্‌টেটরশিপের আবশ্যক।" অবশ্য স্বয়ম্ভু ডিক্টেটার নয়।

তাঁহার প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত করিবার জন্য নাট্যকার বর্ত্তমান গণতন্ত্রের সহিত বাংলার অষ্টম শতাব্দীর সেই গণতন্ত্রের কাহিনী গ্রথিত

করিয়াছেন যাহাতে প্রজাগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গোপালদেবকে গৌড়ের রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিল।

বইখানির টেকনিকে একটু বিশেষত্ব আছে। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে গ্রন্থের ভূমিকা-অংশই প্রধান অংশ এবং G. B. S. প্রভৃতির পদ্ধতিতে নাটকটি ভূমিকার সম্প্রসারণ মাত্র। ভাষার দিক্ দিয়া, দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া প্রমথবাবুর নাটকের ভূমিকা বাংলা ভাষার এক নূতন বস্তু। আমার মনে হয় "বীরবল"-এর পর বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে (এ-অংশটিকে ঐ নামই দিতে হয়) এমন নূতন ভঙ্গির অবতারণা আর কেহই করিতে পারেন নাই। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় এবং হিউমারের দীপ্তিতে তাঁহার বাক্যগুলা এক ধরধার বক্র অসির সহিতই তুল্য। তাঁহার মতের সঙ্গে সব জায়গায় মিলিল কি না-মিলিল সে-কথা আলাদা; তাঁহার লেখার ভঙ্গি এমনই অনবদ্য যে তাহা উপভোগ করিতেই হইবে।

মূল নাটকাংশে লেখক এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন,—পাশাপাশি গোপালদেবের যুগ এবং বর্ত্তমান যুগের দৃশ্য সংযোজিত করিয়া শেষের যুগে দুইটি দৃশ্য মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে দুই যুগের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালীর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুইই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুইটি যুগ আরও স্পষ্ট হইয়াছে সুবিবেচিত ঘটনা-সংস্থানে, উপযোগী পাত্রবৃন্দের সমাবেশে ও কথোপকথনের স্বাভাবিকতায়।

মাঝে মাঝে লেখক ফার্সের অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের মতে এটুকু না করিলেই যেন ভাল ছিল, কেননা ইহাতে শুদ্ধ ব্যঙ্গ-নাট্যের মর্য্যাদা না ক্ষুণ্ণ হইয়াই পারে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পল্লীর মেয়ে—শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরি, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়িতে সাহসের দরকার। উগ্র পাণ্ডিত্য কিংবা উগ্রতর আধুনিকতার দ্বারা পাঠককে মূর্খ ও গ্রাম্য প্রমাণ করিয়া দেওয়াই যেন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভয়ে ভয়ে উপন্যাসখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, লেখিকা গল্প লিখিতে বসিয়া গল্পই লিখিয়াছেন—একটি স্নিগ্ধ গল্প!

শুভা নামে একটি পল্লীর মেয়েকে অবলম্বন করিয়া কাহিনীটি লিখিত, নিখিলেশ নামে একটি অত্যাধুনিক যুবকের সঙ্গে বিবাহের; অনেক দুঃখ ও বিরহের অন্তে অবশেষে মিলনের।

ভাষা বিষয়ানুগ অর্থাৎ সরল স্বচ্ছ; জীবনযাপনের পক্ষে যেটুকু মনস্তত্ত্বের আবশ্যক তাহা আছে; চরিত্র বুঝিবার পক্ষে যেটুকু বিশ্লেষণ প্রয়োজন, তাহার অভাব নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

গ্রন্থাগার—কুমার শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। ডি. এম লাইব্রেরি, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা চ+২৮৫, মূল্য দুই টাকা।

জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারগুলির স্থান সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন হই নাই, সেই জন্যই আমাদের দেশে ভাল গ্রন্থাগারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এদেশে গ্রন্থাগারগুলি সাধারণতঃ পাঠকপাঠিকাগণের নাটক-নভেলের খোরাক জোগায়, অথচ সুগঠিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার জনসাধারণের শিক্ষার প্রকৃষ্টতম উপায়। পাশ্চাত্য দেশে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। সেখানে গ্রন্থাগারগুলি সত্যসত্যই দরিদ্র পাঠকের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিতেছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাই এখনও আবশ্যিক ও অবৈতনিক হয় নাই, সুতরাং এদেশে তো গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। দেশের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য কিছু দিন আগে গ্রন্থাগার-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সেই আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক ও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এদেশের ও বিদেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তিনি বিশেষজ্ঞের অধিকার লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে জাতীয় জীবন গঠনে গ্রন্থাগারের স্থান, গ্রন্থাগার কি ভাবে লোকশিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূর করিতে পারে, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডে, যুক্তরাষ্ট্রে ও রুশিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারগুলি কি ভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয়, কি ভাবে সেগুলি দেশের সেবা করে, সে সকল কথাও তিনি মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

মূর-সভ্যতা—আবদুল কাদের, বি-এ, প্রণীত। ৪৫।১ সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা হইতে মোস্‌লেম পাবলিশিং কন্‌সার্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখকের 'স্পেনের ইতিহাস' সমালোচনা করিবার সময়ে বলিয়াছিলাম যে, এইরূপ ধরণের পুস্তক প্রকাশের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে এবং তজ্জন্য আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পুস্তকের উপসংহার রূপে মূর সভ্যতা প্রকাশিত করিয়া লেখক দেশবাসীর আরও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অপূর্ব্ব সভ্যতার ইতিহাস জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে বিশেষ রেখাপাত করিবে। যখন সমগ্র ইউরোপ বর্ব্বরোচিত অজ্ঞতা ও অসভ্যজনোচিত আচার-ব্যবহারে নিমগ্ন, যখন কেবল কনষ্টান্টিনোপল ও ইতালীর কিয়দংশেই মার্জ্জিত রুচির কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইত, তখন আইবেরিয়া উপদ্বীপের বিধর্ম্মী মূরেরা তাহাদের প্রতিভালোকে নিখিল বিশ্ব আলোকিত করিত। খ্রীষ্টান জগতের সমুদয় নরপতির করসমষ্টি অপেক্ষাও বিভিন্ন আরব-ভূপতির আমলে স্পেনের রাজস্বের পরিমাণ অধিক ছিল; সৈন্যচালনা বাণিজ্য-দ্রব্য প্রেরণ ও দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য রাজধানী হইতে চারিদিকে উচ্চ পাকা রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতিথিশালা, পান্থশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি মূর-সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু ছিল। মূর-স্থাপত্য ইউরোপে একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল, মূরদের জ্ঞানসাধনা ইউরোপীয় দেশের অন্ধকার যুগে আলোকস্বরূপ ছিল, দর্শন-বিজ্ঞানে তাহাদের অনন্যসাধারণ উন্নতি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মূরেরাই ইউরোপে সর্ব্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিল। তাহাদের কৃষি-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত, তাহাদের শিল্প উন্নতিশীল এবং তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বহুদূরব্যাপী ছিল। তাহাদের শাসননীতি এবং সামাজিক জীবনও ইউরোপীয় জাতির শিক্ষাস্থানীয় হইয়াছিল। এক কথায় মূর-সভ্যতার প্রভাব ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। সুতরাং এই মূরজাতির ইতিহাস বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়।

মৌলবী আবদুল কাদের নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে মুর-সভ্যতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করিয়া বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার রচনা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 'স্পেনের ইতিহাস' অপেক্ষা এই গ্রন্থের ভাষা আরও সরল ও সাবলীল, এবং মুর-সভ্যতার তিনি যে গুরবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকের পক্ষে বিষয়টি বুঝিবার সহায়তা করিয়াছে। এই স্থলে একটি বিষয়ে আমরা লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বড়ই নির্মম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন; অবশ্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে কোমলতার স্থান নাই, কিন্তু বর্ণনায় তিনি বিদ্রূপবাণগুলি অতটা মর্ম্মান্তিক ধারালো না করিলেও পারিতেন। আর একটি বিষয়ে তিনি কিছু কার্পণ্য করিয়াছেন; দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষিগণের নিকট আরবদিগের ঋণ সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং সে ঋণ মাঝে মাঝে স্বীকার করিলে গ্রন্থের সৌষ্ঠব কোন অংশে লঘু হইত না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যাহা হউক, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসারে মুর-সভ্যতার দান লেখক যেরূপ মনোজ্ঞভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার—ডাক্তার শ্রীবিধুভূষণ পাল। প্রাপ্তিস্থান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা ও গ্রন্থকারের নিকট, ৩১।৩।১এ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

যক্ষ্মা যেরূপ ত্বরিত গতিতে দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে, ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে যত বেশী গ্রন্থ প্রচার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এই হাসপাতাল-চিকিৎসক-বহুল কলিকাতায় সন্তানসম্ভাবনা-বয়স্কা স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রোগে মৃত্যু পুরুষদের অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক। ৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বিধুবাবু এই রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যক্ষ্মা হাসপাতাল ও স্যানিটেরিয়মের তালিকায় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদে কর্তৃত্বাধীন মাণিকতলার যক্ষ্মা অন্তর্বিভাগের নাম উল্লেখ করিলে তালিকা পূর্ণাঙ্গ হইত।

আশা করি এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকেই উপকৃত হইবেন এবং রোগ বিস্তৃতি নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়া এই মারাত্মক রোগের প্রভাব হ্রাস করিবেন।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

পরাগতি—সামাজিক উপন্যাস। রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বসু, এম্-এ।

সংস্কারের নামে আধুনিক শিক্ষা ও বর্ত্তমান সমাজ যেভাবে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, "পরাগতি" সেই যুক্তিহীন প্রগতির চিত্র। বাংলার দুইটি বিভিন্ন সমাজকে পরিমাপ করিতে বসিয়া হয়ত লেখক ভ্রান্ত হইয়াছেন; তথাপি তাঁহার এই বিচিত্র বর্ণরাগোজ্জ্বল আলেখ্য কোথাও অঙ্গহীন হয় নাই। গ্রন্থোক্ত নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রে—যেখানে অভাব, অপূর্ণতা, ত্রুটি, সেখানে গ্রন্থকারের সদা-সচেতন দৃষ্টির ভ্রূকুটি। অথচ তাহাতে বিদ্রূপ-বিদ্বেষের বিন্দুমাত্রও পরিচয় নাই। সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও সহানুভূতি জানাইয়া, লেখক অনেকগুলি কঠোর সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়

গোলক ধাঁধা—(উপন্যাস) শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত। পৃষ্ঠা ২০৭। মূল্য দুই টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

একটি তরুণীর জীবনের স্বপ্নকে অবলম্বন ক'রে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। এই স্বপ্নের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে মেয়েটির কৈশোর থেকে উপন্যাসের সুরু। উচ্চশিক্ষা এবং আদর্শবাদী গুরু তার কাকার দীক্ষার অনুপ্রেরণার চিত্র সুন্দর ভাবে ভাবী পরিণতির ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছে। এই শিক্ষা এবং দীক্ষার প্রেরণায় মেয়েটি চলতে চাইলে সেবাধর্ম্মকে আশ্রয় করে মহত্তর কর্ম্মজীবনে বৃহত্তর জগতের পথে। কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভেই এল বাধা; তার কৈশোরের সখা, যৌবনের বন্ধু, কর্ম্মজীবনের সঙ্গী তিনটি পুরুষ এসে তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে অঞ্জলি ভরে ঢেলে দিলে তাদের প্রেম। এক দিকে সৃজনময়ী প্রকৃতির দাবি, অন্য দিকে মানব-সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ; এইখানেই স্বপ্নের সৃষ্টি। একটি কথা বলা প্রয়োজন, এই যে তিনটি পুরুষের প্রেম-নিবেদন—এর মধ্যে অপবিত্র বা কদর্য্যতার এতটুকু ইঙ্গিত নেই, অথচ সে নিবেদন স্বাভাবিক এবং বলিষ্ঠ। মেয়েটি তাদের ঘৃণাও করতে পারে নি, শুধু ব্যথিত হৃদয়ে সমস্ত ঠেলে জীবনপথে আপন আদর্শ-লক্ষ্যে অগ্রসর হ'তে চাইলে, ব্রহ্মচর্য্য হ'ল তার ব্রত। লেখিকার ভাষা ঝরঝরে, লিখবার শক্তিও তাঁর আছে। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটিও কল্যাণময় এবং বলিষ্ঠ।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহমুক্তি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির। মূল্য পাঁচ সিকা।

'মোহমুক্তি' একখানি উপন্যাস, গোঁড়া হিন্দুয়ানীর সমর্থনে লিখিত। বইয়ের প্রধান চরিত্র বালবিধবা অপরাজিতা। লেখক বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে,—এই চরিত্রটির পরিকল্পনা এবং চিত্রণে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বইখানিতে ঘন বন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী, ডাকাতের দল, এমন কি আধপোষা দুইটি আশ্রম-ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত আছে। এগুলি আজকাল অচল, কেন না জীবনের সঙ্গে এসবের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। তাই সংসারের মধ্যে থাকিয়া অপরাজিতা যতক্ষণ নিজের শক্তিতে সকল রকম বিরুদ্ধতার মধ্যে নিজের বৈধব্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততক্ষণ ভাল লাগিয়াছে। তাহার পর গল্পের ইন্টারেষ্ট নষ্ট হইয়াছে।

লেখক যে শক্তিমান তাহাতে সন্দেহ নাই; ভাবে, বর্ণনায় অনেক স্থলেই প্রচুর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরিকল্পনা এবং ভাষায় যে-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এখন চলিবে কিনা সেইটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্যই উপরের কথাগুলি বলিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—৫৭তম খণ্ড। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। "বিশ্বভারতী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই বৃহৎ অভিধানটির বিস্তারিত পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে কয়েক বার দেওয়া হইয়াছে। ইহা শান্তিনিকেতন-নিবাসী অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলন করিতেছেন। ইহার ৫৭ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। উহাতে "পাষণ্ড" শব্দ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অভিধানটির ১৮১২ পৃষ্ঠা এ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা বড়। প্রেস পরিবর্ত্তনের জন্য মধ্যে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এখন আর বিলম্ব হইতেছে না। ইহা সমুদয় শিক্ষালয়ের লাইব্রেরীতে ও অন্য সাধারণ লাইব্রেরীতে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য সহকারী সম্পাদকের ও লেখকের সহযোগিতায় প্রকাশিত। ২য় খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা। কলিকাতার ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট স্থিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র শীল দ্বারা প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

এই বাংলা এন্‌সাইক্লোপীডিয়াটির পরিচয় আগে কয়েক বার দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত "অদ্বৈতবাদ" সম্বন্ধীয় দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে। তাহার পর কয়েকটি ছোট প্রবন্ধের পর "অদ্বৈতাচার্য্য" সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং তাহার আট পৃষ্ঠা এই সংখ্যায় আছে।

রাজা রামমোহন রায়—তাঁহার জীবনী, সার্ব্বজনীন ধর্ম ও বিশ্বমানবতা (কবিবর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা ও কবিতা সহ)। শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্ এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক, ১৬ নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫+৬৪। ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দিরের ছবি পুস্তকটিতে আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে গ্রন্থকারের ষোলপৃষ্ঠাব্যাপী জীবনবৃত্তান্ত আছে। মূল্য আট আনা।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও গ্রন্থকারের রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ৪৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনাটি সুলিখিত। তাহার পর পরিশিষ্টে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর "রামমোহন রায়ের পারিবারিক তথ্য" ৫ পৃষ্ঠা এবং "আনন্দ বাজার পত্রিকার ১৩৪৩ সালের 'দোল'সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত" "রামমোহন রায় ও রাজারাম" ১১ পৃষ্ঠা, এই দুটি পরিশিষ্ট আছে।

পুস্তকখানিতে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। "মহাত্মা রামমোহন রায়ের সার্ব্বজনীন ধর্ম ও বিশ্বমানবতা" অধ্যায়টি বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে।

মূল পুস্তিকায় রামমোহন রায়ের বহু গুণাবলীর উল্লেখ ও প্রশংসা আছে। তন্মধ্যে, তাঁহাকে "বিশ্বমানবতার অগ্রদূত" বলা হইয়াছে। করুণানিধানবাবু স্বলিখিত ভূমিকায় তাঁহাকে "সাহিত্যে ও শিক্ষায়, ধর্মে ও সমাজে এক যুগপ্রবর্ত্তক" বলিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, রামমোহনের প্রদর্শিত পথ "ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে।" এইরূপ মত প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি রামমোহনের উচ্চতর প্রশংসাও করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনটি প্রধান বিষয়ে তিনি রামমোহনের নির্দ্দেশানুযায়ী পন্থার অনুসরণ করিতেন। অতএব রামমোহনের প্রশংসা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন ও অপরকে বিশ্বাস করাইতে চান, যে, রামমোহনের এক "প্রণয়িনী" ছিল এবং রাজারাম রামমোহনের ও তাহার পুত্র, তাঁহারাও তাঁহাকে আবার যুগপ্রবর্ত্তকও মনে করেন। বহু জাতির পুরাণে তাঁহাদের দেবতাদের অপকার্য্যের বৃত্তান্ত আছে, অথচ ঐ দেবতারা তাঁহাদের পূজ্য। অনেক দেশের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবতার ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের কোন কোন দুষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। কিন্তু রামমোহনের মত কোন সাধারণ মানুষ (যিনি দেবতা নহেন, অবতার নহেন, "প্রেরিত" পুরুষ নহেন, যিনি ঈশ্বরের আদেশ পান নাই ও পান বলিয়া কখন দাবী করেন নাই, যাঁহার কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল না, এরূপ কোন মানুষ) চারিত্রিক গুরুতর দোষ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মত বহু জাতির বহুভাষাভাষীর বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত প্রাচীন-সভ্যতা-বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রবণ কোন বৃহৎ দেশের ধর্ম্মে সমাজে শিক্ষায় রাষ্ট্রনীতিতে,...যুগপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি না, রামমোহনের সমালোচকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। ও-রকম সাধারণ মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রতিভা ও কৃতিত্ব দ্বারা যুগপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, চরিত্রহীন হইলে পারেন না। চারিত্রিক হীনতা সত্ত্বেও মানুষ কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে কৃতী হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, প্রভৃতি মানবজীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে "যুগপ্রবর্ত্তক" হইতে পারে কি? যিনি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টার জন্য এবং নারীদের অন্য কোন কোন দুর্দ্দশামোচনের চেষ্টার জন্য সম্মানিত, তিনিই স্ত্রীলোকের সহিত বহুবিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এরূপ আচরণ সত্ত্বেও যুগপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য।

ব্রজেন্দ্রবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে প্রবাসীতে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কথার উত্তরও প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সে সমুদয়ের খণ্ডন বা উল্লেখ তাঁহার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে করেন নাই। সান্যাল মহাশয়ও উভয় পক্ষের কথা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল ব্রজেন্দ্রবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমি একটি ছোট বহির পরিচয় প্রদান উপলক্ষ্যে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিতে চাই না। সাধারণ ভাবে আরও ২।১টি কথা মাত্র বলিব।

উপরে যাহা লিখিয়াছি এবং পরে যাহা লিখিতেছি, তাহা লিখিবার কারণ, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সকল মানুষেরই সুনাম তাঁহাদের অমূল্যসম্পত্তি। তদ্ভিন্ন, প্রসিদ্ধ মানুষদের সুনাম, তাঁহারা যে-জাতির মানুষ, সেই জাতির অমূল্য সম্পত্তি। তাহা সহজে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়।

ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহনের বহু প্রশংসনীয় কার্য্য ও আচরণ গবেষণা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন। ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি তাঁহার যে নিন্দা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবিতকালে কেবল ধর্ম্মবিষয়ক কলহ উপলক্ষ্যে তাঁহার হিন্দু বিপক্ষদের লেখায় স্থান পাইয়াছিল, তাঁহার জীবিতকালে কোন ঐতিহাসিক বা জীবনচরিত-বিষয়ক পুস্তকে স্থান পায় নাই। এই সব কলহে সত্য-নির্ণয় অপেক্ষা বিপক্ষকে হেয় করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী থাকে। এই জন্য কলহ উপলক্ষ্যে লিখিত নিন্দার বিশ্বাসযোগ্যতা কম। ইহার বিশ্বাসযোগ্যতা এই আর একটি কারণেও কম যে, রামমোহনের হিন্দু বিরোধীরা তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া থাকিলেও খ্রীষ্টিয়ান বিরোধীরা তাহা করেন নাই, বরং অনেকে তাঁহার চারিত্রিক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাস্তবিক দোষ থাকিলে মিশনরীরা ছাড়িয়া কথা কহিতেন না, নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যে "সমাচার দর্পণ"কে নিরপেক্ষ বলিয়াছেন, তাহার ১৮৩২ সালের ৩রা নবেম্বরের সংখ্যা হইতে তিনি "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"শ্রীযুত রামমোহন রায়। আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।"

রামমোহন কোন বিবিসাহেবকে বিবাহ করেন নাই। সুতরাং তদ্বিষয়ক গুজব মিথ্যা রটিত হইয়াছিল। অতএব উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফটিতে উল্লিখিত "উন্মত্ততাপূর্ব্বক" রটিত গুজবটা সমাচার দর্পণ যেমন "অমূলক ও অগ্রাহ্য" বলিয়াছেন, রামমোহনের "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা" "রাগপূর্ব্বক" যে সব গ্লানি রটনা করিয়াছিলেন তাহাও সেইরূপ অবিশ্বাস্য, সমাচার দর্পণে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে। এই মত ব্যক্ত হইয়াছে এরূপ লোকের দ্বারা যাঁহার রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ছিল।

রামমোহন তাঁহার ব্যক্তিগত চারিত্রিক কুৎসার প্রতিবাদ করেন নাই, অতএব তাহা সত্য, ইহা বলবৎ যুক্তি নহে। ব্যক্তিগত কোন কোন জঘন্য মিথ্যা নিন্দা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ হয় নাই, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কেহ কেহ তাঁহাদের কুৎসার প্রতিবাদ করা আত্মমর্য্যাদার হানিজনক (beneath their dignity) মনে করিতে পারেন। রামমোহন তাঁহার কুৎসার সাধারণ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কুৎসার অন্তর্নিহিত প্রশ্নের দিকটা উত্তর দিবার যোগ্য মনে করেন নাই—ইহা অসম্ভব নহে।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের ও রাজারামের এক একটি ছবি দিয়াছেন। তিনি এই দুটিতে যে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুমানের সমর্থক মনে করেন। সাদৃশ্যের বিচারের পূর্ব্বে অন্য কতকগুলি কথা বিচার্য্য।

রামমোহন রায়ের কয়েকটি ছবি দেখা গিয়াছে। কোনটিই ফোটোগ্রাফ নহে। কোন কোনটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। কোনটি যে ঠিক্ তাঁহার চেহারার মত, জানি না। রাজারামের ছবিও যে ঠিক্ তাঁহার চেহারার মত কি না, বলা যায় না। অতএব এই দুটি ছবি হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ছবি দুটি যদি ঠিক্ তাঁহাদের চেহারার মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আরও কিছু বিবেচ্য আছে। যথা—

বিস্তর পিতাপুত্র আছেন ও ছিলেন যাঁহাদের মধ্যে চেহারার মিল নাই, এবং এরূপ লোক অনেক আছে ও ছিল যাহাদের চেহারা প্রায় হুবহু এক অথচ যাহাদের মধ্যে কোন রক্তসম্পর্ক নাই। অল্পস্বল্প সাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইংলণ্ডে আজকাল অনিশ্চিতপিতৃত্ব শিশুদের পিতৃত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রক্তপরীক্ষার (Blood test এর) আলোচনা হইতেছে। চেহারার সাদৃশ্য নিশ্চিত প্রমাণ বা অনুমান-ভিত্তি নহে।

ব্রজেন্দ্রবাবু দুটি ছবির মধ্যে সাদৃশ্যই দেখিয়াছেন, অন্য অনেকে বৈসাদৃশ্য দেখিয়াছেন। যেমন. একটির নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, কতকটা শুকনাসিকার মত; অন্যটির নাসিকা স্থূলাগ্র; ইত্যাদি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমানগুলির একটিরও আলোচনা আমি করিলাম না। তাহা না করিয়াও সাধারণ ভাবেও আরও অনেক কথা বলিবার আছে। বাহুল্যভয়ে বলিলাম না। যাহা লিখিলাম তাহাও আলোচ্য পুস্তকের ক্ষুদ্রতার তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গীতাংশুক—শ্রীমমতা মিত্র প্রণীত এবং কলিকাতা, ২৭।১ কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, বিচিত্রা নিকেতন হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

গ্রন্থখানি একাত্তরটি গীতিকবিতার সমষ্টি। পুলক-অশ্রু-বিরহ মিলনে যাহা ব্যক্ত হইতে চায়, সেই কবিতাগুলি প্রীতির সুরে বাঁধা।

আমায় তুমি দেখতে পাবে
দোষে-গুণে এমনি ভাবে,
অন্ধকারের আবরণে
হৃদয় নাহি ঢাকব।

প্রকাশের বেদনায় তরুণ মন চঞ্চল। কাননে পবনে আলোকে নীলাকাশে এই চঞ্চলতার স্পন্দন।

রহি রহি আজি আমার পরাণ মাঝে
পুলক মধুর, আগমনী কার বাজে।

সার্থকতা-লাভে জীবন পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

মানসলোকে মিলিয়ে ছিলে—
রূপ ধ'রে আজ দেখা দিলে;
পরাণ হ'তে বাহির হয়ে
এলে পরাণ-প্রিয়।

ছন্দের সহজ প্রবাহ এবং প্রকাশের অকৃত্রিমতা কবিতাগুলিকে উপভোগ্য করিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমার বই—শ্রীশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'আমার বই', 'ইজি চেয়ার', 'রবিবার', 'বর্ষার দিনে', 'চিঠি লেখা' ইত্যাদি লঘু বিষয় লইয়া লঘুছন্দে এই লেখাগুলি রচিত; কিন্তু সেজন্য এগুলিকে লঘু বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। একটি বিশেষ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী ও সামান্য বিষয়কে রস-রচনায় পরিণত করিবার ক্ষমতার পরিচয় এই স্বগত উক্তিগুলির মধ্যে আছে। বাংলায় এই ধরণের রস-রচনা বেশী নাই; আধুনিক লেখক অনেকে এই জাতীয় রচনায় মন দিয়াছেন। এই বইটি তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্থানে স্থানে অতি-উক্তির ত্রুটিতে ও অসার্থক রসিকতায় রচনা সংহত রূপ গ্রহণ করিতে বাধা পাইয়াছে, এবং কোনও আধুনিক লেখকের বিশেষ ভঙ্গীর প্রভাব রচনাগুলির স্থানে স্থানে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ত্রুটিগুলি কাটাইয়া উঠিতে লেখকের যে বেশী বিলম্ব হইবে না, তাহার পরিচয়ও তাঁহার রচনায় আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রূপশিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর রূপশিল্প বইখানি পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

শরীরে যখন শক্তি থাকে যথেষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তখন যে কোনো একটা উপলক্ষ্যে এমন কি বিনা উপলক্ষ্যে একচোট ঘুরে আসতে ইচ্ছে হয়। মনের সম্বন্ধেও তাই। তার উদ্যমের সঞ্চয় পর্যাপ্তের চেয়ে বেশি থাকলে কারণে অকারণে কলম চালাবার জন্যে তাকে তাগাদা দিতে হয় না। আমার বর্তমান অবস্থায় তাগাদা দিয়েও ফল পাওয়া কঠিন হয়েছে তবু এইমাত্র পড়া শেষ ক'রেই উঠে পড়েছি উৎসাহের তাজা অবস্থায় কিছু একটা লিখে ফেলবার জন্যে। উৎসাহের কারণ আছে। চিত্রকলার স্বকীয় রহস্যটা যে কী তা আমি কখনো কখনো বোঝাতে ইচ্ছা করেছি কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। শিল্পরসিক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার এই অল্প কয়েকটি পাতায় সেই কথাটি বুঝিয়েছেন। তার ভাষা যেমন সহজ তেমনি সরস। এই রচনায় পাণ্ডিত্য বোঝা হয়ে উঠে লেখনীকে মন্থর ক'রে তোলে নি। বিষয়টা তর্কের নয় বোধের। সেই জন্যেই সহজ নয় তাকে সহজে বোঝানো।

সমস্ত রসসৃষ্টির আদর্শ যে তার নিজেরই মধ্যে, তার বাইরে নয় এ কথাটা অন্তত চিত্রকলায় সাধারণ লোকে সহজে মানতে চায় না। কোকিল-কণ্ঠের প্রশংসা অনেক শোনা গেছে কিন্তু কোকিলের কুহু কুহু ডাকের অবিকল অনুকরণেই যে কণ্ঠের সার্থকতা, অর্থাৎ হরবোলাই যে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ এমন কথা কেউ বলে না। মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝর ঝর বৃষ্টির অনুকরণ না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব-বিলাসী তাকে অবাস্তব ব'লে নিন্দে করে না। অথচ ছবির মধ্যে এমন একটা জীবের চেহারা চোখে পড়তে পারে প্রাণীবৃত্তান্তের কোনো বিশেষ জন্তুর সঙ্গে যা মেলে না, তার মধ্যে জন্তুত্বের প্রকাশ প্রবল হ'লেও সাধারণে ছবিটাকে অসত্য ব'লে অপবাদ দিয়ে বসে। গ্রন্থকার সেই রকম জন্তুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন প্রাণীবৃত্তান্তে ওটা অশ্রদ্ধেয় কিন্তু চিত্রকলায় ওটা সত্যই। অর্থাৎ ছবির প্রাণী আপন সত্যতা আপনার মধ্যেই নিয়ে আসে। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে তাকে সনাক্ত করবার সাক্ষী খুঁজতে হয় না। সাধারণ দর্শক ছবি দেখলেই জিজ্ঞাসা করে এর অর্থ কী? অর্থাৎ এটা হাতি, না ঘোড়া, বন না পাহাড়? ভুলে যায় অর্থকে খুঁজতে হয় ভাষায়, ছবিতে খুঁজি ছবিকেই। অর্থাৎ ছবির পাহাড়ে পাহাড়ের সাদৃশ্য যদিবা থাকে তবু সব ছাড়িয়ে তার মধ্যে একটি মুখ্য জিনিষ পাওয়া যায় যা কেবল মাত্র সেই ছবিরই নিজস্ব, যা চিত্রকরের একান্ত আপন তুলির। প্রকৃতির রাজ্য মায়ার খেলা। ইন্দ্রিয়বোধের দ্বার দিয়ে কল্পনাদৃষ্টির প্রাঙ্গণে তার ইন্দ্রজাল। সেই মায়াবিনী প্রকৃতির সঙ্গেই রসপিপাসু মানুষের কারবার। উদ্ভিদবিজ্ঞানী পদ্মকে সওয়াল জবাব ক'রে ক'রে যে তত্ত্ব আদায় করেন সেটা মায়ার আবরণ খসিয়ে দিয়ে, তাতে বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু পদ্মরূপেই যে পদ্মের চরম প্রকাশ, তাকে দেখেই রূপবিলাসী বলেন বাস্ আর কোনো অর্থ চাই নে ও নিজেতেই নিজে সার্থক। কোন্ মায়ার গুণে পদ্ম মনকে টানে চোখকে ভোলায় সে তত্ত্ব খুঁজে বের করবে এমন ল্যাবরেটরি নেই। তার স্বজাতীয় অন্যান্য ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য বিশ্লেষণ ক'রে পদ্মফুলের শ্রেণী নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কোঠায় বন্দী করার কাজ জ্ঞানের কাজ বোধের কাজ নয়। এই বোধের আমন্ত্রণ প্রকৃতির মায়ার মহলে, সেখানে ছবিতে দেখা দেয় তার অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বকীয় বিশেষ রূপ। সেই প্রকাশেই তার চরম অর্থ। সেই চরম অর্থ যদি তার কাছ থেকে পাই অর্থাৎ সে যদি মনের কাছে আপন একান্ত নিজকীয়তায় বিদ্যমান হয়ে ওঠে শিল্পকলার অভাবনীয় জাদুতে, সে যদি চিত্তদ্বারে আঘাত ক'রে বলতে পারে অয়মহংভো, তবে

তার কাছ থেকে তাকেই ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। কিন্তু আর কিছুর সন্ধানে আছে যার মন তার কানে এই ডাক পৌঁছয় না। অর্থের ধ্যানে নিবিষ্ট থেকে রসলোকের অতিথিকে সে ফিরিয়ে দেয়, যে অতিথি ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ আসে।

প্রকৃতির কারখানা ঘরে সমাপ্ত রূপের কীর্তি যত আছে তার চেয়ে অনেক আছে অপূর্ণ রূপের ইঙ্গিত। আছে তা মেঘের স্তরে, পাতার স্তবকে, জলের হিল্লোলে। তা ছাড়া সমাপ্ত সৃষ্টির থেকেও উপচে পড়চে ইঙ্গিত, সাপের ফণায়, পাখীর পেখমে, বলাকার উড়ে চলায়। ঐশ্বর্যের উদ্বৃত্ত ছড়াছড়ি যায় ভাণ্ডারের বাইরে। তারা উপেক্ষিত হয় সাধারণের দৃষ্টিতে। তাদের মধ্যে রেখায় বর্ণে ভঙ্গীতে রয়ে গেছে সৃষ্টির অর্থসঙ্কেত। এই সব অর্থ ধরা পড়ে রূপকারের চোখে। তিনি ইসারাগুলিকে নিয়ে বিধাতার সৃষ্টিক্ষেত্রে বানিয়ে তোলেন মানুষের সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যে সঙ্কেতের যোগ আছে তবু আছে প্রকাশের পার্থক্য। সেই অন্তরঙ্গ যোগের গুণে এই পার্থক্য সৃষ্টিছাড়া হ'তে পারে না।

মানুষের সকল উদ্ভাবনার মূলে তার কল্পনাবৃত্তি। সেই কল্পনার মধ্যে এই প্রেরণা রয়ে গেছে যে মানুষ নকল করবে না—রচনা করবে। লোমশ জন্তুর চামড়াতেই তার গাত্রবস্ত্র। তার বদলে নগ্নদেহ মানুষের আছে কল্পনা। আদিম অক্ষম অবস্থায় পশুর আস্ত চামড়া চুরি করেই মানুষ শীত বাঁচিয়েছে; তাকে বলা যায় পশুর হুবহু নকল। ঐ নকলে সৃষ্টিনিপুণ মানুষের সম্মান থাকে না। যত ক্ষণ না সে পশুলোম থেকে পশম, পশম থেকে শাল বানিয়েছে তত ক্ষণ যদি বা তার শীত নিবারণ হয়ে থাকে লজ্জা নিবারণ হয় নি। যে সকল কারিগর প্রকৃতির অবিকল নকল করে, তারা চুরি করে প্রকৃতির কাছ থেকে। এই চৌর্যনৈপুণ্য দেখেই যারা বাহবা দেয় তারা মানব-শিল্পের মর্যাদা বোঝে না।

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের শেষ ভাগে যে কথাটা বলেছেন সেটা প্রণিধানের যোগ্য। সেটা বুঝিয়ে বলা যাক। শিল্পের পরম মূল্য তার নিজের পূর্ণতাতেই। প্রয়োজনের দাম বিচার ক'রে তার দাম ধরা হয় না। কিন্তু মানুষ আদিকাল থেকেই চেষ্টা করেছে শিল্পকে আপন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ক'রে আপন জীবনযাত্রাকে সুন্দর ক'রে তুলতে। কেন না তার জীবনযাত্রার পথে পদে পদে আনন্দ আছে; আনন্দ তার পানে আহারে মৃগয়ায় রণজয়গৌরবে। এই আনন্দকে প্রকাশ করে সুন্দর, সুন্দরকে পরিস্ফুট করে শিল্প। জলের ঘড়া, রাঁধবার হাঁড়ি, পানপাত্র, অন্নের থালি, মৃগয়ার উপকরণ, যুদ্ধের অস্ত্র, ভ্রমণের রথ, বসবার আসন, শোবার খাট, গায়ের কাপড়, পায়ের জুতো এই সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের সামগ্রীতে মানুষ কেবল যে আপন প্রয়োজন সাধন করে তা নয়, আনন্দ প্রকাশ করে, যে আনন্দ অনির্বচনীয়। যে যুগে যে দেশে মানুষ জীবনের আনন্দকে জীবনের বিচিত্র ব্যবহারে প্রকাশ করতে আপনার কার্পণ্য বা অক্ষমতা প্রমাণ করে সে যুগের সে দেশের ধনমান প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু তার চিত্তদৈন্য শোচনীয়। এমন এক দিন ছিল যখন এদেশের সর্বত্রই জলভরণের ঘট ছিল রমণীয়; কিন্তু আজ যখন দেখি কেরোসিনের টিনে জল ভরে নিয়ে আসে এবং সেটা কারো চক্ষুশূল হয় না তখন বুঝি এ কালের মুনাফার থলি এবং বি. এ., এম. এ-র ডিগ্রির উপরে অলক্ষ্মী বাসা করেছে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে, সে হচ্চে গান। গ্রন্থকার গ্রন্থের আরম্ভভাগে এই প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য কিছু বলেছেন। আমারও কিছু বলবার আছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন "দশ-বারো শতকের প্রাচীন পারস্য দেশের নিত্যব্যবহারের পানপাত্রগুলি ঐ একই সুরে বাঁধা।" এখানে সুর শব্দের তিনি প্রয়োগ করেছেন অনির্বচনীয়তাকে বোঝাতে। সুর অনির্বচনীয়ের প্রধান বাহন। কিন্তু মানুষ কেবল যে ব্যবহার্য সামগ্রীর সঙ্গেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুল হয়ে চেয়েছে আপন সুখদুঃখ ভালোবাসার সহযোগে। অর্থাৎ যে সব শব্দ তার হৃদয়াবেগের সংবাদমাত্র দেয় শিল্পকলার দ্বারা তার মধ্যে সে অসীমের ব্যঞ্জনা আনতে চায়। আদিকাল থেকেই মানুষ তাই শব্দের সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে গান গেয়েছে। একথা মানি শব্দের নিজেরই একটা

শিল্প আছে, ছন্দ তার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ছন্দ তার একলার নয় গানেরও বটে। এ ছাড়া কাব্যের আছে বিশেষ ভাবে শব্দ যোজনা ও শব্দ বাছাই। তা হোক তবু দেখা গেছে মানুষ যেমন চেয়েছে কাব্যকে তেমনি চেয়েছে গানকে। জানি নে ইতিহাসে কবে মানুষের ভাষা এমন অনাথা ছিল যখন সুর তাকে অবজ্ঞা ক'রে তাকে পর ব'লে বর্জন করেছে। আমার তো মনে হয় এই সম্বন্ধের মধ্যে যেটুকু পরত্ব আছে তাতে পরকীয়া প্রীতি বাড়ে বই কমে না। প্রিয়জনকে একথা বলবার বেদনা মনে সহজেই জাগে, যে "ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে"। ভাষা যদি নিজেই স্বীকার করে বাক্যটাতে সবটা বলা হোলো না, সে অবস্থায় ভৈরবীর সঙ্গে সে মিতালি করলে ওস্তাদরা কি বলবেন অসবর্ণ মিলনে সঙ্গীতের জাত গেল? অপর পক্ষে নির্বাক ভৈরবী একটা এব্‌ষ্ট্রাক্ট আবেগ প্রকাশ করতে পারে কিন্তু ঠিক ঐ কাব্যের কথাটি বলতে গেলে সে বোবা। অথচ বলতে গেলে যেমন দরকার কথার তেমনি দরকার সুরেরও। তাহলে কি হুকুম হবে দরকারটাকেই সমূলে উচ্ছেদ করা চাই? মানুষ কি এ হুকুম মানবে?

প্রিয়া বল্‌চেন,

> চূড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
> সে রঙে আমার চুনরি রাঙিয়ে দিয়ো।

এ কাব্য। এর মধ্যে একটি হৃদয়াবেগ নিবিড় হয়ে আছে; কানাড়ার স্পর্শে সে উচ্ছলিত হয়ে উঠল, কিন্তু শুধুমাত্র কানাড়ার আলাপে এর বাণী থাকে বোবা হয়ে। বাণীর যোগে কানাড়া একটি বিশেষ রস পেয়েছে, তার দাম কম নয়। চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে—সুর বড়ো কি কথা বড়ো এ তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয় তাহলে আমি বলব এক্ষেত্রে সঙ্গীতই স্বামী—ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে। এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করেছে আনন্দের সঙ্গে। একটি পুরানো গান আছে "কাল আসিবে বলে গেল, কেন এলো না।" এ তো একটা সংবাদ মাত্র কিন্তু খাম্বাজ সুরের জিয়নকাঠি লাগবামাত্র সংবাদের নির্জীবতা থেকে শিল্পের প্রাণলোকে বাণীটি মাথা তুলে উঠল। এমনি ক'রেই পারসিক রূপকার নিত্যব্যবহারের জিনিষকে শিল্পের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। যাঁরা সুরে কথা মিলিয়ে দিয়ে গান রচনা করেন তাঁদেরও ঐ এক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে সঙ্গীতেরই সার্থকতা অগ্রগণ্য।

গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের আরম্ভেই পার্টিশনের মামলা তুলেছেন। তিনি ভাষা ও সুরের মধ্যে "বিবদমান বৈরীভাব" দেখতে পেয়েছেন। তা যদি সত্য হ'ত তাহলে সাহিত্যে কাব্যের স্থান থাকত না। কবিতায় আছে অগীত সঙ্গীত, তার সীমানায় যদি গীত সঙ্গীতের ব্যবধান অলঙ্ঘ্য হয় তাহলে তো স্বভাবতই গানের সৃষ্টি হ'তে পারে না। কোনো নারীর পায়ে চলার ভঙ্গী সুন্দর হ'তে পারে, কিন্তু যদি তার মন লাগে তা হ'লে সে কি তার সেই ভঙ্গীকে নৃত্যকলায় জাগিয়ে তুলতে পারে না? পায়ে চলার শিল্প যেমন নাচ, বাক্যের শিল্পরূপ তেমনি গান। অবশ্য আরো এক জাতের শিল্প আছে তাকে বলে কাব্য।

য়ুরোপের দেশবিশ্রুত সঙ্গীতশিল্পী গ্লুক্‌-এর (Gluck) অন্য পরিচয় না হোক তাঁর খ্যাতির পরিচয় হয়তো এদেশেও অনেকের কাছে অগোচর নয়। এইখানে তাঁর বচন উদ্ধৃত ক'রে দিই :—

My idea was that the relation of music to poetry was much the same as that of harmonious colouring and well-disposed light and shade to an accurate drawing which animates the figures without altering their outlines.

সঙ্গীতকলা বলো চিত্রকলা বলো, মূর্তিকলা বলো একান্ত স্বাতন্ত্র্যে আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা প্রকাশ করতেও পারে স্বীকার করি। সঙ্গীতে যেমন যন্ত্রবাদন আলাপ বা আধুনিক কালে যেমন বিষয়নিরপেক্ষ ছবি বা মূর্তি। কিন্তু আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থলে ভাষায় প্রকাশযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রেই তারা আপন গৌরব রক্ষা করেছে। বেটোফেন প্রভৃতি মহৎপ্রতিভাশালী গুণীদের রচিত একান্ত

সুর-আশ্রয়ী সিম্‌ফোনি-জাতীয় সঙ্গীত য়ুরোপীয় সংস্কৃতির নিত্যসম্পদ ব'লে সেখানকার সকল সমজদাররা কীর্তিত করে এসেছেন। অথচ তেমনি বাগ্‌নার প্রভৃতি গুণীদের রচিত সাহিত্যবিষয়সমাশ্রিত পার্সিফাল প্রভৃতি অপেরা পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রভূত সম্মান পেয়েছে। ঐ সঙ্গীত যা বলতে চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হ'তেই পারে না। ঐ সকল অপেরার সাহিত্য-বিষয়ও পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্যে সঙ্গীতের অপেক্ষা করেছে।

আমাদের দেশে সাহিত্যসঙ্গ-বর্জিত সঙ্গীত কণ্ঠের বা বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের আলাপে প্রকাশ পায়। বিখ্যাত গুণীদের রচিত সঙ্গীতের মহৎ রূপসৃষ্টি ব'লে তারা বিশেষ শিল্প আকারে রক্ষিত ও কালে কালে ঘোষিত হয়ে আসে নি। তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কণ্ঠে পরিবর্তিত ও বিকৃত হ'তে হ'তে যুগ-প্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরী আশ্রয় ক'রে। অনেক স্থলেই সে তরী সামান্য ডিঙি বা ভেলা। কাজ চালাবার জন্যে যাঁরা সে তরী বানিয়েছেন তাঁরা যদি সে তরীকে অকিঞ্চিৎকর না ক'রে শিল্পভূষিত করতে পারতেন তাহলে বাহনের উৎকর্ষে আরোহীর সম্মানের লাঘব হ'তই যে তা কেমন ক'রে বলব? তানসেন প্রভৃতির গানে সাহিত্যের উৎকর্ষ যে সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে তাও তো সত্য নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে সঙ্গীতের সেবকতায় বাক্যকে গৌণভাবে আশ্রয় করলেও বাক্য আপন ধর্ম সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না, তার অর্থের জীর্ণ চীরের মধ্য দিয়েও সাহিত্যের কুলশীল বেরিয়ে পড়ে। রাধিকা বলছেন, "লইরে মোরি শ্যাম এঁদোরিয়া, কৈসে ধরুঁ মেরে শিরো পর গাগরিয়া।" অর্থাৎ শ্যাম আমার কলসীর বিড়েটা সরিয়ে নিয়েছেন এখন আমি মাথার উপরে গাগরি ধরি কি ক'রে? যদি সঙ্গীত আদেশ করে এই জল আনার ব্যাঘাতের কথাটা একেবারে ভুলে যাও, কেবল মনে রাখো পূরবী রাগিণীর রূপ আমি বলব, আমি না পারি একে ভুলতে না পারি ওকে। আমার কানে বাজতে থাকে, ইথে মথুরা উথে গোকুল নগরী বীচে মিলে মোহে নন্দকো নন্দরিয়া,—এক দিকে রইল মথুরা আর এক দিকে গোকুল নগরী; মাঝখানে মিলল আমার সঙ্গে নন্দের নন্দন কিন্তু করি কী, সে যে আমার মাথার বিড়ে নিয়ে গেল আমি জল ভরতে যাই কি ক'রে।—কথা আর সুরের ফাঁকে ফাঁকে এই খবরটা ধরা পড়ল যে বিড়ের শোকটা ছলনা। গোপিনীর কর্তব্যের বিড়ে গেছে হারিয়ে, সে সাধ ক'রেই ধরা পড়েছে মথুরা আর বৃন্দাবনের মাঝখানটাতে। এ তো খাঁটি সাহিত্য আর এর সহচরী পূরবী তো খাঁটি সঙ্গীত—দুইয়ের একাত্মতা তো মনে নিবিড় ক'রে বাজছে, শাস্ত্র মেনে কি এদের জোড় ভেঙে দিতে হবে? পার্সিফাল অপেরার বুকে গানের ওস্তাদ যদি সার্জারির ছুরি চালাতে আসেন তাহলে সবাই মিলে দেবে তাকে পাগলা-গারদে চালান ক'রে।

নিরর্থক শব্দ আশ্রয় করে সঙ্গীত তেলেনা সারগম সৃষ্টি করেছে। গীতকলায় তাদের স্থান উচ্চ শ্রেণীর নয়। তানসেন প্রভৃতি গুণীদের রচনা সাহিত্যভাষা অবলম্বনেই আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে। সে ভাষা সাহিত্যের কোঠায় সব সময়ে উচ্চাসনের অধিকারী হয় না। তবু তাদের অভাবে রসের কিছু অভাব যদি ঘটত তাহলে সঙ্গীতে দেখা দিত তেলেনা-বর্গেরই আধিপত্য। বস্তুত অকিঞ্চিৎকর হ'লেও গানে সাহিত্য গৌণ নয়। সূর্যের আলো মেঘের স্তর পেলে বাষ্পপুঞ্জে আপন রং ফলিয়ে দেয়। অতি সামান্য বাক্যকেও রঙিয়ে তোলবার সুযোগ পায় গান। "গুরুজি কালো কম্বল আমাকে কিনে দাও," মুখের কথায় এটা তুচ্ছ। কিন্তু পরজ রাগে এটাকে টেনে তোলে বৈরাগ্যের ব্যাকুলতায়। কিন্তু এর জো নেই তোম তানানায়। সূর্যকিরণ যে তুচ্ছ মেঘের বাষ্পকেই মহিমা দেয় তা নয়, তাজমহলকেও ক'রে তোলে অপরূপ।

এই তো গেল এক দিকের কথা, এখন ছবির দিকে তাকাও। বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সঙ্গীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক ঐদিকে। কিন্তু ছবি যদি সাহিত্যবিষয়কে অবলম্বন ক'রেও আপন সতীত্ব রক্ষা করতে পারে সেও তো কম কথা নয়। বরবুদরের পাথরে খোদা জাতক-কাহিনী সাহিত্যেরই মূর্তিরূপ, এতে শিল্পকলার অমরতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। তেমনি মধ্যযুগের ইটালীয় চিত্রকরের তুলিকায় খৃষ্টকাহিনী যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে কলারসিক তাকে কি সাহিত্যিক বিষয় সংসর্গের অপবাদে জাত তুলে গাল দেবেন? প্রত্যেক কলার স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে ব'লেই পরস্পরকে আতিথ্য দেবার পথ তারা কৃপণের মতো অবরুদ্ধ ক'রে রাখে নি। এ নিয়ে দলাদলি করবার উত্তেজনা আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। ছাপাখানা চলতি হবার পূর্বে এক সময়ে গান গেয়েই কাব্য পড়া হ'ত। তেমনি ক'রেই মানুষ বরাবর কথার আশ্রয়েই সঙ্গীতকে চালনা ক'রে এসেছে।—আজকেই দেখি এ ক্ষেত্রেও কম্যুনালিজমের হাওয়া বইল। এই হাওয়ায় যে ধুলো ওড়ায় তাতে সত্য হয় আচ্ছন্ন।

মংপু
২৮।৫।৩৯

বুলগারিয়ার রাজধানী সোফিয়া। বুলগার জাতির উদ্ধারকর্ত্তা রাশিয়ার জার দ্বিতীয়-আলেকজাণ্ডারের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি।

সোফিয়ার রাজপথ। বামে প্রাচীন তুর্কী মস্‌জিদ।

রুমানিয়ার রাজধানী বুকারেস্টের বাজার
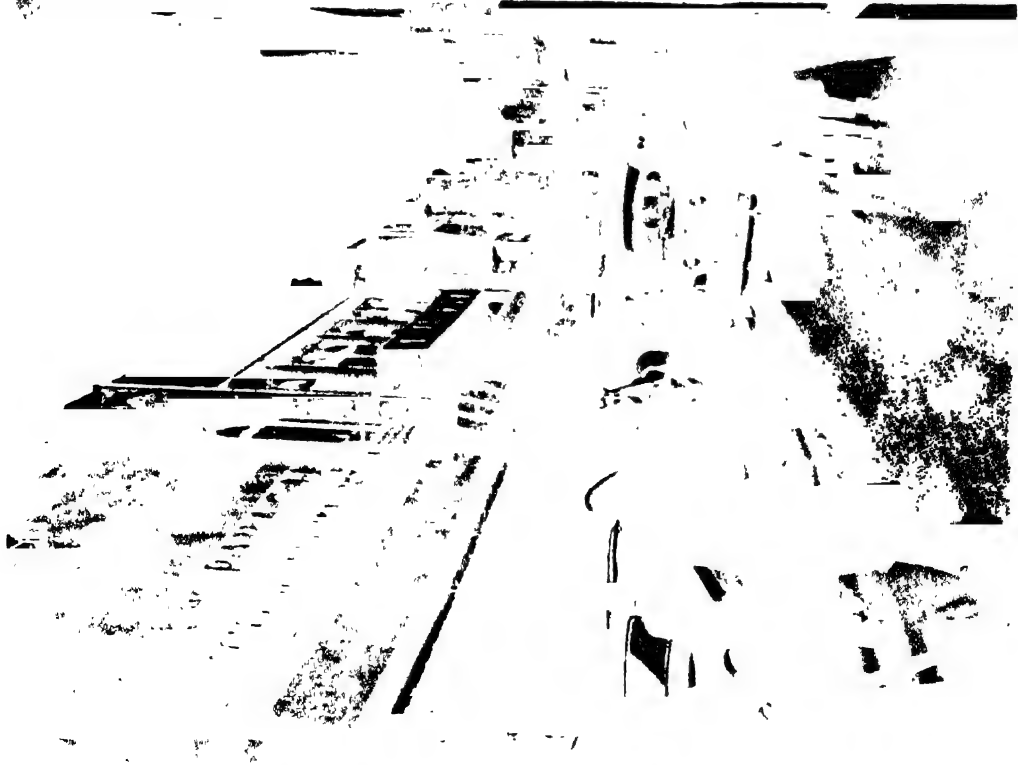
বুকারেস্টের আধুনিক পল্লী

বুডাপেস্টে হাঙ্গেরীয় রাজাদের অভিষেক-মন্দির
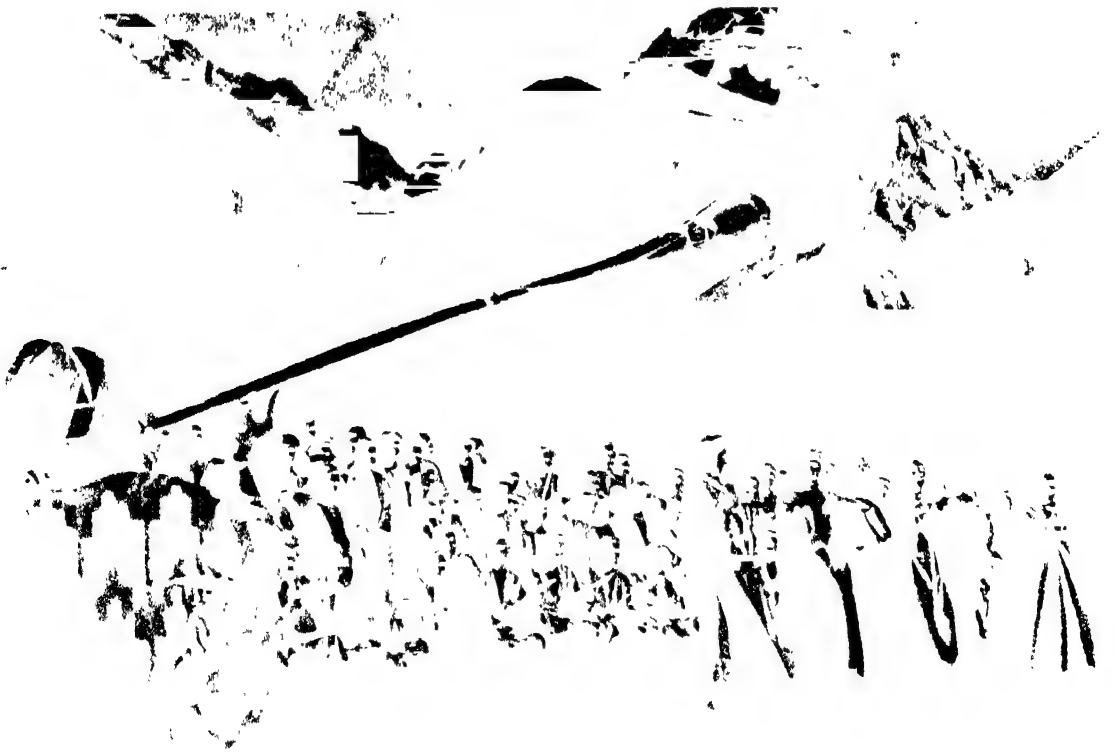
তাজাকিস্তানের লোক-নৃত্য ও উৎসব

ইন্দো-চীনে বুদ্ধ-উৎসব। সিংহল হইতে আনীত বোধিতরুর বন্দনা

ইন্দো-চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ

অভ্রখনির সন্ধানে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গত বৎসর আমার পিসতুতো ভাই প্রবীর মজুমদার তাঁহার জনৈক বন্ধুর প্রমুখাৎ খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত পাডু নামক স্থানের নিকটে অভ্রখনির কথা শুনিয়া একেবারে সরেজমিনে তদারক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। আষাঢ়ের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে মেজদা এবং আমি আমাদের অনুচর অমরদাস সহ ডাউকি-গামী মোটর ধরিলাম। বেলা আন্দাজ দশটা নাগাদ জৈন্তাপুরে নামিয়া স্থানীয় ডাকবাংলায় আশ্রয় লওয়া গেল।

স্নানাহারান্তে ডাকবাংলা হইতে আমি একলাই রওনা হইলাম আসাম প্রদেশের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য রূপনাথ গুহার উদ্দেশে। কাঁচা রাস্তা ধরিয়া মাইল দুই চলিয়া অবশেষে পাহাড়ে ঢুকিয়া জনবিরল বনপথ দিয়া একাকী অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে নয়নস্নিগ্ধকর বনভূমির শ্যামলিমা। বেলা তিনটা নাগাদ সওাইপুঞ্জীতে পৌঁছিলে পর একটি পাহাড়ী আমাকে 'মামা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া "টুমার কৈ যাই" বলিয়া আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। এই নবলব্ধ ভাগিনেয়টির পিতৃশ্যালকপদে অভিষিক্ত হইয়া গৌরব বোধ করিলাম না বটে, কিন্তু সে আমাকে সঙ্গে করিয়া রূপনাথ গুহায় লইয়া যাইতে রাজি হওয়ায় আশ্বস্ত হইলাম। আন্দাজ সিকি মাইল যাইবার পর বাঁ-দিকে এক দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলের ভিতরকার নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ, গলিতপত্রে সমাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গুহামুখে পৌঁছিয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। গুহাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অন্ধকারের অজানা রহস্য যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমার পথপ্রদর্শক তাহার হস্তস্থিত মশালটি জ্বালাইয়া লইলে পর আমরা উভয়ে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়া বায়ুহীন নিস্তব্ধ নীরন্ধ্র অন্ধকারাবৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম। মশালের ক্ষীণ আলোয় স্বল্পালোকিত দর্পণের মত স্বচ্ছ, গুহাছাদটির

জৈন্তাপুরের প্রাচীন শিবমন্দির

নৈসর্গিক কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কোন সুনিপুণ রূপকার যেন বহুযত্নে পাথর কুঁদিয়া ছাদটিকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। গুহামধ্যে বহুসংখ্যক মেটে রঙের মসৃণ সুদৃঢ় বিরাট্ পাষাণস্তম্ভ সারবন্দী ভাবে অবস্থিত। এ যেন পাতালপুরীর এক পরম রমণীয় বিশালায়তন রাজপ্রাসাদ। ইহারই কোন এক মণিদীপ-প্রদীপ্ত নিভৃত রহস্যকক্ষে মর্ম্মরপ্রস্তর-রচিত পালঙ্কে শয়ান প্রিয়প্রতীক্ষমানা পাতালপুরীর রাজকন্যার দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটিয়া যাওয়া বুঝি বিচিত্র নহে।

উপল-বিষম, বন্ধুর পথ বাহিয়া ক্রমারোহণ করিতে করিতে অবশেষে পদতলে আর্দ্র মৃত্তিকার স্পর্শ অনুভব করিলাম। গুহাপ্রাচীর-সংলগ্ন এক জায়গায় ভূগর্ভ হইতে অনবরত জল উঠিতেছে। এখান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করিতে করিতে আর একটি গুহা-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। জলকণাসিক্ত প্রস্তরখণ্ড-

ডাউকি নদীর উপরে ঝুলানো সেতু

গুলির উপর হামাগুড়ি দিয়া বহু আয়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখি মাথার উপর নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে অজস্র মণিমুক্তা জল্‌জল্‌ করিতেছে। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কবে না জানি কাহারা এই গুহা-প্রকোষ্ঠের ছাদটিকে মণিমুক্তায় খচিত করিয়াছিল। কিন্তু নাতিউচ্চ ছাদ স্পর্শ করিবা মাত্র যখন আমার আঙুলের ডগা জলে ভিজিয়া উঠিল, তখন আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। ভাল রূপে পরখ করিয়া দেখি উপরকার প্রস্তরচ্ছদ হইতে বাহির হওয়া অগণিত ছোট ছোট ফ্যাকড়াগুলিতে পাহাড়-চোয়ানো জলকণা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং মশালের আলোয় দ্যুতিমান হইয়া তাহা মণিমাণিক্যের বিভ্রম জন্মাইতেছে। এই স্থান হইতে মশালচী আমাকে নিবিড়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ এক গহ্বরের ভিতর দিয়া লইয়া চলিল, চারি দিকে শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি চলে না। পাতালপুরীর নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শনজনিত বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া এবার নিদারুণ আতঙ্কে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। খানিক ক্ষণ পরে সম্মুখের দিকে প্রায় দুই শত গজ ব্যবধানে বহু ঊর্দ্ধে মৃদু আলোকিত একটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দৃষ্টিগোচর হইল। ছিদ্রপথটির নাম "স্বর্গদ্বার"। বাস্তবিকই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্ছুরিত শুভ্র অমলিন জ্যোতিকণা গুহারন্ধ্র-পথকে দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম স্বর্গদ্বার দিয়াই এই পাতালপুরী হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক আমাকে ভিন্ন পথে লইয়া চলিল। একটু পরেই যে-পথে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা নজরে পড়িল। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজির পত্রাবরণ ভেদ করিয়া রৌদ্রধারা গুহামুখে পড়িয়া চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। পাতালগহ্বর হইতে সূর্য্যালোকিত পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিলে বকশিশ লইয়া খাসিয়াটি চলিয়া গেল। আমি জৈন্তাপুরের পথে রওনা হইলাম।

পর দিন বেলা দুইটা নাগাদ মোটরযোগে ডাউকিতে পৌছান গেল। এখান হইতে আমাদিগকে গিরি-অভিযান সুরু করিতে হইবে। পথের সন্ধান জানা নাই; স্থানীয় খাসিয়াদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ডান দিকে একটা চড়াই দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, ঐ রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলে সখাপুঞ্জীতে পৌছানো যাইবে। সেখানে এক জন 'পস্তর' (খাসিয়া পাদরী) আছেন। তাঁহার নিকটেই নাকি অভ্রখনি সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং খাসিয়াদের নির্দ্দেশিত পথেই রওনা হওয়া গেল। দলে দলে বিচিত্র পোষাক-পরা খাসিয়ানীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে লইয়া হাস্যে গল্পে নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য পথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে ডাউকির হাটে বেসাতি করিতে। চলিতে চলিতে যখনই গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠে, তখনই কোনও খাসিয়ানীর নিকট গিয়া বলি, "আই ইয়াক্তি তম্পেউ বাড্‌ কোয়াই খণ্ডিয়াং" (আমাদিগকে কিছু পানসুপারি দাও)। খাসিয়ানী পিঠের বোঝা হইতে পান আর কোমরে ঝুলানো ঝোলাটা হইতে আস্ত আস্ত কাঁচা সুপারি বাহির করিয়া হাসির ঝরণা ঝরাইয়া বলে, "সিম নো, বাম" (ধর, খাও)। চড়াইটির শীর্ষদেশে পৌছিয়া একটি শিলাপট্টের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইটি এত বিশাল যে, পাঁচ-ছয় জন ইহার উপর শুইয়া পড়িলেও স্থানের অকুলান হইবে না। নিম্নাভিমুখে তাকাইবা মাত্র বিচিত্র এবং অভিনব দৃশ্যপট

চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। চক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত সমতলভূমিতে কোথাও হরিৎবর্ণ সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, কোথাও শষ্পাবৃত প্রান্তর; আবার কোথাও বা শ্যামায়মান বনভূমির অনন্ত প্রসার। স্থানে স্থানে আঁকাবাঁকা নদী-খাল-বিলের জলরেখা প্রখরোজ্জ্বল রৌদ্রকরে রূপার পাতের মত চক্‌চক্‌ করিতেছে। কাননকুন্তলা বসুমতীর শ্যামল অঙ্গ যেন রজত আভরণে বিভূষিত।

প্রাণ ভরিয়া বহু ক্ষণ সমতলের দৃশ্য উপভোগ করিয়া পুনরায় আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইবার পর পিছনে বামাকণ্ঠে 'মামা' ডাক শুনিয়া থামিতে হইল। একটু পরে এক খাসিয়া যুবতী ত্বরিতপদে আমাদের নিকটে আসিয়াই একখানা রুমাল আমার হাতে দিয়া বলিল যে, শিলাখণ্ডটির উপর এই রুমালটি সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। খাসিয়া ভাষাটা অল্পস্বল্প জানা থাকায় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিলাম। সে গল্প করিতে করিতে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিল। জন-মানবশূন্য ছায়াঘন আরণ্যভূমিতে এই হাস্যময়ী তরুণীর আকস্মিক অভ্যাগম আমার নিকট যেন পরম রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। এই রহস্যময়ীর নির্দ্দেশেই যেন কোন্ অনাবিষ্কৃত স্থানে প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে দুর্জ্জেয় পথে আমাদের এই অভিযান। মনে পড়িল লংফেলোর কবিতার কয়েকটি পংক্তি :—

"Come, wander with me" she said
"Into the regions yet untrod
And read what is still unread
In the manuscripts of God."

অরণ্যে প্রদোষান্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন ডান দিকের একটি সুঁড়িপথ ধরিয়া বরাবর সখাপুঞ্জীতে চলিয়া যাইবার পরামর্শ আমাদিগকে দিয়া এই ভয়লেশহীনা নিঃসঙ্গ বনচারিণী গিরিনন্দিনী নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক খাসিয়া-বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহস্বামিনী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া 'পস্তরে'র বাড়ীতে লইয়া গেল। খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করার পর আহারের ডাক পড়িল। পরিবেশিকাটি যেন মূর্ত্তিমতী অপরিচ্ছন্নতা।

ভুবনছড়ার উপর জৈন্তাপুরের খাসিয়া রাজাদের আমলে প্রস্তুত পাথরের সেতু।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পাডুর পথে রওনা হইলাম। সহসা গুরু গুরু রবে গিরিশৃঙ্গে মেঘের মাদল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই ঝমাঝম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া এক খাসিয়া-বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বাড়ীতে বাঁশের মাচার উপর তৈরি বুনো ঘাসে ছাওয়া একটিমাত্র ছোট দোচালা ঘর। তাহাতে দরজা-জানালা ইত্যাদির বালাই নাই। শুধু দুই দিকে দুইটি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ প্রবেশ ও নির্গমন পথ। সেই প্রায়ান্ধকার গৃহের সামনের কক্ষটিতে গনগনে আগুনের চারি পাশে দশ-বার জন বিরলবসন পাহাড়ী জটলা করিয়া বসিয়া মদ খাইতেছে। পিছন দিক্‌কার কক্ষে একটি স্ত্রীলোক রন্ধনকার্য্যে রত।

বৃষ্টি ধরিবামাত্র পুনরায় রওয়ানা হইলাম। আন্দাজ সিকি মাইল চলিয়া একটি উৎরাইয়ের মাথায় পৌছিয়া নীচের দিকে তাকাইবা মাত্র মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর বিছানো উৎরাই-পথ একদম খাড়াভাবে যেন অতলে নামিয়া গিয়াছে। বারিধারা-নিষিক্ত পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ডসমূহের উপর দিয়া অত্যন্ত

সন্তর্পণে চলিয়া আমরা পর্ব্বতাবরোহণ করিতে লাগিলাম। উৎরাইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করিবার পর ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে রোদের ঝিকিমিকি দেখা দিল। উৎরাইটির শীর্ষদেশে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূরাগত একটা তুমুল গর্জ্জন আমাদের কানে পৌছিয়াছিল। যতই আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম, সেই গর্জ্জনধ্বনি উত্তরোত্তর ততই প্রবর্দ্ধমান হইতে লাগিল। উৎরাইয়ের নিম্নতম স্থানে পৌছিয়া দেখি উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ আকাশচুম্বী পাহাড়ের পাষাণ-বক্ষ বিদারণ করিয়া এক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী বহু নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক দুই ধারের শিলাময় তীরভূমির মাঝখান দিয়া দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা যেখানে নামিয়াছি, সেখানে এক বিরাট্ বনস্পতি নদীর এপার-ওপার গুটিকতক সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ শিকড় চালাইয়া দিয়াছে। পাহাড়ীরা এই শিকড়গুচ্ছের উপর একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করিয়াছে। প্রকৃতি-মাতার এই সহায়তাটুকু না পাইলে পাহাড়ীদের পক্ষে এই নদী পারাপার করা কস্মিনকালেও সম্ভবপর হইত না।

সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যরাশি দুই চক্ষু ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। মাথার উপর আমাদের শাখায়িত বনস্পতির পল্লবঘন শ্যাম উত্তরচ্ছদ, নিম্নে গর্জ্জমান তটিনীর ফেনিলোচ্ছল অপ্রতিহত জলপ্রবাহ। বৃক্ষমূলসমেত বাঁশের সাঁকো প্রবল স্রোতোবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চতুষ্পার্শ্বে বর্ষাপুষ্ট সবুজ সতেজ শাল, শিরীষ ইত্যাদি মহীরুহে সমাচ্ছন্ন নির্ঝরস্বনিত পর্ব্বতশ্রেণী সুদৃঢ় প্রাকারের মত দৃষ্টিসীমা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে হয় যেন পৃথিবীটা এই পাহাড়ের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যেই সীমায়িত। বর্ষণস্নাত শ্যাম বৃক্ষপল্লব সদ্য-উন্মেষিত অরুণালোকে মখমলের মত ঝলমল করিতেছে। গিরিগাত্রস্থ শ্যামল কান্তার অগণিত ঝিল্লীরবে নিনাদিত। স্রোতস্বিনী এবং নির্ঝরসমূহের বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে ঝিল্লীকণ্ঠের সংমিশ্রণে এক প্রকার সুমধুর ধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অনুপম পার্ব্বত্য দৃশ্যে একেবারে অভিভূত হইয়া [illegible] সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম, তার পর সাঁকোটি পার হইয়া এক উত্তুঙ্গ চড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। চড়াইটি অতিক্রম করিয়া চার-পাঁচ মাইল হাঁটিয়া বুডেং নামক এক গ্রামে পৌছিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় পাডুযাত্রী এক খাসিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গ লইল।

খানিক বিশ্রামান্তে আমরা পুনরায় পথ চলা আরম্ভ করিলাম। বনানীমণ্ডিত পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করিয়া এখন আমরা বৃক্ষলতাহীন সমতল গিরিতটের উপর দিয়া চলিতেছি। এই দিগন্তবিসর্পিত মালভূমির অতি দূর প্রান্তস্থিত, দিগ্বলয়-ঘেঁষা ক্রমসূক্ষ্মায়মান একটি পাহাড়ের মাথার উপরকার আকাশে দ্বিতীয়ার এক ফালি বাঁকা চাঁদ উদীয়মান। তারাভরা অবারিত আকাশের নীচে বিরাট্ অধিত্যকা জুড়িয়া গভীর মৌন প্রশান্তি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা নাগাদ পাডুতে পৌছিয়া এক বাঙালী ডাক্তার বাবুর আস্তানায় গিয়া উঠিলাম। সেখানে আরও দুই জন নবাগত বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হইল। ইহারা মৈমনসিংহের নিম্নশ্রেণীর লোক, জীবিকার সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যেই এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে আসিয়াছে।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকাইয়া আমরা তিন জন একটি খাসিয়াকে সঙ্গে করিয়া অভ্রখনির সন্ধানে রওনা হইলাম। মাইল তিনেক চলিয়া বাঁ-দিক্‌কার একটা সুঁড়ি পথ ধরিয়া নীচে নামিতে নামিতে অবশেষে পাহাড়ের ঢালুতে আসিয়া থামিলাম। বনপ্রান্ত দিয়া একটি অনতি-গভীর গিরি-নদী বহিয়া যাইতেছে। স্বল্পতোয়া নদীটির গর্ভে অভ্রের চাংড়া, নিকটেই কালোমত একটা উঁচু অভ্রের ঢিবি। অভ্রের খনি কোথায় সে-সম্বন্ধে আমাদের পথ-প্রদর্শকের নিকট হইতে কোন হদিস পাওয়া গেল না। এক জন সঙ্গী মহা উৎসাহে নদীগর্ভ হইতে অভ্র সংগ্রহ করিতে লাগিল।

দুর্গম রাস্তাটা বেলাবেলি পার হওয়া দরকার, সুতরাং ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গী আন্দাজ আধ মণ অভ্র নিজেই পিঠে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিল। পথশ্রমে সে অতিশয় ক্লান্ত, তথাপি অভ্রের বোঝা ত্যাগ করিবে না। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সামনে একটা

মস্তবড় খাড়াই। কিছু দূর উঠিয়াই বেগতিক দেখিয়া সে অভ্রখণ্ডগুলি ফেলিয়া দিল। চড়াইটির মাথায় পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাহার অভ্রশোক একেবারে অভ্রভেদী হইয়া উঠিল।

দুর্গম রাস্তা পার হইয়া এখন অন্ধকারাবৃত বনবীথিকার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। মাথার উপরকার ঘন পত্রাচ্ছাদন তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। অকস্মাৎ পথের উভয় পার্শ্বে এক বিচিত্র দ্যুতিমণ্ডিত দৃশ্য দেখিলাম। বনভূমিতে আলো-আঁধারির এ কি অপরূপ মায়া। দুই ধারে বনঝোপের ডালে ডালে লতায় পাতায় কোন্ মায়াবী যেন অগণিত মায়া-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। নিস্তব্ধ নিষুপ্ত নিশীথে নিবিড় কান্তারে আজ যেন দীপালি-উৎসবের দীপ্ত সমারোহ। জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা ডাল ভাঙিয়া দেখি, আমার হস্তস্থিত প্রশাখাটি হইতে শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

রূপনাথের পথে তরুবীথিকা

গভীর রাত্রে আস্তানায় পৌছিয়া আমরা গল্পগুজবে মাতিয়া উঠিলাম। শুধু আমার সেই সঙ্গী মনের দুঃখে এক ধারে পড়িয়া রহিল—আধ মণ অভ্রের শোক বেচারা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৩।৯৪ সালে। তাঁহার সৌজন্য, বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা, তাঁহার জ্ঞানের প্রসার—এ সকলই আমাকে প্রথম হইতেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। সে সময় কর্ণেলগঞ্জে একটি বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা ছিল। আমরা সকলে উহার সভ্য ছিলাম ও কর্ণেলগঞ্জের পুস্তকালয়ের পরিচালনার ভারও ঐ সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। সভার প্রায় অধিবেশনেই জ্ঞানবাবু কোন নূতন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার রচনা সর্ব্বদা চিত্তাকর্ষক হইত। ১৮৯৫ সালে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিও

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

আমাদের উক্ত সভায় যোগ দিতেন। সেই সময় জ্ঞানবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

যখন জ্ঞানবাবু 'চকের' জন্য আমাদের উপযোগী একটা পুস্তকালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন, রামানন্দবাবু ও মেজর বামনদাস বসু তাঁহাকে এ-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। ঐ পুস্তকালয় জ্ঞানবাবুর একান্ত চেষ্টার ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। যত দিন জ্ঞানবাবু এলাহাবাদে ছিলেন উহা ভাল রূপেই চলিত, এখনও আছে কিন্তু উহার অবস্থার বিষয় কিছু বলিতে পারি না।

সে সময় জ্ঞানবাবু ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিস-এর আঁপিসে কাজ করিতেন ও ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল-এর ক্যাম্প ক্লার্ক (দৌড়ার বাবু) ছিলেন। শীতকালে তাঁহাকে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে হইত, আবার গ্রীষ্মকালে নৈনিতালেও থাকিতে হইত। শত শত নথি তাঁহাকে পড়িতে হইত, চুম্বক করিতে হইত ও তদুপরি তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে হইত। এত কাজের চাপে জ্ঞানবাবু কখন্ সাহিত্যচর্চ্চার সময় পাইতেন বুঝিতে পারিতাম না, আশ্চর্য্য হইতাম। মাঝে মাঝে এলাহাবাদে আসিলে আমাদের সহিত রবিবাবুর 'কড়ি ও কোমল,' 'চিত্রাঙ্গদা', তাঁহার নবপ্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী', নবীন বাবুর 'রৈবতক' ও 'অমিতাভ', বড়াল কবির কবিতা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠে কড়া' (রবিবাবুর 'কড়ি ও কোমলে'র বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ), সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' লইয়া আলোচনা হইত। তাঁহার মতামত শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক থাকিতাম, কারণ উহাতে সর্ব্বদাই কিছু মৌলিকতার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইতাম।

এলাহাবাদ হইতে রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী' বাহির হইলে জ্ঞানবাবু উহাতে প্রায় লিখিতেন। এই সময় তিনি তাঁহার 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'র উপাদান-সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহার এই অক্ষয়-কীর্ত্তি গ্রন্থের মালমশলা জোগাড় করিতেন। এ কাজে

তিনি যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৯১০ সালের কিছু কাল পরেই তিনি প্রায় ৪০ বৎসর (?) বয়সে পুলিসের চাকুরী হইতে অবসর লইয়া তাঁহার আগড়পাড়ার বাটীতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সেবার জন্য তিনি দারিদ্র্যকে সাদরে আলিঙ্গন করেন। নতুবা কর্ম্মে থাকিলে তাঁহার মত দক্ষ লোক কালে আপিসের হেড অ্যাসিস্টেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে পারিতেন।

'ঋদ্ধি', 'চরিত্রগঠন' স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্‌-এর ধারায় লিখিত পুস্তকগুলি দ্বারা জ্ঞানবাবু বাঙালী বালক ও যুবকদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। এ বৃদ্ধ বয়সেও সেগুলি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়াইবার সময় আমার হৃদয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় নাচিয়া উঠে।

১৯০৮।৯ সালে জ্ঞানবাবু 'মেঘনাদবধ'-এর আদর্শ সংস্করণ বাহির করিতেছিলেন। তুলনামূলক বাক্যাংশ (parallel passages) খুঁজিবার জন্য এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরিতে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, পেত্রার্ক ইত্যাদির অনুবাদ পাঠ করিতেন। উহা কিছু ব্যাকরণ-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয় প্রকাশকদের ইচ্ছায়; কারণ তাঁহারা উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অমূল্য সংস্করণ হইতে অনঙ্গীকৃত রত্ন আহরণ করিয়া অনেকেই সস্তায় নাম কিনিয়াছেন। উঁহার অভিধান হইতেও অনেকে ঐরূপে বহু পয়সা ও কিছু প্রশংসা উপার্জ্জন করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সংস্করণে আমি তাঁহাকে ব্যাকরণ-ভাগটা একেবারে বাদ দিতে ও মূল অংশ (text)-টা আরও বড় অক্ষরে ছাপাইতে বলিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ, দ্বিতীয় সংস্করণের গোটা-কয়েক ফর্ম্মার অধিক আর ছাপা হয় নাই। প্রধান কারণ, বোধ হয় বাঙালী পাঠকদের অবহেলা। প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। কোন্‌ প্রকাশকের উদ্যম, উৎসাহ ও সঙ্কল্প এ অবস্থায় অচঞ্চল থাকিতে পারে? জ্ঞানবাবুর হস্তলিখিত পুঁথি আমার মনে হয় পুরা তৈয়ারী ছিল।

ইহার পর ১৯১৩ বা তাহার কাছাকাছি জ্ঞানবাবু বাংলা ভাষার অভিধানের মালমশলা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। বাংলা ভাষা লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইত,—তাঁহার পুস্তক পূর্ব্বের বাংলা অভিধান-লেখক রামকমল বিদ্যারত্ন ইত্যাদির অভিধানের মত হইবে, না, ভাষার কথিত ও লিখিত সকল শব্দ উহাতে স্থান পাইবে। অবশেষে শেষের ব্যবস্থাই স্থির হইল।

জ্ঞানবাবু একলা এত বড় অভিধানের শব্দাবলী, উদাহরণ, ভাবার্থ, সংজ্ঞা সংগ্রহ করেন। তাঁহার বিদুষী ভগ্নী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী ও এক জন ত্রিশ টাকার পণ্ডিত তাঁহাকে সাহায্য করেন; দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় তিনি এ সাহায্যও পান নাই। এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা ডাঃ স্যামুয়েল জন্‌সনের সহিত হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মনে, অবিশ্রান্ত দেহে তিনি অভিধানের কাজ করিয়াছেন। কয় জন জানে কত নিরুৎসাহ, কত বাধা-বিঘ্ন, কত অবসাদের মধ্যে তিনি তাঁহার মহান্‌ শব্দকোষ শেষ করিয়াছেন। লর্ড চেষ্টারফীল্ডকে জন্‌সন্‌ তাঁহার সুবিদিত পত্রে কষাঘাত করিয়া যে লিখিয়াছিলেন—

> "Seven years, My Lord, have now past since I waited in your outward rooms, or was repulsed from your door : during which time I have been pushing my work through difficulties, of which it is useless to complain, and have brought it at last to the verge of publication, without one act of assistance, one word of encouragement or one smile of favour."

তাহা জ্ঞানবাবুর সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। তাঁহার প্রকাশকদের সাহায্য ও উৎসাহ ছাড়া বাংলা দেশে তিনি বিশেষ কোন সহায়তা বা উৎসাহ পান নাই। বাংলা ভাষায় কোন অভিধান বিশেষ ছিল না, যাহা ছিল তাহা সংস্কৃত অভিধান বলিলেও চলে, জ্ঞানবাবুর অভিধানই যথার্থ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান। যত দিন না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফর্ড ইউনিভার্সিটি অক্সফর্ড ডিক্শনরীর মত বাংলা ভাষায় অভিধান প্রকাশিত করেন সে পর্য্যন্ত উহাই প্রধান ও প্রমাণসিদ্ধ কোষ বিবেচিত হইবে।

১৯২৮।২৯ (?) সালে ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য ইংরেজী হিন্দী কোষ সম্পাদন করিবার জন্য পুনরায় তাঁহাকে এলাহাবাদে থাকিতে হয়। উহার কার্য্য শেষ করিয়া উক্ত প্রেসের জন্য তিনি কতকগুলা বাংলা পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সেই সময় বিরামহীন কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে ও তিনি বহুমূত্র রোগে পীড়িত হন। এই রোগ ক্রমশঃ তাঁহার অটুট স্বাস্থ্যকে ক্ষয় করিয়া দেয়। অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সময় তিনি ভগ্নশরীর লইয়া যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতেন, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম।

এক বিষয়ে জ্ঞানবাবুর বড় মন্দ ভাগ্য ছিল। তাঁহার পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া কত লোকে বাহবা কিনিল, কত অর্থই না উপার্জ্জন করিল, আর তিনি আজীবন কষ্টেই কাটাইলেন। কিন্তু কখনও তাঁহাকে আমি সে-বিষয়ে দুঃখ করিতে দেখি নাই। তিনি বড় নিঃস্পৃহ পুরুষ ছিলেন, অল্পেই সন্তুষ্ট। তিনি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন,

"সন্তোষ এব পুরুষস্য পরং নিধানম্"

আমি তাঁহাকে কখনও রাগান্বিত হইতে দেখি নাই। তাঁহার সদা-হাসিমুখ এখনও আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

এলাহাবাদ — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন—ইহা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই মর্ম্মন্তুদ। তাঁহার মত লেখক, ভাবুক ও প্রবাসী বাঙ্গালীর আপন-জন বুঝি বা আর হইবে না।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—এমন কথা বলিলাম কেন, তাহাই খুলিয়া বলিব। তাঁহার বহুবৎসরব্যাপী সাধনার ফল নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' তাঁহার অতুল কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই; বাঙ্গালীর কাছে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম খ্যাতিমান্ [illegible] 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'। "প্রবাসী বাঙ্গালী" আজ বাঙ্গালীর সমাজে ও সাহিত্যে, ঘরে ও বাহিরে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন" ও প্রবাসের বহু সাহিত্য সভা ও সমিতি ইহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এ সকলের প্রবৃত্তি ও অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল কোথা হইতে? 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' হইতে নয় কি? প্রবাসী বাঙ্গালীর জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাঁহার প্রতিভার সমাদর কত দূর করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাই নাই।

তিনি কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, হৈ-চৈ ছিল না। তিনি সভাসমিতির পীঠস্থানে সহস্রচক্ষুর লক্ষ্যীভূত হইতে চাহিতেন না। কোন এক উপলক্ষ্যে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া লেখাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "হৈ-চৈ-বর্জ্জন নীতিই আমার অবলম্ব্য। সমাজবদ্ধ অনেকেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন কর্ত্তব্যবোধে। কিন্তু সমাজের বাহিরে না থাকিয়াও কতকগুলি লোক একান্তবাস করিবেন এবং হৈ-চৈ-এর বাহিরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া মৃত এবং অনুপস্থিত জীবিতদের লইয়া ডুবিয়া থাকিবেন।"

তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ এবং দায়িত্বজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। অভিধান-সম্পাদনের জন্য তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। অসুস্থ হইয়া পড়িলেও বিশ্রাম লইতে চাহিতেন না। এ সম্বন্ধে একবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

...বিশ্রাম গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। কিছুতেই তাহা সম্ভব হইবে না। হাতে একটা বড় রকমের দায়িত্ব ইণ্ডিয়ান প্রেস্ হইতে লইয়াছি। তাহাতে লক্ষাধিক টাকা তাহাদের ব্যয় হইবে। উহা যতক্ষণ না শেষ হইতেছে, ততক্ষণ আমার জীবনের চেয়ে দায়িত্বটাই বড় মনে হইতেছে।

"বৃহত্তর বঙ্গ শাখা" প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এখন একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহার প্রথম সৃষ্টি হয় মীরাট-অধিবেশনে—১৩৩৪ সালে এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের উপর নেতৃত্ব-ভার দিয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি

পার্ব্বণ

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গঠিত হয়। ঔপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙালীর ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের উদ্দেশ্যেই এই শাখা স্থাপিত হয়। সম্মেলনের অনুরোধে দাস-মহাশয় ইহার গঠন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। দাস-মহাশয় ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গ শাখার প্রথম সভাপতি। তিনি তাঁহার অভিভাষণে খুব একটি বড় কথা বলিয়াছিলেন,—

…বর্ষে বর্ষে সম্ভব না হয়, ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ বা দ্বাদশ-বার্ষিক পূর্ণকুম্ভমেলার সময় প্রয়াগে, হরিদ্বারে, নাসিকে যেমন মহামেলা বসে, সেইরূপ ভারতের প্রত্যেক বাঙ্গালী-বহুল কেন্দ্রে "বৃহত্তর বঙ্গে"র গৌরব-চূড়ামণিদের স্মরণ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কৃষ্টি বা ক্যাল্‌চ্যুর-প্রকাশক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য আদির প্রদর্শনী বসাইতে বলি…।

বাঙালীর সংস্কৃতির প্রসার সম্বন্ধে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তিও ছিল অপূর্ব্ব। তিনি বলিয়াছেন,—

বাঙ্গালীর…কৃষ্টির বিজয় বাঙ্গলার বাহিরে বিশেষ করিয়া উত্তর-ভারতে যে ক্রমে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ও সাহিত্যে, বাঙ্গলা সাহিত্য, বাঙ্গলার চিন্তা ও বাঙ্গালীত্ব প্রতিবেশ-প্রভাবে প্রবেশ করিতেছে ও অনুবাদের ভিতর দিয়া প্রতিবিম্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।…বাঙ্গলা নভেল নাটকদির ভিতর দিয়া বঙ্গীয় চিন্তার অনুসরণ করিতে করিতে বেশ-ভূষায় আকার-ইঙ্গিতে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আজকাল ঢিলা কাছা, লম্বা কোঁচা দিয়া ধুতি ও সার্ট পরা, অদৃশ্যপ্রায় সূক্ষ্মীকৃত শিখা অনাবৃত-মস্তক অ-বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটি দুইটি হইতে অল্প দিনের মধ্যে দশ-বিশটি সহরে ও কলেজ-বোর্ডিংএ দেখা যাইতেছে।…মাছভাত একটা উপহাসের কথা ছিল।…এই দুই-ই এখন অ-বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ চলিয়াছে…এবং সরিষার তৈলের পরিমাণ হিন্দুস্থানী-মহলে ঘৃতের ভাগকে কমাইয়া দিতেছে…।"

অতিপ্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে কি করিয়াছেন, সে-বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সমান অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান আর কোন বাঙালীর ছিল বলিয়া অবগত নহি।

নয়া দিল্লী শ্রীযামিনীকান্ত সোম

শিশুই শিক্ষক

শ্রীমায়া সোম

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, শিশুর নিকট হইতে আমাদের কিছুই শিক্ষা করিবার নাই; বাস্তবিক তাহা নহে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইলেই কিংবা বিভিন্ন বিদ্যা শিখাইবার শক্তি থাকিলেই উত্তম শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হওয়া যায় না। কিন্তু শিশুদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই, শিশুর কি কি মানসিক ও শারীরিক আহারের দরকার তাহা জানা চাই। গাছ হইতে উত্তম ফুল-ফল পাইবার নিমিত্ত মালী যেমন যথোচিত ব্যবস্থা করে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকেও সেইরূপ শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির উপযোগী অনুকূল ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশু যাহাতে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর সামান্য সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শিশুর অভিপ্রায় পূর্ণ না হইলে সে অন্যায় উপায়ে, ছলচাতুরীর দ্বারা উহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ পথে যাইতে না দিয়া শিশুর ইচ্ছা সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন।

শিশু যখন জানে তাহার রাজ্যে সে ছাড়া আর অপর কোন বয়স্কের প্রভাব নাই, তখনই সে তাহার প্রকৃতি ও অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করে। সমস্ত পারিপার্শ্বিক তাহার নিকট যখন সুমধুর বলিয়া

মনে হয়, তখন সে আত্মপ্রকাশ করিয়া শিক্ষকের পদটি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পদটি গ্রহণ করিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের দরকার হয় না। কখনও সে খানিকটা খেলিয়া, কখনও বা সারা দিন খেলিয়া পর দিন, আবার কখনও বা তামাশা ও আনন্দের মধ্যে হঠাৎ তাহার মনোমত রস খুঁজিয়া পাইলে সে কখনও বা শিক্ষক আবার কখনও বা ছাত্র হইয়া পড়ে। এইরূপে সে অপর শিশুকে দেখিয়া মনোযোগী, আত্মনির্ভরশীল, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, সত্যবাদী ইত্যাদি হইতে শিখিয়া থাকে, শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতেও প্রয়াস পায়—এইরূপে তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান বৃদ্ধি হয়। সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মন্তেসরি শিক্ষালয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রীর বড় প্রভাব দেখা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। শিশুর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং শিশুদেরও অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শিশু যদি কোন খেলনা লইয়া খেলিতে চায়, অপর শিশুর খেলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করে। খেলাঘরের সমস্ত জিনিষ পরিপাটি রূপে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার ভার শিশুদের উপর দেওয়া হয়, কাজেই তাহার খেলার বা কাজের অভাব হয় না। সে অপরের দেখিয়া অনেক কিছুই শিখিয়া ফেলে, এমন কি পাঠেও দ্রুত অগ্রসর হয়। এক বার দেখি, একটি চার-পাঁচ বছরের শিশু তাহার বন্ধুকে "ঈ" অক্ষরটি শিখাইবার সময় নিজের দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিতেছে "ঈ"র মত দাড়ি থাকে। আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম, কারণ শিশুটির অক্ষর-পরিচয় আমার নিকট হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে সে কত রকমে শিখে ও অপরকে শিখায় সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি।

শিশুরা আদেশ পছন্দ করে না; কেন করিতে হইবে এবং কেন হইবে না, এ-সমস্যাটি ঠিক রূপে উপলব্ধির অভাবে মনে দ্বন্দ্ব বা "confusion"এর সৃষ্টি হয়। কোন কোন শিশু স্কুলে আসিয়া ছুটাছুটি বা চীৎকার করে। ধরিতে বা নিষেধ করিতে গিয়া দেখিয়াছি, উহারা আরও বেশী উত্তেজিত হয় ও কৌতুক বোধ করে। যখন সে সকলকে আস্তে আস্তে কথা বলিতে শোনে, যে-স্থান হইতে যে-জিনিষ লয়, তাহা পুনরায় সেই স্থানে রাখিতে দেখে, তখন কিছু দিনের মধ্যেই সে আপনিই ঐ রূপ করিতে শিখে। প্রথম প্রথম সে কারণও জিজ্ঞাসা করে, বুঝিতেও চেষ্টা করে। এক বার দেখি, একটি শিশু নিজের মনে বলিয়া যাইতেছে "ক্লাস হইতেছে", "ক্লাসে আস্তে কথা বলিতে হয়, মাঠে চেঁচাইতে হয়" ইত্যাদি। একটি নূতন শিশু বাগান হইতে ফুল ছিঁড়িয়া কতক তাহার পকেটে পুরিত আবার কতক নষ্ট করিত, তাহার বন্ধুরা তাহাকে বারণ করিলে সে শুনিত না। এক দিন তাহার পকেটে কতকগুলি ফুল দেখিয়া বলিলাম "ফুল ছিঁড়িতে নাই"। উত্তরে সে আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ছিঁড়িলে কি হয়, বাগান কেন সুন্দর দেখাইবে না, ফুল তাহা হইলে কি হইবে, আমি ফুল ছিঁড়িব" ইত্যাদি। তদুত্তরে আমি তাহাকে ফুল ছিঁড়িবার অনুমতি দিতেই সে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তখনই বলিল, সে আর ফুল ছিঁড়িবে না। কয়েক দিন পর দেখি সেই শিশুটিই তাহার ছোট ভাইকে বলিতেছে "ফুল ছিঁড়িও না, বাগান নষ্ট হইয়া যাইবে, তুমি আর ফুল পাইবে না" ইত্যাদি।

শিশু তাহার স্বকীয় প্রেরণা (initiative) অনুযায়ী কাজ করিতে ভালবাসে। একবার আমি শিশুদের একটি ইংরেজি ছড়া শিখাইতেছিলাম, ছড়ার শেষে ডিগ্‌বাজী খাওয়া ছিল। একটি চার বছরের শিশু "tumbled down" কথাটির সঙ্গে সমান দুই হাত রাখিয়া সকলের আগে লম্বা হইয়া উপুড় হয়, এইরূপ সে বেশ বার কতক করে; তাহার পর সে কয়েক দিন দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর এক দিন সকলের সঙ্গে ডিগ্‌বাজী খায়।

শিশুরা স্কুলে আসিয়া কয়েকটি ছোটখাটো জিনিষ—রঙীন খড়ি, কাগজ, পেন্সিল, ছবি ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে—যখন যাহা সম্মুখে পায়, তখনই তাহা লইতে চায়। একটি শিশু ঐরূপ জিনিষ লইয়া বাড়ী যাইত, অবশ্য তাহার পর দিন বাড়ীর লোকেরা উহা ফেরত পাঠাইতেন। আমি তাহাকে কয়েক বার নিষেধ

করিয়াছি, তদুত্তরে সে জানাইয়াছে "লইয়া গেলে কি হয়, কেন ফুরাইয়া যাইবে, কেন খেলিতে পাইবে না" ইত্যাদি। এক দিন সে ক্লাসে আসিয়া জিনিষগুলি দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করে এবং নিজেই বলিয়া উঠে, "জিনিষ বাড়ী লইয়া গেলে ফুরাইয়া যাইবে, বাড়ীর জিনিষ বাড়ীতে, স্কুলের জিনিষ স্কুলে থাকিবে" ইত্যাদি। অপর একটি শিশু সুন্দর বই দেখিলেই গোপনে বাড়ী লইয়া যাইত। শিশুরা প্রায় আমাকে জানাইত যে তাহারা তাহাদের বই স্কুলে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কখনও কখনও উহাদের মায়েরাও আমাকে স্কুলে খোঁজ করিয়া দেখিবার জন্য বলিতেন, কিন্তু পাইতাম না। এক দিন ঐ শিশুটির মা আমাকে কতকগুলি বই সমেত লিখিয়া পাঠান যে তিনি তাঁহার মেয়ের বাক্সে এগুলি পাইয়াছেন। বইগুলির কতক ছবি কাটা ও তাহার খাতায় আটকান। কারণ জানিতে বেশী দেরি হইল না; শিশুটি যথেষ্ট ছবি পায় না বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছে। শিশুটিকে যথেষ্ট ছবি দেওয়াতে সে আর কখনও ঐরূপ কাজ করে নাই

দুরন্ত শিশুও স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া যত দিন না তাহার ভয় ভাঙে তত দিন চুপচাপ বসিয়া অপরের কাজ লক্ষ্য করে। তাহার পর এক দিন যখন তাহার চমক ভাঙে যে সে কি চায়। প্রথম প্রথম সে খেলনাগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া ফেলিয়া দেখিতে চায়, তার পর সে তাহার মনোমতটিকে বাছিয়া লইয়া যথেচ্ছভাবে খেলিতে আরম্ভ করে, অপর বন্ধুরা দেখাইতে আসিলে তাহাদের সাহায্য বড় পছন্দ করে না, শেষে এক দিন অপরের দেখিয়া খেলিতে প্রয়াস পায় ও আনন্দ বোধ করে। একবার একটি শিশু "সিলিণ্ডার" নামক খেলনাটি লইয়া অনবরত ট্রেন করিয়া খেলিত, অপরের দেখাইয়া দেওয়া সে পছন্দ করিত না; এক দিন দেখা গেল, সে নিজেই ঠিক ভাবে পনর-কুড়ি বার একই খেলা মহানন্দে খেলিতেছে। কোন কোন শিশু আবার নূতন খেলনা লইয়া ঠিকভাবে খেলিতে না জানিলে অপরের নিকট গিয়া তাহাকে খেলিতে বলে, এইরূপ সে খেলনাটির ঠিক ব্যবহার শিখে; আবার কোন খেলনা লইয়া সামান্য সাহায্যের অপেক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এক বার একটি শিশুর দু-চারটি অক্ষর ছাড়া প্রায় সমস্ত অক্ষর-পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাহাকে অতি সংক্ষেপে নূতন অক্ষরগুলি দেখাইয়া সাজাইতে ও লিখিতে বলিয়া অন্য কাজে যাই, ঘণ্টাখানেক বাদে তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমার খেয়াল হইল, সামান্য দেখাইয়া দিতে সে উৎফুল্ল হইয়া অক্ষরগুলি সাজাইল ও লিখিল।

শিশু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কোথায় কি হয় এবং কি আছে দেখিবার ও জানিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হয়, যখন তাহার নিজের সাহসে কুলায় না তখন সে সব বিষয় দেখিবার ও জানিবার জন্য অপরের শরণাপন্ন হয়। যত দিন না সে নিজেকে তাহার পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে তত দিন সে ঐ ভাবে থাকে; তাহার পর সে যখন বুঝিতে পারে যে তাহার অবাধ গতি তখন সে সেখানে নির্ভয়ে যাইতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে সাহস পায়। এক বার একটি শিশু স্কুলের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে চাহিত না; অথচ সেখানে কি হয় জানিবারও প্রবল ইচ্ছা। প্রথম কয়েক দিন সে দূর হইতে ব্যাপারটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে "ওখানে গান হয়?" তাহার পর হইতে সে নিজেই এক দিন অপরের সঙ্গে সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

কোন কোন শিশু স্কুলে আসিয়া শিক্ষয়িত্রী তাহার মনোমত কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া লয়। এক বার একটি শিশু হঠাৎ আমার গালে সজোরে চড় মারে। আমি আমার গালে হাত বুলাইয়া মারিবার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোন উত্তর দিল না। অল্প ক্ষণ পরে দেখি, সে একটি টেবিলের উপর উঠিয়া দেওয়ালের গায়ে ঝুলান ছবি লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেছে; পড়িয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে ছবিটি ঠিক করিয়া দিলাম। শিশুটি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমি কোল হইতে নামাইয়া দিলে সে তাহার পকেট হইতে একটি মাদুলী-বাঁধা দড়ি দেখাইয়া বলিল, "আমার জ্যাঠাইমা দিয়াছে।" আমিও তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মাদুলীটি চাহিলাম। সে অত্যন্ত খুশী হইয়া সেটি আমাকে দিল।

কোন কোন শিশু কিছুদিন স্কুলে অভ্যস্ত হইলে পর কতকগুলি কাজ নিজেই করিতে অগ্রসর হয়। এক বার

স্কুল দেখিতে কোন একটি কলেজ হইতে ছাত্রদের আসিবার কথা ছিল। স্কুল আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে একটি সাড়ে-ছয় বৎসরের শিশু আসিয়া আমাকে খবর দিল যে তাহাদের পিসিমা (পরিচারিকা) আসেন নাই। আমি তাহাকে আলমারির চাবি দিয়া বলিলাম "এখনি যাইতেছি।" আমার যাইবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া যে-স্থানে যে-জিনিষ থাকে পরিপাটিরূপে তাহা সাজাইয়া রাখিয়াছে। শিশুরা কত সতর্কতা ও সন্তর্পণের সহিত কাজগুলি করে তাহার একটি পরিচয় দিতেছি। কোনও স্কুলে জলখাবারের সময় শিশুরাই তাহাদের খাবারের আয়োজন করে; একবার পরিবেশন করিতে গিয়া একটি শিশু কাচের জগ ভাঙিয়া কাঁদিতে থাকে। তাহার কান্না দেখিয়া কয়েক জন তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা দিতে ও আর কয়েক জন কাচের টুকরাগুলি উঠাইয়া পা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ঠিক সেই সময় একটি তিন বছরের শিশু আর একটি জলপূর্ণ জগ লইয়া যাইবার উপক্রম করাতে তাহার বন্ধুরা তাহার কাজে বাধা দিতেছে, কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সে অতি সন্তর্পণে জগটি টেবিলের উপর রাখিল।

এক বার একটি শিশু ছুটাছুটি করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া থুতনী কাটিয়া ফেলে; একটি শিশুকে দেখিলাম তাহাদের মুখ ধুইবার ঝাড়ন দিয়া জলপটি দিতেছে, আর একটি শিশু দৌড়াইয়া তাহার সেলাই-কার্পেটের টুকরা আনিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। শিশু তাহার অপর বন্ধুর প্রতি কত সহানুভূতির পরিচয় দেয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিশুদের লইয়া পর-পর দুই দিন লাট সাহেবের বাগানে গিয়াছিলাম। একটি শিশু ছাড়া প্রত্যেকেই তাহাদের খাবার লইয়া যাইত। আমি কয়েকটি শিশুর খাবার হইতে কিছু কিছু লইয়া তাহাকে খাইতে দিই। পরদিনও উক্ত শিশু খাবার আনে নাই। পূর্ব্বদিন যে শিশুর খাবার হইতে লইয়া তাহাকে দিই সেই আপনা হইতেই তাহার খাবার হইতে তাহাকে খাইতে দিয়া বলিল, "অমুক আজও খাবার আনে নাই আমি তাহাকে খাইতে দিয়াছি।"

স্কুলে আসিয়া প্রথম প্রথম কোন কোন শিশু মিথ্যা বা অশ্লীল কথা বলে; যখন তাহার ন্যায়-অন্যায় বোধ হয় তখন সে আপনিই সে-অভ্যাস ছাড়িতে চেষ্টা করে। এক বার একটি সাত-আট বৎসরের শিশু তাহার বন্ধুদিগের নিকট গল্প করিতেছিল, সে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে গিয়াছে এবং রাজারাণীকে দেখিয়াছে। গল্প শুনিয়া তাহার বন্ধুদের খুব হাসিতে দেখিয়া সে তাহার আচরণ যে অসঙ্গত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল, তাহার পর শিশুটি আর কখনও ঐরূপ গল্প করে নাই।

অনেক সময় বড়দের শাসন ও আদেশ শিশুদের মনকে প্রবল ভাবে আন্দোলিত করে। নিজের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া সে কখনও অত্যাচারী, কখনও নিষ্ঠুর, কখনও বা মিথ্যাবাদী হয়। শিশু যখন স্বাধীন ভাবে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়, তখন তাহার দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে বেশী দেরি লাগে না। সেই জন্যই ডাঃ মন্তেসরি বলেন—শিক্ষার সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই সে তাহার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করিতে শিখিবে। শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা শিশুর মধ্যেই আছে, এই সুপ্ত শক্তিকে পরিস্ফুট করাই শিক্ষার কাজ। এই জন্য তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, আনন্দকর পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের অবাধ গতি দিতে হইবে।

মা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

শীতকালের বেলা, দেখিতে দেখিতে একেবারে শেষ হইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার চারি দিক্ ছাইয়া ফেলিল। ঈশানী এই ভর-সন্ধ্যাবেলা নিজের শুইবার ঘরের দাওয়ায় গালে হাত দিয়া একমনে বসিয়া আছে। ছোট বাড়ী-খানির পশ্চিম পাশে কতকগুলি বাঁশের ঝোপ। তাহারই শুক্‌না পাতা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া সমস্ত উঠানময় ছড়াইয়া আছে। কতকগুলি শিয়াল বাঁশঝোপের নিকটে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বার-কয়েক ডাকিয়া কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। বাঁশের শুক্‌না পাতার উপর তাহাদের পায়ের শব্দ তখনও সর্ সর্ করিয়া বাজিতেছিল।

দত্ত-বাড়ীর মেয়েরা আজ কি একটা ব্রত করিয়াছে, তাহারই নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে—লক্ষ্মী, নরেন, আর সুরেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল কিন্তু এখনও তাহারা ফিরিল না! যাক্ তবু তো পেট ভরিয়া চারটি ফলার খাইয়া আসিতে পারিবে। আজ সেই সকালে ঈশানী আধ সের চাল সিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আধপেটা খাওয়াইয়া জল দিয়া পেট ভরাইয়াছিল। এ বেলার জন্য আর এক দানা চাউলও ঘরে নাই। আজ নিমন্ত্রণ না থাকিলে কি উপায় করিত সে! নিজের অদৃষ্টে আজ আর কিছুই জুটে নাই—কড়াতে কয়টি পোড়া ভাত লাগিয়াছিল, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া কড়াটি মাজিতে যাইবার আগে কোন মতে তাহারই এক গ্রাস মুখে দিয়া এক ঘটি জল খাইয়া আছে। স্বামী শশিনাথ আজ সাত দিনের উপর বাড়ী নাই—কোথায় যাত্রাদলের সঙ্গে গান করিতে চলিয়া গিয়াছে—এমনই প্রায়ই যায়। কখনও ঘরে দু-এক টাকা রাখে, কখনও না-রাখিয়াই যায়। ঈশানী কিন্তু নিজেও সব সময় স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে না—হাতে যে দু-এক টাকা থাকে তাহা দিয়া ও-পাড়ার গোলোক শা'র বাড়ী হইতে ধান কিনিয়া আনে। সেই ধানের চাউল করিয়া বিক্রয় করে—চাউলের ব্যাপারী বাড়ীতে আসিয়া চাউল কিনিয়া লইয়া যায়। বেশী না হউক দু-এক সের চাউলও তো তাহাতে লাভ থাকে।

কিন্তু এবার শশিনাথ বাড়ী হইতেও গিয়াছে—ঈশানীও পড়িয়াছে জ্বরে। আজ দু-দিন তাহার জ্বর আসে নাই। কাজেই এ কয় দিনে তাহার পুঁজি যাহা ছিল তাহা সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। শরীরে এখনও বল পাইতেছে না—এই দুর্ব্বল শরীরে ঢেঁকিতে চাল ছাঁটাইও সোজা পরিশ্রম নয়। তাহা সত্ত্বেও সে আজ গিয়াছিল গোলোক শা'র বাড়ী, কিন্তু তাহার পূর্ব্বের এক টাকা এখনও বাকী। বাকী শোধ না-হইলে ধান পাওয়া যাইবে না বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং উপবাস আজই শেষ নয়—এর পর স্বামী যে কয় দিন বাড়ী না আসে, কি করিবে সে? নিজের কথা ভাবে না, দু-তিন দিন না-খাইয়াও কাটাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের অবস্থা কি হইবে?

শশিনাথ পাশের গ্রামে দু-তিন জন মহাজনের খাতা লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। নিয়মিত কাজ করিলে ইহাতেই দিন তাহাদের এক প্রকার চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে কি যে হয় শশিনাথের—এমনি দু-এক মাস অন্তর যাত্রার দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দশ-বার দিন পরে বাড়ী আসিয়া হাজির হয়—ইতিমধ্যে কেহ বাড়ীতে মরিল কি বাঁচিল, কোন খবরই সে রাখে না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—বাগ্দীদের মেয়েরা সামনের মাঠটায় ধান কুড়াইতে গিয়াছিল—তাহারা দল বাঁধিয়া ধানের ধামা মাথায় করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছে। ঈশানীর ঘরের পাশ দিয়াই পথ—রোজ সকালে সন্ধ্যায় ঈশানী তাহাদিগকে যাইতে আসিতে দেখে। ইহাদের দেখিয়া তাহার হিংসা হয়—কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কেমন হাসিয়া খেলিয়া রোজ যায় রোজ আসে! এমনি স্বাধীন জীবন তাহার

থাকিলে সে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু উপায় তো নাই। পুরুষ সক্ষম হউক, অক্ষম হউক, তাহারই মুখ চাহিয়া নারীকে সারাজীবন ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে হইবে—নিজের সন্তানসন্ততি লইয়া অনশন, অর্দ্ধাশনে থাকিলেও কেহ দেখিতে আসিবে না—চব্বিশ ঘণ্টা তিলে তিলে পলে পলে ইহা তাহাকে সবটুকুই একেবারে ভোগ করিতে হইবে। পুরুষের চিত্ত-বিশ্রামের জন্য সারা দুনিয়া খোলা রহিয়াছে—গৃহে শান্তি না-থাকিলে যেখানে ইচ্ছা দু-দণ্ড ঘুরিয়া আসুক, কিন্তু নারী চিরকালের জন্য 'অশোক কাননে বন্দিনী সীতা'।

কলরব করিতে করিতে দুই ছেলে ও মেয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। লক্ষ্মীর এক হাতে একটি দইয়ের ভাঁড় ও আঁচলে বাঁধা কিছু চিঁড়া-মুড়কি। ঈশানী জিজ্ঞাসা করিল, "এ-সব কি রে লক্ষ্মী ?"

নরেন বলিল, "দিদি কিচ্ছু খায় নি মা—তাই ওরা সব কাপড়ে বেঁধে দিলে।"

"আমার একটুও ক্ষিদে পায় নি মা—তাই সব নিয়ে এলাম। ইস্ হাতটা একেবারে ধরে গেছে—ভাঁড়টা নাও ত মা।" ঈশানী দইয়ের ভাঁড়টা এক পাশে নামাইয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে সুরেন আব্দার সুরু করিয়া দিয়াছে, "আমার ঘুম পাচ্ছে—আমি শোব মা।"

ঈশানী লক্ষ্মীকে বলিল, "তুই একটু বোস্ মা, আমি নরু সুরুকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।"

একটু পরে ঘর হইতে থালা বাহির করিয়া দই চিঁড়া মাখিয়া ঈশানী লক্ষ্মীকে খাওয়াইতে বসিল।

"অত দই চিঁড়া আমি কিন্তু একা একা কিছুতেই খেতে পারব না মা।"

ঈশানী মেয়ের এই ছল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। এখন তাহার দুই চোখ জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, বলিল, "তাই বুঝি এতক্ষণ তোর ক্ষিদে পায় নি মা ?"

ঈশানীর গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এই তো সবে দশ বৎসরের মেয়ে, ইহারই এত মায়া! আর স্বামী, যাহার উপরে সকল দায়িত্ব, সে কোথায় সমস্ত বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এই এতটুকু মেয়ে অনাহারে কৃশ, সারা দেহ অযত্নে ধূলিমলিন, পরনে একখানি শতছিন্ন বস্ত্র মাত্র, পর পর দশটা দিনও ইহাদের সে না-পারিয়াছে পরিতৃপ্ত করিয়া আহার দিতে, না-পাইয়াছে একটু সময় আদর-যত্ন করিতে। চক্ষের জলে ভাসিয়া ঈশানী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া খাওয়াইতে লাগিল।

২

পরের দিন সকাল বেলা ঈশানী পাশের বাড়ীর বিন্দু ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক সের চাউল ধার করিয়া লইয়া আসিয়া ছেলেমেয়েদের রান্না করিয়া দিল। কিন্তু নিজের খাওয়া আর হইল না। আজ পুনরায় তাহার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিল। কোন প্রকারে ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া অবশিষ্ট ভাত কয়টি ঢাকা দিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল। কয় দিন পূর্ব্বে জ্বর তাহার যেমন প্রবলভাবে আসিয়াছিল, আজ তেমন প্রবল না হইলেও শরীর দুর্ব্বলতায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ দুপুর বেলার রৌদ্র মাথায় করিয়া শশিনাথ আজ কোথা হইতে আসিয়া হাজির হইল। ঘরের দাওয়ার উপরে উঠিয়া বসিয়া ডাকিল, "মা, লক্ষ্মী, একখানা পাখা দে ত।" লক্ষ্মী একখানি পাখা আনিয়া দিল—পা ধুইবার এক ঘটি জল আনিয়া দাওয়ার উপরে রাখিল। বিশ্রাম করিয়া হাত পা ধুইয়া শশিনাথ ঘরের ভিতরে আসিয়া বলিল, "এ কি শুয়ে কেন? জ্বর হ'ল নাকি।" গায়ে হাত দিয়া বলিল, "তাই তো, তা গা ঘামছে, জ্বর ছাড়বে এবার।" ঈশানী চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, একটা কথারও জবাব করিল না।

"যাই স্নান ক'রে আসি—সারাটা দিন কিছু না খাওয়া, তাতে এত পথ হাঁটা, শরীরটা যেন ভেঙে যাচ্ছে।" বলিয়া শশিনাথ গামছা লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া আসিলে ঈশানী লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিল, "যা তো মা, হাঁড়িতে যে ভাত চাট্টি আছে থালায় ক'রে ধরে দিগে।"

আহার শেষ করিয়া শশিনাথ পাশের গ্রামের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। সেখানে আজ আবার মহাজনদের খাতা লিখিবে। সন্ধ্যার দিকে ঈশানীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। আজ দুই দিন এক প্রকার অনাহার, প্রচণ্ড ক্ষুধায় তাহার হাত পা ভাঙিয়া আসিতেছিল। নরু ও সুরু আসিয়া 'খাই খাই' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঈশানীর আজ আর এই দুর্ব্বল শরীরে তাহাদের আব্দার সহ্য হইতেছিল না। ঘরে চারটি পুরাতন ক্ষুদ ছিল, লক্ষ্মী তাহাই সিদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু নরু সুরু দুই একবার তাহা মুখে দিয়াই সারা দাওয়ায় ছিটাইয়া একাকার করিয়া দিল, তাহা তাহারা কিছুতেই খাইবে না। বস্তুতঃ ক্ষুধার কতটা তীব্রতা হইলে যে মানুষ এই দুর্গন্ধযুক্ত পোকা-ধরা ক্ষুদ সিদ্ধ খাইতে পারে, তাহা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ঈশানী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, নরু ও সুরুর পিঠে কয়েকটি কিল চড় দিয়া ঘরে লইয়া শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোরাও মর্, আমিও মরি—হা ভগবান্, কিছুই কি কানে শুনতে পাও না! আর যে সহ্য হয় না!" নরু সুরু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—লক্ষ্মী চুপ করিয়া পুতুলের মত বসিয়া রহিল।

ঠিক এমনি সময় শশিনাথ আসিল বাড়ী ফিরিয়া। লক্ষ্মীর নিকটে সমস্ত শুনিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল—"কি, চাল নেই—তা আগে থাক্‌তে বলতে পারে না?—যত সব নবাব! কোন কাজ তো নেই—শুধু বসে শুয়ে থাক্‌বে আর গিল্‌বে।" বলিয়া ঘর হইতে একটা চাউলের পাত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল। ঈশানী কিন্তু একটা কথারও জবাব করিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কয়েক সের চাউল লইয়া শশিনাথ ফিরিয়া আসিল। নরু সুরু ও লক্ষ্মী তিন জনেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শশিনাথ চাউলের পাত্র ঘরের মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া লক্ষ্মীকে ঘুম হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "এই যে চাল রইল—ভাত চড়িয়ে দিতে বল।"

ঈশানী এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল, "ঐ অতটুকু মেয়ে এত রাত্রে ভাত রান্না করবে নাকি? যেমন আক্কেল, তেমন কাজ।"

"কেন তোমার এমন কি হয়েছে যে ভাত চাট্টিও রান্না করতে পারবে না?"

"না, আমি আর গিলবোও না—রান্নাও করবো না।"

শশিনাথের রাগ মাথায় চড়িয়াই ছিল—এবার একেবারে ভাঙিয়া পড়িল—"কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?—বেরো আমার বাড়ী থেকে।" বলিয়া ঈশানীকে কয়েকটি কিল চড় মারিয়া চাউলগুলি সারা ঘরময় ছড়াইয়া দিয়া নিজেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

ঈশানী একটা শব্দও করিল না, একটুও কাঁদিল না—লজ্জায় ঘৃণায় যেন একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু হাঁকডাক শুনিয়া ও-বাড়ী হইতে বিন্দুঠাকুরাণী, নরেশ ডাক্তার আরও কয়েক জন ছুটিয়া আসিল। ঘটনা শুনিয়া নানা জনে নানা মন্তব্য করিতে লাগিল। ঈশানী সেই যে বিছানায় পড়িয়া রহিল, আর না আসিল বাহিরে, না দিল কাহারও একটা কথার জবাব।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে—ছেলেমেয়েরা ঘরের মধ্যে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঈশানী এখনও দাওয়ায় বসিয়া একমনে ভাবিতেছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিল—সে মরিবে। এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ছেলেমেয়েদের কথা? তা সে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি করিতেছে? কোন দিন তো তাহাদের পেট ভরিয়া চাট্টি খাইতে দিতে পারে নাই—তাহারই সম্মুখে উহারা অনাহারে শুকাইয়া মরিবে, তাহা সে দেখিতে পারিবে না। স্বামী দিন দিনই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে—ছেলেমেয়েদের কোন দায়িত্বই সে লইতে চায় না। আর আজ এই প্রথম সে তাহার গায়ে হাত তুলিল—ইহার পরে তাহার অদৃষ্টে আরও কত কি আছে কে জানে? উঠানের এক পাশে একটি করবী-ফুলের গাছ—তাহারই কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করিয়া ঈশানী আঁচলে বাঁধিল। ঘরে আসিয়া ছেলেমেয়েদের গায়ে ভাল করিয়া কাপড় ঢাকা দিতেছিল, হঠাৎ সুরুর গায়ে হাত পড়িতেই ঈশানী একেবারে চমকাইয়া উঠিল। এই

গণ্ডগোলের মাঝে কখন যে সুরুর কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে কেহ লক্ষ্যও করে নাই। ঈশানী বার-কয়েক তাহার গায়ে কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল। তার পর কাপড় কাঁথা যাহা ছিল সুরুর গায়ে খুব ভাল করিয়া জড়াইয়া দিয়া আবার দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

সুরুর জ্বর হইলে প্রায়ই ফিট হয়—সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরিয়া মাথায় জল দিতে হয়—তাহা না হইলে বিপদ হইতে পারে। কিন্তু কাল যদি জ্বর না কমে—এমনি ফিট হইতে থাকে—তাহা হইলে কে দিবে সুরুর মাথায় জল—কে করিবে বাতাস? সে তো আর বাঁচিয়া থাকিবে না—বড়জোর আজ রাতটা—কাল সকালেই তাহার সব শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে মরিলেও স্বামী কি এমনি উদাসীনই থাকিবে, না, সে তো এমন নয়—তবে মাঝে মাঝে তাহার মতি-গতি কেমন যেন বিগড়াইয়া যায়। না, তাহার মৃত্যুই ভাল—সে মরিলে সব দায়িত্ব স্বামীর উপরে পড়িবে—সে আর সকল বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না—নিয়মিত কাজ করিবে—ছেলেমেয়েদের যত্ন করিবে—তাহাদিগকে আর অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিতে হইবে না।

ঈশানী উঠিয়া রান্নাঘরের ভিতরে আসিল। আঁচল হইতে করবী-ফুলের বীজগুলি খুলিয়া একটি শিলের উপরে রাখিয়া আবার চুপ করিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। না, কাল আর সে বাঁচিয়া থাকিবে না। তাহার মৃত্যু লইয়া বেশ একটু হৈচৈ পড়িয়া যাইবে। স্বামী বেচারী একেবারে অনুতাপে পুড়িয়া মরিবে—ভাবিবে, তাহারই জন্য এই আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা! হাঁ তাই তো। উঃ গত বৎসর দত্তদের বাড়ীর বউ আফিং খাইয়াছিল, কিন্তু একটা বেলা চলিয়া গেল তাহার মৃত্যু হইল না—উঃ সে যে কষ্ট! অবশেষে শেষ বেলায় সে গেল মারা। যাক, বাঁচিয়াছে বেচারী—স্বামী তাহাকে নিত্য প্রহার করিত—শাশুড়ী ননদ কেহ এক দণ্ড দেখিতে পারিত না—বেশ হইয়াছে, হতভাগিনী মরিয়া বাঁচিয়াছে। শিলের উপর নোড়া দিয়া ঈশানী বীজ কয়টি বাঁটিতে লাগিল।···কিন্তু এই তো কয় বৎসরের কথা—নন্দী-বউ গেল মারা, তাহার ছোট ছোট তিনটি ছেলে—একটি গেল তাহার বোনের বাড়ী, আর দুইটি এখানে-সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—যেটি বোনের বাড়ীতে, সেটিরও নাকি কত কষ্ট! আহা মা নাই! নন্দী-বউ বাঁচিয়া থাকিলে কখনও এমন হইতে পারিত না। নিজের ছেলেদের পরের বাড়ীতে দুঃখী কাঙালীর মত থাকিতে দিত না—নিজে যেমন করিয়াই হউক চালাইত।

আচ্ছা, সে মরিলে যদি নরু, সুরু, লক্ষ্মী এদেরও অমনি অবস্থা হয়?

না—সে কখনও হইবে না—তাহার স্বামী বাঁচিয়া আছে, সে-ই দেখিবে।

হঠাৎ শুইবার ঘর হইতে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "মা, মা, শিগ্‌গির এস—সুরুর ফিট্ হয়েছে।" কানে যাইতেই ঈশানী এক মুহূর্ত্তে একেবারে এ ঘরে ছুটিয়া আসিল। দেখে—স্বামী সুরুর পাশে বসিয়া তাহার মাথায় জল দিতেছে, লক্ষ্মী করিতেছে বাতাস।

ঈশানী একেবারে সুরুকে কোলে করিয়া বসিল—রান্নাঘরে শিলের উপরে পড়িয়া রহিল তাহার আত্মহত্যা করিবার বিষ। অনশন, অর্দ্ধাশন, স্বামীর অত্যাচার, ছেলেমেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশাপূর্ণ এই যে সংসার, এক মুহূর্ত্তে আবার আসিল তাহারই মাঝে ফিরিয়া। সে যে মরিবে, সে-কথা আর তাহার মনেও রহিল না

"ভারতবর্ষ যদি অমুক জাতির অধীন হইত"

সাম্রাজ্যাসক্ত ব্রিটনরা মনে করে, যেহেতু তাহাদের সাম্রাজ্য তাহাদের সুখসুবিধা ও লাভের কারণ, অতএব তাহাদের সাম্রাজ্যের অধিবাসী অধীন প্রজারা উহার নিছক প্রশংসা করিতে বাধ্য।

কংগ্রেস যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অমঙ্গলকর মনে করে এবং তাহার অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহাতে ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড ভারী খাপ্‌পা হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনে সাম্রাজ্য-দিবসের ভোজে বলিয়াছেন, যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অনিষ্টকর বলে, তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়, ভারতবর্ষ জার্মেনী ইটালী প্রভৃতির মত দেশের অধীন হইলে ভারতীয়দের দশা কিরূপ হইত। অর্থাৎ কি না, তাহারা তাহা হইলে মজাটা টের পাইত!

ভারতবর্ষের ভাগ্য কোন্‌রূপ হইলে ভারতীয়দের অবস্থা কেমন হইত, ইহা কল্পনা ও অনুমানের বিষয় বটে; কিন্তু মজার কথাটা এই যে, ব্রিটনরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেবল এই কল্পনাই করেন যে, এই দেশ হয় ব্রিটেনের নয় অন্য কোন দেশের অধীন হইবে, এবং আমরা ব্রিটেনের অধীন না হইয়া অন্য কোন দেশের অধীন হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত আমাদের সেই দুর্দ্দশাটা তাঁহারা কল্পনায় উপভোগ করেন! তাঁহারা ভ্রমক্রমেও এরূপ কল্পনা ও অনুমান করেন না যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ভারতীয়দের অবস্থা কিরূপ হইত। কেননা, ভারতবর্ষ যে কখনও স্বাধীন হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত।

আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে কেবল সেই সেই জাতির অধীন বলিয়া কল্পনা ও অনুমান করিতে ভালবাসেন যাহারা তাঁহাদের মতে ইংরেজদের চেয়ে অত্যাচারী। যখন রাশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল এবং ভারতবর্ষকে রাশিয়া গ্রাস করিতে চায় ইংরেজদের এইরূপ আশঙ্কা থাকায় তাহাদের রুশ-ভীতি ছিল, তখন ইংরেজরা আমাদিগকে এই বলিয়া শাসাইত, "আমাদের রাজত্বে তোমরা সুখে আছ, রাশিয়ার অধীন হ'লে টেরটা পাবে।" এখন সেইরূপ জার্ম্যান ও ইটালিয়ানদের অধীনতার ভয় দেখান হইতেছে। কিন্তু তখন কিংবা এখন ইংরেজরা কখনও স্বয়ং কল্পনা করিতে বা আমাদিগকে কল্পনা করাইতে চায় নাই যে, ভারতবর্ষ আমেরিকার অধীন হইলে অবস্থাটা কি প্রকার হইত। কেননা, তাহারা জানে আমেরিকার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শাসননীতি ও তাহার ফল ব্রিটেনের ভারতশাসন নীতি ও তাহার ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফিলিপিনোদিগকে চল্লিশ বৎসর শাসন করিবার আগেই আমেরিকা তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দিয়াছে এবং আর অল্প কয় বৎসর পরে স্বাধীনতা দিবে তাহাও বলিয়া দিয়াছে। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব কখন দিবে তাহা ত বলেই নাই, অধিকন্তু আগে অনির্দ্দিষ্ট কোন এক ভবিষ্যতে তাহা দিবার যে আশা দিয়াছিল, নূতন ভারতশাসন আইনে কোথাও ঘুণাক্ষরে তাহার আভাস নাই।

"যদি রাশিয়া ভারত শাসন করিত"

যখন রাশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল, তখন ভারতবন্ধু বলিয়া পরিচিত ইংরেজরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে রাশিয়া-জুজুর ভয় দেখাইতেন।

গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ১৮৮৪।১৮৮৫ সালে একবার রুশাতঙ্কের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন ভারতবর্ষে ইংরেজদের কাগজগুলাতে ভারতীয়েরা ইংরেজ-রাজত্বে কিরূপ সুখে আছে এবং রাশিয়ার অধীন হইলে তাহাদের কী দুঃখ ও সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা বর্ণনা করিয়া অনেক প্রবন্ধ বাহির হইত। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবও তখন এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সর্‌ উইলিয়ম

ওএডারবার্ন তাঁহার অভিভাষণেও রাশিয়ার অধীন হইলে ভারতবর্ষের কি বিপত্তি ঘটিবে তাহার উল্লেখ করেন। তাহার বহু বৎসর পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচিত মিঃ নেভিনসন ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান কাগজে একটা চিঠি লেখেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনিও বলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের পরিবর্ত্তে রাশিয়ান রাজত্ব স্থাপিত হইলে "কল্পনাতীত বিপত্তি" ("incalculable disaster") হইবে। "আমরা ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া গেলে এক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া, জার্মেনী বা জাপান দ্বারা আমাদের স্থান অধিকৃত হইবে; হয়ত তিনটা দেশই নিজের জায়গা করিয়া লইবে।" রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁহার মতের তাৎপর্য্য উপরে দিয়াছি। জার্মেনী ও জাপান সম্বন্ধে তিনি বলেন, "তাহারা এখনও সাফল্যের সহিত অধীন দেশ শাসন করিবার সামর্থ্যের পরিচয় দেয় নাই।"

বহু বৎসর ধরিয়া ইংরেজরা আমাদিগকে রুশ-জুজুর ভয় দেখানতে অনেক ভারতীয় হয়ত চিন্তা করিয়া থাকিবেন, বাস্তবিক যদি রাশিয়া ভারত জয় করিত, তাহা হইলে তাহার ফল কি ইংরেজদের দ্বারা ভারত-অধিকারের ফল অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই মন্দ হইত? আমরাও "ইফ্ রাশিয়া রূল্ড্ ইণ্ডিয়া" ("যদি রাশিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিত") এই নাম দিয়া একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৮ সালের মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

পরাধীনতা ও বিদেশীর শাসন যে কোন দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে, এবং ইংরেজের অধীনতার পরিবর্ত্তে আর কোন জাতির অধীনতা যে ভারতবর্ষ চায় না, তাহা ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল। রাশিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিলে যে-রকম অত্যাচার হইত তাহারও উল্লেখ করা ও আভাস দেওয়া হইয়াছিল।

অন্য রকমের ফল যাহা হইতে পারিত, তাহাও ঐ প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল। সংক্ষেপে তাহার দু-এক কথা লিখিতেছি।

এখন রাশিয়ায় পণ্যশিল্পের প্রচলন ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার খুব হইতেছে। কিন্তু সম্রাট্‌দের আমলে, ৩১ বৎসর পূর্ব্বেও, রাশিয়া প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, ইংলণ্ডের মত পণ্যশিল্পপ্রধান ও বাণিজ্যপ্রধান দেশ ছিল না। সুতরাং তৎকালে ভারতবর্ষ রাশিয়ার অধীন হইলে রাশিয়া নিজের কারখানার জিনিষ ভারতবর্ষে চালাইবার নিমিত্ত ও নিজের বাণিজ্যের বিস্তারসাধন করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের পণ্যশিল্পসমূহ ও বাণিজ্য নষ্ট করিত না; কারণ, আগেই বলিয়াছি, রাশিয়া কল-কারখানা ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল না, সুতরাং ঐ দুই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা হইত না।

রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ ছিল বলিয়া, ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যশস্য নিজের দেশে চালান করিবার তাহার প্রয়োজন হইত না। তাহার কলকারখানা সামান্যই ছিল, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল লইয়া যাইবারও তাহার প্রয়োজন হইত না। এই কারণে, ভারতবর্ষের খাদ্যশস্য ভারতবর্ষেই থাকিত, ভারতবর্ষের কাঁচা মালও ভারতবর্ষেই থাকিয়া কালক্রমে তাহা এখানেই ভারতীয় মিস্ত্রী মজুর কারিগরদের দ্বারা নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইতে থাকিত।

রাশিয়ানরা সমুদ্রচারী জাতি ছিল না, এখনও সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য তাহারা বিখ্যাত নহে। এই কারণে ভারতবর্ষের সহিত জাহাজ নির্ম্মাণে ও সমুদ্রে যাতায়াতে তাহার প্রতিযোগিতা হইত না, এবং ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি চলিতে থাকিত। ইংরেজরা সমুদ্রচারী জাতি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই হেতু, কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের সহিত এ বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা হয়। পরাধীন ভারতবর্ষ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথম যুগে ভারতবর্ষে সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য হাজার বন্দর ছিল, এখন আঙুলে গোনা যায় এরূপ কয়েকটাতে দাঁড়াইয়াছে। তখন এদেশে বড় ও খুব মজবুৎ জাহাজ তৈরি হইত, এখন হয় না।

ভারতবর্ষের নিজস্ব বহুবিধ পণ্যশিল্পের অবনতি বা বিনাশে বহু কোটি লোকের জীবিকা নষ্ট হইয়াছে। অগণিত লোক এক মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য

হইয়াছে। তাহাতে এত মানুষের অন্নসংস্থান হয় না। অধিকন্তু খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য আবার দেশের বাহিরে চলিয়া যায়।

জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্রে জাহাজ চালানর কাজ দ্বারা বহু লক্ষ লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে।

ভারতবর্ষ রাশিয়ার অধীন হইলে সম্ভবতঃ উক্ত দুই প্রকারে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যবৃদ্ধি হইত না।

কোন সাম্রাজ্য যদি পৃথিবীর পরস্পরসংলগ্ন সুবৃহৎ ভূখণ্ডব্যাপী হয়, তাহা হইলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকারে ততটা অসাম্য করা চলে না, যতটা চলে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সমুদ্র দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে। রাশিয়ার সম্রাট্ জারদের আমলে অবশ্য রাশিয়ানদের রাষ্ট্রীয় অধিকার তত ছিল না, যত ইংলণ্ডে ইংরেজদের ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সম্রাটের প্রজাদের যতটুকু অধিকার ছিল, তাহার (সমস্তটা না হইলেও) অনেকটা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে রুশীয় সাম্রাজ্যের সব অংশের লোক ভোগ করিত। তখন রাশিয়ার পার্লেমেণ্টের নাম ছিল ডুমা। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মধ্য-এশিয়ার (মুসলমান) অধিবাসীরাও এই ডুমাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত। ডুমার এই এশিয়াটিক প্রতিনিধিদের কথা ও কাজের বিষয় সেকালে খবরের কাগজে বাহির হইত। দুই-এক জন ভারতীয় ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডের কোন-না-কোন শহরের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কোন জায়গার প্রতিনিধিরূপে নহে। এখন রাশিয়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র হইয়াছে। তাহাতে ইয়োরোপ ও এশিয়ার সব অংশের সব জাতির ধর্ম্মের ও ভাষার লোকদের অধিকার সম্পূর্ণ সমান।

কালাপানী পার হইলে জাতি যাইবার ভয়ে এবং সমুদ্রপথে ইয়োরোপ যাওয়া বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রথম প্রথম ত অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয়ই ইয়োরোপ গিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি শিখিতে পারিত। এখনও তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। কিন্তু যদি ইয়োরোপের সহিত ভারতবর্ষের যোগ রাশিয়ার মারফতে স্থলপথে হইত, তাহা হইলে নিষিদ্ধ সমুদ্রযাত্রার ভয় না থাকায় এবং ব্যয়বাহুল্য না থাকায় অনেক অধিকসংখ্যক লোক ইয়োরোপের বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির জ্ঞান লাভ করিতে পারিত।

এইরূপে কেবল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য সুবিধাগুলি ভারতীয়দিগের আয়ত্ত হইত, তাহা নহে; ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবও ইয়োরোপের উপর অধিক পরিমাণে পড়িত।

ভারতবর্ষের মত রাশিয়াতেও একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা ছিল। সুতরাং রাশিয়ার সংস্রবে ভারতে এ বিষয়ে সমাজবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা কম হইত।

ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক একটি গ্রাম স্বশাসক ছোট ছোট সাধারণতন্ত্রের মত ছিল, যাহাদিগকে ইংরেজীতে ভিলেজ্ কম্যুনিটিজ্ বলে। রাশিয়াতেও এইরূপ ভিলেজ কম্যুনিটিজ্ ছিল; ইংলণ্ডে নাই ও ছিল না। এই জন্য ইংরেজ-রাজত্বে যেমন ভারতীয় গ্রাম-সাধারণতন্ত্রগুলি লুপ্ত হইয়াছে, রাশিয়া ভাবতবর্ষের মালিক হইলে তাহা হইত না।

এত কথা লিখিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা ইংরেজের অধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জাতির অধীনতা বাঞ্ছনীয় মনে করিতাম বা এখন বাঞ্ছনীয় মনে করি। উদ্দেশ্য ইহাই দেখান যে, ইংরেজরা যে আমাদিগকে বলেন ভারতবর্ষ তাঁহাদের অধীনতায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে এবং অন্য কোন জাতির অধীনে কোন দিকেই ভারতবর্ষ অধিকতর সুবিধা পাইতে পারিত না, তাহা ভুল। কিন্তু অন্য কোন জাতির শাসন যদি ইংরেজশাসন অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত অনুমিত বা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতাই চাই, কাহারও অধীনতা চাই না।

কবি রঙ্গলাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন :—

> "দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ প্রায় হে, স্বর্গসুখ প্রায়,
> কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।"

বঙ্গদর্শনের নিরাকার ও সাকার রস

এক বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া বাঙালীরা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের গুণ গান ও শ্রবণ করিলেন, তাহার

নিরাকার সাহিত্যিক রসের আস্বাদনে মশগুল রহিলেন। তাহার পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে ও সমালোচনায় দেখিলাম, ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানী নামক এক কোম্পানী বঙ্কিমচন্দ্রের **বঙ্গদর্শন** পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিক্রী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙালীর "ন্যাশন্যাল" হইতে কোনই বাধা নাই—"ন্যাশন্যাল"-বিশেষণ-যুক্ত অনেক কারবার পূর্বে বাঙালীর ছিল এবং এখনও আছে। বাংলা সাহিত্যের যাহা গৌরবের বস্তু, তাহা পুনর্মুদ্রণ করাও বাঙালীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। বাঙালী নিরাকার সাহিত্যরসের আস্বাদনে পটু বলিয়া বিশেষ একটি সাহিত্যিক জিনিষের বাণিজ্যে যে সাকার আর্থিক রস আছে, তাহার সন্ধান পাইতে পারেই না, এমনও নহে। সেই জন্য আমাদের এ-সন্দেহ হয় নাই যে, যে-ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানী **বঙ্গদর্শন** আবার ছাপিতেছেন, তাহা বাঙালীর কারবার নহে। কিন্তু যখন এড্‌ভান্স কাগজে নিম্নমুদ্রিত খবরটি পড়িলাম, তখন বুঝিলাম ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানী বাঙালীর কারবার নহে, **বঙ্গদর্শনের** সাকার আর্থিক রসের সন্ধান বাঙালী পায় নাই, অন্যে পাইয়াছে।

Mr. Shew Bhagawan Bhubna, proprietor of the National Literature Company. Publishing House, who are bringing out reprint edition of Bankim's Bangadarshan, gave a Tea-Party on Saturday, the 20th May, at Stephen House to meet the members of its Advisory Committee and the Press.

Mr. S. Patel of the National Literature Company, welcoming the guests said that the Public had now before them a publication in a language which anybody should be proud to have as his mother-tongue and the Company and its Staff felt very much obliged for the kind sentiments expressed by the members of the Advisory Committee. He thanked them all and trusted that they would continue to lend their support and co-operation to the Company. Mr. Wajed Ali, third Presidency Magistrate, replied suitably on behalf of the guests.

Among those present were, Mr. Wajed Ali, Messrs. Keshub Ch. Gupta, Sourindra Mohan Mookerjee, Upendra Nath Ganguly, Surendra Nath Ganguly, Kalidas Roy, Provat Kumar Sastri, Subodh Roy, Bholanath Mookerjee and Anath Nath Mookerjee of the Calcutta Publicity Service.

যাঁহারা **বঙ্গদর্শন** পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও দোষ দিতেছি না। তাঁহারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত এমন একটি জিনিষ বাঙালীদিগকে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন যাহা টাকা দিয়াও পাওয়া যাইতেছিল না। দোষ আমরা বাঙালীদিগকেই দিতেছি এই কারণে যে, বঙ্গের নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য ত অবাঙালীর হস্তগত হইয়াছেই, শেষে কিনা বাঙালীর যাহা প্রধান গৌরবের বিষয় সাহিত্য, তাহাও পণ্যরূপে অবাঙালীর হাত হইতে আমাদিগকে কিনিতে হইবে!

শুনিয়াছি, ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানীর কোন কোন কর্ম্মচারী ও পরামর্শদাতা বাঙালী। অন্নের জন্য বাঙালীকে বাংলা দেশে অবাঙালীর জুতার দোকানেও কেরানীগিরি করিতে হয়। সুতরাং সাহিত্যের ব্যাপারী অবাঙালীর সাহায্য অর্থবিনিময়ে বাঙালী না করিবেন কেন?

যে চা-পান মজলিসের আয়োজন কোম্পানী করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙালী সাহিত্যিক অতিথিও ছিলেন। ইহা অসঙ্গত কিছু নহে।

রবীন্দ্রনাথের মতে একমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টিতেই বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বাণিজ্য কে করিতেছে, সে বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকদের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে।

কিন্তু বাঙালী পুস্তক-বিক্রেতা ও পুস্তক-প্রকাশক অন্ততঃ এমন কয়েক জন আছেন যাঁহাদের বেশ দু-পয়সা পুঁজি আছে। কয়েক বৎসরের **বঙ্গদর্শন** ছাপিয়া বিক্রী করা মোটেই অধিক অর্থব্যয়সাপেক্ষ নহে। তাঁহারা এই কাজটি কেন করিলেন না? বাঙালী সাহিত্যিকগণ **বঙ্গদর্শনের** নিরাকার রস আস্বাদনে (এবং যদৃচ্ছালব্ধ চা পানে) মশগুল থাকিতে পারেন, কিন্তু বাঙালী সাহিত্যবণিক্‌গণ ত অর্থলাভ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। তাঁহাদের উদ্যোগিতার অভাব কেন হয়?

বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলন

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় যে-সকল রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যবিধ সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি আলোচনার যোগ্য। সবগুলির উদ্দেশ্যের আমরা সমর্থন করি—যদিও মাসিক কাগজে সবগুলির পুনর্মুদ্রণ ও উল্লেখ সম্ভবপর নহে। বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলনের উল্লেখের একটি

কারণ ও প্রধান কারণ এই যে, ঐ জেলায় এরূপ সম্মেলন এই প্রথম হইল। যাঁহারা ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার জন্ম খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লীলাবতী রায় ইহার সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপর খুব জোর দিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এইরূপ পদ্ধতি 'প্রবাসী'তে এবং মহিলাদের অনেক সভায় আমাদের বক্তৃতায় বিবৃত হইয়াছে।

সম্মেলনে গৃহীত নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবটিতে সভানেত্রীর অভিভাষণের প্রভাব লক্ষিত হইবে।

"এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, যেহেতু বাঁকুড়া জেলায় নিরক্ষরতা অত্যন্ত বেশী, সুতরাং নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্ত বাঁকুড়া জেলা-কংগ্রেস মহিলা-সভা সচেষ্ট হউক এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করা হউক।"

সম্মেলনের আর দুইটি প্রস্তাব সামাজিক। যথা—

"এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, যেহেতু বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তের দরুন সারদা-আইন কার্য্যকরী হয় নাই, অতএব বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সংঘের পক্ষ হইতে এ-বিষয়ে মতামত গঠন করিবার জন্ত ও সারদা-আইনকে কার্য্যকরী ভাবে পরিবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা হউক।"

"এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, যেহেতু পণপ্রথা প্রচলিত থাকার দরুন আমাদের মেয়েদের বিবাহের অন্তরায় উপস্থিত হইয়া সমাজের ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং বাঁকুড়া জেলা-কংগ্রেস মহিলা-সংঘের পক্ষ হইতে এ-বিষয়ে আন্দোলন করিয়া পণপ্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হউক।"

রাষ্ট্রনৈতিক প্রস্তাবগুলি অন্যান্য জেলা-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অনুরূপ। যেমন—

"দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার লাভ করিবার জন্ত যে আন্দোলন চালাইতেছেন, এই সম্মেলন তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।"

"এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাঁকুড়া জেলার কংগ্রেস মহিলা-সংঘের একটি স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠন করা হউক।"

বঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যা

গত ২৩শে মে বঙ্গীয় রাষ্ট্রপরিষদে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাসের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন বলেন, ১৯৩৮ সালে বঙ্গে ৩৯৩১ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। ললিত বাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কত জন বেকার অবস্থার জন্ম আত্মহত্যা করিয়াছিল, এবং কত জন অন্নকষ্টে বা উপবাসে আত্মহত্যা করিয়াছিল। মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কেন যায় না? কে কি কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা পুলিসের কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থলে কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ই থাকে বটে, কিন্তু অনেক স্থলে কারণ জানা যায়। প্রশ্নকর্ত্তা যে দুটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া অন্য কারণও আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ ঐগুলিই প্রধান কারণ।

আরও দু-একটি প্রশ্ন হইতে পারিত। যেমন, আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে পুরুষ কয় জন, স্ত্রীলোক কয় জন। আমরা আগে কখন কখন বিবিধ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, ইয়োরোপে স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষরাই আত্মহত্যা করে বেশী। এখন ঠিক্ কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে জানি না—ইহা কয়েক বৎসর আগেকার কথা। স্ত্রীলোকদের চেয়ে অধিকসংখ্যক পুরুষদের আত্মহত্যা করিবার কারণ পুরুষদের জীবনে সংগ্রাম, উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের আধিক্য। বঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর রিপোর্টে দেখিতাম পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকরা আত্মহত্যা করে বেশী। কারণ এদেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদের জীবনে লাঞ্ছনা বেশী। এখন বেকার-সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করায় পুরুষরাই আত্মহত্যা বেশী করিতেছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা বঙ্গে হিন্দুদের মনে আশাভরসা কমান হইয়াছে এবং জীবনসংগ্রামে পরাজিতত্বের উদ্রেক বেশী করিয়া করা হইয়াছে। তাহার ফলে আত্মহত্যার আপেক্ষিক হার হিন্দুদের মধ্যে বেশী হইয়াছে কি না অনুসন্ধেয়।

আগে আমরা কোন কোন বৎসর ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশের সহিত তুলনায় বঙ্গে আত্মহত্যার হার বেশী

দেখাইয়াছিলাম। সব প্রদেশের রিপোর্ট নিকটে না থাকায় অধুনা অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিতে পারিতেছি না।

হিন্দুর হার হওয়াই চাই

সরকারী বাংলা প্রদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী—পুরুষ ও নারী, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলকে গণনার মধ্যে আনিয়া। মুসলমান যখন সংখ্যায় বেশী তখন সরকারী সব রকম চাকরীতে তাহাদের সংখ্যা বেশী হওয়া চাই। তাহারা মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪ জনের কিছু অধিক, স্বতরাং ভগ্নাংশটাকে ১ ধরিয়া শতকরা ৫৫টা চাকরী তাহাদের পাওয়া চাই।

চাকরী করে প্রধানতঃ লেখাপড়া জানা লোকেরা—একটু অধিক বেতনের চাকরী ইংরেজী জানারাই পায়। কিন্তু সাধারণ বাংলা লেখাপড়া জানা কিংবা ইংরেজী জানা, উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক বেশী। তথাপি চাকরী মুসলমানদিগকেই বেশী দিতে হইবে। আইনের পাস থাকিলে তবে মুন্সেফী প্রভৃতি কাজ পাওয়া যায়। আইন পাস করা মুসলমানের চেয়ে আইন পাস করা হিন্দুর সংখ্যা ঢের বেশী। তাহা হইলেও মুসলমানদিগকে মুন্সেফী প্রভৃতি বিচার-বিভাগের কাজ বেশী দিতে হইবে। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণেরা ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং পাস করা লোকেরা এঞ্জিনীয়ারিং, ...কাজ পাইয়া থাকে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিশিষ্ট লোকদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী। তথাপি ডাক্তারী প্রভৃতি বিভাগেও অধিকাংশ চাকরী মুসলমানদিগকে দিতে হইবে।

হিন্দুরা সংখ্যায় কিছু কম হইলেও সরকারী রাজস্বের রকম বার আনা হিন্দুরাই দেয়। তথাপি চাকরী দ্বারা রোজগারের পরিমাণটা মুসলমানদেরই বেশী হওয়া চাই।

বিদ্যার প্রত্যেক বিভাগে অধিকাংশ স্থলে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর কৃতিত্ব বেশী। যোগ্যতম লোক বাছিতে গেলে তাহাদের অধিকাংশ দেখা যায় হিন্দু। তথাপি, যোগ্যতা অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানকেই অধিকাংশ চাকরী দিতে হইবে।

মুসলমান-প্রধান বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলের সিদ্ধান্ত সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ঐ প্রকার। মুসলমানরা কেবলমাত্র সংখ্যায় বেশী বলিয়া এক্ষেত্রে সংখ্যার মাহাত্ম্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

কিন্তু যদি কোথাও হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী হয়, এবং অন্য সব দিকেও শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহারা সংখ্যার স্থবিধা, সংখ্যার অনুপাতে স্থবিধা, এবং অন্যান্য দিকে শ্রেষ্ঠতার স্থবিধা পাইবে না। দৃষ্টান্ত, নূতন কলিকাতা মিউনিসিপালিটি বিল।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এলাকাভুক্ত স্থানগুলিতে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী, করদাতাদের মধ্যে তাহারা সংখ্যায় বেশী, কর হইতে প্রাপ্ত টাকার শতকরা অন্যূন আশী টাকা তাহারা দেয়। অধিকাংশ ভোটদাতা তাহারা, শিক্ষিত কলিকাতাবাসীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা বেশী, সার্বজনিক অবৈতনিক কাজে তাহাদের উৎসাহ কৃতিত্ব ও যোগ্যতা বেশী। কিন্তু তথাপি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার স্থবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে তাহাদিগকে শক্তিহীন করিতে হইবে।

সরকারী বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের নেশায় সংজ্ঞাহীন মুসলমানপ্রধান বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলের জেদ উক্তরূপ।

হিন্দুদিগকে যেন তেন প্রকারেণ শক্তিহীন প্রভাবহীন ক্ষতিগ্রস্ত করিবার এই যে অপচেষ্টা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ইহার প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষী, এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ আছেন। সত্য ও ন্যায় তাঁহাদের পক্ষে।

—

সরকারী চাকরী শুধু রোজগারের উপায় নহে

সরকারী চাকরী যদি কেবল টাকা রোজগারেরই অন্যতম একটা উপায় হইত, তাহা হইলেও আমরা তাহাকে একটা তুচ্ছ জিনিষ মনে করিতাম না। উহা রোজগারের একটা সদুপায়। যোগ্যতা অনুসারে ঐ সদুপায় অবলম্বন কতকগুলি লোককে কেবল তাহারা হিন্দু বলিয়া কেন

করিতে দেওয়া হইবে না? রোজগারের অন্য সব ক্ষেত্রে ত ভাগবাটোআরা করিয়া দেওয়া হয় না। শতকরা কোন্ সম্প্রদায়ের কত লোক চাষী, দরজি, রাজমিস্ত্রী, সারেং মাঝি মাল্লা হইবে, তাহা ত গবর্মেণ্ট নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই।

কিন্তু সরকারী চাকরী শুধু রোজগারের উপায় নহে, উহা দেশের কাজ ও সেবা করিবারও একটা উপায়। উহাকে গোলামি বলিয়া অবজ্ঞা করিবার একটা ফ্যাশান আছে বটে। সরকারী হুকুমে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কিছু কোন সরকারী চাকর্যে করিলে তাহাকে গোলাম বলা চলে। কিন্তু সুবিচারক স্বাধীনচিত্ত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, বিদ্বান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ অধ্যাপক ও শিক্ষক, দুষ্টের দমনকর্ত্তা পুলিস কর্মচারী, যোগ্য ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার,—ইঁহারা সরকারী চাকরী করেন বলিয়াই গোলাম নহেন। ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট বিদেশী। সেই জন্য আমরা সবাই, সরকারী চাকরী করি বা না-করি, অল্পাধিক পরিমাণে গোলাম। যে পরিমাণে দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইতেছে ও হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের সকলেরই গোলামত্ব কমিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষীরা দেশের পরাধীনতার যে দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, সরকারী চাকর্যে বলিয়া কখন কখন তাঁহাদের বেদনা আরও মর্মান্তিক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা চাকর্যে হিসাবে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশই দেশসেবা জনসেবা নহে, সমস্তই গোলামি, ইহা স্বীকার্য্য নহে।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন সম্প্রদায়ের অনেক লোককে নিয়মের জোরে চাকরীতে বঞ্চিত করার মানে তাহাদিগকে দেশের সেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা।

রোজগারের দিকটা ছাড়িয়া দিলেও, চাকরী যে-কেহ পাক্ না কেন তাহাতে দেশের কিছু আসিয়া যায় না, ইহা সত্য নহে। সরকারী প্রত্যেক কার্য্যবিভাগে দক্ষ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, যোগ্য লোক চাই। নতুবা খাজনা আদায়, সুবিচার, অপরাধ দমন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষাদান, রোগের সহিত সংগ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষির বিস্তার ও উন্নতি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি, জলপথ ও স্থলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ও ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে যোগ্য লোকদের সরকারী চাকরী পাওয়া দেশের মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক। ইহা সত্য যে, সব স্থলে যোগ্যতমকে চাকরী দেওয়া হয় না; "মুরুব্বির জোর," আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি কারণে ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু এই অনিষ্টকর অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাত ও অন্যায় হয় বলিয়া, সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত ও অন্য সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি অবিচার কায়েমী করিতে যাওয়া যেমন শোচনীয় ও অনিষ্টকর, তেমনই হাস্যকরও বটে।

বাঙালীরা যে ইংরেজ-রাজত্বের গোড়া হইতে চাকরীর দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁকিয়াছে, তাহাতে তাহাদের মোটের উপর ক্ষতি হইয়াছে, বঙ্গেরও ক্ষতি হইয়াছে। বঙ্গের ছোটবড় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গোয়ালা ধোপা নাপিতের কাজ প্রভৃতি কৌলিক বৃত্তিও অবাঙালীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই সমুদয় কাজেও বাঙালীর প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যোগ্য, যোগ্যতর ও যোগ্যতম হিন্দু বাঙালীদিগকে সরকারী সব আপিস আদালত হইতে তাড়াইয়া দিলেই তাহারা সবাই রাতারাতি সওদাগর কারিগর বনিয়া যাইবে, মনে করা ভুল। সরকারী চাকরী ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে এবং অনেক যুবক রোজগারের অন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। আরও অনেককে সেই পথে চালিত করা আবশ্যক। কিন্তু সরকারী আপিস আদালত হইতে যোগ্যতমদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার উপায় নহে।

—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কংগ্রেসীদিগকে তাড়ান

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক ও "হোম" মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে হিন্দুদিগকে শক্তিহীন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে,

কংগ্রেসী দলকে তাড়ান বা শক্তিহীন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটা অদ্ভুত ও বে-নজীর। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বা অন্য কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভায় কোন [illegible] দলকে তাড়াইবার বা শক্তিহীন করিবার নিমিত্ত অন্য কোন দল কখনও আইন করিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

মন্ত্রিদ্বয় তাঁহাদের যাহা উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, তাহা যদি ন্যায়সঙ্গত মনে করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আইনে নিম্নলিখিতরূপ একটা ধারা কেন বসান নাই? যথা—

"কংগ্রেসের কোন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান শিখ পারসী বা অন্যধর্ম্মাবলম্বী সভ্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কৌন্সিলর বা অল্ডারম্যানের পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। কেহ কৌন্সিলর বা অল্ডারম্যান নির্বাচিত হইবার পর যদি কংগ্রেসের সভ্য হন, তাহা হইলে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির উক্তরূপ সভ্য থাকিতে পারিবেন না।"

—

রাজকোট ও বঙ্গদেশ

ভারতবর্ষের যে-কোন অংশ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহা নগণ্য ও তুচ্ছ নহে। সেই জন্য কংগ্রেসীরা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ৭৫০০০ মানুষের বাসভূমি রাজকোট লইয়া যত মাথা ঘামাইয়াছেন, উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কোন কোন প্রদেশের মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুতি জানাইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বা অনাবশ্যক হইয়াছে মনে করি না। কিন্তু সকলেরই— বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের মত প্রভাবশালী সংঘের নেতা ও সভ্যদের, সমদৃষ্টি ও মাত্রাজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা রাজকোটের জন্য (এবং অন্য ছোট ছোট দেশী রাজ্যের জন্যও) দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন (responsible self-government) চান, যাহাতে অধিবাসীদের সকলের বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার অবিচার না হয়। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা রাজকোটের চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঙ্গের শ্রম ও কৃতিত্ব রাজকোটের চেয়ে কম নয়। এ হেন বঙ্গদেশে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন আছে কি? বাংলা দেশের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডল অনেক বড় ও ছোট দেশী রাজ্যের চেয়ে দায়িত্বহীনভাবে কাজ করিতেছেন। কংগ্রেসের নেতারা ও কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যেরা এবং চারি আনার কংগ্রেস সভ্যও যিনি নহেন সেই কংগ্রেস-ডিক্টেটর মহাত্মা গান্ধী বাংলা দেশের কথা ভাবিতেছেন না কেন? গান্ধীজী বঙ্গের রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু জেলের বাহিরে যে-সব বাঙালী নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক গুণ বেশী। তাহাদের অবস্থার প্রতি কেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইতেছে না?

প্রভিন্স্যাল অটনমির বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের মানে অবশ্য এক দিক দিয়া "চাচা আপনা বাঁচা"ই বটে। কিন্তু এরূপ প্রাদেশিক সংকীর্ণতার একটু অসুবিধাও আছে। যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, সেখানে তাহারা যদি কংগ্রেস নেতাদিগকে বলে, "বঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী বলিয়া তাহাদের মন্ত্রীরা তাহাদের সংখ্যার পূরা অনুপাতে মুসলমানদিগকে চাকরী আদি সব দিতেছে, আপনারা তাহাতে টুঁ শব্দটিও করিতেছেন না; আপনাদের মৌন ঐ নীতিতে সম্মতির লক্ষণ। অতএব আমরা দাবী করিতেছি, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে শতকরা ৮৬টি সরকারী চাকরী, বিহারে শতকরা ৯০টি সরকারী চাকরী,... হিন্দুদিগকে দেওয়া হউক। এই দাবীর উত্তরে আপনারা কি বলেন জানিতে চাই," তাহা হইলে কংগ্রেস-নেতারা কি বলিবেন?

হিন্দু বাঙালীদের বলহীনতা

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন দ্বারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক হিন্দু বাঙালীদের প্রতি অবিচার করিয়াছে, তাহাদিগকে শক্তিহীন প্রভাবহীন করিয়াছে। ইংরেজরা সাধারণতঃ বাহুবল অস্ত্রবলকেই বল মনে করে। সে বল হিন্দু বাঙালীদের নাই। কিন্তু

সত্য ও ন্যায় তাহাদের পক্ষে। সত্য ও ন্যায়কে বলদৃপ্ত লোকেরা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, শক্তিহীন মনে করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

হিন্দু বাঙালীরা অন্য যে দিকে যত বলহীনই হউক, একটি কাজ তাহাদের অগ্রণীরা করিয়াছেন এবং এখন ও ভবিষ্যতেও করিবেন। ভারতবর্ষের যে-সকল লোক ভারতের এবং কিয়ৎপরিমাণে জগতের লোকমত গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু বাঙালী মনীষীদের সংখ্যা নগণ্য নহে। এই মনীষীদের অনেকে এখন পরলোকগত, কিন্তু সকলে নহেন, এবং তাঁহারা আধ্যাত্মিকবংশহীনও নহেন।

বলহীন হিন্দু বাঙালী আপনাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের বাহিরের জগতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্য মত গঠন করিতে থাকিবে।

সাংবাদিকের নাইট পদবী লাভ

ইংলণ্ডের রাজার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারত-প্রবাসী অনেক ইংরেজকে এবং ভারতবর্ষের অনেক লোককে উপাধি দেওয়া হয়। এবার এক জনের উপাধিলাভ অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। এলাহাবাদের লীডার কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিররাভরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি এখন সর্ সী ওয়াই চিন্তামণি হইলেন। তিনি খুব যোগ্য সম্পাদক। অনেক বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছিলেন, স্বাধীনচিত্ততা ও যোগ্যতার সহিত মন্ত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, এবং গবর্ণরের সহিত মতভেদ হওয়ায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ও তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর সম্পাদক আগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সর্ উপাধি পান নাই, তবে তিনি কেন পাইলেন, এ বিষয়ে কৌতূহল হইতে পারে। আনুমানিক দুটা কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক, তিনি কংগ্রেসের তীব্র সমালোচক; দুই, তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য সর্ জগদীশ প্রসাদের বৈবাহিক—সর্ জগদীশের কন্যার সহিত ডক্টর চিন্তামণির পুত্র সিবিলিয়ান বালকৃষ্ণ শ্রাওয়ের বিবাহ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের যোগ্যতা ভারতীয় কোন সম্পাদকের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাঁহার কিংবা অন্য কোন সম্পাদকের সরকারী উপাধি দ্বারা দাগী হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না। সম্পাদকদের প্রধান সমালোচ্য বিষয় গবর্মেণ্টের কাজ ও অ-কাজ। সেই জন্য, গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়।

বিষ্ণুপুরে সুতা ও কাপড়ের কল

বাংলা দেশে যত সুতা ও কাপড় বিক্রী হয়, তাহার অল্প অংশই বঙ্গে প্রস্তুত হয়, অধিকাংশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এবং ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আমদানী হয়। সুতরাং বাংলা দেশে যে কয়টি সুতা ও কাপড়ের কল আছে, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক মিল বঙ্গে স্থাপনের প্রয়োজন আছে এবং তাহা হইতে লাভও হইতে পারে। বঙ্গের কয়েকটি মিল লাভের সহিত চলিতেছেও।

বঙ্গে আরও মিল আবশ্যক বলিয়া বাঁকুড়া জেলার অন্যতম ও প্রাচীন শহর মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে একটি মিল স্থাপিত হইতেছে। সেখানে মিল করিবার সুবিধার কথা পরে বলিতেছি। প্রথমে একটা আপত্তির কথা বলি।

বাঁকুড়া জেলার বহু স্থানে, এবং বিষ্ণুপুরেও, গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়। সেই জন্য এইরূপ আপত্তি অনেকেরই মনে উঠিয়াছে যে, এত গরমে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কাজ চলা অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু নাগপুর বা দিল্লী অপেক্ষা বাঁকুড়ার গরম বেশী নয়। নাগপুরে ও দিল্লীতে বেশ লাভের সহিত সুতা ও কাপড়ের মিল বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাঁকুড়া জেলাতেও চলিবে। যে-যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারখানার ভিতরকার বায়ু অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও আর্দ্র রাখা যায়, তাহা যেমন নাগপুর ও দিল্লীতে অবলম্বিত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরেও সেইরূপ অবলম্বিত হইতে পারে ও হইবে।

বঙ্গের অন্য সকল জেলায় সুতা ও কাপড়ের মিল যে যে কারণে আবশ্যক, বাঁকুড়া জেলাতেও সেই সেই কারণে আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আরও কিছু কিছু কারণ আছে। একটি

এই যে, এই জেলা নানা কারণে বড় দরিদ্র; অন্নাভাব লাগিয়াই আছে, এবং তাহা মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়—যেমন এ বৎসর হইয়াছে। এই জেলার সাধারণ লোকদের মধ্যে ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। সাধারণ লোকেরা শ্রমিক রূপে নানা স্থানে গিয়া থাকে। সকল বেকারের জন্য কাজ জুটান কঠিন। কিন্তু সূতা ও কাপড়ের কল হইলে কতক লোকের আয়ের উপায় হইবে। বঙ্গের অনেক কারখানায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ শ্রমিকদের সহিত কাজ করেন। এখানেও করিবেন।

এখন বিষ্ণুপুরে মিল স্থাপন করিবার কথা বলি।

এখানে রেলওয়ে স্টেশনের নিকট এবং যমুনাবাঁধ নামক জলাশয়ের ও একটি নদীর নিকট মিলের জন্য বিস্তর জমি সামান্য মূল্যে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই মোট আড়াই হাজার টাকা দামে ছয় শত বিঘা জমি কেনা হইয়াছে এবং আরও তিন শত বিঘা লইবার কথা হইতেছে। পরে আরও পাওয়া যাইবে। ইহার উপর মিলের সব ঘরবাড়ী হইবে, এবং শ্রমিকদিগকে অল্পঅল্প জমিবিশিষ্ট আলাদা আলাদা কুটীর দেওয়া চলিবে। বঙ্গের অন্য কোন কোন মিলের জমি কিনিতেই লক্ষাধিক টাকা লাগিয়াছে।

এখানে কয়লা অপেক্ষাকৃত কম খরচে পাওয়া যাইবে, কারণ কয়লার খনি অপেক্ষাকৃত নিকটে।

সাধারণ শ্রমিক এখানে সাধারণ মজুরীতে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বয়নশিল্পী ও পাড়ের নক্সাকারীদের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে।

বাঁকুড়া জেলার যে-সকল তন্তুবায় নিজ নিজ গৃহে কাপড় বুনেন, তাঁহারা বিষ্ণুপুর মিল হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে সুতা পাইবেন।

বাঁকুড়া জেলার অনেক জমি তুলার চাষের উপযুক্ত। এখানে বর্ত্তমানে-অনাবাদী এরূপ হাজার হাজার বিঘা জমি সামান্য মূল্যে পাওয়া যাইবে। জেলার বহু শ্রমিক প্রতি বৎসর কাজের চেষ্টায় অন্য জেলায় যায়। এই শ্রমিকদিগকে এই সব অনাবাদী জমি তুলা উৎপাদনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে, বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে। বিষ্ণুপুর কটন মিল সম্প্রতি যত জমি লইয়াছেন ও লইতেছেন, আপাততঃ তাহারই কিয়দংশে তুলার চাষ আরম্ভ করাইবেন। জেলাতেই তুলা উৎপন্ন হইলে সূতার ও কাপড়ের দাম অপেক্ষাকৃত কম হইবে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরার হইতে তুলা আমদানী করিতে বিষ্ণুপুরে বঙ্গের অন্যান্য মিল অপেক্ষা দাম ও ব্যয় বেশী হইবে না, হয়ত কিছু কম পড়িবে।

মিলের জন্য রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে যেখানে জমি লওয়া হইয়াছে, নদী ও যমুনাবাঁধ তাহার নিকট হওয়ায় সাধারণ ব্যবহার্য্য জল যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। পানীয় জল ও অন্য আবশ্যক জলের নিমিত্ত গভীর নলকূপ বা অন্য কূপ খনন করা হইবে।

মিলটির কাজ শীঘ্র আরম্ভ করিবার ও তাহা লাভজনক করিবার নিমিত্ত ডিরেক্টরগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিষ্ণুপুর কটন মিলস লিমিটেড গত ১৭ই এপ্রিল রেজিষ্টারী করা হয়। উহার মূলধন ২৫ লক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। আপাততঃ ছয় লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী হইবে। গত ১৭ই মে তারিখের ডিরেক্টরদের মীটিঙে ১,০৭,৯৩০ টাকা মূল্যের শেয়ার বিলি হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ টাকার শেয়ার ডিরেক্টরগণই লইয়াছেন। ডিরেক্টরগণের ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে আরও প্রায় লক্ষাধিক টাকার অংশ লইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ১৯শে জুন ৪ঠা আষাঢ় মিলের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। পাঁচ টাকা হাজার ব্যয়ে বিস্তর ইট প্রস্তুত হইয়াছে। এক মাসের মধ্যেই ইমারত নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে, এবং যত সত্বর সম্ভব যন্ত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইবে।

এই কলটির কাজ যাহাতে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে ও লাভজনক ভাবে পরিচালিত হয়, ডিরেক্টরগণ তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এখন যে দশ জন ডিরেক্টর আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আট জন কৃতী ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসাদার, সূতা ও কাপড়ের ব্যবসা ও অন্য ব্যবসা করেন। ব্যবসার অভিজ্ঞতা তাঁহাদের যথেষ্ট আছে।

মিলের লাভ হউক বা না-হউক; ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স্‌ রাখিলে তাঁহাদিগকে একটা থোক টাকা দিতেই হয়, ও

তাহাতে অনেক টাকা বাহির হইয়া যায়। বিষ্ণুপুর মিলের কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ স্থানীয় ডিরেক্টররাই ইহার কাজ চালাইবেন। তাহার জন্ত তাঁহারা অতিরিক্ত কিছু পাইবেন না।

মিল হইতে লাভ হইবার পর তবে ডিরেক্টরগণ নীট লাভের শতকরা দশ টাকা পাইবেন, তৎপূর্ব্বে কিছুই পাইবেন না। নীট লাভের শতকরা নব্বই টাকা অংশীদারগণ পাইবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

—

মন্ত্রীদের প্রতিকূল সমালোচনা রাজদ্রোহ নহে

হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের সম্পাদক ও মুদ্রাকর বঙ্গের মন্ত্রীদের কোন কোন কাজের প্রতিকূল সমালোচনা করায় কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হন। তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করিয়া খালাস পান। কিন্তু হাইকোর্টের যে বিচারপতি বিচার করেন তিনি সাধারণ ভাবে এরূপ কোন মত প্রকাশ করেন নাই, যে, মন্ত্রীরা "গবর্ন্মেণ্ট" নহেন বা তাঁহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা রাজদ্রোহ নহে। অতঃপর লাহোরের একটি কাগজ পঞ্জাবের মন্ত্রীদের প্রতিকূল সমালোচনা করায় রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কিন্তু তথাকার হাইকোর্ট তাহার সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে এই বলিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে মুক্তি দেন, যে, মন্ত্রীরা যখন "গবর্ন্মেণ্ট" নহেন, তখন তাঁহাদের প্রতিকূল সমালোচনা বা নিন্দা রাজদ্রোহ হইতে পারে না।

"মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আক্রমণ দঃ বিঃ-র ১২৪(ক) ধারার আমলে পড়ে কি না", দৈনিক বসুমতীর বিরুদ্ধে (একটি প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং অপরটি অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে) আনীত দুইটি রাজদ্রোহের মামলায় এই প্রশ্ন উঠিলে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়েই এই প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্টের অভিমত প্রার্থনা করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, মিঃ নাসিম আলী ও বিচারপতি রাওকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চে ইহার শুনানী হয়। গত বুধবার বিচারপতিগণ মামলার রায় দিয়াছেন।

দৈনিক বসুমতীর ১২ই নবেম্বর ও ১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যায় যথাক্রমে, 'কালীপূজা ও রমজান' এবং 'নান্যঃপন্থা' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ এবং মুদ্রাকর শ্রীযুত শশিভূষণ দত্তকে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে হাইকোর্টের অভিমত জানিতে চাহেন—(১) ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৪৯ ধারার বিধান অনুসারে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী গবর্ণরের অধীন কর্ম্মচারী কি না, (২) মন্ত্রিমণ্ডলীকে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলা যায় কি না, এবং (৩) দঃ বিঃ-র ১৭ ধারায় একজিকিউটিভ গবর্ণমেণ্টের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীকে "একজিকিউটিভ গবর্ণমেণ্টের" অংশবিশেষ বলা যায় কি না।

প্রধান বিচারপতি রায়ে বলেন—তাঁহাদের মতে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর—'না'।

ইহা বিচারপতিত্রয়ের 'অভিমত' মাত্র, তাঁহাদের রায়, ডিক্রী, বা চূড়ান্ত আদেশ নহে। ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়ের আদালতে মোকদ্দমার বিচার শেষ হইলে, যদি হাইকোর্টে আপীল হয়, তখন হাইকোর্টের রায় বা চূড়ান্ত আদেশ জানা যাইবে। তখন যদি হাইকোর্টের বর্ত্তমান 'অভিমত'ই রায় বা চূড়ান্ত আদেশ হয়, তাহা হইলেই যে বঙ্গের মন্ত্রীরা হাল ছাড়িয়া দিবেন এবং সম্পাদকেরা মনের সুখে তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া লইবেন, এমন না-হইতেও পারে। হাইকোর্ট বর্ত্তমান আইন অনুসারে বিচার করিবার মালিক, কিন্তু নূতন আইন প্রণয়ন বন্ধ করিতে পারেন না। যদি বঙ্গের মন্ত্রীরা, তাঁহাদের সমালোচনাও রাজদ্রোহ, এরূপ আইন তৈরী করান, তখন সম্পাদকেরা আবার দরকার মত অভিযুক্ত হইতে পারিবেন।

—

অধ্যাপকের কার্য্যকালবৃদ্ধিতে আপত্তি

অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি এই কাজ বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধেও নাই। অধিকন্তু তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের সামান্য

অংশই তিনি নিজের জন্ম ব্যয় করেন। সমুদয় সঞ্চয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে জ্ঞানবিস্তারের জন্ম দেন। এইরূপে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়াছেন। তাঁহার এখন অবসর লইবার বয়স হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখনও বেশ কার্য্যক্ষম আছেন বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ (তন্মধ্যে বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার আজিজুল হক মহাশয়ও আছেন) তাঁহার কার্য্যকাল আর এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে চান। ইহাতে ছাত্রদের সুবিধা, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়েরও সুবিধা। অধিকন্তু তাঁহাকে আর এক বৎসর কাজ করিতে দিলে তিনি যে বেতন পাইবেন, তাহার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই পরে আসিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহার অধ্যাপকতার সময় এক বৎসর বাড়াইতে হইলে শিক্ষা-মন্ত্রীর অনুমোদন চাই। শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক অনুমোদন করিতেছেন না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্যকাল, একবার নহে, বার-বার বৃদ্ধির নজীর আছে। সরকারী শিক্ষা-বিভাগেও আছে। খবরের কাগজে শিক্ষা-বিভাগের এক জন মুসলমান কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল কয়েক বারে ছয় বৎসর বাড়ান হইয়াছে বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে 'ভয়ানক' বিদ্বান ও যোগ্য কর্ম্মচারী এরূপ কোন সংবাদ কোথাও দেখি নাই। ডক্টর মুখোপাধ্যায় খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু নহেন। সুতরাং হিন্দু বলিয়া যে মৌলবী ফজলল হক তাঁহার উপর বিরূপ তাহা নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "অপরাধ" বোধ হয় এই যে, তিনি কংগ্রেসের ন্যায্য প্রশংসা করেন, চাকরীর বাঁটোআরা প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান মন্ত্রীদের সাম্প্রদায়িক কুনীতির বিরোধী, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে এই বিরোধিতা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

—

বঙ্গে অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ

বঙ্গে অনেকগুলি জেলায় অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এ বৎসর এখনও দস্তুরমত বর্ষা আরম্ভ না হওয়ায় আবার হয়ত যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হইবে না। তাহা হইলে অবস্থা আরও কত খারাপ হইবে অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় না।

মানুষ যখন প্রথম অন্যের দুঃখের কথা শুনে, তখন তাহার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়, তাহার সামর্থ্য থাকিলে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমাগত বা বার-বার দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে বঙ্গের লোকদের তাহা সহিয়া গিয়াছে। এখন দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে জনহিতৈষীরা সহজে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া সাহায্যকেন্দ্র খুলিতে চান না, সর্ব্বসাধারণেও টাকা দিতে অগ্রসর হয় না। ইহাও সম্ভব যে, বঙ্গের হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। হিন্দুরাই দুর্ভিক্ষে টাকা দিত—প্রধানতঃ যে তাহারাই দিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের অবস্থা মন্দ হইলে কে সাহায্য করিবে?

কুটীরশিল্পসমূহের হয় বিনাশ নয় অবনতি বশতঃ চাষ ভিন্ন অধিকাংশ সাধারণ লোকের অন্য আয়ের উপায় নাই। তাই কোন বৎসর চাষ নিষ্ফল হইলে দেশে হাহাকার উঠে।

এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকার আবশ্যক।

কিন্তু আপাততঃ নিরন্ন মানুষগুলিকে ত বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এই সমস্যাটি "ফরোআর্ড ব্লক" গঠন, চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল, প্রভৃতি বিষয় অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ কম পাইতেছে। অথচ ইহা জীবনমরণের ব্যাপার। আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলির গুরুত্ব অস্বীকার করি না, স্বীকারই করি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের নিরন্ন অবস্থাও গুরুতর সমস্যা।

নিরন্ন চাষীদের অবস্থা এ বৎসর আরও খারাপ হইবার কারণ কৃষিঋণসালিসীর আইন। এই আইন মহাজনীর মূলে কুঠারাঘাত করায় মহাজনেরা ঋণ দিতেছে না। গবর্মেণ্ট মহাজনী নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জায়গায় চাষীদের ঋণ পাইবার আর কোন সহজ উপায় এ পর্য্যন্ত করিয়া দেন নাই।

আমরা গত মাসে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার এলাকার অবস্থা কিছু জানিয়া আসিয়াছি। তথাকার প্রধান জনহিতকর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের গত ২৭শে মে তারিখের চিঠির কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গঙ্গাজলঘাটী থানার প্রায় অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ পাঁচটি ইউনিয়ন, বিশেষ ভাবে বিপন্ন। প্রত্যেক ইউনিয়নেই একটি করিয়া রিলীফ কমিটি গঠন করতঃ সরকারী তহবিল হইতে কিছু কিছু অর্থ প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হইতেছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অন্যান্য প্রকারের অথর্ব্ব ব্যক্তি। **নিঃস্ব ভদ্র গৃহস্থ, যাহাদের দুর্দ্দশা অতি চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, উক্ত তহবিল হইতে তাহাদিগকে সাহায্য দিবার কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই।**

"কৃষিঋণ এ পর্য্যন্ত বণ্টিত হয় নাই, শীঘ্রই লোকেরা উহা পাইবে আশা করা যাইতেছে।

"প্রস্তাবিত মহাজনী আইন এবং স্থানীয় ঋণসালিশী বোর্ডের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট কোনরূপ ঋণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। ঐসব ঋণ স্থানীয় লোকেরা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত দায়িত্বে লইত। বর্ত্তমানে বাঁকুড়া কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, অন্যূন পনের জনকে লইয়া দল বাঁধিতে পারিলে, 'অসীম' দায়িত্বে নয় টাকা ছয় আনা হার সুদে, চারি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত (সদর মহকুমায়) কৃষকগণকে ঋণ দিতে প্রস্তুত আছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐরূপ সমবেত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে গ্রামে অন্যূন পনের জনের একজোট হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মহাজনী আইন ও ঋণসালিশী বোর্ডের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, কম সুদে ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে টাকা ধার পাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে সে অবস্থার প্রতিকার হইবে না। সরকার হইতে তাগাবী ঋণ দিবার যে প্রথা আছে, উহা সম্পত্তিবান্ ব্যক্তিগণকে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত দায়িত্বেই দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কগুলি হইতে ঐরূপ ভাবে টাকা পাওয়া উচিত।

"আপনার এখানে আগমনের পরদিবসই, এখানের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ইউনিয়নগুলি হইতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তাঁহারা নিজ নিজ ইউনিয়নের অবস্থা তদন্ত করিয়া অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে বিশেষ কিছু অর্থসাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় এখানের কমিটি নিয়মিত ভাবে কিছু সাহায্য প্রদানের সাহস করে না। যাহাতে বিপন্ন ব্যক্তিগণকে ইউনিয়ন রিলীফ কমিটি হইতে সাহায্য দেওয়াইতে পারা যায় তজ্জন্য সকলে বিশেষ চেষ্টা করিবেন, কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা করিতে হইলেও সাময়িক সাহায্য হিসাবেও সপ্তাহে ৩।৪ মণ চাউল বা ১২।১৪ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে।

অন্ততঃ এই সামান্য পরিমাণ চাউল বা টাকা যাহাতে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে আমরা বাঁকুড়ার সহৃদয় নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। বাঁকুড়ার মহিলাসঙ্ঘ মুষ্টিভিক্ষার পাত্র শহরের প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগের সহযোগিতায় সাপ্তাহিক সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন। গোবিন্দবাবু জেলার কেবল একটি অংশের কথা লিখিয়াছেন। অন্য কোন কোন অংশেও অন্নাভাবে লোকে বিপন্ন হইয়াছে।

গোবিন্দবাবুর চিঠিতে বাঁকুড়ার চাষীদের ঋণ পাইবার দুঃসাধ্যতা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐরূপ অবস্থা অন্যান্য জেলাতেও হইয়াছে।

"বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী"

কলিকাতার ৩৫।১০ নং পদ্মপুকুর রোড ভবন হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ "বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী" নাম দিয়া একটি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। উহার কোন মূল্য লেখা নাই। বোধ হয় বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৩৪৫ সালের ১৯শে মাঘ, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার ও বাঙ্গালা ভাষার রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার দাবী সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহার বিবরণ এই পুস্তিকায় আছে। ইহাতে এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, ও সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচনা-সভায় স্থিরীকৃত সুবিবেচিত প্রস্তাবগুলি এই পুস্তিকায় আছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গীয় হিন্দু সভায় গৃহীত ইংরেজীতে লিখিত দুটি প্রস্তাব, জ্যোতিষবাবুর লেখা "বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা "বাঙ্গালা ভাষার যোগ্যতা" সম্বন্ধীয় অন্য একটি প্রবন্ধ, এবং তিনটি পরিশিষ্টে "বাঙ্গালা

ভাষার সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে বিশ্বভারতী সম্মেলন সভায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি", বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় আজিজুল হক মহাশয়ের অভিমত, এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি নিবন্ধিকা ইহাতে আছে। শিক্ষিত বাঙালীদের এই পুস্তিকাটি পড়া উচিত

অক্ষয়কুমার দত্ত

বালী সরস্বতী পাঠাগার সমুদয় বাঙালীর একটি কর্ত্তব্য করিয়াছেন—অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের ৫৩তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় তাঁহার একটি আলেখ্য পাঠাগারে স্থাপিত করিয়াছেন। অক্ষয় দত্ত বাংলা গদ্যের অন্যতম গঠনকর্ত্তা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তিনি অন্যতম স্রষ্টা। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া গত শতাব্দীতে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্গের অগণিত বালকবালিকার চরিত্র প্রভাবিত ও গঠিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগে তাঁহার নানাবিধ প্রবন্ধ এরূপ বহু যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিদের দ্বারাও পঠিত হইত যাঁহারা নানা গভীর বিষয়ে গম্ভীর রচনা অধ্যয়ন করিতে চাহিতেন। যাহা পড়িলে মানুষের মনে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, উদ্দীপনা আসে, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এরূপ বহু বাক্য দৃষ্ট হয়।

—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী

আমরা অবগত হইলাম, আগামী মাঘ মাসে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মের পর এক শত বৎসর পূর্ণ হইবে। যাঁহারা তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা শুধু তাঁহার রচনার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে জানেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ত এরূপ স্মৃতি-উৎসব চাহিবেনই। প্রধানতঃ এই উৎসব শান্তিনিকেতনেই হইবার কথা। অন্যত্রও হইবে।

তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে নিভৃতে থাকিতে ভালবাসিতেন। জীবনের শেষ বহু বৎসর শান্তিনিকেতন পল্লীতে যাপন করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কবি ও দার্শনিক বলিয়া সাহিত্যরসগ্রাহী ও দার্শনিকজ্ঞানলিপ্সু-দিগের নিকট পরিচিত। তিনি রাষ্ট্রনীতিতে কখনও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতাকামী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি সমর্থন করিতেন। মহাত্মাজী তাঁহার সমর্থন পাইয়া উৎসাহ বোধ করিতেন

যাঁহারা কবিতা, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি—কোন কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋষিপ্রতিম জীবন, বালকের মত সরল হৃদয়, ও সকল জীবে প্রীতির কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া ও ভাল না-বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সরল অট্টহাস্য তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দিত।

তিনি রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা বলিয়া এণ্ড্রুজ সাহেব ও আরও অনেকে তাঁহাকে বড়দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শান্তিনিকেতনের কলেজ

বিশ্বভারতীর যে শিক্ষালয়টিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম পাঠভবন। তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষালয়টিকে বলা হয় শিক্ষাভবন। আমরা ইহাকেই চলিত ভাষায় শান্তিনিকেতনের কলেজ বলিয়াছি। এই দুটি শিক্ষালয় ব্যতীত শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর উচ্চতর একটি অংশ আছে, তাহা বিদ্যাভবন। এখানে সাংস্কৃতিক (cultural) গবেষণা হইয়া থাকে।

আগামী ১লা জুলাই বিশ্বভারতীর শিক্ষাবৎসর আরম্ভ হইবে। তদুপলক্ষ্যে এখানকার কতকগুলি সুবিধার কথা ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

অন্য সকল স্কুলকলেজে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানেও তাহা দেওয়া হয়। অধিকন্তু বিশ্বভারতী আবাসিক

প্রতিষ্ঠান (residential institution) বলিয়া, ছাত্রছাত্রীদের পরস্পর সাহচর্য্য ও অধ্যাপকবর্গের সংস্পর্শ লাভের সুযোগ এখানে অধিক।

বিশ্বভারতীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যাহা শিখিতে হয়, তাহা ছাড়া চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা নন্দলাল বসুর মত শিল্পাচার্য্যের পরিচালনায় শিখিতে পারা যায়। তদুপরি যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত শিখিবার সুব্যবস্থা আছে। যাঁহারা নৃত্য শিখিতে চান, তাঁহারা সুরুচিসঙ্গত উৎকৃষ্ট নৃত্য এখানে শিখিতে পারেন।

কলিকাতার মত বড় শহরের অনেক আকর্ষণ আছে, যাহার সহিত মফঃসলের কোন জায়গার প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। কলিকাতার মত উন্মাদক বিরাট্ রাজনৈতিক সভা শান্তিনিকেতনে হইতে পারে না। এই জন্য বহু ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কলিকাতার আকর্ষণ বেশী। কিন্তু রাজনীতি শিক্ষার পক্ষে যেরূপ রাজনৈতিক বক্তৃতা, বিতর্ক সভা, আলোচনা আবশ্যক, তাহা শান্তিনিকেতনে হইতে পারে ও হয়। কলিকাতার বড় বড় ফুটবল ম্যাচ শান্তিনিকেতনে হয় না, কিন্তু খেলা খুব হয়, ম্যাচও হয়; এবং খেলায় সকলেরই যোগ দিবার সুবিধা শান্তিনিকেতনে কম নয়—বোধ হয় বেশী। খেলা দেখায় আমোদ অবশ্যই আছে—সে সুখ শান্তিনিকেতনেও পাওয়া যায়; কিন্তু নিজে খেলিতে পারিলে তবে খেলার সুখ ও উপকার দুই-ই পাওয়া যায়।

কলিকাতার একটা বড় আকর্ষণ সিনেমা। সিনেমার সমালোচনা না-করিয়াও ইহা বলা যায় যে, তাহার সবটাই ভাল নহে। উহা হইতে যখন যতটুকু নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, শান্তিনিকেতনের নৃত্যসম্বলিত অভিনয়, শুধু অভিনয়, এবং বৎসরের কয়েকটি ঋতু-উৎসব হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের অভিনয় দেখিবার জন্য কলিকাতার লোকদিগকে টাকা খরচ করিতে হয়, শান্তিনিকেতনে বিনা ব্যয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা তাহা উপভোগ করেন।

কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের যে-সব ঋতু-উৎসব হয় (এবং নৃত্য গীত অভিনয়াদিও যাহা হয়), তাহাতে শান্তিনিকেতনের উৎসবের প্রধান যে অঙ্গ, তাহা থাকে না। তাহা প্রাকৃতিক পটভূমিকা। এই পটভূমিকার অভাবে যে কোন ঋতু-উৎসব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা শহুরে মন লইয়া বুঝা যায় না, শহুরে মনকে বুঝানও কঠিন। কলিকাতায় অমাবস্যা পূর্ণিমা দুই সমান। এখানে প্রকৃতির নানা রূপ, নানা বেশ, নানা রস-পরিবেষণ আমাদের অগোচর। শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নববর্ষাসমাগম দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

প্রকৃতির নিবিড় ঘনিষ্ঠ সঙ্গ শান্তিনিকেতনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সুবিধা। এই সঙ্গ পরীক্ষায় বেশী মার্ক পাইতে সমর্থ করে না বটে, কিন্তু শহরের চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলির মত অসমর্থও করে না।

ভারতবর্ষের নানা অংশ ও ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দেশ হইতে মানুষ আসে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক দর্শন ও সংস্পর্শ লাভের আশায়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের এই সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে বহুবার ঘটিতে পারে। যখন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা দিতেন ও চিত্তবিনোদন করিতেন, সে-দিন এখন নাই বটে; কিন্তু এখনও ত তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচনা পড়িয়া শুনান, আবৃত্তি করেন এবং অভিনয়াদি শিক্ষা দেন।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রীরা নির্ম্মল উন্মুক্ত প্রান্তরে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বেড়াইয়া দেহমনকে সুস্থ রাখিতে পারেন। এ-সুবিধা কোন শহরে হইতে পারে না। এখানে বড় লাইব্রেরি, সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রাদির সংগ্রহ, ইলেকট্রিক লাইট, জলের কল, ডাক ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি শহরের সুবিধা আছে, আবার পল্লীজীবনের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শও আছে।

শুধু সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ নহে। পল্লীসংস্কার ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে যে-সব বড় কথা শুনা যায়, বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে তাহা কাজে করা হয় ও শিখান হয়। সেখানে কৃষি, নানাবিধ কুটীর শিল্প প্রভৃতিও শিখান হয়। যাঁহারা সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারা সংগীতাদির মত এগুলিও শিখিতে পারেন।

কাগাওআ জাপানের এক জন জগদ্বিখ্যাত জনহিত-

কর্ম্মী ও শান্তিকামী। তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কাগাওআ বলেন, বাংলা দেশে তিনি গোসাবা দেখিতে যাইবেন (যেখানে সর্ ডানিয়েল হামিল্টনের জমিদারী ও তাঁহার মতানুযায়ী আদর্শ গ্রাম আছে)। গান্ধীজী প্রশ্ন করেন, "শান্তিনিকেতন যাইবেন না?" তিনি "না" বলায় মহাত্মাজী বলেন, "গোসাবা গোসাবা, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ" ("Well—Gosaba is Gosaba, but Santiniketan is India")। ইহার অর্থ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা এখানে করা চলিবে না। দু-একটা কথা মাত্র বলি। শান্তিনিকেতনে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের ছাত্রছাত্রী একত্র শিক্ষা পায়, অধ্যাপকদের মধ্যেও কয়েক প্রদেশের লোক আছেন, নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির চর্চা এখানে হয়। তাহার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরের কোন কোন অধ্যাপকও এখানে কাজ করেন। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি চৈনিক। তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ চীন-ভবনে করা যায়। এখানে যেমন ভারতভক্তি সেইরূপ বিশ্বমৈত্রীরও অনুপ্রাণনা ও সৌরভ অনুভূত হয়।

বিশেষ কোন ধর্ম্মমত প্রচারের স্থান ইহা নহে। কিন্তু ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট করিবার ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় আশ্রমসচিবকে চিঠি লিখিলে বেতন, শিক্ষণীয় বিষয় ও নিয়মাবলী জানিতে পারা যায়।

—

"ফরোআর্ড ব্লক"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার পর একটি "ফরোআর্ড ব্লক" গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। "ব্লক" কথাটি ইউরোপ ও আমেরিকায় ঠিক "দল" কথাটির সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয় না। বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দলের কতকগুলি লোক যদি একজোট হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমষ্টিকে ব্লক বলা হয়।

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষবাবুর যে-সকল চিঠি গত ১৪ই মে ইংরেজী দৈনিক কাগজগুলিতে বাহির হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, সুভাষবাবু কংগ্রেসের একাধিক দলের লোক লইয়া ওআর্কিং কমীটি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ধারণা এইরূপ যে, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নামে অভিহিত কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে ভিত্তিগত মতপার্থক্য আছে। এই কারণে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক লইয়া ওআর্কিং কমীটি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না ও নহেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এক রকম মতের লোক লইয়া ওআর্কিং কমীটি গঠিত হওয়া উচিত; এবং সুভাষবাবুর পদত্যাগ ও বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের নির্ব্বাচনের পর সেইরূপ ওআর্কিং কমীটি গঠিত হইয়াছে। গান্ধীজী ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যে যে দলের মধ্যে মতের মিল নাই, তাঁহারা, পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া, নিজ নিজ পন্থা অনুসরণ করিতে পারেন। সুভাষবাবু ফরোআর্ড ব্লক গঠন করিয়া গান্ধীজীর পরামর্শ, নির্দেশ বা ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিতেছেন বলা যাইতে পারে। সুতরাং গান্ধীজীর মতাবলম্বী কংগ্রেসীরা সুভাষবাবুর স্বতন্ত্র ব্লক গঠনের যে প্রতিকূল সমালোচনা করিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

অবশ্য ফরোআর্ড দল যাহা করিবার চেষ্টা করিবে সুভাষ বাবু বলিতেছেন, তাহার সমালোচনা করিবার অধিকার অন্য সকলের মত দক্ষিণপন্থীদেরও আছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল অঞ্চল হইতেই সুভাষবাবু ফরোআর্ডদল গঠনের সমর্থন পাইতেছেন। সমর্থকদের সংখ্যা কত, জানা যায় নাই। কার্য্যকালে তাঁহারা সমর্থক থাকিবেন কি না, তাহাও বলা যায় না। সুভাষবাবু যখন দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতি হইবার প্রয়াসী হন, তখন সমাজতন্ত্রীদল খবরের কাগজে তাঁহার ঐ উদ্যমের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরীতে পন্তজীর যে প্রস্তাব দ্বারা সুভাষবাবুর হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং যাহার দ্বারা

পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়, সমাজতন্ত্রী সদস্যদের অধিকাংশ সেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে যাহারা মানুষকে গাছে উঠাইয়া দিয়া মইটি সরাইয়া লইতে পারে।

আজ কাল দৈনিক কাগজে এত রকম মানুষের এত রকম ও এত দীর্ঘ বক্তৃতা ও স্টেটমেণ্ট বাহির হয় এবং সুভাষ বাবুও সম্প্রতি এতগুলি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, যে, আমরা স্বীকার করিতেছি, এই সকল মুদ্রিত জিনিষের অতি সামান্য অংশই আমরা পড়িয়াছি। মানবজীবন খুব দীর্ঘ নহে। তাহার খুব বেশী অংশ স্টেটমেণ্ট ও বক্তৃতা পাঠে ব্যয় করা চলে না। ফরোআর্ড ব্লক কি কাজ করিবে সে বিষয়ে আমরা সুভাষবাবুর বক্তব্য যতটুকু পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই ব্লকের প্রধান কাজ হইবে কংগ্রেসীদের মধ্যে এবং অপরাপর ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্লবিক ও সাংগ্রামিক মনোভাব জাগাইয়া তোলা। অবশ্য ইহা কথিত হইয়াছে যে, ফরোআর্ড ব্লক কংগ্রেসের অহিংসামূলক নীতি মানিয়া চলিবে। সুতরাং এই ব্লক বৈপ্লবিক ও সাংগ্রামিক মনোভাব জাগাইয়া যে সংগ্রাম চালাইবেন ও বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষ হইতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ এবং রক্তপাত করা হইবে না। স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত আবশ্যক হইলে নীতির দিক্ দিয়া আমাদের এরূপ সংগ্রামে ও বিপ্লবচেষ্টায় কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সংগ্রামের কাজের ও বৈপ্লবিক কাজের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের না-থাকায় আমরা বলিতে পারি না বৈপ্লবিক চেষ্টা করিলে এখন তাহা সফল হইবে কি না।

মহাত্মা গান্ধীর এরূপ কাজের অভিজ্ঞতা আছে, এবং দেশের কিরূপ অবস্থায় এবং জনগণের মনোভাব কিরূপ থাকিলে বিপ্লবচেষ্টা অহিংসভাবে চালান যায়, তাহা তিনি জানেন। তিনি মনে করেন অহিংস সংগ্রাম চালাইবার মত জাতির মনোভাব ও দেশের অবস্থা বর্ত্তমানে নাই। অন্য দিকে সুভাষবাবু মনে করেন, আছে কে ঠিক বুঝিয়াছেন, বলিবার মত অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের ধারণা গান্ধীজীর মত উপেক্ষণীয় নহে।

সুভাষবাবুর একটি অভিযোগ এই যে, কংগ্রেস-নেতা ও কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা বাড়িয়াছে। ইহা সত্য কথা। বহু পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, পার্লেমেণ্টারী মনোভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে ("Parliamentary mentality has come to stay")। তাহার ফলে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিদল গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তর অংশে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট প্রণীত আইনসমূহ বলবৎ রাখিতে হয়। তাঁহারা ও তাঁহাদের কংগ্রেসী সহচর ও অনুচরেরা বিপ্লবী হইবেন কি প্রকারে? বিপ্লব-চেষ্টার অর্থই হইতেছে প্রচলিত আইন-কানুন প্রয়োজনমত অমান্য করা।

সুভাষবাবু অহিংস বিপ্লবচেষ্টা করিবার জন্য, অর্থাৎ অহিংস ভাবে প্রয়োজনমত আইন অমান্য করিবার জন্য, অল্লাধিক লোক সকল প্রদেশেই পাইবেন। আগে যখন কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ ও অহিংস আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন, নূতন ভারতশাসন-আইন তখন প্রণীত হয় নাই, "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" ("প্রভিন্সিয়াল অটনমি") তখন ছিল না। এখন ঐ "আত্মকর্তৃত্ব" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আটটি প্রদেশে "কর্ত্তা" হইয়াছেন কংগ্রেসীরা। এখন "ফরোআর্ড ব্লক" অহিংস আইনলঙ্ঘন আরম্ভ করিলে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইবে যে, কতকগুলি কংগ্রেসী আইনভঙ্গ করিবেন এবং অন্য কতকগুলি কংগ্রেসী "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় যাঁহারা কংগ্রেসীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন, তাঁহারা অ-কংগ্রেসী এবং ব্রিটিশ আমলা বা তাঁহাদের আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী। এখন অসহযোগ আরম্ভ হইলে যাঁহাদিগকে সম্ভবতঃ কংগ্রেসী অসহযোগীদিগের দণ্ডদাতা হইতে হইবে, তাঁহারা হইবেন ব্রিটিশ আইনের আজ্ঞাকারী কংগ্রেসী। এই প্রকারে কংগ্রেসী কংগ্রেসীতে গৃহবিরোধ আরম্ভ হইবে। তবে যদি ফরোআর্ড ব্লক খুব দলে পুরু ও প্রবল হইতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে

বাধ্য হইতে পারেন ভবিষ্যতে ঠিক্ কি ঘটিবে বলা যায় না।

ঢাকার হিন্দু-বিধবা-আশ্রম

ঢাকার হিন্দু-বিধবা-আশ্রমে সকল হিন্দু জাতির অসহায়া চল্লিশ জন বিধবাকে আশ্রয় ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে এখনও ১০।১২টি বিধবার স্থান আছে। প্রত্যেকের নিকট হইতে আশ্রমে বাসের ও আহারের ব্যয় মাসিক ছয় টাকা মাত্র লওয়া হয়। এখানে মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা এবং বস্ত্রবয়ন, সেলাইয়ের কাজ, মোজা প্রভৃতি বুনা, খেলনা প্রস্তুতি, রেখাঙ্কন, প্রভৃতি শিল্প বিনাবেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অত্যধিক দারিদ্র্যের প্রমাণ দিলে মাসিক দেয় ছয় টাকার পরিবর্ত্তে অল্প কয়েক জনের নিকট হইতে তিন টাকা লওয়া হইতে পারে। আশ্রমটি শহরের বাহিরে একটি সুন্দর বিরলবসতি স্থানে দু-তলা বাড়ীতে অবস্থিত। আমরা তাহা দেখিয়াছি। আশ্রমে ভর্ত্তি হইবার ও থাকিবার নিয়মাবলী, পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা, ঠিকানায় উহার সেক্রেটরীকে চিঠি লিখিলে পাওয়া যায়।

—

লোকসংখ্যা-গণনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আগামী দশবার্ষিক লোকসংখ্যা গণনা হইবে। তাহাতে এতাবৎ-প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন এই অজুহাতে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ব্যয় বেশী হয়। কিন্তু যেরূপ ব্যয়-সঙ্কোচে গণনার নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কমে, সেরূপ ব্যয়সংক্ষেপ কখনই করা উচিত নয়। গবর্মেণ্ট বড় বড় অনাবশ্যক অনেক ব্যয় করিতে থাকেন, অথচ যাহা আবশ্যক এরূপ ছোট ছোট অনেক ব্যয় ছাঁটিয়া দিতে চান। এক একটা আফিসের ব্যয় কমাইবার কথা উঠিলে তাঁহাদের চোখ পড়ে পেয়াদা চাপরাসী ঝাড়ুদারদের উপর, উচ্চবেতনভোগী কর্ম্মচারী একজনও অনাবশ্যক কিনা তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিবেচিত কচিৎ হয়।

লোকসংখ্যা-গণনা যাহাতে ভ্রমশূন্য হয় এবং বৃহত্তম জনসমষ্টির অধিকতম প্রয়োজন সিদ্ধ করে, এইরূপ প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। তাহাতে কিছু বেশী খরচ হইলে তাহা অপব্যয় নহে।

অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, জড়বুদ্ধি, দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত প্রভৃতি লোকদিগের গণনা বন্ধ করা অনুচিত।

এ-পর্য্যন্ত একই তারিখে সব জায়গার লোক গণিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গণনা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এরূপ করিলে যাহারা ভ্রাম্যমাণ থাকিবে বা দুই তারিখের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিবে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক দুইবার গণিত হইবে, এবং কতক একেবারেই গণনা হইতে বাদ পড়িবে। সুতরাং একই তারিখে সর্ব্বত্র গণনা হওয়া আবশ্যক।

আমরা মতে এবং আচরণে জাতিভেদের বিরোধী। কিন্তু জাতিভেদ যত দিন আছে, তত দিন ভিন্ন ভিন্ন জাতির (caste-এর) লোকদের গণনা আবশ্যক। তাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি অবনতি এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, বৃত্তি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নিরূপিত হইতে পারে। তাহা হওয়া আবশ্যক।

যদি জাতি লেখা ও জাতির লোকসংখ্যা-গণনা বাদ দিতেই হয়, তাহা হইলে সকল জাতির (caste-এর) পক্ষেই তাহা করা উচিত। কিন্তু তপসিলভুক্ত জাতিদের সংখ্যা গোনা হইবে, কারণ তাহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ইহা আবশ্যক! ব্রিটিশ ভেদবুদ্ধির যাহা সহায়ক তাহা রাখিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক প্রয়োজনে যাহা আবশ্যক বর্ণ-হিন্দুদের ("caste Hindus"-দের) বেলায়, সামান্য একটু ব্যয় বাড়িবে বলিয়া তাহা করা হইবে না!

লোকসংখ্যা-গণনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা উপরে যে-সব আপত্তি জানাইলাম, তাহাতে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের এতদ্বিষয়ক মন্তব্য অনুসৃত হইয়াছে। ঐ মন্তব্য সমর্থনযোগ্য।

সমগ্রভারতীয় পণ্যশিল্পবিষয়ক পরিকল্পনা

সুভাষ বাবুর সভাপতিত্বের সময় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগিতায় সমগ্র ভারতবর্ষের নিমিত্ত পণ্যশিল্প-বিষয়ক পরিকল্পনা রচনার জন্য যে কমীটি নিযুক্ত হয়, পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু তাহার সভাপতি মনোনীত হন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সেই কমীটির অধিবেশনে অনেকগুলি সব-কমীটি নিযুক্ত হইয়াছে।

এক সময় রাশিয়া পণ্যশিল্পবিষয়ে ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর ছিল। বিপ্লবের পর রাশিয়া সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়া পাচ পাচ বৎসরে কি কি পণ্যশিল্পের কারখানা স্থাপন করিবে এবং তাহাতে কি কি জিনিষ কত প্রস্তুত হইবে, তাহার পরিকল্পনা ও তালিকা প্রস্তুত করে। তদনুসারে কাজ হওয়ায় এখন পণ্য-শিল্পবিষয়ে রাশিয়া অনেক অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া কাৰ্য্যতঃ অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে নানা শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় একটি বড় রকম প্রভেদ আছে—রাশিয়া স্বাধীন, ভারতবর্ষ পরাধীন। নিজের শক্তিসামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ভিন্ন রাশিয়ার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে বাধা দিবার কিছু ছিল না; কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্বন্ধে ব্রিটেনের বাধা জন্মাইবার কারণ ও সামর্থ্য আছে। তথাপি ভারতবর্ষকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের দেশে নানা রকমের কাঁচা মাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। শিল্পীর কুটীরে কিংবা বড় কারখানায় সেইগুলি হইতে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহাদের মূল্য বাড়িয়া যায়। এই জন্য বিদেশীকে কাঁচা মাল বিক্রি করা অপেক্ষা সেগুলিকে দেশেই শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া বিক্রি করা অধিক লাভজনক। তাহার প্রমাণ, বিদেশীরা আমাদের দেশের তুলা লোহা তৈল-বীজ চামড়া লাক্ষা প্রভৃতি স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্য আবার আমাদের দেশেই অধিক মূল্যে বিক্রয় করে।

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু পরিকল্পনা-কমীটির উদ্দেশ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন, জাতীয় আয় ও ধন (national income and wealth) দু-তিন গুণ বাড়াইতে হইবে, এই বৃদ্ধি অসাধ্য নহে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও পরিচালনা অনুসারে কাজ হইলে জাতীয় আয় ও ধন নিশ্চয় বাড়িবে। কিন্তু বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত কিংবা 'অনন্যকৰ্ম্মা' অ-শ্রমিক শ্রমিক-নেতাদের অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য সংঘটিত শ্রমিক ধৰ্ম্মঘট বন্ধ বা সংযত করিতে না-পারিলে পণ্যশিল্পবিষয়ক পরিকল্পনা হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না।

কুটীর-শিল্প ও কারখানা-শিল্পের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন কঠিন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে অসম্ভব তাহা নহে।

অনেকের যুক্তি এইরূপ যে, ভারতবর্ষে যত কারখানা বাড়িবে, কুটীরশিল্প ততই নষ্ট হইবে, অতএব কারখানা স্থাপন হইতে আমাদের নিবৃত্ত থাকা উচিত। কিন্তু ভারতীয়েরা নিবৃত্ত থাকিলেই কি অন্য জাতিরা নিবৃত্ত থাকিবে? একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের যত সুতা ও কাপড়ের কল আছে, সবগুলি যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই কি বিলাতী ও জাপানী মিলের সহিত আমাদের চরকা ও হাতের তাঁত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে? বিলাতী ও জাপানী মিল-মালিকেরা তাহাদের মাল বেচিয়া যত টাকা আমাদের দেশ হইতে লইয়া যায়, তাহার সমস্তটা—অন্ততঃ অনেক অংশ, দেশে রাখিবার প্রধান উপায় আমাদেরও যথেষ্টসংখ্যক মিল ভারতবর্ষে স্থাপন। কেবল চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা বিলাতী ও জাপানী সুতা ও কাপড় ভারতবর্ষের বাজার হইতে তাড়াইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

আমরা তন্তুবায়দের উচ্ছেদ চাই না, তাহারা যাহাতে টিকিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাই চাই। তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। অনুসন্ধান না-করিয়া ও না-ভাবিয়া সব অঞ্চলের উপযোগী উপায় হঠাৎ বাৎলাইয়া দেওয়া যায় না।

যে-সকল তন্তুবায় এখনও কৌলিক কাজ করিতেছে, কোন কোন স্থানে হয়ত তাহাদের কুটীরে বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাইলে তাহাদের সুবিধা হইতে পারে।

অনেক জায়গায়, তন্তুবায়রা হাতের তাঁতে কি কি জিনিষ

ভাল করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সেইগুলি কেবল যাহাতে তাহারাই করে, মিল না-করে, এরূপ ব্যবস্থা বা রীতির প্রচলন হইতে পারে কিনা, বিবেচ্য। ইউরোপের অনেক দেশে যান্ত্রিক উন্নতি খুব হওয়া সত্ত্বেও এবং মিল যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও হাতের তাঁতও চলে বলিয়া, এ দেশেও উভয়ই কার্য্যবিভাগ দ্বারা চলিতে পারে বোধ হয়।

তন্তুবায়জাতীয় যে-সকল লোক কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের শহর বা গ্রামে বা তাহার নিকটে মিল স্থাপিত হইলে, তাহাতে অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে কাজ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে কিনা বিবেচ্য। মিলের কাজ শিখিতে তাহাদের বিলম্ব হইবে না।

অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও কুটীরশিল্পসংরক্ষণ নিমিত্ত এইরূপ নানা উপায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

পরিকল্পনা-কমীটি নূতন কারখানা স্থাপন এবং চলতি কারখানার বিস্তারসাধন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অনুমতি-সাপেক্ষ করিতে চান। ইহা খুব দরকারী ও সমীচীন প্রস্তাব। ইহার অন্য প্রয়োজন ছাড়া, ইহার দ্বারা এদেশে বিদেশীদের কারখানা স্থাপন ও বিস্তার বন্ধ বা নিয়মিত করা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজন্যবর্গের যোগদানের নূতন সর্ত্তনামা অগ্রাহ্য

বোম্বাইয়ে দেশী রাজ্যের নৃপতি প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের সম্মিলিত বৈঠকে দেশী রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নূতন সর্ত্তনামা আলোচিত ও বিবেচিত হইতেছিল। গত ১২ই জুন তাহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর আলোচনা শেষ হয়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দেশী রাজ্যসমূহের যোগ দিবার সর্ত্ত সম্বন্ধে দরকষাকষি চলিতেছে দেখিতেছি। সার্ব্বভৌম শক্তি সর্ত্তনামা আরও কিঞ্চিৎ লোভনীয় করিলে এবং আরও কিঞ্চিৎ চাপ দিলেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারিবে।

বঙ্গে চাকরীর বাঁটোআরা

বঙ্গে চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশের রূপ সুনির্দিষ্ট নহে, এবং কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ফলে মুসলমানেরা শতকরা ৫০টির অনেক অধিক চাকরী পাইতে থাকিবে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকরীর কোন প্রকার বাঁটোআরাই আমরা অনুমোদনযোগ্য মনে করি না। এ-বিষয়ে আমাদের মত বহু বার বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছি।

—

বঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিস্তারের কারণ

বঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পুণার মারহাট্টা কাগজে ইংরেজীতে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, বঙ্গের বাহিরের সকল শিক্ষিত লোকদের, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসীদের, তাহা পঠনীয়। বঙ্গেও তাহাই। বঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা শান্ত ভাবে বিবেচনা করিতে সমর্থ, হরেন্দ্রবাবুর মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অনুধাবনযোগ্য। বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি মনের ভাব নিতান্ত অসন্তোষজনক হওয়ার যে-সকল কারণ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মুসলমান-সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা হিন্দুনারী হরণ ও ধর্ষণ তাহার মধ্যে জঘন্যতম।

—

নারীনিগ্রহের মামলায় অভিযুক্তদের অব্যাহতি

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের জজদের রায়ের বিরুদ্ধে কতকগুলি মোকদ্দমায় প্রিভি কৌন্সিলে আপীল হয়, এবং আপীলে কখন কখন হাইকোর্টের রায় উল্টিয়া যায় ইহার কারণ, আইনের অসম্পূর্ণতা (defect) বা খুঁত (flaw), কিংবা হাইকোর্টের জজদের ভ্রম। অন্য সব মানুষদের মত হাইকোর্টের জজরাও যে অভ্রান্ত নহেন, কিংবা আইন নিখুঁত নহে, এই সত্য উক্ত প্রকার আপীলের ফলের দ্বারা সমর্থিত হয়। প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করা

বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। যে-সকল নারী নিগৃহীতা ও অত্যাচরিতা হন, তাঁহারা সাধারণতঃ কেহই ধনী নহেন। এই কারণে, আমরা যত দূর জানি, হাইকোর্টে আপীল করিয়া নারীনিগ্রহমূলক যে-সব মামলায় দণ্ডিত লোক খালাস পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন মামলার শেষ বিচার প্রিভি কৌন্সিলে হয় নাই। হইলে বুঝা যাইত, প্রিভি কৌন্সিলের মতে হাইকোর্টের ঐ সব লোককে খালাস দেওয়া সকল স্থলেই আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা, কিংবা আইনের খুঁত আছে কিনা।

প্রিভি কৌন্সিলের সিদ্ধান্ত যদিও এরূপ কোন মামলায় জানা যায় নাই, তথাপি হাইকোর্ট এইরূপ যে-সব মোকদ্দমায় অভিযুক্তদিগকে আপীলে খালাস দেন, সেই সকল আপীলের ফল সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের নিজ নিজ মত স্থির করিবার অধিকার আছে। কিন্তু এই সব মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতের রায় এবং আপীলে হাইকোর্টের রায় সমগ্র ও বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত না হওয়ায়, লোকে মত স্থির করিবার যথেষ্ট উপকরণ পায় না। অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গত প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করিয়া এরূপ প্রায় ২০।২৫ টা মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খালাস পাইয়াছে। ইহার মধ্যে খোর্দ গোবিন্দপুরের মোকদ্দমা, বিন্দু গোয়ালিনীর মোকদ্দমা প্রভৃতি খুব চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমাও আছে। আমাদের বোধ হয়, বঙ্গের নারীরক্ষা-সমিতিগুলি এই সকল মোকদ্দমার নিম্ন আদালতের ও হাইকোর্টের রায়গুলির নকল লইয়া আদ্যোপান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়ে মত স্থির করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া গেলে, তদনন্তর মাসে মাসে বা তিন মাস অন্তর এক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেই চলিবে।

—

দেশী রাজ্যে আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর "নূতন আলোক"

কিছু দিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, যে, রাজকোটের ব্যাপার হইতে গান্ধীজী দেশী রাজ্যসমূহে প্রজাদের আন্দোলন সম্বন্ধে নূতন আলোক পাইয়াছেন; এবং সেই আলোক অনুসারে তিনি দলবদ্ধ ভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে, প্রজাদের দাবী খুব কম করিতে, আন্দোলন না করিয়া সাক্ষাৎভাবে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া প্রজাদের বাঞ্ছিত অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে, সত্যাগ্রহের জন্য কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীদের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন না হইতে, এবং চরকায় সুতা কাটা খদ্দর বোনা ও খদ্দর পরা প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ করিয়া সত্যাগ্রহী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। পরে সংবাদপত্রে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, গান্ধীজী বলিয়াছেন তাঁহার এই উপদেশ, পরামর্শ বা অনুরোধ সকল দেশী রাজ্যের প্রজাদের জন্য নহে, কেবল ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের প্রজাদের জন্য, এবং তাঁহার যাহা বক্তব্য তিনি তাহা বলিয়াছেন, ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা প্রত্যেক রাজ্যের লোকদের বিচারসাপেক্ষ।

গান্ধীজী যখন নূতন আলোকের কথা বলেন, তখন তাহা শ্রদ্ধার সহিত চিন্তনীয় ও গম্ভীর ভাবে আলোচ্য, ব্যঙ্গ শ্লেষ বিদ্রূপের বিষয় নহে।

যে-সকল রাজ্যের প্রজারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌর বা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের নিমিত্ত কখনও আবেদন বা প্রতিনিধি পাঠান নাই, তাঁহারা পাঠাইয়া দেখিতে পারেন ফল কি হয়। যাঁহারা পাঠাইয়া বিফলকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

দাবী বা প্রার্থনা কম করার পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মঞ্জুর করিতেও পারেন, কিন্তু উচ্চ দাবী মঞ্জুর করিবেন না; এবং কম প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে পরে আরও কিছু চাওয়া যাইতে পারে। উচ্চতম দাবী বা প্রার্থনা করার পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ষোল আনা চাহিলে আট আনা বা তিন আনা পাওয়া যাইতে পারে, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ।

গান্ধীজী যে দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে দাবী কমাইতে বলিয়াছেন, তাহার এই সমালোচনা হইয়াছে যে, তাঁহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কাছে কেন পূর্ণস্বরাজরূপ উচ্চতম দাবী করিয়াছে? ব্রিটিশ ভারতের প্রজারা যেমন মানুষ, দেশী রাজ্যের প্রজারাও সেইরূপ মানুষ। ভারতবর্ষের এক অংশের লোকেরা যদি উচ্চতম দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য অংশের লোকদের তাহা করা কেন উচিত বা যুক্তিসঙ্গত হইবে না? ইংরেজ প্রভুদের যদি উচ্চতম দাবী গ্রাহ্য করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দেশী প্রভুদের তাহা গ্রাহ্য করিবার সম্ভাবনা কেন নাই?

গান্ধীজী কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীদের জন্য উদ্বিগ্ন না হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু হায়দরাবাদের জেলে কয়েক জন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাদের কাহারও কাহারও দেহে আঘাতের চিহ্ন আছে। যে-যে রাজ্যের জেলে বন্দীরা এরূপ দুর্ব্যবহার পায় বলিয়া সন্দেহ হয়, সেখানে বন্দীদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

গান্ধীজী চরকায় সুতা কাটা এবং খদ্দর উৎপাদন ও পরিধান দ্বারা সত্যাগ্রহী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে বলিয়াছেন। ইহা না করিলে সত্যাগ্রহী হইবার যোগ্য

কেন হইতে পারা যায় না, এবং অহিংস কেন হওয়া ও থাকা যায় না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, স্নুতরাং এ-বিষয়ে কোন তর্ক করিব না। কিন্তু ইহা না-করিয়াও অনেক পরাধীন দেশের লোক স্বাধীন হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে তাহারা অহিংস উপায়ে স্বাধীন হয় নাই, ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, চরকা না-চালাইয়াও অনেক দেশের লোক অহিংস উপায়ে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর পৌর ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে তাহা অসম্ভব না-হইতে পারে।

বঙ্গে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার

বঙ্গের বিশিষ্ট হিন্দু প্রতিনিধিগণ বঙ্গে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার হয় তাঁহাদের স্টেটমেণ্টে এইরূপ বলায়, প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক এরূপ উক্তির সমর্থক তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। তথ্য ত গত দুই বৎসরের খবরের কাগজে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই কি? সেগুলা একত্র করিয়া ছাপিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইলেও ত তিনি কিছু করিবেন এরূপ ভরসা নাই; স্নুতরাং সে পণ্ডশ্রম ও অপব্যয় কেন করা হইবে?

প্রধান মন্ত্রী তথ্য চাহিবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার এক জন সংবাদদাতা পাবনা জেলায় হিন্দুধর্ম্মের উপর জঘন্য ও বিদ্বেষমূলক আক্রমণের পঁয়ষট্টিটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার পরিদর্শকও ঐ জেলায় ঘুরিয়া একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। মৌলবী সাহেব এগুলি দেখিয়াছেন কি?

হিন্দুদের প্রতি অবিচারের সব দৃষ্টান্ত মনে করিয়া রাখা কঠিন—তাহার সংখ্যা এত অধিক। সম্প্রতি বাংলা-গবন্মেণ্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য যে নয়টি বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছয়টি দেওয়া হইয়াছে মুসলমানদিগকে, তিনটি হিন্দুদিগকে। ইহার সমর্থনে বলা হইবে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষায় অনগ্রসর, অতএব তাহাদিগকে বেশী উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু মুসলমানদিগকে চাকরী দিবার বেলায় ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারা হিন্দুদের সমান লায়েক হইয়া উঠিয়াছে!

চিকিৎসা-বিদ্যায় মুসলমানরা অনগ্রসর বলিয়া মুসলমান ছাত্রদের নিমিত্ত গত বৎসরের মত এ বৎসরও মোট ৩৫০০০৲ টাকা চিকিৎসা-শিক্ষার বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছে। অথচ চাকরীর বেলায় চিকিৎসা-বিভাগেও অনগ্রসর মুসলমানরা অগ্রসর "বর্ণহিন্দু"দের চেয়ে বেশী চাকরী পাইবে!!

গ্রামে গ্রামে হিন্দু সভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা বাংলা দেশের সব জেলা শহর ও গ্রামে হিন্দু সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক স্থানে হিন্দু সভা স্থাপিত হইয়াছে। কংগ্রেস যদি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হইতেন, যদি রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারে হিন্দুদের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহাদের ধর্ম্মের উপর আক্রমণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেন, এবং যদি হিন্দুনারীহরণ-নিবারণে যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দু সভা স্থাপনের প্রয়োজন থাকিত না; কেবল ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই হিন্দু সভা আবশ্যক হইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ বিষয়ে অসাম্প্রদায়িক হইলেও এবং যে স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যই করিতেছেন বলিয়া এই প্রধান বিষয়টিতে অসাম্প্রদায়িক হইলেও, হিন্দু ও মুসলমানে কোন কোন বিষয়ে সমদর্শী নহেন। মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা এবং মুসলমানের কৃত অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া বহু কংগ্রেস-নেতার যেন প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না করিলে এবং হিন্দুদের প্রকৃত অভিযোগে কর্ণপাত করিলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে আরও উচ্চকণ্ঠে ছদ্মবেশী হিন্দু মহাসভা বলিবে, এই ভয়ে তাঁহারা যেন আড়ষ্ট। এ অবস্থায় হিন্দু সভার কার্য্যক্ষেত্র ও সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আগামী ডিসেম্বর মাসে বঙ্গে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। বঙ্গের হিন্দুগণকে তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইতেছে। কাজ এখনই আরম্ভ করা আবশ্যক।

—

নববর্ষা-সমাগম

আষাঢ়ের প্রথম দিবস আসন্ন। এখনও বর্ষার আগমন না হইলে কবিদের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইত না, দেব-মাতৃক ও নদীমাতৃক বাংলা দেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অকবিদের উদ্বেগও বাড়িতে থাকিত। কিন্তু বর্ষা সমাগত। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কবি অকবি সকলের দ্বারাই অভিনন্দিত হইতেছে।

—

বয়স্কদিগকে শিক্ষাদান

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে যে ৫০০ ছাত্র মফঃসলে বয়স্ক নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষণপদ্ধতি শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা বহু গ্রামে ও শহরে বহুসংখ্যক নিরক্ষর লোক ইতিমধ্যেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। ইহা আশাপ্রদ ও উৎসাহজনক

সুসংবাদ। গ্রীষ্মের ছুটির অবসানে এই শিক্ষাদাতা ছাত্রেরা কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। তাঁহাদের আরব্ধ কাজ স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা যাহাতে চলিতে থাকে, আশা করি সেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য অনেক উপনিবেশের ন্যায় দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয় শ্রমিকদের পরিশ্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। শ্বেতদের কাজ হাসিল হইবার পর ভারতীয়-দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতিও গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা যাহাতে কৃষি ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসুবিধাগ্রস্ত ও তাহা হইতে তাড়িত হয়, তদর্থে আইন হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিকারের আশা না-থাকারই মধ্যে বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়েরা সত্যাগ্রহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। লর্ড হাডিঞ্জের মত লর্ড লিনলিথগোরও এই ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত।

কি স্বদেশে কি বিদেশে, দুর্দশার চরম ও স্থায়ী প্রতিকার ভারতের স্বাধীনতা লাভ—যদিও স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব্বেও অবস্থার উন্নতির অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

—

রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন

রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহা চুক্তি বা সন্ধিতে পরিণত হইলে আপাততঃ কিছু কালের জন্য য়ুরোপীয় রাজনীতির গতি ঠিক্ কোন্ দিকে হইবে, বুঝা যাইবে।

—

চীনে জাপান

যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় চীনে জাপানের অধিকার বিস্তৃত না হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছে এবং তাহার শক্তিও কমিতেছে। তিয়েন্তসিনে জাপান যে ইংরেজ ও ফরাসীর সহিত বলদৃপ্ত ব্যবহার করিতেছে, তাহা কি মরণ-কামড়?

—

প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী

প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীর বিরোধের মীমাংসা ও নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও হত্যা চলিতেছে।

হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ

হায়দরাবাদে আর্য্যসমাজী ও হিন্দুরা যে সত্যাগ্রহ করিতেছেন, নিজামকে হীনবল বা অপদস্থ করা কিংবা মুসলমান-সম্প্রদায়কে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য, মানুষের সাধারণ ধর্ম্মবিষয়ক এবং পৌর ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ। এই জন্য অনেক শিখ, খ্রীষ্টিয়ান, এমন কি মুসলমানও, এই সত্যাগ্রহের সমর্থন করিতেছেন। হায়দরাবাদের জেলে কয়েক জন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হওয়ায় এবং তাহাদের অনেকের দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকায় ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে উত্তেজনা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতেই অধিক সত্যাগ্রহী হায়দরাবাদ গেলেও অন্যান্য প্রদেশ—যেমন বাংলা, বাদ যাইতেছে না। ইহা স্বাভাবিক।

হিন্দুদের বেসরকারী ও আধা-সরকারী চাকরী

সাম্প্রদায়িক কারণে বহু যোগ্য, যোগ্যতর ও যোগ্যতম হিন্দুকে সরকারী চাকরী হইতে হিন্দু বলিয়াই বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থার সাফাই স্বরূপ মৌলবী ফজলল হক বলিয়াছেন, বেসরকারী ও আধা-সরকারী যত চাকরী হিন্দুরা পাইতে পারে, তাহার তুলনায় সরকারী চাকরীর সংখ্যা কম। অর্থাৎ কিনা, হিন্দুরা বেসরকারী ও আধা-সরকারী চাকরীগুলা অবাধে যোগ্যতার জোরে পাইতে পারে। কিন্তু আধা-সরকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউসিপালিটিসমূহ, সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ—এ-সকলেও ত মুসলমানদের মুসলমান বলিয়াই, সাম্প্রদায়িক কারণে, যোগ্যতার জন্য নহে, চাকরীগুলার একটা বড় বখরা মুসলমানদের জন্য চাওয়া হইয়া আসিতেছে না কি? প্রাপ্তিও বহু স্থলে ঘটিয়াছে। হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সম্পূর্ণ বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহেও মুসলমান স্কুলপরিদর্শকেরা মুসলমান বলিয়াই মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের জেদ করেন।

অন্য চাকরী অপেক্ষা সরকারী চাকরীতে বেতন বেশী, প্রভাব ও ক্ষমতা বেশী; দেশের কাজ করিবার সুযোগ বেশী। সরকারী চাকরোদের যোগ্যতা, সততা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতির উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে। তাহাতে যোগ্যতাকে সাম্প্রদায়িকতার নীচে স্থান দেওয়ায় দেশের খুব অনিষ্ট হইবে;—ইতিমধ্যেই হইয়াছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের কন্‌ফারেন্স

সম্প্রতি প্রদেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আগেকার আমলাতন্ত্রের মতই "আইন ও শৃঙ্খলা"র জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা "সাম্প্রদায়িক" কাগজগুলাকে জব্দ করিতে চান। কিন্তু "আজাদ"কে ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়ার কোন নিন্দা কন্‌ফারেন্সে হয় নাই! তাঁহারা সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-উত্তেজক বক্তৃতা বন্ধ করিতে চান। কিন্তু পঞ্জাবের ও বঙ্গের মন্ত্রিসভাদ্বয়ের যে-যে সভ্য ঐরূপ বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন নিন্দা করেন নাই! ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতশাসন আইন, সরকারী সব চাকরীতে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা, মিউনিসিপালিটি জেলাবোর্ড প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা, স্কুল-কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার ও শিক্ষাদাতা নিয়োগের রীতিতে সাম্প্রদায়িকতা—এই সব থাকিতে ও এই সব রাখিয়া কেবল খবরের কাগজগুলাকে সায়েস্তা করিয়া যাহারা ভারতবর্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে চায়, তাহারা আহাম্মক, ভণ্ড, না পাগল? উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীরা সরকারী সব চাকর্‌য়েকে, শুধু মন্ত্রীদিগকে নহে, প্রতিকূল সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আইন করিতে চান। মনু বামুনদের এবং মধ্যযুগে ইয়োরোপে পোপেরা খ্রীষ্টিয়ান পাদরীদের সাত খুন মাপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সরকারী চাকর্‌য়েরা এ-যুগের বামুন ও পাদরী।

কোন্ এক মন্ত্রিপুঙ্গব (অনুমান করুন কোন্ প্রদেশের) কথা তোলেন যে, ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষাভাষী অঞ্চলের—"যেমন মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের এবং বাংলা ও বিহারের", ভাষিক তর্কবিতর্কে হাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে পারে! অতএব তাহার বিরুদ্ধে আইন করা হউক !!!

কংগ্রেসের কন্সটিটিউশ্যন পরিবর্ত্তন

কথা উঠিয়াছে, কংগ্রেসে বড় দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব তাহার কন্সটিটিউশ্যন বদলান দরকার। প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু (সুভাষবাবুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে?) আবির্ভাব নূতন করিয়া হইয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। আগে আগেও কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত, স্বরাজ্যদলের কৌন্সিলপ্রবেশ-নীতি মঞ্জুর করাইবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য উপলক্ষ্যে কোন কোন পক্ষ নিজ নিজ ব্যয়ে কংগ্রেস সভ্য ও প্রতিনিধি বাড়াইয়াছিলেন এবং

নিজ নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে কংগ্রেসের অধিবেশন-স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, কংগ্রেসে সত্যসত্য দুর্নীতি নিবারণের নিমিত্ত যাহা করা হইবে তাহা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু দুর্নীতি-নিবারণের ওজুহাতে ভিন্ন দলের লোকদিগকে তাড়াইবার বা শক্তিহীন করিবার চেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত।

বর্ত্তমান কংগ্রেস কন্সটিটিউশ্যনের ৫ (গ) ধারায় আছে, "যাহারা কোন নির্ব্বাচনমূলক কংগ্রেস-কমীটির সদস্য তাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের ঐরূপ কোন কমীটির সদস্য হইতে পারিবেন না।" দুর্নীতি-নিবারণ সাব্-কমীটির রিপোর্টে এই ধারার নিম্নলিখিত রূপ সংশোধন প্রস্তাবিত হইয়াছে:—"যাহারা কোন সাম্প্রদায়িক **বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের** সদস্য তাঁহারা কোন কংগ্রেস-কমীটির সদস্য হইতে পারিবেন না।" এই "অন্য কোন"র মধ্যে কিষান সভা, সমাজতন্ত্রী দল, শ্রমিক সমিতি, কংগ্রেস জাতীয় দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, প্রভৃতি আনা যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ভাতা

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা রাহা খরচ আদি বাবতে কে কত টাকা লইয়াছেন, তাহার তালিকা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। অল্প কয়েক জন কিছুই লয়েন নাই। তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। অনেকে আইনানুসারে যাহা ন্যায্য পাওনা, তাহাই লইয়াছেন। তাহা ঠিকই হইয়াছে। একাধিক খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে যে, কয়েক জন বরাবরই কলিকাতায় থাকেন, কিন্তু মফঃসলে যেখানে তাঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে যাতায়াতের খরচ বার-বার গ্রহণ করেন এবং দৈনিক খোরাকীও আদায় করেন। উল্টা-গাধায় আরোহিত এই সদস্যবৃন্দের সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিক শোভাযাত্রা হওয়া আবশ্যক।

বিহারের দুটি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান

বিহারে একটি বাইসিকেলের কারখানা খোলা হইবে। ইহা প্রশংসনীয় উদ্যম। বঙ্গেও এরূপ কারখানা হওয়া উচিত। এবং হওয়া দুর্ঘট নহে।

বিহারে একটি সামরিক বিদ্যালয়ও হইতেছে। বঙ্গেও হওয়া উচিত। যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সামরিক বিদ্যালয়ের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

রাজগীর

বঙ্গে বা বঙ্গের নিকটবর্ত্তী উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত অঞ্চলে আরোগ্যশাল স্থাপনের প্রস্তাব

ডাঃ আজিতমো-ন বসু, এম. বি., সিএইচ. বি. (এডিনবরা), এল. এম. (ডাব্লিন)

আমাদের দেশে নানা অঞ্চলে উষ্ণপ্রস্রবণের অস্তিত্বের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহার অনেকগুলি আবার তীর্থস্থান বলিয়াও পরিগণিত; সেগুলিতে স্নান করিলে শারীরিক গ্লানির সহিত আধ্যাত্মিক পাপও ধৌত হইয়া যায় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। স্বাস্থ্যকরতার সহিত আধ্যাত্মিক পবিত্রতার এই যোগাযোগ আরোপের ফলে এই সব স্থানকে প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যশালায় পরিণত করিবার পথে অনেক বাধা উপস্থিত হইয়াছে।

ইউরোপে উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যশালা বা "স্পা" (spa) স্থাপনের মূলসূত্রগুলি এই রূপ: এই সব স্থান সহজগম্য হওয়া আবশ্যক; এই সব স্থানে খাদ্যতত্ত্ববিৎ-অধ্যুষিত ও আরামদায়ক হোটেল থাকা চাই; ছায়াশীতল এবং উন্মুক্ত দুই প্রকারেরই ভ্রমণ-পথ থাকা আবশ্যক; স্বাস্থ্যান্বেষীদের আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা, অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর থিয়েটার সিনেমা কন্‌সার্ট প্রভৃতির আয়োজন থাকা চাই, এবং উচ্চশ্রেণীর শুশ্রূষালয় (নার্সিং হোম) থাকা চাই। এই সকল স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে স্বাভাবিক প্রস্রবণ-জলের ব্যবহার দ্বারা শরীরের খাদ্যজারক- ও পুষ্টিগ্রহণ-ক্ষমতার বিকলতা আরোগ্য হয়।

ইউরোপে প্রস্রবণ-জলের বিশিষ্ট গুণাবলী লইয়া অনেক গবেষণা চলিয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ প্রস্রবণ আসলে বহু বর্ষ ধরিয়া স্বাস্থ্যান্বেষীকে আরোগ্য করিতে সাহায্য করিয়াছে, স্বাস্থ্যশালা নির্ম্মাণে সেই দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকও বিবেচনার বিষয়।

অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক ও সংসারের প্রাত্যহিক নানা দুশ্চিন্তার হইতে দূরে অবস্থিত এই সকল আরোগ্যশালা মনের দিক দিয়াও স্বাস্থ্যান্বেষীর পক্ষে আরোগ্যলাভের

বিশেষ অনুকূল হয়। নানাভাবে জলের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসারও সুব্যবস্থা এই সব স্থানে হয়। এই সকল স্থানের জলের ব্যবহারে শরীরের বর্জ্জনীয় অংশের নির্গম-ক্রিয়াও সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এই সকল "স্পা"র আরোগ্যপ্রণালী সাধারণ পাঠকের জন্য সহজভাবে লেখা সুসাধ্য নহে।*

বোম্বাই প্রদেশে ১৯৩৮ সালে স্থাপিত ছোট একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ভারতবর্ষে আর কোথাও কোন "স্পা" নাই। সিন্ধুদেশে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। লেখক এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রস্রবণগুলি দেখিয়াছেন (১) মুঙ্গেরের নিকটে সীতাকুণ্ড (২) পাটনার নিকটে রাজগীর (৩) হাজারিবাগের নিকটে সুরজকুণ্ড এবং (৪) সিউড়ির নিকট বক্রেশ্বর।

এই সব স্থানের জল আমি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি নাই, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বাস্থ্যশালা স্থাপনের জন্য ঐ অঞ্চলের জলের রাসায়নিক প্রকৃতি অপেক্ষা উহার জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক, সহজগম্যতা, স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা এই সব বিষয়ের দিকেই ইউরোপে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। ইউরোপের কোন কোন স্থানের প্রস্রবণ-জলের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক গুণ কোন কোন ব্যাধির পক্ষে পূর্ব্বে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইত, যেমন কোন কোন স্থানের গন্ধকাবিষ্ট জল বাত ও চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এমন অনেক স্থানের জলে এখন এই সব রোগ সারিতেছে যেখানকার জলে গন্ধকের লেশমাত্র নাই। এ বিষয়ের কোন [illegible] নাই।

বঙ্গে ও বিহারে যে-যে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করি।

১। সীতাকুণ্ড: এইখানে তিন-চারিটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। জল পরিষ্কার ও নিঃস্বাদ, যদিও [illegible] হাইড্রোজেনের গন্ধ অল্প পাইয়াছিলাম। ডাঃ [illegible] রায় এই জলের তাপ ১৪০° ফা. এইরূপ বলিয়াছেন। এইখানে

সীতাকুণ্ড

অনেক লোককে স্নান করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেহ কেহ সুস্থ, চর্ম্মরোগ ও বাতরোগে আক্রান্ত লোকও দেখিলাম।

এখানকার সুবিধা এই যে, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পাটনা প্রভৃতি বিহারের অনেক শহর হইতে সীতাকুণ্ডে সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায়। জলের রাসায়নিক

* এ-সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা *Calcutta Medical Journal* for May 1939, pp. 345-52 পড়িবেন। ভারতের প্রস্রবণ-জল ও তাহার আরোগ্যক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি পড়িতে বলি—Mineral water of India, Dr. K. S. Ray in the [illegible] *of Indian Medical Association* for [illegible] 1932,

প্রকৃতি ও গঠন না জানা থাকিলেও ইহার যে আরোগ্য-শক্তি আছে তাহা নিঃসন্দেহ। কলিকাতা হইতে এই স্থান অনেক দূরে, এক অসুবিধা এই। দ্বিতীয়, এই প্রস্রবণের মূল উৎস এক মন্দিরের মধ্যে, সেখান হইতে ব্যবহারের জন্য জল সংগ্রহ করাও কঠিন।

২। রাজগীর: এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। মন্দির ও পর্বতমালায় এই স্থানটি বিশেষ সৌষ্ঠববর্দ্ধিত। এখানে উনিশটি উষ্ণপ্রস্রবণ ও চারিটি

রাজগীরের প্রস্রবণ

শীতল প্রস্রবণও আছে। তাপ ১০০° ফা. হইতে ১১০° ফা. পর্য্যন্ত। ইহার জল স্বাদগন্ধহীন ও বিরেচকগুণসম্পন্ন। পরলোকগত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতে এই জলের 'রেডিও-অ্যাক্টিভ' গুণ আছে। এই স্থানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। বাতরোগে আক্রান্ত বহু লোক প্রতি বৎসর এই স্থানে স্বাস্থ্যান্বেষণে আসে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।*

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই স্থানটির সুবিধা-সুযোগ এইরূপ: (১) এখানকার জলের আরোগ্যশক্তি (২) এই স্থানের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য (৩) শীতকালে এই স্থানের জলবায়ু বিশেষ ভাল (৪) পাটনা, গয়া, কোডারমা প্রভৃতি হইতে এই স্থানের সহজগম্যতা। ইহার অসুবিধাগুলি এইরূপ: (১) ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ; (২) মেলার সময় কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব (৩) গ্রীষ্মকালের অত্যন্ত উত্তাপ (৪) কলিকাতা হইতে ইহার অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তিতা।

৩। বক্রেশ্বর: বাংলাদেশে এই একটি উষ্ণপ্রস্রবণই আমার দেখা আছে। সিউড়ি হইতে ইহা আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত, তাহার মধ্যে অন্তত পাচ মাইল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। জলের তাপ ১২৮° হইতে ১৬২° ফা. জলে সালফুরেটেড হাইড্রোজেনের তীব্র গন্ধ।

এই উষ্ণ প্রস্রবণটির সুবিধা এই যে (১) ইহা বাংলা দেশে অবস্থিত (২) ইহার জল বিশেষ উষ্ণ ও গন্ধযুক্ত বলিয়া বাত ও চর্ম্মরোগে বিশেষ উপযোগী (৩) গ্রীষ্মকালে ইহার শুষ্ক ও স্বাস্থ্যানুকূল আবহাওয়া। অসুবিধার মধ্যে, (১) ইহা শ্মশানঘাটের অতি নিকটে (শ্মশানঘাট হইতে কিছু দূরে স্বাস্থ্যশালা প্রবর্ত্তন করিয়া এই অসুবিধাটি দূর করা যায়) (২) ইহার পারিপার্শ্বিক একেবারেই চিত্তাকর্ষক নহে।

৪। সূরজকুণ্ড: এই উষ্ণপ্রস্রবণটি কলিকাতা হইতে প্রায় ২৩৯ মাইল দূরে, হাজারিবাগের পথে অবস্থিত। ৫।৬ দিন ব্যাপী মাঘমেলা ব্যতীত এখানে আর কোন উৎসবাদি হয় না, যাহাতে অত্যন্ত জনসমাগম হইতে পারে। ইহার জলের স্বাদে ও গন্ধে আমাকে 'ভিসি'র

*বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ দেখাইয়াছেন যে, রাজগীরের উষ্ণপ্রস্রবণগুলি 'রেডিও-অ্যাক্টিভিটি'র দিক দিয়া ইউরোপের বিখ্যাত উষ্ণপ্রস্রবণগুলি অপেক্ষা বিশেষ হীন নহে। এ-সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা *Transactions of the Bose Research Institute* (1931)-এ অধ্যাপক নাগ মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িবেন।

(Vichy water) কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। বহু লোক, বিশেষতঃ বাতরোগ, নানাবিধ চর্ম্মরোগ এবং রক্তাল্পতা প্রভৃতিতে আক্রান্ত অনেক রোগী এই প্রস্রবণে স্নান করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে।

সুরজকুণ্ডের সুবিধা এই (১) এই স্থানটি সহজগম্য, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া নয় ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে এই স্থানে মোটরে যাওয়া যায়, রেলপথেও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যাওয়া যায়—পথের দৃশ্যও মনোহর। (২) গ্রীষ্মের সময় ছাড়া বৎসরের অন্য সব সময়েই ইহার জলবায়ু বিশেষ সুখকর। নিকটবর্ত্তী রামগড় পাহাড় ও অরণ্যে ইহার শোভা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। শীতকালে ইউরোপীয় ও ভারতীয় অনেকে এই অঞ্চলে শিকার করিতে আসেন। (৩) এই স্থানের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা একটা বিশেষ সুবিধা। (৪) এই স্থানের জলের আরোগ্যশক্তি আছে ইহা নিশ্চিত। ইহার অসুবিধা এই যে, ইহা বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত।

উষ্ণপ্রস্রবণের জল হইতে সম্যক উপকার পাইতে হইলে শুধু রোগীকে কোন রকমে ঐ জলে স্নান করাইলে বা খানিকটা জল পান করাইতে পারিলেই চলিবে না। সম্যক উপকার পাইতে হইলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক। এই জলচিকিৎসা বিধিমত হওয়া আবশ্যক; জলের তাপ, ব্যবহারের কাল ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ব্যায়াম করা আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে বিদ্যুৎ-চিকিৎসা ইত্যাদিও করিতে হয়। ইউরোপের "স্পা"-গুলিতে এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা আছে।

এই প্রবন্ধে বিহারের তিনটি স্থানে ও বঙ্গের এক স্থানে মোট চারিটি উষ্ণপ্রস্রবণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। বাংলা দেশে বা নিকটবর্ত্তী কোন উষ্ণপ্রস্রবণযুক্ত স্থানে যে একটি আরোগ্যশালা স্থাপিত হওয়া একান্ত

বক্রেশ্বর

আবশ্যক, অনেক দিন হইতেই ইহা অনুভব করিয়াছি। ক্রমশই ইহার প্রয়োজনীয়তা বাড়িতেছে। বহু লোক স্বাস্থ্যলাভার্থ উষ্ণপ্রস্রবণের জল ব্যবহার করিতে চান, কিন্তু এই সব স্থান বর্ত্তমানে এমন অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে যে তাহাতে ঐগুলি ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এইরূপ একটি স্বাস্থ্যশালা প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইলে ও চিকিৎসকদের সহায়তা পাইলে তাহা অর্থকরীও হইবে, এবং অনেক যুবক-চিকিৎসকের জীবিকারও অবলম্বন হইবে।

ইউরোপের নানা স্থানে, যথা ইটালী, জার্ম্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি বহু স্থানের অনেক বিখ্যাত "স্পা" আমি দেখিয়া আসিয়াছি। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সের "স্পা" গুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সব স্থানের সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত, সরকারী সাহায্যও আছে। জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে এই সকল জাতি সর্ব্বদা সজাগ। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির [illegible] কথা এমন করিয়া আমরা কবে বুঝিতে শিখিব?

বঙ্গে বা বঙ্গের [illegible] স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে যাঁহাদের উৎসাহ আছে তাঁহারা [illegible], খনিগণ

সুরজকুণ্ড

প্রেস, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধলেখকের সহিত পত্রব্যবহার করিলে অনুগৃহীত হইব। যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে এ-সম্বন্ধে একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আমার ইচ্ছা আছে।

সেদিন ও আজ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম যবে তোমারে হেরি প্রিয়া
চাহিয়াছিনু আঁখিতে আঁখি দিয়া।
ভেবেছি মনে—'সে জন এ কি?
নয়ন-নাসা তেমনি দেখি!'
শুধাতে নারি, দ্বিধায় কাঁপে হিয়া,
নীরবে চোখে চাহিনু শুধু প্রিয়া।

সেদিন যবে নিকটে এলে তুমি
সঘন শ্বাসে কাঁপিছে বনভূমি।
চকিত ভীরু হরিণীসম
লগন হ'লে দেহেতে মম
হরিনু ভয় শিরে তোমার চুমি;
সঘন শ্বাসে কাঁপিল বনভূমি!

যেদিন এলে অতি নিকটে মোর
নিবিড় বাঁধা বাহুতে বাহুডোর,
অধর ছিল অধরে মিশি
তবুও যেন দিবস-নিশি
কিসের ভয়ে দোঁহারি চোখে লোর;
সেদিন তুমি অতি নিকটে মোর।

এবার তুমি গিয়াছ বহু দূর
ভাবনা যত তোমাতে পরিপূর,
তেমনি দ্বিধা তেমনি ভয়ে
তোমারে বুকে চাপিয়া লয়ে
কখনো কাঁদি কখনো গাঁথি সুর।
এবার প্রিয়া গিয়াছ বহু দূর!

আবার কবে ভুলিব সব ভাষা,
কাছে পাবার নাহি যে ছিল আশা;
যে তুমি আছ বুকেতে লীন
সে যেন সেই চির-অচিন,
আভাসে বুঝি তাহার কাঁদা-হাসা,
কাছে পাবার জীবনে নাহি আশা।

প্যালেস্টাইন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ মিত্রপক্ষ পরাজিত দলের সাম্রাজ্যগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতেছিলেন, তখন দেখা গেল যে এশিয়া মাইনর ভূমিখণ্ডের এক প্রান্তে প্যালেস্টাইন নামে একটি দেশ আছে। ইহার পূর্ব্বে ঐ দেশটির কোনও বিশেষ ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছিল না। রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদের বিচারেও ইতিপূর্ব্বে ঐ নামের কোন দেশের চৌহদ্দি জানা যায় নাই, কেবলমাত্র ইহুদী জায়নিষ্ট (Zionist) সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টভক্ত লেখকদিগের কথা-সাহিত্যে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে ও

জর্ডন নদ। যেখান হইতে ছবি লওয়া হইয়াছে সেইখানে খ্রীষ্ট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

য় এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টানদিগের "পবিত্র দেশ" অবশ্য ঐখানেই, কিন্তু তাহার সহিত ব্রিটিশ- এই নূতন দেশের চৌহদ্দির মিল পাওয়া যায় পৃষ্ঠায় ঐখানে বিভিন্ন সময়ে ছোট বড় অনেক রাষ্ট্র বা জনপদের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দেখা যায় যে ঐ দেশ বর্ত্তমান আকারে ও আয়তনে কখনও একটি অখণ্ড রাজত্ব বা রাষ্ট্ররূপে বিরাজ করে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে তুর্কদিগের আমলে বর্ত্তমান প্যালেস্টাইন একই গবর্ণরের এলাকায় সিরিয়া প্রদেশের অংশবিশেষ ছিল। কেবলমাত্র জেরুসালেম অঞ্চল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ পবিত্র তীর্থ হওয়ায় সেখানকার শাসনকর্ত্তার সহিত ইস্তাম্বুলের সাক্ষাৎ যোগ ছিল। বর্ত্তমান ট্রান্সজর্ডানিয়ার কিছু অংশও বোধ হয় সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

জাতীয়তার বিচারেও প্যালেস্টাইনের কোনও বিশেষ স্থিতি পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। আডামস্-স্মিথের মতে, "ইহা কখনও এক জাতির হস্তগত ছিল না এবং কখনও হইবে বলিয়া সম্ভাবনাও নাই।" ইহা ইতিহাসসম্মত। এই ভূমিখণ্ডের ঐরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ তাহার ভৌগোলিক অবস্থান। এশিয়া মহাদেশ যেখানে ভূমধ্যসাগরের পারে ইয়োরোপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে, মিশর ও আরব দেশের দ্বারপালরূপে প্যালেস্টাইন সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার পশ্চিম সীমানার সাগরকূল বাহিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য ও দিগ্বিজয়ের পথ। এই পথে আরব দেশের সহিত প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশের যোগ।

খ্রীঃ-পূঃ অষ্টাদশ শতকের শেষে মিশর-রাজগণ এই দিগ্বিজয়ের পথে এশিয়ায় অভিযান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিজয় পতাকা ইউফ্রেটিস নদের কূলে প্রাচীন অসুরদেশ (বর্ত্তমান ইরাক) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। উহার এক শতাব্দী পরে (খ্রীঃ-পূঃ ১৬০০) বর্ত্তমান প্যালেস্টাইনের স্থলে তখন যে অতিক্ষুদ্র জনপদ ও রাষ্ট্রগুলি বিদ্যমান ছিল তাহাদের প্রথম উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে সেমিটিক জাতির

বেথলেহেম

প্রাধান্য ছিল না। কোন্ সময়ে যে সেমিটিক জাতি ঐ স্থানে প্রবল হইয়া উঠিল, তাহা এখনও অজ্ঞাত।

তখন ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি নগর ছিল এক একটি ছোট রাষ্ট্র এবং এইরূপ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র বর্ত্তমান প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক পরিক্রমার মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিল। খ্রীঃ-পূঃ ১১৫০ পর্য্যন্ত ঐ সকল রাষ্ট্র মিশরের অধিকারে ছিল; কিন্তু হিটাইট, মিত্তানি, লিবানন পর্ব্বতমালার উত্তরে আমোরাইট জাতি এবং সমুদ্রকূলের ফিলিষ্টাইনগণ (ইহাদের নামানুসারে পরে এদেশের ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইন নামকরণ হয়) ক্রমাগত মিশরের এই অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযান করিত। খ্রীঃ-পূঃ ১১১৫ অব্দে অসুররাজ টিগ্‌লাথ পিলেজর হিটাইট-রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করেন, তখন মিশরের প্রতাপ লুপ্তপ্রায়। এই সময়েই প্রথম ইস্রায়েল জাতিসমষ্টি ঐ দেশে প্রবল হইয়া উঠে। কিরূপে ঐ সকল ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র একতাবদ্ধ হইল, সে-প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নাই; কিন্তু খ্রীঃ-পূঃ দশম শতকের প্রারম্ভে, যখন ঐ দেশের আশেপাশে কোনও প্রবল সাম্রাজ্য ছিল না, তখন ইস্রায়েল জাতি ঐ দেশে প্রথম ইহুদী রাষ্ট্রের স্থাপনা করে। বর্ত্তমান দক্ষিণ-প্যালেস্টাইন, উত্তর-আরব দেশ (প্রাচীন ইলাথ ও ইজিয়ন্‌গেবর্) হইতে ইহুদী জাতি-উপজাতির দল মিশরের ইস্রায়েলীয় ইহুদীদিগের সঙ্গে যোগদানের ফলে ইহা বোধ হয় সম্ভব হয়। প্রথমে সমস্ত দেশ রাষ্ট্র-নির্ব্বাচিত ন্যায়াধীশের অধীনে ছিল, পরে তাহা দুইটি রাজত্বে (জুডহ্ ও ইস্রায়েল) পরিণত হয়।

বাইবেলের পাতায় পাতায় এই দুই রাজ্যের সহিত সমুদ্রকূলবাসী ফিলিষ্টাইন ও ফিনিশীয় জাতি এবং প্রতিবেশী মোয়াব, ইডম, আমন, গিলিয়ড এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। খ্রীঃ-পূঃ নবম শতকের মধ্যে এই সকল রাষ্ট্র মিলিত হইয়া অসুররাজ তৃতীয় শাল্‌মানেসেরের আক্রমণ প্রতিরোধ করে; এই মিত্রপক্ষে ইস্রায়েল ছিল। কিন্তু এই মৈত্রী অল্প দিন পরেই লুপ্ত হওয়াতে শতবর্ষাধিক কাল যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্তর্বিরোধ চলে; ইহার ফলে খ্রীঃ-পূঃ ৭১৫ অব্দে অসুরগণ দেশ অধিকার করে। অসুর-সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহা অংশতঃ মিশর ও ব্যাবিল সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। দেশ ক্রমেই অন্তর্বিপ্লবে দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং এইরূপে খ্রীঃ-পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে জুডা রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্তি হয়। ইহার পর ঐ দেশের ইতিহাস অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন। সুতরাং দেখা

যাইতেছে যে, যে-দেশ এখন প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত তাহার সকল অংশ কখনও ইহুদীদিগের অধিকারে ছিল না এবং চারি শত বৎসরকাল মাত্র ঐ দেশের কতক অংশে ইহুদীদিগের স্বাতন্ত্র্য ছিল।

ইহার পর পারসীকরাজ কুরুশ এই দেশ জয় করেন। ইহুদীগণ তাঁহাকে য়াহ্‌বেহ্‌-অভিষিক্ত বলিয়া অভিনন্দন করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের অনেক অধিকার দান করেন। প্রায় দুই শত বৎসর পারসীকগণের শাসন-কালে ইহুদীগণ সমৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু পরে পারসীকরাজ তৃতীয় অত্রক্ষয়র্শের (Artaxerxes III) আমলে সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা ক্ষীণ হওয়ায় নানা দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দেয়, তাহাতে ইহুদীগণ মিশরের সঙ্গে যোগদান করে। পারসীকরাজ প্রবল পরাক্রমে বিদ্রোহ দমন করিয়া ইহুদী-দিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন এবং দেশে ভীষণ উৎপীড়ন চলে। কিছু দিন পরে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিলে ঐ অঞ্চল তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর প্যালেস্টাইন অঞ্চল মিশরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া টলেমীদিগের অধিকারে যায়। যবন-বংশোদ্ভূত সিলিউকিডগণ টলেমীদিগকে পরাস্ত করিয়া এশিয়া মাইনর অধিকার করে, কিন্তু সে-সময় ইস্রায়েল পুরোহিত-রাজকুলের নেতৃত্বে ঐ অধীনতা-পাশ মোচনের জন্য বহুকাল বিশেষ চেষ্টা করে। শেষে রোমকগণ গ্রীকরাজ্য দখলের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আসিলে ইহুদী হেরড-বংশ করদ রূপে ঐ দেশের সিংহাসন অধিকার করে। কিছু দিন পরে এই করদ রাজ্য সাক্ষাৎভাবে রোমক সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য-বিভাগের সময় এই অঞ্চল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভাগে পড়ে। তাহার পর দেশে প্রায় দুই শত বৎসরাবধি শান্তি ও সংগঠনের পর পারস্য-রাজ দ্বিতীয় খস্‌রু উহা অধিকার করেন। ইহুদীগণ তাঁহার দেশজয়ে বিশেষ সাহায্য করে, কিন্তু বাইজান্টীয় সম্রাট্ হেরাক্লীয়স ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা পুনরধিকার করায় ইহুদীদিগের কোনও সুবিধা হয় নাই।

ইতিমধ্যে আরব দেশে ইস্‌লামের অভ্যুদয় হয়। অল্প দিনের মধ্যেই ইস্‌লামের প্রতাপশালী সেনানায়কগণ সিরিয়ার দ্বারে আঘাত করেন। আবুবকর ও ওমর প্রথমে হেরাক্লীয়স্‌কে পরাজিত করেন। কিন্তু হেরাক্লীয়স্ পরে নূতন সৈন্যদলের সাহায্যে ওমরকে হটাইতে থাকেন। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতক খ্রীষ্টানের চক্রান্তে য়ারমুক নদের যুদ্ধে হেরাক্লীয়স ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ায় সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ইস্‌লামের ছত্রাধীন হয়। পরবর্ত্তী কালে খিলাফতের বিভিন্ন দলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলে, শেষে ৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় খলিফা এদেশ অধিকার করেন। ৭২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয়গণ খোরাসানের সেলজুক তুর্কোমান-গণের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণ তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থলগুলি দখল করিবার জন্য প্রথম ক্রুসেড (জেহাদ্‌) অভিযান করে। ইহারা জেরুসালেম জয় করিয়া সেখানে লাটিন রাজ্য স্থাপন করিয়া গডফ্রে নামক এক ফরাসীকে প্রথম রাজা করে। ৮৮ বৎসর কাল ধর্ম্মের নামে অতি উৎকট অত্যাচার, বিলাস-ব্যভিচার চলে; তাহার পর এই রাজ্যের পতন হয়। এই রাজ্যকালের মধ্যে ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নুরেদ্দিনকে তাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় দ্বিতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয়। নুরেদ্দিন ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাওয়ার পর সালেহেদ্দিন সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই বীর যোদ্ধা প্রথমে অসভ্য ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানদিগকে বীরোচিত ব্যবহারের দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মযুদ্ধ কি নিয়মে করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার নিকট পরাজিত হইয়া খ্রীষ্টানগণ সন্ধি করে বটে, কিন্তু প্রথম সুযোগেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাহার প্রতিফল-স্বরূপ সালেহেদ্দিন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রুসেড-অভিযানকারী খ্রীষ্টানদিগকে এখান হইতে দূর করেন। ক্রুসেডের ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানদিগের পাশবিক অত্যাচার ও বর্ব্বরোচিত ব্যভিচারের নিদর্শনে সে সময়ের ইতিহাস কলুষিত।

তাতারগণ কর্ত্তৃক পারস্যের অধিকার হইতে বিতাড়িত হইয়া দামস্কসের শাসকের অধীনে কার্য্য করিবার কালে খ্বারিজ্‌মির মোঙ্গলগণ ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া মিশরীয়দিগের সহিত যোগদান করে। এই যুক্তদল সিরিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া

উত্তর-সিরিয়া জেরুসালেম ও গাজা লুট করে। পরে মিশরের মামেলুক সুলতান উহাদেরও তাড়াইয়া নিজে ঐ দেশ দখল করেন। বহুকাল মিশরের শাসনে থাকিবার পর ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীগণ তুর্কি সুলতান "বিরূপাক্ষ" সেলিম কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় সমস্ত দেশ তুর্কদিগের দখলে যায়। অসৎ মিশরীয় শাসকের দ্বারা পরোক্ষভাবে শাসনের ফলে সিরিয়া ও প্যালেস্‌টাইন অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন প্যালেস্‌টাইন আক্রমণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবহর আসিয়া পড়ায় তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর তুর্কগণ ঐ দেশের শাসনভার সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করে এবং তাহাতে স্থানীয় শেখ্‌দিগের প্রতাপ কমিয়া যাওয়ায় দেশের উন্নতি হইতে থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা উদারমত প্রচার করায় ক্রমে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিরোধ কমিয়া আসে এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানগণ বিনাবাধায় হারাম-এশ-শরীফ মসজিদের এলাকায় প্রবেশ করিতে পারে। তুর্ক শাসনের শেষ ৪০ বৎসরে দেশের অশেষ উন্নতি হয়, তজ্জন্য বহু ইয়োরোপীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ঐ দেশে নিজেদের নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ থিয়োডর হেরডসল প্যালেস্‌টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব প্রচার করেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সম্ভবপরতা বিচার করিতে ঐ দেশে আসেন, ইহার ফলে "জায়নিজ্‌ম" (Zionism) মতের প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান আব্দুল হামিদ প্যালেস্‌টাইনে তুর্কদিগের অধীনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনে মত দিয়াছিলেন। বহু ইহুদী ঔপনিবেশিক ধীরে ধীরে প্যালেস্‌টাইনে যাইতে থাকে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইহুদী ধনকুবের রথশিল্ড-পরিবারের অর্থ সাহায্যে ইহুদীগণের "জাতীয় আবাস" স্থাপনের স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তুর্কদিগের আমলে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলনের কথা শোনা যায় নাই।

ইংলণ্ডে বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের স্থলপথের প্রথম ঘাঁটিরূপে প্যালেস্‌টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল। অবশ্য, এই রাষ্ট্র নাম মাত্র স্বাধীন থাকিবে (যাহাতে কার্য্যতঃ ইংরাজের অধিকার অটুট থাকে) ইহা ঠিক ছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-লেখক হলিংসওয়ার্থ "প্যালেষ্টাইনে ইহুদী" নামক পুস্তকে এই মতের প্রচার করেন। লর্ড পামারস্টন এই মতের পরিপোষক ছিলেন এবং লর্ড সল্‌সবেরী ও লর্ড বিকন্সফীল্ড লরেন্স অলিফান্ট মারফৎ তুর্ক সম্রাটের নিকট ঐ দেশ ক্রয় করিবার বা ইজারা লইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া ইহুদীদিগের জন্য প্যালেস্‌টাইনে কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের চেষ্টা চলিবার পর নব্য তুর্কের অভ্যুদয় হয়। তাহারা স্বদেশের কোনও অংশ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিতে রাজী না হওয়ায় ঐ প্রয়াস নিষ্ফল হয়। ইতিমধ্যে তুর্কের নবজাগরণে ব্রিটেন প্রমাদ গণিয়া পদে পদে তুর্কদের বাধা দিতে আরম্ভ করেন। তুর্কদিগের শাসনকালে প্যালেস্‌টাইন বলিয়া কোনও প্রদেশ ছিল না। বর্ত্তমানে যে-ভূমিখণ্ডের ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ছিল; কেবলমাত্র জেরুসালেমের সহিত ইস্তাম্বুলের সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহার কারণ ঐখানের বিভিন্নধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা।

* * *

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্যালেস্‌টাইন দেশ ইংরেজের সৃষ্টি। প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐখানে দুইটি স্বায়ত্বশাসিত ইহুদী রাষ্ট্র ছিল বটে, কিন্তু সেই সময়েই তাহার আশেপাশেই বর্ত্তমান প্যালেস্‌টাইনের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কয়েকটি অ-ইহুদী রাষ্ট্রও ছিল এবং ইহুদী স্বাতন্ত্র্যের বিলোপও হইয়াছে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। অন্য দিকে মুসলমান ও খ্রীষ্টান আরব ঐ দেশে প্রাধান্য লাভ করে প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে, প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল স্বাধীন থাকার পর ইহা মুসলমান তুর্কের অধীন হয়। স্বাধীন ও পরাধীন ভাবে তাহারা ঐদেশে প্রায় সহস্র বৎসর ভোগ-দখলের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে "প্যালেসটাইনে ইহুদীর জাতীয় নিবাস" রূপ অপরূপ কল্পনার সৃষ্টি হয়; তাহার ফলে, ঐ দেশের এখন এই অবস্থা।

মহাযুদ্ধের শেষভাগে যখন ব্রিটিশ মিত্রপক্ষ বাহির হইতে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাইবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত, সেই সময় ইংরেজ বৈদেশিক মন্ত্রী বালফোর (পরে লর্ড বালফোর) ইহুদী ধনকুবের লর্ড রথশিল্ডকে এক পত্র লিখেন। ঐ পত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ঘোষণা ছিল—

"প্যালেস্টাইনে ইহুদীগণের জাতীয় নিবাস স্থাপনের বিষয়ে মহামহিম সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট অনুকূল ভাব পোষণ করেন। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে তাঁহারা (অর্থাৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট) যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। তবে ইহা নিশ্চয় রহিল যে, এমন কিছু করা হইবে না যাহা ঐখানকার বর্ত্তমান অ-ইহুদী অধিবাসিগণের রাষ্ট্র বা ধর্ম্ম সম্পর্কিত অধিকারের পরিপন্থী হইতে পারে অথবা যাহাতে অন্য দেশে ইহুদীগণ যে-সকল রাজনৈতিক বা অন্য অধিকার ভোগ করে তাহা ক্ষুন্ন হইতে পারে।"

এই ঘোষণা জগতের যাবতীয় ইহুদী মহানন্দে সমর্থন করিল। তখন অর্থনৈতিক জগতে ইহুদীর প্রভাব অতি প্রবল, সুতরাং মিত্রপক্ষের অর্থসমস্যার সমাধানেরও বিশেষ সুবিধা হইল।

অন্য দিকে এশিয়ার নানা যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মান-চালিত তুর্কসৈন্য ইংরেজকে বিশেষ বেগ দিতেছিল। শত্রুজয়ের একটি অমোঘ অস্ত্র শত্রুর দেশে অন্তর্বিপ্লব বাধাইয়া দেওয়া। তুর্ক-সাম্রাজ্যের মধ্যে আরবদিগের নানা দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় উপজাতি বাস করিত যাহাদিগের উপর তুর্কের শাসনদণ্ড ছিল অতি লঘুভার। মিত্রপক্ষ দেখিলেন, তাহাদের দলে টানিতে পারিলে আরব দেশ, ইরাক, সিরিয়া, এই তিন অঞ্চলে তুর্কদিগের সৈন্য-চালনা, রসদের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশেষ বাধা পড়িবে; সুতরাং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের দলে টানিলেন। কিন্তু দলে টানিবার সময় দেখা গেল যে অসভ্য আরবও স্বর্ণরৌপ্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাম বেশী মনে করে। সেই জন্যে কর্ণেল লরেন্স ও কয়েক জন আরব বন্ধুর মারফৎ আরব জাতিকে জানানো হইল যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে মিত্রপক্ষ আরবজাতি-অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বাধীন আরব-রাষ্ট্র স্থাপনার যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমান প্যালেস্টাইনের লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আরব। যখন ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সে-সময় ঐ স্থানের লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ জন ছিল আরব। সুতরাং আরবজাতি মনে করিয়াছিল যে, উহাও স্বাধীন আরব-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এইরূপে ব্রিটিশ-রাজনীতিবিদ্‌গণ একই সময়ে একই ভূখণ্ডে দুইটি পরস্পরবিরোধী জাতিকে অধিকার দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া রাখিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে পর মিত্রপক্ষ প্রথম চেষ্টা করিলেন যাহাতে তুর্ক-সাম্রাজ্য তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া রাখা যায়। "দখল করা" বা "সাম্রাজ্যভুক্ত" করা স্বাধীনতার যুগে শ্রুতিকটু, সেই কারণে জাতিসঙ্ঘ নামে এক শিখণ্ডী-সভা স্থাপিত হইল যাহার "অধীনে" ফ্রান্স ও ব্রিটেন বহু দেশের "রক্ষণাবেক্ষণে"র ভার গ্রহণ করিলেন। অবশ্য মরুময় আরবদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছা কাহারও ছিল না, সুতরাং সেখানে অন্য ব্যবস্থা হইল। এ সকল এখন পুরাতন কথা।

প্যালেস্টাইনের আরব প্রথমে দেখিল ইংরেজ তাহার "ভার গ্রহণ" করিয়াছেন, পরে সেই সঙ্গে দেখিল যে তাহার দেশে বিদেশী আনিয়া বসাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। তাহারা এই দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল, এবং ইংলণ্ডে প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রতিকারের চেষ্টাও করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না।

যুদ্ধের পর আরব প্রথমে দাবি করিল যে, যুদ্ধে তাহার সহায়তার প্রতিদানে কর্ণেল লরেন্স প্রভৃতির প্রতিশ্রুতির এবং তাহার সপক্ষে জেরুসালেম-জয়ের পর ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ লর্ড এলেনবি শহরের চারি ধারে যে মুদ্রিত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন তদনুযায়ী সর্ত্তগুলি পূরণ করা হউক। ঐ সর্ত্ত অনুসারে আরবজাতির বাসস্থল যে সকল দেশ, যথা প্যালেস্টাইন, সেই দেশগুলিতে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে অধিকার আরবের থাকিবে। ইহুদীর জন্য প্যালেস্টাইনে কয়েকটি উপনিবেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাহাদের প্রথমে আপত্তি ছিল না এবং জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী জেরুসালেম-প্রবেশের অধিকার তাহারা ইহুদী

যে কোন ধর্ম্মমতাবলম্বীকেও দিতে প্রস্তত ছিল। কিন্তু নিজের দেশে বিদেশীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা রাষ্ট্র-অধিকারে গরিষ্ঠ হইতে দিতে তাহারা আদৌ স্বীকার করে নাই।

এদিকে ইহুদী-জগতে "জাতীয় নিবাস" স্থাপনের সাড়া পড়িয়া গেল। বন্যার স্রোতের মত ইহুদীর জনবল ও অর্থবল প্যালেসটাইন প্লাবিত করিল। আরব, ব্রিটিশ, ফরাসী ইহাদের কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই যে লর্ড বালফোরের ঘোষণার ফলে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতে পারে। ইংরেজদিগের ধারণা ছিল যে, প্যালেস্‌টাইনের মত পর্ব্বতময় বর্ব্বর দেশে আধুনিক "শহুরে" ইহুদী কখনও ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিবে না। দশ-বিশটা রথশিল্ড-প্রতিষ্ঠানের মত সুন্দর ছোট জনপদ, দুই-তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য সংস্কৃতিকেন্দ্র অথবা বড়-জোর কয়েকটা নূতন ধর্ম্মবিচারের স্থল—ঐরূপ সভ্যতাবর্জ্জিত, আধুনিক কলকারবারের সুযোগশূন্য দেশে ইহুদীরা ইহার অধিক কিছু করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা ব্রিটিশ বা আরব কেহই কল্পনাও করে নাই। ইংরেজের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, একটি বিরাট্ যাদুঘর, তীর্থ ও প্রমোদ উদ্যানের সমাবেশ করিয়া প্যালেস্‌টাইনকে ব্রিটিশ হোটেলওয়ালা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পুলিস ও সেনানীর আয়ের আকর করা এবং সেই সঙ্গেই পরোক্ষ ভাবে দেশ শাসন করিয়া ভারতের স্থলপথের ঘাঁটি দখল করা। ইহুদীদিগের উৎসাহের আতিশয্যে এই সুন্দর "রথ দেখা ও কলা বেচা"র আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল।

স্থানীয় আরবেরা প্রথমে এই ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই যখন তাহারা দেখিল যে, দেশের চারি ধারে জিনিষপত্রের দাম অর্থশালী বিদেশীর চাহিদায় চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই তাহাদের মনে অস্বস্তি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিলোলুপ ইহুদী যখন গরিব আরব চাষীর ভিটামাটি প্রবাসী জমিদারের নিকট কিনিয়া বিরাট্ উচ্ছেদ পর্ব্বের সূচনা করিল, তখন আরবেরা প্রমাদ গণিল। অনেকে টাকার লোভে জমি বিক্রয় করিয়া অন্য অঞ্চলে জমি কিনিতে গিয়া দেখিল জমি অগ্নিমূল্য, মজুরি দ্বারা রুটির চেষ্টা করিয়া দেখিল যে ইহুদী উপনিবেশ-স্থাপন-সমিতিগুলির নিয়ম, ইহুদী ভিন্ন অন্য কোন লোককে কোনও কাজ দেওয়া হইবে না। পথেঘাটে তখন পাশ্চাত্য-সভ্যতা-অভিমানী ইহুদীরা অসভ্য আরবদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে এবং উচ্চকণ্ঠে জগৎবাসীকে জানাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহারা দেশে জনবলে ও রাষ্ট্রীয় অধিকারে গরিষ্ঠ হইবে এবং প্যালেস্‌টাইন সত্য সত্যই "ইস্রায়েলের লীলাভূমি"তে পরিণত হইবে।

আরবেরা দেখিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই আরবী ও ইংরেজীর মত হিব্রু ভাষাও আদালতের ও দরবারের ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য হইল; তাহাদের পিতৃভূমিতে অন্যের অধিকার বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাদের যে-সকল নূতন অধিকার দিবার কথা ছিল সে-বিষয়ে কেহই কোন উচ্চবাচ্য করে না। ব্রিটিশ সরকারের কথার মূল্যের উপর তখনও তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সুতরাং তাহারা আবেদন-আরজী করিল, এমন কি গরিব দেশ হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রতিনিধিদল পাঠাইল। সে সবই বৃথা হইল এবং ধনগর্ব্বিত ইহুদীর অবজ্ঞার অপমানে তাহারা জ্বলিতে থাকিল। অন্নকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ বাড়িতে বাড়িতে প্রথমে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় (এপ্রিল ১৯২০) এবং পরে বিদ্রোহে পরিণত হইল।

যুদ্ধের পর "শান্তির যুগ" আসিবে বলিয়া ব্রিটিশ মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং সেই যুগে নিজেদের সাম্রাজ্য ও প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। অর্থবল, অস্ত্রবল, কূটনীতিজ্ঞান, বিদেশে জনমত-প্রচারের মত প্রভাব কোনটাই প্যালেস্‌টাইনের আরবদিগের ছিল না, সুতরাং "শান্তির যুগ" সত্যই যদি মিত্রপক্ষের কল্পিত ধারায় চলিত, তবে আরব-বিদ্রোহের কি পরিণাম হইত বলা দুঃসাধ্য নহে। "ভদ্রলোকের এক কথা" এই নীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অভদ্র, অসভ্য অর্থাৎ দুর্ব্বলের সম্বন্ধে একতরফা খাটে।

শান্তির যুগে তুর্কিতে মুস্তাফা কেমাল, ইটালীতে মুসোলিনি, আরবদেশে ইবন্-সাউদ, পারস্যে রেজা শাহ নানা প্রকার অশান্তির সূচনা করিলেন। ইঁহাদের দেখা-দেখি ইরাকে ও সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আরব এবং জার্ম্মানীতে নাৎসির দল নানা প্রকার গোলমাল বাধাইল।

রুষদেশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিয়া দ্রুতবেগে উপরে উঠিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া জাপান—যাহাকে ভাগ-বাটোয়ারার সময় ফাঁকি দেওয়া হইয়াছিল—উত্তর-চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় সাম্রাজ্যবিস্তারে "গুরুমারা" বিদ্যার পরিচয় দেখাইল। প্যালেসটাইনের আরব তাহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিল।

তাহার পর যাহা হইল তাহা অতিআধুনিক ইতিহাস। ১৯২১ সালে মন্ত্রী চার্চিলের স্তোকবাক্যে আরবদের ভুলানো যায় নাই। তাহার পর রাজকীয় কমিশন, পার্লামেণ্টের তরফ হইতে অনুসন্ধান-কমিটি, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ভারতীয় "খ্যাতি"-যুক্ত বিশেষজ্ঞের আমদানী, দলে দলে ব্রিটিশ পুলিস ও গোরাপল্টন, এরোপ্লেন, সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদের সকল মহৌষধেরই প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু রোগ-উপশমের লক্ষণ নাই। এই অশান্তির যুগে স্বাধীনতার স্বর্ণ-মোড়কে মুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের মেকী চালানো ক্রমেই অসাধ্য হইয়া আসিতেছে।

লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে আরব ও ইহুদী একাসনে বসিতে না চাওয়ায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া যায়। অবশেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গত ১৯শে মে "প্যালেস্‌টাইন প্ল্যান" বলিয়া এক রসায়নের প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে ইহুদীদিগের নিকট লর্ড বালফোরের প্রতিশ্রুতি এবং আরবদিগের নিকট ম্যাকমাহনের অঙ্গীকার দুই-ই পাল্টাইবার ব্যবস্থা আছে। আরবদিগকে বলা হইয়াছে "সবুরে মেওয়া ফলে" অর্থাৎ দশ বৎসর পরে প্যালেসটাইনে স্বাধীনতার বাতাস বহিবে, **তবে সে-স্বাধীনতার সঙ্গেও ইংরেজের বাণিজ্য বা রাজ্যরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে!** সম্প্রতি দশ বৎসর ইংরেজেরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছামত আরব ও ইহুদীগণকে দেশ শাসন ও পরিচালনে শিক্ষিত করিবেন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-পরিষদ্‌ বা মন্ত্রীপরিষদ্‌ **এখন স্থাপিত হইবে না,** তবে সে-বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাইতে পারে। দেশে শান্তি স্থাপিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বিচার করা হইবে এবং সেই বিচার-সভায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং প্যালেস্‌টাইনের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি—দুই পক্ষই থাকিবেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে কে, এবং অশান্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করিবে কে, সে-বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই এবং শান্তি স্থাপিত হইলে যাহাদের অসুবিধা তাহাদের অশান্তি ঘটাইবার ক্ষমতা-হ্রাসেরও কোনও কথা নাই, সুতরাং এই দশ বৎসর পঞ্জিকার দশ বৎসর না হইতেও পারে। সর্ব্বশেষে উপরিউক্ত পাঁচ বৎসর পরে যে স্বাধীনতার ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যরক্ষার (যুদ্ধবিগ্রহের) জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন মনে করিবেন তাহার সর্ব্ব-প্রকার বিধি-ব্যবস্থা **রাখিতেই হইবে!**

বিদেশী ইহুদীর আগমন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে আন্দাজ ৭৫০০০ ইহুদীকে প্যালেস্‌টাইনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। দেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ইহুদী হইলেই তাহাদের প্রবেশের দ্বার বন্ধ হইবে। আরবদিগের জমি ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাই হয় নাই।

বলা বাহুল্য, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহুদীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা উমেদার মাত্র, পাওনাদার নহে, অতএব যাহা কিছু দয়াদাক্ষিণ্য করিয়া দেওয়া যাইতেছে তাহা করজোড়ে কৃতজ্ঞতার সহিত লওয়া উচিত। আরবদিগকে বুঝানো হইয়াছে যে, শান্তশিষ্ট ও সভ্য হইলে দশ বৎসর পরে সে সমস্তই পাইবে, সুতরাং বৃথা বিদ্রোহ-অশান্তির প্রয়োজন কি?

ইহুদী-প্যালেস্‌টাইন-সঙ্ঘ এই প্রস্তাবকে ভদ্রভাষায় বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেখাইলেন যে সন্ত্রাস-বাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয়তাবাদী আরবেরাও এই সকল প্রস্তাবে কোনও সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। মনে হয়, পূর্ব্বের অনেক প্রস্তাবের মত এই প্রস্তাবও শেষ পর্য্যন্ত বাজে কাগজের স্তূপে স্থান পাইবে।

ইহুদীরাও দেশের বহু উন্নতি করিয়াছে। অশেষ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে, জলের মত অর্থব্যয় করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া প্যালেস্‌টাইনে তাহারা

অসম্ভব, এমন কি পূর্ব্বকালে অবিশ্বাস্য, অনেক জিনিষই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য অসভ্যতার দোষে দুষ্ট বলিয়া সে-দেশের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত তাহারা কোনও সহানুভূতি দেখায় নাই। কিন্তু এখন তাহারা সে পাপের অনেক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, ভবিষ্যতে করিতেও প্রস্তুত আছে। তবে ইহুদীরা এখন ইয়োরোপে শক্তিহীন এবং পূর্ব্বের তুলনায় অর্থসামর্থ্যহীন, সুতরাং ভদ্রলোকের এক কথা সে ক্ষেত্রে খাটে না।

আরবেরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া প্রাণপাত করিয়া লড়িয়াছে এবং এখনও লড়িতেছে। তাহাদের জন্য দুইটি মনিবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন দিনকাল খারাপ, সুতরাং এক মনিবের ব্যবস্থা চালাইবারই চেষ্টা হইয়াছে।

এই দুই দল পরস্পরের মধ্যে কোন মীমাংসা করিলেই সমস্যা আরও জটিল এবং তাহার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী আরব-নেতাদের কেহ কেহ ইহুদীদিগকে সংখ্যায় শতকরা ৪০ জন পর্য্যন্ত হইতে দিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী বেলারাণী বসু

শ্রীমতী বেলারাণী বসু এই বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় সমুদয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী অল্প বয়সে বৈধব্যগ্রস্ত হইবার পর বারাণসীতে যাইয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পাঠ-সমাপ্তির পর "আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। তিনি শান্তিপুরে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে বহুকাল যোগ্যতার সহিত চিকিৎসাকার্য্য করেন। সম্প্রতি শান্তিপুরে দত্ত-পাড়ায় "কামাখ্যা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়া চিকিৎসাকার্য্য চালনা করিতেছেন। বঙ্গদেশে তিনিই বোধ হয় প্রথম মহিলা-কবিরাজ। তাঁহার উদ্যোগে আরও কয়েক জন মহিলা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

সোভিয়েট্ বন্ধুত্ব—ব্রিটেনের দ্বিধা

শ্রীগোপাল হালদার

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মুখ চিরদিনই ছিল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে—তাহাই থাকিবার কথাও। কিন্তু দুই মাস পূর্বে সেই পররাষ্ট্রনীতি আবার মোড় ঘুরিতে চাহিল। প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন—তিনি পূর্বেকার ফাশিস্ত-'তুষ্টিবিধান' নীতি পরিত্যাগ করিয়া এবার হইতে আক্রমণ-রোধের নীতিই গ্রহণ করিলেন। এই নীতি-পরিবর্ত্তনের অর্থ যে কি দাঁড়ায় তাহা বোঝা সহজ। ইহার অর্থ অন্তত এই যে, ইউরোপের বুকে জার্ম্মানি ও ইতালী প্রমুখ আক্রমণোদ্যত জাতিদের আর ব্রিটেন ও ফরাসী নির্বিবাদে পররাজ্য গ্রাস করিতে দিবে না এবং ইউরোপের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শান্তিকামী শক্তিগুলির একটি সংহতি গঠনে ইহারা উদ্যোগী হইবে। অর্থাৎ ব্রিটেনের এত দিন চেষ্টা ছিল ফাশিস্তদের সৌহার্দ্য লাভ, এবার চেষ্টা হইবে বিপরীত—এইবার পূর্বেকার অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোভিয়েটকেই তাহার স্বপক্ষীয় জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কতটা সম্ভব?

একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, নীতিটা ঘোষণা করা চেম্বারলেনের পক্ষে যতটা সহজ হইয়াছে, এই নীতিটি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে ততটা সুসাধ্য হইবে না। বরং সেদিকে দুই-একটি বিষয়ে তাঁহার একটু উৎসাহের অভাবই দেখা যাইবে। ব্রিটেন ও সোভিয়েটে চুক্তি তেমনি একটি দিক্—চেম্বারলেনের নূতন নীতি কতটা চেম্বারলেনের প্রকৃতিতে সহিতেছে, এই চুক্তির ব্যাপারে তাহারই একটা পরিচয় মিলে;—সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়—কোনও রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে ও প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব ঘটিলে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সে রাষ্ট্র কতটা অসহায় হইয়া পড়ে। মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বর্ত্তমান মেরুদণ্ডহীনতা যে সেইরূপ এক দ্বন্দ্বের

নিউইয়র্কে বিশ্ব-প্রদর্শনী, ১৯৩৯। ক্রাইজলার মোটর-ভবন। এই প্রদর্শনীতে আশিটি দেশের শিল্প, কারু, ও বাণিজ্য সম্ভারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমাহৃত হইয়াছে। প্রদর্শনীর বিভিন্ন ভবন নির্ম্মাণে বাস্তুবিদ্যা অতি-আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এক দ্বিধা-দুর্বল জড়তারই ফল—ব্রিটেন ও সোভিয়েটের চুক্তির এই ক্রম-বিলম্বিত আলাপ-আলোচনা তাহাই পরিষ্কার করিয়া তুলিতেছে।

ব্রিটিশের সংহতি-চেষ্টা

চেম্বারলেনের বিঘোষিত নূতন পররাষ্ট্রনীতির কার্যক্ষেত্রে যে অর্থ দাঁড়ায় তাহা সহজবোধ্য। ইউরোপের যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর জার্মানি ও ইতালীর শ্যেনদৃষ্টি পড়িয়াছে সেগুলিকে রক্ষা করা এবং সেই-সব রাজ্য ও সোভিয়েটের মধ্যে অন্যান্য শক্তিশালী জাতিদের সহযোগে একটি শান্তি-সংহতি বা পীস্ ফ্রণ্ট গঠন করা। বিপন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথমেই পড়ে পোল্যাণ্ড ও রুমেনিয়া; তৎপর পূর্ব-ইউরোপের দানিউব-তটের ও বল্কান্ অঞ্চলের যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি; আর বাল্টিক্ সমুদ্রের উপকূলের এস্তোনিয়া, লাট্ভিয়া, লিথুনিয়া। অবশ্য ইহা ছাড়াও উত্তর সমুদ্রপারের ডেনমার্ক, সুইডেন, প্রভৃতি স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ জাতিগুলিও একেবারে নিশ্চিন্ত নয়। নাৎসিদের অবাধ আক্রমণে যেভাবে চেকোস্লোভাকিয়া তলাইয়া গেল, মেমেল জার্মানির করতলগত হইল, তাহাতে এই সব কোন রাজ্যই আর নিরাপদ নয়। অন্য দিকে, এই রাজ্যগুলি ব্রিটেন ও ফরাসীর ফাশিস্ত-নিরোধে নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া এই দুই শক্তিরই এই বিষয়ে ঐকান্তিকতায় বা কর্ম্মকুশলতায় আস্থা হারাইয়াছে—বেশ বুঝিয়াছে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ভরসায় থাকা অপেক্ষা বিনা বিরোধে নিজেদের রাজ্যে নাৎসি বা ফাশিস্তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মানিয়া লওয়াও শ্রেয়ঃ। সেইরূপ আনুগত্যে বরং তাহাদের একটা স্বাধীন সংস্থা থাকিতেও পারে, না হইলে চেকদের মত তাহাও খোয়াইতে হইবে। এই কারণেই, মিউনিখ্-চুক্তির পরেই জার্মান অর্থসচিব ডাক্তার ফুঙ্ক যখন দানিয়ুব ও বল্কান রাজ্যগুলির সম্মুখে জার্মান অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন, ঐসব রাজ্য তাহা সহজেই গ্রহণ করিল—জার্মানির আর্থিক প্রভাব সেই অক্টোবর মাস হইতেই ইহাদের উপরে পড়িল—তখনও এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে চাহিতেছিল রুমানিয়া ও কতকাংশে যুগোস্লাভিয়া। তার পর মার্চের মধ্যভাগে চেক্-দেশ জার্মানির কুক্ষিগত হয়। তখনই রুমানিয়ার উপর জার্মানির চক্ষু পড়িল, ডান্ৎসিগ্ পথটিকে পোলাণ্ডের হাত হইতে প্রত্যর্পণের দাবি উঠিল। রুমানিয়ার রাজা কেরল কিন্তু ব্রিটেন ও ফরাসীর নিকট হইতে তাড়াতাড়ি কোন ভরসা পাইলেন

না। বাধ্য হইয়াই রুমানিয়াব আর্থিক জীবনকে জার্মানির পায়ে সঁপিয়া দিয়া তাহার রাষ্ট্রিক সত্তাকে কোনরূপে তখনকার মত তিনি রক্ষা করিলেন। ইহার পরেই চেম্বারলেন তাঁহার নূতন নীতির ঘোষণা করেন। রুমানিয়া ও পোলাণ্ড দুই দেশই আক্রান্ত হইলে ব্রিটিশ ও ফরাসীব সহায়তা লাভ করিবে—এই মর্মে একটা চুক্তিও হইয়া গেল। কিন্তু বল্কান্ অঞ্চলেব অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ দূতেরা বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিলেন না,—ইতালীর আল্‌বেনিয়া-গ্রাসের পবে ব্রিটেন তুর্কীর সঙ্গে আবার একটা তেমনি চুক্তি করিল। তখন গ্রীসও ব্রিটিশ-ফরাসীর বন্ধুত্বেব জন্য আগ্রহান্বিত হইল। ইহার ফলে রুমানিয়া আক্রান্ত হইলে কৃষ্ণসমুদ্রেব পথে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাহায্য তাহার নিকটে পৌঁছাইতে পারে—এই সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এদিকেও ব্রিটেন নাৎসি-ফাশিস্ত বন্ধুদ্বয়ও চেষ্টার ক্রটি করিল না। পোলাণ্ড ও রুমানিয়া যেই 'গণতান্ত্রিক শক্তিদের' ভরসা পাইল, পূর্ব-ইউরোপে তাহাদের প্রভাব খর্ব রাখা জার্মানির প্রয়োজন, ভূমধ্যসাগরের সর্বত্র ব্রিটিশ সমুদ্র-প্রাধান্য শেষ করিয়া নিজ প্রাধান্য দৃঢ়তর করা তেমনি প্রয়োজন ইতালীর। এই কারণেই সপ্তাহকাল-মধ্যে ইতালী নিজের বন্ধু-রাষ্ট্র আলবেনিয়া হস্তগত করিল—আদ্রিয়াতিক তটে ও ডোডাকানিজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালীর ঘাঁটি থাকায় পূব ভূমধ্যসাগরে এখন ইতালীর প্রতিপত্তি কে খর্ব করিবে? কিন্তু ঠিক ইহা দেখিয়াই গ্রীস ও তুর্কী ব্রিটিশ-ফরাসী বন্ধুত্বের জন্য উদ্যোগী হয়। মুসোলিনির সমুদ্র-পথে ইহাতে একটু বাধার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু, অপর দিকে ইতালী ও জার্মানির তিন দিক হইতে চাপে পড়িয়া যুগোস্লাভিয়া আর
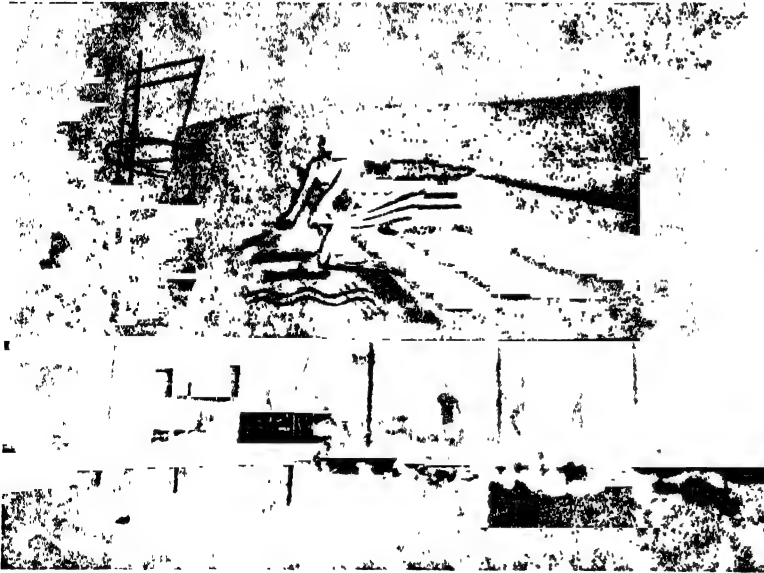
নিউইয়র্কে বিশ্ব-প্রদর্শনী, ১৯৩৯। অপারেশন্‌স বিল্ডিং। চিত্র ও বর্ণাঢ্যতার দ্বারা এই সকল ভবনকে শোভন ও মনোহর করা হইয়াছে। পৃথিবীর কোন্ দেশ কি ভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, এই প্রদর্শনীতে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আর অগ্রসর হইতে পারে নাই—অন্য দিকে বাল্টিক উপকূলে কোনরূপ বন্ধুত্ব সন্ধানের জন্যও সে সচেষ্ট হইল না—শুধু সোভিয়েটের সঙ্গে কথাই চালাইতে লাগিল। সমস্ত পূর্ব-ইয়ুরোপের উপরে ঘনায়মান জার্মান বা ফাশিস্ত বিভীষিকা অপনোদনের পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট? বাল্টিক অঞ্চলে বা সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি কি এতই গৌণ?

ফাশিস্ত তৎপরতা

ইহা যে যথেষ্ট নয় তাহা ব্রিটেনও বুঝিতে পারে। আর, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য চেম্বারলেনীয় নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক দলে ভিড়িবার সাহস পাইবে না—বিশেষতঃ যখন তাহার গৃহমধ্যে আছে লক্ষ দশেক ক্রোট, লক্ষ দশেক স্লাব, ও লক্ষ পনের সার্বিয়ানের দীর্ঘকালের অমীমাংসিত কলহ। হইতে চলিয়াছে তাহাই—প্রিন্স রিজেণ্ট পল বাধ্য হইয়াই যুগোস্লাভিয়াকে রোম-বার্লিন অক্ষের পিছনে বাঁধিতেছেন, আর সে বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছেন কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে। এইরূপে বল্কান্ অঞ্চলের রাষ্ট্রনীতিতে ছায়াবিস্তারের প্রয়াস কেহই ছাড়ে নাই—কিন্তু এখনও কোন ছায়া স্থায়ী হয় নাই বুল্‌গেরিয়ায়। যুদ্ধ-পরাজিত বুল্‌গেরিয়া রুমেনিয়ার নিকট তাহার দবরুয়া অঞ্চল বিসর্জ্জন

দিতে বাধ্য হয়,—আজ তাহা ফেরৎ না পাইলে রাজা বোরিস্ রুমানিয়ার সঙ্গে গণতান্ত্রিক বন্ধুগোষ্ঠীতে ঠাঁই লইবার কথা মনে তুলিবেন না। অথচ জার্মানদের সম্পর্কেও একটা জাতিগত বিরোধিতা বুলগেরিয়ার মনে সঞ্চিত হইয়াই আছে। কাজেই রোম-বার্লিন অক্ষেও আশ্রয় লইতে সে উদ্যোগী নয়—অন্তত সে অক্ষের চক্রতলে যতক্ষণ নিষ্পিষ্ট হইবার আশঙ্কা আশু সম্ভাবনা দেখা না যায়।

অন্য দিকে উত্তর-সমুদ্র ও বাল্টিক-তটে বার্লিনের উদ্যোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রোম-বার্লিনের দানবীয় বলে ও ক্ষুদ্র রাজ্য বিনাশের চেষ্টায় ব্যথিত হইয়াছেন। গণতন্ত্রের নামেও তাহার মার্কিনী চিত্ত ঐ শক্তিদের প্রতি বিমুখ; তাহার উপর দক্ষিণ-আমেরিকায় আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে জার্মান-প্রভাব বিস্তারের সূচনা দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুব্ধ এবং শঙ্কিতও। তাই, তিনি দশ বৎসরের মত এই রাষ্ট্র-নায়কদের নিকট চাহিলেন অনেকগুলি রাষ্ট্রসম্বন্ধে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি। গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহাতে খুশী হইল, বুঝিল, শান্তির নামে ভবিষ্যতে মার্কিন দেশকে খানিকটা নিজেদের সঙ্গে টানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। এদিকে হিট্‌লার উত্তর দিলেন—সে-সব রাজ্য তো আমাকে ভয় করে না। সুইডেন নরওয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ড তো এইরূপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করে না; ডেনমার্ক আমার সহিত একটা চুক্তিই করিতেছে; এস্টোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়ারও সহিত তেমনি চুক্তি হইবে শীঘ্রই। আর, পোল্যাণ্ড যখন ব্রিটেনের বন্ধুত্বই গ্রহণ করিল, তখন ১৯৩৪ সনে স্বাক্ষরিত পোলাণ্ড-জর্মান চুক্তি তাহাতে বাতিল হইল এবং ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তিও হইল শেষ।

বল্‌কানের ও দানিয়ুবের তীরের মত বাল্টিক-তীরের রাষ্ট্রগুলিও এই ভাবে এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, ব্রিটিশের গণতান্ত্রিক ও শান্তি-সংহতির বুলিতে ভুলিয়া লাভ নাই—বার্লিন তদপেক্ষা অনেক তৎপর, অনেক ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে পূর্ব-ইউরোপের এই অক্ষ-প্রভাবকে দৃঢ়মূল করিয়া লইলেন হিট্‌লার ও মুসোলিনি। রোম ও বার্লিন দুই রাষ্ট্রে সামরিক ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। মিলানের আলোচনার পরে ভিয়েনাতে এই চুক্তিপত্র চিয়ানো ও ফন্ রিবেন্‌ট্রপ স্বাক্ষর করিলেন।

এইরূপে চেম্বারলেন যখন নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া রুজভেল্টের নিবেদনের ফল দেখিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন, পোলাণ্ড, রুমেনিয়া, তুর্কীকে ভরসা দিয়া আক্রমণ-বিরোধী শান্তি-

সংহতি গঠন করিবার কাজ চুকাইয়া দিতেছিলেন, তখন রোম-বার্লিন অক্ষ একটির পর একটি দেশকে নিজেদের আওতায় আনিয়া ফেলিল। এই দিকে তাহাদের অক্ষ-গত বন্ধু জাপানেরও পূর্ণ সহযোগিতাই তাঁহারাও পাইবেন। শুধু এসিয়া-খণ্ডের ব্যাপারে জাপান ব্যাপৃত—আর পরাজিত চীন মরিয়াও মরে না—তাই তাহার এই বিষয়ে উদ্যোগ ও উচ্চ-ভাষণ শোনা যায় না। বরং সোভিয়েটের সহিত সম্পর্কে, বহিম ঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত-সজ্ঘর্ষে ও শাখালিন্ দ্বীপপুঞ্জের মৎস্য-ব্যবসায়ে, জাপান অনেকটা সংযমেরই পরিচয় দিতেছে। এ সংযম অবশ্য তাহার স্বভাবগত নয়—তবে একই সঙ্গে চীন ও রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে জাপান অক্ষম বলিয়াই এই সংযম।
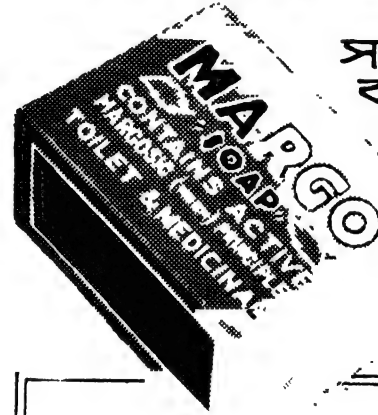
সোভিয়েট সৌহার্দ্য

পরিষ্কার দেখা যাইতেছে—রোম-বার্লিন যেভাবে দ্রুত ও সুস্থির পদে অগ্রসর হইতেছে, ব্রিটিশ ও ফরাসী সেভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বল্‌কানে যদিবা ইতালীর তাড়নায় তুর্কী ও গ্রীস তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে, বাল্টিকে তাহারা একেবারেই মিত্রলাভে পশ্চাৎপদ—এমন কি, সেখানে তাহাদের সে প্রয়াসও নাই। অন্য দিকে মাস দুই যাবৎ সোভিয়েট সৌহার্দ্য প্রকাশ্যত: তাহারা কাম্য বলিয়া স্বীকার করিলেও সেদিকে এখনও কোন স্থির চুক্তিতে পৌঁছিতে তাহারা সমর্থ হয় নাই। এমন কি, ব্রিটেনের নূতন-মিত্র তুর্কীর স্পষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন এই সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। অথচ চেম্বারলেনীয় নূতন পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণার সঙ্গেই উহার প্রয়োজন তাহারা স্পষ্টই মানিয়া লন, সেদিকে আয়োজনও চলে। ব্রিটিশ-দূত সর উইলিয়ম সীড্‌স্ মস্কৌতে আলাপ চালনা করেন; সোভিয়েট-দূত মেইস্কি লণ্ডনের মন্ত্রিমহলে ঘন-ঘন দর্শন দেন; আর ব্রিটেনের জনমতও পুনঃ পুনঃ এই সোভিয়েট সৌহার্দ্যের জন্য নিজেদের আগ্রহ ঘোষণা করে। এই কথা খুবই পরিষ্কার—বার্লিন-রোমের আক্রমণ চক্রান্ত যদি ঠেকাইতে হয় তাহা হইলে সোভিয়েট-সহায়তা ছাড়া এক পদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে সে কারণগুলি এই—প্রধানত:, নীতির দিক হইতে সোভিয়েট পূর্ব্বাপর শান্তি-

রক্ষার পক্ষপাতী ও গণতন্ত্রের সহায়ক, দ্বিতীয়তঃ শক্তির দিক হইতে জার্মান ও ইতালী জলে-স্থলে-আকাশে যে বিপুল
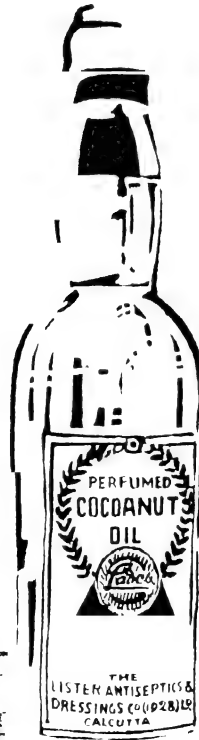
আলবানিয়ায় ইটালীর পেট্রোলিয়াম কারখানা

সমরসজ্জা করিয়াছে ও করিতে সমর্থ, ব্রিটিশ ও ফরাসীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। অস্ত্রবলে ফাশিস্ত শক্তিদ্বয় অতুলনীয়, জনবলেও তাঁহারা প্রবলতর—কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সৈনিক সাধারণকে ইউরোপখণ্ডে না আনিতে পারিলে ব্রিটেন ও ফরাসী জনবলে বলীয়ান্ নয়, আর হিট্‌লার-মুসোলিনিও তাহা বেশ জানেন, তাই এবারকার যুদ্ধ তাহারা এইরূপ সাহায্য লাভ সম্ভব হওয়ার পূর্বেই খুব তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প। অবশ্য, এই কথাও আবার ব্রিটেনের অবিদিত নয়, সে-ও অস্ত্রবৃদ্ধিতে উদ্যোগী। সেই ব্রিটিশ সমরায়োজন সুসমাপ্ত হইলে অস্ত্রবলে ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী কে থাকিবে বলা কঠিন। আর, এদিকে সৈন্যবলের অভাব যাহাতে যুদ্ধপ্রারম্ভেও না ঘটে তজ্জন্য ফরাসীর পীড়াপীড়িতে চেম্বারলেন ২০-২১ বৎসরের যুবকদের এক বৎসরের মত বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রস্তাবটিতে বিলাতের শ্রমিক ও উদারনীতিকরা আপত্তি করেন—প্রথমতঃ, বাধ্যতা কথাটা ইংরেজের কানে উপাদেয় নয়, দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট-সম্পর্ক স্থাপনে চেম্বারলেনের যে বিলম্ব ঘটিতেছে তাহার কারণ তাহার অনিচ্ছা বলিয়া শ্রমিকদল সন্দেহ করেনই আর তাঁহারা তাই মনে করেন, চেম্বারলেন শান্তিও চাহেন না, ফাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধেও বিলাতের এই সমরশক্তি প্রয়োগ করিবেন না—হয়ত এ শক্তি প্রয়োগ করিবেন ফাশিস্তদের স্বপক্ষে—তাঁহার বন্ধু দালাদিয়েও ফ্রান্সে শ্রমিক-ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এইরূপ সৈনিকদের প্রয়োগ করিয়াই ফরাসী জনগণের শক্তিকে পঙ্গু
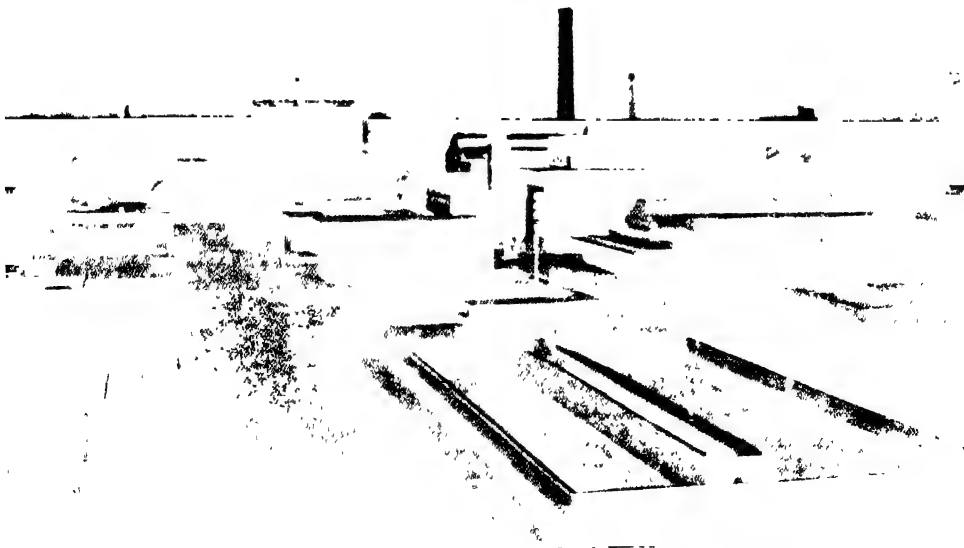
আলবানিয়াতে ইটালীর পেট্রোলিয়াম সংগ্রহের যন্ত্রাদি ও কারখানার এক অংশ

আলবানিয়াতে ইটালীর পেট্রোলিয়াম সংগ্রহের যন্ত্রাদি ও কারখানার অন্য অংশ

করিয়াছেন। ব্রিটিশ শ্রমিকদের কথা এই—সত্য সত্যই যদি ফাশিস্ত প্রতিরোধই চেম্বারলেনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে চাই সোভিয়েট চুক্তি।

সোভিয়েট শক্তির উপর ব্রিটিশ জনগণের এই আস্থা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমান পূর্ব-ইউরোপের বিপন্ন রাজ্যগুলির সংস্থান যেরূপ তাহাতে সোভিয়েট সহায়তা তাহাদের পক্ষে বেশ দরকার। পোলাণ্ড বা রুমেনিয়ার পক্ষে ব্রিটিশ বা ফরাসী সাহায্য পাওয়ার পথ সুপ্রশস্ত নয়, অথচ সোভিয়েট সাহায্যের পথ প্রায় অবাধ। এইরূপে দেখা যায়, আজ সোভিয়েটের সৌহার্দ্য-লাভ না করা ব্রিটেনের পক্ষে দুর্ভাগ্য। কারণ প্রথমতঃ সৈন্যবলে, অস্ত্রবলে সোভিয়েট আজ এক অতুলনীয় শক্তি; তদুপরি তাহার পক্ষেই বিপন্ন রাজ্যগুলির সহায়তায় অগ্রসর হওয়া সহজে ও দ্রুতগতিতে সম্ভব; এবং সর্বোপরি তাহার মূলনীতি শান্তি ও গণতান্ত্রিকতা;—তাই তাহার সহায়তা না পাইলে শান্তি-সংহতি ও গণতান্ত্রিক সংহতি কখনও গঠিত হইবে না—ফাশিস্তের বর্বর অভিযান ঠেকানো অসম্ভব।

কিন্তু দুই মাসেও সেই সোভিয়েট সৌহার্দ্য চেম্বারলেন লাভ করিতে পারিলেন না। কথা চলিয়াছে, আলোচনা বাড়িয়াছে, দুই পক্ষের বুঝা-ভুলবুঝার বোঝাও ভারী হইয়াছে অনেক—কিন্তু গোল চুকিল না। সে গোল কোথায়? টাস্ এজেন্সির মস্কৌর একটি সংবাদে মে মাসের মধ্যভাগে জানা গেল—ব্রিটিশ মন্ত্রীরা চাহেন, ব্রিটেন যখন পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সোভিয়েট তাহা স্বীকার করিয়া সেজন্য লড়াই করুক। কিন্তু সোভিয়েট যদি ঐরূপই সহায়তা ব্রিটেনের নিকটে চায়—বাল্টিকের যে-সব শক্তিদের সে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিবে, তাহারা আক্রান্ত হইলে ব্রিটেনও তাহাদের জন্য লড়াই করিবে? অতএব, সোভিয়েট চাহে এই চুক্তিটা ব্যাপক হউক, এবং উভয়ের প্রতি সমপ্রযোজ্য হউক। ব্রিটেন বলিল—কথাটা রুশিয়া ভুল বুঝিয়াছে, আমরা 'পারস্পারিক ভিত্তিতেই' চুক্তি চাই। ইহার পরে জুনের প্রারম্ভে বর্ত্তমান সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মলোটোভের বক্তৃতা পাওয়া গেল। মলোটোভ বলিলেন—বেশ, চীনের সীমান্ত সম্বন্ধে না হয় ইউরোপীয় শক্তিদের কোনও সহযোগিতা না দাবি করিলাম, কিন্তু বাল্টিক দেশগুলি সম্বন্ধে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন ও ফরাসী দিক্। কারণ, সে-দেশগুলি জার্মানির আয়ত্ত হইলেও সোভিয়েটের বিপদ সমাসন্ন হয়—না হইলে জার্মানির সঙ্গেই বা রুশিয়ার এমন কি শত্রুতা?

এদিকে ব্রিটেনের সাফাইও বেশ ভাল:—এইসব বাল্টিক রাজ্য দুই প্রবল দলের মধ্যখানে পড়িয়া বলিতেছে, 'আমরা কাহারও

সহিতই চুক্তিতে যাইব না'—এ-স্থলে সোভিয়েটের কথামত ব্রিটেন কি প্রতিশ্রুতি দিবে ?

ব্রিটেন চিন্তা করিতেছে,—কোন্ ফরমূলায় এই বাল্টিক রাজ্যের রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে না লইয়াও সোভিয়েটের সৌহার্দ্য লাভ করা যায়। সে চুক্তি যে তাহার দরকার,—ঘটনা বিপর্য্যয়ে এই কঠিন সত্যকে এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও না মানিয়া উপায় নাই।

দোটানার মাঝে ব্রিটেন

কিন্তু এই প্রয়োজন তো পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে—তথাপি কার্য্যতঃ এই সৌহার্দ্য লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হয় কেন ? ইহার কারণ, ব্রিটেনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, প্রকৃতির সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্ঘর্ষ। ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী, চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় ধনিকশ্রেণীর। তাহারা সাম্রাজ্যের জন-সাধারণকে শোষণ করিয়া নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করে, মানব-সভ্যতা বাড়ায়,—ইহাই ধনিকতন্ত্রের প্রকৃতি। এই ধনিকতন্ত্রের পরিপোষক ও রক্ষাকর্ত্তাই ফাশিস্ট একনায়কত্ব; আর ইহার সংহারকর্ত্তাই সোভিয়েটতন্ত্র। সোভিয়েটতন্ত্র কার্য্যতঃ প্রতিপাদন করিতে চায় শোষণধর্ম্মী সমাজ অচল ; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসোন্মুখ ; একমাত্র জনগণের আর্থিক পূর্ণাধিকার ও তাহাদের রাষ্ট্রিক অধিকারই শ্রেয়ঃ। অতএব, সোভিয়েট চেম্বারলেন-প্রমুখদের, ধনিকতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদের সহজাত শত্রু এবং তাহাদের আজন্ম মিত্র ফাশিস্তরা। কিন্তু ধনিকতন্ত্র আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর স্থাপিত—প্রত্যেক ধনিক ও ধনিক-রাষ্ট্র অন্য ধনিক ও ধনিক-রাষ্ট্রের উপর লাভ করিয়া জয়ী হইতে চায়। যেমন, জার্ম্মানি ও ইতালী এখন চায় নূতন সাম্রাজ্য—যাহাতে তাঁহাদের মুনাফা বাড়ে। ব্রিটেন প্রথম ভাবিল, মাঞ্চুকু, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশ ঘুস দিয়া এই স্বগোত্রের ধনিকদের তুষ্ট রাখা যাইবে। কিন্তু দেখা গেল উহার পরেই আরম্ভ হইল ব্রিটেন ও ফরাসীর সহিত ইহাদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা—জার্ম্মানী তাহার ইংরাজাধিকৃত কলোনি ফেরৎ চায়; ইতালী ভূমধ্যসাগরে একচ্ছত্র হইতেছে। অতএব, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহারাও শত্রু। এ শত্রুদের ঠেকাইতে হইলে প্রয়োজন সোভিয়েটের সাহায্য। কিন্তু সোভিয়েট চায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। প্রয়োজন ও প্রকৃতির এই সংঘর্ষেই ব্রিটেন দোটানায় পড়িয়াছে—সোভিয়েট সৌহার্দ্য তাহার আশু প্রয়োজন, অথচ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিই এই সোভিয়েট-বিরোধী। তাই, ব্রিটেনের দ্বিধা আর ঘোচে না।

আলবানিয়ার কথা

ইতালীর আলবানিয়া অধিকার সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। ইতালীর আলবানিয়া অধিকারের একটি সম্ভব কারণ আমাদের দেশে তেমন সুবিদিত নহে।

সকলেই জানেন যুদ্ধের সময় একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে পেট্রোলিয়াম একটি প্রধান। সকল জাতিই এখন এ বিষয়ে পরদেশনিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক জাতিই জগতের যে অঞ্চলে পেট্রল পাওয়া যায় তাহা আপনার দখলে রাখিতে চাহিতেছে, বা এই জন্য নানারূপ চুক্তি ইত্যাদি করিতেছে। ইতালী এ-বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, এই জন্য ১৯২৫ সালে বহু অর্থব্যয়ে তৈল সংগ্রহ করিবার জন্য আলবানিয়াতে কোম্পানী খাড়া করে এবং আলবানিয়ায় প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেদের নানারূপ ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা চলে। ১৯২৫ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত বহু অর্থব্যয় এজন্য ইতালী করিয়াছে, এবং তাহার ফলে এখন আলবানিয়ায় ইতালীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় তৈল সংগ্রহ শোধন ইত্যাদি কাজ চলিতেছে। এখন জগতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এই কারখানাগুলি যাহাতে ইতালীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকে, এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা প্রয়োজন। সাবধানের মার নাই। আলবানিয়া অধিকারে এই সুবিধাটি সম্বন্ধেও ইতালী নিশ্চিন্ত হইতে পারিল।

ভ্রম-সংশোধন

আষাঢ়ের প্রবাসীর ৩৮৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ২৯-৩২ পংক্তির বাক্যটি এইরূপ হইবে :—

"রামমোহন তাঁহার কুৎসার অন্তর্নিহিত সাধারণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কুৎসার ব্যক্তিগত দিক্‌টা উত্তর দিবার যোগ্য মনে করেন নাই—ইহা অসম্ভব নহে।"

র. চ.
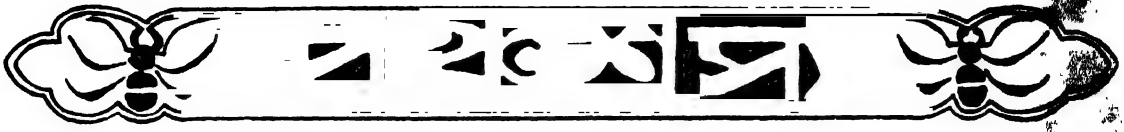
আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা

পলিনেশিয়া ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে জলন্ত অঙ্গার, বা আগুনে উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে খালি পায়ে হেঁটে যাবার যে প্রক্রিয়া দেখা যায়, বহুকাল ধরে অনেক ইউরোপীয় দর্শকের মনে তা বিস্ময় উৎপাদন ক'রে আসছে। তাঁদের অনেকে একে ফাঁকি ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এর সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ বিশেষ দিতে পারেন নি, বিষয়টা রহস্যাবৃত হয়েই আছে। সম্প্রতি "সায়ান্টিফিক অ্যামেরিকান" পত্রে এ-সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

পলিনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তপ্ত পাথরের উপরে হাঁটার নিদর্শন দেখা যায়। বড় বড় কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের চার দিকে গর্ত ক'রে কাঠ জ্বালিয়ে রাখা হয়, যার ফলে পাথরগুলি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার পর নানা মন্ত্রতন্ত্রাদি পাঠের পর অবলীলাক্রমে তার উপর দিয়ে অনেক লোককে হেঁটে যেতে দেখা গেছে, তাদের পায়ে সামান্য একটু ফোস্কাও পড়ে নি। জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হাঁটা ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। মোটামুটি দৈর্ঘ্যে বারো ফুট প্রস্থে ছয় ফুট গভীরতায় প্রায় এক হাঁটু সমান গর্ত ক'রে তাতে কাঠ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তার পর কাঠ পুড়ে জলন্ত অঙ্গারে পরিণত হ'লে তার উপর দিয়ে অনেক লোক স্বচ্ছন্দে হেঁটে যায়, তাতে তাদের কোন অসুবিধা বোধ করতে দেখা যায় না।

যারা এ-সব প্রক্রিয়া করে তারা অনেকেই বলে, অপ্রাকৃত শক্তি ও ভক্তির বলেই তারা আগুনের দাহিকা শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে, তারা ইচ্ছা করলে এই অগ্নি-প্রতিরোধ-ক্ষমতা অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে। আগুনে হাঁটবার কিছু কাল পূর্ব্ব থেকেই তারা পবিত্র ভাবে দিনযাপন করে, ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিয়োগ ক'রে থাকে, মদ্যমাংস এ-সময় বর্জ্জনীয়। অনেক প্রক্রিয়াকারীর মতে, এই আগুনের স্পর্শে তাদের অতীত পাপ সব দগ্ধ হয়ে যায়, ভবিষ্যতেও পাপপথে তাদের প্রবৃত্তি হয় না।

ইউরোপীয় দর্শকেরা নানা জনে এর নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেন, প্রাচ্যদেশীয়দের স্পর্শসচেতনতা পাশ্চাত্যদেশের লোকের চেয়ে কম, এদের পায়ের চামড়া শক্ত, এই জন্যই আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে; কেউ বলেছেন, এরা এই প্রক্রিয়ার সময় এমন একটা ভাবোন্মাদের মধ্যে থাকে যাতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়; কেউ বলেন, এরা পায়ে এমন কিছু মেখে নেয় যাতে আগুনের আঁচ লাগে না। কিন্তু লোক ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'লে সেজন্য আগুন তার স্বাভাবিক দাহিকা শক্তি ত্যাগ করবে না, আর আগুনে হাঁটবার আগে

ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে জনতার সম্মুখে এক জন লোক দীর্ঘ অগ্নিপথ অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতেছে

অনেক বার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে তারা কোন ঔষধ ব্যবহার করে নি, এবং নিঃসন্দেহ হবার জন্য পা ধুয়ে দিয়েও দেখা গেছে, ফল একই হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাগুলি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়।

অনেকে বলেছেন, এই প্রক্রিয়ার পূর্বে লোকেরা স্নান ক'রে নেয়, তাতে পা অল্প বিস্তর আর্দ্র থাকে, এতে এমন একটা বাষ্পের সৃষ্টি হয় যাতে তাপের হাত থেকে রক্ষা করে। বৈজ্ঞানিকেরা এ-ব্যাখ্যাকে বিচারসহ মনে করেন নি। রিচার্ড মার্টিন টাহিটিতে উত্তপ্ত পাথরের উপর হাঁটা দেখেছিলেন এবং তিনি নিজেও ঐরূপ হেঁটে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন। তার নিজের খুব বেশি আঘাত লাগে নি। তিনি পাথরগুলি পরীক্ষা ক'রে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ঐ পাথরগুলির গঠন এইরূপ যাতে তাপ-সঞ্চারণ অধিক মাত্রায় হয় না, এই জন্যই তার উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে হাঁটা সম্ভব। ছাড়া যারা আগুনের উপরে হাঁটে তাদের পায়ের চামড়াও অত্যন্ত শক্ত, এজন্যও তাপের হাত থেকে তারা রক্ষা পায়।

লণ্ডনে খুদা বক্সের আগুনের উপর দিয়া হাঁটিবার নৈপুণ্য প্রদর্শন

'ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডন কাউন্সিল ফর্ সাইকিক্যাল ইন্‌ভেষ্টিগেশ্যন' এর পক্ষ থেকে এসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য তাঁদের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল আগে লণ্ডনে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাউন্সিলের আহ্বানে খুদা বক্স এই প্রক্রিয়া দেখাতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। খুদা বক্স বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাসের বলে আগুনকে প্রতিরোধ করতে পারেন, এবং তিনি এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা অন্যের
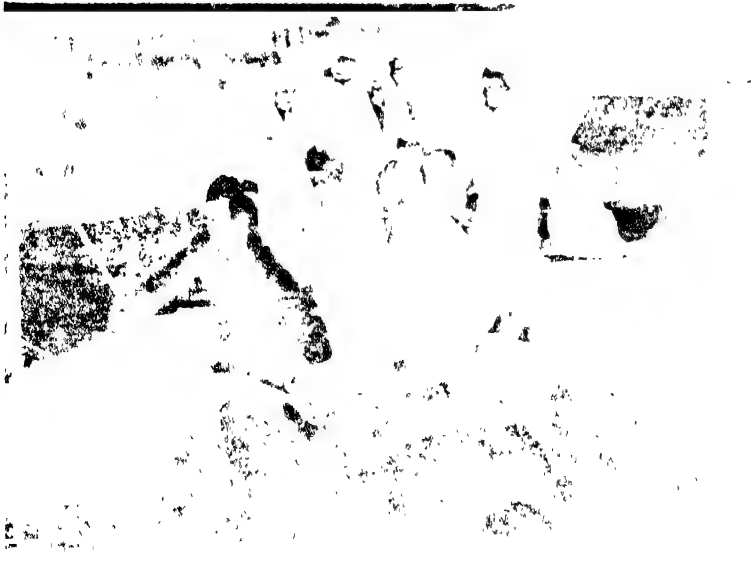
লণ্ডনে আহমেদ হুসেন ১০৬৭° (ফা) ডিগ্রী উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন, তাঁহার সহিত তিন জন ইউরোপীয়ও চলিয়াছেন।

মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পারেন। খুদা বক্সের কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য পঁচিশ ফুট দীর্ঘ তিন ফুট প্রস্থ ও এক ফুট গভীর পরিখা খনন ক'রে, তাতে তিন টন কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সাড়ে তিন ঘণ্টার জ্বলবার পর তা তিন ইঞ্চি গভীর জ্বলন্ত অঙ্গাররাশিতে পরিণত হয়। হাঁটবার পূর্ব্বে খুদা বক্সের পা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, তাতে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় নি। তার এক পা ধুয়েও দেওয়া হয়েছিল, যদি পায়ে কোন ঔষধের প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ অনেকে অনুমান করেন যে, ফটকিরি, লবণ, সাবান ও সোডার প্রলেপ দিলে আগুনের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। পরে আহমেদ হুসেন নামে আর এক জন ভারতীয়ও এইরূপ ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। এঁরা দুজন পর পর কয়েক বার এই পরীক্ষা দেন। তাঁদের সঙ্গে কয়েক জন ইউরোপীয়ও আগুনে হাঁটবার চেষ্টা ক'রে দেখেন। কয়েক বার চেষ্টার পর তাঁরাও মোটামুটি সফল হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। এই সকল পরীক্ষার পর কাউন্সিল যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে এর বিভিন্ন প্রচলিত ব্যাখ্যার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও এ-সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ, অনেকে যে বলেছেন, এটা একটা চালাকি মাত্র, তা সত্য নয়, কোনরকম ঔষধ প্রয়োগ না ক'রে, খালি পায়ে এটা করা হয়।

পা ভিজা থাকলে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই হয়—পরীক্ষাকারীদের মধ্যে পা যাদের অপেক্ষাকৃত আর্দ্র তাদেরই পা পুড়ে যেতে দেখা গেছে। পায়ের চামড়া এ-কাজের জন্য বিশেষ রকম শক্ত হওয়া আবশ্যক করে না।

উপবাস ইত্যাদি যে-সব প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া [illegible] ক'রে থাকে তাতে বাস্তবিক পক্ষে কোন সহায়তা হয় [illegible] ভক্তি ও বিশ্বাস যত দৃঢ় হোক আগুনের শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

অগ্নিপ্রতিরোধক্ষমতা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হ'তে পারে না।

অনেকে যে বলেন, শীতল ছাইয়ের উপর দিয়ে হাঁটবার দরুন আগুনের আঁচ লাগে না, তাও ঠিক নয়, কারণ খুদা বক্সের পরীক্ষার সময় ছাই সরিয়ে নিয়ে দেখা গেছে, এবং তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়েই হাঁটতে হয়েছে।

এই রিপোর্টে এই ক্ষমতার কারণ নির্দ্দেশ করা হয়েছে এইরূপ:

চামড়া বা অন্য কিছু, তার চেয়ে অধিক উত্তাপবিশিষ্ট কোন বস্তুর সংস্পর্শে পুড়ে যায় সেই ক্ষেত্রেই, যখন উষ্ণতর বস্তুটি থেকে কম উষ্ণ বস্তুতে তাপ প্রবেশ করতে পারে, নইলে নয়। কিন্তু কাঠের অঙ্গারের তাপসঞ্চালন-ক্ষমতা অন্য বস্তুর থেকে কম; যেমন তামার তাপসঞ্চারণ-ক্ষমতা কাঠের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। তাপসঞ্চারণক্ষমতার এই অপেক্ষাকৃত অল্পতার জন্যই অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটেও অনেকের পা পুড়ে যায় না, আর তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে একেবারের পা ফেলায় আধ সেকেণ্ডের বেশি অঙ্গারের সঙ্গে পায়ের সংস্পর্শ ঘটে না। এ-ছাড়া, যে-সব দেশে লোকে সাধারণতঃ খালি পায়ে হাঁটে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাদের সর্ব্বদা খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে অগ্নিতাপ সহ্য করবার ক্ষমতা স্বভাবতই কিছু অধিক হবারও কথা।

আলবানিয়ার ইতালীয় কোম্পানী প্রচুর পেট্রোলিয়ামের খনির সন্ধান পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ২০০টি তৈল-কূপে কাজ চলিতেছে।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্"
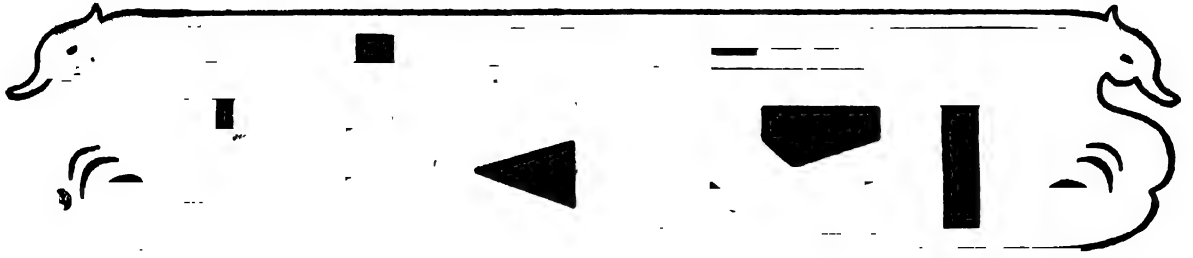
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৬

৪র্থ সংখ্যা

এপারে-ওপারে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘঁ্যাষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে আড়ে কাছে কাছে।
যা খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।
অকারণে হাত ধরে ;
যে যাহারে চেনে,
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে
কথা কাটাকাটি চলে গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্ত্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।
পরস্পরে দেখা হয়
বাঁধা ঠাট্টা করে বিনিময়।

কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে
হেসে ওঠে অহেতু কৌতুকে।
"আনন্দবাজার" হতে সংবাদ উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা দ্বন্দ্ব চলে,
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।
পথপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে বসি
ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো হাতে দর-কষাকষি।
একই সুরে দম-দিয়ে বার-বার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটরি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাস পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চীৎকার।
যেদিন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে জামাই উদয় হয় আসি,
মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি,
টেপাটেপি কানাকানি,
অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি।
দেউড়িতে ছাতে বারান্দায়
নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়।

হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।
অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে
দিনে রাত্রে কাজের আভাসে।
উঠোনে অনবধানে খুলে রাখা কলে
জল বহে যায় কলকলে ;

সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁৎসেঁতে।
বেলা হোলে ওঠে ঝনঝনি
বাসনমাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘরকরনার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।
কড়ায় শর্ষের তেল চিড়বিড় ফোটে,
তারি মধ্যে কই মাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক করে ওঠে।
বন্দেমাতরম্ পেড়ে সাড়ি নিয়ে তাঁতি বউ ডাকে
বউমাকে।
খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়ছড় খড়খড় আঙিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
দুই বার জোয়ার ভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।
হোথা পড়ামুখস্থের একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,
এগজামিনেশনে দেয় তাড়া।

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে।
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।
রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,

সারাদিন চলেছে সন্ধান

দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।

মনের ধূসর কূলে

প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝক্‌ঝক্‌ করে

রিক্তরস উদ্দীপ্ত প্রহরে।

ভাবি এই কথা—

ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা

এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে

নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।

কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,

মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল

ছন্দটারে তার

বদল করিছে বারংবার।

তারি ধাক্কা পেয়ে মন

ক্ষণেক্ষণ

ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি

সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।

আপনার উচ্চতট হতে

নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

পুরী

২০ বৈশাখ, ১৩৪৬

দারা শুকোর কান্দাহার-অভিযান

যোগী ও হাজীর কেরামতি

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

শাহজাদা দারা শুকো গোলা বারুদ লস্কর তোপখানার উপর ভরসা করিয়া নিশ্চয়ই কান্দাহার-উদ্ধারের মত দুষ্কর কার্য্যে হাত দেন নাই। দোয়া-দরুদ পড়িবার জন্য মোল্লা, তুক্-তাক-মন্ত্রতন্ত্র-জানা ওঝা ও যাদুবিৎ এবং ভৌতিক উপায়ে কান্দাহারের দেওয়াল ভাঙিতে পারে এমন এক জন হিন্দুযোগী ইন্দ্রগীরকে তিনি লাহোর হইতে অনেক খাতির তোয়াজ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। দারার মনে সিদ্ধবাবা দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি চল্লিশটি "দেও"র মালিক; তাঁহার হুকুমে ঐগুলি উঠে বসে। কান্দাহারের সুবিশাল দুর্গ-প্রাকার দেখিয়াই শাহজাদার সাত দিনে কেল্লা ফতে করিবার দিবাস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছিল। তোপখানার দ্বারা কান্দাহারের দেওয়াল উড়াইতে অনেক দেরি হইবে; এজন্য শাহজাদা ৩রা মে তারিখে ইন্দ্রগীরকে আদেশ করিলেন, এবার আপনার "দেও"গুলিকে ডাকিয়া দুর্গের দেওয়াল ভাঙিতে আদেশ করুন। ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ইন্দ্রগীর চিলম্-চিম্‌টা লইয়া সোজা কান্দাহার-দুর্গের পরিখার কিনারায় উপস্থিত হইলেন। ইরাণী সান্ত্রী হাঁক দিল— "কোন্ হ্যায়?" জটা-কম্বলধারী হিন্দু যোগীর সাহস দেখিয়া ইরাণীরা বিস্মিত হইল; ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাহাদের কিছু ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল; না হইলে সন্ন্যাসীকে অক্ষত দেহে দুর্গ-পরিখা পর্য্যন্ত পৌছিতে হইত না। ইন্দ্রগীর সান্ত্রীকে কিছু মাত্র সমীহ না করিয়া জবাব দিল, আমি শাহজাদার পিয়ারের লোক; আমি এই কেল্লার আন্দর গিয়া ঐ বুরুজের উপর বসিয়া একটি চিলম তামাকু টানিব।" সান্ত্রী পথ ছাড়িয়া দিল; সন্ন্যাসী দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুই-চার দিন হয়ত শাহজাদা রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ইন্দ্রগীরের দৈত্যগুলি কান্দাহারের দেওয়াল ভাঙিতেছে। কিছু দিন পরে কয়েক জন পলাতক দুর্গরক্ষী সিপাহীর কাছে ইন্দ্রগীরের বাকী খবরটা শুনা গেল। ইরাণী সিপাহীরা সন্ন্যাসীকে দুর্গাধ্যক্ষের কাছে উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীর কথামত তাঁহাকে দুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখাইবার এবং বুরুজের উপর বসিয়া তামাকু-সেবনের অনুমতি দিলেন। ইন্দ্রগীরের দিনগুলি সেখানে ভালই কাটিতেছিল—দৈনিক এক সুরাই শিরাজী ও দু-বেলা ইরাণী কোপ্তা-পোলাও! কিছু দিন পরে তাঁহার দুর্মতি হইল, তিনি মোগল-শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ইহাতে দুর্গাধ্যক্ষের সন্দেহ হইল, হয়ত সন্ন্যাসী মোগলের গুপ্তচর। সন্ন্যাসীর হাত-পা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া তাঁহাকে তক্তাচিপা (শিকাঞ্জা) দেওয়া হইল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ইন্দ্রগীর সব স্বীকার করিলেন। শাস্তিস্বরূপ "লাখা" উপদুর্গে জল জোগাইবার ভিস্তির কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। সন্ন্যাসী ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতা ও তুক্‌তাকে ইরাণীরাও হিন্দুস্থানীদের চেয়ে কম বিশ্বাসী ছিল না। দুর্গাধ্যক্ষ ইন্দ্রগীরকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি তিনি কোন যাদু করিয়া হিন্দুস্থানী ফৌজকে কান্দাহার হইতে ভাগাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি মুক্তি পাইবেন। কয়েক দিন পরে ইরাণীরা সন্ন্যাসীকে জামরুদ-শাহী পাহাড়ের উপর হইতে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। ইন্দ্রগীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চল্লিশটি দৈত্য এখনও হিন্দুস্থান এবং হিন্দু-মুসলমানকে ছাড়ে নাই!

ইন্দ্রগীরের তিরোভাবের পর আর এক জন যোগী ৪০ জন চেলা সহ শাহজাদার ডেরায় হাজির হইলেন। তিনি জানাইলেন, তিনি এক বিশেষ স্বস্ত্যয়ন করিবার

সঙ্কল্প করিয়াছেন; বিশ দিনের মধ্যে ইহার সাক্ষাৎ ফল পাওয়া যাইবে; যথারীতি যোগী ও চেলাদের খোরাক বাবদ সরকারী রসদখানা হইতে দৈনিক ডাল চাল আটা ঘি এবং নগদ ১০০৲ টাকা অন্যান্য খরচের জন্য মঞ্জুর হইল। যোগীপ্রবর চেলাদের লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে আস্তানা গাড়িলেন। ইহার পরে শাহজাদা যোগীর কোন খোঁজ লইবার অবকাশ পান নাই। কিছু দিন পরে কয়েক জন দাক্ষিণাত্যবাসী সাধুর আবির্ভাব হইল। ইহাদের পদবী ছিল "গুরু", জাতিতে অবশ্য ব্রাহ্মণ, পেশা জুয়াচুরি ও ধোঁকাবাজী। ইহারা সপ্তদশ শতকের কাউণ্ট জেপেলিন। শাহজাদাকে বুঝাইলেন, তাহারা এমন এক যন্ত্র তৈয়ার করিতে জানেন যেটা পাখা-পালক ছাড়া স্বচ্ছন্দে হাওয়ায় উড়িবে, উহার ভিতরে দু-তিন জন লোক বসিয়া উপর হইতে "হুক্কা" (এক রকম গোলাবাজীর মত পোড়া মাটির খোলে কিংবা নারিকেলের খোলে বারুদ-ভরা হাতবোমা) ছুড়িতে পারিবে। ঠগকে অবিশ্বাস করা দারার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। তিনি সম্মতি জানাইয়া "সাধু"দের জন্য চাল ডাল (তেঁতুল?) ও নগদ রোজানা ৪০৲ টাকা বরাদ্দ করিলেন।

হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা চিরদিন "হাজী" বলিতে ধর্ম্মপ্রাণ সরলবিশ্বাসী লোকেরা ইহাদিগকে সদ্যোজাত শিশুর মত নিষ্পাপ (মাসুম্) হজরত রসুল-আল্লার বরকৎ ও খোদার ফজলের দাবিদার বলিয়া মনে করে। তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে সকলেই একই মতলবে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর দর্শন, তুলসী রুদ্রাক্ষ ধারণ কিংবা জর্ডনের জলে অভিষেক, যীশুর জন্ম-ভূমির মাটিতে গড়াগড়ি, মোটা চট পরিধান ও গো-ঘণ্টার মত ভারী "ক্রুশ" গলায় ধারণ করে না; কিংবা হজযাত্রা ও কাবা-পরিক্রমা করিয়া হাজী সাজে না। এমনও দেখা যায়, অতি পাষণ্ড ও মূর্খ ব্যক্তিও যে-দুষ্কর্ম্ম করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন সব কাজও মণিকর্ণিকার ঘাটে নিত্যগঙ্গাস্নায়ী কাশীর পাণ্ডা এবং যাহারা একাধিক বার হজ করিয়াছে এরূপ হাজীদের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। মদিনা অনেকেই যায়, কিন্তু "সিনা" সকলের (অন্তঃকরণ) সাফ্ হয় না।

শাহজাদা দারা শুকো ও তাঁহার প্রিয়পাত্র মীর আতিশ জাফর কান্দাহারে এক হাজীর ধোঁকায় পড়িয়াছিলেন; যোগী ও সাধুদের হারাইয়া ধূর্ত্ততায় বাজী হাজীই মাৎ করিয়াছিল। ২৩শে জুলাই (১৬৫৩ খ্রীঃ) শাহজাদার তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া হাজী সাহেব জানাইলেন, স্বনৌর (গনৌর?) নামক স্থান হইতে তিনি আসিতেছেন; উদ্দেশ্য কান্দাহারের দুর্গ দখলে "দোয়া" ও যাদুর দ্বারা শাহজাদার সহায়তা করা। দারা হাজী সাহেবের খানা-পিনার বন্দোবস্ত ও দৈনিক ২০৲ টাকা ভাতা মঞ্জুর করিলেন। হাজী সাহেব বলিলেন, মন্তরের জোরে তিনি বেশী নয় এক প্রহর দুমড়ী পর্য্যন্ত কেল্লার তোপ ও বন্দুকচীর বন্দুক একবারে খামুশ (স্তব্ধ) করিয়া দিতে পারেন। ঐ সময়ের মধ্যে কয়েক জন জান-নিসার সিপাহী দেওয়ালে চড়িয়া অনায়াসে কেল্লা ফতে করিতে পারিবে। কিন্তু এ জন্য একটি গুপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাই। হাজী সাহেবের জিনিষের ফর্দ্দ দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ রহিল না; দুই জন যুবতী নাচওয়ালী, দুই জন জুয়ারী, দুই জন চোর, একটি মহিষ, একটা ভেড়া ও পাঁচটি মুরগী তাঁহার প্রয়োজন। মোগল-শিবির ছিল মানুষের চিড়িয়াখানা; সব রকম লোক উর্দ্দুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মেবাত বা বর্ত্তমান আলোয়ার-রাজ্যবাসী মেও-জাতীয় লোকেরা নামজাদা চোর। মোগল সৈন্যের পদাতিক-বাহিনীতে "মেও"দিগকে এজন্য চৌকিদার হিসাবে ভর্ত্তি করা হইত। সুতরাং চোরের অভাব কান্দাহারে ছিল না; জুয়া অল্পবিস্তর মন্‌সব্‌দারেরাও খেলিতেন; তরল-সঙ্গীত ও অসামরিক নৃত্য ইস্‌লাম ধর্ম্মে নিষিদ্ধ হইলেও নাচগানের সমজদার ছিল সেকালের আমীর ও গরিব সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান। হাজী সাহেব এ সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সঙ্গে করিয়া জাফরের মোর্চ্চায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলেন। হাজী সাহেবের বরকতে কান্দাহারের দেওয়াল সকলের আগে ডিঙাইয়া সাত-হাজারী মন্‌সব্ প্রাপ্তির স্বপ্নে জাফর বিভোর; সে তাঁহার মহা ভক্ত হইয়া পড়িল।

হাজী সাহেব শয়তানী বিদ্যা কিছু কিছু জানিতেন।

আসলে তিনি ছিলেন এক জন যাদুবিৎ এবং সম্মোহন-কারী (ছায়ের ও চশমবন্ধ)। পর-দিন (২৬শে জুলাই) মোগল-শিবিরে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গেল। শাহজাদার হুকুমে নকীবেরা মন্‌সব্‌দারদের ডেরায় ডেরায় গিয়া হাঁক দিল, আজ দুপুর বেলা কেল্লার উপর হামলা; সকলেই যেন প্রস্তুত থাকে। দুপুর বেলা সিপাহী মন্‌সবদার সকলেই কোমর বাঁধিয়া হাজী সাহেবের হুকুমের প্রতীক্ষায় রহিল। হাজী সাহেব একবার দেখা দিয়া অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি আবার হঠাৎ হাজির হইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—আমি কেল্লার ভিতর গিয়াছিলাম; মঙ্গলবারে সিপাহীদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইব। সেকালের লোক হাজীর কথা অবিশ্বাস করিবার হিম্মৎ রাখিত না। মঙ্গলবার আসিলে হাজী সাহেব বলিলেন—আজ নয়; আগামী সোমবার। ২৬শে জুলাই রাত্রিতে হাজী জাফরের ডেরায় তাঁহার পূর্ব্বকথিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন; বেচারা জাফর সারারাত্রি বাহিরে জাগিয়া রহিল। হাজী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া উহার উপর কতকগুলি মাষকলাই নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর আরম্ভ হইল তাণ্ডব নৃত্য; হাজী সাহেব কখনও লাফ দিয়া এক গজ উপরে উঠেন; কখনও মাটিতে পড়েন। নাচের পর প্রদীপের সামনে একটি কুকুর বলি কিংবা জবাই করা হইল; কুকুরের পর একটি ভেড়া ও পাঁচটি মুরগী। ইহার পর তিনি নাচওয়ালী, জুয়ারী ও চোরদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এবার তোমাদের পালা; খুন চাই; সকলকেই জবাই করা দরকার। যাহা হউক, তোমাদের বদলে আমি নিজের খুন দিতেছি, তোমরা মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। এই বলিয়া তিনি নিজের উরু জখম করিয়া কিছু রক্ত নিহত পশুপক্ষীগুলির রক্তের উপর ছিটাইয়া দিলেন। আবার সেই উদ্দাম নৃত্য কিছুক্ষণ চলিল। এবার তিনি শিষ্য জাফরকে ভিতরে আসিবার আদেশ দিয়া বলিলেন, তোমার তলোয়ার এই মন্ত্রপূত রক্তে ধুইয়া ফেল। এই তলোয়ার ইস্পাতের উপর মারিলেও উহা শশার মত কাটিয়া যাইবে। তোমার জন্য যাহা করিলাম তাহাতে তোমার শরীর অস্ত্রশস্ত্রের অভেদ্য হইয়াছে।

জাফর এবার হাজী সাহেবের কেরামতি দ্বারা অন্যান্য সকলের অগোচরে চুপচাপ তাহার নিজ সিপাহীদিগকে লইয়া কান্দাহার ফতে করিবার সঙ্কল্প করিল। উহার পর-দিন রাত্রি ৪ ঘড়ী অবশিষ্ট থাকিতেই সে আক্রমণকারী সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া হাজী সাহেবকে জাগাইতে চলিল, কারণ হাজী বলিয়াছিলেন সব ঠিকঠাক হইলে তিনি কান্দাহার-দুর্গ হইতে গোলাগুলি বর্ষণ মন্ত্রের দ্বারা স্তব্ধ করিয়া দিবেন। জাফরের ডাকে নেহাৎ অনিচ্ছায় চোখ খুলিয়া হাজী সাহেব বলিলেন—"মীর্জ্জা জাফর! তিনটি দৈত্য এই দুর্গের পাহারায় ছিল। সারারাত্রি ইহাদের সঙ্গে লড়িয়াছি; একবার আসমান, একবার জমিনে লাফা-লাফি। যাহা হউক, দুটা কাবু হইয়া আমার হেপাজতে কয়েদ আছে; তৃতীয়টি সবচেয়ে পাজী ও বেয়াড়া; ঐটাই কেল্লার দেওয়াল পাহারা দিতেছে। হামলা সামনের সোমবার পর্য্যন্ত মুলতুবি থাক; ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কাবু করিতে পারিব।"

জাফরের মঙ্গলার্থ হাজী সাহেবের "ক্রিয়াকাণ্ডে"র কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; ইরাণীরাও বোধ হয় এ সংবাদ পাইয়াছিল। শুক্রবার রাত্রিতে ইরাণীরা পাল্টা যাদু করিয়া একটি কুকুর মারিয়া উহার পেট চিরিয়া পেটের ভিতর ভাত পুরিয়া বন্ধ করিল এবং মারা কুকুরটি জাফরের মোর্চ্চার উপর ফেলিয়া দিল। রাজা রাজরূপের মোর্চ্চায়ও অনুরূপ একটি কাটা কুকুর নিক্ষিপ্ত হইল। যাহা হউক, জাফর ইহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া সোমবার হাজী সাহেবের কাছে চলিল। হাজী সাহেব এবার সাফ জবাব দিলেন—তৃতীয় দৈত্যটি কায়দায় আনিবার আশা নাই; অন্য দুটিকেও সহসা মুক্ত করিয়া না দিলে উহারা তাঁহার ঘাড় মটকাইবে। সুতরাং এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা যাক। ইহার পর হাজী সাহেবের আর কোন উল্লেখ লতাইফ-উল-আখ্‌বারে নাই।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহীন্দ্র, যোগেশ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া, পূর্ব্বদিন রাত্রেই আসিয়া পৌছিয়াছিল। বার্ত্তা নাকি বায়ুরও আগে পৌছিয়া থাকে, এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, মিথ্যা বলিয়া একেবারেই অস্বীকার করা চলে না। পঞ্চাশ মাইল দূরে বহির্জ্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কহীন একখানি পল্লীগ্রামেও কেমন করিয়া কথাটা গিয়া পৌছিল তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সুনীতির পত্রও তখন গিয়া পৌছে নাই। সরীসৃপসঙ্কুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ চরটায় নাকি সাঁওতাল আসিয়া সব সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, আশপাশের চাষীরা না কি চরের মাটি দেখিয়া বন্দোবস্ত লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি শহর-বাজার হইতেও সঙ্গতিপন্ন লোকেও চরের জমি বন্দোবস্ত পাইবার জন্য প্রচুর সেলামী দিতে চাহিতেছে—এমনিধারা স্ফীত-কলেবর অনেক সংবাদ। শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংবাদ—চর দখল করিবার জন্য রায়-বংশীয়েরা কৌরবদের মত একাদশ অক্ষৌহিণী সমাবেশের আয়োজন করিতেছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাহাকেও না কি ও-চরের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর্য্যন্ত অধিকার দেওয়া হইবে না।

উত্তেজনায় মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এই ধরণের উত্তেজনায় মহীন্দ্রের যেন একটা অধীরতা জাগিয়া উঠে। সে মজুমদারকে বলিল—থাক এখানকার কাজ এখন। চলুন, আজই বাড়ী যাব।

মজুমদার বলিল, সেখান থেকে একটা সংবাদই আসুক, সেখানে যখন মা রয়েছেন—

মহীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—মা কখনও সংবাদ দেবেন না, তিনি এসব বোঝেনই না, তা ছাড়া তাঁর একটা ভয়ঙ্কর ভয়—বিবাদ হবে। চরে একবার খানকয়েক লাঙল ফেরাতে পারলেই আমাদিগকে ভীষণ মামলায় পড়তে হবে। তখন সেই টাইটেল্ স্যুটে যেতে হবে।

মজুমদার আর আপত্তি করিতে পারিল না, সেই দিনই তাহারা রওনা হইয়া প্রায় শেষরাত্রে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। অহীন্দ্র এবং সুনীতির কাছে চরের বৃত্তান্ত শুনিয়া মহীন্দ্র খুশী হইয়া উঠিল, মজুমদার হাসিয়া বলিল, তবে তো ও আমাদের হয়েই গিয়েছে; সাঁওতালরা যখন রাঙাবাবুকে ছাড়া খাজনা দেব না বলেছে, তখন তো দখল হয়েই গেল। চরটার নাম দিতে হবে কিন্তু রাঙাবাবুর চর—সেরেস্তাতে আমরা ঐ ব'লেই পত্তন করব।

মহীন্দ্র বলিল, না, ঠাকুরদাদার নামেই নাম হোক—রাঙাঠাকুরের চর! আর কাল সকালেই চাপরাশী নিয়ে যান ওখানে, বলে দিন সাঁওতালদের—কেউ যেন রায়েদের ডাকে না যায়। যে যাবে তার জরিমানা হবে, তাতে রায়েরা জোর করে, আমরা তার প্রতিকার করব।

অহীন্দ্র এবার বলিল—না, সে হবে না দাদা। মহীন্দ্রকে সে ভয় করে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

মহীন্দ্র রুক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কেন?

—আমি ও-বাড়ীর মামার কাছে কথা দিয়ে এসেছি—

—ও-বাড়ীর মামা? কে ও-বাড়ীর মামা? ইন্দ্র রায় বুঝি? সম্বন্ধটা পাতিয়ে দিয়েছ বুঝি মা! বাঃ চমৎকার!

সুনীতি অহীন্দ্র দু-জনেই নীরব হইয়া এ তিরস্কার সহ্য করিলেন। মহীন্দ্র আবার বলিল, তার পর কথাই বা কিসের? আমাদের ন্যায্য সম্পত্তি, তিনি আমার অনুপস্থিতিতে সাঁওতালদের হুমকি দিয়ে দখল করে নেবেন, আর তুমি একটা দুগ্ধপোষ্য বালক—তুমি না জেনে একটা কথা দিয়েছ—সেই কথা আমাকে মানতে হবে?

অহীন্দ্র আবার সবিনয়ে বলিল—ওঁরাও তো বলছেন—চর আমাদের।

—ওঁরা যদি কাল এসে বলেন—এই বাড়ীখানা আমাদের ?

অহীন্দ্র এ-কথার জবাব দিতে পারিল না। সুনীতি অন্তরে অন্তরে অহীন্দ্রকে সমর্থন করিলেও মুখ ফুটিয়া মহীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। মজুমদার কৌশলী ব্যক্তি, সে অহীন্দ্রের মুখ দেখিয়া সুকৌশলে একটা মীমাংসা করিয়া দিল, বলিল—বেশ তো গো, অহিবাবু যখন কথাই দিয়েছেন, তখন কথা আমরা রাখব। ছোট রায় মশায় ডাক পাঠালে আমি নিজে সাঁওতালদের নিয়ে যাব। দেখিই না তিনি কি করতে পারেন।

মহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল—কথাটা সুসঙ্গত এবং যুক্তির দিক দিয়াও সুযুক্তিপূর্ণ—তবুও তাহার মন ইহাতে ভাল করিয়া সায় দিল না।

মজুমদার বলিল, তা ছাড়া মুখোমুখি কথা কয়েই দেখি না, কোন্ মুখে চরটা তিনি আপনার ব'লে 'কেলেম' (claim) করেন।

সুনীতি বলিলেন, এটা খুবই ভাল কথা মহীন, এতে আর তুমি আপত্তি ক'রো না।

মহীন্দ্র এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল, তাই হবে। কিন্তু অহি কালই চলে যাক ইস্কুলে, ওর এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আর একটা কথা, ও রকম ধারার সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টা যেন আর করা না হয়! তিন পুরুষ ধ'রে ওরা আমাদের শত্রুতা ক'রে আসছে।

তাহাই হইল, অহীন্দ্র ভোরে উঠিয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সকালেই মজুমদার সাঁওতালদের সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্র রায়ের দ্বন্দ্বঘোষণা মর্য্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মজুমদারের মুখে সমস্ত শুনিয়া মহীন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—খুব ভাল ব'লে এসেছেন। মায়ের যেমন, তিনি ভাবেন, দুনিয়াভোরই বুঝি মানুষের অন্তর তাঁর মতন। ব'লে আসুন তাঁকে, তাঁর ও-বাড়ীর দাদার কথাটা ব'লে আসুন।

মজুমদার বলিল—না না মহীবাবু, ও কথা মাকে বলে না; তিনি আপনাদের ভালর জন্যেই বলেন, আর ঝগড়া-বিবাদে তাঁর ভয়ও হয় তো!

মহীন্দ্র বলিল, সেটা ঠিক কথা। ভয়টা তাঁর খুবই বেশী, জমিদারী ব্যাপারটাই হ'ল ওঁর ভয়ের কথা, ওঁর বাপেদের তিন পুরুষ হ'ল চাকরে!

মজুমদার এ প্রসঙ্গে আর কথা বলিয়া কথা বাড়াইল না। মহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে। প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিয়া সে বলিল—বাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহীন্দ্র বলিল, আজ সকালে আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম, তাঁকে দেখে আমার বুক ফেটে গেল মজুমদার-কাকা, তিনি বোধ হয় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, মহীন্দ্রও নীরব। এই স্তব্ধ অবসরের মধ্যে কলরব করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এক দল সাঁওতালদের ছেলে। হাতে তীর ও ধনুক, এক জনের ধনুকের এক প্রান্তে দুইটা কি সদ্যনিহত ছোট জন্তু ঝুলিতেছিল। এখনও জন্তু দুইটার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। ছেলেদের পিছনে কয়টি তরুণী মেয়ে—মেয়েদের মধ্যে কমলা মাঝির নাতনী, সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি ছিল সকলের আগে। সমগ্র দলটি মহীন্দ্র ও মজুমদারকে দেখিয়া অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

মজুমদার ও মহীন্দ্র একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ইহাদের আকস্মিক আগমনে তাহাদের মনে হইল, ইন্দ্র রায় আবার কোন গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছেন। মহীন্দ্র মজুমদারকেই প্রশ্ন করিল—আবার কি হ'ল? রায়েরা আবার কোন গোলমাল বাধিয়েছে নিশ্চয়।

মজুমদার প্রশ্ন করিল সমগ্র দলটিকে লক্ষ্য করিয়া, কি রে, কি বলছিস তোরা?

সমগ্র দলটি আপনাদের ভাষায় আপনাদের মধ্যেই কি বলিয়া উঠিল। মজুমদার আবার বলিল—কি বলছিস বাঙালী কথায় বল কেনে!

দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি বলিল—বলছি, আমাদের বাবুটি। গো?

হাসিয়া মজুমদার বলিল—এই যে বড়বাবু রয়েছেন, বল না কি বলছিস!

—উ কে-নে হবে গো? সি আমদের রাঙাবাবু, সি বাবুটি কুথা গো?

—তিনি পড়তে চলে গেছেন ইস্কুলে, সেই শহরে। ইনি হ'লেন বড়বাবু, ইনিই হ'লেন মালিক—মরং‌বাবু!

—কে-নে, তা' কে-নে হবে?

মজুমদার হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা একগুঁয়ে বোকা জাত! যা ধরবে তা আর ছাড়বে না! তা-কে-নে হবে! তাই হয় রে—তাই হয়। ইনি বড় ভাই। তিনি ছোট ভাই। বুঝলি!

—হুঁ সিটি তো আমরা দেখছি! ইটিও সেই তেমুনি সিটির পারা বেটে! তা' সিটিই তো আমদের রাঙাবাবু হছে। উয়ার লেগে আমরা সুসুরে মেরে এনেছি।

মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, সুসুরে—খরগোস? কই দেখি দেখি!

তাহারা এবার খরগোস দুইটা আনিয়া কাছারির বারান্দায় নামাইয়া দিল। ধূসর রঙের বন্য খরগোস—সাধারণ পোষা খরগোস হইতে আকারেও অনেকটা বড়। মহীন্দ্র বলিল, বাঃ এ যে অনেক বড়, এদের রঙটাও মাটির মত। এ পেলি কোথায় তোরা? সেই মেয়েটি বলিল—কেনে আমাদের ওই নদীর চরে, মেলাই আছে। শিয়াল আছে, খটাস আছে, খেঁকশিয়াল আছে, সুসুরে আছে, তিতির আছে। আমরা মারি, পুড়িয়ে খাই।

মহীন্দ্র আরও বেশী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, শিকারে তাহার প্রবল আসক্তি, নেশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে বলিল—তা হ'লে চলুন মজুমদার-কাকা আজ বিকেলে যাব শীকার করতে; চরটাও দেখা হবে, কি বলেন।

—বেশ তো।

মেয়েটি বলিল তু যাবি? বন্দুক নিয়ে যাবি? মারতে পারবি? খুঁজে বার করতে পারবি?

হাসিয়া মহীন্দ্র বলিল, আচ্ছা সে তখন দেখবি তোরা! যা তোরা সর্দ্দারমাঝিকে বলবি আমরা যাব বিকেলে।

—সি আমাদের রাঙাবাবুটি? তাকে নিয়ে যাবি না?

—সে যে নেই এখানে।

—কে-নে, সি আসবে না কে-নে? তুরা তাকে নিয়ে যাবি না কেনে?

মজুমদার হাসিয়া ফেলিলেন, কি বিপদ!

—কেনে কি করলম আমরা? উ কে-নে বলছিস তু?

—আচ্ছা আচ্ছা, বাবু এলে তাকে নিয়ে যাব। তোরা যা এখন।

এবার তাহারা আশ্বাস পাইয়া সোৎসাহে আপন ভাষায় কলরব করিয়া উঠিল। মেয়েটিই দলের নেত্রী, সে বলিয়া উঠিল, দেলা, দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল-চল-চল।

মহীন্দ্র কাছারি-ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল। নলের মুখটা ভাঁজিয়া ভিতর দেখিয়া সে বলিল, বড্ড অপরিষ্কার হয়ে আছে! সে বন্দুকের বাক্সটা বাহির করিয়া আনিয়া বন্দুকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

ইন্দ্র রায়ের এই কাজটি অচিন্ত্যবাবুর মনঃপূত হইল না; তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তিনি গাছগাছড়া চালানের লাভ-ক্ষতি কষিয়া রায়কে বুঝাইয়াছেন, রায়ও আপত্তি করেন নাই, বরং উৎসাহই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই লাভকে উপেক্ষা করিয়া অকস্মাৎ তিনি কেন যে চর বন্দোবস্ত করিলেন তাহার কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

আর ননী পালের মত দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে বিনা পণে চর দিয়া প্রশ্রয় দেওয়ার হেতুও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ঐ লোকটার জন্য সমগ্র চরটা দুর্গম হইয়া উঠিল, কে উহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবে। তাহার সীমানা বাদ দিয়া চরে পদার্পণ করিলেও ননী বিবাদ করিবেই। সেই বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতেই তিনি পথ দিয়া চলিয়াছিলেন।

—হ'ল, বেশই হ'ল, উত্তম হ'ল, খুব ভালই করলেন। ওখানে আর কেউ যাবে? থাকল ঐ সমস্ত জায়গা পড়ে। গেলেই ও গোঁয়ার চপেটাঘাত না ক'রে ছাড়বে না। বাবাঃ আমি আর যাই—সর্ব্বনাশ, কোন্ দিন পাষণ্ড আমাকে একেবারে এক চড়ে খুনই ক'রে ফেলবে। একমনেই বকিতে বকিতে তিনি চলিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী বাবুদের কাছারির বারান্দায় মজুমদার হাসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন

করিলেন, কি হ'ল অচিন্ত্যবাবু, হঠাৎ এমন চটে উঠলেন কেন মশায় ?

—হঠাৎ ? অচিন্ত্য বাবু যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, হঠাৎ ? বলেন কি মশায় ? আজ তিন দিন তিন রাত্রি ধ'রে, হিসাব কষে লাভ-লোকসান দেখলাম, টু-হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট লাভ। কলকাতার সাত-আটটা ফার্মকে চিঠি লিখলাম, সাত-আট আনা খরচ ক'রে, আর আপনি বলেন হঠাৎ !

মজুমদার বলিলেন, সে-সব আমরা কেমন ক'রে—

বাধা দিয়া অচিন্ত্য বলিলেন—ঠিক কথা, আমারই ভুল, কেমন ক'রে জানবেন আপনারা ! তবে শুনুন, আপনাদের এই ইন্দ্র রায় মশায় একটা 'ডেঞ্জারাস গেমে' হাত দিয়েছেন। বাঘ নিয়ে খেলা, ননী পালও একটি সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র ! বলিয়া সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ক্ষোভে দুঃখে ভদ্রলোক, কাঁদিয়া ফেলিলেন। মশায়, তিনটি রাত্রি আমি ঘুমুই নি। দশ রকম ক'রে দশ বার আমি লাভ-লোকসান কষে দেখেছি। বেশ ছিলাম বদহজম অনেকটা ক'মে এসেছিল, এই তিন রাত্রি জেগে আমার বদহজম আবার বেড়ে গেল ! কথা বলিতে বলিতেই যেন রোগটা তাঁহার বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক ঢেকুর তুলিয়া তিনি বলিলেন—ভাস্কর লবণ খানিকটা না খেলে এইবার গ্যাস হবে। যাই, তাই খানিকটে খাই গে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়। ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্রমাগত উদ্গার তুলিতে তুলিতে চলিয়া গেলেন।

মহীন্দ্র বন্দুকটা ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—চাপরাশীদের বলে দিন—ননী পাল রায়দের কাছারি থেকে বেরুলেই যেন ধরে নিয়ে আসে।

* * * *

মজুমদার খুব ভাল করিয়াই বলিলেন, আদেশের সুরে নয়, অনুরোধ জানাইয়াই বলিলেন—দেখ ননী—এ-কাজটা করা তোমার উচিত হবে না। এ আমাদের সরিকে-সরিকে বিরোধ, এর মধ্যে তোমার যোগ দেওয়াটা কি ভাল ?

ননী নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, তা মশায় ইয়ের ভাল-মন্দ কি ? সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া, সম্পত্তি করতে গেলেও ঝগড়া। সে ভেবে সম্পত্তি কে আর ছেড়ে দেয় বলুন।

মহীন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল—দেখ ননী, ও সম্পত্তি হ'ল আমার, ওটা ইন্দ্র রায়ের নয়। তোমাকে আমি বারণ করছি—তুমি এর মধ্যে এস না।

মহীন্দ্রের স্বরগাম্ভীর্য্যে ননী রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, সম্পত্তি আপনার তারই বা ঠিক কি ?

—আমি বলছি।

—সে রায় মশায়ও বলছেন, সম্পত্তি তেনার।

—তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন।

—আর আপনি সত্যি বলছেন। ব্যঙ্গভরে ননী বলিয়া উঠিল।

মহীন্দ্র বলিল—চক্রবর্ত্তী-বংশ তেমন নীচ নয়—তারা মিথ্যে কথা বলে না, বুঝলে !

ননী পাল প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, ইন্দ্র রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মহীন্দ্রকে অপমান করিবার সঙ্কল্প লইয়াই—ডাকিবা মাত্র সে এখানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে এবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ—সে-সব আমরা খুব জানি, চাকলাটার লোক জানে; চক্রবর্ত্তী-গুষ্টির কথা আবার জানে না কে ?

মহীন্দ্র রাগে আরক্তিম হইয়া বলিল, কি ? কি বলছিস্ তুই ?

মুখভঙ্গি করিয়া ননী বলিল, বলছি, তোমার সৎ-মায়ের কথা হে বাপু ! বলি যার মা চলে যায়—

মুহূর্ত্তে একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। অসহনীয় ক্রোধে মহীন্দ্র আত্মহারা হইয়া অভ্যস্ত হাতের ক্ষিপ্রতার সহিত বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া টোটা পুরিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। ননী পালের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল—রক্তাপ্লুত দেহে মুখ গুঁজিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বন্দুকের শব্দে, বারুদের গন্ধে—ধোঁয়ায় রক্তে, সমস্ত কিছু লইয়া সে এক ভীষণ দৃশ্য ! মজুমদার যেন নির্ব্বাক মূক হইয়া গেল, থরথর করিয়া সে কাঁপিতেছিল। মহীন্দ্রও নীরব, কিন্তু সে-ই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বন্দুকটা হাতে লইয়াই উঠিয়া বলিল, আমি চললাম কাকা—থানায় সারেণ্ডার করতে !

মজুমদার কিছু একটা বলিবার চেষ্টায় বার কয়েক হাত তুলিল, কিন্তু মুখে ভাষা বাহির হইল না। মহীন্দ্র মায়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করিল না; চৈত্রের উত্তপ্ত অপরাহ্নে সে দৃঢ় পদক্ষেপেই ছয় মাইল দূরবর্ত্তী থানায় আসিয়া বলিল—আমি ননী পাল ব'লে একটা লোককে গুলি ক'রে মেরেছি।

বজ্রের আঘাতের মত আকস্মিক নির্ম্মম আঘাতে সুনীতির বুকখানা ভাঙিয়া গেলেও তাঁহার কাঁদিবার উপায় ছিল না। সন্তানের বেদনায় আত্মহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িবার শ্রেষ্ঠ স্থান হইল স্বামীর আশ্রয়। কিন্তু সেই-খানেই সুনীতিকে জীবনের এই কঠিনতম দুঃখকে কঠোর সংযমে নিরুচ্ছ্বসিত স্তব্ধ করিয়া রাখিতে হইল। অপরাহ্নে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সুনীতি সমস্ত অপরাহ্নটাই মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মত পড়িয়া রহিলেন, সন্ধ্যাতে তিনি গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপ-প্রদীপ দিতে পর্য্যন্ত উঠিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার পরই তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইল। মনে পড়িয়া গেল তাঁহারই উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল স্বামীর কথা। এখনও তিনি অন্ধকারে আছেন, দুপুরের পর হইতে এখনও পর্য্যন্ত তিনি অভুক্ত। যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া সুনীতি রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। বন্ধ ঘরে গুমোট গরম উঠিতেছিল, প্রদীপ জ্বালিয়া সুনীতি ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারেন নাই, স্বামীর মুখ কল্পনা মাত্রেই তাঁহার হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। এবার, কঠিন ভাবে মনকে বাঁধিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন গভীর আতঙ্কে রামেশ্বরের চোখ দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিস্পন্দ মাটির পুতুলের মত তিনি বসিয়া আছেন। সুনীতির চোখে চোখ পড়িতেই তিনি আতঙ্কিত চাপা কণ্ঠস্বরে বলিলেন—মহীনকে লুকিয়ে রেখেছ ?

সুনীতি আর যেন আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। দাঁতের উপর দাঁতের পাটি সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রামেশ্বর আবার বলিলেন, খুব অন্ধকার ঘরে, কেউ যেন দেখতে না পায়

আবেগের উচ্ছ্বাসটা কোনমতে সম্বরণ করিয়া এবার সুনীতি বলিলেন—কেন, মহী তো আমার অন্যায় কাজ কিছু করে নি, কেন সে লুকিয়ে থাকবে ?

—তুমি জান না, মহী খুন করেছে—খুন।

—জানি।

—তবে ? পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাবে যে !

সুনীতির বুকে ধীরে ধীরে বল ফিরিয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন, মহী নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সে তো আমার কোন অন্যায় কাজ করে নি, কেন সে চোরের মত আত্মগোপন করে ফিরবে ! সে তার মায়ের অপমানের শোধ নিয়েছে, সন্তানের যোগ্য কাজ করেছে !

অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন, তুমি ঠিক বলছ সুনীতি; বলছ ! মণিপুর-রাজনন্দিনীর অপমানে তার পুত্র বভ্রুবাহন পিতৃবধেও কুণ্ঠিত হয় নি ! ঠিক বলেছ তুমি !

গাঢ়স্বরে সুনীতি বলিলেন, এই বিপদের মধ্যে তুমি একটু খাড়া হয়ে ওঠ, তুমি না দাঁড়ালে, আমি কাকে আশ্রয় করে চলাফেরা করব ? মহীর বিচারের মোকদ্দমায় কে লড়বে ? ওগো, একটু মনকে শক্ত কর, মনে কর কিছুই হয় নি তোমার।

রামেশ্বর ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সুনীতি বলিলেন, আমার কথা শুনলে ?

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বার-বার ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন—হুঁ। সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ—তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালে, মহীর কিছু হবে না। মজুমদার-ঠাকুরপো আমায় বলেছেন, এ রকম উত্তেজনায় খুন করলে ফাঁসী তো হয়ই না, অনেক সময় বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

রামেশ্বর একদৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুনীতি এবার স্বামীর জন্য সন্ধ্যা-কৃত্যের আয়গা করিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় ছেড়ে নাও,

সন্ধ্যে ক'রে ফেল। আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।

রামেশ্বর বলিলেন, একটা কথা ব'লে দি তোমাকে। তুমি—

সুনীতি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন—বল, কি বলছ।

—তুমি একমনে তোমার দিদিকে ডাক—মানে রাধারাণী, রাধারাণী, সে বেঁচে নেই,—ওপার থেকে সে তোমার ডাক শুনতে পাবে! বল, তোমার মান রাখতেই মহীর আমার এই অবস্থা—তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর, বাঁচাও!

সুনীতি বলিলেন—ডাকব—তাঁকে ডাকব বইকি।

* * * *

সুনীতি নীচে আসিয়া দেখিলেন, মজুমদার তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। সে মহেন্দ্রের খবর জানিবার জন্য থানায় গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই সুনীতির ঠোঁট দুইটি আবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। মুখে কোন প্রশ্ন তিনি করিতে পারিলেন না, কিন্তু মজুমদার দেখিল, সহস্র উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

সে নিতান্ত মূর্খের মত খানিকটা হাসিয়া বলিল—দেখে এলাম মহীকে!

তবুও সুনীতি নীরব প্রতিমার মতই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মজুমদার অকারণে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার বলিল—এতটুকু ভেঙে পড়েন নি. দেখলাম! আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়াও সুনীতির নিকট হইতে সরব কোন প্রশ্ন আসিল না দেখিয়া বলিল, থানার দারোগাও কোন খারাপ ব্যবহার করে নি!

আবার সে বলিল—আমি সব জেনেও এলাম, থানায় কি এজাহার দিয়েছেন তাও দেখলাম। একটা কথাও মিথ্যে বলেন নি।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র, আর কোন জীবন-স্পন্দন স্ফুরিত হইল না।

মজুমদার বলিল, দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বরং লোকটা কি বলছিল বলুন তো? মহীবাবু সে-কথা বলেন নি। দারোগা কথাটা জানতে চেয়েছিল, তাতে তিনি বলেছেন—সে-কথা আমি যদি উচ্চারণই করব তবে তাকে গুলি ক'রে মেরেছি কেন? আমি বললাম সব।

সুনীতি এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন—ছি!

মাথা হেঁট করিয়া মজুমদার বলিল—না বলে যে উপায় নেই বউঠাকরুন, মহীকে বাঁচানো চাই তো!

দর দর করিয়া এবার সুনীতির চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে উৎফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ভাববেন না আপনি, ও মামলায় কিচ্ছু হবে না মহীর। দারোগাও আমাকে সেই কথা বললেন।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, মহী কিছু বলে নি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল—বললেন, মাকে বলবেন, তিনি যেন না কাঁদেন। আমি অন্যায় কিছু করি নি। বড়মাকে দেখি নি, মা বললেই মাকে মনে পড়ে! সে সয়তান যখন মায়ের নাম মুখে আনল, তখন মাকেই আমার মনে পড়ে গেল, আমি তাকে গুলি করলাম। আমার তাতে একবিন্দু দুঃখ নেই—ভয়ও করি না আমি। তবে মা কাঁদলে আমি দুঃখ পাব।

সুনীতি বলিলেন—কাল যখন যাবে ঠাকুরপো, তখন তাকে ব'লো—সে যেন মনে মনে তার বড়মাকে ডাকে, প্রণাম করে। বলবে তার বাপ এই কথা বলে দিয়েছেন, আমিও বলছি।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল—অনেক-গুলি কথা আছে আপনার সঙ্গে। স্থির হয়ে, ধৈর্য্য ধ'রে আপনাকে শুনতে হবে।

সুনীতি বলিলেন—আমি কি ধৈর্য্য হারিয়েছি ঠাকুরপো?

অপ্রস্তুত হইয়া মজুমদার বলিল—না। মানে মামলা-সংক্রান্ত পরামর্শ তো। মাথা ঠিক রেখে করতে হবে এই আর কি!

—আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ওঁকে দুধটা গরম ক'রে খাইয়ে আসি। যাইতে যাইতে সুনীতি

দাঁড়াইলেন, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে মানদাকে ডাকিলেন, মানদা, বামুন-ঠাকরুণকে বল তো মা, মজুমদার-ঠাকুরপোকে একটু জল খেতে দিক। আর তুই হাত-পা ধোবার জল দে।

মজুমদার বলিল—শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল তৃষ্ণায় তাহার ভিতরটা যে শুকাইয়া গিয়াছে।

স্বামীকে খাওয়াইয়া সুনীতি নীচে আসিয়া মজুমদারের অল্প দূরে বসিলেন। যোগেশ মাথায় হাত দিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিল। সুনীতি বলিলেন, কি বলছিলে, বল ঠাকুরপো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, মামলার কথাই বলছিলাম। আমার খুব ভরসা বউঠাকরুন মহীর এতে কিছু হবে না। দারোগাও আমাকে ভরসা দিলেন।

—সে তো তুমি বললে—ঠাকুরপো।

—হ্যাঁ। কিন্তু এখন দুটি ভাবনার কথা, সেই কথাই বলছিলাম।

—কি কথা বল।

—মামলায় টাকা খরচ করতে হবে, ভাল উকীল দিতে হবে। আর ধরুন দারোগা-টারোগাকেও কিছু দিলে ভাল হয়।

সুনীতি প্রশ্ন করিলেন—ঘুষ?

—হ্যাঁ—ঘুষই বই কি মা। কাল যে কলি বউঠাকরুন। তবে আমরা তো আর ঘুষ দিয়ে মিথ্যে কিছু করাতে চাই না!

—কত টাকা চাই?

—তা হাজার দুয়েক তো বটেই মামলা খরচ নিয়ে।

—আমার গহনা আমি দেব ঠাকুরপো, তাই দিয়ে এখন তুমি খরচ চালাও।

ইতস্তত করিয়া মজুমদার বলিল—আমি বলছিলাম, চরটা বিক্রী করে দিতে। অপয়া জিনিষ, আর খদ্দেরও রয়েছে। আজই থানার ওখানে একজন মাড়োয়ারী মহাজন আমাকে বলছিল কথাটা

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনীতি বলিলেন, ওটা এখন থাক ঠাকুরপো; এখন তুমি গহনা নিয়েই কাজ কর পরে যা হয় হবে। আর কি বলছিলে বল!

—আর একটা কথা বউঠাকরুন—এইটেই হ'ল ভয়ের কথা। ছোট রায় মশায় যদি বেঁকে দাঁড়ান!

সুনীতি নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

মজুমদার বলিল, আপনি একবার ওঁদের বাড়ী যান।

সুনীতি নীরব।

মজুমদার বলিল, মহীর বড়মা—ধরুন মা-ই। কিন্তু তিনি তো রায় মশায়ের সহোদরা! ননী পাল তাঁর আশ্রিত কিন্তু সে কি তাঁর সহোদরার চেয়েও বড়।

সুনীতি ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু মহী তো তাঁর সহোদরার অপমানের শোধ নিতে এ কাজ করে নি ঠাকুরপো!

—কিন্তু কথা তো সেই একই।

ম্লান হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিলেন, একই যদি হয়, কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে কি আমার যাবার প্রয়োজন আছে ঠাকুরপো? তাঁর মত লোক এ কথা কি নিজেই বুঝতে পারবেন না?

মজুমদার চুপ করিয়া গেল, আর সে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুনীতি আবার বলিলেন, যে কাজ মহী করলে ঠাকুরপো, বিনা কারণে সে কাজ করলে ভগবানও তাকে ক্ষমা করেন না। কিন্তু যে কারণে সে করেছে সে কারণটাই আজ বড় হয়ে কর্ম্মের পাপ হাল্কা করে দিয়েছে। এ কারণ যে না বুঝবে—তাকে বোঝাতে কি ব'লে যাব আমি? আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন—আর মহীর কাছে মহীর মা বড়। রায়-মশায়ের কাছে তাঁর ভগ্নী বড়। মহী মায়ের অপমানে যা করবার করেছে; এখন রায় মশায় তাঁর ভগ্নীর জন্যে যা করা ভাল মনে করেন, করবেন। এতে আর আমি গিয়ে কি করব বল?

গভীর রাত্রি; গ্রামখানা সুষুপ্ত। রামেশ্বর বিছানায় শুইয়া জাগিয়াই ছিলেন। অদূরে স্বতন্ত্র বিছানায় সুনীতি অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনিও জাগিয়া মহীন্দ্রের কথাই ভাবিতেছিলেন। মায়ের অপমানের শোধ লইতে

গিয়া মহী এ কাজ করিয়াছে এ যুক্তিতে মনকে বাঁধিলেও প্রাণ সে-বাঁধন ছিঁড়িয়া উন্মত্তের মত হাহাকার করিতে চাহিতেছে। বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনার বিক্ষোভ চাপিয়া তিনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নগৃহে স্বামীর বুকের কাছে থাকিয়াও প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া সে-বিক্ষোভ লঘু করিবার উপায় নাই। রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলে বিপদ হইবে, ইহার উপর তিনি অধীর হইয়া পড়িলে বিপদের উপর বিপদ ঘটিয়া যাইবে।

পূর্ব্বাকাশের দিকৃচক্রবালে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া আলোর আভাস আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে খাট হইতে নামিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঘুমন্ত সুনীতির বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটাইবার জন্যই তাঁহার এ সতর্কতা। জানালা দিয়া নীচে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কয়েক পা পিছাইয়া আসিলেন। মৃদু স্বরে বলিলেন—উঃ—ভয়ানক উঁচু।

সুনীতি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, বলিলেন, কি করছ?

রামেশ্বর ভীষণ আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—কে?

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলিলেন—আমি, আমি—ভয় নেই, আমি!

—কে? রাধারাণী?

—না, আমি সুনীতি!

—আশ্বস্ত হইয়া রামেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও! এখনও ঘুমোও নি তুমি? রাত্রি যে অনেক হ'ল সুনীতি!

সুনীতি বিচিত্র হাসি হাসিলেন। বলিলেন, তুমি ঘুমোও নি যে? এস শোবে এস।

—আমার ঘুম আসছে না সুনীতি। শুয়ে হঠাৎ রামায়ণ মনে পড়ে গেল।

—রামায়ণ আমি পড়ব, তুমি শুনবে?

—না। মেঘনাদকে যখন অধর্ম্ম-যুদ্ধে লক্ষ্মণ বধ করলে, তখন রাবণের কথা মনে আছে তোমার? শক্তিশেল, শক্তিশেল! আমার মনে হচ্ছে—তেমনি শেল যদি পেতাম, তবে রায়বংশ, রায়হাট সব আজ ধ্বংস করে দিতাম আমি! রামেশ্বর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। সুনীতি বিব্রত হইয়া স্বামীকে মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এস, বিছানায় বসবে এস, আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, আসিয়া বিছানায় বসিলেন। একদৃষ্টে জানালা দিয়া চন্দ্রালোকিত গ্রামখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুনীতি বলিলেন—তুমি ভেবো না, মহী আমার অন্যায় কিছু করে নি। ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।

রামেশ্বর ও কথার কোন জবাব দিলেন না। নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা পরম ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ্যাঃ—বিষে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে!

সুনীতি কাতর স্বরে মিনতি করিয়া বলিলেন—ওগো, কি বলছ তুমি? আমার ভয় করছে যে!

—ভয় হবারই কথা। দেখ, চেয়ে দেখ—গ্রামখানা বিষে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! কতকাল ধরে মানুষের গায়ের বিষ জমা হয়ে আসছে, রোগশোক, কত কি! মনের বিষ, হিংসা-দ্বেষ, মারামারি কাটাকাটি খুন! এ্যাঃ!

চন্দ্রালোকিত গ্রামখানার দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; সত্যই গ্রামখানাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল। জমাট অন্ধকারের মত বড় বড় গাছ, বহু কালের জীর্ণ বাড়ীঘর,—ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি, এদিকে গ্রামের কোল ঘেঁসিয়া কালিন্দীর সুদীর্ঘ সুউচ্চ ভাঙন, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বিকৃতমস্তিষ্ক রামেশ্বরের মত বিষজর্জ্জরিত মনে না হইলেও, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয়।

সহসা রামেশ্বর আবার বলিলেন—দেখ!

—কি?

কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন—আমার আঙুলগুলো বড় টাটাচ্ছে।

—কেন? কোথাও আঘাত লাগল না কি?

বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন—উহুঁ!

—তবে? কই দেখি। বলিয়া অন্তরালে রক্ষিত

প্রদীপটি উস্কাইয়া আনিয়া দেখিয়া বলিলেন—কই, কিছুই তো হয় নি।

—তুমি বুঝতে পারছ না। হয়েছে—হয়েছে। দেখছ না আঙুলগুলো ফুলো-ফুলো, আর লাল টক্‌টক্‌ করছে!

—হাত তো তোমাদের বংশের এমনই লাল।

—না। তোমায় এত দিন বলি নি আমি! ভেবেছিলাম, কিছু না, মনের ভ্রম। কিন্তু—। তিনি আর বলিলেন না, চুপ করিয়া গেলেন। সুনীতি বলিলেন—তুমি একটু শোও দেখি, মাথায় একটু জল দিয়ে—তোমায় আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, সুনীতির নির্দ্দেশমত চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। সুনীতি মাথার শিয়রে বসিয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। চাঁদের আলোয় কালির গর্ভের বালির রাশি দেখিয়া মনে কেমন একটা উদাস ভাব জাগিয়া উঠে। এক পাশে কালির ক্ষীণ জলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, সুনীতির মনে ঐ উদাসীনতার মধ্যেও একটু রূপের আনন্দ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। তাহার ওপারে সেই কাশে ও বেনাঘাসে ঢাকা চরটা—জ্যোৎস্নার আলোয় কোমল কালো রঙের সুবিস্তীর্ণ একখানি গালিচার মত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বনাশা চর। বাতাস করিতে করিতে সুনীতিও ধীরে ধীরে ঢলিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেলেন। পড়িয়াই আবার চেতনা আসিল, কিন্তু দারুণ শ্রান্তিতে উঠিতে আর মন চাহিল না, দেহ পারিল না। ঘুম যখন ভাঙিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। রামেশ্বর উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। সুনীতিকে উঠিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, কবরেজ মশাইকে একবার ডাকতে পাঠাও তো।

—কেন? শরীর কি খারাপ করছে কিছু?

—এই আঙুলগুলো একবার দেখাব।

—ও কিছু হয় নি, তবে বল তো ডাকতে পাঠাচ্ছি।

—না। অনেক দিন উপেক্ষা করেছি, ভেবেছি ও কিছু নয়। কিন্তু এইবার বেশ বুঝতে পারছি—হয়েছে—হয়েছে।

রাত্রেও ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। এ আর সুনীতি কত সহ্য করিবেন, বিরক্ত হইতে পারেন না, দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদিবার পর্য্যন্ত অবসর নাই, এ এক অদ্ভুত অবস্থা। তিনি বলিলেন—আঙুলে আবার কি হবে বল? আঙুলে তো—

—কুষ্ঠ—কুষ্ঠ! সুনীতির কথার উপরেই চাপা গলায় রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—অনেক দিন আগে থেকে সূত্রপাত—তোমায় বিয়ে করবার আগে থেকে। লুকিয়ে তোমায় বিয়ে করেছি!

সুনীতি বজ্রাহতার মত নিস্পন্দ নিথর হইয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ]
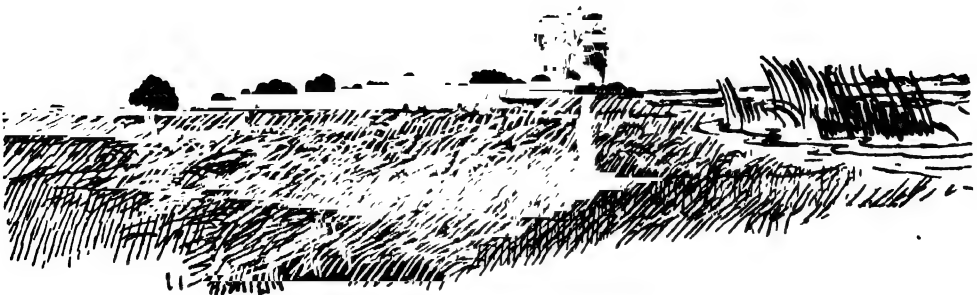
আলো-মাছ ও বিজলী-মাছ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জৈব শক্তি প্রধানতঃ গতি ও উত্তাপ রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। জীবকোষ হইতে যে আলোক ও তড়িৎ উৎপন্ন হইতে পারে, অনেকেই হয়ত তাহা ধারণা করিতে পারে না। জোনাকী, অগ্নি-মক্ষিকা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কীটপতঙ্গ ছাড়া আলোক- ও তড়িৎ- উৎপাদক অন্যান্য প্রাণীরা সচরাচর নজরে পড়ে না বলিয়াই বোধ হয় সাধারণতঃ লোকে এ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে মনঃসংযোগ করে না। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রবক্ষে জল কাটিয়া চলিবার সময় জাহাজের উভয় পার্শ্বে যে তরল আগুনের খেলা দেখা যায়, তাহাতে কেহই বিস্মিত না হইয়া পারে না; ইহা কিন্তু জীবদেহ-নিঃসৃত আলো ছাড়া আর কিছুই নহে। সমুদ্রের নোনা জলের অনেকাংশেই অতি ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য জীবাণু বিচরণ করিয়া থাকে। জল একটু আন্দোলিত হইলেই সাধারণতঃ 'নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিস্‌' নামক জীবাণুরা শরীর হইতে এক প্রকার হরিতাভ আলোক বিকীর্ণ করে। সংখ্যা ইহাদের অগণিত, কাজেই জল তরল অগ্নির মত প্রতীয়মান হয়। 'নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিস্‌' ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রকার জীবাণু সমুদ্রজলে আলোপাত করিয়া থাকে। হাক্সলী তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার বিবরণে 'পাইরোসোম্‌স্‌' নামক আলো-বিকিরণকারী জীবাণুর কথা বলিয়াছেন:—চন্দ্র না-থাকিলেও সেদিন আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। সেই পরিষ্কার আকাশের নীচে যত দূর দৃষ্টি যায় সমুদ্রের কালো জল উজ্জ্বল নীলাভ আলোকে ছাইয়া গিয়াছে—তাহার যেন সীমা নাই, যেদিকেই চোখ পড়ে সর্ব্বত্রই যেন তরল আগুনের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই আলোক-তরঙ্গ অবিরাম নহে। এক স্থানে অনেক দূর ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে নিবিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থান আবার আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এক স্থানে একটা আলোর বিন্দু ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেল—দেখিতে দেখিতে
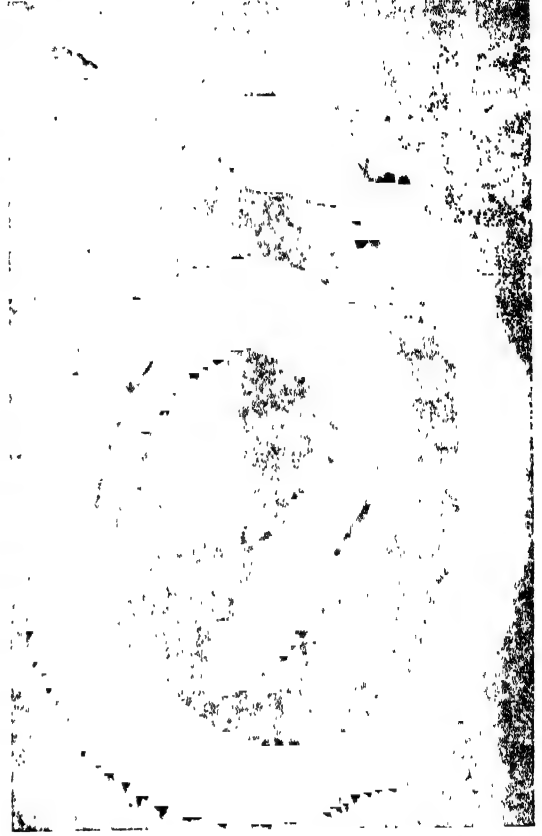
জাপানের গভীর সমুদ্রের এক জাতের বিচিত্র প্রাণী। ইহাদের শরীর হইতে স্নিগ্ধ আলো নির্গত হইয়া সমুদ্রের তলদেশ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

তাহা বিস্তৃত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। আবার নিবিল, পরক্ষণেই জ্বলিয়া উঠিল। 'পাইরোসোম্‌সে'র ঝাঁকের মধ্যে কোন একটির শরীরে জলের আলোড়নের ফলে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিলেই সে আলো বিকিরণ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ

পলিফস্ মাছ। ইহাদের শরীরের বিচিত্র বর্ণের (ছবিতে সাদা দেখাইতেছে) দাগগুলি হইতে স্নিগ্ধ আলো নির্গত হয়।

সকলগুলিই জ্বলিয়া উঠে; কিন্তু দুই-এক সেকেণ্ড পরেই আবার ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক নদনদীর মোহানায় নোনা জলে এইরূপ আলোর খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। মোহানার পথে যতই সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই আলোর তীব্রতা অনুভূত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে পসর নদী দিয়া সুন্দরবন অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। মোহানায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নদীর জল ভয়ানক বিস্বাদ বোধ হইল। মোহানার দিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর এক দিন রাত্রিবেলায় বাহিরে বসিয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিতেছিলাম, খালাসীরা উপর হইতে বাল্‌তি ফেলিয়া জল তুলিতেছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখ ফিরাইতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। বাল্‌তি উপর হইতে জলে পড়িবা মাত্রই চতুর্দ্দিকে যেন আগুনের ফুল্‌কি ছিটকাইয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই জলের মধ্যে অপূর্ব্ব আগুনের খেলা। বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি নদীর ছোট ছোট খাঁড়িগুলির মধ্যে রাত্রিবেলায় 'জলি-বোটে' ঘুরিতে বাহির হইয়াছিলাম। অন্ধকার রাত্রি। বৈঠার আঘাতে ও বোটের জল কাটিয়া অগ্রসর হওয়ার ফলে মনে হইতেছিল যেন আমরা তরল অগ্নির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। হাতে করিয়া জল তুলি, ঠিক যেন তরল আগুনের মত ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়ে। সে যে কি অদ্ভুত দৃশ্য তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে সহজে উপলব্ধি হয় না। কৌতূহলের বিষয় এই যে, খোলা পাত্রে জল তুলিয়া রাখিলে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই আগুনের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তার পর ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু সরু-মুখ বোতলে রাখিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আলো-বিকিরণ-ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাতাসের মধ্যস্থিত অক্সিজেন গ্যাস ইহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক প্রকার জীবাণু হইতেই এই আলোর উৎপত্তি হইয়া থাকে। অক্সিজেনের অভাবে জীবাণুগুলি মরিয়া যায় এবং মৃত জীবাণুর শরীর হইতে এইরূপ আলোক নির্গত হয় না। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এই জৈব আলোকের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিক বয়েল দেখিয়াছিলেন—এই আলোক-উৎপত্তির জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য্য। অক্সিজেনের অভাবে জৈব আলোর বিকাশ ঘটে না। বুদ্ধিকৌশলে মানুষ আলোক-উৎপত্তির যত রকম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, জৈব আলো তাহার প্রত্যেকটি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ অনভিপ্রেত হইলেও কৃত্রিম আলোর প্রায় চৌদ্দ আনাই উত্তাপে বাজে খরচ হইয়া যায়, কিন্তু জৈব আলোর শতকরা এক ভাগ মাত্র উত্তাপে ব্যয়িত হয়, এই জন্যই জৈব আলোককে ঠাণ্ডা আলো বলা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এখনও আলোক হইতে উত্তাপ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, কিন্তু জীবজগতে এরূপ আলোর অভাব নাই। যেখানে উত্তাপের প্রয়োজন নাই—শুধু আলোরই প্রয়োজন—সেখানে উত্তাপের অপচয় আমরা বন্ধ করিতে অক্ষম, অথচ উত্তাপবিহীন আলোক-উৎপাদন যে অসম্ভব, জৈব আলোর বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখিয়া তাহাও তো মনে
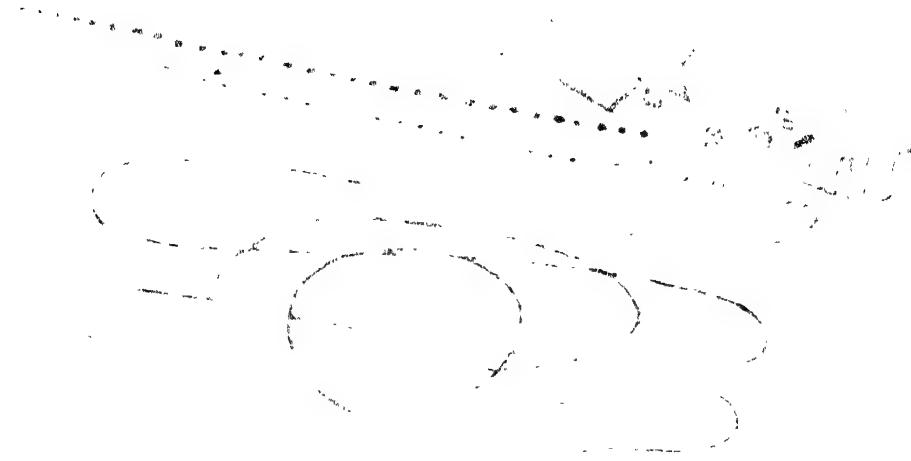
আয়ার্লণ্ডের নিকটবর্ত্তী গভীর সমুদ্রের 'ফ্ল্যাজেলীবার্বা' মাছ। শরীরের সাদা দাগগুলি ও মুখের নীচের চাবুকের মত লম্বা তন্তুটি হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।

হয় না। কেঁচো প্রভৃতির গাত্রনিঃসৃত রস আঙ্গুলের ডগায় তুলিয়া লইলেই দেখা যাইবে তাহা অন্ধকারে আলোক বিকিরণ করিতেছে। প্রাণীদেহের আলো-বিকিরণকারী কোষগুলির মধ্যে 'লুসিফেরিণ' নামে এক প্রকার পদার্থ আছে। তাহা 'লুসিফারেস' নামক এক প্রকার 'এন্‌জাইমে'র সাহায্যে উত্তেজিত হইয়া আলো প্রদান করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক আলোর সুইচটি টিপিলেই যেমন আলো জ্বলিয়া উঠে, ঘর্ষণ বা তদনুরূপ অন্য কোন আঘাত আলোড়নের ফলেই এই 'এন্‌জাইম'টিও কতকটা বৈদ্যুতিক সুইচের মতই কাজ করে। কিন্তু অক্সিজেন না থাকিলে আলোর উৎপত্তি হয় না।

আমাদের দেশে কয়েক প্রকার আলো-বিকিরণকারী কীটপতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচো, জোনাকী, সূক্ষ্মাকৃতি এক জাতীয় লাল বিছার আলো প্রায়ই লোকের নজরে পড়িয়া থাকে; কিন্তু ইহারা অতি পরিচিত বলিয়া এ সম্বন্ধে লোকের বিশেষ কোন কৌতূহল জাগ্রত হয় না। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের মৃত চিংড়ির শরীর হইতে এক প্রকার নীলাভ আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। ভাদস, ইলিশ প্রভৃতি মাছ বাসি করিয়া রাখিলেও সময় সময় তাহাদের শরীর হইতে এরূপ আলোক নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। হাঁস, কবুতর প্রভৃতির মাংস এক দিন রাখিয়া দিলে কখনও কখনও তাহা হইতে নীলাভ আলো নির্গত হইয়া থাকে। মাছমাংসে উৎপন্ন এক প্রকার 'ব্যাকটিরিয়া'ই এইরূপ আলোক-উৎপত্তির কারণ। আমাদের দেশে এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা হইতেও এইরূপ আলো নির্গত হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে, অপরিষ্কৃত স্থানে পরিত্যক্ত লতাপাতার মধ্যে এই ঠাণ্ডা আলোর যেরূপ প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কিছুতেই দেখা যায় না। হয়ত অনেকেরই ইহা নজরে পড়িয়া থাকে, কিন্তু জোনাকী বা অন্য কিছু মনে করিয়া স্বভাবতঃই উপেক্ষা করিয়া থাকে। কুসংস্কারের প্রভাবও আমাদিগকে এই সকল ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে প্রতিবন্ধক হয়। এসব ব্যাপারে কুসংস্কারের প্রভাব যে কত বেশী, সে-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। অনেক দিন আগের কথা, তিন চার জনে বসিয়া গল্প করিতেছি—কথায়-কথায় আলেয়া ও ভূতের গল্প উঠিল। স্থানীয়
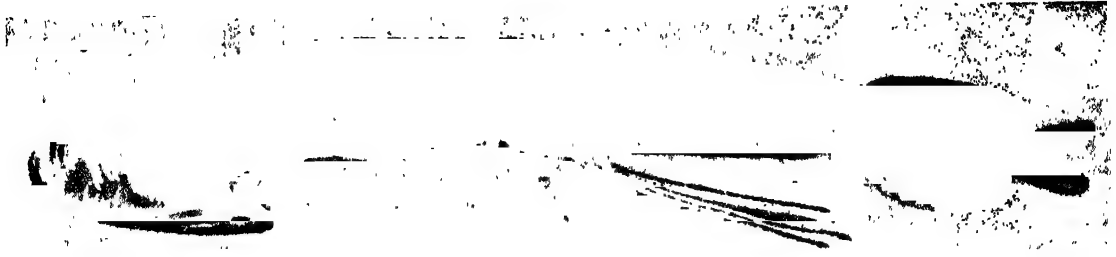
গভীর সমুদ্রের 'গুয়েনাই' মাছ। শরীরের ফোঁটাগুলি হইতে আলোক নির্গত হয়।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, এই গ্রামটার দক্ষিণ দিকের পাচীর মার ভিটাতে রাত্রিবেলা গেলেই হয়ত আপনি চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবেন, এইরূপ কোন পদার্থের সত্যই অস্তিত্ব আছে কিনা। পাঁচীর মার ভিটা একটা পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। সময়ে সময়ে লোকে ঐখানে শবদাহ করিয়া থাকে। সেখানে নাকি রাত্রিবেলায় উপর্য্যুপরি কয়েক দিনই লোকে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতে দেখিয়াছে। অগ্নিকুণ্ডটা নাকি আবার মাঝে মাঝে বেমালুম নিবিয়া যায় আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। বক্তা স্বচক্ষে না দেখিলেও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। মনে বড়ই কৌতূহল হইল। ভাবিলাম, নিশ্চয়ই ফস্‌ফিন্ অথবা ফসফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপার। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলাম। বন্ধুদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গী হইতে রাজী হইলেন। তখন বর্ষা সুরু হইয়া গিয়াছে। রাত তখনও বেশী হয় নাই। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, বেশ অন্ধকার। যিনি কথাটা বলিয়াছিলেন, তিনি বাধ্য হইয়াই আমাদের দুই জনকে পাঁচীর মার ভিটার পথ দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন। লণ্ঠন হাতে লইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। স্থানটা লোকালয় হইতে বেশ একটু দূরে। একটা পরিত্যক্ত জমি, স্থানে-স্থানে উঁচু ঢিবির মত লতা-গুল্ম জন্মিয়া আছে। মাঝে মাঝে ফাঁকা। এক পাশ দিয়া এপাড়া হইতে ওপাড়া পর্য্যন্ত সরু রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এখানে-সেখানে এক-একটা গাছ যেন জমাট অন্ধকারের বোঝা মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তেঁতুল, চালিতা ও অন্যান্য কতকগুলি গাছ খুব কাছাকাছি থাকিয়া গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা ভিটার মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হইলাম। যতই অবিশ্বাস করি না কেন—সংস্কার তো একেবারে কাটে নাই। গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টির শব্দ, আর কাঠ-ঝিঁঝি ও উইচিংড়ির কর্ণভেদী ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভরসা ছিল এই যে, সঙ্গে আলো আছে আর রাতও বেশী নহে। অনেকক্ষণ

আলো-বিকিরণকারী স্কুইডের ঝাঁক। জাপানের উপকূল হইতে বহুদূরে গভীর সমুদ্রে ইহাদিগকে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

এদিক-ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আলোটার জন্য কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য আলোটাকে ছাতার আড়ালে রাখিলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নাই। একটা ঝোপ ঘুরিয়া আর একটু অগ্রসর হইলাম। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সেই অন্ধকার স্থানটার দিকে নজর পড়িতেই মনে হইল যেন একটা ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে। সঙ্গী তখন আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা জানাইলেন। এত কাণ্ডের পর ফিরিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছিল না। অগত্যা সঙ্গীকে সেই স্থানে আলো আড়াল করিয়া বসিয়া থাকিতে রাজী করাইয়া অতি সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইলাম। প্রায় পনর-বিশ হাত অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম আলোটা যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল ও বড় দেখাইতেছে। প্রাণে সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য সঙ্গীকে ডাকিয়া ডাকিয়া কথা বলিতেছিলাম। কথাবার্ত্তার ফলেও আলোটার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না। আরও অগ্রসর হইব কিনা ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে দেখি হঠাৎ যেন আলোটা অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। পরক্ষণেই আবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমাগত কয়েক বার এইরূপ হইল। তার পর আবার অনেকক্ষণ একটানা আলো। সাহসে ভর করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া অগ্নিকুণ্ডটার প্রায় তিন-চার হাত দূরে উপস্থিত হইলাম। অতি স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। আশে-পাশের ঘাসপাতাগুলি আলোতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। একটা পুরাতন কর্ত্তিত গাছের গুঁড়ি হইতে আলো নির্গত হইতেছিল। জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে যেরূপ আলো নির্গত হয়, ইহা দেখিতে কতকটা সেইরূপ। সমস্ত গুঁড়িটাই যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কখনও দেখি

শম্বুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী 'বুকেফালা'। জলে সাঁতার কাটিবার সময় শরীর হইতে আলোক নির্গত হইতেছে।

আলোকবিকীরক ভীষণাকৃতি সামুদ্রিক মৎস্য 'স্কুইড' শিকার করিতেছে। স্কুইডগুলিও এক প্রকার উজ্জ্বল তরল পদার্থ জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিতেছে।

'থমাটোল্যাম্পাস'—গভীর সমুদ্রের আলো-বিকীরক কাট্‌ল্‌ মাছ

নাই। বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সঙ্গীটিকে নির্ভয়ে কাছে আসিতে বলিলাম, লণ্ঠনের আলোতে ঐ আলোটা প্রায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। দেখিলাম, গাছের গুঁড়িটা বহুদিনের পুরাতন। অনেক অংশই পচিয়া গিয়াছে। কয়েক টুকরা কাঠ ভাঙিয়া লইলাম। অন্ধকারে সেগুলিও বেশ আলো বিকিরণ করিতেছিল। সম্মুখের এক পাশে অন্যান্য লতাগুল্মের মধ্যে একটা বড় কচুগাছ জন্মিয়াছিল। একটু বাতাসেই তাহার একটা পাতা আন্দোলিত হইয়া উঠা-নামা করিতেছিল। দূর হইতে আলোটাকে এক বার জ্বলিতে ও তৎপরেই নিবিতে দেখিয়াছিলাম—এতক্ষণে তাহার কারণ বোধগম্য হইল। পরে পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছি—শুষ্কাবস্থায় ঐ কাঠগুলি আলো বিকিরণ করিতে পারে না, কিন্তু একটু জল দিয়া ভিজাইয়া দিলেই আলো বিকিরণ করিতে থাকে। এই জন্যই বর্ষাকালে সচরাচর এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অক্সিজেন প্রয়োগে আলোর ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়, বাতাসের অভাবে আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। মৃত গাছপালা, লতাপাতার মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছত্রাক-সূত্র জন্মায়—এই ছত্রাকসূত্র হইতেই নীলাভ আলোক নিঃসৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই জাতীয় ছত্রাকসূত্র মৃত উদ্ভিদ্‌গাত্রে প্রায় সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। বৃষ্টির পরে দেখা যায়, অনেক স্থলে বহুদূর ব্যাপিয়া অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ আলোর খেলা চলিয়াছে। ফসফরাসের কোন কোন যৌগিক মিশ্রণের সাহায্যে এই ঠাণ্ডা আলোর অনুরূপ কৃত্রিম আলো উৎপাদন করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে আলো-প্রদানকারী কীটপতঙ্গ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া গেলেও ঐরূপ কোন মাছ বা তদনুরূপ অন্য কোন জলজ প্রাণী আছে কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চিংড়ি কিংবা অন্যান্য মাছের শরীরে যে-আলোর উৎপত্তি হয়, তাহা জীবন্ত মাছে দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃত মৎস্যের শরীরে উৎপন্ন এক প্রকার 'ব্যাকটিরিয়া'ই এই আলো প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমুদ্রজলে বিচিত্র আকৃতির আলোক-মাছ ও অন্যান্য অনেক অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপান-সমুদ্রের উপকূলভাগ হইতে বহুদূরে গভীর জলের তলদেশে 'অ্যানথপ্‌টিলাম' নামে এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। চলতি কথায় ইহাদিগকে 'সাগর-কলম' বলে। শরীরের নিম্নভাগ তলদেশের কোন নরম বস্তুতে প্রোথিত করিয়া ইহারা খাড়া ভাবে অবস্থান করে এবং প্রায়ই আশে-পাশে দুলিতে থাকে। ইহাদের আগাগোড়া সমস্ত শরীর হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ নীলাভ আলো নির্গত হইয়া সমুদ্র-জল আলোকিত করিয়া রাখে। ইহারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে বলিয়া শরীরের এদিক-ওদিক আন্দোলনের ফলে মনে হয় জলের নীচে যেন আগুনের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। 'অ্যানথপ্‌টিলাম' কিন্তু একটানা আলো বিকিরণ করে না। অনেকক্ষণ

হয়ত কোন আলোই নাই, একসঙ্গে হঠাৎ কতকগুলি আলো জলিয়া উঠিল আবার হঠাৎ নিবিয়া গেল। খুব সম্ভব এই উপায়ে ইহারা শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কারণ হঠাৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে শত্রুরা আচম্‌কা ভয় পাইয়া হয়ত পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

ভূমধ্যসাগরে আলোকবিকিরণকারী জেলি-মাছ

গভীর সমুদ্রের তলদেশে 'ফটোষ্টমিয়াস গুয়েন'ই' নামক এক প্রকার বিকট আকৃতির মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দাঁতগুলি সাপের দাঁতের মত পিছনের দিকে বাঁকানো। শিকার একবার ধরা পড়িলে আর বাহির হইয়া আসিবার উপায় থাকে না, পিছনের দিকে মুখের মধ্যে চলিয়া যাইতেই বাধ্য হয়। মুখের গঠনও অদ্ভুত। নিম্ন চোয়ালের পশ্চাদ্ভাগ পিছনের দিকে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। শরীরের উভয় পার্শ্বে একটু নীচের দিকে এবং মুখের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া সারবন্দিভাবে ছোটবড় কতকগুলি ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বসমেত প্রায় দেড় হাজার ফোঁটা থাকে। এই ফোঁটাগুলি হইতে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হয়। প্রত্যেকটি ফোঁটাই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'টর্চে'র মত। শিকারের সুবিধার জন্যই হয়ত ইহাদের শরীরে আলোক-উৎপাদক যন্ত্রের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে

তড়িৎ-উৎপাদনকারী বাণ-মাছ।

'ফটোষ্টমিয়াসে'র মত আর এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নীচের চোয়াল হইতে একটি বোঁটা ঝুলিয়া থাকে। বোঁটার অগ্রভাগ পিণ্ডাকৃতি। এই পিণ্ডাকৃতি অংশটা বাতির মত আলো বিকিরণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের সর্ব্বশরীরে ছোট-বড় অসংখ্য আলো-বিকিরণকারী ফোঁটা রহিয়াছে। কাট্‌ল্‌ মাছের মত ছোট ছোট এক প্রকার প্রাণী দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। আলো-বিকিরণকারী রাক্ষুসে মাছেরা ক্ষুদ্রকায় কাট্‌ল্‌ মাছ শিকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রকায় মাছগুলিও ভয় পাইলে অথবা আক্রান্ত হইলে জলের মধ্যে আলো-বিকিরণকারী এক প্রকার তরল পদার্থ ছুড়িয়া মারে।
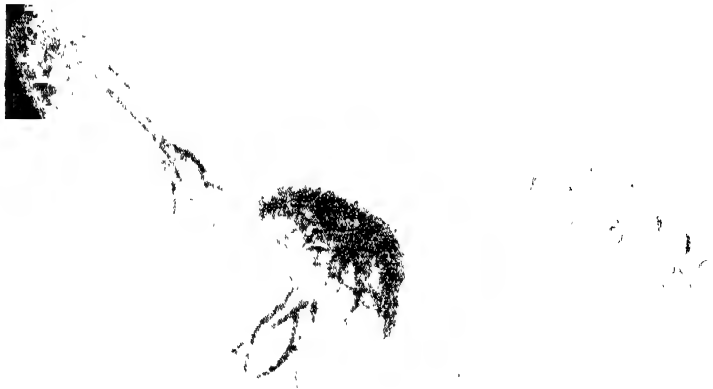
আয়ার্লণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গভীর জলে 'ল্যাম্প্রোটক্সাস্‌ ফ্ল্যাজেলীবার্বা' নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি যেমনই হউক, নিম্ন চোয়ালের তলদেশ হইতে দাড়ির মত লম্বমান অসম্ভব দীর্ঘ এক গাছি সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই সূত্রটি মাছটির শরীরের দৈর্ঘ্যের প্রায় ছয়-সাত গুণ লম্বা হইয়া থাকে। সূত্রটি উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। মাছটির কান্‌কোর পশ্চাদ্ভাগে খানিকটা স্থান জুড়িয়া ত্রিভুজাকৃতি আলোক-রেখা জল্‌ জল্‌ করিতে দেখা যায়। তা ছাড়া শরীরের উভয় পার্শ্বে দুই লাইনে সারবন্দীভাবে অসংখ্য ফোঁটা সজ্জিত থাকে। মস্তকের উভয় পার্শ্বেও এলোমেলোভাবে অসংখ্য ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফোঁটাগুলি হইতে অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো নির্গত হইয়া থাকে।

'গনোষ্টোমা পলিফস'ও গভীর সমুদ্রের মাছ। ইহাদের
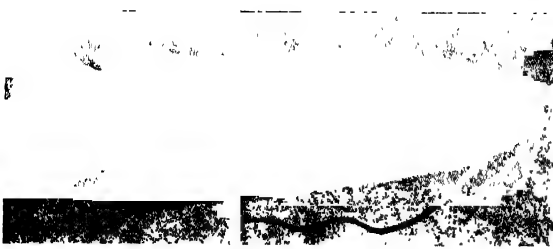
তড়িৎ-উৎপাদনকারী এক জাতীয় দাড়িওয়ালা মাছ।

শরীরের চামড়া মিশকালো। গায়ে আঁশ নাই। 'পলিফস্' মাছ প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। শরীরের উভয় পার্শে আলোক-উৎপাদনকারী অসংখ্য ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য আলোক-উৎপাদনকারী মাছ হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার গায়ের ফোঁটাগুলি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। উপরের সারের পাশাপাশি ফোঁটাগুলি সবুজ, নীল ও বেগুনী রঙের। নীচের সারের ফোঁটাগুলি লাল ও বাদামী। আবার লেজের দিকের গুলি লাল। এতদ্ব্যতীত পেটের দিকেও কতকগুলি বেগুনী রঙের ফোঁটা আছে। সকলগুলি মিলিয়া এক বিচিত্র বর্ণের আলোক সৃষ্টি করে।

জাপানের উপকূলভাগ হইতে দূরবর্ত্তী গভীর সমুদ্রে খোলস-সংযুক্ত এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণীকে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ 'স্কুইড' নামে পরিচিত। ইহাদের শরীর হইতে নীলাভ আলোক নির্গত হইয়া থাকে। ইহারা যখন দল বাঁধিয়া চলিতে থাকে, তখন সমুদ্র-জল আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

'ফাইলিরি বুকেফালা' নামক, শম্বুকের মত এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মুখের কাছে শুঁড়ের মত দুইটি যন্ত্র বাহির করিয়া জলে সাঁতার কাটিবার সময় শরীরের চতুর্দ্দিক হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। মনে হয় যেন একটি জলন্ত পদার্থ জল কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে 'থমাটোল্যাম্পাস্' নামে এক প্রকার অদ্ভুত কাট্‌ল্‌মাছ পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের আকৃতি শশার মত। বর্ণ হরিতাভ ধূসর। মুখের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া কতকগুলি ছোট ছোট শুঁড় আছে। দুইটি শুঁড় লম্বায় প্রায় শরীরের সমান। এই শুঁড় দুইটির সাহায্যেই সাঁড়াশির মত চাপিয়া ইহারা ছোট ছোট মাছ প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকে। উভয় চোখের নিম্নভাগে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কতকগুলি ফোঁটা আছে। লম্বা শুঁড় দুটির ডগার দিকে ও মধ্যভাগে একটি একটি করিয়া দুইটি ফোঁটা জল জল করিতেছে, ঘাড় ও পিঠের পশ্চাদ্ভাগে চারটি লাল রঙের ফোঁটা। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে আরও চারিটি উজ্জ্বল ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ফোঁটা হইতে উজ্জ্বল আলো নির্গত হইয়া জল আলোকিত করিয়া তুলে।

ভূমধ্যসাগরের তড়িৎ-উৎপাদক 'রে'-মাছ

ভূমধ্যসাগরে 'পেলাজিয়া নক্‌টিলুকা' নামক এক প্রকার জেলি-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ছাতার মত শরীর হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ আলো নির্গত হইয়া থাকে। ছাতার তলা হইতে ইহারা অনেকগুলি শুঁড় বাহির করিয়া

দেয়। এই শুঁড়গুলি হইতেও স্থির আলো নিঃসৃত হইয়া থাকে।

আত্মরক্ষার উপায় অথবা শিকার ধরিবার কৌশল, ইহার যে-কোন কারণেই হউক না কেন, মাছের শরীর হইতে যেমন আলোক নির্গত হয়, সেইরূপ আবার এমন কতগুলি মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা উপরিউক্ত কারণেই শরীর হইতে আলোর পরিবর্ত্তে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই জৈব তড়িৎ এত প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, অতিবলশালী প্রাণীও তাহার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। দক্ষিণ-আমেরিকার তাড়িতিক বাণমাছ এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক ক্ষমতাশালী। অরিণকো, এমাজন প্রভৃতি নদীর অগভীর জলে এবং আশে-পাশের জলাভূমিতে এক জাতীয় অদ্ভুত বাণমাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম—'জিমনোটাস্ ইলেকৃট্রিকাস্'। ইহাদের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ তড়িৎশক্তি নির্গত হয় যে, সময় সময় ঘোড়া প্রভৃতি ভারবাহী পশুরা জলপান করিতে গিয়া এই বাণমাছের তড়িতাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক-একটা বাণমাছ প্রায় ৮ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা এবং ওজনে আধ মণেরও বেশী হয়। ইহাদের শরীরের পাঁচ ভাগের চার ভাগই লেজ। ইহার উভয় পার্শ্বেই তড়িৎ-উৎপাদক কোষগুলি লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত। সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে দুই বিপরীতধর্ম্মী তড়িৎশক্তি সঞ্চিত থাকে। কাহাকেও তড়িতাঘাত করিবার সময় শরীরটাকে বাঁকাইয়া উভয় প্রান্ত একসঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দেয়। আফ্রিকার নীলনদের মধ্যেও 'মরুমারু' নামক এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরও লেজের উভয় পার্শ্বে তড়িৎশক্তি সঞ্চিত থাকে, কিন্তু তাহাদের 'শক্' বাণমাছ অপেক্ষা অনেক ক্ষীণ।

নীলনদের নিম্নভাগে প্রায় দুই হাত লম্বা এক জাতীয় দাড়িওয়ালা মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইহারা 'ম্যালপ্‌টেরারাস্ ইলেকৃট্রিকাস্' নামে পরিচিত। এই মাছগুলি অত্যন্ত অলসপ্রকৃতি এবং অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে। ইহাদের তড়িৎ-উৎপাদক শক্তি অসাধারণ। পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, এক-একটি মাছের শরীর হইতে উৎপন্ন তাড়িতিক চাপ ৪৫০ ভোল্টের কম নহে। অন্যান্য বিজলী-মাছের তড়িৎ-কোষগুলি চামড়ার নীচে অবস্থিত, কিন্তু ইহাদের তড়িৎ-কোষগুলি চামড়ার মধ্যেই সজ্জিত, মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত দুইটি গ্রন্থি হইতে স্নায়ুসূত্র-সাহায্যে সেগুলি ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত হয়। মাছগুলি অলসতার জন্য ছুটাছুটি করিয়া শিকার করিতে পারে না। কাজেই তড়িৎশক্তি ব্যবহার করিয়া অন্য মাছকে অসাড় করিয়া সহজেই উদর পূরণ করিতে পারে।

ভূমধ্যসাগরে আমাদের দেশের শঙ্কর মাছের মত 'টরপেডো মারমোরাটা' নামে এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চল্‌তি কথায় ইহাকে 'রে'-মাছ বলে। ইহাদের শরীর প্রায় দুই হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া হইয়া থাকে। পিঠের উপর চোখের মত কতকগুলি গোলাকার দাগ আছে। মুখ ও কান্‌কোর মধ্যস্থলে শক্তিশালী তড়িৎ-উৎপাদক কোষসমূহ খাড়া ভাবে সজ্জিত থাকে। উত্তেজিত হইলেই ইহাদের তড়িৎশক্তির বিকাশ ঘটে, সেই সময়ে ইহাদিগকে হাত দিয়া ধরিলে তড়িতাঘাতে হাত অবশ হইয়া যাইবে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসকেরা অবশাঙ্গের চিকিৎসার্থ যেরূপ বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রয়োগ করেন, প্রাচীনকালের রোমক চিকিৎসকেরা সেইরূপ চিকিৎসার জন্য 'রে'-মাছ ব্যবহার করিতেন।

নিয়তি

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

আজ ড-হ্লা-চী'র বাড়ী মহা সমারোহ। বাড়ীখানিকে কুটীর বলাও চলে—কয়েক খানি মোটা মোটা খুঁটির উপর জমি হইতে পাচ-ছয় ফুট উঁচুতে পিঙ্গাডো কাঠের তৈয়ারী একখানি প্রশস্ত ঘর, কাঠের সিংগ্‌ল্ দিয়া ছাওয়া তাহার চালের উপর নানাবিধ লতার জাল, আর লাল নীল হলুদে বেগুনি কত রঙের ফুল ফুটিয়া বাতাসের দোলায় দুলিয়া দুলিয়া পথিকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ঘরের চালের কড়ি হইতে ঝোলানো ছোট ছোট বাঁশের টব হইতে রংবেরঙের মরসুমী ও পরগাছা ফুলের গুচ্ছ হেলিয়া পড়িয়াছে। খোলা জানালাগুলিতে কাচের ঝালরের পর্দা, তাহার উপর ময়ূর ও প্রজাপতি আঁকা, বাহির হইতে চোখের এক পলকেই যে-কোন নবাগত ব্যক্তি গৃহস্বামিনীর সৌন্দর্য্যরুচির পরিচয় লাভ করিতে পারে।

ক্ষুদ্র কুটীরখানি—নিত্য বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ আরামের হইলেও, উৎসবের দিনে নিতান্তই অকুলান হয়। প্রায় এক মাস ধরিয়া অনেক পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে ড-হ্লা-চী তাহার কুটীরখানির সম্মুখের ও দুই পাশের খোলা আঙিনাটুকু বাঁশ ও ধানিপাতার সাহায্যে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং প্রতিবেশী তরুণ বন্ধুদলের সহায়তায় স্থানটি সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্তই বৌদ্ধদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশস্ত সময়, এই সময়ের মধ্যেই নানাবিধ ব্রতপালন ও অনুষ্ঠানের বিধি আছে। বৎসরের এই কয়েকটি মাস নিষ্ঠাপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম, দান, তপস্যা ইত্যাদি করিতে পারিলেই নির্ব্বাণের পথ উন্মুক্ত। সারা বৎসর যে যে-ভাবেই চলুক না, ক্ষতি নাই বিশেষ, যদি এই সময়টা একটু সংযতভাবে চলিতে পারে, আমোদ-প্রমোদ থিয়েটার-বায়স্কোপ বাদ দিয়া প্যাগোডায় ফুল-বাতি দেওয়া যায়, ফোঙ্গীদের (ধর্ম্মযাজক) আহার্য্য ও বস্ত্রাদি দান করা যায়, তবেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রতগ্রহণ, ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষেও এই শুভ-সময়। ড-হ্লা-চী-র জ্যেষ্ঠপুত্র মাউঙ্-বা-তানের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইল, জ্যেষ্ঠকন্যা মা-মা-জি-রও চৌদ্দ পূর্ণ হইয়া পনর চলিতেছে, এখনও কাহারও সিন্-ব্যু এবং না-তুইন্-মিংগালা হইল না—এই সমালোচনা শুনিতে শুনিতে ড-হ্লা-চীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারও কি অসাধ ছেলেমেয়ের এই অতিআবশ্যক অনুষ্ঠানটি করিবার? কিন্তু সম্বল কোথায়?

একলা মানুষ, আটটি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া সে সংসারক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে, প্রতিদিনের অভাব মিটাইয়া সঞ্চয় এতই কম হয় যে, এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন এত দিন হইয়া উঠে নাই। অধ্যবসায়ী, কঠিন-পরিশ্রমী, অমায়িকস্বভাবা এই রমণীর বন্ধুসৌভাগ্যের ফলে আজিকার বিপুল আয়োজনের কোথাও ত্রুটি ঘটিতে পারে নাই। বর্মীদের মধ্যে পরস্পর অর্থসাহায্য করিয়া পারিবারিক অনেক অনুষ্ঠান সফল করিয়া তোলার প্রথা প্রচলন থাকায় ইহাতে কাহারও সম্মানে আঘাত লাগে না।

বাহিরের অভ্যর্থনার ভার প্রতিবেশী বন্ধুদের উপর অর্পণ করিয়া ড-হ্লা-চী পুত্রকন্যাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মাউঙ্-বা-তানের সমবয়সী ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজকের দিনই তাহার সহিত শেষ গল্প করিয়া লইতে হইবে, এখনই ঐ গোমড়ামুখো ফোঙ্গীর দল গম্ভীর গলায় তাহাকে এক-শ গণ্ডা মন্ত্র পড়াইবে, তার পর তাহাদের দলের সঙ্গে লইয়া যাইবে, তিন মাসের মধ্যে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।

মাউঙ্-বা-তান বলিতেছে, "আমার একটুও ভাল

লাগছে না ভাই, এমন পালিশ-করা টেরির বাহার মুহূর্ত্তে নাপিত বেটার ক্ষুরের আগায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার পর আবার খালি গা, খালি পা, জবরজং আলখাল্লা, হাতে একটা ভিক্ষের গামলা—কি চেহারা হবে বল তো ?"

মাউঙ্ পে বলিল, "আমি কিন্তু ভাই তিন মাস থাকি নি। চার বেলা মন্ত্র পাঠ, এক বেলা খাওয়া, সারাক্ষণ ফোঙ্গী-চাউঙে বন্ধ থাকা, ভোর না হ'তে ভিক্ষের পাত্র গলায় বেঁধে দোরে দোরে ঘোরা, ও-সব কি আমাদের এই যুগে পোষায় ? আমি মাকে অনেক কষ্টে রাজী করেছিলাম, এক সপ্তাহ থাকব ব'লে।"

মাউঙ্ তান বলিল, "আমার মা-বাবা বড় সেকেলে লোক, আর ভীষণ ধর্ম্মভীরু। ফোঙ্গীরা যা আওড়ায় তাঁদের সামনে তাই ধ্রুবসত্য ব'লে মেনে নেন। আমাকে পুরো তিন মাসই থাকতে হয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রের বিধান নাকি সুপুত্রকে পিতার জন্য এক মাস, মায়ের জন্য এক মাস আর নিজের জন্য এক মাস ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করতে হয়। আর কোন বিষয়ে সুপুত্র হই বা না-হই, জন্মের মধ্যে কর্ম্ম এই এক বারই তো, কষ্ট ক'রে সুপুত্র নাম নিয়েছি। নইলে মা হয়ত রাগ ক'রে টাকা-পয়সা বন্ধ ক'রে দিতেন। এখন আছি রাজার হালে, যা চাই তাই পাই।"

মাউঙ্গ-বা বলিল, "ও-সব পুরাকালের নিয়ম। আধুনিক যুগে কি ও-সব চলে ভাই ? আমি কলেজের সিনিয়র বি-এ ষ্টুডেণ্ট, আমার কি মাথা মুড়িয়ে, হলুদ ঢেলে, গেরুয়া প'রে ধ্যান করবার অবসর আছে ? তা বোঝে কে ? বাবা শিক্ষিত লোক, এক জন ডেপুটি-কমিশনার, মাও জাড্‌সন্ কলেজের ছাত্রী ছিলেন, তবু শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, লোকমত এসব ত্যাগ করতে পারেন নি। দু-বেলা ফায়ায় যান, আর ফোঙ্গীদের কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনেন। এক দিন আমায় বললেন, 'যে-ছেলের সিন্-ব্যু হয় নি সে পুরুষ-নামেরই যোগ্য নয়, তা জানিস্ ? সিন্-ব্যু না হ'লে তোরও মুক্তি হবে না, আমাদেরও পাপ হবে। একটি সপ্তাহ কষ্ট ক'রে থাক্, তার কম থাকলে বড় নিন্দে হয়। আমরা বাড়ী থেকে তোর জন্য খাবার পাঠাব, নিজেরা গিয়ে সর্ব্বদা দেখা করব।' কি করি ? মাকে খুশী করবার জন্যে শেষে রাজী হলাম, আর নিজেরও মর্য্যাদায় আঘাত পড়ল এই ভেবে যে পুরুষ নামের অযোগ্য থাকতে হবে ? কিন্তু সকাল ন'টা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ছিলুম চাউঙে, তাতেই হাঁপিয়ে উঠবার জোগাড় ! দুপুর রাতে যখন মঠের প্রধান ফোঙ্গীও অঘোরে ঘুমচ্ছেন, তখন আমরা তিন-চার জন নবীন ফোঙ্গী পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে বাড়ীতে এসে হাজির। পর-দিন মা-বাবা অনেক বুঝিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন আবার, কিন্তু প্রধান ভিক্ষু ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে অনেক তিরস্কার করলেন, মাথা নীচু ক'রে শুনলাম। মা-বাবা ক্ষমা চাইতে বললেন, ক্ষমাও চাইলাম কিন্তু ফিরে যেতে রাজী হ'লাম না। মা আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্যাগোডার মাথায় সোনার ছাতি গড়িয়ে দিলেন।"

এই বিবৃতির পরে আরও চার-পাঁচ জন গৌরব সহকারে বলিয়া উঠিল, "আমরাও কেউ কয়েক ঘণ্টার বেশী থাকি নি, কি দরকার ?"—তাহাদের উচ্চ কণ্ঠস্বর দমাইয়া দিয়া একটি তরুণী বলিয়া উঠিল, "থাম, থাম, কাপুরুষের দল, সামান্য শারীরিক কষ্ট সইতে, ভোগবিলাস সাময়িক ভাবেও ছাড়তে যারা এত ভয় পায়, তারা সত্যিই পুরুষ নামের যোগ্য নয়। এখন বন্ধুটির কানে আর সুমন্ত্র ঢেলো না—কো*-বা-তান, উঠে এস, মা তোমায় ডাকছেন ভিতরে।"

সবাই চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ঐ বুঝি মা-মা-জী, বা-তানের বোন্ ? বেশ সুন্দর দেখতে তো। আজ তো ওরও না-তুইন্-মিংগালা, না রে ?"

মাউঙ্-তান্ বলিল, "জানিস্ তো সিন্-ব্যু না হ'লে যেমন পুরুষ-নামের গৌরব পায় না, না-তুইন্-মিংগালা না হ'লে তেমনি মহিলা নামের যোগ্যতাও হয় না।"

অদূরে সাহেবী পোষাক পরিহিত একটি যুবক নীরবে বসিয়া তরুণ-দলের রসালাপ উপভোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "না-তুইন্-মিংগালা ব্যাপারটা কি ভাই ?"

য়ুনিভার্সিটি কলেজের সিনিয়র বি-এ ষ্টুডেণ্টটি আগ্ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যালো সেইন্, বর্ম্মা দেশে এত বছর বাস করছ, ওকালতী ক'রে পকেট ভর্ত্তি করছ,

* কো = বড় ভাই, দাদা।

আর না-তুইন-মিংগালা কি ব্যাপার, তাও জান না, জিজ্ঞেস করছ? সাধে কি তোমাদের উপর চটি আমরা? রোজগার করবে, টাকা জমাবে, সম্পত্তি বাড়াবে, পছন্দ হ'লে বর্ম্মিণী বিয়েও করবে হয়ত, কিন্তু দেশটার, জাতিটার কোন খবরও নেবে না, আমাদের কোন ব্যাপারে সহানুভূতিও দেখাবে না।"

মিঃ সেন ওরফে মাউঙ্ সেইন, বাধা দিয়া বলিল, "তোমার বক্তৃতার স্রোতটা একটু থামাও তো পণ্ডিত? অনেক কথাই মনের ঝালে ব'লে ফেললে দেখছি। আজকের অনুষ্ঠানে বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছি নিজে যেচে, তা জান? ওকালতী পরীক্ষা দেবার সময় বাপ-মায়ের দেওয়া দেশী নামটাও বদ্‌লেছি, দরকার হ'লে প্যাণ্ট ছেড়ে লোঙ্গী পরতেও রাজী। আর কি করলে তোমরা স্বীকার করবে যে এদেশটাকে আমরাও স্বদেশ ব'লে মেনে নিয়েছি?"

মাউঙ্-পে বলিল, "আহা-হা, ওসব অপ্রিয় কথা আজকের উৎসব-সভায় তুললে কেন ভাই মাউঙ্-তান? না-তুইন্-মিংগালা ব্যাপারটা হচ্ছে এই—মেয়ের বয়স যখন বার-তের হয় অথবা আরও কম, তখন পুরোহিত ডেকে একটা অনুষ্ঠান ক'রে তার কান বেঁধানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি লোককে জানিয়ে করবার অর্থই—মেয়ে যে বড় হয়েছে, বিয়ের প্রস্তাব চলতে পারে, এইটুকু লোককে বুঝিয়ে দেওয়া। যে-সব মায়ের বাজারে ষ্টল আছে, তারা এই অনুষ্ঠানের পর মেয়েদের দোকানে জিনিষপত্র বিক্রি করতে বসায়, অনেকের চোখ পড়ে তখন, আর বিয়ের সম্বন্ধেরও সুবিধা হয়। আজ দুটো ব্যাপারই এখানে হবে, এসেছ যখন, ব'সে থেকে সবটা দেখে যাও। এরা ত বড়লোক নয়, নইলে প্রাপ্যটিও বেশ লোভনীয় হ'ত।

মিঃ সেন বলিল, "তোমাদের এ নিয়মটা বেশ ভাই। নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াও, আবার উপহারও দাও নিমন্ত্রিতদের। আমাদের দেশে ঠিক উল্টো নিয়ম। যার বাড়ী অনুষ্ঠান, তাদেরই উপহার পাঠাতে হয়।

মাউঙ্-পে বলিল, "আমাদের অনুষ্ঠানে বাড়ী সাজানো এবং অভ্যাগতদের উপহার দিতেই অনেক খরচ পড়ে যায়, খাওয়ানোতে বেশী খরচ করা যায় না। আর তোমাদের মতন পাত পেড়ে ভূরিভোজন করানো আমাদের পছন্দও হয় না, ওতে বড় গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা হয়, উৎসব-সভার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না।"

এমন সময় বর্ম্মী ঢাক ও জলতরঙ্গের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া উৎসব-সভার দিকে চলিল।

সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত একখানি মনোরম গালিচার উপর জরির কাজ-করা দুইটি বড় বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়া উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত দুই ভাইবোন বসিয়া আছে।

ট্যাভয়-রেশমের ধূপছায়া রঙের মূল্যবান্ পাসো (সম্ভ্রান্ত ঘরের বর্ম্মী পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র) এবং শুভ্র ম্যাণ্ডেলে-রেশমের এঙ্গি পরিয়া, গোলাপী সূক্ষ্ম রেশমের গাউঙ্-বাউঙ্ (বর্ম্মী পাগড়ী) মাথায় বাঁধিয়া মাউঙ্-বা-তান্ রীতিমত ভদ্রলোক সাজিয়া মৃদু হাস্যে অভ্যাগত-দিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

রূপসী তরুণী মা-মা-জীর পরনে সাদা জরির কাজ-করা গাঢ় নীল রঙের বেনারসী লোঙ্গী এবং ধবধবে সাদা মসৃণ পাডোমার এঙ্গি। গলায় সাদা মুক্তার চিক্, মাথার তালুর উপর চুলের গ্রন্থি বাঁধা, গ্রন্থির এক পাশ হইতে এক গোছা শিথিল চুলের গুচ্ছ ঝুলিতেছে, তার উপর নীল রঙের ছোট ছোট কৃত্রিম ফুলের স্তবক হেলিয়া পড়িয়াছে। এঙ্গির বোতামগুলি কৃত্রিম হীরার হইলেও কাটিবার নৈপুণ্যে জ্যোতির ছটায় আসলকেও হার মানাইয়াছে।

ছেলেমেয়ে দুইটির সম্মুখে দুইটি বিরাট্ রূপার পানের বাটা—সম্ভবতঃ কোন ধনীগৃহ হইতে ধার করিয়া আনিয়া উৎসব-সভার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এক ধারে মখমলের চাদর ঢাকা একটি বৃহৎ জলচৌকির উপরে আত্মীয়বন্ধুদের প্রেরিত রূপার কৌটা, ফুলদানী, রেশমের লোঙ্গী, জর্জেটের স্কার্ফ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর উপহারদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে এক দল গৈরিকবসনাচ্ছাদিত মুণ্ডিতশির ফোঙ্গীর দল মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন, সভার সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। চারি দিকে সুবেশা, সুকেশিনী বর্ম্মিণী রমণীরা চুরুটের রেকাবী ও পানের বাটা সম্মুখে লইয়া মৃদুগুঞ্জনে রসালাপ

করিতে ব্যস্ত। এত লোকসমাগমেও সভা মুখরিত নয়, মানুষের কণ্ঠস্বরে সভার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে নাই।

সুগন্ধি ফুল ও আতরের গন্ধ, তরুণ-তরুণীর সরস হাস্যালাপ, প্রৌঢ় ও প্রবীণের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ,—ইহার মধ্যে ড-হ্লা-চী-র মঙ্গল-অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

প্রবীণ জ্যোতিষী স্যায়া চি-মাউঙ্ একখানি জীর্ণ পুঁথি সম্মুখে খুলিয়া ঘড়ি-হাতে শুভলগ্নের অপেক্ষা করিতেছিলেন, ড-হ্লা-চী-কে ইঙ্গিতে জানাইলেন শ্রীমতীর কান বিদ্ধ করিবার প্রশস্ত সময় উপস্থিত। ড-হ্লা-চী একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত সূচ হাতে লইয়া উপস্থিত সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন এবং একটি বৃদ্ধার হাতে সূচটি দিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে আমার কানও বেঁধানো হয়েছিল, আজ আমার মেয়ের কানও তুমিই বিঁধিয়ে দাও। বৃদ্ধা সূচটি হাতে লইয়া বলিল, "আমার ত এই ব্যবসা, মা, তোমাদের সকলের আশীর্ব্বাদে এই কাজেই দু-পয়সা রোজগার ক'রে পেট চালাই।" জ্যোতিষী স্যায়ার ইঙ্গিতে জোরে বাজনা বাজিয়া উঠিল, মা-মা-জীর আর্ত্তনাদ তাহাতে চাপা পড়িয়া গেল, নিকটস্থ দুই-এক জন আত্মীয় ছাড়া তাহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি কেহই শুনিতে পাইল না। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলারা সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মা-মা-জীর কর্ণভূষণের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক জন বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা! ড-হ্লা-চী কম জোগাড়ে নয়, কত বড় হীরেখানা দিয়েছে মেয়েকে দেখেছ?" আর এক জন জবাব দিলেন, "কি করবে বল? আমাদের প্রথাটাই যে বড় বিশ্রী, মেয়ের কান বিঁধোতে হবে সোনার সূচ দিয়ে, আবার ঐ সূচের ডগায় যে হীরেটুকু থাকবে, ঐটেই হবে তার কানের গহনা। সূচটাও কম মোটা নয়, ঐটে বেঁকিয়েই তো কানে আটকে দিল এখন, দেখলে না?" পশ্চাৎ হইতে আর এক জন মন্তব্য করিলেন, "হ'লই বা নিয়ম, নিয়মের ব্যতিক্রমও কি হয় না? যে না পারে, সে রূপোর সূচে নকল হীরেও দেয় ত? হয়ত ওটাও নকল হীরে!"

কান-বিঁধানো বুড়ী বলিয়া উঠিল, "কেন গা, মা-হ্লা-চী'র কি হীরে কম ছিল? আজই না হয় দুঃখে প'ড়ে তুলোর ব্যবসা, তামাকের চাষ ক'রে ছেলেমেয়ে পুষছে, এক সময় দেখ নি কি, আপাদমস্তক হীরে-জহরতে মুড়ে মোটর হাঁকিয়ে স্বামীর সঙ্গে লাট-সাহেবের বাড়ীতে ডিনার খেতে যেত। দেনাদারেরা সব গহনা যখন কেড়ে নিয়ে গেল, তখনকার দৃশ্য তো আমি দেখেছিলাম! কি স্থিরবুদ্ধি মেয়ে! সব দিয়েও দু-চারখানা গয়না কি আর হাতে রাখে নি ভেবেছ? এখনও খুঁজলে ওর ঘরে হীরের অভাব হবে না।"

নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সম্মুখে ছোট ছোট রেকাবীতে তিল-ভাজা, নারিকেল-ভাজা, আদার কুচি ভাজা, কুচো চিংড়ি ভাজা, সিমের বিচি, চিনে বাদাম, চিঁড়া প্রভৃতি দশ-বারো রকমের ভাজাভুজি এবং কাচের ছোট ছোট বাটীতে আইসক্রীমে ভিজানো কয়েক রকম ফলের টুক্‌রা পরিবেশন করা হইল। খাওয়া-দাওয়ার শেষে সকলে গৃহস্বামিনীর পুত্রকন্যা ও পরিবারের কল্যাণ কামনা করিয়া গৃহকর্ত্রী-প্রদত্ত এক একটি কাগজের থলি হাতে বাড়ী ফিরিল। থলি খুলিয়া কেহ একটি বড় তোয়ালে, কেহ একটি স্কার্ফ, কেহ বা এক টুকরা পাডোমা কাপড় লাভ করিল। ড-হ্লা-চী এই অনুষ্ঠানে সাধ্যমত খরচ করিলেও অনেকে মন্তব্য করিল, "অমুকের বাড়ী কাট্-গ্লাসের বড় বড় বাটী, তমুকের বাড়ী ল্যাকারের সোনালী কৌটা দিয়াছিল, এ আর কি দিয়াছে?" বলা বাহুল্য, মন্তব্য যাহারা করিল, তাহারা কেহই বর্ম্মী নয়, ভারতীয় প্রতিবেশীর দল, যাহারা অনেকেই উপহার-দ্রব্যের লোভে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একাধিক বার নিমন্ত্রণ-বাড়ী পাঠাইয়াছিল। কারণ তাহারা জানে যে অনুষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যখনই যাইবে, সে-ই বিদায়-দর্শনী পাইবে।

অতিথি-আপ্যায়ন সমাধা করিয়া ড-হ্লা-চী ফোঙ্গীদের সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার কাজ তো ফায়ার আশীর্ব্বাদে এক রকম হয়ে গেল, এখন আপনারা মাউঙ্-বা-তান্‌কে আপনাদের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।"

প্রবীণ ফোঙ্গী উ-উত্তমা প্রস্তাব করিলেন, "আমরা এখন মঠে ফিরে যাই। তুমি তোমার ছেলেকে শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে, মঠে নিয়ে যেও, মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতিও সেখানেই

ভাল হবে। এখানে এত লোকের ভিতর ব্রতের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না।"

ড হ্লা-চী মস্তক ভুলুণ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। ভিক্ষুর দল নিজ নিজ প্রাপ্য বস্তু বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চাউঙের (মঠ-সংশ্লিষ্ট আশ্রম) আশ্রিত এক দল বালককে রাখিয়া নতমুখে নীরবে সারি গাঁথিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

ড-হ্লা-চী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "এবার তোমার বন্ধুবান্ধবদের এবং বাদ্যকর দল সঙ্গে নিয়ে শোভা-যাত্রা ক'রে, সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ ক'রে একবারে 'চাউ-তোলোন' ফায়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের রওনা করিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করব, তোমরা বেশী দেরি ক'রো না, শুভলগ্ন যেন উত্তীর্ণ না হয়ে যায়।"

মিঃ সেন (ওরফে মাউঙ্-সেইন্) বা-তানের হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি ভাই আমার মোটরে যাবে? আমি নূতন ওপেল্ গাড়ী কিনেছি, তোমাকে নিয়ে আজ শহর প্রদক্ষিণ করলে আমার গাড়ীর পয় ভাল হবে নিশ্চয়। আজ তুমি ফোঙ্গী হবে, এত বড় একটা শুভ অনুষ্ঠানে আমার গাড়ীর বৌনি হ'লে আমার হয়ত কপাল খুলে যাবে।"

বা-তান্ ঝক্‌ঝকে গাড়ীখানির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, কি রঙের বাহার। অর্ডার দিয়ে করিয়েছেন নাকি? গাঢ় নীলের কোলে সাদা বর্ডার কি মানিয়েছে! আপনার পছন্দ বেশ। ক'-দিনই বা উকীল হয়ে বসেছেন, খুব পয়সা পাচ্ছেন, না?"

মাউঙ্ সেইন্ বলিল, "পয়সা আর কোথায় বেশী? তোমাদের সকলের শুভ ইচ্ছায় চলে যাচ্ছে এক রকম। বাড়ী একখানা করতে না পারলে আর মান থাকছে না, এখন সেই চেষ্টায়ই আছি। যাক্ সে-সব কথা, তোমার মা ও বোনকে নিয়ে এস, আমি নিজেই ড্রাইভ করব আজ।"

বা-তান্ বলিল, "মা তো যাবেন না, আমার এক মামা আমার সঙ্গে যাবেন।"

দেখিতে দেখিতে বিশ-পঁচিশখানা মোটর এবং মোটর-বাস্ একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়া দিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং মহিলার দল অনেকেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বা-তান্ এবং মা-মা-জীকে লইয়া যাইবার জন্য অনেকেই অনুরোধ জানাইল, কিন্তু বা-তান্ তাহার দুই-একটি বন্ধুকে লইয়া মাউঙ্ সেইনের নূতন গাড়ীতেই উঠিয়া বসিল। মা-মা-জী কিন্তু তাহার এক সখী মা-মা-এ-কে লইয়া একটি হুড-খোলা টুরার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মাউঙ্ সেইনের সিডান্ গাড়ীতে বসিয়া শহর বেড়াইলে তাহার এমন সুন্দর সাজসজ্জা কেহই তো দেখিতে পাইবে না। মাউঙ্ সেইন্ বেচারী বিশেষ দুঃখিত ও নিরাশ হইল। আধ ঘণ্টাখানেক শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি ঘুরিয়া বেলা প্রায় বারোটার সময় তাহারা ফোঙ্গী-চাউঙে আসিয়া পৌঁছিল। প্যাগোডার ফটক হইতে প্রায় সকলেই বিদায় গ্রহণ করিল। মাউঙ্-তান, মাউঙ্-বা, মাউঙ্-পে প্রভৃতি বন্ধুবর্গ মাউঙ্-বা-তান্‌কে আশ্বাস দিল, মাঝে মাঝে চাউঙে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিবে, যদিও জানে তাহাতে বড়-ফোঙ্গীর ক্রোধভাজন হওয়ার বিপদও আছে।

মাউঙ্-বা-তান্ মাউঙ্ সেইনের হাত ধরিয়া বলিল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, এখন অনেক দিন তো আর দেখা হবে না। তিন মাস থাকতে পারব না জানি, তবু এক মাসের আগে মা বাড়ী নেবেন না নিশ্চয়ই। আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে খবর দেব, আসবেন আমাদের বাড়ী।"

মাউঙ সেইন্ হাসিয়া বলিল, "আমি এখন অপেক্ষা করব এখানে, তোমার মা ও বোনকে বাড়ী নিয়ে যাব আমার গাড়ীতে। তোমার মাকে আমি যে কত শ্রদ্ধা করি, তুমি জান না। তিনি মাঝে মাঝে আমার আপিসে যান, তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ নিতে। তাতেই তাঁকে জানবার সুযোগ হয়েছে। কি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক! আর কি পরিশ্রমী। তোমাদের দেশের মেয়েরা অনেকেই খুব পরিশ্রমী দেখেছি, কিন্তু তোমার মায়ের মতন এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্না মহিলা দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।"

এমন সময় বা-তানের মা প্যাগোডার সিঁড়ির উপর ধাপে দাঁড়াইয়া বা-তান্‌কে ডাকিলেন।

শুভলগ্নে একটি বিরাট্ অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় মাউঙ্-বা-তানের মস্তক-মুণ্ডন এবং পবিত্র বৃক্ষের ছাল এবং বিচি-সংযোগে স্নান ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। প্রধান ভিক্ষু-প্রদত্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া নতমস্তকে ফায়া, টায়া এবং তিঙ্গার (বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ) নামে দশটি ব্রত গ্রহণ করিল। প্রধান ভিক্ষু তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, জীবহত্যা করিব না, অপরের দ্রব্য হরণ করিব না, ব্যভিচার করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিব না—এই পাঁচটি ব্রত তোমাকে আজীবন পালন করিতে হইবে। এই কয়েকটি অবশ্যপালনীয় ব্রত সকল গৃহস্থ পুরুষ-রমণীর প্রতি তথাগত বুদ্ধের আদেশবাণী বলিয়া যুগে যুগে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভিক্ষু-জীবনের আরও পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য তোমাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে; সেগুলি এই—

মধ্যাহ্নের পর আহার করিবে না; গান, বাজনা, নাচ, খেলা প্রভৃতি লঘু আমোদে যোগ দিবে না; সুগন্ধি, আতর, অঙ্গরাগ প্রভৃতি প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করিবে না; কোনরূপ উচ্চাসন পালঙ্ক প্রভৃতিতে উপবেশন বা শয়ন করিবে না; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি স্পর্শ করিবে না।

ভগবান্ বুদ্ধের প্রসাদ-বারি তোমার উপর বর্ষিত হউক, আজ হইতে তোমাকে আমাদের সঙ্ঘের এক জন বলিয়া বরণ করি।"

অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্য্যে এবং ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের একত্র মন্ত্রোচ্চারণে, পারিপার্শ্বিক পবিত্র আব্‌হাওয়ায় মাউঙ্-বা-তানকে যেন আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর প্লাবন নামিয়া আসিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে অনুষ্ঠানটির কঠিন দায়িত্ব অনুভব করিয়া ভীত হইয়া বলিল, "গুরুদেব, আমি বড় দুর্ব্বল, এ ভার যদি বহন করতে না পারি?"

ভিক্ষু হাতজোড় করিয়া সম্মুখে অর্দ্ধশায়িত মর্ম্মর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "ইঁহারই শরণ লও।" মাউঙ্-বা-তান্ জোড়হস্তে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি যেন ভিক্ষা চাহিয়া লইল।

ড-হ্লা-চী এতক্ষণ দূরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। বিদায়গ্রহণের সময় হইয়াছে বুঝিয়া, উঠিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমরা চললাম, তুমি সুখী মনে, শান্ত ভাবে, এই জীবনকে গ্রহণ কর, বাছা, মনে যেন কোন ক্ষোভ রেখো না।"

মঠের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন কন্যা মা-মা-জী মাউঙ্ সেইনের সহিত দ্বারের সম্মুখে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ড-হ্লা-চী এই তরুণ যুগলের দাঁড়ানোর ভঙ্গী এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া যেন শঙ্কিত হইলেন। পর-মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক ভাবে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "উকীলবাবুর বড় দয়া, এতক্ষণ ব'সে আছেন আমাদের জন্যে? এতখানি সময় মক্কেলের প্রতীক্ষা করলে হয়ত দুই পকেট ভ'রে উঠত আপনার।"

মাউঙ্ সেইন্ অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করিল, "মক্কেলের কাজ তো রোজই করি, মা। শুধু পেটের খোরাকে কি চলে? মনের খোরাকও যে না হ'লে প্রাণটা বাঁচে না।"

* * *

ইহার পর তিন মাস অতীত হইয়াছে। মাউঙ্-বা-তান্ গৃহে ফিরিয়াছে। মায়ের কঠিন আদেশে বার-বার অনুমতি চাহিয়াও ইহার পূর্ব্বে সে গৃহে ফিরিতে পারে নাই বটে, কিন্তু প্রধান ভিক্ষুর অনুগ্রহে প্রতিদিন উকীল-বন্ধুটির সহিত এক বার করিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে পারিয়াছে।

শহরের প্রান্তদেশে ধনী কাষ্ঠব্যবসায়ী বাবু রমণলালের বাগানবাড়ীখানি ধনীদরিদ্র জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই আরামের স্থান ছিল। বাবু রমণলাল সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহমনকে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত পাহাড় ও নদীতে ঘেরা এই নিরালা স্থানটিতে উন্মুক্ত আকাশতলে এক বার জুড়াইয়া লইবার জন্য দিনান্তে এখানে আসিতেন এবং রাত্রিশেষে উদ্যান-সংলগ্ন সরোবরে অবগাহন এবং পূজা সমাধা করিয়া পুনরায় শহরে ফিরিতেন।

সাধারণের চিত্তরঞ্জনের এবং সুবিধার জন্য এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণ দানশীল মহাজন অনেকগুলি ছোট ছোট

বাংলো এবং সন্তরণ-শিক্ষা ও অবগাহনের উপযোগী কতকগুলি পুষ্করিণী করিয়া দিয়া এই স্থানটিকে অধিকতর আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। সপ্তাহান্তে এবং প্রতিদিনও শহর হইতে অনেক লোক এই স্থানে ভ্রমণ, সন্তরণ এবং বনভোজনের উদ্দেশ্যে আগমন করে।

মাউঙ্ সেইন প্রতিদিন অপরাহ্নে আপিসের কাজ শেষ করিয়া বা-তান্‌দের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং ড-হ্লা-চী-র পরিবারে কফি-পানের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ইহার বিনিময়ে সে প্রতিদিনই এক বার করিয়া তাহার গাড়ীতে বেড়াইয়া আসিবার প্রস্তাব করিত। ছেলেমেয়েরা এ প্রস্তাবে সকলেই সোৎসাহে সম্মতি দান করিত, যদিও ড-হ্লা-চী ইহাতে খুশী হইতেন না। কিন্তু পুত্রকন্যার আবদারে তাঁহার পরাজয় হইত। ছেলে-মেয়েরা এক একখানি গামছা ও লৌঙ্গী হাতে প্রস্তুত হইয়া বলিত, "কো-সেইন্, চল, বাবু রমণলালের বাগানে, একটু সাঁতার দিয়ে আসি।" মাউঙ্-বা-তানের সাঁতারে খুব ঝোঁক ছিল। সে যে কত রকম-বেরকমে "ডাইভ" দিতে পারে, তাহার নমুনা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইত। বিশেষ ভাবে মেমদের স্কুলের ফিরিঙ্গী মেয়ের দল, যারা সবে সাঁতার শিখিতেছে, তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবার জন্যই সে বেশী উৎসাহিত ছিল। মা-মা-জী কিন্তু মেয়েগুলির লজ্জাহীনতায় বড়ই সঙ্কুচিত ও বিরক্ত হইত। বাগানে পৌঁছিয়াই সে বলিত, "আমি তোমাদের সাঁতারের বাহাদুরি দেখ্‌তে চাই নে, তার চেয়ে ঐ পাহাড়ের গায়ে যে মস্ত গাছটায় একটা দোলনা আছে, ওখানে আমি দুল্‌ব, তোমাদের স্নান হ'লে আমায় ডেকো।"

মাউঙ্ সেইন্ পড়িত উভয়সঙ্কটে, মাউঙ্-বা-তান ও তার ছোট ভাইবোনদের সাঁতার দেওয়া না দেখিলেও তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, আমার মা-মা-জীকে একা থাকিতে দিতেও তাহার মন সরে না।

সে কোনদিনই স্নান করিতে চাহিত না, কোট-প্যাণ্ট, টাই পরিয়া পুরাদস্তুর সাহেব সাজিয়াই আসিত এবং মা-মা-জীকে পিছন হইতে তাহার অগোচরে একটি দোলা দিয়া তাহাকে চম্‌কাইয়া দিতেই তাহার বেশী আমোদ লাগিত। বেশী জোরে দোল দিলে মা-মা-জী ভয় পাইয়া কাতর নয়নে যখন তাহার দিকে চহিয়া বলিত "কো-সেইন্, লক্ষ্মীটি, থামাও, আমার মাথা ঘুরছে" তখন মাউঙ্ সেইন্ দোলনার শিকল ধরিয়া ধীরে ধীরে থামাইয়া তাহার মাথাটা নিজের বুকে ঠেকাইয়া বলিত, "এইখানে মাথা রাখ্‌লে সব কষ্ট সেরে যায় না?"

মা-মা-জী কেমন যেন একটু ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি দোল্‌না হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিত, "না, কো-সেইন, তোমরা শীঘ্র বাড়ী ফিরে চল, মা রাগ করছেন নিশ্চয়।" মাউঙ্ সেইন্ বলিত, "মা রাগ করবেন কেন ভাব্‌ছ? মা আমাকে 'তা' (ছেলে) বলেন, তা জান তুমি? আমি যদি আজই তাঁর কাছে তোমাকে চাই, তিনি খুশী হয়েই দেন, ঠিক্ বলতে পারি।"

মা-মা-জী রাগ প্রকাশ করিয়া বলিত, "অসভ্যের মতন যা-তা ব'লো না, বল্‌ছি। মা এসব কথা শুনলে আর কোনদিন তোমার সঙ্গে আসতে দেবেন না।"

মাউঙ্ সেইন্ তাহাকে আরও ক্ষেপাইয়া বলিত, "বেশ তো তাহ'লে আজ আর ঘরে না ফির্‌লে কেমন হয়? কয়েক দিন না-হয় বাগানের মালিকের অনুমতি নিয়ে একটা ছোট বাংলো রিজার্ভ ক'রে তোমাকে নিয়ে হনি-মুন্ করি, শহরে রটে যাক্ 'মাউঙ্-সেইন্—মা-মা-জী নিরুদ্দেশ।' তার পর ফিরে গিয়ে বিবাহ-উৎসবটা জাঁকিয়ে করা যাবে। তোমাদের বিয়ে তো এই ভাবেই হয়? আমাদের দেশেও এ রকম গন্ধর্ব্ব-বিয়ে প্রচলিত ছিল এক সময়। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, তোমার মত পেলেই নিশ্চিন্ত।"

মা-মা-জী ভীতকণ্ঠে বলিত, "না, কো-সেইন্, তুমি এসব ব'লো না আমাকে, আমি টের পেয়েছি, আমার মা 'কালার' (বিদেশী ভারতীয়) সঙ্গে কখনও আমার বিয়ে দেবেন না। আমার মা বড় দুঃখিনী, মায়ের জীবনের ইতিহাস বড় করুণ। আমার যেদিন 'না-তুইন্-মিংগালা' হ'ল, তার আগের দিন রাত্রে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে মা আমাকে তাঁর ছোটবেলার কথা কত বললেন আর সাবধান করলেন—'এখন বড় হয়েছিস্, না ভেবে চিন্তে

কারও হাত ধরিস্ নে।" বলিতে বলিতে মা-মা-জীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। মাউঙ্ সেইন তখন তার হাত ধরিয়া বলিত, "দূর পাগলী, কাঁদছিস্ কেন? আমি যা ঠাট্টা ক'রে বলি, সব সত্যি মনে ক'রে বসে থাকিস বুঝি? আমিই বুঝি বর্ম্মিণী বিয়ে করব? আমার মায়ের জীবনও বড় দুঃখের, তিনিও আমাকে আর আমার বড় ভাইকে মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন 'বাবা, তোরা বর্ম্মা দেশে যাস্ নে কোনদিন, দেশে যদি খেতে নাও পাস, তবু যাস নে।'"

মা-মা-জী উৎসুক দৃষ্টিতে মাউঙ্ সেইনের দিকে চাহিয়া বলিত, "কেন, কেন, কি জন্যে বল না কো-সেইন্? মাউঙ্ সেইন্ কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিত, "দেখ্ দেখ, ঐ সাহেবটা কত উঁচু ডাইভিং-বোর্ড থেকে ডিগ্‌বাজী খেয়ে জলে পড়্‌ল!"

তার পরে দু-জনেই ডুব-দেওয়া ও সাঁতার-কাটা দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব আলোচনা ভুলিয়া যাইত। এমনি করিয়া হাসি-খেলার ভিতর দিয়া কখন যে অজ্ঞাতসারে এই দুটি তরুণ-তরুণীর প্রাণ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল, তাহারা নিজেরাও অনুভব করিতে পারিল না।

ড-হ্লা-চী বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ রমণী। নূতন উকীলটি তাঁহাকে অতি অল্প পারিশ্রমিকে, কখনও বা সম্পূর্ণ বিনা-পারিশ্রমিকে অনেক কাজ করিয়া দিয়াছেন, অনেক লোকসান হইতে বাঁচাইয়াছেন, অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করা চলে না অথচ দিন দিন কন্যার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির নানাবিধ পরিচয় পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতিদিনের অভ্যাগতটির আগমন এখন আর তাহাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ না দিয়া বরং চিন্তিত করিয়াই তুলিতেছে। কন্যার নিকটে নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াও তাহার মনে বিমুখতা আনিতে পারেন না। এদিকে মা-মা-জী যে মা-অন্ত-প্রাণ হইয়াও মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। পুত্র বা-তানও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাহার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিতেও সঙ্কোচ হয়।

ড-হ্লা-চী মেয়েকে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারিলে যেন বাঁচেন।

ড-টিন্-চীর একটি লোঙ্গীর দোকান আছে জে-জো বাজারে (বড় বাজারে); সেখানে যদি সারা দিনটা মেয়েকে বসাইয়া রাখা যায়, তাহার কাজের সাহায্যও হয়, আর বড় বড় ঘরের ছেলেদের চোখেও পড়ে। বন্ধুও সে—মা-মা-জীকে মেয়ের মত ভালবাসে! না-তুইন্-মিংগালার দিন সে নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিল, মেয়েকে সকাল সকাল একটু সাজসজ্জা করাইয়া পাঠাইয়া দিতে তাহার দোকানে, বেচা-কেনা করিতে শিখিবে, তাহার লাভ কিছু হইবে, মেয়েরও হয়ত ভাল বর জুটিয়া যাইবে। তখন ড-হ্লা-চী কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, মেয়ে বড় হইতে-না-হইতেই এমন আপদ আসিয়া জুটিবে?

এই সব নানা চিন্তা ড-হ্লা-চী-র মনকে দিনরাত পীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে এক দিন সকালে উঠিয়াই কন্যাকে ডাকিয়া নিজহস্তে তানাখা ঘষিয়া সুন্দর করিয়া মাখাইতে বসিলেন। পরিপাটি করিয়া কেশ-বিন্যাস করিয়া আলমারি হইতে একখানি মূল্যবান্ রেশমী লোঙ্গী বাহির করিয়া বলিলেন, "এখানা প'রে নে, আর বড় বড় মুক্তোর সেই হীরে-বসানো কণ্ঠীটাও পরিস্, আমার সঙ্গে আজ 'জে-জো'য় যাবি।"

মা-মা-জী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে মায়ের দিকে চাহিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, "অমন ক'রে চাইছিস্ কেন? তোর টিন্-চী মাসীকে অনেক দিন দেখি নি, তোকে এত ভালবাসে, এক বার ঘুরে আসি গিয়ে।"

মা-মা-জী বলিল, "মাসীর সঙ্গে দেখা করতে বাজারে যাবে কেন? সন্ধ্যার পর তার বাড়ী গেলেই হয়।"

ড-হ্লা-চী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তার বাড়ী কি এখানে? অত দূরে যাবার সময় ও পয়সা কোথা আমার?

মা-মা-জী বলিল, "বাজারের ষ্টলে ব'সে গল্প করতে আমার ভাল লাগে না মা, ছেলেগুলো বড় তাকায় আর কত রকম মন্তব্য করে। বিকেলে তো কো-সেইন্ রোজ গাড়ী নিয়ে আসে, তাকে বল্‌লে সে খুশী হয়েই তার গাড়ীতে নিয়ে যাবে আমাদের।"

ড-হ্লা-চী ভাবিলেন, কন্যাকে সাবধান করিয়া দিবার

এই সুযোগ উপস্থিত। বলিলেন, কো-সেইনের সঙ্গে এই বেড়াবার ফল এখন বুঝতে পারছ না, পারবে পরে যখন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, তোর বাপ যেমন ক'রে আমাকে আটটি সন্তানের মা ক'রে অতলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল! তবু তার ধনদৌলত-জমিদারী ছিল, আমায় রাজরাণীর ঐশ্বর্য্যে, হীরে-জহরতে সাজিয়েছিল এক দিন। মদের নেশায়, ঘোড়দৌড়ের বাজীখেলায়, সর্ব্বস্ব খুইয়ে যখন পথের ভিখিরী হ'ল, তখনও এক-একখানি ক'রে গহনা বেচেও কত বৎসর সকলের মুখে এক মুঠো অন্ন জুগিয়েছিলাম। শুধু ওর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েই ওকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু তাও সইল না ওর ধর্ম্মে, ওর আত্মীয়স্বজনের, ওর শাস্ত্রের বিধানের! রোগে শোকে, অকাল-বার্দ্ধক্যে জীর্ণ মানুষটিকে আমার চোখের আড়াল না করলে, আমার স্পর্শ-দোষ হ'তে মুক্ত না করলে নাকি মরলেও তার সদ্গতি হবে না, এই শাস্ত্র-বচন শুনিয়ে তার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরম আত্মীয়রা এসে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় জাহাজে চড়িয়ে তাদের দেশে নিয়ে গেল। দেশের মাটিতে দেহ-রক্ষা করলে বুঝি সারাজীবনের সকল অপরাধের ক্ষয় হবে তার!

"সে-দৃশ্য যেন আজও আমার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে—এক বার শেষ দেখা দেখতেও দেবে না তারা আমায়! ছোট মেয়েটা 'বাবা, বাবা' ক'রে কি কান্না! তাকে কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে জাহাজ-ঘাটে গেলাম, কত ক'রে বাবুদের বললাম, পায়ে ধরলাম, একবার কাছে যেতে দাও! বাবুরা ধমক দিয়ে বল্‌লে 'যা দূর হ, আর মায়া বাড়াস নে, তোর দৃষ্টিতেও পাপ!' হায় ধর্ম্ম, হায় শাস্ত্র!

"জাহাজ সিটি দিয়ে ছাড়ল, পারের থেকে চেঁচিয়ে গলা ফাটাল তোর ছোট বোন্‌টা, 'বাবা গো, বাবা, এস, এস!' তোর বাপ তখন ধুঁকছেন, একটা ক্যাম্প-খাটে শোয়ান খোলা ডেকের উপর, হাতখানা উঁচু ক'রে ইসারায় ব'লে গেলেন, আমি চল্‌লাম—ঐ উর্দ্ধে, ঐ স্বর্গে।

"জানি না, কারা তাকে কোন্ স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। আমি জানি, আমি কোন অপরাধ করি নি, কখনও কোন পাপ করি নি, কখনও সজ্ঞানে তার বা তার কোনও আত্মীয়ের কোন অনিষ্ট করি নি, কখনও তাকেও একটু অমান্য করি নি। তবু এ শাস্তি আমার কেন, কেন? সে তো দেশের মাটিতে মরে বাঁচ্‌ল, আমার মুক্তি কোথায়? কবে হবে, কে বলবে?"

ড-হ্লা-চীর জীবন-কাহিনীর এই পরিচ্ছেদটি সন্তানদের জানা ছিল না।

মা-মা-জী পাথরের মত নিশ্চল স্তব্ধ হইয়া মায়ের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ "মা-গো" বলিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ড-হ্লা-চীও আপন গোপন দুঃখে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সন্তানের প্রাণে যে কতখানি আঘাত বাজিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, সংযমের বাঁধ অগোচরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কন্যার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কাঁদিস্ নে মা, অনেক সয়েছি এত দিন, আজ আর পারলাম না। একটি কথা স্মরণ রাখিস—তোরা ভাবিস, তরুণ বয়সে সকলেই ভাবে বোধ হয়,—বিয়ে ব্যাপারটা কেবল দুটি প্রাণীকে নিয়েই। ভালবাসে দু-জনে দু-জনকেই, সেই ভালবাসাই বিবাহিত জীবনের প্রধান পাথেয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুটি মানুষ যে দুই ভিন্ন পরিবারের। সেই পরিবার, সেই সমাজ, সেই ধর্ম্ম, সেই জাতি যদি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়, তবে সেই বিবাহ কখনও সুখের হয় না। একে অপরকে ঠিক্ আপন করতে পারে না; পরস্পরের রুচি, মত, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার, নিষ্ঠা, পদে পদে তাদের জীবন-পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং ফলে প্রেমের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ, ঘৃণা তাদের অন্তরেরও বিচ্ছেদ ঘটায়। মনের বড় দুঃখেই আজ তোকে এত বড় আঘাত দিলাম। ঐ কো-সেইনের আদরে ভুলিস নে, চল্ মা যাই, বেলা গেল।"

মা-মা-জী বলিল, "না মা, আমি জে-জোয় যাব না, ঐ রকম দোকানে বিবি সেজে ব'সে ছেলেদের মন-ভুলানো আমার দ্বারা হবে না। তুমি আমায় জোর ক'রো না।"

ড-হ্লা-চী আজ আর মেয়ের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। একাই ছোট ছেলে মাউঙ্-তিন-কে সঙ্গে লইয়া বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে নিয়মিত সময়ে মাউঙ্-সেইনের ওপেল গাড়ীখানি নিঃশব্দে ড-হ্লা-চী'র গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। পরিচিত হর্ণের আওয়াজে মা-মা-জী যেন ভীত চকিত হরিণীর মত গৃহের কোণে কোথাও গুপ্ত আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। আজ আর সে স্বাভাবিক মনে কো-সেইনের সঙ্গে গল্প করিতে বা কাছে বসিয়া কফি পরিবেশন করিতে পারিবে না। মা-মা-জীর কনিষ্ঠা ভগিনী মা-পু দৌড়াইয়া বাহিরে আসিয়া, চীৎকার করিয়া হাততালি দিয়া বলিল, "কো-সেইন লা-বি, কো-সেইন্ লা-বি" (সেইন্-দাদা এসেছে)। বাড়ীর অন্য ছেলে-মেয়েরাও বাহির হইয়া কেহ হর্ণ টিপিয়া, কেহ মাউঙ্-সেইনের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া, কেহ তাহার কাঁধ ধরিয়া ঝুলিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মাউঙ্-সেইন্ কাহাকেও একটা চকোলেট দিয়া, কাহাকেও একটা আপেল দিয়া, কাহাকেও বা একটা হুইস্‌ল্ বাজাইয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। মাউঙ্-বা-তান্ তখনও মোটরের সম্মুখের সীটে বসিয়া আছে, ভাইবোনদের কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোরা ভালমানুষকে পাগল ক'রে ছাড়বি যে! মা-মা-জীকে বল্ শিগ্‌গির পোষাক ক'রে নিক্, আজ একটা পাহাড়ে যাবার প্ল্যান আছে আমাদের, যা দেরি করিস নে।"

ভাইয়ের গলা শুনিয়া মা-মা-জীর সঙ্কোচ খানিকটা কাটিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতেই বলিয়া উঠিল, "সারাদিন পরের গাড়ী চ'ড়ে বেড়িয়ে বেড়ান হচ্ছে, যেন ঘরে আর কাজকর্ম্ম নেই। নেমে এস গাড়ী থেকে, ষ্টিয়ারীং হুইল ধ'রে বড্ড যে ষ্টাইল ক'রে বসে আছ, যেন নিজেরই গাড়ীখানা, আর কত যেন চালাতে জান।"

বা-তান্ উত্তর করিল, "বেশ তো, তোমার কি তাতে? আমার বন্ধুর গাড়ীতে আমি চড়ে বেড়াচ্ছি, আর চালাতে জানি কিনা, একবার চড়েই দেখ না। নিজেও তো কম বেড়াও না, আমাকে খোঁচা দিচ্ছ কেবল! সাজতে তো তিন ঘণ্টা লাগবে তোমার, সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্যাস্তের একটা ছবি নিতে পারব না। শিগ্‌গির ক'রে নাও, উপদেশের ঘটা এখন থামাও।"

মাউঙ্-সেইন্ বা-তানকে ধমক দিয়া বলিল, "আঃ কি করছ বা-তান্? বোনকে ক্ষেপাচ্ছ কেন? তুমি নেমে এস না, ঘরে গিয়ে দেখ ওরা কেউ যাবে কিনা আজ বেড়াতে। তোমার মা যেন ঘরে নেই মনে হচ্ছে, নইলে এতক্ষণ তাঁকে এক বার দেখা যেত।"

মাউঙ্-বা-তান গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া মা-মা-জীর উদ্দেশে বলিল, "মানুষ বাড়ী এলে তাকে অভ্যর্থনা করতেও ভুলে গিয়েছ নাকি? কো-সেইন্ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একটু ডাকছও না ভিতরে, কফি তৈরি রেখেছ?" মাউঙ্-বা-তান্ গৃহের এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ঘুরিয়াও মা-মা-জীর সন্ধান পাইল না। রান্না-ঘরের দিকে গিয়া দেখিল, সে ঘরও তালাবন্ধ। ছোট ভাইবোনদের জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়, মা-মা-জীই বা কোথায়?" এক জন উত্তর করিল, "মা তো আজ সারাদিনই বাড়ী নেই। সকাল বেলা মাউঙ্-তিনকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় জানি গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেন নি। দিদি তো ঘরেই আছে, কোথাও লুকিয়েছে বুঝি?"

মাউঙ্-সেইন্ মা-পুর হাত ধরিয়া বাড়ীর চার পাশের ফুলের বাগান দেখিয়া বেড়াইতেছিল, কুয়ার পাড়ে শান-বাঁধানো একটি সিঁড়ির ধাপে মা-মা-জীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ কি, এখুনি তোমার গলা শুনলাম ঘরের ভিতর, দাদাকে খুব বকুনি দিচ্ছিলে, এরই মধ্যে এখানে! তুমি বুঝি হাওয়ায় উড়তে জান?"

মা-মা-জী কোন জবাব না দিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। মাউঙ্-সেইন্ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "মা-মা-জী, তোমার কি হয়েছে? আমার সঙ্গে কথা কইছ না যে!"

মা-মা-জী গম্ভীর হইয়া বলিল, "কো-সেইন্, তুমি আর আমাদের বাড়ী এস না। মা তোমায় চান না, বড় রাগ করেন তোমার সঙ্গে আমরা বেড়াতে যাই ব'লে। আমি বেড়াতে যাব না আর, তুমি শিগ্‌গির চলে যাও, মা আজ

রাগ ক'রে বোধ হয় ঘরেই ফেরেন নি, তাঁর বন্ধুর বাড়ী গিয়েছেন।"

মাউঙ্-সেইন্ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তার গলার স্বরও যেন কে কাড়িয়া লইল, কি বলিতে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিল না, মা-পু-র হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল এবং পর-মুহূর্ত্তেই গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল, গাড়ীও অদৃশ্য হইল।

মাউঙ্-বা-তান্ মাউঙ্-সেইন্‌কে অকস্মাৎ এই ভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভাইবোনদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তারা কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মা-পু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "দিদি কো-সেইন্‌কে বড্ড বকেছে, তাই কো-সেইন্ চলে গেল। আমাদের বেড়ানো হ'ল না।"

বা-তান্ ছুটিয়া মা-মা-জীর নিকট গিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "হয়েছে কি তোমার? শুধু শুধু একটা মানুষকে অপমান করলে কেন? এক জন ভদ্রলোক নিজে যেচে বন্ধুত্ব করল, কত সাহায্য করছে আমাদের পরিবারকে, তাকে কি বললে তুমি? শীগ্‌গির বল।"

মা-মা-জী কাঁদিয়া ফেলিল, বার-বার প্রশ্নের পরও কোন জবাব দিতে পারিল না। শেষে সংক্ষেপে বলিল, "কো-বা-তান্, তুমি জান না মায়ের কষ্টের কথা! মা এক জন 'কালা'র কাছে বড় আঘাত পেয়েছেন, আর কোন 'কালা'কে বিশ্বাস করতে পারেন না। কো-সেইন্‌কে মা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না, তাই আমি তাঁকে বারণ ক'রে দিলাম আর যেন আমাদের ঘরে না আসেন।"

বা-তান্ যেন আকাশ হইতে পড়িল। মাউঙ্-সেইন্ যে এক জন 'কালা', সে-কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহাকে সে নিজের বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিত, বন্ধুর মত ভালবাসিত। মায়ের উপর তাহার বিষম রাগ হইল। সে বলিল, "দেখ, মা-মা-জী, তুমি এই ভাবে তাকে বিদায় ক'রে বড় অন্যায় করেছ। আমি জানি, সে তোমায় ভালবাসে, তার বড় সাধ সে তোমায় বিয়ে ক'রে সুখী হবে। মা যদি এ কাজে বাদ সাধেন, তবে মায়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটবে দেখছি। মা বুড়ো হয়েছেন, মনও বড় সঙ্কীর্ণ হয়েছে দেখছি। কো-সেইন্ নামেই 'কালা', সে বর্ম্মী পোষাক, ভাষা, নাম সবই গ্রহণ করেছে, বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে সম্পূর্ণ বর্ম্মী হবারই তার ইচ্ছা। এদেশে জমি কিনেছে, বাড়ী করেছে, আর বাকী কি? মা নেই, বাপ নেই, দেশের সঙ্গে নাকি তার কোন সম্পর্কও নেই, তবু তাকে 'কালা' 'কালা' ক'রে ভয় করবার, তুচ্ছ করবার কারণ কি?"

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে মায়ের গলার স্বর শুনিয়া বা-তান্ চুপ করিয়া গেল। মা-মা-জীও ইসারায় বা-তান্‌কে এসব কথা মায়ের সম্মুখে বলিতে বারণ করিল।

ড-হ্লা-চী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি রে, কুয়োর পাড়ে ব'সে সন্ধ্যেবেলা কি হচ্ছে? ঘরে বাতিটাও জ্বালতে পারিস নি? ফায়ার সামনের বাতিটাও দিতে নেই মনে ক'রে? মা-টিন্-চী কিছুতেই ছাড়ল না, বললে বড় ছেলেমেয়ে আছে ঘরে, এক দিন না-হয় তারাই সংসার চালাবে। তা কি আর আমার কপালে আছে? ভাইবোনগুলো বিকেলে একটু কফিও পায় নি বোধ হয়? দু-জনে ব'সে গল্পই করছ বুঝি সারা বিকেলটা? তোমাদের কো-সেইন্ এসেও জুটেছিল বুঝি?" শেষ কথার জবাব না দিয়া মা-মা-জী শুধু বলিল, "রান্নাঘরের চাবিটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছ, খাবার পাব কোথা যে সকলকে দেব? আমার কাছে দু-আনা পয়সা ছিল, কফি আর রুটি কিনে ওদের দিয়েছি একটু একটু, আর কি করব?"

ড-হ্লা-চী নিজের ভুল ও অবিবেচনায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

মা চলিয়া গেলে বা-তান্ চুপি চুপি বলিল, "মা-মা-জী, কালকে সকালে চল আমরা হেঁটে ঐ সামনের ফায়ায় বেড়াতে যাই। ঐ ফায়ার পাহাড়ে কো-সেইন্ রোজ ভোরে বেড়াতে যায়, ওখানে ওর সঙ্গে দেখা ক'রে তুমি ক্ষমা চাও, তার পর যা হয় ক'রো। আমার বড় লজ্জা হচ্ছে, এ রকম ব্যবহার করা তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে, বুঝেছ বোধ হয়?"

মা-মা-জী বলিল, "আচ্ছা, সেই ভাল পরামর্শ, তাকে একটু বুঝিয়ে বলা আমার উচিত ছিল। আমি তাকে বিয়ে কিন্তু করব না, এ-কথা তুমি তাকে স্পষ্ট ব'লে দিও।"

শহরের সীমানা ঘিরিয়া যে-পাহাড়ের

গিয়াছে, তাহারই সর্ব্বোচ্চ শিখরে উজিনা ফায়া স্থাপিত। পাহাড়ের বুক চিরিয়া কালো পিচ-ঢালা রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া ফায়ার সোপানশ্রেণীর মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সুতরাং মোটরে ভ্রমণের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় সৌন্দর্য্যপিপাসু এবং স্বাস্থ্যান্বেষী বহু নরনারী মোটরে এবং পদব্রজে এই মন্দিরটিতে এবং পারিপার্শ্বিক মনোরম স্থানটিতে পূজার এবং বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। পাহাড়ের উচ্চতম সমতল স্থানটিতে কয়েকখানি প্রস্তরাসন নির্ম্মিত আছে, উহার উপর বসিয়া সমস্ত শহরটির এবং শহরের অপর সীমান্তবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর-অভিমুখী স্রোতস্বিনীর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

দুই ভাইবোনে যখন দুই-তিন মাইল চড়াই আরোহণ করিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেই শিলাসনে বিশ্রাম করিবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্য পূর্ব্বাকাশের অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে। মা-মা-জী বলিল, "কো-সেইন্‌কে তো রাস্তায় কোথাও দেখলাম না, বৃথাই হাঁটার পরিশ্রম হ'ল। তবে এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে—যেমন সুন্দর হাওয়া, তেমনি চারি দিকের দৃশ্য!"

মাউঙ্‌-বা-তান কিছু জবাব না দিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল। নিকটে কোথাও মোটরের চিহ্ন দেখা গেল না। সে বলিল, "মা-মা-জী, তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি একটু খুঁজে দেখি কো-সেইন্‌কে পাই কি না, সে তো রোজ বেড়াতে আসে ভোরে এখানে।"

কিছু দূরে আরও একটু উঁচু টিলার উপর একটি তুষার-শুভ্র বিরাট্ স্তূপ, তাহার শীর্ষে ছোট ছোট সোনালি বলের সারি, বাতাসে একটির গায়ে আর একটি ঠেকিয়া ঠুন্‌ঠুন্ মিষ্টি আওয়াজ হইতেছে। স্তূপটির পাদমূলে ছোট ছোট কুলুঙ্গীর ভিতর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি। তাহারই নিকটে একটি দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া আছে মাউঙ্‌-সেইন্। মুখে-চোখে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। বা-তান ডাকিল, "কো-সেইন্!"

মাউঙ্‌-সেইন চমকিয়া চাহিয়া বলিল, "হ্যালো বা-তান যে! তুমি এত ভোরে উঠেছ আজ, আবার এত পথ হেঁটে এসেছ? আশ্চর্য্য বটে!"

বা-তান মাউঙ্‌-সেইনের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য একটি নয় মশায়, একেবারে চমক লাগিয়ে দেব, চল না আমার সঙ্গে।"

মা-মা-জী একটা বর্ম্মী ছাতা খুলিয়া সূর্য্যকে আড়াল করিয়া নদীর দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া ছিল, বন্ধু-যুগলের হাসির লহরীতে তাহাকে সজাগ করিয়া দিল।

মাউঙ্‌-সেইন্ প্রস্তাব করিল ফায়ার ভিতরের একটি জায়াতে (অতিথিশালাতে) বসিয়া কথাবার্ত্তা বলা যায়, বাহিরে বড় রোদ, বসিবার মত ছায়া আর কোথাও নাই। মা-মা-জী সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

সে বলিল, "কথা বেশী নয়, ঐ স্তূপের আড়ালে ছায়া আছে, ওখানেই ঘাসের উপর বসা যাবে, চল।"

সেখানে বসিয়াই মা-মা-জী বিনা ভূমিকায় বলিল, "কো-সেইন্, তোমাকে কাল বড় রূঢ় কথা বলেছি, আমায় ক্ষমা কর।"

মাউঙ্‌-সেইন বলিল, "ভালই করেছ, নইলে আমি হয়ত সহজে তোমাদের বাড়ী ছাড়তে পারতাম না।"

বা-তান্ বলিল, "বাঃ! তুমি ওর কথায় আমাদের বাড়ী যাওয়া ছাড়বে কেন? মা তো কিছু বলেন নি তোমায়!"

মাউঙ্‌-সেইন বলিল, "আমি আজ স্পষ্ট কথাই বলব। তোমাদের বাড়ী যেতাম মা-মা-জীকে পাবার আশায়। সে আশা মা-মা-জী ভেঙে দিয়েছে; মা-মা-জী আমাকে চায় না, আমি বুঝেছি। আর আমিও আজ আমার মায়ের শেষ কথাগুলি স্মরণ করছিলাম। মা মারা গেছেন মোটে দু-বছর। আমাকে পালন করেছিলেন মা একাই, বাবা বেঁচে থেকেও আমার প্রতি তাঁর কোন কর্ত্তব্য করেন নি। বর্ম্মা দেশে এসে এদেশী পত্নী গ্রহণ ক'রে, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছিলেন, আমার মায়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আর রাখেন নি। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নাকি সারা-জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। আমার এক মামা রেঙ্গুনে প্রতিপত্তিশালী ডাক্তার ছিলেন, তাঁর যত্নে আমি লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়েছি। কলেজের ছুটির সময় আমি আমার চিরদুঃখিনী মায়ের

কাছে যেতাম, তিনি আমাকে দেশে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্ম্মার আকর্ষণ আমাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, আমি কিছুতেই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি নি।

"ওকালতি পাশ করবার পূর্ব্বেই আমার বাবার মৃত্যু হয়, তখন আমার বিধবা মা আমাকে পুনঃপুনঃ সতর্ক ক'রে দেন, যেন কখনও বর্ম্মা দেশের মেয়ে বিয়ে না করি। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম শেষ দিন, তাঁর অন্তিমশয্যায়। কাল মা-মা-জীর রুক্ষ তাড়নায় আমার অন্তরের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। এই দেখ আমার মায়ের ছবি, আমার জন্ম-দুঃখিনী জননী, তিনি স্বর্গ হ'তে কত অশ্রু না জানি বিসর্জ্জন করেছেন, ছবিতেও যেন তাঁর চোখ দুটি সজল দেখছি।" বলিতে বলিতে মাউঙ্-সেইনের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

মা-মা-জী মাউঙ্-সেইনের হাত হইতে ফোটোখানি লইয়া বলিল, "কি সুন্দর দেখতে ছিলেন তিনি! কি করুণ চাহনি! কো-সেইন্, চোখ দুটি ঠিক তোমার মত, নয়? কি সুন্দর!"

মাউঙ্-সেইন হাসিয়া বলিল, "আর কেন ওকথা বল্‌ছ, মা-মা-জী? আমার দৃষ্টি কি তোমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করছে না এখন?"

মা-মা-জী মাউঙ্-সেইনের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমাকে ভাল না বেসে আমি বাঁচব না—আবার মাকেও যে ছাড়তে পারি নে, কি করব আমি?"—বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মাউঙ্-বা-তান বলিল, "আঃ কি যে করিস তুই, মা-মা-জী!"

"আচ্ছা, কো-সেইন, তোমার বাবার নাম কি ছিল? তাঁর কোন ফোটো নেই তোমার কাছে?"

মাউঙ্-সেইন একটা সোনার হার হইতে একটি লকেটের বোতাম টিপিয়া একটি মুখ বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "এটা মায়ের চেন ছিল, মা আমাকে দিয়েছিলেন এই ছবির একখানা এনলার্জমেণ্ট করিয়ে দেবার জন্যে। আমি এত দিন অগ্রাহ্য ক'রে করি নি, আজ মায়ের কথা মনে পড়াতে এইটাও পকেটে নিয়েছি ফোটোগ্রাফারের কাছে দেব ব'লে, কিন্তু মা আর দেখবেন না।"

বা-তান্ ও মা-মা-জী লকেটটি আগ্রহে হাতে লইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল এবং বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল!

মাউঙ্-সেইন্ তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, "এ ছবি তাঁর তরুণ বয়সের, বর্ম্মায় এসেই তুলে মাকে পাঠিয়েছিলেন।"

মা-মা-জী একটা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া ঘাসের উপর গড়াইয়া পড়িল।

মাউঙ্-বা-তান্ ব্যস্ত হইয়া মা-মা-জীকে ধরিতে ধরিতে বলিল, "কো-সেইন, তোমার বাবার নাম কি, শীগ্‌গির বল।"

মাউঙ্-সেইন মা-মা-জীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া রুমাল দিয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কেন, বা-তান কি হ'ল তোমাদের? আমার বাবার নাম ছিল—সুধীন্দ্রলাল সেন, বর্ম্মায় তিনি এস্. এল্. সেইন্ নামে পরিচিত ছিলেন।

"মা-মা-জী, তুমি হঠাৎ এ রকম অসুস্থ হ'লে কেন? তোমরা একটু ব'স, আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ীটা নিয়ে আসি, একটু দূরে নীচে ছায়ায় রেখে এসেছি।"

বা-তান্ বলিল, "কো-সেইন, আমার বাবার নামও ছিল, এস্. এল. সেইন, এই ফোটোরই একখানা এনলার্জমেণ্ট মায়ের শোবার ঘরে আছে। নিয়তির কি ক্রূর পরিহাস!"

হিন্দী, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব

হিন্দী তুলসীদাস-সুরদাসের ভাষা; বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, পরবতিয়া (নেপালী), গুজরাতী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, ও সিন্ধীর ভগ্নী এবং গৌড়ীয় ভাষার অন্তর্গত।

উর্দ্দু হিন্দীর আরবী-ফারসী-মিশ্রিত রূপ; উহার জন্ম মোগল সম্রাট্‌দের সময়; উহার ব্যাকরণ হিন্দীর অনুরূপ; ক্রিয়াপদগুলি সবই হিন্দী, কোন প্রভেদ নাই। অতএব উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা চলে না, যতই ফারসী-আরবীর সংমিশ্রণ হউক না কেন। যে পর্য্যন্ত ক্রিয়াপদগুলি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, উহাকে হিন্দীর "মুসলিম" সংস্করণ বলিতে হইবে। ইংরেজীতে কত ভাষার কথাই না ঢুকিয়াছে, কিন্তু ইংরেজী তাহার ইংরেজীত্ব হারায় নাই।

উত্তর-পশ্চিমের লোকদের বিদেশীদের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য উহার উৎপত্তি—যেমন হংকঙে পিজিন ইংলিশ, (Pidgin English), গুজরাতে পার্সিক গুজরাতীর উদ্ভব; লীভাণ্টে (ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকূলস্থ দেশে) গ্রীক-তুর্কি ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা, ও ইউরোপের ইহুদীদের য়িড্ডিশ (Yiddish)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য ভাগে (১৮৪০ ?) যখন ফারসী আদালতের ভাষার পদ হইতে বিচ্যুত হয়, উর্দ্দু তাহার শূন্য স্থান অধিকার করিল ও সেই সময় হইতে উহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আইন-আদালত সম্পর্কিত সমাজের ভাষা হইল। হিন্দী অস্পৃশ্যা হইয়া রহিলেন। সুরদাস, তুলসীদাস বেনে-বক্কালের দোকানে, দরবানজীর কুঠারীতে ও নিরক্ষর গ্রামের নিভৃত কোণে শুধু দেবনাগরী-অক্ষর পরিচিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে আশ্রয় পাইলেন। সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিত-সমাজ উহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; উহার ধার দিয়াও যাইতেন না। হিন্দী পল্লীবাসী ও শহরের অমার্জ্জিতরুচি লোকদের ও নিম্ন শ্রেণীর ভাষা হইয়া রহিল। রাজরাণী বাঁদী হইল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল কয়েক জন হিন্দী-প্রেমিক হিন্দী প্রচারের জন্য কাশীতে "নাগরী প্রচারিণী সভা" স্থাপিত করিলেন। ইহার আরও কিছুকাল পূর্ব্বে কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্র হিন্দী কাব্য ও নাটক লিখিয়া মুষ্টিমেয় হিন্দী-প্রেমিকদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে ও পরে অনেক শিক্ষিত লোকও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই।

১৮৮০ সালে হিন্দীতে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "কাশী পত্রিকা" বোধ হয় পাক্ষিক ছিল, পরে মাসিক হয়। হল্কাবন্দী স্কুলের শিক্ষকদের ও গ্রাম্য পাঠশালার গুরু-মহাশয়দের জন্য শিক্ষা-বিভাগ উহাকে বহুদিন জিয়াইয়া রাখিয়াছিল। উর্দ্দুতে মুন্সী নবলকিশোর লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহার দৈনিক "অবধ অখবার" বাহির করিতেন; উহা কেবল "পাইওনিয়ার" ও "ষ্টেট্‌সম্যান" ইত্যাদির তর্জ্জমা। সরকার তাহার তিন শত খণ্ড ক্রয় করিয়া স্কুল ও আপিসে বিতরণ করিতেন। সাপ্তাহিকের মধ্যে "নসীম আগ্রা" মুন্সী যমুনাদাস সরকার নামক এক জন বাঙালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার উর্দ্দু ভাষার জ্ঞানের জন্য লোকে তাঁহাকে "মুন্সী" বলিত। "অলীগঢ় গেজেট", সইয়দ অহমদ সাহেবের কলেজের মুখপত্র, আধা-ইংরেজী, আধা-উর্দ্দু সাপ্তাহিকের জীবন-মরণ সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। মাসিকের কেবল একটি প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিত। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভটের* "হিন্দী প্রদীপ" হিন্দীর মুখ রক্ষা করিয়াছিল। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া বহু দিন উহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন,

* অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেবের মত আমি বহু বৎসর এলাহাবাদে এই তেজস্বী নির্লোভ দেশভক্ত অধ্যাপকের সহকর্ম্মী ছিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।

কিন্তু হিন্দী পাঠকের অভাবে ও অবহেলায় "প্রদীপ" নিবিয়া গেল। এখন উহা আমাদের "বঙ্গদর্শনে"র মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর অমর কীর্ত্তির পুনর্মুদ্রণ হইতেছে, কিন্তু "হিন্দী প্রদীপে"র সে সৌভাগ্য এখনও হয় নাই, হইবার আশাও নাই, যদিও উহা হইতে দুই-একটা প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। "সরস্বতী", যাহা প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠতায়, চিত্রাদির সৌন্দর্য্যে ও মুদ্রাঙ্কনের উৎকর্ষে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাসিক-গুলির সমকক্ষ, বহু পরে প্রকাশিত হয়। উহা বাঙালীর দান। *

যুক্তপ্রদেশের আর্য্যসমাজ ১৮৮০ সালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে হিন্দী প্রচলনের জন্য চেষ্টিত ছিল, যদিও সে সময়ে উহা পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজ দ্বারা প্রভাবান্বিত, ও উহার ভজন গান ও প্রচার-কার্য্য সবই উর্দ্দুতে হইত। কিন্তু ক্রমশঃ উহা এ প্রভাব কাটাইয়া উঠিল এবং পাঞ্জাব-সমাজও ক্রমশঃ হিন্দীর পক্ষপাতী হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় মালবীয়জী ১৮৯৬-৯৭ সালে আদালতে হিন্দী প্রচলনের জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক আবেদন যুক্তপ্রদেশের সরকারের নিকট পেশ করেন। উহার ফলে সমন ইত্যাদিতে হিন্দী উর্দ্দুর পার্শ্বে স্থান পাইল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা আদালতের ভাষা হইল না; নথীপত্রে উহার দর্শন মিলিল না। যদিও শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী হিন্দু ও শতকরা ৮০ জন উর্দ্দু জানে না। উর্দ্দু আদালতের ও আদালত-সম্পর্কিত ভদ্রলোকদের ভাষা হওয়াতে ও উহা দ্বারা চাকুরী মিলিবে, এই আশায় শতকরা নব্বইটি ছেলে ফারসী পড়িত। শহরে হিন্দী পড়িবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিতরা দুই ছত্র বিশুদ্ধ হিন্দী লিখিতে পারিতেন না; হিন্দী শিক্ষা দিবার যোগ্যতাও তাঁহাদের ছিল না। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও বাঙালীর ছেলেরা স্কুল-কলেজে সংস্কৃতের অশ্রু মোচন করিত। আমাদের এক জন সুপরিচিত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ 'লালা' ভদ্রলোক গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বদাব্যবহার্য্য পুস্তকের এক কোণে ফারসী অক্ষরে উহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবনাগরী অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত তাঁহার জানা ছিল না। হিন্দী গ্রাম্য স্কুলে ও ভইয়াজীর (গুরুমহাশয়ের) পাঠশালায় পড়ান হইত। সেখানে নিম্নশ্রেণীর ও বেনে-বক্কালের ছেলেরা পড়িত। শহুরে ভদ্রলোকের ছেলেদের উহার সহিত পরিচয় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুলে হিন্দী সেদিন প্রবেশাধিকার পাইয়াছে ও তাহাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখাদেখি। এত দিন সে কালামুখী হইয়াই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের হিন্দী-উর্দ্দুর ইতিহাস জানিবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় গারস্যাঁ দ্য তাসীর (Garcin de Tassy, 1794-1878) ষাণ্মাসিক বিবৃতি। তাসী পারীতে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের উর্দ্দু-হিন্দীর নব প্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিবরণ, ও দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আলীগড় ইত্যাদির সাহিত্য-সভাগুলির কার্য্যাবলীর সকল সংবাদই তিনি রাখিতেন। এলাহাবাদের মুন্সী রামপ্রসাদ * উর্দ্দুর উন্নতির জন্য কি করিতেছেন, বা আলীগড়ের সইয়দ সাহেবের কোন্ নূতন রচনা প্রকাশিত হইল, তাঁহার নিভৃত পাঠকক্ষ হইতে সে তথ্য সংগ্রহ করিতেন। হিন্দীকে সেকালে 'হিন্দুই' বলা হইত, তিনিও উহাকে সেই নামে অভিহিত করিতেন। উর্দ্দুকে 'হিন্দুস্থানী' বলিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যতই

* পেশাবর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের জন্য, হিন্দীর উন্নতির জন্য, বিহার ও উত্তর-পশ্চিমের সংস্কৃতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য, বাঙালীরা যাহা করিয়াছে, সে ইতিহাস লিখিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যে এপ্রদেশে কেবল উড়ে এসে জুড়ে বসি নাই (interlopers নহি), কিন্তু বহু বিষয়ে পথ-প্রদর্শক, ইহা দেখানো আবশ্যক হইয়াছে।

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, ও বিহারের প্রত্যেক নগরের পুরাতন অধিবাসীরা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া "প্রবাসী"-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মালমসলা পাঠান, তাহা হইলে এই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু যদি এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত করেন, তবে সুবিধা হয়।

* এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও পরে "কায়স্থ পাঠশালা"র প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ফারসী-আরবী মিশ্রিত হউক না কেন উহা স্বতন্ত্র ভাষা নহে। সে সময়ে উর্দ্দু-হিন্দীর স্রোতস্বতী অতি ক্ষীণ ভাবেই বহিত। উর্দ্দু ছিল রাজপ্রিয়া, কারণ উহা আদালতের ভাষা; দুয়োরাণী হিন্দীর কোন উচ্চ আশা ছিল না, জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকারে মুখ লুকাইয়া সে জীবন যাপন করিতেছিল।

জাতীয়তার উত্থানের সহিত সব বদলাইয়া গেল। হিন্দী তাহার হৃত পদমর্য্যাদা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইল। স্কুলকলেজে ছেলেরা দলে দলে হিন্দী সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিল। হিন্দী হইতে আরবী-ফারসী কথার বহিষ্কার আরম্ভ হইল। এখন অধিকাংশ হিন্দু ছেলে আর ফারসী পড়ে না, ফারসী অক্ষরের সহিতও পরিচয় রহিত। স্কুলে ভাষার একটা দ্বিতীয় রূপ (second form) পড়ান হয়। কিন্তু সেটা বাজে। হিন্দু ছেলেরা উর্দ্দু শিখে না, মুসলমান ছেলেদের হিন্দীর সহিত কোন পরিচয় হয় না। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের হিন্দী উর্দ্দু দুইয়েতে পাস করিতে হয়, কারণ উহাদের দুটিই জানা দরকার।

কিন্তু এ বহিষ্কার-নীতির ফলে হিন্দী অবোধ্য না হইয়া জনসাধারণের সহজবোধ্য হইল। কারণ উহা দেশের মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিতেছে, সংস্কৃত হইতেই তাহার পুষ্টির উপাদান লইতেছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানেরা বিপদ বুঝিয়া উজান বহিতে আরম্ভ করিলেন, যেহেতু অধিকাংশ মুসলমানের নিকট জাতীয়তার অর্থ বিজাতীয়তা। এই অবসরে উহারা উর্দ্দুকে আরবী-ফারসীর পেঁয়াজ-রসুন দিয়া এরূপ অদ্ভুত পোলাও পাকাইলেন যে, উহা জনসাধারণের পক্ষে একেবারে অখাদ্য, ও হিন্দু ভদ্রসমাজের পক্ষেও— যাহারা আর উর্দ্দু-ফারসী পড়ে না।*

নব্য তুর্কী ও ইরানীরা তাহাদের ভাষাকে আরবীর করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জাতীয় ভাষাকে বিজাতীয় সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অবিরাম প্রযত্ন চলিতেছে। তাহাদের রাষ্ট্র পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সচেষ্ট। আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের উর্দ্দুকে ফারসী বলিলেও চলে, ক্রিয়াপদগুলিই যত বিপদ হইয়াছে।

কবি মহম্মদ ইকবালের* পিতা বা পিতামহ কাশ্মীরী হিন্দু ছিলেন (শুনিয়াছি তাঁহারা সপ্রু-বংশীয়)। ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন বংশধরের এরূপ মানসিক বিকার উপস্থিত করিল যে, "সব জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা" (আমার হিন্দুস্থান সকল দেশের সেরা) ও "খাকে বতন কা মুঝকো হর জর্‌রা দেবতা হয়" (জন্মভূমির প্রত্যেক ধূলি-কণা আমার দেবতা) লিখিবার পর তিনি "পকিস্তানে"র, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান ভারতে দ্বিখণ্ডিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার উর্দ্দু কবিতা তাঁহার দেশপ্রেমের মতই সাধারণের অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শেলীর "Cloud" এর অনুকরণে যে কবিতা তিনি লিখিয়াছেন, পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহার দুই ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,

"সবজয়ে মজার নবখেজ কী উমদে হুঁ ময়ঁ
জাদয়ে বহর হুঁ, পরবরদয়ে খুরশীদে হুঁ ময়ঁ।"
(আমি প্রান্তরের নব অঙ্কুরিত শ্যামশ্রীর আশা
সিন্ধুতে জনম মম,
পালিয়াছে আমারে তপন)।

আর অধিক নহে এই দুইটি পদে "হুঁ" (আছি, হই) ও "ময়ঁ" (আমি)† কেবল হিন্দী, আর সব আরবী বা ফারসী, এইরূপ সমস্ত কবিতাটি।

ইকবাল পরে ফারসীতেই কবিতা লিখিতেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। উহা বিকৃত মুসলিম

* সম্প্রতি এলাহাবাদের "বণিকসমিতি" স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটীকে উর্দ্দুতে রসীদ ইত্যাদি দেওয়া তুলিয়া দিতে বলিয়াছেন, কারণ তাঁহারা উর্দ্দু জানেন না। ইঁহারা সকলে অবশ্যই ভদ্রসমাজের লোক।

* একালের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উর্দ্দু কবি। তাঁহাকে স্তাবকরা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বলে।

† হিন্দী বর্ণমালার উচ্চারণে এই দুই চরণ পড়িলে যথা-যোগ্য উচ্চারণ হইবে।

মানসপ্রকৃতির একটা উদাহরণ মাত্র। জানিতে ইচ্ছা হয়, ইরানীরা তাহার ফারসী কবিতা পড়িয়া কি মনে করিত। নব ইরানী ও পুরাতন ফারসীতে (যাহা আমাদের ভারতে প্রচলিত) অনেক প্রভেদ—ভাষায়, ভাবে, ব্যাকরণে। কোন ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। মাইকেল, তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডুর ইংরেজী কবিতা ইংরেজের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, দূর হইতে ইংরেজের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু ইংরেজী কাব্যজগতে তাঁহাদের স্থান কোথায়?

হালের উর্দ্দ গদ্যেরও ঐ অবস্থা। আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারের এক পত্র হইতে সামান্য নমুনা দিলাম;

"কাংগ্রেসী হুকুমতে অহদ মেঁ মুসলমানোঁ পর কিসী জগহ কোঈ নঈ পাবন্দী নহীঁ আয়দ কি গঈ হয়। বল্কী বাজ মৱকোঁ পর জো পাবন্দিয়াঁ পহলে সে আয়দ থী রুহ ঈঁ হটা দী গভী। আলবত্তা বরঅক্স ইসকে কঈ মুকামাত জরূর অয়সে মিলেঁগে জহাঁ মৱজুদা হুকুমত নে হিন্দুওঁ কো মন্দিরোঁ মেঁ পূজা যা আরতী করনা যা সঙ্খ বজানেসে রোক দিয়া। উনকে জুলুস পর কিসী কিস্ম কী পাবন্দী লগা দী গঈ।"

মর্ম্মার্থ: কংগ্রেসী শাসনে মুসলমানদের উপর কোন নূতন বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হয় নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। অপর দিকে এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্যই মিলিবে যে অনেক স্থলে হিন্দুদের মন্দিরে পূজারতি ও শঙ্খনাদ বর্ত্তমান আমলে বন্ধ করা হইয়াছে। হিন্দুদের শোভাযাত্রার উপরও কোন কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে।

এই কয় ছত্রেই বুঝিতে পারা যাইবে—উর্দ্দু কি কটমট, দুর্বোধ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক যদি "মন্দির" "শঙ্খ" ও "আরতি"র তুল্যার্থক ফারসী শব্দ জানিতেন, সেগুলা ব্যবহার করিতে কসুর করিতেন না; কারণ উর্দ্দু লেখাতে ফারসী আরবী শব্দ ব্যবহার না করা অমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। তবুও সর সিকন্দর হয়াত খাঁ, বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক লীগ কনফারেন্সে দুঃখ করিয়াছেন যে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা উর্দ্দর (ভারতে) সার্ব্বজনীন ভাষা হওয়ার দাবিটা স্বীকার করিয়া লইতে নারাজ।* স্বীকার করিবে কিরূপে? যে-ভাষার শিকড় আমাদের দেশের মাটি হইতে রস আহরণ করে না, আমাদের জীবনের সহিত আমাদের আত্মার সহিত সম্পর্ক রাখে না, তাহা আমাদের ভাষা হইবে কিরূপে? যে-চারা দেশের জমিতে জন্মায় না, সে বাঁচিবে কিরূপে? তাহার মরণ নিশ্চয়! মহাকবি গেটে তাঁহার 'ফাউষ্ট'-এ বলিয়াছেন; "তুমি শিশু ও বানরদের প্রশংসা পাইতে পার যদি তোমার সে স্পৃহা থাকে, কিন্তু যাহা হৃদয় হইতে বাহির হয় না তাহা অন্য হৃদয়ে প্রবেশ করিবে কিরূপে?"

এ প্রদেশে পাশাপাশি দুইটা সাহিত্যিক ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে—হিন্দী, উর্দ্দু। হিন্দী দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়, উর্দ্দ ফারসী অক্ষরে। উর্দ্দু অক্ষর লেখা পড়া শেখা কঠিন। অক্ষরগুলি বিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত, কতকটা আন্দাজে পড়িতে হয়, দুই-চারিটা বিন্দু ছাড়িয়া গেলে মুষ্কিল। শতকরা ৮০ জন হিন্দীর পাঠক, ২০ জন উর্দ্দুর। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে দুই সতীনের সমান তোয়াক্কা করিতে হইতেছে।

সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিপোষিত "হিন্দুস্থানী একাডেমী" যে সকল বৈদেশিক পুস্তকের অনুবাদ করেন, কিংবা উর্দ্দু বা হিন্দী পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকের পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহার অন্য ভাষার সংস্করণ বাহির করিতে হয়। সময়, অর্থ ও শ্রমের কি সদ্ব্যবহার!

তাসী বা তাহার সমসাময়িক কেহই বুঝিতে পারেন নাই হিন্দী ও উর্দ্দুর স্বতন্ত্র রূপ এ প্রদেশের কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, শিক্ষাবিস্তারের কি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে! যেমন মক্তব ও পাঠশালা বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত করিতেছে, সেই রূপ এই প্রদেশে একই স্কুলে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য হিন্দী ও উর্দ্দু ক্লাস রাখিতে হইতেছে। প্রত্যেক শহরে ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে হিন্দু মেয়েদের জন্য একটা ও

*"A *lingua franca* is one of the essential pre-requisites of a united nation and till very recently Urdu was acclaimed as such by all . . . Narrow-mindedness of a section of our countrymen has not allowed even Urdu to escape the venom of petty communalism.

মুসলমান মেয়েদের জন্য অন্য একটা স্কুল। তাদের উর্দ্দু ও পর্দা * দুই রক্ষা করিতে হইবে! এমন নূতন শিক্ষা-সংস্কারের ফলে এ প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সকল বিষয় হিন্দুস্থানীতে পড়ান হইবে। সেখানেও এইরূপ বিভ্রাট ঘটিবে। প্রত্যেক পুস্তকের হিন্দী উর্দ্দু সংস্করণ করিতে হইবে যদিও ভাষার "খিচুড়ি" এক হইবে।

যুক্তপ্রদেশেই নহে, সুদূর দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে উর্দ্দুর এই তাণ্ডবলীলা চলিতেছে! মহামান্য নিজাম বাহাদুর তাঁহার দেশের লোকদের খাঁটি উর্দ্দুভাষী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (নামেই, কাজে কিছু নহে) তত্ত্বাবধানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত ইত্যাদির পুস্তকের অনুবাদ হইতেছে উর্দ্দুতে; পরিভাষা রচনা করা হইতেছে আরবী ফারসী হইতে। যাহাদের শিক্ষার জন্য এই পণ্ডশ্রম হইতেছে তাহারা তামিল, তেলেগু, কন্নাড, মারাঠীভাষী—হায়দ্রাবাদের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী। যদি সংস্কৃতের সাহায্যে পরিভাষা প্রস্তুত হইত, সমস্ত ভারতের কাজে লাগিত, সহজবোধ্য হইত, আমরাও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতাম। আরবী ফারসী পরিভাষা বুঝিবে কে? কিন্তু যে জানিয়া শুনিয়া অন্ধ তাহাকে পথ কে দেখাইবে? যদি সংস্কৃতের প্রতি ওসমানীয় সরকার এতই বিরূপ, ইংরেজীর প্রচলিত পরিভাষা রাখিলেই হইত, উচ্চবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার কাজে লাগিত ও অনেক শ্রম লাঘব হইত।

আমরা কেবল ভাষা লইয়া মারামারি করি না, আমরা "বর্ণমালা" লইয়াও মাথা-ফাটাফাটি করিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উর্দ্দু ফারসী অক্ষরে ও হিন্দী দেবনাগরীতে লেখা হয়। যুক্তপ্রদেশের (সে সময়ের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে) সরকার যদি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেন, একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, একটা সরল, সহজ শিক্ষণীয় বর্ণমালা সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করিয়া চালাইয়া দিতেন, তবে এ বর্ণমালা-বিভ্রাট উপস্থিত হইত না। এখন ত ভাষা বদলাইতে হইতেছে।

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন

"Any script will do provided it is simple and easy." 'যে-কোন বর্ণমালায় কাজ হইবে যদি উহা সহজ ও সরল হয়"। All-India Common Script-Associationএর মত :—"There is no reason to grow sentimental over any script. It is an instrument for the use of man and it is folly to reverse the relation and make man the instrument of the script."

"কোন বর্ণমালার সম্বন্ধে অতি অধিক ভাবপ্রবণ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। উহা মানবের ব্যবহারের একটা যন্ত্র মাত্র। এ সম্বন্ধ উল্টাইয়া দিলে মানুষ বর্ণমালার দাস হইবে।"

ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কিন্তু বোঝে কে? সকলেই নিজ নিজ বর্ণমালা আঁকড়াইয়া আছে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশই (রুশিয়া ও পূর্ব্বের আরও দুই-চারিটা দেশ ছাড়া, যাহাদের বর্ণমালায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে যাহার স্থান রোমন অক্ষর দ্বারা পূর্ণ হয় না) রোমন বর্ণমালা স্বীকার করিয়াছে। জরমনীও নিজের পুরাতন ইংরেজী অক্ষর (Old English) গুলিও ত্যাগ করিয়াছে। কমাল পাশা আরবী বর্ণমালা বিতাড়িত করিয়া রোমন অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এখন তুর্কীর জনশিক্ষা অতি দ্রুত পদে অগ্রসর হইতেছে। সমস্ত ভারতে এক বর্ণমালা হওয়ার কোন বিশেষ বাধা নাই, যদি আমরা একমত হইতে পারি। বিভিন্ন বর্ণমালা কতক পরিমাণে আমাদের একতার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি একই বর্ণমালা থাকিত, ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিখিবার একটা বিষম প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইত। ভাষাগুলি নিকটতর হইত, কারণ বর্ণমালার একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। ফারসী অক্ষরে লেখা হয় বলিয়া উর্দ্দু ফারসী-আরবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে।

উর্দ্দু-হিন্দীর বিবাদ মিটাইবার জন্য, উহাদের একীভূত করিবার জন্য, হিন্দু-মুসলমানকে ভাষা-একতার দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের ও বিহারের সরকারেরা যে "হিন্দুস্থানী" প্রচলিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন ও বিহার সরকার এই অভিপ্রায়ে এক কমিটী গঠন করিয়াছেন, তাহা

* আমি Crossthwaite Girls' College-এর অতি নিকটে থাকি। যে মুসলমান মেয়ে বোরকা পরিয়া দুই মাস আসে, তৃতীয় মাসে বস্ ড্রাইভারের পার্শ্বে তাহার স্থান করিয়া লয়। বোরকা একেবারে অদৃশ্য!

এক নূতন খিচুড়ি হইবে,—language made to order, ফরমাইশী চীজ! ভাষার ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় জানা ছিল, কিন্তু এখন কমিটী-কনফারেন্স নূতন ভাষা প্রস্তুত করিবে ও সরকারী হুকুমে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে, কংগ্রেস-রাজ্যে তাহাও দেখিতে হইল! বৎসর কয়েক হইতে যুক্তপ্রদেশের স্কুলগুলিতে উর্দ্দু হিন্দী (দ্বিতীয় ভাষা) ছাড়া আর একটা ভাষা শিখান হইতেছে। উহাকে "হিন্দুস্থানী" (বা common language) বলা হয়। উহার একটা পাঠ্যপুস্তক প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়ান হয় (বোধ হয় ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত) এবং উহা লিখিবার ও অনুমোদন করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষজ্ঞ আছেন। কেবল তাঁহারাই জানেন "হিন্দুস্থানী" কাহাকে বলে। এ নব হিন্দুস্থানী সম্ভবতঃ পুরাতন হিন্দুস্থানী হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইবে। কারণ "শক্তিশালী" কমিটী গঠিত হইয়াছে; তাহাতে হিন্দুও আছেন, মুসলমানও আছেন। এ পর্য্যন্ত কিন্তু দুই সরকারের মধ্যে কোন সরকারই বলিতে পারিলেন না কোথায় হিন্দী শেষ হইবে, কোথায় হিন্দুস্থানী আরম্ভ হইবে, হিন্দুস্থানীর সীমা কোথায়, আর উর্দ্দুর দখল কতটা। হিন্দুস্থানী একাডেমী সম্প্রতি হিন্দুস্থানীর এক সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদেরই যোগ্য হইয়াছে।" "হিন্দুস্থানী* দ্বারা সেই লিখন ও কথন পদ্ধতি বুঝায় যাহা সযত্নে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্দাবলী পরিহার করে, কিংবা ভাষার অন্য কোন রূপ বা পদ্ধতি, যাহা লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ব্যবহৃত হয় না, তাহা বর্জ্জন করে।"

প্রত্যেক প্রগতিশীল ভাষার সর্ব্বদাই নূতন শব্দাবলী গঠন বা উদ্ভাবন করিবার আবশ্যক হয়—বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সংবাদপত্র ইত্যাদির জন্য। আমাদের প্রয়োজন অত্যধিক, কারণ আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিঃস্ব। উহা যদি classical languageগুলি হইতে না লওয়া হয়, তবে কোথা হইতে আসিবে? ইউরোপ, আমেরিকাকে গ্রীক ও লাটিনের সাহায্যে প্রতি বৎসর কত নূতন কথা রচনা করিতে হইতেছে। সাধারণ মানুষের লিখিবার ও বলিবার শব্দসংখ্যা অতি সীমাবদ্ধ। যদি দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের শিক্ষিত সমাজের শব্দাবলীর উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। ভাষার পুষ্টির জন্য অনেক সময় প্রাদেশিক উপভাষা (dialects) হইতে কথা, idioms ও phrases লইতে হইবে যাহা লক্ষ্ণৌ-দিল্লীর পুঁজিতে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। তদুপরি ঐ দুই শহরের ভাষাও এক নহে। কিন্তু দুইটিকেই "উর্দ্দু" বলা হয়; উহা হিন্দুস্থানী হইল কবে? তবে কি "উর্দ্দু" মুখস পরিয়া 'হিন্দুস্থানী' সাজিবে?

এই নবগঠিত ভাষায় কি পরিমাণে ফারসী আরবী ও ইংরেজী থাকিবে তাহা নিশ্চয় এই সমিতি স্থির করিবেন। বিহারের খাস ভোজপুরী, মৈথিলী, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতালী ও যুক্তপ্রদেশের গঢ়্বালী, বেনারসী, গাজীপুরী, ব্রজবুলী জনসংখ্যা হিসাবে থাকিবে বা মুসলমানেরা তৎসহিত weightageও চাহিবে; এবং হিন্দুদের স্বার্থ যেমন সকল বিষয়েই বলি দেওয়া হইতেছে এখানেও তাহাই হইবে—ইহা জিজ্ঞাস্য। লেখায়, বলায় যদি কেহ নির্দ্ধারিত পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারা অনুসারে তাহার শাস্তি হইবে, সেটাও বোধ হয় নিরূপিত হইবে।

কমিটী আবার এই নব হিন্দুস্থানীর এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। যে ভাষার কোন অস্তিত্ব নাই, তাহার আবার শব্দকোষ! রাম না হইতেই রামায়ণ!

কোন অঞ্চলের বিশেষ গোজাতির বংশ অবিকৃত রাখিতে হইলে অন্য জাতির ষাঁড়গুলিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে হয়। যুক্তপ্রদেশের সরকারের উচিত বর্ত্তমান অভিধানগুলিকে ভস্মীভূত করা, কারণ ইহারা গোলযোগ বাধাইতে পারে।

যৌগিক শব্দ (compound words)গুলির কি আকার হইবে? যুগলমূর্ত্তি কি অর্দ্ধনারীশ্বর হইবে,—আধা-সংস্কৃত, আধা-আরবী? সম্প্রতি আমি এইরূপ কতকগুলি নমুনা পাইয়াছি, সেই জন্য সন্দেহ হয়।

Norman Conquest-এর লেখক অধ্যাপক ফ্রীম্যান

* "By 'Hindustani' is meant a style which carefully avoids classical vocabulary or a type which is not used by the educated Delhi or Lucknow men"—*Hindustani Academy Enquiry Committee Questionnaire,* 1. 6. 1939.

ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইংরেজীতে লাটিন-গ্রীক-জাত শব্দ বর্জ্জন করিয়া কেবল অ্যাংলো-স্যাক্‌সন কথা রাখিবার জন্য এক সময় সচেষ্ট হন। সেই উদ্দেশ্যে বালকদের জন্য "ক্ল্যাসিকাল" কথাগুলি বাদ দিয়া একটি ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনাও করেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা তাহাদের বিফল হয়।

ইউরোপে কয়েকটি কৃত্রিম ভাষা তৈয়ারী হইয়াছিল। যেমন Volapuk, Esperanto ইত্যাদি, কিন্তু সেগুলি চলিল না। দুইচারি জন সখ করিয়া শিখিয়া থাকিবে; দুই-একটি সমিতি উহার বিস্তৃতির জন্য স্থাপিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু যে-ভাষা জগতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ভাবের সহজ বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জীবন্মৃত রহিয়া গেল। হিন্দুরা কি হিন্দী ত্যাগ করিবে, মুসলমানেরা কি প্রিয়তমা উর্দ্দুকে ছাড়িয়া এই নব হিন্দুস্থানী "না-হিন্দী না-উর্দ্দুকে" স্বীকার করিবে? হিন্দুর সংস্কৃতপ্রবণতা, মুসলমানের আরবী-ফারসী-আসক্তি কে রোধ করিবে? কি উপায়ে রোধ হইবে? পরিকল্পিত অভিধানের কি একটা "পকেট এডিশন" সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে হইবে?

হিন্দী উর্দ্দুকে এক প্রকার কোণঠাসা করিয়াছে। জাতীয় জাগরণের পূর্ব্বে উহার যে প্রতাপ ছিল, তাহা বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। যদি সরকার হস্তক্ষেপ না করিতেন, হিন্দী স্বাভাবিক নিয়মে প্রচুর বল সঞ্চয় করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিনীর গলা টিপিয়া মারিত নিশ্চয়। কিন্তু এখন অবস্থা কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন; কারণ যুক্তপ্রদেশের সরকার পাশাপাশি তিনটি ভাষার পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের ভার নিজ হস্তে লইতে পারেন এরূপ সম্ভাবনাও আছে।* যুক্তপ্রদেশের ভাষা-সমস্যা পূর্ব্ব হইতেই বড় জটিল, কংগ্রেস-সরকার উহা আরও জটিলতর করিয়া তুলিতেছেন।

উর্দ্দু সীমান্তের, পঞ্জাবের, সিন্ধু প্রদেশের, কাশ্মীরের ভাষা নহে; যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের নহে, দাক্ষিণাত্যের ত নহেই। উহা কেবল উত্তর-পশ্চিমের মুষ্টিমেয় শহুরে ভদ্রলোকদের (মুসলমান ও হিন্দুর) ভাষা। এই অল্পসংখ্যক লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত ব্যগ্রতা, এত উৎকণ্ঠা কেন? ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ইহুদীরা থাকে, তাহারা ধর্ম্মে, জাতিতে ও ভাষায় স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের গেটো (Ghetto)-বাসীদের য়িডিশ (Yiddish) কি পরিমাণ দেশভাষার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে সে ঔৎসুক্যের ইতিহাস আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। চীনের মুসলমানেরা কি আরবী-ফারসীতে কথা কহে? সকল রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা; কোথাও ভাষাকে বিকৃত করিবার হীন প্রচেষ্টা দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষেই সব সম্ভবে! আজকাল অনেকের মুখেও এই বুলি আওড়াইতে শুনি— সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেই ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতিতে কি তফাৎ? ঝগড়া করিবার জন্য অজুহাত অনেক। কাজে কি? তুর্কীর পরিত্যক্ত ফেজ ও বম্মার ধার করা লুঙ্গী যদি না থাকিত, তবে কে হিন্দু, কে মুসলমান বুঝা ভার হইত।

আজকাল বোরকাবর্জ্জিতা শিক্ষিতা শাড়ীপরিহিতা মুসলমান মহিলায় ও হিন্দু মহিলায় কোথায় প্রভেদ? জাতি হিসাবে তফাৎ কোথায়? ইরানের এক নূতন কবি বলিয়াছেন,

"গর মুসলমাঁ ব নসারা ব গর অজ
জরতুশ্‌তেম
লেক যক পিদর, ব নসব ব যক
পুস্তেম।
বর কফে কিশবর পিন্দার পঞ্জ
অঙ্গুস্তেম।
তাকি জময়েম বদন্দানে অজানিব
মুস্তেম
পরাগন্দা ব ফরদেম শিকার
আনাঁ।"

"যদিও আমরা পারসীক, খৃষ্টান ও মুসলমান;
তবুও এক জাতি, এক পরিবার, একই পিতার সন্তান।

* "Should the Central body set itself the task of creating deliberately and propagating a standard style of Hindustani, Urdu and Hindi, or of Hindustani alone, if not of Hindi and Urdu"?—*Hindustani Academy's Questionnaire* No. 7. এ যে ফ্রেঞ্চ একাডেমীকেও হার মানাইল।

মাতৃভূমির পাণির ভেবো পাঁচটি আঙুল পুরা
যুক্ত হলে মুষ্টি হয়ে করি রিপুর দাঁত গুঁড়া,
ছিন্ন হলে, ভিন্ন হলে, শিকার তাদের মোরা।"

কি গভীর স্বদেশপ্রেম! যুধিষ্ঠিরও ভীমকে ঐ উপদেশই দিয়াছিলেন। আমরা ইহা কবে শিখিব? আমরা যে এক পিতামাতার সন্তান

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশকে কখনও অধিপ্রবাসীদের (immigrants) ভাষা কি পরিমাণে দেশীয় ভাষায় প্রবেশ করিবে সে বিষয় মাথা ঘামাইতে শুনি নাই। রুশীয়, ইতালীয়, গ্রীক, আইরিশ, জার্ম্যান, রুমানীয়, পোল, সকলেই দুই পুরুষেই আমেরিকান ইংলিশ আয়ত্ত করিয়া ফেলে ও পুরাদস্তর আমেরিকান নাগরিক বনিয়া যায়; কেহ ভাষার ও সংস্কৃতির কথাই তুলে না। আর আমাদের হিন্দু হইতে মুসলমান ভ্রাতারা দুই-চারি পুরুষেই একেবারে আরব, ইরানী, তুর্কী, সিরিয়ান বনিয়া গেলেন! স্বর্গীয় কমাল পাশা বলিতেন, 'ইসলাম হয়ত মরুভূমিবাসী যাযাবর আরবদের উপকারী ছিল, কিন্তু প্রগতিশীল জাতির পক্ষে একেবারে উপযোগী নহে"—ইহাই কি সত্য?

গান্ধীজী বলেন, হিন্দী শিক্ষা কর মাদ্রাজীরা উহার বিপক্ষতা বরণ করিয়া জেলে যাইতেছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার বলেন হিন্দুস্তানী; দক্ষিণ ভারতের সত্যমূর্ত্তি, যিনি জীবনে বোধ হয় দুই-দশটা হিন্দুস্থানী কথা এক সঙ্গে কহিতে চেষ্টা করেন নাই,—উহার পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে যাহার ধাঁধা লাগিয়া যাইবে,—তিনিও উহার গুণগানে শতমুখ! সর্ সিকন্দর হয়াত বলেন, উর্দ্দুটাই ভারতের জনসাধারণের ভাষা হউক! সকলেই "মহাজন"। কাহার পন্থা অনুসরণ করি?

সকল জীবিত ভাষাই আপন পুষ্টির জন্য বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দাবলী আহরণ করে; কিন্তু সেটা নিজের প্রয়োজন মত নিজেকে শক্তিশালী করিবার জন্য, যে পরিমাণে উহা পরিপাক করিতে পারে, ভাষার সহিত বেমালুম মিশিয়া যায়। অবাধে বর্ষার জলের মত উহা প্রবেশ করিবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। ইংরেজী উপরিউক্ত পন্থা অনুসরণ করে, সেই কারণে উহা এত বৃদ্ধিমতী, এত শ্রীশালিনী। ফরাসী মধুপায়ীরা যদিও 'ককটেল'-এর গুণে মোহিত, কিন্তু উহাকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করাইবার জন্য বিশ বৎসরের অধিক ফরাসী একাডেমীর দুয়ারে ধরনা দিতে হইয়াছিল। জরমনী বেনো জল ঢুকিতে দেয় না, ইতালী এ বিষয়ে রক্ষণশীল।

সম্প্রতি কলিকাতায় মুসলিম-সাহিত্য সম্মিলনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন:—

"The language of a province is the heart of a province; the language of a people is the soul of a people. No power on earth, no legislation can oust a national language. The question of language should not, therefore, be a question of political controversy."

ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক বিরোধ-বিবাদের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। ইহাই যথার্থ কথা।

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬

এমনই ভাবে গীতা লইয়া সুখদুঃখকে অমিয় যখন অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তখন অকস্মাৎ বীরেনের পত্র আসিয়া তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। অন্তরের স্থৈর্য্য ও গীতার শ্লোক সে-আঘাতে একাকার হইয়া গেল।

বীরেন লিখিয়াছে :

অমিয়, বহুদিন পরে আজ তোমাকে চিঠি লিখছি, বহু দূর থেকেও বটে। মনে ক'রো না, তোমার কুশল-সংবাদ-প্রত্যাশায় মন আমার উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ রয়েছে, যেমন বহুদিন প্রিয়বস্তুর অদর্শনজনিত কোন বন্ধুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে! আসলে ওটা গৌরচন্দ্রিকা। মনের উৎকণ্ঠা যেখানে স্বাভাবিক—দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদ সেখানে তিষ্ঠতে পারে না। যেখানে বিরহ-নিবারণের কোন উপায় নেই, সেখানে লিপিপ্রাচুর্য্য থাকবেই। তোমার সম্বন্ধে আমার যখন উৎকণ্ঠা নেই, আশা করি আমার সম্বন্ধে তোমার উৎসাহও সেখানে স্বভাবতই স্তিমিত। কিন্তু এই দীর্ঘ দিন, বোধ হয় বছর দুই হবে, ঠিক হিসাব আমার নেই, এই দীর্ঘ দিন পরে তোমার ঠিকানা খুঁজে তোমাকে চিঠি লেখার অর্থ তোমাকে অত্যন্ত বিস্মিত তো করবেই, সেই সঙ্গে স্তিমিত কৌতূহল-শিখাটিকে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল করবে নাকি? চিঠিতে একান্ত ভাবে আমারই কয়েকটি কথা তোমাকে জানাতে প্রবল ইচ্ছা হ'ল। আশ্চর্য্য নয়? যাকে বন্ধু ব'লে মানি অথচ আত্মার সন্নিকটে বসিয়ে আলাপ করতে ভালবাসি নে, যাকে দুর্ব্বল ভেবে কৃপা করি অথচ কথার আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা বোধ করি নে, তার কাছে আমার অন্তরের কি এমন গোপন কথা থাকতে পারে? এবং এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করলেই বা ক্ষতি কি? সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, এ বুঝি প্রকৃতির মস্তবড় একটা অভিশাপ যে, এই পৃথিবীর এক জন না এক জনকে মন-পুস্তকের গোপন অধ্যায়গুলি যদি খুলে না দেখাতে পারলাম তো যত্ন ক'রে এত অক্ষরের শোভা ও ভাষার কলরব তুলে ভাবের কমলবন বিমথিত করলাম কেন! ভয় নেই, কৃষ্ণনগর কলেজের স্মৃতি রোমন্থন করব না, বাল্যস্মৃতিও না। জীবনের যেখান থেকে ছেদ টানব ভাবছি, সেখান থেকেই আমার কাহিনীর আরম্ভ। কাহিনী না তো কি!···ট্রেনের কথা মনে পড়ে? আমার বিবাহ-বিদ্বেষ নিয়ে তোমাদের পরিহাস হয়ত কত অলস অবসর-মুহূর্ত্তে কৌতুক সৃষ্টি করেছে, কিন্তু দুঃখকে ঠেকাবার ঐ একটি মাত্র বর্ম্মই আমি আবিষ্কার করেছিলাম। সে বর্ম্ম আজও আমার অটুট থাকলেও, মনে হচ্ছে ওতে যেন মরচে ধরে আসছে। হেসো না, এবং বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে কোটেশন ছেড় না—

Marriage is like beleaguered fortress,
those who are without want to get in.

মোটেই না। যার সামনে দিনরাত্রি আগুন জ্বলছে, সে কোন্ সুখে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করবে! কিন্তু দুঃখকে যে ঠেকানো যায় না—এ কথা আমি স্বীকার করি। দুঃখের প্রবেশপথ যে বহু শত—মনের ছিদ্রগুলি তো সহজ নয়। যে বাড়ীখানিতে দু-দিন মাথা রাখবার জায়গা পেলাম, সেখানে মমতার উর্ণনাভ বোনা আরম্ভ হয়ে গেল। যেমন মুহূর্ত্তের বিশ্রাম উপভোগ করেছি—অমনি মনে কল্পনার ইন্দ্রধনু ফুটে উঠতে চায়। নিজেকে যতই অশুচি বাঁচিয়ে আগলে চলি—অলক্ষ্যে মন অন্ধকার পথে ততই টক্কর খায়। ভূমিকা আর দীর্ঘ করব না। আসল কথা বলি।

তুমি তো জান, আমার একটি ভাই ছিল এবং তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবার ব্রত (তোমার

ভাষায়) আমি নিয়েছিলাম। এক দিন বুঝি তোমাকে বলেছিলামও,—সে যদি উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করে তো আমিই তাকে গুলি করে মারব। ভাব দেখি কত বড় স্পর্দ্ধার কথা! মানুষ ইচ্ছে করলেই কি মানুষকে গুলি ক'রে মারতে পারে? সহজ অবস্থার মানুষের দ্বারা তা কি সম্ভব? আমার সে দণ্ডবাণী অলক্ষ্যে বসে কেউ হয়ত শুনেছিলেন। কেউ মানে ভগবান্ নন। আমি ঈশ্বর মানি না। মানি না:

God is to man what sun is to earth, and more.

কেউ মানে আমার অন্তরের সুপ্ত কোন বৃত্তিও তো হ'তে পারে, যে-বৃত্তি সময়বিশেষে অত্যন্ত সজাগ হয়ে অতীতের উপর বিহার করতে ভালবাসে। অতীতের মতবাদের ফাঁকে ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে গুম্ভিত হয়ে যায়।

ভাইয়ের উপর স্নেহ আমার কিছু ছিল বইকি, যে-স্নেহের বহিঃপ্রকাশকে চোখ রাঙিয়ে দিনরাত শাসন করতাম। স্নেহ যদি না থাকবে তো দুর্দান্ত সাহসী হয়েও মন কেন কার্য্যক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল! তার পর, শোন। ভাই আমার কলকাতায় পড়ত। ভিতরে ভিতরে সে যে মনুষ্যধর্ম্মের চর্চ্চা করছিল সে-খবর তো পাই নি কোনদিন। টাকা চাইলে টাকা দিয়েছি, পাশের খবর জেনে খুশী হয়েছি—এই পর্য্যন্ত। বাড়ীতে ছুটি-ছাটাতে দেখা হলে কখনও কুশল-প্রশ্ন করি নি; একসঙ্গে বসে তার সঙ্গে যে কোন বিষয় নিয়ে পাঁচ মিনিট আলোচনা করেছি—সে কথা তো মনে পড়ে না। তার অসুখ হ'লে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকি নি, অথচ তাকে মনের বার করতে গিয়ে দেখলাম, অবহেলিত ভাঙা ঘরের কার্ণিশে সে যেন যত্নে বর্দ্ধিত এক অশ্বত্থ গাছ। শুকনো চুনসুরকির মধ্যে তার অনেকগুলি শিকড় সেঁধিয়েছে; বহুমুখী শিকড়ে রস টানবার শক্তিও তো কম নয়! বুঝলাম, বর্ম্মে আমার মরচেই ধরেছে। ব্যাপারটা কি জান, ভাই আমার কোন দুঃস্থ প্রতিবেশীর কন্যাদায় উদ্ধারের মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন। ভয় নেই, প্রণয়-প্রেম এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গও ছিল না, উদার মনের একাগ্র পরিণতিই তাকে পরোপকারের যূপকাষ্ঠে আকর্ষণ করেছিল। দুঃখ-মোচনের সঙ্কল্প নিয়ে দুঃখের হ্রদে ভাই আমার নেমে গেলেন। আমার শাসন অনায়াসে সে অগ্রাহ্য করলে। ভাবতে পার অমিয়, অনিমন্ত্রিত দুঃখ যখন বিপুল বন্যার বেগে আমার গৃহাঙ্গনে এল, তখন তাকে বহন করবার যোগ্যতা আমার কতখানি ছিল! হরজটামুক্ত-জাহ্নবী-বেগধারা-বিপর্য্যস্ত মত্ত ঐরাবতের কথা স্মরণ কর। পিস্তল আমার কাছেই ছিল, গুলি করতে পারলাম কই? বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, চাকরি আর কেন! কিন্তু ছাড়ব বললেই তো চাকরি ছাড়া যায় না। ভাত খাব না বললেই কি অন্নত্যাগ সম্ভব! কিছু কৌতূহল হ'ল। দেখি না খরচপত্র বন্ধ করে দিয়ে, ভাই যে দায়িত্ব মাথায় নিলেন তা বহন করবার যোগ্যতা ওঁর কতখানি। উনি দুঃখের হ্রদে আর পাঁচ জনের মত তলিয়ে যান, না মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন? হায় রে আমার আশা! হাঁড়িসুদ্ধ ভাত দেখেও কি একটি ভাতের অবস্থা জানতে ভুল হয়? সবাই যে-হ্রদের তলদেশে থিতিয়ে পড়েছেন, ও সেখানে শোলার মত ভাসবে! যাঁরা ভাবের চাষ-আবাদে মনোযোগী, তাঁরা যে মরুভূমির বালুতে বাষ্প হয়ে যাবেন এ আর বেশী কথা কি! বার দুই বাড়ী গিয়েছিলাম, দেখলাম, ত্রৈরাশিক অঙ্কের নির্ভুল উত্তরের মত সংসারের অবস্থা। অসম্পূর্ণ বিদ্যা নিয়ে ভাই গোটা দুই টুইশনি করছেন। চাকরির যা বাজার—সহায়-সম্পদ কিংবা গোত্র-জাতির খুঁটি না থাকলে সে-ক্ষেত্রে অবলম্বনহীন লতার মত কাদামাখা তো হতেই হবে। ভাই লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, বৌমাটি এসে প্রণাম করলেন। ময়লা কাপড়ে তাঁর দুর্দ্দশার কাহিনী লেখা রয়েছে। মুখ দেখি নি, কিন্তু বলতে পারি ময়লা কাপড়ের মতই সে-মুখ ম্লান। শীর্ণ দেহ হয়ত আহারের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মন সে যুক্তি মানবে কেন? অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন রাত্তিরে, ভাত না রুটি?'

বললাম, 'কিছু না, এখনই আমায় ফিরতে হবে।'

বউমা কাতর সংক্ষিপ্ত অনুরোধ জানালেন থাকবার জন্য। কিন্তু দুঃখের অন্ন মুখে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের মধ্যে কোথায় ফাঁক স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ছুটে পালালাম। না পালালে সেই মুহূর্ত্তে ওদের কিছু অর্থসাহায্যও হয়ত করতাম।

তার পর দ্বিতীয় বার যখন বাড়ী যাই, বোধ হয় বছর খানেক বাদে, সে নিতান্ত দায়ে প'ড়ে। দুঃখবিলাসের চর্চ্চা ক'রে নরেন (ভাইয়ের নাম) বাস্তখানিকে মহাজনের হাতে প্রায় দান ক'রে ফেলেছেন। আমায় চিঠি লিখেছেন বৌমার জবানীতে। হঠাৎ নাকি তাঁর মনে হয়েছে, অভাবের তাড়নায় কাজটা ভাল করেন নি; পিতৃপিতামহের বাস্ত ইত্যাদি ভাবপ্রবণতায় ভরা ফাঁপা সে-চিঠি। ভাবালুতা যে ছোঁয়াচে তা বোধ হয় তুমি ভালরূপেই জান। না হ'লে পিতৃপিতামহের বাস্তর দোহাই আমার মনকে স্পর্শ করল কেন? সেন্টিমেণ্ট্যাল না হ'লে অনায়াসে কি মনে করতে পারতাম না: The world is our room.

বাড়ী এসে দেখলাম, প্রবল বেগে সেখানে দুঃখ-চর্চ্চা সুরু হয়ে গিয়েছে। বাড়ী ঋণের দায়ে বাঁধা পড়েছে—সে তো তুচ্ছ, নরেন পিতৃপিতামহদের জলগণ্ডুষের উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। রোগা কালো একটি মানবশিশু—দিনরাত কাঁদছে, অসুস্থ দেহের জন্য কি অপ্রচুর আহারের জন্য কে জানে? নগ্ন দারিদ্র্য আর কাকে বলে! এ দেখেও সেদিন চলে আসতে পারলাম না। মহাজনের সঙ্গে দেখা ক'রে বাস্ত রক্ষা করব—হয়ত এই সঙ্কল্পের জন্য। কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আসল সঙ্কল্প আমার প্রকাশ পেল। টাকা আমি ক-বছরে কিছু সঞ্চয় করেছি, ইচ্ছা করলে অনায়সে ওদের দারিদ্র্য মুক্ত করতে পারি। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিতে শুকনো ফাটা জমির মধ্যে এক কলসী জল ঢালার মত সে কি নিরর্থক নয়। অনেক ভেবে দুঃখমোচনের আর একটি উপায় বার করলাম। উপায় সহজ, কিন্তু তোমরা ভাববে—এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর জগতে নেই। দেখেছ তো, ভাঙা ঘরের ফাটলে যে বট অশ্বত্থ বা ডুমুর গাছ বেড়ে ওঠে তাকে টেনে তোলা কত কঠিন! প্রত্যেক বার তার সতেজ শাখাগুলিকে কেটে পতনোন্মুখ গৃহকে বাঁচানোর অপচেষ্টার মত মূর্খতা আর নেই। শিকড়সুদ্ধ না ওপড়ালে শাখার পল্লবিত হওয়াকে রোধ করবে কে? তেমনি আমি যদি আজ ওদের সাহায্য করি, সে দুঃখ-মোচন হবে কিছুক্ষণের জন্য। দু-দিন পরে আবার বাস্ত বাঁধা পড়বে। আবার সেই হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে। ঠিক করলাম শিকড়ই উপড়ে ফেলব, তাতে যদি বাস্তর দুই-একখানা ইঁট স্থানচ্যুত হয়—হোক। আমার সংসারে ও-আগাছা আমি রাখব না। বের করলাম পিস্তল। ভেবে দেখলাম ওর দরকার হবে না। ছোট একটি শিশুর কান্না বন্ধ করতে আমার শক্ত হাত দুখানি যথেষ্ট। শিউরে উঠো না, হাঁ, শিশু-হত্যাই বটে। বংশলোপ পিণ্ডলোপের ব্যবস্থা। কেন করব না। হাজার হাজার বছর ধরে মনু-বিধান মেনে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আমরা, তাই মৃত আত্মার জলগণ্ডুষের নামে নিজেদের পশুবৃত্তি চরিতার্থতার ফলগুলিকে—শুকনো, রুগ্ন, কুৎসিত ফলগুলিকে—সযত্নে লালন ক'রে চলেছি। অহংভাবটাই যে আমাদের নীচে নামিয়ে দিয়েছে, নইলে যার গৃহ নেই, সে কেন বাস্ত-ভিটা বাঁচাতে ছুটে এসেছে; যার সন্তান নেই সে কেন বংশরক্ষার মোহে দুঃখের আগুনে জলে পুড়ে মরছে! এই রাত্রিতেই এ সমস্যার সমাধান করব। ও-ঘরে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর চীৎকার—বাপ-মা তার ঘুমিয়েছে। গ্রীষ্মকাল, কাজেই দরজায় খিল পড়ে নি। সুযোগ তো হাতের কাছেই। উঠ্‌লাম। রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও ওঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দু-হাতের মুঠো তখন আমার শক্ত। দাঁতের উপর দাঁত চেপে নির্নিমেষে শিশুর মুখের পানে চাইলাম। ঘরের স্তিমিত আলো তার মুখে পড়েছে। মনে হ'ল, একটানা কান্না ছাড়া ওর দেহে জীবনের লক্ষণ কোথায়? মৃতকে আঘাত করব! গীতা মনে পড়লো: 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' শিশুর মৃত্যু মানেই আমারও মৃত্যু। ভাবতেই মনটা আনন্দে শিউরে উঠল। বাঃ রে, মুক্তি! এ-কথা তো এক দিনও মনে জাগে নি।

আমিও তো ইচ্ছা করলে মরতে পারি। মরবার অস্ত্রও আমার কাছে রয়েছে। মরে তো দুঃখজয় আমিও করতে পারি। কিন্তু আবার সংস্কার উঁকি মারল, ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম ঘরে। আত্মঘাতীর মুক্তি নেই! কিসের মুক্তি! আত্মার? বন্ধু, হেসো না; আমি অনেক কিছু অবিশ্বাস করলেও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, এর পুনর্জন্ম আছে। ভরত রাজার মৃগমুগ্ধ মনের একাগ্রতার আলোকে এর পরজন্মের অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। না হ'লে আমরা বাঁচব কি ক'রে? মৃত্যু যদি আমাদের নবজন্মের রূপান্তর না হবে তো দুঃখের জাঁতায় আত্মাটি যে নিষ্পিষ্ট, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতীয় আত্মা যদি ভারতবর্ষের গণ্ডী না পেরোতে পারে, উঃ, ভাবতে পার সে দুঃসহ ব্যথা! তাই আমি মনের জোরে আমার আত্মাকে সাগরপারে উত্তীর্ণ ক'রে দেবই দেব। যদি জন্মাই—এ-দেশে আর নয়। এই দুঃখবাদীর দেশে, কালির ছাপ কপালে এঁকে,—না না, এখানে নয়। স্বদেশকে সবাই ভালবাসে, আমি ভালবাসি না। আত্মার কি কোন স্বদেশ আছে? নিছক মনোবিলাস মাত্র। আমি যদি জন্মাই—সাত সমুদ্রের পারে গিয়েই জন্মাব। লেনিনের রাশিয়ায়, কিংবা হিট্‌লারের জার্ম্মেনীতে; মুসোলিনীর ইটালীও আমার কাম্য। কেমালের তুর্কী, পিলস্থুডিস্কির পোল্যাণ্ড অথবা ডি ভ্যালেরার আয়র্ল্যাণ্ডকেও আমি পছন্দ করি। ইংলণ্ডে জন্মাতে পারলে তো বেঁচে যাই। মোট কথা, ওরা দুঃখ পেলেও তাকে জয় করবার মন্ত্র জানে। ওদের ঘরে রুগ্ন শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনি করে চেঁচায় কি? তুমি ইতিহাসের না-হয় উপন্যাসের নজির দেখাবে। আমিও জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি, সে-দুঃখ ওদের শরতের মেঘ। বার মাস তার তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকতে হয় না ওদের। একখানি ভাঙা ঘরের তলায় পিতৃপিতামহের জল-গণ্ডূষকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে ওরা দুঃখজয়ীর দল ব'লে গর্ব্ববোধ করে না। দুঃখকে ওরা মহত্ত্ব ব'লে স্বীকার করে না, ঘৃণ্য কৃমিকীটের মত পিষে মারবার চেষ্টা করে। তাই তো মন আমার ছুটে যেতে চায় নীল সাগরের পারে। বলতে পার, ঘরের কাছে জাপান রয়েছে—সূর্য্যোদয়ের দেশ। হাঁ, জাপানকেও আমি শ্রদ্ধা করি। আমাদের সূর্য্যাস্তের দেশের যত মহিমাই থাকুক না কেন (অধ্যাত্ম মহিমা, নয় কি?) আমি ভালবাসি সূর্য্যোদয়ের দেশ। যেখানে মানুষের সুস্থ দেহ, সুস্থ মন; অটুট কর্ম্মশক্তি, অফুরন্ত আনন্দ, সবল মননশীলতা—সব মিলে একটি সম্পূর্ণ মানুষকেই প্রকাশ করে। যদি ওদের মধ্যে বর্ব্বরতা কিছু থাকে, সেটুকু অপরিমিত জীবন-তরঙ্গের ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। আমাদের শান্তসমাহিত, দুঃখ-জর্জ্জরিত জীবনের রুগ্ন প্রকাশের চেয়ে তা কত মনোহর! প্রচণ্ড যে সুন্দর হয় সে-জ্ঞান ওদের দেখলে পাই, সুন্দর যে নিষ্প্রাণ হয় সে সম্ভাবনা তোমার আমার মধ্যে বর্ত্তমান। যাই হোক, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি কিনব এইটাই স্থির ক'রে ফেললাম। কিন্তু মরবার আগে ওদের একটু শিক্ষা দিয়ে যাব না? খবরের কাগজে এই নিয়ে যদি হৈচৈ না হ'ল, আমার এ অন্তর্দাহ যদি কাউকে না বোঝাতে পারলাম তো বৃথা আত্মঘাতী হয়ে লাভ! হাঁ, শিক্ষাই দেব। সঙ্কল্প স্থির ক'রে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম সেই খোলা দরজায়। শিশুর কান্না থেমেছে; ম্লান আলোয় দেখলাম, তার মা এ-পাশ ফিরে সন্তানকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছেন। শুকনো স্তন্যরসে হয়ত বা শিশু সান্ত্বনা পেয়েছে। ঘুমন্ত স্নেহে তার মা একখানি শীর্ণ হাত বেড়ে রুগ্ন শিশুকে সাপটে ধরেছেন। ম্লান আলোয় মনে হ'ল, যেমন রুগ্ন তার মা, তেমনি রুগ্ন তাঁর সন্তান। দু-জনের উপরেই মৃত্যু তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি মেলে ধরেছেন।

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব', সুতরাং আমি আর কেন? আবার ফিরে এলাম ঘরে। আমার কথা শুনে বুঝতে পারছি, তুমি হাসছ! মনে মনে বলছ, সেন্টিমেণ্টাল হওয়ার কতকগুলি সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত আছে—সেগুলির কাছে নদীর স্রোতে বেতসলতার মত মন আমাদের নুয়েই পড়ে। হয়ত সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যই কি ভ্রাতৃস্নেহ বা বংশরক্ষার মমতা ওর অন্তরালে সক্রিয় ছিল? তা যদি ছিল তো ওদের অর্থসাহায্য না ক'রে চলে এলাম কেন! কেন বাস্তুরক্ষার প্রয়াসমাত্র করলাম না। কেনই বা রাইফেল-ফ্যাক্টরির চাকরি ছেড়ে দিলাম!

এখানে, বাংলা থেকে বহু দূরে ব'সে, অনুভব করছি—আমাদের মনের ছাঁচ সত্যই অন্য দেশের থেকে আলাদা। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা দেশ; অল্প শ্রমে ফসল ফলে, অল্প দুঃখে মন গলে। এখানে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশী, যাতে চোখের জল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বার হয়, স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে বুকে বাধে। এই রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরে ব'সে (দেশের নাম করব না)—সূর্য্যাস্ত দেখছি। কোন মহিমা নেই। ধুলায় ধুলায় এখানকার পথঘাট আচ্ছন্ন। গরিব অধিবাসীদের নোংরা পোষাক ও কলহমুখর বাক্‌বিতণ্ডায় সারা দিনমান সারা রাত্রি বিদীর্ণ হয়ে যায়। এরা ভূতের মত খাটে, কৃমিকীটের মত নীচু হয়ে থাকে, খায় ছাইভস্ম—তবু কোলাহল না ক'রে গল্প জমাতে পারে না, বুক না কাঁপিয়ে হাসতে জানে না। আশ্চর্য্য এই দেশ! এত দরিদ্র অথচ এত অল্পে সন্তুষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কথা মনে পড়ে। সেখানকার অধিবাসীদের কথা। আমার সেই বাসগৃহ, ভাই, ভাইয়ের বউ এবং রুগ্ন খোকাটিকে। তারা কি এখনও বেঁচে আছে? হয়ত নেই। না থাকুক, আমি বাংলায় আর ফিরব না। কি কাজ এই ভাবপ্রবণ প্রাণটাকে ধ'রে রেখে।

চিঠি দীর্ঘ হয়ে গেল, এখনও আসল কথা বলা হয় নি। আমার পাসবইখানি সঙ্গেই আছে। সমস্ত টাকা তুলে তোমার কাছেই পাঠাচ্ছি। ওগুলোর সদ্গতি না-হওয়া পর্য্যন্ত আমার আত্মার মুক্তি নেই। ভেব না, দেশের কোন সদ্‌প্রতিষ্ঠানে এ টাকা দান করব—কোন অনাথ আশ্রমে। রোগীর জন্য আমার মাথাব্যথা নেই, আতুরের জন্যও নয়। এ টাকা নরেনকেই দিয়ো। বাঙালী কি না, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির সন্তান আমি, মনু-বিধানের অন্তঃসমর্থক আমি—ভায়ের উপর স্নেহটা কিছু অনুভব করছি, কিছু মমতা বাস্তুর প্রতি—আর কিছু বা সেই মৃত্যু-অভিমুখী বংশধরের প্রতি। স্বীকার করছি, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—জন্মলগ্নের বন্ধন, রক্তের ঋণ, পিতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। যদি কখনও সংবাদপত্রে এই হতভাগার মৃত্যুসংবাদ পাও, মুক্তিসংবাদ মনে ক'রে উল্লাস ক'রো। আর প্রার্থনা ক'রো, জন্মান্তর যদি হয় এ দেশে যেন আর না হয়—এই আর্য্যের দেশে, মনুর দেশে, স্বর্গের দেশে। যেখানে দুঃখ আছে, জয়ের অস্ত্র বিকল; ভাষা আছে, জড়তা ঘোচে নি; প্রাণ আছে অথচ আগুন জ্বলে না—তেমন ঘুমপাড়ানীর দেশে নয়। ছবিতে ওদেশের অনেক মানুষ দেখেছি, ইতিহাসে ওদের অদ্ভুত কাহিনী পড়েছি, ওরা সত্যকার মানুষ—স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, মনীষায়, পশুশক্তিতে ও নিয়ত যুধ্যমানতায় অফুরন্ত প্রাণশক্তি ওদের নিয়ত অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। কাচের আবরণে আগুনকে ওরা ঘিরে রাখে নি, ওরা জানে এ আগুন বাইরের বাতাসে নেচে উঠলে যেমন সহজে বিপদ বাধায়, তেমনি মনোহর হয়ে দীপ্তি পায়। আমি মিশতে চাই ঐ প্রচণ্ড-মনোহরের মধ্যে।

পুঃ যখন এ-পত্র পাবে, তখন আমি হয়তো ভ্রূণ-অবস্থায় ওদেশের কোন উল্কাজ্যোতিতে পরিণত হ'তে চলেছি। বাংলার নীল আকাশে যে কোমল নক্ষত্র সন্ধ্যাবেলায় জ্বলে ওঠে, তাদের মিছিলে আমায় খুঁজে পাবে না। চৈত্র-দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের দিকে যদি তাকাবার শক্তি না হয়, চক্ষু বুজে সূর্য্যকিরণের লাল আভায় আমাকে ভাবতে চেষ্টা ক'রো। দুঃখকে অনায়াসে জয় করলে যে—সে যে পবিত্র এবং সে যে মানুষ তাতে কি সন্দেহ করতে পারবে, বন্ধু?

অমিয় এ আঘাতে নির্ব্বাক হইয়া গেল। চোখ দিয়া এক ফোঁটাও জল বাহির হইল না, জল বাহির হইলে সে বুঝি বাঁচিয়া যাইত!

১৭

পরদিন সকালবেলায় মেসের কোলাহলটা কিছু বেশী বলিয়াই বোধ হইল। বিপুলকায় বিষ্ণুবাবু কোনদিন সাতটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না; যদিও ঘুম ভাঙে তাঁহার কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষু বুজিয়া বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া ছিন্ন তন্দ্রার আলস্যটুকু ঘণ্টা দুইয়ের জন্য উপভোগ করিতে তিনি ভালবাসেন। মেসের মধ্যে এই লোকটিই ভাল এবং নির্ব্বিবাদী। সকলের কথাতেই থাকেন অথচ কাহারও সঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপ নাই। বার্দ্ধক্যের প্রান্তরে সবেমাত্র পা দিয়াছেন, কিন্তু বিবাহরূপ

বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তা বলিয়া সংসার সম্বন্ধে মোটেই অচেতন নহেন। কলিকাতার কোন্ গলিতে সস্তায় কোন্ বিশেষ জিনিষটি পাওয়া যায়, এ সকল তথ্য তাঁহার অজানা নহে। চাকরি করেন কোন নামজাদা গভর্ণমেণ্ট আপিসে। মাহিনা মাঝারি। ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সংসার পাতিতে পারিতেন, কিন্তু কেন ইচ্ছা করেন নাই সেইটাই এই মেসবাসীদের কাছে পরম রহস্য। অমিয় প্রথমটা ইঁহাকে বীরেনের ধাতুতে গড়া বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝিল, এ-ধাতু আলাদা। এখানে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তো দূরের কথা, ধূমের রেখামাত্র নাই। নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ। ভাল খাওয়া, টাকা বাঁচানো, শয়নের আরাম ও আপিসের দপ্তর তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ। সকালে সংবাদপত্র এক বার পড়েন এবং আপিসে বা বাহিরে কোন রাজনীতিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে মতামত সংগ্রহ করিয়া মেসের ছাদে বসিয়া সেগুলি নিজস্ব বলিয়া সরবে চালাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। যথা :—

'হুঁ, গান্ধীর কথা আর কেউ মানবে না, কংগ্রেস হয়েছে একটা অ্যারিষ্টোক্রাট প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর আবার জাতীয়তা! এই বার দেখেছ তো হিট্‌লারের গুঁতো, বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের প্ল্যানটা ওদের অনেক দিনের।' ইত্যাদি

সংবাদপত্রে বন্যার কাহিনী পড়িয়া বলেন: 'আর মশায়, দেশ গেল! গরিবের জমি সব জলের নীচে। মাটির ঘর ধ্বসে পড়ছে, গাছের ডালে শুয়ে দিন কাটাচ্ছে, এদিকে শহরে সিনেমার সংখ্যা বাড়ছে। এইসব দুঃখ-কষ্টকে মানুষ এমনি অগ্রাহ্য ক'রেই কাটাচ্ছে, এ-জাত যদি না নামবে তো' ইত্যাদি।

কিন্তু কোন সমিতি চাঁদার খাতা সম্মুখে ধরিলে চোখ পাকাইয়া বলেন: 'বাঙালীর মধ্যে সাধুতা কোথায়। আজ চাঁদা দেব, কাল চপ-কাটলেট খেয়ে ওড়াবে।'

অথবা: 'বন্যা হয়েছে শ্রাবণ মাসে, এখন কার্ত্তিক মাসে এসেছেন চাঁদা নিতে! আমরা তো আর লক্ষপতি নই, নিজেরই বলে……' ইত্যাদি।

অধিকাংশ লোকের সঙ্গে তাঁহার যে বাক্যালাপ নাই তাহার একটু মাত্র আভাস তাঁহার কথায় কখনো বা পাওয়া যায়। তিনি প্রায়ই বলেন: হ্যাঃ, ওসব চ্যাংড়া ছোকরাদের সঙ্গে মিশব কি, তার চেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান ভাল।'

কিন্তু কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না থাকিলেও প্রয়োজন মত লোক ডাকিয়া গল্প জমাইতে তিনি ভালবাসেন।

আজ প্রাতঃকালে চক্ষু চাহিয়াই উঠিয়া বসিলেন এবং বাহিরে আসিয়া যাহাকে পাইলেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শুনেছেন, সূর্য্যিবাবু,—চাকরি করা আর পোষাল না। কোন্ দিন হয়ত ব'লে বসবে—কাল থেকে আর এস না। একে তো পাওনা মাইনের টেন পারসেণ্ট বহুদিন থেকে কেটে নিচ্ছে, আবার বলে কিনা, রিডাকশ্যন! আহা, সক্কাল বেলায় এক চোখে আর হাত দেবেন না, কে জানে আবার কোন্ সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসব।'

বেচারি সূর্য্যবাবু বিষ্ণুবাবুর নির্দ্দেশ মত দুটি চক্ষুতে হাত কচলাইলেন।

বিষ্ণুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'শোনেন নি কিছু?'

'কই, না তো।'

কণ্ঠস্বর চড়াইয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'এখনও কাক-পক্ষীতে জানে না এ-খবর। আমার দাদার ভায়রাভাই যে সিমলের হেড আপিসে কাজ করে; যা-কিছু কলকাঠি তারাই তো টেপে। কাল হঠাৎ ক-দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে, দেখা হ'তেই বললে সব। মনে আছে মাইনে-কাটার খবর ওর মারফৎ পেয়ে সেবার আপনাদের জানাই। এই সুরেশ তো সেদিন হেসেই উঠেছিল। বলেছিল, স্রেফ গপ্পালিস! কেমন, সে-খবর মিথ্যে হয়েছিল। আজ কত দিন ধরে তার জের চলছে বল দেখি?' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

সূর্য্যবাবু বলিলেন, 'সে সু-খবর তো আজও মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করছি।'

বিষ্ণুবাবু হাসি থামাইয়া সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন ও মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'যা বলি মিথ্যে বলি না। বাজে বলি না। আমরা তো চ্যাংড়া নই, বয়স আমাদের হেঃ—'

সত্যশরণবাবুকে দেখিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মুখে ছেদ টানিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'শুনেছেন, সত্যবাবু,

এবার আপিস থেকে বেলপাতা শোঁকাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

শুষ্ক মুখে সত্যশরণ বলিলে, 'তাই নাকি, কবে থেকে?'

বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'শিগ্‌গিরই হবে। রিট্রেঞ্চমেণ্টের খসড়া সব তৈরি হয়ে গেছে, কেবল তারিখটি বসানো বাকী।' বলিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, 'ভাবছিলাম আর দুটো বছর যাক, রিটায়ার করে কোন তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে বাস করব, তা আর অদৃষ্টে নেই।'

সূর্য্যবাবু ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, 'আপনার ভাবনা কি, মশাই, পাকা ফলটির মত টুপ ক'রে খসে পড়লেই হ'ল! চাকরি তো করছেন বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ধরে, যেখানে থাকবেন পেনসন নিয়ে রাজার হালে বাস করবেন।'

বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'তোমাদেরই বা ভাবনা কিসের? আট-দশ বছর সার্ভিস হ'ল, উপর-নীচে কোন দিক দিয়েই নাগাল পাবে না। যেতে সিনিয়রমোষ্ট বা জুনিয়ররাই যাবে।' একটু থামিয়া বলিলেন, 'হবে না কেন, কংগ্রেস এসে ঠেকাক!'

এমন সময় প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া সুখেন্দু প্রবেশ করিল। বয়স বাইশ-তেইশ, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় চুল অবিন্যস্ত, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। সবে কলেজ ছাড়িয়া সে চাকরিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। কে একজন দূর-সম্পর্কীয় দাদা সওদাগরি আপিসে চাকরি দিবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া পড়া শেষ হইলেও মেস ত্যাগ করে নাই।

কংগ্রেসের নিন্দা হইলে সুখেন্দু চটিয়া উঠিত, লঘুগুরু না বাছিয়া মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিত।

ঢুকিয়াই সে বলিল, 'কি দাদা, কংগ্রেস আপনার বুকে আবার কি মই ডললে? বেশ তো আছেন মেস, আপিস আর সায়েব নিয়ে, ও-সব খারাপ নাম আবার সক্কাল বেলায় কেন?'

বিষ্ণুবাবুর বৃহৎ লাল চক্ষু দুইটি কুঁচকাইয়া ছোট হইয়া গেল, মুখের কুঞ্চনে হিট্‌লারী ফ্যাশানের গোঁফটিকে বার দুই নাচাইয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'কত ধানে কত চাল এখনও তো বোঝ নি, যাদু! সবুর কর, সবুর কর, আগে চাকরিতে ঢোক, তখন বুঝবে।'

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, 'সে তো আপনাদের মত মহাত্মাদের দেখেই বেশ মালুম করছি। সেদিন বললেন, পি. সি. রায় বাঙালী জাতির সর্ব্বনাশ করছেন। যত সব ভিন্‌দেশীয়দের ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে বাংলার দফাটি শেষ ক'রে আনছেন। বিদেশে আর কারও কলম পিষে খেতে হবে না।'

সক্রোধে ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ করিয়া ঘন ঘন ওষ্ঠ সমেত গোঁফ নাড়িয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'ডেঁপোমি নয় ছোকরা, বুঝবে। পি. সি. রায় যা সর্ব্বনাশ করছেন, এমন সর্ব্বনাশ তোমার কংগ্রেসও করতে পারে নি। কিনা কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখছেন, বাঙালী আত্মস্থ হও। তোমাদের হা-চাকরি বৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায়ে মনোযোগ দাও। মাড়োয়ারী-ভাটিয়া মিলে তোমাদের বাংলা দেশ লুটে নিলে। তোমরা দেশের ছেলে হয়ে ভিখারীর মত জুলজুল করে চেয়ে আছ আর ওদের দুয়োরে ধর্ণা দিচ্ছ, ওরা তোমাদেরই পয়সায় কলকাতার প্রায় সবটা কিনে নিলে। এই যে বিষ ছড়াচ্ছেন, এর ফল কি ভাল হবে?'

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, 'তা সত্য। ঘরের মটকায় আগুন লেগেছে এ-কথা বলে ঘুম ভাঙানোও তো মহা অপরাধ! আর ঘুম যদি ভাঙাবেই তো এমন বেয়াড়া বেসুরো চীৎকার কেন? মোলায়েম ক'রে, কবিত্ব ক'রে বল!'

বিষ্ণুবাবু বিকৃত মুখেই বলিলেন, 'জান তো ভারি! আমার এক আত্মীয় চাকরি করতেন এক ভাটিয়ার গদিতে। পরশু কাঁদ-কাঁদ মুখে এসে বললেন, 'দাদা, আজ আমার চাকরিতে জবাব হ'ল।' অপরাধ? সে বাঙালী এই অপরাধ। ভাটিয়া প্রভু বললেন, 'আমরা তোমাদের সব লুটেপুটে খাচ্ছি, আর কেন। তোমাদের পি. সি. রায়কে গিয়ে বল এর ব্যবস্থা করতে। তোমাদের ঠকিয়ে আমরা অন্ন করছি—সে অন্ন তোমাদের আবার দিয়ে পাপের ভাগী কেন হই?' শুনলে তো জবাব? দেবেন পি. সি. রায় ওঁকে একটি চাকরি? ওঁর বৌ-

ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে যে শুকিয়ে মরবে—উনি তার কি ব্যবস্থা করবেন শুনি?'

বিষ্ণুবাবুর মুখে আবার হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সুখেন্দু বলিল, 'চাকরির মায়া যে-বৃদ্ধ কখনও করেন নি তিনি কেরানীগিরি দিয়ে পোষণ করবেন আপনার আত্মীয়কে?'

বিষ্ণুবাবু দুই হাতে চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'আলবৎ করবেন। কেন তিনি ভিন্ন জাত ক্ষেপিয়ে আমাদের অন্ন মারবার ব্যবস্থা করছেন?'

সুখেন্দু বিষ্ণুবাবুর উত্তেজনার মুহূর্তে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কোলাহলে অনেকেই প্রাতঃনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুবাবু ও সুখেন্দুর বাক্‌যুদ্ধ উপভোগ করিতেছিলেন। সুখেন্দুর সঙ্গে সকলেই সরবে হাসিয়া উঠাতে বিষ্ণুবাবু একেবারে নিবিয়া গেলেন। দুই হাতে কোমরের কাপড়ের কসি আঁটিতে আঁটিতে আপনার জায়গায় গিয়া বসিলেন এবং অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, 'যত সব চ্যাংড়া—হাঃ।'

হাসি থামিলে সুখেন্দু বলিল, 'আমাদের অবস্থাটা কি রকম জানেন, সেই স্বার্থপর বুড়োর মত। বলুন না দীনেশবাবু—সেই রকম সুর ক'রে, 'ও বাবা মধু, এক বার জলে নেমে দেখ তো, বাবা, কুমীর আছে কিনা, আমার রাধু নাইবে।' অর্থাৎ জলে যদি কুমীর থাকে তো প্রতিবেশীর ছেলে মধুই যাক, রাধু আমার বেঁচে থাক।'

—'হাঁ, অনেক দিন চাকরি করলে একটু মায়া পড়ে বইকি। যার আর কোন ব্যসন নেই, তার সায়েব-সংবাদ যে গীতা-সংবাদের চেয়ে মূল্যবান হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ।' বলিয়া বেচারি সূর্য্যবাবু বিষ্ণুবাবুর ঘর উদ্দেশ করিয়া একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই হাসিয়া উঠিলেন।

অনিল প্রফুল্ল কণ্ঠেই বলিল, 'যাই বল ভাই, চাকরি আমাদের। ওয়েজকাটও নেই, রিডাকশনের ভয়ও নেই। যখন মাইনে বাড়ে একেবারে পঞ্চাশ—'

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, 'আর কমবার মুখে দশখানি দশ টাকার নোট!'

অনিল বলিল, 'তাও হয় তবে সেটা খুব কম। কে ভাল কাজ করে না করে সেদিকে সায়েবদের নজর খুব বেশী।'

সুখেন্দু বলিল, 'কিছু দিন চাকরির উমেদারি ক'রে আমার ও-সম্বন্ধে একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। চাকরি কেমন জানেন? ঠিক ভারতবর্ষের আবাদী জমির মত। যে-জমির উপর মেঘের মমতা পড়ল না সে-জমি শস্য সমেত শুকিয়ে গেল, যেখানে অতিবর্ষণ সেখানেও শস্য-হানির সম্ভাবনা। সুবর্ষণ আর ক'টা কমিতে হয়। আমাদের চাকরির ক্ষেত্র এই অদৃষ্টনির্ভরশীল জমিগুলির মত।'

অমিয় এত ক্ষণে বাহিরে আসিয়াছে। সুখেন্দুর শেষ কথাগুলি তাহার কানে প্রবেশ করিতেই বলিল, 'না, সুখেনবাবু, জমিতে চেষ্টা করলে তবু ফসল ফলানো যায়, নদীর জলে সেচ তৈরি বা বাঁধ বেঁধে বন্যার জল আটকানো—'

সুখেন্দু বলিল, 'না অমিয়দা, কথাটা আপনি আমার সব শোনেন নি। আমি ভারতবর্ষের জমি বলেছি। যেখানে উপায় আছে, অথচ আলস্য অফুরন্ত; ধান বুনে চাষা মেঘ-দেবতার পূজা করে। তবে এ-কথা আপনি বলতে পারেন যে, আর যেখানে যত আলস্যই থাক, চাকরির চাষ-আবাদে আমরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক চাষা। ওখানে একবার বীজ বোনা হয়ে গেলে ফসল কেটে ঘরে না তোলা পর্য্যন্ত আমাদের অমানুষিক পরিশ্রম চলেই চলে। না হ'লে, ধীরেসুস্থে যখন অবসর নেবার সময় তখনও 'হা-চাকরি' বলে ঐ খুঁটি কেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।'

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সূর্য্যবাবু বলিলেন, 'চুলোয় যাক চাকরি, এদিকের একটা সুসংবাদ শোনেন নি বুঝি?'

'কি, কি?' বহুকণ্ঠে প্রশ্ন হইল।

'অমিয়বাবুর যে এ-মাস থেকে মাইনে বাড়ছে।'

'সত্যি? সত্যি? তাহলে আমাদের খাওয়া?' বহুকণ্ঠের প্রশ্ন।

অমিয় হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'পাঁচ টাকা মাইনে বাড়বে, কিন্তু কেটে নিচ্ছে যে টেন পারসেণ্ট।'

'সে তো সকলকারই সমান অবস্থা। কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।'

'আগে মাইনে পাই।'

সূর্য্যবাবু বলিলেন, 'সে ত ইনক্রিমেণ্টের দরুন। আর একটা জবর ভোজও যে পেকে উঠছে।'

আবার বহুকণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, 'কি, কি ?'

সূর্য্যবাবু অমিয়র পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'বলি, অমিয় বাবু ?'

অমিয়র সারা মুখে সূর্য্যাস্তের রং আসিয়া লাগিল; মাথা নীচু করিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'বেশ তো, বলুন না।'

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, নিজের ঘরে একটু দ্রুত পদেই চলিয়া গেল।

গভীর লজ্জা অনুভব করিলেও গভীর আনন্দও সে সংবাদে ছিল বইকি। সূর্য্যবাবু তাহার রুম-মেট। সেদিন বাড়ী হইতে পাওয়া সেই চিঠিখানির আংশিক মর্ম্ম অমিয়ই যে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিয়াছে।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অমিয়র মুখে উদ্বেগের ছায়া হয়ত সুনিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। পাশে বসিয়া সূর্য্যবাবু হয়ত সেটুকু লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'খবর কি, অমিয় বাবু ? বাড়ীতে কারো অসুখ করেছে কি ?'

অমিয় শুষ্ক মুখে বলিয়াছিল, 'হাঁ, আমার স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে।'

'খুব জ্বর বুঝি ?'

'না, জ্বর, পেটের অসুখ ও-সব কিছু নয়। কিছুই সে খেতে পারছে না।'

'আর ?' সকৌতূহলে সূর্য্যবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

'আর খেতে গেলেই গা বমি বমি করে।'

সূর্য্যবাবুর কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু দুটি হাসির দীপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রসন্ন কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বটে তবে তো ভাগ্যবান পুরুষ আপনি।'

সূর্য্যবাবুর কৌতুকে অমিয় বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে লজ্জা ও আনন্দের গভীর স্বাদে সে হয়ত বিহ্বল হইয়াই পড়িয়া ছিল। এ কি সৌভাগ্যের সূর্য্যোদয় তাহার জীবনের আকাশে। চাকরি হইয়াছে, সংসার ধীরে ধীরে গুছাইয়া উঠিতেছে, এমন শুভলগ্নে শিশু-অতিথি তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইবে। বাঃ রে জীবন! চঞ্চল দুরন্ত স্রোতে সুবাতাস পাইয়া তরীখানি বুঝি স্ফীত পালে অভীষ্ট পথেই ছুটিয়া চলিল। নিজের সৃষ্টিতে এমন অপরিসীম আনন্দ কে জানিত ? প্রথম সূর্য্যালোকে নবজন্মের উত্তেজনায় রুক্ষ মাটি ভেদ করিয়া তৃণাঙ্কুর কি এমনই আবেগে কাঁপিতে থাকে ?

অমিয় সূর্য্যবাবুর সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। সেই দিনকার আনন্দ আজ যেন নূতন করিয়া তাহার সারা অন্তরে তরঙ্গ তুলিল। এ আনন্দ একা এবং নির্জ্জনে কিছুক্ষণ ভোগ করা তার চাই, নতুবা সম্পূর্ণতা নাই। কোলাহলে ইহার মর্ম্মকথাটি মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া যাইবে। অন্য পাঁচ জনের মাঝে বিতরণ করিয়া যদিও এই বার্ত্তার পরম সার্থকতা, তথাপি নির্জ্জন মুহূর্ত্তে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়া সে এটি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিবে। মাথার উপর খোলা কলের জলধারা অবিশ্রান্ত ঝরিতে থাকিবে, মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত চলিবে এই শুভ আবিষ্কারের ফল্গুধারা। কে বলে সৃষ্টির সোমরস কেবল মাত্র দেবতারাই উপভোগ করিয়া থাকেন; ইহার মাদকতায় মানুষও যে পাগল হইয়া যায়।

কলের তলায় মাথা পাতিয়া অমিয় নূতন করিয়া এই অভাবনীয় উল্লাসকে মনের মধ্যে রোমন্থন করিতে লাগিল। কিন্তু সন্তানের আবির্ভাব-সংবাদের উগ্র উল্লাস অবিশ্রান্ত জলধারা পতনের শীতলতায় ক্রমশঃ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া যে-ভ্রূণ রক্তমাংসের মানবশিশুতে নিঃশব্দে রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার আবির্ভাব অমিয়র জীবনে প্রথম বসন্ত-প্রকাশের যত মাধুর্য্য ও যত বিস্ময়ই বহিয়া আনুক না কেন, পুরাতন পৃথিবীর মৃত্তিকায় নূতন করিয়া রোমাঞ্চ জাগাইতে পারিবে কি ? অবিশ্রান্ত জলধারা-পতনের সঙ্গে যাহাদের পদধ্বনি শব্দমুখর হইয়া উঠিতেছে, সেই শিশুদেবতার মিছিলের পুরোভাগে চলিয়াছে বিশ্বজিতের সন্তান, বীরেনের বংশধর, এবং আরও অনেক নাম-না-জানা ও আধজানা অযুত রুগ্ন, দুর্ব্বল, ক্ষুধাতুর ও মৃত্যু-অভিমুখী শিশু। তাহাদের

পিছনের পটভূমিতে ও সম্মুখের প্রাঙ্গণে বিরাট্ অন্ধকার-স্তূপ, মাঝখানে শুধু স্তিমিত আলোয় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উহাদের যাত্রা সুরু হইয়াছে। সেই অন্ধকার ও শিশু-জনতার মধ্য হইতে অমিয়র সন্তানকে পৃথকভাবে বাছিয়া লওয়া কি এতই সহজ ?

অমিয় জোর করিয়া চক্ষু বন্ধ করিল ও অন্তরের দৃষ্টিকে বহু দূরে প্রসারিত করিয়া দিল। কতকগুলি আলোকবিন্দু অন্ধকার তরঙ্গে পড়িয়া ক্রমশঃ যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে, সেখানে কলরব বা কোলাহল নাই, মুক্তির কোন প্রয়াস নাই, আর্ত্তনাদের ঘটা নাই। স্থির নিঃশব্দ অথচ দ্রুত মৃত্যুর লীলায় অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে। দম বুঝি বন্ধ হইয়া আসে।

সজোরে অমিয় চক্ষু চাহিল। জলধারা তেমনই অশ্রান্ত পড়িতেছে, এবং সারা গায়ে কাঁটা দিয়া শীত-শীত বোধ হইতেছে।

তাড়াতাড়ি সে গামছা নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে লাগিল। পিছনে যাহার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড তাড়না, নিশ্চিন্তে দু-দণ্ড আলো বা অন্ধকার, সুখ বা দুঃখকে ধ্যান করিবার সময় তাহার কোথায় ?

[ক্রমশঃ

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

শ্রীকানাই সামন্ত

কজ্জলজলদপটে উদ্ভাসিল চকিত বলাকা :
বিদ্যুৎকঙ্কণ-আঁকা
করে কে গো বিরহিণী ব্যর্থ প্রতীক্ষার থালি হ'তে
অম্লান মন্দারমাল্য নিক্ষেপিল আর্দ্র বায়ুস্রোতে !
ক্ষণপরে মিলাল কোথায় দিব্য দিবাস্বপ্ন হেন !

একা এ প্রান্তরপ্রান্তে সমুৎসুক ব'সে আছি কেন
সম্মুখে নয়ন মেলি : শ্যামল ধান্যের ক্ষেতগুলি
ক্ষণে ক্ষণে বায়ুচ্ছ্বাসে আদিগন্ত ওঠে দুলি দুলি।
কমলকহ্লারশোভা কাকচক্ষু সরসীর জলে।
তীরে সিক্ত তালীবন স্থির শান্ত শিহরণছলে
কী পুলক প্রকাশিছে ! আমজামবেণুবনে-ঢাকা
পরিচিত গ্রামগুলি দূরে দূরে চিত্রবৎ আঁকা :
পরিচয়হীন শোভা ; যত দূর তদধিক দূরে।

মেঘান্তরিত সূর্য্যে অবিশ্রুত পূরবীর সুরে
মুদিছে পদ্মিনী দিবা। মূরছায় মূর্চ্ছনা তাহার
বিরহের দীর্ঘশ্বাসে মোর মর্ম্মতলে। যে আমার
প্রিয় সে কি হোথা নাই ওই দূরে কিম্বা দূরতরে ?
সে কি একা রুদ্ধ ঘরে ? সে কি একা বিষণ্ণ প্রান্তরে
সুদূর পশ্চিমে দৃষ্টি মেলি মোরে সন্ধানিছে ? হায়,
দিশাহীন সে সন্ধান দিকে দিকে সীমায় সীমায়
সজল শ্যামলে নীলে কেঁদে ফিরে। কে দেখাবে দিক ?

বিষণ্ণ বিরহী নির্নিমিখ
এ সন্ধ্যায় দূরে দূরে এই মত মানব-হৃদয়
ধায় বসি মাঠে ঘাটে : এই মত মেঘবাষ্পময়
পশ্চিম গগনতল ; এই মত সাশ্রু পক্ষ্মরেখা,
হায়, এই মত একা !

সাঁলো শিল্প প্রদর্শনী

ওডিসিয়ুসের আশ্রয়দাত্রী রাজনন্দিনী নসিকা
শিল্পী রিউল দ্য গর্দিয়ের

স্পেন গৃহহীন শিশু ও রমণী
এমিল ব্রাঁশ

ভিক্টর হুগোর প্রতিমূর্ত্তি
শিল্পী এইচ, বুশার

ভাস্কর বুর্দেলের প্রতিমূর্ত্তি
শিল্পী দানিয়েল বাকে

ইন্দোচীনের শ্রমণ-মূর্ত্তি
শিল্পী পল দ্য কুএ

কয়লাকুঠীর দিনমজুর

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

দামোদরের তীর ঘেঁষিয়া বিহারের খানিকটা রুক্ষ বন্ধুর ভূভাগ—শাল, পলাশ ও মহুয়া বৃক্ষে সমাকীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া রহিয়াছে ছোটবড় অসংখ্য কয়লাকুঠী। যে-দিকেই তাকাও, দেখিতে পাইবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'হেডগীয়র' দৈত্যের মত মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এঞ্জিনের শব্দে ও চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। রাস্তাগুলিও প্রায়ই গুঁড়া কয়লার দ্বারা প্রস্তুত। চতুর্দ্দিকের এই কালিমাময় আবহাওয়ার ভিতর অনুরূপ কালিমাময় জীবন যাপন করিতেছে কুঠীর মজুরেরা। ইহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে ভবিষ্যৎচিন্তা। গতানুগতিক ভাবে মেষপালের ন্যায় মাত্র কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিয়াই ইহারা দিন কাটায়। কয়লাকুঠীর ধনী স্বত্বাধিকারীরা কখনই মজুরদের বেশী পারিশ্রমিক দিতে চাহেন না—যথাসম্ভব অল্প খরচে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভ রাখিয়া কাজ চালাইতেই তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। বেশীর ভাগ সময়ই মজুরেরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে খাটিয়াও কায়ক্লেশে দিনপাত করে। অসুখবিসুখ হইয়া খাটিতে অপারগ হইলে অর্দ্ধাহারে, এমন কি অনাহারেও হয়ত দিন কাটে। তাও ইহাদের অভাব অতি সামান্যই। মাত্র লবণসহযোগে খুব মোটা রাশি চালের মাড়-ভাতই ইহাদের সাধারণ খাদ্য, ব্যঞ্জনাদি অন্যান্য উপকরণ বিলাসিতার সামিল। কাপড়চোপড়েরও বিশেষ বালাই নাই—শীতের সময় দিনে রৌদ্র এবং রাত্রে কয়লার আগুন শীতনিবারণের কাজ করে। সাধারণতঃ মজুরদের এই সামান্য অভাবও মজুরির পয়সায় ভালভাবে পূরণ হয় না। কিন্তু যদিই বা ভাগ্যক্রমে কখন-সখন মজুরির হার বাড়িয়া যায়, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহারও সুযোগ লইবার যোগ্যতা ইহাদের নাই। দুর্দ্দিন তো কষ্টে কাটেই, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সুদিনের সুবিধাও ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। দুর্দ্দিনের দুঃখ তো আছেই—তাহাতে পরিতাপ নাই, কিন্তু নিজেরই অবহেলায় সুদিনও যদি বৃথায় চলিয়া যায়, লাভ যদি ক্ষতিরই রূপান্তর ধরিয়া আসে, তাহার অপেক্ষা অনুশোচনার বিষয় আর কি হইতে পারে? অজ্ঞতা ও অশিক্ষার দরুন মজুরেরা বেশী পারিশ্রমিক পাইলে মদ খাইয়া ও জুয়া খেলিয়াই বাড়্তি পয়সাটা উড়াইয়া দিবে। সঞ্চয় কাহাকে বলে, দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকার অর্থ কি, সে সম্বন্ধে ইহাদের কোন ধারণা নাই। অন্নাভাবে সপরিবারে উপবাস করিবে, দেনার দায়ে ঘটিবাটি বিক্রয় করিবে, তথাপি সময়ে সঞ্চয় করিবে না। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইলে কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে উচ্চহারে টাকা ধার লইবে এবং চিরজীবন ধরিয়া সুদ দিয়া যাইবে, তথাপি বেশী মজুরির সময় প্রত্যহ খাটিবে না বা খাটিলেও মজুরির পয়সা সঙ্গে-সঙ্গেই নানা আমোদ-প্রমোদে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। নিজেদের কল্যাণ সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র ধারণাও ইহাদের নাই। এইরূপে শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, আশাহীন অতি কদর্য্য ধূলি-মলিন জীবন যাপন করিয়া ইহারা সমগ্র সভ্যজগতের সভ্যতার রসদ জোগাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত আনন্দ হইতে ইহারা বঞ্চিত—কোন উজ্জ্বল আশার আলো ইহাদের অন্ধকার জীবনযাত্রাপথে বিন্দুমাত্রও রশ্মিপাত করে না।

সেদিন রবিবার সন্ধ্যায় এমনি একটি কয়লাকুঠীতে ৫ নম্বর ধাওড়ার তৃতীয় ঘরটিতে ফুল্কী ও হরিয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। কয়লাকুঠীর ধাওড়া মানে টালি, টিন, খোলা অথবা খড়ে-ছাওয়া ছোট ছোট খুপ্রিওয়ালা লম্বা লম্বা দোচালা। প্রত্যেক খুপ্রির সামনে অর্দ্ধেকটা ঘেরা একটু বারান্দা—তাতে একটা করিয়া চুল্লী—সেই হইল রাঁধিবার জায়গা। ঘরে প্রায়ই জানালা থাকে না—যদিই বা থাকে প্রায় না-থাকার মত—মোটের উপর সে-সব

ঘরে আলো-বাতাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এক-একটি দোচালায় দশ-বারটি করিয়া ঘর—প্রত্যেক ঘরের অধিবাসীই সন্ধ্যাবেলায় যে যার নিজের নিজের চুলায় আগুন দিয়াছে। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার উত্তাপে এবং স্বল্পপরিসর স্থানে বহুজনের একত্র বাসহেতু প্রচণ্ড কলরবে সহজ মানুষেরই মাথা বিগড়াইয়া যায়। এমনি সন্ধ্যায় রোরুদ্যমান অর্দ্ধ-উপবাসী, ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যাদিগকে কোনরূপে ঘুম পাড়াইয়া অনাহারক্লিষ্টা ফুলকী তাহাদের পাশে শুইয়া কাঁদিতেছিল। এমন সময় প্রমত্ত হরিয়া গান গাহিতে গাহিতে ও হল্লা করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। ফুল্‌কী নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না—যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া হরিয়াকে গালি দিতে লাগিল। প্রমত্ত হরিয়াও তাহাকে খুব মারধোর করিতে আরম্ভ করিল—গোলমাল শুনিয়া ধাওড়ার অন্য সব লোকেরা আসিয়া তাহাদের উভয়কে পৃথক্ করিয়া দিল—হরিয়া প্রায় তখনই ঘুমাইয়া পড়িল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুল্‌কীও এক সময় ঘুমাইল।

অনেক রাত্রে হরিয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল—তাহার নেশার ঘোর তখন কাটিয়া গিয়াছে; ধীরে ধীরে সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। কয়েক দিন ধরিয়া সে কিছুতেই কাজে যাইতে চাহিতেছে না—ফুল্‌কীর সব যুক্তিতর্ক, মিনতি, অনুনয় উপেক্ষা করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে। আজ সকালে ফুল্‌কীর নিকট হইতে তাহার শেষসম্বল পয়সা কয়টি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—সন্ধ্যায় প্রচুর মদ্যপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। মজা এই যে, বিহারে মদ খুব সস্তা*। কোনরকমে একবার বরাকর পার হইতে পারিলেই আর ভাবনা নাই। ঝরিয়ার কুলীমহলে সেজন্য মদ্যপান আরও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান—কোনরূপে দু-চারিটা পয়সা জোগাড় করিতে পারিলেই মনের আনন্দে মদ খাওয়া যায়।

হরিয়া তো মদ খাইয়া সারাদিন বাদে বাড়ী ফিরিল।

এদিকে ক্ষুধার্ত্ত শিশুগুলিকে লইয়া ফুল্‌কীর দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা কি সে এখনও বুঝিতে পারিতেছে না? ঘরে নাই চাউল, হাতে নাই পয়সা। ধার করিয়া যে অল্প দুটি চাউল পাওয়া গিয়াছিল তাহারই মাড়-ভাত করিয়া এবং কুড়াইয়া-কাড়াইয়া যে-শাকপাতা সংগ্রহ করা গিয়াছিল তাহাই সিদ্ধ করিয়া সে কোন রকমে বুভুক্ষু শিশুদের কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঘুমন্ত পুত্রকন্যাদের এবং তাহাদের পার্শ্বে শায়িতা ফুল্‌কীর দিকে চাহিয়া হরিয়ার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। নিজের প্রতি অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল। ধীরে ধীরে সে ফুল্‌কীকে জাগাইল। অনুতপ্ত চিত্তে তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কিরা দিয়া কহিল, আর কখনও সে তাহাদের এইরূপ কষ্ট দিবে না। কাল ভোরেই সে কাজে বাহির হইবে। ফুল্‌কীর দুই হাত ধরিয়া সোৎসাহে সে কহিল, "তুই দেখে লিস—কাল আমি একাই তিন গাড়ী বোঝাই ক'রে তুখে টাকা আনে দিব—কাল তো ই খাদে যাব নাই, উই দিকের চাঁদনী খাদে যাব। সেথায় মজুরিও বেশী আর ঝুলা কয়লা কাটতেও খুব মজা—তুই ভাবিস নাই তো—"

এই সব কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ভোরের দিকে হরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু ফুল্‌কী আর ঘুমাইল না। সে ভোরে উঠিয়াই কিছু শাকপাতা তুলিয়া আনিল। তাহার পর পাশের ঘরে তাহার সইয়ের নিকট হইতে কিছু চাউল ধার করিয়া আনিয়া, চুলায় আগুন ধরাইয়া ভাত চড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হরিয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাঁইতি ও শাবল লইয়া সে কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ফুল্‌কী তাহাকে খাইয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হইল না—বলিয়া গেল, "না রে না—এখনই যাই, অনেকটা দূর যাতে তো হবে—শেষে ভাল জায়গা পাব নাই—তুই উহাদের খাওয়ায়ে দে—নিজেও কিছু খায়ে লিস—কাল হ'তে তো কিছু খাস নাই—আমি আসেই খাব।" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। তাহার নবজাগ্রত উৎসাহ ও অনুশোচনা তাহাকে আর অপেক্ষা করিতে দিতেছিল না।

* গল্পটি ১৯৩৮ সালে লেখা। বিহারের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা তখনও মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধ জারি করেন নাই।

একটু পরেই ক্ষুধাতুর শিশুগুলি জাগিয়া খাবারের জন্য বায়না ধরিল। ফুল্‌কী তাহাদের খাওয়াইয়া, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া আদর করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে একটা কোলাহল শোনা গেল। মনে হইল অনেকগুলি লোক হটগোল করিতে করিতে যেন তাহার ঘরের দিকেই আসিতেছে। সে উঠিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই এক জন বলিয়া উঠিল, "ঐ তো হরিয়ার বৌ"—এত গোলমাল শুনিয়া ফুল্‌কী ভাবিতেছিল ব্যাপারখানা কি—এখন নিজের নাম শুনিয়া আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেনে গো—কি হইছে?" তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা কেহই কিছু বলিতে পারিল না—তার্‌ পর তিন-চার জন একসঙ্গে যাহা বলিয়া উঠিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বন্ধ সুঁদে (fenced gallery) ঝুলা কয়লা (hanging coal) কাটিতে গিয়া এক চাপ কয়লা ভাঙিয়া হরিয়ার বুকের উপর পড়িয়াছে—পাঁজরা ভাঙিয়া গিয়াছে—প্রাণ এখনও রহিয়াছে বটে, তবে আর বেশীক্ষণ হয়ত থাকিবে না। তাই তাহারা ফুল্‌কীকে ডাকিতে আসিয়াছে। প্রথমটা ফুল্‌কীর যেন বিশ্বাসই হইতে চাহে না—মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে যে সুস্থসবল মানুষ হাসিমুখে তাহার কাছে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তাহার জীবনের মেয়াদ আর মাত্র ঘণ্টা-কয়েক? সেই বিদায়ই শেষ বিদায়? আর কখনও সে এই ঘরে আসিবে না? সেই জোয়ান মরদের জীবনের এখনই শেষ হইয়া গেল? কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু লোকগুলির মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে সংবাদ সত্য। তখন সে কোন দিকে না চাহিয়া—কোন কথা না বলিয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিল। অপর সকলে তাহার অনুসরণ করিল।

হরিয়াকে তখন ডাক্তারখানায় লইয়া আসা হইয়াছে। ডাক্তারবাবু, কম্পাউণ্ডারবাবু তাহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। অন্য বাবুরাও রহিয়াছেন, ম্যানেজার সাহেবও আসিয়াছেন—সহসা উন্মাদিনীপ্রায় এই বাউরী-রমণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে যেন একটু সম্ভ্রমের সহিতই সরিয়া দাড়াইলেন। ফুল্‌কী কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা হরিয়ার নিকট গিয়া তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো—আমি যে তোমার লাগে মাড়ভাত রাঁধে রেখেছি গো"—সংজ্ঞাহীন, মুমূর্ষু হরিয়ার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু কয়লাকুঠীর বহু দুর্ঘটনায় অভ্যস্ত কঠিনহৃদয় কর্ম্মচারীদের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

কয়লার গুঁড়ার কালো পথের উপর দিয়া, কয়লার ধূলি-ভারাক্রান্ত মলিন বাতাসে ফুল্‌কীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চিন্তানিমগ্না—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী অঙ্কিত

বক্রেশ্বর

শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি. এল.

[আমাদের প্রবাসীতে "বঙ্গে ও বঙ্গের নিকটবর্ত্তী উষ্ণপ্রস্রবণ-যুক্ত অঞ্চলে আরোগ্যশালা স্থাপনের প্রস্তাব" প্রবন্ধে বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা দেশের উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত এই স্থান সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইল।]

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ির তের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ঈ. আই. আর. অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনের

বক্রনাথ শিবমন্দির
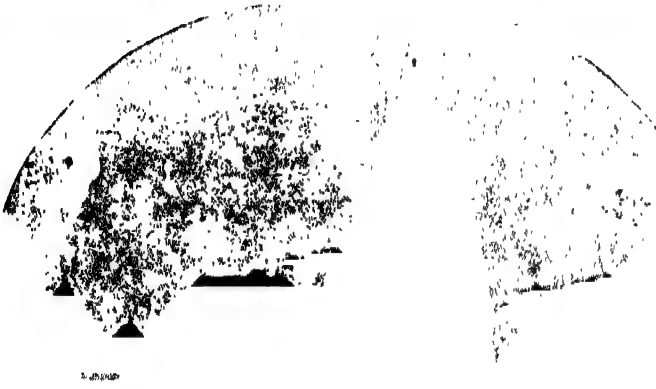
দুবরাজপুর ষ্টেশনের সাড়ে সাত মাইল উত্তরে বক্রেশ্বর তীর্থস্থান অবস্থিত। উক্ত দুই দিক্ হইতেই এখানে আসিবার পাকা রাস্তা ও যানবাহনাদি আছে। এই স্থানের উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ বেষ্টন করিয়া বক্রেশ্বর নদী প্রবাহিত।

বক্রেশ্বর, মহাঋষি অষ্টাবক্রের তপস্যাভূমি। এই স্থানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ঋষি-আরাধিত শিব, ঋষি[illegible]নামানুসারে বক্রেশ্বর নামে অভিহিত হন।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত "শ্রীশ্রী৺বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য" পুস্তকে এই তীর্থ "গুপ্ত-কাশী" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৬৫৮-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ম্যাথ্ ভ্যান ডেন ব্রুক্ (Mattheus Van den Broucke) চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণর ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র[1] অঙ্কিত করেন। পরে এই মানচিত্র ভ্যালেণ্টাইন (Valentyn) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হয়। তাহাতে বক্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাতে বক্রেশ্বর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়া কাশিমবাজার পর্য্যন্ত দুইটি রাস্তাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে জানা যায় যে, তখনকার দিনেও বক্রেশ্বরের প্রাচীন মাহাত্ম্যের কথা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং বক্রেশ্বর তীর্থে জনসমাগম হইত।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে (১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩) বক্রেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

"বক্রেশ্বর তীর্থ।—…মোং বীরভূমির নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উষ্ণোদক ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে ঘাট আছে। ঐ কুণ্ডহইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে পড়িতেছে কিন্তু তাহাতে কুণ্ডের জল কখন ন্যূনাধিক হয় না। কুণ্ড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ

(১) 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ. ৭০৮।

গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে পারে না কিন্তু কোন শস্য দিলে সিদ্ধ হয় না ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে তাহার অতিনিকটে আর কএকটা কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল।"*

বীরভূমে যে-কয়েকটি পীঠস্থান আছে তন্মধ্যে বক্রেশ্বর একটি মহাপীঠ। এখানে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন হইতে সাত দিন ব্যাপী একটি প্রকাণ্ড মেলার অনুষ্ঠান হয়। ঐ সময় এখানে বক্রেশ্বর মহাদেব, উষ্ণ-প্রস্রবণ ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শনার্থ প্রায় দশ-বার হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহা কেবল পীঠস্থান নহে—এখানে আটটি উষ্ণ-প্রস্রবণ ও পাপহরা নামক একটি নদী আছে। উষ্ণ-প্রস্রবণগুলিতে অবিরত জল ফুটিতেছে। নিকটস্থ ক্ষীণকায়া বক্রেশ্বর নদী বর্ষার সময় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে।

এখানকার প্রস্রবণগুলি সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন হাত নিম্নে অবস্থিত। সেগুলির চতুর্দ্দিক চৌবাচ্চার ন্যায় শান-বাধান। নিম্নের ছিদ্র দিয়া গরম জল বাহির হইয়া যায়, এই জন্য প্রস্রবণগুলি এক-একটি কুণ্ড নামে অভিহিত হয়। এখানে জীবিতকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, সূর্য্যকুণ্ড, যোগকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, পাচককুণ্ড প্রভৃতি দশ-বারটি উষ্ণ ও শীতল কুণ্ড আছে। উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান করিলে পক্ষাঘাত, বাত, দৌর্ব্বল্য, পুরাতন জ্বর, খোসপাচড়া প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অগ্নিকুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ—তাহা স্পর্শমাত্রেই হাতে ফোস্কা পড়ে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উষ্ণ-প্রস্রবণের সন্নিহিত কূপের জল সাধারণ কূপের জলের ন্যায় শীতল ও সুমিষ্ট।

মহাদেবের মন্দির সন্নিহিত শ্বেতগঙ্গা নামক বৃহৎ কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি ডুবন্ত ছোট প্রাচীর যায়। তাহাতে মানু রাপারের মত একটি বৃহৎ ছিদ্র আছে। এই কুণ্ডটির জল খুব বেশী গরম নহে; স্থানে স্থানে গরম ও ঠাণ্ডার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন অনেক পুরুষ-যাত্রী এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া পারাপার হয়। অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া পার হইতে পারিলে তাহারা নিজেদের নিষ্পাপ বলিয়া মনে করে এবং অকৃতকার্য্য হইলে এখনও তাহারা নিজেদের পাপী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এখানকার দেবতা মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব বক্রেশ্বর। মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি একটি পুষ্করিণী হইতে পাওয়া যায়। ইহাই এখানকার প্রাচীন মূর্ত্তি। বর্ত্তমানে মূর্ত্তিটি এক পাণ্ডার বাড়ীতে রক্ষিত আছে। দেবীর অষ্টাদশ ভুজে অষ্টাদশ প্রহরণ। নিম্নে সিংহ ও মহিষাসুর, চালচিত্রে কৌমারাদি নবশক্তি-মূর্ত্তি ক্ষোদিত।

পাপহরা বা বৈতরণী

ইহা ব্যতীত শ্বেতগঙ্গার উত্তর-সংলগ্ন প্রায় ঈশান কোণের নিকট "অক্ষয়বট", নিম্নে হরগৌরী প্রভৃতি কতক-গুলি প্রাচীন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মহামহোপাধ্যায়

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং.), পৃ: ৩১১।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া ইহা হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার নিকটেই একটি ক্ষুদ্র মন্দির-গৃহে স্থানীয় পাণ্ডারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন দেখাইয়া থাকে।

জীবিতকুণ্ড

এখানে কয়েক শতের অধিক শিবালয় পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত আছে। এগুলি তীর্থযাত্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলিই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বক্রেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন ও বৃহদাকার। ইহা কোন্ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, সম্মুখস্থ উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডের লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

উষ্ণপ্রস্রবণের দক্ষিণ দিকে সাতকাটুলি, চন্দ্রসায়র* ও দামুসায়র নামক তিনটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের উৎপত্তির বিষয় বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। সেবাইতগণের মতে ঐ পুষ্করিণীগুলির নাম পুষ্করিণী-দাতৃগণের নামানুসারেই হইয়াছে।†

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্রেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বোক্ত অস্পষ্ট ফলকের একাংশ পাঠ করিয়া 'নরসিংহ' নাম ক্ষোদিত আছে এইরূপ বলেন। তাঁহার মতে মন্দিরটি উৎকল দেশীয় মন্দিরের অনুকরণে গঠিত এবং রাজনগর-রাজ গাঙ্গেয়-বংশসম্ভূত নরপতি অনঙ্গ ভীমের পুত্র নরসিংহদেব গৌড়াধিপ মালিক তুগ্রাল ইতুগাল খাঁকে পরাজিত করিয়া লক্ষুর[৫] অধিকার পূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎকালে তিনি এই বক্রনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত 'নরসিংহ' রাজপুরাধিষ্ঠিত নরসিংহদেব ভিন্ন অপর কেহ নহেন।[৬]

পূর্ব্বে যে-সকল কুণ্ডের কথা বলিয়াছি তাহার পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহত্যাগী ব্যক্তি যোগসাধনে নিযুক্ত আছেন। নিকটেই দাঁইহাট-নিবাসী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার প্রকাণ্ড

বক্রেশ্বর—হরগৌরী-মূর্ত্তি

* চন্দ্রচূড় বা চন্দ্রকেতু নামক রাজার খনিত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। তাঁহার নামে বক্রেশ্বরের ৩ মাইল উত্তরে চন্দ্রপুর নামে একটি গ্রামও আছে। প্রায় সওয়া সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এখানে রাজত্ব করিবার কথা শুনা যায়।

† Skrine : *The Hot Springs of Bakreswar.*

৫। বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী নগর।

৬। বীরভূম বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃঃ পাদটীকা।

মন্দির। এই কালীমাতার নিত্য পূজার ও অতিথি-সৎকারের সুব্যবস্থা আছে।

সিউড়ি রতন-লাইব্রেরির ৩২৬৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে, সিউড়ির ৪ মাইল দক্ষিণে গজালপুর-নিবাসী শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১১৯৭ সালের ২২শে বৈশাখ তারিখের লিখিত বক্রেশ্বর-বর্ণনা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

বন্দো করি জোড় পাণি যথা দেব বক্রমুনি
কৈলাস সমান পুরি খান।
দেখহ অপূর্ব্ব লীলা দেহবার চিত্র শিলা
নাটশালা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কলিতে কলুষ ভঙ্গা উত্তরেতে শ্বেতগঙ্গা
ইশানে বটের অধিষ্ঠান।
নৈঋতে ভৈরব নাথ ভূত প্রেত যার সাথ
ছাগমেষ নিত্য বলিদান।
ইটায় প্রাঙ্গণে বন্দ নাটগীত নানা ছন্দ
ভক্তগণ গড়াগড়ি যান।
দেখহ সাক্ষাতে পুরি হরশিরে সুরেশ্বরী
তাহে হর সদা করে স্নান।
গঙ্গার মহিমা যত কহিবারে পারি কত
স্বর্গে যায় যদি করে তুণ্ডে।
পাতকী করিতে ত্রাণ সেই জল বঞা যান
পড়য়ে যাইয়া অগ্নিকুণ্ডে।

চন্দ্রসায়র হইতে কতকগুলি শিবমন্দিরের দৃশ্য

অগ্নিকুণ্ডে জল পড়ি উঠয়ে বিম্বুকি ছাড়ি
সেই জল অনল সমান।
তথাহৈতে বঞা যায় পাপহরা কহি তায়
পাপ খণ্ডে তাহে কৈলে স্নান।
কপালে শোভিত ফোঁটা বসিঞা দ্বিজের ঘটা
শিবলিঙ্গ করয়ে নির্ম্মাণ।

শ্বেতগঙ্গা ও অক্ষয়বট

চন্দনচর্চ্চিত ফুলে বসিঞা পাপহরা জলে
পূজে হর হঞা সাবধান।
নৈবেদ্য অনেক আনি খণ্ড মণ্ডা দুগ্ধ চিনি
ঘৃত মধু আতব সন্দেশে।
নাম জাপি সদা ফেরে প্রণাম করিঞা হরে
স্বর্গ ভোগ পাইবার আশে।
প্রার্থী পূজা সাঙ্গ করি ভ্রমণ করএ পুরি
অনাদ্যে করয়ে দরশন।
সিদ্ধিয়া গঙ্গার নীরে দরশন করে হরে
করিঞা নৈবিদ্য আয়োজন।
প্রণাম করিঞা হর যাচিঞা করএ বর
যার সেই মনের বাসনা।
ধন ধান্য সুত আসে কেহ স্বর্গ ভোগ বাসে
সেই মত পুরএ কামনা।
হৃদে শিব শিবশক্তি ধ্যানী যোগী করি ভক্তি
সর্ব্বদা করএ তথা বাস।

দেবগণ সঙ্গে করি স্থিতি কৈলা ত্রিপুরারি
দেখ পুরি সাক্ষাৎ কৈলাস।
তিথি পাইঞা শিবরাত্রি আসি যাছে কত যাত্রি
কত শত নৃপতি নন্দন।
নৃপগণ বসি ঠাটে দেখে নানা গীত নাটে
গুণীগণে দেয় নানা দান।
জ্বালিয়া আতস বাতী গুজরান করে রাতি
নিশি হয় দিবস সমান।
দক্ষক্ষেত্র বক্রেশ্বর যাহে বিরাজিত হর
হেন স্থানের কি জানি বর্ণন।
দ্বিজ রমাকান্ত বলে শমন তরিবে হেলে
আশা করি ও রাঙ্গাচরণ।

মহাদেবের সেবার জন্য পালাক্রমে পাণ্ডা নিযুক্ত আছে। তীর্থদর্শনে আসিয়া তাহাদিগকে কিছু পয়সা দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া সব কাজই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইয়া দেয়। পাণ্ডারা এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণগুলি, মহাদেব, গৌরাঙ্গদেবের পদচিহ্ন, হরগৌরী-মূর্ত্তি, মানগিরি গোসাঞীর সমাধি, গুহা, কালীবাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় দর্শকগণকে দেখায় ও তৎসম্বন্ধে প্রবাদ বর্ণনা করে। তাহারা যাত্রিগণকে সমাদরে স্ব-স্ব গৃহে স্থান দেয় এবং তাহাদের পরিচর্য্যার কোনরূপ ত্রুটি করে না।

এখানে প্রায় প্রতিবৎসর মেলার সময় কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। বীরভূমে বৎসরে প্রায় ৮০টি ছোট-বড় মেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বক্রেশ্বরের মেলাই বৎসরের শেষ বড় মেলা। স্বাস্থ্য-বিভাগের যথারীতি ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক সময় দোকানদারগণ তাঁহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া থাকে এবং প্রায় প্রতিবৎসর এরূপ কোন-না-কোন সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

খেলা শ্রীপ্রভাত নিয়োগী
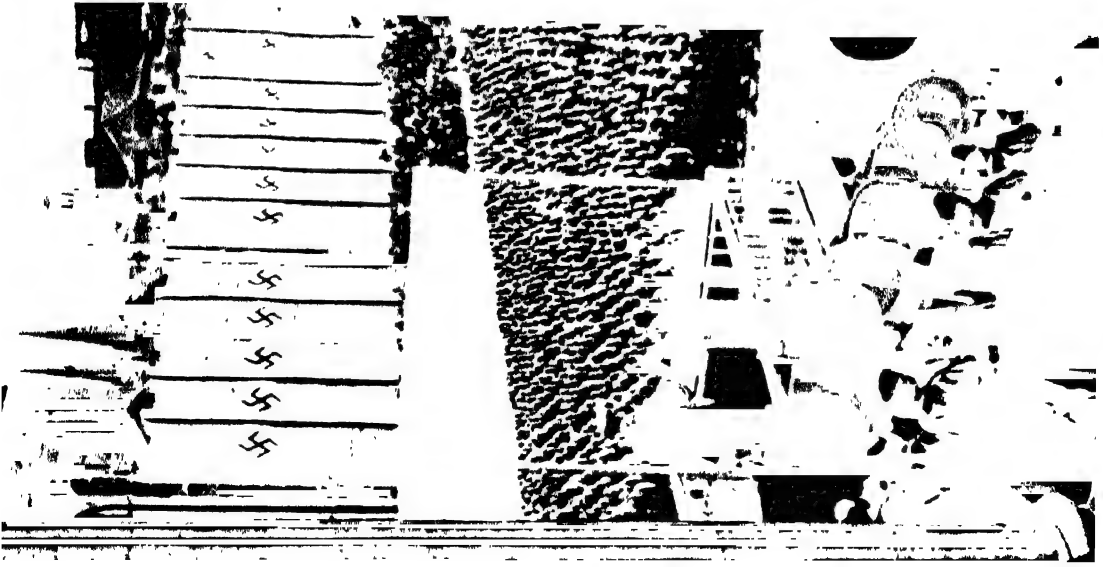
বার্লিনে স্পেন-প্রত্যাগত স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের সংবর্দ্ধনায় হিটলার
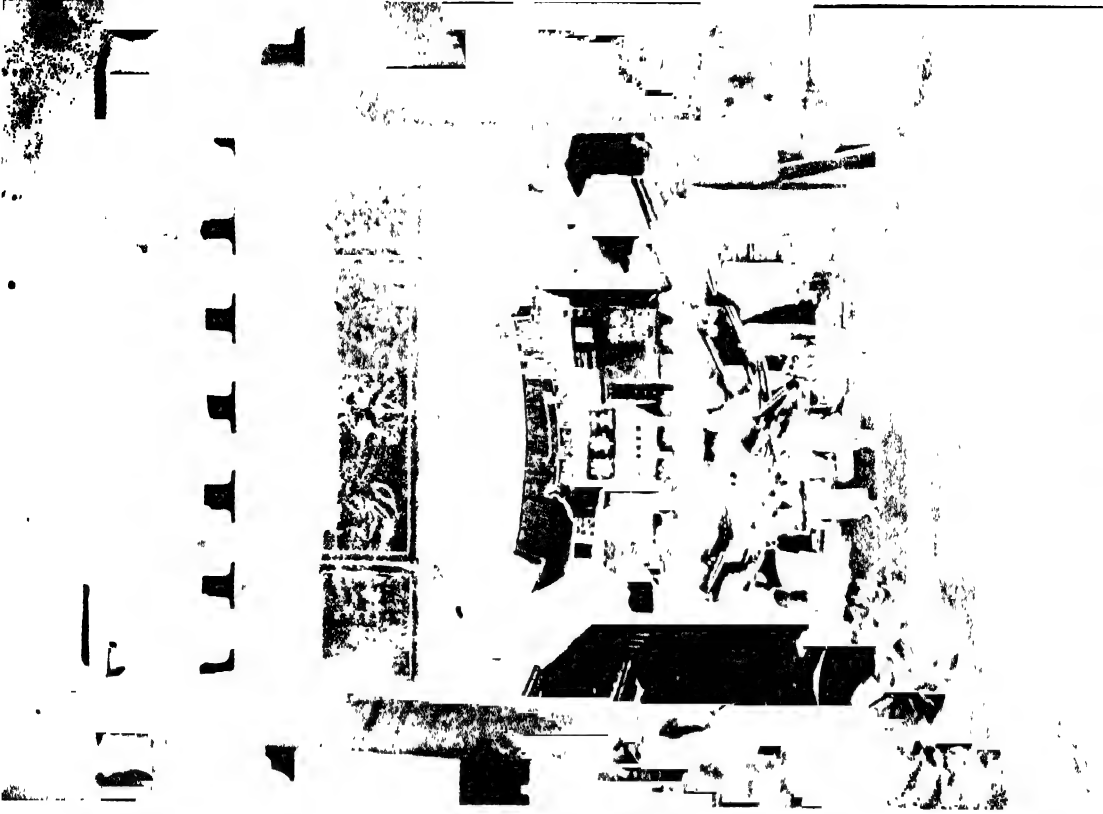
চীনের তালিফু অঞ্চলের বিশাল দক্ষিণ-তোরণ

বসফরাস-তীরে মসজিদ

তুরস্কের ছাত্রীদল
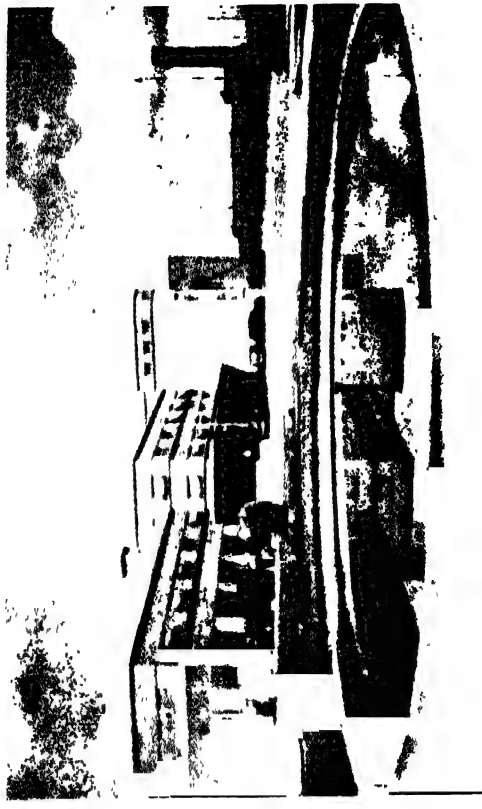
আংকারার নূতন ষ্টেশন

কান্তি চৌধুরীর কুমীর-শিকার

"সম্বুদ্ধ"

তখন আমাদের বয়স অল্প। আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন বৃদ্ধ কান্তি চৌধুরী। কান্তি চৌধুরী যৌবনে প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। তাঁহার অংসাবলম্বী গোঁফ দেখিলেই তাহাকে শিকারী বলিয়া মনে হইত। তাঁহার শিকারের কাহিনী আমরা শুনিতাম, এবং শুনিয়া অকপটে বিশ্বাস করিতাম। না করিলে রক্ষা থাকিত না।

তাঁহার সেই গল্প একটি আপনাদের শুনাইতেছি।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, কি সব কুমীর কুমীর কর। কুমীরের তোমরা দেখেছ কি। তোমরা যা দেখ, ওকে বলে গোসাপ। এই তো কাগজে সেদিন পড়ছিলাম, আমেরিকায় না কোথায় একটা আঠার ফুট কুমীর মেরেছে, সেই না কি তাদের দেশের ওয়ার্লড্ রেকর্ড। আরে ছোঃ। আমেরিকার সরুমুখো কুমীর, ও তো মাছখেকোর জাত, ঘড়েল।

কুমীর দেখবে ত যাও ঈস্ট-বেঙ্গলে—ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল। বোশেখ-জষ্ঠি মাসে নদীগুলো সব নূতন জলে ভ'রে ওঠে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কুমীর। এ আলিপুরের কুমীর নয়, যার একটা মরা কাক খেলে তিন দিন আর খিদে পায় না। এ হচ্ছে জলের রাক্ষস, আসল গঙ্গাদেবীর বাহন। মেঘনা নদীতে এর বাস, সেখান থেকে অন্য সব নদীতে গিয়ে ওঠে। বাইশ হাত চব্বিশ হাত লম্বা, তেমনি বিরাট্ বেড়, দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা। আহারও তেমনি, গরু ঘোড়া তার একবেলার জলখাবার। আমেরিকার টিকটিকিকে গিলে খেতে পারে। যেখানে হানা দেয়, নদীর দু-ধারে ত্রাহি ত্রাহি রব প'ড়ে যায়।

আমরা বলিলাম, সে কুমীর মারা যায় না?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, যাবে না কেন। জানলেই যায়। আমি একবার মেরেছিলাম। সেই গল্প বলি শোন।

ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জের ওখানে আমার এক মাসীমা ছিলেন। একবার গরমের ছুটিতে তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যাই।

ওদিকটাতে আগে কখনও যাই নি। ভারি ভাল লাগল জায়গাটা। মেসোমশাই ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কণ্ট্রাক্টর। সখও ছিল তাঁর, পছন্দও ছিল। নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে মাইল দুই দূরে, নদীর ঠিক ওপরে বাড়ী করেছিলেন। সুন্দর ছোট বাংলো-প্যাটার্ন বাড়ীটি, আশে-পাশে আর বাড়ী নেই, দু-পাশে পেছনে ধানক্ষেত, সামনে নদী। আর তখন বোশেখ মাসের ভরা নদী, বুঝতেই পার। নদীর দিক্‌কার বারান্দায় বই হাতে ক'রে বা সবাই মিলে গল্পগুজব ক'রে, তোফা আরামে ক'টি দিন কেটে গেল।

কিন্তু বেড়াতে গেলে হবে কি, কপাল যায় সঙ্গে। যাবার দিন পাচ-সাত পরে। সন্ধ্যের পরে সবাই মিলে গল্প হচ্ছে, আমিও আমার দু-একটা শিকারের গল্প তাদের শোনাচ্ছি। ঠিক এই সময় মেসোমশাই বাড়ী ফিরলেন। বারান্দায় এসে কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, ওহে শিকারী, কুমীর মারতে পার?

আমি বললাম, কেন?

মেসোমশাই বললেন, এখানকার লোকেরা আমাকে বড্ড ধরেছে। আমার কাছে তোমার নাম শুনেছে কিনা। একটা কুমীর ভয়ানক উৎপাত করছে ক-দিন ধ'রে। পার ত মেরে দাও।

আমি বললাম, কুমীর মারতে শিকারী কি হবে। জেলেদের খবর দিন না, তারা ছিপ্ ফেলে তুলে দেবে এখন।

মেসোমশাই বললেন, না হে না, যা ভাবছ, তুচ্ছ করবার জীব এ নয়. তাহ'লে কি আর তোমায় বলতাম। বঁড়শি ছোঁবার পাত্রই নয় সে, বেজায় চালাক। আর তাকে গেঁথে রাখে এমন জোর বঁড়শির নেই। রাক্ষস অবতার, দশ দিনে তেরটি মানুষ মেরেছে।

মানুষ মেরেছে! শুনে নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসলাম। বললাম, বলুন তো ব্যাপারটা, সব শুনি। কোথায় কুমীর

মেসোমশাই বললেন, এই নদীতেই। বলছি এসে, দাঁড়াও।

কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে মেসোমশাই এসে বারান্দায় বসলেন। বললেন, শোন এবার কুমীরের ইতিহাস। দিন-কুড়িক আগে এই কুমীরটা প্রথম দেখা দেয়, এখান থেকে মাইল-সতরো দূরে একটা জায়গায়। খেয়া নৌকোয় লোক পার হচ্ছিল, এক জন বসেছিল নৌকোর ডালির ওপর, জলের মধ্যে পা ঝুলিয়ে। পা ধ'রে টেনে তাকে নিয়ে যায়। এই হ'ল সুরু। তার পর ক'টি দিন সেখানে অকথ্য অত্যাচার করলে। আট দিনের ভেতর ছ-জন মানুষ তার পেটে গেল। গরু-বাছুর তো কত যে নিলে তার হিসেব নেই। এত বড় যণ্ডা কুমীর—নদীর ধারে মাঠে বাঁধা রয়েছে গরু, দিনদুপুরে ডাঙায় উঠে সেই গরুকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলে গেল, শতেক দেড়-শ মানুষের চোখের সামনে।

আমি বললাম, মারতে কেউ চেষ্টা করলে না?

মেসোমশাই বললেন, চেষ্টা করলে কি হবে। বঁড়শি ফেলা হ'ল, দুটি দিন সে আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করলে, টোপ ছুঁলেও না। তার পর বঁড়শি খেয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তাকে ধ'রে রাখে কার সাধ্য। সারাটা দিন বঁড়শি মুখে ক'রে ছুটাছুটি করলে, পেছনে ছোট ছোট নৌকোয় শিকারীরা ছুটছে, তাদের হাতে বঁড়শির কাছি। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ কাছি আলগা হ'য়ে গেল, বঁড়শি কেটেছে। তার পরই শিকারীদের একখানা নৌকো উল্টে প'ড়ে গেল। তাড়া করলে কুমীর পালাবার পথ খোঁজে, ইনি পালটা লড়াই করেন। নীচে থেকে আচমকা ভেসে উঠে নৌকোখানাকে পিঠে ক'রে উল্টে দিলে। লোকগুলো জলে পড়ল, তাদের একজনকে মুখে নিয়ে ছুট দিলে।

দিলে তো দিলে—সোজা আমাদের এইখানে। ক-দিন ধ'রে যা উপদ্রব করছে সে কহতব্য নয়।

আমি বললাম, এখানেও মানুষ মেরেছে?

মেসোমশাই বললেন, মেরেছে শুধু? ঐ তো বললাম, দশ দিনও হয় নি এসেছে, এর মধ্যেই তের জন সাবাড়। তায় আবার কাল যা করেছে শুনে এলাম, এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কাণ্ড মানুষে করতে পারে শুনলে বিশ্বাস হয় না।

আমি বললাম, কি করেছে?

মেসোমশাই বললেন, এখান থেকে মাইলটাক দূরে একটা বুড়ী থাকে। বুড়ী আর তার মেয়ে, আর কেউ নেই। নদীর ধারে চালা বেঁধে দু-জনে থাকে, বনবাদাড় কুড়িয়ে শাকপাতা এনে বাজারে বেচে, লোকের বাড়ী কাজে-কর্ম্মে খেটে দেয়, ধান ভেনে মুড়ি খই ভেজে দেয়, কখনোসখনো ভিক্ষেও করে। এ-বাড়ীতেও অনেক বার এসেছে। তোমরাও তাকে চেন তো—সেই যে ফাল্গুন মাসে দোল বেঁধে দিয়ে গেল।

মাসীমা বলিলেন, কার কথা বলছ, শরির মা? তাকে খেয়েছে?

মেসোমশাই বললেন, তাকে খেলেও তো হ'ত। খেয়েছে শরিকে।

মাসীমা বলিলেন, ওমা সে কি কথা। কোথা থেকে তাকে নিলে?

মেসোমশাই বললেন, বাড়ীর উঠোন থেকে। কাল সকালবেলা। কারা মুড়ির-ধান ভানতে দিয়েছিল, উঠনে চাটাই বিছিয়ে সেই ধান শুকতে দিয়েছে। শরি গিয়েছিল ধান নেড়ে দিতে। নদীর ওপরেই ওদের বাড়ী তো। নদীর দিকে পেছন দিয়ে সে উবু হয়ে ব'সে ধান নাড়ছে, এদিকে নদী থেকে কুমীরও নিঃশব্দে উঠে এসেছে। শরিটা কিছু টের পায় নি।

—কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

—তার পর টের পেলে বোধ হয় যখন কুমীর একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। তখন তাকে দেখতে পেয়ে কি অবস্থা হয় বুঝতেই পার। শরি চীৎকার ক'রে দৌড় দিলে,

কুমীর তার পেছনে তাড়া করলে। চীৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল, বুড়ীও ছুটে বেরুল, কিন্তু তাকে বাঁচাবে কে। মেয়েটাও একটা বড় ভুল করলে—ঘরের দিকে গেলে হয় তো বা মাচায়-টাচায় উঠে বাঁচতে পারত, সে ছুটল মাঠের দিকে। মাঠে এখন নতুন লাঙল দেওয়া হচ্ছে, সে এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে চলাই যায় না। মেয়েটা নাকি যা চেঁচিয়েছে শুনলাম, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সে চেঁচাচ্ছে আর দৌড়চ্ছে আর তার পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে কুমীর। লোক জুটেছিল কম নয়, কিন্তু কাছে এগুতে কেউ সাহসই করলে না। ছুটতে ছুটতে মেয়েটা অনেক দূর গিয়েছিল, কিন্তু কপালে আছে মরণ, হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ব্যস্ আর কি, পলক না পড়তে কুমীর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুমীরের স্বভাবই হ'ল শিকার কাদায় পুঁতে পচিয়ে খাওয়া। ডাঙ্গায় উঠে শিকার ধরলেও তাকে জলে টেনে নিয়ে যায়। এ ব্যাটা কিন্তু তা করলে না। সেইখানে ব'সেই মেয়েটাকে খেলে।

মাসীমা বললেন, খেলে মানে?

মেসোমশাই বলিলেন, খেলে মানে খেলে। খিদেটা বোধ হয় বেজায় লেগেছিল। তাকে পুরোপুরি মারতেও তর সইল না, টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে গবাগব গিলে ফেললে। একটা একটা ক'রে হাত পা টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে আর বাকী দেহটা ছট্‌ফট্ করছে, ভাবতে পার সে দৃশ্য?

মাসীমা 'উঃ' ব'লে দু-হাতে চোখ ঢাকলেন।

আমার তখন রক্ত ফুটছে। বললাম, আর লোকগুলো দাঁড়িয়ে খালি চেয়ে চেয়ে দেখলে? কেউ কিছু করলে না?

মেসোমশাই বললেন, কি আর করবে। সে দানবের সঙ্গে লড়া তো সম্ভব নয়। তাড়াতাড়িতে যে যা হাতের ধারে পেয়েছে নিয়ে ছুটে এসেছে—কারও হাতে লাঠি কারও হাতে দা, কারও বা হাতে বল্লম। তাতে ও কুমীরের কি হবে। আর তখন যা তার বীভৎস মূর্তি—দুটো লোক তো অজ্ঞানই হ'য়ে গেল দেখে।

মাসীমার মেয়ে লীলা, তার তখন দু-চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আহা রে সোনার বাছা রে। একটু গরম দুধ ক'রে খাইয়ে দিলে না কেউ?

মেসোমশাই বললেন, তবে হ্যাঁ, সাহস বটে বুড়ীটার। আর তখন প্রাণের মায়া করবেই বা সে কার জন্যে? মেয়েকে খাচ্ছে দেখে বুড়ী ক্ষেপে গেল, তাকে ধ'রে রাখা যায় না। লোকেরা আট্‌কাতে গেল, তাদের হাত ছিনিয়ে বুড়ী গিয়ে কুমীরের ওপর পড়ল। মুখে তাকে গালাগাল দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ ছেড়ে দে ছেড়ে দে, আর কুমীরের গায়ে পিঠে এলোপাতাড়ি কিল চড় লাথি মারছে। শেষটা উবু হয়ে প'ড়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে কামড়ে ধরল। পাগলের মতো তাকে কামড়াতে আর আঁচড়াতে লাগ্‌ল। কুমীরের কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই, দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটাকে সারা ক'রে ধীরে সুস্থে নদীতে গিয়ে নাম্‌ল। বুড়ীটা পেছন পেছন ছুটেছিল, তাকে ল্যাজের এক ঝাপ্‌টা মার্‌লে, বুড়ী বিশ হাত দূরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল।

মাসীমা ধীরে ধীরে বললেন, আমার কাছে একখানা কাপড় পরতে চেয়েছিল।

আমার খুন চেপে গেল। বললাম, আমি এ কুমীর মারব।

মাসীমা মুখ তুলে চাইলেন। ধরা গলায় বললেন, যাও বলতে প্রাণ চায় না, তবু বলব একে মেরে এস। মানুষের এত বড় শত্রুকে যদি শক্তি থেকেও না মার, তবে মিছেই পুরুষ হয়ে জন্মেছ।

লীলা দু-চোখ বড় বড় ক'রে বললে, একে মারতে পারলে তবেই বুঝব তুমি মানুষ।

সে রাতটা কাটল। সকালবেলা উঠে আমি বললাম, এখানে এদেশী শিকারী নেই? তাদের একবার খবর দিতে হবে। কুমীর মারবার কলকায়দা জানে এমন লোক যারা থাকে ডেকে পাঠান।

মেসোমশাই তখন কাজে বেরোচ্ছেন। বললেন, আমি আজই তাদের সব খবর দিয়ে দেব।

মেসোমশাই বেরিয়ে গেলেন। আমি বন্দুক খুলে সাফ করতে বসলাম।

বেলা তখন ন-টা হবে, হঠাৎ নদীর দিকে একটা হৈ-চৈ উঠল। ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। নীচেই নদীর খাড়া পাড়, বারান্দা থেকে নদী অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। দেখলাম খানিক দূরে নদীর পারে অনেক লোক জমেছে। নদীর দিকে চেয়ে দেখি, মাঝনদীতে দু-খানা নৌকো। একখানা সরু লম্বা জেলে ডিঙি, তাতে জন তিনেক লোক দাঁড়িয়ে। একটির পরনে খাকি হাফপ্যাণ্ট্ মাথায় টুপি। আর দু-জনের পোষাক দেখে মনে হ'ল পুলিস কনস্টেবল্। চার জন মাঝি নৌকো বাইছে, আর পুলিসরা জলের দিকে ঝুঁকে কি দেখছে। অন্য নৌকোটা ছোট্ট ডিঙি, তাতে লোক নেই, ঘুরতে ঘুরতে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

তার পর চোখে পড়ল, জলের ওপর একটা মানুষের মাথা। লোকটা সাঁতার কাটছে, পুলিসের নৌকোটাও তার দিকেই বেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরই যা ঘটল, ভয়ানক কাণ্ড। নৌকোটা তার থেকে তখন হাত দশ-বারো মাত্র দূরে, হঠাৎ লোকটার পাশে জলের ওপর একখানা ভয়ঙ্কর মুখ ভেসে উঠল। কুমীর। পুলিসেরা চেঁচিয়ে উঠল, লোকটাও মুখ ফেরালে, কিন্তু পলক না পড়তে কুমীর বিরাট্ হাঁ ক'রে তার ঘাড় কামড়ে ধরলে। ধরেই ডুব।

পারের লোকরা হল্লা করতে লাগল। কেউ কেউ টিন পেটাতে লাগল। কেউ কেউ রাগে নদীর মধ্যেই ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

পুলিসের নৌকো একটুক্ষণ এদিক ওদিক করলে, কিন্তু তখন আর মাঝগাঙে ব'সে থেকে তারা কি করবে। শেষে ছোট ডিঙিখানাকে ধ'রে নিয়ে তারা পারে এসে উঠল।

আমি নেমে গেলাম। লোকেরা পরিচয় করিয়ে দিলে, নারায়ণগঞ্জের টাউন দারোগা। দারোগাবাবু মেসোমশাইকে চিনতেন। আমার সঙ্গে আমাদের বারান্দায় এসে উঠলেন।

তাঁকে বসিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কি হ'ল, বলুন তো?

তিনি বললেন, হ'ল যা তো দেখতেই পেলেন। বাপ, মনে করতে গায়ে কাঁটা দেয়।

বাস্তবিক তখনও তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

আমি বললাম, এটুকুন ত স্বচক্ষেই দেখলাম। আগের ইতিহাসটা কি? লোকটা কে?

দারোগা বললেন, ফেরারী আসামী। পাকা জালিয়াৎ।

আমি বললাম, কি জাল করত?

দারোগা বললেন, মুদ্রা। জিনিয়াস্, স্বদেশী সিকি দু-আনি যা তৈরি করে, দেখে কে বলবে কাণ্ট্রিমেড্। বার দু-তিন জেলও খেটেছে, আবার বাইরে এসে কারখানা বানিয়েছে। কিছু দিন ধ'রে এঁর খোঁজ হচ্ছিল, ডুব মেরে মেরে বেড়াচ্ছিলেন।

আমি বললাম, আজ বুঝি খোঁজ পেয়েছিলেন?

দারোগা বললেন, হ্যাঁ। ব্যাটার সাহস বলতে হবে, সবগুলো পকেট ঠেশে সিকি দু-আনি নিয়ে বাজারে গিয়েছে, দোকানীদের বলছে টাকার ভাঙানি চাই? একসঙ্গে অতগুলো নতুন সিকি দু-আনি দেখে তাদের হয়েছে সন্দেহ, তাকে বসিয়ে থানায় খবর দিয়েছে। এ-ও কম যায় না, আমাদের দূর থেকে দেখেই টেনে দৌড় দিয়েছে। ছুটে যখন দেখলে পারবে না তখন এক ডিঙি খুলে নিয়ে নদীতে নামল। বোধ হয় ভেবেছিল নদী পাড়ি দিয়ে পালাবে। আমরা ধর-ধর হয়েছি দেখে জলে লাফিয়ে পড়েছে। তার পর এই কাণ্ড।

আমি বললাম, যাক, সে যা হবার তা হয়েছে, ভেবে আর লাভ নেই। কিন্তু যা ভয়ঙ্কর জীব নদীতে এসে বাসা বেঁধেছে, একে মারবার জন্যে আপনারা চেষ্টা করছেন না?

দারোগা বললেন, চেষ্টা হচ্ছে না কে বললে। গবর্ণমেণ্ট থেকে একশটি টাকা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে মশাই। কিন্তু দেখলেন তো স্বচক্ষে, ও দানবকে মারবে কে, বলুন।

আমি বললাম, আমি মারব। এ-লাইনে আমার নাম হয়ত শুনেছেন।

দারোগা বললেন, তা শুনেছি বইকি। কিন্তু সত্যি পারবেন?

আমি বললাম, আশা তো করি, যদি আপনারা একটু সাহায্য করেন। রিওয়ার্ডের টাকা আমি চাই নে, সে আপনাদেরই থাক। আমার ট্রফি পেলেই হ'ল।

দারোগা বললেন, কিন্তু আমাদের কাছে কি সাহায্য চান আপনি, বলুন? একটা অ্যারেস্ট্-ওয়ারেণ্ট্?

আমি বললাম, না, চাই একখানা ষ্টীমলঞ্চ। যা চেহারা দেখলাম, নৌকো ক'রে একে তাড়া করতে ভরসা হয় না। আপনাদের জল-পুলিসের ছোট লঞ্চ যদি একখানা বন্দোবস্ত করতে পারেন তবে আমি একবার কপাল ঠুকে দেখি।

দারোগা বললেন, লঞ্চ পাওয়া শক্ত হবে না, সায়েবকে বললেই হুকুম দেবেন। তার জন্যে তো ভাবি না, কিন্তু মারবেন কি ক'রে? দেখা যদি বা পান, বন্দুকের গুলি এর গায়ে বিঁধ্‌বে না। বঁড়শিও ছোঁয় না। ক-দিন ধ'রেই বঁড়শি ফেলা হচ্ছে।

আমি বললাম, বন্দুকে বঁড়শিতে হবে না সে আমিও বুঝেছি। অন্য কোনো উপায় করতে হবে।

দারোগা বললেন, আর কি উপায় আছে? তবে একটা অবশ্য ক'রে দেখতে পারেন—এদিককার লোকেরা কুমীর মারবার জন্যে একটা ফিকির খাটায়, ছাগল ভেড়া মেরে তার ভেতরটাতে পাথুরে চুন পুরে শেলাই ক'রে জলে ছেড়ে দেয়। সেই চুনসুদ্ধ লাস খেয়ে কুমীর মারা পড়ে। খেলে কাজ হয়, কিন্তু যা শয়তান কুমীর, এ কি তা ছোঁবে? হয়ত দূর থেকেই গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ফন্দিটা আমিও জানতাম। কিন্তু আমার সেটা পছন্দ নয়। চুন খেয়ে কুমীরের বুকে-পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গায়ের জ্বালায় সে পাগলের মত খালি ছুট্‌তে থাকে। তখন তাকে নজরে রাখা কঠিন ব্যাপার। তার পর চুন খেয়েই হোক আর বন্দুকের গুলিতেই হোক, মরার সঙ্গে সঙ্গে কুমীর নদীর তলায় তলিয়ে যায়। তলভাসা দিয়ে কদ্দূর যাবে তার ঠিক নেই, অনেক সময় আর তার পাত্তাই মেলে না। যদিই বা কোনটা কাছাকাছির মধ্যে ভেসে ওঠে, উঠবে দু-তিন দিন পরে, প'চে ফুলে। চামড়া প'চে খারাপ হয়ে যায়। এমন একটা বিরাট্ কুমীর মারব তার চামড়াটাও যদি টাট্‌কা না পেলাম তবে মেরে কি সুখ, বল?

দারোগাকে সেই কথা বললাম। তিনি বললেন, কিন্তু টাট্‌কা চামড়া পেতে হ'লে কুমীরকে বঁড়শিতে গাঁথতে হয়। আর না হ'লে কোথাও ডাঙায় বেড় দিয়ে মারতে হয়। দুটোই এর বেলায় অসম্ভব।

আমি বললাম, সেইখানেই যে মুস্কিল। নইলে বিষই যদি দেব তো চুন কেন, একেবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড্ খাওয়ালেই তো পারি। আপনাদের নারায়ণগঞ্জে কেমিস্টের দোকান নেই?

দারোগা বললেন, থাকলেই বা তারা সায়ানাইড্ বেচবে কেন আপনাকে। সে পেতে হ'লে কলেজ ল্যাবোরেটারিতে যেতে হবে। তার জন্যে অবশ্য আটকাবে না, চান তো বলুন আমরা একটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে দিচ্ছি প্রিন্সিপালের নামে।

আমি বললাম, আচ্ছা সে ভেবে দেখি, যদি দরকার হয় তখন চেয়ে নেব। আপনি লঞ্চ কবে পাঠাচ্ছেন তাই বলুন।

দারোগা বললেন, সায়েবকে এখন গিয়ে বলব। লঞ্চ দু-খানাই ঘাটে আছে জানি, খুব সম্ভব কালই পেয়ে যাবেন। আমার কিন্তু মশাই একটি আবদার আছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

লোকটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। পুলিস হ'লেও তার বুদ্ধি আছে। বললাম, নিশ্চয় নিশ্চয়, সে আর বলতে হবে কেন। আমিই তো আরও আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছুটি পাবেন তো?

দারোগা বললেন, তা পাব।

আমি বললাম, তবে আর কি। আর এমনিতেও তো লঞ্চে অফিসার কেউ একজনকে থাকতেই হবে। নইলে অচেনা বাইরের লোকের হাতে আপনারাই বা লঞ্চ ছেড়ে দেবেন কেন।

—না না, সে কি কথা। আপনারা তো আর অচেনা নন। ইত্যাদি ইত্যাদি ব'লে এক রাশ বিনয় প্রকাশ ক'রে দারোগাবাবু বিদায় নিলেন।

পর-দিন ভোর হ'তে না-হ'তে লঞ্চ এসে হাজির। দারোগা তো এসেছেনই, সঙ্গে এসেছেন খোদ পুলিস-সায়েব। বললেন, বড় শিকারী ব'লে আপনার নাম শুনেছি, এবারে স্বচক্ষে দেখতে এলাম। আমি বললাম, এতে আর দেখবার কি আছে সা[illegible] শুধু আমাকেই

লজ্জা দিলে। বাঘ ভালুক মারায় আনন্দ আছে, সেখানে শক্তির পরীক্ষা হয়। খাবারে বিষ দিয়ে মারা, সে তো ছ্যাঁচড়ামো ক'রে মারা।

সায়েব বললে, এ কুমীর নয়, শয়তান। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করায় পাপ নেই।

আমি বললাম, সে কথা আমিও মানি, নইলে এতে আমি রাজি হতাম না। মানুষের প্রাণ যেখানে বিপন্ন, সেখানে নীতি বড় কথা নয়। সে যাক্, এখন চল, জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

খালাসীরা জিনিষপত্তর নিতে এল। সায়েব বললে, এ কি চৌধুরী, বন্দুক কই?

আমি বললাম, নোব না। ও বন্দুক আমার বহুকালের সাথী। ওকে দিয়ে আমি হীন কাজ কখনও করি নি, আজও করব না। আর এমনিও বন্দুকের দরকার হবে না কিছু।

সায়েব হেসে বললে, বাপ, তোমরা বাঙালীরা বড্ড বেশী সেন্টিমেণ্টাল। আমি কিন্তু ছাড়ব না তাই ব'লে। বাগে পেলেই তাকে গুলি করব। কম ভোগানটা ভুগিয়েছে!

আমি বললাম, বা রে আবদার। এত কষ্ট ক'রে মারব কুমীর, আর তুমি না-হক গুলি ছুঁড়ে তার চামড়া জখম ক'রে দেবে। সে হবে না।

সায়েব বললে, আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।

জিনিষপত্র সব তৈরিই ছিল। আর কি-ই বা জিনিষ। বারান্দার এক কোণে একটা মরা ছাগলকে চট ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। দারোগাবাবু তার পেটটা টিপেটুপে দেখলেন। বললেন, কি, চুনই দিলেন শেষ পর্যন্ত?

আমি বললাম, উপায়হীন।

তিনি বললেন, কেন আপনার সেই পটাশিয়াম সায়ানাইড কি হ'ল? পেলেন না?

আমি বললাম, পাগল না ক্ষ্যাপা। সের-বরাদ্দে ও জিনিষ পায় কখনও?

সায়েব বললে, চৌধুরী, এ সরু লাক্‌লাইন কি হবে? কুমীরকে কাঁধে ঝুলিয়েই নিয়ে আসবে নাকি?

আমি বললাম, দড়ি একটা থাকা ভাল। সময়ে অসময়ে গলায় দেওয়া যায়।

মাঝনদীতে গিয়ে ছাগলটাকে জলে ছেড়ে দিলাম, বেশ ভাসতে লাগল। তার সঙ্গে একটা লম্বা সরু দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ির মাথায় ছোট্ট এক টুক্‌রো কলাগাছ বেঁধে দিলাম। টোপ খেয়ে কুমীর ডুব দিলে তখন এইটে ফাত্‌না হবে।

সব ঠিকঠাক ক'রে লঞ্চ দূরে এনে লাগিয়ে বাইনোকুলার হাতে ক-জনে ব'সে চেয়ে রইলাম।

আধ ঘণ্টা গেল। এক ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা। কুমীরের সাড়া নেই। আমরা ঠায় ব'সে আছি।

প্রায় দু-ঘণ্টা যখন পার হয়, হঠাৎ আমার হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে দারোগাটি বললে, দেখুন দেখুন। চেয়ে দেখলাম অনেক দূরে নদীর বাঁকে জলের ওপর দুটি কাচের মারবেল ভেসে উঠেছে। কুমীর। সকালবেলা, তায় ভাঁটা। নদী একেবারে পাটির মতন পালিশ। সেই পালিশ জমির উপর দুটি চকচকে কাচের গুলির মত কুমীরের চোখ জেগে রয়েছে—তার শরীর মাথা সব জলের তলায়, চোখ দুটি খালি জলের উপরে। প্রথম দেখে মনে হ'ল একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। তার পর দেখলাম, না, কাছে এগোচ্ছে! ধীরে ধীরে—এত ধীরে যে প্রথমটা ঠাহরই হয় না। তার পর একটু কাছে এলে দেখলাম তার গতি ক্রমেই বাড়ছে—সোজা সেই মরা ছাগলটাকে লক্ষ্য ক'রে সে ছুটেছে। শেষের দিকে সে একেবারে তীরবেগে ছুটল। কুমীর ভাসা কখনও দেখেছ? দেখো। বড় সুন্দর জিনিষ। স্থির টলটলে জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে দুটি চোখ; তার নীচে ছুটেছে তার বিশাল দেহ। তবু জলের কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই, জল নড়ছে না।

ছাগলের একেবারে কাছে গিয়ে সে মুখ তুললে। সেই বিকট মুখ আগের দিন একবার দেখেছিলাম। একটুখানি সে থামলে, মনে হ'ল ছাগলটাকে যেন শুঁকে দেখলে। তার পর এক গ্রাসে তাকে প্রায় মুখে পুরে নিয়ে ডুব মারলে।

আমি সারেংকে বললাম, এঞ্জিন চালু কর। খালাসীরা যে যার জায়গায় তৈরি হয়ে দাঁড়াল

মিনিট দশ-বারো কাটল। তার পর নদীর মধ্যে একটা প্রলয় কাণ্ড সুরু হ'ল। বোঝা গেল বিষ ধরেছে। ডুবে ভেসে ল্যাজ আছড়ে ঝাঁপিয়ে কুমীর নদীটাকে একেবারে তোলপাড় ক'রে তুললে।

এক-এক বার ভেসে ওঠে, ল্যাজ আছড়ায়, বোঁ বোঁ ক'রে চক্কর দিয়ে ঘুরতে থাকে, আবার ডুব দিয়ে এক দিকে ছুট লাগায়। ছুটলেই আমরাও লঞ্চ চালিয়ে পেছনে ছুটি, চোখের আড়ালে না যায়। ফাৎনাটা আছে তাই পেছু নিতে কষ্ট নেই। ভেসে উঠলে দূরে গিয়ে লঞ্চ থামাই। এদিকে লঞ্চের বাঁশি অবিশ্রাম বাজছে—লোককে সাবধান করতে, কেউ যেন না জলে নামে, কেউ যেন না নৌকো খোলে। এই উন্মত্ত কুমীরের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। নদীর দুই পার লোকে লোকারণ্য।

একবার কুমীর লঞ্চের একেবারে গা ঘেঁষে ভেসে উঠল, লঞ্চ নিয়ে আমরা দূরে পালিয়ে গেলাম। তখন দেখলাম কুমীর কেবলই দমকা নিশ্বাস ফেলছে আর হাঁ ক'রে ক'রে জল খাচ্ছে। তার ভেতরে খুব একটা যন্ত্রণা চলছে সে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। দারোগা বললে, চুনের কাজ সুরু হয়েছে। চুনের জলুনিতে কুমীর জল খায়, জলে চুনে মিশে গরম হয়ে গিয়ে তার ভিতরটাকে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

কুমীর আবার ডুবল। আবার খানিক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। আবার ডুবল। আবার উঠল। দেখলাম তার জোর ক্রমেই কমে আসছে। শেষবার যে ডুবল, আর ওঠে না।

সায়েব বললে, চৌধুরী, ওর হয়ে গেছে। চল ফিরি। আমি বললাম, দাঁড়াও, আর একটু দেখি।

পনর মিনিট—কুড়ি মিনিট। তার পর আস্তে আস্তে কুমীর আবার ভেসে উঠল। এখন আর সে ল্যাজ আছড়াচ্ছে না, একটু একটু নাড়ছে মাত্র। আমরা দূর থেকে দেখতে লাগলাম। ক্রমে তার সমস্ত দেহ জলের উপর ভেসে উঠল। উঃ, কি বিশাল চেহারা, আর তার মুখের দিকে তাকালে তো আত্মাপুরুষ শুকিয়েই যায়।

একটু একটু ক'রে সেই বিরাট্ দানব জলের উপর জেগে উঠতে লাগল। আস্তে, আস্তে, আস্তে।

সায়েব হঠাৎ বিকট এক চীৎকার ক'রে আমার জামা খাম্‌চে ধরলে। বললে, দেখছ চৌধুরী, দেখছ। আমি তখুনি বলেছিলাম এ শয়তান, মানুষ নয়, শয়তান। নইলে শুনেছ তুমি আর কখনও কুমীর জলের ওপর দিয়ে হাঁটে ?

বাস্তবিক কুমীর তখন জল ছেড়ে উপরে উঠে পড়েছে। গোটা দেহটা শূন্যে, থাবা চারখানা আর ল্যাজটা জলের উপর বসানো—ঠিক যেন নদীর কঠিন মেঝের উপর সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কুমীর আরও উপরে উঠতে লাগল। তার থাবা আর ল্যাজও জল থেকে আলগা হয়ে গেল। সায়েব তখন ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। বললে, ও কি চৌধুরী ও-যে উড়ছে! এ কি সত্যিই কুমীর না ড্র্যাগন ?

তার কথার জবাব দেবার আমার তখন সময় নেই। সারেংকে বললাম, ওর কাছে লঞ্চ নিয়ে যাও।

সায়েব সারেংকে জাপটে ধরে বললে,—না না, পালাও পালাও।

আমি জোর ক'রে তাকে টেনে সরিয়ে দিলাম। ধম্‌কে বললাম, এখন গোল ক'রো না। সারেং, চালাও।

সারেংও তখন ভয়ে কাঁপছে। হাতজোড় করে বললে,

আমি তাকে এক ঠেলা মারলাম, সে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। আমি নিজে হালের চাকা ধরে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। লঞ্চ আস্তে আস্তে কুমীরের দিকে চলল।

বাজারে আজকাল জাপানী রবারের পুতুল উঠেছে, দেখেছ ? সেই যে পাৎলা রবার-শীটের পুতুল, বাঘ কুকুর মানুষ ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে নিতে হয় ? কুমীরের সমস্ত শরীর তখন ফুলে টন্‌টনে হয়ে ঠিক সেই রকম দেখতে হয়েছে। সায়েব ঠিকই বলেছিল, ড্র্যাগন। একছেয়ে সোনালি-হল্‌দে রং, সারা গায়ে বড় বড় আঁশ, ফুলে [illegible]ইট হয়ে মুখ থেকে ল্যাজের ডগা অবধি একদম সোজা [illegible] হয়ে গেছে, রন্দ্র

প'ড়ে ভিজে চামড়াটা আরও বেশী জলজ্বল করছে। জল থেকে হাত দেড়েক উপরে শূন্যে স্থির হয়ে ভাসছে সেই বিরাট্ দেহ, থাবা থেকে ল্যাজ থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ছে,—একটা দৃশ্য বটে। যেন কাঁচা সোনার জেপেলিন জল ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠছে, স্বর্গের দিকে উড়ে যাবে ব'লে।

সায়েব মরীয়া হয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। আমি এক ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। কাজের সময় কাঁদুনি আমি সইতে পারি নে।

লঞ্চ তখন কুমীরের একেবারে পাশে এসে পড়েছে। চাকা ঘুরিয়ে আমি লঞ্চের মুখ ফিরিয়ে দিলাম। সারেংকে বললাম, চাকা ধর।

সারেং কথা বললে না, মড়ার মত হাত বাড়িয়ে চাকা চেপে ধরল। আমি লাকলাইনের গুছিটা হাতে তুলে নিলাম। বারকতক শূন্যে দুলিয়ে ল্যাসোর মত ক'রে তার একটা দিক্ ছুঁড়ে দিলাম। দড়ি কুমীরের পেটের উপর দু-তিনটে পাক জড়িয়ে টাইট হয়ে গেল।

সারেংকে বললাম, লঞ্চ ফেরাও। পারে চল।

পারে ওদিকে মানুষের ভিড়ে মহামারি কাণ্ড। কুমীর শূন্যে উঠতে উঠতে তখন লঞ্চের ছাত ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গেছে। সমস্ত দেহটা তার স্থির, ল্যাজটা শুধু একটু একটু কাঁপছে।

লঞ্চ ধীরে ধীরে পারের দিকে চলল। জোরে যাবার জো নেই, দড়ি ছিঁড়ে যাবে। তাতে খালাসীরা সব ভয়ে আড়ষ্ট, বয়লারের আগুন নিবু-নিবু। আস্তে আস্তে লঞ্চ এগোচ্ছে, তার পেছনে শূন্যে ভেসে আসছে সেই সোনার জেপেলিন।

ঢের ঢের পুলিস-সায়েব দেখেছি ভাই, এমনটি আর কখনও দেখি নি। পারে পৌঁছতে তখন সামান্য বাকী। আমি চেয়ে দেখছি কোন্ জায়গাটাতে লঞ্চ লাগালে সুবিধে হবে। হঠাৎ পেছনে দুদ্দুম্ ক'রে জোড়া বন্দুকের শব্দ, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্বুম্-ক্কড়্ড়াৎ-বুম্ ক'রে এক প্রচণ্ড আওয়াজ। চমকে পেছন ফিরে দেখি, সর্ব্বনাশ। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এই ফাঁকে সায়েব বন্দুক তুলে একেবারে [illegible] নলই ঝেড়ে দিয়েছে কুমীরের পেট-সই ক'রে। ভীষণ বাজের মত শব্দ হয়ে অতবড় কুমীর ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেল, তার পর আমার চোখের সামনেই টাল খেয়ে ঝপাং ক'রে নদীর জলে পড়ল। পড়তে পড়তে তার একখানা থাবা লঞ্চের ছাতে লেগে গিয়েছিল, লঞ্চ ভয়ানক দুলে উঠল, কাৎ হয় আর কি! টাল সামলে নিয়ে আবার যখন চাইলাম তখন কুমীর নদীর জলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে সময় মনের কি অবস্থা হয়, ভাবতে পার? সায়েবের কাঁধ ধ'রে ক'ষে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কে বলেছে তোমাকে গুলি ছুঁড়তে?

সায়েব তখন বন্দুক ফেলে দিয়ে মেঝেয় ব'সে পড়েছে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মদ্দা-হাঁসের মত গলা ক'রে বললে, আই অ্যাম্ সরি। চৌধুরী, আই অ্যাম্ সরি।

এর পরে আর কি বলি তাকে। লঞ্চ ভিড়িয়ে আমি পারে নেমে পড়লাম। মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সেখান থেকে চ'লে এলাম। এমন একটা ট্রফি—থাকলে লোককে গর্ব্ব ক'রে দেখাতে পারতাম। এ কি কম আপশোষের কথা।

দারোগা বাবুটি স্টেশনে এসে দেখা ক'রে গেলেন। লোকটিকে বড় ভাল লেগেছিল। অতগুলো মানুষের মধ্যে এক তিনিই মাথা স্থির রেখেছিলেন। দুঃখ ক'রে বললেন, আপনার মন তো খারাপ হ'তেই পারে।

আমি বললাম, এত ভয় পায়, একে সায়েব বলে? ছিঃ!

দারোগাবাবু বললেন, কি আর বলব বলুন।

তার পর বলিলেন, যদি মনে কিছু না করেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?

আমি বললাম, কি?

তিনি বললেন, ড্র্যাগন-ট্র্যাগন বাজে কথা। কিন্তু কুমীরটা শূন্যে উড়ল কি ক'রে?

আমি বললাম, থাক মশাই, কেলেঙ্কারি যদ্দূর হবার তা হয়েছে। আর ওকথা টেনে বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমরা বলিলাম, কিন্তু সত্যি, কুমীর উড়ল কি ক'রে?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, সে শুনে তোমরা ছেলেমানুষরা কি করবে।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ব-প্রদর্শনী, ১৯৩৯ঃ সান্ ফ্রান্সিস্কো গোল্ডেন গেট প্রদর্শনী

নিউ ইয়র্ক বিশ্ব-প্রদর্শনীর রাত্রির আলোকোজ্জ্বল এক অংশের দৃশ্য—বিরাট মূর্তিচতুষ্টয় গণশক্তির প্রতীক
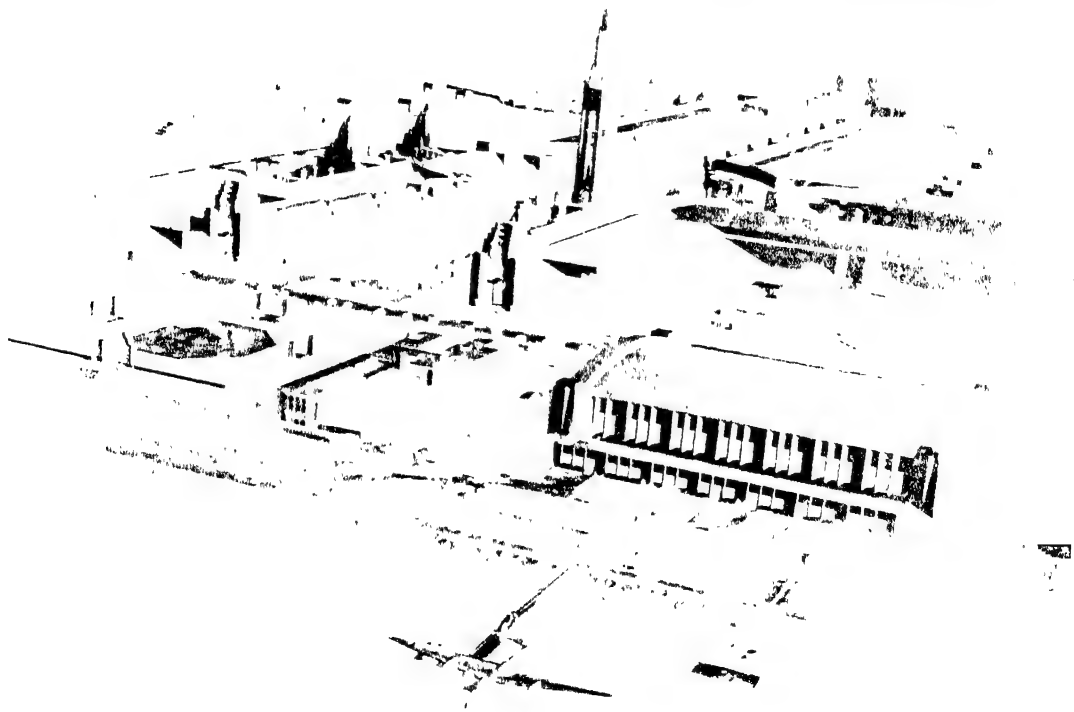
সান্ ফ্রান্সিস্কো প্রদর্শনীর "ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড" বা রত্নদ্বীপ। উহার দক্ষিণ অংশে বিমান-পোতাশ্রয় দেখা যাইতেছে
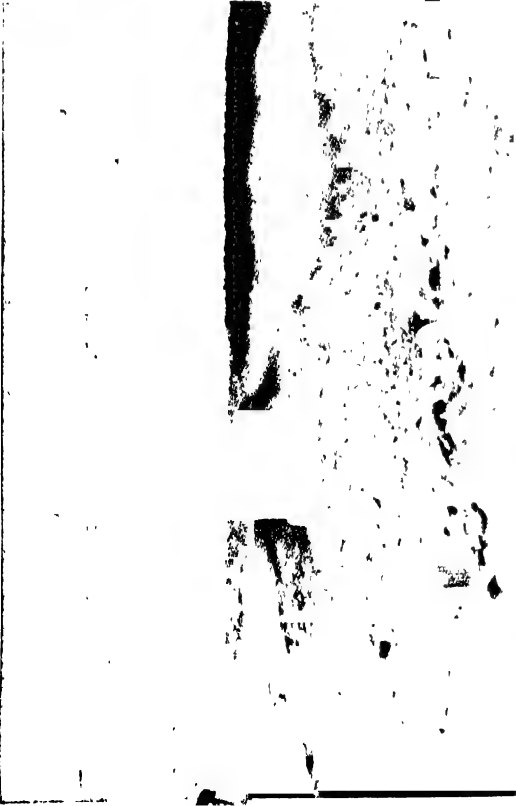
নিউ ইয়র্ক প্রদর্শনীর ক্ষেত্র—পূর্ব্বে আবর্জ্জনা নিক্ষেপের স্থান ছিল

প্রদর্শনীর জন্য ঐ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে ও নানারূপ উন্নতি হইয়াছে

উক্ত আবর্জ্জনা-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান রূপ—প্রদর্শনীর সৌধাবলী দেখা যাইতেছে
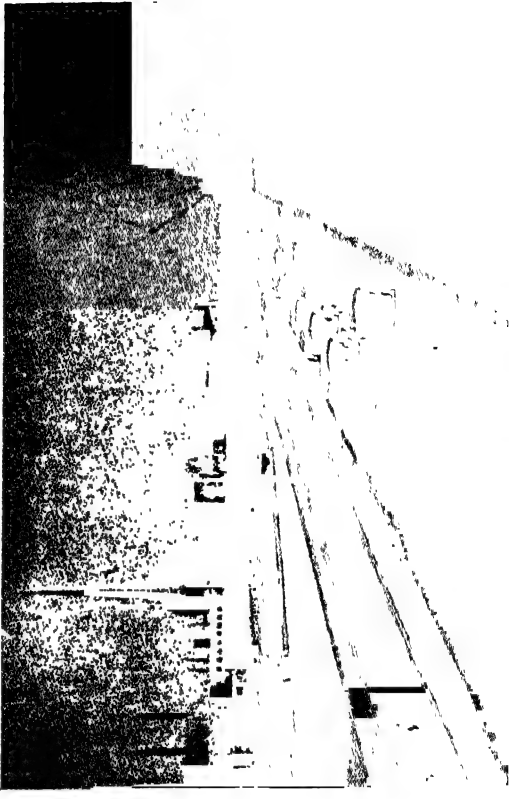
প্রদর্শনীর উদ্যান ও প্রশস্ত পথ
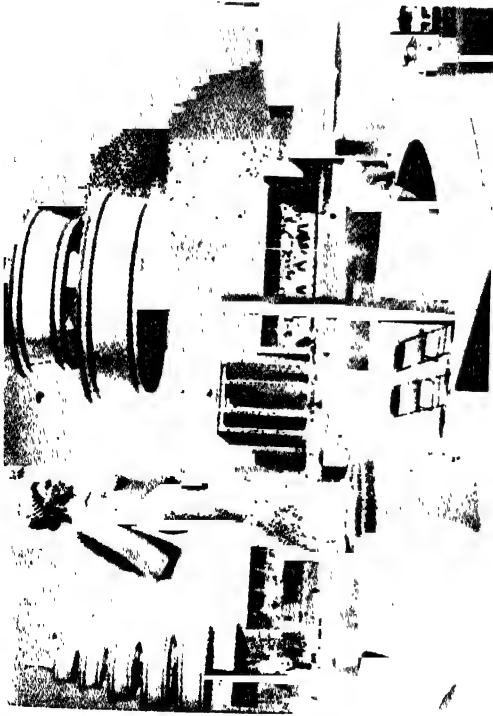
সান্ ফ্রান্সিস্কো প্রদর্শনীতে ফেডার‍্যাল গবর্মেণ্ট-সৌধ

সান্ ফ্রান্সিস্কো প্রদর্শনীতে নেদারল্যাণ্ড-সৌধ

প্রদর্শনীর "পুষ্পভবন"

প্রদর্শনীর "প্যাসিফিক"-তোরণ

সুইজারল্যাণ্ড
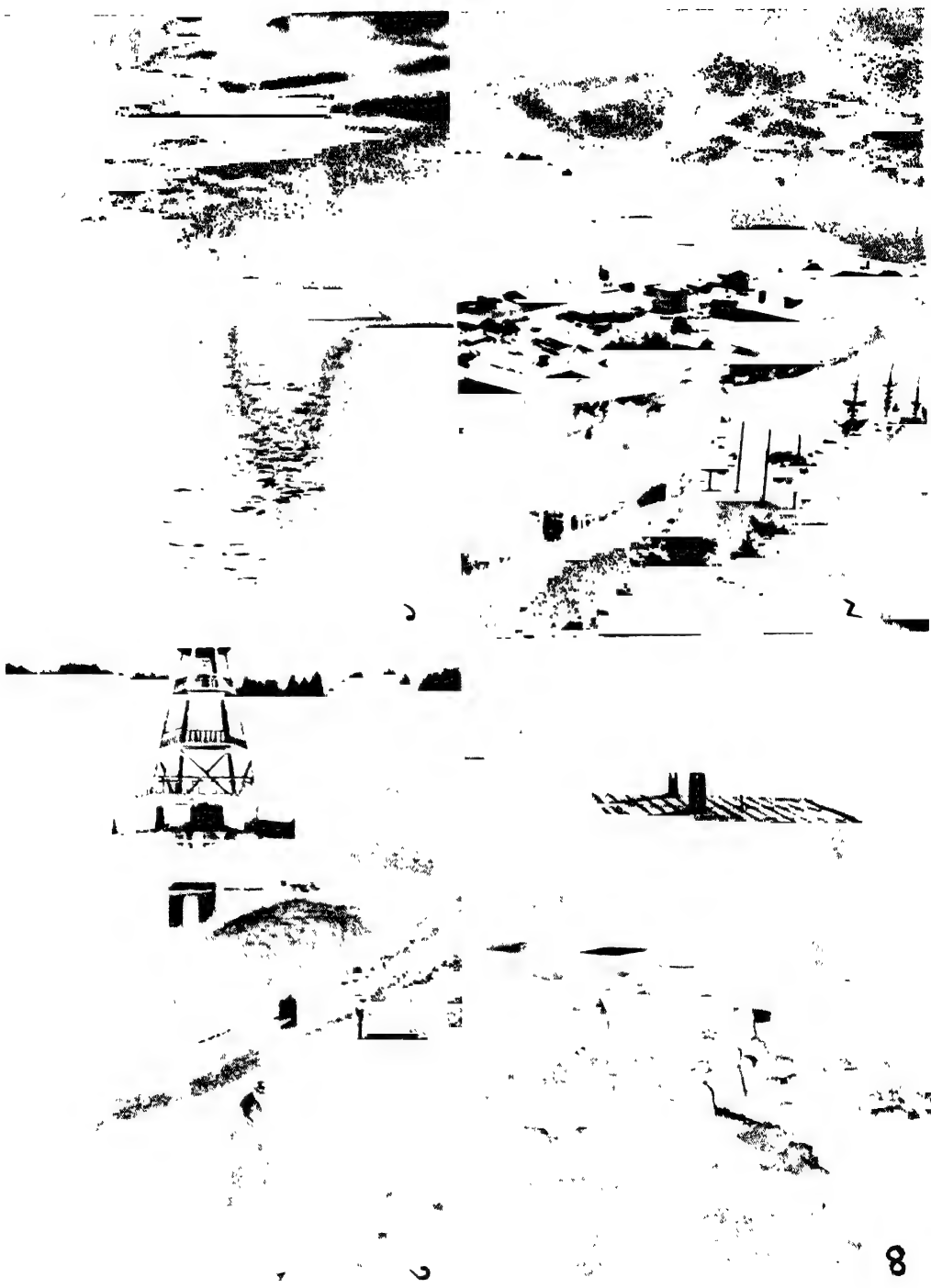
১। জেনেভা হ্রদে সূর্য্যাস্ত
২। সুইস্ পল্লীতে তুষারপাত
৩। সুইস্ চাষী
৪। সুইস পল্লীর বাজার

[শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সিংহ-গৃহীত ফটোগ্রাফ

আমরা বলিলাম, না, বলুন।

কান্তি চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, বেশ, তোমাদের বলছি। আমার তো কথা ছিল কুমীরটা ডুবে না যায়? আগের দিনে সেই যে জালিয়াৎকে সে খেয়েছিল, তাই থেকে ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। ছাগলের পেটে আমি চুন পুরে দিই নি। দিয়েছিলাম অনেকখানি জমাট সালফিউরিক এসিড।

—তাতে কি হ'ল?

—শোনই। সালফিউরিকের জ্বলুনিতে কুমীর জল খেয়েছে। সেই ডাইলিউট্‌ সালফিউরিক এসিড, আর তার পেটে ছিল এক রাশ মেকি সিকি দু-আনি। তার মানেই দস্তা। দুয়ে মিলে হয় হাইড্রোজেন গ্যাস্‌। এবার বুঝলে?

আমরা বলিলাম, কিন্তু অমন সেয়ানা কুমীর, সালফিউরিকের গন্ধ টের পেলে না?

কান্তি চৌধুরী চটিয়া বলিলেন, বোকার মত কথা ব'লো না। পাড়াগেঁয়ে কুমীর, চুনের গন্ধ সে চিনতে পারে। সালফিউরিক এসিড সে বাপের জন্মে দেখেছে, যে চিনবে?

সুইজারল্যাণ্ড

শ্রীফণীন্দ্রনাথ সিংহ

সুইজারল্যাণ্ড পর্ব্বতময় মধ্য-ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের গঠন, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও সুইস্‌দের শান্ত, অনলস ও উন্নত জীবনযাত্রাপ্রণালী এই ছোট দেশটিকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১২৯১ অব্দে আল্পস্‌ উপত্যকার তিনটি ক্যাণ্টন (Uri, Schwyz, Unterwald) মিলিত হইয়া একটি লীগ প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারই পরিণতি বর্ত্তমান সুইস্‌ যৌথরাষ্ট্র। সমগ্র দেশটি বাইশটি ক্যাণ্টনে বিভক্ত। জনসংখ্যার প্রতি শতে প্রায় ৭৩ জন জার্ম্মান, ২১ জন ফরাসী, ৫ জন ইটালীয়ান ও অবশিষ্ট রোমান্‌শ বা অন্য ভাষাভাষী। রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০, মুষ্টিমেয় ইহুদীদের বাদ দিলে আর সব প্রোটেষ্টাণ্ট।

সুইস্‌দের চরিত্রের বিশেষত্ব স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও রক্ষণশীলতা। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়ও এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত । রাষ্ট্রের শাসনভার (executive power) সাত জনের একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত। এই কমিশনের প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা অপর ছয় জন সদস্যের ক্ষমতার সমতুল্য। ইহারা নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্য ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী। ব্যবস্থাপক সভা দুইটি: ১। রাষ্ট্র-পরিষৎ (Council of State)। প্রতি ক্যাণ্টন হইতে পরিষদে দুই জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ২। জাতীয় পরিষৎ (National Council)। ইহাতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি প্রেরিত হন। প্রতি ২২ হাজার নাগরিকের জন্য এক জন প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট।

এই দুই পরিষৎ হইতেই শাসনসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিন বছর অন্তর এই সভার নূতন নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। শাসনসভার সভাপতিই যৌথরাষ্ট্রের সভাপতি। অধিকাংশ ক্যাণ্টনের বা সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দাবি অনুসারে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হইতে পারে। যৌথরাষ্ট্রের কিংবা কোন ক্যাণ্টনের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত কোন আইন গ্রহণের বা বর্জ্জনের অধিকার ইহাদের রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উপায় বিহিত হইয়াছে, এবং সুইস্‌দের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি উগ্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণতঃ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই দল গড়িয়া উঠে। কিন্তু জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থাকায় অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। দলগত

স্বইজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের গায়ে বন্য ফুল

শাসন (party government) ব্যবস্থার প্রচলনও এই কারণে সম্ভবপর হয় নাই। মানুষ ক্ষমতাপ্রিয়, ক্ষমতার অপব্যবহারও স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং স্বাধীনতাপ্রিয় সুইস্‌রা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়াছে।

ব্যর্ণ (Berne) সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী। সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ লোজানে (Lausanne) প্রতিষ্ঠিত। যৌথরাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি রাজধানীতে অবস্থিত। সামরিক শিক্ষা অবশ্যগ্রহণীয়। বিদেশে অবস্থান হেতু অথবাঅন্য কোন কারণে সামরিক শিক্ষা লাভে অসমর্থ হইলে আয়ের অনুপাতে বিশেষ কর ধার্য্য হইয়া থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ১৯৩৪-৩৫ সালের গণনানুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪,৩৩৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪৭৩,০৪০, উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১৩ এবং ছাত্র সংখ্যা ৭৭,২৫৭। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫-৩৬ সালের ছাত্রসংখ্যা ৮,৭৩৮। একটি পলিটেকৃনিক্ হাইস্কুল ও তিনটি শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া প্রত্যেক বড় শহরেই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স কিংবা জার্ম্মেনী ভিন্ন ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, গ্রহণে আমরা উদাসীন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কথা তো আমরা ভুলিয়াই যাই। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির প্রতিই আমাদের ঝোঁক বেশী। সম্ভবতঃ ঐসব দেশের শহরের জীবনের প্রলোভন বা আকর্ষণ এই পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ।

সুইজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ, এবং আয়তন ১৫,৯৪৪ বর্গমাইল। সমুদ্রতীর হইতে দেশটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আলপ্‌স্ পর্ব্বত ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অনেকগুলি রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য দেশের সহিত যোগাযোগ সহজ হইয়াছে। বিখ্যাত সিম্প্‌লন্ (Simplon) টানেল সুইজারল্যাণ্ডকে ইটালীর সহিত যুক্ত করিয়াছে।

বরফের আবরণে পাইন বৃক্ষ

সুইজারল্যাণ্ডের বসতি অতি ঘন। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা গড়ে ২৫০। পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া চাষের উপযোগী ভূমির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কয়লা, লৌহ ও পেট্রোলিয়ম্—আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয়
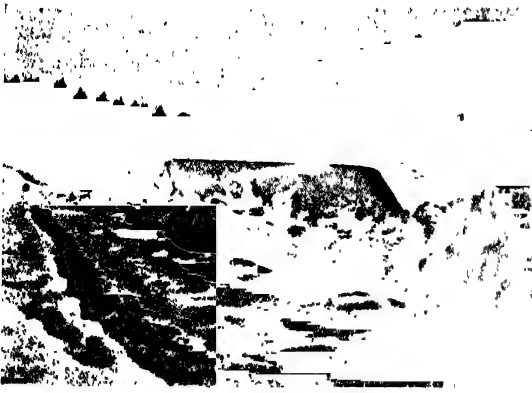
সুইজারল্যাণ্ডে তুষারপাতের দৃশ্য

এই উপাদানগুলিও নাই। শিল্পসম্ভারোপযোগী কাঁচা-মালের নিতান্ত অভাব। যুদ্ধপ্রিয় হইলেও সুইসরা জন্মভূমির সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিদেশীর স্বাধীনতা হরণ করে নাই কিংবা উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ইহাদের আর্থিক সচ্ছলতা ও উচ্চাঙ্গের জীবনযাত্রা বিদেশীদের বিস্মিত করে। গড়ে ইহাদের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ গ্রেট ব্রিটেনে কিংবা হলাণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে কম নয়। বেকার-সংখ্যা শতকরা দুই জনেরও কম। ইহারা পরিশ্রমী ও নিরলস, বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে ইহারা অভ্যস্ত। নিষ্ঠুর ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে ইহারা বশে আনিয়াছে—পাহাড়ের গায়ে যেখানেই সম্ভবপর বাসা বাঁধিয়াছে এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য কঠিন প্রয়াস স্বীকার করিয়াছে। দেশ হইতে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যসম্ভার জোগান সম্ভব নয়—চাহিদার ⅔ অংশ বিদেশ হইতে আসে। শিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানির উপর দেশের অর্থাগম নির্ভর করে।

যাঁহারা নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ অথবা স্বাস্থ্যলাভের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যান তাঁহাদের পক্ষে সুইস্‌দের শিল্পপ্রচেষ্টার সম্যক্ পরিচয় লাভ সম্ভবপর নয়। বরফে ঢাকা পাহাড়, হিমশীতল বাতাস, পাইন বনানী ও ফুলের সমারোহ ইহাদের মন কাড়িয়া লয়। কিন্তু অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে দেখিলে এক নূতন সুইজারল্যাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন কেন্দ্রে নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। গোটা দেশটাকে সুইসরা একটা কারখানায় পরিণত করিয়াছে। সুইস্ শিল্পী ও কারিগরদের শিল্পকৌশল অসামান্য। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের মত খনিজ সম্পদহীন ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই শিল্পনৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নূতন নূতন আবিষ্কার ও চেষ্টার দ্বারা প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলিয়া চলিতে হয়। প্রতিবৎসর যে-সব পেটেণ্ট মঞ্জুর হয় তাহাতে সুইস্‌দের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেলোফেন, কৃত্রিম রেশম, টাইপ-রাইটার প্রভৃতি ইহাদের আধুনিক আবিষ্ক্রিয়ার নিদর্শন।

সুইজারল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশে জুড়া পর্ব্বত। ইহার উচ্চস্তরে শীতের আধিক্য খুব বেশী। গ্রীষ্মে পাহাড়ের ঢালু গায়ে তৃণভূমিতে পশুচারণ করা হয়। ঘড়িনির্ম্মাণ-ব্যবসায়ের জন্য এই প্রদেশের খ্যাতি পৃথিবী ব্যাপী। একমাত্র ১৯৩৫ সনেই ১৭০ লক্ষ ক্লক্-ঘড়ি তৈরি হইয়াছিল। অতিরিক্ত তুষারপাতের ফলে যখন চাষের কাজ বন্ধ থাকে, চাষীরা তখন ঘরে বসিয়া ঘড়ির ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরি করে। এই কুটীরশিল্প হইতে ঘড়ির কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলের কর্ম্মমুখর

আল্পসের কয়েকটি চূড়া

উপত্যকাগুলি জনবহুল। স্থানে স্থানে জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৫০০। জুড়ার নিম্নপ্রদেশের ভূমি চাষের উপযোগী। ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং অনেকগুলি রেলপথের সংযোগস্থল বাজ্‌ল্ (Basle) নগর এই অঞ্চলে অবস্থিত। বয়ন ও রাসায়নিক শিল্পের জন্যও ইহা বিখ্যাত।
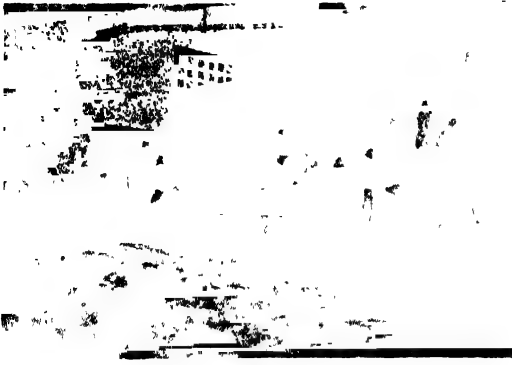
রোলিয়া সৌরবিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বরফের উপর হাঁটিতেছে

আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত সুইজারল্যাণ্ডের তিন ভাগ জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার উপত্যকাপ্রদেশ রোণ, রাইন ও ইন্‌ নদী দ্বারা বিধৌত। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর, হিমবাহ, খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী, পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাকা সুদৃশ্য পথ। হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলে ধবল গিরির প্রতিবিম্ব, আলো ও মেঘের খেলা এবং পাইন বনানীর সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। দূরদূরান্তর হইতে বহু লোক এখানে ভ্রমণ করিতে আসে। পূর্ব্বে যে সকল স্থান দুরারোহ ও অপরিচিত ছিল, রেল- ও মোটর- পথের বিস্তার হওয়ায় এখন তাহা সুগম ও পরিচিত হইয়াছে। ভ্রমণকারীরা পায়ে হাঁটিয়া, রেলে কিংবা মোটরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আল্‌প্‌সের চূড়ায় আরোহণ ও বরফের উপর নানা রকম খেলাধুলার আকর্ষণও আছে। ভ্রমণকারীদের জন্য সর্ব্বত্র বহু সুপরিচালিত উচ্চশ্রেণীর হোটেল আছে। হোটেলের ব্যবসায়ে দেশের প্রভূত ধনাগম হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যভাগ মালভূমি। শতকরা ৭০ জন লোক এই অংশে বাস করে, যদিও আয়তনে ইহা সমগ্র দেশের চতুর্থাংশ মাত্র। ইহাই দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ জমাট দুধ ও চকোলেট এ অঞ্চলে প্রস্তুত হয়। আল্‌প্‌সের পার্ব্বত্য নদীর জলধারা হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কলকারখানা চালান হয়। এ-দেশের রেলগাড়ীও বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। জুরিখ্‌ (Zurich) সর্ব্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য এই শহরটি জগদ্বিখ্যাত। দক্ষিণ জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া হইতে রেলপথগুলি এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। লীগ অফ নেশনের কেন্দ্র এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস জেনেভা শহরে। এই শহরেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রেড ক্রসের জন্ম হয়। বাজ্‌ল্‌ ভিন্ন সুইজারল্যাণ্ডের অন্য সব আধুনিক বড় শহরগুলি আল্‌প্‌সের অধিত্যকা-প্রদেশে অবস্থিত। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত হর্ম্ম্য ও মনোরম গির্জ্জা, তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতের দৃশ্য ও হ্রদ এই শহরগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডের মত অল্পপরিসর ভূখণ্ডে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। মেরুপ্রদেশ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের জলবায়ুর তারতম্য এখানে অনুভূত হয়। আল্‌প্‌সের অধিত্যকাপ্রদেশে সূর্য্যালোক ও তুষার সৌন্দর্য্যের মায়ালোক সৃষ্টি করে। বৎসরের অধিকাংশ সময় যে-প্রকৃতি সুপ্ত থাকে গ্রীষ্মে সে যেন জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় সজীব হইয়া উঠে, নিষ্পত্র বৃক্ষরাজি নবকিশলয়ে মঞ্জরিত হইয়া উঠে। শুভ্রবসনা প্রকৃতির এই আকস্মিক শ্যামলিমা স্বপ্নের মতই রহস্যময়। আবার শিলাবৃষ্টি, তুষারঝঞ্ঝা, উন্মত্ত বায়ুবেগ প্রকৃতির রুদ্র রূপেরই পরিচয় দেয়।

আল্‌প্‌সের উচ্চ প্রদেশের অবাধ সূর্য্যকিরণ প্রচুর আল্‌ট্রা-ভায়লেট রশ্মিতে ও নিম্নপ্রদেশের বায়ু 'ওজোন'-এ পূর্ণ থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। দেশবিদেশ হইতে স্বাস্থ্যান্বেষীরা স্বাস্থ্যলাভের জন্য এ-দেশে আসে। Davos, St. Moritz প্রভৃতি কেন্দ্র যক্ষ্মা-চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত। বিনা অস্ত্রোপচারে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে (Heliotherapy) টিউবারকিউলোসিস চিকিৎসার জন্য লেজাঁ (Leysin) পৃথিবী-বিখ্যাত। এই চিকিৎসার প্রবর্ত্তক ডাক্তার অগাষ্টা রোলিয়া। সূর্য্যরশ্মির অসাধারণ সঞ্জীবনী শক্তি ও রোগজীবাণুনাশক ক্ষমতার প্রভাবে যক্ষ্মারোগীরা আরোগ্য লাভ করে। প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ রোলিয়া অস্ত্রোপচার ও প্লাষ্টারের সাহায্যে যক্ষ্মা-চিকিৎসার প্রচলিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায়

এই চিকিৎসা আদৃত হইয়াছে। কিন্তু আলোর দেশ ভারতবর্ষ এখনও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এখন লেজ্যাঁতে ৪০টি ক্লিনিকে প্রায় ১,০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ হইতেই এখানে রোগী আসে।

সুইস্‌রা বিলাসী বা উচ্ছৃঙ্খল নয়, মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। আয় যত সামান্যই হউক প্রত্যেকেই আয়ের কিয়দংশসঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করে। সুইজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ; কিন্তু সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যাহাদের জমার হিসাব আছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ। গড়ে এদেশের প্রতি ব্যক্তির জীবনবীমার পরিমাণ যত বেশী অন্য কোথাও তত নয়। ধনীর সংখ্যা বেশী না হইলেও গরিব এদেশে নাই বলিলেও চলে। অসঙ্গত অর্থলিপ্সা কাহারও নাই। ধনবণ্টনের সমতা কতকটা রক্ষিত হওয়ায় শ্রেণীগত বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে নাই।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। এই জন-বহুল বিস্তৃত দেশে একটি রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে, যদিচ এ-ভাষা কি রূপ গ্রহণ করিবে, ইহার সাহিত্য-সম্পদ্ রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি রাখে কিনা, ইহা লিখিবার জন্য কোন্ লিপি ব্যবহৃত হইবে, সে-বিষয়ে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে সমস্যার সমাধান সহজ হইতে পারে। এই ছোট দেশটিতে জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়ান এই তিনটি রাষ্ট্রভাষা চলিত। সম্প্রতি রোমান্‌শ্ (লাতিনের অপভ্রংশ) রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। রোমান্‌শ্-ভাষীর সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার! দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে মাত্র একটি রাষ্ট্রভাষার প্রচলন অপরিহার্যও নয়। অধিকন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষিতদের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আছে। স্কুল এবং কলেজেও এই ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় থাকিবে। একটি ভারতীয় ভাষা শিখিলেই আমাদের ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পাইবে এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। রাশিয়ায় বিপ্লব-আন্দোলনের সময় কোন একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা হয় নাই, তবু বিপ্লব সফল হইয়াছিল। পরেও এ-

গ্রেট সেণ্ট বার্ণার্ড গিরিবর্ত্ম

চেষ্টা হয় নাই। প্রয়োজনবোধে রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কেহ একাধিক ভাষা শিখিতে পারেন। গৃহবিবাদ ও বৈদেশিক আক্রমণে রাশিয়া যখন বিপর্য্যস্ত, লেনিন তখনও চেক ভাষা শিখিবার সুযোগ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন!

সুইজারল্যাণ্ড দীর্ঘকাল স্বীয় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার মূলে সুইস্‌দের জাতি, সংস্কৃতি বা ভাষাগত ঐক্যবোধ নাই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দেশাত্মবোধ ও সমষ্টির স্বার্থ ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বারা সুইজারল্যাণ্ড বেষ্টিত ছিল। ১৯১৯-এর সন্ধির ফলে আলসাস্ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই দেশের ভৌগোলিক আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ার স্বাধীন সত্তার বিলোপ হওয়ায় প্রতিবেশী
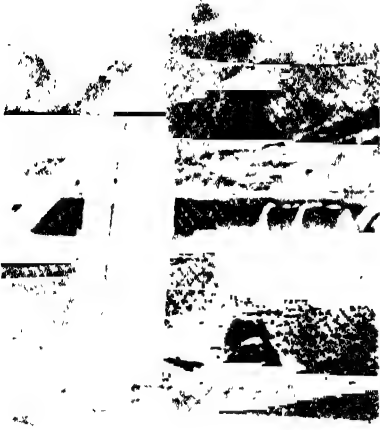
বিখ্যাত সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর

রাষ্ট্রের সংখ্যা চার হইতে তিনে দাঁড়াইয়াছে এবং ডিক্টেটর-শাসিত জার্ম্মেনী ও ইটালীর সহিত সুইজারল্যাণ্ডের সীমারেখা এখন সমগ্রের প্রায় ⅔ অংশ। হিট্‌লার ও মুসোলিনীর পররাজ্যজয়ের অভিযান সুইসদের স্বভাবতই বিব্রত ও শঙ্কিত করিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষতঃ জার্ম্মেনীর, ভৌগোলিক সংস্থান, লোকবল কিংবা আয়তন অপেক্ষা স্বৈরাচারমূলক শাসনব্যবস্থাই সমধিক শঙ্কার কারণ হইয়াছে। পূর্ব্ব-ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর জার্ম্মান রাইখের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। জার্ম্মানী রুমেনিয়াকে অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছে। হাঙ্গেরীও প্রায় আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ইটালী আলবানিয়া দখল করিয়াছে। স্পেনে ফ্রাঙ্কো-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র বল্‌কান্ প্রদেশ সন্ত্রস্ত। রাশিয়া ও বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলি হইতে ফ্রান্স বিচ্ছিন্নীকৃত। রণনীতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে এদেশের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। এই দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করা জার্ম্মেনী ও ইটালীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। এই বিপদের সম্ভাবনাও সুইস্‌দের আতঙ্কিত করিয়াছে। শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর সুইজারল্যাণ্ডের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে। জার্ম্মেনী সুইস্ পণ্যের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। ১৯৩৮ সনেও সুইজারল্যাণ্ডের রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ১৫.৭ ভাগ জার্ম্মেনী লইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে যদি জার্ম্মেনীর সহিত মনোমালিন্য ঘটে, দেশের সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। তাই উদারনৈতিক মতাবলম্বী লোকেরা ও সমাজতন্ত্রীগণ আশঙ্কা করেন মহাজন ও শিল্প-ব্যবসায়ীদের আর্থিক স্বার্থ দেশে নাৎসী-প্রভাব বিস্তারের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যৌথরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রবিভাগের মন্ত্রী মঃ মোটা-র নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট প্রীতিও অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। রেডিও ও সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচার ও অপচেষ্টার ফলে যদি সুইস্‌দের সংহতি-শক্তি শিথিল হয়, সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হইবে না। ইংলণ্ডের প্রশ্রয় না পাইলে জার্ম্মেনী ও ইটালী আজ কখনই এত শক্তিশালী ও ইউরোপের পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া উঠিতে পারিত না। ইংরেজ জানে সাম্রাজ্যলিপ্সু জার্ম্মেনী, ইটালী ও জাপান তৃপ্ত না হইলে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। তাই সে চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মানীর গ্রাসে তুলিয়া দিয়াছে, স্পেনে 'নিরপেক্ষতা'-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, আবিসীনিয়ায় ইটালীকে ও চীনে জাপানকে বাধা দেয় নাই। রাশিয়ার সাহায্য ভিন্ন ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার একরূপ অসম্ভব। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান পররাষ্ট্রনীতির মূলে রহিয়াছে এই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ধ্বংসের প্রেরণা। জার্ম্মেনী দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজ হিট্‌লারের পূর্ব্বদিকের অভিযানে বাধা সৃষ্টি করিতে চায় না। সোভিয়েটের সাহায্যে হিটলার ও মুসোলিনীকে সায়েস্তা করিলে ব্রিটেনে সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রসার হইতে পারে, এ আশঙ্কাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে পঙ্গু করিয়াছে। ইংরেজের কূটনীতির ফলে ফ্রান্স বিচ্ছিন্নীকৃত ও কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বনের উপায় নাই। চেম্বারলেন- ও দালাদিয়ার- শাসিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির ফলেই সুইজারল্যাণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপের ভবিষ্যৎ আজ তমসাচ্ছন্ন। এখনও পররাজ্যলোলুপ হিট্‌লার ও মুসোলিনীকে সংযত করিতে না পারিলে ইউরোপে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিপন্ন হইবে

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত আলোক চিত্রগুলি ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, এম্-বি, কর্ত্তৃক গৃহীত]

চল্লিশ বৎসরের দুই প্রান্তে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বেই এই বাড়ীর কর্তা ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়,—গঙ্গাধর বাচস্পতি। অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, এদিকে স্মৃতি আর ন্যায়েও অসাধারণ অধিকার। সভাপণ্ডিতীর জন্য এক দিকে বর্ধমান অপরদিকে কৃষ্ণনগর থেকে টানাটানির আর অন্ত ছিল না। যান নাই। বলিতেন—"বোনের দাসী ক'রে রাখবার জন্যে কি মা-সরস্বতীকে তপস্যা ক'রে ঘরে আনলাম ?"

একটি চতুষ্পাঠী ছিল—নবদ্বীপ, মিথিলা এমন কি বারাণসী থেকেও ছাত্রসমাগম ছিল তাতে।

লোকে বলে—"দাম্ভিক ছিলেন। কত কি ক'রে যেতে পারতেন, কিন্তু নিজের কোট ছেড়ে এক পা নড়লেন না কখন· "

ছিলেন নিশ্চয় অটল, দাম্ভিক। সমুদ্র তো আর নিম্নগা নদীর প্রকৃতি অবলম্বন করিতে পারে না।

যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের এখনও বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসা উঠিলে মনে পড়ে একটি দীপ্ত, সৌম্য পুরুষ-সিংহকে,—উন্নত ললাট, দীর্ঘ নাসা, প্রশস্ত বক্ষে সংযত জ্যোতিচ্ছটার মত শুভ্র যজ্ঞোপবীত, প্রোজ্জ্বল অগ্নি-শিখার মত রক্তাভ, সুগৌর, ঋজু, দীর্ঘ কলেবর। তখন ফুট-ইঞ্চি দিয়া দৈর্ঘ মাপিবার রেওয়াজ হয় নাই। দেশে সংস্কৃতচর্চা ছিল,—"রঘুবংশে"র দিলীপের তুলনা দিয়া লোকে বলিত—'শালপ্রাংশু।'

তিনি ছিলেন এক নাম, এক রূপ আর এক প্রতিজ্ঞায় চিরপ্রতিষ্ঠিত।

কিঞ্চিদূর্ধ্ব চল্লিশ বৎসর পরে, এখন, এ বাড়ীর কর্তা রমণীমোহন—বাবু রমণীমোহন ভট্টাচার্য, বাচস্পতি-মহাশয়ের পৌত্র। চার ফুট নয় ইঞ্চির মানুষটি, গড়ন পাতলা-পাতলা সৌখীনগোছের। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর। নামের জন্যও, এবং অনেকটা স্বল্প, সুকুমার দেহের জন্যও স্কুলে তাহার নাম হইয়াছিল "লেডী"। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে সেটা এখনও জারি আছে।

ঠাকুরদাদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লোক ছিলেন, রমণীমোহনেরও চরিত্রে তাহার অংকুর ছেলেবেলা হইতেই দেখা গেল,—যেটা ভাল লাগিবে না সেটাতে কোন মতেই লাগিয়া থাকিবে না। কিছু সংস্কৃত পড়িল, ভাল লাগিল না, ছাড়িয়া দিল। গ্রামের স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত, তাহার পর আর ভাল লাগিল না। কলিকাতায় গিয়া মেসে থাকিয়া ম্যাট্রিক দিল, আই-এস্‌সি-টাও পাস করিল; কিন্তু আর ওসব ভাল লাগিল না। বন্ধুবান্ধবেরা বিস্তর বোঝাইল, অভিভাবকেরা বোঝাইল, চোখ রাঙাইল; মেয়েরাও কাঁদিয়া চোখ রাঙা করিল, কিন্তু রমণীমোহন অটল, ছেলেবেলায় যা মাত্র জিদ ছিল তা এখন ষ্ট্রং প্রিন্‌সিপ্‌লে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সুধু একটি কথা যেন নখে-দন্তে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল—"আর ভাল লাগছে না।" কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া বসিল।

মাঝের কয়েক বৎসরের ইতিহাস আরও দ্রুত ভাল লাগা না-লাগার কাহিনী। তাহার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরিয়া চরকা-তকলি কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া চৌমাথায় দাঁড়াইয়া গান্ধীর চৌদ্দপুরুষান্ত করা—সবই আছে। এমন কি প্রায় সব ছাড়িয়া সে ছাগলীটির দুধের উপরই দিনকতক জীবনতরী বাহিয়া রাখিয়াছিল। গান্ধীর উপর আক্রোশে সেটির বাচ্চার উপর দিয়াই এক সময় উগ্ররকম আমিষ-ভোজী হইয়া উঠিল। কিন্তু উদরের ভাল লাগা না-লাগা বলিয়াও একটা ব্যাপার আছে; ছাগলীর-দুধ-খাওয়া দুর্বল নাড়ীতে তাহার ছানাদের হাড়-মাংস-চর্বি বরদাস্ত হইল না। খুব এক চোট পেটের ব্যারামে ভুগিয়া পছন্দসই নূতন পথ খুঁজিবে এমন সময় তাহার পিতার মৃত্যু ঘটিল।

দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মিলাইয়া জমিজমা নিতান্ত নিন্দার যোগ্য নয়; কিন্তু রমণীমোহনের জীবনের চরকার যুগ অনেক দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌ বদলাইয়াছে, সুধু মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা ভাল লাগিল না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল,—একটা বাড়ীর কর্তা, অথচ চাকরি করে না, এটা যেন কি রকম একটা খাপছাড়া ব্যাপার হইয়া পড়ে—কেমন যেন নেড়া-নেড়া ভাব একটা।—ঠিক কারণ দেওয়া যায় না, ঠিক বর্ণনা করাও যায় না—তবে শরীরের উপরে মাথাটিতে চুল না থাকার সঙ্গে বাড়ীর কর্তার চাকরি না-থাকার নিশ্চয়ই কোন্ দিক দিয়া যেন একটা সাদৃশ্য আছে।

হাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে; তাই এই বাড়ীর এক কর্তা এক সময় রাজসভায় হাজরি দেওয়ায় অসম্মান জ্ঞান করিত, আর অন্য সময় অন্য এক কর্তা প্রবল উৎসাহে সবুট চরণ-সকাশে ভিক্ষাপত্র নিবেদন করিতেছে—আই হাভ্ দি দি অনার্ টু বি—ইত্যাদি, অর্থাৎ হে দাতা, তোমার নিতান্ত অনুগত দাসের বৃত্তিই আমার পরম সম্মান।

চাকরি হইয়াছে। রমণীমোহন এখন ডেলী প্যাসেঞ্জার। আশ্চর্যের বিষয়, ভাল না-লাগার অমন যে একটা উগ্র বৃত্তি ছিল রমণীর মনে এত দিন, সেটা প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর তাহার সমস্ত জীবনের উপর দিয়া বিজয়-অভিযান করিয়া এইবার যেন শান্ত, সংযত হইয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে এই একটা অবস্থা আসিয়াছে যাহা বেশ দিব্য ভাল লাগিতেছে।

বাচস্পতি মহাশয় এক নামেই দেশবিশ্রুত ছিলেন, পৌত্র এরই মধ্যে তিনটি নামে খ্যাত হইয়া পড়িয়াছে—রমণীমোহন, লেডী আর ছোটবাবু। শেষের নামটা এখনও আপিসেই আবদ্ধ আছে, পুষ্ট হইয়া এক দিন "বড়বাবু"তে দাঁড়াইবে, ক্রমে গ্রামে আসিয়াও চারাইয়া পড়িবে।—রমণীমোহনের এখন সবচেয়ে উচ্চ আশা এই।···এ ভিন্ন ট্রেনের দৈনিক রাজনীতি-বৈঠকে স্বরের উচ্চতা এবং আলোচনার উগ্রতার জন্য বিশেষ নাম আছে, তবে সেটা গাড়ীতেই নিবদ্ধ—সঙ্গে করিয়া নামিতে হয় না।

শুধু বহু নামই নয়, কর্মের দিক দিয়াও বাচস্পতি-পৌত্রের পিতামহ হইতে বিশিষ্টতা আছে। তাহার মূলেও প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌, থিয়োরি প্রভৃতি কতকগুলি জটিল ব্যাপার আছে যা এ-যুগের মানুষের জীবন আরও সমস্যাঘন করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহা দ্বারা সে নিজেকে ভাল মত ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, নিজের একটি নিজস্ব রূপ দাঁড় করাইতে পারিতেছে না।—অত্যুগ্র নাগরিক জীবন আছে আবার ব্যাক্-টু-ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর যোগের কথাও আছে; দেবদেবী আছেন, কুলধর্ম্ম আছে, আবার এদিকে উদার বিশ্ব-মানবতাও আছে; সাহেব না হইলেও এক পা চলা দায়, আবার এদিকে স্বরাজ আছে, বিপ্লবের জয়গানও চাই—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সবেরই মর্যাদা রক্ষা করিতে হয় একটু-আধটু করিয়া। সারা যুগটাতেই থিয়োরি আর প্রিন্‌সিপ্‌লের জট পাকাইয়া গিয়াছে। গঙ্গাধর বাচস্পতির যুগটা ছিল 'না' অথবা 'হ্যাঁ'-এর, দুইটার মধ্যে আপোষের অবসর ছিল না—রমণীমোহনের যুগটা "না" এবং "হ্যাঁ"-এর আপোষের, সব কিছুর সঙ্গে মানাইয়া বেশ মানানসই হইয়া চলিবার যুগ। যুগের এই মূল তত্ত্বটাই তাহার জীবনের প্রতি দিনটিতে মূর্ত হইয়া উঠে। যে-কোন একটা দিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা চলে।

রমণীমোহন ভোরে উঠিল,—অবশ্য সে-যুগের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নয়, কেন-না এ-যুগের হাইজীন্ অর্থাৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলিতেছে তাহাতে এক্সপোজারের ভয় আছে।··প্রাতঃকৃত্য সারিয়া একটা খাটো ময়লা কাপড়ের উপর গামছাটা জড়াইয়া হাতে একটা দা লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিয়া গেল। এ-ব্যাপারটা ব্যাক্-টু-ভিলেজ, গ্রামের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিতালি। আজ কিন্তু বেশী সময় দিতে পারিবে না রমণী; ষষ্ঠীপূজা আছে; আটটি যজমানের বাড়ী হাজিরা দিতে হইবে। হাতে একটি রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা, ঘুরিয়া ফিরিয়া এ-গাছটার মাথায় কোপ ও-লতাটার গোড়ায় কোপ বসাইয়া ঠিক পনর মিনিট ব্যাপী—যেন একটি ল্যাবরেটরি-গ্রাম্য জীবন অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা বিড়ি ধরাইল, সেটা ভস্মীভূত করিয়া তেল মাখিয়া তালপুকুরে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নানের পরের রমণীমোহন একেবারে অন্য লোক। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় সাবান দিয়া কাচা ঝকঝকে পৈতা, গায়ে নামাবলী, কপালে, কর্ণমূলে চন্দনের রেখা, টেডির ও-প্রান্তে টিকিটি বড় বড় হালফ্যাশানী চুলের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র করা, একটি বিল্বপত্র বাঁধা, ডান হাতের অনামিকাতে একটি কুশাঙ্গুরীও পরানো। রমণীমোহন বাড়ীতে রান্নার তাগাদা দিয়া ষষ্ঠীপূজা অভিযানে হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মনটা আরও আগাইয়া গিয়া ষ্টেশনে ন-টা ছত্রিশের গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আটটা বাড়ীতে পূজা সারিতে আটটা পঁয়তাল্লিশ হইয়া গেল। অবশ্য পূজা যা হইল তাহাতে যজমানদের রাতারাতি বংশলোপ হইবার কথা, নেহাৎ বাঙালী পরিবার বলিয়াই রমণীর পূজার উজান ঠেলিয়াও বৎসর বৎসর বংশবৃদ্ধিই হইতেছে।

হাতে ঠিক একান্নটি মিনিট। ইহার মধ্যে কাপড়-চোপড় বদলান, খাওয়া, একটু বিশ্রাম, গাড়ী ধরা। তবে বেশ কেমন করিয়া যন্ত্রের মত হইয়াও তো যাইতেছে মন্দ নয় এই বছর দুই ধরিয়া। ভাত বাড়িবার তাগাদা করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিয়া রমণী প্রথমেই মণিবন্ধে ঘড়িটা বাঁধিয়া লইল। কাঁটার দিকে চাহিয়া কপাল কুঁচকাইয়া বলিল—"বাবাঃ—আজ আবার পূজোতে পাঁচ মিনিট দেরি করিয়ে দিলে—ঐ নটবর-কাকার বাড়ীতে—নিশ্চয় গিন্নী নেই, ও-সব হালফ্যাশানের বউদের কি পূজোর যোগাড় করা পোষায়···কই গো দিলে ভাত?··· নাঃ·"

আহারটি হাইজীন্ সঙ্গত—দ্রব্য হিসাবেও, রন্ধনের প্রক্রিয়া হিসাবেও, আবার আহারের পদ্ধতির দিক দিয়াও। দ্রব্যের দিক দিয়া বলা যায়—রমণী ঠাকুরদাদার যুগকেও অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে—অল্পস্বল্প নয়—প্রায় হাজার-আড়াইয়েক বছর, যখন তেল-মসলা এমন কি বোধ হয় কুলো-বঁটিরও ব্যবহার ভাল করিয়া জানা ছিল না। কুটনা কোটায় কিংবা রন্ধন-প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসেরই ভাইটামিনের উপর হাত পড়িয়াছে কি না ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া, হাত উল্টাইয়া ঘড়িটা কন্‌সল্ট করিয়া রমণী খুব সংযত ভাবে আসন গ্রহণ করিল। তাহার পর বাঁ হাতের কনুইটা খুব অনুভব করিয়া কষিয়া বাঁ দিকের পাঁজরার নীচে খানিকটা প্রবেশ করাইয়া ঝুঁকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। জানেন না বলিয়াই আপনারা হাসিতেছেন,—ইহাতে লিভার হইতে হজমের রস অবাধে নিষ্ক্রমণ হয়, হজমের সহায়তা করে। আহার্যগুলা দাঁতে পিষিয়া পিষিয়া স্যালিভার সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া আহার সমাপন করিতে করিতে ঠিক পঁচিশটি মিনিট লাগে। এতে দাঁতও অবিকৃত থাকে, পরিপাকও নির্দোষ রকম হয়। দাঁত এবং পরিপাকশক্তি দুইটাই খুব খারাপ বলিয়া রমণী ইহার এক মিনিট এদিক-ওদিক হইতে দেয় না।

"লেট্ হ'ল?" জয়হরি ডাকিয়া গেল, ন টা বাইশের জয়হরি। রমণী তখন সংযত ভাবে শ্বাস উর্দ্ধে টানিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, উত্তর দিল না। বাটিটা রাখিয়া তাহাতে খানিকটা জল ঢালিয়া সেটুকুও দুধের প্রথাতেই চুমুক দিয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিল, মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া একটু নাকী স্বরে বলিল, "আচ্ছা, কেন খাবার সময় ডিস্টার্ব করা বল তো?—ঐটুকু ডেকে আপ্যায়িত না করলেই হ'ত না?—হ'ল তো একটা বিঘ্নি খাবার সময়?—এখন সামলাই সমস্ত দিন ধ'রে—"

ঢেকুর তুলিতে তুলিতে এবং পেটে টোকা মারিতে মারিতে উঠিয়া পড়িল।

মা বসিয়াছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—"কি ঢেকুরের ঘটা বাবা বুড়োর মত। শ্বশুরঠাকুরের অত বয়সেও কেউ এ-সব উপদ্রব দেখে নি।"

রমণী আবার নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তভাবে বলিল—"আরে রোজ দেখছ এই রকম একটা না একটা বিঘ্ন হচ্ছে। —নয় জয়হরি, নয় পেনো, নয় যতে যত ওদের বারণ করি··"

আসন ছাড়িয়া আবার মূর্ত্তি বদলাইয়া গেল। পূজাতে পাঁচ মিনিট সময় গিয়াছে—জয়হরেও মিনিট-খানেকের ধাক্কা দিয়া গেল। ঠিক সাত মিনিট আর সময় আছে, বাহির হইতেই হইবে। বিদ্যুৎ-চালিতের মত আঁচাইয়া, জুতা জামা পরিয়া লইল, আজ আবার একটি ফালতু হাঙ্গাম আছে—টিকিটি পৃথক করা আছে,—আঁচাইয়া বড় চুলের

সঙ্গে সেটাকে আবার একাকার করিয়া দিতে হইবে, কপালের, কানের ফোঁটা-চন্দন মুছিয়া ফেলিতে হইবে—সাহেব চটা বেজায় এসবে।

তাড়াতাড়ি এই সব ত্রুটি সারিয়া রমণী শুইবার ঘরে গিয়া একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা ডেক-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। স্ত্রী মনোরমা পানের ডিবা এবং একটা বিস্কুটের বাক্স হাতে করিয়া প্রবেশ করিল।

ডেক-চেয়ারের আরামটি বাঁধা পাঁচ মিনিটের, এই সময় স্ত্রীর সহিতও রুটিন-বাঁধা একটু একথা-সেকথা, একটু ফষ্টিনষ্টি হয়।...ডাক্তারি বিজ্ঞান বলিতেছে—আহারের পরেই শরীর এলাইয়া একটু রিল্যাক্সেশ্যন, আর হালকা-গোছের একটু কথাবার্তা হজম এবং পরমায়ুর পক্ষে খুব উপকারী।

তাহার মানে এই পাঁচ মিনিট মনোরমা একটা জারক ঔষধের শিশি। একটু কথা কওয়া, একটু হাসি, একটু ঠাট্টা-প্রশংসা—সে-সব সেবনের পূর্ব্বে শিশিটাকে একটু নাড়িয়া লওয়া··ডাক্তারি বিজ্ঞানেরই একটা নির্দেশ—শেক্ দি ফায়েল বিফোর ইউস·

"আজ ছোটবাবুর বড্ড দেরি হয়ে গেল, হাঁ করুন, পানটা আমিই না-হয় মুখে দিয়ে দিই, সময়ের সুসার হবে এখন।"

—হাসিয়া মনোরমা ডিবা হইতে দুইটা পান বাহির করিয়া স্বামীর মুখে পুরিয়া দিতে যাইতেছিল, রমণী হাত উলটাইয়া একবার চকিতে ঘড়িটা দেখিয়া লইল,—"ওঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেল, আজ আর তিন মিনিটের বেশী দেওয়া যাবে না"—বলিয়া প্রায় লাফাইয়াই স্ত্রীর হাত হইতে পান দুইটা লইয়া তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দিল; মুখটা যে সে-বেচারির কেমন-ধারা হইয়া গেল সেটা লক্ষ্য করিবারও ফুরসৎ নাই। ডিবাটা পকেটে পুরিল, বিস্কুটের টিফিন-বাক্সটা বাঁ হাতে লইল, তাহার পর পটের কালীর দিকে যুক্ত করে দাঁড়াইয়াই হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল—খুব মনে পড়ে গেল প্রণাম করতে গিয়ে,—আজ আমার আসতে দেরি হবে, লাষ্ট ট্রেনে আসব।

আবার ঘুরিয়া যুক্তকর তুলিতে যাইবে মনোরমা প্রশ্ন করিল—"কেন?"

আধ-ফেরা হইয়া রমণী বিরক্তভাবে বলিল—"সব কথায় টোকা কেন যাত্রার সময়?···আজ গোলদীঘিতে মহাবোধি হলে বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ পণ্ডিত ফাদার লা মোসা—'সত্যধর্ম ও ধর্মে অসত্য'—নিয়ে এক বক্তৃতা দেবেন··· পারলে বুঝতে কথাটা। ·· কেমন একটা অভ্যেস টুকতেই হবে, হাজার তাড়াতাড়ি থাকুক লোকের!"

পুরা প্রণাম আর করা হইল না; তাড়াতাড়ি আর এক বার পটের দিকে চাহিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই পটের দিকেই চাহিয়া চাহিয়া মনোরমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তবে ব্যাপারটা কিছু নূতন নয়, মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাজে বাহির হইয়া গেল।

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই বাড়ীর, সম্ভবতঃ এই ঘরেরই একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলে চলে।

সময়টাও এই, অর্থাৎ দিবার প্রথম প্রহর মাত্র শেষ হইয়াছে, সূর্য্য দেখিয়া অনুমান হয়, তখন সূর্য্যের সঙ্গে সব দিক দিয়াই যোগটা নিবিড়তম ছিল।

গঙ্গাধর বাচস্পতি প্রাতঃকালীন পূজা-আদি সমাপন করিয়া এই ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সদ্যসঞ্চিত পুণ্যে সমস্ত শরীর ভাস্বর, যেন সূর্য্যদেহচ্যুত একটি জ্যোতি-শিখা। গৃহিণী একটি বঁটিতে উরু চাপিয়া একটি বড় থালায় নানাবিধ ফল কাটিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া, কাপড়ের চওড়া টকটকে লাল পাড় কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন—"হ'ল পূজো? ···দেখো···"

শেষের এই কথাটুকু একটা সতর্কতার বাণী। বাচস্পতি মহাশয়ের মাথাটা চৌকাটের উপর যায়, তাই সাবধান করিয়া দেওয়া।

মাথাটা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বাচস্পতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"ও বলতে হবে না, স্বয়ং তুমি যখন ভেতরে রয়েছ, মাথা আপনিই নুয়ে আসবে।"

গালে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠায় গৃহিণীর নথটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিলেন—"আর রঙ্গ করতে

হবে না, ব'স এসে। বড্ড বেলা হয়ে যাচ্ছে আজকাল পূজোতে।"

"আর এদিক থেকে সময় ওদিকে যতটা যায় ততই ভাল ; এদিককার বেলাও তো প'ড়ে আসছে

আসন পাতা ছিল, বাচস্পতি মহাশয় গিয়া তাহার উপর বসিলেন। গৃহিণী মিছরির পানা আর ফল, ভিজান মুগের ডাল ও ছানার থালাটা সামনে আগাইয়া দিয়া বলিলেন—"তা পড়ে আসছে বই কি।"

একটু লজ্জিত অথচ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। যাহাদের দিনমান কাটিয়াছে ভাল, বেলা যখন পড়ন্ত সে-সময় ব্যর্থতার অনুতাপে যাহাদের অতীতের দিকে চাহিতে হয় না, এ তাহাদের মুখের হাসি।

"মুগের ডাল আজ বেশী ভিজিয়েছ।"

"বৌমা ভিজিয়েছিলেন।…তা হোক, খেয়ে নাও, খাবার সেই দুপুর গড়িয়ে গেলে ভাতে বসবে তো ?"

বধূমাতা একটি কাল পাথরের রেকাবি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"দেখেছ মরণ ? আর মনেও থাকে না কিছু।…রেখে দাও ওঁর সামনে মা।…বউমার নিজের হাতের গড়া সন্দেশ, এবার বাপের বাড়ী থেকে শিখে এসেছেন। কেমন হ'ল দেখ। আজকালকার মেয়েরা যে শিখছে এই সব।"

অবগুণ্ঠনময়ী পুত্রবধূ রেকাবি শ্বশুরের সামনে রাখিয়া একটু কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। অভিমতের অপেক্ষা করিতেছে।

শ্বশুর ফলমূল থেকে হাত সরাইয়া ধীর আগ্রহে একটা সন্দেশ তুলিয়া মুখে দিলেন, বিচক্ষণতার সহিত আহার করিয়া বলিলেন—"বাঃ, চমৎকার। তুমি ব'লে না দিলে মনে করতাম আমাদের তারু ময়রার মেয়ে গড়েছে বুঝি অতি মধুর !"

দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। বধূর শরীরটিও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুলিয়া উঠিল। গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"উনি অত মেহনৎ ক'রে গড়ে খাওয়ালেন, পুরস্কার হ'ল বেহানের গালাগাল খাওয়া—এমনই যুগই পড়েছে বটে !"

আর একটা তুলিয়া লইয়া বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "না, সত্যিই বড় উপাদেয় হয়েছে মা। রোজ আমার বরাদ্দ রইল, তবে এতগুলো ক'রে নয়—ছেলে তো তোমার বুড়ো হ'তে চলল কি না…"

আহারান্তে ধীরে-সুস্থে চতুষ্পাঠীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রচুর স্বাস্থ্যে, প্রচুর অবসরে, প্রচুর মুক্তিতে, সমস্ত সম্বন্ধ পূর্ণভাবে উপভোগ করা, সমস্ত রস নিঙড়াইয়া পান করা, ওদিকে এক আত্মসমাহিত জীবন,—জীর্ণ অকালবৃদ্ধ অনবসর, শৃঙ্খলিত, স্বজন-বিচ্ছিন্ন, চিরবুভুক্ষু, এদিকে এক শতবিক্ষিপ্ত জীবন।

মাঝে মাত্র চল্লিশটি বৎসরের ব্যবধান।

পুঁথির কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আজ প্রায় সত্তর বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সঙ্কলনের কাজ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে -ভারতীয় সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত, অল্পজ্ঞাত, নষ্টপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথির সাহায্যে মহাভারত প্রভৃতির ন্যায় সুপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রন্থের যথাসম্ভব বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—যে সকল পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক্ আলোচনার যথোচিত সুব্যবস্থা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে—সত্বর যথাবিহিত ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।১

দেশের বিবিধ প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পুঁথিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর—অথচ পুঁথির মধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের যত তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে এত আর কোথাও নাই। দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুঁথির পাতা হইতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। দেশের শিল্প-সম্পদের প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের যথাসম্ভব সুব্যবস্থার জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। কিন্তু সেই শিল্প-সৃষ্টির বিধি যে সমস্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তাদৃশ ব্যবস্থা কোথায়? বস্তুতঃ, এই কার্যের জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি স্বতন্ত্র শাখার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, পুরাতত্ত্ব বিভাগ এ বিষয়ে উদাসীন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে এই বিভাগের একটা আশাপ্রদ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—এই বিভাগের চেষ্টায় স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহচর্যে প্রায় বার হাজার প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত ও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এ গুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। অবশেষে, এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তে ইহাদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগ অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন।

দেশের জনসাধারণের—এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়ে তাদৃশ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। সত্য বটে, দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পুঁথিসংগ্রহ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত নানা প্রদর্শনীতে পুঁথিপ্রদর্শন একটা শোভার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সংগৃহীত পুঁথির সংরক্ষণ, বিবরণ সংগ্রহ, এমন কি তালিকা প্রণয়ন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ফলে, স্তূপীকৃত পুঁথির রাশি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা পুঁথির যে রকম যত্ন করিতেন—তাঁহাদের খড়ের ঘরের বাঁশের মাচার উপর পুঁথিগুলি যে আদর পাইত—বর্তমানে দোতালা তিনতালা বাড়ীর সুন্দর লাইব্রেরী ঘরের দামী আলমারিতে আবদ্ধ পুঁথিগুলি সে আদর পাইতেছে না। তাই দুরন্ত পোকা সেগুলিকে নষ্ট করিতেছে। আগেকার দিনে পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলি নিয়মিত নাড়াচাড়া করিতেন—মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতেন এবং ঝাড়িতেন তাহাদিগকে যেমন 'পুত্রের মত আদর করিতেন' তেমনই কাপড় ও দড়ি দিয়া তাহাদিগকে 'শত্রুর মত বাঁধিয়া রাখিতেন'। ফলে পুঁথি নষ্ট হইত কম।

সত্য বটে, পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ অতি কষ্টসাধ্য। ঝাড়-পোঁছের জন্য নিয়মিত লোকের ব্যবস্থা করা ও তাহার কার্যের তদারক করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তারপর, কি উপায়ে ইহাদের রক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে। তাহা এখনও নির্ণীত বা আলোচিত হয় নাই। কতদিনই বা কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জীর্ণ পত্রগুলিকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে? মূল্যবান্ পুঁথিগুলির নকল করা বা আলোকচিত্র সাহায্যে প্রতিলিপি গ্রহণ করা অতীব কষ্টসাধ্য। তাই বহু অর্থ ও পরিশ্রমের দ্বারা সংগৃহীত অনেক অমূল্য পুঁথি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানেও চক্ষের সম্মুখে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

যথোচিত আলোচনা ও মুদ্রণের সাহায্যেও পুঁথিগুলির রক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অনায়াস-সাধ্য নহে। সমস্ত পুস্তকই মুদ্রণযোগ্য নহে—মুদ্রণই সমস্ত পুঁথির উদ্দেশ্যও নহে। মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সকল ক্ষেত্রে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে—কেবল একখানি পুঁথি থাকিলেই মুদ্রণ করা চলেও না

১। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য বা কালক্ষেপের বিষময় পরিণামের কথা একাধিক মনীষি কর্তৃক অতি স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। Gough সংকলিত Collection and Preservation of Ancient Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের ৭, ২৪ ও ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

—সেজন্য নানা অসুলভ বিষয়ের একত্র সমাবেশের প্রয়োজন—সেজন্য চাই অর্থ, চাই উপযুক্ত সম্পাদক, চাই একাধিক পুঁথি। তাই অনেক ক্ষেত্রে পুঁথির বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন ও আলোচনা বিশেষ উপযোগী। এই বিবরণ ও আলোচনার ফলে পুঁথির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে—অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গোচরীভূত হইতে পারে। অবশ্য এরূপ কার্যও সুসাধ্য নহে—ইহার জন্যও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেরূপ কার্য করিবার আশা সুদূর-পরাহত। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না। প্রাচীন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের বড় আদরের পুঁথিগুলি আজ অনেকের গৃহে অনাদরে, উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণের আলোচনার সুবিধার জন্য সমবেত করার মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুঁথির রাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে যক্ষের ধনের মত সেগুলিকে গৃহকোণে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি? এইভাবে পুঁথিসংগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি পায় কি? দুঃখের বিষয় এই যে অনেক প্রতিষ্ঠানে পুঁথি যেভাবে রক্ষিত হইতেছে তাহা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। অনেক স্থলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি—পুঁথির তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে যথাসম্ভব সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব করিয়াও বিশেষ ফললাভ হয় নাই। অপ্রিয় হইলেও একথা বর্ণে বর্ণে সত্য যে, কৃপণের মত আমরা সঞ্চয়েই পরিতৃপ্ত—সদ্ব্যবহারে নয়।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে—সাধারণের কর্তব্যবোধ জাগরিত করা। আমাদের পূর্ব-গৌরবের অমূল্য নিদর্শনগুলি—আমাদের পিতৃপিতামহের প্রাণাধিক আদরের সম্পদ্গুলি কিভাবে অতি দ্রুত বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে এই জাতীয় সম্পদ্ রক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টা ও বিধিমত ব্যবস্থা হইতে পারে—সংগৃহীত ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত পুঁথিগুলির আলোচনার দিকে উৎসাহী ছাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সুফল লাভের আশা করিতে পারা যায়।২ পুরাতত্ত্ব বিভাগের লেখশাখার মত (Epigraphic Department) একটী পুঁথিশাখার (Manuscripts Department) প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় লেখমালা পত্রিকার মত (Epigraphia Indica) একটী পুঁথিবিবরণ পত্রিকা (Manuscriptia Indica) প্রবর্তন করিতে পারিলে কার্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পুঁথিসংগ্রহ, পুঁথিরক্ষা ও পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন বিষয়ে আদর্শ পদ্ধতি নির্দেশ করিতে পারেন।৩ অন্য দেশে কিভাবে কার্য হয় তাহার আলোচনা দ্বারা অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে বর্তমানে পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু পুঁথি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন এই সব বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই বাহ্যিক—অতি সাধারণ লোকের সাহায্যে এই জাতীয় বিবরণ সংকলিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে থাকে পুঁথির পাতার মাপ, পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, পত্রসংখ্যা, অক্ষরসংখ্যা, প্রারম্ভ ও অন্ত। পুঁথি পড়িয়া তাহার বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন হয় না—অথবা অতি সাধারণভাবে পুঁথির বিষয় নির্দেশ করিলেই চলিতে পারে। প্রকাশিত গ্রন্থের সহিত পুঁথির পার্থক্য কোথায় পুঁথির আলোচ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য কি—এ সব বিষয় প্রায়শই এই সকল বিবরণ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। নামহীন অনেক পুঁথির নাম পর্যন্ত বাহির করিবার পরিশ্রম স্বীকার করা হয় না। ফলে সাধারণ তালিকা অপেক্ষা সেগুলির মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশী নহে। তারপর তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ভুল থাকে তাহা বিশেষ কৌতুককর। গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ না করিয়া আমি এস্থলে মাত্র দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। 'শিবার্চনচন্দ্রিকা' নামক বিবিধ দেবতার উপাসনার বিবরণপূর্ণ বিস্তৃত তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থকে একজন শৈবনিবন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।৪ 'হরমেখলা' নামক দুর্বোধ্য আভিচারিক গ্রন্থের বিবরণ দিতে যাইয়া একজন এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী হইতে পারে। আর একজন লিখিয়াছেন—ইহা বৈদ্যক গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাব্য গোবিন্দলীলামৃতের রচয়িতার নাম রঘুনাথ দাস বলিয়া একাধিক বিবরণগ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই সব ভুলের জন্য বিবরণ-রচয়িতার অজ্ঞতা অপেক্ষা শৈথিল্য ও ব্যস্ততা অধিক পরিমাণে দায়ী। এই সব বিবরণগ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি সহজে ধরা পড়ে না—কালে-ভদ্রে কেহ বিবরণের অন্তর্গত কোনও পুঁথির আলোচনা করিতে গেলে তবেই এই সমস্ত দোষ ধরা পড়ে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের তৈয়ারী বিবরণের এইরূপ ত্রুটি মাঝে মাঝে

২। ভারত সরকারের প্রযোজকতায় ও নেতৃত্বে ১৮৬৮-৯ সালে পুঁথির অনুসন্ধান ও অনুশীলনের কার্য নবীন উদ্দীপনার সহিত বিভিন্ন প্রদেশে সূচনা করা হয়। ইহার ফলে কয়েক বৎসরে সারা ভারতে যে কাজ হয় তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় ভারত সরকার কর্তৃক ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই।

৩। ১৮৭০ সালে কিলহোর্ণ সাহেব বিবরণ সংকলনের এক সাধারণ পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং সাধারণতঃ যে সকল ত্রুটি বিবরণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আভাস দিয়াছিলেন। Gough সাহেব সংকলিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ১৯২—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। কেবলনাম দর্শন গ্রন্থের বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে গিয়া অনেকে এইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন।

ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম নামক প্রসিদ্ধ পুঁথির তালিকা-গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এসব সাধারণ ত্রুটি অনেকটা অপরিহার্যবোধে সাধারণের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ত্রুটির জন্য যেখানে কৈফিয়ৎ দিবার আশঙ্কা নাই—উৎকর্ষের জন্য যেখানে প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই—সেখানে শৈথিল্য স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই বিবরণ-গ্রন্থের বিস্তৃতি দর্শনেই পরিতৃপ্ত—দ্রুত কার্য পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহারা উৎসুক। ফলে, বিবরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষগণ অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষাপকর্ষের দিকে দৃষ্টি না দিয়া যে কোন প্রকারে কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। অবশ্য দীর্ঘ সময়ের সুযোগ প্রদান করিলেই যে কার্য সুসম্পন্ন হইবে এমন বলা যায় না। সকল বিশেষজ্ঞের কাজের মত এ কাজেও কর্মাধ্যক্ষের সাধুতা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

তারপর সমালোচকের শ্যেনদৃষ্টি এবং উচ্চ আদর্শ অনেক পরিমাণে কার্যের উৎকর্ষসম্পাদনে সহায়তা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুঁথির বিবরণের কার্য অনেকের নিকট একটা অতি সাধারণ অনতিগৌরবজনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই ইহার ভালমন্দ বিচারের জন্যও বেশী লোক ব্যস্ত নহেন। উচ্চ আদর্শের অভাবও পদে পদে অনুভূত হয়। সত্য বটে, এগ্‌লিং, আউফ্রেক্‌ট, ওএবর প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ যে সমস্ত কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ আমাদের দেশে তেমন অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ, তদনুসারে আমাদের দেশে বেশী কাজ হয় নাই। ফলে আমাদের দেশে একটা উচ্চ আদর্শ গড়িয়া না উঠায় কার্যের তেমন উৎকর্ষ সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রাচীন লেখমালা পত্রিকায় (Epigraphia Indica) যেরূপ লেখসমূহের আদর্শ সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রস্তাবিত পুঁথি-পত্রিকায় (Manuscriptia Indica) পুঁথির আদর্শবিবরণ প্রকাশিত হইলে কর্মীদিগের সেই আদর্শ অনুসারে কার্য করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে এবং আদর্শবিবরণ প্রস্তুত করার যে পরিশ্রম তাহা সার্থক হইতে পারে। বস্তুতঃ প্ররোচনা ও উৎসাহ না পাইলে গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নতির আশা কম।

পুঁথির বিবরণ সংকলনের কার্যে যাঁহারা রত তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্মের গুরুত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিবৃত পুঁথিগুলি যে সকল সময়ই উৎকৃষ্ট তাহা নহে। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতাকে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করিতে হয়। কত অপাঠ্য, ভ্রম-পরিপূর্ণ, অপ্রয়োজনীয় পুঁথি পড়িয়া তাঁহাকে তাহাদের বিবরণ সঙ্কলন করিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় বা বাজে বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতার দীর্ঘ পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। কোন প্রকাশিতপূর্ব বা বিবৃতপূর্ব পুঁথির নামহীন অংশবিশেষ পাইয়া তিনি প্রথমে আনন্দে অধীর হইতে পারেন—কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর যখন অভিনবত্বের মোহ কাটিয়া যায় তখন তাঁহার সেই নিষ্ফল(?) পরিশ্রমের মূল্য যদি জনসাধারণ তাঁহাকে প্রদান না করে তবে তাঁহার কার্যে আগ্রহ আসিবে কোথা হইতে? অথচ এইরূপ পুঁথির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ কর্মীর পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতেছেন ইহা অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন পুঁথি এক নামে বা একই গ্রন্থকার বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থলে পরিচিত[৫]। পুঁথির বিবরণ সংকলনকালে এ রহস্যের উদ্‌ভেদ না করিলে ভবিষ্যতে কাজের অনেক অসুবিধা হয়। উদাহরণের দ্বারা আমি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। তবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাইলে পুঁথির বিবরণ-রচয়িতার নিকট হইতে এইরূপ অনেক উপযোগী বিষয়ে খবর পাওয়া যাইতে পারে। যাহাতে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ সংকলিত হইতে পারে সেজন্য সাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, পুঁথিতত্ত্ব একটা স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং পুঁথি-তত্ত্বপ্রবীণ এক দল ছাত্র গড়িয়া তোলা সম্ভবপর কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। এ বিষয়ে ধীর স্থির নিপুণ কর্মীর প্রাচুর্য নাই একথা অস্বীকার করা চলে না। অথচ পুঁথির সম্বন্ধে জানিবার, করিবার ও বুঝিবার বিষয় অনেক আছে। সেই সকল দিকে অল্পের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য- কাহারও নিন্দা বা দোষপ্রদর্শন আদৌ ইহার লক্ষ্য নহে।

৫। খণ্ডিত পুঁথিতে অনেক সময় যে নাম পাওয়া যায় তাহা পরিচ্ছেদ মাত্রের নাম—পূর্ণ গ্রন্থের নাম নহে। অথচ এই নাম অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের আসল নাম রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলে, একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নাম-সমস্যার সমাধান কালসাপেক্ষ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে

আলোচনা

বঙ্গে বাঙালীকে অস্থায়ী গবর্ণর না-করা

শ্রীরামানুজ কর

বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে বঙ্গে বাঙালীকে অস্থায়ী গবর্ণর না-করা বিষয়ক সম্পাদকীয় নিবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড রেডিং চারি মাসের ছুটিতে দেশে গেলে বাংলার তৎকালীন গবর্ণর লর্ড লিটন্ অস্থায়ী ভাবে বড়লাট হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে সর্ আবদুর রহীমের অস্থায়ী গবর্ণর হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁহার দাবি উপেক্ষা করিয়া আসামের গবর্ণরকে বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত করা হয় এবং সে সময়ে বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী আসামের অস্থায়ী গবর্ণর হন নাই।

মধ্যপ্রদেশে প্রথম ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ শ্রীপদ বলবন্ত তাম্বে অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হন এবং ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজে সর্ মহম্মদ ওসমান ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং সর্ কে. রেড্ডী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র বাংলা, বোম্বাই ও বিহারে কোন ভারতীয় অস্থায়ী গবর্ণর হন নাই। প্রচলিত আইন অনুসারে বোধ হয় আর কোন ভারতীয় অস্থায়ী গবর্ণর হইতে পারিবেন না।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের দাবি বহুদিন হইতে উপেক্ষিত হইতেছে। বাংলা-গবর্মেণ্টের আট জন সেক্রেটারীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ। তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া ১৮ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বিভাগীয় কমিশনরের পদ পাইয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ৫ জন চীফ সেক্রেটারীর পদ পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্ ররার্ট রীড ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়া চীফ সেক্রেটারী, বাংলা-গবর্মেণ্টের শাসন-পরিষদের সদস্য, আসামের স্থায়ী গবর্ণর এবং দুই বার অস্থায়ী ভাবে বাংলার গবর্ণর হইলেন। সর্ গিলবার্ট হগ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়া পরে বিভাগীয় কমিশনার, চীফ-সেক্রেটারী এবং আসামের অস্থায়ী গবর্ণর হইয়াছিলেন। মেসার্স টোয়াইনাম ও ব্র্যাণ্ডি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বিভাগীয় কমিশনারের পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, মিঃ টোয়াইনাম কয়েক বার অস্থায়ী ভাবে চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমানে আসামের অস্থায়ী গবর্ণর হইয়াছেন। মিঃ ব্র্যাণ্ডি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী ভাবে চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি এই পদে নিযুক্ত আছেন।

অস্থায়ী গবর্ণর হওয়া ত দূরের কথা বাংলায় কোন ভারতীয়কে আজ পর্য্যন্ত চীফ সেক্রেটারী করা হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুক্তপ্রদেশে চীফ সেক্রেটারী হইয়াছিলেন, তৎপরে আরও দুই জন ভারতীয় এই প্রদেশে চীফ সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। সিন্ধু ও মধ্যপ্রদেশেও ভারতীয়কে চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাংলায় ভারতীয় সিভিলিয়ানদের দাবি নানা ভাবে অগ্রাহ্য হইতেছে। জিলা জজ মিঃ প্রবোধচন্দ্র দে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ৫ জন সিভিলিয়ান জজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ পাইয়াছেন। বিচারপতি হেণ্ডারসন ও সর্ বেনিগেলরাও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, এজলী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এবং পেজ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদার ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক বৎসরের জন্য স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল তিনি যানবাহন-বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত বৎসর ছুটি লইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে বাঁকুড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ বেকার তাঁহার স্থানে সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চাকরিতে যোগদান করিয়াছেন। মেসার্স সাইমন ও ওয়াকার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমানে সেক্রেটারীর পদে বাহাল আছেন। কয়েক জন সিভিলিয়ান ভারত-সরকারের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন। এরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত দত্ত ও দে এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর আর পদোন্নতি হইবে না। শ্রীযুক্ত বসু বর্তমানে জিলা জজের পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চাকরিতে যোগদান করিয়াছেন। ইঁহার দাবি বার বার অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দত্তের যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়া জিলায় শালবান্ধ পরিকল্পনা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার নাম রাধানগরের অধিবাসিগণের স্মৃতিপটে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। চারি হাজার বিঘা অনুর্ব্বর জমি তাঁহার চেষ্টায় স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়াছে। বাঁকুড়ায় থাকিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার অধীন বিভাগ-গুলির বহু তথ্যপূর্ণ বার্ষিক বিবরণী যত শীঘ্র বাহির হয়, আর কোন সেক্রেটারী এত শীঘ্র বার্ষিক বিবরণী সঙ্কলন করিতে পারেন না। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের যোগ্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দত্ত ব্যতীত আর কাহারও সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

নাই। তাহাদের সহিত কোন পরিচয়ও নাই, তথাপি সিভিল-লিষ্ট দেখিয়া গত ২২শে শ্রাবণের দৈনিক বসুমতীতে বাংলায় সিভিল-সার্ভিসের বাঙালী কর্ম্মচারীদের দাবি কি ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে তাহাই লিখিয়াছিলাম। পরে শ্রীযুক্ত হালদার বাঁকুড়ায় আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বলিলেন, "আপনি ভুল করিয়াছেন, আমার উপর কোন অবিচার হয় নাই। এখানে আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে। আমার দুই ষ্টোন ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে।" কালেক্টরদিগের মধ্যে ইনিই প্রধানতম। অদূর ভবিষ্যতে আর কোন বাঙালীর বিভাগীয় কমিশনার কি সেক্রেটারী হইবার আশা নাই।*

বঙ্গে সাইকেলের কারখানা

কলিকাতাস্থ "ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ"র ডিরেক্টর লিখিতেছেন—

আমাদের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" "বিহারের দুটি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান" শীর্ষক মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে, বিহারে একটি বাইসাইকেলের কারখানা খোলা হইবে এবং "বঙ্গেও এইরূপ কারখানা হওয়া উচিত এবং হওয়া দুর্ঘট নহে"। সুতরাং বাংলা দেশে যে এইরূপ একটি কারখানা পূর্ব্বেই হইয়াছে এই সংবাদ জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি।

* ইহা লিখিত হইবার পর শ্রীযুক্ত হালদারের রাজশাহীর কমিশনার হওয়া স্থির হয়।

১৯৩৮ সনের মার্চ্চ মাসে দশ লক্ষ টাকা মূলধন সহ "ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ" নামে একটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ইহার হেড অফিস এবং বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী তিলজলাতে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কারখানার বাড়ীঘর কলকব্জা ও নিকেল প্লেটিং প্ল্যান্টে এ যাবত প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আরও প্রায় ষাট হাজার টাকার কলকব্জার জন্য জার্ম্মেনীতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, দুই-এক মাসের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। একটি সাইকেল বহু ছোট-বড় অংশে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র দ্বারা স্বতন্ত্র কারখানায় তৈরি হইয়া পরে সেই অংশগুলি একত্র করিয়া তৈরি হয়। সুতরাং সমগ্র সাইকেল তৈরি করিতে বিস্তৃত কারখানা ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ কতক-গুলি অংশ তৈরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন, ইহা সফল হইলে বাকী অংশগুলি তৈরি করার কাজে হাত দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে skeleton frame, bells, carrier and stand combined এইগুলি কারখানায় সাফল্যের সহিত তৈরি হইয়াছে ও বাজারে চলিতেছে। অন্যান্য অংশ শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। কলিকাতা ভিন্ন বিহার ও মধ্যপ্রদেশে অনেক মাল সরবরাহ করা হইয়াছে। অধুনা করাচী এবং মান্দ্রাজ হইতেও অর্ডার আসিতেছে। বর্ত্তমানে এঞ্জিনীয়ার, মজুর ও শিক্ষানবীশ সহ মোট প্রায় দুই শত জন লোক প্রত্যহ এই কারখানায় কাজ করিতেছে। ইহারা সকলেই বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান। সাইকেল তৈরির কাজ ও সংশ্লিষ্ট কলকব্জার ব্যবহার ভালরূপে শিক্ষা করার জন্য কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ারকে কোম্পানীর খরচে সম্প্রতি জার্ম্মেনীতে পাঠান হইয়াছে।

অন্ধকারে

শ্রীকল্লিতা দেবী

নুয়ে-পড়া নিমের বাঁকা ডাল
হেলে আছে আলগা খোঁপার 'পরে।
অন্ধকারে কাঁদন চাপা বুক
আঁকড়ে আছে পাথরখানা যেন।
ফোঁটা ফোঁটা ঘামে কপাল ভিজে,
দূরে-চাওয়া কালো চোখের পাতা
খেয়ান পাঠায় ভূ-সীমানার পারে।
মাথার উপর—
তারায় তারায় আকাশ করে থরোথরো,
তাকিয়ে থাকে সাথীবিহীন বোবার ব্যথা।

হেনা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে জোনাক জ্বলে,
প্রেতচ্ছায়ার অতৃপ্ত চোখ আগুন হানে।
বাদুড়ের ডানার ঘায়ে,
নিশুৎ রাত্রি বক্ষে চেপে হাঁপিয়ে ওঠে।
হঠাৎ গোরুর গাড়ীখানা হাটের পথে
প্রাত্যহিকের গ্রাম্যভাষা বয়ে আনে।
লণ্ঠনের ঝিকিমিকি দোলখাওয়া আলো
ঝিমন্ত চাকার সুর দিয়ে যায় কানে
দূর গ্রামের ইঙ্গিতে॥

খাপছাড়া

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অভিধানের ৫৮তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ পত্রাঙ্ক ১৮৪৪ এবং শেষ শব্দ "পুরোভাগ"। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা ও ডাকমাশুল এক আনা।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। কলিকাতার ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। দ্বিতীয় খণ্ড নবম সংখ্যা।

এই সংখ্যায় "অদ্বৈতাচার্য" প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে। তাহার পর ছোট ছোট অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। শেষ ব্যাখ্যাত শব্দ "অধিবক্তা"।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার মহত্ত্ব—শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী। ১৯২+।০ পৃষ্ঠা। কেশবচন্দ্রের একখানি তিন রঙে মুদ্রিত ছবি আছে। মূল্য এক টাকা। ঢাকা, উয়ারীতে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই বহিটির পরিচয় প্রদান উপলক্ষ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"নবযুগের প্রবর্ত্তক, মহামতি রাজা রামমোহন রায় বিশ্বমানবের কল্যাণ-জন্য ও বিশেষভাবে ভারতের উন্নয়নজন্য যে সব মহৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছিলেন, সেই সব কার্য্যে ও বাস্তবতায় পরিণত করিতে কেশবচন্দ্র তাঁহার বিরাট্ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়া জগতে এক প্রগতিশীল বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শুধু ধর্ম্মে নয়, নীতি সমাজ রাষ্ট্র শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তিনি ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন।...ব্রহ্মানন্দের জীবনকাহিনী, তাঁহার বাণী শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি যতই প্রচারিত হয়, এই দুর্গত দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া সাম্প্রদায়িক ও আন্তর্জাতিক অবিশ্বাস ও অপ্রেমের ভীষণ বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে। শুধু এদেশ কেন, সমস্ত জগতের পক্ষেই কেশবচন্দ্রের সমন্বয় ও শান্তির বার্ত্তা একান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ মহাশয় প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ ভাষায় কেশবের জীবনকাহিনী ও বাণী সংক্ষেপে এই গ্রন্থে প্রচার করিয়া তরুণদের সম্মুখে এক মহৎ ও রমণীয় আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহারা নব প্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহাদের জীবন সুন্দর, পবিত্র, মধুর ও কর্ম্মশীল করিতে সমর্থ হইবেন। আশা করি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা গ্রন্থকারের প্রশংসনীয় শ্রম সার্থক হইবে।"

রত্নকণা—মহাভারতের কথা ও উপদেশ। শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী কর্তৃক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত হইতে সংগৃহীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা এক টাকা, কাগজের মলাটে বাঁধা বার আনা। প্রকাশক রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত উপাখ্যানগুলি সুলিখিত ও উপদেশপ্রদ।

তীর্থচিত্র—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা ও বিবৃতি আছে :

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শান্তিপুর, শ্রীমৎ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, নবদ্বীপতীর্থ, শ্রীক্ষেত্র, মোক্ষধাম কাশী, ৺বৃন্দাবনধাম, গঙ্গাসাগরতীর্থ, চন্দ্রনাথতীর্থ, বদরিকাশ্রমের পথ, নেপালে পশুপতিনাথ, আদি আচার্য্য সনৎসুজাতের উপদেশ, ৺দ্বারকাধাম, প্রভাসতীর্থ, উজ্জয়িনীতীর্থ, শ্রীশ্রীরামেশ্বরতীর্থ, নীলকণ্ঠ মহাশয়ের কবিতা।

তীর্থযাত্রীরা এই বহিটি হইতে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। ইহা বেশ সরল ভাষায় লিখিত।

ড.

প্রজ্ঞাভাবনা—শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির সঙ্কলিত ও অনূদিত। প্রকাশক—প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, নালন্দা বিদ্যাভবন, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, বউবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক পালি ভাষায় লিখিত বিশুদ্ধিমগ্‌গ নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রজ্ঞানির্দেশ অংশের সংক্ষিপ্তসার ও বঙ্গভাষায় তাহার ভাবানুবাদ এই পুস্তকে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। পালি টেক্‌সট সোসাইটি প্রকাশিত মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠার (৪৩৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭৭ পৃষ্ঠা) বিষয় এই পুস্তকে ৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তকের সাহায্যে অতি অল্প আয়াসে বিস্তৃত বিশুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থের অনুশীলন সম্ভবপর হইবে। বাঙ্গালী পাঠক অনুবাদ হইতেও অনেক উপকার পাইবেন। বিশুদ্ধিমগ্‌গের অন্যান্য অংশের এবং অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থেরও এইরূপ সার সঙ্কলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্কলনের প্রতি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সারসঙ্কলনে অবলম্বিত মূল সংস্করণের পৃষ্ঠাদির নির্দেশ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। মূলের সহিত পাঠবৈষম্য থাকিলে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া উচিত। অন্যথা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে এই সমস্ত সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি বিশেষ পীড়াদায়ক এবং এ জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে অগৌরবকর। এইরূপ পুস্তকে মূল অংশে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহৃত হইলে সারা ভারতের পক্ষে ব্যবহারের সুবিধা হয় এবং বহুল প্রচারের ফলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আশা করি, বিজ্ঞ সঙ্কলয়িতা এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন এবং জিজ্ঞাসু জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অতীশ দি গ্রেট—শ্রীঅবনীনাথ রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

আমাদের উপন্যাস মুখ্যত নায়কনায়িকার যৌবন এবং তদুত্তর জীবন লইয়াই থাকিত। যত দূর জানা আছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' হইতে কিশোরকেও নায়কত্বের আসনে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রোম্যান্স যে শুধু দুইটি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, এই কথাটা মানিয়া লওয়ায় কথাসাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসারটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, কিশোরের চোখের সামনে (এবং তাহার পূর্ব্বে শিশুর সামনেও) জীবন-শতদলের পাপড়ি যখন একে একে বিকশিত হয়, তখন তাহার যে অপরূপ বিস্ময়ের অনুভূতি তাহার রোম্যান্স উত্তর-জীবনের প্রণয়ঘটিত রোম্যান্সের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই শ্রীকান্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত এ-ধরণের যে গোনাগুনতি উপন্যাস কয়টি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি তাহাদের অভিনবত্বে পাঠকের অন্তর একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

'অতীশ দি গ্রেট' এই পর্য্যায়ের উপন্যাস। অবনীবাবুকে এত দিন গল্পে পাইয়াছি, প্রবন্ধ-রচনায় পাইয়াছি এবং সবচেয়ে বোধ হয় বিশিষ্ট ভাবে পাইয়াছি খণ্ড খণ্ড জীবনী রচনায়, যাহাতে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি তাঁহার শক্তির এক নূতন রূপ দেখাইয়া আমাদের যুগপৎ পুলকিত এবং বিস্মিত করিয়াছেন। শৈশব হইতে যৌবনের দিকে অভিযানে একটি নবীন জীবনের অভিজ্ঞতা লেখক এত দরদ দিয়া ফুটাইয়াছেন যে, মনে হয় নিজেও বয়সের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঐ জীবনপ্রবাহে লীন হইয়া গিয়াছি। সব লেখকের দ্বারা এটুকু হয় না এবং মুষ্টিমেয় যে কয়জনের দ্বারা হয় তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ঐটুকু বলিলেই বোধ হয় সব বলা হইল।

লেখার ভাষা খুব হাল্কা এবং মনোরম, মাঝে মাঝে ভাবের গুরুত্বে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে ভাল লাগিল অতীশের জীবনের গতিবেগ—ভালমন্দ কোন অভিজ্ঞতাই তাহাকে যেন এক স্থানে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সে ক্রমাগতই মহৎ হইতে মহত্তরের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এবং যা শ্রেষ্ঠ, যা মহৎ, তাহার পথের ধূলিকণা হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকেই সাদরে তুলিয়া জীবনে গ্রহণ করিয়াছে।

বইয়ের ঘটনাবলীর মধ্যে বা অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও কোনখানে শ্লথতা বা অস্পষ্টতা নাই। পড়িতে পড়িতে মনে হয় সব যেন অতীশের মুগ্ধ, স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্য দিয়া দেখিতেছি, কিছু বাদ পড়িবার উপায় নাই।

বইয়ের নামকরণটি কিন্তু আমাদের কানে বাজিয়াছে। মনে হয় নামটি দুইটি ইংরেজী শব্দের আড়ম্বরে কোথা দিয়া যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

মৈত্রেয়ী—শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর জীবনের প্রথমাংশ লইয়া লিখিত এই চিত্রনাট্যখানি আমাদের খুবই ভাল লাগিল। মুখবন্ধে বলা হইয়াছে লেখকের বয়স মাত্র সতের বৎসর এবং 'মৈত্রেয়ী' তাঁহার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা। অল্প অল্প ত্রুটির কথা বাদ দিলে বইখানি পাকা-হাতের লেখা বলিয়া মনে ছাপ দেয়। ভাষার উপর লেখকের দখল তাঁহার বয়সের অনুপাতে অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ করিয়া চিত্রনাট্য বা সিনারিও-জাতীয় নাটকে বাঙ্গালা ভাষার এই দৈন্যের যুগে এই উদীয়মান লেখকের দিকে আমরা খুব আশার দৃষ্টিতেই চাহিয়া রহিলাম

সত্যপ্রিয়া—শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র। প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র, ৬৩ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একখানি নিতান্ত অসঙ্গতিদুষ্ট চিত্রনাটিকা।

অল্পপরিসরের মধ্যে একরাশি অর্থহীন অথচ চমকপ্রদ ঘটনা ঠাসিয়া বইটাকে একটা-কিছু করিবার চেষ্টা আছে। মুখবন্ধে দেখা গেল লেখক বইটিকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করিতে চাহিয়াছেন। বাংলা চলচ্চিত্রে কিই বা না চলে? সে হিসাবে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—শ্রীইলা দেবী। ডি. এম্ লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলার অতিআধুনিক প্রগতি-সাহিত্য বাস্তবের জয়ঘোষণায় মুখর। প্রতিক্ষণে এ-সাহিত্য মনে করিয়ে দিতে চায় যে, জীবনটা ঠেসে রয়েছে ক্ষুধা তৃষ্ণা সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। স্বপ্ন ব'লে এই সংগ্রামকে উড়িয়ে না দিয়েও যে দু-এক জন আধুনিকা জীবনের রহস্যলোকের উপর স্নিগ্ধ আলোকপাত করেছেন, শ্রীমতী ইলা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম নারীশিল্পী। ভাষা তাঁর আধুনিক, অথচ ভাব তাঁর প্রবীণ বনেদী ছাঁদের। বহু যুগ আগে যা ঘটেছে, আধুনিকদের বহু যুগ পরেও যা নাড়া দেবে মানুষের প্রাণকে—সেই সব স্বপ্ন রহস্য ও প্রেরণা যেন ভরে ওঠে তাঁর সুললিত অবদানকথার আলাপে। গল্পের কলাকৌশল তাঁর বেশ জানা আছে, কিন্তু গল্পের অন্তরতম লোকে জাগে লেখিকার সুর যার ঝঙ্কার ও দরদ সত্যি "ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া"। চারটি গল্পে চার রকম সুরের আলাপ জমে উঠেছে: "বর্ষারাতে" চমক দিয়ে গেছে নিষ্ঠুর সন্দেহের গমক, গৌড়ের রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়েছে, ধ্বংসস্তূপকে গ্রাস করে উঠেছে জঙ্গল, তার উপর লাগল মায়ার ছোঁয়াচ। বিরাট প্রাসাদের ছাদে রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধরূপিণী নারী দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কর্কশকণ্ঠে এক পুরুষ করছে শাসন; হঠাৎ তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকার! দুর্ভাগা নারীর দেহ তলিয়ে গেল বহু নীচে পরিখার জলে—পুরুষের মুখে বীভৎস নির্ম্মম হাসি···সুদূর অতীতের এই ছবির উপর পড়ল এ-যুগের ছায়া: হালের লক্ষ্ণৌ শহরের আর এক ছাদ থেকে এক নারীর পড়ে যাওয়া। পাঠকদের মনে হবে কালের ব্যবধান দূর ক'রে দিয়ে নারীজীবনের চিরন্তন অভিশাপ যেন মূর্ত্তি ধরে উঠেছে।

"চিত্রলেখা" গল্পটি ঘরোয়া স্মৃতির আমেজে মধুর। পুজোর বাজারে খদ্দেরের ভিড়; কত রকম মানুষ দোকানে ঢুকছে বের হচ্ছে, তাদের চালচলন, হাবভাব সুনিপুণ তুলির টানে লেখিকা যেন ছবি এঁকে গেছেন। সস্তা ব্যারিষ্টার-পত্নী করছে ডিনারের আয়োজন: স্যাঁৎসেঁতে কলতলায় বাসন মাজছে বুঁচির মা, জমিদার-গিন্নী ও তাঁর অন্দরমহল এবং জমিদার বাবুর বাইরের বাড়ী ও বাইনাচ। তারই সঙ্গে দেখি এঁদো গলির মধ্যে ভাঙা বাড়ীর ময়লা বিছানায় পড়ে আছে মা-হারা ছোট্ট মেয়ে। তার রোগশীর্ণ মুখের সামনে দাদামশাই ধরছেন একখানা শাড়ী, বহু কষ্টে কেনা। অভিমানিনীর পছন্দ হ'ল না, ছুঁড়ে ফেলে দিল সস্তা শাড়ী। এমনি কত রকমের ছবি, সহজ নৈপুণ্য ও সমবেদনার সঙ্গে লেখিকা এঁকে গিয়েছেন।

অতীতের পটভূমিকায় ভেসে ওঠে আধুনিকা বিপাশার ছবি। পাহাড়পুরের স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রাচীন মূর্ত্তি; তার চার দিকে জাগল নব বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষা। এম-এ ক্লাসের ছাত্রী, "প্রজ্ঞাপারমিতা"র মত ধীশালিনী বিপাশার ভিতর বাহির গেল বদলে—সব রকম পাশ ছিন্ন ক'রে চলে গেল বিপাশা। আকাশ বাতাস শিউরে উঠল তার নিষ্ঠুর অন্তর্দ্ধানে।

বইখানির মধ্যে সবচেয়ে বড় গল্প "উল্কা"। শ্রীলতার মধ্যে লেখিকা তাঁর রচনাশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখিয়েছেন। অতি-আধুনিকদের এ-গল্প হয়ত ভাল লাগবে, কারণ তাদের ভাষা ও টেকনিক্ সব বজায় আছে। অথচ তারই মধ্যে লেখিকা তাঁর নিজস্ব আদর্শবাদ ও অপরাজেয় প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে গেছেন।

"আনন্দবর্দ্ধন"

তিব্বতের পথে হিমালয়—স্বামী অখণ্ডানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। পৃ. ১৫৯+৪ খানি চিত্র।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কেদার বদরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার পর ১৯০৪ সালে সেই ভ্রমণকাহিনী উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই সকল প্রবন্ধেরই প্রতিলিপি।

তীর্থযাত্রার বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ বলিয়া বইখানিতে আমরা ভ্রমণকারীর সদ্যোজাত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাই না, যাহা পাই তাহা কালের ব্যবধানের জন্য কল্পনার মন্ত্রস্পর্শে মধুর ও অপ্রাকৃতভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর অনাবিল ভক্তিভাব, গম্ভীর রমণীয় দৃশ্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ, তাঁহার ত্যাগনিষ্ঠা এবং ঈশ্বরানুবর্ত্তিতা ও সর্ব্বোপরি হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক প্রেম বর্ত্তমান কাহিনীটির পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে এবং ভাষার গাম্ভীর্য্যগুণে পুস্তকখানি ভক্ত পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদর লাভ করিবে এইরূপ আশা করা যায়।

ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পৃ. ৬৭।

রেলওয়ে বাজেট উপলক্ষে "আর্থিক জগৎ" পত্রিকার সম্পাদক যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পুস্তকে সেগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আর্থিক সমস্যার সম্বন্ধে সুলেখক বলিয়া যতীনবাবুর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাঁহার তথ্যবহুল চিন্তাপূর্ণ সমালোচনা পাঠ করিলে সকলেই লাভবান্ হইবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া এইরূপ আরও পুস্তিকার প্রণয়ন ও বহুল প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শুশ্রূষা-বিদ্যা, তৃতীয় পাঠ—ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। ৫৭।১।১এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

গ্রন্থকার এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা বহু পূর্ব্বেই সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকখানি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা, দিব্যদীপ্তি-সমুজ্জ্বল রত্নকণা। ১১৭ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পরিসরে, সাধারণ সমস্ত রোগের নাম, নিদান, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ, অরিষ্ট-চিহ্ন, আতুরোপক্রম, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংক্ষেপে, অথচ সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি, তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ, আকস্মিক বিপদের প্রতিকার, পথ্য-প্রস্তুত প্রণালী, কিছুই বাদ পড়ে নাই; প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানের গবেষণা, এমন সহজ সরল অকুণ্ঠিত ভাষায়, নূতন ভঙ্গিতে বুঝাইয়া দেওয়া, আর কাহারও গ্রন্থে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শুধু শুশ্রূষাকারিণী কেন, পল্লীগ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এমন কি সাধারণ গৃহস্থেরাও এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন। লেখকের কাছে আমাদের একটি অনুযোগ আছে। তিনি "ভাল্ভ" লিখিতে গিয়া "হ্বাল্হ্ব" এইরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, সকলে কি ইহা উচ্চারণ করিতে পারিবে?

শ্রীব্রজবল্লভ রায়

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শরৎকুমার রায় প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের মুকুটহীন রাজার জীবনচরিতের এই নবসংস্করণ চিত্র ও তথ্য-বাহুল্যে সমৃদ্ধতর হইয়াছে। ইহা উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য অথচ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় চিত্তের উদ্বোধক।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

জুজু—কুমারী শোভনা দাশ। চ্যাটার্জ্জি ব্রাদার্স, ৬।১ এক-ডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃ ৭২, সচিত্র, মূল্য দশ আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত আটটি চলনসই গল্পের সমষ্টি।

শতদল—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১২৮। মূল্য দেড় টাকা।

১১০টি কবিতার সমষ্টি—কবিতাগুলিতে ভক্তি ও আত্মনিবেদনের আবেগ আছে। দু-এক স্থানে সে আবেগ কাব্যরূপও পাইয়াছে।

জগৎ কোন্ পথে?—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। পৃ ১৯৯। মূল্য এক টাকা। বহু পূর্ণপৃষ্ঠ চিত্র সংবলিত।

কয়েক জন শক্তিশালী লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হইলেও, আমাদের শিশুসাহিত্যের শৈশবদশা কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছে না; ছেলেদের জন্য ইদানীং অনেক বই লেখা হইতেছে, কিন্তু তাহার অনেকগুলিতেই জোলো ছেলেমানুষির অংশ অত্যন্ত বেশী। আলোচ্য বইখানি অবশ্য ঠিক শিশুদের জন্য লেখা নয়, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অভিপ্রেত। কিশোরদের জিজ্ঞাসাকে লেখক শ্রদ্ধা করিয়াছেন, ও বর্ত্তমান জগতের আন্তর্জাতিক অবস্থা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রবিধি, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি গুরু বিষয়ও তাহাদের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত হইলেও লেখক বইখানি হাল্কা কথায় পূর্ণ করেন নাই; বয়স্কও অনেকে এই বইখানিকে ছেলেদের বই বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া পড়িয়া দেখিলে বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা জানিতে পারিবেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সহজ উপায়ে ভগবৎ-দর্শন বা প্রেমলীলা—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ধর (মণী ধর) প্রণীত। প্রকাশক—মণী ধর, ১১ নং মধুগুপ্ত লেন, কলিকাতা। সচিত্র। পৃ. ৫০। মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ইংরেজী ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সন হইতে ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়া তিনি 'মহা-আনন্দ' লাভ করিতেছেন। কি প্রকারে এবং কি কি ক্রিয়া দ্বারা তাঁর 'দুষ্ট মনকে' বশ করিয়া তিনি এই আনন্দ লাভ করিয়াছেন, "তাঁহার প্রত্যেকটি ক্রিয়াই এই পুস্তকে ফটো দ্বারা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা" তিনি করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, গ্রন্থকারের নিজের বিভিন্ন ভঙ্গির অনেক ফটো ইহাতে রহিয়াছে।

সহজ উপায়ে পরীক্ষা পাসের জন্য বাজারে বহু বই বিক্রয় হয়। 'সহজ উপায়ে ভগবৎ-দর্শন' যদি কারও অভীষ্ট হয়, তবে তিনি এই বইখানা কিনিতে পারেন। কিন্তু এরূপ লোকের বাহুল্য কোন সমাজের পক্ষেই স্বাস্থ্যের চিহ্ন নয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিক্ষানায়ক আশুতোষ—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১০৭। দাম এক টাকা।

এই পুস্তিকাখানি আশুতোষের পুরা জীবনচরিত নহে। তাঁহার জীবনের একদেশ (ছাত্রজীবন ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাবলী) লইয়া লিখিত। প্রসঙ্গতঃ সাধারণভাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনের অন্যান্য তথ্যও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ছাত্রপাঠ্য ভাল জীবনচরিতের সংখ্যা খুবই কম। এখানি সেই অভাব কিয়দংশে পূরণ করিবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

দেবী—শ্রীতারিণীকমল পণ্ডিত, এম-এ, বি-এল। ২৩৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ টাকা। প্রকাশক শ্রীললিতমোহন সিংহ। ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই উপন্যাসখানির ভূমিকায় কথাসাহিত্যের স্বরূপের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এ বইখানিতে সেই সংজ্ঞানুযায়ী বস্তু প্রচুর আছে। পরিশেষে, 'পাঠক তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করিবেন' বলিয়া তাঁহার 'বিশ্বাস'ও ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় আমরা সেনগুপ্ত মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কথোপকথনের অস্বাভাবিক রীতি অবাস্তব চরিত্র মনের রস-পিপাসাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। বহু চেষ্টা করিয়া বইখানি শেষ করিলাম, আবার পড়িলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত নরেশবাবুর সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না।

ত্রিধারা—শ্রীনলিনকৃষ্ণ ঘোষ। ১৩১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। ঘোষ এণ্ড সন্স, ৩।১ রসা রোড, কলিকাতা।

লেখক নিজেই গল্পগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন --কবি ছবি রবি। গল্পগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আবেগ এবং ভাবপ্রবণতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ভাষায় লেখকের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আবেগপ্রবণতা হেতু কাব্যগন্ধী হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা আবেগপ্রবণ রচনার পক্ষপাতী, বইখানি তাঁহাদের ভালই লাগিবে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন—শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী, এম-এ, বি-এল, অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট। চতুর্থ সংস্করণ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১২০+৬২২+১৬, মূল্য ৩৲।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় আইনসভা কর্ত্তৃক আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণে সেই সব আমূল পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব আইন কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, ইতর ভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই দরকারী, সকলকারই জীবনের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী পাঠকের সম্মুখে উপযুক্ত, সুখপাঠ্য ও যথাযথ আইনের বিধান ও মর্ম্ম প্রকাশক কোন পুস্তক ছিল না। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আর একটি অসুবিধা--ইহার প্রত্যেকটি বিধানের মর্ম্ম-প্রকাশক অনেক নজীর আছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় একটি নজীর আর একটি নজীরের সম্পূর্ণ বিপরীত। নজীর-সম্বলিত বিস্তৃত ব্যাখ্যাযুক্ত "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া বিনয়েন্দ্রবাবু একটি প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছেন। আর একটি অসুবিধা, ১১৯৯ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাস্বত্ব আইনের ইতিহাস জানা না থাকিলে আইনের বর্ত্তমান বিধানগুলি সম্যক্ বুঝা যায় না। বিনয়েন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের বিস্তৃত উপক্রমণিকায় এই অভাব দূর করিয়াছেন। এই পুস্তকে ইংরেজী ভাষায় অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া রেভেনিউ এজেণ্ট ও মোক্তার প্রভৃতি অনেকেই উপকৃত হইবেন।

আইনের ধারাগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপা। ব্যাখ্যাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে ছাপা। পাঠকালে ইহাতে বড় সুবিধা। উদ্ধৃত নজীরগুলি আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, ইহাতে ভুল নাই।

বিনয়েন্দ্রবাবু যদি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী ছাপিতেন, একসঙ্গে একই পুস্তকে থাকার দরুন পাঠকের সুবিধা হইত। দুই-একটি স্থলে ছাপার বা অনুবাদের ভুল দৃষ্ট হইল। ৬০৫ পৃষ্ঠায় বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাকৃত আইন না হইয়া উহা বঙ্গদেশের আইনসভাকৃত আইন হইবে। ৩১৯, ৩২০, ৩২১ পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে "এক শত এক ধারা" স্থলে এক শত দুই ধারা হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ডি. ভ্যালেরা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। আর্য্য পাব্লিশিং কোং, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বিদেশী সাহিত্যিক ও রাজনীতিজ্ঞের জীবনকথা আলোচনায় গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার 'ডি. ভ্যালেরা' প্রথম পাঠ করি। বইখানি তখন খুবই ভাল লাগিয়াছিল। বর্ত্তমানে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া দেখিলাম এবং তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই ভাল লাগিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কবিতার মূল্য

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের জীবনযাত্রার চারি পাশে এমন অনেক বস্তুর পরিচয় পাই, ব্যবহারিক হিসাবে যার মূল্য স্বল্প, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বাজার-দর অসম্ভব রকম চড়া। যেমন একখানা ভাল ছবি, অথবা হাতে-তৈরি একটু শিল্পকাজ। শরীররক্ষার প্রয়োজনে আমরা এদের আহ্বান করি নে, মন ব'লে এক নিগূঢ় বস্তুর অস্তিত্ব ও রূপ নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের কাছেও এদের প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য্য নয়। কিন্তু তথাপি বাজারে এই শ্রেণীর বস্তুগুলির চাহিদা আছে, এবং চাহিদা আছে ব'লেই শিল্পীর অর্থনৈতিক মূল্য সমাজ মেনে নিয়েছে।

শিল্পীর যে-পরিমাণ মূল্য সমাজ স্বীকার করে, কবিরও সে-পরিমাণ মূল্য দিতে আমরা কৃপণতা করি নে। অর্থাৎ মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোকের বসবার ঘর সাজাবার যে-উপকরণ, তার মধ্যে যেমন কৌচ-কেদারার সঙ্গে মিলিয়ে ছবি চাই, দু-একটা কাশ্মীরী কাঠের অথবা জয়পুরী এনামেলের শিল্পকাজ চাই, তেমনি বুক-কেস্ সাজাবার জন্য বাছাই-করা দেশী বিলাতী কবিতা ও সাহিত্যের বইও চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁদের আলাদা একটা বসবার ঘরের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই, তাঁদের কাছে ছবি ও কবিতা উভয়ই অপরিহার্য্য নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজ ব্যাপক ভাবে কবিতা অথবা ছবির প্রয়োজন মেনে নিচ্ছে না। যেখানে স্বীকার করেছে, সেখানেও এদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট সম্মানজনক নয়। মেলা থেকে উচ্চ মূল্যে পাতাবাহারের গাছ কিনি, কিন্তু সদর-দরজার শোভা বাড়ান ছাড়া তার কাজ নেই, স্থানাভাবে যদি তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, তবে তাকে অপ্রয়োজনীয় ব'লে সৌখীন বন্ধুকে বিতরণ করতে বাধে না। কবিতার মূল্যবিচারকালে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, কবিতা পাতাবাহার গুল্মজাতীয় গাছ নয়, যদিও এই প্রকার মূল্যই আমরা এত দিন কবিতাকে দিয়ে এসেছি।

আদিম কাল হ'তে দেখা গিয়েছে, নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক সমস্তকে সাজাবার নরনারীর একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাগাত্রে যে-সব চিত্র ও কারুকার্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তু সেকালের গুহাবাসী অজ্ঞ মানব-সম্প্রদায়ের সুকুমার অন্তর্লোকের পরিচয় কিছু কিছু প্রকাশ করে। সেকালের সেই শিল্পানুভূতি আজ যখন বাংলার পর্ণকুটীরের অন্দরমহলেও প্রকাশ পাচ্ছে, তখন সেখানে কবিতার প্রবেশাধিকার নেই কেন? এই প্রশ্নের আলোচনার আগে ছবি ও কবিতার বিভিন্ন প্রকৃতিকে ঠিক মত জানা চাই। আঙুলের সামান্য আকুঞ্চন-প্রসারণে অথবা তুলির একটু অলস আন্দোলনে যে রূপ-রঙের আবেষ্টন সৃষ্টি করে, সেও যেমন শোভালঙ্কৃত কল্পনা, কবিতার ভাষায় ও ছন্দে যে সুর বাজে সেও তেমনি ছন্দালঙ্কৃত কল্পনা। রঙে রেখায় শিল্পী আঁকলেন গোধূলির বিচিত্র আলোক, কবিও গুঞ্জন করছেন দিনের শেষ রবিরশ্মির দিকে চেয়ে। যিনি রসবোদ্ধা, তিনি কিন্তু এই গোধূলির জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতিকে প্রণাম জানিয়েই তৃপ্তি পেলেন না, তাঁর অন্তরেব তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি গভীর ভাবে স্পর্শ করতে চাইছে কবি ও শিল্পীর কল্পনার উৎসকে। সেখানে যে ভাবের রসলোক ক্ষণে ক্ষণে আপন মাধুর্য্যে আপনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে, সেই রসের ক্ষেত্রে ছবি ও কবিতা অভিন্ন, এখানে এদের প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রভেদ রয়েছে অন্যত্র, উভয়ের প্রকাশভঙ্গীতে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একখানি অবগুণ্ঠনে শিল্পী যে বিশেষ বস্তুটিকে আবৃত রাখতে চান, কবি অপূর্ব্ব নিপুণতার সঙ্গে তাকেই প্রকাশ করেন। ছবির রসবোধের জন্য সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি

দ্বারা ক্ষুণ্ণ করতে হয়, কবিতার রস স্বতঃপ্রকাশিত। এই কারণে কবিতা সহজবোধ্য এবং সহজবোধ্য ব'লেই অধিকতর সংখ্যায় মানব-মনকে তৃপ্ত করতে পারে।

কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কবিতার বিশেষ পরিচয় ও প্রসার হওয়ার প্রকাশ্য কোন বাধা নেই, সেখানে কবিতা অপরিচিতের মত বাইরের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা ক'রে আছে। বোঝা যাচ্ছে কোথায় একটু অনমুরাগের অদৃশ্য বাষ্প মানব-মনকে কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ক'রে রেখেছে, কিন্তু সে কোথায়? কেনই বা এ বিরুদ্ধতা? কবিতার যে অংশ শুধু ছন্দোবদ্ধ রচনা, সেইটুকুর প্রতি অতি অল্প-শিক্ষিত বাঙালীরও অপ্রীতি নেই। কারও কারও মতে এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কবিতারই সমাদর দেখা গিয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম কল্পনা আশ্রয় ক'রে যে-কবিতা জন্মলাভ করে, তার মূল্য ও মর্য্যাদা নেই। এই মত পরিপূর্ণ ভাবে সত্য নয়; সত্য ব'লে যদি ধ'রেও নিই, তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে জনসাধারণ কবিতার বিষয়-বস্তুর বিচার করে, পড়বার উপযোগী ব'লে মনে করলে মূল্য দেয়, নতুবা দেয় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বাঙালী সমাজ স্থূল রুচির মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, সে যুগের বহু অসদ্‌গুণের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা একটি। এক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পেও ধর্ম্মের প্রকাশ কাম্য হবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই এখন, যখন বাঙালী সমাজের অতি নিম্নস্তরের শ্রেণীও জীবনযাত্রায় কিছু পরিমাণে আধুনিক হয়ে উঠেছে, শিক্ষিতের মধ্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ দেখা দিয়েছে, তখনও কবিতার সার্ব্বজনীন মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ, একালের কবিতাকে সেই সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, যে-সম্মান বিগত সামাজিক ধর্ম্মান্ধতার দিনের কবিতাকে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা আগেই বলেছি, কবিতার একটা অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য সমাজ ধার্য্য ক'রে দিয়েছে, কারণ এ-বস্তু সাধারণের প্রয়োজনের জন্য নয়, বিশেষের প্রয়োজনে। চিন্তায় কল্পনায় ও রুচিবোধে সমাজকে এগিয়ে দেওয়া ভাল কবিতার একটি মহৎ গুণ। কবিতার এ মহত্ত্ব স্বীকার ক'রেও কেন সে সাধারণের প্রয়োজনে আসবে না, সে-সম্বন্ধে আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর ভাবে উদাসীন। এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি এক বিশিষ্ট কবি-সমাজের দাবি চোখে পড়ল। সমাজের কাছে দর্জ্জি অথবা মুচির যে শ্রেণীর অর্থনৈতিক মূল্য, কবিরও মূল্য সেই শ্রেণীর হওয়া চাই। জুতো ও জামার মত কবিতাকে একটি সামাজিক কমোডিটি হিসাবে গ্রাহ্য করলে এবং জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজন ব'লে স্বীকার করলে, তবেই কবিতার যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া হবে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, অথবা রাজনৈতিক বক্তৃতা যদি সে-সম্মান পেতে পারে, তবে কবিতাই বা তা না পাবে কেন? দাবির এই ঈষৎ উগ্রতা ছেড়ে দিলেও কবি পেশাদারকে রাস্তায় ঘাটে দেখা যাচ্ছে না কেন, তা বিচার করতে হ'লে আধুনিক জীবন ও কাব্যের বর্ত্তমান উপাদানকে বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগের প্রশ্ন—জীবনের সঙ্গে কাব্যবোধের সম্পর্ক কি?

প্রশ্নটিকে একটু গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চাই। দার্শনিকেরা জীবনকে নানা ভাবে প্রকাশ ক'রে এসেছেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রে জীবনকে বোঝান যায় না। "A conception of life is only obtained from life itself, in its entirety, of which literature and human thought are but an infinitesimal part."

দার্শনিকের মতে প্রত্যেক জীবিত বস্তুর মানসিক গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন ও নব নব রূপে জীবন প্রকাশ পাচ্ছে। একের সঙ্গে অন্যের এত অমিল এবং এই অমিলের ক্ষেত্রে জীবন-পরিধি এত দূরবিস্তৃত যে, কোন সাহিত্যিক পরিপূর্ণ ভাবে তাকে প্রকাশ করতে অথবা অনুভব করতেও পারেন না। কিন্তু এই বিভিন্নমুখী প্রকাশভঙ্গীর মূলে একটি নিগূঢ় অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে, যাকে ইংরেজীতে ইমোশন বলি, বাংলায় আবেগ বললে যে জিনিষটির ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। ইমোশন সেই অদৃশ্য বিচিত্র শক্তি, যে-শক্তি আপনার প্রচণ্ডতায় মানব-জীবনকে ভাগ্যদেবীর রথে চড়িয়ে রৌদ্র-ছায়ার অজ্ঞাত অপরিচিত পথে পরিচালিত করছে। কিন্তু সংসারের সমস্ত সৃষ্টিকে প্রেরণা দিচ্ছে যে-ইমোশন তারও জনক আছে, সেই জনক ইমাজিনেশন বা কল্পনা। বস্তুতঃ জীবনের পটভূমিকার অন্তরালে কল্পনা অহর্নিশি

কাজ করছে ব'লে জীবনের কোন অবস্থাকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না। এখানে মানব-প্রকৃতি নিজেকে নিজে সৃজন করছে এবং স্থূলতার আবরণে আংশিক ভাবে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। এইখানে আমরা জীবন ও কাব্যের সম্বন্ধসূত্রটিকে নিরূপণ করতে পারছি, এবং এইখানেই কাব্য ও জীবনের মূল সংযোগ। কল্পনা জীবনের উৎস, কাব্যেরও। তবুও জীবন ও কাব্য এক বস্তু নয়, উভয়ের মধ্যে প্রচুর সমতা থাকা সত্ত্বেও। কল্পনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন প্রসারিত হয়, উদারতর হয়, কাব্য সেই প্রসারিত কল্পনা, যা আপনার চিন্তা ও সুরের শোভায় মুগ্ধ ক'রে আদিম জীবনকে মহত্তর পরিণতির দিকে আহ্বান করছে। কাব্যের এখানে শিক্ষকের কাজ, জীবনে নূতন অনুভূতি ও নবীন প্রেরণা সঞ্চার করা। সুতরাং জীবনের পক্ষে কাব্যকে স্বীকার করতে হবে, কাব্যবোধও সেই কারণে জীবনের সঙ্গে সহজাত।

কাব্য যুগপ্রবর্ত্তক। আধুনিক জীবনযাত্রা যে বহু যুগের সযত্নলালিত স্থূলতা বর্জ্জন করছে, তার জন্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সামাজিক পরিস্থিতির সহিত ইউরোপীয় কাব্যও যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণা দিয়েছে, একথা বললে বাড়িয়ে বলার অপরাধ হবে না। বস্তুতঃ কবিতার কাজই এই, যাকে প্রকাশ করছে, সৌন্দর্য্যে ও সূক্ষ্মতায় মহিমা-মণ্ডিত ক'রে প্রকাশ করছে, এবং একে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার স্বাভাবিক আগ্রহে জীবনের রসলিপ্সা গভীরতর দৃষ্টি লাভ করছে। এই দৃষ্টিলাভ কিন্তু জীবনকে শান্তি দিতে পারে নি, বরং তার লোলুপতা বাড়িয়ে চিত্তের ভারকেন্দ্র চঞ্চল ক'রে তুলেছে। এক কালে জীবনকে যে একটি একক দৃষ্টিতে সমগ্র ভাবে দেখা হ'ত, তার চরম লক্ষ্য ছিল পরিণতির দিকে, এবং প্রতিদিনের পায়ে-চলা এই যে বিপুল বিচিত্র জীবনযাত্রা, তা উপলক্ষ মাত্র ব'লে হেয় ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে ছিল, যেন এক শীর্ণ বিধবা নিরন্তর আপনাকে অস্বীকার ক'রে বেঁচে রয়েছে; এবং বেঁচে রয়েছে এক অজ্ঞাত স্বর্গলাভ-কামনায়। কিন্তু আধুনিক জীবন প্রাণ-স্পন্দনে চঞ্চল, এবং পরিপূর্ণ অনুভূতিবোধসম্পন্ন। আজকের জীবনকে আমরা সত্য ও বাস্তব ব'লে গ্রহণ করেছি, এবং কোন কিছুর মোহে এর মর্য্যাদা লাঘব করতে চাই নে। তাই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ক্ষুদ্রতম অনুভূতিকেও আমরা নিষ্কৃতি দিই নে, পরন্তু এদের প্রকৃতি প্রকৃষ্টভাবে জানতে চাই। আধুনিক জীবনের এক দিকে আছে এই প্রবল অনুসন্ধিৎসা, এবং এর পরিবেষ্টনে যে-জীবন গঠিত হচ্ছে, তার চিত্ত প্রকৃত কাব্যরসবোধসম্পন্ন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যা সত্য, সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তা সত্য নয়। বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে একটি প্রবল, বাস্তব, সজীব বিশেষ্য পদ যার অমানুষিক ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কার্য্যতঃ মরীচিকার মত অন্তর্হিত হচ্ছে। আমি সার্ব্ব-জনীন ক্ষুধার কথা বলছি। এই থেকেই শ্রেণী-সংগ্রাম এবং শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে সামাজিক বিপ্লব। আধুনিক সমাজে বিপ্লবী মনোভাবের এত প্রভাব বেড়েছে যে অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রাণী (political animal) ব'লে মানুষের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ আধুনিক মানুষের ভাগ্য স্বহস্তরচিত নয়, অদৃশ্য বিধাতা-পুরুষের হাতের লিখনও নয়, একেবারে নিকটতম কালের প্রত্যক্ষ অর্থনীতির বিশাল পাখার আতপ্ত আবরণে সজীব। এই সামাজিক বিপুল শক্তির প্রেরণায় মানুষ ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ শ্রেণীভাবে পর্য্যবসিত হচ্ছে। বস্তুতঃ মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে, আধুনিক জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্র ব'লে মনে হয়; এবং সে যুদ্ধ অজ্ঞাত-পরিণাম। একই সঙ্গে দুই বিভিন্ন ভাবের অন্তর্বিরোধ আধুনিক মানুষকে অন্ততঃ রুচির দিক্ দিয়ে প্রবল ভাবে পীড়ন করছে, সুন্দরকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না, তার সংজ্ঞা বিচার করার প্রয়োজন ঘটেছে। আজ যে কবি-সমাজে কাব্যের উৎপত্তি বিশুদ্ধ কল্পনা অথবা শ্রেণীবোধ এই নিয়ে বিচার-সভা বসেছে তার কারণও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব।

কিন্তু এই ভয়াবহ বিরোধের মধ্যে যদি কোন সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা দিয়ে থাকে, তো তাকে প্রকাশ করেছে কাব্য এবং সে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাস্তব' নামে অভূতপূর্ব্ব এক বস্তুকে খাড়া ক'রে। পাশ্চাত্য মহাদেশ-

সমূহের কবিরা, তাঁহাদের এই সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কারে সাম্রাজ্য জয় করার আনন্দ পেয়েছেন এবং বলেছেন এই নবাবিষ্কৃত পথে জীবন এবং কাব্য পরস্পরের প্রাণের যোগ খুঁজে পাবে। অথচ বাস্তব বলতে যা বুঝি তা বোঝান সহজ নয়। বাস্তববাদীরা বোধ করি মোটামুটিভাবে এই কথা প্রকাশ করতে চান,—এত দিন কাব্যে জীবনের যে-সব সমস্যার উদ্ঘাটন দেখেছি, সে-সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, সেগুলো একান্তই জোর ক'রে ঘাড়ে চাপানো সমস্যা, অনুভূতির বাইরের দিক্‌টা নিয়েই তাদের কারবার। সুতরাং প্রচ্ছদপট দেখে বই বিচার করলে যে ভুল হয়, এবং মুখোসকে মুখ ব'লে সমালোচনা করলে যে ভুল হয়, কবিরা এত দিন সেই ভুল ক'রে এসেছেন। বস্তুতঃ সুন্দরকে প্রকাশ করব, এই ছিল তাঁদের চরম উদ্দেশ্য, বস্তুর সম্ভাব্যতা বিচার ক'রে কল্পনাকে পক্ষহীন করার মনোবৃত্তি তাঁদের ছিল না। আজকালের বাস্তবী কবি বলেন সুন্দরকে প্রকাশ করব, কিন্তু সত্যের বিচারশালায় যাচাই ক'রে। অর্থাৎ তফাৎ এই যে, এক কালের কবিরা বলতেন, কাব্যের ট্রুথ্ রূপের ট্রুথ্—তথ্যের নয়, আধুনিক কবি তথ্যের ট্রুথ্‌কেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এই জন্য পারেন না যে, পারিপার্শ্বিকতা বাদ দিয়ে আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব নেই, এবং এই পারিপার্শ্বিকতায় কুয়াশার রহস্য নেই, মরীচিকার ভ্রান্তি নেই, আঁধারের অনিশ্চয়তা নেই। তা পরিপূর্ণভাবে সজাগ, উগ্রপ্রকৃতি, অসহিষ্ণু। এই একান্তভাবে স্থুল, মলিন, সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের বাইরে এনে আধুনিক জীবনকে চেনাই যায় না, আবেষ্টনকে বাদ দিয়ে জীবনের মর্য্যাদা নেই।

সুতরাং বাস্তবী কবিকে জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হয়, বাইরের বিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে জীবন-সমস্যা যত জটিল হয়ে ওঠে কবির কাজ তত দুরূহ হয়। এক দিন রসের ক্ষেত্রে কাব্যের আহ্বান ছিল, সুতরাং সমাদরও ছিল, আজ সেইখানে কলের কলরব। কাব্যকে আবাহন ক'রে গ্রহণ করত যে মানুষ, পরিচয়ের দিক দিয়ে সে আর মানুষ নেই, সংখ্যা হয়ে পড়েছে। সংখ্যার অন্তর্নিহিত যে মুমূর্ষু মানুষটি আজও দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে, তারই মানসিক সংস্কৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখার কঠিন কাজে আধুনিক কবিতা পণবদ্ধ। কবিতাকে কিছু পরিমাণেও 'সামাজিক কমোডিটি' ক'রে তুলতে হ'লে এই পণ কবিকে রক্ষা করতে হবে। তাঁকে এমন কিছু দিতে হবে, যার ভাবে আধুনিক মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, যেমন হ'ত গত যুগের মানুষ ধর্ম্মাশ্রয়ী কাব্য পড়ে। এক কথায় কবিকে আধুনিক রামায়ণ রচনা করতে হবে এবং এইখানেই গোলযোগ ঘটেছে। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতা সম্বন্ধে Aldous Huxley লিখেছেন,

"There is nothing intrinsically novel or surprising in the introduction into poetry of machinery and industrialism, of labour-unrest and modern psychology: these things belong to us, they affect us daily as enjoying* and suffering beings; they are a part of our lives; just as the kings, the warriors, the horses and chariots, the picturesque mythology were part of human life. The subject matter of the new poetry remains the same as that of the old. The old boundaries have not been extended."

মোটামুটি তাঁর বক্তব্য এই যে, কবিতায় প্রচুর আধুনিক উপাদান প্রবর্ত্তিত করেও, তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নি। দৃষ্টিভঙ্গি গত যুগের কবির যা ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে, কিছু মাত্র উন্নতি লাভ করে নি। বোঝা যাচ্ছে, ইউরোপীয় কবির উপাদানের বিষয়ে আজ বাহ্যবস্তুর উপর ঝোঁক বেশী, অন্তরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে তার ঠিক সমন্বয় ঘটাতে পারছেন না। হাক্সলির বক্তব্য আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় F. R. Leavis-এর 'আধুনিক কবিতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন,

"For the most part it is not so much bad as dead—it was never alive. The words that lie there arranged on the page have no roots. The writer himself can never have been more than superficially interested in them."

অর্থাৎ আধুনিক কবিতায় প্রাণবস্তুর একান্ত অভাব। কবি যা বলতে চান তার সঙ্গে তাঁর মর্ম্মের যোগ নেই। এমনতর প্রাণহীন রচনা কারও কোন কাজে লাগে না। বাংলা দেশের কবিকুল সম্বন্ধেও সমালোচক-মহলের এমন মত-প্রকাশ প্রচলিত হয়ে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ কবিতার অধুনিকতাকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি, এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।" রবীন্দ্রনাথকে 'সেকেলে' ব'লে অপাংক্তেয় করলেও সপক্ষের শক্তি কিছু বাড়ে না। কারণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন,

"আধুনিক জীবনের সঙ্গে আধুনিক কবিতার বনিবনা ঘটছে না। জীবনের ক্রমেই প্রত্যয় হচ্ছে যে কবিতার কিছুই বলবার নেই, শুধুমাত্র বলাটাই তার বলবার। এত বড় জলজ্যান্ত জীবনটা সামনে পড়ে রয়েছে, তবু তার বিষয়ের অভাব! আমার মনে হয় বাণীকে বাহন না ক'রে উপাস্য করাতেই এই দুর্গতি।"

এই সকল সমালোচনার সত্যতা যদি আংশিক ভাবেও মেনে নেওয়া যায়, তবে স্বীকার করতে হবে আধুনিক কাব্যলোকে কবিদের পথভ্রান্তি ঘটেছে, এবং ঘটেছে দুই কারণে। প্রথম কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্‌গদ্ আবিলতা নামে ভাষায়, স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্ব্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।"

অর্থাৎ বাক্যের অরণ্যে বক্তব্যকে হারিয়েছি, কিন্তু স্বীকার করছি নে। এক্ষেত্রে সকল দুর্ব্বলের যা বল, কবিরাও বাক্যে সেই বল প্রয়োগ করছেন। অহঙ্কার ক'রে নিজেদের মস্তিষ্কের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করছেন। দ্বিতীয় কারণ, এবং আমাদের মতে এইটাই প্রধান কারণ—আধুনিক ব্যক্তি ও সমাজের নিগূঢ় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি, কবির ঠিকমত বোধগম্য হয় নি। পরীক্ষার্থী ছাত্র যে-প্রশ্নটির উত্তর যথাযথ জানেন না, সেই প্রশ্নটির উত্তরেই যেমন অলঙ্কারের অলৌকিকত্ব প্রকাশ করেন, আধুনিক কবিদের অবস্থা সেই রকম। ছন্দের মোহ বিস্তার ক'রে তাঁরা সমাজের নিকট থেকে কিছু নম্বর আদায় করছেন, কিন্তু পুরাপুরি পাচ্ছেন না। এখানে কবি যে শুধু পাঠক-সাধারণের বুভুক্ষু অন্তরকে ফাঁকি দিচ্ছেন তা নয় আপনাদের অজ্ঞাতে নিজেকেও প্রতারিত করছেন। রস-পরিবেশনে তাঁরা যে পথ ধরেছেন, সমাজ সমগ্র ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারছে না, সে রসে তার রুচির বাধা, ইচ্ছারও। যেখানে জলেরই একান্ত প্রয়োজন সেখানে জলীয় বস্তুমাত্রই স্বীকার্য্য নয়।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আর একটা বড় অভিযোগ এই যে, দিনে দিনে কাব্য নিরাশাবাদী হয়ে উঠছে। সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক জন প্রবীণ বলেছিলেন, সংসার-যুদ্ধে পরাজিত যে মানুষের মৃত্যু-ইচ্ছা জাগে, সাহিত্যের উদার ক্ষেত্র হ'তে সে সাহস ও সান্ত্বনা পায়। যে-সাহিত্য পরাভূত হওয়ার মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, সে-সাহিত্য মৃত অথবা মুমূর্ষু। বিশ্বপৃথিবীর ইতিহাস এই মহাশিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে, যুগে-যুগে যেখানে মানুষ নিপীড়িত হয়েছে, শক্তির মত্ততা যেখানে সমাজকে রক্তাক্ত করেছে, সেই সবের মাঝখানে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই শৃঙ্খলিত বুভুক্ষু নগ্ন নরনারীর সামনে দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন—এই পুঞ্জীভূত বেদনার সমুদ্র পার হয়ে তোমাদের আসতে হবে, ভয় ক'রো না কোনও আঘাতকে, ভয় ক'রো না মৃত্যুকে। অনন্ত কালের ভস্মাচ্ছাদিত যে-অগ্নিশিখাটি আজও তোমার আত্মার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রভায় প্রদীপ্ত, তার আবরণ উন্মোচন কর, সেই প্রাণাগ্নি-শিখা সকল দেশ-কাল উত্তীর্ণ ক'রে তোমাকে নবজীবনের দ্বারে পৌঁছে দেবে, বন্ধু, এগিয়ে চল! রাজ্য-সাম্রাজ্যের কত উত্থান-পতন অতিক্রম ক'রে তাই আজও পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে যখন ইতিহাসের নৃশংসতম অধ্যায় রচিত হচ্ছে, তখন কবি কোথায়? গত মহাযুদ্ধের পর হ'তে আজ পর্য্যন্ত কাব্য অকেজো রকমের বিলাসী হয়ে উঠেছে, তাই সভ্যতার আধুনিকতম অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে তার সময় লাগছে। আগেই স্বীকার করেছি আধুনিক কবির কর্ত্তব্য বিগত যুগের যে-কোন কবির কাজ অপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু সমস্যার সমাধান তো কবির কাজ নয়। অস্ত্রধারণ করাবেন সেনাপতি, যুদ্ধ পরিচালনা করাও তাঁর কাজ। কবির কাজ সকল হতাশা ও অগৌরব হ'তে মানব-মনকে ত্রাণ করা, যার ফলে সর্ব্বেন্দ্রিয় সক্ষম ও সক্রিয় হ'তে পারে। বস্তুতঃ এ-ক্ষেত্রে সাহিত্যের শক্তি অদ্বিতীয়। মানুষের রস

(sentiment)-বোধকে আঘাত দিয়ে যে-ফল পাওয়া যায়, বুদ্ধির দ্বারে হাত পাতলে সে-ফল পাওয়া যায় না।

কারও কারও মতে আধুনিক সাহিত্য বুর্জ্জোয়া মনোভাবাপন্ন ব'লেই নিরাশাবাদী হয়েছে, এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের মতে সাহিত্যকে প্রাণময় ও প্রয়োজনীয় করতে হ'লে প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যকে প্রোলিটারিয়ান বলা যেতে পারে, এবং তার বিশেষ মূল্য কি, তা বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়, কিন্তু শোষক শ্রেণীর পরিবর্ত্তে শোষিত শ্রেণীর ধমনীর গতি মধ্যযুগের আদর্শে নির্ণয় করতে পারলেই এক কালে সকল সমস্যার সমাধান হবে, এর যুক্তি মেনে নেওয়া দুরূহ। যে-সাহিত্যের মূল স্বর সর্ব্বকালের শিক্ষিত নরনারীকে আবিষ্ট করতে না পারে, সে সাহিত্য উচ্চবংশজাত নয়, তার মূল্যও স্বল্প। সমাজে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষে মানুষে ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যের রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাসাদ ও পর্ণকুটীরে প্রভেদ সামান্যই। সাহিত্য মানুষের সম্মান করে, ধনিকেরও না, শ্রমিকেরও না। বিশেষতঃ যে সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্ব্বে করেছি, তাতে অর্থনৈতিক সকল শ্রেণী সমভাবে সংশ্লিষ্ট। যে-সাহিত্য এই সকল শ্রেণীকে তৃপ্তি দিতে পারে, সেই সাহিত্যই প্রকৃত মূল্যবান্। কাব্যের ক্ষেত্রেও এই উক্তি খাটে; কৃষক অথবা কুলীকে নায়ক এবং কারখানা ও ধর্ম্মঘটকে বিষয়বস্তু করলেই আধুনিক সকল শ্রেণীর পাঠক-সম্প্রদায় খুশী হন না, তার প্রমাণ ইউরোপে পাওয়া গেছে। হাক্সলিও এই কথা বলেছেন। মূল কথা, বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, নায়ক-নায়িকা যে শ্রেণীর হোক না কেন, তাদের সম্বন্ধে গতানুগতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ছাড়তে হবে। কবিকে আধুনিক সামাজিক আবেষ্টন এবং আধুনিক সকল শ্রেণীর মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। কবির ছন্দে আধুনিকতার ঠিক সুরটি যে-দিন বেজে উঠবে, সে-দিন কবিতার মূল্য নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন হবে না। আর নৈরাশ্যবাদ! উগ্র শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর ধ্বংস যদি অনিবার্য্য হয়, তো তাকে ঘটতে দাও। কিন্তু সেই মৃত্যুর প্রবলতার সম্মুখে সমগ্র জগৎকে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াতে হবে। এ মৃত্যু নিরাশার দ্যোতক নয়, পরন্তু নবতম জীবনের সূচনা। বিপ্লবের এই মূল তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে, আধুনিক কবি হতাশার সকরুণ দুর্ব্বলতা হ'তে আপনাকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাবটি এইবার সর্ব্বশেষে করি। কবিতাকে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় ক'রে বাজারে সাধারণ মূল্যে বিক্রয় করতে হ'লে, এর প্রসার সার্ব্বজনীন করা দরকার। এর একমাত্র উপায় ব্যাপক ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা। কিন্তু সে কাজ বর্ত্তমানে করবেন কে? সম্রাট্, জননেতা, অথবা কবি স্বয়ং!

মহারাজ রণজিৎ সিংহ শতবার্ষিকী

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতের বহু স্থানে তাঁহার মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথবা হইবে।

দুই জন নেপোলিয়ন একই সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। দুই জন রণজিৎ সিংহও নহে। ভারতে তখন মাত্র এক জন রণজিৎ সিংহই ছিলেন, যেমন তাঁহার কিছু কাল পূর্ব্বে ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী।

শিবাজীর সহিত রণজিৎ সিংহের অনেক মিল রহিয়াছে। উভয়েই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাহুবলে রাজা হইয়াছিলেন, রাজবংশের সন্তান হইয়া স্বাভাবিক উপায়ে নহে। অল্প বয়সে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে যে-রাজ্য তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লোপ পায়, তাঁহাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য লোক কেহ ছিল না,—মহারাষ্ট্রেও নহে, পঞ্চনদেও নহে।

দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য কেহই খ্যাত ছিলেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে বাল্যকাল হইতেই পাঠাভ্যাস অপেক্ষা অসিচালনার দিকেই তাঁহাদের আগ্রহ ছিল বেশী, ফলে উভয়েই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু প্রতিভা আক্ষরিক বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না। নিরক্ষরতা দু-জনের কাহারও রাজ্যজয়ের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণা নদীর তীরে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী এক অসীম উচ্চাশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতে এক হিন্দুরাজ্য গঠনের আশা তাঁহার সফল হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বহস্তে গড়া মারাঠা-রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্জাবে শতদ্রুতীরে আর

মহারাজ রণজিৎ সিংহ

এক জনের মনে আর একটি বিপুল আশা জাগিয়াছিল। সমগ্র ভারতজয়ের বাসনা তাঁহার ছিল না, তিনি চাহিয়াছিলেন সমস্ত ক্ষুদ্র শিখরাজ্য একত্র করিয়া এক বিরাট্ শিখরাষ্ট্রের স্থাপনা করিতে। তিনিও সফল হন নাই, যদিও তাঁহার বিফলতার বেদনা তাঁহাকে জীবিতকালেই অনুভব করিতে হইয়াছিল। তাঁহারও মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই স্বাধীন শিখরাজ্য লোপ পাইল, ভারতের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি শিখগণ ইংরেজের অধীন হইল।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়সে রণজিৎ সুকেরচাকিয়ার সর্দ্দাররূপে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের যে-বীজ বপন করিয়াছিলেন, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর-প্রবেশের সঙ্গে সেই ব্রতের প্রথম উদ্‌যাপন। বর্ত্তমান কাল হইতে এক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা সগৌরবে চতুর্দ্দিকে ইংরেজবেষ্টিত

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অন্যতমা পত্নী মহারাণী ঝিন্দন

উত্তর-ভারতের স্বাধীন রাজ্য ছিল, রণজিতের মৃত্যুর এক দশকের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। পঞ্জাবকেশরীর রাজত্বকালের চল্লিশ বৎসর ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়মাত্র হইয়া রহিল, যেমন হইয়াছে শিবাজীর মারাঠা-সাম্রাজ্য। দূর অতীতের উজ্জ্বল আলোকের ছায়া ছাড়া আর কিছু বাকী রহিল না।

তবু ইতিহাসে এই দুই জনের, এবং ইহাদেরই মত আরও কয়েক জনের, স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলা চলে না। জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সে-যুগে ছিল অস্পষ্ট; শিবাজী সমগ্রভারতে একরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সমস্ত ভারতবাসীর রাজ্য নহে, শুধু হিন্দুরাজ্য, এবং সম্ভবতঃ মারাঠা-রাজ্য। রণজিৎ সিংহ ছিলেন অধিকতর বাস্তববাদী, তিনি ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র শিখ জাতিকে একত্র করিয়া একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে। নেপোলিয়নের মত গগনচুম্বী আশা তাঁহার ছিল না, আটিলা অথবা গেস্‌লারের মত রাজ্যজনপদ মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিগ্বিজয়ী সাজিবার দুরাকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল না। জাতীয়তা বলিতে যে-জিনিষ আমরা বুঝি, তাহারই প্রথম ক্ষীণ আলোক দেখা দিয়াছিল রণজিৎ সিংহের মনে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা বিচার করিলে জগতের শ্রেষ্ঠ বীরগণের সহিত এক তালিকায় হয়ত রণজিতের স্থান হয় না। কিন্তু অল্প আশা, অল্প আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে সফলতার সম্ভাবনা থাকে, রণজিৎ তাহা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু সমস্ত ক্ষুদ্র শিখরাজ্য একত্র করিয়া একটি শিখরাজ্য গঠনে সকল শিখের সহানুভূতি ছিল না। এক ধর্ম্মবিশ্বাস তাহাদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বহিঃশত্রুর উপর নির্ভরতা, যাহা ভারতের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে, তাহা দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। রণজিতের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই পাতিয়ালা, নাভা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এবং সুকেরচাকিয়ার এক নগণ্য সর্দ্দারের নিকট মাথা নোয়াইতে ইহাদের কাহারও আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া অদম্য স্বাধীনতার তৃষ্ণা যে রণজিতের সঙ্গে যোগদানে ইহাদের বাধা দিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা তাঁহাদের ইংরেজের আশ্রয় ভিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না। শতদ্রুর দক্ষিণ পারে এই সব ক্ষুদ্র শিখরাজ্যের পরেই তাঁহাদের সীমারেখা আরম্ভ। রণজিৎ সিংহ যখন আফগানদিগকে পরাজিত

করেন, সেটা মোটের উপর ইহাদের পক্ষে ভালই হইয়াছিল, কারণ আফগান ও কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের অন্তরায় হইয়া রহিল শতদ্রুর উত্তরপারবর্ত্তী রণজিতের রাজ্য।

কিন্তু ঠিক রণজিৎ সিংহের রাজত্ব ও কোম্পানীর রাজত্বের সীমারেখার মিলন সংগঠন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। আফগান ও কোম্পানীর মধ্যে যেমন রণজিৎ, তেমনি রণজিৎ ও তাঁহাদের মধ্যে শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পারের এই অকিঞ্চিৎকর রাজ্যগুলিকে জীয়াইয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ইহাদের রণজিতের কুক্ষিগত হইতে দিতে কোম্পানীর আপত্তি ছিল।

ভারতে তখন ইংরেজের প্রধানতম শত্রু ফরাসী জাতি। মেটকাফ রণজিতের সহিত সন্ধি কামনা করিলেন, পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহে সহায়তার সর্ত্ত। বিনিময়ে রণজিৎ শতদ্রুর দক্ষিণে সমস্ত শিখজাতির উপর একাধিপত্য দাবি করিলেন। কিন্তু এ-দাবি চলিল না। শতদ্রুর উত্তরে রণজিৎ যেখানে যাহা খুশী করুন, শুধু দক্ষিণে দৃষ্টিনিক্ষেপ নিষেধ।

রণজিৎ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বহু চিন্তার পর এই সর্ত্ত মানিয়া লইলেন। পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা করিয়া হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতির কি অবস্থা হইয়াছিল, সে-বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। সহসা তেজ দেখাইয়া বহু যত্নে গঠিত শিখ-সাম্রাজ্যের পতন দেখিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। রণজিৎ সিংহের জীবনের এই অধ্যায়টুকু (এবং ইহাই তাঁহার রাজ্যজয়ের পর-জীবনের প্রধানতম অধ্যায়) তাঁহার সমর্থক ও সমালোচকদিগের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে।

একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ইংরেজের এই সর্ত্ত মানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্মানজনক হয় নাই। ১৮০৯ সালের সন্ধি তিনি সন্তুষ্ট মনে মানিয়া লন নাই। তাঁহার কল্পনা অপেক্ষা দূরদর্শিতা ছিল অধিক,

মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবার (প্রাচীন চিত্র)

তাই ১৮২৭ সালে যখন ফিরোজপুরের উপর তাঁহার দাবি ইংরেজ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল, তখনও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই। এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ত্রিশক্তি-সন্ধির অংশীদার হইতে সম্মত হইয়াছিলেন।

তাঁহার মনে যাহাই থাক, কাগজে কলমে ইংরেজের বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন তাঁহার উপায়

ছিল না। পরিবর্ত্তে তিনি কি-ই বা করিতে পারিতেন ?

এক উপায় ছিল, কোম্পানীর গ্রাসের বাহিরে যে-কয়টি রাজ্য তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করা। কিন্তু কোম্পানীর অধিকার তখন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এ উদ্যম যে সফল হইত না তাহা জোর করিয়া বলা চলে। আর এক উপায় ছিল, কাহারও সহায়তার উপর নির্ভর না করিয়া একাকী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, ফল যাহাই হউক না কেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড

কিন্তু ফল যাহা হইত, তাহা জোর করিয়া বলা যায়। রণজিৎ সিংহের রাজ্য স্থাপনের আশা অচিরেই লোপ পাইত, এবং সমগ্র পঞ্জাব অবিলম্বে কোম্পানীর অধীনস্থ হইত। ঠিক এই অবস্থাই দাঁড়াইল, রণজিতের মৃত্যুর এক দশক পরে শিখ-সর্দারদের হঠকারিতা ও অবিবেচনার ফলে।

রণজিতের সেনাপতি হরিসিং নালোয়া

ভবিষ্যতের এ অবস্থা রণজিতের অবিদিত ছিল না। অসাধারণ ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এক দিন "সব লাল হো যায়েগা!" কিন্তু তাহা যে তাঁহার মৃত্যুর এত অব্যবহিত পরে, সে কথা বোধ হয় তিনি ধারণা করেন নাই।

যিনি সার্ব্বভৌম শিখরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মনোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমান থাকিলে হয়ত অসঙ্গত হইত, কিন্তু অস্বাভাবিক হইত না। কিন্তু মোগল সম্রাট্ আকবরের ন্যায় তিনি কর্ম্মদক্ষতাকে জাতিধর্ম্মের অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকার্য্যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহু ব্যক্তি উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসকার তাঁহার রাজ্যশাসনের মধ্যে দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্তু সে দোষ হয়ত তাঁহার নহে, তাঁহার কালের। এ কথা বৈদেশিক ইতিহাস-লেখক ও পর্য্যটকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ মোটামুটি সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ছিল,

এবং সম্ভবতঃ পঞ্জাবের বাহিরে কোম্পানীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট ভারত অপেক্ষা বেশী নিরাপদে ছিল।

রণজিতের আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। আকাঙ্ক্ষার এই সীমাবদ্ধতাই তাঁহার জীবনে এক ধরণের সাফল্য আনিয়াছিল, আবার এই সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার খ্যাতিকে সসীম করিয়াছে। শিবাজীর ন্যায় কল্পনার দূরবিসর্পী দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে শতদ্রুর দক্ষিণ পারে চাহিয়া তাঁহার জীবনের পরমতম অপূর্ণ আশার কথা ভাবিয়া তিনি কি ব্যথিত হন নাই? ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা রণজিৎ সমগ্র ভারতকে মানসচক্ষে যখন রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়াছিলেন, তখন কতখানি বেদনা, কতখানি ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে লুকাইয়া ছিল? "সব লাল হো যায়েগা" তাঁহার নিরুদ্বিগ্ন ভবিষ্যদ্বাণী নহে, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের বিলাপ।

তবু মনে হয় অতটা বাস্তববাদী যদি তিনি না হইতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। মেবারের প্রতাপ-সিংহ যখন আকবরের বিরুদ্ধে অবিরাম দেশরক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তখন কি সত্যই জয়লাভের কোন ক্ষীণতম আশাও তাঁহার মনে ছিল? রণজিৎও যদি জয়পরাজয়ের কথা না ভাবিয়া, ইংরাজের শক্তিকে অত বেশী সমীহ না করিয়া শতদ্রুপারবর্ত্তী শিখরাজ্যসমূহ ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বিফল তিনি সম্ভবতঃ হইতেন, কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষের চোখে তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত থাকিত।

এক জন মানুষের শতবার্ষিকী তাহার দোষগুণ বিচারের ক্ষেত্র নহে। রণজিতের ব্যক্তিগত জীবনের দোষত্রুটি আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সেদিন ও বর্ত্তমানের ব্যবধান যতই বাড়িয়া চলে, তুচ্ছ ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনা আর মনে থাকে না, দূর হইতে অতীতের এক উজ্জ্বল আলোকশিখার

রণজিৎ সিংহের অন্যতম মন্ত্রী ফকির নুর-উদ্দীন

দিকে চাহিয়া মনে পড়ে একটি খর্ব্বকায়, একচক্ষু সর্দ্দারের কথা, যিনি এমন এক যুগে জন্মিয়াছিলেন যখন বৈদেশিক শক্তি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন।

[এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি লাহোরের "ট্রিবিউন" পত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কষ্টিপাথর

পালা শেষ

যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে
কে ছিল কাহার খোঁজে
ভালো করে মনে ছিল না তা'।
ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে আসন পাতা
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে।
মালা কেহ গিয়েছে পরায়ে
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে।
মাঝখানে বারে বারে
কত কী যে এলোমেলো
কভু গেলো কভু এলো।
সার্থকতা ছিল যেইখানে
ক্ষণেক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে।
সে যৌবন-মধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি সন্ধ্যার প্রদীপ হ'ল জ্বালা।
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে
হয় নাই দেখা
একেলার ঘরে তারে একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে
পাই তারে না-পাওয়ার রূপে।

(জয়শ্রী) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ

...মাটির দীপ হইতে আকাশের তারা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। নক্ষত্রের পানে চাহিবার অবকাশ আমাদেরও মাঝে মাঝে চাই—আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে সেইরূপ আকাশগঙ্গায় স্নান করিবার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যে মৃৎপ্রদীপের আলোকে এই মাটির উপরেই আমাদের পথ চিনিয়া চলিতে হয়, তাহার শিখা উজ্জ্বল করিবার জন্য কবি আমাদিগকে যে ধনের অধিকারী করিয়াছেন তাহার জন্যই আমরা তাঁহার কাছে অধিকতর ঋণী।... আজ আমরা কবির নিকটে সেই স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও স্বধর্ম্মপ্রীতির দীক্ষা নূতন করিয়া পাইতে চাই—কবির গানের সেই মর্ম্মান্তস্পর্শী সুরে বিদ্ধ হইতে চাই, যাহাতে এই দেশের প্রকৃতি ও এই জাতির আত্মা আমাদের সকলকে সর্ব্বসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে—এক ভাবের ভাবুক করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা তাহা পাইয়াছি; বাংলার জলমাটি ও বাংলার আকাশ-বাতাসকে তিনি ধ্যানস্বপ্নের সুষমায় বিচিত্রিত করিয়াছেন, বাংলার ঋতুগুলিকে তিনি সকল রঙে ও সকল সুরে তাঁহার গানের ইন্দ্রজালে মূর্ত্তি দিয়াছেন। বাংলার নদনদী বাংলার গ্রাম ও তাহার "অবারিত মাঠ গগন-ললাট"কে তিনি যেমন করিয়া আমাদের চর্ম্মচক্ষে ও মানসনেত্রে, শরীরী ও অশরীরী শোভায় প্রকাশিত করিয়াছেন, বাংলা কাব্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তেমনটি আর কোথাও ঘটে নাই। পুরাণ-ইতিহাসের ঐশ্বর্য্য, নাটকীয় কল্পনার চমকপ্রদ কৌশল, অথবা বিশেষ কোন ধর্ম্মনৈতিক আদর্শের সাহায্য না লইয়া তিনিই প্রথম খাঁটি বাংলা দেশ ও খাঁটি বাঙালী হৃদয়ের মর্ম্মস্থানকে, বাঙালী-জীবনের অখ্যাত ও অপরিচিত কোণগুলিকে অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এমন করিয়া আমরা আমাদের দেশকে আগে কখনও দেখি নাই; আমাদেরই দেশের নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা ও শিশুর মুখে যে এত সৌন্দর্য্য আছে, আমাদেরই নিভৃত পল্লীকুটীরে, গৃহ-পরিবারের তুচ্ছ জীবনযাত্রায় যে এত গভীর হৃদয়োৎকণ্ঠা, মনের মোহের এমন মাধুরী লুকায়িত আছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কাব্যমুকুরে আমাদের মুখপ্রতিবিম্ব আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, সে মুখে সুন্দর হাসি ও সুন্দরতর অশ্রুর বিকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেষ্ঠ গানে আমরা বাঙালীসুলভ রসকল্পনার অতি সহজ অথচ গভীর আবেগের পরিচয় পাই। এক কথায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা যেমন বাংলা ভাষার সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য হৃদয়গোচর করিয়াছি, তেমনই তাহার সাহায্যেই বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ঘনিষ্ঠতম পরিচয়, অর্থাৎ আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে আর একটা বস্তুকে খুব বড় করিয়া আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন—জাতীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ। তাঁহার এই জাতীয়তাবোধ ভূগোল বা ইতিহাস সম্পর্কিত নয়, মানুষের সহজ মনুষ্যধর্ম্মের অনুগত। যে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছে, তাহার একটা দেশ ও জাতিগত ধর্ম্ম আছে; আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-উৎসবে, ভাষায় ও ভদ্রতায় সেই জাতিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সে সর্ব্বদা উন্নত রাখিয়া চলিবে, বিজাতির অনুকরণ করিবে না। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে এই নীতি লঙ্ঘন করেন নাই, বরং দেশের ইঙ্গবঙ্গসমাজের লজ্জাহীন আচরণের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাই তাঁহার এই মনোভাবের কারণ—এই গৌরববোধের দিক দিয়া তিনি শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের প্রতিনিধি।...

(শনিবারের চিঠি) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ

…শুধু অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনা নয়, কালিদাসের কাব্যে যে গভীর ও নিবিড় ভারত-প্রীতির পরিচয় পাই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।…সুদূর বংক্ষুনদী বা আমুদরিয়া থেকে তাম্রপর্ণী নদী এবং আসামের অন্তর্গত প্রাগ্জ্যোতিষপুর থেকে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী মলয় পর্বত পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশই কবিচিত্তের প্রীতিরসে অভিষিক্ত হয়ে যে মহিমা অর্জন করেছে আজও তা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে। বস্তুতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের কাব্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত ও উপলব্ধি করার যে ঐকান্তিক প্রয়াস দেখ্তে পাই, আধুনিক ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই।…

কালিদাস তাঁর কাব্যগুলিতে নানা উপলক্ষে তৎকালীন ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই সবগুলি বর্ণনার একত্র মিলনে গুপ্ত-যুগের ভারতবর্ষের যে চমৎকার চিত্রটি ফুটে ওঠে তা সত্যই অপূর্ব। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে কবি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তেরই একটি অতি মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। আবার ঐ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী নরপতিদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু জনপদের উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ কাব্যেরই ত্রয়োদশ সর্গে রাক্ষসপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র যখন পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে আকাশমার্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন, তার বর্ণনা উপলক্ষে কবি সিংহল থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রামচন্দ্রের পথরেখার একটি অপূর্ব চিত্র অংকন করেছেন। আর তাঁর মেঘদূতকাব্যে বিরহী যক্ষের বার্তাবাহী দূতরূপী মেঘের পথ নির্দেশ উপলক্ষে বিন্ধ্য-পর্বত ও নর্মদা-নদীর দক্ষিণস্থিত রামগিরি থেকে হিমালয়ের পরপারস্থিত কৈলাসপর্বত ও মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের যে ছবিটি এঁকেছেন, তা যুগে যুগে ভারতবর্ষের চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরসীমাব্যাপী বিশাল হিমালয় পর্বতের একটি বর্ণনা পাই কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে; আর ভারতবর্ষের দক্ষিণদিক্‌বর্তী মহাসমুদ্রের একটি বর্ণনা পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলিয়ে পাঠ করলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড ছবি যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ ভেসে ওঠে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দেখি রাজা রঘু দিগ্বিজয়-বাসনায় ষড়্বিধ সেনাদল নিয়ে প্রথমেই পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন। সুহ্ম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীরা বেতস লতার ন্যায় নত হয়ে আত্মরক্ষা করল। তৎপরে রঘু গঙ্গা-স্রোতোন্তরবর্তী বঙ্গদেশে (আধুনিক প্রেসিডেন্সী বিভাগ) উপনীত হয়ে নৌযুদ্ধনিপুণ বাঙালীদের পরাজিত ক'রে ঐ দেশে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং বাংলা দেশের কলম ধান্য অর্থাৎ রোয়া ধান যেমন প্রথমে উৎখাত ও পরে প্রতিরোপিত হয়ে প্রচুর শস্য দান করে বঙ্গদেশের রাজাও তেমনি প্রথমে রাজ্যচ্যুত ও পরে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজা রঘুকে প্রচুর উপহার দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলেন। তৎপরে তিনি কপিশা অর্থাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁসাই নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে উৎকল (উত্তর-উড়িষ্যা) দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কলিঙ্গ অর্থাৎ বৈতরণী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশে উপস্থিত হলেন। তাম্বুল, নারিকেল ও মহেন্দ্র-পর্বতের জন্য কলিঙ্গ বিখ্যাত। এই দেশের অধিপতিকে পরাভূত ও স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ধর্ম-বিজয়ী রঘু আরও দক্ষিণে কাবেরী নদী অতিক্রম ক'রে মরীচ, এলা ও চন্দন-সুরভিত মলয়-পর্বতের উপত্যকাস্থিত পাণ্ড্য (দক্ষিণ তামিল) দেশে গিয়ে তাম্রপর্ণী-সাগরসংগমে জাত প্রচুর মুক্তা উপহার গ্রহণ করলেন। তৎপরে তিনি ক্রমে দর্দুর (সম্ভবত নীলগিরি) ও সহ্য (পশ্চিম-ঘাট) পর্বত অতিক্রম ক'রে কেরল (ত্রিবাংকুর ও মালাবার) দেশে প্রবেশ করলেন। তৎপরে অপরান্ত (কোংকন) দেশের চিত্রকূট পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে পারসীকদের দেশে গিয়ে যবনদের অর্থাৎ পারসীকদের অসংখ্য শ্মশ্রুমণ্ডিত শির ভূপতিত করেন। পরে তিনি উদীচ্য দেশ জয়ে অগ্রসর হয়ে বংক্ষু অর্থাৎ আমুদরিয়ার তীরবর্তী কুংকুম-রঞ্জিত বাহ্লীক দেশে উপনীত হলেন। সেখানে হূণদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে রাজা রঘু আধুনিক কাশ্মীরের অন্তর্গত কাম্বোজ দেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবেশ করেন। ক্রমে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম ক'রে ও কিরাত প্রভৃতি পার্বত্য জাতিদের বিধ্বস্ত ক'রে তিনি লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কালাগুরুদ্রুমশোভিত প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তৎপরে ভয়ত্রস্ত কামরূপাধিপতি অসংখ্য রত্নপুষ্পোপহার দ্বারা দিগ্বিজয়ী রঘুর চরণ বন্দনা করেন। এভাবে সুহ্ম বা রাঢ় দেশ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে কামরূপ বা আসামে এসে রঘুর দিগ্বিজয় সমাপ্ত হয়। এই বর্ণনাটিতে শুধু ভারতবর্ষের সীমান্ত-স্থিত নদী-পর্বত-জনপদগুলিরই উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী জনপদসমূহের কোনো উল্লেখ নেই—এটা লক্ষ্য করার বিষয়।…

কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের আর একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাই মেঘদূত কাব্যের পূর্ব খণ্ডে। এটি স্পষ্টতই কালিদাসের নিজের যুগের বর্ণনা এবং এ বর্ণনার অনেকটাই কবির নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত…ব'লেই মেঘদূতের দেশবর্ণনা রঘুবংশের দেশবর্ণনার চেয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করে।

…আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর উপলব্ধির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কালিদাসের কাব্যে 'ভারতবর্ষ' এই নামটি কিংবা তার কোনো প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি কতকগুলি কারণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় পুস্তক। (১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ; (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন ইহাতে রক্ষিত হইয়া আছে—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইহা অন্যতম আদি পুস্তক; (৩) ইউরোপীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চার প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশীর হাতে বাঙ্গালা রচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন; (৪) বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান-ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের ইহা এক আদি গ্রন্থ; (৫) দুই শত বৎসর পূর্বেকার পূর্ববঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ইহা সুন্দর নিদর্শন; এবং (৬) রোমান বর্ণমালায় পোর্তুগীস ভাষার উচ্চারণ ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদের (তথা পোর্তুগীস ভাষার) উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনায় এই বই অমূল্য।

পাদ্রি মনোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ দুই শত বৎসর পূর্বেকার লোক।…পাদ্রি মানোএল্-এর আগমন ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগীস-জাতীয় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রতিষ্ঠার ফলে। …ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতেই পোর্তুগীস ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে পরে, পোর্তুগীস পাদ্রিরা ধর্ম-প্রচারের চেষ্টায় এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালা শিখিয়া পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অনুবাদ করিতে লাগিয়া যান। এই অনুবাদগ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টান-সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যায়—কিন্তু এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।…

দোমিনিক-দে-সুজা Dominic de Souza নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রি ১৫৯৯ সালের পূর্বে দুই একখানি খ্রীষ্টানী বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাহার পরের খবর যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে যে, দোম্ আন্তোনিও Dom Antonio নামে একজন দেশী (বাঙ্গালী) খ্রীষ্টান, হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি বই রচনা করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, কিন্তু জনৈক পোর্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন, ও পরে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা লয়েন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লিখিয়া থাকিবেন।…

পোর্তুগীস রোমান-কাথলিক পাদ্রিদের দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রাণনায় সৃষ্ট সাহিত্য-পরম্পরা-মধ্যে দোম্ আন্তোনিও-র এই বইয়ের পরে আমরা পাই পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্-এর পুস্তকদ্বয়।…

পাদ্রি মানোএল্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই কথা বলিয়া, বইখানির অল্প-স্বল্প আলোচনা করিব। ইহার জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না।…১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন; তখন তিনি (পূর্ব-ভারতের মণ্ডলীভুক্ত) অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন (Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregaçao [da India Oriental]), এবং বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধ নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনোর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচার-কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। (Reitor da Missaõ de S. Nicolao de Tolentino em Bengalla)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪—১৭৫৭ এই দুই তারিখের পূর্বের ও পরের কোনও সংবাদ তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই।…

এই বইয়ে মোটামুটি রোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস-সমূহ এবং অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি (৬১টি) ধর্মমূলক উপাখ্যানও বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।…

ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ঔচিত্য সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওয়া হইয়াছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস করা শিশুজনোচিত সরল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয় না।…

আমাদের কাছে এখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে, এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলিয়া পুরাতন বাঙ্গালার উচ্চারণ-নির্দেশক পুস্তক হিসাবে।…

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা যে বিদেশীর রচিত বাঙ্গালা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চারিটি কারণে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা খুব ভাল হইতে পারে নাই: (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষা দখল করা

তাঁহার হয় নাই ; মনে হয়, তিনি মৌখিক ভাষাই বলিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাষা বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহার অধিকার তেমন ছিল না ; (২) তখনকার দিনে সাধু গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং গদ্য-রচনায় পাদ্রি মানোএল্‌কে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল। গদ্যের ভাল আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাঁহাকে লাতীন ও পোর্তুগীসের (বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোর্তুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ভাষায় বহু স্থলে ফিরিঙ্গিয়ানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্য-রীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী বই লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক রকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল্‌, ঢাকা ভাওয়াল-অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া জানিতেন, সেই জন্য তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণার রাজপুত্র দোম্‌ আন্তোনিও-র ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া, পাদ্রি মানোএল্‌-কে রোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্য বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলীর ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া, পারিভাষিক শব্দের জন্য চল্‌তি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইয়াছিল।...

পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল্‌-এর বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা হওয়া স্বাভাবিক—আরবী-ফারসী শব্দও বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু-ভাষার প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা যায় নাই, সেই জন্য প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা ও অর্ধতৎসম শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

পাদ্রি মানোএল্‌-এর বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার উপাখ্যানগুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, মোটের উপরে বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য বাঙ্গালা তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে স্খলন হইলেও, এবং পোর্তুগীসের প্রভাব দেখা দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহার উপাখ্যানগুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপাখ্যান সরল বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে—অবশ্য তখনকার দিনের শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী কর্তৃক অঙ্কিত

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় স্বাজাতিকেরা কি চান

ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাঁহার সম্মানার্থ গত ২১শে জুন প্রদত্ত এক ভোজের সভায় বক্তৃতার মধ্যে বলেন :—

"I often think that much that is going on in the world today must give them furiously to think in India. The desire of the most fervent Indian nationalist is to secure liberty in India, but on every side in Europe and Asia he sees a conflict between philosophies, often in a very menacing form, and he cannot, I think, have much doubt which of these two philosophies is more favourable to what he understands by liberty, and it may well be that, in the light of these events, the British Empire will appear to the Indian nationalist in a different guise to what he has sometimes seen it in."

তাৎপর্য্য। পৃথিবীতে আজকাল যাহা ঘটিতেছে তাহা ভারতের লোকদের খুবই চিন্তার কারণ হইয়াছে বলিয়া আমার অনেক সময় মনে হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী স্বাজাতিকের ইচ্ছা স্বাধীনতালাভ। কিন্তু তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার সব দিকে রাষ্ট্রনীতির দু-রকম দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে বিরোধ—অনেক সময় খুব ভয়াবহ রকমের বিরোধ—দেখিতে পাইতেছেন। আমার বোধ হয়, স্বাধীনতা বলিতে তিনি যাহা বুঝেন, এই দু-রকম রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কোন্‌টি তাহার অধিকতর অনুকূল, সে-বিষয়ে তাঁহার বেশী সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা হইতে পারে যে, যে-সব ঘটনা আজকাল পৃথিবীতে ঘটিতেছে, তাহার আলোকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাধারণতঃ ভারতীয় স্বাজাতিকদের চোখে যে-রকম দেখায়, তাহাদের চোখে অন্য রকম দেখাইবে।"

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "ভারতবর্ষ যদি অমুক জাতির অধীন হইত" এবং "যদি রাশিয়া ভারত শাসন করিত" এই দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধিকায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের যে ধরণের উক্তির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের উক্তিও সেই-জাতীয়। এ-রকম উক্তি যে নূতন নয়, তাহা আমরা "যদি রাশিয়া ভারত শাসন করিত" নিবন্ধিকার গোড়ায় দেখাইয়াছি।

সাম্রাজ্যাসক্ত ও সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজদের বক্তব্যটা কার্য্যতঃ দাঁড়ায় এইরূপ :—"আমরা তোমাদের খুব ভাল মনিব। অমুক অমুক যদি তোমাদের মনিব হ'ত, তা হ'লে তোমরা বুঝতে পারতে আমরা কত ভাল।"

উত্তরে আমরা বলি, "আমরা সারা জগৎ ভাল মনিব মন্দ মনিব খুঁজে বেড়াচ্ছি না। আমরা চাই স্বাধীনতা।"

ইংরেজরা যে রাষ্ট্রনীতি অনুসারে নিজেদের দেশে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও পৌর অধিকার দাবি ও আদায় করিয়া আসিতেছেন, নিজেদের প্রশংসা করিবার বেলা সেই রাষ্ট্রনীতিরই মূল সূত্রগুলি আওড়ান বটে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই রাষ্ট্রনীতি অনুসারে কাজ হয় না। নূতন যে ভারতশাসন আইন ১৯৩৫ সালে প্রণীত হইয়াছে ও যাহা অনুসারে এখন প্রদেশগুলি শাসিত হইতেছে, তাহাতে প্রাদেশিক কতকগুলি বিষয়ে লোকদেখান কিছু অধিকার দেশের লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে বটে (যদিও সকল শ্রেণী ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে সমভাবে দেওয়া হয় নাই); কিন্তু সমগ্রভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন, রাজস্বের শতকরা ৮০ অংশ ভারতীয়দের মতামতনিরপেক্ষ ভাবে নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছা অনুসারে খরচ করিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, ইংরেজ কারখানাওয়ালা ও বণিক্‌দের ভারতবর্ষ হইতে ধন আহরণের অবাধ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন (যদিও তাহা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্তরায় এবং যদিও ব্রিটিশ বাণিজ্য ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ), ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশী রাজ্যের রাজাদিগকে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে প্রবল বাধার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা ভারতীয় বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ একজাতিত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক নানা লোক-সমষ্টির মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা

করিয়াছেন। সকল প্রদেশকে ঠিক্ এক রকমের আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই। কি প্রাদেশিক ব্যবস্থায়, কি সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থায়, হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে। নাৎসীরা জার্মেনী হইতে ইহুদি-দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে বাঙালী হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া ঠিক অসম্ভব না হইলেও কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়া সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইনের ব্যবস্থার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ফলে বঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কমিয়াছে, সমষ্টিগত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে, যাহাতে কাহারও কোন অসুবিধা হয় না ও যাহাতে দুর্নীতি নাই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এরূপ অনুষ্ঠানও হিন্দুরা বহু স্থানে করিতে পারিতেছে না, রাজস্বের অধিক ভাগ এবং ছাত্রবেতনের অধিক অংশ হিন্দুসমাজ হইতে আসিলেও হিন্দুদের শিক্ষায় নানাবিধ অসুবিধা জন্মান হইয়া আসিতেছে, এবং নানা আইন ও নিয়ম দ্বারা হিন্দুদের অর্থাগমের পথ বন্ধ বা সংকীর্ণ করা হইতেছে। ব্রিটিশ জাতি স্বদেশে ও আপনাদের অধিকারের বেলায় গণতান্ত্রিক বলিয়াই তাহাদের ভারতশাসন-ব্যবস্থাকেও স্বর্গীয় মনে করা যায় না। বস্তুবিচ্ছিন্ন বা বিমূর্ত্ত (abstract) বিচারে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি জার্ম্যান, ইটালিয়ান বা জাপানী জবরদস্ত রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতীত হইতে পারে। হইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে জার্ম্যান, ইটালিয়ান বা জাপানী প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে তাহার বাহ্য ফলের চেহারাটা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ব্রিটিশ শাসনের বাহ্য চেহারা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ বা চক্ষুপীড়াদায়ক হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসনের সহিত ঐসব কাল্পনিক বা আনুমানিক শাসনের তুলনা করিতে হইলে ব্রিটিশ-শাসনের আগেকার সব ঘটনাও স্মরণ করিতে হইবে।

—

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নানা হিসাব-বিভাগ

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অসামরিক ও সামরিক অনেক রাজস্বঘটিত ও হিসাবঘটিত বিভাগ আছে। তাহাদের চাকরীগুলিকে মোটামুটি সাধারণভাবে ফিন্যান্স সার্ভিস্ বলা হয়। প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দ্বারা এই সব চাকরীতে লোক নিযুক্ত করা হয়। ইঁহারা শেষ পর্য্যন্ত একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনার‍্যাল প্রভৃতি উচ্চ পদ পাইতে পারেন।

১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে যে পরীক্ষা হয়, তদনুসারে ১১টি পদে প্রতিযোগিতার ফল অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, ৩টিতে মুসলমান নিযুক্ত হইবে, এবং ১টিতে অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত হইবে, বলা হয়। নিযুক্ত লোকদের তালিকা গত মাসে বাহির হইয়াছে। তাহাতে ১৫ জনের নাম আছে। প্রথম, সপ্তম, অষ্টম ও ত্রয়োদশ নাম বাঙালীর; যথা—অর্দ্ধেন্দু বক্সী, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ও সত্যেন্দ্রমোহন ঘোষ।

ইহা অবশ্য "ছাত্রসংবাদ" নহে, কারণ ইহাতে বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক কিছুই নাই। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এই কারণে যে, ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সমগ্র-ভারতীয় লেখাপড়ার প্রতিযোগিতায় বাঙালী ছাত্রেরা কেবল যে হারে তাহা নহে, জিতে এবং কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে। তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কিছু সুবিধা হয়।

—

দ্বিবিধ শিকারী মনুষ্যজাতি

হিংস্র জীবদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা যাহাদিগকে বধ করে ও ভোজন করে তাহাদের রক্তপাত করে ও ভুক্তাবশেষ কিছু রাখে, যেমন সিংহ বাঘ ইত্যাদি। তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, শিকারী জীব শিকার করিয়াছে।

শিকারী অন্য এরূপ জীবও আছে যাহারা শিকারের কোন চিহ্নই রাখে না; যেমন অজগর। ইহারা শিকারের রক্তমাংসাদি কোন চিহ্ন রাখে না।

পরদেশজয়ী মনুষ্যজাতিও দু-রকমের হইয়া থাকে। অতীত কালে এই রকম সব জাতিই সিংহ ও বাঘের মত ছিল। তাহারা রক্তপাত খুব করিত—কোন কোন বিজেতা নরমুণ্ডের পিরামিড বানাইত। আজকাল বিজেতা জাতিরা সবাই ব্যাঘ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে বলা যায় না—অন্ততঃ বিজয়ের গোড়ার দিকটাতে নয়। কিন্তু একটা জাতির পক্ষে আর একটা জাতিকে পরাজিত

করিয়া তাহার অনেকগুলা মানুষকে বধ করা ক্রমশঃ অন্‌-ফ্যাশনেবল হইয়া আসিতেছে। এখন অজগর বা বোড়া সাপই অনুকরণীয়। বিজিত জাতির সব অর্থাগমের পথ গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে বেমালুম নিশ্চিহ্ন করা, কিংবা তাহাদের অধিকাংশকে ভারবাহী পশুর মত করিয়া অমানুষ করিয়া ফেলা—ইহাই দেশজয়ের নূতন ফ্যাশন। যে-সব শিকারী জাতি অতীতে ব্যাঘ্রবৎ আচরণ করিয়াছে, তাহারা এখন অজগরের মত সাধু সাজিতে চায়, শিকারের কোন রক্ত হাড় বা মাংসের চিহ্ন রাখিতে চায় না।

আগেকার যুদ্ধ ছিল অস্ত্রশস্ত্রের—সেটা এখনও আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বাণিজ্যিক যুদ্ধটাই প্রধান যুদ্ধ। যে-সব জাতি টিকিয়া থাকিতে চায়, বাণিজ্যিক যুদ্ধের জন্যও তাহাদের প্রস্তুত হওয়া ও থাকা আবশ্যক।

এশিয়াটিক সোসাইটি

কলিকাতায় যে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল আছে, তাহা গত শতাব্দীতে স্থাপিত। বিদ্যার সকল বিভাগই ইহার কার্য্যক্ষেত্র। ভারতীয় লোকেরা যত অধিক পরিমাণে ইহার কর্মী ও কর্তৃপক্ষ হন, ততই মঙ্গল। ইহার কাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ও শৈথিল্য হইয়া আসিতেছে এবং ইহার টাকার কিরূপ অপব্যয় হয়, সে সম্বন্ধে কয়েক মাস পূর্ব্বে 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ফলে সংস্কার আরম্ভ হয় এবং তাহাতে ইতিমধ্যেই কিছু সুফলও হইয়াছে।

সম্প্রতি সোসাইটির যে সাধারণ মাসিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার রিপোর্টে দেখিলাম, ইহার সেক্রেটরী মিঃ জোহান ভ্যান মানেন কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। তাঁহার জায়গায় ডক্টর বিরজা-শঙ্কর গুহ সেক্রেটরী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সোসাইটির নৃতত্ত্ব-বিভাগের সেক্রেটরী ছিলেন। শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র চাকলাদার ডক্টর গুহের জায়গায় নৃতত্ত্ব-বিভাগের সেক্রেটরী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নিয়োগে সোসাইটির কাজ উত্তমরূপে চলিবে আশা করা যায়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের অনুল্লেখ

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা-কল্পে রামমোহন রায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অবগত আছেন—অন্ততঃ তাঁহারা এ বিষয়ের ইতিহাস লিখিলে রামমোহন রায়ের এতদ্বিষয়ক কার্য্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, এরূপ কেহ আশা করে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সম্প্রতি বিলাতে সাংবাদিকদিগের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ভারতবর্ষে সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনাদির যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তটি প্রেরণ করেন, অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে হাল নাগাদ বহু তথ্য তাহা হইতে জানা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ উল্লেখ ইহাতে নাই। রামমোহন অগ্রণী হইয়া অপর পাঁচ জন বাঙালীর সহযোগিতায় এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত-লেখিকা শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট তাহাকে ভারতবর্ষের "আরিওপ্যাজিটিকা" বলিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া মহাকবি মিল্টন "আরিওপ্যাজিটিকা" (Ariopagitica) লিখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে আবেদন নিষ্ফল হইবার পর রামমোহন রায় ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আপীল করেন। মিস্ কলেট আপীলটির অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পরে মেটকাফের আমলে যে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অংশতঃ রামমোহনের চেষ্টার পরোক্ষ ফল বলিয়া সেই সময় স্বীকৃত হইয়াছিল।

—

বর্দ্ধমানে খালের জলের কর হ্রাস

বর্দ্ধমানে চাষের জমিতে জলসেচনের নিমিত্ত যে খাল খনিত হইয়াছে, গবর্মেণ্ট প্রথমে তাহার জলের করের হার স্থির করেন ৫॥০ টাকা। প্রজারা বহু আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ও দুঃখভোগ করার পর এখন সরকার তাহা ২॥/০ করিয়াছেন। ইহা মন্দের ভাল।

. কংগ্রেসের সভ্যেরা ইহা যাহাতে ১ টাকা বা ১৷৷৹ টাকা হয়, তাহার নিমিত্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন। মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহরায় মহাশয় এত কম হারকে "প্রিপস্টারাস্" (অসঙ্গত বা হাস্যকর) বলিয়াছেন। আমরা তদপেক্ষাও "অসঙ্গত" আর একটি দাবির কথা এখানে উল্লেখ করিব। তাহা ইতিপূর্ব্বে সিংহরায় মহাশয় দেখিয়াছেন কি না জানি না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ একটি স্মারক গ্রন্থ ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক-সমিতিতে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সত্যচরণ লাহা, এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ইহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে মেঘনাদবাবুর প্রবন্ধটির সহিতই আমাদের এখন সম্পর্ক। পারিভাষিক শব্দবর্জ্জিত ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি উহাতে নদী-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণাগারের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে, তিনি সর্ উইলিয়ম উইলকক্স প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এক সময়ে বর্দ্ধমান ভারতবর্ষের উর্ব্বরতম অঞ্চল ছিল। রেল বিস্তারের ফলে বর্দ্ধমান ডিবিজনের উর্ব্বরতা অর্দ্ধেক হইয়া যায় এবং দশ বৎসরে ম্যালেরিয়ায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। আগে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ জন লোক তথায় বাস করিত; বসতির ঘনতা কমিয়া বর্গমাইল-প্রতি ৫০০ হয়। এইরূপ নানা কথা লিখিয়া ডক্টর সাহা নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:

If there be anything like justice in the world, the people of Burdwan are entitled to compensation from the parties concerned, for all these terrible inflictions on them. It may be given to them, by imposing a terminal or thoroughfare tax on the railway passengers, and utilising the sum so collected to resuscitation of the old prosperity of the country by undertaking new constructive works according to well-laid-out and well-studied plans.

ডক্টর সাহা বলিতেছেন, পৃথিবীতে ন্যায় বিচার বলিয়া কিছু থাকিলে, বর্দ্ধমান ডিবিজনের লোকেরা যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও দুঃখভোগ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের যাত্রীদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া সেই ট্যাক্সের টাকা হইতে পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইতে পারে। তিনি এই কথাগুলি লিখিয়া বলিতেছেন, "কেহ যেন মনে না-করেন আমি পরিহাস করিয়া বলিতেছি বর্দ্ধমানের লোকদের ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবী আছে।" ইহা যে তামাশা নহে, তাহা এক জন বড় ইংরেজ এঞ্জিনীয়ারের কথা উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। ডক্টর সাহার উক্তি এবং ঐ এঞ্জিনীয়ারের মত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Let nobody think that when I am proposing that the people of Burdwan are entitled to compensation for the damage done to them, I am at all joking. Such a claim is supported by many engineers; Sir John Benton (in course of the discussion on the Sarah Bridge) says about a proposal to build railway bunds in North Bengal for the safety of the Sarah Bridge:

"Any blocking of flood waters by these proposed new railway lines would increase the damage to crops, and in the light of experience of similar works elsewhere, this would lead to demand on the part of cultivators for compensation, or for increased water-way to pass the flood waters."

অবশ্য বাংলা দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রীরা বর্দ্ধমান ডিবিজনের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী নহেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দায়ী, এবং তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার এজেণ্টরূপে কথা বলেন। সুতরাং তাঁহাদের কথার ভঙ্গী যদি এরূপ হয় যে, গবর্মেণ্ট দয়া করিয়া কম ট্যাক্স লইয়া জলদান দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বাড়াইতেছেন, তাহা হইলে সেরূপ ভঙ্গী সঙ্গত হইবে না ও সত্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকিবে না। বর্দ্ধমান ডিবিজনের কৃষকদিগকে তাহাদের ক্ষেতে জলসেচনের নিমিত্ত বিনিপয়সায় জল দিলে তবে ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়।

বর্দ্ধমানের জলকর হ্রাস গলসীতে যে-সভায় ঘোষিত হয়, তাহাতে সর্ বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং মিঃ এইচ এস্ সুহ্রাবর্দি, এই তিন জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদের উল্লিখিত স্মারক গ্রন্থে ডক্টর সাহার প্রবন্ধটি পড়িলে উপকৃত হইবেন। ডক্টর সত্যচরণ লাহা নিজ ব্যয়ে এই বৃহৎ গ্রন্থটি ছাপাইয়া-ছিলেন। বহি বোধ করি তাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে।

পশ্চিম-বঙ্গের আরও তিনটি জলসেচন-পরিকল্পনা

গলসীর যে-সভায় বর্দ্ধমানের জলকর হ্রাস ঘোষিত হয়, তাহাতে ইহাও জানান হয় যে, পশ্চিম-বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গবন্মেণ্টের আরও তিনটি পরিকল্পনা মজুদ আছে। কিন্তু লোকেরা যদি যথেষ্ট ট্যাক্স দিতে রাজী হয় (তাহা ২॥০ টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে), তাহা হইলেই গবন্মেণ্ট পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিবেন।

যদি তাহারা অসামর্থ্যবশতঃ রাজী না-হয়, তাহা হইলে——? তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সরকার বাহাদুরের কোন কর্ত্তব্য নাই?

যাহা হউক, গবন্মেণ্ট কি করিবেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

পশ্চিম-বঙ্গের একটি জেলা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই এই জন্য যে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। এই জেলা বাঁকুড়া। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ইহার জলসেচনের সমস্যাটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সমস্যাটির কিছু সমাধান-চিন্তাও করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন জেলার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার জলাশয়ের মধ্যে অনেক হাজার অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই জেলার জলসরবরাহ-সমস্যার সহিত বিশেষ পরিচিত। গবন্মেণ্ট পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে যাহা করিতে চান, সে-বিষয়ে ইঁহাদের মত বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ লইলে কাজ ভাল হইবে।

—

ঢাকায় মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষক দুষ্প্রাপ্য

বাংলা দেশে যত রকম সরকারী চাকরী আছে, তাহার মধ্যে, সাহেবলোগদের একচেটিয়া বা প্রায় একচেটিয়াগুলি বাদ দিয়া, বাকী সব চাকরীর অন্ততঃ শতকরা ৫০টি মুসলমানরা পাইবে, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। অন্য সব বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা শিক্ষা-বিভাগ সম্বন্ধেই এখন কিছু বলিব।

বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু মুসলমান সমাজ বঙ্গের শিক্ষালয়গুলিতে অর্দ্ধেকের উপর ছাত্র এবং অর্দ্ধেকের উপর মোট ছাত্রবেতন যোগাইবার ভার গ্রহণ করেন নাই। তাহা হইলে কি হয়? শিক্ষাবিভাগের নানা রকমের অর্দ্ধেক অধ্যাপক, নানা শ্রেণীর অর্দ্ধেক বিদ্যালয়-পরিদর্শক, নানা শ্রেণীর অর্দ্ধেক শিক্ষক তাঁহাদের হওয়া চাই-ই চাই। মোট ছাত্রসংখ্যার অর্দ্ধেকের চেয়ে অনেক কম মুসলমান; কিন্তু যেহেতু শিক্ষাদাতা হইলে পয়সা পাওয়া যায়, অতএব অন্ততঃ অর্দ্ধেক শিক্ষাদাতা মুসলমান হওয়াই চাই। অর্থাৎ মুসলমানরা শিখিতে প্রস্তুত ও অগ্রসর নহেন, কিন্তু শিখাইতে খুবই প্রস্তুত ও অগ্রসর। অন্য দিকে, ছাত্রবেতন হিসাবে প্রাপ্ত মোট টাকার অর্দ্ধেকের অনেক বেশী হিন্দু ছাত্রসমষ্টির নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, এই টাকা তাহারা দিবে, কিন্তু ইহা দাবি করিতে পারিবে না যে, অর্দ্ধেকের উপর অধ্যাপক ও শিক্ষক হিন্দু হওয়া চাই। যোগ্যতা কম হইলেও অধ্যাপক ও শিক্ষক হিন্দু হওয়া চাই, এমন কথা তাহারা বলে না। তাহাদের ন্যায্য আপত্তি এই যে, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বেতনের বেশীর ভাগ টাকা তাহাদের নিকট হইতে আসিবে কিন্তু তাহাদিগকে শতকরা অন্ততঃ ৫০ জন মুসলমান অধ্যাপক ও শিক্ষকের কাছে পড়িতে হইবে (তাঁহাদের যোগ্যতা যেমনই হউক), এবং যতক্ষণ না শতকরা ৫০ জন মুসলমানের নিয়োগ হইতেছে, ততক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধি-চরিত্রে যোগ্যতম হিন্দুও অধ্যাপক ও শিক্ষক হইতে পারিবে না।

মুসলমানরা ত দুরূহ বিষয়সমূহেরও অধ্যাপকতারও অর্দ্ধেক ভাগ চান—পরিশ্রম করিয়া মন দিয়া শিক্ষালাভ করিলে কালক্রমে তাহা পাইতে পারেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এখন শিক্ষায় অনগ্রসর থাকিয়াও বড় বখরাটা চাওয়ায় একটা জেলায় কিরূপ যুগপৎ হাস্যকর ও শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি হইতে তাহা বুঝা যায়:—

"ঢাকা জিলা স্কুল বোর্ডের পরিচালনায় পল্লীঅঞ্চলে যে সব নূতন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার জন্য এক হাজার নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইবে। ঢাকা জিলা স্কুল বোর্ড শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই এক হাজার শিক্ষকের

মধ্যে শতকরা ৭০ জন মুসলমান হইবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। শতকরা ৭০টি শিক্ষক পদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। অতএব আপাততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে! প্রথম যখন শতকরা ৭০ জন মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়, তখন দেখা গেল বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শতকরা ৭০ জন শিক্ষক মুসলমান সম্প্রদায়মধ্যে নাই। অতঃপর একটা প্রস্তাব হইয়াছিল যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদের জন্য শতকরা ৭০ জন অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক মুসলমান নিযুক্ত করিয়া, নিম্নতর পদসমূহে শতকরা ৭০ জন অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত করা হোক; তাহা হইলে মোটের উপর শতকরা ৭০ জন মুসলমান শিক্ষকই হইবে। কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানেরা জেদ ধরিলেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদেও শতকরা ৭০ জন মুসলমান নিযুক্ত করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষক-নিয়োগে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সে-দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই, তাদের জিদই বড় কথা!

"এই অচল অবস্থা সৃষ্টির ফলে যে-সব পুরাতন স্কুল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলির শিক্ষকদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। তাহারা এ-পর্য্যন্ত নূতন নিয়োগপত্র পায় নাই, সুতরাং ঢাকা জেলা স্কুল বোর্ডের নিকট বেতন দাবী করিতে পারিতেছে না। অপর দিকে স্কুল বোর্ডের ঘোষণা অনুসারে ছাত্রবেতন গ্রহণ এই চারি মাস বন্ধ থাকায়, ঐ আয়ের পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সব স্বল্প বেতনের দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকেরা সপরিবারে কি ভীষণ কষ্টভোগ করিতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অথচ শিক্ষাকর বাবদ জেলার জমিদারদের নিকট হইতে ইতিমধ্যেই বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ জমিদার হিন্দু।

ধর্ম্মসম্প্রদায়নিবিশেষে যদি ৭০০ শিক্ষক চাওয়া হইত, তাহা হইলে অবিলম্বে সাত শতের অনেক অধিক হিন্দু গ্রাজুয়েটেরই দরখাস্ত আসিত—আই-এ পাস ও ম্যাট্রিক পাস ত অনেক হাজার পাওয়া যাইত। কিন্তু পড়িয়া-পণ্ডিত হিন্দু যথেষ্টসংখ্যক অপেক্ষাও অধিক থাকা সত্ত্বেও, না-পড়িয়া-পণ্ডিত মুসলমান খুঁজিয়া বেড়াইতে হইতেছে!

যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল একটা জেলার জন্য আবশ্যক শুধু প্রাথমিক শিক্ষক যথেষ্ট যোগাইতে অসমর্থ, তাহাদের উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম সব রকম চাকরীর অন্যূন অর্দ্ধেক বখরা চাওয়া ও পাওয়া কিরূপ সুসঙ্গত এবং দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তাহা কিরূপ কল্যাণকর, তাহা বুঝান অনাবশ্যক।

"কেবল শিক্ষক নিয়োগেই যে সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা নহে। যে-সব নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার স্থান নির্ব্বাচনেও এই অনিষ্টকর নীতি অবলম্বিত হইবে। প্রকাশ যে, নূতন অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য বহু ক্ষেত্রেই মুসলমান পল্লীতে স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে; পাছে অ-মুসলমান-দের পক্ষ হইতে বিরোধিতা, প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়, তজ্জন্য নির্ব্বাচিত স্থানগুলির পরিচয় কাহাকেও এ পর্য্যন্ত জানিতে দেওয়া হয় নাই।"

শিক্ষাবিষয়ে এইরূপ সাম্প্রদায়িক কুব্যবস্থার ফলে অনেক স্থলে হিন্দু ছেলেমেয়েরা অযোগ্য শিক্ষকের ছাত্র-ছাত্রী হইতে বাধ্য হইবে ও ভাল শিক্ষা পাইবে না, এবং মুসলমান পল্লীতে মক্তব-মাদ্রাসা-জাতীয় বিদ্যালয়ে হিন্দু-সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা পাইবে। টাকা হিন্দুরাই বেশী দিবে, কিন্তু কর্তৃত্ব করিবে মুসলমানেরা।

হিন্দুদের পক্ষ হইতে এই দাবি করা উচিত যে, তাহারা শিক্ষাকরের যে-অংশ দিবে, সেই অংশ কেবল তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের জন্যই ব্যয়িত হইবে। শিক্ষা-বিভাগে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোআরা সম্পূর্ণরূপে রহিত করাই অবশ্য প্রথম ও প্রধান প্রতিকার। শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক হওয়াই উচিত এবং আমরা তাহাই চাই। তাহা না-হইলে, আমরা যে-দাবির কথা বলিয়াছি, সেই দাবি করিতে হইবে। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের পূর্ণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ট্যাক্স যাহা দেওয়া হইবে, তাহার ফল ভোগ করিতে না-পাইলে ট্যাক্স না-দেওয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ত বটেই, সে-ক্ষেত্রে ট্যাক্স দিয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া অধর্ম্ম।

বাঙালী হিন্দুর দুর্দিন আসিয়াছে। দুর্গতি আরও বাড়িতে পারে। এখন খুব শক্ত মানুষের দরকার। কংগ্রেসীদের মধ্যে শক্ত মানুষ অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহারা হিন্দুর দুর্গতি মোচনে দুঃখ বরণ করিবেন কি? তাহার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অ-কংগ্রেসী

হিন্দুদিগকেই এ বিষয়ে কথায় ও কাজে দৃঢ় হইতে হইবে।

ট্যাক্স না-দেওয়া সকল ক্ষেত্রেই একটি চরম উপায়। অন্য সকল উপায় অবলম্বন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইলে তবেই চরম উপায় অবলম্বন বিবেচ্য।

—

সর্ সিকন্দর হায়াৎ খানের সু-প্রস্তাব

পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খান এরূপ কয়েকটি জাতীয় উৎসব প্রবর্তিত করিতে চান, যাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই যোগ দিতে পারে। তাঁহার এই ইচ্ছা ও প্রস্তাব প্রশংসনীয়। তিনি কিংবা অন্য কেহ দৃষ্টান্তস্বরূপ এরূপ দুই-একটি উৎসবের নাম ও বর্ণনা করিলে প্রস্তাবটি আলোচনার সুবিধা হয়।

—

আগামী সেন্সসে লোকসংখ্যা কমবেশী প্রদর্শনের আশঙ্কা

আগামী সেন্সসের সময় কার্য্যপদ্ধতির যে-সব পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে, সে-বিষয়ে আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। তপসিলভুক্ত হিন্দু জাতিসমূহের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে, কিন্তু অন্য হিন্দু জাতি-সমূহের লোকসংখ্যা গোনা হইবে না, ইহা একটি প্রস্তাব। জাতিভেদের আমরা বিরোধী, কিন্তু সেন্সস রিপোর্টে জাতির উল্লেখ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির (caste-এর) লোক-সংখ্যা না থাকিলেই উহা উঠিয়া যাইবে না। যদি কোন কোন কারণে জাতির উল্লেখ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক-সংখ্যার উল্লেখ সেন্সস রিপোর্টে না-করা বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে কোন জাতিরই নাম ও লোকসংখ্যা রিপোর্টে না-থাকা আবশ্যক। কতকগুলির থাকিবে, কতকগুলির থাকিবে না, ইহা ভেদবুদ্ধিপ্রসূত।

১৯৩১ সালের সেন্সসের পূর্ব্বে কতকগুলি অবিবেচক ও অদূরদর্শী কংগ্রেসওআলা সেন্সসে অসহযোগ নীতি প্রয়োগের পরামর্শ দেন। তদনুসারে বঙ্গের অনেক কংগ্রেসী হিন্দু গণনাকারীদিগকে আপন আপন পরিবারের লোকসংখ্যা-আদি জানাইতে অসম্মত হন। ফলে বঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা বাস্তবিক যত তাহা অপেক্ষা সেন্সসে কম দেখান হইয়াছে, অনেকের এইরূপ ধারণা। এবার কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ সেন্সসের সহিত অসহযোগ করিতে বলেন নাই। তাঁহাদের সুবুদ্ধি হইয়াছে—যদিও বিলম্বে।

মাথা-গুন্তির উপর আজকাল অনেক অত্যাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা নির্ভর করে, মাথার ভিতর কি আছে তাহার উপর নহে। এই জন্য আগামী সেন্সস সম্বন্ধে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনেক লোক আশঙ্কা করিতেছেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম দেখান হইবে ও অন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী দেখান হইবে। এরূপ যাহাতে না-হয় তাহার যথোচিত উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত।

—

সংবাদপত্রে জন্মনিরোধক ঔষধের বিজ্ঞাপন

বাংলা দেশের অধিকাংশ বড় খবরের কাগজ হিন্দুদের সম্পত্তি ও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুদের সংখ্যা যে যথেষ্ট বাড়িতেছে না, তাহার যে আপেক্ষিক হ্রাস হইতেছে, এই আক্ষেপ এই সব কাগজগুলিতে কোন-না-কোন সময়ে বাহির হইয়াছে এবং পরেও হইবে। আগামী সেন্সসে হিন্দুর সংখ্যা যাহাতে কম দেখান না-হয়, সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি আছে।

কিন্তু এই সব কাগজেই জন্মনিরোধের সাজসরঞ্জাম ও ঔষধের বিজ্ঞাপন বৎসরের পর বৎসর বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সকল জিনিষ ও ঔষধের ফলপ্রদতা কিরূপ তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। সে-গুলার ও সে-গুলার প্রচারের উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য। বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর যাহাতে সন্তান না-হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। ইহার নৈতিক ফলাফল এস্থলে বিচার্য্য নহে।

যে-সব কাগজের হিন্দু স্বত্বাধিকারী, পরিচালক ও সম্পাদকেরা হিন্দুদিগের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি না-হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কাগজে ঐসব জিনিষের বিজ্ঞাপন প্রকাশের সহিত এরূপ দুঃখপ্রকাশের সঙ্গতি কোথায়?

অনেক সভ্য দেশে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা দারিদ্র্য বা স্বাস্থ্যের অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য ক্লিনিকে গিয়া যোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে জন্মনিরোধক যন্ত্রাদির ব্যবস্থা লইতে পারে, আইন এই প্রকার। অবশ্য অন্যেরাও অনেকে আইনকে ফাঁকি দিয়া, এই সব জিনিষ ব্যবহার

করে'।. কিন্তু বার্থ-কণ্ট্রোল সম্বন্ধীয় জিনিষের অবাধ বিজ্ঞাপন প্রচার অন্য কোন দেশের কাগজে আমাদের চোখে পড়ে নাই। আমাদের দেশে যে-সব কাগজে এই রকম বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তাহাদের কাহারও আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাহাদের ঘোষিত কাটৃতি-সংখ্যা হইতে এরূপ অনুমান হয় না। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল কাগজের মালিকদিগকে পেটের দায়ে এই সব বিজ্ঞাপন ছাপিতে হয় না। অন্য নানাবিধ বিজ্ঞাপন ছাপিয়া তাঁহারা হাজার হাজার টাকা আরও পাইয়া থাকেন। সুতরাং ঐসব জিনিষের বিজ্ঞাপন না-ছাপিলে তাহাদের অন্নকষ্ট হইবে না।

—

কলিকাতায় সুপরিচালিত আরও ছাত্রীনিবাস আবশ্যক

কলিকাতার বিদ্যালয়সমূহের, কলেজসমূহের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্রী পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের গৃহে বাস করেন না, তাঁহাদিগকে কোন-না-কোন ছাত্রীনিবাসে থাকিতে হয়। তাঁহাদের জন্য সুপরিচালিত যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রীনিবাস নাই। যেগুলি আছে, তাহাদের কোনটিই সুপরিচালিত নহে, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুপরিচালিত ছাত্রীনিবাস আরও চাই, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য। কলিকাতার অনেক সম্রান্তা ও শিক্ষিতা মহিলা এরূপ ছাত্রীনিবাসের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নির্ম্মাণ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

কলিকাতায় অনেক ছাত্রীর কিরূপ অধোগতি ও বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

—

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও কলেজ

গত ১লা জুলাই শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও কলেজ খুলিয়াছে। উভয়ই আবাসিক (residential)। এই জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ও কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। এখনও কিছু স্থান থাকিতে পারে। যাঁহারা আপনাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষার জন্য এখানে পাঠাইতে চান, তাঁহারা আশ্রমসচিব মহাশয়কে চিঠি লিখিলে জানিতে পারিবেন। এখানকার বহু সুবিধার কথা আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। শহরের নৈতিক বিপৎসম্ভাবনা ও অনেক অঞ্চলের দূষিত পরিবেষ্টন এখানে নাই।

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর জুলাই মাসের বিশ্বভারতী নিউস পাইয়া তাহাতে দেখিলাম, শান্তিনিকেতনের ছাত্রীনিবাস শ্রীভবনে এখন আর স্থান নাই, কয়েক জন ছাত্রীকে স্থানাভাবে ভর্ত্তি করিতে পারা যায় নাই।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল হইতে লোকে শিক্ষালয়-বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিয়া থাকে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও কলেজের ফল সাধারণতঃ ভাল হইয়া থাকে, এ বৎসরও হইয়াছে।

—

বাংলা গাথার ফরাসী অনুবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকা ও অনুবাদ সহ মৈমনসিংহের যে গাথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী রম্যাঁ রোলাঁর ভগিনী মাদলীন রোলাঁ তাহার নয়টির ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ডক্টর কালিদাস নাগ তাঁহার গাথাগুলির অনুবাদের পরিচয় ১লা জুলাই প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুতে দিয়াছেন। ডক্টর নাগ লিখিয়াছেন, শ্রীমতী মাদলীন রোলাঁ বাংলা শিখিয়াছেন এবং নিয়মিতরূপে "প্রবাসী" পড়িয়া বাংলা সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শ রক্ষা করেন। নয়টি মৈমনসিংহ গাথার তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, ফ্রান্সের সাহিত্যিক মহলে তাহার খুব প্রশংসা হইয়াছে।

—

মাৎগুড় হইতে এঞ্জিন চালনার্থ সুরাসার প্রস্তুতি

আকের রস হইতে চিনির কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইবার পর বিস্তর মাৎগুড় বা ঝোলাগুড় উচ্ছিষ্ট থাকে। ইহা কি কি কাজে লাগান যাইতে পারে, রাসায়নিকেরা তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। জমিতে সার দিবার নিমিত্ত

ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। রাস্তা নির্মাণেও ইহা ব্যবহার করা চলে। মোটর গাড়ীর এঞ্জিন ও অন্য কোন কোন এঞ্জিন যেমন পেট্রল দ্বারা চালান হয়, সেইরূপ কোন কোন সস্তা সুরাসারের (alcoholএর) সাহায্যেও চালান যাইতে পারে। মাৎগুড় হইতে যে এইরূপ সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা, অন্য দেশে যিনিই প্রথমে প্রমাণ করিয়া থাকুন, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কানপুরের ডক্টর এন্ জি চাটুজ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রথম প্রমাণ করেন।

তাহার কিছু কাল পরে, মাৎগুড় হইতে এইরূপ সুরাসার-প্রস্তুতি কারখানায় বাণিজ্যিক পরিমাণে লাভজনকভাবে হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবন্মেণ্ট একটি কমীটি নিযুক্ত করেন। ইহার আট জন সদস্যের মধ্যে বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন তিন জন—ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগড় এবং ডক্টর এন্ জি চাটুজ্যে।

কমীটির রিপোর্ট মোটামুটি এই যে, মাৎগুড় হইতে লাভজনকরূপে বাণিজ্যিক পরিমাণে এঞ্জিন চালন এবং অন্যবিধ ব্যবহারের নিমিত্ত সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারিবে। তদনুসারে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে উহার কারখানা খোলা হইলে ঐ দুই প্রদেশের সুবিধা ও আর্থিক লাভ হইবে। তাহারা আপন আপন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরাসার প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা অন্যান্য প্রদেশেও চালান হইবে।

বাংলা দেশে চিনির কলের সংখ্যা খুব কম। যাহা আছে তাহার অধিকাংশ বাঙালীদের নহে। তাহা না হইলেও, বঙ্গেও মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারিবে।

—

বঙ্গে চিনি উৎপাদনের সম্ভাব্যতা

কোন বিষয়েই আগেকার ভাল অবস্থার সহিত বর্ত্তমান হীন অবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখ করা নিষ্ফল। কিন্তু আগেকার ভাল অবস্থা স্মরণের একটা প্রয়োজন ও উপকারিতা এই আছে যে, আগে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, এখন তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। এই কারণে, বিস্তারিত বৃত্তান্ত না দিয়া, আমরা ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী-দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা দেশ চিনি উৎপাদনে, শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। উদ্যোগিতা ও পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে এখনও বাঙালী এই কার্য্যক্ষেত্রে মাথা তুলিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ আজিজুল হক্ তাঁহার "দি ম্যান বিহাইণ্ড দি প্লাও" ("লাঙ্গলের পেছনের মানুষ") নামক কেজো বহি-খানিতে সাংখ্যিক তথ্য দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক একর জমিতে উৎপন্ন আক হইতে গড়ে বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুড় পাওয়া যায়; যুক্তপ্রদেশে ২৬০০ পাউণ্ড, পঞ্জাবে ২০৪৫ পাউণ্ড, বিহার-উড়িষ্যায় ২৪৬০ পাউণ্ড, বঙ্গে ৩০৬৪ পাউণ্ড। জলসেচনের নিমিত্ত নির্ম্মিত কৃত্রিম খালের জল সেচন করিয়া অন্য তিনটি প্রদেশে আকের চাষ করা হয়। বঙ্গে তাহা করা হয় না। এই জন্য বঙ্গের আকচাষীকে জলকরের ভার বহিতে না হওয়ায় তাহার আক উৎপাদনের খরচ কম। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন, যে, তিনি যে সংখ্যাগুলি দিয়াছেন তাহা কয়েক বৎসর আগেকার; বর্ত্তমানে বঙ্গে প্রতি একরে উৎপন্ন গুড়ের গড় পরিমাণ ৪৬৪৩ পাউণ্ড এবং অনেক জেলায় ৫০০০ পাউণ্ডের উপর ("it now stands at 4643 lbs. of *gur* per acre and in a good many districts it is over 5000 lbs.")। সুতরাং অনেক অ-বাঙালী যে বঙ্গে চিনির কারখানা খুব লাভজনক হইবে বুঝিয়াছেন এবং চিনির কারখানা খুলিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বঙ্গে চিনির কারখানা লাভজনক হইবার আর একটি কারণ, অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে চিনির মোট কাট্‌তি অধিক।

—

শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর খবরের কাগজে তাঁহার নানা সদ্গুণ এবং বহুবিধ কৃতিত্বের বিষয় লিখিত হইয়াছে। একটি বিষয়ের উল্লেখ কিন্তু কোথাও দেখিলাম না।

গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর বোধ হয় ১৮৯১ সালে কলিকাতায় "দাসাশ্রম" নামক একটি জনসেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে উহা "দি রেফিউজ" নামে পরিচিত। দাসাশ্রম যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, শরৎ বাবুর শ্যালক পরলোকগত মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, এবং তাঁহাদের আত্মীয় পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস। রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া অসহায় দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত লোকদিগকে দাসাশ্রমে রাখা হইত ও তাহাদের সেবা করা হইত। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "দাসী" নামক একটি মাসিক পত্র চালান হইত। দাসাশ্রম মেডিক্যাল হলও আয়ের উপায়-স্বরূপ চালান হইত। যে কমীটি দাসাশ্রম চালাইতেন, শরৎ বাবু তাহার এক জন বিশিষ্ট, কর্ম্মিষ্ঠ ও সুপরামর্শদাতা সভ্য ছিলেন। বোধ হয় ১৮৯৫ সালের শেষে, কিংবা ১৮৯৬ সালে দাসাশ্রমের ভার আনন্দ বিশ্বাস নামক এক জন খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোকের হাতে যায়। সম্ভবতঃ তিনি ইহার নাম বদলাইয়া "দি রেফিউজ" রাখেন।

—

সুধাকৃষ্ণ বাগচী

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন," "পুণ্যের জয়," "লণ্ডন কাহিনী" প্রভৃতি পুস্তকের লেখক এবং মাসিক "জাহ্নবী" ও শান্তিপুরের সাপ্তাহিক "বঙ্গলক্ষ্মী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচী দীর্ঘকাল দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া ৫২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শৈশবকাল হইতে রুগ্ন থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। তথাপি তিনি সাহিত্যসেবার প্রবল উৎসাহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ষীয়সী মাতা শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবীর সাহিত্যিক প্রভাব তাঁহাকে সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত করিয়া থাকিবে।

—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত "সাহিত্যাচায্য শরৎচন্দ্র" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৯ ও ৮০ পৃষ্ঠায় নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলি দেখিলাম।

"'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে যেন পূর্ব্বাহ্ণে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবে,—এ সর্ত্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই 'প্রবাসী'তে কখন কোন রচনা দেন নি।"

ইতিপূর্ব্বে (১৩৪৬ সালের ২৩শে আষাঢ়ের পূর্ব্বে) এই বহিখানি ও ইহাতে লিখিত এই কথাগুলি আমি দেখি নাই। এই জন্য ইতিপূর্ব্বে এগুলির প্রতিবাদ করি নাই। ২৩শে আষাঢ় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎ বাবুকে কস্মিন্ কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশও করি নাই। সুতরাং, "তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে পূর্ব্বাহ্ণে" আমাকে পাঠাইতেও কখনও বলি নাই।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসীতে' লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সেই জন্য, এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল

উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে ?

৯।৭।৩৯ আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, 'প্রবাসী'তে শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্ব্বাহ্নে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া, এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, "বারংবার" 'প্রবাসী'তে লিখিতে নিষেধ করা—সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর কটন মিলসের ভিত্তিস্থাপন

বিষ্ণুপুরে যে সুতা ও কাপড়ের কল স্থাপিত হইতেছে, আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে তাহার বিষয় কিছু লিখিয়াছিলাম। উহার ঘরবাড়ীর ভিত্তিস্থাপন গত ১৯শে জুন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় ডিরেক্টরগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধানাদি করিতেছেন। পাচ মাসের মধ্যে তাহা শেষ হইবে আশা করা যায়। কলকব্জা যন্ত্রপাতির দর কয়েক জায়গা হইতে লওয়া হইতেছে। শীঘ্র অর্ডার দেওয়া হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, এক বৎসরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের মিলটি বাজারে সুতা ও কাপড় বিক্রী করিতে পারিবে।

আপাততঃ তিন শত তাঁত ও বার হাজার টাকু চালান হইবে।

বিষ্ণুপুরে সুতা ও কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া তাহাতে সুতা ও কাপড় উৎপন্ন করিতে পারা যাইবে এবং তাহা অন্যত্র উৎপাদিত সুতা ও কাপড়ের অন্ততঃ সমান দরে বিক্রী করিয়া লাভবান্ হইতে পারা যাইবে, ডিরেক্টরদিগের এই বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা প্রথমেই স্বয়ং বিস্তর শেয়ার কিনিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সর্ব্বসাধারণ শেয়ার কিনিয়া মিলের পরিচালনায় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে ও তদ্দ্বারা লাভবান্ হইতে পারেন, তন্নিমিত্ত তাহাদের জন্য অধিকাংশ শেয়ার রাখা হইয়াছে। তাঁহারাও উৎসাহের সহিত শেয়ার কিনিতেছেন।

প্রথম হইতেই বলা হইয়াছিল যে, মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বাঁকুড়া জেলায় তুলার চাষ করিবেন। তাহার জন্য অনেক জমি কেনা হইয়াছে এবং পরে আরও কেনা হইবে। ইতিমধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞ এমন এক জন বিশেষজ্ঞকে জমি দেখাইয়াছেন যিনি স্বয়ং চাষ করিয়া বঙ্গের স্থানবিশেষে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, জমি তুলার চাষের উপযুক্ত, এবং তাহা হইতে ৮০ নম্বরের সুতা কাটিবার যোগ্য তুলা উৎপন্ন করা যাইবে। তাঁহার উপদেশ মত তুলা চাষ করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বাঁকুড়া জেলার ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দালাল কটন মিল্‌স্ লিমিটেডকে তুলা চাষ করাইবার জন্য ৭০০ বিঘা জমি দান করিয়াছেন এবং প্রয়োজন মত আরও জমি দিতে প্রস্তুত আছেন। বর্দ্ধমান-রাজের এই জেলায় অধিকাংশ জমিদারি থাকায় তাঁহারা এখানে তুলা চাষ করাইবার জন্য প্রতি বৎসর চাষীকে নানারূপ সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

বাঁকুড়া জেলায় বয়ন-শিল্পীর সংখ্যা অধিক। এখানে বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার সুতা বিক্রয় হয়। বিষ্ণুপুর কটন মিল্‌স্ সুতা প্রস্তুত করিয়া এই বয়ন-শিল্পীদিগকে অপেক্ষাকৃত কম দরে সুতা দিলে কুটীর-শিল্পের সাহায্য হইবে এবং মিলেরও যথেষ্ট লাভ হইবে

বাঁকুড়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। তাহা হইতে অনেক তথ্য জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা বঙ্গে কতটা অনগ্রসর, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এক একটি জেলা ধরিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদিগের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে এই শিক্ষকদিগের স্থায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ নীচে মুদ্রিত হইল।

বাঁকুড়া জেলায় পাঠশালায় যাইবার বয়সের বালকবালিকার সংখ্যা	১৬৬৭০৫
তাহাদের মধ্যে যত বালকবালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে	৬১০২১
বালকদের জন্য পাঠশালার সংখ্যা	১৩৮২
বালিকাদের " " "	১৯৬
উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩০৩
নিম্ন " " "	১২৭৫
গবর্মেণ্ট-পরিচালিত পাঠশালার সংখ্যা	২
জেলাবোর্ড- " "	১২৭
সাহায্যপ্রাপ্ত " "	১৪৪৯
বার্ষিক গবর্মেণ্ট সাহায্য	৬৫৫৩১৲
বার্ষিক জেলাবোর্ডের সাহায্য	২১৯৮৭।০
বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটির বার্ষিক সাহায্য	৫২১৫৲

শতকরা ৩৬টি বালকবালিকা সামান্য লিখিতে পড়িতে শিখিতেছে, বাকী ৬৪ জন নিরক্ষর থাকিতেছে। বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা আরও খারাপ। বালকদের জন্য যত পাঠশালা আছে, বালিকাদের জন্য পাঠশালার সংখ্যা তাহার এক-সপ্তমাংশ মাত্র! পাঠশালার মধ্যে অধিকাংশই নিম্নপ্রাথমিক।

পাঠশালাগুলিতে ছাত্রবেতন সামান্য যাহা আদায় হয় এবং গবর্মেণ্ট ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সাহায্য যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে শিক্ষক মহাশয়দের গড়ে ৫।৬ টাকার বেশী মাসিক আয় হয় না—কাহারও কাহারও তার চেয়েও কম। ইহাতে কাহারও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনই চলে না, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ত দূরের কথা। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহাদের সমুদয় সময় ও শক্তি শিক্ষণকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন না। ন্যূনকল্পে তাঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় ১৫৲ টাকা হওয়া আবশ্যক।

তাঁহাদের সকলেরই শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য এক একটি জেলায় প্রত্যেক থানার এলাকায় একটি করিয়া ট্রেনিং স্কুল থাকিলে তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ পাঠশালাগুলির পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকেরই ইংরেজী জানা না থাকিতে পারে; কিন্তু বাঁকুড়ায় তাঁহাদের কন্‌ফারেন্সে তাঁহারা অনেকে যেরূপ বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহাদের সম্পাদক যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা সংস্কৃতিহীন (uncultured) নহেন এবং শিক্ষকের কার্য্যের উচ্চ আদর্শ ও গৌরব তাঁহারা অনবগত নহেন।

জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির ভিত্তি শিক্ষা। অধিকাংশ স্থলে শিক্ষা দেন এই পণ্ডিত মহাশয়েরা। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির এবং শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিলে ইঁহাদিগের দ্বারা জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারিবে, নতুবা নহে।

—

বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাঙালীর সাহিত্যানুশীলন

নিজের মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্যের চর্চ্চা করা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। স্বভাষাভাষী অধিকাংশ লোকের সহিত রাষ্ট্রীয়ভাবে যুক্ত থাকিলে এই চর্চ্চার যতটা সুবিধা হয়, রাষ্ট্রের ভিন্নভাষাভাষী অংশের মধ্যে গিয়া পড়িলে তাহা হয় না। তাহা সত্ত্বেও, "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ও বিহার প্রদেশের বাঙালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় এবং আপনাদের সন্তানদিগকে তাহা শিখাইবার চেষ্টায়, সুবিধা না-পাইলেও, বাধা পাইতেন না; কিন্তু এখন বাধা পাইতেছেন। সে-বিষয়ে আগে আগে কিছু লিখিয়াছি।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা দুই প্রকারের। এক রকম

তাঁহারা যাঁহারা বাংলা দেশ হইতে এমন কোন অঞ্চলে বা জেলায় গিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছেন যেখানকার ভাষা বাংলা নহে; যেমন পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতির বাঙালীরা। দ্বিতীয় প্রকার তাঁহারা যাঁহারা প্রকৃত বঙ্গেরই অংশ কোন বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বা জেলাতেই আছেন কিন্তু ঐ অঞ্চল বা জেলা এমন কোন প্রদেশের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট জুড়িয়া দিয়াছেন যাহার অধিকাংশ লোক বাংলা বলে না; যেমন মানভূমের বাঙালীরা।

মানভূমের ১৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ১২ লক্ষের ভাষা কেবল বাংলা। বাকী ৬ লক্ষ সাঁওতাল প্রভৃতি আপনাদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বলে কিন্তু বাংলা-ভাষীদের সহিত কথা বলে বাংলা ভাষায়। এই জন্য মোটামুটি মানভূমের সমুদয় অধিবাসীকে বাংলাভাষী বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। অথচ মানভূমের সরকারী বা সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার ব্যবস্থায় হিন্দী চালাইবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা পাইলে তাহা কৃপালব্ধ মনে করা হইতেছে!

পুরুলিয়ায় বাংলার চর্চ্চা

এরূপ অবস্থায় মানভূমের সদর শহর পুরুলিয়াতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত হওয়া আবশ্যক। তত্রত্য হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের উৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়া দেখিলাম, দু-দিন সভায় জনসমাগম খুব বেশী হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণ যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন নহেন ইহা তাহার একটি লক্ষণ। হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের সহিত সম্পর্কিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অনুরাগও উৎসাহবর্দ্ধক। সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স আশীর উপর বা কাছাকাছি; কিন্তু তিনি উৎসবের দুই দিনই আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন এবং প্রথম দিন সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি এখন মহাভারত সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক একটি বাংলা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে ব্যাপৃত আছেন। মানভূমের জেলাজজ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার পত্নী হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কল্পে আগ্রহান্বিত। সাহিত্যমন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশনারায়ণ সরকার ইহার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। উৎসবের আগে হইতে তাঁহাকে খাটিতে হইয়াছে। উৎসবের দু-দিন ত তাঁহার অবসর ছিল না বলিলেই হয়। আশা হয়, ইঁহাদের এবং স্থানীয় অন্যান্য উৎসাহী সাহিত্যানুরাগীদের চেষ্টায় হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের অট্টালিকা বৃহত্তর হইবে, পুস্তকের সংখ্যা বাড়িবে, এবং চাঁদাদাতা সভ্যের ও সাধারণ পাঠকের সংখ্যা অধিকতর হইবে।

"মাহাত"দের ভাষা

সেদিন পাটনার একখানা ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে পড়িলাম, "এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, মানভূম জেলার অধিকাংশ লোক হিন্দীভাষী"। মিথ্যাবাদিতা বা অজ্ঞতার ইহা একটা চূড়ান্ত নমুনা।

মানভূম জেলার প্রায় সব মানুষেরই ভাষা হিন্দী, এরূপ মিথ্যা কথা বলিবার ঝোঁক যখন রহিয়াছে, তখন তাহাদের এক অংশ "মাহাত"দের মাতৃভাষা হিন্দী প্রমাণ করিবার চেষ্টা যে হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেক মাহাত খাস্ বিহারের বাসিন্দা, তাহাদের ভাষা বিহারী। যাহারা মানভূমের বাসিন্দা তাহাদের ভাষা বাংলা। তাহারা হিন্দী বলে না, বলিতে পারে না। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দীভাষী ছিল কিনা, তাহা বিচার্য্য নহে; যদি ছিল তাহা হইলেও এখন তাহাদের ভাষা বাংলা। জনশ্রুতি অনুসারে, বাংলা দেশের বহু লক্ষ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়াছিলেন কনৌজ হইতে এবং তাঁহাদের ভাষা ছিল হিন্দী; কিন্তু তা বলিয়া তাহাদের বংশধর বহু লক্ষ বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ভাষা হিন্দী নহে। বাংলা দেশে পুরুষানুক্রমে বাংলাভাষী হাজার হাজার দুবে, পাড়ে, ত্রিবেদী, পাঠক, তেওয়ারি, শুকুল, অধ্বর্যু, বাজপেয়ী আছেন। তাঁহারা বাংলা বলেন লেখেন, হিন্দী বলেন না লেখেন না। শুধু জাতি বা বংশবাচক পদবী দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বীরেশ্বর পাড়ে ছিলেন হিন্দী-

ভাষী; এবং "বীরবল" প্রমথ চৌধুরী বিহারের জগলাল চৌধুরীর মত হিন্দীভাষী কিংবা পঞ্জাবের ছোটুরাম চৌধুরীর মত পঞ্জাবীভাষী!

মানভূমের মাহাতদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী কেহ কেহ তাঁহাদিগকে হিন্দীভাষী বলিয়া সেন্সসে লিখাইতে পারেন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্ত্তায় বাস্তবিক হিন্দীভাষী তাঁহাদিগকে কেহ করিতে পারিবেন না।

—

ধানবাদ বাংলা দেশের অন্তর্গত কিনা

ধানবাদ মানভূম জেলার অন্তর্গত। মানভূম জেলা এখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বিহার প্রদেশের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রাকৃতিক ও ভাষিক বঙ্গের অন্তর্গত। সুতরাং ধানবাদও বাংলা দেশেরই অংশ।

মানভূমের অধিকাংশ লোক বাংলা বলে, ইহাই তাহা যে বঙ্গের অংশ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। তাহা ছাড়া অন্য প্রমাণ, জেলাটার নাম। বঙ্গদেশে বরেন্দ্রভূম, মল্লভূম, বীরভূম, সামন্তভূম, শিখরভূম, বরাহভূম, ইত্যাদি "ভূম"-অন্ত নাম আছে। ইহা বঙ্গের বিশেষত্ব। অন্য কোন প্রদেশে এইরূপ নামাবলী নাই।

ধানবাদের নিকটবর্ত্তী ও অন্তর্গত ঝামাডোবা, জিয়াল-গোড়া প্রভৃতি নামও প্রমাণ করে যে, উহা বঙ্গের অন্তর্গত। বঙ্গে "গোড়া"-ও "ডোবা"-অন্ত অনেক গ্রামনাম আছে। অন্য কোন প্রদেশে নাই।

ধানবাদের উপকথা, ছড়া, লোকগীত প্রভৃতি বাংলা। যে-অঞ্চল বঙ্গের অংশ নহে, তাহার উপকথা-আদি বাংলা হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন তথাকার জমিদারী ও সরকারী দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি বাংলায় লেখা। ইহাও ধানবাদের বঙ্গীয়ত্বের অন্যতম প্রমাণ।

বিহারীদের একটা যুক্তি এই যে, ধানবাদের অধিকাংশ বর্ত্তমান অধিবাসী হিন্দীভাষী। কিন্তু এই হিন্দীভাষী অধিবাসীরা আগন্তুক। তাহারা সেখানকার পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দা নহে। ধানবাদ অঞ্চলে কয়লার খনি প্রভৃতিতে মজুরি করিবার নিমিত্ত তাহারা সেখানে আসিয়াছে। কতক হিন্দীভাষী আসিয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে। বঙ্গের কোন জায়গায় অধিকাংশ লোকের ভাষা বাংলা না হইয়া অন্য কিছু হইলেই জায়গাটা বঙ্গবহির্ভূত হইয়া যায় না। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে মাড়োয়ারীদের সংখ্যা বেশী। তা বলিয়া বড়বাজার রাজপুতানার অংশ নহে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বিস্তর কারখানাপ্রধান স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাষী নহে; তাহারা চটকল প্রভৃতিতে কাজ করে। কিন্তু সে কারণে কেহ দাবি করে না যে, ঐ স্থানগুলা বিহারের বা আগ্রা-অযোধ্যার অংশ।

—

সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরোধী কন্‌ফারেন্স

স্থির হইয়াছে আগামী আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরোধী এক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। ইহা হওয়া খুব আবশ্যক। ইহার আগে ইহা হইলেও সাময়িকই হইত, অসাময়িক হইত না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটার মত ভারতবর্ষের অনিষ্টকর কোন চা'ল উহার পূর্ব্বে কূটরাষ্ট্রনীতি-বিশারদ ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা চালিতে পারে নাই। ইহার উচ্ছেদ না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। অতি কুক্ষণে ইহার সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্ত্তৃক না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি ঘোষিত হইয়াছিল। গোড়া হইতেই ইহার প্রবল বিরোধিতা করা কংগ্রেসের উচিত ছিল। অন্যায়ের সহিত কোন রফা করিতে নাই।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরোধী কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন করিবেন। সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবেন। কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতি-বিৎ মধুসূদন শ্রীহরি আনে। কন্‌ফারেন্সটিতে যে শ্রোতা খুব বেশী হইবে এবং ইহার বক্তৃতাগুলি যে অকাট্যযুক্তি-পূর্ণ হইবে, তাহা আমরা আগে হইতেই বলিতে পারি। বঙ্গের কংগ্রেস জাতীয় দলের উদ্যোগে এই কন্‌ফারেন্স হইতেছে।

—

বঙ্গের দুটি হিন্দুসভার একীভবন

বাংলা দেশে আগে হইতে ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা। ইহা সমগ্রভারতীয় হিন্দু মহাসভার অঙ্গীভূত। তাহার পর বঙ্গীয় হিন্দুসভা স্থাপিত হয়। ইহার সহিত

হিন্দু মহাসভার যোগ ছিল না। ইহার সভাপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহা সন্তোষের বিষয় যে, এই দুটি সভা একীভূত হইয়াছে। উভয়ের সভ্যেরা এখন পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া বাংলা দেশের হিত-সাধনে ব্যাপৃত থাকুন।

—

হিন্দুসভার একটি অত্যাবশ্যক কাজ

হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় শক্তি, অধিকার ও প্রভাব যাহাতে না কমিয়া ন্যায়সঙ্গত রূপে ও ন্যায্য উপায়ে বাড়ে, হিন্দুসভা তাহার চেষ্টা অবশ্যই করিবেন। কিন্তু একটি সামাজিক ও আর্থিক কাজে সভার অবিরত মনোযোগী থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহাতে প্রাপ্তযৌবন হিন্দু পুরুষ ও নারীর বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বত্র হওয়া চাই। যুবকেরা বহু স্থলে কোন আয় নাই বা যথেষ্ট আয় নাই বলিয়া বিবাহ করিতে চায় না। তাহাদের আয়ের নানা উপায় করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাদেরও কোন সুনীতিসঙ্গত কাজ তুচ্ছ মনে করা উচিত নহে। কারখানার সাধারণ মজুরি, কারিগরি, মিস্ত্রিগিরি, মোটর গাড়ীর ড্রাইভারি —সব কাজই তাহাদের করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধী যে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে খদ্দর চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার এই একটি ভাল দিক আছে যে, তাহা মানুষকে অ-বিলাসী হইতে প্রেরণা দিতে পারে। খদ্দর ব্যবহারের সঙ্গে ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য হয় না। ব্যয়বহুল চালচলনের দিকে ঝোঁক থাকিলে মানুষ অনেক আয় না হইলে বিবাহ করিতে চায় না। এই হেতু সাদাসিধা চালচলন প্রবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

আয়বৃদ্ধির চেষ্টা খুবই করা উচিত, কিন্তু আয় বেশী হইলেই বিলাসে আড়ম্বরে ভড়ঙে তাহা কেন ব্যয় করিতে হইবে? অর্থের নানা সদ্ব্যয় আছে ও ধনোৎপাদক প্রয়োগ আছে।

—

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের কেলেঙ্কারীর রিপোর্ট অপ্রকাশ

বৎসরাধিক পূর্ব্বে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীরা তাহার ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এক মুসলমান ডাক্তারের নামে কয়েকটা জঘন্য অপরাধের অভিযোগ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাইসন দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার প্রকাশ্য তদন্ত করেন। উভয় পক্ষের প্রকাশ্য সাক্ষ্য লওয়া হয়। উভয় পক্ষে উকীল নিযুক্ত হয়। মিঃ টাইসন তদন্ত শেষ করিবার কিছু পরে রিপোর্ট দেন। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রিসভা দীর্ঘকাল রিপোর্ট প্রকাশ ত করেনই নাই, মিঃ টাইসনের কোন সিদ্ধান্তের আভাসও দেন নাই। এই জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করা হয়। পরিশেষে কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ বলিয়াছেন, উক্ত মুসলমান ডাক্তারের বিরুদ্ধে আনীত ছয়টা অভিযোগের মধ্যে পাচটা হয় মিথ্যা বা প্রমাণিত হয় নাই এবং বাকী একটা তুচ্ছ। তাই যদি হয়, তাহা হইলে রিপোর্টটা প্রকাশ করা হইতেছে না কেন? প্রকাশ না-করাতেই সর্ব্বসাধারণের মনে মন্ত্রীর উত্তরের সত্যতা ও ডাক্তারের নির্দোষিতা সম্বন্ধে সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইতেছে।

—

কাগজের কলের লাভ ও জ্ঞানবিস্তারে বাধা

ভারতবর্ষে যাহাতে নানা রকম পণ্যশিল্পের প্রবর্ত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আমদানী কোন কোন জিনিষের উপর বাণিজ্য-শুল্ক আছে। তাহার ফলে ঐ বিদেশী জিনিষগুলির দাম এদেশে বেশী হওয়ায় এদেশের সেই সকল জিনিষের কারখানাওআলারা নিজেদের দাম বাড়াইয়া রাখিতে পারে। কাগজ ঐ রকম একটি জিনিষ। বিদেশী কাগজের উপর অধিক হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত থাকায় তাহা দুর্মূল্য, সুতরাং ভারতবর্ষে প্রস্তুত কাগজও বেশী দামে বিক্রী হয়। এই রকম বেশী দামে কাগজ বেচিয়া টিটাগড়ের কাগজের কল অংশীদারদিগকে শতকরা ত্রিশ টাকা লাভ দিয়াছে। ইহা অত্যন্ত বেশী লাভ। যদি বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপন দ্বারা কাগজের দাম চড়ানর ফলে এই লাভ না হইত, তাহা হইলে কিছু আপত্তির কারণ ঘটিত না। কিন্তু আইনের সাহায্যে শুল্ক বসাইয়া কাহাকেও শতকরা ৩০ টাকা লাভ করিবার সুবিধা

করিয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এক্ষেত্রে অন্যায়টা এই কারণে আরও বেশী যে, কাগজের দাম যত বেশী থাকে পুস্তকাদির দাম তত বেশী হয়, সুতরাং লোকের জ্ঞানলাভে বাধা জন্মে।

গবর্মেণ্ট আইন করিয়া রায়তদের দেয় খাজনা কমাইতেছেন এই ওজুহাতে যে, জমিদারদের অত বেশী টাকা পাওয়া উচিত নয়। আরও আইন হইতেছে যে, মহাজনরা ও লোন আপিসগুলি বন্ধকী ঋণের উপর শতকরা আট ও বেবন্ধকী ঋণের উপর শতকরা দশ টাকার উপর সুদ লইতে পারিবে না। লোকে যে টাকা জমিদারিতে খাটাইয়াছে, তাহার লাভের হার কমান হইয়াছে, তেজারতিতে যে টাকা মহাজনেরা ও লোন অফিস-সমূহ খাটায় তাহার লাভের হার কমান হইতেছে, কিন্তু বাণিজ্য-শুল্ক-সংরক্ষিত কারখানায় যে টাকা খাটান হয়, তাহার লাভের হার কেন অনিয়ন্ত্রিত থাকিবে? শতকরা ৩০ টাকা লাভের জায়গায় যাহাতে উহা আট বা দশ হয়, তাহার ব্যবস্থা কেন করা হইবে না? টিটাগড় কাগজের কল বাংলা দেশে অবস্থিত হইলেও উহার মালিক ইংরেজরা বলিয়া ঐ কারবারের লাভের হার অনিয়ন্ত্রিত থাকিতে পারে না।

—

তেজারতি সম্বন্ধীয় আইন

যে কোন মানুষ বা যে-কোন মনুষ্যসমষ্টি কোন প্রকার কাজ করে, সেই কাজ সম্বন্ধীয় আইন সকলের প্রতি জাতি-বর্ণ-ব্যবসাগতনাম-নির্বিশেষে সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। মফস্বলের মহাজন সাহুকারেরা সুদে টাকা খাটায়, শহরের নানা রকমের ব্যাঙ্ক সুদে টাকা খাটায়, জীবনবীমা কোম্পানী-সমূহ সুদে টাকা খাটায়। কেহ বেশী সুদ লইয়া থাকে, কেহ কম—কখন কম, কখন বেশী। অত্যধিক সুদ উক্ত ঋণদাতাদের মধ্যে যে কেহ আদায় করে, তাহা অধমর্ণের পক্ষে পীড়াদায়ক। ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী ও বড় বড় ব্যাঙ্ক বেশী সুদ লইলে তাহা দেনদারের পক্ষে সুখকর, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে মহাজন লইলে দুঃখকর, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু বঙ্গে যে তেজারতি আইন হইতেছে, তাহা প্রভাবহীন গ্রাম্য মহাজনদের ও লোন অফিসগুলির উপর যেমন খাটিবে, প্রধানতঃ সাহেব সুবাদের দ্বারা পরিচালিত ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী-সমূহ ও ব্যাঙ্কগুলির উপর খাটিবে না। আইনের সমদর্শিতার ইহা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত!

—

শ্রীযুক্ত কমঠের দুরদৃষ্ট

মহারাষ্ট্রীয় শ্রীযুক্ত হরি বিষ্ণু কমঠ সিবিলিয়ান ছিলেন। সরকারী চাকরীতে থাকিয়া রাষ্ট্রনীতিতে যোগ দেওয়া যায় না বলিয়া এবং গবর্মেণ্ট কোন কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সিবিলিয়ানি কাজে ইস্তফা দেন এবং কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁহাকে জাতীয় পরিকল্পনা কমীটির যুগ্ম-সম্পাদক করা হয়। এই নিয়োগের সময় এরূপ কোন সর্ত্তের কথা তাঁহাকে বলা হয় নাই যে, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে, তিনি রাজনীতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি গত কংগ্রেস-সভাপতি-নির্ব্বাচন-বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী দ্বন্দ্বে যোগ দিয়াছিলেন। মতটা তাঁহার বামপন্থী-ঘেঁষা; দক্ষিণপন্থী-ঘেঁষা হইলে তাহা রাজনীতিতে-যোগ-দেওয়া অভিহিত হইত না; যেমন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে রাজনৈতিক মত প্রচার করিলে তাহা সরকারী মতে রাজনীতির সহিত সংস্রব নহে, তাহার বিপরীত জিনিষটাই অশুচি রাজনৈতিক সংস্রব!

—

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির দুটি নির্দ্ধারণ

বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির দুটি নির্দ্ধারণ লইয়া কংগ্রেসীদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধ বা নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২৪শে আষাঢ় অনেক প্রদেশের নানা স্থানে সেই দুইটির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত জনাকীর্ণ অনেক সভা হইয়া গিয়াছে।

দুটি নির্দ্ধারণের মধ্যে একটি এই যে, কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি বা সম্মতি না লইয়া কোন কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন না। ইহার সমালোচনা করা

অ-কংগ্রেসী আমাদের পক্ষে কঠিন ; গান্ধীভক্তেরা তাহা আমাদের অনধিকারচর্চ্চাও মনে করিতে পারেন। তথাপি কিছু বলিতে হইবে।

সত্যাগ্রহ কথাটি গান্ধীজী চালাইয়াছেন, তাহা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তিনিই প্রথমে আপনি আচরি অপরকে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং সত্যাগ্রহ করিতে হইলে তাহার আবিষ্কর্ত্তা বা উদ্ভাবকের অনুমতি বা সম্মতি লওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে—অন্ততঃ অনাবশ্যক বিবেচিত না-হইতে পারে। কিন্তু নির্দ্ধারণটিতে গান্ধীজীর সম্মতি বা অনুমতি লইবার কথা নাই, আছে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির। অবশ্য তাঁহারা গান্ধীজীর উপদেশ বা পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে পারেন, না-করিতেও পারেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ বলিতে মহাত্মাজী যাহা বুঝেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটিই তাহার একমাত্র বা অভ্রান্ত বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা, ইহা স্বীকার করা যায় না। অন্যেরাও তাহা বুঝিতে পারে এবং সেই বোধ অনুসারে কাজ করিতে পারে। অতএব সত্যাগ্রহ করিতে হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির অনুমতি লইতেই হইবে, এই নিয়ম সমীচীন মনে হইতেছে না।

কলকব্জা-আদির উদ্ভাবকেরা তাহার পেটেণ্ট লইয়া থাকেন। তদনুসারে তাহা ব্যবহারের অধিকার উদ্ভাবকদের থাকে—অন্ততঃ নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত। কিন্তু সত্যাগ্রহ কোন জড় যন্ত্র নহে ; মহাত্মাজী ইহার পেটেণ্ট লন নাই। তিনি উপদেশ দিয়াছেন ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি রাজকোটের ব্যাপারে তিনি যে উপবাসাদি করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ অহিংস হয় নাই। সুতরাং তাহা খাঁটি সত্যাগ্রহ হয় নাই। স্বয়ং যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রদাতা তিনি যখন নিজেই বলিতেছেন যে, এখনও তিনি সিদ্ধ হন নাই, তখন তাঁহার উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী সত্যাগ্রহ আর কেহ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ লোকদের না-থাকা অস্বাভাবিক নহে, বরং স্বাভাবিকই বটে। সুতরাং সত্যাগ্রহ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির অনুমতি লইতে হইবে, এরূপ নিয়ম না করিয়া নিয়ম এইরূপ করাই উচিত ছিল যে, "কখনও কোথাও কোনও উপলক্ষ্যে সত্যাগ্রহ করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধীই করিবেন এবং অপর কাহারও দ্বারা করাইতে হইলে তিনিই তাহাকে বা তাঁহাদিগকে আদেশ করিবেন ; কিন্তু সত্যাগ্রহ করা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ।"

কি কি কাজ বা কি কি রকমের কাজ সত্যাগ্রহ তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু শব্দটির অর্থ অনুযায়ী কোন কোন প্রকার কাজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির অনুমতি লইয়া তবে করা সম্ভব বা সুসাধ্য মনে হয় না। সত্যে আগ্রহ সত্যাগ্রহ। মনে করুন, কোন কংগ্রেসী কোথাও একটি সত্য মত প্রচার করা আবশ্যক মনে করিলেন। তদনুসারে সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহূত হইল। ইতিমধ্যে সরকারী হুকুম হইল যে, বক্তা বাহিরের লোক হইলে সেখানে যাইতে ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন না কিংবা সেখানকারই লোক হইলে সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না—এবং সভা হইতেই পারিবে না। সত্যপ্রচারে যাঁহার আগ্রহ আছে এবং সত্য প্রকাশের জন্য যিনি সকল দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার এরূপ স্থলে প্রাদেশিক কমীটির অনুমতি চাওয়া এবং তাহা পাইলে তাহার পর সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করা সম্ভবপর বা সুসাধ্য কিনা বিবেচ্য। যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটি অনুমতি না-দেন, তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া উচিত হইবে কি না এবং যিনি কমীটির আদেশ অনুসারে সত্যকে অপ্রকাশিত রাখিবেন, তিনি নিজের ও অপরের দ্বারা সত্যাচারী বিবেচিত হইতে পারিবেন কি ?

এমন অনেক মত ও মন্তব্য আছে, যাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত হইতে হয়, কিন্তু মত ও মন্তব্যগুলি সত্য। এরূপ সত্য মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অনেকে কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহারা দণ্ডের ভয়ে তাহা অপ্রকাশিত রাখা অধর্ম্ম মনে করিয়াছেন, এবং প্রকাশ করাই সত্যাচরণ ও দেশসেবামূলক ধর্ম্ম মনে করিয়াছেন। লিখিয়া বা মুখে বলিয়া সত্য-প্রকাশ-রূপ যে ধর্ম্মাচরণ, তাহা অপরের অনুমতিসাপেক্ষ হইতে পারে কি ?

প্রায়োপবেশন করা এক রকমের সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর অনুকরণে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সামান্য কারণে,

অনেকে প্রায়োপবেশন করে। আমরা ইহার বিরোধী। ইহা বন্ধ হইলে ভাল হয়। বস্তুতঃ খুব গুরুতর কারণেও প্রায়োপবেশন করা উচিত কি না, তাহা সাধারণভাবে বলা কঠিন। কোন উপলক্ষ্য ঘটিলে এক একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। গান্ধীজী যতবার যে-যে উপলক্ষ্যে প্রায়োপবেশন-রূপ সত্যাগ্রহ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির সমর্থন আমরা করি না। কোনটিরই সমর্থন করি কি না, তাহা প্রত্যেকটি বিবেচনা না-করিয়া বলিতে পারি না।

কোনও মানুষকে বা মনুষ্যসমষ্টিকে অন্য কাহারও বিবেকচালক বা ধর্ম্মবুদ্ধিচালক (অর্থাৎ কন্স্যান্স-কীপার) করায় আমাদের সম্মতি নাই। নতুবা, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কংগ্রেসী প্রায়োপবেশন বা অন্যবিধ উপবাস করিতে পারিবে না, এরূপ নিয়মে আমাদের আপত্তি হইত না।

এক প্রকার সত্যাগ্রহ কংগ্রেস কমীটির সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাহার সম্মতি লইয়া হওয়াই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি; তাহা বহু ব্যক্তির সমষ্টিগত অহিংস আইন অমান্য (mass civil disobedience) করা। কোথাও ইহা আরম্ভ করিলে অন্যত্র ইহা সংক্রামিত হইতে হইতে ইহা দেশব্যাপী হইতে পারে। অতএব এ-বিষয়ে পরামর্শ দিবার ও মত প্রকাশ করিবার সুযোগ কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের থাকা বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য, বিদ্রোহের সম্ভাবিত ফলের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া বিদ্রোহ করিবার অধিকার, অন্য সকলের মত কংগ্রেসীদেরও আছে।

সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমীটির অন্য যে নির্দ্ধারণটির প্রতিবাদ অনেক কংগ্রেসী করিতেছেন তাহা মোটামুটি এই যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের সমালোচনা কংগ্রেসীরা করিতে পারিবে না। এরূপ নির্দ্ধারণ আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস্য সূত্রে শুনিয়াছি, কংগ্রেসী প্রদেশগুলির কোথাও কোথাও কংগ্রেস-কমীটির লোকেরা মন্ত্রীদের এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দৈনন্দিন বা মামুলী কাজেও হস্তক্ষেপ করে ও বাধা দেয়। কোথাও কোথাও তাহারা বিচারাধীন বা আসন্নবিচার মোকদ্দমা বন্ধ করাইয়াছে পর্য্যন্ত; অথচ মোকদ্দমা যাহাদের বিরুদ্ধে, বিচার হইলে তাহাদের শাস্তি হইতে পারিত। সরকারী কাজে এই রকম অন্তরায় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ ইহাকে বে-আইনী ও দণ্ডনীয় বলা যাইতে পারে।

এরূপ হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত আমরা এখনই দিতে পারিতেছি না, দেওয়া নানা কারণে কঠিনও বটে। বাস্তবিক যদি এরূপ হস্তক্ষেপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু এরূপ হস্তক্ষেপ যে হওয়া উচিত নয়, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা কংগ্রেসীরা করিতে পারিবেন না, এ রকম নিয়ম বা রীতির আমরা বিরোধী।

কংগ্রেসীদের কংগ্রেসের সমালোচনা করিবার অধিকার

সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমীটির দুটি নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিবার নিমিত্ত সুভাষচন্দ্র বসু দেশের সকল অংশে সভা আহ্বান করিতে বলিয়াছিলেন। নানা স্থানে সভা হইয়াছিল ও অনেক কংগ্রেসী তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ ও অনেক দক্ষিণপন্থী, সমালোচকদের শায়েস্তা করিবার ভয় দেখাইতেছেন, সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধেও শাসনের ভয় দেখান হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ও বিহারে যাহাদিগকে শায়েস্তা করিতে হইবে, তাহাদের ফর্দ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমীটির এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করিবার অধিকার কংগ্রেসীদের আছে কিনা। প্রশ্নটা ভারি অদ্ভুত ও কৌতুকজনক। এত দিন ধরিয়া মহাত্মাজী কংগ্রেস যে নানা রকম দোষে জর্জ্জরিত তাহা বলিয়া আসিতেছেন। তাহা কি সমালোচনা নহে? তিনি চারি আনা চাঁদাদাতা কংগ্রেসী সভ্য নহেন, এই উত্তর দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের দস্তুরমত সভ্য অনেকেও ত প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের ও তাহার নিয়মাবলীর অনেক দোষ দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহার ফলে কংগ্রেসের কন্সটিটিউশ্যনের

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কংগ্রেসের দোষোদ্ঘাটন যদি করা চলে, তাহা হইলে তাহার একটা কমীটির (তাহা বৃহত্তম কমীটি হইলেও) সমালোচনা নিশ্চয়ই করা চলে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের সভ্যেরা কি তাহার সমালোচনা করিতে পারেন না বা করেন না? নিশ্চয়ই পারেন ও করেন।

প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা এক কথা, নির্দ্ধারণ অমান্য ও অগ্রাহ্য করা অন্য কথা। কংগ্রেসের সভ্যেরা তাহার এবং তাহার যে-কোন কমীটির সমালোচনা করিতে অধিকারী। কিন্তু যতক্ষণ কংগ্রেসের বা তাহার কোন কমীটির কোন নির্দ্ধারণ বা নিয়ম বলবৎ থাকে,—উঠিয়া না যায়, সংশোধিত বা রদ না হয়, ততক্ষণ কংগ্রেসীরা কংগ্রেসী থাকা কালে তাহা মানিতে বাধ্য। কংগ্রেসী থাকিতে থাকিতে কেহ তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার জন্য তাঁহাকে বিহিত শাস্তি লইতে হইবে। নিয়মভঙ্গকারী সভ্যের অধিকার-লোপ বা বহিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু যিনি বিদ্রোহী তিনি ত স্ববহিষ্কৃত। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া বৃথা। আবার, বিদ্রোহীরাই যদি দলে পুরু হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কে শাস্তি দিবে? তাহার দৃষ্টান্ত কংগ্রেসের ইতিহাসেই রহিয়াছে। সেই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইবে যে, কংগ্রেসের সমালোচনা কংগ্রেসীরা করিতে পারে।

কংগ্রেসে যখন অসহযোগনীতি প্রবর্ত্তিত হয় তখন ব্যবস্থাপক সভা বয়কট, ব্রিটিশ সরকারের আদালত বয়কট, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অনুমোদিত শিক্ষাপদ্ধতি বয়কট, সরকারী স্কুল কলেজ বয়কট এবং যে-সব স্কুল কলেজ সরকার-অনুমোদিত পরীক্ষা দেয়, তৎসমুদয় বয়কট করিতে হইবে এই ফতোআ জারি হয়, কিন্তু প্রথম বয়কটের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া স্বরাজ্য দল গঠিত হয়। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করিয়া আছেন বা তাহার সমর্থন এখনও করেন, এমন কংগ্রেসওআলা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

যে-সকল ব্যবহারজীবী এক সময় আদালতের সংস্রব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বয়স ও সামর্থ্য আছে এমন কম লোকই আবার নিজের পেশায় ফিরিয়া যান নাই। কেজো প্রতিবাদ ও সমালোচনা ইহা অপেক্ষা বেশী কি হইতে পারে? যে-সকল শিক্ষক ও অধ্যাপক স্কুল কলেজের চাকরী ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক নিজের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় আছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু অন্য যাঁহাদের নিজের পেশায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ ও বয়স ছিল, তাঁহারা ফিরিয়া গিয়াছেন। ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা কোন অশ্রদ্ধেয় কাজ করেন নাই। স্কুল-কলেজত্যাগী ছাত্রদের মধ্যে যাঁহাদের আবার ছাত্র হইবার বয়স ও সুযোগ ছিল তাঁহারা ছাত্র হইয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে অ-খুশি ও হাতছাড়া না-করিবার নিমিত্ত উহা "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" করেন, কিন্তু এরূপ দু-নৌকায় পা দেওয়ার (অথবা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নৌকাতেই পা দেওয়ার) সমালোচনা ও প্রতিবাদ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও বন্ধ করিতে পারেন নাই। প্রতিবাদ হইতে কংগ্রেস জাতীয় দলের উৎপত্তি হয়। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ বলিতে বাধ্য হন যে, কংগ্রেসওআলারাও স্বাজাতিকতার দিক্ হইতে যুক্তি দেখাইয়া সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে পারিবেন। বঙ্গে শুধু সমালোচনা ও প্রতিবাদ হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণ কংগ্রেসওআলা প্রবেশার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস জাতীয় দল নিজেদের প্রবেশার্থী দাঁড় করান এবং শেষোক্তদের প্রত্যেকে নির্ব্বাচিত হন।

জব্বলপুরে বাঙালীদিগকে প্রদত্ত সুভাষবাবুর পরামর্শ

এলাহাবাদের 'লীডার' কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদ-চিঠিতে দেখিলাম, সুভাষবাবু জব্বলপুরে বাঙালীদিগকে অন্যান্য উপদেশের মধ্যে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, অবাঙালীরা কেমন করিয়া বঙ্গের ব্যবসাবাণিজ্য ও কারখানাশিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা বাঙালীরা যেন ভাল করিয়া জানে, বুঝে ও তদনুসারে কাজ করে। ইহা সুপরামর্শ বটে; কিন্তু আমাদের মত বৃদ্ধদের

বা প্রৌঢ়দের জ্ঞানলাভ করিয়া নূতন পথে যাইবার সময় ও শক্তি নাই। ছাত্রদের এবং অন্য বালক ও যুবকদের সময় ও শক্তি আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সর্ব্বদা রাজনৈতিক গোলমালে মাতাইয়া রাখিলে তাহারা সাধারণ বিদ্যা বা ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিবে কখন ও কিরূপ মন লইয়া?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোক প্রকাশ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিম্নলিখিত চারিটি বিশেষ অধিবেশনের বিজ্ঞাপন পাইয়াছি; যথা—

(ক) ৩০এ আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥টা।

বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও সহকারী সভাপতি রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

(খ) ৩১এ আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥টা।

বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সহকারী সভাপতি রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

(গ) ২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬॥টা।

বিষয়—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

(ঘ) ৪ঠা শ্রাবণ, ২০এ জুলাই, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬॥টা।

বিষয়—পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু এবং পরিষদের ও রমেশভবন সমিতির ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

কাহারও কাহারও জন্য শোক প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে মনে হইতেছে। তাঁহাদের মৃত্যু বহুপূর্ব্বে হইয়াছে। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় সাহিত্যিক সভার অধিবেশন যথা-সময়ে না হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহারা গত গ্রীষ্মাবকাশের বহুপূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অন্য তিন জনের মত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়েরও কিছু পরিচয় দিলে ভাল হইত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় উপেক্ষণীয় হইলে তাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশের আয়োজন করিতেন না।

দেশী রাজ্যের রাজাদের মত পরিবর্ত্তন

বোম্বাইয়ে দেশী রাজ্যের নৃপতি ও মন্ত্রীদের ঘরোআ (informal) বৈঠকে স্থির হয় যে নৃপতিরা ফেডারেশ্যনে ঢুকিবেন না। তখন আমরা বলিয়াছিলাম তাঁহারা দরকষাকষি করিতেছেন, একটু লোভ দেখাইলেই বা একটু চাপ দিলেই তাঁহারা রাজী হইবেন।

এখন কাগজে খবর বাহির হইতেছে যে, অধিকাংশ দেশী নৃপতিই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে রাজী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের ও পঞ্জাবের নৃপতিদের, উড়িষ্যার নৃপতিদের এবং কোচিনের মহারাজার সম্মতির সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

বঙ্গের রাজবন্দীদের প্রায়োপবেশন

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুসারে উপবাস না-করিয়া এবং মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে দমদমার জেলের ও আলিপুরের জেলের আশী জন রাজনৈতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। মন্ত্রীরা এখন বলিতে পারেন না, "তোমরা মরিবার ভয় দেখাইতেছ? আমরা ভয় পাইয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব না"; কারণ তাহারা ত দীর্ঘকাল কোন ভয়ই দেখায় নাই। জেলের বাহিরে তাহাদের স্বদেশবাসীরাও তাহাদের মুক্তির জন্য এত দিন কোন আন্দোলন করে নাই। এত দিন মন্ত্রীরা তাহাদিগকে মুক্তি দিলে কেহ বলিতে পারিত না যে, মন্ত্রীরা ভয়ে বা চাপে খালাস দিলেন।

এই বন্দীদিগকে মুক্তি তাহাদের দণ্ডের মিয়াদের শেষে দিতেই হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন সুপরিবর্ত্তন হইলে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার রীতি বহু সভ্য দেশে আছে। মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই মনে করেন, দেশ স্বরাজ-সোপানের আর এক ধাপ উঠিয়াছে, সুতরাং তাহা

উপলক্ষ্য করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া চলিত। মানুষকে কষ্ট দেওয়া আইন অনুসারে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য নহে; উদ্দেশ্য, দণ্ডিত ব্যক্তির মতিগতি পরিবর্ত্তন। রাজনৈতিক বন্দীরা বলিয়াছে, হিংসাত্মক কার্য্যের ফলদায়কতায় তাহাদের আর বিশ্বাস নাই। তাহাদের উক্তি যে খালাস পাইবার নিমিত্ত একটা ফন্দী নয়, তাহার প্রমাণ তাহাদের যে সকল সঙ্গী, সহকর্ম্মী বা সমবিশ্বাসী খালাস পাইয়াছে তাহারা কেহ পুনর্ব্বার বিভীষিকা-পন্থা অবলম্বন করে নাই। যাহারা খালাস পাইবে তাহারা আপনাদের বিশ্বাসবশতঃই আর হিংসাত্মক রাজনৈতিক কাজ করিবে না। তদ্ভিন্ন, ইহাও তাহাদের জানা আছে যে, লোকমত এখন বিভীষিকা-পন্থার বিন্দুমাত্রও অনুকূল নহে।

"বসুমতী" বেকসুর খালাস

বর্দ্ধমানে কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষ্যে বঙ্গের মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করায় "বসুমতী"র সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হন। সুখের বিষয় ও সন্তোষের বিষয় তাঁহারা বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। হাইকোর্টের মতে মন্ত্রীরা যে গবর্মেণ্ট নহেন এবং গবর্ণরের অধীন রাজকর্ম্মচারী নহেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

লাহোরে একটা মোকদ্দমায় তথাকার হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রীদের সমালোচনা রাজদ্রোহ নহে। কলিকাতার হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের সমালোচনার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল; কিন্তু হাইকোর্টের মতে তাহা রাজদ্রোহ বিবেচিত হয় নাই।

তথাপি বঙ্গের মন্ত্রীদের চেতনা হয় নাই।

বসুমতী ত খালাস পাইলেন। কিন্তু মোকদ্দমা চালাইতে কাগজটির মালিকের অনেক খরচ হইয়াছে; তাহা অর্থদণ্ডস্বরূপ। অন্য দিকে মন্ত্রীরা মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন গবর্মেণ্টের পয়সায়, অর্থাৎ গরীব লোকদের শ্রমোৎপন্ন ধনের ট্যাক্সরূপে প্রদত্ত অংশ হইতে। তাঁহাদের গাঁটের একটা পয়সাও খরচ হইল না। এই রকম মোকদ্দমায় নির্দোষ বলিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ পাইলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।

মন্ত্রীরা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলে মঙ্গল।

কলিকাতায় নূতন ছাত্রীনিকেতন

নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা শাখার ছাত্রীনিবাস কমীটির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার রাসবিহারী এভিনিউ রাস্তার পি. ২৬১ সংখ্যক ভবনে একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৭শে আষাঢ় স্বর্গত আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায় ইহার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই ছাত্রীনিকেতনটি শহরের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। ইহাতে এখন কুড়িটি ছাত্রী থাকিতে পারিবে। তাহাদের খেলা ও চিত্তবিনোদন এবং তাহাদের দ্বারা লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা ইহাতে থাকিবে। অবশ্য, অধ্যয়নের সকল সুযোগ থাকিবেই। ছাত্রীনিবাসটি এক জন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক জন মেট্রন, এবং এক জন অবৈতনিক পরিদর্শিকার দ্বারা পরিচালিত হইবে। তদ্ভিন্ন ইহার কমীটির সদস্যেরা মধ্যে মধ্যে ইহা পরিদর্শন করিবেন।

উপার্জ্জনের নানা উপায় জ্ঞাপন

সরকারী চাকরীগুলির বৃহত্তর অংশ যোগ্যতার বিচার-নির্বিশেষে মুসলমানদের নিমিত্ত রাখিয়া বঙ্গের মন্ত্রীরা শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে রোজগারের অন্য অনেক উপায়ের বিষয় প্রেস-নোট প্রকাশ দ্বারা জানাইতেছেন। রোজগারের এই সকল উপায় অবলম্বন করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু কোন শ্রেণীর লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যে রকম কাজের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে সেই রকম অধিকাংশ কাজ হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্য নানা উপায় দেখাইয়া দেওয়ার মধ্যে (অনভিপ্রেত?) উপভোগ্য তামাশা আছে। তাহা হইলেও সুতা ও কাপড়ের কল, কাগজের কারখানা প্রভৃতিতে ঢুকিতে পারিলে রোজগার কিরূপ হইতে পারে, তাহা

জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রীরা অপকার্য্য করেন নাই, আবশ্যক কাজ করিতেছেন।

চীনে জাপানের কূট চা'ল

বিশাল চীনদেশের যতটা অংশে জাপানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে জাপানের তাঁবেদার চৈনিকের অধীনে একটা ফেডারেশ্যন (যুক্তরাষ্ট্র) স্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত জাপান করিতেছে। ইহা চালু করিতে পারিলে জাপান, তথাকার কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যাদি হইতে যে আয় হইবে, তাহার দ্বারা ক্রমশঃ চীনের অন্যান্য অংশও দখল করিতে পারিবে। ইহা ভারতবর্ষে অনুসৃত ব্রিটিশ চা'লের মত। ইংরেজরা প্রথমে ভারতবর্ষের যে-যে অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তাহারই জনবল ও অর্থবলের সাহায্যে অন্যান্য অংশ ক্রমে ক্রমে দখল করিয়াছিল।

কিন্তু চীনে এই কৌশল সফল হইবে কি ?

চিয়াং-কাই-শেকের ঘোষণা

চীন-জাপানের যুদ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে ৭ই জুলাই আরম্ভ হয়। তৃতীয় বৎসরের আরম্ভে চীনের প্রধান সেনাপতি চিয়াং-কাই-শেক কোন মতেই জাপানের বশ্যতা স্বীকার না করিবার প্রতিজ্ঞা, জাপান কর্তৃক অনধিকৃত প্রদেশ-সমূহে চৈনিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিজ্ঞা, এবং যে-যে প্রদেশ জাপানের হস্তগত হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। এই প্রতিজ্ঞা বৃথা আস্ফালন নহে। যুদ্ধে চীনের লক্ষ লক্ষ লোক হত এবং তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক আহত হইয়াছে, বহু নারীর চরম দুর্গতি হইয়াছে, বহু নগর ও গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং অপরিমেয় সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও চীনের লোকদের সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং দেশের সম্মান রক্ষায় উৎসাহ কমে নাই। অতএব চিয়াং-কাই-শেকের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে, বিশ্বাস করা কঠিন নহে।

—

ব্রিটেনের

আমরা জাতি হিসাবে কোন বীরত্বের দাবী এখন করিতে পারি না বলিয়া অপরের পৌরুষের পরীক্ষক আমরা হইতে চাই না। কিন্তু যাহারা পৌরুষের দাবী করে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহারের বৈপরীত্য লক্ষ্য না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। পঞ্জাবে ২০ বৎসর আগে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোকের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা হয় (সেরূপ ব্যবহার নিন্দনীয়), কিন্তু কেহ তাহাকে নগ্ন করিয়া বেইজ্জত করে নাই। ইহার শাস্তি ও প্রতিশোধ স্বরূপ হুকুম হয় যে, যে রাস্তা ও গলিতে ইংরেজ স্ত্রীলোকটির প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা দিয়া যে-কোন ভারতীয় ব্যক্তি যাইতে চাহিবে, তাহাকে কেঁচোর মত বুকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এই হুকুম তামিল অগণিত লোককে করিতে হইয়াছিল। এক জনেরও তাহা করা উচিত ছিল না; অনেকে যে তাহা করিয়াছিল, ইহা জাতীয় কলঙ্ক। কিন্তু সে কথা এখন হইতেছে না।

চীন-জাপান যুদ্ধের আরম্ভের পর বহু ইংরেজ নানা প্রকারে জাপানের দ্বারা অপমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছে। চরম অপমান হইয়াছে তিয়েন্তসিনে। তথায় একাধিক ইংরেজ নারীকে জাপানী সরকারী লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে বিবস্ত্র করিয়া তাহারা কোথাও কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে কিনা তল্লাস করাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিশোধ বা প্রতিকার ইংরেজরা করিতে পারে নাই। কোন জাপানীকে এরূপ ব্যবহারের জন্য কেঁচোর মত বুকে হাঁটিতে হইবে, এমন কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদের মনে আসে নাই।

আমরা বলিতেছি না যে, এ সকলের জন্য জাপানের সহিত একটা মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল। কি করা উচিত ছিল তাহার পাঁতি দিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু আমরা ইহাই লক্ষ্য করিতেছি যে, অন্যায় করিল জাপান, অথচ সে-বিষয়ে আলোচনা করিবার নিমিত্ত ব্রিটেনের প্রতিনিধিকে ছুটিতে হইতেছে জাপানেরই রাজধানী টোকিওতে! আসামীর বিচার ত হইবেই না, কেবল আলোচনা হইবে, এবং তাহা হইবে আসামীর

বাড়ীতে তাহার অনুগ্রহে! ব্রিটেনের ন্যায়বত্তা, ন্যায়কারিতা, পৌরুষ ও শক্তির খ্যাতি ও প্রভাব এরূপ নাই, যে, সে জাপানকে আসামী করিয়া কোন নিরপেক্ষ সালিসের নিকট বা সালিসী-সভায় হাজির করে।

—

পাবনায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার

পাবনা জেলায় হিন্দুদের দেবমন্দির কলুষিত, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রতিমা ভগ্ন বা অপহৃত যে হইয়া আসিতেছে, এবং এরূপ ঘটনা যে বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, তাহা মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দিনের নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু প্রতিকার কি হইতেছে?

তিনি যে এক মুসলমান "তর্কবাগীশে"র কথা কিছুই জানেন না, ইহা একটি চমৎকার তথ্য।

—

হায়দরাবাদ জেলে সত্যাগ্রহীর মৃত্যু

এ পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্যের জেলে মোট ১৪ জন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃত প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।

—

হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ

আর্য্যসমাজীরা ও হিন্দুমহাসভার সভ্যেরা হায়দরাবাদে যে সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের বা নিজামের বা নিজাম রাজবংশের বিরুদ্ধে নহে; তাহা নিজামের রাজ্যে হিন্দুদের সেই সব সাধারণ অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত যাহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশ ভারতে বিনা চেষ্টায় ভোগ করিয়া থাকে। অথচ এই প্রকার সত্যাগ্রহ করিবার "অপরাধে" বহু নির্দোষ ব্যক্তির —শ্রীযুক্ত ভোপৎকারের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও দেশভক্ত নেতারও—এক বৎসর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ড হইতেছে।

সর্ব্বসাধারণের পরিচিত ভারতবর্ষের এক শত শিক্ষিত ব্যক্তি বড়লাটের নিকট একটি আবেদনে তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, তিনি যেন হায়দরাবাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও তাহার পর প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের পণ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে জমিসংক্রান্ত নূতন আইন হইয়াছে, তাহা তথাকার এসিয়ানদের স্বার্থহানিকর ও অসম্মানজনক। এসিয়ানদের মধ্যে ভারতীয়েরাই সংখ্যায় বেশী। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা করিবার নিমিত্ত ও তাহাদের বিতাড়নের নিমিত্তই এই আইন প্রণীত হইয়াছে। ভারতীয়েরা বরাবর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে কোন ফল না-হওয়ায় তাঁহারা ১লা আগষ্ট হইতে সত্যাগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ন্যায়কারী এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেত ও অশ্বেতদের সম্বন্ধে সমদর্শী হইলে অবস্থা এরূপ হইত না। অবস্থার উন্নতি পূর্ণ স্বরাজ লাভ দ্বারা হইতে পারে।

—

সিংহল হইতে ভারতীয় বিতাড়ন

অনেক হাজার ভারতীয় শ্রমিক সিংহলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের পরিশ্রমে যে-ধন উৎপন্ন হয়, তাহার বৃহত্তর অংশ সিংহলীরাই পায়। তথাপি ভারতীয়দিগকে এই উদ্দেশ্যে বা ওজুহাতে সিংহল হইতে তাড়াইবার সংকল্প হইয়াছে যে, তাহারা সেখানে না থাকিলে বেকার সিংহলী শ্রমিকেরা তাহাদের স্থানে নিযুক্ত হইতে পারিবে। শ্রমশক্তি, মজুরির পরিমাণ, ও শ্রমে প্রবৃত্তি যদি ভারতীয় ও সিংহলীদের সমান হয়, তাহা হইলে এত হাজার ভারতীয় সিংহলে স্থান পাইল কিরূপে?

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি সিংহলের ভারতীয় বিতাড়ন সংকল্পের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ কোন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিদের প্রতিবাদ হইলে তাহার জোর অধিক হইত। সিংহল গবর্মেণ্টের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার নিমিত্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সিংহল গিয়াছেন।

হেভ্‌লক এলিস্

যৌন মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রধান গবেষক ও প্রামাণিক লেখক হেভ্‌লক এলিসের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক দিকে বৈজ্ঞানিক আবার অন্য দিকে মরমী (mystic) ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী হইয়াছিল। তিনি প্রধানতঃ যে গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত, ইংলণ্ডে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা ও প্রকাশে বাধা হওয়ায় তিনি তাহা আমেরিকায় প্রকাশ করেন।

—

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ (Assembly) কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল ব্যবস্থাপক সভায় (Councilএ) যে আকারে পাঠান তাহাতে সভা এই পরিবর্ত্তন করেন যে, মিউনিসিপালিটিতে মনোনীত সদস্য আট জন না হইয়া চারি জন হইবে। এক জন মুসলমান সদস্যের প্রস্তাবে এই পরিবর্ত্তন হয়। পরিবর্ত্তিত বিলটা আবার পরিষদে আসে। পরিষদ পরিবর্ত্তনটা নাকচ করিয়া পূর্ব্বেকার আকারে বিলটা ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইয়া দেন। এবার ব্যবস্থাপক সভা নিজের মতে স্থির থাকিয়া নিজের সম্মান রক্ষা করেন নাই, পরিষদের হুকুম তামিল করিয়াছেন। যে মুসলমান ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সভায় পরিবর্ত্তন হয়, তিনি নিজ মতে স্থির থাকিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক হিন্দু ও মুসলমান সদস্য ডিগবাজি খাইয়াছেন। তপসিলভুক্ত জাতিরা মনোনয়ন (nomination) চান নাই, যুক্ত নির্ব্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা চান নাই, তাঁহাদিগকে তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

বিলটাতে গবর্ণর সম্মতি দিলেই উহা আইনে পরিণত হইবে। তাঁহার সম্মতি নিশ্চিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে গণতান্ত্রিকতা নষ্ট হইতে, হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত প্রভাব ও কার্য্যকারিতা প্রায় লুপ্ত হইতে এবং ইংরেজদের ও অ-বাঙালী মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইতে চলিল।

সুভাষ বাবু বলিয়াছিলেন, মিউনিসিপালিটিতে গণতান্ত্রিকতা বিলোপের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়িবে। তিনি এখন ব্যাপকতর ও গুরুতর সংগ্রামে ব্যাপৃত। এখন তিনি কলিকাতার নিমিত্ত কিছু করিতে পারিবেন কি?

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের মিউনিসিপাল বিল সংখ্যা

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের মিউনিসিপাল বিল সংখ্যাটি দেখিতে যেমন সুদর্শন হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিও সেইরূপ কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে ও বিলটা সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্যের ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়াছে। কলিকাতার (এবং বাংলা দেশেরও) যে এখন শনির দশা চলিতেছে, তাহার দ্যোতক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পিত প্রচ্ছদপট-চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে।

—

সুরা-নিষেধ নীতির সুভাষ বাবুর সমালোচনা

কংগ্রেস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ক্রমশঃ সুরার প্রস্তুতি, বিক্রয় ও পান বন্ধ করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া ঠিক কাজ করিয়াছেন। তদনুসারে মান্দ্রাজ গবর্ন্মেণ্টের ন্যায় বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট সুরা নিষিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুভাষ বাবু তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া ঠিক করেন নাই। —

ইয়োরোপের কথা

ইয়োরোপের কথা আমরা কিছুই লিখিলাম না। মাসিক কাগজে টাটকা কি সংবাদ দিতে পারি? ডানজিগ লইয়া যে-কোন সময় জার্ম্মেনী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে। মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে জাপানে ও রাশিয়ায় বড় যুদ্ধের আখড়াই দিবার মত লড়াই চলিতেছে। রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কথাবার্ত্তার কোন চরম পরিণতি হয় নাই। জার্ম্মেনী ও ইটালীর দম্ভ ও দর্প বাড়িয়া চলিতেছে। —

প্যালেষ্টাইন

প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীর বিরোধের অবসানের এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

—

সীরিয়া

ফ্রান্স সীরিয়াকে স্বাধীন হইতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু অঙ্গীকার রক্ষার কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তজ্জন্য সীরিয়ায় বিক্ষোভ হইতেছে।

সালোঁর প্রদর্শনী

ব্রিটেনে যেমন রয়াল অ্যাকাডেমি, ফ্রান্সে তেমনি ল্য সালোঁ। রয়াল অ্যাকাডেমিতে সমাদর পাইলে ব্রিটিশ শিল্পীমাত্রই আনন্দিত হন; সালোঁর সমাদর লাভ করিলেও তেমনি ফ্রান্সের শিল্পীরা সুখী হন।

তাই বলিয়া এমন কথা সত্য নয় যে, সালোঁর আধিপত্য শিল্পীমাত্রই মানিয়া লন। বরং প্রথিতযশা অনেক শিল্পীই উহার আওতার বাহিরে পড়িয়া থাকেন—কেহ বা নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জনের ভয়ে উহার ছায়া এড়াইয়া চলেন, আর কেহ বা উগ্র বৈশিষ্ট্যের জন্য উহার সমাদর লাভে বঞ্চিত থাকেন। মোটের উপর, সালোঁ সমস্যায় পড়ে এই বৈশিষ্ট্যবান্ শিল্পীদের লইয়া। তাহার কারণ, সালোঁর মত প্রতিষ্ঠান মাত্রই একটু রক্ষণশীল—ব্রিটিশ রয়াল অ্যাকাডেমি, বা ফ্রান্সেরই মহাসম্মানিত উচ্চতম প্রতিষ্ঠান যে অ্যাকাডেমি তাহাও এইরূপ স্থিরতাধর্মী। বহুদিনের ঐতিহ্য থাকে ইহাদের পিছনে,—অনেক পূর্ব্বগামী কৃতীদের কীর্ত্তিতে তাহাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ। নূতন বা নূতনতমের প্রতি সহমর্ম্মিতা পোষণ করা এই সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নয়—কারণ, অনেক সময়েই নূতন যাহা তাহা অর্ব্বাচীন, আর প্রবীণদের চক্ষে উহার রীতিনীতি অর্ব্বাচীনতা। পুরাতন প্রতিষ্ঠান আপনার প্রাচীন পুঁজির গৌরবে তাই নবাঙ্কুরিত রূপ ও চিন্তাকে গণনার মধ্যে আনিতে চায় না, সুপরিচিত নহে বলিয়াই উহা তাহার নিকট সুশোভন বলিয়াও মনে হয় না।

কিন্তু বৈশিষ্ট্য তো পরিচিত রূপ গ্রহণ করিয়া আপনার পরিচয় দিতে চায় না—অনেক সময়েই তাহার রূপ থাকে অভিনব। দেখিয়া দেখিয়া সে রূপ মানুষ যখন চিনিয়া লয়, তখন সে আর বৈশিষ্ট্যও প্রায় থাকে না, হইয়া উঠে ঐতিহ্য। এমনি করিয়াই এক যুগে যাহা অভিনব ও অপরিচিত ছিল তাহা দুই-এক যুগ পরে আবার ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্বতন ধারাকে সে করে পূর্ণতর, কিন্তু নূতনতর বৈশিষ্ট্যকে সেই আবার করে অস্বীকার!

সাঁলোও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী, 'মানসিক অরাজকতা'র প্রশ্রয় না দিতে সে বদ্ধপরিকর— কারণ, সত্যকার বৈশিষ্ট্য সুদুর্লভ, অথচ বিশৃঙ্খলার মত সুলভ আর কি আছে? যে-কোন বিশৃঙ্খলাই আবার বলিবে,—বৈশিষ্ট্যের দাবী তাহার, সে বাঁধাপথে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া চলিবে কেন? সালোঁর মত প্রতিষ্ঠান জানে—সবাই মোনে, পিকাসো, সেজান নয়; অথচ যে-কোন শিল্পী আপনাকে মনে করে উহাঁদের প্রায় সমতুল্য। তাই, নূতনত্ব জিনিসটাতে সালোঁ অবিশ্বাসী—কারণ সে অনেক

বিধবা — শিল্পী ওদেৎ পোডের

দেখিয়া বুঝিয়াছে, নূতনত্ব মানেই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই উহা অক্ষমতার লক্ষণ—হয়ত পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতিরও ফল; অনেক ক্ষেত্রে ব্যাধির চিহ্ন।

অথচ মুস্কিল এই, নূতনত্ব প্রতিভারও ধর্ম,—সালোঁর মত প্রতিষ্ঠান নূতন মাত্রকেই নূতন বলিয়া নাকচ করিতে গিয়া প্রতিভাকেও আবিষ্কার করিতে পারে না—আবিষ্কার কেন, চিনিতেই পারে না; আর চিনিলেও নিজের অভিমান-গর্ব্বে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে চায় না। এই হয় সালোঁর রক্ষণশীলতার ফল—তাই ফরাসী অ্যাকাডেমির মত সালোঁ অনেক উগ্র শিল্পী ও শিল্পরসিকের শ্লেষ ভোগ করে—কিন্তু যখন বৈশিষ্ট্য আপন স্থান পাকা করিয়া লইতে থাকে তখন সেই সালোঁও আবার তাহাকে হাত বাড়াইয়া নিজ বক্ষে গ্রহণ করে, আর চিরদিনের শিল্পরসিকদের স্থায়ী তীর্থক্ষেত্র হিসাবে সালোঁর আসনও অটুট থাকিয়া যায়।

রয়াল অ্যাকাডেমির মত সালোঁর শিল্পদৃষ্টিকেও বলা হয় "অফিসিয়াল আর্ট"। ইহার বিরুদ্ধে যে বৈশিষ্ট্যবাদীরা, নূতনেরা, মাথা তুলিয়া দাঁড়ান, তাঁহারা বাধ্য হইয়া সালোঁর প্রদর্শনীকে উপহাস করেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র প্রদর্শনী খুলিয়া শিল্পরসিকের রসবোধকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই সব সমিতির পরেও আবার নূতনতরেরা আসেন, তাঁহারা আবার আর এক নূতন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিল্পরসিকদের ভাবাইয়া তোলেন। মোটের উপর এই ভাবেই শিল্পের পরিচয় ও পরীক্ষা চলে—সকলেই জানে, সালোঁ প্রতিভা আবিষ্কারে কুণ্ঠিত; কিন্তু সকলেই বুঝে, প্রতিভা সালোঁতে স্থান লাভ করিবেই। সালোঁর এই দৃষ্টি-পরিবর্ত্তনের কাজে অন্যান্য সমিতি ও তাহাদের প্রদর্শনী অনেকটা সহায়তা করে—এইরূপ একটি উল্লেখযোগ্য সমিতি "ফরাসী শিল্পী-সমিতি," "সোশিয়েতে দ্যজ্ আর্তিস্ত্ ফ্রাসেঁ।" আজকালকার সালোঁর প্রদর্শনী-গৃহে উপস্থিত হইলে বুঝা যায়, সালোঁ এদিক হইতে কতটা সচল ও সহিষ্ণু। চিরন্তন রূপভঙ্গী তো রহিয়াছেই, কিন্তু তাহার মধ্যেও নূতনের ছাপ কেমন করিয়া লাগে, আবার চিরদিনের শিল্পসংস্কার ছাড়িয়া কি করিয়া নূতন নূতন রূপরীতি রূপভঙ্গী গড়িয়া উঠে, তাহাও এই সব প্রদর্শনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সালোঁর এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীতেও ইহার প্রমাণ মিলিবে। অবশ্য যাঁহারা বহুদিন এই সব প্রদর্শনীতে আপনাদের আসন করিয়া লইয়াছেন তাঁহারাও আছেন।

এ যুগে রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনযাত্রায় সর্ব্বত্র বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। তাহার সহিত যে শিল্পরীতিতেও বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা অস্বাভাবিক নয়। দেখিতে হইবে, এই রীতি-পরিবর্ত্তনে, এই রূপান্তরে, সমস্ত সাময়িক লক্ষণের তলায়ও, সেই শিল্প-সত্য সঞ্চিত হইয়াছে কিনা যাহা না-থাকিলে শিল্প যথার্থ শিল্প হইতে পারে না। আধুনিক শিল্প মানুষকে চমকিত করিয়া যখন সহজে জিতিতে চায়, তখন প্রয়োজন তাহাকে এই শিল্প-সত্যের নিকষে যাচাই করিয়া লওয়া, পূর্ব্ব ঐতিহ্যের মধ্যে যে মূলসত্য রহিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। সালোঁর প্রদর্শনী সেই কর্ত্তব্যটিই সুন্দররূপে সাধন করে।
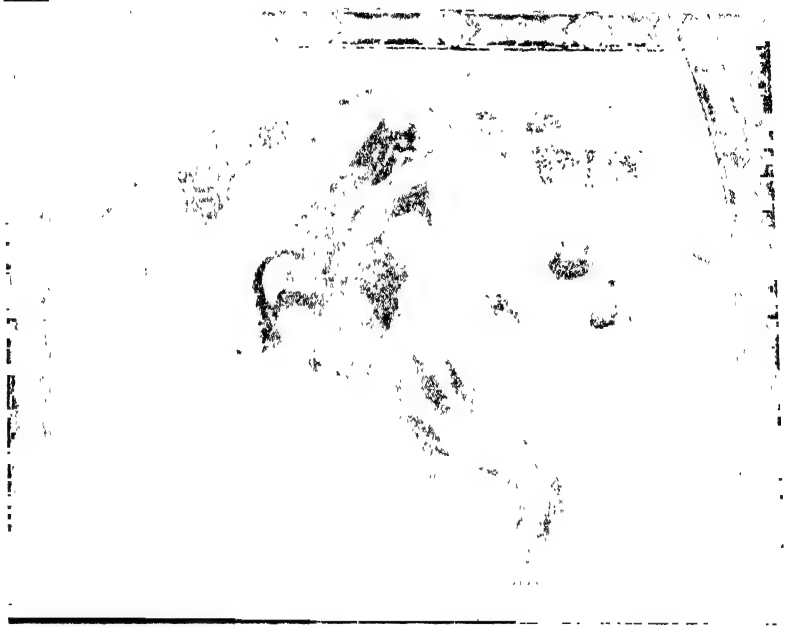
ক্রুশ হইতে অবতরণ — শিল্পী ও. গিউওনে

শ্রীগোপাল হালদার

জাপানের প্রাচীন বর্ম্ম

জাপানে প্রাচীনকালে যোদ্ধারা আত্মরক্ষার জন্ত যে বর্ম্ম পরিধান করিতেন সেগুলি শত্রুর তরবারি বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার যেমন উপযোগী ছিল তেমনি তাহার কারুকৌশলও ছিল অপূর্ব্ব; বর্ত্তমান যুগে শিল্পনিদর্শনরূপেই সেগুলি আদৃত। লোহা ও অন্যান্য ধাতু, চামড়া, সুতা প্রভৃতি এই বর্ম্ম নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। চীনদেশ হইতে এই বর্ম্ম-নির্ম্মাণ-প্রণালী জাপান গ্রহণ করিয়াছিল। আত্মরক্ষাব উপায়ের সহিত সৌন্দর্য্যবোধের এমন অপরূপ সমাবেশ সত্যই আশ্চর্য্যকর। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে অনেক সময় জাপানের সামুরাই যোদ্ধা এই সকল বর্ম্ম শিণ্টো মন্দিরে উৎসর্গ করিয়া জয়ের কামনা করিতেন; পরে এই মন্দিরে বর্ম্মগুলি সযত্নে রক্ষিত হইত; এই ভাবেই অনেক প্রাচীন বর্ম্মের নিদর্শন বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে।

জাপানের প্রাচীন কারুকার্য্যময় বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ

নাৎসী-বিরোধীদের প্রচার-কৌশল

নাৎসী-জার্ম্মানীতে সরকারী নীতির প্রতিবাদের কোন অবসর নাই, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চিন্তা ও বাচনের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রচারকার্য্য গোপনে চলিতেছে কি না সেদিকেও জার্ম্মান পুলিসের কড়া নজর আছে—এজন্য জার্ম্মানীতে গুপ্তপুলিস বিভাগ ছাড়া আরও অন্ততঃ পাঁচটি পুলিস বিভাগ আছে; সরকারী নীতির সম্বন্ধে গোপনেও সমালোচনা করিয়া বা প্রচারপত্রী মুদ্রণ ও বিতরণ করিয়া, ধরা পড়িলে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন প্রচারের অপরাধে ১৯৩৭ সালে ২৫ জনের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে।

এই সকল কারণে, নাৎসী-বিরোধী যাহারা আছে, নির্বিঘ্নে কাজ চালাইবার জন্য তাহাদের নিত্য নব নব উপায় ও কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়; প্রচারপত্রী পুস্তিকা ইত্যাদি এমনভাবে ছাপা হয় যাহাতে সহসা দেখিয়া মনে কোন সন্দেহ না হয়, সাধারণ কোন বই বলিয়া মনে হয়। যেমন, বার্লিনে ওলিম্পিক ক্রীড়ার সময় কতকগুলি পুস্তিকা বিলি হইল, বাহির হইতে সেগুলি ওলিম্পিক ক্রীড়ার সরকারী গাইড-বুকের মত অবিকল দেখিতে; কিন্তু তাহার ভিতরে ছিল জার্ম্মানীর কারখানার ও বন্দীশিবিরের দুর্দ্দশার কাহিনী। সরকারী পুস্তক-পুস্তিকার মলাট ইত্যাদি অবিকল নকল করিয়া ভিতরে সরকারী নীতির সমালোচনা ছাপাইয়া বিতরণ বহু ক্ষেত্রে হইয়াছে। এক বার কারখানা সম্বন্ধে সরকারী

রিপোর্টের মলাট নকল করিয়া তাহার মধ্যে জার্মানীর কারখানায় শ্রমিকদের দুঃখদুর্দ্দশার বিবরণ প্রচার করা হইয়াছিল।

বাহির হইতে দেখিতে নির্দোষ চেহারার পুস্তিকা-পত্রী ইত্যাদির মধ্যে নাৎসীবিরোধী আলোচনা ভরিয়া দিয়া পুলিসের চোখে ধুলা দিয়া তাহা অনেকবার স্বচ্ছন্দে বিতরণ করা হইয়াছে। কোন পুস্তিকার মলাট হয়ত কোন প্রসাধন-দ্রব্য প্রস্তুতের

প্রাচীন বর্ম্মভূষিত জাপানী যোদ্ধা

কারখানার বিজ্ঞাপনের মত দেখিতে, মলাটের উপর প্রসাধনরতা সুন্দরীর চেহারা, কাহারও কোন সন্দেহ হইবার উপায় নাই। মলাটটি উল্টাইলেই হয়ত চোখে পড়িবে, সরকারের কোন নীতি বা কাজের সম্বন্ধে কঠোর নিন্দা ও আক্রমণ। একটা খাম, বাহির হইতে দেখিয়া সেটাকে ফটোগ্রাফিক দ্রব্য প্রস্তুতের কোম্পানীর ব্যবহৃত খাম ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া কখনও মনে হইবে না। ভিতরেও যে ফটোগ্রাফির কাগজপত্র ছাড়া অন্য কিছু থাকিতে পারে তাহা কল্পনায়ও আসে না। কিন্তু খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে আছে নাৎসী-বিরোধী নানাবিধ প্রচারপত্রী। এইরূপে সুপরিচিত পত্রিকার মলাটের মধ্যে, ডাকটিকিট-সংগ্রহকারীদের জন্য বিক্রীত ডাকটিকিটে পূর্ণ খামের মধ্যে, নানা উপায়ে প্রচারপত্রী বিলি হয়।

পুস্তিকা পত্রী ইত্যাদিই যে নাৎসী-বিরোধীদের প্রচারের একমাত্র উপায়, তাহা নয়। হয়ত কোন বিখ্যাত গায়কের গান শুনিবার জন্য রেকর্ড বাজানো গেল, প্রথম অল্পক্ষণ গান চলিল, তার পরে আরম্ভ হইল জার্মানীকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা। পথে চলিতে হয়ত দেখিলেন, টাকা বা পয়সার মত কি একটা পড়িয়া আছে; কুড়াইয়া লইয়া দেখা গেল, দু-এক কথায়
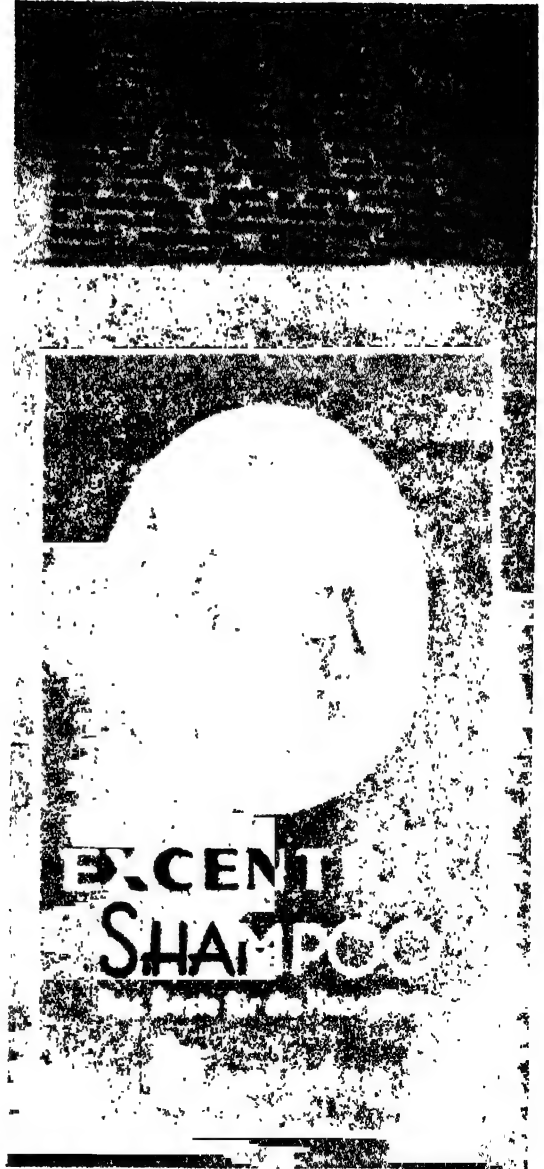
প্রসাধন-দ্রব্যের প্যাকেটে গোপন প্রচারপত্রী।

একটি প্রচারপত্রীর তৃতীয় পৃষ্ঠার এক অংশ—দক্ষিণে সরকার-বিরোধী প্রবন্ধের অংশ মুদ্রিত দেখা যাইতেছে। প্রচারপত্রীটির মলাট দেখিলে ভ্রমণকারীদের জন্য অভিপ্রেত চিত্র-পুস্তিকা বলিয়া মনে হয়; অন্যান্য পৃষ্ঠা ও তৃতীয় পৃষ্ঠার এক অংশেও জার্ম্মানীর নানা দ্রষ্টব্য স্থানের ছবি ও ম্যাপ—তৃতীয় পৃষ্ঠা খুলিলে ইহা আসলে কি তাহা বুঝা যায়।

তাহাতে নাৎসী-বিরোধীদের দাবির কথা মুদ্রিত আছে, লেখা আছে, "শান্তি চাই, আহার চাই, মুক্তি চাই"।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আকাশচারী মাইন্

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই যুদ্ধে এরোপ্লেনের ব্যবহার সুরু হয়। সৈন্যগণের হাতাহাতি যুদ্ধ অথবা ডাঙার উপর গোলাবারুদের যুদ্ধ হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর হইবেই না। পৃথিবীর সকল সভ্য রাষ্ট্রই এরোপ্লেনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সমরসম্ভারে এরোপ্লেনের সংখ্যা বাড়াইতেছে।

শত্রুপক্ষের বোমানিক্ষেপকারী আকাশযান ধ্বংসের জন্য কামানের ব্যবহার আছে, কিন্তু তাহা যথোচিত কার্য্যকরী নয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের পথে অনেক সময় মাটির মধ্যে "মাইন্" পুঁতিয়া রাখা হয়, যাহাতে সেই জমির উপর সৈন্যদলের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণের ফলে দলকে দল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। সমুদ্রে রণতরী ধ্বংস করার জন্যও এই ধরণের উপায় অবলম্বন করা হয়। শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আকাশচারী মাইনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। বেলুনের সাহায্যে ইস্পাতের

আকাশচারী মাইন

জালে তৈয়ারী বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ বালতির মত চেহারার মাইন আকাশে ঝুলাইয়া রাখা হয়। অল্প কয়েকটি এরকম মাইন রাখিয়া কোনো লাভ নাই, কারণ এরোপ্লেনের পক্ষে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়া অত্যন্ত সোজা। কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলি মাইন যদি বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেনের আগমন পথে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রচণ্ডবেগের উপর ইহাদের সংঘর্ষে এক মুহূর্ত্তে এরোপ্লেন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

আর এক ধরণের মাইন তৈয়ারী করা হইতেছে, যাহা আকাশে কয়েক ঘণ্টা থাকিবার পর কোনো এরোপ্লেনের সহিত সংঘর্ষ না হইলে আপনিই ফাটিয়া যাইবে। এই জাতীয় মাইনের নির্ম্মাণ-প্রণালী গোপন রাখা হইয়াছে।

রাত্রিকালে বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেনের আগমন রোধ করিতে এই আকাশচারী বিমান সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইবে। অন্ধকার রাত্রিতে কখনও আকাশের কোন্ ফাঁকে সারিসারি ইহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই আতঙ্ক হয়ত ক্রমে ক্রমে এই ধরণের যুদ্ধের পরিমাণ কমাইয়া আনিবে, এবং কালে কালে হয়ত বন্ধ করিয়াও দিতে পারে। অন্ততঃ নির্ম্মাতারা এই আশা করিতেছেন।

এই আকাশচারী মাইনের আবিষ্কর্ত্তা মেজর এচ. জে. মুইর।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

দেশ-বিদেশের কথা

"চীনের ঘটনা"

শ্রী গোপাল হালদার

গত ৭ই জুলাই (২২শে আষাঢ়) চীন-যুদ্ধের আর একটি বৎসর সুরু হইল—এইটি তৃতীয় বৎসর। চীন ও জাপান উভয়েই আবার ঘোষণা করিয়াছে—একের পরাজয় সম্পূর্ণ না হইলে অপরে থামিবে না। চীনে মার্শ্যাল চিয়াং কাই-শেক আপনার ঘোষণাবাণীতে বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, চীনের ব্যাপারে জাতি-সঙ্ঘের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরিত সন্ধি-পত্র অবহেলা করিয়া 'অখণ্ড চীন'কে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, কেলগ চুক্তির প্রতিশ্রুতি উড়াইয়া দিয়া—আলোচনার সহায়ে নয়, অস্ত্রের সহায়ে আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে বদ্ধপরিকর;—পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা কি নীরবে ইহা দেখিবে? চিয়াং দেশবাসীকেও সাবধান করিয়াছেন—কুমিং তাং সরকারের বিতাড়িত সদস্য ওয়াং চিং-ওয়েই'র জাপানের সহিত মিলন-প্রয়াসের বিরুদ্ধে, কুমিং তাং-এর ও চীন-স্বাধীনতার প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্কে। আর চিয়াং জাপানের অধিবাসীদের নিকট নিবেদন করিয়াছেন—চীনের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ ও অভিযান পরিত্যাগ করিবার জন্য। এদিকে জাপানে এবং জাপান-অধিকৃত চীনের সর্ব্বত্র এই দিনটিতে জাপানী বিজয় ও জাপানী লক্ষ্যের জয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইল—সুদূর প্রাচ্যে 'নয়া ব্যবস্থা'র প্রবর্ত্তন হইতেছে। জাপ প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকদের এক সভায় বলেন "তিয়েনৎসিনে ব্রিটিশ এলাকা অবরোধ লইয়া যে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, আসন্ন ইঙ্গ-জাপানী আলোচনা তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু জাপান পূর্ব্ব-এসিয়ায় যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের ভিত্তিতে আলোচনা চালানো না হইলে সমস্যার সমাধান কোনদিনই সম্ভব হইবে না। ব্রিটেন যদি জাপানের আসল উদ্দেশ্য ও তাহার দাবী স্বীকার না করে, তাহা হইলে জাপানের আলোচনা ভাঙিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।"

জাপানের সমর-সচিব মিঃ ইতাগাকি ঘোষণা করেন, "চিয়াং কাই-শেকের গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতা ব্যর্থ করিবার জন্ত তৃতীয় পক্ষের জাপ-বিরোধী ও চিয়াং কাই-শেকের সমর্থক নীতি ধ্বংস করা অপরিহার্য্য।"

তৃতীয় পর্ব্ব

চীন-যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ এই ভাবে আরম্ভ হইল। এই তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বেই অবশ্য চীন-যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্ব সুরু হইয়াছে। প্রথম পর্ব্ব গিয়াছে ১৯৩৭ সালের জুলাইয়ের যুদ্ধারম্ভ হইতে সে-বৎসরের ডিসেম্বরে চীন-রাজধানী নানকিং-এর পতন পর্যন্ত। পিইপিং-এর ৭ই জুলাই তারিখের মার্কোপলো সেতুর স্থানীয় সংঘর্ষ হইতে তাহার উৎপত্তি। সেই প্রথম পর্ব্বে জাপানের সম্মুখে চীন প্রায় দাঁড়াইতেই পারে নাই—একবার শুধু সাংহাইতে প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস চলিয়াছিল। সাংহাইয়ের পতন ছিল অনিবার্য্য, চীনেরও তাহাতে সংশয় ছিল না। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া চীন সেখানে যে বলক্ষয় করিয়াছে তাহা তাহার পক্ষে সুকৌশল হয় নাই। ইহার পরে যদি জাপান এমনি করিয়া যুদ্ধ করিবার অবসর পাইত তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্পিত কালের মধ্যেই চীন-যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত। নান্‌কিং-এর পতনের পরে জাপান অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্টতায় কিছু দিন কাটাইল—জাপানী সৈন্যদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, আর জাপানের আশা ছিল, পরাজিত চীন এবার জয়াশা হারাইয়া দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কিন্তু সে-আশা সফল হইল না—বরং অবসরকালে চীন-সৈন্যেরা পরাজয়ের শ্রান্তি ও নৈরাশ্য অপনোদন করিয়া নূতন রণকৌশল গ্রহণে উদ্যোগী হইল আর চীন-জাতি বিপদের সম্মুখে পড়িয়া দৃঢ় ঐক্যবন্ধনে একত্র হইয়া দাঁড়াইল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে—চিয়াংও এতদিনের সাম্যবাদী-সংহারযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই সঙ্কটদিনে সাম্যবাদীদিগকে সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ এই ভাবে—তার পরে শুচাউ অভিযান, তাইএরচোয়াংএ জাপানের একটি শোচনীয় পরাজয়, পীত নদীর বাঁধ ভাঙিয়া আর একবার জাপানের গতিরোধ, ইয়াংসি উপত্যকায় জাপানের আবির্ভাব—আর শেষে জাপানের কাণ্টন ও হাঙ্কাউ অধিকার। প্রায় এক বৎসর এই ভাবে কাটে—দ্বিতীয় পর্ব্ব শেষ হয়।

আরম্ভ হইল তৃতীয় পর্ব্ব—জাপানের এই পর্ব্বে উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—চীনের শাস্তি বিধান,—জাপানী-বিরোধ চীন হইতে উন্মূলিত করিয়া চীনে জাপানের সঙ্কল্পিত 'নয়া ব্যবস্থা' প্রবর্ত্তিত করা। ইহা সময়সাপেক্ষ—হয়ত দুই-এক বৎসরের কাজও নয়; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন—চিয়াং কাই-শেকের ধ্বংস-সাধন, চীনের অধিকৃত প্রদেশগুলিতে জাপানের হাতে-ধরা
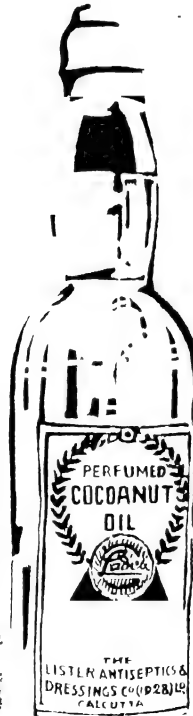
খণ্ড খণ্ড চীনা-রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া একই কালে চীনের অখণ্ডতা বিনষ্ট করা এবং সেই সব অঞ্চলে জাপানের আর্থিক ও সামরিক প্রভাব সুদৃঢ় করিয়া তোলা। এই পর্ব্বে তাই জাপানের দিক হইতে চেষ্টা চলিয়াছে—(ক) বিজিত অংশে শাসন স্থাপন; (খ) তাই ব্রিটেন, ফরাসী, জার্মান, প্রভৃতি বৈদেশিক যে-সব শক্তি চীনে ইতিপূর্ব্বেই সুযোগে-সুবিধায় ঐ সব অঞ্চলের মোড়ে মোড়ে ঘাঁটি বাঁধিয়াছে তাহাদিগকে সেই সব স্থান হইতে অপসারণ; (গ) চীনের দিক হইতে প্রয়াস, গরিলা খণ্ডযুদ্ধে জাপানকে দুর্বল ও অস্থির করিয়া রাখা, আর (ঘ) ব্রিটেন, ফরাসী, জার্মান ও রুশ সমস্ত শক্তিপুঞ্জের সহিত সদ্ভাব পোষণ করিয়া চীনের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের পথ উন্মুক্ত রাখা। ইহাই তৃতীয় পর্ব্ব—সম্মুখে তত বড় যুদ্ধ নাই, কিন্তু চীন-দখল চলিতেছে; নূতন করিয়া খণ্ড খণ্ড চীন গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে; আর চলিয়াছে জাপানের সহিত অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির দ্বন্দ্ব ও বুঝাপড়া। ইহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—জাপানী-প্রবর্ত্তিত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে, ব্রিটিশকে শক্তিহীন করিবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের এময় দ্বীপের কুলাংসুতে ও সতাও অধিকারে, উত্তর-চীনের তিয়েনসিন অবরোধে, আর রুশকে পরোক্ষে বাধা দিবার জন্য বহির্মঙ্গোলিয়া-মাঞ্চুকু'র সংঘর্ষে।

চীনের অবস্থা

কিন্তু দুই বৎসর পরে এই তৃতীয় পর্ব্বে বিভিন্ন শক্তির বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা বুঝিবার মতো। চীন যে প্রায় সর্ব্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটা যুদ্ধক্ষেত্রেই সব সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই দিক হইতে চীনের অবস্থা তেমন শোচনীয় মনে হইবে না। অবশ্য উত্তর-চীন সম্পূর্ণরূপে জাপানের করতলগত; প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি নাই, সেই প্রদেশগুলিও জাপানের পদানত; আর ইয়াংসি ও হোয়াংহো দুই নদীর উপত্যকা জাপানীদের অধিকৃত—ইহার পরে যে চীনকে সভ্যজগৎ এতদিন চিনিত তাহার আর কিই বা বাকী আছে? কিন্তু যে চীনকে সভ্যজগৎ চিনিতে পারে নাই, সেই চীনই এবার প্রবল হইতেছে, পরিচিত হইতেছে। দুর্বিপাকের বশে বাধ্য হইয়া চীন জাতি আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলিতে আপনাদের শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ করিতেছে—চুংকিং-এর অস্থায়ী গৃহাবলীতে চীনা সরকারের আপিস-আদালত, সৈন্য-সামন্ত, ইস্কুল-কলেজ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাও বিস্ময়ের বিষয় নয়;—বিস্ময়ের বস্তু বরং দুইটি—চীনের ঐক্য ও চীনের পুনর্গঠন।

সুবিশাল চীন, চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি;—প্রধানত কৃষিই জীবিকা, যাতায়াতের পথঘাট সুগম নয়—তাই চীন কোন দিনই একেবারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। ইহার উপর তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সেনাপতি ও নেতৃবৃন্দের কলহ। এতদিন এই ছিল চীনের ইতিহাস; এই চীনা ইতিহাস এবার মোড় ঘুরিল। জাপানীরাই চীনের এই উপকার করিয়াছে—চীন এক হইতে পারিয়াছে। ইহা ছিল অভাবনীয়।

চীন এতটা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে যে, একমাত্র কতকাংশে শানটুং প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও জাপান চীনাদের মারফৎ সত্যসত্যই রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। ছোট ছোট রাজ্য চীনা তাঁবেদার দিয়া স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বেয়নেটের বিভীষিকায় ছাড়া উহার অধিবাসীরা তাহা সমর্থন করে না। আর জাপানী সেনা-ছাউনির আওতা এড়াইয়া গেলে সে-সব রাজ্যের শাসন কেহ মানেও না। ওয়াং-এর মত নেতার সহায়তায় জাপান ভাবিয়াছিল এই তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে একটি নয়া চীনা রাজ্যের ঘোষণা করিবে। কিন্তু ওয়াংও তাহাতে ভরসা পাইলেন না—অধিবাসীদের সমর্থন লাভ না করিলে তিনি অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক। যে জাপান মনে করিয়াছিল—চীন কতকগুলি খণ্ড প্রদেশ—এক নিমেষে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার নিকট সন্ধির জন্য শরণাপন্ন হইবে—দেখা যাইতেছে, সে চীনকে চিনিত না।

তেমনি দুঃসাহসিক এই ঐক্যবদ্ধ চীনের সংগঠন-প্রয়াস। নিষ্ঠুর সত্যকে মানিয়া লইয়া এই আভ্যন্তরীণ প্রদেশ হইতে চীনের নিজের রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিয়াছে। সে পুনর্গঠন এমনি সুসম্পূর্ণ হওয়া চাই যাহাতে একই কালে বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াও চীন এই যন্ত্রযুগের উপযোগী জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারে, আবার জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া যাইতে পারে—শেষ পর্য্যন্ত শ্রান্ত জাপান যেন তাহার বিজয়-আশা বিসর্জ্জন দেয়, চীন পরিত্যাগ করে।

চীনের পুনর্গঠন-প্রয়াসে এই দুই উদ্দেশ্যই দেখা যায়। সমুদ্র-সংলগ্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০টি যন্ত্র-গঠনের কারখানা সোচোয়াং, কোয়েইচো, য়ুন্নান, প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রদেশ স্থানান্তরিত হইয়াছে; ছোট ছোট শিল্পাগারে চীনা উপাদান হইতে বস্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি আবশ্যক-জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে, সোচোয়ান-এর ছাগচর্ম্ম এখন সেখানেই পোষাকে পরিণত হয়। এই সমস্ত আয়োজনের মূলে আছে আবার সমবায়-প্রচেষ্টা—যাহাতে ধন-বৈষম্যের উদ্ভব না হয়। এমনি নানা শিল্প-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আছে চীনের যুদ্ধবিমান, যুদ্ধাস্ত্র গড়িবার কারখানা। অবশ্য, এখনও তাহার যুদ্ধোপকরণ বহুলাংশে আমদানি করিতে হয়।

এই পুনর্গঠন-পরিকল্পনা যেমন সাহসিকতার পরিচায়ক, তেমনই কুশলতার পরিচায়ক ইহা চালনা করিবার জন্য বিদেশীর নিকট হইতে ঋণ-সংগ্রহ। সত্য বটে, ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বার্থ চীনে এত বড়, এবং জাপানী বিজয়ে তাহা বিলোপের সম্ভাবনা এত স্পষ্ট যে, তাহারা চীনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই দুই শক্তির নিকট হইতে ঋণলাভ চীনের অর্থ-নেতা ডাক্তার কু ও ডাক্তার ওংএর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তাঁহাদের [illegible] প্রমাণ এই যে, চীনা ডলার টিকিয়া আছে বলিয়া [illegible] বিক্ষুব্ধ; কারণ, জাপানের অধিকৃত চীনা অঞ্চলে তাহাদের প্রচলিত নূতন চীনা মুদ্রা ইয়েন টলটলায়মান!

জাপানের অবস্থা

দুই বৎসরে যুদ্ধশেষে জাপান যে-বস্তুটি বিশেষ করিয়া বুঝিতেছে তাহা এই যে, যুদ্ধ আরও চলিবে। অথচ যুদ্ধারম্ভ-কালে তাহার মনে হয় নাই যে, যুদ্ধ এত দীর্ঘ হইবে। এখনও তাহার ইচ্ছা, যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করা। চীন-যুদ্ধ এখন চীনের প্রতিরোধশক্তি ও জাপানী প্রতিরোধশক্তির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রূপে দেখা দিয়াছে—কতদিন কে যুদ্ধজনিত দৈন্য-অভাব, আর্থিক ও সামাজিক জীবনের তীব্র প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিতে পারে। একদিক হইতে দেখিলে ইহা জাপানের পক্ষেই বেশি বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা।—চীনারা সরল গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত, তাহা সর্ব্বত্রই অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। জাপানীরা শিল্পোন্নতিতে সুসমৃদ্ধ, যুদ্ধের ফলে অনেক অভ্যস্ত আরাম-আয়াস ও প্রয়োজনীয় উপাদান তাহাদের ভাগ্যে জুটে না। এইরূপ অভাবের পীড়নেই কিছুকাল পরে সুসভ্য ও শিল্পপোষিত সমাজ ভাঙিয়া পড়ে—বিদ্রোহ করে। তাই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলিলে জাপানেও সমাজবিপ্লব দেখা দিবে—এই ছিল অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী। তাহাদের চোখে প্রমাণও ছিল প্রচুর। প্রথমতঃ, জাপানী বজেটের ঘাটতির অঙ্ক, ২০০০ হাজার কোটি ইয়েন, একটা অদ্ভুত চমক লাগাইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ জাপান নবাধিকৃত চীনে যে-ভাবে অন্য জাতির শিল্পবাণিজ্য বিতাড়িত করিয়া নিজের শিল্পবাণিজ্যে টাকা ঢালিতেছে, তাহাতে সকলেই প্রমাদ গনিবে,—মাঞ্চুকুতে যাহার বহু কোটি টাকা আবদ্ধ হইয়া আছে তাহার এখানে আবার এ-সময়ে এই দুঃসাহস করা কেন? তৃতীয়তঃ, জাপানী রাষ্ট্র সৈনিক-পরিচালিত—বণিকরা সেখানে ক্ষমতাবান নয়। এই বৈশ্য-শক্তি, ক্ষাত্র-শক্তির আদেশে ক্ষুব্ধচিত্তে অন্য দেশ হইতে ব্যবসা গুটাইতেছে; মাঞ্চুকুতে, উত্তর-চীনে ব্যবসা খুলিতেছে; আবার স্বদেশের বিপুল করভার বহন করিয়া সৈনিক-রাজাদের যুদ্ধ-সাধ মিটাইতেছে। এই করভার বহনে কি তাহাদের শিল্পবাণিজ্য আর সমর্থ হইবে? অতএব, অনেকেই অর্থনৈতিক হিসাব দেখিয়া মনে করিতেছেন,—জাপানের গৃহবিপ্লব সন্নিকট। ইঁহাদের হিসাবে ভুল ছিল না, ভুল ছিল একটি সূত্রে—আর্থিক দুরবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত চলিলে তাহার নিকট মানুষ মাত্রই অবনত হইবে, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত মানুষ অনেক অভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, বরং তাহাতে একটা সগর্ব্ব স্পর্দ্ধাও অনুভব করে—যদি কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, ছোট হোক্, বড় হোক্, সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, একটা আদর্শ—তাহাকে সঞ্জীবিত রাখে। ইতালীতে, জার্ম্মানীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; জাপানেও তাহারই প্রমাণ মিলিল। আহার্য্যে জাপান স্বাবলম্বী, চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জনে উন্মুখ, অভাব তাহার পৃথিবীর অনেক দেশেরই অনুরূপ—জাপানী শক্তির এই দিকটি বেশ সুন্দর করিয়াই প্রসিদ্ধ লেখক চেম্বারলেন 'এশিয়া' পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আসলে, ঘাট্তি-বজেটে ভয় নাই—যতক্ষণ মানুষের প্রেরণায় ঘাট্তি না পড়ে। অবশ্য, বরাবর জীবন-যাত্রায় ঘাট্তি পড়িলে প্রেরণার পুঁজিও একদিন নিঃশেষ হইবে—বিশেষ যদি তখন দেখা যায় রণক্ষেত্রে প্রিয়জনেরা প্রাণ বিসর্জ্জন

দিয়েছে। সেইরূপ হইলে সর্ব্বত্রই,—তখন ইতালীতে, জার্মানিতেও,—জনসমাজ অধীর হইয়া উঠিবে। জাপানেও তাহার বণিকদল, এবং তাহার 'তোপের খোরাক' সহস্র সহস্র সাধারণ অধিবাসীরা এই ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে অবস্থায় করিবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবের চিহ্নই নাই, চিরন্তন জাপানী প্রেরণার বশে জাপানী-সৈনিক সম্রাটের জন্য আপন প্রাণ দিতেই উন্মাদ, অধীর।

অতএব, মনে রাখিতে হইবে, জাপানের ভাগ্য নির্ভর করে—কত শীঘ্র এবার এই চীন-যুদ্ধ শেষ হয় তাহার উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা ভাল—আসল চীন,—তাহার শিল্পের কেন্দ্র, বাণিজ্যের দ্বার, পৃথিবীর পথ—জাপান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; বাকী চীন জয় না-করিলেও আপাততঃ জাপানের ক্ষতি নাই, অধিকৃত অংশের শিল্পবাণিজ্যের মধ্য দিয়াই সে বাকী চীন জয়ের ব্যয়-ভার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে পারে। তাহা ছাড়া, জাপানের শিল্পবিপ্লব, চিরন্তন জাপানী সামাজিক কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া, পাশ্চাত্য শ্রেণী-সংঘাতের কঠিন সত্যকে এখন পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই—তাই জাপানে শ্রমিক-শ্রেণী সচেতন নয়, বিপ্লবের জন্য অপেক্ষমান নয়। বরং জাপানে বিপ্লব যদি আসে হয়ত তাহা বণিক-শ্রেণীরই বিপ্লব হইবে। ক্ষাত্র-শ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্য হয়ত বণিক-শ্রেণীই প্রয়াস করিতে পারে। কিন্তু, কৃষক ও শ্রমিক-শ্রেণী এখন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়দেরই বেশি বিশ্বাস করে, এবং যদি যুদ্ধে বহুদিন বলি যাইতে না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষত্রিয়দের ত্যাগও করিবে না। যে আদর্শ জাপানী মনে বাসা বাঁধিয়া আছে তাহা আত্ম-বিসর্জ্জনকেই ধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছে,—ইহা স্মরণীয়।

বিদেশীয় যোগাযোগ

কিন্তু যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে—জাপানের পক্ষে নহিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই খানেই জাপান চীনের বিদেশীয়দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। হংকং-এর পথে চীনারা যুদ্ধোপকরণ পায়, তাহা বন্ধ করা দরকার। ইন্দো-চীনের উপকূল দিয়া এই কারবার চলে, জাপান চুপ করিয়া কি ফ্রান্সকে এই ব্যবসা চালাইতে দিবে? তাই, সমুদ্রে জাপানী রণতরী ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী বাণিজ্য-জাহাজ আটক করিয়া তল্লাসী করিতে লাগিল। কাজটা বে-আইনী, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের এই সঙ্কট-সময়ে কার্য্যতঃ জাপানকে বাধা দিবার সাধ্য তাহাদের নাই। এইরূপ য়ুনান-সীমান্ত বা রুশ-চীনের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করাও জাপানের প্রয়োজন; প্রয়োজন বিদেশীয় ব্যাঙ্কে জমা-দেওয়া চীনা রৌপ্য হস্তগত করা; প্রয়োজন জাপানী-প্রচলিত মুদ্রানীতি চালু করা, বিদেশীয় ঘাঁটিতে যে-সব চীনা আশ্রয় লইয়া জাপান-বিরোধী ভাব ও কার্য্য চালায় তাহাদের বহিষ্কৃত করা; সর্ব্বোপরি প্রয়োজন, 'নয়া ব্যবস্থা' প্রবর্ত্তন করা, অর্থাৎ চীনে বিদেশের ঘাঁটি বন্ধ করা। তৃতীয় পর্ব্বের এই একটি প্রধান যুদ্ধকৌশল।

এই কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই জাপান টিয়েনসিনে, সোটাওতে ও মঙ্গোল-সীমান্তে এখন অগ্রসর হইতেছে।

দিল্লীতে শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি নির্ম্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও বাঙালী স্থাপত্যশিল্পী শ্রীমণিলাল রায় (ইন্‌সেট)। ইঁহারই পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

বাঙালী বয়নশিল্পবিৎ

শ্রীআই. এন. রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বয়নশিল্পের আধুনিক প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করিবার জন্য ১৯৩৫ সালে জাপানে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কিরিউ টেকনিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। রেশম ও কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ বসু

এলাহাবাদ-প্রবাসী যতীন্দ্রনাথ বসু চরিত্রগুণে এলাহাবাদ-বাসীদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের সরকারী রাজস্ব-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

আশানন্দ ঢেঁকি স্মৃতিস্তম্ভ

নদীয়া-শান্তিপুরের আশানন্দ ঢেঁকির (মুখোপাধ্যায়) সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি এখনও লোকমুখে প্রচলিত। তিনি প্রয়োজনমত ঢেঁকি ঘুরাইয়াও দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করিতেন বলিয়া তিনি আশানন্দ ঢেঁকি নামে বিখ্যাত হন।

সম্প্রতি শান্তিপুরে তাঁহার গৃহদেবতা রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

আশানন্দ ঢেঁকি স্মৃতিস্তম্ভ

ওয়েল্‌সে বাঙালী চিকিৎসক

ডাক্তার ত্রিপুরাচরণ দে ১৯২৯ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পাশ করিয়া ১৯৩০ সালে বিলাত গিয়া

সস্ত্রীক ডাঃ ত্রিপুরাচরণ দে

শ্রীউমেশ মল্লিক

রোটাণ্ডা বিদ্যালয় হইতে এল. এম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এক বৎসর পর ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. জি. ও. উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানা হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর পোষ্টগ্রাডুয়েট শিক্ষানবিশী করেন। পরে ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ ওয়েলসস্থিত ডাওলাস সহরে চিকিৎসাগার ক্রয় করিয়া সেইখানেই স্বাধীন চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি এখন ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের ও মেডিক্যাল ডিফেন্স ইউনিয়নের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সেণ্ট জন এম্বুলেন্সের ডিভিসিনাল সার্জ্জন ও মাষ্টার জেনারেল হাসপাতালের পরিদর্শক সার্জ্জনরূপে কাজ করিতেছেন।

ব্যায়ামবীর শ্রীউমেশ মল্লিক

সুপরিচিত ব্যায়ামবীর শ্রীউমেশ মল্লিক কলিকাতা শান্তি ইনষ্টিট্যুট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবলচাঁদ দে স্মৃতিপদক লাভ করিয়াছেন। "স্বাস্থ্যরক্ষায় কোন্ ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী", ইহা প্রবন্ধের বিষয় ছিল।

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশের বিখ্যাত চিত্রশালাগুলি দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য, বিশেষতঃ আধুনিক শিল্পধারা ও রীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য ইউরোপে গিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পতীর্থও তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। সিকিম ও তিব্বত-সীমান্তে গিয়া তিনি ঐ অঞ্চলের প্রাচীর-চিত্র সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাহার চিত্র রোমের "ইটালিয়ান ইনষ্টিট্যুট ফর দি মিড্‌ল এ্যাণ্ড একষ্ট্রিম ওরিয়েণ্ট" বা "মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষৎ" কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে।

নারিকেলবীথি—শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

ডান্‌জিগের সুবিখ্যাত সেণ্ট মেরী গীর্জ্জা। ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও দুই শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ হয়। ১৪৬৬ খ্রীঃ হইতে ১৭৯৩ পর্য্যন্ত ডান্‌জিগ পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে প্রুসিয়ার আয়ত্ত হয়। ১৯১৯ সালে ইহা লীগ অব নেশন্সের অধীন হয়। এখন জার্ম্মানী ইহা নিজের বশে আনিতে চাহিতেছে।

মহিলা-সংবাদ

কুমারী তারা পুরী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. এসসি. পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী কুসুম নায়ার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী বাণী ঘোষ এই বৎসর অতি অল্প বয়সে (১০ বৎসর ৭ মাস) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী উমা গুহ

কুমারী বাণী ঘোষ

বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা পরলোকগত অহীন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী উমা গুহ এই বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে তিনি প্রবেশিকা হইতে বি. এ. পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাই বিবাহের পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনীরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি বাঁকুড়া উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন।

কুমারী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে আই. এ. পরীক্ষায় তিনি ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কুমারী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ও স্বর্গীয় সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
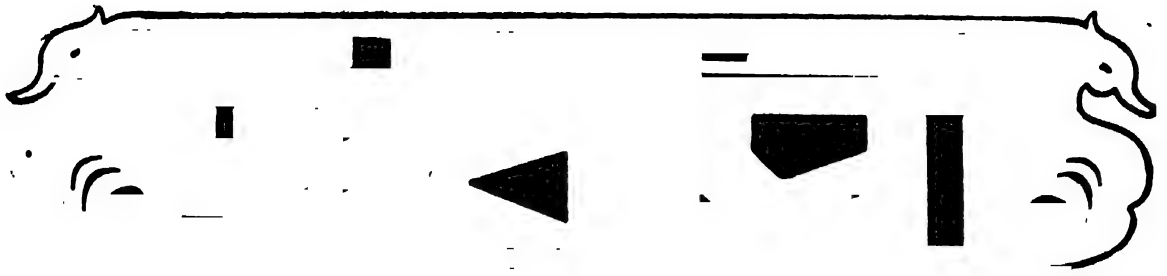
৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

াদ্র, ১৩৪৬

৫ম সংখ্যা

স্মৃতি-ভূমিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্নছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি'।
সারাবেলা ধরি'
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি
হঠাৎ কী হোলো মতি
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রূপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়
পাছে ওর জাগাই সংশয়,
ধরা পড়ে যায় পাছে আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।

চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড় ;
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে আসা দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা,
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক।

এখনি এ আমার লেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ।
এ চারিদিকের সব স্মৃতি নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক-দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার॥

৮।৬।৩৯
মংপু

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের ঘষে-যাওয়া তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করতে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কেননা যে বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।

আমার কাছে আমার রচনার যে অংশ বেঁচে আছে, যার সঙ্গে আমার ব্যবহারের বিচ্ছেদ ঘটে নি তাকেই আমি চিনি। যারা আছে কবরস্থানে তাদের পুরোনো তারিখের খুঁটিগাড়া বেড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়ালে অবসাদ চেপে ধরে মনকে, সাহিত্যিক জীবনের ধ্বংসাবশেষে অর্থভ্রষ্ট স্তূপগুলো মরুপ্রদেশের চেহারা দেখিয়ে দেয়। নতুন সংস্করণ ওঝা হয়ে উঠে সেই সব গতায়ুদের ভূত নামাতে বসেছে, যাদের সত্যতা চলে গেছে অথচ যারা বেঁচে থাকার ভান করছে। আমার লেখার যে অংশ ভুতুড়ে বাড়ি সেইখানে প্রয়োজনের খাতিরে প্রবেশ করতে হয়েছে সম্প্রতি।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্তর লিখেছি, অগত্যা তার মধ্যে বিস্তর আছে যা ভালো নয়। যেমন জীবনটা তেমনি তার সাহিত্য রচনা ভালমন্দ জড়িয়েই। সে তো অন্যায় নয়। অতি বিশুদ্ধ বাছাইয়ে বাস্তবের ক্ষতি করে। আমার আপত্তি হচ্ছে সেই অংশ নিয়ে যেখানে কাদা ভেঙে চলার চিহ্নগুলো আঘাটার ঠিকানায় গিয়ে পৌঁচেছে।

নিষ্কৃতি নেই। যারা ত্যাজ্য, তারা কেবলমাত্র জন্ম-স্বত্বের দোহাই দিয়ে মিতাক্ষরার আইন অনুসারে উত্তরাধিকারের দলিল বার করে। শাস্ত্রে আছে মৃত্যুতেই ভবযন্ত্রণার অবসান নেই, আবার জন্ম আছে। আমাদের যে লেখা ছাপাখানার প্রসূতি-ঘরে এক বার জন্মেছে তাদের অন্ত্যেষ্টিসংকার করলেও তারা পুনঃ পুনঃ দেখা দেবেই। অতএব সেই অনিবার্য অস্তিত্ব-প্রবাহের আবর্তন অনুসরণ ক'রে প্রকাশকেরা যদি বর্জনীয়কে আসন দেন সেটাকে বাধা দেওয়া চলবে না। প্রথা তাঁদের পক্ষে।

সে এক সময় গেছে যখন সমস্ত দেশেরই মন আর ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার মালমসলায় কমদামী ক'রে দিত উৎপন্ন জিনিসকে। আমরাই নিজের সাধনায় স্তরে স্তরে জমি উঁচু করেছি, আর আঁট করেছি তার মাটি। এখন একটা সাধারণ উৎকর্ষ সহজ হয়েছে সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। তাই তখনকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখার জাত গেছে বদল হয়ে। আমার তো মনে হয় আমার রচনার দুই বয়সের মধ্যে ঐক্যই নেই, কী ভাবের দিক থেকে কী ভাষার দিক থেকে আমার চিত্তের জন্মান্তর হয়ে গেছে। তাই আমার এই গ্রন্থাবলীর গোড়ায় রয়েছে চৌরঙ্গীর মিউজিয়ম, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন আলিপুরের পশুশালা।

স্পেংগুরের চটি বইখানি পড়লুম। আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি সাহিত্যকে বিশেষ মতের ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। প্রাণতত্ত্বে

বলে দেহে সাময়িক অভ্যাসজনিত যে বিশেষত্ব জন্মে তা বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। বাইরের অভ্যাস যত প্রবল হোক আয়ুর সীমায় এসে তারা লুপ্ত হয়। সাহিত্যেও তাই। রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো বাহ্য মতকে মানতে বাধ্য নয়। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-ব্যাপারের মাঝখানে সমস্ত ভগবদ্গীতা ভিৎ গেড়ে বসে আছে, কিন্তু মহাভারতের কাব্যকে স্পর্শও করতে পারে নি। ভীষ্মের মৃত্যু-ঘটনার মধ্যে যে মহিমা যে করুণা আছে, সমস্ত শান্তিপর্ব আপন মহোচ্চ উপদেশের বোঝা নিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে যায় নি। ধর্মকর্ম সম্বন্ধে কবির যে মতই থাক, ভীষ্মবধের বিবরণে তার দৃষ্টান্ত খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃষ্ণের পরামর্শের কুটিলতা, এবং পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধাচরণ কাব্যের রসকে এত তীব্র করে তুলেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই নীতিবিকার দেখা যায়। উপদেশ হিসাবে মত হিসাবে একে সমর্থন করা যায় না কিন্তু কাব্যের রস হিসাবে এ মহার্ঘ্য। কবির কল্পনা এবং কবির মতের একজোট হবার দরকার নেই। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়। কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে তবে সায়েন্সের জয়জয়কার করব কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হলেই হ'ল।

মাঝে মাঝে তোমাকে কিছু কিছু লেখবার জন্যে মন উৎসুক হয়েছে, ঘটে ওঠে নি। মনের দিবালোকের উপর একটা কুয়াশা নেমেছে, সে একটা বিস্মরণের প্রলেপ।

মৃত্যুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় মৃত্যুর অনেক পূর্ব থেকে, এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে জীবনে অস্পষ্টতার বিস্তার; অর্থাৎ রাত্রির ভূমিকা গোধূলিতে। এই অনিবার্যকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। মৃত্যুতে যেমন সংকোচ নেই, এতেও তেমনি সংকোচের কারণ থাকা অসংগত। সংকোচ স্বভাবতই থাকত না মৃত্যুকে যদি শূন্যাত্মক পদার্থ ব'লে মনে না করতুম, যদি তার সম্বন্ধেও দায়িত্ব আছে মনে করে তার জন্যে প্রস্তুত হবার একটা পালা থাকত জীবনযাত্রার শেষ পর্বাধ্যায়ে। মৃত্যুটাকে যদি পথের বিপরীত দিক থেকে একটা কলীশনের বেগে আসতে দিই তাহলেই সেটা ঘটে দুর্ঘটনার মতো। বাঁশিতে টার্মিনসের ইস্টেশনে আসবার ঘোষণা জানিয়ে এঞ্জিনের দম কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্যটাকে যদি স্বীকার করে নিই তাহলে সেটা যথোচিত হয়। কিন্তু পুরো দমে চলবার দাবি এখনো আমার উপরে সম্পূর্ণ রয়েছে। দরকারী কাজের ভিড় বেড়ে উঠেছে বই কমে নি। যাকে আমরা "দরকার" আখ্যা দিয়েছি সেটা হচ্ছে জীবনযাত্রার অধিকারে, তাকেই একান্ত বলে মানার মধ্যে আছে জীবনকেই একান্ত বলে স্বীকার করা। সেটা যে ভুল, দিনাবসানের বেলায় তার প্রমাণ আসে পদে পদে, তখনি পুরাতনের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সহজ মনে অদরকারের চর্চাটাই শোভন। কেননা মৃত্যুর পরেও সত্তার যদি নূতন ফসল চাষের পালা থাকে, তাহলে প্রস্তুত হবার জন্যে আগেকার ঋতুর শিকড় সমস্ত উপড়ে ফেলা চাই, ক্ষেতটাকে দরকারশূন্য করতে পারলেই সেটা যথোচিত হবে। পুরো কাজের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাওয়াটাই ট্রাজিক। কিন্তু মৃত্যুকে কেন বলব ট্র্যাজিডি, কেন বলব শেষ, কেন বলব না নূতন আরম্ভ। নূতন আরম্ভের সূচনাস্বরূপেই আসে পুরাতনের শেষ। সেই শেষই হচ্ছে কাটা শস্যের শূন্য ক্ষেত, পাগলা হাতির পায়ে দলা ফসলক্ষেত নয়। কাটা শস্যের ক্ষেতেই সফলতার আশা বিরাজ করে, হঠাৎ দলা শস্যের ক্ষেতেই হাহুতাশ। তর্ক ওঠে মৃত্যু যে শেষ নয় তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি যে রবিঠাকুর তারও লেশমাত্র প্রমাণ ছিল না রবিঠাকুর আসবার আগে, কেননা রবিঠাকুর তখন একেবারেই ছিল না। এর চেয়ে নীরবিঠাকুরের আর কী যুক্তি হ'তে পারে? হওয়া আপনার প্রমাণ আপনি নিয়ে আসে হওয়ার দ্বারাই। তার জন্যে একটা অপেক্ষা মনের মধ্যে জেগেছে। তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। আলো যখন কমে আসছে তখন আপিসের বাইরেকার ডাক শুনে খাতাপত্র বন্ধ করাই ভালো। আলো কমায়

অর্থটাকে ছুটির পরবর্তী কোনো একটা দায়িত্বের দিকেই স্বীকার·ক'রে নেওয়া যাক শূন্যতার দিকে নয়। যাই হোক কাজের ভিড় জোর ক'রে ঠেলে নিয়ে চলাটাই আজকাল আমার কাছে নিরর্থক ব'লে ঠেকে, দেহমন তার প্রতিবাদ করছে। কর্তব্যের পূর্বাভ্যাস এখনো ক্ষীণ হাতে লগি ঠেলছে—মন বলছে লগি ফেলে দিয়ে স্রোতে ভাসান দেওয়াই তীর্থযাত্রার শেষ পথ। কিন্তু বর্তমান যুগটা কর্মের যুগ, এ যুগ মৃত্যুকে শূন্য ব'লে জানে, সত্য ব'লে বিশ্বাস করে না। তাই বোধ হচ্ছে জীবনের গোলামি করতে হবে শেষ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, এর চেয়ে নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কিছু হ'তে পারে না।

আজ এই পর্যন্ত। ইতি ১৬।৭।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলুম। যখন কংগ্রেস সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বর্তমান সংকট তখনো স্পষ্ট ক'রে উপস্থিত হয় নি। সেই জন্যে তখন যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু বলবার ছিল না। শরীর মন যদি অনুকূল হয় তবে উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে পরে লিখব।

অহিংসাত্মক আত্মরক্ষা

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ভারতে সশস্ত্র আত্মরক্ষার মূল্য কি

যদি আমাদের চেষ্টার ফলে আজই আমরা স্বরাজ লাভ করি, অথবা বহির্জগতের ঘটনার চাপে ইংরেজকে নিজ হইতেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় তবে আমাদের কি দশা হইবে? এই ধরণের প্রশ্ন কেবল কল্পনা-বিলাস নয়। ইংরেজের সহিত ঠোকাঠুকি করিয়া বিজয়ী হওয়া এক কথা আর নিজের গরজেই ইংরেজের ভারত ত্যাগ অন্য কথা। জগতে আজ পরিবর্ত্তনের যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তাহাতে ইংরেজ যে কোনও সময় ভারত শাসন করার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসিতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। এই অবস্থায় ইংরেজ যদি ভারতকে নিজের অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া চলিয়া যায় তবে ভারতবর্ষের কি অবস্থা হইবে? কোন কোন ইংরেজ এই প্রকার প্রশ্ন করেন। ভারতবর্ষের অসমর্থতা দেখাইবার জন্যই অবশ্য এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়। প্রায় দুই শত বৎসর কাল ভারতবর্ষকে দাস করিয়া রাখিয়া, ভারতের সর্ব্বক্ষমতা সকল প্রকারে অপহরণ করিয়া ইংরেজ যে এই প্রকার প্রশ্ন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়। "স্বরাজ ত চাহিতেছ কিন্তু স্বরাজ লাভ করিলে আত্মরক্ষা কেমন করিয়া করিবে?" এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর আমাদের আত্মরক্ষা-সমস্যা মিটাইবার জন্যও প্রয়োজন। আবার এই ধরণের প্রশ্ন নূতনও নয়। সাধারণতঃ এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে নিশ্চিত হইতে পারা যায় না। যে উত্তর এতাবৎ দেওয়া হইয়া আসিতেছে তাহা এই :

১। আমাদের নিকট লড়াইয়ের সরঞ্জাম নাই সত্য, কিন্তু আমরা উহা খরিদ করিয়া লইব।

২। আমাদের এখন যুদ্ধকুশলতা নাই সত্য, কিন্তু উহা শিক্ষা করিয়া লইব।

৩। আমাদের সঙ্গে কাহারও শত্রুতা নাই, এজন্য কেহ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না।

৪। প্রবল শক্তিশালী জাতিরা আজ নিজেদের ভিতর গোলমালে এত ব্যস্ত যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার উহাদের না আছে শক্তি, না আছে ইচ্ছা।

কিন্তু এই সকল উত্তরের প্রত্যেকটিই ত্রুটিপূর্ণ এবং উত্তরগুলি খণ্ডন করা যায়।

১। আমরা যুদ্ধ-সরঞ্জাম কিনিয়া দরকারের সময় কাজ চালাইব, ইহা সম্ভবপর নহে। সারা জগৎ আজ লোভ ও অর্থের দাস। আমরা অস্ত্রশস্ত্রের ক্রয়মূল্য বলিয়া যাহা দিব তাহা অপেক্ষা বেশী দিয়া আক্রমণকারী আমাদের উহা পাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। নিরস্ত্র অবস্থায় এক স্বাধীনতার বিনিময়েই আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারি।

২। আমরা যুদ্ধকুশলতা শিখিয়া লইব যে বলি, তাহাতে কত দিন লাগিবে? বিরোধীরা যদি তত দিন সময় না দেয় তবে পুনরায় আমরা স্বাধীনতা হারাইব।

৩। কাহারও সহিত আমাদের বিরোধ নাই ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পার পাইব না। যদি আমাদের অসমর্থতা দেখিয়া বিরোধীর লোভ হয় তবে ঐ অক্ষমতাই বিরোধের কারণ হইবে।

৪। শক্তিশালী জাতিদের হিন্দুস্থানের উপর দৃষ্টি নাই বা পড়িবে না এ-কথা কেমন করিয়াই বা বলা যায়? জাপান ইটালী জার্মানী বা আমেরিকা আক্রমণ করিবে না, হলফ করিয়া এ-কথা কে বলিতে পারে? ব্রহ্মদেশের তৈল, খনিজ পদার্থ ও অরণ্যজাত দ্রব্য, ভারতবর্ষের শস্য ও খনিজ পদার্থ এ সমস্ত যুদ্ধের উপকরণ। যদি অন্যত্র যুদ্ধ বাধে তবে অসমর্থ ভারতবর্ষ হইতে বলপূর্ব্বক এই যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ যে পারে সেই করিবে। বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করা মানেই স্বাধীনতা হরণ করা।

দেখা গেল আত্মরক্ষার উপায়-নির্দ্দেশক উত্তরগুলি অকাট্য নয়। স্বরাজকামী উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহা হইলে ইংরেজের কবল হইতে মুক্ত ভারত যুদ্ধকামীর নিকট হইতে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে? ইহার একমাত্র উত্তর সত্যাগ্রহ দ্বারা।

সত্যাগ্রহই আত্মরক্ষার উপায়

আমাদের আত্মরক্ষার জন্য এমন একটা পথ বাহির করিতে হইবে যাহা অপর জাতির লোভশূন্যতা বা তাহাদের ব্যস্ততার উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধনিপুণ আমরা হইয়া উঠিব এ-কথাও বলা চলে না। আমরা যে উহাতে বিশেষ পারদর্শী হইব তাহার সম্বন্ধে খুবই শঙ্কা আছে, কেননা আমাদের অতীত ইতিহাস উহার বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। ভারতবর্ষ বার-বার বহিঃশত্রুদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু পরাজিত হইয়াও ভারতবর্ষ বিজেতাকে ভারতীয় বানাইয়া নিজের জন করিয়া লইয়াছে। চেঙ্গীজ খাঁ, মহম্মদ ঘোরী, সিকন্দর, ইহারা কেহই ভারতবর্ষকে স্থায়ীভাবে জিতিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের এই মর্ম্ম কথা কবি ম্যাথ্যু আর্ণল্ড যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতের বন্দনা-গীতের মতই শোনায়।

> "The east bowed low before the blast
> In patient deep disdain
> She let the legions thunder past
> And plunged in thought again."

> "পূরব করিল নতি।
> শত্রুর রণ-আস্ফালন
> সয়ে নিল
> নীরব গভীর অবজ্ঞায়।
> বয়ে যেতে দিল নিজ 'পরে
> ঝটিকা-প্রবাহ,
> উন্মত্ত গর্জ্জন।
> তারপর হল মগ্ন পুনরায়,
> আত্মজ্ঞান-কামনায়।"

ভারতের এই ঐতিহাসিক ধারা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এই শক্তি আজও কতকটা আছে—যদিও ইংরেজের প্রসারিত মোহে ভারতবর্ষ উহা অনেকটা খোয়াইয়া বসিয়াছে। সেই প্রাচীন ধারাকেই কিন্তু গান্ধীজী নূতন জন্ম দিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে মহারাজ অশোক অহিংসাব্রতী হইয়া রাজ্যজয়-লিপ্সা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অশোকের ঐ মহাদান জগতের মধ্যে ভারতকে মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রথম স্থান দিয়াছিল। রাজ্য-লিপ্সার নিবৃত্তিতেই তাঁহার নীতি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সেদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ ভারতবর্ষ এক প্রবল বিদেশী শক্তির দাস হইয়া তাহার স্বার্থ-সিদ্ধির উপকরণ হইয়াছে। আজ পরাধীনতা হইতে মুক্ত হওয়ার যে রাস্তা গান্ধীজী দেখাইয়াছেন উহা ভগবান্ বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম্মের রাজনৈতিক প্রয়োগ মাত্র। অহিংসা

সত্যাগ্রহের প্রেরক, আধার ও রক্ষক। অহিংসার ব্যাপক প্রয়োগদ্বারা আমরা কেবল এই অমঙ্গলময় শাসন হইতেই মুক্ত হইব না, পরন্তু উহাদ্বারাই আত্মরক্ষাও করিতে পারিব।

"উমা জো রামাচরণরত, বিগত কামমদক্রোধ
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগতে কেহিসন করহিঁ বিরোধ।

এই ভাব দ্বারা যেমন ব্যক্তি প্রভাবিত হয় তেমনি সমাজও প্রভাবিত হইতে পারে। ইহা আদর্শ অবস্থার কথা। সত্যাগ্রহ এই আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আমাদিগকে আগাইয়া দিতে থাকে। অহিংসার প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগের অর্থ এ নয় যে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আমাদের কোনও ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে না। পরন্তু ত্যাগ স্বীকার ত করিতেই হইবে। সাধারণ যুদ্ধে একে অপরকে মারিয়া ফেলে এবং কাটাকাটিতে যে অধিক পটু সেই জিতে। হিংসকের সহিত অহিংসকের যুদ্ধেও অহিংসকে নির্যাতিত হইতে বা মরিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। প্রভেদ এই যে, এক ক্ষেত্রে মারিয়া মরা আর অপর ক্ষেত্রে না মারিয়া অন্যায় ঠেকাইবার চেষ্টায় মরার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে মরিতেও হয়।

অহিংস-নীতি প্রয়োগের ফল

যদি ভারতবর্ষ অহিংসায় বিশ্বাসী হয় তবে মুক্ত ভারতকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে বাঁচার জন্য অহিংসার আশ্রয়ই লইতে হইবে।

অস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে অহিংসা যে কোনও মারণ-অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যদি এই বিশ্বাসই সেনা-নায়কদের মধ্যে থাকে তবে বোমাবর্ষণের জন্য ব্যোমযান প্রস্তুতের চেষ্টা অপেক্ষা অহিংসার প্রয়োগের জন্য নানা পরিকল্পনা করিতে ও তাঁহার প্রয়োগের জন্য নিপুণ সেনা প্রস্তুতেই তাঁহাদের মন যাইবে। ভারতবর্ষ নিজে মুক্ত হইয়া দুনিয়াকেও অহিংসার দিকে আকৃষ্ট করিবে। পৃথিবী এক ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনার জন্য অগ্রসর হইবে। অমুকের কি ধর্ম্ম, সে হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান এ-কথা লইয়া মারামারি হইবে না। ধর্ম্মের এক পুকুরের নানা ঘাটে নানা লোক পরিতৃপ্ত হইয়া পান ও স্নান করিবে। দেশ দেশ লইয়াও হানাহানি থাকিবে না। নাম থাকিবে ভারত বা ইটালী বা জার্মানী যেমন আছে, শাসক থাকিবে আপন আপন পছন্দমত কিন্তু সব মিলিয়া সসাগরা ধরণী এক হইবে এবং উহার রাজা হইবে এক জগৎপতি বিশ্বেশ্বর।

"ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা
এক ভূপ রঘুপতি কোশলা"

বর্ত্তমানে কংগ্রেসের যে মূলনীতি আছে "বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়" উহার ভিতরকার অর্থ এবং ঐ নীতির পরিণতি ইহাই। কোনও যুক্তি দ্বারাই ইহার খণ্ডন সম্ভবে না।

যদি নেতারা এই পথ স্বীকার করেন, মূলনীতি বলিয়া, রাজনীতির মূলসূত্র বলিয়া সত্য ও অহিংসাকে মানিয়া লন তবে তাঁহারা মারণ-অস্ত্র-বিহীন ভারতবর্ষকে এক মহান্ শক্তিশালী দেশে পরিণত করিবেন। তাঁহারা জগতের সৈন্য ও যুদ্ধোদ্যমের সম্মুখে অম্লান অকম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হইয়া উঠিবেন। মারণ-অস্ত্রের বদলে অহিংসা-অস্ত্র হাতে লইতে হইবে। যুদ্ধের আশঙ্কায় যেমন অস্ত্রশালায় মারণ-অস্ত্র তৈরি করা দরকার, যন্ত্রী ও কারিকর নিয়োগ করা দরকার, অহিংস যুদ্ধের জন্যও তেমনি সেনার হৃদয়ে অস্ত্রাগার তৈরি করা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক সিপাহীকেই অস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে হইবে। এই কাজ অবশ্যই কঠিন। ভারতবর্ষের পক্ষে আজ ইংরেজ জার্মানী ইটালী ফ্রান্স জাপান প্রভৃতি ডাকু-গবর্ণমেণ্টর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য, তাহাদের সমবেত অস্ত্রাদির পাল্টা আত্মরক্ষার জন্য যোগ্য যুদ্ধসজ্জা কেবল কঠিন নয়, উহা অসম্ভব। ভারতবর্ষকে উহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রদ্বারা ঠেকান অপেক্ষা উপরে বর্ণিত অহিংসা-অস্ত্র দ্বারা ঠেকান সম্ভব। কঠিন হইলেও উহাই একমাত্র সম্ভব। নচেৎ চিরদাসত্ব বরণ করা ছাড়া না ভারতের না আর কোনও ছোট ছোট অরক্ষিত দরিদ্র দেশের উপায় আছে।

অহিংসা-অস্ত্র খরিদের জন্য বিদেশীর দ্বারে দ্বারে

ঘুরিবার অনিশ্চয়তা লইতে হইবে না। টাকা দিলেও ঘাতক-অস্ত্র মিলিবে না এমন হইতে পারে। কিছু চেষ্টা করিলে মানুষের হৃদয়ে অহিংসা-অস্ত্র অবশ্যই তৈরি করা যায়। ইহা বাহিরের কোনও কিছুর উপর নির্ভর করে না।

কেহ ইহাকে অসম্ভব কল্পনা-বিলাস মাত্র মনে করিতে পারেন। কিন্তু অহিংসার কেবল সামান্য প্রয়োগের দ্বারা আর অনেক লোকের অল্প ত্যাগদ্বারা গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাত সকলেই দেখিতেছেন। যদি উহার বেশী অহিংসা প্রয়োগ করা যায় তবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ও দেশ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে সত্যাগ্রহী বাঁচিতেও চায়, দেশরক্ষাও করিতে চায়। কিন্তু সে অপরকে মারিয়া বাঁচিতে চায় না। যদি সে চেষ্টায় মৃত্যু হয় ত তাই হউক। এই না কথা? যদি সৎচেষ্টা করিতে করিতে সারা জাতি লুপ্ত হয় তবু মানুষের সমাজ ঐ লোপদ্বারাই আদর্শের দিকে আগাইবে, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে সত্যাগ্রহী জাতিকে কেহই গোলাম বানাইয়া রাখিতে পারিবে না। যাহারা ধনপ্রাণের পরোয়া রাখে না তাহাদিগকে কোন বাহ্য শক্তিই পরাজিত করিতে ও দাবাইয়া রাখিতে পারে না।

অহিংস-যুদ্ধে সকলেই সামরিক

হিংস-যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ দেশবাসীকে দুই ভাগ করা হয়—এক সামরিক ও অপর অসামরিক। এই রকম একটা বিশ্বাস থাকে যে, যাহারা লড়াই করে তাহারা সাধারণ অসামরিক লোকের ক্ষতি করিবে না। ইহার মতলব এই যে, সামরিক লোকদ্বারা একবার যুদ্ধ জয় করিলে পরাজিত অসামরিক বাসিন্দারা সহজেই অধীনতা স্বীকার করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই এই নীতি ভাঙা হয়। আক্রমণকারী নিজের শক্তির ভয়ঙ্করতা দেখাইয়া শত্রুকে ভয়ভীত করিতে চায়। সেই জন্য অসামরিক বাসিন্দাকেও আক্রমণ করিয়া যেখানে সেখানে ভীষণ ভাবে হত্যা করে। কিন্তু এই সকল উপায়ে স্বাধীনতা হরণ করার পরই পরাজিত দেশের জনসাধারণের উপর রাজার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা সহজ হয়। তাহাদিগকে দাসত্বে বাঁধিয়া তাহাদিগকে দিয়া যাহা খুশী বলাইয়া ও করাইয়া লইতে পারে। জনসাধারণ পরাজয়ের পর এত ভয়ভীত হয় যে বাধাদান দ্বারা ধনপ্রাণ রক্ষা করার প্রবৃত্তিও খোয়াইয়া বসে। এই অবস্থায় বিজেতা সহজেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে। কিন্তু দেশে যদি 'অসামরিক' বলিয়া কোনই লোক না থাকে—যদি সকলেই 'সামরিক' হইয়া যায় তবে আক্রমণকারী সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে। রাজ্যবিস্তারের কৌশল ও চরম উদ্দেশ্য এই যে, 'সামরিক'দিগকে পরাজিত করিয়া 'অসামরিক'-দিগকে দাস করিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করাইবে। যদি সমস্ত লোকই 'সামরিক' হইয়া যায় তবে আক্রমণকারীর আক্রমণের লোভই আর থাকে না। কিন্তু হিংস-যুদ্ধে সর্বসাধারণের 'সামরিক' হওয়ার সুবিধা নাই। তত অস্ত্রশস্ত্র ত চাইই, তাহা ছাড়া হিংস-যুদ্ধকুশলও হওয়া চাই। বাস্তবিক ইহা করা অসম্ভব। এই জন্যই ত হিংস-যুদ্ধে আক্রমণকারীর বিজয়ী হওয়ার সুযোগ মিলে। কিন্তু যদি অহিংসাই যুদ্ধের নীতি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তবে দেশের সকলেই এই যুদ্ধে অংশ লইতে পারে। এই প্রকার অহিংস-সঙ্কল্প জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধসজ্জায় সর্ব্বদা সজ্জিত হয় এবং সমস্ত দানবীয় পরাক্রম একত্র করিয়াও সে জাতিকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। অহিংস-সঙ্কল্প জাতি হয় আত্মরক্ষা করিবে নয়ত মরিবে, কিন্তু দাস হইয়া কখনও থাকিবে না। মরিয়া যাইবে তবু স্বাধীনতা লুটিয়া লইতে দিবে না। যে-জাতির ভিতর এই প্রকার সঙ্কল্প ও শক্তি উপস্থিত হয় তাহার সহিত কোনও পরাক্রমই আর লড়াই করিতে চাহিবে না, কেননা লড়াই করিয়া লোভ তৃপ্ত হইবে না। লড়াই বাধিলেও সত্যাগ্রহীর জীবিত বা মৃত অবস্থায় জয় হইবে।

সত্যাগ্রহ ভারতের সনাতন অস্ত্র

সত্যাগ্রহ অস্ত্র ভারতবর্ষের নিজস্ব। ইহা বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণের-অস্ত্রশালায় তৈরি হইতেছিল। গান্ধীজী

ইহাকে বিরাট্ আকার দিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহার শক্তি কত।

কিন্তু তবুও সংশয় হয়। হৃদয় হইতে অহিংস-মন্ত্র গ্রহণ না করিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, যদি আজ চীন প্রতিজ্ঞা লইত—যদি চেক্‌রা তাহাই করিত তবে তাহা কি আত্মহত্যারই সমান হইত না? জাপান নানা প্রকারের মারণ-অস্ত্র দ্বারা চীনকে উজাড় করিতে থাকিবে আর চীন আত্মরক্ষার অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া আরও বেশী করিয়া মরিতেই থাকিবে?" কিন্তু জিনিষটা এমন নয়। জাপান আজ ত কেবল চীনাদের শরীরকেই মারিতেছে না, কতকগুলি চীনাকে প্রাণে মারিয়া বাকী সকলের ইজ্জত নাশ করিতেছে। হাজার হাজার অসামরিক চীনার হাতে জাপানের পতাকা দিয়া উহাকে সেলাম করাইতেছে। চীনের যে-অংশ জাপান দখলে আনিতেছে সেখানকার লোককে দিয়া জাপানের গুণগান করাইয়া লইতেছে। সত্যাগ্রহী চীনকে জাপান মারিতে পারে, কিন্তু তাহাকে দিয়া জাপানের জয়গান গাওয়াইতে পারিবে না। ইহার কারণও স্পষ্ট। হিংসায় যে সকল অস্ত্র যথা—বোমা কামান তলোয়ার ও কূটবুদ্ধি—এ সমস্তই দুর্ব্বলের অস্ত্র। এই সকল অস্ত্রের প্রয়োগ যদি সফল না হয় তবে অস্ত্রধারী অসহায় হইয়া যায়। অসহায় অবস্থা হইতে ভীতি আর ভীতি হইতে নতি উপস্থিত হয়। অহিংসা-অস্ত্র লোককে ভীত হওয়ার অবকাশই দেয় না, শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে লড়াই করে শেষ পর্য্যন্ত এবং সকলে মিলিয়া বা জনে জনে লড়ে। আজ যদি চীনে এই শক্তি আসে তবে কিছুদিন চেষ্টার পর জাপান বুঝিবে যে চীনকে অধিকার করিয়া জাপান উহা ভোগ করিতে পারিবে না। সে অবস্থায় মিছা চীনের পিছনে শক্তিক্ষয় না করিয়া উহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

দুর্ব্বলতাই লোভীকে আকৃষ্ট করে

যখনই কোনও জাতির নিকট এইটা ধরা পড়ে যে, অমুক জাতি আত্মরক্ষায় অসমর্থ তখনই সে লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিতে থাকে। সেই জন্য সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রশক্তি বাড়াইয়া ভাবী আক্রমণকারীর সম্মুখে ধরিয়া দেখায় যে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারেই এবং ওদিকে লালসা করিলে সুবিধা হইবে না, পাণ্টা সাজা পাইবে। কিন্তু এই মনোবৃত্তিতে রাজ্যজয়ের লিপ্সা দূর হয় না। কেবল পরস্পরের মধ্যে হিংস্র শক্তি বাড়াইয়া যাওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। তেমন সংযোগ হইলে একে অন্যকে দুর্ব্বল বুঝিয়া তাহার উপর আসুরী শক্তি খাটাইতে লাগিয়া যায়। খুনখারাবী চলিতে থাকে। হয় হারজিত হয় নয়ত একটা সম্মান বা অসম্মানের আপোষের রফা হয়। ইতিহাস ত এই উদাহরণে ভরা। চীন যদি অহিংসপন্থী হয় তবে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে না—জাপানকেই নিরস্ত হইয়া ফিরিতে হইবে, নয়ত চীনের শ্মশানে পাহারা দিতে হইবে। জাপান যদি আত্মহত্যা করিতে চায় তবেই অহিংস চীনের পিছনে লাগিয়া লোকক্ষয় করিতে থাকিবে। চীন এই চেষ্টায় মরিবেই এমন কথা নয়—আর যদি মরেই তবে মরিয়া জগতের বাঁচার পথ করিবে। অহিংস যুদ্ধ যুদ্ধই। উহা যে আত্মহত্যা নয় ইহা বুঝিতে হইবে এবং চীন ঐ যুদ্ধে জয়ীও হইতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু যদি চীন অহিংস যুদ্ধনীতি অনুসারে চলিয়াও মরে তবু মরিয়াও সে জগতে যুদ্ধের রীতি বদলাইয়া দিবে। একথা বলিতেছি না যে এখনই চীন হিংস-যুদ্ধের রীতি ত্যাগ করিয়া অহিংসা-অস্ত্র ধরিতে পারে। ইহার জন্য তৈয়ারী হওয়া চাই। আজ চীনের সামনে এই প্রকার তৈয়ার হওয়ার অবকাশ ও অনুকূলতা আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না।

যদি কেহ জলে ডুবিয়া মরিতে থাকে তবে লোকে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে। কখনও ইহাতে দুই জনেই মরে। কিন্তু যে নিজের প্রাণ দিয়াও অপরকে বাঁচাইতে ছুটিয়া যায়, দুনিয়া তাহার স্তুতি করে এবং উহাই আদর্শ বলিয়া জানে। ব্যক্তির বেলায় যেমন জাতির বেলাতেও ইহা তেমনই সত্য। মরিয়া বাঁচা ইহাকেই বলে। হিংস-যুদ্ধেও পরিণামে কাহাকেও সম্পূর্ণ আহুতি দিতে হয়। কোনও জাতি এই প্রকার করিলে কেহ উহার নিন্দা করিবে না। ভীরুরাই

বলিবে দাস হইয়া বাঁচা ভাল—যেমন তেমন করিয়া বাঁচিতে পারিলেই হইল। বীরেরা প্রাণ, নিজের ও সাধারণের প্রাণ আহুতি দিয়াই মান রক্ষা করিতে বলিবে। এ-কথাও কি নীতি বলিয়া আজ নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হইবে যে অপমানিত দাস-জাতি হইয়া থাকা অপেক্ষা লুপ্ত হইয়া যাওয়া ভাল? সত্যাগ্রহ করিয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য মরা আত্মহত্যা নয়। কিন্তু মরিতেই হইবে; সত্যাগ্রহে বাঁচার চেষ্টা নাই একথাও একেবারে নিছক ভুল। আমি বলি হিংস-যুদ্ধে অধিক শক্তিশালীর নিকট মরার যত সম্ভাবনা, অহিংস-যুদ্ধে হিংস্র পরাক্রমীর হাত হইতে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা তাহা হইতে অনেক বেশী। তাহার কতক কারণ উপরে দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহার ব্যবহারিক দিকটাও দেখাইতেছি।

অহিংসা দ্বারা আত্মরক্ষা—আত্মহত্যা নয়

সাধারণতঃ রাজ্য-আক্রমণ বা রাজ্যরক্ষার বেলায় আমরা দেখি যে বিরুদ্ধ দুই জাতিই যুদ্ধের সময় অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। যুদ্ধ করা, তাহার প্রস্তুত হওয়া, তাহার মশলা জোগানই একমাত্র কাজ হয়। লোক যুদ্ধসংক্রান্ত হাজারো কাজে লাগিয়া যায়। যোদ্ধা সংগ্রহ, হাতিয়ার সংগ্রহ ও প্রস্তুত, আহতের চিকিৎসার ব্যবস্থা, যানবাহন, রসদ—এই সব লইয়া সারা দেশে তোলপাড় আরম্ভ হয়। রাজা ও রাষ্ট্রপতি এই কাজে লোককে উত্তেজনা দিতে থাকেন। নেতারা দেশের মধ্যে চেষ্টা দ্বারা একটা রণোন্মত্ততা সৃষ্টি করেন। লড়াই করার জন্য সকলের মনে আগ্রহ আনিয়া দেওয়া হয়। একটা উৎসাহ আসিয়া যায়। হিংস-যুদ্ধে যদি এই প্রকার হয় - যেখানে জীবন-মরণ অনিশ্চিত, তবে অহিংস-যুদ্ধেও জীবন-মরণ অনিশ্চিত বলিয়া কেন এমনই জাগৃতির সূচনা প্রবাহ চলিবে না? এই অবস্থায় অহিংস-জাতি সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে। আক্রমণকারীর সহিত পূর্ণ অসহযোগ করার নীতি ও উপায় স্থির করিবে। অহিংসার গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া আক্রমণকারীর সমস্ত অপচেষ্টায় বাধা দিবে। আততায়ী যদি বিষাক্ত গ্যাস চালায় তবে তাহা হইতে বাঁচিবার উপায় বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় অবলম্বন পারিলে করিবে। যদি দেশের রেল দ্বারা আততায়ীর সুবিধা হয় তবে তাহার পক্ষে রেল চালান অসম্ভব করিয়া তুলিবে—রেল চালাইবার জন্য রেল-লাইনের প্রত্যেক ফুটে আততায়ীকে পাহারা মোতায়েন করিতে বাধ্য করিবে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি তাহাকে নিজ দেশ হইতে আনিতে বাধ্য করিবে। আক্রান্ত দেশ হইতে স্বেচ্ছায় বা বলে পরাভূত হইয়া তাহাকে কেহই কিছুই জোগাইয়া দিবে না। আবশ্যক হইলে নিজেরাই সমস্ত রেল ও দ্রুত চলাচলের পথ ধ্বংস করিয়া দিবে। এক মুঠা খাদ্যও আক্রমণকারীর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিবে। সে এক জবরদস্তি করিয়া লুটিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ আসিয়া লুট করার সম্ভাবনাও সত্যাগ্রহী দিবে না। এমনই জাগ্রত সে থাকিবে। আক্রমণকারীর হাতে খাদ্য বা সরঞ্জাম পড়ার পূর্ব্বে সে নিজেই তাহা জ্বালাইয়া দিবে। আর নিজের অবস্থান করা তখন যদি সেখানে অসম্ভব হয় তা জঙ্গলে চলিয়া যাইবে। এই ধরণের বিপদে সত্যাগ্রহী প্রচলিত সভ্য জীবন যাপন করা ত্যাগ করিবে ও আক্রমণকারীকে নিরুপায় করিয়া তুলিবে। এক দিকে বাসস্থান ত্যাগ আর অপর দিকে নির্ভীকতার সহিত জীবন-ধন-সম্পত্তি রক্ষা এই দুই পরস্পরবিরোধী কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে শিখিবে। এই শিক্ষার ভিতর সারা জাতির পক্ষে অহিংস আত্মরক্ষা ও অসহযোগের অপূর্ব্ব রসাস্বাদ করা হইতে থাকিবে। এ-কথা বলিতে পারি যে, অসহযোগের রসাস্বাদ ভারতবর্ষ এক বার কতকটা করিয়াছে। নির্ভীকতা ও নির্যাতন—এই দুইয়ের সংযোগে মানুষের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হয় ভারতবর্ষ তাহার কিছুটা রস ত এক বার লইয়াছে।

সশস্ত্র আক্রমণকারীর নিকট অহিংসের কেবল আত্মদানই যে একমাত্র পথ নয় ইহা এক্ষণে বুঝা গেল। ইহা ছাড়া আরও কিছু করণীয় থাকে। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উপরে যে ইঙ্গিত করা হইল তাহাতে যদি শত্রুর দ্রুত চলাচলের পথ রোধ করিতে গিয়া উহা নষ্টই করা হয় তবে দেশের ভিতর পরস্পর যোগ থাকিবে কি করিয়া? নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না আর নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমস্ত

চেষ্টা পণ্ড হইবে। কিন্তু এই প্রকার আশঙ্কা অমূলক। দ্রুত চলাচলের ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নষ্ট হইলে আততায়ীই বেকার হইয়া পড়িবে। আত্মরক্ষাকামী সত্যাগ্রহীর বড় ক্ষতি হইবে না। গত সত্যাগ্রহের আন্দোলনে কাহারও কাহারও এই অভিজ্ঞতা হইয়া থাকিবে। আমারও কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছিল।

আইন অমান্যে অহিংসার প্রয়োগ

বাংলার আইন অমান্যের ভার কিছুদিন আমার উপর ছিল। সে সময় পুলিস বার-বার আমার ক্যাম্পে হানা দিয়া সব তচনচ করিয়া দিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ দিন আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই। স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঞ্ছনা দেখিয়া আমি বলিতাম যে আমিই ইহাদের পরিচালক, আমাকে আগে লও। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেন তোমার সময় এখনও নয়। এই জন্য চার মাস কাল আমার ডাইনের-বামের সমস্ত লোক জেলে নীত হইলেও নূতন লোক লইয়া আমি সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিতেছিলাম। অন্য প্রদেশের সহিত, কখনও বা নিজ প্রদেশের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগ থাকিত না। সংবাদ পাঠাইতে ডাকঘর ব্যবহার করার সুবিধা ছিল না। রেলে লোক পাঠাইয়া সত্যাগ্রহ সংবাদ আদান-প্রদানের ডাক বসাইয়াছিলাম, তাহাও প্রায়ই বিপর্য্যস্ত হইত। অখিল-ভারত দপ্তরের সহিত যোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সময় এক আমেরিকান সংবাদপত্র-প্রতিনিধি আসেন। তিনি বলেন যে তিনি অনেকগুলি সংবাদপত্রের পক্ষে আসিয়াছেন। তিনি বাংলা বিহার উৎকলের খবর আমার নিকট পাইতে চাহেন। আমি বলি যে আমার নিজের প্রদেশের খবর সব সময় পাই না, অন্য প্রদেশের খবর কদাচিৎ পাই। তাঁহাকে বলি যে সশস্ত্র যুদ্ধে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্দেশ যতটা আবশ্যক সত্যাগ্রহে ততটা নয়। বরঞ্চ যেমন হিংস-যুদ্ধে সেন্ট্রালিজেশন বা কেন্দ্রীকরণ প্রধানতম আবশ্যক, অহিংস-যুদ্ধে সম্ভব অনুযায়ী বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisationএর) উপরই নির্ভর করিতে হয়। কেন্দ্রের সহিত সংযোগ থাকে ভাল, না থাকে তবুও কাজ চলা চাই। কেন্দ্র যদি একান্ত আবশ্যক হয় তবে সেই কেন্দ্রকে বিনষ্ট করিয়া সমস্ত সত্যাগ্রহের উদ্যম শত্রুপক্ষ নষ্ট করিতে পারে। যদি কেন্দ্র নাই থাকে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর না করা হয়, যদি প্রত্যেক অঙ্গ আপন আপন কাজ নীতিরক্ষা করিয়া চালাইয়া যাইতে থাকে তবে আইন অমান্য ও অসহযোগের বাধাদান-নীতি অপর পক্ষ নষ্ট করিতে পারিবে না। অহিংস-যুদ্ধে ইহা একটা বড় বিশেষত্ব। প্রশ্নকর্ত্তাকে জানাই যে অপর প্রদেশের খবর না জানিলেও সেজন্য আমার দুশ্চিন্তা নাই, আমার ক্ষেত্রের অনুকূল কাজ আমি করিয়া যাইতেছি, তাহাতেই আমার সার্থকতা এবং আমার ভিতর দিয়া এই আন্দোলনের সার্থকতা। প্রশ্নকর্ত্তা বিস্মিত হন। কেন্দ্রীয় সংস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া কি প্রকারে এই বিরাট্ আন্দোলন চালান হইতেছে, ইহা তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। হয়ত পরে তিনি আমার শ্রদ্ধার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমার কথা কতকটা বুঝিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয় পরিচালনা এই আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে।

গোপনীয়তার সীমা

পরে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শেষের দিকে এই নীতিটা আর সুস্পষ্ট কার্য্যকরী ছিল না। সংযোগ রাখা রূপ কাম্য লাভ করার জন্য শেষ দিকে গুপ্ত উপায় অবলম্বিত হইতে থাকে। গুপ্ত আন্দোলন বিধিপূর্ব্বক বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও হয়ত নেতারা গোপনীয়তা ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরে জেল হইতে বাহির হইয়া জানি সমস্ত আন্দোলন গুপ্ত আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে গোপনীয়তা ভীরুতার জননী। ভীরুতা আর অহিংসা পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম। আমার বিশ্বাস গোপনীয়তার প্রসারে অহিংসা যুদ্ধ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। এ-কথার উল্লেখ করার হেতু এই যে, অহিংস কার্য্যক্ষেত্রে কি করিতে হয় তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। মামুলী তর্ক-বিচার দ্বারা ইহার মীমাংসা হয় না।

আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য সেবার আমরা বিজয়ী হইতে

পারি নাই। দুর্ব্বলতা দূর করার রাস্তা কতক কতক আমরা বুঝিয়াছি। কিন্তু আস্থা ও ত্যাগবৃত্তির পরিমাণ কম বলিয়া আজও আমরা দুর্ব্বলতা দূর করার দিকে অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। বাহিরের দিকে দেখিতে গেলে কংগ্রেস দিন দিন অধিক শক্তিশালী হইতেছে। কিন্তু কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রারম্ভে উহাতে যে পবিত্রতা ছিল তাহা আজ অনেকটাই মলিন হইয়াছে। বাহিরে কংগ্রেস-শক্তি যতই প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপক হউক না কেন, উহার ঐ আন্তর গুণ যে-পরিমাণে মলিন হইয়াছে সেই পরিমাণে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ-শক্তি কমিয়াছে। ঐ শক্তি বাড়াইলেই আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব ও প্রাপ্ত স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিব। অন্য আর কোনই উপায় নাই।

কংগ্রেস-নীতি অহিংস আত্মরক্ষা

গঠনমূলক কার্য্যক্রম পূর্ণ করিয়াই কংগ্রেস অহিংস-যুদ্ধ করিতে অথবা অহিংসা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। সে অন্য কথা।

কংগ্রেসের মূলনীতিতে যদি বহু লোকের ব্যবহারিক অবিশ্বাস থাকে, অসহযোগের জন্য এবং তাহা দ্বারা স্বরাজ লাভের জন্য অহিংসা চাই—আর প্রাপ্ত স্বরাজ রক্ষা করার জন্য হিংসা চাই, এইটাই যদি কথা হয়, তবে তাহার মানে এই যে, সে অহিংসা-নীতি ভীরুর অহিংসা বা মেকী অহিংসা। ইংরেজের সামনে আজ গোলাগুলি বাহির করিয়া স্বরাজের জন্য লড়িবার শক্তি নাই—উক্ত অহিংসা তখন তাহারই অভিব্যক্তি হয়। ঐ মেকী অহিংসা আমাদিগকে ধোঁকা দিবে—স্বরাজও দিবে না আর ইংরেজ-পরিত্যক্ত ভারতবর্ষে আত্মরক্ষারও শক্তি দিবে না। কংগ্রেসের যুদ্ধমান অহিংস নীতির সমর্থন করা অথচ দেশরক্ষার জন্য হিংসা-অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার ভিতর চিন্তার সামঞ্জস্য নাই। দেশরক্ষা বলিতে ভারতেই হউক আর চেক-চীন-আবিসীনিয়া দেশেই হউক, অহিংস-নীতি একই।

তবু

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তবু তুমি এক বার পিছনেতে চাও।

সেই সব রূপকথা রাত :
তোমার আলোতে তারা ধানের শীষের মত
হয়েছিল সোনালী-সবুজ।
জীবনের হিসেবী দেবতা
নিয়ে গেছে
সময়ের রথে।

তবু তুমি এক বার পিছনেতে চাও।
জীবনের সিংহাসনে যৌবনের মুকুতা-মুকুটে
সেই অভিষেক-দিন :
দীপ্ত তলোয়ার!

তারা চলে গেছে, এতে ক্ষোভ নেই।
শুধু আজ মন্থর প্রহরে
রথের চাকার ধ্বনি থেকে থেকে শুনি ;
সোনালী ধানের বোঝা চলে গেল দূরে ;
প্রতিটি মুহূর্ত্ত আজ ঝিরঝিরে বালি
ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়ে।

তবু তুমি এক বার পিছনেতে চাও।

দারা শুকোর কান্দাহার-দুর্গ আক্রমণ ও পরাজয়

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

কান্দাহার-দুর্গের অবরোধকার্য্যে শাহজাদা তাঁহার মীর-আতিশ জাফরের প্রতি প্রথম হইতে নানা রকমে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইহাতে জাফরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও শাহজাদার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শের হাজী বুরুজের সম্মুখের পরিখা হইতে জল বাহির করিয়া উহার উপর দিয়া আক্রমণের রাস্তা প্রস্তুত এবং বড় বড় কামান হইতে গোলা দাগিয়া বুরুজের দেওয়াল ভাঙিবার জন্য কাসিম খাঁ, আবদুল্লা, ইজ্জৎ খাঁ এবং জাফর যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মনের মিল বা সহযোগিতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। শেষোক্ত তিন জন দারার নিজ তাবিনের মনসবদার। শাহজাদার প্রিয়-পাত্র হওয়ার জন্য তাহারা এক জন আর এক জনের বিরুদ্ধে আড়ালে নিন্দা করিতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের ঝগড়া চরমে উঠিল। এক দিন ইজ্জৎ খাঁ প্রকাশ্যে শাহজাদাকে বলিয়া ফেলিল—বান্দা-পরোবর! জাফরের মত পাজীদের উপর ভরসা করিলে ও অতিরিক্ত মেহেরবানি দেখাইলে কাজটাই পণ্ড হইবে। আবদুল্লা ও জাফর পাশাপাশি মোর্চ্চা হইতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া দুর্গ-পরিখার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আবদুল্লা জাফরকে অনুরোধ জানাইল, যে-পর্য্যন্ত তাহার নিজের সুড়ঙ্গ জাফরের সুড়ঙ্গের বরাবর এক লাইনে না পৌছে, সে-পর্য্যন্ত জাফর যেন কাজ স্থগিত রাখে। জাফর সরল বিশ্বাসে তদনুযায়ী কাজ বন্ধ রাখিল। চার দিন পরে আবদুল্লা চুপি চুপি জাফরের সুড়ঙ্গের চেয়ে আরও বেশী অগ্রসর হইয়া শাহজাদাকে জানাইল, "হুজুর! খন্দকের কাজে আমি জাফরের চেয়ে কয়েক কদম আগেই আছি!" একথা জাফরের কানে পৌছা মাত্র সে ক্রোধে দিশাহারা হইয়া দরবারে আবদুল্লার সাতপুরুষের বাপান্ত করিল, গরীব-নেবাজ্ আমি তুরানী; পেঁচপ্যাচ আমরা বুঝি না। আবদুল্লা হারামজাদা রাফিজী—বেইমান্ শিয়া ইরানী, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত; সে আমাকে ফাঁকি দিয়া বাহাদুরি নিতে চায়, যাহার সঙ্গে পাশাপাশি নমাজ করিলে নমাজ কবুল হয় না, তাহার সঙ্গে আমি কাজ করিব না।" স্বয়ং শাহজাদা অনেক মিষ্ট কথা বলিয়াও জাফরকে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শের হাজী বুরুজ মোটামুটি আক্রমণের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। পরিখার জল কিছু বাহির করিয়া গাছের ডালপালা ও মাটির বস্তা ফেলিয়া উহা ভরাট করা হইয়াছিল। ৬ই আগষ্ট মরিয়ম, কিলাকুশা ও কয়েক দিন পরে ফতে-মোবারক্ তোপ শিবিরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ভারী লোহার গোলা সঙ্গে না থাকায় ঐগুলি কোন কাজেই আসিল না, কিলাকুশা হইতে নিক্ষিপ্ত নরম পাথরের গোলা হাওয়াতেই ফাটিয়া নিজ পক্ষের লোকগুলি জখম করিল। পাথরের গোলা শনের দড়ি দিয়া মুড়িয়া পরীক্ষা করা হইল—ফলাফল সহজেই অনুমেয়। ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ-দের কয়েক জন শত্রুদুর্গে পলাইয়াছিল; বাকী কয়েক জন ছিল হিন্দুস্থানীদের মতই ওস্তাদ। সর্ব্বসুদ্ধ ২৭০০০ গোলা দাগিয়াও মোগল তোপখানা দুর্গ-প্রাচীরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই; ইরানী তোপ সমান জোরে জবাব দিতে লাগিল। কিন্তু দরবারী রিপোর্টে লেখা হইল শাহজাদার তোপখানা শের হাজী বুরুজের তিন শত গজ দেওয়াল ধূলিসাৎ করিয়াছে। জাফর ও ইজ্জৎ খাঁ শাহজাদাকে জানাইল তাহাদের মোর্চ্চার সামনের দেওয়াল তোপের গোলায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে; এখন দুর্গ আক্রমণ করা যাইতে পারে।

আগষ্ট মাসের ২১এ তারিখে শাহজাদা দুর্গ আক্রমণের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। সরকারী সিলাহ-খানা

(অস্ত্রাগার) হইতে লৌহনির্ম্মিত বখ্তর, জিরাহ্ ইত্যাদি নানা রকমের বর্ম্ম অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হইল। আক্রমণের সময় কোন্ কোন্ মনসবদার কোন্ মোর্চ্চা হইতে সৈন্য পরিচালনা করিবেন শাহজাদা কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজেই তাহা ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলেন। ঢোল-সহরতে ডেরায় ডেরায় জানাইয়া দেওয়া হইল দুই-এক দিনের মধ্যেই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে। যাহারা সিপাহী নয় এবং হামলায় শরিক হওয়ার হিম্মৎ যাহাদের নাই তাহারাও ঠিক সেই সময়ে নমাজ দোওয়া পড়িবার জন্য যেন তৈয়ার থাকে। শাহজাদা সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মোটা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন—প্রত্যেক লাল টুপিওয়ালা কিজিলবাশ্ সিপাহীর কাটা মাথার দাম ৫৲ এবং জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে এক আশরফি ইনাম।

সমস্ত বন্দোবস্ত নিজের বুদ্ধিতে এক রকম পাকাপাক করিয়া শাহজাদা পরদিনই সকালবেলা (২২এ আগষ্ট) সলাহ্‌পরামর্শ করিবার জন্য মনসবদারগণকে নিজ তাঁবুতে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। মহাবৎ খাঁ (ছোট), মীর্জ্জা-রাজা অম্বরপতি জয়সিংহ এবং নেজাবৎ খাঁ যথাসময়ে হাজির হইলেন। ইঁহারা সকলেই পাঁচ-হাজারী। কিলিচ খাঁ খবর দিলেন তিনি জোলাপ লইয়াছেন, বিকালবেলা আসিবেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পাঁচ-হাজারীদের মুখ নিতান্ত গম্ভীর, দরবারী কায়দায় হাসি ও সৌজন্যের অন্তরালে অন্তঃরুদ্ধ রোষবহ্নি যেন ধূমায়মান। শাহজাদা প্রথমে মহাবৎ খাঁর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জাফর ও ইজ্জৎ খাঁর মোর্চ্চার বিপরীত দিকস্থ দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভাঙিয়াছে; আক্রমণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি?" এই মহাবৎ খাঁ সেই মহাবৎ খাঁর পুত্র—যিনি অত্যন্ত রাজভক্ত হইয়াও জাহাঙ্গীরের মুখের উপর নূরজাহান সম্বন্ধে যা-তা বলিবার সাহস রাখিতেন এবং অবশেষে জাহাঙ্গীরকে কিছু কালের জন্য নজরবন্দী করিয়াছিলেন। বাপের মত ছেলের মুখের আড় ছিল না, ইনি পরবর্ত্তী কালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উপর মোল্লাদের মুরুব্বিয়ানাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "জাঁহাপনা, কাফের শিবাকে শায়েস্তা করিবার জন্য আমাদের মত গোলামের প্রয়োজন কি? শেখ্-উল্-ইস্‌লাম্ সাহেব (আব্দুল-ওহাব) নর্ম্মদা পার হইয়া এক ফতোয়া জারি করিলেই কাজ হাসিল হইবে!" মহাবৎ খাঁ শাহজাদাকে কিছুমাত্র সমীহ না করিয়া জবাব দিলেন, "আমরা হুজুরের গোলাম; হুকুম তামিল করা ব্যতীত বান্দার আর কোন কাজ নাই। রাজা-বাদশারাই কেবল বাদশাহকে পরামর্শ দিতে পারে।" শাহজাদা মহাবৎ খাঁকে বলিলেন, "আপনি দৌলতাবাদ-দুর্গ-বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ মহাবৎ খাঁর পুত্র, আপনি কান্দাহার জয় করিয়া পিতার সুনাম রক্ষা করুন।" কিন্তু তোষামোদও বিফল হওয়াতে দারার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। দু-চার কথার পর তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কান্দাহার দখল না করিয়াই আপনি বাড়ী ফিরিবার ফিকিরে আছেন দেখিতেছি। এ-রকম বেহুদা খেয়াল ও বদমতলবকে মনে জায়গা না দেওয়াই ভাল (বেহ্‌তর্)।"

ইহার পরে দারা দুর্গ আক্রমণ করা সমীচীন কিনা এ-বিষয়ে নেজাবৎ খাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। ইরানীয় রাজবংশের রক্ত ও আভিজাত্য-গৌরব নেজাবৎ খাঁর চরিত্র ও কার্য্যে তাহার বৃথা অহঙ্কার, অনুচিত ঔদ্ধত্য এবং দুঃসাহসিকতায় প্রকাশ পাইত। কান্দাহার-অভিযানের পূর্ব্বে তিনি একবার কুমায়ুন-গড়োয়ালের নাক-কাটি রাণীর রাজ্য আক্রমণ করিয়া চরম দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন; তবে নাকটা কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছিল। কান্দাহারে আসিয়া নেজাবৎ খাঁ প্রথম হইতেই অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছিলেন; আব্-দোজদ দরজার সামনে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় শাহজাদা শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গের সৈন্যের সহিত বুস্ত দুর্গে যাইবার আদেশ দিলেন। এই আদেশও প্রথমে অমান্য করিয়া পরে অন্যান্য আমীরদের অনুরোধে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন; পরে শাহজাদার সঙ্গে মিটমাট হওয়ায় কান্দাহারে আসিয়াছিলেন। এবার তাঁহার সুর কিছু নরম হইয়াছিল। তিনি নিবেদন করিলেন—আক্রমণ করার পূর্ব্বে আরও তিন-চার দিন গোলা বর্ষণ করিয়া দুর্গের প্রাচীর জমিন বরাবর করিলেই ভাল হয়। দারা ইহাতে বিষম

চটিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আপনি বলিতে চান কেল্লার পর্দ্দা এখনও ভাঙা হয় নাই? দেওয়াল ফুটা হউক আর নাই হউক আক্রমণ করিতেই হইবে।"

অতঃপর কচ্ছবাহ্-পতি মীর্জ্জা-রাজা জয়সিংহের পালা আসিল। জয়সিংহ নাবালক বয়স হইতে যুদ্ধ করিয়া চুল পাকাইয়াছিলেন। সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও যুদ্ধকৌশলে তাঁহার সমকক্ষ সেনাপতি সেকালে ছিল না। পরবর্ত্তী কালে সুচতুর সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইঁহাকেই ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া অদম্য শত্রু শিবাজীকে দমন করিয়াছিলেন। ম্যনুচী লিখিয়া গিয়াছেন, শাহজাদা দারা নাকি এক দিন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন রাজা সাহেবকে এক জন নাটুয়ার (musician) মত দেখায়। জয়সিংহ পাতলা গড়নের লোক ছিলেন, তাঁহার লম্বা চওড়া শরীর, মুখে ভয়সঞ্চারী দাড়ি কিংবা গালপাট্টা ছিল না। সেকালের রাজপুতদের মত তিনি দাড়ি কামাইতেন, কানে কুণ্ডল, হাতে বাজুবন্ধ ও গলায় মুক্তার মালা পরিতেন। হয়ত শাহজাদা রসিকতা করিয়া এ-কথা বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি দারার কোন আক্রোশ ছিল না। সমসাময়িক চিঠি-পত্রে দেখা যায় তিনি মীর্জ্জা-রাজাকে যথেষ্ট খাতির তোয়াজ করিতেন। বালক সুলেমান শুকোর বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই এক চিঠিতে তিনি রাজাকে লিখিয়াছিলেন, সুলেমান শুকো আপনাকে সেলাম জানাইতেছে। কিন্তু জয়সিংহ কথায় ভিজিবার পাত্র ছিলেন না। রাজপুতসুলভ সরলতা, ঔদার্য্য এবং ভাবের উচ্ছ্বাস জয়সিংহের চরিত্রে ছিল না। কথায় ও কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী, ভিতরে টগ্‌বগ্ করিলেও বাহিরে একেবারে ঠাণ্ডা বরফ, তাঁহার হাতে সাপ মরিলেও লাঠি ভাঙিত না।

রাজা জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে ইতিপূর্ব্বে দুই বার কান্দাহার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এবার শাহজাদা দারার ভাব দেখিয়া অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহই রহিল না। জাফর প্রভৃতির দাপট ও বাহ্বাস্ফোটে অন্যান্য প্রবীণ পাঁচ-হাজারীগণের ন্যায় তিনিও নিজকে অবজ্ঞাত ও অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। শুনা গিয়াছিল, একবার কান্দাহারের দুর্গাধ্যক্ষ জুলফিকর খাঁ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যদি রাজা জয়সিংহ, মহাবৎ খাঁ ও কিলিচ খাঁ কথা দেন তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ইহাতে নাকি বিরক্ত হইয়া শাহজাদা বলিয়াছিলেন—জুলফিকর যদি আসিতে চায় জাফর ও ইজ্জৎ খাঁর প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া সে আসিতে পারে, তাহাদের কৌল ও জবান্ আমার প্রতিশ্রুতির সমান। ব্যাপারটা আদৌ সত্য না হইলেও নিশ্চয় পাচ-হাজারী মনসবদারগণ এই জনরবকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত মনে করিয়াছিলেন।

দারার সহিত কান্দাহারে আসিয়া মীর্জ্জা-রাজা জয়সিংহ অবরোধকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার মোর্চ্চায় কাজ আশানুরূপ অগ্রসর না হওয়ায় তাগিদ দিবার জন্য শাহজাদা তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি জবাব দিলেন, "আমরা রাজপুত। গর্ত্ত খোঁড়া ও কেল্লা ঘের দেওয়া আমাদের কাজ নয়, বরং অন্য কাহাকে ইচ্ছা করিলে শাহজাদা এই মোর্চ্চা সোপর্দ্দ করিতে পারেন (২৮ মে ১৬৫৩)।" ইহার পর এক দিন রাজার অতি নিকটেই একটি ইরানী তোপের গোলা ফাটিয়াছিল, তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পাইলেন। দুর্দৈব নিবারণার্থ মীর্জ্জা-রাজা সেখানে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। ৩০এ জুলাই শাহজাদা মীর্জ্জা-রাজাকে ডাকাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া গা-বাঁচান-গোছের কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এবার শাহজাদা মীর্জ্জা-রাজার দিকে ফিরিয়া সোজাসুজি বলিলেন, "রাজাজীউ! কান্দাহারে আপনার মেহনৎ ও কোশিশ্ আশানুরূপ দেখা যায় নাই। এখন কোন অজুহাত শুনা হইবে না। এই তিন বারের বার যদি কান্দাহার দখল না করিয়া ফিরিয়া যান, তবে কেমন করিয়া হিন্দুস্থানের জনানার কাছে মুখ দেখাইবেন? মরদ হইয়াও যাহারা বার-বার অকৃতকার্য্য হইয়া এখান হইতে ফিরিয়াছে তাহারা সত্যই আওরতের চেয়েও না-মরদ।" এবার মীর্জ্জা-রাজার মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোকও গরম

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সহিত শাহজাদার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হইল। শাহজাদা ক্রোধে অস্থির হইয়া রাজাকে বলিলেন, "দুর্গ আক্রমণে আপনার সম্মতি থাকুক আর নাই থাকুক, আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি কেল্লা চড়াও করিতেই হইবে; আপনি মারা যান কি দুর্গ দখল করেন উহাতে কিছু আসে যায় না।" এই বলিয়া শাহজাদা গম্ভীর ভাবে সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়া দরবার বরখাস্ত করিলেন। উপস্থিত মনসবদারদের মধ্যে জাফর, ইজ্জৎ খাঁ ও রাজা রাজরূপ এই তিন জনই দুর্গ আক্রমণের স্বপক্ষে মত দিয়াছিল। বেচারা বৃদ্ধ কিলিচ খাঁ বৈকালে শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই শাহজাদা বলিলেন, "দুর্গ আক্রমণ করাই স্থির; আপনি ফাতেহা পাঠ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন।"

২৩এ আগষ্ট সমস্ত রাত্রি মোগল-বাহিনী আক্রমণের জন্য সুসজ্জিত হইয়া জাগিয়া রহিল। শাহজাদা দারা স্বয়ং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তুত আছে কিনা দেখিলেন। রাত্রি তিন ঘড়ি অবশিষ্ট থাকিতে সৈন্যদল দুই দিক্ হইতে যুগপৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। ইজ্জৎ খাঁর মোর্চ্চা হইতে জাহাঙ্গীরবেগ এক হাজার অশ্বারোহী এবং দুইটি জঙ্গী হাতীসহ দেওয়ালের ভাঙা অংশের দিকে অগ্রসর হইল। প্রথমে মনে হইল ইরানীরা ঐ স্থান অরক্ষিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অতি নিকটে পৌঁছামাত্র হঠাৎ ভীষণ ভাবে তিন দিক্ হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি ও তীর বর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইজ্জৎ খাঁ নাকি এ সময়ে নিজের তাঁবুতে জামা খুলিয়া গায়ে গোলাপ-জল ছিটাইতেছিল! জাফরের মোর্চ্চা হইতে কাসিম খাঁ, কিলিচ খাঁ এবং মীর্জ্জা আবদুল্লা অসম সাহসে দুর্গের সম্মুখস্থ অংশ আক্রমণ করিলেন, এস্থানে যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়াছিল। কিন্তু শাহজাদার প্রিয়পাত্র নাকি এ সময় খোশমেজাজে তাঁবুতে বসিয়া রুটি, পিঁয়াজ ও তরমুজ (হিন্দুয়ানা) খাইতেছিল। রাজা মুকুন্দ সিংহ হাড়া এবং নেজাবৎ এই মোর্চ্চায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। নেজাবৎ খাঁ রাজা মুকুন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজাজীউ! এ কেমন কথা? আপনি যে সিপাহীদিগকে হামলা করিবার জন্য পাঠাইতেছেন না?" রাজা উত্তর দিলেন, "খাঁ-বাহাদুর! আমার সৈন্যেরা সাধারণ ভাড়াটিয়া সিপাহী নহে—আমার সগোত্র ভাই-বেরাদর। আমি নিজে স্বয়ং যে জায়গায় যাইব না সেখানে ইহাদিগকে পাঠাইতে পারি না।" নেজাবৎ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "বাদশার কাজে ভাই কিংবা ছেলের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। কথাটা উগ্রপ্রকৃতি হাড়া রাজপুতের বুকে তীরের মত বিদ্ধ হইল। নেজাবতের পুত্র মহম্মদ কুলী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মুকুন্দ সিংহ মহম্মদ কুলীর হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গের দিকে ধাবিত হইলেন; নেজাবৎ প্রথমে মনে করিয়াছিল রাজপুত শুধু তামাশা করিতেছে, কিন্তু যখন দেখিল মুকুন্দ সিংহ প্রায় বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়াছে অথচ তাঁহার ছেলেকেও ছাড়িতেছে না তখন তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে জুতা ফেলিয়া মোজা পায়ে ঐ দিকে দৌড় দিলেন এবং অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া রাজার হাত হইতে নিজের ছেলেকে মুক্ত করিলেন। মীর্জ্জা-রাজা জয়সিংহের মোর্চ্চা হইতে দুই জন লোক মই লইয়া দুর্গের দিকে যাইতেছিল; ইরানীদের গুলিতে দুই জনই ধরাশায়ী হইল। মীর্জ্জা-রাজা ইহাকেই যথেষ্ট নিমকহালালী মনে করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। মহবৎ খাঁ তাঁহার দমদমা হইতে আদৌ বাহির হইলেন না। তাঁহার হুকুমে লতাইফ্-উল-আখবার-লেখক নিকটস্থ একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়ের মত খাঁ-সাহেবকে যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনাইতেছিলেন।

অপর দিক্ হইতে কাইতুল পাহাড়ের উপর এ সময় মোগল-সৈন্যের এক অংশ আক্রমণ চালাইতেছিল। বারাহ্-বাসী সাহসী সৈয়দগণ এবং বাদশাহী আহদী সৈন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও জয়ী হইতে পারিল না। পরদিন এক প্রহর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মোট চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলিয়াছিল; এ যুদ্ধে শাহজাদার এক হাজার সৈন্য হত এবং এক হাজার আহত হইয়াছিল। মোগল-বাহিনী বিফলমনোরথ হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। সেদিন কান্দাহার-দুর্গে সারাদিনব্যাপী গানবাজনা ও উৎসব চলিল। ইরানীরা হিন্দুস্থানীদের মোর্চ্চার নিকট প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া নানা রকম কৌতুক ও মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। অধিকন্তু ঐখানে দু-জন ভাল নাচওয়ালী আনাইয়া হিন্দুস্থানীদিগকে ইরানী নাচের মহড়া দেখাইল। পরের দিন ধর্ম্মনিষ্ঠ জুলফিকর খাঁ দয়াপরবশ হইয়া অনুমতি দিলেন শত্রুপক্ষীয় মুসলমানের লাসগুলি শুধু হিন্দুস্থানীরা বিনা বাধায় উঠাইয়া লইতে পারে, কিন্তু তিনি হিন্দুদের লাস উঠাইতে দিলেন না। তাহাদের পাঁচ শত ছিন্ন মুণ্ড ইরানীরা লইয়া গেল; ধড়গুলি শকুনি-গৃধিনীর ভক্ষ্য হইল।

আলবার্ট আইনষ্টাইন
বর্ত্তমান বর্ষে এই মনীষীর বয়ঃক্রমের ষাট বৎসর পূর্ণ হইল
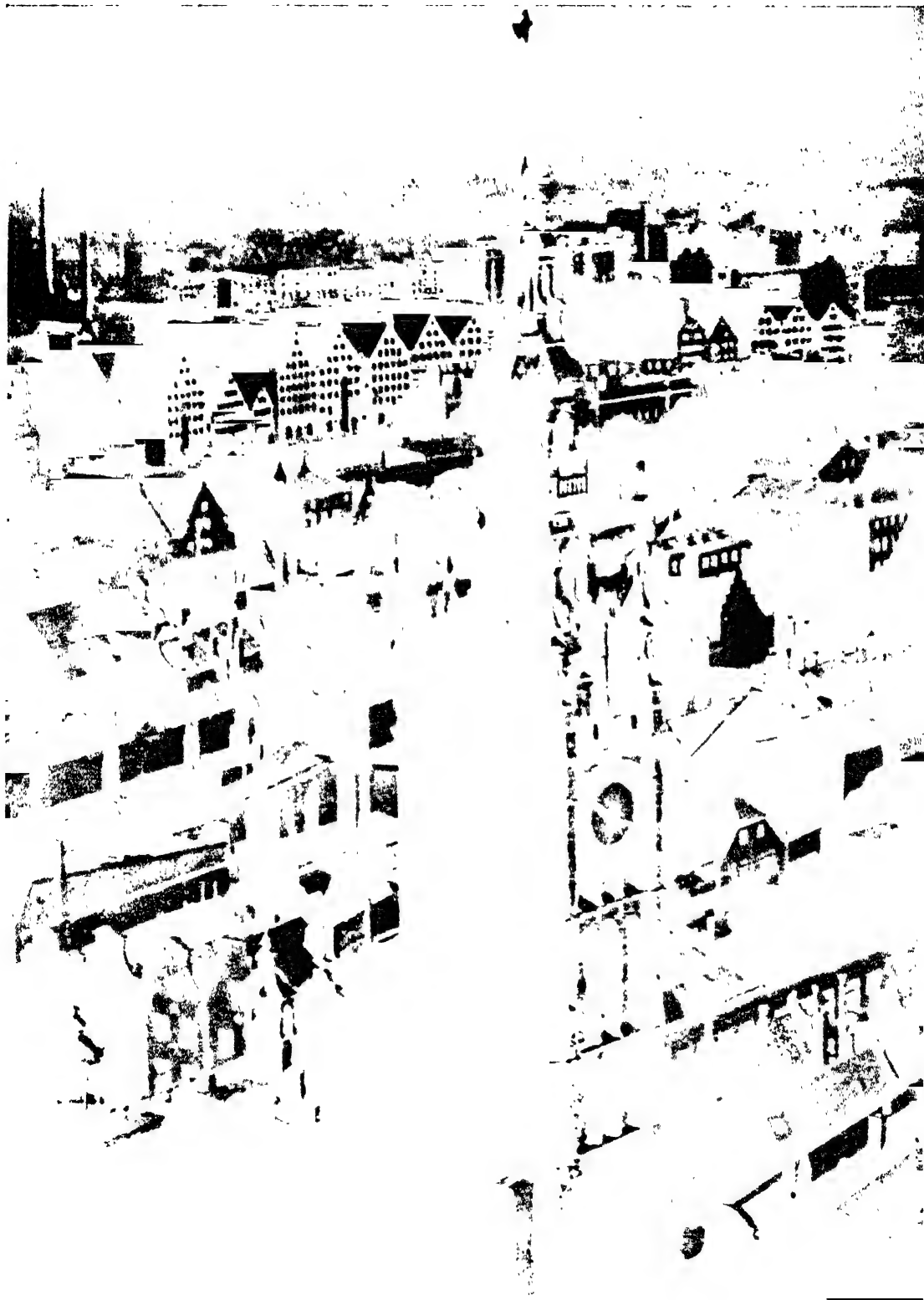
ডানজিগের টাউন হল

[ডানজিগের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে 'পোলণ্ড ও পিলস্যুড্স্কি' প্রবন্ধ ও "দেশ-বিদেশের কথা" দ্রষ্টব্য]
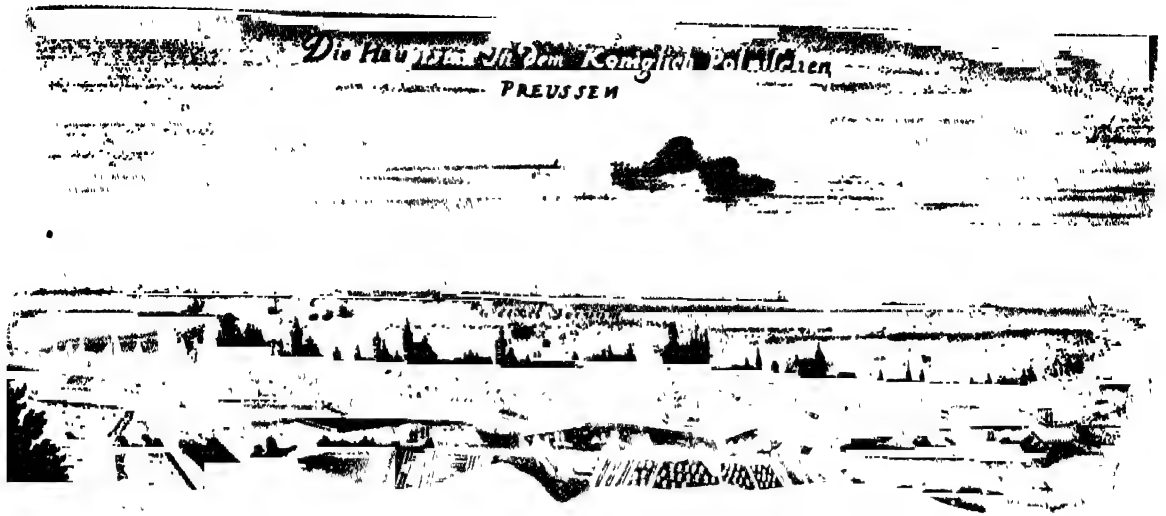
ডানজিগের প্রাচীন চিত্র

ডানজিগের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে "পোলণ্ড ও পিলসুডস্কি" ও "দেশ-বিদেশের কথা" দ্রষ্টব্য।
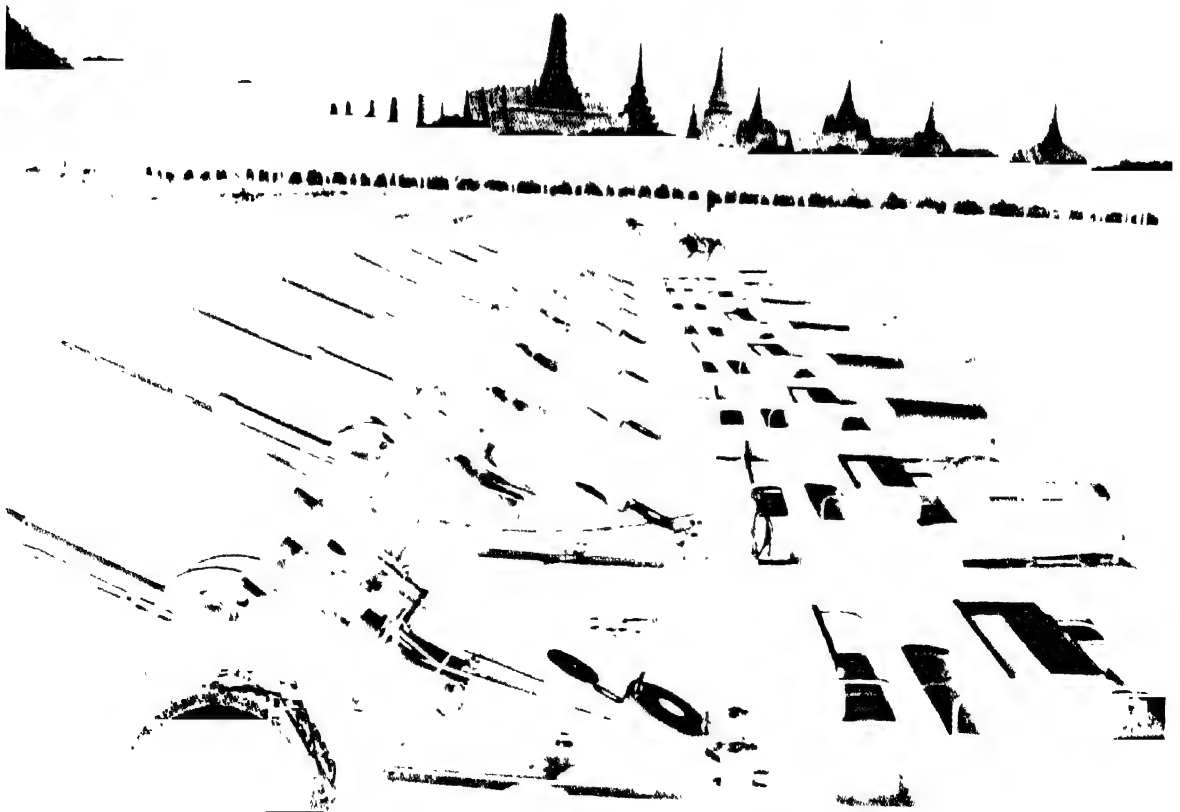
শ্যামদেশের সমরসজ্জা। আকাশপথে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কামান

এরোপ্লেন-বিনাশী কামান

["পঞ্চশস্য" দ্রষ্টব্য]

এরোপ্লেন-নাশক কামানের দিক- ও লক্ষ্য- নির্ণয়যন্ত্র। এই যন্ত্রের সঙ্গে এক সঙ্গে অনেকগুলি কামানের যোগ থাকে। ইহা দ্বারা এরোপ্লেনের দূরত্ব, উচ্চত, গতি ও দিক দ্রুত নির্ণয় করা যায় এবং তাহা ঠিক হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সব কয়টি কামান নির্দ্দিষ্ট দিকে এক সঙ্গে ঘুরাইয়া "তাক" করা যায়।
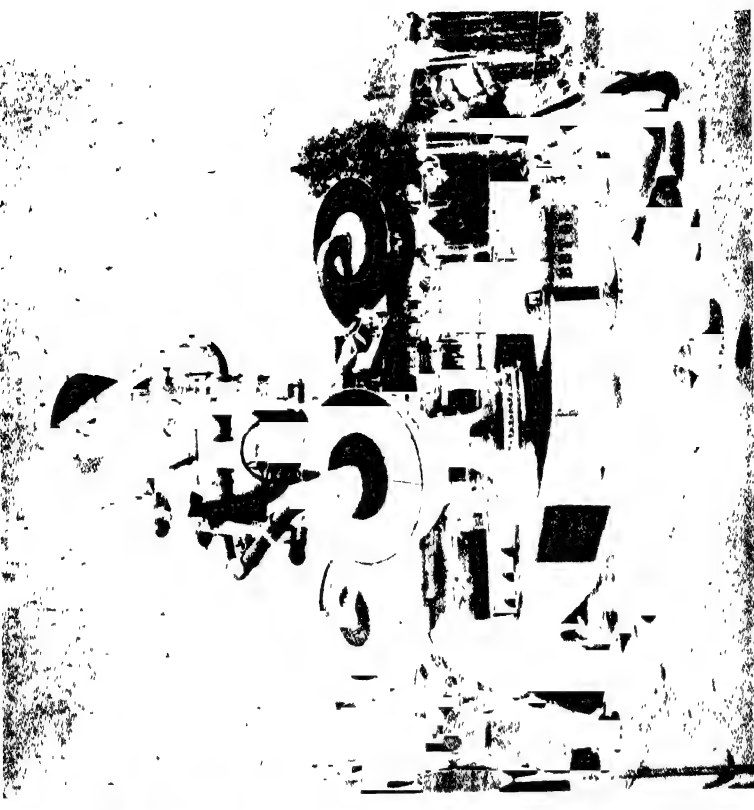
দূর-শ্রবণ যন্ত্র। দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের এরোপ্লেনের ক্ষীণ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় এবং বিভিন্ন প্রকারে স্থাপিত মাইক্রোফোনগুলি কোন্ দিকে ঘুরাইলে শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয় তাহা দেখিয়া, কোন দিক হইতে এরোপ্লেন আসিতেছে তাহা সঠিক ধরা যায়। রাত্রে ইহার সাহায্যে এরোপ্লেনের আকাশপথ অতি সহজে ধরা যায়।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

এক বৎসরের মধ্যেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অবস্থা হইয়া গেল বজ্রাহত তালগাছের মত। তালগাছের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই সে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় না। দিন কয়েকের মধ্যেই পাতাগুলি শুকাইয়া যায়, তার পর শুষ্ক পাতাগুলি গোড়া হইতে ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়ে, ক্রমে সেগুলি খসিয়া যায়, অক্ষত-বহিরঙ্গ সুদীর্ঘ কাণ্ডটা ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পুরাকীর্ত্তির স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অবস্থাও হইল সেইরূপ, মহীন্দ্রের মামলাতেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বিষয়সম্পত্তি প্রায় শেষ হইয়া গেল। থাকিবার মধ্যে থাকিল বজ্রাহত তাল-কাণ্ডের মত প্রকাণ্ড বাড়ীখানা, সেও সংস্কার-অভাবে জীর্ণ, শ্রীহীনতায় রুক্ষ-কৃষ্ণবর্ণ। ইহারই মধ্যে বাড়ীটার অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসিয়া গিয়াছে, চুনকামের অভাবে শেওলায় ছাইয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। মহীন্দ্রের মামলায় দুই হাজারের স্থলে খরচ হইয়া গেল পাঁচ হাজার টাকা। মজুমদারের বন্দোবস্তে টাকার অভাব হয় নাই, হ্যাণ্ডনোটেই টাকা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু টাকা থাকিতেও বাকী রাজস্বের দায়ে এক দিন সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেল। ভাগ্যের এমনি বন্দোবস্ত যে, নিলামটা হইল, যে-দিন মহীন্দ্রের মামলার রায় বাহির হইল সেই দিনই। মামলার এই চরম উত্তেজনাময় সঙ্কটের দিনেই ছিল নিলামের দিন, তাই মজুমদারের মত লোকও এ-কথাটা বিস্মৃত হইয়া গেল। যখন খেয়ালে আসিল তখন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। রায়-বাড়ীর অনেকে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে এজন্য আক্ষেপ উঠিল না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের তো বজ্রনাদে শিহরিয়া উঠিবার অবকাশ হয় না! মামলায় মহীন্দ্রের দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়া গেল, সেই আঘাতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তখন নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল, মহীন্দ্রের গুরুতর শাস্তি কিছু হইবে না। সমাজের নিকট মহীন্দ্রের অপরাধ, ননী পালের অন্যায়ের হেতুতে মার্জ্জনার অতীত বলিয়া বোধ হয় নাই, কিন্তু বিচারালয়ে সরকারী উকীলের নিপুণ পরিচালনায় সে অপরাধ অমার্জ্জনীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া গেল। মায়ের অপমানে সন্তানের আত্মহারা অবস্থার অন্তরালে তিনি বিচারক ও জুরীগণকে দেখাইয়া দিলেন—জমিদার ও প্রজার চিরকালের বিরোধ। সওয়ালের সময় তিনি ঈশপের নেকড়ে ও মেষশাবক গল্পটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এ অপরাধ যদি ঐ অপমানসূচক কয়টি কথার ভারে লঘু হইয়া যায়, তবে ঈশপের নেকড়েরও মেষশাবক-হত্যার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধ হয় নাই। কারণ সেও অভিযোগ তুলিয়াছিল যে, মেষশাবক নেকড়েকে গালিগালাজ করিয়াছিল। ঐ অপমানের কথাটা ঈশপের গল্পের মত দুরাত্মার একটা ছল মাত্র, আসল সত্য হইল—উদ্ধত জমিদার-পুত্র, এই হতভাগ্য তেজস্বী প্রজাটিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হিসাবে হত্যা করিয়াছে, এবং সে-কথা আমি যথাযথরূপে প্রমাণ করিয়াছি বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর যে কথা-কয়টিকে মর্ম্মান্তিক অপমানসূচক বলিয়া, চরম উত্তেজনার কারণ স্বরূপ ধরা হইতেছে—সে কথাও মিথ্যা কথা নয়,—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আসামীর—;

—কেন আপনি মিথ্যে বকছেন? উকীলের সওয়ালে বাধা দিয়া মহীন্দ্র বলিয়া উঠিল। সে কাঠগড়ার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উকীলের বক্তব্যের প্রারম্ভ শুনিয়াই সে তৈলহীন রুক্ষ পিঙ্গল চুল, পিঙ্গল চোখে তীব্র দৃষ্টি লইয়া, মূর্ত্তিমান উগ্রতার মত বলিয়া উঠিল, —কেন আপনি মিথ্যে বকছেন। হ্যাঁ—উদ্ধত প্রজা হিসেবেই তাকে আমি গুলি করে মেরেছি!

সরকারী উকীল বলিলেন—দেখুন, দেখুন, আসামীর

মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখুন। প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জলন্ত এবং জীবন্ত নিদর্শন!

ইহার পর চরম শাস্তি হওয়াই ছিল আইনসঙ্গত বিধান। কিন্তু বিচারক ঐ অপমানের কথাটাকে আশ্রয় করিয়া এবং অল্প বয়সের কথাটা বিবেচনা করিয়া সে শাস্তিবিধানের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ওদিকে সম্পত্তি তখন নিলাম হইয়া বসিয়া আছে, ডাকিয়াছেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মহাজন মজুমদার-মহাশয়েরই শ্যালক। লোকে কিন্তু বলিল মজুমদারের বেনামদার।

মহীন্দ্র অবিচলিত ভাবেই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল। রায় দিয়া এজলাস ভাঙিয়া বিচারক বলিলেন—I admire his boldness! সাহসের প্রশংসা করতে হয়!

সরকারী উকীল হাসিয়া বলিলেন—Yes sir! এর পিতামহ সাঁওতাল-হাঙ্গামার সময় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে মরেছিল। সামন্তবংশের খাঁটি রক্ত ওদের শরীরে—true blood!

মহীন্দ্র যোগেশ মজুমদারকে বলিল, দুঃখ করবেন না। আপীল করারও প্রয়োজন নেই। পারেন তো বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। বলবেন—বাবার ভার, অহির ভার সম্পূর্ণ এখন তাঁর উপর। অহিকে যেন পড়ান হয়, এম-এ পর্য্যন্ত।

সম্পত্তি নিলামের কথা সে শোনে নাই।

* * *

সুনীতি সব সংবাদই শুনিলেন। মহীন্দ্রের সংবাদ শুনিলেন সেই দিনই, তবে এ সংবাদটা শুনিলেন দিন দুই পর—অপরের নিকট; গ্রামে তখন গুজব রটিয়া গিয়াছিল। সুনীতি এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি মজুমদারকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, একি সত্যি?

মজুমদার নিরুত্তর হইয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীতি বলিলেন, বল ঠাকুরপো, বল! ভিক্ষে করতেই যদি হয়, তবে বুক আগে থেকেই বেঁধে রাখি, আর গোপন ক'রে রেখ না, বল!

মজুমদার এবার বলিল, কি বলব বৌঠাকরুন, আমি তখন মহীর মামলার রায় শুনে—

সুনীতি অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করিলেন—সব গেছে?

চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল, আজ্ঞে না, দেবোত্তর সম্পত্তি আমাদের নাখরাজ, এই গ্রাম—তার পর চক আফজলপুর—তার পর জমিজেরাত—এসব রইল।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, আর তাঁহার জানিবার কিছু ছিল না। মজুমদার একটু নীরব থাকিয়া বলিল, একটা কাজ করলে এক বার চেষ্টা করে দেখা যায়। বিষয় হয়ত ফিরতেও পারে! ঐ চরটার জন্যে অনেক দিন থেকে এক জন ধরাধরি করছে; ওটা বিক্রী ক'রে—মামলা ক'রে দেখতে হয় বিষয়টা যদি ফেরে।

সুনীতি বলিলেন, না ঠাকুরপো; ও চরটা থাক। ঐ চরের জন্যেই মহী আমার দ্বীপান্তরে গেল, ও চর মহী না-ফেরা পর্য্যন্ত পড়েই থাক।

মজুমদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে থাক। তা হ'লেও আমি ছাড়ব না, যাব এক বার আমি রবি ঘোষালের কাছে। টাকা নিয়ে সে সম্পত্তি ফিরে দিক।

সুনীতি হাসিলেন—বলিলেন, তিনিও তো অনেক টাকা পাবেন; সে টাকাই বা কোথা থেকে দেব বল! তুমি তো সবই জানিছ।

মজুমদার আর কিছু বলিল না। যাইবার জন্যই উদ্যত হইয়া উঠিল। কিন্তু সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, আর একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো। কথা বহুক্ষণ থেকেই বলব ভাবছি, কিন্তু পারছি না। বলছিলাম তুমি তো সবই বুঝছ, যে অবস্থায় ভগবান্ ফেললেন, তাতে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবই জবাব দিতে হবে। তোমার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে করব ঠাকুরপো?

মজুমদার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—তা বেশ তো, বৌঠাকরুন; আর কাজই বা এমন কি রইল এখন। লোকের দরকারই বা কি? তবে যখন যা দরকার পড়বে

আমি ক'রে দিয়ে যাব। যে আদায়টুকু আছে, সেও আমি না-হয় গোমস্তা হিসেবে ক'রে দেব। সরঞ্জামী কেবল লোগদীর মাইনেটাই দেবেন।

সুনীতি আর কোন কথা বলিলেন না, মজুমদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সেই দিনই সুনীতি, মানদা, বামুনঠাকরুন এমন কি চাকরটিকে পর্য্যন্ত জবাব দিয়া দিলেন। কিন্তু জবাব দেওয়া সত্বেও গেল না শুধু মানদা। সে বলিল—মা, আজ পঁচিশ বছর এখানে রয়েছি—ভেবেছিলাম চোখও বুজব এই বাড়ীতে। বাড়ীঘর আমার তো নেই কিছুই। এইখানেই দিনকতক থাকতে দিন আমাকে, একখানা খড়ে-বাঁশে ঘর আমি করে নিই।

সুনীতি একটু হাসিলেন মাত্র।

দিন দুয়েক পরের কথা। ইন্দ্র রায় মজুমদারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মজুমদার তাহার কাছারির ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন—আরে এস এস, মজুমদার-মশায়—এস!

মজুমদার প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু, আশয়-হীন লোককে মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়। আমি আপনাদের চাকর।

হাসিয়া রায় বলিলেন, বিষয় হ'লে আশয় হ'তে কতক্ষণ মজুমদার! এক দিনে এক মুহূর্ত্তে জন্মে যায়

মজুমদার চুপ করিয়া রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রায় বলিলেন, জান মজুমদার, আজকাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রী হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে—সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কি তফাৎ! তা আমি তোমার খান দুয়েক হাড় কিনে রাখতে চাই—পাশা তৈরি করাব।

মজুমদারের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। রায় আবার বলিলেন, রহস্য করলাম, রাগ ক'রো না। এখন একটা কাজ আমার ক'রে দাও, ঐ চরটা আমাকে ব'লে ক'য়ে বিক্রী করিয়ে দাও। ওটার জন্যে আমার আজও মাথা হেঁট হয়ে রয়েছে গ্রামে।

মজুমদার এবার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, চরটা ওঁরা বিক্রী করবেন না রায়মশায়।

—ওঁরা? ওঁরা কে হে? তুমিই তো এখন মালিক।

—আমার জবাব হয়ে গেছে।

—জবাব হয়ে গেছে? কে জবাব দিলে, রামেশ্বরের এখনও এদিকে দৃষ্টি আছে না কি?

—আজ্ঞে না। তিনি একেবারেই কাজের বাইরে গিয়েছেন। জবাব দিলেন গিন্নীঠাকরুন।

রায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, মেয়েটি শুনেছি বড় ভাল; সাবিত্রীর মত সেবা করেন রামেশ্বরের। এদিকে বুদ্ধিমতী ব'লেও তো বোধ হচ্ছে। না হ'লে—বাকীটুকুও তো অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে ইচ্ছা না হ'লে ফেলে চলে যায়, কিন্তু সাপের তো উপায় নেই—গিলতে আরম্ভ করলে শেষ তাকে করতে হয়। কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না মজুমদার।

এইবার মজুমদার বলিল, আজ্ঞে বাবু, টাকাও তো আমি পাঁচ হাজার দিয়েছি।

—তা দিয়েছ; কিন্তু মামলা খরচের অজুহাতে তার অর্দ্ধেকই তো আবার তোমারই ঘরে ঢুকেছে মজুমদার। আমি সবই জানি হে! আমার দুঃখটা থেকে গেল—চক্রবর্ত্তীদের আমি ধ্বংস করতে পারলাম না।

মজুমদার জবাব দিল—আজ্ঞে, পনর আনা তিন পয়সাই আপনার করা বাবু, ননী পালকে তো আপনিই খাড়া করেছিলেন।

রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও কাজটাতে আমি সুখী হ'তে পারি নি যোগেশ। এতখানি খাটো আমি জীবনে হই নি। রামেশ্বরের বড় ছেলে আমার গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। সেই কালি আমাকে মুছতে হবে। সেই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম। আর লোভ তুমি ক'রো না। ঐ চরের দিকে হাত বাড়িয়ো না, ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাক। ওরা না জানুক, তুমি জেনে রাখ—রক্ষক হয়ে রইলাম আমি।

মজুমদারের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; সে আপনার করতলের রেখাগুলির দিকে চাহিয়া বোধ করি আপনার

ভাবী ভাগ্যলিপি অনুধাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রায় সহসা বলিলেন—সাইকেলে ওটি রামেশ্বরের ছোট ছেলে নয়?

সম্মুখের পথে এক জন অতি দ্রুত সাইকেল চালাইয়া চলিয়াছিল, গতির দ্রুততা হেতু মানুষটিকে সঠিক চিনিতে না পারিলেও এ ক্ষেত্রে ভুল হইবার উপায় ছিল না। আরোহীর দেহবর্ণ উগ্র গৌর, তাহার ললাটের উপর পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে চঞ্চল হইয়া নাচিতেছে চক্রবর্ত্তীদের বংশ-পতাকার মত। মজুমদার দেখিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদের অহীন্দ্রই বটে!

রায় বলিলেন—ডাক তো, ডাক তো ওকে। এত ব্যস্ত ভাবে কোথা থেকে আসছে ও।

মজুমদারও চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বার-বার ডাকিল—অহি—অহি! শোন—শোন।

গতিশীল গাড়ীর উপর হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া একটা হাত তুলিয়া বলিল—আসছি! পরমুহূর্ত্তেই সে পথে মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমি যাই তাহ'লে বাবু। দেখি, অহি এমন ক'রে কোথা থেকে এল, খবরটা কি আমি জেনে আসি।

রায় বলিলেন, আমায় খবরটা জানিয়ে যেও মজুমদার।

* * *

দ্রুতবেগে গাড়ীখানা চালাইয়া বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া অহীন্দ্র একরূপ লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্যও সে ছুটিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু শুব্ধ বাড়ীখানার ভিতর হইতে একটি অতি মৃদু ক্রন্দনের সুর তাহার কানে আসিতেই তাহার গতি মন্থর, সকল উত্তেজনা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে ডাকিল—মা!

দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবকাশে সুনীতি আপনার বেদনার লাঘব করিতেছিলেন; মৃদু মৃদু বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। অহির ডাক শুনিয়া তিনি চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, দেরি করলি যে অহি? কালই ফিরে আসবি ব'লে গেলি! কণ্ঠস্বরে তাঁহার শঙ্কার আভাস।

অহি বলিল—হেডমাষ্টার মশায় কাল আসেন নি মা, আজ সকাল ন-টায় এলেন ফিরে।

—পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে?

—হ্যাঁ মা।

—তোর খবর?

—পাস হয়েছি মা।

—তবে বলছিস না যে। সুনীতির ম্লান মুখ এবার ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—বলতে ভাল লাগছে না মা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অহি বলিল, দাদা আমায় বলেছিলেন, ভাল করে পাশ করলে একটা ঘড়ি কিনে দেবেন, একটা রিষ্টওয়াচ।

সুনীতির চোখ দিয়া আবার জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অহি বলিল—আমি বড় অকৃতজ্ঞ মা। মাষ্টারমশায় বলিলেন, কম্পিট তুমি করতে পার নি, কিন্তু ডিভিসনাল স্কলারশিপ তুমি পাবেই। যে কলেজেই যাবে—সুবিধে অনেক পাবে। কোথায় পড়বে ঠিক ক'রে ফেল। আমি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলাম। সমস্ত পথটার মধ্যে দাদার কথা একবারও মনে পড়ে নি মা; বাড়ীতে এসে বাড়ী ঢুকতেই তোমার কান্নার আওয়াজে আমার সব স্মরণ হ'ল—দাদাকে মনে পড়ে গেল।

সুনীতি ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তুই ভাল ক'রে পড়ে টপ্ টপ্ করে পাস করে নে। তার পর তুই জজ হবি অহি। দেখবি, এমন ধারার অবিচার যেন কারও ওপর না-হয়। ততদিনে মহী ফিরে আসবে। সে বাড়ীতে বসে ঘর-সংসার দেখবে, তুই সেখান থেকে টাকা পাঠাবি।

অহি বলিল—একটা খবর নিলাম মা এবার। দশ বৎসর দাদাকে থাকতে হবে না। মাসে মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ হয়। বছরে দু-মাস তিন মাসও হয় ভাল ব্যবহার করলে। তাহ'লে তিন দশে তিরিশ মাস—আড়াই বছর বাদ যাবে দশ বছর থেকে। সাড়ে সাত বছর থাকতে হবে। আর দ্বীপান্তর লিখলেও আজকাল সকলকে আন্দামানে পাঠায় না। দেশেই জেলে রেখে দেয়।

উপরে রামেশ্বর গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া সুনীতি বলিলেন, বাবুকে প্রণাম করবি আয় অহি। ওঁকে খবর দিয়ে আসি; ওঁর কথাই আমরা সবাই ভুলে যাই।

মাটির পুতুলের মত একই ভাবে রামেশ্বর সেই খাটটির উপর বসিয়াছিলেন, সুনীতি সত্যসত্যই একটু আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ওগো, অহি তোমার পাস করেছে, স্কলারশিপ পেয়েছে। অহি রামেশ্বরকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, পাস করেছে—স্কলারশিপ পেয়েছে?

—হঁ্যা, ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

—হঁ্যা—হ্যা।

—ও এবার কলেজে পড়তে যাবে। যে কলেজেই যাবে, সেখানেই ওকে অনেক সুবিধে দেবে।

—বাঃ বাঃ। রাজা দিলীপের পুত্র রঘু—সমস্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরই নামে বংশের পর্য্যন্ত নাম হয়ে গেল রঘুবংশ। তুমি রঘুবংশ পড়েছ অহি, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ—"বাগর্থবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে—জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্!

অহি এবার বলিল—স্কুলে তো এ-সব মহাকাব্য পড়ান হয় না, এইবার কলেজে পড়ব।

—ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন—তাঁর নাম সেক্ষপীর। সে-সবও প'ড়ো।

—হঁ্যা, সেক্সপীয়ার পড়তে হবে বি-এ-তে।

এ-কথার উত্তরে আর রামেশ্বর কথা বলিলেন না। সহসা তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, যাও, তুমি এখন বেড়িয়ে এস।

সুনীতি বলিলেন—না—না, ও এখনও খায় নি। তুই এখানেই ব'স অহি, আমি খাবার এইখানে নিয়ে আসি।

রামেশ্বর তিক্তস্বরে বলিলেন,—না—না। যাও অহি, ভাল ক'রে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেল, স্নানই বরং কর। তার পর খাবে

পিতার অনিচ্ছা অহীন্দ্র বুঝিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুনীতি জলভরা চোখে বলিলেন—কেন তুমি ওকে এমন ক'রে তাড়িয়ে দিলে? এই জন্যেই—

বাধা দিয়া রামেশ্বর আপনার দুই হাত মেলিয়া বলিলেন—ছোঁয়াচে, ছোঁয়াচে, কুষ্ঠরোগ—।

সুনীতি আজ তারস্বরে প্রতিবাদ করিলেন—না, না। কবরেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা করে দেখেছে—ও রোগ তোমার নয়!

—জানে না, ওরা কিছুই জানে না—। বাহিরের সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া রামেশ্বর নীরব হইলেন। দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া অহীন্দ্র ডাকিল—মা!

—যাই আমি অহি। সুনীতি অভিমানভরেই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অহীন্দ্রই দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে রায়-গিন্নী হেমাঙ্গিনী—ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

দীর্ঘকাল পরে হেমাঙ্গিনী রামেশ্বরকে দেখিলেন। রামেশ্বরের কথা মনে হইলেই তাঁহার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিত রামেশ্বরের সেকালের ছবি। পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল, তাম্রাভ গৌরবর্ণ, বিলাসী কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল একটি যুবকের মূর্ত্তি। আর আজ এই রুদ্ধদ্বার অন্ধকার-প্রায় ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ স্তব্ধ শঙ্কাতুর এক জীর্ণ প্রৌঢ়কে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। চোখে তাঁহার জল আসিল। সুনীতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে সামাজিক ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে সুনীতির বিলম্ব হইল না। তিনি অতি ধীরভাবে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—আসুন, আসুন। দিদি আসুন। তাড়াতাড়ি তিনি একখানা আসন পাতিয়া দিলেন।

হেমাঙ্গিনী কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—এত খাতির করলে যে আমি লজ্জা পাব বোন! এ তো আমার খাতিরের বাড়ী নয়। তুমি তো আমার পর নও। তবে তুমি দিদি ব'লে সম্মান ক'রে দিলে—আমি বসছি। বলিয়া আসনে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি চোখ মুছিলেন। তার পর মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিলেন, পুরানো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়—না?

—না, না। আপনি রায়-গিন্নী, রায়-গিন্নী! মৃদুস্বরে

বলিলেও কথাটা রামেশ্বরের কানে গিয়াছিল, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতি সকরুণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া কথা কয়টি বলিলেন।

হেমাঙ্গিনীর চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, চিনতে পারেন নি। কই, আমাকে আদর ক'রে সম্মান ক'রে যে নাম দিয়েছিলেন, সে নামে তো ডাকলেন না!

রামেশ্বর বলিলেন—ভুলে যান, রায়-গিন্নী ও কথা ভুলে যান। দুঃখই যেখানে প্রধান রায়গিন্নী, সেখানে সুখের স্মৃতিতেই বা লাভ কি? ভগবান্ হলেন রসস্বরূপ—তিনি যাকে পরিত্যাগ করেছেন সে পরিবেশন করবার মত রস পাবে কোথায় বলুন!

হেমাঙ্গিনী গভীর স্নেহে অভিষিক্ত কণ্ঠস্বরে বলিলেন—না, না, এ কি বলছেন আপনি? ভগবান্ পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে? অহিকে দেখাইয়া বলিলেন—এমন চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে?

রামেশ্বর হাসিলেন, অদ্ভুত হাসি, সে হাসি-না দেখিলে কল্পনা করা যায় না, বলিলেন—সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে রায়-গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে। দেখি আপনাদের আশীর্ব্বাদ!

প্রসাধন যতই সযত্ন এবং সুনিপুণ হোক, দিনের আলোকে প্রসাধনের অন্তরালে স্বরূপ যেমন প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি ভাবেই রামেশ্বরের রূপক উক্তির ভিতর হইতে সদ্যসংঘটিত মর্ম্মান্তিক আঘাতের বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল। একই সঙ্গে সুনীতি ও রায়-গিন্নীর চোখ হইতে টপ টপ জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, অহি আর সহ্য করিতে পারিল না, সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বর সুনীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অহিকে খেতে দেবে না সুনীতি? ও তো এখনও খায় নি?

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—সে কি? আমিই তো তোমাকে বসিয়ে রেখেছি বোন! আর এখনও পর্য্যন্ত খায় নি? ম'রে যাই!

এতক্ষণে সুনীতি প্রথম কথা বলিলেন—শহর থেকে এই মাত্র ফিরল। তাই দেরি হয়ে গেল। পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে—তাই এই দুপুরেই না-খেয়ে ছুটে এসেছে।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বাছা আমার পাস হয়েছে নিশ্চয়! ও তো খুব ভাল ছেলে!

মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুনীতি বলিলেন—হাঁ দিদি, আপনার আশীর্ব্বাদে খুব ভাল ক'রে পাস করেছে অহি; ডিভিশনের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে, স্কলারশিপ পাবে।

আকস্মিক প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে পঙ্ক হইতে পঙ্কজের উদ্ভবের মত দুঃখের স্তরকে নীচে রাখিয়া আনন্দের আবির্ভাবে সকলেই একটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—শিবের ললাটের চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্ত্তী-মশায়; এ চাঁদ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর বলিলেন—মঙ্গল হোক আপনার, অমোঘ হোক আপনার আশীর্ব্বাদ!

সুনীতি হেমাঙ্গিনীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন; হেমাঙ্গিনী বলিলেন—যাও ভাই, তুমি ছেলেকে খেতে দিয়ে এস। আমি বসছি চক্রবর্ত্তী-মশায়ের কাছে।

সুনীতি চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় হেমাঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া চুপি চুপি বলিয়া গেলেন—মাঝে মাঝে দু-একটা ভুল বলেন; দেখবেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—কত দিন ভেবেছি, আসব আপনাকে দেখে যা'ব, কিন্তু পারি নি। আবার ভেবেছি, যাক মুছেই যখন গেছে সব, তখন মুছেই যাক। কিন্তু সেও হয় নি! মুছে গেল না, পাথরের দাগ ক্ষয় হয়ে মুছে যায়, কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না। আজ আর থাকতে পারলাম না; অপরাধ যে আমাদেরই। এর জন্যে দায়ী যে উনি।

—কে? ইন্দ্র? না, না, রায়-গিন্নী, দায়ী আমি। হেতু ইন্দ্র। সব আমি খতিয়ে দেখেছি। চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি উঁকি মেরে দেখি কিনা!

হেমাঙ্গিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর বলিলেন—কিন্তু এমন ভাবে ভেঙে

লুটিয়ে পড়লে তো চলবে না আপনার চক্রবর্ত্তী-মশায়। সুনীতির দিকে, ছেলের দিকে এক বার তাকিয়ে দেখুন তো তাদের মুখ।

—বুক ফেটে যায় রায়-গিন্নী বুক ফেটে যায় কিন্তু কি করব বলুন, আমার উপায় নেই।

—উপায় আপনাকে করতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে

-কি ক'রে উঠে দাঁড়াব? দিনের আলোতে আমার চোখে অসহ্য যন্ত্রণা, তার উপর—, আপনার কাছে গোপন করব না রায়-গিন্নী, হাতে আমার কুষ্ঠ হয়েছে!

হেমাঙ্গিনী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

রামেশ্বর বলিলেন, এরা কেউ বিশ্বাস করে না, কবরেজ বলেন—না, ডাক্তার বলেন—না, রক্তপরীক্ষা ক'রে তারা বলে না, সুনীতি বলে না! মূর্খ সব, রায়-গিন্নী, ভগবানের বিধানের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এরা বোঝে না। আয়ুর্ব্বেদে আছে কি জানেন? যেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, রোগ যেখানে কর্ম্মফল, সেখানে চিকিৎসকের ভুল হবে। এক বার নয়, শত বার দেখলে শত বার ভুল হবে।

হেমাঙ্গিনী সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রামেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ দেখিতেছিলেন, কোথাও এক বিন্দু বিকৃতি তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন আজ প্রত্যক্ষ বুঝিলেন, এই রোগই তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতির উপসর্গ। বলিলেন—না চক্রবর্ত্তী-মশায় এ আপনার মনের ভুল। কই কোথাও তো এক বিন্দু কিছু নেই!

হাতের দশটা আঙুল প্রসারিত করিয়া দিয়া রামেশ্বর বলিলেন—এই আঙুলে—আঙুলে!

অহীন্দ্রের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সুনীতি একটা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। বলিলেন—আজ তাহ'লে আসি ভাই।

সুনীতি বলিলেন—সারাক্ষণ নন্দাইয়ের সঙ্গেই বসে গল্প করলেন, আমার কাছে একটু বসবেন না দিদি?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—তোমার সঙ্গে কত যে গল্প করতে সাধ, সে কথা আর এক দিন বলব সুনীতি। চক্রবর্ত্তী-মশায় যখন তোমায় বিয়ে ক'রে আনলেন, তখন তোমার উপরেই রাগ হয়েছিল। অকারণ রাগ। তার পর যত দেখলাম ততই তোমার সঙ্গে কথা ব'লে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে সাধ হয়েছে! সে অনেক কথা, পরে এক দিন বলব। আজ যাই, বুঝতেই তো পারছ লুকিয়ে এসেছি। তবে একটা কথা বলে যাই, যেটা বলতে আমার আসা। তুমি ভাই মজুমদারকে সরাও। ওঁর কাছে আমি শুনেছি, সম্পত্তি ঐ বেনাম ক'রে ডেকেছে।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—জানি দিদি! আমি ওঁকে জবাব দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কি জানেন, তবুও উনি আসছেন, না বললেও কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—সেও বন্ধ করা দরকার বোন, যে এমন বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, তাকে বিশ্বাস কি?

—এখন বার বার বলছেন, চরটা বেচে ফেলুন—অনেক টাকা হবে।

—না, না, এমন কাজও ক'র না ভাই। আমি ওঁর কাছে শুনেছি চরটায় তোমাদের অনেক লাভ হবে, আয় বাড়বে।

—কিন্তু, চর নিয়ে যে গ্রাম জুড়ে বিবাদ দিদি। আমি কেমন ক'রে সে-সব সামলাব? আর বিবাদ না মিটলেই বা বন্দোবস্ত করব কি ক'রে, বলুন!

—সাঁওতালদের ডেকে তোমরা খাজনা আদায় করে নাও সুনীতি। আমি এইটুকু বলে গেলাম যে, তোমার দাদা আর কোন আপত্তি তুলবেন না। আর যদি কেউ তোলে তবে তাতেও তিনি তোমাকেই সাহায্য করবেন।

সুনীতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাঁকে আমার প্রণাম দেবেন দিদি, বলবেন—

বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন—পারব না ভাই। বললাম তো লুকিয়ে এসেছি!

মানদা ঝি যায় নাই; বাড়ীঘর নাই বলিয়া এখানেই এখনও রহিয়াছে। আপনার কাজগুলি সে নিয়মিতই করে। সুনীতি আপত্তি করিলেও শোনে না। বরং কাজ তাহার এখন বাড়িয়া গিয়াছে—বাড়াইয়াছে সে নিজেই।

সদর কাছারি-বাড়ীর চাকর চলিয়া গিয়াছে, নায়েবও নাই, কিন্তু তবুও পরিষ্কারের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন সে নিজেই আবিষ্কার করিয়া কাজটি আপনার ঘাড়ে লইয়াছে। তাহার উপর সকালে সন্ধ্যায় দুয়ারে জল, প্রদীপের আলো, ধূপের ধোঁয়া এগুলি তো না দিলেই নয়। হিন্দুর বাড়ী, মা লক্ষ্মী রুষ্ট হইবেন যে!

সুনীতি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মানদা বলিয়াছিল—য'দিন আছি আমি করি, তার পর আপনার যা খুশী হয় করবেন। আপনি যদি তখন নিজে হাতে গোবর মেখে ঘুঁটে দেন পয়সা বাঁচাবার জন্যে—দেবেন, আমি তো আর দেখতে আসব না।

কাছারি-বাড়ী সে পরিষ্কার করে দিনে দ্বিপ্রহরে, খাওয়া-দাওয়ার পর মানুষের একটা বিশ্রামের সময় আছে, এই সময়টা বাহিরটায় লোকজন থাকে না, সেই অবসরে নিত্য কাজটা সারিয়া লয়। লজ্জাটা তাহার নিজের জন্য নয়, চাকরের বদলে ঝি কাছারি সাফ করিলে অন্য কেহ কিছু না বলুক, ঐ রায়-বাড়ীর ছেলেগুলি হয়তো ছড়া বাঁধিয়া বসিবে। সেদিন সে তক্তাপোষের উপর পাতা ফরাস হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝে পর্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়া ঝাঁট দিতেছিল, আর গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিল। এতবড় নির্জ্জন ঘরগুলার মধ্যে একা কাজ করিতে করিতে কেমন গান পাইয়া বসে। দুই-এক বার বড় আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিভ ও ঠোঁট বাহির করিয়া দেখে পানের রসটা কেমন ঘোরালো হইয়াছে। স্নানের পর হইতেই চুল খোলা থাকে—খোলা চুলও সে এই সময়ে বাঁধিয়া লয়। সহসা তাহার গান থামিয়া গেল, মনে হইল অনেকগুলি লোক যেন কাছারির বাহিরের প্রাঙ্গণে কথা বলিতেছে। ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া মাঝের খড়খড়ি-দেওয়া দরজাটার খড়খড়ি তুলিয়া সে দেখিল সাঁওতালেরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনহীন রুদ্ধদ্বার কাছারির দিকে চাহিয়া তাহারা চিন্তিত হইয়া কি বলাবলি করিতেছে। মানদা ঘরের ভিতরে ভিতরেই অন্দরে চলিয়া গিয়া সুনীতিকে বলিল, সাঁওতালেরা সব দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে আছে মা, কি-সব বলাবলি করছে আমি এই গলিগলি গিয়ে ডাকব নায়েব-বাবুকে?

সুনীতি বলিলেন—না। অহিকে ডাক তুই, উপরে নিজের ঘরেই আছে সে।

অহীন্দ্র আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই মাঝির দল কলরব করিয়া উঠিল, রাঙাবাবু, রাঙাবাবু। অহীন্দ্র সাধারণতঃ এখানে থাকে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল মজুমদারকে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদের রাঙাবাবুকে পাইয়া তাহারা খুব খুশী হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল-কি রে তোরা সব কেমন আছিস?

ঠকাঠক তখন প্রণাম হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি জোড় হাত করিয়া বলিল, ভাল আছি আজ্ঞে। আপনি কবে এলি বাবু? আমরা সব কত বলি কত খুঁজি তুকে। বলি, আমাদের রাঙাবাবু আসে না কেনে? মেয়েগুলা শুধায়।

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি যে পড়তে গিয়েছিলাম মাঝি।

—ক-খ-অ-আ সেই সব? রিংজী, ফর্সী, না কি বাবু?

—হ্যাঁ, অনেক পড়তে হয়। তার পর তোরা কোথায় এসেছিস?

—আপনার কাছে তো এলাম গো! বুলছি, আমাদের জমি কটির খাজনা তুরা লে, আমাদিগকে চেক-রসিদে দে। তা লইলে, কি ক'রে থাকব গো?

—খাজনা কে পাবেন এখনও যে তার ঠিক হয় নি মাঝি। সে ঠিক—

বাধা দিয়া কমল বলিল, না গো, সি সব ঠিক হয়ে গেল। দিলে সব ঠিক ক'রে উই-সেই রায় হুজুর। উনি আজ আমাদের বললে, চরটি তুদের রাঙাবাবুদেরই ঠিক হ'ল মাঝি। খাজনা তুরা সেই কাছারিতে দিবি। রিথেই তো আজ ছুটে এলম গো।

দ্বিপ্রহরে হেমাঙ্গিনীর কথা অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল। সে এবার দ্বিধা না করিয়া বলিল,—দে তবে দিয়ে যা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া মাঝি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, হা বাবু, ইটি আপুনি কি বুলছিস? জমিকটি মাপতে হবে, তার পরে হিসেব করতে

হবে, তুদের খাতীতে নাম লিখতে হবে, সি সব কর আগে!

অহীন্দ্র বিব্রত হইয়া বলিল—সে তো আমি পারব না মাঝি। আমি তার ব্যবস্থা করছি, বুঝলি

মাঝি বিস্মিত হইয়া গেল—তবে আপুনি কি বিদ্যে শিখলি গো? কি পড়লি তবে?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—সে-সব অনেক বই মাঝি, নানা দেশের কথা, কত বড় বড় বীরের কথা, কত যুদ্ধের কথা!

—হাঁ! কোন গাঁয়ের কথা বটে সি গো? বীর বুললি—কারা বটে সি সব?

—সে সব পৃথিবী জুড়ে নানা দেশ আছে, সেই সব দেশ—আর সেই সব দেশের বড় বড় বীর—তাদেরই কথা মাঝি। আরও সব কত কথা—ওই আকাশে সূয্যি উঠছে—চাঁদ উঠছে—সেই সব কথা।

—হাঁ! মাঝির মুখচোখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া দলের সকলকে আপন ভাষায় বলিল—রাঙাবাবু কত জানে দেখ্!

সঙ্গীর দল আপন ভাষায় রাঙাবাবুর তারিফ করিয়া মৃদু কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। কমল বলিল—হাঁ বাবু, এই যি পিথিমীটি এই যি ধরতি-মায়ী ইয়াকে কে গড়লে? কি লেখা আছে বইয়ে তুদের?

অহীন্দ্র বলিল—পৃথিবী হ'ল গ্রহ, বুঝলি! আকাশে রাত্রে সব তারা ওঠে না, ওই রকম এও একটি তারা। আগে পৃথিবী দাউ দাউ ক'রে জলত। যেমন কড়াইয়ে গুড় কি রস টগবগ ক'রে ফোটে তেমনি ক'রে ফুটত!

মাঝি বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু! তুকে এখুনও অ্যানেক পড়তে হবে। পিথিমীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না শুধুই জল ছিল। তার পরে হ'ল কি জানিস—বলি শোন—বলিয়া সে মোটা গলায় গান আরম্ভ করিল—

অথ জনম্ কু ধরতি লেণ্ডং,
অথ জযম্ কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা,
ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা।

গান শেষ করিয়া মাঝি বলিল, পেথমে ছিল জল—কেবল জল। তার পরে হ'ল—'অথ যজম্ কু ধরতি লেণ্ডং' বুলছে লেণ্ডং গায়ে থেকে মাটি বার ক'রে ধরতিকে বানালে—মাটি করলে। লেণ্ডং হ'ল—ওই যে মাছ ধরিস তুরা, কেঁচো গো কেঁচো! দেখিস কেনে—আজও উয়ারা গায়ে থেকে মাটি বার করে। তার পরে হ'ল 'অথ যজম কু মানোয়া হড়'—বুলছে মাটিতে হল মানুষ, 'মান-মান কু মানোয়া হড়,' কি না মানুষ মানুষ—কেবলি মানুষ। তখন তুর 'ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা', কি না মানুষ করলে ধরতি—মাটি খুঁড়ে চাষ—ফসল হ'ল, 'ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা'—একবারে তামাম ধরতিতে চাষ হয়ে অ্যানেক ফসল হ'ল।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু বড় ভাল লাগিল তাহাদের গান। মাঝি আবার বলিল—ধরতি মাটি বানালে তুর 'লেণ্ডং'—কেঁচোতে—পোকাতে!

অহীন্দ্র তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—খুব ভাল গান মাঝি তোদের।

—হুঁ গো, খুব ভাল বটেই। তা হাঁ বাবু, আমাদের তবে কি করবি?

—বললাম তো লোক পাঠিয়ে দেব।

—উহু। তুকে নিজে যেতে হবে। উয়ারা সব চোর বটে। আজি চ' কেনে তবে!

পিছন হইতে সঙ্গীরা কি বলিয়া উঠিল, মাঝি বলিল—উয়ারা বুলছে, চেক-রসিদেটি না হ'লে উয়াদের চাষে মন লাগছে না। তার পরে আমাদের বিয়া আছে, ওই যে আমার লাতিনটি—সেই লম্বাপারা—তারই বিয়া হবে। তাতেই সব মাতন আছে আমাদের, হাঁড়িয়া খাবে সব—নাচবে গান করবে। তাতেই সব তাড়াতাড়ি করছে।

অহীন্দ্র বলিল—বেশ তাড়াতাড়িই ক'রে নেব, কাল কি পরশু। কিন্তু তোর নাতনীর বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবি না?

মাঝি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা রে, আমাদের রাজা তু, রাঙাঠাকুরের লাতি, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ, তেমুনি চুল। তুকে তাই বলতে পারি। আমরা সব কত কি খাই—মুরগী শুয়োর—ছি। [ক্রমশঃ]

"মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা"

শ্রীপারুল দেবী

কলিকাতায় হাতীবাগানের দিকে একটা গলির ভিতর পুরাতন আমলের চকমিলান বাড়ী। রান্নাবাড়ীর দিকটায় নিরামিষ রান্নাঘর, আমিষ রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি সারি সারি ঘরের পর ঘর চলিয়াছে—একটা বৃহৎ ব্যাপার। ওদিকে ঠাকুরদালানের মত মস্ত বড় দালান; এক কালে সেখানে বারো মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকিত। এ বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্রী নিস্তারিণী দেবী বধূকালে ঐ দালানে শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া ঘোমটা দিয়া, আজ মা-ষষ্ঠীর, কাল সত্যনারায়ণের, পরশু লক্ষ্মীদেবীর, কত নৈবেদ্যই সাজাইয়াছেন, আজও ঐ দিকটায় দৃষ্টি পড়িলেই তাহা মনে পড়িয়া যায়। কালে কালে সবই বদল হইয়া গেল—শ্বশুর, শাশুড়ী, বড় ভাসুর, যাঁহারা সেকালের লোক ছিলেন সকলেই একে একে সরিয়া গেলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বিধিব্যবস্থাও থামিয়া গেল। নিস্তারিণী দেবীর স্বামী অবিনাশ সেকালের লোক হইলেও কতকটা নব্যপন্থী—তিনি পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজনে প্রতি বৎসর অত টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা স্কুল ও হাসপাতালে সে অর্থ দান করার বেশী পক্ষপাতী। প্রথম প্রথম নিস্তারিণী দেবী স্বামীর মনের এইরূপ ইচ্ছা জানিয়া মা-দুর্গা, মা-লক্ষ্মীর চরণে নিজেকে একান্ত অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং স্বামীর এই অজ্ঞতা, এই অবিশ্বাস ও অবিবেচনার জন্য বার-বার তাঁহাদের সকলের নিকট মাথা কুটিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন মাথা কোটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরদালান শূন্য পড়িয়া থাকে—এখন সেদিকে চাহিলে আর মন তেমন হুহু করিয়া উঠে না; এদিকে ভাঁড়ার ও রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম লইয়াই নিস্তারিণী দেবীর বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। তবে এখনও প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী-পূজার জন্য পয়সা পাঠাইতে তিনি কখনও ভোলেন না, সত্যনারায়ণের কথাও মাঝে মাঝে দিয়া থাকেন এবং পুত্র-কন্যার অকল্যাণের ভয়ে ষষ্ঠীর পূজা বাদ দিতে আজও তাঁহার মাতৃহৃদয় আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠে।

আজ ষষ্ঠী ছিল; সারাদিন উপবাস গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কোন্ মন্দিরে যেন পূজা পাঠাইয়া তবে নিস্তারিণী দেবী জলগ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে রান্না-ঘরের দালানে নানাবিধ ডালা ও টুকরি সাজাইয়া তিনি কুটনা কুটিতে বসিয়াছিলেন। সকালবেলা কর্ত্তার আপিস, ছেলেমেয়ে দুই জনেরই কলেজ যাইবার তাড়া—সে সময়ে কুটনা লইয়া বসিবার সময় পাওয়া যায় না, তাই বরাবর এই বিকালের দিকেই নিস্তারিণী দেবী ও-কাজটা সারিয়া রাখেন। পাশেই নিরামিষ রান্নাঘরে নিস্তারিণী দেবীর আশ্রিতা তাঁহার এক বিধবা খুড়শাশুড়ী দুধ জ্বাল দিতে দিতে বলিতেছিলেন, "জান গা বউমা, এই নীলষষ্ঠীর দিনে বড়ঠাকুরের আমলে আমাদের যা পূজো পাঠান হ'ত, তা চারটে বামুনে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারত না। তুমি তখন ছেলেমানুষটি ছিলে—সবে বৌ হয়ে এসেছ—তোমার বোধ হয় অত মনে নেই—আমার যেন সে-সব দিন চোখের সুমুখে ভাসছে। ঐ যে আমাদের কুমুদিদি গো—আর-বছর যিনি ছেলের পৈতে ব'লে কত টাকা নিয়ে গেলেন চেয়ে—ওমা, তার পর শুনি ছেলের পৈতেও না, কিছুই না, সে টাকা নিয়ে যে তিনি কি করলেন তিনিই জানেন বাছা—সেই কুমুদিদির উপর ভার ছিল সকলের জলখাবার সাজাবার। বাড়ীতে তখন ঝি-বউ ছিল কতকগুলি—সেই জলখাবারের রেকাবিতে একটা দালান ভ'রে যেত। তখনকার দিনই ছিল সব অন্য রকম।"

বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া খুড়ীমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

দোতলার সিঁড়ি দিয়া নিস্তারিণী দেবীর একমাত্র পুত্র ভানু নামিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। নিস্তারিণী দেবী দেখিয়া ডাকিলেন, "চললি কোথা রে ভানু? শরীর না তোর ভাল ছিল না দুপুরে? ভাতে তো নামে বসেছিলি—বিকেলেও খাবার খাস নি কিছু—চললি কোথা সেজেগুজে?"

ভানু মায়ের ডাকে দাঁড়াইল—কাছে আসিল না। সুন্দর চেহারা—টেনিস খেলিবার ইংরেজী পোষাকে ছেলেটিকে ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। ইহাকে দেখিলে নিস্তারিণী দেবীর ছেলে বলিয়া মনে হয় না। রুমালে মুখ মুছিয়া ভানু উত্তর দিল, "খেলা আছে মা রণেনদের বাড়ী, যেতেই হবে। শরীর আবার কখন্ খারাপ হ'ল আমার? কিছুই তো হয় নি।"

নিস্তারিণী দেবী বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। "তোর গলা কেন ভারী ভারী ঠেকছে রে? খুব সর্দ্দি হয়েছে বুঝি? বার-বার মানা করি যে এখন তো তেমন গরম নেই, ঐ বাজারের বরফগুলো অত ক'রে খাস্ নে বাপু—তা কে কার কথা শোনে? ছাইপাঁশ দিনে বরফ দশ বার ক'রে আসছে—গলা ধরবে না? আমি ঠিক জানতুম এই হবে। এখন সর্দ্দি হোক্, গলা ধরুক, জ্বরজাড়ি হোক্, না হ'লে মায়ের সুখটা পুরো হবে কেন?... মাথা নামা, কপাল দেখি গরম কিনা।"

ভানু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামমাত্র মাথা নামাইল। নিস্তারিণী দেবী বেঁটে মানুষ; কষ্টে ছেলের কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। ভানু মাথা সরাইয়া বলিল, "কি যে মিছিমিছি বকতে পার মা তুমি। রাজ্যিসুদ্ধ লোক বরফ খাচ্ছে, কার যে রোজ জ্বর হচ্ছে বরফ খেয়ে তা তো জানি নে।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, "জ্বরজাড়ি তো আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্ছে—ঐ বরফই হ'ল গিয়ে সব অসুখের মূল। তোরা তো সব খবরই রাখিস কি না। কেবল কলেজ যাওয়া, খেলা আর বায়োস্কোপ—এ ছাড়া কি আর দুনিয়ার কোনও খবরই তোদের আছে বাছা? গলার মাফলারটা আয় দেখি জড়িয়ে দিই বেশ ক'রে—গলাটা বড় ধরে গেছে তোর—ঠাণ্ডা লাগাস নে বাপু।"

ভানু সরিয়া গেল। "কিছু ঠাণ্ডা লাগবে না মা। আর আমি তো কচি খোকা নই—ঠাণ্ডা লাগলে নিজেই জড়িয়ে নিতে পারব।"

উপরের বারান্দা হইতে সুসজ্জিতা উমা ডাকিল, "ও দাদা, তুমি কি বেরোচ্ছ নাকি? থাম ভাই একটু—ধাঁ ক'রে গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে যেও না। আমাকে শীলাদের বাড়ী নামিয়ে দিয়ে যেও—চা আছে আমার ওখানে।"

দাদা অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর দিল, "মার পাল্লায় প'ড়ে খানিক দেরি হ'ল অনর্থক, আবার এখন তোর জন্যে খানিক হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি। খেলতে যাবার কথা সাড়ে চারটেয়—এদিকে পৌনে পাঁচটা তো এখানেই বাজে। আর ঢুকিস না উমা ঘরে—যেমন আছিস নেমে আয়, না হ'লে কিন্তু আমি চললুম গাড়ী নিয়ে। তুই হেঁটে যাস—এই তো কাছেই ওদের বাড়ী।"

উমা দাদার কথা না শুনিয়া পুনর্ব্বার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "তা হোক কাছেই, আমি এক পাও হাঁটতে পারব না। ভারি তো টেনিস খেলার নেমন্তন্ন—ও তো রোজই তোমার লেগে আছে—আজ এক দিন পাঁচ মিনিট দেরি হ'লে রিণি কিছু মূর্চ্ছা যাবে না দাদা, ভাবনা নেই তোমার। আমার চুলে বব্-পিন আটকান হয় নি এখনও, দু-মিনিট দেরি হবে।"

নিস্তারিণী দেবী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুই আবার কোথায় চললি? বাবা, রোজ কি বাছা তোদের একটা-না-একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে? এ কি বাপু আজকাল চা-খাওয়ানর ফ্যাশান উঠেছে—ছেলেমেয়ের দেখছি বাড়ীতে জলখাবারের পাট উঠেই গেল।" বলিয়া রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ও খুড়ী, ও পাটিসাপ্টার হাঙ্গাম নিয়ে আর ব'স না বাপু—ভানু উমা তো কেউ খাবে না, ওরা চলল এখন ওদের বন্ধুদের বাড়ী চা খেতে। জলখাবার তো গেল—এখন পরের বাড়ী এটা-ওটা খেয়ে এসে রাত্রে হয়তো ইনি বলবেন পেট ভার, উনি বলবেন মাথা ভার—কেউ হয়তো খেতেই বসবে না। আজ আর কি হবে তবে ওসব হাঙ্গামা করে?"

উমা চুলে বব্-পিন আটকাইয়া, ফিকা সবুজ রঙের ঢাকাই শাড়ী পরিয়া নামিয়া আসিয়া দাদার পাশে দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, ছোটখাট গড়ন, মেয়েটি বরং কতকটামায়ের দিকে গিয়াছে। খুড়ীমা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "বউমার আমাদের ছেলেটি হ'ল গোরা, মেয়েটি হ'ল শ্যাম। উল্টোটি হলেই তো বেশ হ'ত বাপু।"

মা উমার দিকে ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কবে আবার তোর শীলাদের বাড়ী নেমন্তন্ন হ'ল? কই, আমাকে তো বলিস নি কিছু।"

উমা বাঁ-হাতের কব্জিতে ঘড়ির ফিতা আটকাইতে আটকাইতে উত্তর দিল, "কালকেই শীলা কলেজে বলেছিল মা—আমি বলতে ভুলে গিয়েছি তোমাকে। চা খেয়ে যত শীগ্‌গির পারি ফিরে আসব—একটু দেরি হ'লে কিন্তু ভেব না যেন।"

মা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "ভেবে আর কি করছি বাছা? তোমরা কবেই বা রাত ন-টার আগে বাড়ী ফের! যদি বা কোনদিন ভানু আসে তো তুমি আস না, আর যদি বা তুমি এলে তো ভানু আসে না। রোজই তোদের কি যে এত বাইরে ঘোরার থাকে তাও বুঝি নে। উনি যেমন একেবারে পছন্দ করেন না ছেলেপিলের এই রাত অবধি বাইরে থাকা, তেমনি কি ভানু আজকাল বাড়িয়েছে? রোজ যেন রাত ন-টার কমে বাড়ী আর ওর আসতে নেই। উনি রোজ জানতে পারেন না তাই—জানলে কিন্তু আর রক্ষে রাখবেন না বাছা—তা আমি এই ব'লে দিলুম।"

ভানুর জুতার ফিতাটা ঠিক মনের মত বাঁধা হয় নাই; এখন মায়ের কথার ফাঁকে সে সিঁড়ির উপর পা তুলিয়া দিয়া ফিতাটা পুনর্ব্বার বাঁধিতেছিল। উমা তাড়া দিয়া বলিল, "দাদা কে দেরি করছে এখন? নাও, নাও আর অত বাহার ক'রে জুতোর ফিতে বাঁধতে হবে না—চল না, আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ভানু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নিজে চুল আঁচড়াতে দেরি ক'রে আমার নামে দোষ—না? তোর আবার দেরি কিসের? এই তো পাশের গলিতে যাবি—মোটরে চড়া-ই বা কেন জানি নে। আমায় কতটা যেতে হবে জানিস? সেই বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে। যেতেই তো আধ ঘণ্টা যাবে। আয় আয়। চললাম মা।"

মা বলিলেন, "এস, দুর্গা, দুর্গা।"

উমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ভানু বাহির হইয়া গেল। উমা চেঁচাইতে লাগিল, "মা দেখ না দাদা কি রকম টানছে আমাকে হিড়হিড় করে।...হাত ছাড় না দাদা—ভাল লাগে না। প'ড়ে যাব নাকি শেষে এই শরীর নিয়ে?"

উমাকে একেবারেই মোটা বলা চলে না—তবে ঠিক গ্রেটা গার্ব্বোর ওজন নয় বলিয়া ভানু তাহাকে রাতদিন মোটা মোটা বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া থাকে, এবং উমাও সেটা মানিয়া লয়। সে জানে আজকালকার ফ্যাশানমত রোগা সে নয়—সেজন্য মনে যে ক্ষোভ নাই তাহা নহে এবং সাধ্যমত রোগা হইবার চেষ্টাও সে করিয়া থাকে। কিন্তু সেই যে বছর দুই আগে একবার মাস-তিনেক হাজারিবাগে থাকিয়া এক মণ দশ সের ওজন হইয়া গিয়াছে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা হইতে একটুও কমান যায় নাই।

ভানু উমার চীৎকারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাকে টানিতে টানিতেই লইয়া চলিল। বলিল, "হাতী-বাগান থেকে বেরোচ্ছেন একটি হাতী। বাবাঃ—আমার সাধ্যি কি যে তোমাকে টেনে বার করি? ভাগ্যিস সেই ছোটবেলায় কুস্তি করতুম আর এখনও রোজ ক-সেট ক'রে টেনিস খেলি, তাই তবু যা হোক্ একটু নড়াতে পারছি।"

উমা রাগ করিয়া টান মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। "আহা, সেই তোমার দেশলাইয়ের কাঠি রিণির মত শরীর-খানি না হলেই সবাই একেবারে হাতী আর কি! হাতী হাতী ক'রো না দাদা—ভাল লাগে না।"

দুই ভাইবোনে মোটরে উঠিয়া বসিলে ভানু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, "কি যে মা-বাবা রোজ রোজ এই একটু দেরি ক'রে বাড়ী ফেরা নিয়ে খিট্‌খিট্ করেন তার ঠিক নেই। ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী গেলেই প্রায় একটু দেরি হয়ে যায়। সকলেই ব'সে গল্প-সল্প করেন, আমাকেও ওঁরা বসতে বলেন—আমি তো আর তার মধ্যে ক্রমাগত কচি খোকার মত 'মা বকবেন, যাই যাই' করতে পারি না—বসতেই হয় একটু। ওঁরা ওঁদের

মেয়েকে যা ফ্রীডম্ দেন, মা-বাবা আমাকে তা দিতে পারেন না—আশ্চর্য্য। একেই তো রিণি আমাকে ক্রমাগত goody goody বলে ক্ষেপায়, আর সকলের সামনে বলতে থাকে, আটটা বাজল, তোমার শোবার সময় হ'ল না? আমার এমন লজ্জা করে! বাবা-মা কি যে ভাবেন—আমি কি একটা স্কুল-বয় নাকি?"

উমা দাদার অবস্থা বুঝিত। মা-বাবার এই অহেতুকী কড়া নিয়মের বিরুদ্ধে তাহাদের দুই ভাইবোনের ভিতরে আলোচনাও প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু মা-বাবার বিবেচনাবুদ্ধি ভালই হউক আর মন্দই হউক সব সময়ে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করাটা উমার কাছে ভাল ঠেকে না। তাই এখন সে চুপ করিয়াই রহিল।

ভানু আবার বলিল, "তুই কেন মার সামনে রিণিকে নিয়ে ঠাট্টা করিস উমা? মা কি মনে করেন বল্ তো? এখন কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই; এখন থেকে ও-রকম ঠাট্টা করা বুঝি ভাল?"

সাজিয়া-গুজিয়া চা খাইতে যাইতেছে এমন সময়ে ভানু তাহাকে হাতী হাতী বলাতে উমা রাগিয়াই ছিল, এখন আবার তাহার নামে অভিযোগ শুনিয়া আরও রাগিয়া গেল। ঝাঁঝাল স্বরে উত্তর দিল, "না মা তো আর জানেন না কিছু, আমার ঠাট্টার অপেক্ষাই ক'রে আছেন। আর মার কথা ছেড়ে দাও, মা তো জানবেনই—বাইরের লোকই বা কে না জানে তোমার সঙ্গে রিণির বিয়ের কথা? সেদিন সরোজ-পিসীমা বেড়াতে এসে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন—কমল-বউদি বললে ওদের বাড়ীর সকলেই নাকি জানে—মণিমা তো সেদিন ঠাট্টা ক'রে বলছিলেন নূতন বউকে গয়না দেওয়ার চেয়ে মা যেন টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে মুখ দেখেন। কে না জানে আবার? তুমি বড় লুকিয়ে চল কিনা।"

ভানুও বিরক্ত হইল। বলিল, "আমি কেন লুকিয়ে চলব? শুধু আমার ইচ্ছেয় যদি হ'ত তাহলে এত দিন দেরি হ'ত না, অনেক কাল আগেই বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু এ পক্ষের মতের উপর তো আর সব নির্ভর করছে না—ওঁরা দেবেন কিনা সেইটেই হ'ল বড় কথা। সে কি আর মা-ই জানেন না? ও কি রকম ভাবে মানুষ হয়েছে সে তো সবাই জানে—আমাদের মত বাড়ীতে—যেখানে মাসে পাঁচ বার ক'রে ষষ্ঠীপূজো হয়, তিন বার ক'রে কথক-ঠাকুর এসে হাত-পা নেড়ে কথকতা করে, সেখানে এসে ও মানিয়ে চলতে পারবে কিনা সেই ভেবে তো ওর মা-বাবা এগোতেই চাইছেন না। আমাকে তো ওর মা সেদিন স্পষ্টই বললেন যে ঐ বাড়ীর ধরণ-ধারণের বাধাটা না থাকলে আর তাঁদের কোন আপত্তিই ছিল না।"

উমা নিজেও যে মায়ের সত্যনারায়ণের কথকতার খুব অনুমোদিকা ছিল তাহা নহে, কিন্তু নিজেদের বাড়ীর উপর দাদার এই খোঁচা এখন তাহার গায়ে বাজিল। রুক্ষ স্বরে জবাব দিল, "আহা আপত্তিটা যেন শুধু ওঁদেরই থাকতে পারে! কেন মার আপত্তি থাকতে পারে না? যে-বউ এসে বাড়ীর কোন ব্যবস্থা মানবে না, ক্রমাগত টেনিস খেলে বেড়াবে, সে-বউ ঘরে আনতে মারই বা এত সাধ হ'তে যাবে কেন? মা যদি বেঁকে বসেন তো কি ক'রে বিয়ে হবে শুনি? তুমি আর বাড়াবাড়ি ক'রো না দাদা—শ্বশুরবাড়ী না হ'তেই আর ওদের টেনে অত কথা ব'লো না।"

গাড়ী ততক্ষণে উমার বন্ধুর বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভানুকে উত্তর দিবার সময় না দিয়াই উমা গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া সশব্দে দরজাটা পুনরায় বন্ধ করিয়া কোন দিকে না চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ভানু ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরাইয়া লইতে বলিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

জীবনের সমস্যা একটু জটিল হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। বালীগঞ্জে ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সাহেবী কেতাদুরস্ত প্রকাণ্ড বাড়ী, সুবিস্তৃত লনে রোজ টেনিস খেলা, অবাধ মেলামেশা, আনন্দ উপভোগের প্রচুর উপকরণ, ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সুসজ্জিত সুন্দরী কন্যা রিণি—ইহারা সকলে মিলিয়া ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের জীবনযাত্রা প্রণালীতে অনভ্যস্ত ভানুর মন ভুলাইয়াছে। রিণি নূতন ভঙ্গীতে শাড়ী পরে, অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলে, টেনিস খেলিবার সময় সাত বছরের মেয়ের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, নিজে মোটর চালাইয়া সারা লেক ঘুরিয়া আসে। পিয়ানো বাজাইয়া মিহি সুরে বাংলা গানে ইংরেজী সুর

মিশাইয়া গান করে—পরমাশ্চর্য্য রিণি ভানুর মনে মায়া রচিয়াছে। এক বৎসরের পূর্ব্বেও এরূপ কোন একটি মেয়ের কল্পনাও ভানুর কল্পনাশক্তির বাহিরে ছিল। রিণির সহিত মিশিয়া ভানু টেনিস খেলিতে শিখিয়াছে, সাহেবী সমাজে মিশিবার যোগ্য নিয়মকানুন শিখিয়াছে, নিখুঁৎভাবে বিলাতী সজ্জায় সাজিতে শিখিয়াছে। এ সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র ভানুর কিছুই ছিল না, কেবল সুন্দর চেহারা ছাড়া। সুন্দর চেহারার জোরে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিয়া তার পরে রিণি ও তাহার নব্য বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে ভানু এখন পুরাদস্তর সাহেব। আগে আগে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ও তৎপত্নী ভানুকে বড়-একটা আমল দিতেন না—এখন সেই ভানুই তাঁহাদের একমাত্র কন্যার বিবাহের পাত্র হিসাবে একান্ত অযোগ্য না হইতে পারে, এরূপ চিন্তাও তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ও রিণির জননীর মনে এরূপ চিন্তা সঞ্চারিত করিবার গর্ব্বে ভানু যে স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ তো পাওয়া যায় না, তাই এ হেন সুখ সম্ভাবনাও ভানুর মনে আশঙ্কার ছায়াপাত করিতে ছাড়ে নাই। রিণি—যে-রিণি পাঁচটা কথা বলিলে তার তিনটা ইংরেজী বলে, যে-রিণি গৃহকর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে-রিণি ভানুদের পাড়ায় পঞ্চমবর্ষীয়া সতুরাণীর ন্যায় সরলা অর্থাৎ লজ্জাহীনা—ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীতে টেনিস খেলিবার অবকাশে শ্রান্ত হইয়া ভানু চেয়ারে বসিলে যে-রিণি ভানুর চেয়ারের হাতল ব্যতীত অন্য কোথাও বসে না—এরূপ যে-রিণি, সে-রিণি কি ভানুর বাড়ী আসিয়া কুট্‌না কুটিবে, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গৃহকর্ম্ম শিখিবে, পিতাকে দেখিয়া মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিবে, দিনের বেলা ভানুকে দেখিলে লজ্জায় রাঙা হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইবে? এ-ও কি সম্ভব? সেরূপ রিণিকে তো কল্পনাও করা যায় না।

ভানু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীতে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। গাড়ী এইমাত্র শিয়ালদা ষ্টেশন পার হইয়া আসিল। বিকালবেলা কর্ম্মক্লান্ত আপিস-ফেরত বাবুদের দল—ট্রামে বাসে লোক ধরে না—সারি সারি লোক পরবর্ত্তী ট্রামে বা বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া। কাহারও হাতে ঝাড়নে বাঁধা বাজারের পুঁটুলি, কাহারও হাতে দুইটা কমলালেবু, কাহারও হাতে দড়িতে বাঁধা ছোট একটি মাছ। ভানু সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল ইহারা এখনি বাড়ী ফিরিবে—সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে হয়তো ততোধিক সঙ্কীর্ণ বাড়ী—বাড়ীর গৃহিণী হয়তো উনানে আগুন দিয়াছেন, সমস্ত বাড়ী ধোঁয়ায় ভরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আব্দার করিতেছে—কেহ খাইতে চায়, কেহ কাপড় চায়, কাহারও বা শুধু ক্রন্দনই উদ্দেশ্য। ছেলেমেয়ের ভিড় সরাইয়া বাড়ীর গৃহিণী সেই ধোঁয়ার মধ্যেই রান্নার আয়োজন করিতেছেন। এই মাছটি গেলে হয়তো নিজেই কুটিতে বসিবেন, তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে রান্না সারিয়া সকলকে খাওয়ান আছে, বিছানা পাতিয়া ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ঘুম পাড়ান আছে, গৃহকর্ম্মের সহস্র দাবি আছে। সেই সব মিটাইয়া রাত্রে তাঁহার ছুটি। ততক্ষণে অর্দ্ধমলিন শয্যায় শ্রমক্লান্ত দেহ এলাইয়া গৃহিণীর স্বামী হয়তো গভীর নিদ্রামগ্ন; অতএব স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর হয়তো সেদিন আর হইয়াই উঠিল না। এই তো সাধারণ জীবন। তাহার নিজের বাড়ীই বা ইহা হইতে কিসে ভিন্ন? বাড়ীটা ছোট নহে ইহা সত্য—পিতাও হয়তো নিজ হাতে মাছ কিনিয়া বাড়ী আনেন না এবং মাকেও কখনও নিজে মাছ কুটিতে দেখিয়াছে বলিয়া ভানু আজ ঠিক মনে করিতে পারিল না—কিন্তু তথাপি জীবনপ্রণালী যে তাহাদের প্রায় ঐ বাবুটিরই মত তাহাতে ভানুর সন্দেহ নাই। পিতা বাহিরে কাজ করেন, সন্ধ্যার পর ছাড়া বাড়ী আসেন না—মা সারাদিন ভাঁড়ার-ঘরে কি যে এত কাজ করেন ভানু তো ভাবিয়াই পায় না। সেই রাত্রে পিতা খাইতে বসিলে মা পাখা হাতে লইয়া কাছে বসেন, এবং সেই আসরেই কথাবার্ত্তা যাহা কিছু তাঁহাদের হইয়া থাকে—ইহা ছাড়া তাঁহাদের আলাপ-আলোচনার সময় তো ভানুর চোখে কই ধরা পড়ে না। সাধারণ ভাবে মায়ের পছন্দ মত একটি মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিলে ভানুর জীবনও ইহা অপেক্ষা কোনও বিষয়েই অন্যরূপ হইবার আশা বৃথা—

সে আসিয়া মায়ের ঐ সর্ব্বগ্রাসী ভাঁড়ার ও রান্নাঘরের কবলে পড়িবে ও ভানু সেই অর্দ্ধরাত্রি ব্যতীত আর তাহার নাগাল পাইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু রিণি—রিণি আসিয়া কি তাহাদের এই চিরাচরিত আনন্দহীন জীবনপ্রণালী অন্যরূপ করিয়া দিবে না? সে সকালবেলা উঠিয়া প্রজাপতির মত সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, কলহাস্যে সমস্ত বাড়ী মুখরিত করিয়া দিবে, পায়ের শব্দে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া উপর হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিবে, শেলী ও বায়রনের কবিতা দিনের মধ্যে শতবার আওড়াইবে ও বারণ করিলেও দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ-সাত বার গান করিতে ছাড়িবে না। রাত্রে ভানুর খাবার লইয়া পাখা হাতে করিয়া বসিয়া হয়তো থাকিবে না—কিন্তু ভানু তো রিণিকে পাখার বাতাস করিবার জন্য বিবাহ করিতে চায় না। আর তা ছাড়া পাখার দরকারটাই বা কি? মাথার উপর ইলেকট্রিক ফ্যান তো দিবারাত্রই ঘোরে—তবু মায়ের কি যে সেই বিনা-ইলেকট্রিকের দিনের বহু পুরাতন অভ্যাস, আজ ইলেকট্রিক ফ্যান বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকা সত্ত্বেও মায়ের হাত হইতে পাখা আর নামে না। ওটা একটা সংস্কার, ওটা একটা অভ্যাস,—বাঙালী মেয়েদের অস্থিমজ্জাগত কন্‌জারভেটিব সব আইডিয়া। এ সংসারে রিণির মত বধূই প্রয়োজন—যে তাহার আধুনিক শিক্ষার ঘূর্ণিহাওয়ায় পুরাতন জীর্ণ সংস্কারগুলাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিবে।

এদিকটায় অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা পাইয়া গাড়ী জোরে ছুটিয়াছিল—অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীর সম্মুখে থামিল। ভানু এক লাফে গাড়ী হইতে নামিয়া লনের দিকে অগ্রসর হইল। রিণি খেলিতেছিল; অন্য দিনের মত ছুটিয়া আসিয়া ভানুর হাত ধরিয়া টানিয়া ও অনর্গল কথা কহিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিল না। টেনিস খেলার ফাঁকে একবার চকিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যালো", তাহার পর আবার খেলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া না-আসা পর্য্যন্ত খেলার বিরাম রহিল না। রায় খেলিল, ভানু খেলিল, ডাঃ ব্যানার্জ্জী খেলিলেন, সর্ব্বানন্দ ধর খেলিল, শশধর সেন খেলিলেন—সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাহার পর খেলা থামিলে ঠাণ্ডা সরবৎ আসিল, আইসক্রীম আসিল, সিগার, সিগারেট আসিল—খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুজব চলিতে লাগিল। কথার মধ্যে এক সময়ে সর্ব্বানন্দ ধর বলিল, "এখন সবাই দল বেঁধে সিনেমায় গেলে হয় না? অনেক দিন যাওয়া হয় নি।" রায় তখনই সমর্থন করিয়া বলিল,"মেট্রোতে রোমিও জুলিয়েট হচ্ছে—আমার এখনও দেখাই হয় নি, চলুন না।" ডাঃ ব্যানার্জ্জী একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে না? এখন গেলে অনেকটা মিস্ করতে হবে। আমার আবার একটু কাজ ছিল।" ভানু তাঁহার শেষের কথায় কান না দিয়া বলিল, "তা হোক, প্রথমটা একটু মিস্ করলে কিছু এসে যাবে না—যাবে রিণি?" রিণি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দি আইডিয়া! এমন সীনে নর্ম্মা শিয়ারারকে যা সুন্দর দেখায়—I simply can't miss it; দু-বার already দেখেছি।...মিঃ রায়, আইসক্রীমের মায়া ছাড়ুন যদি নর্ম্মা শিয়ারারকে দেখতে চান...উঠুন উঠুন।...এই খানসামা, ড্রাইভারকো জলদি গাড়ী লে আনে বোলো।...আমি একটু চুলটা ঠিক ক'রে আসি, ঠিক এক মিনিটে আসব।...ভানু তুমি এক দুই তিন গোন, দেখ আমি এক-শ গোনার আগেই এসে যাব।"

রিণি ছুটিয়া গাড়ী-বারাণ্ডার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল, "মা, ও মা, মামণি, আমি একটু ভানুদের সঙ্গে পিকচারে যাচ্ছি—যাই তো মাম্? 'হ্যাঁ' বলেছ তো? বল বল, শীগ্‌গির হ্যাঁ ব'লে দাও—আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই।"

মা কি বলিলেন তাহা শোনা গেল না, কিন্তু এক বার ছাড়িয়া পাঁচ বার এক শত গুনিবার মত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—রিণি আসিল না। সকলেই রিণির পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া।

ভানুর এ-বাড়ীতে একটু বিশেষ অধিকারের কথা দলের কাহারও অবিদিত ছিল না। রায় ভানুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই বি. বি, যাও না ভিতরে তাড়া দিয়ে বার ক'রে আন না মিস্ চ্যাটার্জ্জীকে। নর্ম্মা শিয়ারারের প্রথম সীন কি—শেষ সীনও দেখতে পাওয়া যাবে কিনা

সন্দেহ, যদি উনি আর কিছুক্ষণ এই রকম তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াতে থাকেন।

ভানু ব্যানার্জ্জীকে দলের সকলেই বি. বি বলিয়া ডাকে। আগে আগে ভানু আপত্তি করিয়াছিল, এখন মানিয়া লইয়াছে।

রায়ের কথায় ভানু রিণিকে তাড়া দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। ছুটিয়া রিণি বাহির হইয়া আসিল, এবং সকলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "Awfully sorry— দেরি করেছি, না? নর্ম্মা শিয়ারারের মত চুলটা আঁচড়াতে পারি কিনা একটু দেখছিলাম—হ'ল না।···এই ভানু, মা বললেন তাঁর গাড়ী চাই, গাড়ী আমি নিলে চলবে না। তাহলে আমি তোমার গাড়ীতেই যাই—তুমি আবার আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেও—কেমন? কই গাড়ী কই তোমার?"

সকলে যে যাহার গাড়ীতে গিয়া বসিল—রায়ের গাড়ী, ভানুর গাড়ী, ধরের গাড়ী, আরও পাঁচ-সাতটা গাড়ী দল বাঁধিয়া মেট্রোর উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

সিনেমা দেখিয়া রিণিকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ভানু যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিতে আর বড় দেরি নাই। বাড়ী নিস্তব্ধ, অন্ধকার, শুধু উঠানে সিঁড়ির নীচে আলো জ্বলিতেছে ও উপরে ভানুর নিজের ঘরের পর্দ্দার আড়াল হইতে আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছে। অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে—পিতা নিশ্চয়ই আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া ভানু আস্তে আস্তে জুতার শব্দ না করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিয়া প্রথমেই ভানুর পিতার শয়নগৃহ—অন্ধকারে ভিতরে কিছু দেখা গেল না। ভানু বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইয়া নিজের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পর্দ্দা সরাইল। দেখিল নিস্তারিণী দেবী মেঝেতে বসিয়া সামনের একটা চেয়ারে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—মাটিতে তিনখানি থালায় পাশাপাশি তিন জনের খাবার ঢাকা দেওয়া।

মুহূর্ত্তে ভানুর মনে পড়িয়া গেল আজ ষষ্ঠী—মা সকাল-বেলাই তাহাকে বলিয়াছিলেন আজ সারাদিন তাঁহার উপবাস—সন্ধ্যার পর পূজা হইয়া গেলে ষষ্ঠীর প্রসাদ তাহারা দুই ভাইবোনে মায়ের পাতে খাইবে—আজ যেন তাহারা বাড়ী ফিরিতে বেশী দেরি না করে।

অন্য দিন ন-টা সাড়ে-ন-টার বেশী দেরি প্রায় হয় না, আর আজই কিনা বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। হয়ত মা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, হয়ত এখনও তাঁহার খাওয়া হয় নাই। মুহূর্ত্তে ভানুর মন হইতে ডাঃ চ্যাটার্জ্জির বাড়ী, রিণি, টেনিস খেলা, সিনেমার 'রোমিও জুলিয়েট'—সব মুছিয়া গেল। সারাদিনের উপবাসের পর মা হয়তো তাহার অবিবেচনার জন্য এখনও ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত দেহে না খাইয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া ভানুর সারা সন্ধ্যার আনন্দ নিমেষে মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

টেনিস-র‍্যাকেটটা বিছানায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভানু মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "মাগো।" নিস্তারিণী দেবী চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া চারি দিক এক বার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এলি?"

মাকে জাগিতে দেখিয়া ভানু মাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোটটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই আসছি। বড্ড দেরি হয়ে গেল। তুমি খেয়েছ তো মা? আজ যে তোমার উপোস ছিল আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিয়েছ তো?"

নিস্তারিণী দেবী আড়া-মোড়া ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "জল খেয়েছি বাবা—তার পর এই তোদের প্রসাদ দিয়ে তবে খাব ব'লে ব'সে ব'সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। কত দেরি করলি ভানু আজ? দিনে দিনে যেন বাবা তোরা বেশী বাড়াচ্ছিস্। উনি আজ বলেছেন এবার থেকে তোমরা সব ওঁর সঙ্গে রাত্রে সাড়ে আটটায় এসে খাবে। আমি আর কত তোমাদের সামলে চলব বল—কাল তুমি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিও। ক'টা বাজল এখন? দশটা বেজে গেল নাকি?"

ভানু কাপড় ছাড়িতেছিল—মায়ের এত কথায় কিছুই উত্তর দিল না। নিস্তারিণী দেবী ঘর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "কই রে উমা
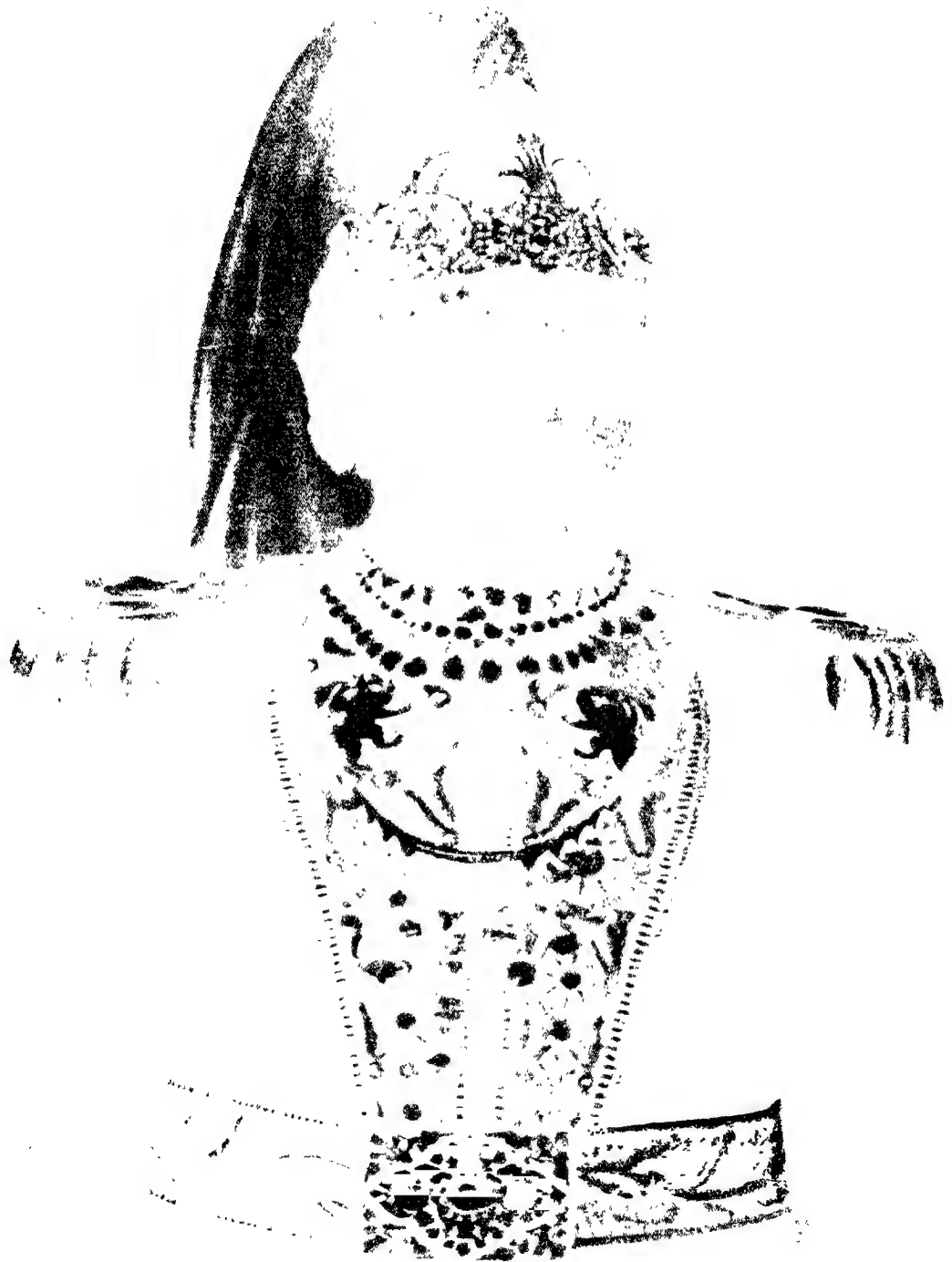
শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ যুদ্ধ শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা
জি. সি. এল. এইচ., জি. সি. এল., জি. সি. এস. আই., জি. সি. এস. এস. এম. এল., জি. সি. আই. ই.

কোথা গেলি? আয়, তোর দাদা এসেছে, খেয়ে নিবি তুই ্র নে না বাপু, তোর ব'সে থাকবার কি দরকার—তা না, সেই আমার সঙ্গে খাবে ব'লে ব'সে রইল। আয়, আয় বাছা শীগ্‌গির।"

মায়ের ডাকে উমা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বৈকালিক প্রসাধন এখন অবিন্যস্ত, চুল এলোমেলো, বব্‌পিন খসিয়া পড়িয়াছে, চোখে ঘুম জড়ানো। উমা ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্ত মুখে বলিল, "আজ কিনা মার ষষ্ঠী, তাই দাদা খুব সকাল সকাল এসেছ তো! সত্যি নিশুতি রাত অবধি তোমাদের ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীতে কি যে হয় আমি তো বুঝতে পারি না। তোমাদের কি রাত দশটা অবধি টেনিস খেলা হয় নাকি?"

তাহারই জন্য খাবার লইয়া মা এত রাত্রি অবধি বসিয়া আছেন দেখিয়া ভানু এত ক্ষণ নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল, কিন্তু উমার কথায় নিমেষে মনটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তর দিল, "হয়ই তো। তোমার মত রাত দশটা বাজতে-না-বাজতে লেপ মুড়ি দিয়ে লক্ষ্মীমেয়ের মত বিছানায় ঢোকাটাই যে একটা 'আইডিয়াল' জিনিষ তা তো সকলের জানা নেই কি না। তুমি না-হয় এক দিন ব'লে এসো গিয়ে।"

উমা থালার উপরকার ঢাকাগুলা তুলিয়া সরাইয়া রাখিতেছিল—বলিল, "তোমাকে ব'লে ব'লে যখন কিছুই হ'ল না তখন তাদের গিয়ে ব'লে আসাটাই দেখছি দরকার হয়েছে। এক দিন আধ দিন না, রোজ রোজ তোমার খাবার কোলে নিয়ে কে ব'সে থাকবে শুনি? আগে ছিল ন-টা, তার পর হল সাড়ে ন-টা, আবার হচ্ছে দশটা—তার পর কি বারোটা হবে নাকি? মাকে যত বলি মা ব'সে থেকো না, ব'সে থেকো না, থাক্ দাদার খাবার ঢাকা, তুমি শুয়ে পড়—তা কে শোনে। মার সেই জেগে ব'সে না থাকলে চলে না।"

রাগিয়া ভানু চড়া গলায় বলিল, "দেখ্ উমা, গিন্নিপনা করিস্ নে। মা আমার জন্যে যা করেন তা করেন—তোর অত মাথাব্যথা কিসের? আমার খাবার নিয়ে তোকে ব'সে থাকতে কে বলেছে? আমি বলেছি কোন দিন?"

মা আজ সারাদিন উপবাসী আছেন মনে করিয়া উমা আজ যত শীঘ্র পারে বাড়ী আসিয়াছে; আসিয়া অবধি মাকে খাওয়াইবার জন্য বার চেষ্টা করিয়াং নাই—মা-ষষ্ঠীর প্রসাদ ছেলেমেয়ের মুখে না দিয়া মা কিছুতেই খাইতে রাজী হন নাই। মায়ের জেদে তখন উমা মায়ের উপরও খানিক রাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন সব রাগটা আসিয়া পড়িল দাদার উপর। ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, তাহার কন্যা, তাহাদের সহিত ভানুর এই ঘনিষ্ঠতা, এই রাত করিয়া বাড়ী ফেরা—ইত্যাদি সকলের বিরুদ্ধে যাহা কিছু উমার অভিযোগ তাহা একসঙ্গে ভিড় করিয়া এখন উমার জিহ্বাগ্রে আসিল। কিন্তু মা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া বরফ ধুইতেছেন, মার সম্মুখে দাদাকে উমা ছোট করিতে পারিল না। দাদার একান্ত ইচ্ছা জানিয়া কত দিন উমা দাদার হইয়া এ মেয়ে যাহাতে বধূরূপে এ বাড়ীতে আসে তাহার জন্য মায়ের নিকট সালিসী করিয়াছে—আজ আবার সেই মেয়েরই এই অবিবেচনা, বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ মেলামেশা, তাহার দাদাকে এইরূপ ভুলাইবার চেষ্টা দেখিয়া তাহার নিজের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও মায়ের কাছে কেমন করিয়া সে-নালিশ করা যায়?

উমা সংযত স্বরে বলিল, "আমাকে তো ভূতে পায় নি যে তুমি ব'লে গেলেই আমি রাত এগারটা অবধি তোমার খাবারের থালা আগলে ব'সে থাকব। আমার সকাল বেলা কলেজ আছে, সকালে উঠতে হবে—খাবার আগলানই বল আর টেনিস খেলাই বল, রাত দশটা অবধি ওর কোনটাই আমাকে দিয়ে হবে না। সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাস ক'রে রিণির মত পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্ হয়ে ব'সে আছে যারা, তাদেরই রাত দুপুর অবধি এ রকম হৈ হৈ করা সাজে।......কিন্তু তুমি আর আমাকে বকিও না দাদা, আমার মাথা ধ'রে গেল। খেতে ব'স।...মাগো, ও মা, কোথায় গেলে আবার? এস না খাবে।"

মা একটি ছোট রেকাবিতে কয়েক টুকরা বরফ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "তোরা কি চ্যাঁচামেচিই করছিস বাবা! পাশের ঘরে উনি ঘুমচ্ছেন, এখনই ঘুম ভেঙে যাবে। এত বড় বড় ছেলেমেয়ে, এখনও একটু বুদ্ধি হ'ল না—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করিস্ তোরা?

আমরা কতগুলি ভাইবোন ছিলাম, ছেলেবেলায় এক দিনও কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়া হয়েছে কই মনে করতে পারি না তো। আর তোরা এই মাত্র দুটি, তা এক জায়গায় হয়েছিস কি আর তোদের কথা-কাটাকাটির জ্বালায় যেন বাড়ীতে হাট ব'সে যায়।"

উমা মায়ের হাত হইতে বরফের রেকাবি লইয়া গেলাসে বরফ দিতে দিতে বলিল, "তোমার ভাইগুলি যে সব লক্ষ্মী ছিল মা—আমার গুণের দাদাটির মত ভাই যদি একটি থাকত তো দেখতে।...তোমার জলে বরফ দেব মা?"

মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন— না না দিস্ নে, দিস্ নে বাছা। কি না কি জলে তৈরি তার ঠিক নেই, আমার ও বরফ খেতে প্রবৃত্তি হয় না। তোরাই বা কেন যে খাস্। ভানুকে ব'লে ব'লে তো আর পারি না।"

ভানু বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, কি কি করতে নেই একবার গোড়া থেকে বল তো—মুখস্থ ক'রে নিই। বরফ খেতে নেই, চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই, বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই,—রাত ক'রে বাড়ী ফিরতে নেই,—আর কি মা?"

মা হাসিলেন—উমা উত্তর দিল। বলিল, "অত শুনতে হবে কেন? সোজা কথা তুমি যা যা কর, তার কোনটাই করতে নেই।—কি কি কর না সেইটে মনে ক'রে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে কি কি করা উচিত।"

ভানু বলিল, "শ্রীমতী উমার মতে যদি কাউকে চলতে হয় তো তার সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাস করা উচিত নয়; ঐ মান্ধাতার আমলের বেথুন কলেজে হিষ্ট্রী মুখস্থ ক'রে বি-এ পড়া নেহাৎ উচিত। তার পর রোগা হওয়া কিছুতে উচিত নয়, বেশ দিব্যি ট্যাপাটোঁপা হওয়া উচিত। তার পর টেনিস খেলা কিছুতে উচিত নয়, সন্ধ্যার পর হাতীবাগানের শ্রীমতী শীলার বাড়ী চা খেয়ে ফিরে এম. সেনের ইংরিজীর নোট-বই হাতে নিয়ে ব'সে ব'সে ঢোলা উচিত। ব্যস্, এই করতে পারলেই তার সব উচিত কর্ম্ম করা হয়ে গেল আর কি।"

উমা মায়ের নিষেধ ভুলিয়া চ্যাচাইয়া উঠিল, "মা দেখ না দাদা শুধু শুধু কি রকম বলছে আমায়।"

মা বলিলেন, "ওরে চ্যাচাস নে বাবা চ্যাচাস নে। উনি জেগে উঠে বকতে থাকবেন এখনই।—চুপ কর্ একটু। তোরা যেন সত্যি ক্ষেপিয়ে দিস্ মানুষকে।...আয় মাথাটা এদিকে আন্—প্রসাদী ফুল ঠেকিয়ে দিই। হাঁ কর্ ভানু, চন্নামেত্তরটুকু আগে খেয়ে তবে অন্য কিছু খা। ওমা ওই বুঝি আগেই খেতে সুরু করেছিস? যাক্ গে কি আর হবে—এই প্রসাদটুকু মুখে দে।...আয় উমা সরে আয়, চন্নামেত্তর পড়ে যাবে না হলে।" বলিয়া আঁচলের গেরো হইতে ফুল বাহির করিয়া ছেলেমেয়ের মাথায় একবার করিয়া সেই ফুলসুদ্ধ হাতখানি বুলাইয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও তাহার পর চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া মা-ষষ্ঠীর নিকট সন্তান দুইটির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-কামনায় একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন।

ভানু ও উমা মায়ের হাত হইতে চরণামৃত পান করিয়া প্রথমে মুখ বিকৃত করিল—তাহার পর প্রসাদী বাতাসা ও মিষ্টান্ন পাইয়া নীরবে খাইতে খাইতে বার-বার মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদের দুই জনের মাঝখানে মা বসিয়া একান্ত মনে তাহাদেরই দুই জনের কল্যাণকামনায় মগ্ন—এই মায়ের স্নেহে তাহারা দুইটিতে এক সূত্রে গাঁথা। উমার মনে হইল পৃথিবীতে কত মানুষ আছে—ইহাদের মধ্যে বাছিয়া তাহাদের দুইটিকে ভগবান্ নিজের হাতে এই স্নেহসম্বন্ধে বাঁধিয়া মায়ের স্নেহ-ছায়ায় পাঠাইয়াছেন। তাহারা দুই জনে ঝগড়াই করুক আর যাহাই করুক—এ পৃথিবীতে তাহারা দুই জনে যত কাছাকাছি, এমন আর কে হইতে পারে? দাদা যতই রিণি-রিণি করুক না কেন—উমা অপেক্ষা রিণি তাহার আপন হইবে—এ যে অসম্ভব কথা।

মায়ের কোলের উপর দিয়া উমা দাদার কাছে নিজের হাতখানি বাড়াইয়া দিল। ভানু উমার হাতখানি নিজের বাঁ-হাতে তুলিয়া লইয়া হাসিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে উমা?"

উমাও হাসিল। বলিল, "কিছু না।" মা তখনও মনে মনে পূজা করিতেছেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ভানুর পিতা

এখন পরলোকে, মাতা কাশীবাসিনী। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ভানুর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন পৌত্রমুখ দর্শন করিবার জন্য এক বার কয়েক দিনের জন্য নিস্তারিণী দেবী গৃহে আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়া গিয়াছেন। পিতার আশ্রিতা বিধবা খুড়ীমাকে ভানু তাহার বোনপোর নিকট হালিশহরে পাঠাইয়া দিয়াছে—মাসে মাসে তাঁহার মাসহারা দিয়া থাকে। উমা তাহার স্বামিগৃহে। রিণি এখন সেই হাতীবাগানের চকমিলান ঠাকুরদালান-সংযুক্ত বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

রিণিকে বিবাহ করিবার পর ভানুর ঠাকুরদাদার আমলের সেই বহুপুরাতন বাড়ী কিছু ভাঙিয়া, কিছু জুড়িয়া, কিছু বাদ দিয়া নূতন করিয়া যথাসম্ভব হালফ্যাশানের করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে বইকি। অবশ্য টেনিস্ কোর্ট করা সম্ভব হয় নাই—কিন্তু ছাতের উপর মাটি ফেলিয়া তাহাতে ঘাস দিয়া চারি পাশে বিলাতী পাতাবাহারের টব লাগাইয়া সেখানে ব্যাডমিন্‌টন খেলা চলিতেছে। নীচে ঠাকুরদালানের ঠাকুরদালানত্ব ঘুচিয়া গিয়া যাহাতে সে জায়গাটি চায়ের মজলিসের উপযুক্ত দেখায়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দোতলায় সারি সারি ঘর কতক ভাঙিয়া ফেলিয়া সংখ্যায় কম ও আয়তনে বড় কয়েকটি ঘর বসিয়াছে। তাহার কোনটা শয়নগৃহ, কোনটা বসিবার, কোনটা লাইব্রেরি। এই নূতন বাড়ীর সাজসজ্জা দেখিয়া, বাহিরের লোকের দূরের কথা, ভানুরই মাঝে মাঝে ভ্রম হয় যে, এই সেই একই বাড়ী কিনা, যেখানে ঐ নীচেকার দালানে ভানুর জীবনের চব্বিশ বৎসরের প্রতি বৈকালে মাকে কুটনার ডালা লইয়া ভানু বসিতে দেখিয়াছে, যেখানে এই দোতলার পিতার ঘরের পাশের ঘরে কত বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রে সে মা ও উমার সহিত মেজের উপর পাশাপাশি বসিয়া আহার করিয়াছে। আজ আর দালানে বসিয়া কেহ কুট্‌না কোটে না—মেজেতে বসিয়া খাওয়ার পাট উঠিয়া গিয়াছে—মায়ের পূজার ঘরটা কাঠ ও কয়লা রাখিবার ঘরে পরিবর্ত্তিত। পিতা নাই—মা দূরে—উমাও আজকাল কদাচিৎ এ বাড়ীতে আসে; চিরদিনের বাড়ীখানাও যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছে—ভানুর মনে হয় তাহার চব্বিশ বৎসরের জীবনটা এই পরবর্ত্তী চার বছরের জীবনের মধ্যে যেন হারাইয়া গিয়াছে। রিণি-হীন তাহার গত চব্বিশ বৎসরের জীবনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য যে তাহার সত্য সত্যই কিছু আগ্রহ আছে তাহা নহে, এবং রিণিকে বিবাহ করিয়া ভানু যে সুখী হইয়াছে তাহাতেও ভানুর নিজের মনে বোধ করি সন্দেহ নাই। তবে অভ্যস্ত জীবনটাকে নূতন পথে পরিচালনা করিলে প্রথম কিছু দিন একটু কেমন-কেমন ঠেকে, এই যা। সেই বহুকালসঞ্চিত আবর্জ্জনায় ভরা তাহাদের বাড়ীটিকে রিণি যেভাবে সংস্কার করিয়া আধুনিক ধরণে বাসোপযোগী করিয়াছে তাহা রিণি ছাড়া আর কেহ পারিত কিনা সন্দেহ। যাহা কিছুর সহিত পুরাতন স্মৃতি জড়িত আছে রিণি তাহা সেকেলে বলিয়া নির্ম্মম ভাবে উড়াইয়া দিয়াছে—এখন এ বাড়ীর সবই নূতন, সবই ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সবই আরামের। ভানুর ঠাকুরদাদার ব্যবহৃত ময়ূরপঙ্খী খাটখানির উপর মায়ের কত টান ছিল—মা সেটি ভানুকে দিয়াছিলেন। পুরাতন আমলের উঁচু খাট; ভানুর নিজের সে খাট মোটেই পছন্দ ছিল না, কিন্তু মায়ের জন্য সেই খাটখানিতেই বরাবর তাহাকে শুইতে হইয়াছে। খাটখানি বিদায় করিবার কথা মাকে বলিবারও জো ছিল না; মা বলিতেন, "ওরে বাজারে নূতন জিনিষের অভাব নেই, পয়সা ফেললেই সে জিনিষ সবাই ঘরে আনতে পারে। কিন্তু এ জিনিষ কি পয়সা দিয়ে পাবার? এই খাটে তোর ঠাকুরদাদা তাঁর যাট বছরের জীবনের প্রতি রাতটি কাটিয়েছেন; তার পর আমার বিয়ের পরে আমার ঘরে এই খাট এল, তখন তোর বাবা শুতেন। তার পর তুই যখন যোল বছরের ছেলে তখন উনি এক দিন আমাকে বললেন—এইবার ভানুর ঘরে এই খাট পাঠিয়ে দাও—সেই থেকে তুই শুচ্ছিস। তুই এই খাটে শুয়ে থাকলে আমি যেন নিশ্চিন্দি থাকি বাবা। গুরুজনদের কত দিনের ব্যবহার-করা জিনিষ এ সব যেন আমার তাঁদের অঙ্গ ব'লে মনে হয়—তোরা এর অনাদর করিস নে।"

মায়ের কন্‌সারভেটিব আইডিয়ার বিরুদ্ধে গজ গজ করিতে করিতে ভানু বরাবর সেই প্রকাণ্ড উঁচু খাটে

লাফ দিয়া উঠিয়া তবে শুইত। আজ সে খাট নীচেকার কোন্ একটা ঘরে বন্ধ হইয়া পচিতেছে ঠিক জানা নাই। আজ ভানুর খাট মেজে হইতে হাত-দেড়েকের বেশী উঁচু হইবে না—তাহার এক দিকে আলো রাখিবার ট্রে, এক দিকে বই রাখিবার শেল্‌ফ্—তাহার আরও কত সুবিধার সরঞ্জাম। কিন্তু তবুও এক-এক দিন সেই পুরনো খাটখানির জন্য ভানুর মন কেমন করিয়া উঠে। নিজের এই কন্‌সারভেটিব আইডিয়াকে ভানু যদিও মনে মনে ধিক্কার দেয় এবং নিজের সেই মন-কেমনটুকু নিজের কাছেও কিছুতে মানিতে চাহে না, তবুও এক-এক দিন কেমন যেন মনে হইতে থাকে, সেই শয্যার কোমল স্নেহস্পর্শটুকু কই এ শয্যায় তো পাওয়া যাইতেছে না।

আর শুধুই কি বাড়ীঘর আসবাবপত্র নূতন হইয়াছে? চাকর-বাকর, নিয়ম-কানুন, সবই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। খাবার সময় উত্তীর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিলে এখন আর কেহ কিছুই লক্ষ্য করে না; একটু দেরি করিয়া আসিলে এখন আর পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ি উঠিতে হয় না; কাহারও কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দিবার নাই—অবাধ স্বাধীনতা। বিবাহের পর বছর দুই রিণির শাসন কিছু কড়া ছিল বটে—ক্লাব হইতে দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিলে রিণির বকুনি এড়াইবার জো ছিল না। ভানু হাসিয়া বলিত, "মা বুঝি এইটে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তোমাকে? কিন্তু মা তোমাকে পাটিসাপ্টা তৈরি করতে না শিখিয়ে বকুনি দিতে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন কেন বল তো?" কিন্তু কিছু কাল হইতে সে স্নেহশাসন ঘুচিয়াছে। রিণির বাহিরের অনেক কাজ—আজ চ্যারিটি শো দিতে হইবে, তাহাতে পার্ট লইতে হইয়াছে—কাল টেনিস-টুর্ণামেণ্টে রিণির যাওয়াই চাই—পরদিন গানের মজলিসে রিণির গান গাহিবার নিমন্ত্রণ—ও-সব ব্যাপারে ভানুর বিশেষ আগ্রহ না থাকায় ক্রমে ক্রমে ভানু নিজেই সরিয়া আসিয়াছে এবং রিণিও নিজের সহস্র কাজের ব্যস্ততায় অত লক্ষ্য করে নাই। কোনও বাঁধাবাঁধি নাই—কোনও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না—ভানু স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ মনে মনে ভোগ করিতে চেষ্টা করে।

সেদিন শনিবার ছিল। ভানু তাহার এটর্ণীর চেম্বার হইতে সোজা ক্লাবে গিয়া সেখানে টেনিস খেলিল, ক্লাবের লাইব্রেরি হইতে বই বাছিতে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া দিল, তাহার পর ব্রিজ খেলিতে বসিয়া রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী নিস্তব্ধ; কোথাও কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না। উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে আলো জ্বালাইয়া সিঁড়ির উপরে বসিয়া বসিয়া ভানুর বেহারা ঢুলিতেছে। ভানু শিস দিতে দিতে বড় বড় পা ফেলিয়া ঢুকিয়া এক এক লাফে তিন-তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেমসাব ঘরমে হ্যায়?"

বেহারার তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া চোখ রগড়াইয়া সে প্রভুর পিছনে পিছনে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, মেমসাহেব বৈকালে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর এই আধ ঘণ্টা হইল এক বার বাড়ী আসিয়া সাহেবকে খুঁজিয়াছিলেন; না পাইয়া তাহাকেই বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার বড় জরুরি কাজ আছে, সারিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি সাড়ে বারোটা একটা হইয়া যাইতে পারে—চিন্তার কোন কারণ নাই। মেমসাহেব তাড়াতাড়ি করিয়া খানা সারিয়া চলিয়া গিয়াছেন—ভানুর খানা তৈয়ারী।

ভানু জিজ্ঞাসা করিল, "বেবী কেয়া শো রহা হ্যায়?"

বেহারা বিনীত ভাবে জবাব দিল বেবী তো সন্ধ্যার পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ও এখনও ঘুমাইতেছে। আয়া তাহার ঘরে আছে।

ভানু নীরবে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। বেহারা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাহার লিখিবার টেবিল হইতে একখানি পত্র তুলিয়া ভানুর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া জানাইল যে, দিদিমেমসাহেবের গৃহ হইতে ভৃত্য এই চিঠিখানি লইয়া সন্ধ্যা হইতে অপেক্ষা করিয়া আছে, জবাব না লইয়া যাইবে না। কি হুকুম হয়।

ভানু চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। উমা লিখিয়াছে কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভানু যেন কিছুতেই ভোলে না—দশটা বেলার পর তবে ফোঁটা দিবার সময়, তাহার আগে যেন ভানু

কিছুতেই চা খাইয়া বসিয়া না-থাকে—ফোঁটার আগে কিছু খাওয়া নিষেধ। দশটার সময় যেন ভানু অতি অবশ্য উমার কাছে যায়—ঐখানেই ভাত খাইবে।

কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া! কাল ভানু সকালে উঠিবে, চা খাইতে পাইবে না; কপালে চন্দনের টীকা লইবার আগে কিছু খাইলে উমা আর রক্ষা রাখিবে না। তাহার পর স্নান করিবে, ধুতি-চাদর পরিবে, তাহার পর উমার কাছে গেলে উমা বার-বার বলিতে থাকিবে, "দাদা, এ কাপড় ছাড়, নূতন কাপড় পর, দাদা এখানে ব'স, এটা আগে হাতে নাও, ওটা আগে মুখে দাও; আজকের দিনে এটা করতে নেই—" ইত্যাদি সে কত ধরাবাঁধা নিয়ম—উমার কাছে তাহার এক চুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই।

প্রতিদিন সকাল হইতে রাত্রি অবধি ভানু যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে। বেলা দশটা অবধি বিছানায় থাকে, বিছানায় চা খায়, আধ টিন সিগারেট দু-ঘণ্টায় শেষ করে, খোকাকে নিজের ঘরে আনাইয়া তাহাকে সিগারেট টানিতে শেখায়। রিণি তাহার সিনেমার অ্যাকৃটিং লইয়া রাত্রি জাগে বলিয়া এদিকে বেলা করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠে—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিবার তাহার সময় হয় না। সকাল হইতেই ক্ষণে ক্ষণে তাহার টেলিফোনে ডাক আসিতে থাকে, দ্বিপ্রহরে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া অভিনয়ের উপযোগী কাপড় কিনিতে হয়, সন্ধ্যার পর তাহাদের ষ্টুডিওতে রিহার্সাল বসে—বাড়ীতে চাকর আছে, খানসামা আছে, আয়া আছে, খোকা আছে, ভানু আছে—কাহারও কোনও অসুবিধা হইবার তো কথা নয়। আর অসুবিধা তো হয়ও না; বরং ভানুর সুবিধারই শেষ নাই। যখন ইচ্ছা বাহিরে যাও, যখন ইচ্ছা বাড়ী ফের, যাহা ইচ্ছা হয় কর—নালিশ নাই, কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই, কোনও কিছু মানিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই—অবাধ স্বাধীনতা।

কিন্তু কাল ভাইফোঁটার দিনের উমার শাসনবিধি ভানুর মন হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহে মানিয়া লইল এবং উমার কাছে আজ কত দিন যাওয়া হয় নাই মনে করিয়া অকস্মাৎ মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেওয়ালের বড় ঘড়িতে টং করিয়া সাড়ে নয়টা বাজিল। এক বার সেই দিকে চাহিয়া ভানু ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার এক এক লাফে তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া নীচে নামিতে লাগিল। বেহারা পুনরায় খামখেয়ালি মনিবের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল, "হুজুর খানাকা টাইম হ্যায়—" কিন্তু ভানুর জুতার প্রচণ্ড শব্দে ভৃত্যের সে ক্ষীণ কণ্ঠ বোধ করি তাহার কানে গেল না। ড্রাইভার তখনও গাড়ীখানায় গাড়ী তোলে নাই—দাঁড়াইয়া মনিবের হুকুমের অপেক্ষা করিতেছিল—ভানু সোজা গিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বেহারা তাড়াতাড়ি গাড়ীর নিকটে আসিয়া আবার আপনার বক্তব্য জানাইলে ভানু বলিল, তাহার খানা টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া তাহারা যেন সকলে চলিয়া যায়—কাহারও অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর ড্রাইভারকে বলিল, "সার্কুলার রোড—জোড়া গীর্জ্জা—'

জোড়া গীর্জ্জার নিকট উমার বাড়ী। দোতলা বাড়ীটির একতলায় একটি মাদ্রাজী পরিবার থাকে—দোতলাটা উমার স্বামী ভাড়া লইয়াছে। ছোট পরিবার; উমা, তাহার স্বামী ও একটি বছর-আড়াইয়ের শিশু-কন্যা—উপরের চারখানা ঘরেই তাহাদের যথেষ্ট কুলাইয়া যায়। ভানু যখনই আসে, বলে, "উমা, এ ফ্ল্যাটখানি তো দেখছি তুই-ই সবটা জুড়ে আছিস, বেচারা সতীশ আর খুকুটা কোণঠাসা হয়ে গেল যে—বদলে আর একটু বড় দেখে একটা ফ্ল্যাট নে না"—উমা হাসে। এখন আর দাদা তাহাকে মোটা হাতী বলিলে উমা রাগ করে না—বলে, "তা আমি হলাম বাড়ীর গিন্নি, জায়গা জুড়বই তো। আমি চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে থাকি আর উনি বড়জোর চোদ্দ ঘণ্টা বাড়ী থাকেন—প্রোপোরশান কষে দেখ না কার কতটা জোড়বার কথা।"

আজ উমার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিলে ভানু অভ্যাস-মত লাফাইয়া নামিল এবং অন্ধকার সিঁড়িতে যতটা সম্ভব লাফাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিতেই উপরের সিঁড়ির দরজা খুলিয়া গেল। উমা সিঁড়ির আলো জ্বালাইয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "কে—দাদা বুঝি? পায়ের শব্দ শুনেই বুঝেছি ঠিক। ও দাদা—আস্তে ভাই আস্তে—

লক্ষ্মীটি অত শব্দ ক'রো না। খুকুটা ঘুমচ্ছে এই পাশের ঘরে, এক্ষুনি উঠে চ্যাচাবে। মেয়ে নয় তো ঠিক যেন কুকুর —এমন সজাগ কান কখনও দেখি নি বাবা। এখন উঠলে আর রক্ষে আছে—তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে দেবে না—ওর সঙ্গে ওর বিছানায় গিয়ে ঢুকতে হবে আমাকে। এস এই ঘরে এস। এত রাত্তির যে?"

ভানু পা টিপিয়া টিপিয়া উমাকে অনুসরণ করিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিল। কয়েকটি বেতের চেয়ার, শেল্‌ফে কয়েকটি বই, দেয়ালে গুটিকতক ফোটোগ্রাফ ঝুলিতেছে। ঘরে পিতলের খেলনা আছে, দু-একটি শ্বেতপাথরের জিনিষ আছে, একটি ফুলদানিতে ফুল আছে, কোণে একটি গ্রামোফোন আছে। ভানুর ঐশ্বর্য্য-উপকরণ-ভরা গৃহের তুলনায় ঘরখানি অকিঞ্চিৎকর।

ভানু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি মেয়েই তৈরি করেছিস উমা। একটু শব্দ হলেই উঠে পড়বে—একটু উঠে পড়লেই কেঁদে ফেলবে—এ কি এ? আমার পায়ের ঐটুকু শব্দে তোর মেয়ে একেবারে ঘুম থেকে উঠে পড়বে? অবাক করেছিস। দেখে আয় দিখিনি আমার ছেলেটাকে —বাড়ীটা মাথায় ভেঙে পড়লেও তার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে না। আর ঘুম ভাঙলেই বা কি—আয়া এক ধমক দিলেই আবার টুপ ক'রে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে—অত মার আঁচল ধরার আবদার খাটবে না। যে মেয়ের ভয়েই গেলি! যা যা সেটাকে তুলে নিয়ে আয় ঘুমটা ভাল ক'রে ভাঙিয়ে দিয়ে যাই। অনেক দিন দেখি নি তাকে।"

উমা যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না—বরং একটা চেয়ার টানিয়া ভাল করিয়া বসিল। বলিল, "না দেখেছ না-ই দেখেছ—আজ রাত দুপুরে আর দেখে কাজ নেই।...একলা এলে কেন দাদা? বউদিকে আনতে পারলে না? দিনের বেলা তো দেখি বউদির সত্তর রকমের কাজ—কোথায় কোথায় যে ঘোরে ঠিক পাই নে। এখন নিয়ে এলেই পারতে।...এল না কেন বউদি বল না। খোকার জন্যে বুঝি?"

ভানু হাত নাড়িয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে বলিল, "ওরে ওরে মূঢ়া, জ্ঞানহীনা, স্থূলদেহা ও স্থূলবুদ্ধি নারী, তোর ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? আর থাকবেই বা কোথা থেকে? সেই যে বি-এ-তে হিষ্ট্রী মুখস্থ করেছিলি গাধার মত, তাইতেই খুইয়ে ব'সে আছিস আর কি সব বুদ্ধিসুদ্ধি। তোর বউদিকে কি ছেলে মানুষ করবার দাই পেয়েছিস নাকি যে খোকাকে কোলে ক'রে ব'সে থাকবে সে রাতদিন? সে গেছে এখন শরৎ চাটুজ্যের 'দেনা-পাওনার' ষোড়শী হ'তে—বাংলার ষ্টেজকে সে দেড়তলা উঁচুতে অন্ততঃ তুলে দিয়ে যাবে; এই বেকার-সমস্যা ও জীবন-সংগ্রামের দিনে সে বাংলার ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সকলের জন্য জীবিকানির্ব্বাহের রাস্তা সাফ ক'রে অন্নসমস্যা ঘুচিয়ে দিয়ে যাবে—সে ভেঙে উড়িয়ে দেবে এই তোদের যত সব কনজারভেটিব আইডিয়া। শুধু দিনের বেলাটুকুতে তার কি হবে—তার সমস্ত জীবনটাই এখন এসব ঘোরতর কাজে সে উৎসর্গ করবে পণ করেছে—খোকাখুকী মানুষ করা—সে-সব তোরা কর।

উমা প্রথমটা হাসিমুখেই দাদার বক্তৃতা শুনিতেছিল, কিন্তু শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, সত্যি বউদি সিনেমায় নেমেছে? আমি এখানে-ওখানে গুজব শুনি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। সত্যি নেমেছে দাদা? তুমি দিলে নামতে? কিছু বললে না?"

ভানু উমার গলা অনুকরণ করিয়া বলিল, "দিলে দাদা, কিছু বললে না দাদা—মানে কি রে? দেব, বলব, তবে সে যাবে? কেন তার হাত-পা নেই নিজের? আমার হাত-পা তো ধার করতে আসে নি—নিজের গুলোই নিয়ে যে-কাজ ভাল মনে করে সেই কাজে লাগাতে গেছে—আমি মানা করতে যাব কোন্ হিসাবে? হ্যাঁ—আমার হাত-পা চারটে ধরে অ্যাকটিঙে নামবার জন্যে টানাটানি করলে কিছু বলতে পারতুম বটে। এতে বলবার কি আছে?"

উমা দাদার ঠাট্টা-তামাশায় কান দিল না। বলিল, "এ আবার কি রকম বাহাদুরি দাদা? বাধা না দিয়ে তুমি কি ভাবছ খুব ভাল কাজ করছ? বউদি তোমার চেয়ে কত ছোট—ভাল-মন্দ সব যদি এখনও ঠিকমত না বুঝতে শিখে থাকে তো তোমার উচিত নয়

ব'লে বুঝিয়ে দেওয়া? এ কি ক'রে বেড়াচ্ছে সে? মা শুনলে কি রকম কষ্ট পাবেন মনে ক'রে দেখ তো। আজ এখন বউদি কোথায় গেছে ঠিক ক'রে বল।"

ভানু বলিল, "ঠিক্ জানি না, তবে মনে হচ্ছে স্টুডিওতে গেছে তাদের। ওদের যে রাত্রেই বেশী কাজ হয় কিনা, তাই।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা কি করছে? ঘুমচ্ছে? তুমি কখন বাড়ী ফিরেছিলে? খেয়েছ?"

ভানু হাসিল। বলিল, "তোর কথা জিজ্ঞাসা করবার কোনও মেথডই নেই। কতগুলো অবান্তর কথা এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলি বল্ তো? একটা একটা ক'রে বল্।"

উমা রাগিয়া গেল। বলিল, "ভাল লাগছে না দাদা তোমার হাসিঠাট্টা। বল না যা যা জিজ্ঞাসা করলাম। অত একটা-একটা ক'রে বলতে আমি পারি না।"

ভানু এবার আর হাসিল না। বলিল, "খোকা আর কি করবে? ঘুমচ্ছে। আয়া আছে তার কাছে—রোজই থাকে। আমি বাড়ী ফিরে দেখলাম তোর বৌদি ফেরে নি, আর তোর চিঠিটাও পেলাম, তাই চলে এলাম সোজা তোর কাছে। খাই নি এখনও—এই গিয়েই খাব।"

উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "রাত দশটা বাজল—এখনও খাও নি? ব'সো, আমার কাছে খেয়ে যাবে তুমি; খাবার দিতে ব'লে আসি?"

ভানুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিল, "ওরে না না রে উমা, কেন হাঙ্গাম করছিস্ এত রাত্রে? আমি ব'লে এসেছি আমার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে—আমি এখনই গিয়ে খেয়ে নেব। তুই ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? রাত হয়ে গেছে মিছিমিছি হাঙ্গাম করিস নে।"

উমা শুনিল না। "তুমি দুটি খাবে তা আবার হাঙ্গামাই বা কি, ব্যস্তই বা কে হবে?" বলিতে বলিতে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

একটু পরে ফিরিয়া খাবার ঘরে ভানুকে যখন উমা ডাকিয়া লইয়া গেল, ভানু তার একলার জন্য থালা দেখিয়া বলিল, "তোদের বুঝি সব খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে?"

উমা উত্তর দিল, "না, উনি যে আসেন নি দাদা এখনও। উনি এলে আমি খাব—তুমি খেয়ে নাও ভাই।"

খাইতে খাইতে ভানুর কেবলই মনে হইতে লাগিল সেই পুরনো দিনের কথা—যখন রাত্রে বাড়ী ফিরিতে দেরি করিয়া মায়ের নিকট বকুনি খাইয়া দুই ভাইবোনে নীরবে মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে খাইতে বসিত। যতই রাত্রি হোক, মা ঠিক তাহাদের খাবার লইয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেন, এবং খাইবার পূর্ব্বে যতই ভর্ৎসনা করুন খাওয়াইতে বসিয়া তাঁহার বেশী করিয়া খাইবার উপরোধ-অনুরোধের ব্যতিক্রম কোনও দিন হইত না।

উমার "এটা খাও, ওটা খাও, ওটা ফেলতে পাবে না" শুনিতে শুনিতে ভানুর মনে হইল, উমাটা বড় হইয়া যেন ছোট মা হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে মনটা আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিল, "দেখ্ উমা, আমাকে কি তোর খুকু পেয়েছিস নাকি যে কি খাব, না খাব, হুকুম করছিস ব'সে ব'সে? ওসব আমি শুনব না। আমি নিজের বাড়ীতে যা ইচ্ছে হয় তাই খাই—অত বলাবলি-টলাবলি সহ্য হয় না আমার।"

উমা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, যা ইচ্ছে হয় খাও বাপু তোমার। পায়েসটা শুধু আমি নিজের হাতে করেছি, উনি খুব ভালবাসেন ব'লে—ওটা সবটা খেও ভাই।"

ভানু বলিল, "তোর উনি ভালবাসেন ব'লে আমাকে ঐ আধসেরী বাটির পায়েস সবটা খেতে হবে নাকি? এ তো ভারী জুলুম তোর। আর তুমি আবার রাঁধতে শিখেছ কবে থেকে? নূতন বিদ্যেতে যা রেঁধেছ, সে যা হয়েছে বুঝতেই পারছি—যাচ্ছেতাই হয়েছে নিশ্চয়ই—" বলিয়া পায়েসের বাটিতে চুমুক দিয়া সবটা খাইয়া ফেলিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া উমা "ঐ উনি বাড়ী এলেন—দেখেছ এক বার কি দেরি বাড়ী ফিরতে"—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একটু পরেই সতীশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। উমা স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো, কি ভেবেছ? বাড়ী আসতে আর হবে না, না? দাঁড়াও না, এবার যেদিন এমনি দেরি ক'রে আসবে তুমি,

আমি রাম সিংকে মানা ক'রে দেব দরজা খুলতে। আটটা থেকে রাস্তা দেখে দেখে আমার চোখ ব্যথা—তার পর ভাগ্যিস দাদা এল তাই খানিকটা সময় কাটল আমার।· ·বাবা:, খুকুটা কবে যে একটু ভদ্রলোকের মত হবে যে ওটাকে ছেড়ে বাইরে যেতে পারব। ঘরে বন্ধ থেকে থেকে প্রাণ গেল আমার।"

ভানুর খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। উঠিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিল, "এইবার তুমি তোমার উনিকে খুব বকতে থাক এবং পায়েস খাওয়াও, আমি চললাম। ওহে সতীশ, দিব্যি আমার বাড়ীতে আমার খাবার ঢাকা ছিল, গিয়ে আমি বিছানার উপর প্লেটটা টেনে নিয়ে আরাম ক'রে শুয়ে শুয়ে খেতাম—তা না ধরে বসিয়ে গুচ্ছের পায়েস-টায়েস খাইয়ে উমাটা আমার সব মাটি ক'রে দিলে।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "আমার উপকার করেছ ভাই। আশা করি আমার বাটিতে পায়েসের ভাগ একটু কম থাকবে আজ তোমার কল্যাণে। পায়েস একটু ভালবাসি ব'লে দেখ না রোজ এক বাটি ছাঁকা ক্ষীর খাইয়ে খাইয়ে তোমার বোন আমার অমন ফিগারটা একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে। ভুঁড়িকে আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভানু বলিল, "ও যে ছোট-বেলায় মাস-ছয়েক মহাকালী পাঠশালায় পড়েছিল—সেখানে ওদের ক্লাসে শেখান হ'ত পতিসেবা নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই বিদ্যে এত কাল পরে সুযোগ পেয়ে তোমার উপর খাটাচ্ছে আর কি। যার কপালের যেমন ভোগ ভাই—কি করবে বল। ভুঁড়ি নিয়ে ব'সে ব'সে ক্ষীরই খাও।"

উমা ডাকিয়া বলিল, "দাদা কাল ঠিক আসছ তো? দশটা বেলার দেরি ক'রো না—সকালে যেন চা খেও না খবরদার—খোকাটাকে এনো।"

ভানু সিঁড়ির নীচে হইতে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া আছে। বলিল, "হ্যাঁ আসব ঠিক। গুডনাইট সতীশ; চললাম রে উমা।"

উমা বলিল, "এসো।" তাহার গলার স্বরটা ঠিক মায়ের মত শুনাইল।

ভানু যখন আবার বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল, তখন এগারটা বাজিতে আর দেরি নাই। চাকরেরা চলিয়া গিয়াছে; ভানুর ঘরে ছোট একটি টেবিলের উপর তাহার আহার্য্য দ্রব্যাদি ঢাকা। জানালা খোলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে হুহু করিয়া আসিতেছে। কেহ পথ চাহিয়া বসিয়া নাই—কেহ বলিল না এত রাত্রি করিয়া কেন বাড়ী আসিলে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল না এত রাত্রি অবধি তোমার কোথায় কি দরকার ছিল। শূন্য গৃহ তাহার ঐশ্বর্য্য-উপকরণ, তাহার সজ্জিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া মূকভাবে ভানুর মুখের প্রতি যেন চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য ভানুর মনটা একটু স্নেহ-শাসনের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—মনে হইল তাহার গতিবিধি, তাহার প্রয়োজন, তাহার অপ্রয়োজন যদি এমন একান্তই তাহার নিজের না হইত—মনে হইল আবার যদি এখনই সে শুধু পথে পথে ঘুরিবার জন্য বাহির হইয়া যায় তো কেহ বলিবে না যে না, যাইও না, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে, তুমি আমার জন্য এখন এখানে থাক। ঠিক এমনটা যদি না হইত। কাহারও জন্য কিছু করিতে হয় না—জীবনটা কবে এমন নিরর্থক হইয়া গেল?

কিন্তু ভানু কি ভাবিতেছে—সে কি পাগল নাকি? বাড়ী ফিরিতে এক ঘণ্টা দেরি হইলে স্ত্রী প্যানপ্যান করিবে, ক্লাবে খেলিতে যাইবার সময়ে আব্দার ধরিবে আজ খেলা থাক, তাহাকে সিনেমায় লইয়া চল—প্রতিদিন কৈফিয়ৎ চাহিবে এতক্ষণ বাহিরে কোথায় ছিলে, কি করিতেছিলে বল—সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার সর্ব্বস্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে থাকিবে—সে জীবন তো সকলেরই—ঐ রায়ের, ঐ ডা: ব্যানার্জ্জীর, ঐ তাহার ভগ্নীপতি সতীশের। উহারা এক দিন দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিতে ভয় পায়—ইচ্ছা হইলেও হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাব হইতে সোজা ডায়মণ্ড হারবারে চলিয়া গিয়া খানিকক্ষণ নির্জ্জন গঙ্গার ধারে বসিয়া থাকিবার স্বাধীনতা তাহাদের নাই। ছিঃ, ও-রকম জীবন ভানু ভালই বাসে না; তাহার বিরক্তি বোধ হয়।

একটা সিগারেট ধরাইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, আলো নিবাইয়া ভানু শুইয়া পড়িল। আজ আর বই পড়িবে না, রাত হইয়া গিয়াছে। কাল আবার উমাটার জন্য

বুনো হাঁস

সুইডিশ চিত্রকর ব্রুনো লিলজেফোর্স অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বলা অবধি ঘুমাইবার জো নাই—সকাল সকাল উঠিতে হইবে—অন্ততঃ নয়টা।

ও-ঘরে খোকাটা কাঁদিতেছে নাকি? ভানু কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল। হ্যাঁ কান্নাই তো। কি হইল খাবার খবর লইতে হয়। জ্বালাইয়াছে।

•ভানু অন্ধকারে উঠিয়া স্লিপার খুঁজিয়া পাইল না। খালি-পায়ে দরজার নিকটে গিয়া ডাকিল, "আয়া, এই আয়া—বেবী কেঁও রো রহা হ্যায়? লে-আও হামারা পাস।"

আয়া খোকাকে লইয়া আসিয়া জানাইল, ঘণ্টাখানেক হইতে বেবী উঠিয়া পড়িয়াছে—কিছুতে ঘুম পাড়ানো যাইতেছে না। শরীর ভালই আছে ও এখন খেলা করিতে চায়—ঘুম পাড়াইতে গেলেই দুষ্টামি করিয়া কাঁদিতেছে।

জলন্ত সিগারেটটা মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া ভানু দুই হাতে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। আয়াকে হুকুম করিল বাবার বিছানা লইয়া আসিয়া তাহার খাটে বিছাইয়া দিতে—বাবা তাহার কাছেই ঘুমাইবে—আয়ার থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বিস্মিতা আয়া সাহেবের আদেশ-মত খোকার বিছানা তুলিয়া সাহেবের শয্যার এক ধারে বিছাইয়া দিয়া মনে মনে মনিবকে বহু ধন্যবাদ দিয়া ঘুমাইতে চলিয়া গেল।

এই নূতন ব্যবস্থায় খোকার আনন্দের সীমা রহিল না। সে একমুখ হাসিয়া নিজের ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ছোট হাতে পাশের বালিশটি নির্দেশ করিয়া পিতাকে বলিল, "তুমি এখানে শোও—কেমন? রোজ রোজ আমি এখানে শোব, তুমি এখানে শোবে—কেমন?"

কে বলিল বাড়ীতে ভানুকে কাহারও কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই?

শুইয়া শুইয়া সিগারেট না খাইলে ভানুর অন্য দিন ঘুম আসে না। খোকার টনসিলের পক্ষে সিগারেটের ধোঁয়া ভাল নহে ডাক্তার বলিয়াছে—ভানুর সে-কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে আজ সিগারেট লইবার জন্য পাশের টেবিলের দিকে হাত বাড়াইয়াও ভানু থামিয়া গেল।

বিছানার অর্দ্ধেকের উপর খোকার বালিস, বিছানায় ভরিয়া গিয়াছে—অল্প জায়গায় আড়ষ্ট হইয়া ভানুকে শুইতে হইল—মুখে অভ্যস্ত সিগারেট নাই, পাছে খোকা পড়িয়া যায় এই ভয়ে খাটে এদিক-ওদিক নড়িবার উপায় রহিল না; তবুও দুই হাতে খোকাকে কাছে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত মনে ঘুমাইবার জন্য ভানু চোখ বুজিল।

কীটপতঙ্গের বাজনা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাণীজগতে সুগায়ক হিসাবে মানুষ ও পাখীরাই সমধিক পরিচিত। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ও পাখী ছাড়া কণ্ঠসঙ্গীতে আর কেহ যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাঙের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গানে ব্যাং কাহারও অপেক্ষা কম যায় না। মানুষের কাছে তাহাদের গানের কদর না থাকিতে পারে, তাহাদের স্বজাতীয়দের নিকট কিন্তু কদর খুবই বেশী। বর্ষাসমাগমে তাহাদের সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং প্রণয়িনীরা প্রতিযোগীদের সঙ্গীতের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করিয়াই তাহাদের সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। শোনা যায় সীল-জাতীয় কোন কোন প্রাণী নাকি সময়ে সময়ে অতি করুণ সুরে ঐকতানে গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যেমন একাধারে যন্ত্র- ও কণ্ঠ- সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, অন্য কোন প্রাণী এরূপ দ্বিবিধ ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই। পাখী, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীত আয়ত্ত করিয়াছে, নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গেরাও তেমনই যেন যন্ত্রসঙ্গীত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীতে বাজনদার কীটপতঙ্গের সংখ্যা অগণিত। আমাদের দেশেই যে কত বিভিন্ন রকমের বাজনদার কীটপতঙ্গ আছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। ইহারা যান্ত্রিক কৌশলে সুসংলগ্ন শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি আলোক-তরঙ্গ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। নির্দ্দিষ্ট সুর-তরঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে কোন শব্দই আমাদের কর্ণগোচর হইবে না। তাহার মধ্যেও আবার ক্ষীণ ও সূক্ষ্মতর তরঙ্গগুলি সহজে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিতে পারে না। বিশেষতঃ সূক্ষ্মতর তরঙ্গগুলি যদি একটানা চলিতে থাকে তবে তাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয় এমন ভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, বিশেষ মনোযোগ না দিলে তাহা মোটেই আমাদের বোধগম্য হয় না। আমাদের আশেপাশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন-জাতীয় কীট-পতঙ্গেরা অহরহ বাজনা বাজাইতেছে। সুরের তীক্ষ্ণতা থাকিলেও আওয়াজ এত ক্ষীণ যে, সেদিকে আমাদের মনোযোগ মোটেই আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কীটপতঙ্গের মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ও পঙ্গপাল-জাতীয় কয়েক প্রকার ফড়িঙের আওয়াজের সুরগ্রাম এত উচ্চ ও কর্ণভেদী যে তাহাতে যখন-তখনই লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিভুজাকার মস্তকবিশিষ্ট শব্দোৎপাদনকারী কয়ার-ফড়িং

বিভিন্ন-জাতীয় মাছ, গুবরে পোকা ও কোন কোন

সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরা যান্ত্রিক কৌশলে শব্দ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের শব্দকে বাজনা বলা যায় না, যেহেতু তাহাদের শব্দে সুসঙ্গত কোন সুরের ঝঙ্কার নাই। বিশেষতঃ দুই-একটি প্রাণী ছাড়া ইহাদের অনেকেরই শব্দবোধ আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়া গিয়াছে। আড়, টেংরা, চেকৃভাগা প্রভৃতি মাছকে জল হইতে তুলিয়া ধরিলেই কান্‌কোর উভয় পার্শ্বস্থিত কাঁটা দুটিকে সামনে ও পিছনে নাড়িয়া কটর কটর শব্দে বিকট আওয়াজ করিতে থাকে। কট্‌কটে মাছকে জল হইতে তুলিবামাত্রই দাঁতের সাহায্যে কট্ কট্ শব্দ করিয়া পেট ফুলাইতে থাকে। পাতি-চাঁদা মাছকে জল হইতে তুলিলেই বুক ও পিঠের কাঁটাগুলিকে খাড়া করিয়া বীণার ঝঙ্কারের মত ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ করিয়া থাকে। অবশ্য শব্দ এত ক্ষীণ যে, বিশেষ মনোযোগ না দিলে কানে পৌঁছায় না, তবে স্পর্শ করিলে কম্পন অনুভূত হয়। সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছেরা উত্তেজিত হইলে জলের উপর মাথা তুলিয়া কুপ কুপ করিয়া শব্দ করে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় জলের নীচে ইহারা কেহই এরূপ শব্দ করে না। ইহাতেই বুঝা যায়, আততায়ীর ভীতি উৎপাদনের নিমিত্তই ইহারা এরূপ শব্দ করিয়া থাকে। উড়িবার সময় কোন কোন পাখীর ডানা ও পালকের সংস্পর্শে বাতাসের মধ্যে অনেক প্রকারের শ্রুতিমধুর শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উড়ন্ত মশামাছির ডানা হইতেও একটানা সুরের মত শব্দ নির্গত হয়; কিন্তু কোনটিকেই যন্ত্রসঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ ইহারা কেহই ইচ্ছানুযায়ী শব্দ উৎপাদন করে না। কোন জাতের টিকটিকি লেজ কাঁপাইয়া শব্দ উৎপাদন করে। র‍্যাট্‌ল সাপের লেজ হইতেও খট্ খট্ শব্দ উত্থিত হয়। ইহার কোনটাই সঙ্গীত নহে, ভয় দেখাইবার কৌশলমাত্র। চাক রক্ষা করিবার সময় বোল্‌তা, ভীমরুল ও মৌমাছিরা আততায়ীকে সম্মুখে দেখিলে ডানা কাঁপাইয়া ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করিতে থাকে। সাপের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে। কেহ কেহ বলেন, সাপ বাঁশীর সুরে সাড়া দিয়া থাকে। সাপের সঙ্গীতবোধ আছে কি না জানি না; কিন্তু সাপ অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের
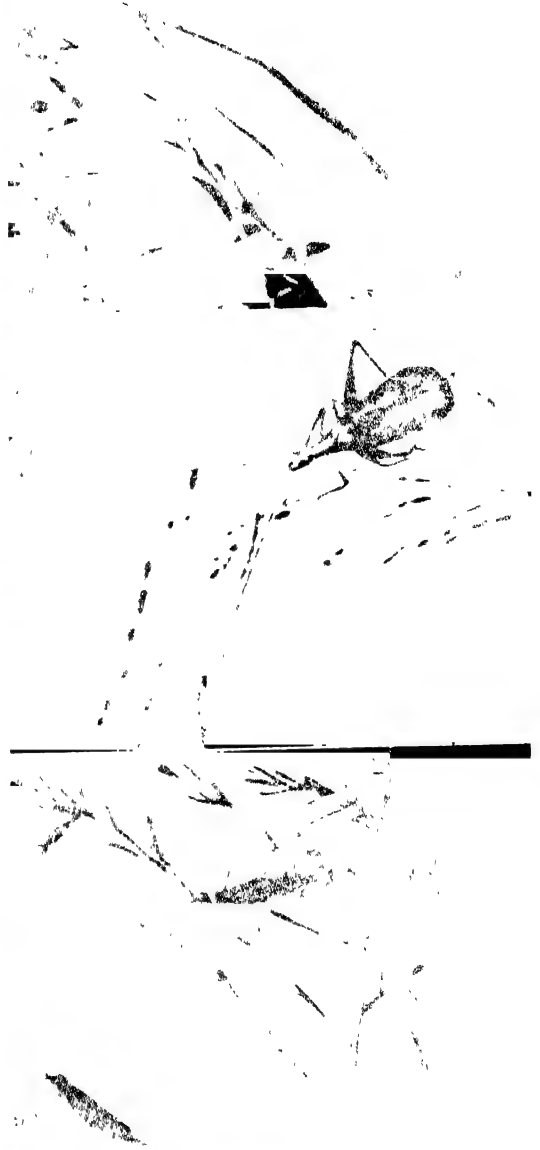
উপরে: বক্রলেজবিশিষ্ট পঙ্গপাল। ইহারা থামিয়া থামিয়া উচ্চ সুরে হিপ্ হিপ্ শব্দ করে

মধ্যে: 'ইকেথাস্ ল্যাটিপেনিস্' নামক একঘেয়ে শব্দকারী এক প্রকার পতঙ্গ

নীচে: শব্দোৎপাদনকারী 'ইক্যানথাস্' পতঙ্গ ও কয়ার-ফড়িং

কীটপতঙ্গের মধ্যে শ্রবণশক্তির অদ্ভুত পরিচয় পাইয়াছি। অভিব্যক্তির স্তরে মাকড়সা অতি নিম্নশ্রেণীর জীব। এই মাকড়সার শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কোন এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়া বেহালা বাজাইতেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই নাকি একটি মাকড়সা যন্ত্রসঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া ছাত হইতে কিছু দূর নামিয়া সুতায় ঝুলিয়া থাকিত। বাজনা বন্ধ হইলেই আবার সুতা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইত। এ কাহিনী সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমি নিজে কোন কোন জাতীয় মাকড়সাকে যন্ত্র-সঙ্গীতের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সুরে সাড়া দিতে দেখিয়াছি। জালের উপর মাকড়সাটি নিরিবিলি বসিয়া রহিয়াছে, খুব জোরে কাঠে কাঠে ঠুকিয়া যত বারই আওয়াজ করিয়াছি, তত বারই সে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে। ধাতব তারকে সবলে প্রসারিত রাখিয়া তাহাতে আঘাত করিলে যে ঝঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া সাড়া দিতে দেখিয়াছি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হইত কি না বলা যায় না। মাকড়সার কথা ছাড়িয়া দিলেও নিম্নস্তরের অন্যান্য কীটপতঙ্গের সঙ্গীতে রসবোধ দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদের কেহই কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী নহে, অর্থাৎ ইহাদের কাহারও কণ্ঠস্বর নাই; কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীতে ইহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-পতঙ্গেরা বাজনা বাজাইয়া স্ত্রী-পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় যেন কেবল চিত্তবিনোদনের জন্যই ইহারা ঐকতানে বাজনা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের শ্রবণশক্তির প্রখরতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই, কোন কোন জাতের পতঙ্গের মধ্যে আবার এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা স্বজাতীয়দের বাজনায় আকৃষ্ট তো হয়ই অধিকন্তু মানুষের যন্ত্রসঙ্গীতে এমন কি তাহাদের গানেও পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে একবার কোনও একটা দীঘির ধারে সোপান-শ্রেণীর উপর বসিয়া কয়েক জনে করিতেছিলাম। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। এমন সময় সকলের অনুরোধে পড়িয়া এক জন গান ধরিলেন। গান সুরু হইবার প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পরেই আশেপাশের গাছপালার উপর হইতে দুই-একটি করিয়া ঝিঁঝিঁ-পোকা উড়িয়া আসিয়া আমাদের গায়ে বসিতে লাগিল। গান চলিতেছিল; দেখিতে দেখিতে প্রায় শতাধিক ঝিঁঝিঁপোকা উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। গান থামিতেই কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের উৎপাত বন্ধ হইয়া গেল। প্রায় পনর-বিশ মিনিট পরে পুনরায় গান সুরু হইতেই দেখা গেল আবার দুই-একটি করিয়া ঝিঁঝিঁপোকা উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িতেছে। সবুজ রঙের ঝিঁঝিঁপোকাদের একটি অদ্ভুত স্বভাব এই যে, ক্রমাগত খট্ খট্ করিয়া কোন কর্কশ আওয়াজ শুনিলেই সেখানে ছুটিয়া আসিবে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক পল্লী-অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ধরার এক অদ্ভুত খেলা প্রচলিত আছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন ঝিঁঝিঁপোকার আবির্ভাব ঘটে, তখন সন্ধ্যাকালে ছেলে-মেয়েরা সকলে মিলিয়া ঝিঁঝিঁপোকার ছড়া সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে থাকে এবং প্রত্যেকে দুই হাতে দুইটি নারিকেলের মালা ঠুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতে থাকে। ঐ শব্দ শুনিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ঝিঁঝিঁপোকা উড়িয়া আসিয়া গায়ে বসে। তখন অনায়াসেই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ডানায় ধরিয়া রাখিলে অথবা বুকে একটু চাপ দিলেই পোকাগুলি কট্ কট্ কড়-ড়-ড়-ড় করিয়া বিকট শব্দ করিতে থাকে। ইহাতেই ছেলেমেয়েদের আনন্দ।

আমাদের দেশে দুই জাতীয় ঝিঁঝিঁপোকা সচরাচর নজরে পড়িয়া থাকে। এক জাতীয় পোকা সবুজ রঙের, অপর জাতীয় পোকার গায়ের রং ধূসর এবং ডানার উপর ফোঁটা-ফোঁটা কতকগুলি দাগ। সবুজ পোকাগুলিই সাধারণের নিকট পরিচিত। ইহাদের ডানাশূন্য পুত্তলীগুলি গাছের গুঁড়ি অথবা অন্য কোন পরিষ্কৃত স্থানে চুপ করিয়া বসে। স্থির হইয়া বসিবার কয়েক ঘণ্টা পরে পুত্তলীর পিঠের উপরের দিক লম্বালম্বিভাবে ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটলের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ঝিঁঝিঁপোকা বাহির হইয়া আসে। শীতের অবসানে ইহাদিগকে সর্ব্বত্র

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভেই আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। পুরুষ-পতঙ্গগুলিই অতি উচ্চৈঃস্বরে 'ঝিন্ ঝিন্' আওয়াজ করিয়া থাকে। দিনের বেলাই ইহাদের বাজনার প্রশস্ত সময়, প্রায় সারাদিনই কোন-না-কোন দলের বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়। সমস্ত নিস্তব্ধ—কোথাও কোন শব্দ নাই—হঠাৎ কোন পাতার আড়াল হইতে 'কিট্ কিট্ কিট্ কিট্ কিরির-র-র-র' শব্দে কর্ণভেদী আওয়াজ উত্থিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর কোন পাতার আড়াল হইতে অনুরূপ শব্দ আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে নানা দিক্ হইতে সেই একই সুরে সুর মিলাইয়া ঐকতান সুরু হইয়া গেল। দুই-একটা এই ঐকতানে সুর মিলাইতে গিয়া সময় সময় সঙ্গৎ বেঠিক করিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই-চার বার শব্দ করিয়া সঙ্গৎ ঠিক হইতেছে না বুঝিতে পারিয়াই যেন তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়া যায়। খানিক বাদে একমাত্রা শেষ হইয়া গেলে দ্বিতীয় মাত্রার প্রথম হইতেই সুর মিলাইয়া ঐকতানে যোগদান করে। যখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে মিলিয়া ঐকতান সুরু করে, তখন কেবল ঝিন্ ঝিন্ আওয়াজ শোনা যায়। সুর যেমন কর্কশ তেমনই সুতীক্ষ্ণ। কর্ণ-পটহে যেন সূচের মত বিঁধিতে থাকে। স্বরসংগ্রাম ক্রমশ ধীরে স্ব-উচ্চ পর্দ্দায় উঠিয়া যায়, আবার ধীরে ধীরে নীচের পর্দ্দায় নামিয়া আসে। এইরূপ তালে তালে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটানা সঙ্গীত চলিতে থাকে। মনে হয় সুরের ঝঙ্কার যেন এক দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে।

বর্ষা আরম্ভ হইলেই ধূসর বর্ণের ঝিঁঝিঁর বাজনা সুরু হয়। ইহারা কাঠ-ঝিঁঝিঁ নামে পরিচিত। সবুজ রঙের পোকাগুলি অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট। কাঠ-ঝিঁঝিঁ প্রায়ই গাছের উঁচু ডালে অবস্থান করে বলিয়া লোকের নজরে পড়ে না। কেবল ঝির ঝির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারাও ঐকতানে বাজনা বাজাইয়া থাকে; কিন্তু শব্দ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও একঘেয়ে বলিয়া সহজে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। ঝিঁঝিঁপোকার শরীরের উভয় পার্শ্বে দুইটি গভীর গর্ত্তের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডানার মত দুইটি পর্দ্দা আছে। ঐ পর্দ্দাগুলিকে দ্রুতগতিতে কাঁপাইয়া তাহারা শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। গর্ত্তের আবরণ ড্রামের পর্দ্দার মত কাঁপিয়া ডানার ক্ষীণ শব্দকম্পনকে বহুগুণে বাড়াইয়া এরূপ উচ্চ সুরে পরিণত করে।

উপরে: পঙ্গপাল-জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পুরুষ-পতঙ্গ। ইহারা ঘাসপালার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বিভিন্ন সুরে শব্দ করিয়া থাকে

নীচে: পক্ষবিহীন শব্দকারী পুরুষ কয়াব-ফড়িং

দার্জ্জিলিঙে এক বার অদ্ভুত ঝিঁঝিঁর ডাক শুনিয়াছিলাম। রাত্রিবেলায় ষ্টেশনের উপরের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে শুনিতে পাইলাম—উপরের একটা বাংলো-প্যাটার্ণের

বাড়ী হইতে যেন কট্ কট্ করিয়া একটা বিকট আওয়াজ আসিতেছে। মনে হইল, ছেলেরা যেন কাঠের চরকি ঘুরাইতেছে। প্রথমে কট্ কট্ শব্দটা হইতেছিল ধীরে ধীরে; কিন্তু ক্রমশই তাহার দ্রুততা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এক দিক্ হইতে শব্দটা আসিতে আসিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। পরক্ষণেই আবার বিপরীত দিকের একটা গাছের উপর হইতে অনুরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন বুঝিলাম এটা ছেলেদের খেলনার শব্দ নহে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—সেই একই ব্যাপার। এক বার এদিক্ হইতে শব্দ হয়, সেটা বন্ধ হইবামাত্রই আবার অন্য দিক্ হইতে শব্দ উত্থিত হইতে

উপরে: বঁড়শির মত লেজবিশিষ্ট সবুজ রঙের পঙ্গপাল-জাতীয় পতঙ্গ। ইহারা মাঝে মাঝে ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দোৎপাদন করে

নীচে: কর্কশ শব্দোৎপাদনকারী পঙ্গপাল-জাতীয় এক প্রকার পুরুষ-পতঙ্গ

থাকে। মনে হইল, পরস্পরের মধ্যে যেন বাজনা-প্রতিযোগিতা অথবা মনোভাব আদান-প্রদানের ব্যাপার চলিতেছে। কেহ কেহ বলিল—ও কিছু নয়, পাহাড়ে ঝিঁঝিঁ। কিন্তু পাহাড়ে ঝিঁঝিঁটা কি পদার্থ তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহার আওয়াজটাই কেবল আজও যেন কানে বাজিতেছে।

দমদম বিমান-ঘাঁটার সন্নিকটে ঘাসপালাসমাচ্ছন্ন একটা জলাভূমির ধারে বসিয়া এক দল তে-চোকো মাছের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, হঠাৎ একটা সুতীক্ষ্ণ কিট্ কিট্ শব্দ শুনিয়া মনটা সেদিকে আকৃষ্ট হইল। কিছুইদখি তে পাইলাম না—পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর অন্তর কেবল কিট্-কিট্-কিটির-র-র এরূপ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রত্যেক বারেই কিট্-কিট্-কিটি-র-র শব্দটা তিন বার করিয়া উচ্চারিত হইতেছিল। প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শব্দের সংখ্যা বাড়িয়া গেল—কিট্ কিট্ কিট্ কিটির-র-র, কিট্ কিট্ কিট্ কিট্-কিটির-র-র। কিন্তু এদিক-ওদিক ঘুরিয়াও শব্দকারীকে দেখিতে পাইলাম না। আরও চার-পাঁচ বার এরূপ শব্দ হইবার পর জলাভূমিটার অপর স্থান হইতেও অনুরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথম যে-স্থান হইতে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম সে-স্থান হইতে শব্দসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর নিরাশ হইয়াই ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম—জলাভূমির মধ্যস্থিত ঘাসের উপর হইতে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা কয়ার-ফড়িং উড়িয়া আসিয়া প্রথমে যেস্থান হইতে শব্দ উঠিতেছিল প্রায় তাহার কাছাকাছিই একটা পাতার উপর বসিল। পূর্ব্বোক্ত শব্দ পূর্ণ উদ্যমেই চলিতেছিল। ফড়িংটা পাতার উপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর উড়িয়া গিয়া আর একটি পাতার উপর বসিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাতার আড়ালে লুক্কায়িত অপর একটি ক্ষুদ্রকায় কয়ার-ফড়িং উড়িয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, বাজনা বাজাইয়া পুরুষ-ফড়িংটি প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল। কয়ার-ফড়িং-জাতীয় বিভিন্ন পতঙ্গের পিছনের পায়ে নিম্নাভিমুখী কতকগুলি সূক্ষ্ম

কাঁটা থাকে। পাতলা পর্দার মত দুইটি সূক্ষ্ম উপাঙ্গের সহিত ঐ কাঁটাগুলি উখার মত ঘর্ষণ করিয়া উহারা এইরূপ শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-ফড়িঙেরাই কেবল এরূপ শব্দ করিতে পারে। ইহাদের বাজনা আমাদের শ্রুতিকটু হইলেও তাহাতে যে একটা তাল ও মাত্রা আছে, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। 'অর্কেলিমাম্,' 'কনোকেফালাস্', 'নিওকনোকেফালাস্,' 'আটলান্টিকাস' প্রভৃতি বিভিন্ন গণভুক্ত বহুবিধ কয়ার-ফড়িং এইরূপ যন্ত্র-সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'ইকেথাস', 'ইক্যান্থাস' প্রভৃতি গোলপত্রী, দীর্ঘ শুঁড় পতঙ্গেরাও যন্ত্র-সঙ্গীতে ইহাদের অপেক্ষা কম যায় না।

লম্বাটে ডানাবিশিষ্ট পঙ্গপালজাতীয় পতঙ্গ। ইহারা থামিয়া থামিয়া ইট্-জি-জি-জিক্ ইট্-জি-জি-জিক্ করিয়া শব্দ করে।

কোন এক পল্লীগ্রামে এক দিন সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসিয়া লেখাপড়া করিতেছি, সবুজ রঙের পঙ্গপাল-জাতীয় একটা ফড়িং উড়িয়া আসিয়া আলোটার উপর পড়িল, কিছুক্ষণ আলোটার উপর বসিবার পর উড়িয়া গিয়া বেড়ার গায়ে বসিল, প্রায় সাত-আট মিনিট পরে আবার উড়িয়া আসিয়া আলোটার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া এক খণ্ড কাগজের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া শুঁড় ও ঠ্যাংগুলিকে পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর সহসা ডানা দুইটিকে ঈষৎ প্রসারিত করিয়া সড়্ সড়্ করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। ক্রমাগত সেই সড়্ সড়্ শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দুই-একটা ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হইতেছিল। আমি অতি মনোযোগসহকারে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এরূপ উল্লসিত বা উত্তেজিত হইবার কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। দেখিলাম, উপরের সবুজ রঙের ডানার নীচে ত্রিভুজাকৃতি আরও ছোট ছোট দুইটি ডানা উপরে নীচে দ্রুতবেগে কম্পিত হইতেছে। এই কম্পনের ফলেই ঐরূপ সড়্ সড়্ শব্দ শোনা যাইতেছিল, কিছুক্ষণ বাদে ডানার কম্পন বন্ধ করিয়া মাঝে মাঝে ক্রিং ক্রিং শব্দ করিতে লাগিল। প্রায় দশ-পনর মিনিট এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ আর একটা বৃহদাকার পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আলোটার উপর পড়িল। মনে হইল যেন প্রথমটার ডাক শুনিয়াই সে উড়িয়া আসিয়াছে। সেটা একটা স্ত্রী-পতঙ্গ। সে এক স্থানে বসিয়া কেবল শুঁড় দুটিকে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আন্দোলন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আগেকার পুরুষ-পতঙ্গটা পূর্ব্বের মত সড়্ সড়্ আওয়াজ সুরু করিয়া দিয়াছে। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, উত্তেজনায় যেন সে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তার পরেই আরম্ভ হইল সুরের ঝঙ্কার—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং-রি-রি-রি-রি—একেবারে একটানা সুর। ছোট ডানা দুটির মূলদেশে অবস্থিত অপর দুইটি উপাঙ্গের সহিত ডানার পরস্পর ঘর্ষণের ফলে শব্দ উত্থিত হইতেছিল। প্রায় মিনিট-দশেক বাজনা চলিল। বাজনা বন্ধ হইতেই স্ত্রী-পতঙ্গটি এক লাফে অনেক দূরে গিয়া বসিল। পুরুষ-পতঙ্গটিও তাহাকে অনুসরণ করায় তাহারা পলায়ন করিতেছে ভাবিয়া আমি পুরুষ-পতঙ্গটিকে ধরিয়া একটা কাগজের বাক্সে বন্দী করিয়া রাখিলাম। ফিরিয়া দেখি ইত্যবসরে স্ত্রী-পতঙ্গটি অদৃশ্য হইয়াছে। যাহা হউক, পুরুষ-পতঙ্গটিকে তার পরদিন ঘাসপালার মধ্যে রাখিয়া তারের জালে বন্দী করিলাম। কোন দিন দিনের বেলায় কখনও বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে তাহার অদ্ভুত বাজনা সুরু করিত। তখন স্ত্রী-পতঙ্গটিকে উড়িয়া আসিয়া জালের উপর বসিতে দেখিয়াছি। দিন-সাতেক বন্দী-অবস্থা হইলেও সে বেশ ভালই ছিল; কিন্তু এক দিন কেমন করিয়া যেন একটা

টিকটিকি জালের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। আমাদের দেশে পঙ্গপালের মত বহু বিভিন্ন জাতীয় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকেই সুদক্ষ বাজনদার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা স্ত্রী-পতঙ্গদের মনস্তুষ্টির জন্য বাজনা বাজাইয়া থাকে। 'মাইক্রোসেন্ট্রাম', অ্যাম্ব্লিকরিফা, 'ফ্যানারোপ্টেরা' প্রভৃতি গণভুক্ত বিভিন্ন পঙ্গপাল-জাতীয় পতঙ্গেরা এরূপ যন্ত্রসঙ্গীতে অপূর্ব্ব পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

একটু অভিনিবেশসহকারে কান পাতিলেই আমাদের চতুর্দ্দিকে অহোরাত্র এক প্রকার ঝির ঝির শব্দ শুনিতে পাই। এই শব্দ কোথা হইতে আসে? ব্যাপারটা জানা না থাকিলে সহজে ইহার হদিস পাওয়া এক রকম অসম্ভব। শব্দ অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই মনে হইবে যেন অন্য কোন স্থান হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে। আমাদের দেশে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র ছোট বড় বিভিন্ন আকারের লম্ফপ্রদানকারী পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উইচিংড়ি নামে পরিচিত। উইচিংড়ি-জাতীয় প্রাণীরাই এরূপ শব্দ করিয়া থাকে। ইহারা তাহাদের ক্ষুদ্র ডানা কাঁপাইয়া ঝিঁঝিঁপোকার মতই একটানা শব্দ উত্থিত করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর উইচিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে, কেহ কেহ লতাপাতার উপরেই ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার কয়েক জাতীয় উইচিংড়ি ঘরের কোণে, কপাটের আড়ালে বা দেওয়ালের ফাটলে অবস্থান করে। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এক জাতীয় উইচিংড়ি মাটির নীচে দু-মুখো গর্ত্ত করিয়া বাস করে। ইহারা কড় কড় করিয়া কর্কশ স্বরে আওয়াজ করিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে গর্ত্ত হইতে লম্বা শুঁড় বাহির করিয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা তদারক করে। সহজে গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে চায় না। কিন্তু নিরুপায় হইয়া পড়িলে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। গেছো উইচিংড়িরা প্রায়ই থামিয়া থামিয়া চিড়িং চিড়িং শব্দ করে। কিন্তু দেওয়ালের ফাটলে বা ঘরের কোণে যে-সব ছোট উইচিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা একটানা ঝিরঝির করিয়া আওয়াজ করিতে থাকে। যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ ইহারা যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করিয়াছে। কারণ বাজনা বন্ধ হইবার পর দুই-তিনটা পুরুষ-পতঙ্গের মধ্যে সময় সময় লড়াই বাধিয়া যায় এবং বিজেতা স্ত্রী-পতঙ্গের সহিত মিলিত হয়।
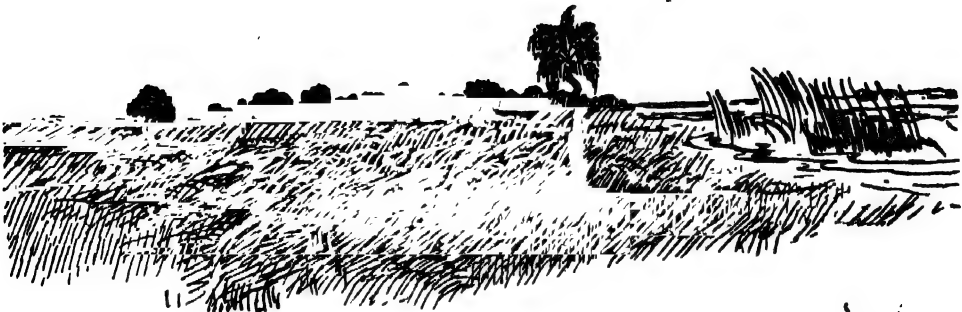
ফরাসী-বিপ্লবের সার্দ্ধশতবার্ষিক উৎসব, ১৪ই জুলাই, ১৯৩৯

বিপ্লবের নেতৃবর্গ

রোবস্পিয়ের

লাফায়েৎ

মিরাবো

দাঁত
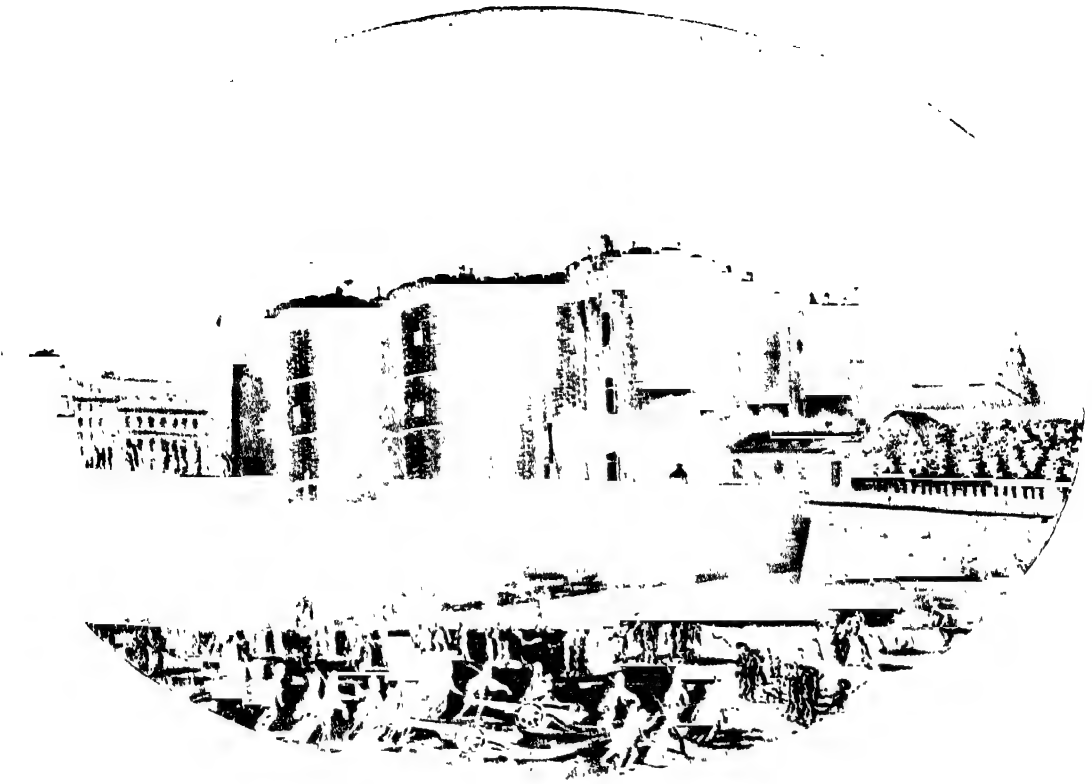
বাস্তিল-দুর্গ আক্রমণ, ১৪ জুলাই, ১৭৮৯। সমসাময়িক চিত্রকর কর্তৃক বিপ্লবীদের দুর্গ-আক্রমণ দেখিয়া অঙ্কিত
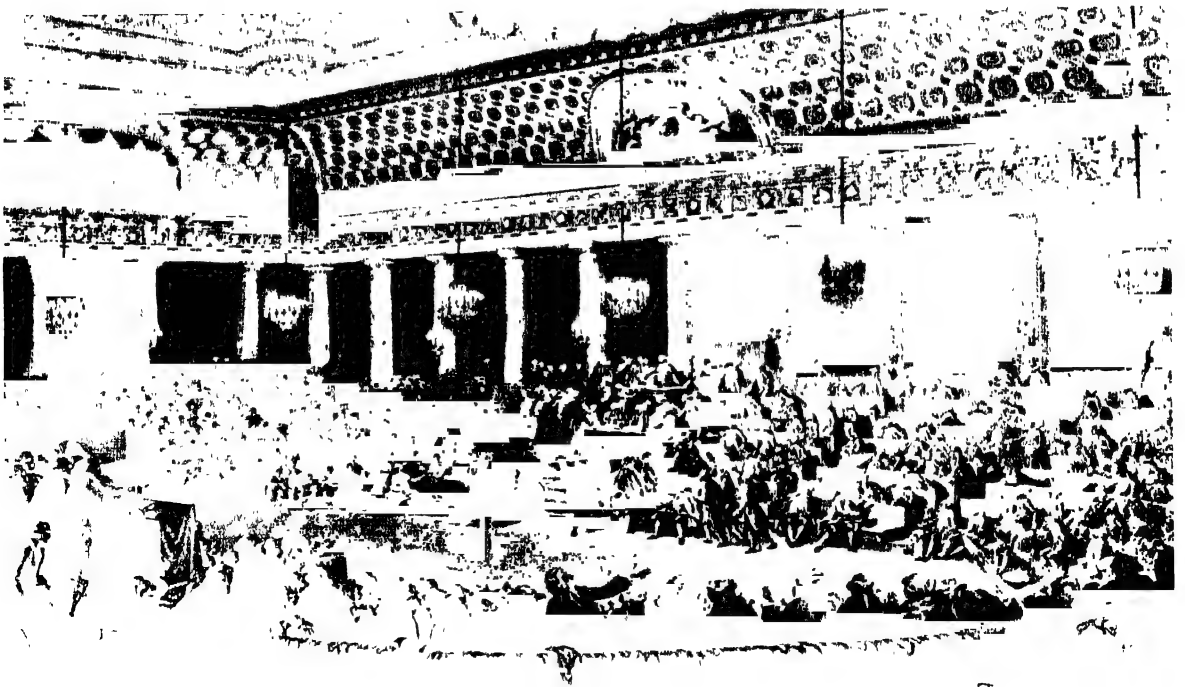
৪ঠা আগষ্ট, ১৭৮৯। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভায় অভিজাতবর্গের অধিকার লোপের দাবী চলিতেছে।
সমসাময়িক চিত্র হইতে।

ছিন্নপাতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষপরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়াপরে।
হেথা হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নিচের তলে
ছোলাক্ষেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে ;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি'।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।
ম্লান রৌদ্রে অপরাহ্নবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা,
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তাসম।
সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদ-পরশন মাগি'।

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হোলো শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝঙ্কারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষঃস্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথীহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছু দিন তরে
শুধু একখানি
সূত্রচ্ছিন্ন বাণী,
সেদিনের দিনান্তের মগ্ন স্মৃতি হোতে
ভেসে যায় স্রোতে॥

পরিচয়]

কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আর্যেরা বিবাহের পর যজ্ঞশালা নির্মাণ করিতেন। ইহা একটা পশ্চিম-পূর্বে লম্বা দু-চালা ঘর। মাঝের উচ্চ খুঁটির উপরে মুদনী ও উত্তর ও দক্ষিণস্থিত খুঁটির উপরে পাড় দিয়া চালা নির্মিত হইত। মুদনীটি ঠিক পূর্বাভিমুখে রাখা হইত। এই কারণে এই যজ্ঞশালার নাম 'প্রাগ্‌বংশ' হইয়াছিল। প্রাগ্‌বংশের পূর্বদিকে ত্রিপদক্ষেপ দূরে বেদি নির্মিত হইত। যজ্ঞশালা ও অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইল, এখন অগ্নির আধান অর্থাৎ উৎপাদন ও স্থাপন করিতে হইবে। সে কোন্ দিনে ? শতপথ-ব্রাহ্মণ (২।১।২) বলিতেছেন,

"তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় (আহবনীয় ও গার্হপত্য) আধান করিবেন। কেন না, (১) এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নির নক্ষত্র। (২) অন্য নক্ষত্র একটি দুইটি, তিনটি, বা চারিটি (তারা লইয়া) আর এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম (ইহাতে ছয়টি তারা আছে)। অতএব তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন। (৩) কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয় না, অপর সকল নক্ষত্র পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয়। ইহাতে তাঁহার অগ্নিদ্বয় পূর্বদিকে আহিত হয়।"—পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখরশাস্ত্রি-কৃত বঙ্গানুবাদ।

এইরূপ পরে পরে অপর নক্ষত্রের নাম করা হইয়াছে। এখানে সমুদয় বিচারে না গিয়া কোন্ কোন্ নক্ষত্রে আধান বিহিত ছিল, কেবল তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। তিনি মৃগশিরায় আধান করিবেন। তিনি পুনর্বসুদ্বয়ে পুনরাধেয় আধান করিবেন। তিনি পূর্বফল্গুনীতে, উত্তরফল্গুনীতে আধান করিবেন। তিনি হস্তায় আধান করিবেন। তিনি চিত্রায় আধান করিবেন।"

এইখানেই শেষ।

পুনর্বসুতে দুইটি তারা আছে। এই কারণে 'পুনর্বসুদ্বয়ে'। এই নক্ষত্রে পুনরাধেয় অগ্নির আধানের ব্যবস্থা। ইহার অর্থ এই, অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীর অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়। এই আধানের নাম পুনরাধেয়।

আধানের আটটি নক্ষত্র পাইলাম। কিন্তু কোন্ কোন্ দিন? "কৃত্তিকায় আধান করিবেন।" 'কৃত্তিকায়' ইহার অর্থ কি? যে রাত্রে কৃত্তিকায় চন্দ্র দেখা যায়, তার পর দিন? চন্দ্র প্রতি-মাসে কৃত্তিকায় আসে, মাসে মাসে এই আট নক্ষত্র ভোগ করে। তবে কি বৎসরে আধানের শুভদিন ৮ × ১২ = ৯৬টি? পুণ্যদিন এত অধিক হয় না। বিশেষতঃ পুনরাধেয় দিন বৎসরে একটি। ইহাতে অনুমান হয়, বৎসরে আধানের দিন সাতটি। অতএব চন্দ্র ত্যাগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু কৃত্তিকা ও সূর্য, রোহিণী ও সূর্য ইত্যাদিও একদা দৃশ্য নয় অতএব সে অর্থও ত্যাগ করিতে হইতেছে। থাকে কৃত্তিকার উদয়, রোহিণীর উদয় ইত্যাদি। এই উদয় বৎসরে এক দিন। আটটি নক্ষত্রের আট দিন যে উষার পূর্বে কৃত্তিকার উদয় হইল সে উষার অন্তে সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান বিহিত ছিল। ঋগ্‌বেদে উষার বহু স্তুতি আছে। সে সব শুভদিনের উষার। বলা বাহুল্য, নক্ষত্রগুলি দৃশ্য তারা ও তারা-সমষ্টি। নচেৎ কৃত্তিকায় বহুতারা, এ বিশেষণ থাকিত না।

এই ব্যাখ্যার সমর্থক আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে (২।১।২।১৮) লিখিত আছে, "সূর্য উদিত হইতে হইতেই নক্ষত্রসমূহের তেজ ও বীর্য গ্রহণ করে।" পুনশ্চ, "সূর্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন। নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান করিবেন না।" এখানে প্রকারান্তরে নক্ষত্রের উদয় বলা হইয়াছে। অতএব যেদিন প্রত্যূষে কৃত্তিকার উদয় হইবে, সেইদিন সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান করিবেন। এইরূপ রোহিণীর উদয়দিন, মৃগশিরার উদয়দিন, ইত্যাদি বৎসরের আটটি দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই অর্থের আরও সমর্থক বাক্য আছে। কৃষ্ণ ও শুক্লযজু-র্বেদে ও তাহাদের ব্রাহ্মণে—তৈত্তিরীয় (১।৫।২) ও শতপথে (২।১।৩)—"বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন ঋতু দেবগণ। শরৎ, হেমন্ত ও শিশির, এই তিন ঋতু পিতৃগণ। যখন সূর্য উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়।" ইহার অর্থ এই, বাসন্তবিষুব হইতে শারদবিষুব পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণ আবর্তন। অর্থাৎ সূর্য যে ছয় মাস বিষুব-বৃত্তের উত্তরে থাকে, সে ছয় মাস শুভ, এবং যে ছয় মাস দক্ষিণে থাকে, সে ছয় মাস অশুভ।

তৈত্তিরীয় ও শতপথ পুনশ্চ বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য বর্ষায়।" অতএব উক্ত আটটি শুভদিন বাসন্তবিষুব (২১ মার্চ) হইতে শারদবিষুব (২২ সেপ্টেম্বর) মধ্যে পড়িত। অতএব চন্দ্র-নক্ষত্র পরিত্যাজ্য। নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া অগ্নির আধান করা হইত। এখানে নক্ষত্রের সহিত সূর্যস্থিতির সম্বন্ধ স্পষ্ট।

এই বিধান কোন্ কালের স্মৃতি, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে। শতপথব্রাহ্মণের উক্তি, "কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয় না, অন্যান্য সর্ব নক্ষত্র পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয়।" মূলে আছে, "এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্বাণি হ বা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে।" ইহার অর্থ বুঝিলে সে উপায়টি পাওয়া যাইবে।

শূন্য আকাশে পূর্বদিক চিহ্নিত করা যাইতে পারে না, কোন্ নক্ষত্র সেদিকেই থাকে, কোন্‌টা তাহার উত্তরে, কোন্‌টা দক্ষিণে আছে তাহা বলিতে পারা যায় না। ভূমিতে পূবপশ্চিম রেখা করিয়া সে রেখার দূরে দূরে দুইটা খুঁটি কিম্বা গোঁজ পুঁতিলে পূবপশ্চিম দিক্ চিহ্নিত হয়। প্রাগ্‌বংশ-নির্মাণের পূর্বে ভূমিতে এই রেখা অঙ্কিত করিতে হইত। সে রেখায় মাঝের দুইটা উচ্চ খুঁটি পোতা হইত। সে রেখা পূর্বদিকে বাড়াইয়া বেদিতে যজ্ঞশালার ত্রিপদক্ষেপ দূরে একটা গোঁজ, ষট্‌ত্রিংশ পদক্ষেপ দূরে আর একটা গোঁজ পোতা হইত। শতপথে (৩।৫।১) এই বিধি বর্ণিত আছে। এখন পশ্চিমের গোঁজের পশ্চাতে বসিয়া পূর্বের গোঁজে দৃষ্টি রাখিলে ক্ষিতিজের ও আকাশের পূর্ববিন্দু পাওয়া যায়। সারারাত্রি দেখিতে থাকিলে কোন্ নক্ষত্র পূর্বদিকে উঠে, কোন্ নক্ষত্র উঠে না, তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যায়। শতপথ বলিতেছেন, কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে উঠে, অন্যান্য নক্ষত্রের কোনটা সেদিকের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে উঠে। কি উপায়ে পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ দিক্ নিরূপিত হইত, তাহা এক্ষণে চিন্তনীয় নয়।

বর্তমানে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুর ২৪° অংশ উত্তরে উঠে। কোন্ কালে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত? আকাশের বিষুববৃত্ত (equator) যে বিন্দুতে ক্ষিতিজে (horizon) লগ্ন হয়, সে বিন্দুই পূর্ববিন্দু। অতএব প্রশ্নটি এই, কোন্ কালে কৃত্তিকা বিষুবরেখায় আসিয়াছিল? গণিত দ্বারা জানিতেছি, খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দে।...পূর্ববিন্দু নির্ণয় করিতে ২° অংশ ভুল হইলেও খ্রি-পূ ৩৩০০ হইতে ২৫০০ অব্দ আসিবে। (চারিটি সূর্যবিন্দু

পাশে পাশে থাকিলে ২° অংশ হইবে।) অতএব প্রায় সাত আট শত বৎসর, প্রতি বৎসরে সাড়ে পাঁচ মাস, প্রতি রাত্রে কৃত্তিকাকে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত। নক্ষত্রদর্শক কৃত্তিকার এই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অসামান্য কিছুই করেন নাই। যে কালে নক্ষত্রচক্র কল্পিত হইয়াছিল, সে খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে প্রত্যেক নক্ষত্র পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ এক দিনে কিম্বা এক বৎসরে ২৮টি নক্ষত্র নিরূপিত হইতে পারে নাই। সে সময়ে কৃত্তিকার পূর্বদিকে স্থিতি লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

উপরে পাইলাম, খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে কৃত্তিকা পূর্বদিক হইতে চ্যুত হইত না। তৎকালে বৎসরের কোন্ কোন্ দিন অগ্নির আধান বিহিত হইয়াছিল? এখন ২৮° অক্ষাংশে (যেমন দিল্লীতে) ৩ জুন কৃত্তিকার 'উদয়' হয়। সেদিন ভোর ৪টায় কৃত্তিকার উদয় হয়, ৫টায় সূর্যের হয়। খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে ২৬ মার্চ হইত। রোহিণীর উদয় ২১ এপ্রিল হইত। অন্য কয়েকটি নক্ষত্র এই দিনের পরে পরে হইত। চিত্রা শেষের শুভ নক্ষত্র। ইহার উদয় ২১ আগষ্ট হইত।

এই গণিত দ্বারা জানিতেছি, কৃত্তিকার উদয় ২৬ মার্চ হইত। ২১ মার্চ বাসন্তবিষুবদিন। অর্থাৎ বিষুবদিনের পাঁচ দিন পরে। আমরা উদয় দর্শনের দেশ জানি না। আমাদের গণিতেও দুই এক দিনের ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে কালের কথা হইতেছে, সেকালে কৃত্তিকায় বাসন্তবিষুবপাত হইত না। আরও পাইতেছি, উক্ত আটটি শুভদিন বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন দেবঋতুর মধ্যেই পড়িত। অতএব আমাদের ব্যাখ্যায় ও কালনির্ণয়ে ভুল নাই।

এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনা যাউক। প্রোফেসর ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ লিখিয়াছেন,১ "শতপথব্রাহ্মণের উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালনির্ণয়ে পর্যাপ্ত নয়। কারণ বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে এইরূপ বচন আছে, বারৃথ সাহেব তাহা হইতে খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়াছেন।" প্রোফেসর কীথ লিখিলেন,২ "নক্ষত্রের সহিত সূর্যকে যুক্ত করিবার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। শতপথ-ব্রাহ্মণের উক্তি অগ্রাহ্য। যেহেতু শতপথব্রাহ্মণে বিজ্ঞানসম্মত নক্ষত্রদর্শনক্ষমতার অভাব দেখা যায়। পরন্তু নক্ষত্র-চক্র বিদেশাগত বোধ হয়।" অর্থাৎ এই পণ্ডিতের বিচারে পূর্বদিকে কৃত্তিকার স্থিতি হইলে নক্ষত্রটি বিষুবপাতে ছিল, আর বিষুবপাতে কৃত্তিকা থাকলে তদ্দ্বারা সূর্যস্থিতি জ্ঞাপিত হইত। যখন এই জ্ঞান ছিল না, তখন কৃত্তিকাও পূর্বদিকে ছিল না। অতএব শতপথব্রাহ্মণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পূর্ববিন্দু নির্ণয় করিতে পারিতেন না। কৃত্তিকাই পরের দ্রব্য, তাহার আবার পূর্বদিক! দুইটি ভ্রমের এমন অপূর্ব-সংযোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাঁহারা ভাবিলেন না, যদি বারৃথ সাহেব খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়া থাকেন, সেটা কিছুতে সম্ভবপর নয়, তাঁহার ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা।

প্রোফেসর উইন্‌টারনিৎস্ শতপথের উক্তিটি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এক বুঝিতে আর বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,৩ "বৈদিক গ্রন্থে বিষুবের কোন উল্লেখ নাই। নক্ষত্র ও সূর্যের স্থিতি সম্বন্ধের কোন উল্লেখ নাই। পূর্বদিক্ অর্থে ঠিক পূর্ববিন্দু নয়, কারণ, সে অর্থ করিলে বাসন্তবিষুবের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। বাক্যটির ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে, কৃত্তিকাতারা-পুঞ্জ পূর্বপ্রদেশে ('eastern region') প্রত্যেক রাত্রে কয়েক ঘণ্টা দৃষ্ট হইত। খ্রি-পূ ১১০০ অব্দের কালে এইরূপ হইত।"

বিদ্বানের এমন বিষম ভ্রম হইতে পারে, তাহার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হইত না। প্রশ্নটা কি, কিরূপে তাহার উত্তর আসিতে পারে, তাঁহারা সে দিক্ মাড়াইলেন না। অগ্নির আধানের দিন-নির্ণয় করিতে হইবে, ইহা মূল প্রশ্ন। 'কৃত্তিকা পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয় না,' ইহা কৃত্তিকার বিশেষণ। মূল প্রশ্নের সহিত বিষুবের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ চিত্রে দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকা বিষুব-বিন্দুতে ছিল না, ইহার পশ্চিমে ছিল। বিষুবপাতে নয়, বিষুবরেখায় আসিয়াছিল। কৃত্তিকা বেবিলন হইতে আসুক, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর উইনটারনিৎস্ মনে করিয়াছেন, আকাশে পূর্বদিকে কৃত্তিকা দেখিয়া যজ্ঞশালার প্রাগ্‌বংশ স্থাপিত হইত!

বস্তুতঃ শতপথব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার তিনটি উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। নক্ষত্রের দ্বারা সূর্যের অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, রবিপথ দুই বিষুব-বিন্দুতে উত্তরদক্ষিণে বিভক্ত হইয়াছে। বিষুববিন্দুর জ্ঞানের কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেবল পূর্ববিন্দুটি জানা আবশ্যক ছিল। আর ক্ষিতিজে সে বিন্দু জানা না থাকিলে 'কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না,' এই বাক্য উক্ত হইতে পারিত কি? বাস্তবিক এই সকল তর্ক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। যজ্ঞশালা নির্মিত হইয়াছে। আর কে বা রাত্রিকালে তারা দেখিয়া পূর্বপশ্চিমরেখা অঙ্কিত করিবে? সে তারা যে পূর্বদিকে আছে, তাহা বলিবার পূর্বে পূর্বদিক্‌জ্ঞান অবশ্য চাই। যদি সে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ নির্বোধ তারা দেখিয়া পূর্বদিক্ আবার নির্ণয় করিবে?

প্রোফেসর উইন্‌টারনিৎস্ বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের (২৫।৫) উপর নির্ভর করিয়া যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত পূর্বদিক্ নির্ণয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু সে বচনে কৃত্তিকা ব্যতীত শ্রবণা এবং চিত্রা ও স্বাতীর অন্তর উল্লিখিত আছে। যদি 'অন্তর' অর্থে চিত্রা ও স্বাতীর যোগরেখার মধ্যবিন্দু বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উক্তিটি অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, সে বিন্দু দৃশ্য নয়, কাল্পনিক।

১) *Vedic Index.*

২) *Cambridge History of India,* Vol. I, p. 148.

৩) Winternitz : *History of Indian Literature,* Vol. I, p. 298.

এই সকল পণ্ডিত ভুলিয়াছেন, শতপথব্রাহ্মণে অগ্নি-আধানের দিননির্ণয়ের কথা, বৌধায়নে যজ্ঞশালা-নির্মাণের দিননির্ণয়ের কথা। শতপথে ও বৌধায়নে কৃত্তিকার বিশেষণটি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন।

শতপথের উক্তি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, বৌধায়নের ব্যাখ্যাও সেই ভাবে সহজে করিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন, প্রথমে যজ্ঞশালার ভূমি পরীক্ষা করিবে। তার পর প্রশ্ন আসে, কোন্ দিন যজ্ঞশালা-নির্মাণ প্রশস্ত। বৌধায়ন তিন মতে তিনটি দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন। (১) কৃত্তিকা দ্বারা, (২) শ্রবণা দ্বারা, (৩) চিত্রা ও স্বাতীর অন্তর দ্বারা নির্ণয় করিবে।

বৌধায়নের নিবাস দক্ষিণাপথে ১৫° অক্ষাংশে ছিল ধরা যাউক, এবং মনে করি, তিনি খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে সূত্র লিখিয়াছেন। গণিত দ্বারা পাইতেছি, ২১ ডিসেম্বর শ্রবণার, ১৭ সেপ্টেম্বর চিত্রার, আর ২৭ সেপ্টেম্বর স্বাতীর উদয় হইত। চিত্রা ও স্বাতীর উদয়-দিনের মধ্যদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এই সকল দিন হইতে বুঝা যায়, যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত বাসন্তবিষুব-দিন, উত্তরায়ণ-দিন আর শারদ-বিষুবদিন, এই তিন দিন নির্দিষ্ট ছিল। শারদ-বিষুবদিন চিত্রা কিংবা স্বাতীর একটির দ্বারা পাওয়া যাইত না। ঐ দুই তারার মধ্যবর্তী দিন ২২ সেপ্টেম্বর উদ্দিষ্ট ছিল। বোধ হয়, যজ্ঞশালা-নির্মাণে রবির দক্ষিণায়ন-দিন বিহিত ছিল না। কারণ, দক্ষিণাপথে তখন বর্ষা পড়িয়াছে। কৃত্তিকা বহুকাল পূর্বে বাসন্তবিষুব-দিনে উদয় হইত। সেই স্মৃতি ছিল। বোধ হয়, শতপথ হইতে কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না, কৃত্তিকার বিশেষণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃত্তিকার উদয়দিন ত্যাগ করিলে দেখা যাইতেছে, শারদ-বিষুবদিন ও উত্তরায়ণ-দিন ঠিক পাওয়া যাইত। ইহাতে এই মনে হয়, বৌধায়ন-সূত্র দক্ষিণাপথে ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মনে করি, উত্তরাপথে ২৫° অক্ষাংশে ও খ্রি-পূ ৫০০ অব্দে বৌধায়ন ছিলেন। গণিতদ্বারা জানিতেছি, সেখানে ২৬ সেপ্টেম্বর চিত্রার ও ২০ সেপ্টেম্বর স্বাতীর উদয় হইত। অর্থাৎ প্রথমে স্বাতীর, পরে চিত্রার। ইহাতে ক্রমটি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। অতএব দক্ষিণাপথ ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দই ঠিক মনে হইতেছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা]

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দ্দশা

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম. এ., বি. এল.

[মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপার্জ্জন ও বেতনের হার বিশ্লেষণে দেখা যায়] যে শ্রেণী বঙ্গদেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে।... যতক্ষণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশ হইতে লোপ না পাইতেছে ততক্ষণ দেখিতে হইবে ইহা যেন সমগ্র দেশের ক্ষতির কারণ না হয়। একটা কথা শোনা যায় (এবং ইহার স্বপক্ষে এত যুক্তির অবতারণা হইয়াছে যে স্বীকার না করা মুস্কিল) যে, বাঙ্গালীর ছেলে ভারতের অন্য সব দেশের ছেলেদের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, এই পরাজয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরাজয়। কেনই বা এই পরাজয় না হইবে? যেখানে নিত্য অন্নকষ্ট, জীবন-সংগ্রাম যেখানে অত্যন্ত কঠোর, যেখানে পরিশ্রম করিবার লোকের অভাব নাই কিন্তু সেই পরিশ্রম যথোচিত মূল্যে কিনিবার লোক নাই, সেখানে দিনে দিনে যে কর্ম্মকুশলতা, কাজ করিবার শক্তি হীন হইয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?...

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই কর্ম্মদক্ষতার ক্রমাবনতির জন্য দায়ী কে? দায়ী যেই হোক্, উদ্ধারের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা হইতেছে, শ্রমকে যথোচিত মূল্যে কিনিবার প্রবৃত্তি জন্মান। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর শ্রম যাঁহারা কিনিতেছেন, সে শ্রম শিক্ষকের, কেরাণীর, জমিদারের কর্ম্মচারীর বা উকীল-ডাক্তারের হউক, তাঁহাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করিতে হইবে যে ভাল মজুরি না দেওয়ার দরুন দেশের এই শ্রেণীর লোকের কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইতেছে বা অবশ হইয়া যাইতেছে। অল্প বেতন দিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন যে লাভবান হইতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছেন না। ভবিষ্যৎ বংশ ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই, তাঁহারাও নিজ নিজ কর্ম্মচারীর দক্ষতা কমাইবার হেতু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ফলে তাঁহারাও যথোচিত প্রতিদান ক্রমশঃ হারাইবেন। একটা নিম্নতম স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা আছে। তাহা না দিলে কোন মানুষ নিজ কর্ম্মশক্তি বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারে না। এই মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন। কিন্তু এই মাত্রার নীচে কোন কর্ম্মচারীকে যাইতে বাধ্য করিলে, তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা এমন কাজ করেন যাহা নীতি-সঙ্গত বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। বলা বাহুল্য বর্ত্তমানে বাংলা দেশে বেতনের হার এত নীচু যে তজ্জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঋণ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। এই ঋণভার তাহাদিগকে পিষ্ট করে। সেইজন্য প্রয়োজন সর্ব্বত্র বেতনের উন্নয়ন। বেতন-বৃদ্ধির দ্বারা যোগ্য লোক হইতে যে অধিকতর কাজ পাওয়া যাইবে ও প্রত্যেকের স্বার্থ অধিকতর পুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্থিক উন্নতি]

বঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যয়

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ.

...বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ১৯৩৫-৩৬ সনের কার্য্যবিবরণী পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায়,

উক্ত বৎসরে বালকদের জন্য ৪২টি সরকারী স্কুল ছিল; ৪টি মিউনিসিপ্যালিটির এবং ১১৪২টি বেসরকারী স্কুল ছিল। ১১৮৮টি স্কুলের মধ্যে ১১৪৬টিই বেসরকারী। আর বালিকাদের জন্য সরকারী স্কুল ছিল ৭টি এবং বেসরকারী স্কুল ৭৬টি। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত স্কুলও অনেক ছিল। আর ৪২টি সরকারী স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৮২১; চারিটি মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ২০০৪; এবং অপর ১১৪২টি বেসরকারী স্কুলে ২৭৯,৬২৪। মোট ২৯৫,৪৪৯ অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রের মধ্যে সরকারী স্কুলে মাত্র ১৩,৮২১ বা প্রায় চৌদ্দ হাজার। আর ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭টি সরকারী স্কুলে ১,৮৪৫ এবং ৭৬টি বেসরকারী স্কুলে ২০,০৭২; অর্থাৎ মোট ২১,৯১৭ বা প্রায় ২২ হাজার ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮৪৫ জন পড়িত সরকারী স্কুলে।

এ সমস্ত স্কুলের জন্য গবর্মেণ্ট বৎসরে যাহা ব্যয় করিয়াছেন তাহাও জানাইতেছি। ৪২টি সরকারী স্কুলের ১৩,৮২১ জন ছাত্রের জন্য বৎসরে খরচ হইয়াছে ৮,১৯,২০৫ টাকা অর্থাৎ প্রতি ছাত্রের জন্য বৎসরে প্রায় ৬০ টাকা এবং মাসে প্রায় ৫ টাকা। আর ১১৪২টি বেসরকারী স্কুলের মধ্যে মাত্র ৫৪১টিতে কিছু সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই ৫৪১টি স্কুলের ১,৩৩,৯৩২ জন ছাত্রের জন্য ৯,৯৯,৪৭১ টাকা অর্থাৎ এই কয়টি স্কুলের প্রতি ছাত্রের জন্য বৎসরে প্রায় ৭।০ টাকা এবং মাসে প্রায় ।৵০ আনা দেওয়া হইয়াছে। আর সমস্ত বেসরকারী স্কুলের ২৭৯,৬২৪ জন ছাত্রের সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিলে প্রতি ছাত্রের জন্য সরকারের মাসিক ব্যয় হইবে প্রায় পৌনে পাঁচ আনা। সরকারী স্কুলের জন্য ৫ টাকা হারে; কিন্তু বেসরকারী স্কুলের জন্য পাঁচ আনাও নয়।

আর ছাত্রীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় করিয়াছেন। সাতটি সরকারী স্কুলের ১,৮৪৫ জন ছাত্রীর জন্য ২২১,০৬৩ টাকা অর্থাৎ প্রতি ছাত্রীর জন্য বৎসরে প্রায় ১২০ টাকা, মাসে ১০ টাকা; সরকারী স্কুলের প্রতি ছাত্রের দ্বিগুণ। ৭৬টি বেসরকারী স্কুলের মধ্যে ৬৬টি সরকারী সাহায্য পায়, ১০টি পায় না। ৬৬টি স্কুলের ১৭,৯৬৬ জন ছাত্রীর জন্য গবর্ণমেণ্ট দেন ৩,৪১,৬৪৬৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি ছাত্রীর জন্য বার্ষিক প্রায় ১৯৲ টাকা, মাসে প্রায় ১॥৵০ আনা, আর সমস্ত বেসরকারী স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ধরিলে প্রতি ছাত্রীর জন্য সরকারের খরচ হয় বৎসরে প্রায় ১৫ টাকা, মাসে প্রায় ১।০ আনা; সরকারী স্কুলের হার ১০ টাকা তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।...

সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট মোট খরচ করেন বৎসরে ১৮,১৮,৬৭৬ টাকা ছাত্রদের জন্য এবং ৫,৬২,৭০৯ টাকা ছাত্রীদের জন্য। আর ছাত্র-বেতনরূপে জনসাধারণ খরচ করে বৎসরে ৮১,৯৯,৯০৮ টাকা ছাত্রদের জন্য এবং ৭,৬৭,১৫৪ টাকা ছাত্রীদের জন্য। সর্ব্ববিধ উচ্চ-ইংরেজী স্কুলগুলির জন্য জনসাধারণ কেবল ছাত্র-বেতন বাবদ খরচ করেন মোট ৮৯,৬৭,০৬২ টাকা অর্থাৎ প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা, আর গবর্ণমেণ্ট খরচ করেন—পরিদর্শনাদির ব্যয় বাদে মোট ২৩,৮১,৩৮৫ টাকা অর্থাৎ ২৪ লক্ষ টাকা—জনসাধারণ যাহা দেয় তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বলা বাহুল্য এই চব্বিশ লক্ষও জনসাধারণের নিকট হইতেই গবর্ণমেণ্ট আদায় করেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য]

বিস্ময়

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

ভালই হউক আর মন্দই হউক সত্যিকারের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে হইলে তাহাতে ফাঁকি চলে না। গর্দ্দভ যে রাগিণী-জগতে অত বড় একটা স্থান করিয়া লইয়াছে তাহাও যে ফাঁকি দিয়া নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই এক-বাক্যে মানিয়া লইবে। বছর দুই পূর্ব্বেও দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিজনের যে নামডাক ছিল, ভালর ভেজালশূন্য সে যে কত বড় খাঁটি বস্তু তাহা তাহার খ্যাতির পরিমাণ হইতেই উপলব্ধি করা যাইত। মা-সরস্বতীর সঙ্গে বিজনের যোগসূত্রটা ছিল খুবই হালকা রকমের, কেবল বছরে দেবীর পূজার তিন-চারিটা দিন সেবকবৃন্দের মধ্যে সে-ই হইয়া দাঁড়াইত অগ্রণী। সেই তিন-চার দিনের দৌলতে অথবা বুদ্ধির গুণে, যে করিয়াই হউক তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পৌছিয়াছিল ; কিন্তু সেখানে আসিয়া এমনই শক্ত করিয়া সে নোঙর গাড়িল যে, তৃতীয় বৎসরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পিতা অন্নদাচরণ বাগ্‌দেবীর সঙ্গে বিজনের ক্ষীণ সম্পর্কটা চিরদিনের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন। বিদ্যার বাঁধাধরা জগৎ হইতে 'থার্ড ক্লাস' মার্কা লইয়া বিজন বাহির হইয়া আসিল।

লোকে বলিত বিজনের বুদ্ধি, চেষ্টা ও অধ্যবসায় ভাল কাজে খাটাইলে জীবনে সে অনেকের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি করিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কথাটার সত্যতা বিজন প্রমাণ করিয়া দিল। বয়স তাহার কুড়ির কোঠা পার না হইতেই নিজের ব্যবসায়ে এবং অর্থ উপার্জ্জনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সে করিল—যদিও তাহার আয়ের পন্থাটা সর্ব্ববাদিসম্মত সুপন্থা বলিয়া বিবেচিত হইল না।

ভোর আটটার মধ্যে পাৎলুন কোট চাপাইয়া বিজন দোকানে চলিয়া যায়, আর ফিরে সেই রাত্রি দশটার পর। শুধু রাত্রিটুকুর জন্য বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক। বাড়ীর প্রতি আন্তরিক টানও বিজনের তেমন নাই, তা ছাড়া সমস্ত দিন নিজের কাজ লইয়া তাহাকে এত বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয় যে বাড়ী ফিরিয়া বিশ্রাম করিবার মত ফুরসৎ সে পায় না।

অন্য দিনের চেয়ে আজ বিজনের ত্রস্ততাটা একটু বেশী। ধূমায়মান চায়ের বাটিতে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে বিজন পোষাক পরিতেছিল, মিঃ মরিসনের কুঠিতে যথাসময়ে তাহাকে পৌছিতে হইবে। মুখ উঁচু করিয়া বিজন গলায় টাই বাঁধিতেছে, এমন সময় দাদা ভূপেশ আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—বালিগঞ্জে যে মেয়ে দেখে এসেছিলাম তাদের ওখান থেকে অত আগ্রহ ক'রে এসে সব খবর জেনে গেল,—কথা ছিল দু-এক দিনের ভিতরেই মতামত জানাবে, কিন্তু কই কেউ তো এল না।····· ঢাকা থেকে বেশ ভাল একটা সম্বন্ধ এসেছে। আমি লিখেছিলাম, ছেলে ব্যবসা করে, আয় দেড়-শ থেকে দু-শ। জানতে চেয়েছে কিসের ব্যবসা, ভাবছি এবার জবাবটা সোজাসুজি না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেব।

টাই বাঁধা শেষ করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিজন শুধু বলিল—হুঁ······

—আচ্ছা, কি লেখা যায় বল্ তো ?

কোট গায়ে চড়াইয়া বিজন অ্যাটাচি-কেসটা হাতে তুলিয়া লইল।

—এখন এ নিয়ে কথা বলবার মত সময় হবে না আমার। বলিয়া রওনা হইয়া পড়িবার জন্য পা বাড়াইল।

ভূপেশ পিছন হইতে বলিল—আর একটা কথা ছিল—

বিজন দাঁড়াইল, হাত-ঘড়িটার দিকে এক বার তাকাইয়া বলিল—শীগ্‌গির বল, কি কথা ?

অনেকটা দ্বিধার সঙ্গে ভূপেশ কহিল—পঞ্চাশটা টাকার জন্যে বড্ড আটকে গেছি,···পাঁচ হাজার টাকার কেসটার প্রিমিয়ম বোধ হয় দিন-সাতের ভিতরই পড়বে, তোর দরকার হ'লে তখন না-হয়—

ভূপেশ থামিল, ফেরত দিবার মত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তাহার বাধে। এই পাচ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স কেসের ইতিহাস মাস-দুইয়ের ভিতর একই প্রকার ঘটনার উপলক্ষে আরও তিন-চার বার বিজনকে শুনিতে হইয়াছে। বারংবার নিছক চাহিয়া লইতে ভূপেশের বাধে বলিয়াই মাসিক বরাদ্দের বাইরে বিজনের নিকট টাকা চাহিতে হইলে নিকট-ভবিষ্যতের কোন একটা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দিয়া লয়।

—এই সে দিন ত পঞ্চাশ দিয়েছি। এত টাকা আমি পাব কোথায়! বলিয়া বিজন আগাইয়া গেল। দরজার কাছেই সুষমা দাঁড়াইয়াছিল, বৌদিকে দেখিয়া বিজন থামিল, পশ্চাতে না তাকাইয়াই ভূপেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—সন্ধ্যায় দোকানে এস এক বার, দেখব কি করতে পারি। বলিয়া শব্দায়মান হিল মেঝের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বাহির হইয়া গেল।

সিঙ্গাপুরী কলার মত বাঙালীসুলভ যৌবন ভূপেশের, যার বাহিরটা নবীন এবং কাঁচা, অন্তরটা ভরিয়া আছে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা ও শৈথিল্যে। যা খুঁজিলে মিলে না, বি-এ পাস করিয়া আজ চার বছর যাবং সেই চাকরিই ভূপেশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অন্য কোন হাঙ্গামায় প্রবেশ করিবার মত সাহস তাহার নাই, তাই দৈনন্দিন জীবনে কিছু-না-কিছু হাঙ্গামা তাহাকে প্রতিদিনই পোহাইতে হয়। স্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজনের কথা বলার ভঙ্গিটা তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছে, তাই ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল—দুটো পয়সা রোজগার ক'রে দেমাক হয়েছে। হ্যাঁ রে, পয়সাটাই কি সব! মান-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে অমন দু-এক-শ টাকা আয় করাটা কঠিন কিছু নয়।

—কঠিন ছেড়ে সেই সহজ দিকটাই দেখ না এক বার। সুষমা তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল। ভূপেশের এই যাচক অবস্থাটা তাহার সম্মানেও কম আঘাত করে না।

—তোমরা শুধু টাকাটাই চেন।

—তাহলে অ্যাদ্দিনে অচেনার দলে পড়ে যেতে।

সুষমার কথাগুলি এমনিতেই একটু চোখা রকমের, ভূপেশও আজকাল সহজেই রাগিয়া উঠে, তাই একটুতেই দু-জনের খিটিমিটি বাধিয়া যায়।

ভূপেশ রুক্ষ স্বরে কহিল—পারলে তাই করতে বইকি। জন্মদিনে দামী শাড়ী উপহার পেয়ে আর দু-চার দিন সিনেমা দেখে ঠাকুরপোর জন্যে দরদটা বড্ড যে বেড়ে গেছে! সবাইকে দাড়ি কামিয়ে পয়সা কামাবার উপদেশ দিচ্ছ।

সত্যই সে-উপদেশ সুষমা যে দিতে পারে তা নয়, তাহা হইলে বন্ধুর নিকট সে-দিন বিজনের কাজের কথাটা গোপন করিয়া যাইত না। বিজনের প্রতি দরদ খুব একটা না থাকিলেও মনটা যে সুষমার প্রসন্ন ছিল সে-কথা সত্য। যে-লোক টাকাপয়সা দিয়া এত সাহায্য করিতেছে তাহার সম্পর্কে যখন-তখন এ প্রকার শ্লেষোক্তিকে সে সুবিচার বলিয়া মনে করিতে পারে না। ভূপেশের শাড়ী-সিনেমার কথায় খুব একটা কড়া রকমের জবাব না দিয়া সে পারিল না, বলিল—সেই দাড়ি-কামানো পয়সায় ভাগ বসাবার জন্যে দরদটা উথলে উঠেছিল তোমাদেরই বেশী, তাই দু-বছর পর বাপ-বেটায় গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে এনেছ। বলিয়া মুখঝামটা দিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

ভূপেশের প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কথাটা মিথ্যা নয়। অন্নদাচরণ স্কুল হইতে বিজনের নামমাত্র ছাত্রত্ব ঘুচাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যে-ছেলে স্কুল কামাই করিয়া চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিয়া আড্ডা দেয়, এমন কি বামুনের ছেলে হইয়া মাঝে মাঝে ছাঁটাইয়ের কাজে বন্ধুদের সাহায্য পর্য্যন্ত করে, তাহার মুখদর্শন করিতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে মারপিট করিয়া বাড়ী হইতেও তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আঘাত দিয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া দেওয়াটা মানুষের পক্ষে যত বড় অভিশাপের কথাই হউক, খেজুরগাছের গলায় সেটা হইয়া দাঁড়ায় দশের কাছে আত্মগুণ প্রতিপন্ন করিবার একটা পথ। এ বয়সে গৃহবিতাড়িত হওয়াটা অপরের কাছে মর্ম্মান্তিক ঘটনা হইতে পারে, কিন্তু বিজনের কাছে দেখা দিল আত্ম-প্রকাশের মুক্ত পথ হিসাবে। কঠোর শাসনপ্রসূত পিতৃদত্ত এই পথের 'পরে স্নেহের কাঁটা বিছাইয়া দিবার

জন্য মাও বাঁচিয়া নাই, তাই বিজনের কোন পিছু-টানই রহিল না।—

ছাত্রাবস্থায় বিজন যখন 'সেলুন ডি লুক্‌স্‌'-এ বসিয়া আড্ডা দিত তখন এক দিন চুল ছাঁটা সম্বন্ধে ভাবিতে গিয়া অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিয়া বসিল যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে চুল ছাঁটাটাই সবচেয়ে শক্ত। বাজে কাপড় বা কাগজ কাটিয়া জামার ছাঁট, কাঠের উপর ছুতোরের কাজ, শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্ত্রোপচার শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু কেশকর্ত্তনে হাত পাকাইবার জন্য কে কাহার মাথা ছাড়িয়া দিবে। পয়সা খরচ করিয়া চুলওয়ালা গরিবের মাথা যদিই বা সংগ্রহ করা গেল তাহাও এক বার কাঁচি চালানোর পরই কিছু দিনের জন্য হইয়া পড়িবে অচল—বিজন ভাবিয়া হদিস পায় না। 'কাটার' বন্ধুদের কাছে সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গিয়া এক দিন সে কাঁচি ও ক্লিপ হাতে তুলিয়া লইল, এবং স্বল্প কালের মধ্যে ভাল ভাল মাথার উপর দিয়া কাঁচি চালাইয়াই এ সখের কাজে বিজন হাত পাকাইয়া ফেলিল।

যে কাজ বিজন শিখিয়াছিল সখ করিয়া, নিজের ভার নিজের উপর পড়িতে অবলম্বনস্বরূপ সেটাকেই সে আঁকড়াইয়া ধরিল। কিছু কালের মধ্যেই সে কেশ-বিলাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, 'এক্‌স্‌পার্ট কাটার' হিসেবে তাহার চাহিদা গেল বাড়িয়া। বেতন পনর হইতে ত্রিশের কোঠায় গিয়া পৌঁছিতেই বিজন কাপড় ছাড়িয়া ধরিল স্যুট। শুধু তাহার কাজ নয়, কাজ করিবার ভঙ্গিটিও চমৎকার। গৌরবর্ণ সুন্দর চেহারায় স্যুটের উপর সাদা একটা আলখাল্লা চাপাইয়া হাত গুটাইয়া সে কাজ করিয়া চলে। কিচ্‌—কিচ্‌কিচ্‌—কিচ্‌, কিচ্‌—কিচ্‌কিচ্‌,—ঠুং, কাঁচি ঠুকিয়া চিরুণী হইতে চুল ঝাড়ে,···সেলুনম্যেডের চিরুণী ছাড়িয়া লয় এলুমিনিয়মের, সেটা ছাড়িয়া পাজা-করা চিরুণীগুলি একটা আঙুলের সাহায্যে সট্‌ সট্‌ ছড়াইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাতলা হইতে অতি পাতলা একটি এমন ভাবে বাছিয়া লয়, মনে হয় ঠিক ঐটি না হইলে তাহার কাজে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। চুল ছাঁটা শেষ হইলে তাহার হাত দুটা ও আঙুলগুলো চোখে, মুখে, চুলে ও ঘাড়ে এমন আরামপ্রদ নৃত্য জুড়িয়া দেয় যে শুধু তাহারই স্বাদটা অধিক্ষণ স্থায়ী করিবার জন্য অনেক লোক অধিক পয়সা খরচ করিয়া যায়। মানুষ মাত্রেই নিজের চেহারা ও বুদ্ধির প্রতি মনে মনে কিছু-না-কিছু শ্রদ্ধা পোষণ করে, একটু চেষ্টা করিলেই সেটাকে যে উস্কাইয়া দেওয়া যায় বিজন তাহা জানে। পাকা মেছুনী তাহার প্রসারিত হস্তে সস্নেহে একটা পচা ইলিশ রাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে যখন তাকায়, তখন যেমন মনে হয় ঐটাই ঝুড়ির সেরা মাছ; তেমনই প্রসাধনান্তে চিবুকের নীচে হাত দিয়া গ্রীবাভঙ্গী সহকারে এমন ভাবে বিজন তাকায় যে নিজের কেশের চেয়ে আয়নায় প্রতিফলিত বিজনের দৃষ্টির দিকে চাহিয়া অতি কুৎসিত লোকও সন্তুষ্ট না হইয়া পারে না।

এক দিন এক বড় দরের সাহেব চৌরঙ্গীর সেলুন-ভ্রষ্ট হইয়া কি করিয়া যেন 'সেলুন ডি লুক্‌স্‌'-এ আসিয়া পড়িয়াছিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছয় পেনির নভেল পড়িয়া ইংরেজী বলার ক্ষমতাটাকে বিজন কতকটা আয়ত্তে আনিয়াছিল, চুল ছাঁটিতে ছাঁটিতে সাহেবের সঙ্গে বেশ গল্প জুড়িয়া দিল। মরিসন সাহেব লোকটি অত্যন্ত অমায়িক ও কৌতুকপ্রিয়; দোকানের এক প্রৌঢ় কাটারকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, "যুবক ডাক্তার এবং বৃদ্ধ নাপিত ভারি বিপদজনক; ওকে অবসর নিতে বল।" বিজনও হাসিয়া কিছু একটা বলিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। মাথা চিৎ করিয়া চিবুকের নিম্নভাগ কামানোর সময় ক্ষুরের টানের সঙ্গে সঙ্গে মুখব্যাদান করিয়া সাহেব দাঁত বাহির করিতেছিল; বিজন কৌতুক করিয়া কহিল, "সরি, কিছু মনে ক'রো না, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে তুমি ডেন্‌টিস্টের কাছে আস নি।" বিজনের কাজে, কথায় এবং কৌতুকে সাহেব ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছিল, যাইবার সময় বিজনের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "যুবক, তুমি ভেরি গুড কাটার, টকার এণ্ড ম্যাসাজিস্ট', এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা ক'রো" বলিয়া একখানা কার্ড দিয়া 'গুড্‌ নাইট' বলিয়া বিদায় লইয়াছিল।

মরিসন সাহেবের নিজের এবং তাহার মারফৎ আরও তিনটি ইউরোপীয় ভদ্রলোকের কুঠিতে নির্দ্দিষ্ট মাসহারায়

বিজন বহাল হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, মিঃ মরিসনের সাহায্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার দক্ষিণ-অঞ্চলে বিজন নিজেই চার জন কর্ম্মচারী সহ আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত একটি দোকান খুলিয়া বসিল। স্বল্প কালের মধ্যেই কাজে এবং কায়দায় বিজনের সেলুন নাম করিয়া ফেলিল প্রচুর। কেশবিলাসীরা আশেপাশে চার আনার দোকান থাকিতেও বিজনের সেলুনে আসিয়া আট আনা খরচ করিয়া চুল ছাঁটিয়া যায়।

এদিকে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ- ও ভ্রাতৃ- স্নেহও বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পুনরায় আসিয়া বিজনকে স্পর্শ করিল ;— এইটুকুই তাহার গত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

মিঃ মরিসনের কুঠি হইতে দোকানে ফিরিয়া বিজন তাহার নির্দ্দিষ্ট আরামকেদারাটিতে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। আজ মনটা তাহার ভার হইয়া আছে। চারি জন কারিগর কাজ করিয়া চলিয়াছে, ঘরের মধ্যে শুধু আওয়াজ হইতেছে কিচ্-কিচ্ কিচ-কিচ্-কিচ্ কিচ্-কিচ্—।

বিজনের মোটেই কাজ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, তাই লোক অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভূপেশের দেওয়া খবরটা তাহার মনে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজন জানে, বালিগঞ্জে যাহাদের মেয়ে সে ও ভূপেশ পছন্দ করিয়া আসিয়াছে, কেন তাহারা হঠাৎ অমন চুপ করিয়া গিয়াছে। তাহার বিদ্যার স্বল্পতা যে ইহার কারণ নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ কথাটা সুরুতেই স্পষ্ট করিয়া জানানো হইলে কনের বাপ নাকি বলিয়াছে, কর্ম্মঠ লোকের হাতে পড়িয়া মেয়ে তাহার খাইয়া-পরিয়া সুখে থাকিবে এই তিনি চান, পাসের প্রতি মোহ তাঁহার নাই। বিজন দোকানের মালিক, এ পর্য্যন্ত জানানোই ছিল উচিত, সে নিজ হাতে কাজ করে এ-কথাটা ভূপেশ গোপন করিয়া গেলেই তো পারিত,—বিজনের সমস্ত রাগটা গিয়া পড়ে ভূপেশের উপর। তাহাকে হেয় করিবার জন্য ভূপেশ ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিয়াছে কিনা সে বুঝিতে চেষ্টা করে।

কিছু দিন যাবৎ বিজন নিজের মধ্যে একটা দৈন্য অনুভব করিতেছে, যেটা পূরণ করিতে সে সততই যত্নবান্। সে যে অভিজাত এ-কথাটা জানাইয়া দিবার চেষ্টা একটুতেই তাহার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। নিজের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকিয়া শুধু নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকার সময় যে-বোধটা ছিল সুপ্ত, বাড়ী ফিরিয়া স্বজনের সংস্পর্শে আসিয়া নানা প্রকার ছোট-বড় ঘটনার আঘাতে সেটা হইয়া উঠিয়াছে সজাগ ও তীক্ষ্ণ। কিছু দিন হইল বিজন দোকানের কর্ম্মচারীদের আদেশ দিয়াছে 'বিজনবাবু' না বলিয়া 'মিঃ ব্যানার্জ্জি' বলিয়া ডাকিতে। কোন উঁচুদরের লোক দোকানে আসিলে চুল ছাঁটিতে ছাঁটিতে বিজন এমন সব কথার অবতারণা করে যাতে বোঝা যায় সে ভদ্র ও বড় ঘরের সন্তান। মক্কেলের সঙ্গে সুবিধা না হইলে কারিগরদের মধ্যে এক জনকে লক্ষ্য করিয়া হয়ত বলে, 'বুঝলে সুরেশ, বিনয়বাবু শুনলাম ব্যবসা ছেড়ে চাকরির চেষ্টা করছেন—' সুরেশ প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহে বিনয়বাবু কে। বিজন বলে, "ঐ যে এম-এ পাস ক'রে ঘিয়ের ব্যবসা করছেন।" সুরেশের চিনিতে-না-পারা দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলে, "চাকরি কি পাস করলেই মেলে, বড় রকমের ব্যাকিং থাকা চাই। আর ব্যাকিং থাকলেই বা কি, দাদা তো বি-এ পাস ক'রে ব'সে আছে আজ চার বছর, বড় বড় আত্মীয় আর চেষ্টার অভাব তো নেই কোনটারই।" তার পর বড় বড় চাকুরে কাহার সঙ্গে কি আত্মীয়তা তাহা বলিতে থাকে। দিনের ভিতর এ প্রকার কত কথার যে অবতারণা করে তাহার অন্ত নাই। বিদ্যার দিক্টা বিজন প্রমাণ করিতে চাহে দোকানে আগত ভদ্রলোকদের সঙ্গে যথাসম্ভব ইংরেজীতে কথা বলিয়া।

বিজনের চিন্তায় বাধা দিয়া একটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। বিজন সিগারেট ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিলাটি আর এক দিন আসিয়াছিলেন ছোট একটি মেয়ের 'বব্' করাইয়া লইতে। আজ আসিয়া বিজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন ; বড় মেয়ের চুলের 'গ্রোথ্' কম, তারও নাকি সখ হইয়াছে বব্ করিবার।

বাঁধা কয়েকটা সাহেববাড়ী ছাড়া বাহিরে বিজন যায়

না। বিশেষ করিয়া বাঙালী-বাড়ী যাইতে সে নারাজ, কহিল—আমি তো বাইরে যাই নে, লোক দিচ্ছি নিয়ে যান, বেশ ভাল কাটার।

—না, তুমি না গেলে চলবে না। তোমার সেদিন-কার 'কাট্' ভারি পছন্দ হয়েছে তার···চল।

কেহ 'তুমি' বলিলে বিজন অসন্তুষ্ট হয়। বিজন কোন আপত্তি তুলিবার পূর্ব্বেই মহিলাটি কহিলেন—তোমার কিছু অসুবিধা হবে না, আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাবে আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।—চার্জ্জ যা তাই পাবে।

টাকার জন্য নহে, মুখের উপর 'না' বলিতে বিজন পারিল না। তাই বাধ্য হইয়াই যন্ত্রপাতি সহ রওনা হইয়া পড়িতে হইল।

বিজনকে বসিবার ঘরে রাখিয়া মহিলাটি অন্দরে প্রবেশ করিলেন। যদিও বসিতে বলা হয় নাই, তথাপি বিজন অ্যাটাচিটা সামনের কার্পেটের উপর রাখিয়া একটা কৌচের উপর বসিয়া পড়িল। একটু পরেই একটি আঠার বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া বিজনকে দেখিয়াই সরিয়া গেল।

বিজন শুনিল মেয়েটি বলিতেছে—কই মা, কোথায় নাপিত? ওখানে তো কে এক স্যুটপরা ভদ্রলোক ব'সে আছেন।

—ও-ই নাপিত, ডেকে নিয়ে আয়।

এবার মেয়েটি বেশ সহজ ভাবে আসিয়া বিজনের সামনে দাঁড়াইল। বিজনের চেহারার দিকে চাহিয়া 'তুমি' বলিতে বোধ হয় বাধিল, কহিল—এদিকে আসতে হবে।

বিজনের দুই কানের মধ্যে কথাটা তখনও ঘুরিয়া ফিরিতেছে 'ও-ই নাপিত'। লজ্জায় ও অপমানে তাহার ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, কোন প্রকারে আত্মসংযম করিয়া কহিল—চলুন কোথায় যেতে হবে।

কোন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া বিজন দোকানে ফিরিয়া আসিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নাপিত, চাকর বা ফেরিওয়ালাদের মত তাহার উপস্থিতিতেও ভদ্র মেয়েরা লজ্জা বোধ করা প্রয়োজন মনে করে না।

মান-অপমানের সূক্ষ্ম বিচার কোন কালেই বিজন করিতে বসে নাই; যে-কাজ করিয়া এত টাকা সে উপার্জ্জন করিতেছে তাহা তাহার মনের উপর নানা রকমে এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে আঘাত করিতে পারে সে ভাবিতে পারে নাই। বিজন মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, স্বহস্তে এ-কাজ আর সে করিবে না। দোকান হইতে যা আয় হইবে তাহাই যথেষ্ট। এমন কি এ-কাজ যে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিশ-পঁচিশ টাকা বেতনের যে-কোন একটা চাকরি মরিসন সাহেবকে ধরিয়া জোগাড় করিয়া লইবে, এমনও মনস্থ করিয়া ফেলিল।

সমস্তটা দিন বিজন আর কাজে হাত দিল না, বসিয়া বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকিয়া চলিল। তাহার কাজটাকে জীবিকা হিসাবে এতটা হেয় চোখে দেখিবার মধ্যে কি যুক্তি থাকিতে পারে, এলোপাথাড়ি চিন্তার ভিতর দিয়া বিজন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতে থাকে। যুক্তি সে পায় না বটে, কিন্তু মনে মনে নিজেও স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে কাজটা তাহার ড্রাইভারি বা ট্রাম কন্‌ডাক্টরির মতই ভদ্রসমাজে অচল। তাই তাচ্ছিল্য দেখিয়া রাগ করিবার অধিকার তাহার নাই। স্বল্প রোজগার হউক ক্ষতি নাই, সসম্মানে না হউক অসম্মানিত না-হইয়া দশের মধ্যে চলিতে পারে এমন কিছুই তাহাকে করিতে হইবে।

সন্ধ্যায় এক মাথা ঝাঁকড়া চুল লইয়া যে-লোকটি আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল তাহার নাম অসিত। খদ্দের হিসাবেই অসিতের সঙ্গে বিজনের পরিচয়, কিন্তু কথাবার্ত্তায় সে পরিচয়টা একটু ঘনীভূত হইয়াছে। গত বার অসিতকে বিজন বলিয়া দিয়াছিল যে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দু-বার চুল কাটা প্রয়োজন, না হইলে ছাঁট মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। তাই ঘরে ঢুকিয়াই অসিত কহিল—কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, চুলগুলো বড্ড বেড়ে গেছে, একটু দুরস্ত ক'রে দিন তো ব্যানার্জ্জি।

বিজন বহু দিন অসিতকে এ রাস্তায় চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে, প্রতিবাদ না করিয়া কহিল—শরীরটা ভাল নেই, আজ সুরেশের হাতেই কাটুন।

—সে হবে না, আট আনা খরচ করি আপনার হাতে কাটবার জন্যে, উঠুন।

চুল ছাঁটিবার জন্য এই আট আনাকে টানিয়া একত্র করা অসিতের পক্ষে কতটা কষ্টসাধ্য সেটা ঠিক বুঝা না-গেলেও কতটা সময়সাপেক্ষ তা তাহার মাথার দিকে চাহিলেই উপলব্ধি করা যায়। পরিচিতের অনুরোধ না এড়াইতে পারিয়া বিজনকে পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল।

বিজন সাদা গাউনটা গায়ে চাপাইয়া প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় ভূপেশ আসিয়া ডাকিল। বিজন বাহিরে রোয়াকে গিয়া দাঁড়াইল। ভূপেশকে দেখিয়া সমস্ত দিনের তাক্তভাটা তাহার হইয়া উঠিল তীব্র, অত্যন্ত রুক্ষ ভাবে বিজন কহিল—টাকার জোগাড় হয় নি··· বার বার এ ভাবে টাকা দিতে আমি পারব না, নিজে যা হোক কিছু একটা চেষ্টা দেখ।

এমন অপমানজনক কথা বিজন আর কখনও বলে নাই। অপ্রত্যাশিত উত্তরে ভূপেশ প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল—আসতে বলেছিলি তাই এসেছি, না দিতে পারিস সেটা ভাল ক'রে বললেই হয়। বলিয়া অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ ভূপেশ চলিতে সুরু করিল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু বিজনের মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল। বেশ বুঝিল, এরূপ ব্যবহার করাটা সমীচীন হয় নাই।···ঢাকার চিঠির কথাটা স্মরণ হইল; বিজন ঠিক করিল বাড়ী ফিরিবার সময় টাকাটা সঙ্গে লইয়া যাইবে।

অসিত অন্যান্য দিনের মত বিজনের সঙ্গে গল্প জমাইতে চেষ্টা করে। অসিত চিত্রকর; যেদিনই আসে কথা-প্রসঙ্গে এটাই বুঝাইতে চেষ্টা করে যে এ দেশে 'ফাইন আর্টে'র কদর নাই, তাই গুণী লোকদের না খাইয়া মরিতে হয়। বিজনও সোৎসাহে কথায় যোগ দেয়, সমর্থন করিয়া সখেদে জানাইয়া দিতে থাকে, সম্মান ও আদরের দিক্ দিয়া তাহার কাজটাও কি প্রকার অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হইয়া আছে।· কিন্তু বিজনের সেই হালকা দুঃখ, যেটা মনের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া কেবলই মুক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়, আজ সেটা যেন অতিবড় গুরুভারে গভীর ভাবে তলাইয়া গিয়াছে। তাই কোন কথায় যোগ না দিয়া মুখ বুজিয়া বিজন কাজ করিতে থাকে।

ভূপেশ বাড়ী পৌঁছিয়া দেখে দরজার সম্মুখে সুন্দর একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরের ঘরে তাহারই সমবয়সী সুট-পরিহিত সুদর্শন একটি যুবক বসিয়া ছিল, প্রবেশ করিতেই হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া কহিল—আপনারই নাম ভূপেশবাবু? আমি ঢাকা থেকে দাদার, অর্থাৎ প্রিয়কুমার বাবুর চিঠি পেয়ে এসেছি। আমার ভাইঝির সঙ্গে আপনার···

—হঁ্যা, আমার ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব চলছে, আপনি বসুন। বলিয়া ভূপেশ নিজেও বসিল, প্রশ্ন করিল, আপনার নাম?

—শান্তিকুমার চক্রবর্ত্তী,···আপনার বাবা বাড়ী নেই বুঝি?

—বেড়াতে বেরিয়েছেন। তিনি কোন কিছুর মধ্যেই নেই, এ-বিষয়ে যা করবার আমাকেই করতে হবে, আপনি বলুন।

যুবকটি মৃদু হাসিয়া কহিল—খুব একটা কিছু বলবার জন্যই যে আমি এসেছি তা নয়, এলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে যেতে। আর আপনাদের অনুমতি পেলে মেয়েকে আমার ওখানে এনেই দেখাবার ব্যবস্থা করব ঠিক করেছি।···বিজনবাবু এখানেই আছেন তো?

ভূপেশ এইমাত্র বিজনের নিকট হইতে অপমানিত হইয়া ফিরিয়াছে, তাহার জ্বালা ভূপেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। বিজনকে সে কাজের পোষাকে দেখিয়াছে, চট করিয়া কহিল—চলুন, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

ভূপেশ শান্তিকুমারকে সঙ্গে করিয়া একেবারে দোকানের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। বিজন অসিতের মাথায় 'মাসাজ' করিয়া দিতেছিল, ভূপেশ ডাকিয়া কহিল—বিজন, এক বার এদিকে আয়!

—এক্সকিউজ মি ফর এ মিনিট। বলিয়া অসিতের মাথা ছাড়িয়া কর্ম্মরত গুটানো হাত লইয়া বিজন আসিয়া ভূপেশ ও শান্তিকুমারের কাছে দাঁড়াইল।

ভূপেশ কহিল—ইনি ঢাকা থেকে চিঠি পেয়ে এসেছেন, প্রিয়কুমার বাবুর ভাই···ভোরে যার কথা বলছিলাম।

মুহূর্ত্তে বিজনের মুখ চোখ রক্তিম হইয়া উঠিল, স্থির দৃষ্টিতে সে একবার তাকাইল ভূপেশের চোখের দিকে। এ-দৃষ্টি কি বস্তু, ভূপেশ তাহা ভাল করিয়াই জানে, দু-তিন বছর পূর্ব্বেও এ-দৃষ্টির সম্মুখে ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঠ হইয়া যাইত। দু-বছর ব্যবধানের পর বিজনের এবারকার শান্ত ভাব দেখিয়া এ-মূর্ত্তি যেন সে ভুলিয়াই ছিল।

শান্তিকুমারের নমস্কারে প্রতিনমস্কার জানাইয়া বিজন শুধু কহিল—আপনারা বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আসছি।

বাহিরে আসিয়া ভূপেশ শান্তিকুমারকে বলিল—আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করুন, আমার একটু জরুরি কাজ রয়েছে আমি যাচ্ছি। বলিয়া চট্ করিয়া কোন মতে একটা নমস্কার জানাইয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে সুরু করিল।

এ প্রকার একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িবে শান্তিকুমার ভাবিতে পারে নাই। কিছু চিন্তা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বিজন বাহিরে আসিল, ভূপেশকে না দেখিয়া কহিল—দাদা কোথায়, চলে গেছে বুঝি?···যাক্ দেখলেন তো আমি কি, আর আমাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন আছে কি?

এবার শান্তিকুমারের নিকট ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। ভূপেশের ব্যবহারের অর্থটা সঠিক না ধরিতে পারিলেও বাকি সবটাই বুঝিল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল—দোকানের কথা তো আমরা শুনেছি, বাকিটা গোপন করবার ইচ্ছা ছিল নাকি?

এ শ্লেষের কোন উত্তর বিজনের মুখে জোগাইল না। বিজনের সুশ্রী মুখের পরিস্ফুট রাগ ও লজ্জার অভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া শান্তিকুমার একটু হাসিল। বিজনের ঋজু বলিষ্ঠ দেহের উভয় স্কন্ধ উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—ওয়েল ইয়ংম্যান, আমার কাছে অতটা মুষড়ে পড়বার কিছু দরকার নেই, আমি হলাম মুচি, বিলেতী কারখানার।···দু-জনেই ফুটপাথের দশ নম্বরী ইট ছেড়ে চেয়ারে উঠে বসেছি।

একটু থামিয়া কহিল—তবে কিনা আমি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে নিজেকে শোধন ক'রে এনেছি··· কুছ পরোয়া নেই, আপনিও চৌরঙ্গী-তীর্থে ব'সে গেলেই সব দোষ কেটে যাবে, কি বলেন? বলিয়া উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিজন বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শান্তিকুমারের কথা শুনিতেছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি জুতো···

শান্তিকুমার বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, তাই···কিন্তু এখন আপনি ঠিক 'মুডে' নেই, আজ কোন কথাই চলতে পারে না। কাল আমার বাড়ী চায়ের টেবিলে ব'সে ভাল ক'রে পরিচয় করা যাবে, ···নেমন্তন্ন রইল।

বলিয়া ঝপ্ করিয়া গাড়ীতে ঢুকিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিল। ষ্টার্ট দিতে দিতে কহিল—চারটের ভেতর তৈরি হয়ে থেকেন, আমি এসে তুলে নিয়ে যাব।

নাৎসী ভঙ্গীতে একটা হাত খাড়া করিয়া 'গুড্ নাইট' বলিয়া শান্তিকুমার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিজন বুঝিতে পারিল না, এ সত্য না আর কিছু।

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো সাঁওতালি ছেলে
শ্যামল সঘন নব বরষার
কিশোর দূত কি এলে।
ধানের ক্ষেতের পারে
শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে
চলেছ হৃদয় মেলে
ওগো সাঁওতালি ছেলে

পুব·দিগন্ত দিল তব দেহে
নীলিম লেখা,
পীত ধড়াটিতে অরুণ রেখা।
কেয়া ফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে।
ওগো সাঁওতালি ছেলে।

আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল দিনের তোমার মনের সাথী।
ঝড়ে চঞ্চল তমাল বনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে।
ওগো সাঁওতালি ছেলে॥

"পুনশ্চ"
১২।৭।৩৯

স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II গা -মা -পা । -দা - পদা -র্জ্জা I র্জ্জা -র্ঋা -র্সা । -ণা -দা -পমা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০০

I গমা -ঋা -া । গা -পা গা I ঋা সা -া । -া -া -া I সা সা সমা । মা মা মা I
সাঁ০ ও ০ তা ০ লি ছে লে ০ ০ ০ ০ শ্যা ম ল০ স ঘ ন

I সমা মা মা । মা মপা -গা I মগা মা -দা । দা -া দা I দা পা -া । -পা -দা -মা II
ন ব ব র ষা র্ কি০ শো র্ দূ ত্ কি এ লে ০ ০ ০ ০

II { দা দা দা । ণা র্সা ঋর্সা I ণা -র্সা -া । -া -ণদা -পমা I মা ণদা দা ।
ধা নে র ক্ষে তে র০ পা রে ০ ০ ০০ ০০ শা লে র

। ণা র্সা ঋর্সা I ণা র্সা -া । -া -া -া } I র্সজ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞর্রা জ্ঞ -র্মা ।
ছা য়া র০ ধা রে ০ ০ বাঁ০ শি র্ সু রে তে সু০ দূ র্

। র্মজ্ঞা জ্ঞঋা র্সা I ঋা ঋর্সা র্সণা । ণা ণপা পণা I ণদা পা -া । -া -া -মা II
দূ রে তে চ লে০ ছ০ হৃ দ০ য়০ মে লে ০ ০ ০ ০

II { র্সা -ঋর্সা র্সণা । ণপা -ণা ণদা I ণদা ণদা দা । দা দা পা I পা পমা পা ।
পু ০ব্ দি০ গ০ ন্ ত০ দি ল ত ব দে হে নী লি০ ম

পমা পা -দা I -া -া -া । -া -া -দপা I মপা মপা মজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞদা দপা I মজ্ঞা মা মজ্ঞা ।
লে০ খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ পী০ ত০ ধ ড়া টি০ তে অ রু ণ

ঋা সা -া } I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । -া জ্ঞর্রা জ্ঞা I জ্ঞর্রা জ্ঞর্মা র্মজ্ঞা । জ্ঞঋা ঋা র্সা I ণা ণজ্ঞা র্রজ্ঞা ।
রে খা ০ কে য়া ফু ল্ খা০ নি ক০ বে০ তু লে০ আ নি ছা রে০ মো

। -ঋা ঋা র্সঋা I ণর্সা র্সণা -া । -দা -পা -া II
র্ রে খে০ গে০ লে ০ ০ ০ ০

II { সা সা সমা । মা মা মা I সমা -া মা । মা মা মগা I
আ মা র০ গা নে র হং ০ স ব লা কা০

I মপা মাঃ -পঃ । -গা -া -া I মগা মা মদা । দা দা দা I দা দণা ণদা । দা দা পা I
পাঁ০ তি ০ ০ ০ ০ বা০ দ ল০ দি নে র তো মা০ র ম নে র

I পমা পা -ণা । -দা -া -া } I পা পমা মা । -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞর্রা জ্ঞর্মা র্মজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞর্মা র্মজ্ঞা I
সা০ থী ০ ০ ০ ০ ঝ ড়ে০ চ ন্ চ ল ত০ মা০ ল ব নে০ র

I ঋা র্সা -া । -া -া -া I ণা ণজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞঋা জ্ঞঋা র্সা I ণা র্সা ঋা । র্সা ঋা -র্সা I
প্রা ণে ০ ০ ০ ০ তো মা০ তে আ০ মা তে মি লি য়া ছে এ ক্

I ণর্সা র্সণা -া । -দা -পা -া I সা সা সমা । মা -া -া I মা -া -পা । -গা -া -া I
খা০ নে ০ ০ ০ ০ মে ঘে র০ ছা ০ ০ য়া ০ ০ য় ০ ০

I গা গপা পগা । ঋা গপা গা I ঋা সা -া । -া -া -া II II
চ লি০ য়া ছি ছা০ য়া ফে লে ০ ০ ০ ০

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যা বলবার ছিল তা অনেক বার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশী কিছু প্রত্যাশা ক'রো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়—আমার উপস্থিতি ও সঙ্গ মাত্র তোমাদের দিতে পারি।

প্রথম যখন এই বাড়ি * কিনলুম তখন মনে কোনও বিশেষ সঙ্কল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষ্যে শিক্ষা-বিভাগের বরাদ্দ বিদ্যার কিছু বেশী দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম, তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ, নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি, নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়া-তরুতলে তাদের কুটীর; আর এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এই জন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হ'তে হ'ল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হ'তে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাব-পত্র, খাজনা আদায়, জমা-ওয়াশীল—এতে কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলুম না, তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব একথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে যখন কোনো দায় গ্রহণ করি, তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন ক'রে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাষ্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত, তখন তার জটিলতা ভেদ ক'রে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা ক'রে যে সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম, তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত, তাই বুঝতে হবে এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে যখন মামলা হবে, তখন আদালতে

* শ্রীনিকেতনের সর্বপুরাতন ভবন।

নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা, সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভাল।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত—সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক তাদের কোনো মানা ছিল না। এক এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালক-কাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যত দিন পল্লীগ্রামে ছিলেম, তত দিন তাকে তন্ন তন্ন ক'রে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষ্যে এক গ্রাম থেকে আর এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা বিলের মধ্য দিয়ে, তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠ্‌ত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্ ক'রে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম, কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড় অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, আমরা কুকুর, ক'সে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক্ থাকি।

আমি সেখানে থাকতে এক দিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হ'ল।

নিজের ভাল তারা বোঝে না, ঘর ভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধ'রে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে, তারা আমার কাছে এসে বললে, ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি। তখন তারা খুব খুশী, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে, তা তারা মেনে নিল যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে, খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে, তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হ'ত, সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এই মাত্র।

ঘর বাঁধা হ'ল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হ'ল না। মাষ্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না, তখন আমাদের এক জন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল, তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম, তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। এক জন সম্পন্ন

লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার তারই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি। যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এই ভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দির নির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামতো করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই সব কর্তব্য-সম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান, এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরত না। লোকে খাতির ক'রে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড় খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এই রকমে সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু একথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব। তারা বললে, এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে। আমি বললুম, তবে আমি কিছুই দেব না। এদের মনের ভাব এই যে, স্বর্গে এর জমা-খরচের হিসাব রাখা হচ্ছে, ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পযন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম, তার লোকদের বললুম, রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের। তারা যেখানে রাস্তা পার হয়, সেখানে গরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী; তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক ক'রে দিতে পার। তারা জবাব দিলে, বাঃ, আমরা রাস্তা ক'রে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্ট ভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড় কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান্ তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে, এই সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ ক'রে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য, এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লী-বাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হ'লে তাদের ভালো হ'তে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখ-দৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না, এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় ক'রে তুলেছে।

এক দিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা পুণ্য কাজ ব'লে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে, অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারো কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই, তারা হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হ'লে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেক দিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, পুলিস সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই সব কথা যখন ভেবে দেখলুম, তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহু যুগ থেকে এই রকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয় তাদের উপকার করা বড়ই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন।* তাঁর

* বর্তমানে শ্রীনিকেতনের অন্যতম প্রধান কর্মী, শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ।

রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনও গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে, তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা ক'রে দিতে হবে।

এই রকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠি-বাড়িতে ব'সে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ ক'রে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম, অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ কর, সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র কর, তাহলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ ক'রে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে। শুনে তারা বললে খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে? আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তাহলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজী আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত, বলত, ঐ রে চার আনার বাবুরা আসছে। কী ক'রে তারা এদের উপকার করবে; না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে* পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এই রকম নানা ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছু দিন চুপ ক'রে বসেছিলুম। অ্যাণ্ড্রুজ† বললেন, বেচে ফেলুন। আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা কিছু তাৎপর্য আছে—আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন ক'রে হবে তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিষেরই তখন অভাব। তারপর, আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হ'তে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট‡ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র ক'রে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হ'ত না। এল্‌ম্‌হার্স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক্ আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হ'লে শিক্ষালাভ করা চাই।

অবশেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই, চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল

---

* বক্তার প্রিয়সুহৃৎ সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। বিদেশ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন।

† সর্বজনপরিচিত ভারতবন্ধু ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী মিঃ সী. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ।

‡ মিঃ এল্. কে. এলমহার্স্ট। শ্রীনিকেতনের জন্য ইঁহার প্রভূত সহায়তার কথা প্রবাসীতে ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে।

এই যে সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গানবাজনা, কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক-খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি ক'রে দাও। আমি বলব এই ক-খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা'হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

[শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়-অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত]

পূর্ণতা

শ্রীশিবানী সরকার

ছিল সঞ্চয় পুরানো যা কিছু
লও গো কাড়ি,
নূতনের পথে প্রভু আমি আজ
দিব যে পাড়ি।
মনের আঁধার যাক্ ঘুচে যাক্
স্মৃতির বেদনা যাক্ মুছে যাক্
অজানা পথের সন্ধানে আজি
ভাসানু তরী,
যাহা আছে মোর, যা কিছু পুরানো
লও গো হরি' ॥

দেওয়ার বাঁশীতে বেজে ওঠে সুর
মধুর রবে,
নেওয়ার বাঁশী সে সুরহীনা আজি
এ উৎসবে।
মধুর দুঃখ মধুর বেদনা
আপন মাঝারে জাগাক চেতনা

দুঃখসুখের মিলনে যে হিয়া
পূর্ণ আজি,
অশ্রুহাসির কুসুমে ভরেছে
পূজার সাজি ॥

দূর হ'তে কার আহ্বানধ্বনি
আসিছে কানে,
আকাশ আমার ভরেছে যে তারি
বাঁশীর তানে।
বুঝি মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
সে-বাঁশীর সুর গিয়াছে হারায়ে
আপন মাঝারে আপনারে আমি
লভিব আজি,
তাহারি বারতা আকাশে বাতাসে
উঠিছে বাজি ॥

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৮

সপ্তাহ দুই পরে, সত্যই এক দিন বিষ্ণুবাবুর সংবাদটি আকস্মিক বজ্রপতনের মত সমস্ত আপিসকে ভয়চকিত করিয়া তুলিল।

উপর হইতে খবর আসিয়াছে, রিট্রেঞ্চমেণ্ট অবিলম্বে আরম্ভ হইবে। অফিসার হইতে সামান্য পিয়ন পর্য্যন্ত কাহারও মুখে নিরুদ্বিগ্নতার প্রশান্তি আর নাই। সকলেই অত্যাসন্ন বিপৎপাতের দিন-গণনায় দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কাহার কত দিন চাকরি হইয়াছে, কত টাকা ফণ্ডে জমিয়াছে, চাকরি গেলে সেই টাকা লইয়া কোন সুবিধাজনক ব্যবসা করিয়া সংসার চালান সম্ভব কি না, সাহেবদের কি মতামত, কাহার উপর কোপ বেশী, ভুলচুক করিয়া কে বা কাহারা সার্ভিস রেকর্ড শোচনীয় করিয়া রাখিয়াছে ইত্যাদির হিসাব-নিকাশে দৈনন্দিন কাজের বেগ কিছু মন্দীভূত হইল। কর্ত্তব্য-অবহেলার দরুন ইহাদের মনে ক্ষোভের চিহ্ন মাত্র কোন কালেই দেখা যায় না, আজও গেল না।

দাদার চেয়ারের সামনে ভিড়টা টিফিনের সময়েই জমে, আজ সকাল হইতেই সেখানে লোকের আনাগোনা সুরু হইয়াছে। অন্যে তো দূরের কথা, খোদ বড়বাবু পর্য্যন্ত একখানি চেয়ার টানিয়া সে-আসরে যোগ দিয়াছেন। খগেনবাবু তাঁহার পাশে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে (এ-ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ মানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই নহেন!) —অশ্রাব্য স্বরে গালি পাড়িতেছেন। পাশে দাঁড়াইয়া কেহ বা সে-গালিতে সাহস সঞ্চয় করিয়া আস্ফালন করিতেছেন, কেহ বা ভরসা না পাইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। বড়বাবুর মুখের এক টুকরা হাসিতে বা একটু সান্ত্বনাবাক্যে যেন ইহাদের প্রাণে মত্ত হস্তীর বল আসিবে। কিন্তু বড়বাবু আজ সে-বিষয়ে অত্যন্ত কৃপণ। নিজের মনের নদীতে যে প্রবল তুফান উঠিয়াছে, রিট্রেঞ্চমেণ্টের ব্যাপারে তাঁহার কতটুকু হাত সে তথ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত মুখে হাসি ফুটান কি এতই সহজ?

দাদা কচি ছেলেটির মত পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "আচ্ছা দাদা, সায়েবদেরও চাকরি যাবে তাহ'লে?"

বড় দুঃখেই বড়বাবুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "তুমি দিন দিন যেন ন্যাকা হচ্ছ, দাদা। কার চাকরি যাবে না-যাবে আমায় কি কেউ জানিয়েছেন! বলে নিজের জ্বালায় মরছি!"

খগেনবাবু বলিলেন, "তোমার আর কি ভাবনা, ভাই, পাচ্ছ দু-শ, চাকরিও হ'ল ত্রিশ বছরের উপর, গ্র্যাটুয়িটিই তো পাবে দু-শ পনের; তিন হাজার; তার পর, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কোন্ না বিশ হাজার জমেছে?"

বড়বাবু বলিলেন, "বিশ হাজার, না হাতী! মাইনে তো এই বছর কতক হ'ল বেড়েছে। মেরে কেটে হাজার দশেক হ'তে পারে। ব্যাঙ্কের ফিক্স্‌ড ডিপজিটে আজ-কাল কত ক'রে ইণ্টারেষ্ট দেয় হে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "ব্যাঙ্কের খাতাও খুলি নি, খবরও রাখি নে। যা পাবে, কাশীবাস করলে রাজার হালে চলবে। মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী নেই, ছেলেও তোমার কলেজে পড়ছে না।"

শান্তিবাবু বলিলেন, "দাদার কোন ভাবনা নেই। সেদিন তো নিজেই বলছিলেন, চাকরি আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে কোথাও গিয়ে দু-দণ্ড নিরিবিলিতে বাস করি।"

দাদা ব্যথিত হাস্যে বলিলেন, "সে বলেছিলাম কথার

কথা। খাটতে হ'ত আমার মত তো তুমিও বলতে ও-কথা।" পরে বড়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আরে দুটো পানই নাও।"

"আর পান! ভাবনা-চিন্তায় কি আর পান চিবতে ভাল লাগছে। যাই এক বার উপরটা ঘুরে আসি, সায়েবরা কি বলাবলি করছেন, জেনে আসি।" বলিয়া দাদাকে বিস্ময়সাগরে ডুবাইয়া দিয়া পান না-লইয়া বড়বাবু সত্যসত্যই মজলিস ত্যাগ করিলেন।

এতক্ষণে খগেনবাবুর আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটিল। সব্যঙ্গে বলিলেন, "ভাবনা তো ভারি! চাল নেই চুলো, ঢেঁকি নেই কুলো! রিট্রেঞ্চমেণ্ট-লিষ্ট যদি ওর হাতে না গিয়ে পড়ে তো কি বলেছি আমি।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কি রকম মনে হয় আঁপনার, সিনিয়রিটি ধরে টান দেবে, না, এফিসিয়েন্সির কলকাঠি টিপবে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "যম জানে! শুনেছি তো যাদের ত্রিশ বছর সার্ভিস হয়েছে তাদের রিটায়ার করতেই হবে।"

এই কথার সঙ্গে অনেকের মুখই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজেন সোৎসাহে বলিয়া ফেলিল, "হে হরি, তাই যেন হয়। আমি কালীঘাটে গিয়ে এক দিন পূজো দিয়ে আসব।"

দাদার মুখের ছায়া গাঢ়তর হইল, শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "তাই নাকি, কোথায় শুনলেন আপনি?"

নিত্যহরি মনের ভয়কে দূর করিবার জন্য সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, "তুমিও যেমন, আজ এল খবর আজই অমনি খগেনবাবু সব জেনে ফেললেন?"

এই কথার সঙ্গে কয়েকটি মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইলেও, অনেকগুলি মুখ পুনরায় ম্লান হইয়া গেল।

—"আচ্ছা, কি ভাবে রিট্রেঞ্চমেণ্ট সুরু হবে?"

—"টেন পারসেণ্ট বোধ হয়?"

—"ধরুন আপিসে এক-শ জন কেরানী আছে, তার মধ্যে দশ জনকে যেতে হবে তো?"

"—তা হবে বইকি।"

সভয়ে সকলে পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। কে সেই ভাগ্যহীন যাহার নাম রিট্রেঞ্চমেণ্টের দেবপূজায় অতি শীঘ্রই উৎসর্গিত হইতে পারে!

সহসা খগেনবাবুর কর্কশ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, "দূর, দূর, যত সব আনাড়ি! ওয়েজ-কাট টেন পারসেণ্ট হয়েছে ব'লে কি এতেও তাই হবে। দশ পারসেণ্ট গেলে চলবে সেকশনের কাজ? একেই তো এক-এক জনের ঘাড়ে ডবল করে কাজ চাপানো।"

শম্ভুচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "একটা পান দিন দাদা, গলা শুকিয়ে যেন কাঠ মেরে গেছে। ভাবতে আর পারি না।"

পানের রসে গলাটা ভিজিলে তিনি আরম্ভ করিলেন, "আমারও মনে হয় জুনিয়রদেরই চাকরি যাবে। মানে, যাঁদের পাঁচ বছরের কম সার্ভিস, তাঁদেরই—"

অমনই গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "এ যুক্তিটায় মন নিচ্ছে। হ'তে পারে এইটাই সম্ভব, হওয়া উচিতও তাই।"

ভিড়ের ও-পাশ হইতে কে একজন ছোকরা বলিল, "হওয়া উচিতও তাই! কেন, যাঁরা বুড়ো হয়েছেন, তাঁরা গেলেই তো আপদ চোকে। হাজার হাজার ছেলে 'হা-চাকরি' ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুড়োরা অনড় পাহাড়ের মত চেয়ার দখল ক'রে বেকার-সমস্যা সঙ্গীন ক'রে তুলছেন বই তো না!"

শান্তিবাবু বলিলেন, "বুড়োরা যাবে কোন্ দুঃখে। তাদের চাকরি গেলে কি আর চাকরি জুটবে? ছেলেদের উৎসাহ আছে, সামর্থ্য আছে—"

ভিড়ের ও-পাশ হইতে উত্তর আসিল, "কেন, চির-কালই কি চাকরি করতে হবে? ভগবানের নাম নেবার দরকার হবে না বুঝি? আমাদের শাস্ত্রে কি নেই পঞ্চাশোর্দ্ধে—"

খগেনবাবু ধমক দিলেন, "থাম ডেঁপো ছোকরা, শাস্ত্র-জ্ঞানও আছে!"

দাদা সদুঃখে বলিলেন, "কি দিনকাল পড়ল বল্ তো খগেন ভাই! ধর, ত্রিশ বছরে যদি-ই রিটায়ার করতে হয়, আমার কথা বলছি না, যাদের ছেলে কলেজে পড়ছে, গুটি দুই-তিন মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি, তাদের অবস্থাটা

এক বার ভাব দেখি। উঃ!" বলিয়া ডিবা খুলিয়া গুটি দুই-তিন পান মুখে পুরিয়া দ্রুতবেগে চিবাইতে লাগিলেন।

শান্তিবাবু বলিলেন, "আচ্ছা ধর যদি নীচের দিক্ থেকেই লোক ছাঁটাই হয়—আর টেন পারসেণ্ট হয়—তাহলে কার কার চাকরি যাওয়া সম্ভব?"

খগেনবাবু খাতা পেন্সিল লইয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠেই হিসাব কষিতে লাগিলেন, "এক—রমাপতি, দুই—নিশীথ, তিন—সুরেন, চার—অমিয়—"

বিশ্বজিৎ অমিয়র জামায় টান দিয়া বলিল, "এ-ঘরে এস। মিছে হয়তো তোমার মন খারাপ হয়ে যেতে পারে!"

অমিয় ম্লান হাসিয়া বলিল, "মন খারাপ হবারই কথা। যখন সংসার ছোট ছিল তখনকার ভাবনার চেয়ে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "এখনকার ভাবনা খুব বেড়েছে? মোটেই না।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "মোটেই না!"

মাথা নাড়িয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "উঁহু। ভাবনার কি ভল্যুম আছে নাকি? যে যখন মনকে পেয়ে বসে, কারণে বা অকারণে, তখন তার সবখানিই জুড়ে থাকে, পীড়া দেয়। চাকরি হবার আগে ভাবনা, বজায় রাখবার ভাবনা, আবার কখন যাবে ব'লেও ভাবনা! ভাবনাটা কোন্ সময় থাকে না বলতে পার, অমিয়?"

—"তোমার ভাবনা হয় না, বিশ্বজিৎ-দা?"

—"হয় না বললে মিথ্যে বলা হবে। খুবই হ'ত। তখন ভাবতাম যে, দুঃখ-দৈন্যের অতল সাগরে আমরা তলিয়েই যাচ্ছি—টেনে তোলবার কেউ নেই। এখন ভাবি, বেশ তো, সেই দুঃখ-সাগরের তলায়ও তো আমরা বাঁধতে পারি ঘর, সেখানেও কল্পনাকে রঙীন ক'রে দুঃখকে গ্রাহ্য নাও করতে পারি। বিষে যেমন বিষক্ষয়।"

—"তা কি হয়। দুঃখ যা তা দুঃখই।"

—"দুঃখকে সুখ তো বলি নি আমি। কেবল সহ্য-শক্তির কথা বলছি। তোমায় এক বার আঘাত করলে যে তীব্র যন্ত্রণা তুমি পাও, বার-বার আঘাত খেয়েও যন্ত্রণার সেই তীব্রতা তোমার থাকে কি?"

—"তা কেন থাকবে! বার-বার আঘাত পেয়ে যন্ত্রণা অবশ্য কমে না, অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "এ-ও তাই। ঢুকে অবধি শুনছি চাকরি গেল গেল। মাইনে কাটার প্রথাটা নূতন হ'লেও, রিট্রেঞ্চমেণ্টের কাঁচি এই প্রথম চলছে না। চাকরি-সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে ও-ধারা চ'লে আসছে। এমন কেউ কি কোন দিন মনে করেছেন যে, চাকরি পাকা হ'লেই সেটি অচ্ছেদ্য বর্ম হয়ে গেল! আগুনে পুড়বে না, তীর খেয়ে ফুটো হবে না?"

—"আজ যদি তোমার চাকরি যায় তো তুমি কি কর, বিশ্বজিৎ-দা?"

—"কি আর করব, তোমাদের মত যাদের স্নেহ করি, এখানকার বাসা ওঠাবার আগে তাদের ডেকে এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াই।"

—"তুমি ঠাট্টা করছ।"

—"কি দুঃখে ঠাট্টা করব? যাদের ভালবাসি, চাকরি গেলে তাদের কি আর তেমন প্রাণের আনন্দে খাওয়াতে পারব। আর কলকাতায় বাসও আমাদের চলবে না। কাজেই, ভোজের মধ্য দিয়ে বিদায় আয়োজন করতে হবে। কিনা, পারটিং কিক্!"

—"দেশে গিয়ে কি করবে?"

—"হয়তো কিছুই না। যত দিন ব্যাঙের আধুলি নাড়বার সুযোগ হবে, ততদিন নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে খাব, ঘুমোব, বউ-ছেলে নিয়ে আদর করব, ইচ্ছে হ'লে তাস পিটতেও পারি। হাঁ, আর একটি কাজ নিশ্চয়ই করব। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প'ড়ে চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা।"

—"আবার চাকরির চেষ্টা?"

—"কেন নয়?" বলিয়া বিশ্বজিৎ হাসিয়া উঠিল।

অমিয়ও হাসিল। বলিল, "তা বটে! আমরা প্রাণপণে চাকরি সংগ্রহের চেষ্টাই তো করছি। ছোট, বড় এবং মাঝারি। চাই চাকরি, চাই অর্থ। চাকরির ছায়ায় ব'সে আমরা হিট্‌লার মুসোলিনীর জয়গান করি, বেকার অবস্থায় কার্ল মার্কস, লেনিন আওড়াই।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বেশ তো, চাকরির নদীতেই চলুক না আমাদের সাঁতার কাটা। যার স্বাদ আমাদের পুলক-বিহ্বল ক'রে তোলে—তার সৌন্দর্য্য, মোহ জেনেও ছাড়া শক্ত। চাই আঘাত, অমিয়, শক্ত আঘাত। আঘাত আমরা পাচ্ছি, আরও পাব। কম্যুন্যালিজম, প্রভিন্সিয়ালিজম ইত্যাদির শাণিত অস্ত্রাঘাতে সে মোহও আমাদের অবিলম্বে কাটবে।" একটু থামিয়া বলিল, "আজ আমি যদি গোলদীঘির বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি, 'ভাই সব, এই সর্ব্বনেশে চাকরির মোহ ছেড়ে গ্রামে ফিরে চল, চাষ বাস কর।' যারা শুনবে তারা নিশ্চয়ই হাততালি দিয়ে আমার বক্তৃতাকে সম্বর্দ্ধিতও করবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে হেসে বলবে, 'পাগল! তা কি হয়? জমি কোথায় চাষ করব, অর্থ কোথায় হাল বলদ কিনব? চাকরি না ক'রে বাঁচব কি করে?' একটু থামিয়া বলিল, "অথচ চাকরি ক'রেও যখন সাচ্ছল্য আসে না, মহাজনের রক্তচক্ষু কোমল হয় না, আধপেটা খেয়েও যক্ষ্মার ওষুধ কিনতে ডিস্‌পেন্‌সারিতে ছুটতে হয়—তখনও চেতনা হয় না কি? আমাদের চাকরি-মোহগ্রস্ত জীবনে সে চৈতন্যের মূল্য অল্প। এক বার যেখানে মাথা গুঁজেছি, রোদ, জল, ঝড় যাই হোক না কেন—মাথা গুঁড়ো হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখান থেকে তা তুলতে পারব না। কিন্তু আমাদের পরে যারা আসবে, তারাও কি ভুল করবে?"

অমিয় বলিল, "যদি তারাও ভুল করে। শিক্ষা যে আমাদের ভুল।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "শিক্ষার গলদ বেশী দিন চলে না। ঘনবাষ্পে ভরা মেঘ কত ক্ষণ বর্ষণ না ক'রে থাকে? জান, অমিয়, আমার তো মনে হয়,—

'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।'

অমিয় কথা কহিল না। বিশ্বজিতের স্বপ্নকে মিথ্যা আঘাত দিয়া লাভ কি?

দিন দুই পরে বড়বাবু দাদার টেবিলের সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "শুনেছ খবর?"

দাদা দুই বৃহৎ চক্ষুর উপর হইতে চশমাটি কপালের উপর উঠাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "না তো! রিট্রেঞ্চমেণ্ট বন্ধ হ'ল?"

বনে আগুন লাগিলে দিশাহারা প্রাণীগুলি যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে এক জায়গায় আসিয়া জমে, মুহূর্ত্তে দাদা ও বড়বাবুকে ঘিরিয়া জনতা সৃষ্টি হইল।

বড়বাবু দাদার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পরে আপন কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মিষ্ট করিয়া স্মিতহাস্যে আরম্ভ করিলেন,—"বেদবাক্য মিথ্যা হ'তে পারে, তবু রিট্রেঞ্চমেণ্ট বন্ধ হয় কখনো! কিন্তু আশ্চর্য্য ওদের বিবেচনা শক্তি! সায়েব লোক—ওদের মেজাজই আলাদা। সাধ ক'রে কি আর বলে সায়েব-সুবো। সুবো কিনা, শুভ। বললে, 'ব্যানার্জ্জি, রিট্রেঞ্চমেণ্টের ব্যাপারে ডিপার্টমেণ্টাল ইন্‌চার্জ্জের মতামত তো নিতেই হবে। সিনিয়র জুনিয়র ও-সব ফাঁকি চলবে না, আমরা চাই এফিসিয়েণ্ট লোক।' একটা লিষ্ট তৈরি করবার ভারও আমায় দিয়েছেন।" বলিয়া দাদার ডিবা হইতে গোটা দুই পান ও নিজের কৌটা হইতে কিছু দোক্তা লইয়া মুখে পুরিলেন। অর্দ্ধ-মুদ্রিত নয়নে ধীরে ধীরে পান চিবাইবার সময় মনে হইল, এই গুরুভার পাইয়াই সহসা যেন তিনি ভারমুক্ত হইয়া অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিতেছেন! পান চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে নামের লিষ্টগুলি তাঁহার বাঁধানো দাঁতের ফাঁকে আসিয়া জড়ো হইতেছে কিনা কে জানে?

বড়বাবুর উল্লাসে দাদাই শুধু খানিকটা মৌখিক উল্লাস প্রকাশ করিলেন, "আঃ বাঁচিয়েছেন ভগবান। তোমার উপর ভার পড়াতে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।"

শম্ভুচন্দ্র ও ফণীবাবু একযোগে অকৃত্রিম আনন্দগদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "ভগবান্ না থাকলে আর দিনরাত হচ্ছে কি ক'রে।"

তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতির অবকাশে ভিড়ও সহসা পাতলা হইয়া গেল। যথাসময়ে টিফিনের ঘণ্টা বাজিলেও সেদিন ছুটির কলরব তেমন জমিল না।

ছুটির পর সকলেই শুষ্কমুখে পথে পা দিলেন। অন্যদিনও মুখ যে সকলের বিশেষ উজ্জ্বল বোধ হয় তাহা নহে, তবে আজিকার শুষ্কতা একটু বেশী মাত্রায় চোখে

পড়ে। অন্য দিন নানাপ্রকার আলোচনায় সে-শুষ্কতা স্বপ্রকট হইতে পারে না, আজ এক জন বক্তার পিছনে বহু শ্রোতা নীরবে শুষ্কমুখে পথ অতিবাহন করিতেছে। কাহারও মুখ হইতে ক্ষুদ্র সাহসের একটি স্ফুলিঙ্গ খসিয়া পড়িল তো সেই দীপ্তিতে অনেকেরই অন্তর ক্ষণতরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? নিশ্চিত মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও মানুষ বুঝি এত শঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন হয় না।

বিশ্বজিৎ বলিল, "কাল শনিবার, বাড়ী যাবে তো?"

অমিয় বলিল, "না। মাসকাবারের শনিবার, হাতে টাকা নেই।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "তাহলে আমার ওখানে তোমার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, ভুলবে না তো?"

"না।" বলিয়া দুই দিন আগে বিশ্বজিতের একটি কথা মনে পড়াতে অমিয় রহস্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "পার্টিং কিক্ নাকি, বিশ্বজিৎ-দা!"

হাসিমুখে বিশ্বজিৎ বলিল, "কিছুই অসম্ভব নয়। ঘটা ক'রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করবার সময় আর না-ও পেতে পারি।'

"মাপ কর, বিশ্বজিৎ-দা, কথাটা হঠাৎ :মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।" লজ্জিত মুখে অমিয় মাথা নামাইল।

অমিয়র পিঠে চাপড় মারিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "তোমার এতে লজ্জা পাবার কি আছে? সকলের মাথার উপরই যখন সরু সুতোয় বাঁধা তলোয়ার ঝুলছে, তখন কার তলোয়ারে হাওয়ার বেগ লাগবে তার ঠিক কি। আমরা চিহ্নিতনামা লোক ব'লেই ভাগ্যকে মিছে আঁকড়ে থেকে কঠিন সত্যকে ভুলতে পারি না। আসবে তো!"

"আসব।"

১৯

হেমন্তকালের দুপুরের একটি মূর্ত্তি আছে। সে-মূর্ত্তি ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিন কর্ম্মীর চোখে পড়া সম্ভব নহে। সংক্ষিপ্ত দিনগুলিতে সূর্য্যের কিরণ কোমল এবং আরাম-দায়ক মনে হয়; এ-দাক্ষিণ্য প্রথম উত্তরবায়ুর প্রসাদাৎ হয়তো মানুষ লাভ করিয়া থাকে। আরামের স্পর্শে দেহের আলস্য বেশী মাত্রায় পরিস্ফুট হয় বলিয়াই কি দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর পায়ে চাদর ঢাকিয়া একটুখানি নিদ্রার আয়োজন ভালই লাগে। হেমন্তের দিনে স্পষ্ট একটি পরিবর্ত্তন প্রকৃতির চারিদিকে ফুটিয়া উঠে। পথের ধূলি কিছু গাঢ়, আকাশের নীলের প্রকাশ ক্রমশই ধূসরত্বে ঢাকিয়া যাইতেছে, গাছের পাতাগুলি কিছু কর্কশ, কিছু ধূলিমলিন। মানুষের দেহেও রুক্ষতা ফুটিয়া উঠে, ত্বকের সে মসৃণতা থাকে না, নখ দিয়া গায়ে আঁচড় কাটিলে স্পষ্ট একটি সাদা দাগ পড়ে। মন,—হাঁ, মনও হিম-হাওয়ায় কিছু সতেজ হইয়া উঠে বইকি। আলস্য ও অবসাদের ধোঁয়া মনকে আর কুয়াশাচ্ছন্ন করিতে পারে না। বাহিরের সূর্য্য-ভ্রমণ-পথ সঙ্কীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদয়াচলে তাঁহার পরিক্রমার ক্ষেত্রটিও বুঝি প্রশস্ততর হইয়া উঠে।

রাস্তায় বাহির হইয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে অমিয় বিস্ময় বোধ করিল। দশটায় আপিস-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পাঁচটায় বাহির হইবার সৌভাগ্য লাভ যাহার হয়—শীতের আরামদায়ক সূর্য্য, বর্ষার বাদলধারা, বসন্তের বিলাস ও গ্রীষ্মের প্রখরতা তাহার ঋতু-পরিচয়ের ক্ষেত্রটিকে আর কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে! মানুষের জন্যই প্রকৃতির বেশবাস, অথচ কর্ম্মব্যস্ত মানুষ সেদিকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুখ তুলিয়া দেখে না। রাস্তা দিয়া ফেরি-ওয়ালা একটানা সুরে অতিপরিচিত বিক্রেয় জিনিষের নাম দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, বেশ লাগে। কাঁসারী যখন বাসন বাজাইয়া বিক্রেয় জিনিষের ইঙ্গিত করে, খিলিপানের সুর যখন ইলিশমাছের মত শোনায়, শিশি-বোতল-কাগজ-বিক্রেতার কণ্ঠস্বর ও অন্ধ বুড়ার একাদশী বা তিথিবিশেষের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের বিচিত্র বাক্-ভঙ্গী রাজপথের ঊর্দ্ধে উঠিয়া দ্বিতল ত্রিতলের জানালায় আঘাত করে তখন রাজধানীর নূতন রূপকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখা দুষ্কর নহে কি? ওগুলি কানের পথে গিয়া মনের সঙ্গে মিতালী পাতায়। বেশ কিছুক্ষণ মনকে লইয়া দোলাও দেয়।

এক বার অমিয়র জ্বর হইয়াছিল। বিছানায় পড়িয়া
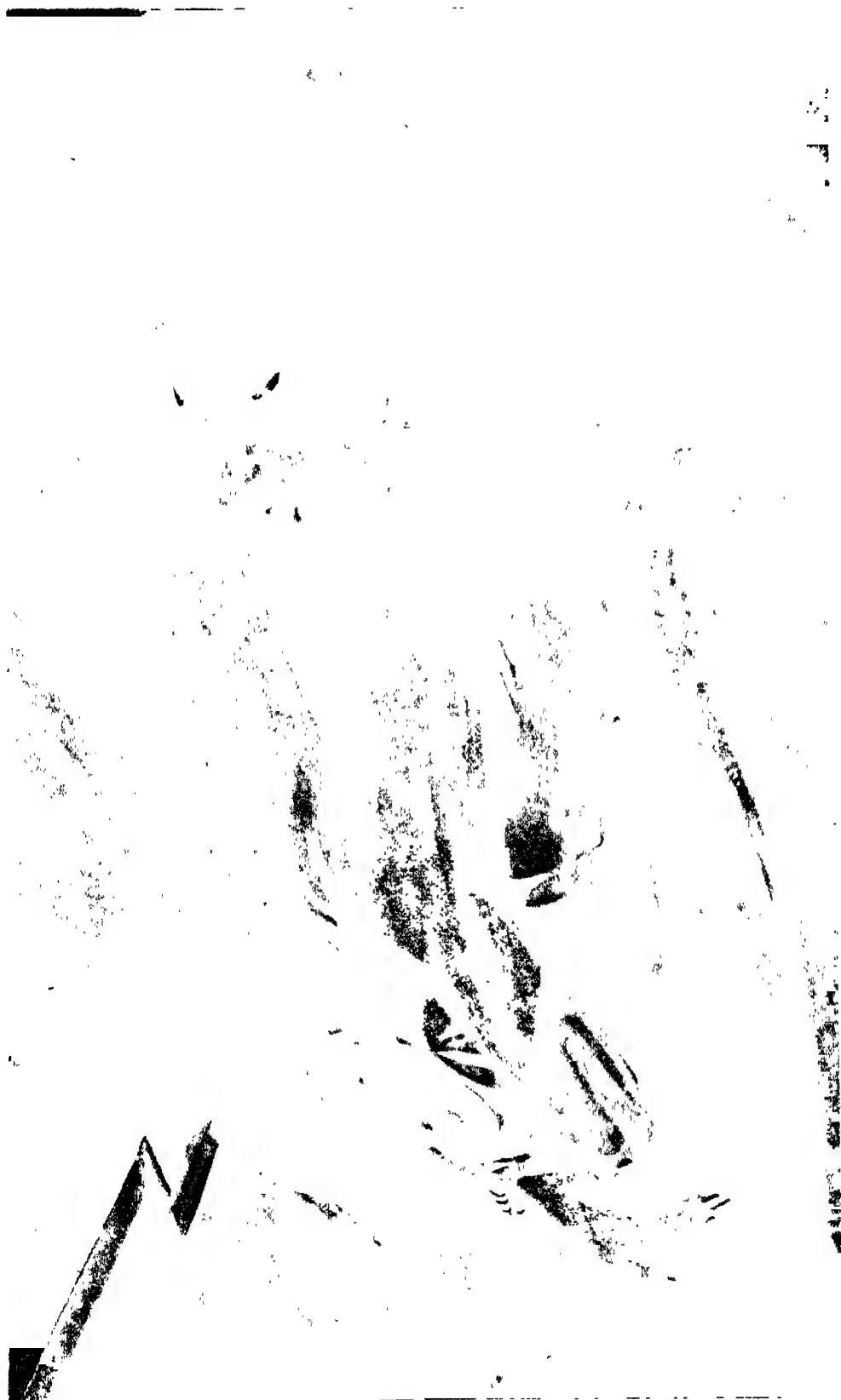
মাথার যন্ত্রণায় সে ছটফট্ করিতে করিতে যেমনই চক্ষু চাহিয়াছে অমনই দুপুরের রংটি মনে হইয়াছে হলুদ। সেই হলদে দুপুরে চক্ষু বুজিয়া ফেরিওয়ালার বিচিত্র কণ্ঠস্বর মেসের নির্জন কক্ষে যে কোন উচ্চ সঙ্গীতধ্বনির মত মনে না হইলেও, সে উপভোগ করিয়াছে। দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে, নিঃসঙ্গতার অবসরে ঐ বিচিত্র রাগিণী বুঝি প্রাণবন্ত হইতে পারে।

পথের বহু দূরে আসিয়া বিশ্বজিতের কথা তার মনে হইল। সেখানে সে চলিয়াছে, অথচ এতক্ষণ হৈমন্তিক দুপুরের ক্ষণকালীন ভালবাসায় পড়িয়া সেখানকার কথা ভুলিয়াছিল। যাহার সম্মুখে অন্নসমস্যার নগ্নরূপ সুপ্রকট, সে হলদে দুপুরের, কোমল ও সংক্ষিপ্ত দুপুরের, স্বপ্ন দেখে কি করিয়া?

কড়া নাড়িয়া বিশ্বজিৎকে ডাকিতে হইল না, সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বোধ করি অমিয়র প্রতীক্ষাই করিতেছিল। হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল, "এস।"

অমিয় সবিস্ময়ে বাড়ীখানার পানে চাহিল। চারি দিকে উহার বাঁশের ভারা উঠিয়াছে, রাজমজুর কর্ণিকের ঠনঠান শব্দে ফোঁপরা দেয়ালে ঘা দিয়া জমাট খসাইতেছে। নোনাধরা পাতলা ইটের দেয়াল আরও কুৎসিত বীভৎস দেখাইতেছে।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য হয়ে দেখছ কি? আমাদের দুর্দ্দশা দেখে বাড়ীওয়ালার করুণা হয় নি, কর্পোরেশনের ঠেলায় আইন-বাঁচানো গোছ মেরামত চলছে।"

ভিতরে ঢুকিয়া অমিয় বিশ্বজিতের শিশুটিকে দেখিতে পাইল। শিশুটি বড় হইয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শীর্ণও হইয়াছে। মাথায় বিশ্বজিতের মতই কোঁকড়া চুল, চোখের ভ্রূ ও তারা বিশ্বজিতের মতই ঘন ও কালো, কিন্তু নাসিকা নিম্ন হইতে চিবুকাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিশ্বজিতের সঙ্গে মেলে না; খুব সম্ভব খোকা মায়ের মুখশ্রী লাভ করিয়াছে। খোকা এখন চলিয়া বেড়াইতে পারে, টলিয়া পড়িয়া যায় না। এ-বয়সের যেমন রীতি—এক জায়গায় একদণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। ষ্টোভের তেল ফেলিয়া, হাতে হলুদ মশলা মাখিয়া, বাসনের ঝনঝন্ শব্দ তুলিয়া, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া, কুটনার খোসা ছড়াইয়া, বাপের পিঠে কিল বসাইয়া ও মায়ের মুখে চুমা খাইয়া, ঘরখানিতে—যত ক্ষণ না নিদ্রা আসে—মাতামাতি করিয়া বেড়ায়। বিশ্বজিতের কাছে চড় খাইলে সুপর্ণার কাছে গাল ফুলাইয়া নালিশ জানায়, আবার সুপর্ণার তাড়া খাইলে মাটিতে পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দেয়। আদরের অর্থ বুঝিতে শিখিয়াছে, তাই অকারণ কান্নায় আবদার তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। অমিয় দেখিল, গোটা দুই কাঠি লইয়া রেলিঙে শব্দ তুলিয়া খোকা বাজনা বাজাইতেছে; মা তাহার হয়তো ঐ ফালি বারান্দার এক পাশে বসিয়া অসতর্ক মুহূর্ত্তে মাথার কাপড় নামাইয়া ডাল সাঁতলাইতেছে।

তাঁহাকে সতর্ক করিবার মানসে অমিয় হাঁকিল,—"কি খোকা, বাজনা হচ্ছে?"

কণ্ঠস্বরে সুপর্ণা মাথায় ঘোমটা তুলিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "অমিয় দিন-দিন যে দেখি নূতন হচ্ছ!"

অমিয় হাসিমুখেই ঘরে ঢুকিল।

ঘরে ঢুকিয়া সে আর একবার বিস্মিত নয়নে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। বিশ্বজিৎ কি কোথাও যাত্রার আয়োজন করিতেছে? তক্তাপোষের উপর ট্রাঙ্ক ইত্যাদি গোছানো, ঘরের রাশীকৃত ক্যালেণ্ডার ও আয়নাগুলি খুলিয়া এক জায়গায় জড়ো করা হইয়াছে; বালি-খসা দেয়ালে শুধু ঘনবিন্যস্ত পেরেকের সারি। জলের কুঁজাটি মাত্র ঠিক জায়গায় আছে, আর সমস্তই গুছাইয়া তক্তাপোষের উপর স্তূপীভূত করা হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ বলিল, "বলেছি তো আইন-বাঁচানো গোছ মেরামত চলেছে। মাসের আর পনরোটা দিন আছে, একেবারে নোটিশ দিয়েই দিলাম। দিন-কতকের জন্যে ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক, আমিও কোন মেস-টেস দেখে নিই। আছে জায়গা তোমার মেসে?"

অমিয় বলিল, "এক বার বাসা ওঠালে আবার বাসা খুঁজে নেওয়াও তো কম হাঙ্গামা নয়।"

—"শুধু হাঙ্গামা! আমাদের আবার বামুনের গরু

না হ'লে তো চলে না। জায়গা বেশী, ভাড়া কম, কল-পায়খানার সুবিধা—অনেক কিছু দেখতে হয়। যাই হোক আমিও কিছুদিন ছুটি নেব ভাবছি।"

—"ছুটি? দেবে তোমায় ছুটি?"

—"শুনছি তো আজকাল ছুটি ঝপাঝপ মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে।"

—"কত দিনের ছুটি নেবে?"

—"দিন পনরোর। কিন্তু আজকাল কর্ত্তৃপক্ষের যা দয়া তাতে ছুটির মেয়াদ অফুরন্ত না ক'রে দেন।"

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, "আশ্চয্য কি!"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বেলা অনেকটা হয়েছে, ভাত দিতে বলি।"

অমিয় বলিল, "এই তো এলাম, একটু জিরোই। খোকা গেল কোথায়?"

—"বারান্দায় ওর মার সঙ্গে খুনসুটি করছে হয়তো।"

—"আর ছড়া ব'লে ঘুম পাড়াতে হয় না?"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "ছড়া বলতে হয় বইকি, তবে ঘুমপাড়ানি গান আর শোনাই নে।"

সকৌতুকে অমিয় বলিল, "কি শোনাও তবে?"

—"শুনবে? খোকন, খোকন, এদিকে এস তো।" বাপের ডাকে খোকন প্রকাণ্ড একটা লাঠি টানিতে টানিতে দুয়ার গোড়ায় উঁকি দিল। অমিয়কে দেখিয়া একটু সঙ্কোচও বুঝি তার হইল, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই।

অতঃপর 'বাবা' 'বাবা' শব্দে টলিতে টলিতে আসিয়া বিশ্বজিতের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; লাঠিটা সশব্দে মেঝেয় পড়িয়া গেল।

বিশ্বজিৎ আদর করিয়া বলিল, "ছড়া শুনবি? খুব ভাল ছড়া?"

খোকা আহ্লাদে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁ।"

বিশ্বজিৎ খোকাকে দোলা দিতে দিতে আরম্ভ করিল:

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—
বাজা শঙ্খ বাজা;
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।

সঙ্গে সঙ্গে খোকাও হাততালি দিয়া উঠিল।

তন্ময় হইয়া বিশ্বজিৎ আবৃত্তি করিয়া চলিল:

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখ-রাতের রাজা।

চঞ্চল খোকা বেশীক্ষণ ছড়া শুনিবার লোভে বিশ্বজিতের কোলে বসিয়া রহিল না। তাহার তন্ময়তার অবসরে কোল হইতে নামিয়া ভূপতিত লাঠিখানি তুলিয়া লইল ও 'হেট হেট' শব্দে সেই লাঠি টানিতে টানিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বজিৎ তখন আবৃত্তি করিতেছে:

নাহি নাহি ভয় হবে হবে জয় খুলে যাবে এই দ্বার,
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার;
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে চেতনা,
সুপ্তি-নিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার।

অমিয় এত আশ্চয্য কোন দিন হয় নাই। তন্ময় হইয়া কবিতা আবৃত্তির ক্ষণে বিশ্বজিৎকে সে যেন আজ স্পষ্ট পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পাইল। সামান্য কেরানী সে নহে, সে মানুষ। যেমন মানুষ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তারা—হিট্‌লার, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা, ষ্টালিন, আতাতুর্ক। এঁদের গোড়ার ইতিহাস কি এমনই অনুজ্জ্বল ছিল না? সেখানে কি দিন-গুজরানের সঙ্গীন সমস্যা ও দুঃখ-আবর্ত্তের প্রচণ্ড বেগ প্রতিনিয়ত ইঁহাদিগকে নিম্ন-অভিমুখী করিয়া টানিত না? কিন্তু সে দুরন্ত বেগ ইঁহাদের দুরন্ত ইচ্ছার কাছে মাথা নামাইয়াছে। দুঃখে ইঁহারা ভাঙিয়া পড়েন নাই, তাই দুঃখকে পায়ের তলায় ফেলিয়া আজ মাথা উঁচু করিয়া সারা জগতের বিস্ময় ও বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বজিৎ রাষ্ট্র গড়িবে না সত্য, সে সুযোগ ও সুবিধা থাকিলেও সে হয়তো রাষ্ট্রনায়ক হইতে পারিত না, কিন্তু দুঃসাহসী দুঃখজয়ীর জয়টীকা তাহার ললাটে প্রথম সূর্য্যকিরণের মত স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অমিয়

ভাবিতে লাগিল, এই বিশ্বজিৎই এক দিন বলিয়াছিল, "দুঃখদৈন্যের অতলে যে আমরা তলিয়ে গেলাম, আমাদের টেনে তোলবার কেউ নেই।"

অমিয় উত্তর দিয়াছিল, "টেনে কেউ তুলবে না, নিজের চেষ্টাতেই এই দুঃখ জয় করতে হবে।"

হাসিয়া বিশ্বজিৎ উত্তর দিয়াছিল, "তাও জানি। মাস-কাবার হোক, আপনিও তা বুঝবেন।"

অনেক বার মাস-কাবার হইয়াছে, ক্রমশ গভীর ভাবে সে তথ্য অমিয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। আজ আর সে সদ্য কলেজফেরত ছাত্রের মত বড় বড় কথা বলে না; বৃহৎ স্বপ্ন দেখার দিনগুলি তাহার ক্রমশই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। রিট্রেঞ্চমেণ্টের খড়্গ যদি বিশ্বজিতের মাথায় পড়ে তো এই সংসারের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অস্বস্তি ঠিক বিশ্বজিতের জন্য নহে। আসলে নিজের ভাবনাই সে ভাবিতেছে।

বিশ্বজিৎ প্রসন্নমুখে বলিল, "শুনলে তো আমার ছড়া, ওতে ছেলের নামে আমিও মেতে উঠি।"

অমিয় বলিল, "তুমি অনেক বদলে গেছ, বিশ্বজিৎ-দা।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "কল্পনার আতঙ্কে অনেক সময় আমরা মরে থাকি কি না; কিন্তু আর্য্য ঋষিরা মিথ্যা বলেন নি। ইচ্ছা করলে অনায়াসে আমরা অনেক দুঃখকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।"

—হ'তে পারে এ তোমার ভাববিলাসিতা।

—হতে পারে। ভাবের জোয়ার যে-মুহূর্ত্তে আসে—তখন বস্তুতন্ত্রের পৃথিবীর অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে হয়; সে জোয়ার চলে যায়ও তেমনি অকস্মাৎ, তখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় আর নির্ব্বোধ মনে হয়। কিন্তু বেকার অবস্থার কল্পনা ক'রে কষ্টের শেষ ধাপ অবধি যতই নামছি ততই এই ভাববিলাসিতা আমায় শক্তিমান্ ক'রে তুলছে, আনন্দময় ক'রে তুলছে; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মত এর মধ্যে অনির্ব্বচনীয় মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি। এই ভাব-বিলাসিতার মধ্যে আজকাল ফাঁকা মুহূর্ত্ত আবিষ্কার করতে পারি না। এ-জোয়ার যেন প্রত্যহের, তিথি-অনুসারী নয়; এ আসছে—আসছেই। মন আমার কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

বিশ্বজিতের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। হয়তো মনের মধ্যে এই দুঃখজয়ের সাধনা তাহার কোন অপ্রত্যক্ষ মুহূর্ত্তেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অমিয় বলিল, "তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবছ না, বউয়ের ভবিষ্যৎ?"

বিশ্বজিৎ উজ্জ্বল মুখে বলিল, "শক্তি যদি পেয়ে থাকি অমিয়, সে তোমার বৌদিদিরই কাছ থেকে। আমায় মাঝে মাঝে ভাবতে দেখে ও বলত, 'তুমি এত ভাব কেন?' এক দিন চাকরির সঙ্গীন অবস্থা সব খুলে বললাম। ও সব শুনে বললে, 'যদি তাই হয়, বেশ তো, আমরা দেশে ফিরে যাব'।"

'সেখানে গিয়ে খাবে কি?' বললাম।

ও বললে, 'সবাই যা খায়, ভাত।'

'তা জোটাবার জন্য যে টাকার দরকার হয়, আসবে কোত্থেকে সে টাকা?'

সত্যি বলছি, অমিয়, সুপর্ণা হাসলে। বললে, 'ভেবে ভেবে তুমি টাকা রোজগারের বন্ধ পথটিকে খুলতে পারবে কি? তবে দেহ নষ্ট কর কেন?'

বললাম, 'আমার জন্যে ভাবি নে। তোমাদের যে আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী করেছি—'

'তুমি ভেব না। আমি যত দিন থাকব—খোকার ভাবনাও তুমি ভেব না। ওকে মানুষ করবার ভার আমার।'

অল্প আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই শহরের জন্য তোমার মন কেমন করবে না? সিনেমার জন্য, জু-গার্ডেনের জন্য, লেকের জন্য?'

সুপর্ণা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে, 'এ তো শহরের নেশা—শহর ছাড়লে আপনিই যাবে। এখন ওগুলো না দেখলে সময় কাটে না, তাই দেখি; তখন খোকাকে মানুষ করবার কাজে আর সবই অনায়াসে ভুলব।' একটু থেমে বললে, 'ভয় নেই গো, ভয় নেই, আমি কেরানীর বউ, চাকরি তালপাতার ছাউনি—তা জানি।'

'সব জেনেও কোনদিন একটি আধলা জমাবার চেষ্টা তো কর নি।'

'কেন করব। অতিসঞ্চয়ী শেয়ালের গল্প কি পড়ি নি বইয়ে। জমানো মানেই তো ভবিষ্যতের জন্য দুর্ভাবনা। সামান্য আয়—এক দিনের অসুখে যা খরচ হয়ে যায়! না, না, যখন মনে হবে সুখে আছি, তখন সব দিক দিয়ে সুখে থাকাই তো ভাল। ভাবনা-চিন্তা ওসব আমার পোষায় না, বাপু।'

সত্যি বলছি অমিয়, ওর কথায় যেন বুকে বল পেলাম; আমার হারানো শান্তি আবার ফিরে পেলাম। আজকে যা পেলাম তাই আমার পরম লাভ, কালকের জন্য সঞ্চয় ক'রে মিছে দুঃখভোগ কেন? এ-যে কত বড় দুঃখজয়ের অস্ত্র তুমি হয়তো বুঝবে না।"

—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই অস্ত্রের ধার—

বাধা দিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "জীবনের মেয়াদ কার কত দিন কেউ জানে না। শেষ যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলো জ্বালতে যাওয়া মূর্খতা। যদি জ্বালবার চেষ্টা কর, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিও প্রদীপ। অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থাক্, আমরা সোনার বর্ত্তমানে সাহসী বীরের মত পা ফেলে চলব।" বলিয়া গাহিল:

আগে চল, আগে চল,
আগামী কালের কথা ভেবে আজ কেন হোস চঞ্চল?
আগে চল, আগে চল।

সুপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বন্ধুটিকে কি কবিতা শুনিয়ে রাখবে, খেতে দেবে না? বেলা একটা যে বাজে।"

সস্মিত মুখে বিশ্বজিৎ বলিল, "তোমার দুঃখজয়ের সহজ বার্ত্তাটি অমিয়কে শোনাচ্ছিলাম; শুনে ও অবাক হয়ে গেছে।"

সকোপ কটাক্ষে বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া সুপর্ণা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "দুঃখ তো ম্যালেরিয়া জ্বর নয় যে সহজ কথার কুইনিন-পিল খেলেই জ্বর পালাবে। আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ঠাকুরপো, হাতমুখ ধুয়ে নিন।"

কথাশেষে সুপর্ণা আহারের আয়োজনে মনোযোগ দিল। পরিপাটি করিয়া আসন বিছাইয়া জল-হাত দিয়া সুপর্ণা জায়গাটি মুছিয়া লইল। অতঃপর জলের গ্লাস ও ভাতের থালা দিয়া বিশ্বজিৎকে আহারের জন্য ইঙ্গিত করিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "এস অমিয়, নিতান্ত গন্ধময় জগতে প্রবেশ করা যাক।"

থালে মল্লিকাশুভ্র অন্ন, পাশে পাঁচ রকম তরকারি শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো; ঝোল, সুক্তা ও ডাল বাটিতে দেওয়া হইয়াছে; সর্ব্বোপরি যত্নে এবং শ্রমের পারিপাট্যে এই রচনা মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। বাড়ীতে সারাদিন ধরিয়া মা এইরূপ আয়োজন করিয়া অমিয়কে আহারে ডাকেন। সেখানকার অন্ন হইতে যেমন ধূম উঠে তেমনি একটা ক্ষুধা-উদ্রেককারী গন্ধও বাহির হয়; ঘন মুগের ডালের সেই সোঁদা গন্ধ অনেকখানি ঘি দিয়াও মেসের ঠাকুর বাহির করিতে পারে না। প্রত্যেক তরকারির চেহারাই আলাদা; যত্নের রূপ আর কর্ত্তব্যের চেহারা এক লহমার দৃষ্টিতেই চেনা যায়।

সুপর্ণার পরিবেষিত অন্নে সেই গন্ধ, ব্যঞ্জনের সেই অপূর্ব্ব রূপ। অত্যন্ত কোমল ও স্বল্প বাক্ বধূটির মত এই তৃপ্তিকর স্বল্প আয়োজনে সুপর্ণা যেন নিজেকেই মেলিয়া ধরিয়াছে। ইহারা কোমল অন্তরের মধ্যে নম্রশক্তির বিদ্যুৎ ভরিয়া রাখিতে জানে। যে-পুরুষ পথ চিনিতে ভুল করে না সেই বিদ্যুতের আলো তাহার কঠিন বুকে বজ্রের সাহস যে ভরিয়া দিবে, এ আর বেশী আশ্চর্য্য কি! এরা আগামী কালের দুর্ভাবনা ভাবিতে চাহে না; ঈশ্বরের উপর অটুট বিশ্বাস—সে কথাও তো সুপর্ণা ভ্রমেও উচ্চারণ করে নাই। সে তো আদর্শ স্ত্রীর মত বলে নাই,—তুমি থাকিলে আমার সাত রাজার ধন বর্ত্তমান রহিল, ভিক্ষা অথবা দাস্যবৃত্তি করিয়াও তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করিয়া তুলিব।

অমিয়কে অন্যমনস্ক দেখিয়া সুপর্ণা মৃদুস্বরে অনুযোগ করিল, "ঠাকুরপো, কিছুই তো খাচ্ছেন না?"

অমিয় উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথাই খালি মনে হচ্ছে, বৌদি।"

সলজ্জ নত মুখে সুপর্ণা জবাব দিল, "বেশ তো, বাসায়

গিয়ে যত খুশী মনে করবেন, এখন খেয়ে নিন। রান্না ভাল হয় নি বুঝি ?"

—এত ভাল হয়েছে যে মনে লোভ জন্মাচ্ছে—ছুটি-ছাটার দিন এসে আপনাদের জ্বালাতনও করতে পারি।

—বেশ তো, আসবেন। আপনি এলে আমরা সত্যিই খুশী হব।

—"তা তো হবেন, কিন্তু আপনি তো শীঘ্রই পলাতক হচ্ছেন। আমার লোলুপ রসনার গতি কি ক'রে যাবেন ?"

সুপর্ণা হাসিয়া বলিল, "অবশ্য রসনার তাগিদে নয়, যদি বউদিকে মনে থাকে, ঠিকানা জানাব, সেই পাড়া-গাঁয়ে একটু কষ্ট ক'রে যাবেন।"

"না-ও যদি যাই," ঢোক গিলিয়া অমিয় বলিল, "আপনাদের ভুলব না কোন দিন। আপনি কি বলে-ছিলেন বিশ্বজিৎদাকে, আর এক বার বলুন তো।"

সুপর্ণার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "অম্বল আনি গে।"

অম্বলের বাটি পাতের গোড়ায় নামাইয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে অমিয় বলিল, "কই বললেন না তো ?"

সুপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে এমন কিছু মূল্যবান কথা নয় যা আপনার জানা দরকার। যদি না ছাড়েন আমার বোনটিকে চিঠি লিখে জানাব সে কথা।"

অমিয় উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "প্রতিজ্ঞা করলেন মনে থাকে যেন।"

মুখ-হাত ধোয়া শেষ হইলে অমিয়র হাতে পান দিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "তাহলে, অমিয় ?"

অমিয় বলিল, "তাহলে চলি।"

অমিয়র পিঠে চাপড় মারিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "মনে থাকে যেন এই চলাই হ'ল আমাদের জীবনের আয়ু আর বিশ্রাম হ'ল মৃত্যু।"

—"বউদিকে ডাক, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দিয়ে যাই।"

—"তোমার বউদি অত বোকা মেয়ে নন। খেতে বসে তোমার ভক্তিটা তিনি লক্ষ্য করেছেন, কাজেই সামনে থেকে সরে পড়েছেন। তিনি অনেক কিছু সহ্য করতে পারেন—ঐ ভক্তিটুকু ছাড়া।"

—"তাই তো—তাঁকে আর কিছু দিতে মন চাইছে না—ঐ ভক্তিটুকু ছাড়া।" পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে অন্তরাল-বর্ত্তিনী সুপর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "উদ্দেশে আপনার পাওনা রেখে গেলাম, বউদি, ভুলবেন না।"

অন্তরাল হইতে মৃদু কণ্ঠের অনুরোধ-ধ্বনি আসিল, "আবার আসবেন।"

সুপর্ণা অন্তরালেই রহিয়া গেল।

অমিয় এতটুকু ক্ষুব্ধ হইল না। তাহার অন্তর-বাহির আজ পরিপূর্ণ। এমন শুভমুহূর্ত্তে কে আসিল কে বা চলিয়া গেল সে-তথ্য জানিয়াও কোন লাভ নাই।

সপ্তাহখানেক পরেই হইবে, দাদার টেবিলের চারি-দিকে সমস্ত সেকশন আসিয়া জমিয়াছে। বড়বাবু এইমাত্র উপরে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন। রিট্রেঞ্চমেণ্টের যে তালিকা তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকটে পেশ করিয়াছেন আর কয়েক মিনিট পরেই তাহার ফলাফল জানা যাইবে। ভিড় জমিয়াছে বটে, কাহারও মুখে কথা নাই। দাদার সম্মুখে বড় পানের বাক্সটি খোলা; শান্তিবাবুর হাতে জরদার কৌটা; ফণীবাবুর মুখের বিড়িটা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কখন নিবিয়া গিয়াছে; খগেনবাবুর কর্কশ কণ্ঠস্বরও শোনা যাইতেছে না; একমাত্র ক্লক-ঘড়িটা ইহাদের আশঙ্কা-আহত হৃদ্‌যন্ত্রের মত টিক্ টিক্ শব্দে দ্রুত তালে বাজিয়া চলিয়াছে। কে জানে, আর কত দিন পৃথিবীর পরমায়ু ? বিহারের মত একটা আকস্মিক ভূমিকম্পেও যদি ধরিত্রী উল্টাইয়া পড়িতেন, কিংবা ফুজিয়ামার লাভা-স্রোতে কলিকাতা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, অথবা মহাযুদ্ধের রণদামামা যদি জার্ম্মান জাতি আবার নবোদ্যমে বাজাইতে পারিত ?

এ-সব কিছুই হইল না, ফাইল বগলে বড়বাবু দেখা দিলেন।

মুখখানি তাঁর অসম্ভব রকম গম্ভীর; বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে সে-গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ত্রুটিও হয়তো ধরা পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করিবে কে ? শুধু ঘড়ির শব্দটাই প্রবল হইয়া উঠিল, লোকগুলির নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল।

জনতার মধ্যেই বড়বাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ কঠিন বিচারকের মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট কণ্ঠে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের নামগুলি পড়িতে লাগিলেন।

—অমলকুমার ভট্টাচার্য্য।

দাদা ভীষণ ভাবে চমকিত হইয়া উঠিলেন। ওঃ—ওঃ শব্দে একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদও বুঝি তাঁহার কণ্ঠদেশে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল; পূর্ণ মুক্তির পথ না পাইয়া দুই চোখে জলধারারূপে হু হু করিয়া পড়িতে লাগিল। সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দাদা টেবিলে প্রসারিত দুই হাতের উপর মাথা রাখিলেন।

বড়বাবু অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া চলিলেন:

—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বজিতের মাথা আর একটু উপরে উঠিল। হয়তো এক সেকেণ্ডের জন্য সে-মুখে সমস্ত অন্তর-বৃত্তি শুদ্ধ হইয়া জমিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র; পরক্ষণেই মুখে তাহার প্রসন্ন হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, চোখের তারায় বিদ্যুদ্দীপ্তি।

অমিয় এক বার দাদার পানে চাহিল, আর বার চাহিল বিশ্বজিতের পানে।

তৃতীয় নাম উচ্চারণের জন্য বড়বাবু ততক্ষণে ওষ্ঠ মুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অমিয়র কানে তাঁহার কণ্ঠধ্বনি আর পৌঁছিল না।

একই সঙ্গে সে তখন দাস-জীবনের উলঙ্গ বর্ত্তমান ও অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পাশাপাশি দেখিতে পাইয়াছে।

সমাপ্ত

পাখী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কত পাখী বসে ডালে গান গায় উড়ে চলে যায়,
বাঁধে না কুলায়।
তাহাদেরি তুমি একজনা
চপলচরণা,
আসিলে, গাহিলে গান, ডানা দুটি মেলে
উড়ে গেলে
জানি না সে কোন শাখী 'পরে,
দুরান্তরে!
শিকড়ে রয়েছি বাঁধা সুকঠিন এই পৃথ্বীতলে
অটুট শৃঙ্খলে।
পত্রে পত্রে শাখায় শাখায়
লক্ষ ডানা মেলি যেন উড়িবারে চায়
এই শাখী,
হে অচিন পাখী
সন্ধানে তোমার,
বন হ'তে বনান্তরে সাগরের এ-পার ও-পার।

ওই গান
বক্ষে মোর রেখে গেল চির কলতান।
দুরন্ত আহ্বান যেন নিত্য মোরে ডাকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে
খসে খসে পড়ে পাতা, মুক্ত পক্ষে তারা উড়ে যায়
চৈত্রবায়ে পর্ণবলাকায়
দীর্ণ করি শীর্ণ শাখা কিশলয় নবীন মঞ্জরী
ওঠে ফুটি, কাঁপে থরথরি।
যেন সে গানের তানে গুমরি গুমরি এত দিন
গুঁড়ির কঠিন বক্ষে ছিল তারা সবে অন্তরীন,
আলোকে মেলিল আজি আঁখি,
সুধায় বরণে গন্ধে, ফুটাল যে, কোথায় সে পাখী?

রূপাবলী—শ্রীনন্দলাল বসু। প্রথম ভাগ, ১ম ও ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান:—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রতি খণ্ড ৫০ আনা।

এক জন ইংরেজ চিত্রশিল্পীর মুখে শুনেছিলাম যে তিনি চিত্রবিদ্যা শিখতে লণ্ডনের রয়েল একাডেমী স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আসল শিক্ষা হয়েছিল বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীর নানা ওস্তাদ কলমের প্রাচীন চিত্রমালার অনুশীলন ক'রে। সেদিন দৈনিক কাগজে দেখলুম এক ভদ্রলোক লিখেছেন—"ট্রাডিশ্যনাল কালচার অথবা আর্টের দোহাই দিয়ে আমরা যেভাবে শিল্পীর প্রতিভাকে খর্ব্ব ক'রে চলেছি তাতে হয়ত ভবিষ্যতে নূতন গান শোনবার অবকাশ আসবে না। বর্ত্তমানের কথা শোনবার জন্যে ঘাঁটতে হবে অতীতের ইতিহাস, জীবন্তকে বাঁচতে হবে মৃতের আদেশ মেনে?" কথাগুলি এক হিসাবে খুব মূল্যবান্। প্রাচীন কালের সৃষ্টিকলা যদি নবীন কালের সৃষ্টির পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়, তা হ'লে বর্ত্তমান জীবনে নবীন শিল্পধারার প্রবাহ শুষ্ক হয়ে যাবে, এবং সবচেয়ে যে কেজো কথা, আজকের দিনের শিল্পীরা অনশনে মারা যাবে। আজ আর কাল, অতীত ও বর্ত্তমানের দ্বন্দ্ব মেনে নিলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অতীতের ইতিহাস মুছে ফেলে, অতীত কালের মনীষীদের সৃষ্টি ধামা চাপা দিয়ে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনটাই গড়া যাবে না। প্রাচীন ওস্তাদ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টমালার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে, কোনও শিল্পসৃষ্টি সফল হ'তে পারে কি না, মনে একটা খটকা লাগল। এমন সময় আচার্য্য নন্দলালের আদর্শ চিত্রপুস্তক দু-খানা হাতে পড়ল। পাতা উল্টে দেখি যে, পুস্তক-প্রণেতা নিজের ওস্তাদী কলমে লেখা একখানি চিত্রও সন্নিবেশিত করেন নি, সবগুলি চিত্রই "অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে" চয়ন করেছেন। কারণ প্রাচীন ওস্তাদ-কলমের যথার্থ শ্রেষ্ঠ চিত্র নিত্য কালের বস্তু। এরা কালকে জয় ক'রে চিরকাল বেঁচে থাকবে, মানুষকে শিক্ষা দেবে, আনন্দ দেবে, ভবিষ্যতের প্রগতির পথে, সত্যের পথে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করবে। বিদেশের অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী প্রাচীন চিত্রগুরুদের ওস্তাদ-কলমের চিত্রাবলীর প্রশংসা ক'রে বলেছেন যে, এঁরা অমর—এবং রূপের জগতে পথ দেখাবার এঁরা অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক। তাঁদের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ "মৃতের আদেশ" নয়। জীবনের চলার পথেও কথাটা খাটে। জীবনের শিশুকালে ঐ পুরাতন বন্ধু ঐ বুড়োদের হাত ধরেই, আমরা হাঁটতে শিখি। এক শিশু অন্য শিশুর হাত ধরে টানাটানি করে বটে, কিন্তু তাতে কাজ এগোয় না, পদে পদে পতনের অঙ্কে হাস্যরসের নাটক গড়ে ওঠে। রেখা-শিল্পের এই আদর্শ পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় চয়নকার ষোলটি মুখ-চিত্র সন্নিবেশিত করেছেন, তার মধ্যে বারোখানি অজন্তার চিত্রমালার আদর্শ থেকে গৃহীত, দু-খানি ভারতের প্রাচীন প্রতিমার নিদর্শন, একখানি রাজপুত কলমের আর একখানি মোগল কলমের। শেষের দুটি বড় কৌশলে পাশাপাশি রেখে, চয়নকার রাজপুত ও মোগল কলমের পার্থক্য কি তাহা সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেকের বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের মুখ-কল্পনা একঘেয়ে বৈচিত্র্য-বিহীন মামুলী রীতিতে নিবদ্ধ ছিল। এই সংখ্যার ষোলটি বিভিন্ন রস ও ভাবের কল্পনা এই অভিযোগের সুন্দর প্রতিবাদ করেছে। শোক, দুঃখ, শঙ্কা, ক্রোধ, আশা, প্রেম, চ, উদ্বেগ ও শান্তিরস প্রভৃতি নানা রসের ও ভাবের চিত্র এক-একটি মুখ-চিত্রে ফুটে রয়েছে। আলো ও ছায়া বর্জ্জন ক'রে কেবল রেখা অবলম্বন ক'রে কত কথা বলা যায়, চিত্রগুলি ভারতের রূপবিদ্যার এই অদ্ভুত প্রকাশ-শক্তির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় সংখ্যায়, অজন্তার চিত্রমালা থেকে কয়েকটি "হস্তমুক্তাবলীর" মালা রচিত হয়েছে। প্রাচ্য দেশের চিত্ররীতির আদর্শে, কেবল মুখমণ্ডল নয়, দেহের সমস্ত অঙ্গই ভাব-প্রকাশের যন্ত্র। ভারতের দেবদেবীর প্রতিমায়, হাত ও পায়ের অঙ্গুলি-লীলায় এমন অনেক ভাব ও রস মূর্ত্তিগ্রহণ করে, যা মুখে ও চোখে প্রকাশ করা যায় না। আমরা বহু বৎসর নবীন সম্প্রদায়ের শিল্পীদের চিত্রে "লতানে আঙ্গুলের" উপহাস ও নিন্দা শুনে আসছি, কিন্তু, এই তরল ও সাবলীল অঙ্গুলিকল্পনার মূল্য কি, আজও তা বিচার করবার চোখ আমাদের খোলে নি। আচার্য্য নন্দলালের এই পুস্তকের সাহায্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের রূপবুদ্ধি সহজেই শিক্ষিত ও পরিণত হয়ে উঠবে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। কেবল বিদ্যালয়ের ছবির ক্লাসে নয়, নাচের ক্লাসেও—এই অঙ্গুলি-লীলার সুন্দর বাক্যপটু কথকতা কথক-নৃত্যের অনেক কথা অনায়াসে শিখিয়ে দেবে। এই দু-খানি আদর্শ পুস্তকের ছাপা, কাগজ, কালি ও মুদ্রণ-রীতি অনবদ্য সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সুরুচির পরিচায়ক। প্রচ্ছদপটের উপর পাঁশুটে কালিতে, নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিজের ওস্তাদ-কলমের একটি দেবী-পরিকল্পনার সুন্দর মৌলিক রেখাচিত্র ছাপা হয়েছে—চিত্রটি বড়ই মনোরম, দেখলে চোখ ফেরান যায় না। "রূপাবলী" আমাদের বিদ্যালয়ে এবং ছেলেমেয়েদের মনের কোণে রূপের আলো জ্বালবে, রূপের পথে এগিয়ে দেবে, এবং আগামী কালের নূতন নূতন রূপ-সাধক ও ওস্তাদ শিল্পীদের গড়ে তুলবে, যারা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রতিভার গৌরব, মর্য্যাদা ও খ্যাতি যুগে যুগে অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই পুস্তকের প্রকাশ বাঙালীর কৃষ্টির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাঙালীর শিক্ষার জগতে এটি একটি বহুমূল্য দান।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ— শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত।

বাংলা ভাষার এই বৃহৎ অভিধানখানির ৬৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা ১৮৭৬ এবং শেষ শব্দ "প্রলোকিন্"।

ড।

পিকপকেট—শ্রীআনন ঘোষাল প্রণীত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫৫, মূল্য এক টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর সমাদর যথেষ্ট থাকিলেও, সে আদরকে পরিতৃপ্ত করিবার মত কাহিনী রচিত হইয়াছে নিতান্ত অল্প। পুরাতন কালের কথা ছাড়িয়া দিলে—শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত ব্যোমকেশের কাহিনী ও ডায়েরীর কয়েকখানি বই ও অনুবাদ ছাড়া পড়িবার মত বই একেবারেই রচিত হয় নাই বলিলে

অত্যুক্তি হইবে না। উদ্ভটকল্পনাপ্রসূত নিতান্ত আজগুবি কাহিনীগুলি পড়িয়া সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি সে ধরণের নয়। শ্রীযুক্ত আনন ঘোষাল যিনিই হউন, তাঁহার ডিটেক্‌টিভ কাহিনী লিখিবার শক্তি ও অধিকার আছে এবং সাহিত্যরসবোধও যথেষ্ট আছে। আমাদের দেশের 'অপরাধী' শ্রেণীকে তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন—তাহাদের কথাবার্ত্তা, তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁহার আছে। আরও আছে তাঁহার অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। আবার প্রগতি ও প্রণবের এবং অত্যন্ত ঘৃণিত দুইটি নরনারী—করিম ও আমিনার কাহিনীর নিপুণ রচনার মধ্যে তাঁহার যথার্থ রসজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, পাঠকসমাজেও বইখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে করি। পুস্তকের ভূমিকাটি অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, এ ধরণের প্রবন্ধের আমাদের সাহিত্যে অভাব আছে।

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য যে অপরূপ রূপে রসে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ছোটগল্প সে রূপ ও রসের একটা বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে, এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণের মধ্যে সাহিত্যের অন্য বিভাগে রবীন্দ্র-প্রতিভা-সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইতে না পারিলেও ছোটগল্পের বিভাগে সুর বজায় রাখিয়াছে—একথা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। বিশেষ করিয়া শরৎ-উত্তর সাহিত্যিকগণ ছোটগল্পের আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন, সেখানে সত্যকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই সাহিত্যিকমণ্ডলীর প্রধানগণের অন্যতম এবং একটি অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নদীমাতৃক বাংলা দেশের মাটির মধ্যে করুণ রসের প্রাধান্য বেশী—ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতির জীবনে দুঃখবাদের সুর প্রবল এবং উচ্চ। সেই হেতু কৌতুকহাস্যের অনাবিল ধারা বাংলা সাহিত্যে ক্ষীণস্রোতা। শ্রদ্ধেয় পরশুরাম ও কেদারনাথ উভয়েই প্রবীণ; তাঁহারা এই শরৎ-উত্তর সাহিত্যিকমণ্ডলীর অগ্রজ এবং অগ্রণী। সুতরাং এই মণ্ডলীর মধ্যে বিভূতিবাবুই প্রধানতম ব্যক্তি যিনি হাস্যরসের স্রোতকে পরিপুষ্ট করিয়া বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই বাংলার পাঠকবর্গ দ্বিতীয় ভাগের জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সে প্রত্যাশা আমাদের পূর্ণ হইয়াছে।

'রাণুর দ্বিতীয় ভাগে' দশটি গল্প স্থান পাইয়াছে। সমস্ত গল্পের মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের ধারা খরস্রোতে প্রবাহিত, কোথাও গতিবেগ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আবার অগভীরতার লঘুতাও কোথাও নাই। বরং কোন কোন গল্পের মধ্যে তিনি হাস্যতরঙ্গের নীচে আর একটি বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিতে হয়, একটি রহস্যময় বেদনা বা উদাসীনতায় পাঠকের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 'ননীচোরা', 'যুগান্তর', 'বাদল' প্রভৃতি গল্পগুলি ইহার নিদর্শন।

হাস্যরসপ্রধান গল্পগুলির মধ্যে 'শিক্ষা-সঙ্কট' শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্প পড়া শেষ হইলেও হাসি থামে না। দারোগার পোষাক পরিহিতা ষ্টেশনের ছোটবাবুর নবোঢ়া পত্নী ও তাহার সম্মুখে বিস্ময়ে হতবাক্ কম্পিত পদে দণ্ডায়মান ভুঁড়িওয়ালা বড় বাবুর চিত্রটি চোখের উপর ভাসিতে থাকে; তামাকু মারীজী হুঁকা হাতে আসিয়া দাঁড়ান।

অন্যান্য গল্পগুলিও চমৎকার, প্রথম শ্রেণীর কৌতুকহাস্যরসের গল্প। কিন্তু এই হাস্যরস জীবনের উপরের স্তর হইতে সংগৃহীত নয়, তাহার উৎসমূল জীবনের গভীরতার মধ্যে। তাই গল্পগুলি মনের গভীরতর প্রদেশে আঘাত দেয়। যে পাত্রপাত্রী নিজেকে সকলের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, জীবনের কোন্ বেদনার প্রেরণায় সে তাহা করিতেছে সেই সত্যটির সুর সুকৌশলী শিল্পী সুরের খেলার মধ্যে স্থায়ী সুরের মত অস্ফুট ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত রাখিয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আগডুম বাগডুম—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও ৩৮, জনসন রোড, ঢাকা। মূল্য ছয় আনা।

বহু চিত্রে সুশোভিত ও রঙীন কালিতে সুমুদ্রিত এই বইখানিতে শিশুদের উপযোগী অনেকগুলি বিচিত্র ছড়া আছে। বইটি শিশুদের খুব ভাল লাগিবে মনে হয়, এবং অনেকগুলি ছড়া তাহারা মুখস্থ করিয়া ফেলিবে।:

বুভুক্ষা—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানী। ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আমাদের দেশে অনুবাদকদের একটি বিচিত্র অভ্যাস—মাসিক পত্রে বা পুস্তকাকারে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির অনুবাদে মূল লেখকের নামের পরিবর্ত্তে বিনা দ্বিধায় নিজের নামটি বসাইয়া দেওয়া। ইংরেজীতে ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার গ্রন্থের যে অনুবাদ আমরা দেখি তাহাতে লেখক হিসাবে মূল গ্রন্থকারের নামই থাকে, অনুবাদকের নাম অন্যত্র উল্লিখিত হয়। অনুবাদকার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া অনেকে বিশেষ যশস্বীও হইয়াছেন, তাঁহাদের নৈপুণ্য বিশেষ কৃতিত্বেরই সূচক। তাই বলিয়া তাঁহারা কেহ মূল গ্রন্থকারের প্রাপ্য স্থানটি অধিকার করিয়া বসেন নাই। এই বিচিত্র রীতি সম্বন্ধে কোন কোন সাহিত্যিক তীব্রভাবে আলোচনাও করিয়াছেন, কিন্তু চলতি রীতির বিশেষ কোনও বদল তাহাতে হয় নাই। যেমন আলোচ্য গ্রন্থখানি মূলতঃ কাহার লেখা, বিচিত্রিত মলাট বা টাইটেল-পেজ দেখিয়া তাহা জানিবার জো নাই (সেখানে গ্রন্থকাররূপে অনুবাদকের নামই আছে)। ভূমিকাটি না-পড়িলে তাহা জানা যায় না। অবশ্য আলোচ্য লেখক এ-পথে একাকী নন, বাংলায় ইহাই প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কিছু না ভাবিয়াই বোধহয় তিনি বা তাঁহার গ্রন্থের প্রকাশক তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

বহিখানি পড়িলে অনুবাদকের শক্তির বিশেষ প্রশংসা না-করিয়া থাকিতে পারা যায় না, রচনার গতি এরূপ সহজ সাবলীল। ভাষা কোথাও অনুবাদগন্ধী হয় নাই, পদে পদে মনে করিয়া রাখিতে হয় না যে অনুবাদ পড়িতেছি।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

হিন্দুজাতির পতনের কারণ—শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। পৃ. ১৮১। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে সমাজের অগ্রণী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সঙ্কীর্ণতার জন্যই হিন্দুর অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য

সাধু এবং যোগের সিদ্ধান্তেও খুব বেশী ভুল হয় নাই। কিন্তু লেখার মধ্যে বহু স্থানে বাহুল্যদোষ ঘটিয়াছে, তাই পুস্তকখানি সুপাঠ্য হয় নাই।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সত্যমপ্রিয়ম্—শ্রীযুণীন্দ্রকুমার মিত্র। ২৩, বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু বক্তব্য কাব্য হইয়া উঠে নাই। লেখক অপ্রিয় সত্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আশা করি আমাদের সে অধিকারও স্বীকার করিবেন। গ্রন্থখানি মহৎ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হয় নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মন্ত্রমুগ্ধ—"বনফুল"। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৮৫। মূল্য এক টাকা।

"মন্ত্রমুগ্ধ" যখন 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে থাকে তখন আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম। বইটি একখানি প্রহসন। প্রহসনের ধর্ম্ম মানুষের দুর্ব্বলতার দিকটা অতিরঞ্জিত করিয়া হাস্যের খোরাকে পরিণত করা। লেখক ইহাতে বেশ মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন। নাটক লেখা নিশ্চয় সহজ নয়; কিন্তু মনে হয় প্রহসন লেখা আরও শক্ত, কেননা মানুষের দুর্ব্বলতা কতটাতে জাগায় সহানুভূতি আর কতটাতে তোলে হাসির হিল্লোল, সে মাত্রাজ্ঞান না থাকিলে প্রহসন লেখা বিড়ম্বনা।

বইয়ের একটি প্রধান চরিত্র একটি কুকুর। তাহাকে ষ্টেজে তুলিয়া লেখক যে অবস্থাটি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সত্যই পরম উপভোগ্য।

পাত্রপাত্রীর কথাবার্ত্তায় কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই, তাহাতে দৃশ্যগুলি বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। তবে প্লটটি আর একটু ঝরঝরে করিলে বোধ হয় ভাল হইত।

রূপান্তর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩৭৬। মূল্য আড়াই টাকা।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহজিয়াপন্থীদের মূল তত্ত্ব এই সুদীর্ঘ উপন্যাস-খানির প্রতিপাদ্য। ইহার সহিত তন্ত্রের যে দিকটায় মিল আছে সে দিকটাও লেখক গ্রহণ করিয়াছেন। নেড়ানেড়ীদের উপদ্রবে সহজিয়াবাদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সাধারণতঃ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক যে সহজিয়া নিতান্ত সহজ নয়—সাধ্য, সাধনা বা সিদ্ধিতে—একথা বুঝাইবার লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের এ-বিষয়ে পাণ্ডিত্য যেমন গভীর, বিশ্বাসও তেমনই জোরাল, তাহার উপর তাঁহার ভাষা খুব সাবলীল; যাহা ভাবিয়াছেন, বুঝিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে কোথাও বাধে নাই। খুব হাল্কা দিক হইতে জীবনের গূঢ়তম রহস্যের কথা সবই তিনি বেশ সহজ শক্তিতেই প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মই যে-পুস্তকের প্রধান উপজীব্য, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের একটা আতঙ্ক থাকে। লেখক কিন্তু সব স্তরের পাঠকই যাহাতে তত্ত্বোপলব্ধি তথা রসগ্রহণ করিতে পারে সে-চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বইয়ের শেষ কয়টি অধ্যায়ে পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা সত্যই উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু প্রথম দিকে দুই-এক জায়গায় বৈষ্ণব-সাহিত্যসুলভ দূতী, অভিসার প্রভৃতি লইয়া শ্লীলতার সীমারেখা যেন ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গিল্টি ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং—শ্রীআশুতোষ মল্লিক। ১৫৫।১এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৩। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা ভাষায় কুটীরশিল্প-সম্বন্ধীয় পুস্তক অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইখানি সেই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। আলোচ্য বইখানিতে লেখক গিল্টি ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহার তড়িৎবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনিই এই পুস্তক-সাহায্যে ইলেক্ট্রোপ্লেটিঙের কারখানা স্থাপন করিতে পারিবেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

কাশবনের কন্যা—শ্রীকাঞ্চনী মুখোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই। ইহাকে এক দিকে কাহিনী-কবিতা, আর এক দিকে গীতি-কবিতার সমষ্টি বলা চলে। দরিদ্র চাষা নবীন তাহার আনন্দ-বেদনার সঙ্গিনী বধূ রাণু, তাহাদের সংসার এবং ছোট ছোট সুখদুঃখের কথা বইখানিতে সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। পড়িয়া লেখকের গভীর পল্লী-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

> আলের উপর লক্‌লকে ঘাস ঘন সবুজের ঢেউ
> ছোট দুটি পায়ে ঘুরে ফেরে রাণু, কাছে আর নাই কেউ;
> একটু দূরেই নবীন তখনো লাঙ্গল চালায় ক্ষেতে,
> রাণু আমাদের গঙ্গাফড়িং ধরল খেলায় মেতে।

তার পর—

> জীবনের পথ ভুল হয়েছিল,—বহুদিবসের পর
> রাণু ও নবীন ক্ষেতপানে যায় পার হয়ে বালুচর।

এমনি সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে 'কাশবনের কন্যা'র কবিতা চলিয়াছে। গীতি-কবিতার হিসাবেও বইখানির বিভিন্ন অংশ পাঠকের মনে রেখাপাত করিবে।

নীরাজন—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যভবন প্রেস, ২৭, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বইখানি পঁয়তাল্লিশটি গীতি-কবিতার সমষ্টি। প্রথম কবিতাটি 'কত রাত্রি'।

> এখনো কি রাত নিকষের মত কালো,
> দেশের পাপীরা ক্ষুৎপিপাসায় কাঁদে?
> এখনো কি পথে পড়ে নি উষার আলো—
> যুগের উদয়—সন্ধ্যার করাঘাতে!

'হে আত্মবিস্মৃত জাতি' কবিতাটিতে গভীর আবেগে লেখক বলিতেছেন,

> উৎসবের স্মৃতি রাখি কত যুগ হল অবসান
> হে আত্মবিস্মৃত জাতি! কর নাই তাহার সন্ধান।
> কল্পনার আন্দোলনে ভ্রান্তিভরা তব ইতিহাস,
> সিন্ধুপারে বসি যারা লিখিয়াছে করি উপহাস,
> তাহাদের লিপিগুচ্ছ ছিঁড়ে ফেল।

'শিপ্রাতটে', 'অগ্নিবীণা' প্রভৃতি এবং পল্লী-কবিতাগুলিতে মাধুর্য্য ও আবেগ আছে। দেশপ্রেমের আলোকে অনেকগুলি কবিতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

> তোমার চরণপদ্ম চিত্তে ধ্যেয়ে করি আরাধন,
> যুগের প্রদীপ জ্বালি' সাজায়েছি, তব নীরাজন।

কবিতাগুলির ছন্দে প্রবাহ আছে। পুস্তকখানি কাব্যামোদী পাঠকের ভাল লাগিবে।

খেয়াপারে—শ্রীশান্তি পাল প্রণীত। কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আট আনা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। বিভিন্ন ছন্দে রচিত এবং বিষয় ও ভাবের বিভিন্নতায় বিচিত্র চৌদ্দটি কবিতা আছে।

প্রথম কবিতা—পান্থ (উষা)।

উচ্ছলিয়া পূর্ব্ব ভাগে নভপ্রান্তসীমা
কোথা যাও একাকিনী মানস-প্রতিমা?

শেষের দিকের কবিতাটি পান্থ (সন্ধ্যা)।

ধ্যানমৌন গিরিতটে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
নিবিড় নির্জ্জন এই অরণ্যের তলে
একা আমি বসে আছি মৌন স্তব্ধতায়,
অসীমের পদপ্রান্তে, স্মৃতিটুকু জ্বলে।

'পৌষে' কবিতায় পৌষের পল্লী আনন্দময় বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানিতে 'ওয়াটার পোলো' প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ধরণের কবিতাও আছে। বৈচিত্র্যে, বর্ণনায় এবং কয়েকটির ছন্দের নূতনত্বে কবিতাগুলি পাঠকের অন্তরে আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মাটির পুতুল—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীমহাদেব মণ্ডল, নিউ বুক ষ্টল, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বইখানি বারোটি ছোটগল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলির লিখনভঙ্গি কাঁচা, আখ্যানভাগ অধিকাংশ স্থলেই শিশুসুলভ। প্রথম গল্পটি শিশুপাঠ্য পত্রিকায় প্রকাশ করা চলিত। শেষ দুইটি গল্প—"ভুল" এবং "স্বপ্ন" বিদেশী গল্পের অনুবাদ, লেখক ঋণ-স্বীকার করিয়াছেন। অনুবাদ আক্ষরিক হয়ত হইয়াছে, কিন্তু সুখপাঠ্য হয় নাই। বাকী গল্পগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটিকে চিনিলাম। "কারাবাস" গল্পটি মার্কিন লেখক ও. হেনরীর "The Cop and the Anthem" গল্প অবলম্বনে লেখা, যদিও লেখক ঋণস্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। উভয় গল্পেরই নায়ক কারাবরণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারিতেছে না। দুই জনেই রেস্তরাঁয় গিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া পয়সা দিল না—আশা, ম্যানেজার পুলিসে দিবে। উভয় ক্ষেত্রেই ম্যানেজার পুলিসের বদলে প্রহার দিয়া বিদায় করিল। উভয়েই দোকানের শো-কেসের কাচ ভাঙিল, এক জন একটি ছাতা, অপর জন একটি ব্যাগ লইয়া পলায়ন করিল, এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কথা, উভয়েই রাস্তার উপরে একটি মহিলাকে অপমান করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল মেয়েটি ঠিক "ভদ্রমহিলা" নয়। শেষ দিকে একটু তফাৎ আছে। ও. হেনরীর নায়কের কারাবাস হইল তিন মাস, বর্ত্তমান লেখক রমেশের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কমাইয়া দুই মাস করিয়াছেন। গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আছে। যেন তাহাতেই আমেরিকান গল্প এক মুহূর্ত্তে বাংলা হইয়া যাইবে!

বাংলা দেশে সাহিত্যিক চুরির (plagiarism এর) পরিমাণ একটু বেশী। এখানে পাঠক ভাল লেখার অনুবাদ পছন্দ করে না, কিন্তু জনকে বীরেন, সিল্‌ভিয়াকে অমলা করিয়া, ঘটনাস্থল লণ্ডন হইতে কলিকাতায় আনিয়া ফেলিলেই আর কোন আপত্তির কারণ থাকে না। ইহা সাহিত্যিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। ভাল বিদেশী লেখার নিপুণ অনুবাদ যে এই জাতীয় চুরি অপেক্ষা লক্ষগুণে গ্রহণযোগ্য তাহা আমাদের দেশের পাঠকবর্গ এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আলোচ্য বইখানিতে শেষ দুইটি গল্পসম্বন্ধে ঋণস্বীকার করায় ফলে পাঠকের ধারণা হইতে পারে বাকী দশটি মৌলিক,—যদিও কার্য্যতঃ তাহা নহে।

লেখকের রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। "মরীচিকা" গল্পের নায়কের মুখ দিয়া লেখক নারীজাতির সতীত্ব সম্বন্ধে যে অভব্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার নিজস্ব না হইলে আশ্বস্ত হইব। "দেহদান" কথাটির উপর লেখকের একটু অতিরিক্ত প্রীতি আছে মনে হইল।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

সাঙ্গীতিকী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। পৃ. ২৫৮।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। ইনি সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত গায়ক। ভারতীয় "দেশী সঙ্গীত" বিষয়ে ইঁহার প্রবন্ধ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক এই পুস্তকে পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনা হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিয়াও স্বভাবপ্রণোদিত উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে "মার্গসঙ্গীতে"র বিরুদ্ধে ভাবধারা অনুসৃত করিয়াছেন। "মার্গসঙ্গীতে" ভাষা অপেক্ষা সুরের আধিক্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। ইঁহার মতে "মার্গসঙ্গীতে" ভাষার সহিত সুরের সামঞ্জস্যের পরিমাণ ঠিক রাখা হয় না। কিন্তু 'সনাতনপন্থী'রা যে সঙ্গীতের ভাষাও রচনা করিতেন তাহা সুবিদিত; 'আলাপ' করিবার পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীতে ভাষার আবশ্যকতা বোধ করিতেন বলিয়াই সঙ্গীতের সৃষ্টি। আলাপ ও গানের বিভিন্ন সার্থকতা না থাকিলে শুধু আলাপেরই প্রচলন থাকিত। বক্তৃতার সময় যেমন ভাষায় মনোনিবেশ করা শ্রোতার পক্ষে অসঙ্গত নয়, সেইরূপ সঙ্গীতের সময় ভাষায় অধিক মাত্রায় মনোনিবেশ না করিয়া সুরের প্রাধান্য দেওয়া অসঙ্গত মনে হয় না। যে ভাষাতে ভাবপ্রকাশ হয়, সেই ভাষা দ্বারা যে সঙ্গীতরসের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ হয় ইহা সঙ্গীতের সনাতন-পন্থীরাও অস্বীকার করেন না।

বিভিন্নপন্থী সঙ্গীতজ্ঞেরা বিভিন্ন ভাবে সঙ্গীতের বিশ্লেষণ বা বিচার করিলেও সঙ্গীতের পূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক। সকলকেই যে এক ভাবে বা চিন্তায় পরিবদ্ধ থাকিতে হইবে ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

পুস্তকে বহু উদাহরণ থাকিলেও আলোচনার দিকেই পাঠকের মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। লেখক "মার্গসঙ্গীত" ও "দেশী সঙ্গীতে"র প্রকার-ভেদ ও স্বরূপ বিচার করিয়াছেন এবং সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা সহকারে সঙ্গীতের সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু পর্য্যালোচনা হয় নাই। সুতরাং উক্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। তবে সঙ্গীতানুরাগী জন-সাধারণ সংক্ষিপ্ত আলোচনার এই প্রকার একটি পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মাখন দেঁড়ে—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১১২ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা মাত্র।

ছোটদের জন্য লেখা বই। কাল্পনিক দুঃসাহসিক কর্ম্মের কাহিনী। ছেলেমেয়েরা পড়িয়া উপভোগ করিতে পারিলে গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরাও আনন্দ পাইব।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মৌমাছির কথা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মৌমাছির সহিত আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু পরিচয় আছে। মৌমাছি যখন ঝাঁক বাঁধিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মাথার উপর দিয়া দ্রুত উড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের স্পন্দিত লক্ষ পাখার বন্‌বন্‌ শব্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফুল ও ফলের বাগানে মৌমাছি যে ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে-কথা আমরা জানি। মুদীর দোকানে গুড়ের মটকির মুখ ঘিরিয়া এবং খাবারের দোকানে মিষ্ট রসের চারি ধারে তাহারা যে গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি তোলে তাহা কে না শুনিয়াছে? খেজুর-রসের জন্য গাছ চাঁচার পর "নলান" আরম্ভ হইলে এবং তালের রসের জন্য "মোচে" "ছে" পড়িলে সেখানেও ইহারা গুঞ্জনধ্বনি তোলে।
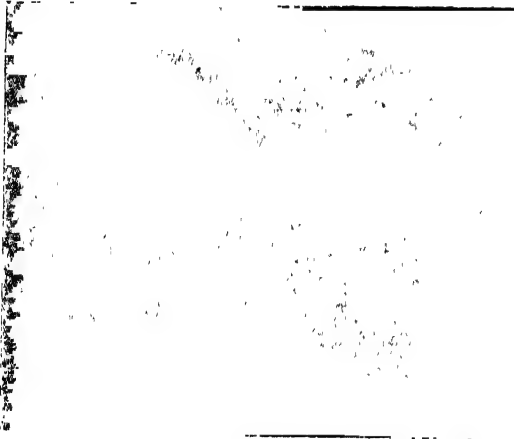
প্রবন্ধকার খাদিপ্রতিষ্ঠানের মধুমক্ষিকাশালার একটি চাক লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

মৌমাছি সামাজিক ক্ষুদ্র প্রাণী। এক এক দঙ্গলে হাজার হাজার মাছি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে সুসঙ্গত সুনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র বর্তমান। মক্ষিসমাজে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। কোনও ব্যক্তিগত আহার্য্য দ্রব্য ইহারা সংগ্রহ করে না। মৌচাকই ইহাদের বাড়ী। এইখানে ইহারা দিবারাত্র নিরন্তর কাজ করিতেছে। প্রকারভেদে মৌমাছিরা নিজ বাসগৃহের জন্য এক বা একাধিক চাক প্রস্তুত করে।

মধুসংগ্রহের পুরাতন প্রথা

ভারতবর্ষে মৌমাছি অনায়াসলভ্য। এক শ্রেণীর লোক যাহাদের ব্যবসাই হইতেছে বন্য চাক হইতে

সোদপুরে খাদিপ্রতিষ্ঠানের মৌশালা। পাঁচ ফুট দূরে দূরে মক্ষিগৃহগুলি স্থাপিত।

মধু সংগ্রহ করা। স্থানভেদে ইহাদিগকে "বাউলে", "মধুভাঙ্গা" বা "করোড়িয়া" বলে (হিন্দিতে "করোলা" অর্থ শিকারী)। করোড়িয়াগণ চাক-শিকারের উদ্দেশ্যে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শহর ও গ্রাম অঞ্চল হইতেও ইহারা মধু সংগ্রহ করে। গৃহস্থ-বাড়ীর চাকের সন্ধান লইয়া, চাক ভাঙিয়া গৃহস্থকে অর্দ্ধেক মধু দেয়, অপর অর্দ্ধেক নিজেদের জন্য রাখে। বালতিতে চাকসহ মধু লইয়া গ্রাম্য পথে এবং শহরের রাস্তায় ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ইহাদিগকে প্রায়ই ঘুরিতে দেখা যায়। চাক ভাঙিবার শ্রমস্বীকারের বিনিময়ে ইহারা মধু সংগ্রহ করে। মৌমাছির কাচ্চাবাচ্চা ও ডিমসহ এই চাক চটকাইয়া ইহারা মধু বাহির করিয়া লয়।

বাংলা দেশের সুন্দরবন বাঘা মাছিতে (Rock Bee) পূর্ণ। সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই সুন্দরবন পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে চব্বিশ-পরগণা, খুলনা এবং বরিশাল জেলার দক্ষিণ অংশে
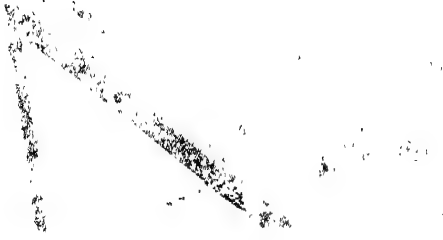
বসন্তকালে মৌমাছির দল বাহির হইয়াছে

অবস্থিত। চৈত্র-বৈশাখে স্থানীয় লোক এক এক দলে তিন-চারি জন মিলিত হইয়া মধুসংগ্রহের জন্য নৌকায় সুন্দর-বনে যায়। আন্দাজ-মত যত মণ মধু সংগ্রহ করিবে তাহারই উপর বন-বিভাগকে মণ-প্রতি নির্দ্দিষ্ট শুল্কের টাকা জমা দিয়া ইহারা বনে প্রবেশ করে। বনে মধুসংগ্রহের অনুমতি কেবল চৈত্র-বৈশাখেই পাইয়া থাকে। চাক ভাঙার পর ফিরিবার পথে মধুর ওজন লইয়া বাড়তি মধুর জন্য প্রাপ্য শুল্ক আদায় করা হয়। তিনটি ভাটা নৌকা চালাইয়া গেলে তবে মধুবনের সন্ধান পাওয়া যায়। মৌমাছি উড়িবার পথ দেখিয়া সংগ্রাহক দল চাকের সন্ধান লয়। গাছের তলায় চাকের নীচে শুকনো পাতা ও অন্যান্য জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া দিনের বেলাতেই উহাতে আগুন দিয়া পর্য্যাপ্ত ধোঁয়া দ্বারা মাছি তাড়াইয়া দেয়। ধোঁয়া দিয়া লোকগুলি ঐ স্থান হইতে সরিয়া পড়ে। মাছি উড়িয়া চলিয়া যাইবার আনুমানিক কাল অপেক্ষা করিয়া উহারা সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে ও চাক ভাঙিয়া লয়। দিনের পর দিন এই ভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া, মাছির সন্ধান লইয়া, চাক ভাঙিয়া মধু সংগ্রহ করে। কার্য্য বিপজ্জনক ও পথ বিপৎসঙ্কুল। এখান হইতে সমুদ্রের ডাক শোনা যায়। দক্ষ লোক ছাড়া এই কাজে অপর কেহ বড় যায় না। ইহারা বাঘা মাছির কামড়ে বিপন্ন হয় এবং বাঘের মুখে পড়িয়াও প্রাণ দেয়।

চাক চটকাইয়া ও চাপিয়া মধু বাহির করা হয় এবং পাত্র পূর্ণ করা হয়। এই ভাবে পাঁচ, সাত বা দশ মণ মধু সংগ্রহ করে। যাতায়াতে ইহারা চৌদ্দ দিনের ভিতর বাড়ী ফিরিয়া আইসে। গ্রামে বা শহরে ফিরিয়া যেমন সুবিধা পায় মণ-প্রতি সাত-আট টাকা মূল্যে মধু বিক্রয় করিয়া দেয়। মাছির ডিম ও বাচ্চাপূর্ণ চটকান চাক হইতে সংগৃহীত এই মধুই বাজার চলতি। ব্যবসায়িগণ এই মধু সারা-বছরের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। বোতলে এই মধু রাখিলে কিছু দিন পরে ফট করিয়া আওয়াজ করিয়া ছিপি উপরে ছুটিয়া যায়। ছিপি শক্ত করিয়া আঁটা থাকিলে বোতল ফাটিয়া মধু বাহির হইয়া পড়ে। ইহা মধুর তেজের লক্ষণ নয়। গাঁজিয়া-যাওয়া মধু হইতে উৎপন্ন গ্যাস এই বিপদ ঘটায়। বুদ্ধিমান্ লোক ছিপির মুখ ঢিলা করিয়া রাখিয়া দেন যাহাতে এই অনর্থ না ঘটিতে পারে

মক্ষিপালনের পুরাতন পদ্ধতি

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে মক্ষিপালনের রীতি চলিয়া আসিতেছে, যদিও এই পালন-পদ্ধতি অত্যন্ত স্থূল

সোদপুর খাদিপ্রতিষ্ঠানের মক্ষিগৃহ

এবং অসংস্কৃত। কাঠের কুঁদা ঢোলকের মত ভিতর ফাঁপা করিয়া, দুই পাশে দুইখানি কাঠের চাকতি গোবরমাটি দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। একখানি চাকতিতে বুড়ো আঙুলের মত ফাঁদের একটি ফুটো থাকে। এই ফাঁপা গুঁড়িতে মাছি বাস করে এবং উক্ত ফুটা দিয়া যাতায়াত করে। মৌমাছি বাসের জন্য এই প্রকার কাঠের কুঁদা ও মাটির কলসী গাছের ডালে, বারান্দার নীচে ছাঁচের তলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও মেটেকোঠার মাটির দেয়ালে কাৎ করিয়া কলসী পুঁতিয়া রাখা হয়। কলসীর মুখ ঘরের ভিতরের দিকে রাখিয়া সরা বা নারিকেলের মালা দিয়া বন্ধ করিয়া মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়। কলসীর তলায় একটি ফুটা করিয়া উহা বাহিরের দিকে রাখা হয়।

মক্ষি-আবাসের উপরের কামরার চাক—মধুতে পূর্ণ। মৌমাছিগুলি বসিয়া আছে।

এই ফুটা দিয়া মৌমাছি বাহিরের দিক্ হইতেই কলসীর ভিতর যাতায়াত করে। বসন্তকালে ঝাঁক ছাড়িয়া মৌমাছি যখন বাহির হইয়া পড়ে তখন এই সকল কৃত্রিম আবাসে আশ্রয় লয়, চাক বাঁধে, মধু সংগ্রহ করে। বস্তুতঃ এই মক্ষি-আবাসগুলিকে (hives) "লোভানি-আবাস" (decoy hives) বলাই ভাল, কেননা একটি ভাল লুকান স্থানের প্রলোভন দেখাইয়া মাছিগুলিকে ঐ স্থানে আশ্রয় লইতে প্ররোচিত করা হয়।

মধুসংগ্রহকালে ধোঁয়া দিয়া মৌমাছিগুলিকে এক দফা তাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ধোঁয়ায় এবং আগুনের আঁচে কতক মৌমাছি মরে, কতক উড়িয়া যায়। সংগ্রাহক মুখে খানিকটা তুলসী পাতা চিবাইয়া লয়, মাথার উপর একটা পাতলা চাদর ফেলিয়া দেয়, ডান হাতের কনুই পর্য্যন্ত

মৌমাছিসহ কাঠামো।

মোটা কাপড় জড়াইয়া খানিকটা তুলসীর পাতা রগড়াইয়া লয় এবং হাত ভিতরে ঢুকাইয়া নির্ম্মম ভাবে চাকগুলি ভাঙিয়া বাহির করিয়া থালায় তুলিয়া লয়। চল্‌তি ভাষায় ইহাই হইল "মন্তর"। তুলসীপাতার গন্ধ উগ্র। মুখে চোখে হাতে মাছি বসিলে ফুঁ দেওয়ায় তুলসীর উগ্র গন্ধে মৌমাছি উড়িয়া যায়। এমন দক্ষ লোকও আছে যাহারা পাতা-ডালসহ তুলসীর ঝাড় হাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করাইয়া মাছি তাড়াইয়া দেয়, তুলসীর রস হাতে মাখিয়া ঐ হাতই ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং হুলের বিষ যথাসম্ভব সহ্য করে।

চাকগুলি চটকাইয়া নিংড়াইয়া মধু বাহির করা হয়। চাকে মাছির হাজার হাজার কাচ্চাবাচ্চা ও ডিম থাকায়, মধু নিংড়াইবার সময় উহার রসও মধুর সহিত মিশিয়া যায়। মধুসংগ্রহের এই পদ্ধতি যেমন অসংস্কৃত তেমনই নির্ম্মম। খাদ্যের অনুপযোগী বলিয়া এই প্রকারে সংগৃহীত মধুর এক ফোঁটাও বিদেশে রপ্তানি হয় না। ইহার সমস্তটাই শহর ও গ্রামের মুদীর দোকানে ও অপরাপর বিক্রেতার নিকট চলিয়া যায়। এই মধু অতি অল্প দিনে গাঁজিয়া যায় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে মক্ষিপালন আরম্ভ করিলে এক দিকে মৌমাছিগুলি অহেতুক অকাল মৃত্যু

হইতে বাঁচিবে, অপর দিকে বিশুদ্ধ মধু উপযুক্ত মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করিবার একটা পন্থা পাওয়া যাইবে। বাংলায় "কমলা মধু" নামে যাহা পরিচিত তাহাও একই চটকানো পদ্ধতিতে সংগৃহীত।

আধুনিক পদ্ধতি

অধুনা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি পালন করা হইয়া থাকে এবং চাক, মৌমাছি, কাচ্চাবাচ্চা ও ডিম

কাঠামোর উপর দিকে মৌ-কোষগুলি দেখা যাইতেছে।

নষ্ট না করিয়া মধু সংগ্রহ করা হয়। মৌমাছিগুলিকে কৃত্রিম মক্ষিগৃহে রাখা হয়। এইখানে উহারা খুব আরামে বাস করে। মক্ষিপালক মক্ষিগৃহ হইতে চাকগুলি একটি একটি করিয়া হাতে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। চাকে মধু সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, মাছির জন্য চাকে পর্য্যাপ্ত মধু রাখিয়াও আবাসের ভিন্ন চাক হইতে মক্ষিপালক মধু সংগ্রহ করিতে পারেন।

এই মক্ষিগৃহ একটি বিশেষ ভাবে প্রস্তুত বাক্স। এইখানে মক্ষিপালক অপূর্ব্ব কৌশলে এবং অত্যন্ত নিপুণতার সহিত মৌমাছিকে নিজ আয়ত্তে রাখিয়া অধিক পরিমাণে মধু সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন এবং চাকের ও মাছির অনিষ্ট না করিয়া উদ্বৃত্ত মধু আহরণ করেন। চাক নির্ম্মাণের জন্য স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী কাঠামো (removable frame) ব্যবহারের প্রথা অবলম্বন করায় এই প্রকারে মধুসংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে। ১৮৫১ সালে আমেরিকায় ল্যাঙ্গোষ্ট্রথ সাহেব ইহা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই ব্যবস্থায় হাজার হাজার মৌমাছি চাকে বসিয়া থাকিলেও চাক তুলিয়া দেখা, চাকে মক্ষিরাণীর সন্ধান লওয়া, মক্ষিগৃহ পরীক্ষা করা, এক আবাস হইতে অন্য আবাসে চাক স্থানান্তরিত করা, মক্ষিদল (colony) কৃত্রিম উপায়ে বিভক্ত করা, ঝাঁক (swarm) ছাড়া বন্ধ করা ও নিজ আয়ত্তে আনা, এক আবাস হইতে রাণীকোষ (queen cell) তুলিয়া আনিয়া অপর আবাসে জুড়িয়া দেওয়া (grafting), নূতন মক্ষিরাণী তৈরি করা এবং পালকের নিজ ইচ্ছামত মৌমাছিকে ব্যবস্থিত করা সম্ভব হইয়াছে।

কৃত্রিম মক্ষিগৃহ

কাঠের তৈরি চতুষ্কোণ কাঠামোতে মৌমাছিকে চাক তৈরি করিতে দেওয়া হয়। মাছির শ্রম ও সময় লাঘবের জন্য মোমের পাতলা চাদরের উপর মৌমাছির চাকের ছয়কোণা ঘরে (hexagonal cell) ছক্ বা বুটি তুলিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম চাক (comb foundation) কাঠামোয় আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার পত্তনি চাকে মৌমাছিরা অতিদ্রুত পূর্ণরূপে কোষগুলি তৈরি করিয়া ফেলে। এই ব্যবস্থায় চাক সোজা হয়, কোনও প্রকারে বাঁকা বা বে-দাঁড়া হয় না। মোমের তৈরি চাক অত্যন্ত পল্‌কা এবং মধু অত্যন্ত ভারি। এই জন্য মৌমাছিরা নিজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই চাক যেখানে বাঁধা থাকে, চাকের উপরের দিকে সেই স্থান দিয়া ছোট-ছোট কোষগুলিতে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে যাহাতে মধুর ভারে চাক ভাঙিয়া না পড়ে। কেননা চাকের নীচের দিকে মধু সঞ্চয় করিলে চাক ভাঙিয়া পড়িবে। কৃত্রিম মক্ষিগৃহনির্ম্মাণকালে মৌমাছির এই স্বাভাবিক বুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

কৃত্রিম মক্ষি-আবাসে সাধারণতঃ দুইটি কামরা থাকে, একটি নীচে ও অপরটি উপরে। নীচের কামরাটি বড়, ইহা বাচ্চা পালনের জন্য। উপরেরটি ছোট, ইহা একমাত্র মধু সঞ্চয়ের জন্য। উপরের কামরায় রাণী ডিম পাড়ে না বা পাড়িতে দেওয়া হয় না। নীচের কামরায় চাকগুলির

কতক কতক কোষে, এখানে সেখানে এবং চাকের উপরের দিকে দুই-তিন ইঞ্চি চওড়া একটানা ভাবে মধু সঞ্চিত থাকে। এই মধু মৌমাছিদের নিজ ব্যবহারের জন্ম রাখিয়া দেওয়া হয়।

মধু নিষ্কাশনের জন্ম মক্ষিপালক উপরের কামরার চাকগুলি বাহির করিয়া লয়েন। উহা হইতে মাছিগুলি ঝাঁকানি দিয়া ঝাড়িয়া নীচের কামরার কাঠামোগুলির উপর ফেলিয়া দেন। চাকের কোষগুলিতে মধু পূর্ণ হওয়ার পর মুখ আঁটা হইয়া গেলে আবরণগুলি বিশেষ ছুরির সাহায্যে পাত্‌লা করিয়া কাটিয়া তুলিয়া নিষ্কাশন-যন্ত্রের (honey extractor) সাহায্যে মধু বাহির করিয়া লয়েন। খালি চাক পুনরায় উপরের কাম্‌রায় রাখিয়া দেওয়া হয়। সাত দিন বা ঐ রকম সময়ে চাক মধুপূর্ণ হইলে আবার নিষ্কাশন চলে। যত দিন মধু পাওয়া যাইবে নিষ্কাশন চলিতে থাকিবে।

অপর দেশে মক্ষিকাপালন

আমেরিকা ও ইউরোপে আধুনিক উপায়ে মক্ষিকাপালন. স্থায়ী ব্যবসা হিসাবে চলিতেছে। এই কার্য্যে আমেরিকা অগ্রণী। প্রায় শত বর্ষ হইল তাহারা মক্ষিপালন করিতেছে। ইংলণ্ডেও এই কাজ পঞ্চাশ বৎসরের উপর চলিতেছে। ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ এবং ইহার আয়তন বাংলা দেশের অনুরূপ। ইংলণ্ডে বৎসরে ২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মধু উৎপন্ন হয়। ১৯২৯ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে উৎপন্ন মধুর ওজন ছিল ৩৪,৩০০ হন্দর। নিজ দেশে উৎপন্ন মধু ছাড়া তাহারা বছরে আরও ১০০,০০০ হন্দর মধু বাহির হইতে আমদানি করে। ইহার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র পুনরায় রপ্তানি হয়।

ইংলণ্ড আপন ব্যবহারের জন্যই মধু উৎপন্ন করে এবং ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌, চিলি, রাশিয়া, কিউবা, স্যানডমিঙ্গো, নেদারল্যাণ্ড, হাইটি ও ফ্রান্স হইতে মধু সংগ্রহ করে। অন্যান্য দেশও ইংলণ্ডে মধু রপ্তানি করে, কিন্তু তাহাদের পরিমাণ বেশী নয়। প্যালেষ্টাইন হইতেও মধু ইংলণ্ডে যায়।

ইংলণ্ডে জন-প্রতি মধুর বার্ষিক খরচা মাত্র চার আউন্স। কানাডাবাসীর মাথাপিছু মধুর খরচা বছরে দুই পাউণ্ড, নিউজিল্যাণ্ডে ইহার চেয়েও বেশী। ইংলণ্ডে মধু-রপ্তানিকারীদের মধ্যে ইউনাইটেড স্টেটস্‌ সর্ব্বপ্রথম, তার পরই নিউজিল্যাণ্ড। অন্যান্য দেশের বিশদ বিবরণ আলোচনা ছাড়াই, কেবল উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতেই বুঝা যায় খাদ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য হিসাবে দুনিয়ার বাজারে মধু কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতবর্ষে মক্ষিপালনের উপযোগিতা

ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে মধু আমদানি করে। আধুনিক প্রণালীতে মক্ষিপালন আরম্ভ করিলে এই
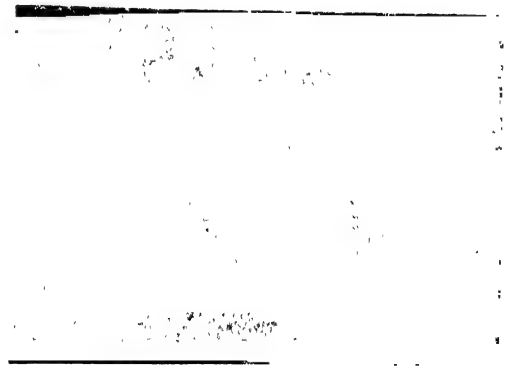
দক্ষিণ-ভারতে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত
এক ধরণের কাঠামো।

আমদানি বন্ধ করা যায়। সরকারী রিপোর্ট হইতে আমদানী মধুর পরিমাণ, টাকায় বা ওজনে, জানা যায় না, কেননা শুধু মধুর খাতে বিশেষ হিসাব রাখা হয় না। দক্ষিণ-ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে কতক পরিমাণে মক্ষিপালন হইয়া থাকে, কিন্তু অপর দেশের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। মক্ষিপালনে ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর গবর্ণমেণ্টের উত্তম প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষের মত বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে অফুরন্ত বনসম্পদ্‌ ও মধুপ্রদানকারী গাছ ও লতাগুল্ম থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মধুর বাজারে তাহার স্থান নাই। ফুলে ফুলে পর্য্যাপ্ত

মধু সঞ্চিত থাকিলেও উপযুক্ত পদ্ধতিতে মধু-আহরণ দ্বারা জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি না করিয়া ভারতবাসী ইহা বছরের পর বছর নষ্ট হইতে দিতেছে, ইহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভারতবর্ষে মক্ষিপালনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত। মৌমাছি আছে, কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে উহাকে কাজে লাগাইয়া বিশুদ্ধ মধু সংগ্রহের উপায় আমাদের জানা না

একটি চাক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

থাকায় এই সম্পদ্ নষ্ট হইতেছে। উন্নত প্রণালীতে মক্ষিপালনের সরঞ্জাম আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এই কার্য্যে বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার সুবিধাও আমাদের নাই। সচেষ্ট মক্ষিপালককে তাহার নিজেরই আন্দাজমত, নিজ সুবিধা অসুবিধার ভিতর দিয়া ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়।

আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যাপক ব্যবসায় হিসাবে ও কুটীরশিল্প-হিসাবে মক্ষিপালন করা হইয়া থাকে। আমেরিকার বড় বড় মক্ষিশালায় একত্র এক হাজার মক্ষি-আবাস বিরল নয়। ইংলণ্ডের অনেক মক্ষিশালায় এক শত এবং তদূর্দ্ধ বাক্স মাছি পালিত হয়। এই সকল দেশে নানা প্রকার অনুসন্ধান, গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা মক্ষিপালন-কার্য্যের উন্নতি এবং বিষয়টি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ সকল দেশে উহার বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত। আইনের দ্বারা ভেজাল বন্ধ এবং মধুর শ্রেণী-বিভাগ বিধিনির্দ্দিষ্ট। মক্ষিকাপালন, মধুনিষ্কাশন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বহুতথ্যপূর্ণ অনেক পুস্তক আছে। বহু ব্যবসায়ী আছে যাহারা সরঞ্জাম প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। ঐ সকল দেশে ডাকযোগে মাত্র একটি মক্ষিরাণী কিনিতে পাওয়া যায়। মৌমাছির ঝাঁক ওজন-দরে বিক্রয় হয়। মক্ষিপালক ইচ্ছা করিলে ডিম্বপ্রসূ-মক্ষিরাণী এবং কাচ্চাবাচ্চাযুক্ত চাকসহ মক্ষিদল কিনিয়া লইতে পারেন। রেল-পার্শ্বেলে জীবন্ত মাছি চালান দিবারও ভাল ব্যবস্থা আছে। এক কথায় মক্ষিপালন-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মৌমাছি-পালন শিক্ষা করা একটা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। হুল ছাড়া মৌমাছির অন্যান্য আচার-ব্যবহার ও চালচলনের সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় না থাকায়, একটা নূতন কুটীরশিল্প হিসাবে এই কার্য্যের প্রাথমিক যে অসুবিধা তাহা ত আমাদিগকে পাইতেই হইবে। শতবর্ষের উন্নতির ভিতর দিয়া আমেরিকা যখন এই ব্যবসায়কে একটা স্থায়ী বনিয়াদে দাঁড় করাইয়াছে, তখনও, শতবর্ষ পরেও আমরা আজ এই শিল্পের কিছুই জানি না। কৃষিপ্রধান দেশের সমস্ত সুবিধা লইয়া, বনে বনে এবং গৃহস্থবাড়ীর আনাচে-কানাচে অগণিত মৌমাছির কর্ম্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা ইহার চলাফেরা বা মধুসঞ্চয়ের কোনও রীতির সহিত বা ইহার কোনও কিছুর সহিত পরিচিত নহি। যদি আমরা আন্তরিকতার সহিত মক্ষিপালনকার্য্য ধরি, তবে এই দেশের ছেলেপিলেরা জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাভীর সহিত যেমন পরিচিত হয়, তাহাকে চিনে, বুঝে, তাহার দুধের সন্ধান রাখে, তেমনই ছোটবেলা হইতে দেখিয়া দেখিয়া মৌমাছির সহিতও তাহাদের একটা স্বাভাবিক পরিচয় হইয়া যাইবে। আমাদের জানা দরকার যে, এক মুঠা মৌমাছিরও অনেকখানি মূল্য আছে। উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে ঐ এক মুঠা মৌমাছিকে ভাল মক্ষিদলে পরিণত করা যায় এবং তাহাদিগকে বাঁচাইবার মূল্যস্বরূপ মক্ষিপালককে তাহারা সুস্বাদু ও সুগন্ধি মধু উপহার দিতে পারে।

মক্ষিপালন

মৌমাছিপালনকার্য্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যাহা

পালককে মুগ্ধ করে, তাহার আহার-নিদ্রা ভুলাইয়া দেয়। কমবেশী দুই মাইল পাল্লার মধ্যে ফলফুলের বাগান আছে এই রকম যে কোনও স্থানে, পল্লীগ্রামে বা শহরে, মৌমাছি পালন করা যায়। মধুসংগ্রহের জন্য মাছির দৌড়ের পাল্লা যত কম হইবে, মধু তত ভাল সংগ্রহ হইবে। আধ মাইলের বেশী ছুটিতে না হয় এই রকম স্থান হইলে সব চেয়ে ভাল। হয়ত অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে কলিকাতা শহরেই বিভিন্ন জাতের মৌমাছির বুনো চাক আছে। কলিকাতা কালীতলা-অঞ্চলে লেখকের এক বন্ধুর বাড়ীতে বছর দুই পূর্ব্বে একটি বুনো চাক ধরিবার তাহার সুযোগ হইয়াছিল। চিৎপুর, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং বহুবাজারের ফুলবিক্রয়ের খোলা স্টলগুলিতে এক বার দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় যে, ঐ তোলা ফুল হইতেও মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করিয়া হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে।

গৃহস্থ তাঁহার নিজ বাড়ীর ব্যবহারের জন্য মক্ষি-পালন দ্বারা মধু সংগ্রহ করিতে পারেন এবং উদ্বৃত্ত মধু বিক্রয় দ্বারা আয়ের সাহায্য হইতে পারে। মধুসংগ্রহ ছাড়াও, ছোট বাচ্চাদের খাওয়াইবার জন্য মৌমাছি ফুলের পরাগ সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ফুলে ফুলে এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ইহারা ফল ও শস্য উৎপাদনকারীর মহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকে। এ-ফুল হইতে ও-ফুলে পরাগ বহনের জন্য গাছের ফল বড় ও সুডৌল হয় এবং কৃষিজাত শস্যের দানা সুপুষ্ট এবং বড় হয়।

ত্রিচিনপল্লীর রেভারেণ্ড ফাদার নিউটন প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্রিম মক্ষিগৃহে "ভারতীয় মৌমাছি" পালন করিয়া উদ্বৃত্ত মধু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যে কাঠামো (British Standard Frame) ব্যবহার হয়, উহার প্রায় অর্দ্ধেক মাপের কাঠামোর তিনি প্রবর্ত্তন করেন। ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফ্রেমের মাপ লম্বায় নীচের কাঠি ১৪ ইঞ্চি এবং পাশের কাঠি ৮॥ ইঞ্চি। উপরের কাঠি লম্বায় ১৭ ইঞ্চি, চওড়া সাতসুতো এবং তিনসুতো পুরু। ভারতীয় মৌমাছি পালনের প্রথম চেষ্টার সময় উদ্যোক্তারা হয়ত এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মক্ষিরাণী ইউরোপীয় রাণীর মত তত অধিক পরিমাণে ডিম প্রসব করিবে না এবং বড় কাঠামো দিলে চাক তৈরি এবং বাচ্চাদের আহারের জন্য মধু সংগ্রহের পর হয়ত পালকের জন্য তেমন কিছু উদ্বৃত্ত মধু থাকিবে না। ভারতীয় মৌমাছি হয়ত তেমন মধুসংগ্রাহকও হইবে না। কাঠামো-নির্ব্বাচনকালে হয়ত তাঁহারা এই প্রকার ধারণার বশে ছোট মাপের কাঠামো উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। মধু আহরণের জন্য স্থানবিশেষ তেমন উপযুক্ত না হইলে, অর্থাৎ মধুদানকারী ফলফুলযুক্ত গাছের তেমন পর্য্যাপ্ত সমাবেশ না হইলে ছোট কাঠামোই ভাল। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফ্রেম ভারতবর্ষে যেখানে ব্যবহার হইতেছে, সেখানে উহাদ্বারা ভাল ফলই পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-ভারতে ছোট কাঠামোই বিশেষ আদৃত।

মধুর উৎপাদন পরিমাণ

মধুর উৎপাদন ঋতুবিশেষের উপর, মধুদানকারী লতাগুল্ম বৃক্ষাদির উপর এবং ক্ষেত্রস্থ ফুলের উপর নির্ভর করে। আম, জাম, লিচু, নারিকেল, তেঁতুল, কমলা, করঞ্জা, বাতাবি, কুল ইত্যাদি গাছের ফুল হইতে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। বনজঙ্গলের শিমুল, নিম, মহুয়া, নাগকেশর, হিজল, গোঁয়া, বান ইত্যাদি গাছের ফুল হইতে মধু সংগৃহীত হয়। কৃষিক্ষেত্রস্থ সরিষা ইত্যাদি বহুবিধ ফুল হইতে মধু আহরিত হয়। ফুলবাগানের গাঁদা, গোলাপ, এণ্টিগোনন্, নষ্টারশিয়াম, সিঙ্গল্ পপি প্রভৃতি মৌমাছিদের প্রিয়। মাটির সহিত মিশিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় এমন গাছ যেমন পুনর্নবা ইত্যাদির ক্ষেতে সকাল বেলায় মাছি ভরিয়া থাকে। পারুলের অপর নাম—মধুদূতী এবং অলিবল্লভা। ইহা উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক। আমের অন্য নাম—মধুদূত এবং পিকবল্লভ। ইহাদ্বারা বসন্ত কালের ও মধু আহরণের সময় সূচিত হইতেছে। উদ্বৃত্ত মধু একমাত্র বসন্তকালে মধুমাসেই সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মোটামুটি হিসাবে একটা ছোট মক্ষিগৃহ হইতে পাঁচ হইতে দশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মধু আহরিত হয়। যে-অঞ্চলে মৌ-শালা (apiary) অবস্থিত ঐ অঞ্চলের মধুদানের যোগ্যতা এবং পালকের দক্ষতার উপর মধুর পরিমাণ নির্ভর করে। পরীক্ষামূলক ছোটখাট ব্যবস্থার এবং অবসরকালে

কাজের জন্য দুইটি মক্ষিগৃহ লইয়া পালনকার্য্য আরম্ভ করা ভাল। পালক যেমন যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন এবং যে পরিমাণ সময় দিতে পারিবেন, মক্ষিগৃহের সংখ্যা সেইমত বাড়াইয়া যাইতে পারিবেন। এই কার্য্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই ভাল, কেননা সমস্ত জিনিষটা পালকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যদক্ষতার উপর নিভর করে। অপর কোনও সোজা এবং সহজসাধ্য রাস্তা নাই। ইহা নিশ্চিত জানিয়া রাখা ভাল যে, প্রথমেই ডজনখানেক আবাসে মাছি পুষিয়া কাজ আরম্ভ করিলে অনভিজ্ঞাবশতঃ কতকটা বিফলতার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন। এই কার্য্যে কর্ম্মকুশলতা যেমন যেমন আয়ত্ত হইবে, কার্য্য সম্বন্ধে নিজের উপর যেমন যেমন বিশ্বাস বাড়িবে, মাছির সঙ্গে যেমন যেমন পরিচয় হইবে, সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ নিজের প্রথম আহরিত মধু পালকের সমস্ত দেহ ও মনে যে উন্মাদনার সঞ্চার করিবে, সেই শ্রমসাফল্যের প্রথম গৌরবই তাহাকে তাহার আরব্ধ কাজে যথাযোগ্য দ্রুততার সহিত লইয়া যাইবে। কার্য্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথাও আটকাইয়া গেলে, পুস্তকের সাহায্য ছাড়াও এই কার্য্যে রত পরিচিত বন্ধু ও দক্ষ পালকের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন হইতে পারে। পূর্ব্বকথিত দুইটি মক্ষিগৃহ রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া, বারান্দায় বা ঐ প্রকার কোনও স্থানে, চার হইতে ছয় ফুট ব্যবধানে রাখা যাইতে পারে। গরু-বাছুরের উৎপাত দুষ্টু ছেলেদের নজর ও পিঁপড়া প্রভৃতির আক্রমণ হইতে মৌমাছিকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার।

খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর মক্ষিশালায় আমরা ছোট এবং বড় দুই প্রকারের কাঠামোই ব্যবহার করি। উপযুক্ত আবহাওয়ায় এবং কার্য্যদক্ষতায় ছোট বাক্স হইতে যে-পরিমাণ মধু পাওয়া যায়, বড় কাঠামোযুক্ত বাক্স হইতে তাহার চেয়ে বেশী মধু পাওয়া যায়। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে এক জোড়া ছোট বাক্সই ভাল। একটি ছোট বাক্স হইতে ১০ পাউণ্ড মধু সংগৃহীত হওয়া ভালই বলিতে হইবে। কার্য্যে হাত আসিলে পালক উপযুক্ত বিবেচনায় বড় বাক্সও আরম্ভ করিতে পারেন। বড় কাঠামোযুক্ত একটি বড় বাক্স হইতে ২০ হইতে ৩০ পাউণ্ড এবং তাহারও বেশী মধু পাওয়া কিছু মুস্কিল নয়। নিম্ন-ভূমিজাত মৌমাছি অপেক্ষা উচ্চভূমিজাত মৌমাছি অধিক মধু দেয়। বাংলার দক্ষিণাঞ্চল—যথা, ২৪-পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে উত্তরাঞ্চল—যথা রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় অধিক পরিমাণে মধু পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ-অঞ্চলের রাণীর রং লাল্‌চে বাদামী এবং উত্তর-অঞ্চলের রাণীর রং কালো। উত্তর-অঞ্চলের কালো কর্ম্মিমাছি অধিক পরিমাণে মধু সংগ্রহ করিতে পারে এবং শত্রুর হাত হইতে নিজদেরকে অধিক পরিমাণে বাঁচাইতে সমর্থ হয়। সোদপুর মক্ষিশালায় আমরা চার বৎসর পূর্ব্বে মাত্র দুইটি ছোট মাপের বাক্স লইয়া কায্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ৫৬টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬টি বাক্স বড়, বাকীগুলি ছোট। প্রত্যেকটি বাক্সই সবল সুস্থ মৌমাছিতে ভরা।

কুলুতে অবস্থিত পঞ্জাব-সরকারের মক্ষিশালায় ৪২ পাউণ্ড মধু এক বাক্স হইতে পাওয়া গিয়াছে। সোদপুর মক্ষি-শালায় আমরা ছোট বাক্স হইতে উর্দ্ধসংখ্যা ১৫ পাউণ্ড এবং বড় বাক্স হইতে ৪০॥ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মধু পাইয়াছি।

ভারতের বিভিন্ন মৌমাছি

পুরাতন গ্রন্থে ভারতবর্ষজাত বিভিন্ন মৌমাছির বিভিন্ন জাতীয় মধুর নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ।

অর্থাৎ জাতিভেদে নিম্নলিখিত আট প্রকারের মধু পাওয়া যায়—যথা, মাক্ষিক মধু, ভ্রামর মধু, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দালমধু। কিন্তু ভারতবর্ষে মোটামুটি তিন প্রকারের মৌমাছিই আছে যাহা মক্ষিপালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথা, (১) পাহাড়ে মাছি বা বাঘা মাছি। ইহার বর্ণ পিঙ্গল, আকৃতি বড় এবং অত্যন্ত কোপনস্বভাব। মাত্র একখানি চাক দ্বারা ইহাদের মক্ষিগৃহ প্রস্তুত। ইহারা বড় বড় বৃক্ষের শাখায়, ঘরের কার্ণিসে বা ঐরূপ স্থানে ও পাহাড়ের গায়ে অতি বৃহৎ চাক প্রস্তুত করে। ইহারা অধিক মধু সঞ্চয় করে,

কিন্তু পোষ মানে না। (২) কপিলবর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকে "ক্ষুদ্রা" অথবা খুদে মাছি বলে। ইহাদের গৃহও মাত্র একখানি চাকে প্রস্তুত। ইহারা ছোট গাছের ডালে, গাছের ঝুপড়িতে এবং কখনও কখনও গৃহস্থের বাড়ীতেও চাক নির্ম্মাণ করে। ইহাদের চাক খুব ছোট এবং মধুও বেশী নয়। ইহারা পোষ মানে না। (৩) ক্ষুদ্রা হইতে বড় কিন্তু পাহাড়ে মাছি হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট এক প্রকার কপিলবর্ণ মক্ষিকা আছে যাহারা বল্মীকমধ্যে, বৃক্ষকোটরে, পরিত্যক্ত কলসী বা ঐ প্রকার পাত্রে, গৃহাভ্যন্তরে সমান্তরাল একাধিক চাক প্রস্তুতদ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ ইহাদের মক্ষিগৃহে সাতখানি চাক থাকে। স্থানবিশেষে এই মাছির নাম "সাত ভাই" ও "সাতপাতি"। ভারতীয় মধ্যমাকৃতি এই মক্ষিকা "এপিস ইণ্ডিকা" নামে পরিচিত। একমাত্র এই শেষোক্ত মক্ষিকাই পালন-উপযোগী। ইহাকে আমরা "ভারতীয় মক্ষিকা" নামে অভিহিত করিব। এই মাছির সহিতই পালকের সম্বন্ধ। "ভারতীয় মৌমাছি" ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। প্রতিবেশীদের কাছে এবং পল্লীতে একটু সন্ধান করিলেই এই মাছির বহু স্বাভাবিক আবাসের খোঁজ পাওয়া যায়।

মৌমাছির সহিত পরিচয়

এক আবাসে বহু হাজার মৌমাছির মধ্যে একটি রাণী ও গুটিকয়েক পুরুষ মাছি থাকে, বাকী সবই কর্ম্মী মাছি। রাণীর কাজ ডিম পাড়া, বাকী সমস্ত কাজই কর্ম্মী মাছিরা করে। আকাশে উড্ডয়নকালে কুমারী রাণীর সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ত করিয়াই পুরুষ-মাছির দেহ গঠিত, এই এক কার্য্যের জন্যই সে জীবন ধারণ করে এবং কাজ মিটিবা মাত্র মরিয়া যায়। আবাসে পুরুষ-মাছির আবশ্যকতা আছে ইহা জানিয়াই, পুরুষ-মাছি আবাসের কোনও দৈনন্দিন কার্য্যের অংশগ্রহণ না করিলেও এবং চাকের সঞ্চিত মধুপান করিয়া জীবন ধারণ করিলেও, কর্ম্মী মাছিরা পুরুষ মাছিকে সহ্য করে। পুরুষ-মাছি নিজ জীবন দান করিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে। রাণী গর্ভবতী হইয়া আবাসে ফিরিয়া আসে এবং ডিম পাড়িতে থাকে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে ডিম পাড়িয়া যায়। রাণী ইচ্ছামত বীজযুক্ত এবং বীজমুক্ত ডিম পাড়ে। বীজযুক্ত ডিম হইতে কর্ম্মী মাছি এবং বীজমুক্ত ডিম হইতে পুরুষ-মাছি উৎপন্ন হয়। রাণী পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী। কর্ম্মী মাছিও স্ত্রী, কিন্তু কর্ম্মীদের সমস্ত অঙ্গ পুষ্ট নয়। মধু আহরণকালে যখন আবাসে বহু মাছির প্রয়োজন, তখন রাণী দৈনিক প্রায় দুই হাজার ডিম পাড়ে। একটি ছোট বাক্সে প্রায় ত্রিশ হাজার এবং একটি বড় বাক্সে প্রায় পঞ্চাশ হইতে সত্তর হাজার পর্য্যন্ত মৌমাছি থাকে।

যে ডিম হইতে কর্ম্মী জন্মায় সেই একই প্রকার ডিম হইতে রাণী জন্মায়। চাকের যে-কোষে মাছির জন্ম হয় সেই কোষের প্রকারভেদে এবং ডিম ফুটিয়া যখন শূকে পরিণত হয় তখন কর্ম্মীরা উহাদের প্রাণধারণের জন্য যে প্রকার খাদ্য দেয়, উহারই প্রকারভেদে কর্ম্মী বা রাণী জন্মগ্রহণ করে। রাণী তৈয়ারির জন্য কর্ম্মীরা পৃথক কোষ নির্ম্মাণ করে। পুরাতন রাণীকে সরাইয়া আবাসে নূতন রাণীর প্রয়োজন হইলে বা অপর কারণ উপস্থিত হইলে রাণী তৈয়ারির জন্য কর্ম্মীরা পৃথক কোষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মক্ষিপালক এই কার্য্যে কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করে।

কর্ম্মী মাছিরা আবাসের যাবতীয় কার্য্য, যথা, মোম-নিঃসরণ, গৃহনির্ম্মাণ, সন্তানপালন, গৃহপরিষ্কার, মধুসংগ্রহ, গৃহরক্ষা ইত্যাদি সমস্তই নিজ আবাসের স্বার্থে শ্রমবিভাগ দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে করিয়া যায়। কর্ম্মীরা আবাসে মাত্র একটি রাণীই থাকিতে দেয়, চলতি রাণীও অপর রাণীর উপস্থিতি সহ্য করে না। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সোদপুর মক্ষিশালায় একবার একটি আবাসে দুইটি রাণী ডিম পাড়িতেছে দেখা গিয়াছিল।

শিক্ষাগ্রহণ

ভাবী মক্ষিপালককে মক্ষিপরিবারের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। কৃত্রিম মক্ষিগৃহের সমস্ত অংশ ও উহার ব্যবহার তাঁহার জানা দরকার। কাঠামো-সংলগ্ন চাক ও জীবন্ত মৌমাছি ঘাঁটা ও নাড়াচাড়া করার কৌশল আয়ত্তে আনা চাই। মধুনিষ্কাশন, চাক হইতে মোম প্রস্তুত এবং মাছি-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য তাঁহার জানিয়া লইতে হইবে।

বন্য আবাস হইতে মাছি ধরা, উহা বাক্সজাত করা, এবং উহা একটি ভাল মক্ষিদলে পরিণত করার বিশেষ ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। যদি কাহারও এমন ধারণা থাকে যে মৌমাছি পালনে মাছির যত্ন লওয়ার দরকার করে না, তবে তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। মক্ষিপালক সুনিপুণ, তীক্ষ্ণধী, অনুসন্ধিৎসু ও কর্ম্মঠ হইবেন।

মক্ষিপালনে সফলতা লাভ করা শ্রমসাপেক্ষ। ইহা অর্জ্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। পুস্তকপাঠদ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় ছাড়াও এক জন অভিজ্ঞ মক্ষিপালকের নিকট হইতে মাছি ঘাঁটিবার ও অন্যান্য কৌশলগুলি শিখিয়া লইলে, এবং তাহার নিকট হইতে পালনকার্য্য সম্বন্ধীয় পাঠ গ্রহণ করিলে নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে কাজের অনেক সুবিধা হয়। খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর মক্ষিশালায় এই কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পত্রব্যবহারদ্বারা উহার বিশেষ বিবরণ জানিয়া লওয়া যায়। কলিকাতা হইতে দশ মাইল উত্তরে, মেন লাইনের উপর সোদপুর রেল ষ্টেশন। খাদি প্রতিষ্ঠান ষ্টেশন-সংলগ্ন। কলিকাতা হইতে যাতায়াতের প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আছে। পাক্ষিক ও মাসিক সস্তা রেল টিকিট পাওয়া যায়। সোদপুর মক্ষিশালা পরিদর্শনের জন্য বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ করি।

আবশ্যক সরঞ্জাম

মক্ষিপালনকার্য্যে কতকগুলি আবশ্যক সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। যথা,—(১) কাঠামোসহ মক্ষিগৃহ, (২) হুল হইতে মুখ ও হাত বাঁচাইবার জন্য টুপি, সূতি জাল ও রবারের দস্তানা, (৩) একটি ধোঁয়াদানী (smoker), (৪) ছুরি একখানা, (৫) ছোট কাঁচি, (৬) ময়ূরের পালক একটি, (৭) কাঠামো রাখিবার স্ট্যাণ্ড, (৮) মাছির বাক্স রাখিবার স্ট্যাণ্ড, (৯) স্ট্যাণ্ডের পায়ার নীচে দেওয়ার জন্য মাটির খুরি বা থালা ; থালায় জল থাকিবে যাহাতে বাক্সে পিঁপড়া উঠিতে না পারে, (১০) মাছির ঝাঁক ধরার জাল, (১১) মধুনিষ্কাশক সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র, (১২) মধুকোষের মুখ খুলিবার জন্য বিশেষ ছুরি দুইখানি, (১৩) চাক রাখিবার থালা বা ট্রে একখানি, (১৪) রাণীর চলনপথ আবশ্যকমত বন্ধ করিবার জন্য ধাতুনির্ম্মিত জাল একখানি।

শেষোক্ত চার দফা জিনিষ মধু নিষ্কাশনের সময় প্রয়োজন। সুতরাং এইগুলি পরে সংগ্রহ করিলেও চলিতে পারে। মাছির বাক্স ও মধুনিষ্কাশকের মূল্য অপর জিনিষগুলির তুলনায় একটু বেশী। একটি নিষ্কাশক দিয়া অনেকগুলি বাক্সের মধু আহরণ করা যায়। মাছির বাক্স একটি বা একাধিক যাহাই রাখা হউক, অপর সরঞ্জামের খরচ একই থাকিয়া যায়।

পুষ্পরস হইতে মধু

ফুল হইতে মৌমাছি পুষ্পরস সংগ্রহ করিয়া পেটে একটি বিশেষ থলিতে রাখে, ফিরিয়া আসিয়া চাকের কোষে উহা সঞ্চয় করে। স্বাভাবিক অবস্থায় পুষ্পরস খুব পাতলা। ইহা সাদা ও স্বচ্ছ। থলিতে থাকা কালে এবং কোষে সঞ্চিত অবস্থায় এই রসের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে উহা মধুতে পরিণত হয়। চাকের উত্তাপে ইহার জলীয় অংশ বহু পরিমাণে উড়িয়া যায়, মধু পুষ্ট হয়। যে-ফুলের রস চাকে অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়, মধুতে ঐ ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। শতেক ফুল হইতে আহরিত রসে এক ফোঁটা মধু হয়। কোনও রাসায়নিক উপায়ে এ পর্য্যন্ত অন্য মিষ্ট দ্রব্য হইতে সত্যকার "মধু" প্রস্তুত করা যায় নাই। একমাত্র মৌমাছিই তাহার নিজ আবাসে পুষ্পরস হইতে মধু উৎপন্ন করিতে পারে।

বিশুদ্ধ টাট্‌কা মধু

বিশুদ্ধ টাট্‌কা মধু ঘন ও স্বচ্ছ। ইহা মিষ্ট, উপাদেয় ও মুখরোচক। মধুর একটি নিজস্ব বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ আছে। মধুকে পুষ্টিকারক খাদ্যসার বলা যায়। উদরে গেলে তবে অন্য খাদ্যদ্রব্য পরিপক্ক হয়, কিন্তু মধু স্বতঃই পরিপক্ক। লৌহ, চূর্ণপদার্থ, ফস্‌ফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটীন, শর্করা, ফরমিক এসিড, উদ্বায়ী সুগন্ধ তৈল এবং জল মধুর উপাদান। ফুল অনুসারে এবং ঋতুভেদে মধুর বর্ণ চক্‌চকে স্বচ্ছ সাদা, বাদামী আভাযুক্ত এবং ঈষৎ অথবা গভীর লাল হয়। মধু দানা বাঁধিলে উহার স্বচ্ছতা থাকে না।

খাদ্য হিসাবে মধু

নানা প্রকার খাদ্যপদার্থের মধ্যে মধুর স্থান খুবই উচ্চ। যাঁহাদের প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ছেলেদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বার্দ্ধক্যবশতঃ অথবা রোগের জন্য যখন হজম করার শক্তি কমিয়া যায় তখন চিনির পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহার করায় উপকার হয়।

রোগনিবারক গুণ

অতীত যুগ হইতে মধুর নানা গুণের কথা ভারতবর্ষে বিদিত। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ও ক্ষয়াদি রোগে মধু বড়ই উপকারী। মধু পিপাসা নিবৃত্তি করে এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত করে। ইহা মৃদু বিরেচক। চক্ষুরোগে ইহা বহুখ্যাত এবং পরম উপকারী। সর্দ্দি, কাশি, স্বরভঙ্গ এবং হাঁপানিতে উপকার হয়। পোড়া ও ঝলসান স্থানে ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

মঘা নক্ষত্র

ব্রহ্মদেশীয় গল্প

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

তুচ্ছ এক কাঁদি কলার কলহে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, কোপন-স্বভাবা মাচ্ছো তাহার বিমাতা ডঙ্কার নামে স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির বারো আনা অংশ দাবি করিয়া মেমিও কোর্টে নালিশ রুজু করিল। মেমিওর ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট গ্যালওয়ে সাহেব তাহার উকীল হইলেন।

উকীল উচ্যাডুনের সাহায্যে ডঙ্কা জবাবনামা দাখিল করিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স তখন পঁয়ষট্টির উপর; কি প্রশ্নে কি উত্তর দিয়া মোকদ্দমা হারিয়া যাইবেন, এই আশঙ্কায় ডঙ্কা তাঁহার এক বন্ধুর মারফত মন্দালয়ের খ্যাতনামা ওলোন্‌ডইয়া (ব্যারিষ্টার) উকাকে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যারিষ্টার নিয়োগের সংবাদ শীঘ্রই মাচ্ছোর কর্ণে পৌঁছিল। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগের মুখে মাচ্ছো আরও এক মর্ম্মান্তিক গুজব শুনিল যে, উকা এক তুড়িতে ডঙ্কার মোকদ্দমা জিতিয়া লইবেন, সাক্ষী-সাবুদের প্রয়োজন হইবে না।

এই জনশ্রুতিতে মাচ্ছোর ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার বারান্দা হইতে ডঙ্কার বাড়ী স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাচ্ছো প্রথমতঃ বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডঙ্কার বাড়ী লক্ষ্য করিয়া জ্বলন্ত তুবড়ির ন্যায় কতকগুলি অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিল। তাহার পর ডঙ্কা যখন তাঁহার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মাচ্ছো নাসিকা আকাশে তুলিয়া, বক্ষে সবলে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চস্বরে কহিল, "হে-ই বুড়ী, তুই শুনে রাখ, আমি বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার আনব, তোর হাঁড়ি-বাড়ী নিলামে চড়াব, তোকে ভিটাছাড়া করব, তবে বুঝবি মাচ্ছো কি ধাতুর মানুষ।" ডঙ্কা অশিষ্টা মাচ্ছোর গর্ব্বিত আস্ফালনে ব্যথিতা হইলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তর দিলেন না—তাঁহার সে-বয়স ছিল না এবং প্রবৃত্তিও ছিল না।

হাতের চুড়িগুলি গোপনে বন্ধক রাখিয়া সেই দিনই মাচ্ছো অর্থ সংগ্রহ করিল এবং এক শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টার নিয়োগের জন্য মন্দালয়ে লোক পাঠাইল। স্থইনহো সাহেবকে পাওয়া গেল না; লুটার সাহেব এ মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন না; লনডন্ মুখার্জ্জি মন্দালয় ছাড়িয়া মেমিওতে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে নূতন এক ওলোনডাইয়া-মিন্ "তেইয়ে-উখা"-কে[১] অগ্রিম এক-চতুর্থাংশ ফিস্ দিয়া "আপ্যি" (মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি) পর্য্যন্ত "আঙ্কু" (মোকদ্দমা) চালাইবার জন্য ভাড়া[২] করা হইল।

মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইল ১লা এপ্রিল। সেদিন বৃহস্পতিবার, মঘা নক্ষত্র, পূর্ব্বদিকে যোগিনী।

২

১লা এপ্রিল তারিখে ভোরের গাড়ীতে দুই ব্যারিষ্টার (উকা ও উখা) তাঁহাদিগের কেরানীদের সহিত বড় বড় দুই বইয়ের বাক্স, স্যুটকেস ও বিছানা ইত্যাদি লইয়া মন্দালয় হইতে মেমিও যাত্রা করিলেন। তখন মেমিওর মোটর-পথ তৈয়ারী হয় নাই। বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কাহারও মোটর ছিল না।

মেমিও এবং মন্দালয়ের গাড়ীর তখন যিবিনজী ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইত। দশ মিনিট সময় পাওয়া যাইত। গাড়ী পৌঁছিবামাত্র এক ঢন্নু[৩] ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ব্যারিষ্টার-

১। তেইয়ে-উখা—তেইয়ে শব্দের অর্থ দৈত্য; উখা ঐ ব্যারিষ্টারের নাম; তুখোড় প্রকৃতির ব্যারিষ্টার বলিয়া এবং উখা-নামীয় অন্য এক ব্যারিষ্টার হইতে ইঁহাকে পৃথক করিবার জন্য বর্ম্মীরা তাঁহাকে তেইয়ে-উখা নাম দিয়াছিল।

২। বর্ম্মারা উকীল নিয়োগ করে না, ভাড়া করে।

৩। ঢন্নু বা ধন্নু—বর্ম্মা ও শান্ জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন এক মিশ্রজাতি। ইহারা সাধারণতঃ শান্‌দিগের অপেক্ষা চালাক লোক।

দিগের সন্ধান লইলেন। তাঁহাদিগের কেরানীরা প্লাটফর্ম্মেই পায়চারি করিতেছিল। তাহাদিগের একজনকে ঢন্ডু ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগুালের ওলোন্‌ডইয়া উকা এ গাড়ীতে এসেছেন?" আগন্তুকটির মাথায় এক প্রকাণ্ড দোতলা শোলা-টুপি, গায়ে ঐ গরমের দিনেও এক খাকি রঙের পশমী ড্রেসকোট, পরিধানে এক কালো শান্ পায়জামা আর মোজাশূন্য পায়ে এক জোড়া পুরাতন অ্যামুনিশন্ বুট। এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া উকা-র কেরানী সহাস্যে কহিল, "হাঁ, তিনি এসেছেন; কি চাও তুমি?" উত্তরদাতা কেরানীটির পায়ে হুড বার্ণিশের নূতন ইংরেজী জুতা, পরণে একখানি ব্যাঙ্কক পাঁজো, গায়ে ব্রাডলি কোম্পানীর এক প্যারামিটারের এঞ্জি (বর্ম্মী জামা) আর ঠোঁটে বার্ডসাইয়ের এক লম্বা চুরুট। সভ্য সমাজের এই উৎকট পরিচ্ছদ দেখিয়া ঢন্ডু ভদ্রলোকটি সসঙ্কোচে কহিলেন, "আমি তাঁর কেরানী উমিয়াকে চাই।" "আমিই উমিয়া, আমাকে চেন না! তুমিই ত সেদিন আমাদের আফিসে ডঙ্কার জন্য উকীল নিযুক্ত করতে এসেছিলে?" "আজ্ঞে সে আমি নই; উ সংখা। তা যাক; আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে; ঐদিকে আসুন।" প্লাটফর্ম্মের অপর প্রান্তে অতিনিম্নস্বরে তিন-চার মিনিটকাল উভয়ের এক জরুরি পরামর্শ হইল। উ-মিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "পঞ্চাশ টাকার নীচে হবে না ভাই; দরকষাকষি ক'রো না।"

ইতিমধ্যে মেমিওর গাড়ীও আসিয়া গেল। ঢন্ডু ভদ্রলোকটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া পঞ্চাশ টাকার নোট অতি সন্তর্পণে উমিয়ার হাতে দিয়া কহিলেন, "কাজটা কিন্তু সুসম্পন্ন হওয়া চাই।" "তা আর হবে না? হাতে হাতে ফল দেখাব" এই বলিয়া উমিয়া সস্মিত মুখে প্লাটফর্ম্মে ফিরিয়া গেল; দেখিল উখা এক সুচারুবেশা সুন্দরীর সহিত গাড়ীতে বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন। উখার কেরানীর সহিত উমিয়া-র আর এক প্রস্ত ত্রস্ত পরামর্শ হইল। তাহার পর দুই জনেই ছুটাছুটি করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই বইয়ের বাক্স বিছানা ইত্যাদি লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। উখাও নামিলেন; গাড়ী ছাড়িবার হুইস্‌ল্ পড়িল; সকলে নামিয়াছে দেখিয়া উকাও শশব্যস্তে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয় দিকের গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ষ্টেশনের অল্প দূরেই যিবিনজীর ডাক-বাংলা। দুই ব্যারিষ্টার বইয়ের বাক্স প্রভৃতি সহ ডাক-বাংলার দুই কামরা অধিকার করিলেন। তখন বেলা সাড়ে ন-টা মাত্র। মক্কেল-ভুলানো ব্যবহার অনুসারে ব্যারিষ্টারদ্বয় পরস্পরের সহিত কোনই বাক্যালাপ করিলেন না; নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় দুই জনে দুই ঈজিচেয়ারে দশ হাত দূরে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা বারোটা বাজিল। মক্কেলদের দেখা নাই। বার-চৌদ্দ জন সাক্ষী তলব করা হইয়াছিল; তাহারাও হাজির নাই। মেমিওর জজ হিল্ড সাহেবেরও আগমনের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। যিবিনজীতে মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে সাড়ে ন-টার গাড়ীতেই তিনি মেমিও হইতে যিবিনজী আসিতেন। তিনিও আসেন নাই।

ব্যারিষ্টারেরা ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ব্রেকফাষ্টের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উখা বিরক্তভাবে ডাক-বাংলার দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেমিওর হিল্ড সাহেব কখন আসবেন কিছু খবর পেয়েছিস?"

দারোয়ান কহিল, "তিনি কাল এখানে এসেছিলেন; কালই মেমিও ফিরে গেছেন।"

—ব্যাটা আহাম্মক! আমি কালকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আজ তিনি এখানে কখন আসবেন কিছু খবর পেয়েছিস?

দরোয়ান বিনীত ভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।" সে একটু বহুভাষী লোক; তা ছাড়া অন্যের অজ্ঞাত সংবাদ দিয়া প্রশংসা লাভ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল। সে কহিল, "আজ মেমিওতে মাচ্ছোর মোকদ্দমা হচ্ছে; মাণ্ডালে থেকে ব্যারিষ্টার আসছেন; মাচ্ছো তার বারো জন সাক্ষী নিয়ে কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে মেমিও গেছে। প্রায় বিশ হাজার টাকার—" দরোয়ানকে বাধা দিয়া উখা সক্রোধে কহিলেন, "বলিস কি ব্যাটা বে-আক্কেল?

এইমাত্র ষ্টেশনে মাচ্ছোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; সে বললে আজ এই ডাকবাংলোয় তার মোকদ্দমার বিচার হবে।"

দরোয়ান ধমক খাইয়া বিস্মিত ভাবে কহিল, "তবে তাই-ই হবে; কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে; কিছু খাবেন কি?"

উকা নিবিষ্ট মনে উভয়ের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। মক্কেলদিগের অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনেও গভীর এক সন্দেহের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডঙ্কার বাড়ী জানিস?"

—এই তো, ঐ তাঁর বাড়ী।

—তাকে ডেকে আনতে পারিস?

—ডাকব কাকে কর্ত্তা? ডঙ্কা তো কালই মেমিও চলে গেছেন। বাড়ীতে কেউ নেই; ফাটকে তালা বন্ধ।

দুই ব্যারিষ্টার তখন ঈজিচেয়ার হইতে উঠিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়েরই তখন একই প্রশ্ন—"এখন উপায়?"

উকা উখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কে সংবাদ দিল যে, মোকদমা মেমিওতে না হয়ে যিবিন্‌জীতে হবে?"

—মাচ্ছো নিজেই আমাকে বলেছে; সে ষ্টেশনে এসেছিল। তা ছাড়া কেরানীরাও সেই কথা বললে।

—কিন্তু মাচ্ছো বা ডঙ্কা কেউ তো যিবিন্‌জীতে নেই! এখানে মোকদ্দমা হ'লে তারা মেমিও যেত না।

একটা তিমিরাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকায় যেন উখার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। হতাশ হৃদয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— "কিন্তু আপনি এখানে নামলেন কেন?"

উকা শান্তভাবে বলিলেন, "আপনারা সকলেই নেমে পড়লেন দেখে আমিও গাড়ী থেকে নেমে পড়েছি। কিন্তু ঐটাই আমার ভুল হয়েছে।" দুই জনে তখন চেয়ার টানিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পনর মিনিট কাল গভীর গবেষণার পর মেমিওতে হিল্ড সাহেবের কাছে এক জরুরি তার পাঠানো হইল—"আমরা ডাক-বাংলোয় আপনার অপেক্ষা করছি, কখন আসবেন জানালে বাধিত হব।" যিবিন্‌জীতে টেলিগ্রাফ আপিস নাই। রেল-ষ্টেশনের মারফৎ তার পাঠাইতে হইল। কখন পৌঁছিবে তাহার নিশ্চয়তা রহিল না।

৪

১লা এপ্রিল মেমিওর কোর্টে লোকারণ্য। ডঙ্কা ও মাচ্ছো তাহাদিগের সাক্ষী ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আদালতের প্রাঙ্গণে কার্পেট পাতিয়া পাইন ও বট গাছের ছায়ায় হাট লাগাইয়া বসিয়া গিয়াছে। অনবরত পান সেলেই পরিবেশিত হইতেছে; জলখাবার-ওয়ালীরা তবোহছা, জিন্‌তউ, লফেতউ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া হয়রান হইয়া উঠিয়াছে। গ্যালওয়ে সাহেব ও উচ্যডুন বার-রুমে নিবিষ্ট মনে কাগজ দেখিতেছেন। আর উকা এবং উখা তখন যিবিন্‌জীতে।

এগারোটার সময় মোকদ্দমা ডাকা হইল। মাচ্ছোর তরফ হইতে গ্যালওয়ে সাহেব কোর্টে হাজির হইয়া বিচারক হিল্ড সাহেবকে কহিলেন, "আমার মক্কেল মাণ্ডালের এক ব্যারিষ্টারকে তাহার মোকদ্দমা চালাইবার ভার দিয়াছে; মোকদ্দমার ব্রিফ তাঁরই হাতে আছে; আমার কোনই 'ইন্‌ষ্ট্রাকশন' নেই। আমাকে বিদায় দিন।" উকীল উচ্যডুনও ঐরূপ অজুহাতে আদালত পরিত্যাগ করিলেন।

মন্দালয়ের ব্যারিষ্টারেরা তখনও আসেন নাই জানিয়া বিচারক হিল্ড সাহেব পক্ষদিগের প্রার্থনায় বেলা একটা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবি রাখিলেন, কহিলেন, "যদি একটার মধ্যে তোমাদের ব্যারিষ্টারেরা না আসেন, তবে তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই আমি মোকদ্দমা চালাব; তারিখ দেব না।"

পক্ষ ও সাক্ষীদের মধ্যে এক দুর্ভাবনার সৃষ্টি হইল। এক বটগাছের ছায়ায় দুই পক্ষের সাক্ষীরা একত্র হইয়া বিষম এক জটলা আরম্ভ করিল।

ওদিকে মেমিও হইতে তারের কোনও জবাব না পাইয়া ব্যারিষ্টারদ্বয় অবশেষে সোয়া তিনটার গাড়ীতে

অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের বারবেলায়—মেমিও যাত্রা করিলেন। কোর্টে পৌছিতে সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল; দেখিলেন, আপিস আদালত সবই তখন বন্ধ; কাছারি নির্জ্জন ও নিঃশব্দ। শুদ্ধ প্রাঙ্গণস্থ পাইন গাছে এপ্রিলের দম্‌কা হাওয়ায় শব্দ হইতেছে।

সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। ব্যারিষ্টারেরা রাত্রিতে আটটার সময় রেল-ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট গৃহে খানা খাইয়া ওয়েটিং-রুমে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গেলেন।

পরদিন এগারটার সময়ে তাঁহারা কোর্টে গিয়া জজ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। উখা কহিলেন, "যিবিন্‌জী ডাক-বাংলোয় বিচার হবে জেনে আমরা কাল সেখানে অপেক্ষা করছিলাম; 'তার'ও দিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও জবাব পাই নাই।" হিল্ড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের সব মোকদ্দমাই মেমিওতে হয়; পক্ষ ও তাহাদের সাক্ষীরা সকলেই কাল মেমিও কোর্টে উপস্থিত ছিল। যিবিন্‌জীতে বিচার করবার কোনও প্রার্থনাই কেউ করে নাই।" উখা কহিলেন, "হুজুর, আমাদের একটা বিষম ভুল হয়ে গেছে; মার্জ্জনা করবেন। আমাদের অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমার হয়ত তারিখ হয়েছে? আমরা বড়ই দুঃখিত যে আপনার অসুবিধা হয়েছিল।" হিল্ড সাহেব কহিলেন, "আপনাদের অনুপস্থিতিতে কিছুই অসুবিধা হয় নাই। পক্ষগণ তাহাদের সাক্ষীদের পরামর্শে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করেছে। আমি মোকদ্দমা ডিসমিস করেছি। পক্ষগণ নিজ নিজ খরচ বহন করবে।"

উখা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বলেন কি হুজুর? আমার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়েছে! আমার ফিস্ পাই নি যে?" হিল্ড সহাস্যে কহিলেন, "বড়ই দুঃখিত হলাম; কিন্তু ও-ব্যাপারটা আমাদের বিচার্য্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

ব্যারিষ্টারেরা তখন বিমর্ষ বদনে হিল্ড সাহেবকে শুভদিন ইচ্ছা করিয়া কোর্ট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাঙ্গণে নামিতেই মাচ্ছৌ তাহার বন্ধুবান্ধব সহ উখাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং 'যুদ্ধং দেহি'ভাবে উখার সম্মুখে আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল—"ওলোনডইয়া-মিন্! মাণ্ডালে ফিরে যাচ্ছেন বুঝি, আমার ফিসের টাকাটা এখানে রেখে যান। মোকদ্দমায় হাজির না হয়ে ফিসের টাকা খাবেন, মাচ্ছৌ তা সহ্য করবে না।" রমণীর কর্কশ ব্যবহারে উখারও ক্রোধ হইল। তিনি অনুসন্ধিৎসু নয়নে চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মাচ্ছৌ কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই। সে-ই আমাকে প্রতারিত করেছে।" মাচ্ছৌ বুকে টোকা দিয়া কহিল, "আমিই মাচ্ছৌ; আমার পয়সা ফেরত দিন, নইলে আমি ছাড়ব না।" উখা দেখিলেন, যিবিন্‌জীর গাড়ীতে যে সুন্দরী রমণী তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সে এ স্ত্রীলোক নহে। একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্রের বিকট প্রতিবিম্ব তাহার চক্ষুতে তখন প্রকট হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে কহিলেন, "আমার সঙ্গে বদমাইসি। আমার বাকী ফিস্ দাও—নতুবা আমি নালিশ করব।"

"নালিশ করবেন? করুন নালিশ। আমি কোর্টে যাব না, এখানেই টাকা আদায় ক'রে ছেড়ে দেব।" মাচ্ছৌ এই বলিয়া তাহার গলার পওয়া (চাদর) কোমরে জড়াইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। উকা দেখিলেন একটা মারামারির উপক্রম হইতেছে। তিনি অগ্রসর হইয়া উখাকে বলিলেন, "এ যুদ্ধকাণ্ডটা কোর্টের প্রাঙ্গণে অভিনীত না হওয়াই ভাল। চল এখন ভালয় ভালয় মাণ্ডালে ফিরে যাওয়া যাক্।" কোর্টের পেয়াদা ইতিমধ্যে সেখানে পৌছিয়া জনতা দূর করিবার আদেশ দিল। পেয়াদার হুকুমে মাচ্ছৌ যুদ্ধোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ফানা (চটিজুতা) পায়ে দিল। উখা একখানি গাড়ীতে উঠিয়া মানে মানে মেমিও পরিত্যাগ করিলেন।

উখা তাহার পর আর ১লা এপ্রিলে তাঁহার মোকদ্দমার দিন রাখিতেন না। একদিন বার-লাইব্রেরিতে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হইল। উকা কিছু কিছু জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "১লা এপ্রিলের কোন দোষ ছিল না বন্ধু; সেদিন ছিল মঘা নক্ষত্র, তা ছাড়া বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমরা যিবিন্‌জী থেকে মেমিও যাত্রা করেছিলাম; দুষ্টা যোগিনী সম্মুখে ছিল; সে-দিন যে আরও কিছু বিপদ উপস্থিত হয় নাই তাই আমাদের সৌভাগ্য।"

উথা বলিলেন, "না মশাই; ১লা এপ্রিল তারিখকে ইংরেজরাও মানে। বৎসরের ঐদিনে বুদ্ধিমান্ লোকেরাও বোকা ব'নে যায়! বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ উকীল পীলে সাহেব কহিলেন, "দিন-নক্ষত্র কিছু নয় ভাই, ওটা কর্ম্মদোষ; যার যেমন অদৃষ্ট তার প্রত্যেক দিনের কার্য্য তেমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নতুবা বিনা দোষে এমন এক অসম্ভব বিপদে পড়া কি ব্যারিষ্টারের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে?"

[এই গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কেবল মোকদ্দমার পক্ষদিগের ও ব্যারিষ্টারদিগের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুইনহো সাহেব, পীলে সাহেব, ও লনুডন মুখার্জ্জি সাহেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যেও এক জন নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিন্ড সাহেব হাইকোর্টের জজ হইয়া পেন্‌সন লইয়াছেন। লুটার সাহেব এখনও মন্দালয়ে সরকারী উকীল-রূপে প্রাক্‌টিস্ করিতেছেন।]

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতি

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

আচার্য্য সর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইল, কত দিনে তাহার পূরণ হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের আধুনিকতম পরিণতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং এই জ্ঞানের সহিত সমঞ্জস তাঁহার একটা দার্শনিক মতও ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। কিন্তু যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ১৯৩৩ সালে আমি কয়েক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং সেই সুযোগে তাঁহার অগাধ ভাণ্ডার হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার ফল যথাসাধ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৩৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে আমি তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিতে যাই। তখন তিনি জগদীশনাথ রায়ের লেনে তাঁহার শ্যালক শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রক্ষিতের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনটার সময় আমার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কোনও কারণবশতঃ সাড়ে তিনটার পূর্ব্বে পৌছিতে পারি নাই। তাঁহার এক অসুস্থ দৌহিত্রকে দেখিতে যাইবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। সুতরাং সেদিন বেশীক্ষণ তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু দেখিলাম বিনয়ের অবতার। কথোপকথনকালে আচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে তাঁহার কত সঙ্কোচ! পাণ্ডিত্য দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহাতে আদৌ লক্ষ্য করি নাই।

প্রথমেই আমি বলিলাম, "শুনেছি, বর্ত্তমানে সৎ পদার্থের (Realityর) একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি আপনার হয়। সেই অনুভূতি সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?"

এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া ডাঃ শীল কহিলেন, "এক সময়ে একটা অনুভূতি আমার হ'ত, তাকে সৎ পদার্থের অনুভূতি অথবা আর যা ইচ্ছা বলুন। কিছু দিন হ'তে সে অনুভূতি আমার হচ্ছে না। শরীর যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন সে অনুভূতি হয় না। স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা সে অনুভূতির অনুকূল নয়।"

আমি কহিলাম, "স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবস্থায় যখন সে অনুভূতি হয় না, তখন তাহার যে সৎ পদার্থের অনুভূতি তার প্রমাণ কি?—একথা আমি বলব না। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি কি তাকে সত্যের অনুভূতি ব'লে বিশ্বাস করেন?"

একটু মৌনী থাকিয়া ডাঃ শীল কহিলেন, "আমি করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বার্গস যাকে অব্যবহিত জ্ঞান (Intuition) বলেছেন, আপনার অনুভূতি কি তাই ?"

আচার্য্য কহিলেন, "না, বার্গস যাকে Intuition বলেছেন তাও বুদ্ধির (Intellect) ক্ষেত্রে আবদ্ধ। যাকে আমরা বুদ্ধি জগৎ (Intellectual order) বলি, Intuitionএর জ্ঞান (Perception) সেই জগতেরই জ্ঞান। কিন্তু আমি যে-অনুভূতির কথা বলছি, তাহা সেই জগতের পশ্চাতে অবস্থিত, যদি তার সম্বন্ধে "পশ্চাৎ" শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। অনেকে বলবেন আমার অনুভূতি আমার শরীরের অসুস্থ অবস্থার ফল। কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে অস্বীকার করব কিরূপে? ইন্দ্রিয় যখন দুর্ব্বল হয়, তখনই সেই অনুভূতি ঘটবার সম্ভাবনা হয়। ইন্দ্রিয় যখন সবল ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন হয় না।"

আমি কহিলাম, "যোগও তো চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ দ্বারাই চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়। সে-নিরোধ ইচ্ছাকৃত, মস্তিষ্কের রুগ্ন অবস্থা (morbid condition) প্রসূত নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বল অবস্থায় অনুভূতি ঘটলে তাকে অসত্য বলবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু যোগবলে যোগী যে-অনুভূতি লাভ করেন, আপনার অনুভূতি কি তারই মত ?"

"যোগী ইচ্ছামত প্রক্রিয়া-বিশেষ অবলম্বন ক'রে তাঁর অনুভূতি লাভ করেন; কিন্তু আমার অনুভূতি আমার ইচ্ছাধীন নয়—আপনিই আসে।"

আমি কহিলাম, "যমেবৈষঃ বৃণুতে।"

ডাঃ শীল কহিলেন, "হাঁ, তিনি আপনা হ'তেই বরণ করেন।"

আমি কহিলাম, "আপনার দর্শন (Philosophy) ও আপনার অনুভূতি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছেন ? না অনুভূতিকে একটা বুদ্ধির অতীত বিষয় (mystery) ব'লে এক পাশে রেখে দিয়েছেন ?"

আচার্য্যের কণ্ঠে একটু উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় সামঞ্জস্য বিধান করেছি। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ (phenomenal world—the world in time and space)—দেশ ও কালে অবস্থিত জগৎ, সেই অনুভূতিলব্ধ জগতের প্রতিচ্ছবি। সেই অনুভূতিলব্ধ জগৎ একটা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিন্যাস (order)। সে জগতেও পারম্পর্য্য আছে, একটা আর একটার পরে আছে, কিন্তু সে পারম্পর্য্য কালের মধ্যে পরবর্ত্তিতা (succession in time) নয়।

আমি বলিলাম, "নৈয়ায়িক পারম্পর্য্য (logical sequence)।

আচার্য্য কহিলেন, "হাঁ, তাই। সেই নৈয়ায়িক পারম্পর্য্যই কালিক অনুক্রম রূপে প্রতিভাসিত হয়।"

আমি কহিলাম, "তা হ'লে সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ গতিশীল নয়; নিশ্চল ?"

—হাঁ, নিশ্চল।

—তাহলে এই প্রাতিভাসিক জগৎও গতিশীল ব'লে প্রতীয়মান হ'লেও প্রকৃতপক্ষে গতিশীল নয় ?

আচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার পরে এই প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। তিনি কহিলেন, "সেখানে সকলই রেখে দেওয়া আছে, কোনটা থেকে কোনটার কাল-ক্রমে উৎপত্তি হচ্ছে না; তবে নৈয়ায়িক পারম্পর্য্য আছে।"

তখন আমি বলিলাম, "তাই যদি হয়, তা হ'লে এ জগতের কোনও অর্থ আছে ব'লে ত মনে হয় না। সগুণ ঈশ্বরের (Personal God) একটা উদ্দেশ্য আছে, যার জন্য সৃষ্টি চলছে। এর মধ্যে যা হোক একটা কিছু অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু একটা নৈয়ায়িক বিন্যাস, তা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে দেশকালে—ইহার অর্থ কোথায় ?"

—নির্গুণের (absolute) যে প্রতিচ্ছবি, তার সঙ্গে সঙ্গে এক জন দুঃখভোক্তা ঈশ্বর (Suffering God) হয়ত আছেন। কিন্তু নির্গুণের মধ্যে ঐ নৈয়ায়িক বিন্যাস ছাড়া আর কিছু পাবার জো নাই।

—আপনার অনুভূতির কোনও বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে ?

—আমাদের ভাষা ত সেখানে পৌঁছবে না।

—তাকে আনন্দ বলা যেতে পারে ?

—ঠিক আনন্দ সে নয়। আনন্দেরও অতীত অবস্থা।

—চৈতন্যের (Consciousness) যে আদিম অবস্থা

উদ্বর্ত্তিত হ'তে হ'তে ক্রমশঃ জটিল হয়ে বর্ত্তমান মানবীয় চৈতন্যে পৌঁছেছে, এ কি সেই অবস্থা?

—না, না, এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা, যাকে বর্ণনা করবার উপায় নাই।

সেদিন আর কথা হইল না, ফিরিয়া আসিলাম। এক দিন পরে সকালে উঠিয়াই আবার জগদীশনাথ রায়ের লেনে রমেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। নমস্কার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেদিন Suffering God-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন, আজ সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন?"

ডাঃ শীল কহিলেন, "উদ্বর্ত্তন (Evolution) একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে গতি চলছে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। চারি দিকে যা কিছু ঘটছে, সবই একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে চলছে।"

আমি বলিলাম, "তাহ'লে একটা উদ্দেশ্য তার আছে।"

ডাঃ শীল কহিলেন, "না, তা এখন বলব না। একটা বিশেষ দিকে উদ্বর্ত্তন চলছে এই মাত্র। কিন্তু তার মধ্যে যেমন সফলতা আছে, বিফলতাও তেমনই আছে। গতি কিন্তু তার সেই দিকে অব্যাহত। বাধাবিঘ্ন প্রচুর—বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাও প্রচুর। এই সফলতা ও বিফলতার ভিতর দিয়ে, তীব্র আনন্দ ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে উদ্বর্ত্তন চলছে। যিনি উদ্বর্ত্তিত হচ্ছেন এই যন্ত্রণা ও আনন্দ উভয়ই তাঁর। তিনিই Suffering God (দুঃখভোগী ঈশ্বর)। যেটা প্রত্যক্ষ জিনিষ তাকে অস্বীকার করা বৃথা। ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলব, অথচ বলব তিনি দয়াময়! নিষ্ঠুরতার অভাব ত দুনিয়ায় নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ যদি তিনি, তবে এত নিষ্ঠুরতা তাঁর কার্য্যে কেন? এরই উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ আর একটা তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। সেটা অমঙ্গল-তত্ত্ব। কেউ তার নাম দিয়েছেন আহ্রিমান, কেউ দিয়েছেন শয়তান। কিন্তু দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন নাই। একটি তত্ত্বই যথেষ্ট— তিনি মঙ্গলময়, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নন। দুঃখকষ্ট জগতে যা-কিছু আছে, তিনি তার ভোক্তা, তিনি Suffering God। কিন্তু এই দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে উদ্বর্ত্তনের গতি নির্দ্দিষ্ট দিকে ঠিক আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে গতিটি তাঁর মঙ্গলময়ত্বের পরিচায়ক। তিনি আমাদের দুঃখী পিতা। দুঃখ যে কেবল আমরাই ভোগ করি তা নয়, সে দুঃখ তাঁর বুকেও অনবরত বাজে। কিন্তু জাগতিক সুখদুঃখের অতীত আর এক জন আছেন, তিনি absolute (কেবল), আমাদের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

আমি বলিলাম, "এই কেবল (absolute) ও আপেক্ষিকের (relative) মধ্যে সেতুটা কোথায়? হেগেলের অব্যক্ত (Idea) আপনাকে ব্যক্ত করছে আপেক্ষিকের ভিতর দিয়ে। কিন্তু realised (সম্পূর্ণ ব্যক্ত) অবস্থায় সে Idea কে পাওয়া যায় না, Ideaর ব্যক্তীকরণ (process of realisation) একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে চলছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ব্যক্তীকরণ-প্রক্রিয়া অন্তহীন।

ডাঃ শীল কহিলেন, "সেটা হেগেলের ভাষ্যের কথা।"

আমি কহিলাম, "Realisation-এর আদিতে (নৈয়ায়িক আদি—কালিক নয়) পূর্ণ Idea যদিও হেগেল স্বীকার ক'রে থাকেন, তবু Ideaর realisation-এর সময় logical categoriesগুলি কেমন ক'রে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় (concrete হয়), তার ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। Idea ও ব্যবহারিক জগৎ এর মধ্যে সেতুটা তাঁর তর্কের মধ্যে কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার absolute ও evolutionary process (ঔদ্বর্ত্তনিক প্রসর)-এর মধ্যের সেতুটাও আমি দেখতে পাচ্ছি না। প্রাতিভাসিক জগৎ (phenomenal world) absolute-এর প্রতিবিম্ব; শুধু প্রাতিভাসিক জগতের কালিক সম্বন্ধগুলি absolute-এ নৈয়ায়িক সম্বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু প্রতিবিম্ব পড়তে হ'লে একটা কিছু চাই, যা প্রতিবিম্বকে ধারণ করবে। Absolute-এর বাইরে ত সেরূপ কোন পদার্থ নেই; কেমন ক'রে তাহ'লে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হবে, তা বোঝা যায় না। তাহ'লে যদি বলা যায়, "দুইটা সত্তা (order of existence) আছে, যাদের বাস্তবিকতা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের; একটি absolute, যার reality

পূর্ণ, আর একটা এই প্রাতিভাসিক জগৎ, এই ঔদ্বর্ত্তনিক প্রক্রিয়া যার reality অসম্পূর্ণ, দুইটাই আছে; দুইটাই আমাদের অনুভূতির বিষয়, যাকে অস্বীকার করা চলে না, এদের একটা যে আর একটা থেকে উদ্ভূত, তাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু কেমন ক'রে তার উদ্ভব হ'ল, কেমন ক'রে এক বহু হলেন অথবা বহুর সৃষ্টি করলেন, তা আমাদের বুদ্ধির অতীত," যদি এই কথা বলি, তাহ'লে কি ভুল হবে?"

স্মিতোজ্জ্বল মুখে আচার্য্য কহিলেন, "না, ভুল হবে না। বাস্তবিকই তাই। চৈতন্যই আমাদের চরম বিচারস্থান। প্রাতিভাসিক জগৎকে আমাদের চৈতন্যের মধ্যেই আমরা পাই, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। আবার absolute যে কেবল আমাদের মননের জন্য আবশ্যিক কল্পনা মাত্র, তা নয়। তাকেও আমরা কখনও কখনও অনুভব করি। সে অনুভূতি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (Sense perception) না হ'লেও অব্যবহিত জ্ঞান (direct, immediate perception), তাকেও অস্বীকার করা যায় না। প্রাতিভাসিক জগৎ অনিত্য, অনবরত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু absolute-এর মধ্যে কালের প্রবেশ নাই, তাহা নিত্য, পরিবর্ত্তনহীন, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির। সেই নিশ্চল, নির্বিকল্প absolute আর এই চঞ্চল পরিণামশীল জগৎ, ইহাদের মধ্যে যে সেতুটা আছে, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধির (Intellect) বিষয়ও নয়। তাকে absolute-এর মত অনুভবও করা যায় না; সুতরাং তাকে mysterious বই আর কিছু বলা যায় না।

টেলিগ্রাফ

পোলিশ লেখক Boleslav Prus-এর "The Human Telegraph" গল্পের অনুসরণে

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

অনাথ-আশ্রম পরিদর্শন করতে গিয়ে জনৈকা জমিদার-পত্নী একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন যে চারটি ছেলেমেয়ে একখানা ছেঁড়া বই নিয়ে খুব কাড়াকাড়ি মারামারি করছে। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, "এ কি, এ কি, অ্যাঁ, তোমরা ঝগড়া করছ—ছি ছি! শাস্তিস্বরূপ তোমাদের আজ মিষ্টি খেতে দেওয়া হবে না, আর সকলকে ঐ কোণে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকতে হবে।"

একটি বালক অপরাধ ক্ষালনের জন্য সাহসে ভর ক'রে ব'লে ফেললে, "ও আমার কাছ থেকে, 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' কেড়ে নিয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন বললে, "মিথ্যা কথা, ও নিজেই নিয়েছে বইটা আমার কাছ থেকে।" তৃতীয় জন অমনি চীৎকার ক'রে উঠল, "আর তুমি যে নিজেই মিথ্যা কথা বলছ এখন! তুমিও তো আমার কাছ থেকে নিয়েছ।"

অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তখন বললেন, যে, তাঁদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায়ই এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে, কারণ ছেলেরা সকলেই বই পড়তে খুব ভালবাসে, অথচ আশ্রমে প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তকের সংখ্যা খুব কম।

জমিদার-পত্নীর মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার হ'ল, কিন্তু বেশী চিন্তা করলেই তাঁর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হ'ত ব'লেই তিনি তা ভুলে যেতে চেষ্টা করলেন। কয়েক দিন বাদে এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে ধর্ম্ম ও মানবকল্যাণ-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা

প্রসঙ্গে তাঁর এই ব্যাপারটার কথা মনে পড়ে গেল—তখন তিনি উপস্থিত সকলের কাছে ঘটনাটি বিশদভাবে বিবৃত করিলেন।

ব্যারিষ্টার খুব মন দিয়ে শুনলেন—তাঁরও মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হ'ল। তাঁর চিন্তা করবার অভ্যাস ছিল, কাজেই তিনি একটু ভেবেই এই প্রস্তাব করলেন যে, উক্ত অনাথ-আশ্রমে কতকগুলি বই পাঠিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। তাঁর আরও মনে প'ড়ে গেল যে, তাঁর বইয়ের শেল্ফে অথবা বাক্সে বা অন্য কোন এক জায়গায় অনেকগুলি বই—যা এক সময় তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য কিনেছিলেন, পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো এখন খুঁজে বের করা এক ভীষণ হাঙ্গামের ব্যাপার।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি এক ভদ্রলোকের বাড়ী গেলেন। এই ভদ্রলোকটি দেশের ও সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। অনাথ-আশ্রমে যা যা ঘটেছিল ব্যারিষ্টার তাঁর কাছে সব বললেন। একথাও বললেন—তাঁর নিজের মনে হয় যে অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তক সংগ্রহ ক'রে দেওয়া উচিত।

সমাজ-সেবক বললেন, "বেশ তো এর জন্যে আর ভাবনা কি? এ তো খুবই সহজ—আমি কালই গিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে অনাথ-আশ্রমে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাপিয়ে দেব।"

পরের দিন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদকের ঘরে ঢুকে তাঁকে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাঁর কাগজে অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তক প্রার্থনা করে জনসাধারণের কাছে একটা আবেদন-লিপি অবিলম্বে প্রকাশ করেন।

তিনি উপযুক্ত সময়েই এসেছিলেন, কারণ সংবাদপত্রে তখন দুই-একটি উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদের প্রয়োজন ছিল। সংবাদ-লেখক তখনই ব'সে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। তার শীর্ষদেশে লেখা হ'ল—"সাধারণের কৃপায় প্রতিপালিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু পুস্তকের অভাবে ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে—পাঠস্পৃহাতুর এই শিশুগুলি উৎসুক, ব্যগ্র ভাবে পুস্তকের প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহাদের উপবাসী আত্মার কথা স্মরণ রাখিবেন।"

তার পর তিনি পরিতৃপ্ত চিত্তে বাড়ী ফিরলেন।

কিছু দিন বাদে এক রবিবারে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পাদকীয় আপিসে ঢুকতে গেয়ে দেখলাম যে দরজার পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পরনে জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদ—হাত দুটো ধাঙ্গড়ের মত ময়লা—সঙ্গে একটি শীর্ণকায়া ম্লানমুখী বালিকা। বালিকার হাতে এক তাড়া পুরনো বই; তারও যথোপযুক্ত পরিচ্ছদের একান্ত অভাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মহাশয়ের প্রয়োজন?"

টুপি তুলে অভিবাদন ক'রে কালিঝুলি-মাখা লোকটি সসঙ্কোচে বললে, "আপনারা যে উপবাসী শিশুদের কথা লিখেছিলেন, তাদের জন্য আমরা খানকয়েক বই এনেছি।" রক্তলেশহীন শীর্ণ মেয়েটি সলজ্জে নমস্কার ক'রে বইগুলি আমাকে দিল, আমি তার কাছ থেকে বইগুলি নিয়ে আপিসের বেহারার জিম্মা ক'রে দিলাম, তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মহাশয়ের নাম?" লোকটি লজ্জিত হয়ে বললে, "কেন আপনারা নাম দিয়ে কি করবেন?"

—যারা যারা বই দেবেন তাঁদের নাম ছাপাতে হবে কি না—

—না না, তার কোন দরকার নেই। আমি এক জন সামান্য লোক, টুপির কারখানায় কাজ করি মাত্র; না না, এ-সবের কোন দরকার নেই।

মেয়েটির হাত ধ'রে সে চলে গেল।

হয়ত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লেই আমার একটা নূতন ধরণের টেলিগ্রাফের কথা মনে হ'ল, তার প্রধান ষ্টেশন হচ্ছে অনাথ-আশ্রম আর গ্রাহক-ষ্টেশন হচ্ছে টুপির কারখানার মজুর। সে যখন সঙ্কেতধ্বনি ক'রে বললে, "শোন"—এ তখন কান পেতে মনোযোগের সঙ্গে শুনলে, তার অভাব এ পূরণ করল। বাকী আমরা আনুষঙ্গিক তার ও খুঁটির কাজ করলাম মাত্র।

আলোচনা
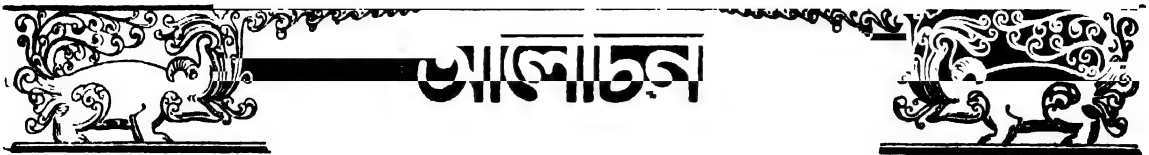
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কেন যে প্রবাসী পত্রিকায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমার 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখিলাম আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রও উহার সমর্থনে (১) মুদ্রিত করিয়াছেন। 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক হিসাবে এ বিষয়ে আমার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফৎ এক খণ্ড পুস্তক প্রবাসীতে সমালোচনার জন্য আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল। (২) কিন্তু উহার কোনও সমালোচনা বা প্রতিবাদ সে সময়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। হইলে একটা সুবিধা আমার এই হইত যে, প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু সত্যের আলোক পাত করিতে পারিতেন। কারণ, প্রবাসীর পক্ষ হইতে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা এবং রচনার চুম্বক চাওয়া সম্পর্কে আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, চারুচন্দ্রের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের জীবনীতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সত্য এবং প্রকৃত ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রবাসী-সংক্রান্ত এই ব্যাপার যে শরৎচন্দ্রের আরও একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মীয় ও অন্তরঙ্গগণও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, এই সঙ্গে প্রেরিত প্রমাণপত্রখানি হইতে আপনি তাহা নিঃসন্দেহ রূপে অবগত হইতে পারিবেন। (৩) এবং ইহাও বুঝিতে আপনার অসুবিধা হইবে না যে 'শরৎচন্দ্র ও প্রবাসী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া জানিয়া ও বুঝিয়াই লিখিয়াছি। 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' বা 'কাল্পনিক' কিছুই লিখি নাই।

কিন্তু, শ্রাবণের প্রবাসীতে আপনি যাহা বলিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি যাহা লিখিয়াছেন, উহা পড়িয়া স্বতঃই মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, তবে কি আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কোথাও কিছু গলদ আছে? জীবনীকারের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমি এ-সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট হইতে সত্যনিরূপক তথ্য কিছু পাওয়া সম্ভব এরূপ কয়েক জনের সহিত ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল এবং তাঁহার প্রথম ও শেষ জীবনের দুঃখসুখের সঙ্গী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যিনি শরৎচন্দ্রের একখানি সুবৃহৎ জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনি বলেন প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষ চুম্বক দেখিতে চাহেন বলিয়া শরৎকে চারুচন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং শরৎ এই ঘটনা কবিকে জানাইলে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া শরৎকে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, এই দুইখানি চিঠিই তিনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার মনে হয় ইহা হয়ত চারুচন্দ্র নিজের দায়িত্বে করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু না জানিতেও পারেন। (৪)

আমি কিন্তু চারুচন্দ্রের জামাতা শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাবাজীবনের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলাম যে তিনি এবং চারুচন্দ্রের পুত্রকন্যাও চারুচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। (৫)

অতঃপর আমি শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাই। তিনি বলেন, প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে এই সেদিনও পর্য্যন্ত একাধিক বার দাদাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। (৬) কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সামতাবেড়ের বাড়ীতে রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবু, জামাতা কালিদাস নাগ মহাশয় এবং প্রবাসীর তদানীন্তন এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাদার নিকট প্রবাসীর জন্য লেখা চাহিতে আসিয়াছিলেন। (৭) দীর্ঘকাল আমাদের উঁহারা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু কাগজ দুইখানি বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক দাদাকে লিখিত অনেক পত্রই আমাদের সামতাবেড়ের বাড়ীতে আছে। আমি এক দিন সময়মত সেখানে গিয়া সেগুলি খুঁজিয়া দেখিব। এ সম্পর্কে লিখিত কবির পত্রখানি যদি পাই, আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ, যিনি ভূতপূর্ব্ব 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বঙ্গবাণীতে দীর্ঘকাল ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিও এ-ঘটনা সমর্থন করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে'ও এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। সুতরাং এ-সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নির্ণয় একটা জটিল ও কঠিন সমস্যা হইয়া

দাঁড়াইতেছে। পূজনীয় কবির চিঠির মধ্যেও একটি লাইনে একটু যেন গোল রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যাপারটা যে সময়ের, শরতের সঙ্গে তখন আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু ব্যাপারটা যে কোন্ সময়ের আমার গ্রন্থে তাহার কোথাও কোন উল্লেখ নাই। কারণ, শরৎচন্দ্র কোন সন তারিখ বা নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া আমাদের কাছে উহা বলেন নাই। তাই মনে হয় আপনার পত্র পড়িয়া কবি সম্ভবতঃ কোথাও কিছু বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিবেন। কবিকে লিখিত আপনার পত্রখানি এই প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এ সমস্যার হয়ত কতকটা নিরসন হইতে পারিত। (৮) যাহা হউক, এ-সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্ত আমি শীঘ্রই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিব। বহুদিন পূর্ব্বের এই এক তুচ্ছ ঘটনা বহুকার্য্যে-ব্যাপৃত কবির স্মৃতি হইতে অপসৃত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এবং ইহাও আমি অসম্ভব মনে করি না যে প্রবাসী-সংক্রান্ত এ-ব্যাপারটা হয়ত আপনার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান আবশ্যক। উহার পরে যদি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ রূপে জানিতে পারি যে এ ব্যাপার প্রকৃতই সত্য নহে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা স্থান পাইবে না। আপনার মন্তব্যের মধ্যে দেখিলাম আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সত্য পরিজ্ঞাত আছেন এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরলোকগত বলিয়া তাহা বলিতে বিরত হইয়াছেন। আমার মনে হয় আপনার এ-যুক্তি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের সত্য-সন্ধানে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। উহা প্রকাশ করিয়া বলাই বোধ হয় সঙ্গত। (৯) ইতি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসী পত্রিকায় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কখনও প্রকাশিত হয় নাই কেন, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব-প্রণীত 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের মুখ হইতে এই ঘটনার অবিকল (১০) এইরূপ ইতিহাস আমরাও শুনিয়াছিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ (অধ্যাপক, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল)
সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পাদক, মৌচাক)
শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'বিচিত্রা')
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (সম্পাদক, 'বাতায়ন')

এই পাঁচ জন ভদ্রলোকই স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রতিবাদটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিবার সুবিধার নিমিত্ত আমি উহার কোন কোন স্থানে একাদি সংখ্যা বসাইয়া ছাপিয়াছি। সংখ্যাগুলি মূল প্রতিবাদে নাই।

গোড়াতেই একটি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি এই প্রসঙ্গে শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপিয়াছি, তাহার এই বাক্যটি তিনি পরে বাদ দিতে লিখিয়াছিলেন: "ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু তাঁহার সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দের এতদ্বিষয়ক পত্র যখন আমার হস্তগত হয়, তখন শ্রাবণের প্রবাসী বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহা বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সেই আদেশের উল্লেখ করিলাম।

(১) নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের যে প্যারাগ্রাফটিতে আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতি আছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত থাকায় আমাকে তাঁহার চিঠি তাঁহার অনুমতি লইয়া ছাপিতে হইয়াছে। নতুবা তাঁহার নাম এরূপ ব্যাপারে আমি জড়িত হইতে দিতাম না।

(২) নরেন্দ্র বাবুর এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আমি পাই নাই ও দেখি নাই। প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ বহি তাঁহাদিগকে কেহ দিয়াছিলেন বা তাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে পড়ে না। নরেন্দ্র বাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবার পর আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি বহি কিনাইয়া আনাইয়াছিলাম।

(৩) নরেন্দ্র বাবু যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, কল্পনা করিয়া বা বানাইয়া কিছু লেখেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কোনই বাধা নাই। সাক্ষীদিগকে ও আমাকেও অবিশ্বাস করি না!

(৪) চারু বাবু শরৎবাবুকে কিছু লিখিয়াছিলেন কি না, সে-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ও বলিতে পারি না। যদি তিনি চুম্বক চাহিয়া থাকেন, নিজের দায়িত্বে চাহিয়া থাকিবেন; "প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষ" অর্থাৎ সম্পাদক কখনও চুম্বক চান নাই।

এখানে আর একটি কথা বলা অনাবশ্যক হইবে না। চারু-বাবুর যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্টাচারবোধ ছিল। কাহাকেও নিজেই লিখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকেই আবার আগাম চুম্বক পাঠাইতে বলা খুব শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া মনে করিবার মানুষ চারুবাবু ছিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ।

(৫) "শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি [চারুবাবু] করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়", একথা আমি এই প্রথম শুনিলাম; আগে জানিতাম না। প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষ ও

মডার্ণ রিভিয়ুর কর্ত্তৃপক্ষ এক। মডার্ণ রিভিয়ুতে সেই কর্ত্তৃপক্ষ "বিন্দুর ছেলে"র অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ প্রবাসীতে শরৎবাবুর কোন লেখা, পাইবার সব বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই কর্ত্তৃপক্ষই ছাপিতে রাজী হয় নাই, ইহা তথ্য বলিয়া মানিতে হইবে দেখিতেছি।

এই কর্ত্তৃপক্ষ আরও দুই একটা কাজ করিয়াছিল। যেমন—যখন শরৎ বাবুর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়, তখন মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার প্রতিবাদ যুক্তিসহকারে করা হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের শেষ প্যারাগ্রাফে ছিল :—

"It will help our readers to understand the position of Babu Sarat Chandra as an author if we tell them that at Villeneuve, Switzerland, M. Romain Rolland told us in the course of our conversation with him that he had read the Italian translation of the English translation of Sarat Chandra's *Srikānta*, and he observed that the author was a novelist of the first order. As M. Rolland does not read or speak English, he had to form his judgment of Sarat Chandra's quality as a novelist from a translation of a translation; yet that was his opinion. But some underling of the Bengal Government has scented sedition in one of Sarat Chandra's works and so it is a book dangerous to society! Or is it to the bureaucracy?"—*The Modern Review* for February, 1927, p. 261.

ফরাসী মনীষীর সহিত আমার কথোপকথনের এই অংশ জেনিভা হইতে প্রেরিত ও ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের চিঠিতেও বাহির হইয়াছিল। সেই প্রসিদ্ধ বিদেশীর কাছে শরৎবাবুর কোন গ্রন্থের এই আদরের কথা ইহার আগে বঙ্গে বোধ হয় কেহ জানিত না।

কোন লোকের কাছে লেখা চাওয়া দোষের বা লজ্জার বিষয় নহে। আমি শরৎবাবুর কাছে লেখা চাহিয়া থাকিলে তাহা অস্বীকার করিতাম না।

শরৎবাবুর মৃত্যুর কিছু পরে চারুবাবু তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ দেন এবং তাহার প্রুফও তিনি দেখেন। (শরৎ বাবুর বন্ধু ও ভক্তদের মতে) বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট এই বিষয়টির কোনই উল্লেখ ঐ প্রবন্ধে নাই। "বিশেষগুরুত্ববিশিষ্ট" এই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহারা বলিতেছেন তাঁহারা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন শরৎবাবুর লেখা প্রবাসীতে কেন বাহির হয় নাই।

৬। "প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে" শরৎবাবুকে একাধিক বার অনুরোধ যদি একাধিক ব্যক্তি করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। আমি কখনও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই, অন্যের দ্বারাও অনুরোধ করাই নাই।

৭। নরেন্দ্র বাবু শরৎবাবুর ভ্রাতা প্রকাশবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমান্ কালিদাস নাগ প্রভৃতির সামতাবেড়ে শরৎবাবুর বাড়ী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা গিয়াছিলেন ইহা ঠিক্। কখন্ ও কি জন্য গিয়াছিলেন, তাহা আমি তাঁহাদের যাইবার আগে ও ফিরিয়া আসিবার পরেও জানিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহারা আমার কোন শিষ্টাচারসম্মত নমস্কারসম্ভাষণাদি লইয়া যাইতে পারেন নাই, কোন অনুরোধ ত লইয়া যানই নাই।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শরৎবাবুর সহিত কালিদাস প্রভৃতির সাক্ষাৎকারের একটি সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখ নাই। তাহাতে শরৎ বাবুকে কোন প্রকার অনুরোধ করার কথা নাই। লেখাটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১লা প্রকাশিত জানুয়ারী সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে থাকায় বোধ হইতেছে সাক্ষাৎকার ১৯২৬ সালের কোন সময়ে হইয়া থাকিবে। নবেম্বরে হইয়া থাকিলে আমি তখন ভারতবর্ষে ছিলাম না। লীগ অব নেশুন্স দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া যে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেই বিদেশযাত্রা হইতে ১৯২৬ সালের ৩০শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

শ্রীমান্ কালিদাসকে এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, এক যুগ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে—যতটা তাঁহার মনে পড়ে তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ও তিনি অনেক দিন হইতে শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাস ১৯২৩ সালের শেষে বিলাত হইতে ফিরিবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার গ্রন্থাদির ভাল অনুবাদ না হওয়ায় পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তাঁহার যথোচিত আদর হইল না। ১৯২১-২৩ সালে ইটালী ভ্রমণকালে কালিদাস অধ্যাপক জি. তুচ্চি ও অধ্যাপক বি. ফিল্লিপীর সহিত শরচ্চন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ শেষ হইলে ফিল্লিপী কালিদাসকে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া শরৎবাবুর কিছু গল্প অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে কালিদাস ইহার ভার লইতে পারেন নাই। কিন্তু শরৎবাবু তাঁহার সঙ্গে এই অনুবাদ-প্রসঙ্গ একাধিক বার করিয়াছিলেন এবং তিনি শরৎবাবুকে জানান যে শ্রীমান্ অশোক অনুবাদ ভাল করেন ও তৎকৃত অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইতে পারে, এবং এই কাগজের মারফতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের বাহিরে বহু সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কালিদাস প্রভৃতি সামতাবেড়ে গেলে শরৎচন্দ্রের সৌজন্যে ও আতিথ্যে যে মুগ্ধ হন তাহার প্রমাণ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত ও উপরে উল্লিখিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে আছে। শরৎবাবু অশোককে 'বিন্দুর ছেলে' অনুবাদ করিতে বলেন। কালিদাস আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন

যে প্রবাসীতে লেখা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের কোন কথা হয় নাই।

মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী যে দীর্ঘকাল শরৎবাবুকে নমস্কার করিতে যাইত, তাহার কারণ 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ তিনি 'মডার্ণ-রিভিয়ু'তে প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন, এবং আমি তাহার কোন আর্থিক প্রতিদান করি নাই।

(৮) রবীন্দ্রনাথকে আমি যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে কবি কখনও শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না, এবং ঐ প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন কি না। তাঁহার উত্তর আদ্যোপান্ত শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

তিনি যে চিঠিখানি দ্বারা উক্ত পত্র ছাপিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, নীচে তাহাও প্রকাশ করিতেছি।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১।৭।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯) আমি "জনশ্রুতি"টির উৎপত্তি সম্বন্ধে আগে যে কারণে কিছু লিখি নাই, এখনও সেই কারণে কিছু লিখিব না।

(১০) নরেন্দ্রবাবু কতকগুলি ভদ্রলোকের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। কারণ, আমি আসামী, আমার কথা নির্ভরযোগ্য না হওয়াই বোধ করি আইনসঙ্গত।

কিন্তু অনেকের ইহা জানিবার কৌতূহল হইতে পারে যে, সাক্ষীরা দল বাঁধিয়া কোন এক দিন কোন এক সময়ে নরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করিয়া সকলে একত্র শরৎবাবুর নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকে নিবদ্ধ কথাগুলি "অবিকল" বলিয়াছিলেন; না, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একা একা গিয়া "অবিকল" ঐ কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। ইহাও জানিতে কৌতূহল হইতে পারে যে, তাঁহারা শরৎবাবুর কথাগুলি শুনিবামাত্র "অবিকল" টুকিয়া রাখিয়াছিলেন কি না। আমি দেখিয়াছি, অনেক রিপোর্টার যে-বক্তৃতা, শুনিতে শুনিতে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লন, তাহার রিপোর্টও কচিৎ "অবিকল" ঠিক হয়, ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টারের রিপোর্ট কিছু ভিন্ন ভিন্ন হয়, "অবিকল" এক হয় না, এবং আমরা প্রতিভাহীন লোকেরা একই ঘটনার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করিলে বর্ণনার খুঁটিনাটি ও ভাষার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতি অনুমান করিয়া, তাঁহার কথা নির্ভরযোগ্য নহে, কার্য্যতঃ ইহাই বলা হইতেছে—যদিও তিনি এখনও নিজের জীবনের বহু কথা বলিতেছেন, এবং জড়বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ বহি লিখিতেছেন। ভুলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই তাহা সম্ভব অথবা নিশ্চিত—নরেন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ ইহা বলিবেন না; কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ পড়িলে এরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

অবশ্য, আসামী ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর সকলের কথাই যে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কারণ, আমাদের দেশে যাঁহাদের কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায় এবং যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি সাতিশয় বলবতী, তাঁহাদের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষ্যে কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি জানেন, ইহা গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী যুগ। এখন পাটীগণিতের প্রাধান্য যতটা স্বীকৃত হয়, কোন প্রকার বৈয়ক্তিক বৈশিষ্ট্য ও অসাম্য সেরূপ স্বীকৃত হয় না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৬।

পুঃ। প্রবাসীর নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না।

র. চ.।

"বেহুলার স্মৃতি-সভা"

গত ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" বর্দ্ধমান শহর হইতে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী কসবা চম্পানগর গ্রামে বেহুলার স্মৃতি-সভার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় স্মৃতি-সভা, স্মৃতি-পূজা, স্মরণার্থ সভা ইত্যাদির এদেশে প্রচলন ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ আবহমান কাল হইতে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট ও তিথি-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি রূপে। স্বগোষ্ঠী ব্যতীত সমাজের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের

উপলক্ষে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান ভীষ্ম-তর্পণ, রাম-তর্পণ ইত্যাদি রূপে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সমাজে ইহারই পরবর্তী রূপ তিরোভাব-উৎসব ইত্যাদি। তৎস্থলে শিক্ষা ও রুচি প্রভাবে স্মৃতি-সভা ইত্যাদির প্রধান প্রবর্ত্তক ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পরলোকগমনের পর হইতে নিয়মিত তাঁহাদের স্মৃতি-সভা বা স্মৃতি-পূজা করিতে থাকেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সেই অনুষ্ঠানের ধারাই বর্ত্তমান দেশ-প্রচলিত স্মৃতি-পূজা বা স্মৃতি-সভানুষ্ঠানের ব্যাপক পরিণতি বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ এখন শিক্ষা ও শ্রদ্ধানুবশে বর্ত্তমান পুরুষের বহু উর্দ্ধতন বহু প্রাচীন কালের পরলোকগত মহাপুরুষদিগের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণ হইয়াছে। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও স্মৃতি-পূজা আরম্ভও করিয়াছি। এই সূত্রে কবি ও মহাকবি-দিগের দিক্ দিয়া কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যিকদিগের স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতে স্রষ্টাকে বাদ দিয়া সৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি-সভা দেখা যায় না। যথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজা হয়, সীতাদেবীর স্মৃতি-সভা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা হয়, দেবী-চৌধুরাণীর স্মৃতি-সভা হয় না, ইত্যাদি। সীতাদেবীর স্মৃতি-সভা হয় না, নিয়মিত পূজাই হয়—সীতাষ্টমীতে। তদনুসারে বেহুলার স্মৃতি-সভা হওয়া অনুচিত। বেহুলার পূজারই প্রচলন আছে—নির্দ্দিষ্ট দিনে। এই সব দেবতা ও দেবতাস্থানীয়দিগের স্মৃতি-সভা হয় না—পূজা হয়। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে না পাইলেও যাঁহাদের অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন স্বীকার্য্য, অথবা, যাঁহাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য অনাহত কাম্য তাঁহাদের স্মৃতি-সভা কেন? ইহার উপসংহারে অপর একটা কথাও বলিতেছি যে, বাংলা দেশে দুর্গা-পূজা না করিয়া কেহই বোধ হয় দুর্গার স্মৃতি-সভা করিবেন না।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন

মহিলা-সংবাদ

শ্রীঅতসীপ্রভা দে এই বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বি. এ. ও বি. এসসি. পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম ও সকল বি. এসসি. পরীক্ষার্থীর মধ্যে দশম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি এখন পদার্থবিজ্ঞানে এম. এসসি. অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীলীলা ঘোষ কেন্দ্রীয় পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি ভারত-সরকারের সেক্রেটারিয়েটের দেশরক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে ইনি সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় মহিলা। কুমারী লীলা ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী।

শ্রীঅতসীপ্রভা দে

শ্রীলীলা ঘোষ

নেপালে ১৭ই ভাদ্র

শ্রীশিবনারায়ণ সেন

আজ ১৭ই ভাদ্র শ্রীশ্রীশ্রীযুদ্ধ শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার রাজ্যভারগ্রহণের সপ্তম বাৎসরিক উৎসব। দাদূ বলেছেন, "পর্চা মাঁগৈঁ লোগ সব……"—লোকেরা-সব চায় পরিচয়; ইনি কে, কেনই বা তাঁহার জন্য এত ঘটা? তাই এই কর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে লিপিবদ্ধ করছি।

৺পশুপতিনাথ হিন্দুমাত্রেরই একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থের সঙ্গে ভারতবাসী অনেকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। তাই নেপাল দুর্গম হ'লেও ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নয়। হিমগিরিকন্দরস্থিত এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যটি ক্রমেই সভ্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নেপালের অতীত গৌরব চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে নেপাল আপন আসন অধিকার করবার ব্যবস্থা করছে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা আছে নেপাল একটি ছোট দেশ, গরিব দেশ—অদ্ভুত এই দেশ, কিম্ভূতকিমাকার তার জনপ্রাণী। কিন্তু এ-ধারণা ভ্রান্ত। নেপাল শুধু গুর্খা-সৈন্যের আবাসভূমি নয়—এখানকার দর্শন, শিল্প ইত্যাদি এ-দেশের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। নেপালের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার শিল্পকলায়, তার "পঞ্চবুদ্ধ"-কল্পনায়, তার তন্ত্রমন্ত্রে। এ-দেশ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত। হলেও বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক এদেশ-বাসীর উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। আধুনিক কালের সঙ্গে এদেশবাসী সুপরিচিত। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির চর্চ্চা এদেশে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং চর্চ্চার সুবন্দোবস্তও হচ্ছে।

কাউকে সত্য ক'রে দেখতে হ'লে তার দিক্ থেকেই তাকে দেখতে হবে। নেপালকে নেপালের দিক্ থেকে দেখলে তার উপর আর অবিচার করা হবে না।

লণ্ডনে নেপালী দূতাবাস

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্ধান করেছে। নেপালের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি হচ্ছেন মহারাজা যুদ্ধ শামসের। সংবৎ ১৯৩২, বৈশাখ কৃষ্ণা-চতুর্থীতে ইনি জেনারেল ধীর শামসের রাণার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ধীর শামসের ছিলেন নেপালের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ এবং কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রী। যুদ্ধ শামসের তাঁর দশম পুত্র। তাঁর অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে মহারাজা বীর শামসের, মহারাজা দেব

শামসের, মহারাজা চন্দ্র শামসের, মহারাজা ভীম শামসেরের নাম উল্লেখযোগ্য। ধীর শামসেরের পুত্রদের মধ্যে মহারাজা যুদ্ধই এখন জীবিত। সংবৎ ১৯৮৯, ১৭ই ভাদ্র রাত্রিযোগে মহারাজা ভীম শামসেরের দেহাবসান ঘটলে ১৭ই ভাদ্র ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। নেপালের এই রাণা-বংশ শিশোদীয়া-কুলগৌরব উদয়পুর-মহারাণার সগোত্র। এঁরা সূর্য্য-বংশী। শৌর্য্যে বীর্য্যে মহারাজা যুদ্ধ শামসের প্রকৃত রাজপুত।

ইনি কর্ম্মযোগী, কর্ম্মেই সদাসর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন। ইনি এক জন শ্রেষ্ঠ শিকারী এবং অশ্বারোহী। রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে ইনি অপরাজেয়, দৈহিক শক্তিতে ইনি অতুলনীয়, ব্যবহারে অতিমিষ্টভাষী ও বিনয়ী। এমন দেশ-প্রেমিক ও প্রজাবৎসল শাসক অতি বিরল, প্রজাদের সুখদুঃখের অংশ এমন ক'রে অতি অল্প শাসকই নিয়ে থাকেন। অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ইনি, অথচ সংস্কারের বশে মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। তাঁর দেহ যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই সুঠাম, মূর্ত্তি সুন্দর ও সৌম্য; মন অতি কোমল হ'লেও বিচারকালে তিনি দেবতার মত কঠোর, পক্ষপাতিত্বশূন্য।

ইনি চান দেশ ও দেশবাসীকে বড় করতে, উন্নত করতে। জগৎ-সভায় নেপালকে প্রচার করবার মানসে ইনি সারা দেশকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। এঁরই প্রচেষ্টায় আজ নেপালের জাতীয় জীবনের চতুর্দ্দিকে নব নব প্রেরণার উন্মেষ হয়েছে, জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে নেপাল আজ আধুনিকতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। নেপালের এই জয়যাত্রার অগ্রদূত যুদ্ধ শামসের চেয়েছেন প্রজার সুখ ও শান্তি, দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় কল্যাণ, সর্ব্বোপরি হিন্দুসভ্যতার জয়। এঁর সময়কে নেপালের ইতিহাসে নবযুগ বলা চলবে।

স্বাধীন হিন্দুরাজত্বকে ইনি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে লণ্ডনে প্রথম নেপালী দূতাবাস (Nepalese Legation) প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উদ্যোগ-পরিষদ্ (Development Board) স্থাপনা করেন। এই উদ্যোগ-পরিষদের কর্ম্মতৎপরতায় আজ নেপালে পাটের কল, চিনির কল, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শিল্পোন্নতির ভার এই বিভাগের হাতে। কুটীর-শিল্প, বিশেষ ক'রে খদ্দর প্রচারের জন্য ঘরেলু বিভাগের (Cottage Industries Department) সৃষ্টি করেন।

নেপাল কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি ও বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে চাষের পরিবর্ত্তনকল্পে কৃষি-পরিষদ্ (Agricultural Department) খোলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা গবেষণা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। বিজ্ঞানের উপর এঁর অগাধ বিশ্বাস—তাই সমস্তই তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে করার পক্ষপাতী। বর্ত্তমান সভ্যতার যা কিছু ভাল তাই তিনি তাঁর জাতির ও দেশের কল্যাণের জন্য আহরণ করতে চান।

সূচনা হ'তেই শিক্ষা এদেশে বিনাশুল্কে বিতরিত হচ্ছে, ইনি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নি। অধিকন্তু শিক্ষা ও সভ্যসমাজের অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ মিউজিয়ম ও চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছেন। দেশের অতীত গৌরব উদ্ধারকল্পে এবং ইতিহাসের গবেষণার জন্য সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ খোলা হয়েছে। মিউ-জিয়মের জন্য ইতি প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে নেপাল বিধ্বস্ত হয়, বহু নরনারীর জীবনাবসান ঘটে—দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়, লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন হয়। দেশের এই দুর্দ্দিনে ইনি রাজকোষ হ'তে ২৯ লক্ষ টাকা প্রজাদের বিতরণ করেন। এই দানের জন্য ইনি চিরস্মরণীয় থাকবেন। যত দিন না গৃহহীন প্রজারা নবগৃহে প্রবেশ করেছে, তত দিন তিনি প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে তাঁবুতে দিনাতিপাত করেন, এমনই তাঁর সমবেদনা প্রজাদের জন্য।

রাজধানী ও রাজত্বের খবর জানবার জন্যে ইনি প্রত্যহ নগর-পরিক্রমা এবং প্রতিবৎসর তিন মাস ধ'রে দেশ ভ্রমণ করেন। এই তাঁর বাৎসরিক শিকার ও ভ্রমণের সময়। রাজত্বের কোথায় কি হচ্ছে, সমস্তই তাঁর নখ-দর্পণে।

রাজ্যপরিচালনায় প্রজাদের মতামত জানবার জন্যে ইনি অধুনা ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। ধীরে ধীরে এ-ব্যবস্থা দেশময় পরিব্যাপ্ত হয় ইহাই তাঁহার সাধু ইচ্ছা।

এইরূপ বহু নব ভাবের প্রবর্ত্তন ক'রে মহারাজা যুদ্ধ শামসের সমগ্র নেপালের প্রিয় ও আদর্শ হয়ে উঠেছেন। নেপালকে ইনি দ্রুত আধুনিকতার পথে নিয়ে চলেছেন।

মহারাজা যুদ্ধ শামসের হিন্দুর গৌরব। তাঁর রাজ্যপরিচালনার সপ্তম বাৎসরিক উৎসবে সমগ্র নেপাল মেতে উঠেছে। চতুর্দ্দিকে তাই আজ উৎসবের বাঁশী শোনা যায়। তাঁর দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা ক'রে দেশবাসীর প্রার্থনা আজ দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে।

মহারাজ যুদ্ধ শামসের জঙ্গ বাহাদুর ও তৎকর্ত্তৃক মৃগয়ালব্ধ প্রাণীর চর্ম্মাদি

কাঠমাণ্ডুর দৃশ্য

নেপাল মিউজিয়ম
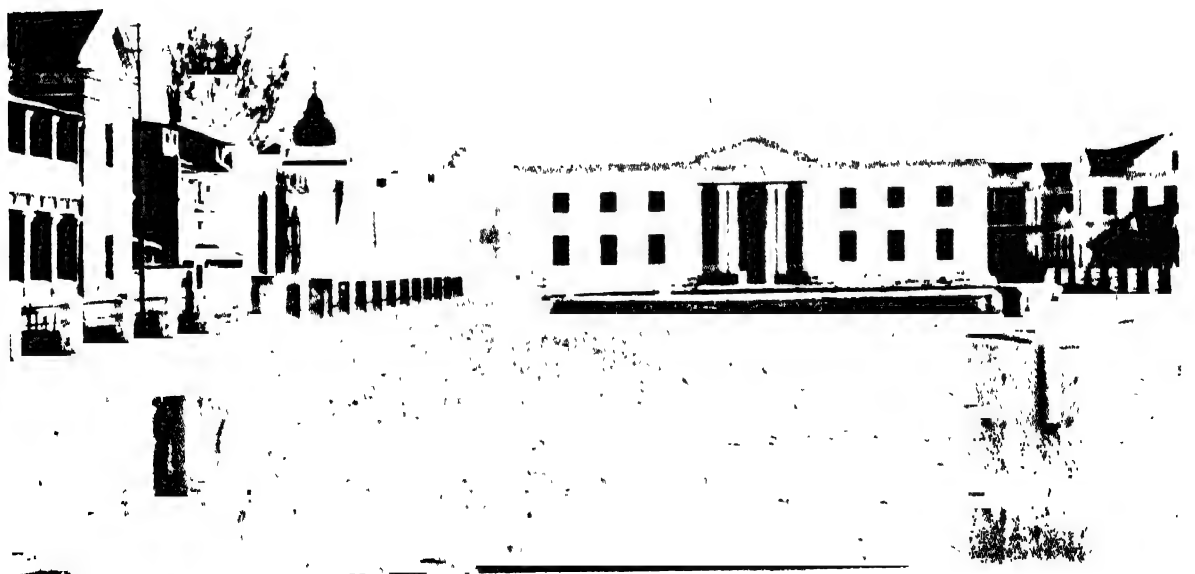
নেপাল ব্যাঙ্ক
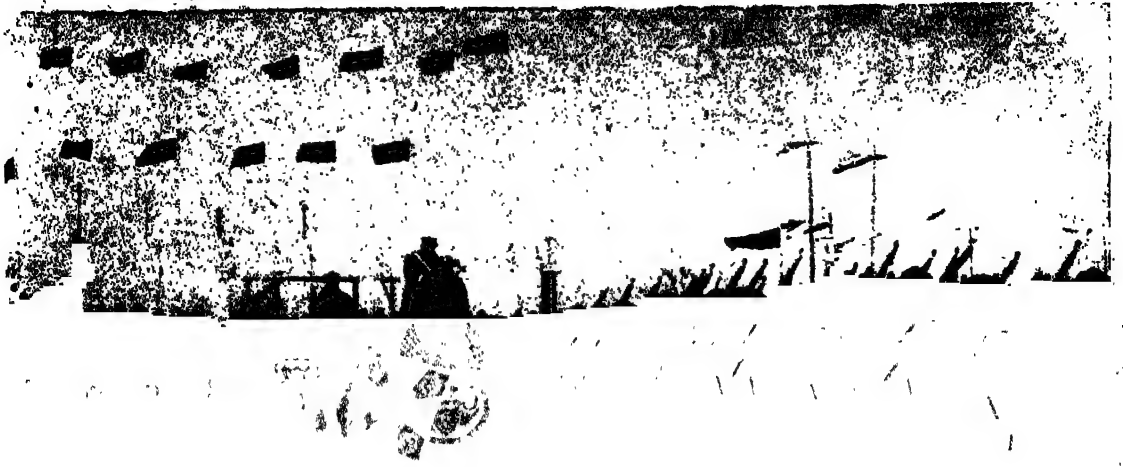
পিলসুড্‌স্‌কি পোলিশ সেনাদল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন

পোলণ্ড ও পিলসুড্‌স্‌কি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত মহাসমরের উপলক্ষ্য হইয়াছিল সার্বিয়া নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। আজ ডানজিগও একটা ভাবী মহাসমরের উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডানজিগকে জার্ম্মানীভুক্ত হইতে দিতে পোলণ্ড কিছুতেই রাজি নয়। অথচ ডানজিগের জার্ম্মান অধিবাসীরা জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হইবেই, জার্ম্মানীও তাহাকে নিজ অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। পোলণ্ড সর্ব্বশক্তি দিয়া জার্ম্মানীর এই কার্য্যে বাধা দিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রিটেন পোলণ্ডের সহায়ক, বন্ধু। পোলণ্ড যুদ্ধে নামিলে ব্রিটেন তাহাকে সাহায্য করিবে। ফ্রান্সের সঙ্গে পোলণ্ডের আগে হইতেই চুক্তি রহিয়াছে। পোলণ্ডের বিপদে ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পোলণ্ডের তথা মধ্য- ও দক্ষিণ- ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের নির্বিঘ্নতা রক্ষায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আশ্বাসদানই যথেষ্ট নহে। সোভিয়েট রুশিয়াকে দলে না পাইলে এই সব রাষ্ট্র রক্ষা করা অসম্ভব। নিজেদের নির্বিঘ্নতাও বিনষ্ট হইবে। ইউরোপের ভারসাম্য (Balance of Power) আর থাকিবে না। তাই ব্রিটেনের পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইবার তাগিদ আজ এত বেশী।

পোলণ্ডকে জীয়াইয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটেন, ফ্রান্সের (ও সোভিয়েট রুশিয়ার) পক্ষে কেন এত বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে তাহা কূটনীতিবিদ্‌দের আলোচনায় বিশেষভাবে জানা গিয়াছে ও এখনও জানা যাইতেছে। চেকোস্লোভাকিয়ার মত একটি সবল, স্বাধীন, উন্নত, গণতন্ত্র-মূলক রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘনাইয়া দিয়াছে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি। আজ এ-কথা কাহারও অজানা নাই। ইহারা তাহাকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দিয়া, পোলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য আজ কেন এত উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে তাহাও কম কৌতূহলের উদ্রেক করে না। বর্ত্তমানে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। পোলণ্ড এখন জার্ম্মানীর চক্ষুশূল। তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনও কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না।

পোলণ্ডের গত দেড় শত বৎসরের ইতিহাস একটি

জাতির দুঃখময় জীবন-কাহিনী। গত মহাসমরের পূর্ব্বেকার মানচিত্রে ইহার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না।

গ্র্যাণ্ডমার্শ্যাল জোসেফ পিলসুড্‌স্কি

মার্শাল পিলসুড্‌স্কির জীবনব্যাপী সাধনার ফলে এই দেশ ও জাতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের ইউরোপে পোলণ্ড একটি সবল স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই তিন শতাব্দীতে এই দেশটি প্রথম শ্রেণীর উন্নত রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বাংলার ইতিহাসে মহারাজ দিব্য যেমন নির্ব্বাচিত রাজা, সপ্তদশ শতাব্দীতে পোলণ্ডেও নৃপতিবর্গ এইরূপ প্রজাসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। এই সময় এক শ্রেণীর ভূস্বামী ও সামন্ত নৃপতির উদ্ভব হয়। তাহারা রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করায় কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পোলণ্ডের পতনেরও ইহাই মুখ্য কারণ।

শতাব্দীর প্রারম্ভে পোলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রুশিয়া (বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব নাম), অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া প্রবল হইতে থাকে। ইহাদের দুর্দ্দমনীয় লোভ স্বভাবতই পোলণ্ডের উপর পতিত হয়। পোলণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ সুরু হয় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সনে রুশিয়াই সর্ব্বপ্রথম ইহার খানিকটা কাড়িয়া লয়। প্রুশিয়া ১৭৯৩ সনে এবং অষ্ট্রিয়া ১৭৯৫ সনে নিজ নিজ দিককার অংশগুলি নিজ রাজ্যভুক্ত করে। অষ্ট্রিয়ার এই রাজ্যভুক্তি-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ সনে। এসব সত্ত্বেও পোলণ্ডের স্বাধীন সত্তা ১৮৬৮ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সওয়া কোটি পোল তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু ইহাতেও বিধি বাম হইলেন। ঐ বৎসর রুশিয়া এই বাকী অংশটুকুও অধিকার করিয়া বসিল।

পোলদের উপর অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী ও রুশিয়ার অত্যাচার সমভাবেই চলিত। তবে শেষ অস্তিত্ব রুশিয়া কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হওয়ায় পোলদের ক্রোধ তাহার উপর বর্ত্তে সকলের চেয়ে বেশী। রুশদের অত্যাচারের মাত্রাও ঢের বাড়িয়া যায়। পোলরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। তাহাদের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা আছে, ভাষা ও সাহিত্যে তাহারা বিজেতাদের চেয়ে কম উন্নত নয়। তাই রুশিয়ার লক্ষ্য হইল পোলদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিলোপসাধন। পোলরা মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে পারিবে না, রুশ ভাষা তাহাদের অবশ্যশিক্ষণীয়। পোল ভাষায় বই ছাপানো, সংবাদপত্র ছাপানো নিষিদ্ধ হইল। শরীরচর্চ্চা, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা তাহাদের পক্ষে বে-আইনী। পোলণ্ডে রুশীয় ধরণের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায় ইহার নাম দেওয়া হয় 'Russification' বা 'রুশীয়করণ'। পোলরা এতাদৃশ অত্যাচারের সম্মুখীন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। প্রথমটা তাই তাহারা কতকটা ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহারা ইহার বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসে। পোল জাতির স্বাধীনতাস্পৃহা কখনও মরে নাই। ইহা বরাবর উজ্জীবিত রাখিয়াছিল পোলদের মায়েরা। বাহিরের বিধিনিষেধের যতই কড়াকড়ি হইতে লাগিল, পোল-জননীরা তাহাদের সন্তানদের হৃদয়ে অতীতের গৌরব-কথা ততই জাগাইয়া তুলিতেছিল। পিলসুড্‌স্কির মাও ছিলেন এইরূপ এক জন নারী। নানারূপ বিরোধী অবস্থার মধ্যেও

তার. শিক্ষা পিলসুড্‌স্কির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

স্বদেশে বসিয়া রুশ-শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে রুশীয় স্কুলে পিলসুড্‌স্কি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কিছুই মাতার শিক্ষাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। রুশদের তাড়াইয়া দিয়া পোলণ্ডকে কিরূপে স্বাধীন করিতে হইবে এই শিক্ষাই তিনি আশৈশব পাইয়াছেন এবং আঠার বৎসর হইতেই তিনি এই কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ১৮৮৭ সনে রুশিয়ার জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। হত্যা-চেষ্টার অপরাধে লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ফাঁসি হইয়া যায়। কোনরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পিলসুড্‌স্কি ধৃত হন এবং পাচ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়া সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হন।

১৮৯২ সনে কারামুক্তির পর হইতে ১৯১৪ সনে মহাসমরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পিলসুড্‌স্কি-জীবনে অদম্য কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু সকল কর্ম্মই নিয়ন্ত্রিত হইত এক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া—পোলণ্ডের স্বাধীনতা অর্জ্জনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পিলসুড্‌স্কি সমাজতন্ত্রবাদের অনুবর্ত্তী লইলেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য উহাই রহিল। তিনি ১৮৯৩ সনে ভিয়েনা শহরে রবট্‌নিক (Robotnik অর্থাৎ শ্রমিক) নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। জাতির মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়া তিনি শীঘ্রই জনগণের হৃদয় জয় করিলেন। রুশ-সরকার বহুবার বিফলমনোরথ হইয়া শেষে ১৯০০ সনে রবট্‌নিকের প্রকাশ-স্থান আবিষ্কার করিলেন! বিচারে পিলসুড্‌স্কির দশ-বৎসর কারাদণ্ড হইল। বলা বাহুল্য, কাগজখানিও বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পিলসুড্‌স্কির প্রথমা পত্নী মেরিয়া সর্ব্বত্র ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তাঁহার সকল কর্ম্মে সাহায্য করিতেন, সকল রকম দুঃখেরও ভাগী হইয়াছিলেন।

পিলসুড্‌স্কি ওয়ার্‌-সয়ের বন্দী-নিবাস হইতে সেণ্ট-পিটার্সবার্গে (অধুনা লেনিনগ্রাড) প্রেরিত হন। সেখানে একজন ডাক্তারের সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯০৪-৫ সনে রুশ-জাপান যুদ্ধে পোলণ্ডের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে উপযুক্ত সময় ভাবিয়া তিনি টোকিও গমন করেন এবং পোলদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় জাপানকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। ইহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া

পিলসুড্‌স্কি ওয়ার্‌-স যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

পোলদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিয়া গেলেন। মধ্যে মধ্যে সম্পন্ন রুশদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেও কসুর করিতেন না। অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায় পিলসুড্‌স্কি ক্রমে বুঝিতে পারেন যে, ইউরোপে মহাসমর আসন্ন। তিনি পোলণ্ডের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ইহার পূর্ণ সুযোগ লইতে জাতিকে আহ্বান করিলেন। তিনি ১৯১৪ সনের প্রারম্ভে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আসন্ন মহাসমরে যদি প্রথম জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়া এবং শেষে ফ্রান্স কর্ত্তৃক জার্ম্মানী পরাজিত হয় তাহা হইলেই পোলণ্ডের স্বাধীনতা পুনরায় লাভ করা সম্ভব হইবে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীই ফলিয়া গিয়াছিল।

মহাসমর আরম্ভ হইলে পিলসুড্‌স্কি তাঁহার স্বেচ্ছা-

যুদ্ধপরিখায় পিলসুড্‌স্‌কি ও সৈন্যগণ
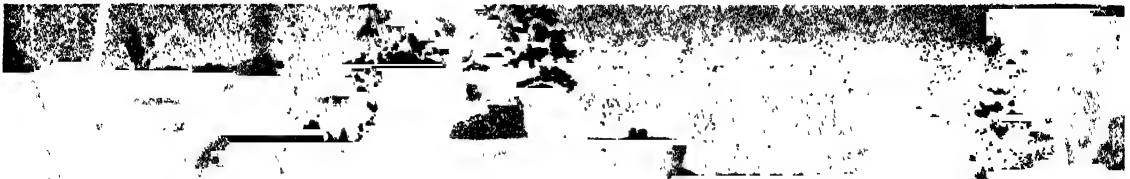
সৈন্যদল লইয়া অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দান করিলেন (৬ই আগষ্ট, ১৯১৪)। দেখিতে দেখিতে ১৯১৫ সনের মধ্যেই রুশরা জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান সৈন্য কর্ত্তৃক পোলণ্ড হইতে বিতাড়িত হইল। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া ১৯১৬, ৫ই নবেম্বর একটি যুক্ত বিবৃতিতে পোলণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। জার্ম্মানীর অত্যাচার কিন্তু ইতিমধ্যে খুবই বাড়িয়া যায়। পোলণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হইলেও পিল্‌সুড্‌স্‌কির ইহা অসহ্য বোধ হইল। তিনি ইহার প্রতিরোধ করিতে পোলদের উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি এ সময়ে জার্ম্মানীর দ্বারা কারারুদ্ধ হইলেন, বিশ হাজার পোল-সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইল (জুলাই, ১৯১৭)।

ইহার পর অতিদ্রুত কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল। পোলণ্ডের বিখ্যাত গীতজ্ঞ পাদেরেভ্‌স্কী আমেরিকায় পোলদের জাতীয় দাবি অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন পোলদের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ চৌদ্দ দফা সর্ত্তের মধ্যে ত্রয়োদশ সর্ত্তে এই দাবির বিষয় উল্লিখিত হয়। ১৯১৮ সনের নবেম্বরে যুদ্ধ বিরতি হইলে পিলসুড্‌স্‌কি মুক্তি লাভ করিয়া ১১ই নবেম্বর সগৌরবে ওয়ার্‌স নগরীতে প্রবেশ লাভ করেন। জার্ম্মানী পোলণ্ডের শাসন-ভার কাউন্সিল অফ্‌ রিজেন্সী নামে একটি পরিষদের উপর অর্পণ করিয়াছিল। পিল্‌সুড্‌স্‌কি এই শাসন-পরিষদ তুলিয়া দিয়া নিজেই পোলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। পোলণ্ড একটি রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

অতঃপর ভের্সাই সন্ধি। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ত্রয়োদশ দফাটি এই,—

"An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by an indispensable Polish population, which should be assured free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial interity should be guaranteed by international convent."

সর্ত্তটি মূলতঃ স্বীকৃত হইলেও ভের্সাই সন্ধিতে ইহার অনেকটা রদবদল হয়। ডানজিগকে একটি স্ব-শাসিত নগরী (Free City) বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পূর্ব্বে পোলণ্ড যখন স্বাধীন ছিল তখনও ডানজিগ পোলণ্ডেরই কর্ত্তৃত্বাধীন

ছিল। ডানজিগকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইলেও পোলণ্ড ইহার পশ্চিমে এক ফালি জায়গা লাভ করিল। এখান হইতেই তাহার সমুদ্রে বাহির হইবার একমাত্র পথ।

পিলসুড্‌স্‌কির অবিরত চেষ্টার ফলে শত্রু মিত্র সকলেই এইরূপে পোলণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। রুশিয়ায় তখন বিপ্লব উপস্থিত। মিত্রশক্তিরা প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, পিল্‌সুড্‌স্‌কি রুশ বিপ্লবীদের সাহায্য করিতে ব্যগ্র। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইহার বিপরীতই প্রমাণিত হইল। পিল্‌সুড্‌স্‌কি পোলণ্ডের স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রে চান। তাই যখন বিপ্লবী রুশ শক্তি একেবারে ওয়ার্-স নগরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি পোল-বাহিনী লইয়া তাহাদের বাধা দিলেন। ভিষ্টিউলার যুদ্ধে (জুলাই, ১৯২০) রুশ সৈন্য একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। পোলণ্ডের স্বাধীনতার পথে অতঃপর আর কোন বিঘ্ন রহিল না। ভের্সাই সন্ধিতে যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছিল, ১৯২১ সনে মার্চ্চ মাসের রিগা চুক্তিতে তাহা অনেকটা সংশোধিত হইল।

পিল্‌সুড্‌স্‌কি অতঃপর পোলণ্ডের সংগঠনকার্য্যে মন দিলেন। গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স এবং পোলণ্ডের মধ্যে একটি আত্মরক্ষার চুক্তি সংঘটিত হইল। লোকার্ণ চুক্তির পরে চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গেও পোলাণ্ড বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। পিল্‌সুড্‌স্‌কি আভ্যন্তরিক দলাদলি হেতু মধ্যে তিন বৎসর (১৯২৩-১৯২৬) রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সনে আবার তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি কতকটা প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এই জন্য গণতন্ত্রের ঠাট সর্ব্বদা বজায় রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু দেশের সুশাসনের জন্য, বিশেষ করিয়া ১৯৩০ সনের পর হইতে তিনি পোলণ্ডে আধা-ডিক্টেটরী শাসন প্রবর্ত্তন করেন। পোলণ্ডের ন্যায় নূতন রাষ্ট্র সর্ব্বদা আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়িলে তাহার উন্নতির পথে বিষম বিঘ্ন ঘটিবে ইহাই ছিল পিলসুড্‌স্‌কির ধারণা। জার্ম্মানীতে হিট্‌লার শাসনভার গ্রহণ করিলে পোলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে পরস্পর মৈত্রী সংস্থাপিত হয় (১৯৩৪) এবং একটি দশ বৎসরের শান্তিমূলক চুক্তিতে পরস্পরে আবদ্ধ হয়। পিলসুড্‌স্‌কি কিন্তু গণতন্ত্রের মর্য্যাদা শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই আনুকূল্যে ১৯৩৫ সনের ২৩শে এপ্রিল পোলণ্ডের গণতন্ত্র-মূলক নূতন গঠনতন্ত্র চালু হয়। পিলসুড্‌স্‌কি ইহার কিছু দিন পরেই, ১২ই মে তারিখে পরলোকগমন করেন।

ইহার পর গত চারি বৎসরের কার্য্যকলাপে অনেকের মনে এই সন্দেহই জাগরিত হয় যে, পোলণ্ডও বুঝি হিট্‌লারী নীতি পুরাপুরি গ্রহণ করিতেই থাকিবে। পোলণ্ড ও জার্ম্মানীর ভিতরকার সন্ধি উভয়ের মধ্যে আর্থিক সংযোগেরও সহায় হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের সঙ্গে এতটা মিলিত হইয়া চলিতেছিল যে, সাধারণের ধারণা হয় ফ্রাঙ্কো-পোলিশ চুক্তি বাতিল না হইলেও একেবারে অকেজো হইয়া গিয়াছে। পোলণ্ডে ইহুদী-নির্য্যাতনেরও ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। গত বৎসরের মিউনিক চুক্তির ফলে যখন জার্ম্মানী চেকোস্লোভাকিয়ার অংশ বিনা যুদ্ধেই পাইয়া গেল তখন পোলণ্ড ইহার খানিকটা কাড়িয়া লয়। অবশ্য তাহার যুক্তি এই ছিল যে, জার্ম্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন জার্ম্মানী পাইয়াছে, পোল-অধ্যুষিত অঞ্চলও তেমনই পোলণ্ড পাইবে। ইহার অল্পদিন পরেই কিন্তু উভয়ের মধ্যে মন-কষাকষি উপস্থিত হয়। এই মন-কষাকষি এখন প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হইয়াছে। পোলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে এতটা বিচ্ছেদ কেন হইল গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী যাঁহারা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহাদের বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না। জার্ম্মানীর চেকোস্লোভাকিয়া-গ্রাস পোলণ্ডকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে সে ততটা ভীত হয় নাই যত হইয়াছে অন্য কারণে। পূর্ব্বে পোলণ্ডের স্বাধীনতা-বিলোপের প্রধান কারণ হইয়াছিল সমুদ্রে বাহির হইবার পথ তাহার পক্ষে অবরুদ্ধ হওয়া। আজিও এই আশঙ্কাই উপস্থিত। আজ ডানজিগ জার্ম্মানীভুক্ত হইলে কাল সরু ফালিটুকুও তাহার অধিকারে আসিবে। পোলণ্ডের বহির্বাণিজ্য তখন জার্ম্মানীর মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। বিদেশের সঙ্গে যোগসাধন তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক সব ব্যাপারে জার্ম্মানীর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হইলে পোলদের পক্ষে পোলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করা তখন কঠিন হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অসহযোগী কংগ্রেস ও বাংলা দেশ

কংগ্রেস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার দ্বারা বা তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সুবিধা অসুবিধা মোটামুটি এক রকমেরই হইয়া আসিতেছিল। কংগ্রেস অসহযোগী হওয়ায় বাংলা দেশের তাহাতে সুবিধা অসুবিধা কি হইয়াছিল এবং এখনও কতকটা হইতেছে, সে-বিষয়ে কিছু বলিব। অবস্থাটা যাহা দাঁড়াইয়াছিল প্রধানতঃ তাহাই জানাইব; তাহার সুবিধা অসুবিধা পাঠকেরা বাছিয়া লইবেন।

ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলা দেশে সমাজের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া মোটামুটি যে কয় শ্রেণীর লোকের প্রভাব পড়িয়া আসিতেছিল, তাঁহারা ভূম্যধিকারী, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, এবং শিক্ষক ও অধ্যাপক। সকলের প্রভাবের পরিমাণ এক নহে, কারণও এক নহে।

অসহযোগী কংগ্রেস তিনটি বয়কট প্রচার করেন। সরকারী আদালত এবং আইনের ব্যবসা বর্জ্জন তাহার মধ্যে একটি। যে-সব উকীল ব্যারিস্টার এই বয়কট ঘোষিত হওয়ার পরেও আইনের ব্যবসা ছাড়িলেন না, বয়কটটার ফলে তাঁহাদের প্রতি লোকের মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মিবার কারণ ঘটিল এবং তাঁহাদের প্রভাব কমিল। অথচ কংগ্রেস অসহযোগী হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মী ছিলেন, কেহ কেহ নেতা ছিলেন, এবং অরাজনৈতিক জনহিতকর সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতেন—কেহ কেহ নেতৃত্বও করিতেন। কংগ্রেস অসহযোগী হওয়ায় এবং আদালত বর্জ্জন করিতে বলায়, এই সমুদয় ব্যক্তির প্রভাবের ফল ও সার্ব্বজনিক কাজে পরিশ্রমের ফল হইতে দেশ কোথাও সম্পূর্ণ কোথাও আংশিক ভাবে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থাটা এখনও কিছু আছে, যদিও আদালত বয়কট এখন আর নাই।

অন্য দিকে, কোন কোন ব্যবহারজীবী আদালতের সংস্রব ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টায় সমুদয় সময় দেওয়ায় ও শক্তি প্রয়োগ করায় এবং দুঃখ বরণ ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় দেশ সাক্ষাৎ ভাবে উপকৃত হয় এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনসমষ্টি আশান্বিত হয়; জনগণের মধ্যে সাহসের সঞ্চারও হয়।

সরকারী, সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত, এবং আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অনুমোদন-প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহকে বর্জ্জন অসহযোগী কংগ্রেসের আর একটি বয়কট। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ এই সকল শিক্ষায়তনেই ছাত্রেরা শিক্ষা পাইত এবং এখনও পায়, এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যেও অধিকাংশ এইগুলিতে শিক্ষা দিতেন এবং এখনও দেন। সেই জন্য, কংগ্রেস এই শিক্ষায়তনগুলিকে বর্জ্জন করিতে বলায়, শিক্ষাবিষয়ক বয়কট ঘোষিত হওয়ার আগে হইতে প্রচলিত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের মনে যে অসন্তোষ ছিল, তাহা ঘনীভূত হয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিক্ষোভ (disturbance) হয়। আমরা শুনিয়াছি, এবং বাল্যকালে কিছু দেখিয়াছিও, যে, আমাদের দেশে আগে শিক্ষাদাতাদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। ইহা নানা কারণে কমিয়া আসিতেছিল। অসহযোগী কংগ্রেসের শিক্ষায়তন-বয়কটের আদেশে শিক্ষাদাতাদের প্রতি ছাত্রদের মনের ভাবের আরও অধিক পরিবর্ত্তন হয়। কারণ, অধিকাংশ শিক্ষাদাতা নিজ নিজ কাজ ছাড়েন নাই, অথচ কারাবরণকারী নেতাদের প্রভাবে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়া থাকিবে যে, কংগ্রেসের আদেশই ঠিক এবং যাঁহারা সেই আদেশ পালন করেন নাই, তাঁহারা ঠিক কাজ করেন নাই। সরকারী ছাপযুক্ত শিক্ষাকে কংগ্রেস এখন আর বয়কট করিতে বলেন না, কিন্তু আগেকার বয়কটের ফল এখনও রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর

প্রতি অসন্তোষ বঙ্গের মত অন্য সব প্রদেশেও আছে। কিন্তু যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় নূতন রকম শিক্ষাপ্রণালী বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতে যাইতেছে। বঙ্গে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই এক্সপেরিমেণ্ট হইবে না, কারণ বঙ্গে কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট স্থাপিত হয় নাই।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রদেশে কংগ্রেসী ও কতকগুলিতে অকংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষাপদ্ধতির যে প্রভেদ উভয়বিধ প্রদেশগুলিতে হইবে, তাহার ফলে অল্পবয়স্কদের মন কতকগুলি প্রদেশে এক ছাঁচে গড়া হইবে এবং অন্য কয়েকটিতে অন্য ছাঁচে গড়া হইবে। ইহা ভারতবর্ষে জাতীয় একতা রক্ষা ও বৃদ্ধির পথে বাধা জন্মাইবে।

অসহযোগী কংগ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধীজী, কারণ ভারতবর্ষে অসহযোগ নীতির উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক তিনি। তিনি গুজরাটের মানুষ। সেখানে বাংলা দেশের মত জমীদারী প্রথা নাই। গুজরাটের সমাজে কৃষিজীবীর যে স্থান, বঙ্গের সমাজে কৃষিজীবীর স্থান সেরূপ নহে। সর্ব্বত্রই কৃষিজীবীর অবস্থা ও মর্য্যাদার উন্নতি আবশ্যক। যেখানে জমীদারী প্রথা নাই, তথায় কৃষিজীবীকে উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভূমির সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন শ্রেণীর অধিকার বা মর্য্যাদা কমাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যেখানে জমীদারী প্রথা আছে, সেখানে কৃষিজীবীকে কিছু বড় করিতে হইলে, হয় জমীদারীর উচ্ছেদ করিতে হয়, নতুবা অন্ততঃ জমীদারকে কিছু ছোট করিতে হয়। বঙ্গে জমীদারী প্রথা প্রচলিত। সেই জন্য এখানে কৃষককে বড় করিতে হইলে জমীদারকে কিছু ছোট করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এবং কংগ্রেস কৃষককে বড় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। কেন না কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এবং ভারতে ও বঙ্গে গণের অধিকাংশ কৃষক।

কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা জমীদারদের প্রভাব কমাইয়াছে। যে-যে প্রদেশে জমীদারী প্রথা নাই, সেখানে কংগ্রেসের এই প্রভাব অনুভূত হয় নাই। বঙ্গে হইয়াছে। জমীদারদের প্রভাব যে দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকর হইয়াছে, দেশের অধিকাংশ লোকের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। অন্য দিকে, ইহাও বলা যায় না যে, জমীদারী প্রথা ও জমীদারদের দ্বারা বঙ্গের হিত ও সুবিধা কিছুই হয় নাই। সুতরাং জমীদারী প্রথা রহিত হইলে তাহার জায়গায় অন্য কি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে ও তাহা কল্যাণকর হইবে কি না, না জানিয়া বলা যায় না যে, জমীদারী প্রথার ও জমীদারদের তিরোভাব বঙ্গের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের কারণ হইবে কি না।

সকলেই অল্প অল্প টাকা দিয়া বড় বড় শিক্ষায়তন, হাসপাতালাদি চিকিৎসালয়, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বৃহৎ কারখানা, এবং বড় বড় সওদাগরী হৌস যৌথপ্রণালী অনুসারে কখন স্থাপন করিতে পারিবে, জানি না। এখন দেশের যে-প্রকার অবস্থা তাহাতে কোন কোন শ্রেণীর কতকগুলি লোকের হাতে বেশী বেশী টাকা না-থাকিলে এবং তাঁহারা এই রকম সব কাজে টাকা না দিলে এসব কাজ হইতে পারে না। বঙ্গে দুই শ্রেণীর কোন কোন লোকের হাতে টাকা থাকিবার কথা। এক, জমীদার; দ্বিতীয়, বেশী রোজগারী ব্যবহারজীবী। কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা জমীদারদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সহায়ক নহে, এবং আদালত-বয়কট ব্যবহারজীবীদের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির অনুকূল হয় নাই।

বঙ্গে খুব ধনী বহুসংখ্যক বণিক্ ও কারখানা-মালিক ছিল না, এখনও নাই। উপরে যে-সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ও অর্থোপার্জ্জনের প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গে তাহার জন্য টাকা দিয়াছেন প্রধানতঃ জমীদারেরা ও ব্যবহারজীবীরা; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দিয়াছেন প্রধানতঃ ধনী বণিকশ্রেণীর লোকেরা। কংগ্রেসে এখন সমাজতন্ত্রী (সোশ্যালিস্ট) ও সাম্যবাদী (কম্যুনিস্ট) দলের লোকের আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু কংগ্রেস পুঁজিবাদীদিগকে (ক্যাপিট্যালিস্টদিগকে) বয়কট কখনও করেন নাই যেমন আদালত ও শিক্ষায়তনগুলিকে একদা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রভাব পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে কখনও সেরূপ যায় নাই, জমীদারী প্রথার বিরুদ্ধে যেরূপ গিয়াছে। বস্তুতঃ অসহযোগ আন্দোলন বোম্বাই প্রদেশের বণিক্ ও কারখানা-মালিকদের অর্থসাহায্যে বহু

পরিমাণে চালান হইয়াছিল। গান্ধীভক্তদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, যমুনালাল বজাজ প্রভৃতি পুঁজিওআলা বণিক্ ও মিলমালিক অনেক ছিলেন ও আছেন, এবং সর্দার পটেল কয়েক মাস আগে সমাজতন্ত্রীদিগকে খুব শাসাইয়াছিলেন।

এই সমুদয় কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, গান্ধীবাদ ছাপার কাগজে যাহাই হউক, উহা প্রবল হইলে বা থাকিলে কার্য্যতঃ বঙ্গে অর্থের-দিক-দিয়া-প্রধান দুই শ্রেণীর (অর্থাৎ জমীদারদের ও ব্যবহারজীবীদের) শ্রীবৃদ্ধির যত অন্তরায় হইবার কথা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বণিক্ ও মিলমালিকদের ঐশ্বর্য্যের তত পরিপন্থী হইবার কথা নহে।

অসহযোগী কংগ্রেস চরখায় সুতা কাটিয়া হাতের তাঁতে সেই সুতার খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহারকে প্রায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের মত অবশ্যপালনীয় বলিয়া আসিতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে চরখায় সুতা কাটিতে হইবে না বা খদ্দর উৎপাদন করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে হইবে না, কংগ্রেস এমন কথা অবশ্য বলেন নাই; কিন্তু এ-কথাও বলেন নাই যে, সুতার ও কাপড়ের মিলগুলি তুলিয়া দিয়া কলের টাকু ও কলের তাঁতের পরিবর্ত্তে চরখা ও হাতের তাঁত চালাইতে হইবে। ফলে, খদ্দর প্রচারের দরুন বোম্বাই প্রদেশে মিলগুলির কোন ক্ষতি হয় নাই, যদিও সঙ্গে সঙ্গে কিছু খদ্দরও উৎপন্ন হইয়াছে। অসহযোগ-নীতি ও খদ্দরপ্রীতি প্রচারের আরম্ভ সময়ে বঙ্গে মিল সামান্যই ছিল, এখনও কম—যদিও বরাবরই মিলের সংখ্যা অনেক বাড়িবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসওআলাদের প্রভাব ও খদ্দরপ্রীতি যখন খুব বেশী ছিল তখন তাহার পরোক্ষ ফলে মিলের সংখ্যা বাড়িতে পায় নাই, এখন তাঁহাদের প্রভাব ও খদ্দরপ্রীতি হ্রাস পাওয়ায় মিলের সংখ্যা বাড়িতেছে।

বঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব ও খদ্দরপ্রীতি বঙ্গের হাতের তাঁতে বোনা মিহি সুতার কাপড় উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার কমাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বঙ্গের প্রাধান্য ও প্রভাব তাহার শিক্ষাবিষয়ক ও সাহিত্যিক কৃতিত্ব হইতে উদ্ভূত। বঙ্গের শিক্ষার উপর কংগ্রেসের আঘাত পড়িয়াছিল সরকারী-ছাপমারা শিক্ষায়তন বয়কটের আদেশ বশে; বঙ্গের সাহিত্যের উপর ঘা পড়িয়াছে হিন্দী উর্দু বা হিন্দুস্থানীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টায়। কংগ্রেস বঙ্গের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত ঘা মারিয়াছেন এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে; ফল যাহা হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।

বোম্বাইয়ে শিক্ষা নাই বা সাহিত্য নাই বলিতেছি না, উভয়ই আছে। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের প্রধান কৃতিত্ব সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিষয়ক নহে। তাহার প্রধান কৃতিত্ব বাণিজ্যে ও পণ্যশিল্পের কারখানায়। এই উভয়ের উপর কংগ্রেসের ঘা পড়ে নাই।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনুকরণে বিপদ, এবং তাঁহারও মুশকিলের সম্ভাবনা!

আমরা যখন কলেজে পড়িতাম তখন কোন কোন যুবককে রবীন্দ্রনাথের মত লম্বা চুল রাখিতে দেখিয়াছিলাম—এক জনের ত "রবিচ্ছায়া" ব্যঙ্গনামই হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু এই কুন্তলানুকারীদের সংখ্যা খুব কম ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাংলা হস্তাক্ষরের নকল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী লোকে করিত এবং এখনও অনেকে করে। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও বিপদে পড়িতে হইয়াছে আগে কখনও শুনি নাই। সম্প্রতি দুটি বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্র রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর নকল করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল, খবরের কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহারা উভয়েই পাস হইবার মত নম্বর পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাতের লেখা ঠিক এক রকম হওয়ায় পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেহ করেন যে তাহারা প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এই জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের সঙ্গে তাহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। পরে তাহারা যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তুষ্ট করে যে তাহাদের প্রত্যেকের উত্তর নিজের নিজের লেখা এবং উভয়েই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনুকরণ করিয়াছে। তখন তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনেকে নকল করায় তাঁহারও মুশকিল কখনও যে না হইতে পারে এমন নয়। কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। হাতের লেখা তাঁহার মত করিয়া কোনও কবিযশঃপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না! মামলা-মোকদ্দমায় বা অন্যবিধ ব্যাপারে যাহা তাঁহার স্বাক্ষরিত দলিল বা অন্যবিধ লিপি নহে, তাহা তাঁহার বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা তাঁহার হস্তাক্ষরভক্তদের দ্বারা হইবে না, কারণ তাঁহারা কোন কু-অভিপ্রায়ে তাঁহার হস্তাক্ষর নকল করেন না। কিন্তু হস্তাক্ষরের নকল যে কেবল সৎলোকেরাই করিতে পারে, এমন ত নয়!

আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বাধা

বাংলা দেশ ও বাংলা প্রদেশ সমার্থক নহে, উভয়ের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি এক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীহট্ট ও মানভূম বাংলা দেশের অন্তর্গত, কিন্তু বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত নহে। বাংলা প্রদেশের বহির্ভূত কিন্তু বাংলা দেশের অন্তর্গত এই সকল অঞ্চলের বাঙালী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধা যে নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে না এমন নয়; কিন্তু তাহার কথা আপাততঃ বলিতেছি না। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে যে-সকল বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার যে বাধা নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই কিছু এখন বলিব।

ছেলেমেয়েরা যে-যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করে মাতৃভাষার সাহায্যে তাহা করিলে অর্জ্জিত জ্ঞান যেমন তাহাদের মনের দ্বারা স্বাঙ্গীকৃত হয় (রূপক ভাষায় বলিতে গেলে মনের অস্থিমজ্জাগত হয়), অন্য ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইলে সেরূপ হয় না। এই কারণে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত ও অনুমোদনীয়।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকের ভাষা হিন্দী বা উর্দু বা হিন্দুস্থানী। সুতরাং সাধারণতঃ তথাকার বিদ্যালয়সমূহে এই ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষাও এই ভাষার সাহায্যে লইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রদেশে এমন স্থায়ী বাসিন্দাও অনেক আছেন যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী নহে। তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যাই বেশী। হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের নিজের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিবার ও পরীক্ষা দিবার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদেরও সেই স্বাভাবিক অধিকার আছে; কারণ, তাহারাও ঐ প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাহাদের অভিভাবকেরা হিন্দুস্থানী অভিভাবকদের মত ট্যাক্স দিয়া থাকেন এবং পৌর কর্ত্তব্য পালন করেন।

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, বাঙালীরা যুক্তপ্রদেশে সংখ্যায় অল্প এবং কোন কোন জেলায় ও শহরে খুবই অল্প; অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য বাংলা ভাষার সাহায্যে সকল বিষয় শিখাইবার বন্দোবস্ত করা ও শিক্ষক নিযুক্ত করা হউক, গবর্ন্মেণ্টকে এরূপ অনুরোধ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু যে-যে শহরে বাঙালীর সংখ্যা বেশী—হয়ত কয়েক হাজার বাঙালী বাস করে, সেখানে বাঙালী ছাত্রদের জন্য বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার, অন্ততঃ বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার, ব্যবস্থা দাবী করা অন্যায় নহে।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট যদি তাহাতেও রাজী না হন, তাহা হইলে আর একটি দাবী তাঁহারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কোন মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সেটি এই:—

এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কানপুর প্রভৃতি বড় বড় কয়েকটি শহরে বাঙালীরা নিজের ব্যয়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছে। কয়েকটি গত শতাব্দী হইতে চলিতেছে। বাঙালীদের এরূপ বালিকা-বিদ্যালয়ও আছে। এইগুলিতে বাংলা শিখান হয় এবং শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিখান যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট এই বিদ্যালয়গুলিকে তাঁহাদের 'জ্ঞানিত' ('recognised') বিদ্যালয় বলিয়া

মানিয়া লউন এবং তাহাদের ছাত্রছাত্রীদিগকে সরকারী পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করুন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অনুমতি পাইলে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ ভাষায় উত্তর লিখিবে? ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নের উত্তর তাহারা হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের মত ইংরেজীতে দিবে, অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর তাহারা বাংলায় দিবে।

প্রশ্নপত্র রচনা কে করিবেন এবং উত্তরগুলি কে পরীক্ষা করিবেন? বাঙালী শিক্ষক ও অধ্যাপক যুক্তপ্রদেশে অনেক আছেন; তাঁহারা কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় পরীক্ষক হইয়া থাকেন। তাঁহারা করিবেন। গবর্মেণ্ট যদি ন্যায়সঙ্গত ও আবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা ইহা বিনা পারিশ্রমিকে করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা ভাষার ও নানা ভাষায় পরীক্ষা করেন; পরীক্ষার্থী অল্প হইলেও প্রশ্নপত্র রচনা করান এবং উত্তর পরীক্ষা করান। অবাঙালীদের প্রতি বঙ্গে এ বিষয়ে যে ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়, বাঙালীরা বাংলার বাহিরে স্থায়ী বাসিন্দা হইলে যদি সেইরূপ ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার আশা করে, তাহা অস্বাভাবিক নহে।

বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা যে ন্যায্য সুবিধাটুকু চাহিলাম, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি তাহাও দিতে নারাজ হন, তাহা হইলে অন্য রকম একটি সুবিধা তাঁহাদের এডুকেশন বোর্ডের একটি নিয়ম অনুসারে চাহিতে পারা যায়। এই নিয়মে আছে যে, বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁহার নামিত কোন ব্যক্তি ("his nominee") ইচ্ছা করিলে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সকল বিষয়েরই উত্তর ইংরেজীতে দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এই বৈকল্পিক নিয়মটি, যে-সব পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা ইংরেজী, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত করা হইয়া থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধে যে সুবিবেচনা দেখান হইয়াছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সেই সুবিবেচনার প্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে। এই জন্য আমরা বলি, বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে যদি উত্তর বাংলাতে লিখিবার অনুমতি না-দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইংরেজীতেই উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া হউক; এবং এই অনুমতি-প্রদান কাহারও মর্জিসাপেক্ষ না রাখিয়া এই নিয়ম অনুসারে করিবার ব্যবস্থা করা হউক যে, হিন্দুস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা নহে, সেইরূপ পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে পরীক্ষার সকল বিষয়ে তাহাদের উত্তর ইংরেজীতে লিখিতে পারিবে। তাহা হইলে এখন পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের সমুদয় ভারতীয় ছাত্রেরা যেমন নানা বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে দিয়া আসিতেছে, বাঙালী পরীক্ষার্থীরা অতঃপরও তাহা পারিবে।

আমরা যুক্তপ্রদেশের বাঙালীদের হিন্দী শেখার পক্ষপাতী, বিরোধী নহি। বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে যদি ভাষা হিসাবে হিন্দী শিখাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে ফল ভালই হইবে। বাঙালী ছেলেমেয়েরা অতিরিক্ত একটি ভাষা শিখিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। এই দাবী তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা যে প্রদেশে, অঞ্চলে, বা রাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদের তথাকার ভাষা শিখিয়া, সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া, ও সংস্কৃতির অনুশীলন করিয়া বঙ্গের বাঙালীদিগকে তৎসমুদয়ের ফলভাগী করা কর্ত্তব্য আমাদের সে মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

—

জনৈক নারীর অপমৃত্যু

নারীর ইজ্জৎ ও প্রাণের মূল্য বাংলা দেশে—বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষেই—খুব কম, যদিও পুস্তকে ও বক্তৃতায় তাহা অত্যধিক। সেই জন্য যদিও নারীনিগ্রহের শুধু মোকদ্দমাই বৎসরে অনেক শত হয় এবং অনেক হাজারের খবর পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় না, তথাপি এ বিষয়ে এখনও বাঙালী হিন্দুসমাজের টনক নড়িয়াছে বলিতে পারা যায় না—এই বিষয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজের মনের ভাব ত, একেবারে বোধের অতীত না হইলেও, বাক্যের অতীত। একটি বিষয়ে বাংলা দেশ সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে। তাহা নরপিশাচদের দ্বারা দলবদ্ধ ভাবে এক-

একটি নারীর উপর অত্যাচার। এ-বিষয়ে হিন্দুনরপিশাচদের কৃতিত্ব একেবারেই নাই এমন নয়, কিন্তু যেমন ফুটবলে মুসলমান স্পোর্টিঙের বাহাদুরি খুব বেশী, সেইরূপ এই নারকীয় কার্য্যেও মুসলমান সমাজের পিশাচপ্রকৃতি লোকদের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

এখানে বলা আবশ্যক, এই মুসলমানের সমাজেরই হাইকোর্ট-জজ পরলোকগত সৈয়দ আমীর আলী গত শতাব্দীতে এক সময়ে রাজশাহীতে নারীর উপর দলবদ্ধ অত্যাচারের কয়েকটা মামলা হওয়ায় এই দুর্ব্বৃত্ততা নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন যে, এইরূপ পৈশাচিকতার জন্য অপরাধীদিগকে ফাঁসী দিবার আইন হওয়া উচিত। তিনি এইরূপ প্রস্তাবের নজীরও দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, এক সময় অষ্ট্রেলিয়ায় ল্যারিকিন ("larrikin") নামে অভিহিত গুণ্ডারা দলবদ্ধভাবে নারীনিগ্রহ করিত, এবং এরূপ অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের আইন হওয়ায় তাহা নির্ম্মূল হয়। হাইকোর্টের অন্যান্য জজেরা সৈয়দ মহাশয়ের প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় তদনুসারে কোন কাজ হয় নাই। তিনি দু-চারটা এইরূপ দুর্ব্বৃত্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করেন, এখন কিন্তু প্রতিবৎসর ন্যূনকল্পে শতাধিক নারীর উপর এই প্রকার দলবদ্ধ অত্যাচার হয়। সুতরাং তাহার প্রস্তাবানুযায়ী আইনের এখনও প্রয়োজন আছে। যাহারা এরূপ আইনের বিরোধী, ফলপ্রদ অন্য উপায় নির্দ্দেশ করা তাহাদের কর্ত্তব্য। আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু নারীর সতীত্বের তুলনায় দুর্ব্বৃত্তদের প্রাণকে অতি তুচ্ছ মনে করি। একটি নারীর প্রতি এক বা একাধিক দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার প্রধানতঃ শহর হইতে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবং কখন কখন মফস্বলের শহরেও হয়। কিন্তু বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় যে একেবারেই হয় না, এমন নয়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতাতেই এক পুলিস কোর্টে কয়েক জন আসামী এইরূপ একটা মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পাইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তাহারা কলিকাতার গড়পারের একটা বাড়ী হইতে সরস্বতীবালা নামে একটি নারীকে অপহরণ করে, এবং তাহার উপর অত্যাচার করে। তাহার মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্রে পোটাসিয়াম সায়েনাইড বিষ পাওয়া যায়।

হইতে পারে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নির্দ্দোষ ছিল। কিন্তু বালিকাটির যে মৃত্যু হইয়াছে, অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, বিচারকের রায়ে তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ একটি ব্যাপার কলিকাতার বুকের উপর হইল, অথচ তাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে পারা গেল না, ইহা আইনের, গবর্মেণ্টের, ও পুলিস-বিভাগের শ্লাঘার বিষয় নহে। এই মোকদ্দমার পুনর্বিচার বা পুনরায় তদন্ত হইতে পারে কি না, আইনজ্ঞ লোকেরা তাহা বলিতে পারিবেন। নারীরক্ষা সমিতি তাঁহাদের পরামর্শ লউন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকার-চেষ্টা করা গবর্মেণ্টেরই ত কর্ত্তব্য।

অনেক কুখ্যাত মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপীল করিয়া প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের সাহায্যে খালাস পায়, আবার সরস্বতীবালার মোকদ্দমার মত অনেক স্থলে প্রথম বিচারের আদালতেই খালাস পায়। নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের খালাস পাওয়াই উচিত। কিন্তু আইনের মারপেঁচের সাহায্যে দোষী ব্যক্তিদের নিষ্কৃতিলাভ বন্ধ করিবার নিমিত্ত এই রকম সব মোকদ্দায় ভাল উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইবার আর্থিক সামর্থ্য নারীরক্ষা সমিতির থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জনমনোভাব ও জনমতের বর্ত্তমান অবস্থায় নারীরক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয়। এক দিকে অত্যাচরিতা নারীরা ও নারীরক্ষা সমিতি দরিদ্র, অন্য দিকে বড় বড় কৌঁসুলি লাগাইবার টাকা দুর্ব্বৃত্তদের আছে বা তাহারা জোগাড় করিতে পারে। এবং ব্যবহারাজীবেরাও বোধ করি তাঁহাদের প্রোফেশ্যনের কোন অলিখিত নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট বদমায়েসদেরও পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে বাধ্য মনে করেন? আলোকের, আশার, সন্ধান কোন্ দিকে?

—

বাঙালী হিন্দুসমাজ ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি

কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার আলবার্ট হলে হিন্দুদের একটি

সভা হয়। তাহার উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালী হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা। লোক-সমাগম খুব হইয়াছিল। হলে ও গ্যালারিতে একটু জায়গাও খালি ছিল না। কেহ কেহ ছাদে উঠিয়া গ্যালারির জানালা দিয়া দেখাশুনার কাজ করিতেছিল। কাজ যদি শ্রোতৃসমাগমের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলা চলিবে না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি বলিতে অনেকেই সাধারণতঃ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাই বুঝেন। কিন্তু সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা বাঙালী হিন্দুদিগকে রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক আর্থিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থার সম্মুখীন হইতে আহ্বান করিতেছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে সকলের চেয়ে বড় যুদ্ধ হইবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরুদ্ধে। ইহার উচ্ছেদসাধন দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। ২৭শে আগষ্ট কলিকাতায় ইহার বিরুদ্ধে একটি সমগ্র ভারতীয় সভার অধিবেশন হইবে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরারই মত বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে পিষিয়া ফেলিবার ও শক্তিহীন করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে। কৃষক প্রজাদের এবং খাতকদের হিতের জন্য যে-যে আইন হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে ভাল ধারা আছে, কিন্তু ভাল ধারাগুলির ভাল উদ্দেশ্যের আড়ালে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য অস্ত্রও অন্য কোন কোন ধারার মধ্যে আছে।

যাহা হউক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ করিতে পারিলে অন্য বিঘ্নগুলার বিনাশ অনেকটা সোজা হইয়া আসিবে।

যাহাদের বংশবৃদ্ধি বেশী হয় তাহারা দেশশাসন করিবে—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ব্যঙ্গমিশ্রিত অভি-যোগের সুরে এই প্রকার একটা কথা বলেন। আমরাও শুধু মাথাগুন্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ কর্ত্তৃক কেবল সংখ্যাবহুল যাহারা তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু ইহা মনে রাখা দরকার যে, যথেষ্টসংখ্যক মানুষ কোন দেশে, কোন জাতিতে, কোন সম্প্রদায়ে বা শ্রেণীতে থাকাটাই সবচেয়ে আগে দরকার। যথেষ্টসংখ্যক মানুষই যদি না থাকে, তাহা হইলে যথেষ্টসংখ্যক ভাল মানুষ, যোগ্য মানুষ, সমর্থ মানুষ প্রস্তুত হইবে কেমন করিয়া? 'যথেষ্ট' শব্দটার মানে আপেক্ষিক। সেই জন্য দেখা যাইতেছে, ইয়োরোপে জার্ম্মেনী ইটালী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিশুজন্মের হার বাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বিত এবং রাজকোষের প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। চীনদেশে কোটি কোটি মানুষ ছিল ও আছে বলিয়াই যুদ্ধে বহু লক্ষ মানুষ হতাহত হওয়া সত্ত্বেও চীনের লড়িবার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে।

বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা সেন্সস অনুসারে বেশী; সত্যসত্য কত বেশী বলা যায় না। মুসলমানেরা শিক্ষায় ও শিক্ষাসাপেক্ষ যোগ্যতায় হিন্দুদের সমান নহে বটে; কিন্তু যদি মুসলমান নেতাদের ও মুসলমান সমাজের সুবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে শিক্ষায় ও যোগ্যতায় এই নিকৃষ্টতা দূর হইতে বেশী সময় লাগিবে না। অন্য দিকে যদি হিন্দু ব্যবসাদারেরা বংশ-বৃদ্ধি-নিবারক উপায় আমদানী করিতে থাকেন এবং দেশ-হিতব্রত ব্যক্তিরা খবরের কাগজের ও বক্তৃতার মারফতে সেগুলার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে যথেষ্টসংখ্যক হিন্দু বাংলা দেশে বরাবর কি প্রকারে থাকিবে?

অনেকে মনে করেন, বাংলা দেশে আর বেশী হিন্দুর মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার স্থান ও উপায় নাই আমরা তাহা মনে করি না। পণ্যশিল্পের বিস্তার ও উন্নতি এখনও খুব বেশী হইতে পারে। তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও চাষের বিস্তার ও উন্নতিও হইতে পারে। এই উভয় উপায়ে বিস্তর লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতে পারে। তবে যদি বলেন, আমরা চাষ করিব না, মজুরী করিব না, মিস্ত্রি কারিগর হইব না, **কেবল** জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার অধ্যাপক কেরাণী ইত্যাদি হইব, তাহা হইলে আর মানুষ যাহাতে না জন্মে এবং যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র মরে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার বক্তৃতায় এই মর্ম্মের কথা বলেন যে, হিন্দুসমাজের মনের ভাব এরূপ হওয়া

স্বর্গীয়া নির্ম্মলা সরকার

আবশ্যক যে, হীনতম দরিদ্রতম হিন্দুও কোথাও বিপন্ন হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজে তাহার ব্যথা অনুভূত হইবে ও প্রতিকারচেষ্টা হইবে। ইহা উচ্চ আদর্শ।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী বঙ্গে নারীনিগ্রহ নিবারণের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায়, বঙ্গে যে-কয়টি কঠিন সমস্যা আছে তাহার মধ্যে নারীনিগ্রহ সমস্যার গুরুত্ব অন্য কোনটি অপেক্ষা কম নহে।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, আগামী সেন্সসে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ ঘোষিত হইবে, সরকারের হাতে দেশের লোকদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার যত প্রকার ক্ষমতা আছে তাহার প্রয়োগ ঐ সংখ্যাগুলি অনুসারে হইবে; প্রত্যেক সরকারী বিভাগে ও প্রতিষ্ঠানে ঐসব সংখ্যা অনুসারে বাঁটোআরা হইবে; অতএব সেন্সসের প্রত্যেক মুসলমান গণনাকারীর সঙ্গে এক জন করিয়া হিন্দু সংখ্যাগণনাকারী থাকা আবশ্যক। মুসলমানরাও দাবী করিতে পারেন যে, প্রত্যেক হিন্দু গণনাকারীর সঙ্গে এক জন মুসলমান গণনাকারী থাকা আবশ্যক। ইহাতে সেন্সসের খরচ বাড়িবে। কিন্তু এখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেরূপ পরস্পর অবিশ্বাস আছে, তাহাতে ভবিষ্যতে সন্দেহ প্রকাশ ও ঝগড়া বৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। এবং ব্যয়বৃদ্ধিসাপেক্ষ দাবী করিবার অধিকার হিন্দুদের আছে, কারণ বাংলার রাজস্বের অন্যূন শতকরা সত্তর টাকা হিন্দুরা দিয়া থাকে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু ঠিক্ কথা বলিয়াছেন।

—

নারীরক্ষা-সমিতির বার্ষিক সভা

নারীরক্ষা-সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনে তাহার নূতন সভাপতি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ভারত গবর্মেণ্টের আইনসচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্য সভায় প্রথম বেসরকারী বক্তৃতা করেন। তিনি নারীরক্ষা-সমিতির সভাপতি হওয়া বিশেষ সন্তোষের বিষয়। সমিতি তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ ও অন্য নানা প্রকার সাহায্য পাইতে পারিবে। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক বিজ্ঞজনোচিত কথা আছে। তাহা পাঠকেরা দৈনিক কাগজে পড়িয়াছেন। তাহার মধ্যে আমরা একটি কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি, যাহাতে অনেকে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারেন। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন যে, সমিতির অনেক টাকার প্রয়োজন এবং তাহা পাওয়া উচিতও বটে; কিন্তু ২।১ জন লক্ষপতি অনেক টাকা দেওয়া অপেক্ষা বহু লোকে অল্প অল্প করিয়া যদি সেই টাকা দেয়, তাহা হইলে তাহা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইবে। ইহা ঠিক্ কথা।

সমিতির টাকার আবশ্যক প্রধানতঃ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত। টাকা যিনি এবং যত জনেই দেন না কেন, তাহার দ্বারা এই কাজ হইতে পারিবে। কিন্তু যদি শুধু এক জন ক্রোড়পতি এক লক্ষ টাকা দেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দেশে অত্যাচরিতা নারীর দুঃখে কেবল একটি মানুষের প্রাণ কাঁদিয়াছে। কিন্তু যদি দুই লক্ষ মানুষ নারীর দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া প্রত্যেকে আট আনা পয়সা দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বহু গ্রামে ও নগরে অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রাণের ও দেহের শক্তিদ্বারা নারীরক্ষায় অগ্রসর হইতে পারিবেন। ফলে অনেক স্থলে অত্যাচার হইতেই পারিবে না।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় প্রায়োপবেশক রাজনৈতিক বন্দীরা উপবাস ত্যাগ করিয়াছেন। বসু-ভ্রাতৃদ্বয় এই কাজের দ্বারা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বন্দীরা সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

এইরূপ কথা হইয়াছে যে, তাঁহাদের উপবাস ত্যাগের দুই মাসের মধ্যে যদি সকলকে মুক্তি দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহারা আবার প্রায়োপবেশন করিবেন। আশা করি, তাহা আবশ্যক হইবে না।

পাছে কেহ মনে করে মন্ত্রীমহাশয়েরা ভয় পাইয়াছেন, সেই জন্য বন্দীদের উপবাস ত্যাগের খবরের সঙ্গে সঙ্গে

সংবাদপত্রে খাজা সর্ নাজিমুদ্দিনের এক বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে যে, বন্দীদের সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের পলিসি একটুও বদলায় নাই এবং মন্ত্রীরা দু-মাসের মধ্যে তাহাদিগকে খালাস দিবেন এরূপ কোন কথা দেন নাই।

এই ব্যাপারে গবর্ন্মেণ্টের ও মন্ত্রীদের প্রেস্টিজ লোপের জন্য আমরা লোলুপ নহি। প্রেস্টিজ বজায় থাক না। বন্দীরা মুক্তি পাইলেই দেশের লোকেরা খুশি হইবে। হঠাৎ যদি দু-মাসের মধ্যেই সব বন্দী খালাস পাইয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা বলিব না মন্ত্রীরা ভয় পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা সকলের প্রতিনিধিরূপে এ প্রতিশ্রুতি দিতেছি না, কেহ কেহ হয়ত তখন বলিয়া ফেলিতেও পারেন মন্ত্রীরা ভয় পাইয়াছিলেন। সেই জন্য বলি, মন্ত্রীরা ষাট দিনের মধ্যে মুক্তি না দিয়া সাড়ে একষট্টি দিন পরে মুক্তি প্রদান করুন। তাহা হইলে কোন কথা উঠিবে না। ইতিমধ্যে যে ক্রমে ক্রমে কাহারও কাহারও মুক্তি হইতেছে, তাহাতে কাহারও কিছু বলা উচিত নয়; শেষ রাজনৈতিক বন্দীটিকে সাড়ে একষট্টি দিন পরে মুক্তি দিলেই প্রেস্টিজ রক্ষা পাইবে।

বন্দীরা উপবাস ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মুক্তির দাবী যে পরিত্যক্ত হয় নাই তাহা বঙ্গদেশের নানা স্থানে (এবং বঙ্গের বাহিরেও) অবিরাম আন্দোলন হইতে গবর্ন্মেণ্ট ও মন্ত্রীরা বুঝিতে পারিবেন। বন্দীদের মুক্তির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শান্তিসুখ ভোগ করিতে দিতে দেশের লোকেরা প্রস্তুত নহে।

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বতঃই মনে হইয়াছে, বঙ্গের কত গ্রামে কত কুটীরে কত নিরপরাধা বিধবা সধবা কুমারী নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে না—কখন কোন শত্রু আসে এই ভয়ে, কত জনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত জন চিরনিদ্রায় সকল উদ্বেগ ও বিপদের পরপারে গিয়াছে; এই অবস্থার কথা বার-বার জানাইয়া বাংলা দেশের লোকদিগকে এবং গবর্ন্মেণ্ট ও মন্ত্রীদিগকে শান্তিহারা করিবার নিমিত্ত আন্দোলন ত হইল না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের আয়ু আবার বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের আয়ু শেষ যাহা বাড়ান হইয়াছিল, তাহা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরে শেষ হইবার কথা। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন পরিষদের আয়ু আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসর বাড়ান হইল। উপায় কি? ফেডারেশ্যন যে এখনও আসন্ন নহে।

—

সুরেন্দ্রনাথের এ বৎসরের স্মৃতিসভা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান বৎসরের স্মৃতিসভার দুঃখকর বিশেষত্ব এই যে, এই বৎসর তাঁহার একটি বিশেষ কীর্ত্তি, কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে দেশের লোকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য লুপ্ত হইল। অবশ্য, ইহা তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নহে। কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে তাঁহার কল্যাণে কংগ্রেসীরা প্রভুত্ব করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই কৃতিত্বটি তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—যদিও তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের শেষ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্যান্য কৃতিত্বও স্মর্তব্য। তাহা বৃদ্ধদের ও প্রৌঢ়দের সুবিদিত। তরুণ ও বালকদিগকে তাহা জানাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই সত্য কথা বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক আমলের কংগ্রেসের শক্তি ও কৃতিত্ব অংশতঃ আগেকার আমলের কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নেতাদের চেষ্টার ফল।

—

তুরস্কে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় তুরস্কের প্রধান শহর ইস্তানবুলে নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হইবে। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ ইহাতে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এরূপ সভার অধিবেশন তুরস্কের নবীভবনের অন্যতম প্রমাণ।

স্বর্গতা শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার

ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার মহোদয়া গত ১লা আগষ্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ও নেতা স্বর্গত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁহার মাতা স্বর্গতা শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার নারীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহিনী ছিলেন এবং এদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ তিনিই প্রথম করেন। এই জন্য ভারত-সচিব তাঁহার নিমিত্ত বিশেষ পেন্স্যনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী ধর্ম্মশীল পিতামাতার গৃহে শিক্ষা পাইয়া লেডী সরকার নানা পারিবারিক ও অন্যবিধ সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর খ্যাতি ও অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁহাকে অহঙ্কৃত করে নাই। তাঁহার ব্যবহার আজীবন অনাড়ম্বর, সৌজন্যপূর্ণ, সরল ও অমায়িক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সহিত তাঁহার হৃদ্‌গত ও আচরণগত যোগ ছিল। বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি বিস্তর শ্রম করিয়াছিলেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনী হয়, তাহার দ্বার মোচন শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকার করেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন :—

"আর্থিক দুর্য্যোগের তীব্র পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের দেশের কত হতভাগা নরনারী অভাবে, অনাহারে, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের প্রচার।

"বিদেশী পণ্য বর্জ্জনই স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পরিচয় নয়। স্বদেশী জিনিষ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া লোকের মনে উৎসাহ বর্দ্ধন করা এবং অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবনের দুর্দ্দশা দূর করাই আসল স্বাদেশিকতা। স্বদেশী প্রচারই শিল্পপ্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের সকলেরই বিলাসসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত আহার করিয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থোন্নতি করার জন্য দৃঢ়মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বদেশী ব্যতীত অন্য পথ নাই।"

তিনি আরও বলেন :—

"বিদেশী বণিক্‌দের লুণ্ঠননীতির ফলে আর্থিক জগতে যে দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং ধনিক ও শ্রমিকদের অবিরাম বিবাদ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে অপর দেশের বাজার লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি পোষিত হয় না। ভারতের কুটীরশিল্পে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আরাধনা করিবার ইচ্ছা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির যে বিস্তারপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূলীভূত উদ্দেশ্য হইতেছে, দেশের দারিদ্র্য দূর করা, দেশকে অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা। অপরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের উদ্দেশ্য।"

তাঁহার এই সব কথা এখনও পুরাতন হয় নাই। তখন তিনি যে আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা বাঙালীরা এখন ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন :

"বাঙালীকে বাঙালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে ?"

তিনি আরও বলেন :—

"আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় তরুণতরুণীদিগকে ইহাই বলিতে চাই, যে, তাঁহারা যেন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে শেখেন। অন্ধ অনুকরণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।"

তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতা অধিকাংশ সময় গৃহপরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। তথাপি তিনি আর একবার সার্ব্বজনিক কাজে নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন, পুরাতন কাগজপত্র হইতে দেখিতেছি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর কাজ করেন। সেই উপলক্ষে পঠিত তাঁহার অভিভাষণটি তথ্যপূর্ণ ও মননশীলতার পরিচায়ক। তাহাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার নানা বাধার আলোচনা করেন এবং নারীদিগের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে যুক্তিসহ নিজের মত ব্যক্ত করেন।

ওআর্কিং কমীটির বিচারে সুভাষ বাবুর শাস্তি

ওআর্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার বাংলা অনুবাদ এই :—

"প্রদেশগুলিতে সত্যাগ্রহ এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সম্পর্ক, এই দুই বিষয়ে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের সম্পর্কে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর—যিনি কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন—আচরণে ওআর্কিং কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সুভাষবাবু যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও ওআর্কিং কমীটি বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু গভীর দুঃখ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় উল্লিখিত মুখ্য বিষয়টি তিনি মোটেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ সম্পর্কে তাঁহার মতভেদ থাকিলেও, তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইবার পর জাতির সেবক হিসাবে উহা বিনা দ্বিধায় পালন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসাবে একথাও তাঁহার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ সম্পর্কে আপত্তি থাকিলে তিনি ওআর্কিং কমীটি অথবা নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির নিকট অনায়াসে আপীল করিতে পারিতেন; কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ বহাল থাকিতে, তিনি উহা কোনক্রমে অমান্য করিতে পারেন না—নিষ্ঠা সহকারে তাহা পালন করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন

"কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যথাযথভাবে চালাইবার পক্ষে ইহাই প্রথম সর্ত্ত। বিশেষতঃ কংগ্রেসের মত বিরাট্ প্রতিষ্ঠান, যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুগঠিত সাম্রাজ্যের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তাহার সম্পর্কে এই সর্ত্ত অপরিহার্য্য। শ্রীযুক্ত বসুর পত্রে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে কোন সদস্যই নিজ অভিপ্রায়মত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এই যুক্তি যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ অরাজকতা ঘটিবে এবং অবিলম্বে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ওআর্কিং কমীটি দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যদি তাঁহারা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত এবং সুস্পষ্ট শৃঙ্খলাভঙ্গ সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না।

"ওআর্কিং কমীটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন যে, এই গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হেতু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে ৩ বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের এবং কোন কংগ্রেস কমীটির নির্ব্বাচিত সদস্য পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

"ওআর্কিং কমীটি ভরসা করেন যে, সুভাষবাবু নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় এই শাস্তিমূলক বিধান মানিয়া লইবেন।

"অপরাপর যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মী এবং দায়িত্বশীল কর্ম্ম-কর্ত্তা এই সম্পর্কে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, ওআর্কিং কমীটি তাহা বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় ঐ কার্য্য করিয়াছেন বিবেচনায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না। তবে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য আবশ্যক মনে হইলে, বিশেষতঃ অপরাধী কংগ্রেস-সদস্যগণ শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ক্রটি স্বীকার না করিলে, তাঁহাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ভার ওআর্কিং কমীটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটিগুলির উপর ছাড়িয়া দিতেছেন। যে সকল সদস্য শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ক্রটি স্বীকার না করিয়া শৃঙ্খলাভঙ্গ করিবার জন্য জিদ করিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ওআর্কিং কমীটি রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করিতেছেন।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির দীর্ঘ প্রস্তাবটির শেষ অংশটিই তাহার নির্দ্ধারণ এবং সুভাষবাবুর প্রতি আদেশ ও অনুরোধ। প্রথম অংশটিই দীর্ঘতর। কমীটি কেন সুভাষ বাবুর প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন, এই দীর্ঘতর অংশটিতে তাহা কমীটির যুক্তিসহকারে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকেরা যুক্তিগুলির সারবত্তা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের নিয়ম ভঙ্গ করিলে তিনি যত প্রভাবশালী এবং কংগ্রেসের যত উচ্চপদে অধিষ্ঠিতই হউন না কেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সুভাষবাবু কংগ্রেসের নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। কংগ্রেসের কন্সটিটিউশ্যনের, বা তাহার পূর্ণ অধিবেশনের, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির ও কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির কোন নির্দ্ধারণের সমালোচনা বা প্রতিবাদ কেহ করিতে পারিবে না, কংগ্রেসের এরূপ কোন নিয়ম আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুভাষ বাবু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির দুটি নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ৯ই জুলাই সভা করিতে বলিয়াছিলেন, নির্দ্ধারণ দুটি অগ্রাহ্য করিতে, তাহার অবাধ্যতা করিতে ও বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহাকেও বলেন নাই, নিজেও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। সুতরাং তিনি নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন বলা যায় না। ইহা ঠিক্ বটে যে, কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে ৯ই জুলাইয়ে সভা আহ্বানের অনুরোধ প্রত্যাহার করিতে বলিয়াছিলেন। ইহাও সত্য যে, সাধারণতঃ কংগ্রেসের সভাপতির আদেশ পালন বা অনুরোধ রক্ষা করা কংগ্রেস-ওআলাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি যদি তাহাদিগকে এমন কোন আদেশ দেন বা অনুরোধ করেন যাহা পালনের বা রক্ষার অর্থ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হওয়া, তাহা হইলে কি সেরূপ আদেশ পালন বা অনুরোধ রক্ষা করিতে কংগ্রেসওআলারা বাধ্য? আমাদের বিবেচনায় বাধ্য নহে।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির সুভাষ বাবুর সম্বন্ধে নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য হয় নাই, ইহার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই। তদ্ভিন্ন, সুভাষ বাবুকে দণ্ড দিতে গিয়া ওআর্কিং কমীটি যে দেশব্যাপী আন্দোলনের ঢেউ তুলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনিষ্টকারিতা ও অসুবিধা বিবেচনা করাও উচিত ছিল। এখন যদি কিছু আন্দোলন করিতে হয়, তাহা দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই হওয়া উচিত। আন্দোলন গঠনমূলক কাজের পরিপন্থী বলিয়া অন্য সব দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ রাখা উচিত।

আর একটা চুলচেরা কিন্তু সহজে খণ্ডনীয় যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ্যদল গঠন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে বিদ্রোহিতার শাস্তি দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে ত সুভাষবাবুকেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে বলিলেই এবং, তিনি তাহা না করিলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেই হইত। তদতিরিক্ত শাস্তি তাঁহার দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতিপদের প্রার্থী হওয়ার পর হইতে দক্ষিণপন্থীদের তাঁহার প্রতি বৈরের আর একটা দৃষ্টান্ত বলিয়া প্রতীত হইবে।

৯ই জুলাইয়ে সুভাষ বাবুর আহ্বানে সব প্রদেশে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা উচিত, কংগ্রেসওআলাদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উপর অসন্তুষ্ট, এবং সুভাষ বাবুর উপর শাস্তির ব্যবস্থায় প্রতিবাদ ও আন্দোলন দেশব্যাপী হইবে।

—

আন্দোলন ও বাংলা দেশ

সকল দেশের ও তাহার ছোট বড় অংশের লোকদের নানাবিধ দোষ-ত্রুটি অভাব-অভিযোগ আছে। তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। অন্য সব দেশের মত বঙ্গে এরূপ আন্দোলনের কারণের অভাব নাই। কিন্তু তাহার উপর বাংলা দেশকে অন্য কতকগুলি আন্দোলন করিতে হইতেছে বা করা উচিত যাহা অন্য অনেক প্রদেশের সংকীর্ণ স্বার্থের দিক্ দিয়া করা অনাবশ্যক। যেমন সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সমুদয় বাংলাভাষাভাষীকে এক প্রদেশের মধ্যে আনিবার জন্য আন্দোলন, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অত্যন্ত অধিক অংশ ভারত-গবর্ন্মেণ্টের আত্মসাৎ-করণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, ইত্যাদি। নানা রকম আন্দোলনে বাঙালীর চিত্তবিক্ষেপ ও শক্তিব্যয় বা শক্তিক্ষয় হইতেছে; বাঙালী একাগ্রচিত্তে তাহার সমুদয় শক্তি বাংলাকে ও বাঙালী জাতিকে বাঞ্ছিত ভাবে গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। ইহার উপর সুভাষ বাবুর শাস্তি লইয়া আর একটা আন্দোলন আসিয়া পড়িল—তাঁহার ফরোআর্ড ব্লকের আন্দোলন ত আছেই।

সুভাষ বাবুকে যদি কংগ্রেসী দ্বন্দ্বে নামিতে না হইত, তাহা হইলেও তিনি বাংলা দেশের নিজের সমস্যাগুলিতে মন দিতে পারিতেন না, সমগ্রভারতীয় ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকিতে হইত—এখনও তাহাই হইবে।

—

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য

কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগের দ্বারা শাসিত প্রদেশসমূহে যে-সকল গঠনমূলক কার্য্য তত্তৎপ্রদেশের জন্য হইতেছে এবং যাহা বঙ্গের জন্য বঙ্গে হইতেছে না, সেই সকল কাজে বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার হাত দেওয়া উচিত; কেবল আন্দোলন করিলে চলিবে না—যদিও অবিরত আন্দোলনও একান্ত আবশ্যক।

—

যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেস কি করিবেন

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে ভারতবর্ষের যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে যে দীর্ঘ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহার শেষ অংশটি নীচে উদ্ধৃত হইল।

যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা হইতে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, তাহার ধুআ ধরিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীর্ণ হইলে ভারত তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না। গত মে মাসে কলিকাতায় নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেসের এই নীতিই অনুমোদিত হইয়াছে এবং বিদেশে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ভারতীয় জনগণের সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার মিশর ও সিঙ্গাপুরে

সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদও ইতিপূর্ব্বেই এই অভিমত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন ভারতীয় সৈন্যকে যেন কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে পাঠান না হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে ভারত-সরকার ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সুস্পষ্ট ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এমন এক কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন, যাহার ফলে ভারতকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতে হইতে পারে। তার পর গবর্মেণ্ট পরিষদের আয়ুষ্কাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ব্রিটিশ সরকারের এই সকল কার্য্য অনুমোদন করিতে পারে না। কংগ্রেস কেবলমাত্র গবর্মেণ্টের এই নীতির সংস্রব ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, যাহাতে এতৎসম্পর্কে কংগ্রেসের নীতিই কার্য্যকরী হয়, তাহারই প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ওআর্কিং কমীটি কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে পরিষদের আগামী অধিবেশনে যোগদানে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ দিতেছে। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহকেও কংগ্রেস কোনক্রমে যুদ্ধায়োজনে বৃটিশ সরকারকে কোন সহায়তা না করিতে এবং এ বিষয়ে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির প্রতি অবহিত ও নিষ্ঠাবান্ থাকিতে নির্দ্দেশ দিতেছে।

এই নীতি অনুসরণের ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে যদি পদচ্যুত হইতে হয় বা পদত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সে'জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যদি ভারতের কোন অংশ আকাশ-পথ হইতে বা অন্য কোন ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে সে জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ঐরূপ আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা কোন জনপ্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে ওআর্কিং কমীটি তাহাতে সমর্থন ও উৎসাহ দান করিবেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে যদি যুদ্ধায়োজনের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ওআর্কিং কমীটি তাহা অনুমোদন করিবেন না। —এ. পি.

কমীটির এই প্রস্তাবের আমরা সমর্থন করি।

কোন বহিঃশত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে চাহিলে তাহাকে জলপথে স্থলপথে বা আকাশপথে আসিতে হইবে। আসিবার পথের দূরবর্ত্তী ঘাঁটিগুলিও রক্ষা করিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বলিতে পারেন, তাঁহারা দূরবর্ত্তী এই সব ঘাঁটি রক্ষার নিমিত্তই ভারতীয় সৈন্য পাঠাইতেছেন। কিন্তু দেশের লোকদের প্রতিনিধিদিগকে, অন্ততঃ এক এক দলের নেতাদিগকে, সম্মত করিয়া তাহা করা উচিত ছিল। আবশ্যক হইলে এই সম্মতিগ্রহণের কাজটি গোপনীয় কন্‌ফারেন্সে করা চলিত। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির অহঙ্কার এরূপ যে, তাঁহারা জাপানীর কীল চড় চাপড় কানমলা লাথি ঘুসি নগ্নীকরণ সব সহ্য করিতে পারেন কিন্তু ভারতীয়দিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারেন না।

ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের সম্মতি না-লইয়া যে-সব সৈন্য এদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের যাতায়াতের ব্যয়, বেতন, এবং অন্যান্য সব ব্যয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দেওয়া উচিত।

যদি বাহিরে এত সৈন্য পাঠাইলেও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা এবং বহিঃশত্রু হইতে আক্রমণ নিবারণ চলে, তাহা হইলে স্থায়ী ভাবে ঐ সংখ্যক সৈন্য কমাইয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় কমিবে; কিন্তু যদি না চলে, তাহা হইলে ব্রিটেন নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষকে বিপদাশঙ্কার মধ্যে ফেলিয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা প্রকাশের আয়োজন

আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। নীচে তাহার বিবৃতি দেওয়া হইল।

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে বালক-কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কবিজীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে, তাঁহার সমস্ত বাংলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র-নাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে যথা—(১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ। রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আগামী আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুই মাস অথবা তিন মাস অন্তর একটি করিয়া খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপে প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতি খণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাইয়ের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪৷৷০, ৫৷৷০ ও ৬৷৷০ টাকা, রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ার বাঁধাই প্রতি খণ্ডের মূল্য হইবে ১০৲ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হইবে ইহার চিত্রসম্ভার। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব নানা ফটোগ্রাফ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও পুস্তক-চিত্রণ; রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে।

এক একটি খণ্ডের প্রকাশ প্রতি দুই মাস বা তিন মাস অন্তর না হইয়া আরও শীঘ্র শীঘ্র হইতে পারে কিনা, কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিবেন।

—

বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রস্তাবাবলী

বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মুদ্রিত একটি খণ্ড আমরা পাইয়াছি। প্রস্তাবগুলি সমস্তই ন্যায্য ও সঙ্গত। শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষাবিভাগ, বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি এইগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুব্যবস্থা করিলে জেলার খুব উপকার হইবে। আশা করি তাঁহাদের নিকট প্রস্তাবগুলি প্রেরিত হইয়াছে।

—

বাঁকুড়ায় পটারি

বাঁকুড়া শহরে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের পটারিতে ছাদ মেঝে ইত্যাদি ছাইবার জন্য, রাণীগঞ্জ টালি নামে পরিচিত টালির মত, টালি নির্মিত হয়। তদ্ভিন্ন জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত মুরি পাইপ প্রভৃতিও নির্মিত হয়। যাঁহারা বাঁকুড়ায় বা তাহার নিকটে থাকেন, তাঁহারা জিনিষগুলি দেখিয়া ও দর জানিয়া সেগুলি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারেন। যাঁহারা দূরে থাকেন তাঁহারা পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য সব কথা জানিতে পারেন। এই পটারির সব জিনিষ বাঙালীর মূলধনে বাঙালীর কারিগরিতে এবং বাঙালীর পরিশ্রমে প্রস্তুত হয়।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার "ফাইন পটারিজ্" নাম দিয়া আর একটি পটারি খোলা হইয়াছে। ইহাতে চীনা-মাটির কুঁজো, চা-দান, ঘি ও তেল রাখিবার পাত্র, শিশুদের ব্যবহার্য্য নানাবিধ খেলনা প্রভৃতি নির্মিত হয়। ইহাও বাঙালীর মূলধনে বাঙালী শিল্পী ও শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত।

বাংলা দেশের নানা স্থানে এইরূপ বহুবিধ পণ্য-শিল্পের কারখানা স্থাপিত হওয়া সুলক্ষণ।

—

মালদহে নারকীয় নারীমেধ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, মালদহ জেলার বারঘরিয়া নামক একটি মাত্র গ্রামে ৬১(একষট্টি)টি নারী অপহৃতা হইয়াছে সঙ্ঘ তাহাদের পরিচয় সমেত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বৃদ্ধেরা ত মরিয়াই আছি। অন্যেরা যে বাঁচিয়া আছেন, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ।

—

নূতনবিধ নারীশিক্ষা-কলেজ

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের উদ্যোগে পূজার ছুটির পর আগামী নবেম্বর মাসে নারীদের শিক্ষার জন্য একটি নূতন রকম কলেজ খোলা হইবে। ইহাতে তাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অধিকন্তু গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Domestic Science) সমাজহিত সাধন (Social Service) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। আপাততঃ অল্পসংখ্যক ছাত্রী লওয়া হইবে, এবং তাঁহারা কলেজসংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে থাকিবেন। এরূপ শিক্ষায়তনের প্রয়োজন আছে।

—

বাংলার নদী-সমস্যা

বাংলার নদীগুলি হইতে উপকার যত পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার বন্দোবস্ত করা এবং পাইবার মত অবস্থায় সেগুলিকে রাখা, বন্যায় নদীগুলি দ্বারা যাহাতে দেশের ক্ষতি না-হয় তাহার ব্যবস্থা করা, এইরূপ বহু সমস্যার সমাধান আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে নদীবেগ নদীগতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাগার আবশ্যক। এইরূপ গবেষণা যে-যে দেশে হয়, তাহার একটি বৃত্তান্ত ডাঃ মেঘনাদ সাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। ডাঃ সাহা এ বিষয়ে মডার্ণ রিভিয়ুতেও একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

এইরূপ গবেষণাগারের প্রয়োজন সম্ভবতঃ বাংলা সরকার এখন অনুভব করিয়াছেন। তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা পঞ্জাব হাইড্রলিক ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর ডক্টর নলিনীকান্ত বসুকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি, ভারতীয়দের মধ্যে ইনি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁহার ফরমাইস অনুযায়ী গবেষণাগার নির্মিত হইলে বঙ্গের উপকার হইবে। আপাততঃ তাঁহাকে, ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে, এবং বাংলা-সরকারের সেচ-বিশেষজ্ঞ প্রধান এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গের পূর্ত্ত-সচিব বন্যার সময় নদীসমূহের অবস্থা দেখিবার জন্য স্টীমলঞ্চে সফরে বাহির হইতেছেন। ইহার সুফল প্রতীক্ষা করিব।

—

হিট্‌লার সম্বন্ধে চার্চিলের মন্তব্য

ব্রিটিশ রাজনীতিক চার্চিল একটা বক্তৃতায় হিট্‌লার সম্বন্ধে অনেক চোখা কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন: হিট্‌লারকে পাগল বলিলেও চলে, কিন্তু তাহার মর্জ্জির উপর পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করিতেছে; আবার, সে একটা হুকুম দিলেই মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, এবং মানব সভ্যতা ছারখার হইবে; এক জন মানুষের দ্বারা এরূপ অনিষ্ট-সম্ভাবনা পৃথিবীর যেরূপ অবস্থায় হইতে পারে, তাহার প্রতিকার হওয়া চাই; ইত্যাদি। সত্য কথা। কিন্তু হিট্‌লারের এত ক্ষমতা হইয়াছে কাহাদের দোষে? ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, আমেরিকার,...এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে।

—

ইয়োরোপের অবস্থা

ইয়োরোপের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিতে চাই না। এবেলা যাহা লিখিব ওবেলা তাহার কোন সার্থকতা না-থাকিতে পারে। যুদ্ধ বাধিতে পারে, না-বাধিতেও পারে। না-বাধিলেই ভাল।

—

চীন-জাপান যুদ্ধের ২৩ মাসের ফলাফল

টোকিওতে জাপানের যে সাম্রাজ্যিক সাধারণ সদর আপিস (Imperial General Headquarters) আছে, তাহা হইতে চীনে জাপানের ২৩ মাস যুদ্ধের ফলাফলের একটি বিবৃতি বাহির হইয়াছে। ১৯৩৭এর ৭ই জুলাই হইতে ১৯৩৯এর ২৯শে মে পর্য্যন্ত যুদ্ধে চীনারা নিহত হইয়াছে ৯,৩৬,৩৪৫; জাপানীরা নিহত হইয়াছে ৫৯,৯৮৮। মোট চীনা হতাহতের সংখ্যা আনুমানিক তেইশ লক্ষ। চৈনিক হতাহত এত বেশী হইবার কারণ জাপানী সেনা-দলের রণসজ্জা অস্ত্রশস্ত্র, শিক্ষা ও নেতৃত্ব চীনাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। চীনদেশে জাপানীরা যে বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করিয়া আছে, তাহা আয়তনে জাপান সাম্রাজ্যের প্রায় আড়াই গুণ। জাপানীরা বলে, তাহারা চীনের ১৫৬১টা এরোপ্লেন নষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের নিজের কেবল ১১৬টা নষ্ট হইয়াছে।

জাপানীদের এইরূপ সাফল্য সত্ত্বেও তাহাদের সামরিক নেতারা বলে, চীনে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাদের ৫০ হইতে ১০০ বৎসর লাগিবে; কাজটা বড় কঠিন, কিন্তু সম্পন্ন হইয়া গেলে তাহাদের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল! কিন্তু কাজ হাসিল করিতে হইলে পাশ্চাত্য বৈদেশিক প্রভাব চীন হইতে দূরীভূত করা দরকার। সেই জন্য জাপানীরা বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ জাতির প্রভাব নষ্ট করিতেছে।

চৈনিক প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাইশেক কিন্তু আগেকার চেয়েও এখন শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ সম্বন্ধে দৃঢ়-বিশ্বাসী। তিনি বলেন, যুদ্ধের আরম্ভের সময়ের চেয়ে এখন যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক তাঁহার বেশী আছে; কিন্তু রণসজ্জা জাপানীদের সমান হওয়া চাই, ও তাহাদিগকে অনেকগুলা সম্মুখ-যুদ্ধে হারান চাই। জাপানের আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাইয়া প্রায় শূন্যে পৌঁছার উপরেই চীনের জয়ের আশা চিয়াং কাইশেকের মতে অধিক নির্ভর করে। জাপানের পুঁজি শেষ হইতে পারে যদি ব্রিটেন ও আমেরিকা একযোগে পেঁচ কষে।

—

তিয়েন্তসিনে জাপানের মূল দাবী ব্রিটেন কর্ত্তৃক স্বীকার!

লণ্ডন, ১১ই আগষ্ট

তিয়েনৎসিনে কোন একটি হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া

শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ যুদ্ধ শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা বাহাদু

বর্ণিত চারি জন চীনাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিচারার্থ আদালতে সমর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই চারি জন চীনাকে জাপ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিয়েনৎসিনে ইঙ্গ-জাপ বিরোধের সূত্রপাত হয়। রয়টার জানিতে পারিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে টোকিওতে যে সমস্ত অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানান হয় এবং লণ্ডনে আইন-বিশেষজ্ঞগণ ঐ সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করেন। ফলে সাব্যস্ত হয় যে, উক্ত চারি জন চীনার মধ্যে দুই জনকে নরহত্যার এবং অবশিষ্ট সকলকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে গবর্ণমেণ্ট সন্দেহভাজন লোকদিগকে স্থানীয় আদালতে সমর্পণ করিতে বাধ্য। কারণ যে-সব লোকের আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধালাভের কোন অধিকার নাই, তাহাদের বেলায় প্রচলিত প্রথানুযায়ী উক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে সন্দেহভাজন পঞ্চম চীনাকেও সর্ত্তাধীনে নজরবন্দী করিবার জন্য আদালতে সমর্পণ করা হইবে। সরকারী মহল দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছেন যে, টোকিওতে যে বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে তাহার সহিত এই ব্যাপারের কোন সংস্রব নাই। উক্ত চীনাদিগকে সমর্থন করার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হইয়াছে। পরন্তু কোন প্রকার লাভের আশায় এরূপ করা হয় নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র ইঙ্গ-জাপ আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য স্যার রবার্ট ক্রেগীর নিকট বিস্তৃত নির্দ্দেশ প্রেরিত হইয়াছে।

আদালতে সমর্পণ করার বিরোধিতা

তিয়েনৎসিনের সন্দেহভাজন চারি জন চীনাকে বিচারার্থ সমর্পণ করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, অধ্যাপক নরম্যান বেণ্টউইক এবং মিস মার্গারেট ক্রাই তাহার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা সাংহাইয়ের একটি সলিসিটর ফার্ম্মকে হেবিয়াস কর্পাস আইন অনুযায়ী পরোয়ানা জারীর জন্য দরখাস্ত পেশ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। —রয়টার

ব্রিটেন আর কতটা নামিবে?

—

ওআর্কিং কমীটি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চান

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটিতে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

দমদম ও আলীপুর জেলের প্রায়োপবেশক রাজনৈতিক বন্দীগণ দুই মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখায় ওআর্কিং কমীটি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছে। রাজনৈতিক বন্দীগণ যে প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, ওআর্কিং কমীটি আশা করেন যে, বাংলা-সরকার তাহার গুরুত্ব যথোচিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়া দেশের জনমতের দাবীকে মর্য্যাদা দিতে ওআর্কিং কমীটি বাংলা-সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। রাজনৈতিক বন্দীগণ হিংসানীতি বর্জ্জন করায় ওআর্কিং কমীটি পঞ্জাব গবর্মেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে তাঁহাদের এলাকাধীন রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি দিতে অনুরোধ জানাইতেছে। ওআর্কিং কমীটির দৃঢ় অভিমত এই যে, মুক্তি অর্জ্জনের জন্য বন্দীদের—রাজনৈতিক বন্দীই হউন আর যে-কোনরূপ বন্দীই হউন, অনশন করা কাহারও কর্ত্তব্য হইবে না। ওআর্কিং কমীটির ইহাও অভিমত যে, অনশন অবলম্বন দ্বারা যদি বন্দীগণ মুক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে সুশৃঙ্খল ভাবে গবর্মেণ্টের কাজ করা অসম্ভব হইবে।

গান্ধীজী স্বয়ং যতবার প্রায়োপবেশন করিয়াছেন সেগুলি কি সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্যের সহায়ক হইয়াছিল?

লোকমত সকল প্রায়োপবেশনের সমর্থন যে করে না, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুধু প্রায়োপবেশনদ্বারা বন্দীরা মুক্তিলাভ বা অন্য কেহ অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না। জনমত তাহার সমর্থক হওয়া চাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রস্তাব

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার আশায় সত্যাগ্রহ স্থগিত করিয়া আফ্রিকার সত্যাগ্রহীরা যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য ওআর্কিং কমীটি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন। দুই দুই বার দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় প্রবাসীদিগকে যে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল তাহা রক্ষাকল্পে তাঁহাদিগকে নির্যাতনভোগের কঠোর পরীক্ষায় যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য ওআর্কিং কমীটি ইউনিয়ন গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার সমস্ত চেষ্টা যদি একান্তই ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে ওআর্কিং কমীটি দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহীদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, তাঁহাদের সংগ্রামে সমগ্র ভারত তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবে।

নেপালের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী হওয়ার বার্ষিক উৎসব

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ সুরেন্দ্র বিক্রম শাহ স্থায়ী ভাবে নেপালের প্রধান মন্ত্রীকে রাজ্যশাসনের সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করেন। তখন হইতে প্রধান মন্ত্রীরা পুরুষানুক্রমে নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সেনাপতি মহারাজা যুধা শমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এবার ১লা সেপ্টেম্বর ১৭ই ভাদ্র। ঐ দিনে নেপালের সর্ব্বত্র উৎসব হইবে। মহারাজা নেপালকে সকল দিকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতেছেন। তাঁহারই আমলে প্রথম লণ্ডনে নেপালী রাজদূত প্রেরিত হয়। নেপালের শিক্ষা অবৈতনিক। তিনি সাতিশয় প্রজাবৎসল। ভূমিকম্পে নেপাল বিধ্বস্ত হইবার পর দরিদ্রদের গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি ২৯ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন এবং যত দিন গরিবদের মাথা রাখিবার স্থান না হইয়াছিল তত দিন প্রাসাদ ছাড়িয়া তাম্বুতে বাস করিয়াছিলেন।

—

শান্তিনিকেতনে বোধিদ্রুমের শাখা রোপণ

শান্তিনিকেতনে বর্ত্তমান বৎসরের বর্ষামঙ্গলের বিশেষত্ব সেখানে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখা রোপণ। আভাগড়ের রাজা বাহাদুর ইহা রোপণ করেন। হয়ত এতদ্দ্বারা অনভিপ্রেত রূপে নূতন তীর্থের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

—

বাংলার হিন্দুমহাসভার সহিত সংস্রব ত্যাগের হুকুম

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির কিংবা আইন সভার যে সমস্ত সদস্য হিন্দুসভার কোন কর্ম্মকর্ত্তাপদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহারা যদি উক্ত কংগ্রেস কমীটির বা আইন সভার সদস্য পদে বহাল থাকিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দুসভার কর্ম্মকর্ত্তা পদ ত্যাগ করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ে সুরা বর্জ্জন

বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রীরা বোম্বাই শহরে মদ বিক্রী ও মদ খাওয়া বন্ধ করিয়া একটি খুব মহৎ কাজ করিয়াছেন। ইহাতে গবর্ন্মেণ্টের আয় খুব কমিবে। এই ক্ষতির তাঁহারা অন্য উপায়ে পূরণ করিবেন। সুরাবর্জ্জনের আরম্ভের দিন বোম্বাইয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন গবর্ন্মেণ্টের ভীত হওয়া উচিত নয়, বোম্বাই গবর্ন্মেণ্টও ভীত হন নাই, সংকল্পে দৃঢ় আছেন।

বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া এরূপ জায়গায় সুরাবর্জ্জনপ্রচেষ্টা সামান্য ভাবে চালাইতেছেন যেখানে আবগারীর আয় খুব কম!

—

মান্দ্রাজের দুটি প্রশংসনীয় বিল

মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় দুটি প্রশংসনীয় ও অত্যাবশ্যক বিল উপস্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এবং অন্য কোথাও কোথাও, দেবমন্দিরে বালিকাদিগকে দেবদাসী রূপে উৎসর্গ করিবার প্রথা আছে। এই দেবদাসীরা নামে দেবতার দাসী হইলেও বেশ্যাবৃত্তি করে বা করিতে বাধ্য হয়। কোনও বালিকাকে যাহাতে অতঃপর দেবদাসী রূপে উৎসর্গ না করা হয় এই উদ্দেশ্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিল মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহা যত শীঘ্র আইনে পরিণত হয় ততই মঙ্গল।

অন্য বিলটির উদ্দেশ্য 'হরিজন'দের দেবমন্দিরে প্রবেশ ও তথায় পূজা করিবার অধিকার দানের আইনগত বাধাবিঘ্নগুলি দূরীকরণ। এই বিলও সমর্থনযোগ্য।

—

স্বর্গতা শ্রীযুক্তা কমলা বসু

গত ২৭শে জুলাই রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ময়ূরভঞ্জে লোহার খনির আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা বসু দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু কলিকাতায়

কিন্তু তাঁহার স্বামী পেন্সন লইবার পর রাঁচীতে বাস করিতেন বলিয়া ঐ স্থানেই বহু বৎসর তাঁহার নিবাস ছিল। তথাকার বালিকা-বিদ্যালয় ও বিধবাশ্রম তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। কলিকাতাতেও তাঁহার নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। দানশীলতা ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি পরিচিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

—

লর্ড অরুণ সিংহের হাউস অব লর্ডসে আসন লাভ

লর্ড অরুণ সিংহের পিতা লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদিও এক বই দুই বিবাহ করেন নাই, তথাপি তিনি হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুমতে একাধিক পত্নী গ্রহণ করা চলে বলিয়া, অরুণ সিংহ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও বিলাতের হাউস অব লর্ডসে এ-পর্য্যন্ত লর্ডরূপে আসন গ্রহণের অধিকার পান নাই; কারণ সেখানে কেবল এরূপ প্রথা অনুযায়ী বিবাহের সন্তানই আসন লাভ করিতে পারে যে প্রথায় এক পত্নী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ চলে না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইবার পর অরুণ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্ম মতে এক পত্নী থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ হইতে পারে না, এই কারণে এখন অরুণ সিংহ হাউস অব লর্ডসে আসন গ্রহণ করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

এই সম্মান কেহ পাইলেন কি পাইলেন না, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকদের কিছু আসিয়া যায় না, এবং সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ সিংহ মহাশয়ও এই সম্মানের প্রকৃত মূল্য জানেন। তিনি যদি লর্ড-সভায় বসিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ন্যায্য কথা মধ্যে মধ্যে বলিবার সুযোগ পান ও বলেন তাহা হইলেই তাঁহার সেখানে বসা সার্থক হইবে—তাহার কথায় কোন সুফল হউক বা না হউক। লর্ডেরা আজীবন সভ্য, কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভের উপর তাঁহাদের লর্ড-সভায় স্থান লাভ নির্ভর করে না। সুতরাং তাঁহারা স্বাধীনভাবে ন্যায্য কথা বলিয়া কোন দলের বিরাগভাজন হইলে তাঁহাদের আসনচ্যুত হইবার ভয় নাই। ভয় থাকিলেও পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সে ন্যায্য কথা কখন কখন কোন কোন সদস্য বলেন। হাউস অব লর্ডসে তাহা বলা আরও যদিও অধিকাংশ লর্ড রক্ষণশীল দলে বলিয়া ভারতবর্ষের সপক্ষে ন্যায্য কথা কচিৎ বলেন। লর্ড অরুণ সিংহ ভারতবর্ষীয় বলিয়া রক্ষণশীল দলের ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মতে তাহার সায় দিবার কথা নহে। তাহার পিতা কংগ্রেস-সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে অনেক স্বাধীন ন্যায্য মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুত্রের মত পিতার মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

—

অন্ধ্রকে আলাদা প্রদেশ করিতে ভারতসচিব অসম্মত

কংগ্রেসের কর্ত্তারা ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী। মান্দ্রাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত। তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় তেলুগুভাষী অন্ধ্রদেশকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার পক্ষে সুপারিস করিয়া ভারতসচিবকে চিঠি লেখেন। ভারতসচিব এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়াছেন। মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, এ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা যদি তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলেন, তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন।

তেলুগুভাষীরা এখন কি করিবেন, পরে জানা যাইবে।

—

বাংলাভাষীদিগকে একপ্রদেশভুক্ত করা

অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে ভারতসচিব রাজী না হওয়ায় বিহারী ভায়ারা আহ্লাদ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই; তাঁহারা মনে করেন তাহা হইলে বিহারপ্রদেশের অন্তর্গত বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলার অন্তর্গত করিতেও ভারতসচিব অসম্মত হইবেন, এবং ছোটনাগপুরকে একটা আলাদা প্রদেশ করিতে রাজী ত হইবেনই না। আমরাও এরূপ মনে করি না যে, বাঙালীদের যাহাতে সুবিধা হয় এমন কিছু করিতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সহজে সম্মত হইবেন।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কি করিবেন না-করিবেন তাহার অনুমান ও আলোচনা না করিয়া আমরা বলিতে চাই যে, একটা নূতন প্রদেশ গঠন এবং ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের কতকগুলি অংশকে বাংলা প্রদেশের পুনরন্তর্ভুক্ত করা এক রকমের প্রস্তাব নহে, ভিন্ন রকমের প্রস্তাব।

অন্ধ্রকে আলাদা প্রদেশ করিতে হইলে তাহার জন্য আলাদা গবর্ণর ও তাঁহার বহু কর্ম্মচারী, আলাদা হাইকোর্ট-আদি, আলাদা ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি চাই; ঘরবাড়ীও অনেক নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এককালীন ও পৌনঃপুনিক বিস্তর খরচের ব্যাপার। কিন্তু আসাম প্রদেশের ও বিহার প্রদেশের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত করিতে হইলে নূতন প্রদেশ গড়িতে হইবে না এবং নূতন গবর্ণরাদিও চাই না; সে সমস্তই মজুদ আছে। অতিরিক্ত খরচ ওরকম কিছুই হইবে না।

জামশেদপুর কারখানায় বিহারীদের দাবী

জামশেদপুরে টাটা কোম্পানীর কারখানায় প্রধানতঃ বিহারীদিগকেই কাজ দিবার একটা দাবী বিহারী ভায়ারা করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ভিতরে ভিতরে বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ এবং বিহারের প্রধান মন্ত্রী এই দাবীর পশ্চাতে আছেন বা তাঁহারা এ-বিষয়ে বিহারের মুখপাত্র। তাহা সত্য হউক বা না হউক, জামশেদপুরের অগ্রমিক শ্রমিক নেতা বিহারের লোক। বিহারীদের দাবী অনুসারে কাজ না হইলে তিনি ধর্ম্মঘট বাধাইতে পারিবেন এবং বিহার-গবর্ন্মেণ্ট তাহা বন্ধ করিতে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ না করিতে পারেন। ইহা আনুমানিক কথা, বাস্তবিক কি ঘটে বা ঘটিতে পারে, বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে, টাটা কোম্পানী যে-সব বাঙালী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিশেষজ্ঞকে চাকরি দিয়াছেন ও চাকরিতে রাখিয়াছেন, তাহাদের মত যোগ্যতাবিশিষ্ট বিহারী পাওয়া গেলে বিহারীদেরই চাকরি হইত।

অথচ জামশেদপুরে বিহারীদিগকে বা অন্য কোন প্রদেশীকে বেশী সংখ্যায় নিযুক্ত করিবার কোন ন্যায্য কারণ নাই, এবং সেরূপ পক্ষপাতিত্ব দ্বারা এ-রকমের একটা বড় কারখানা চলিতেও পারে না। তাহাকে পৃথিবীর সব দেশের শ্রেষ্ঠ লোহা-ইস্পাতের কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইবে, চিরকাল লোহা-ইস্পাতের বিদেশী জিনিষের উপর বাণিজ্যশুল্ক বসাইয়া তাহাকে টিকাইয়া রাখা উচিত হইবে না, চলিবেও না। প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে যোগ্যতম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে—তিনি যে প্রদেশেরই লোক হউন।

জামশেদপুরে অন্য সকল লোকদের চেয়ে বিহারীদের বেশী চাকরি পাইবার দাবীর একমাত্র ভিত্তি ঐ জায়গাটা এখন বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু সেটা কোন ন্যায্য বা স্থায়ী কারণই নয়। যদি ঘটনাচক্রে উহা অন্য প্রদেশভুক্ত হয়, তখন কি হইবে? যোগ্যতার ভিত্তিই স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ ভিত্তি।

জামশেদপুরের পূর্ব্বনাম সাকচী, টাটানগরের পূর্ব্ব নাম কালীমাটী। সাকচী গ্রাম এখনও আছে, তাহার এবং আশপাশের গ্রামের লোকেরা বাংলাভাষী বাঙালী। জায়গাগুলা ভৌগোলিক বঙ্গের অন্তর্গত।

কারখানাটির কাজ যে-সব অংশীদারদের টাকায় চলে, বিহারীরা তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী নহে এবং সবচেয়ে বেশী টাকার অংশও গ্রহণ করে নাই। সুতরাং সে হিসাবে তাহাদের দাবীর প্রাধান্য নাই

ক্রেতারা জিনিষ কেনে বলিয়াই কারবার চলে। জামশেদপুরের কারখানার জিনিষ যদি বিহারীরাই সবচেয়ে বেশী কিনিত তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমরা তোমাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা, অতএব আমাদিগকে সবচেয়ে বেশী কাজ দাও।" কিন্তু তাহারা সবচেয়ে বড় ক্রেতা নয়।

যাহারা জামশেদপুরের কারখানার সবচেয়ে বেশী জিনিষ কেনে, কারখানার উপর তাহাদের আর এক দিক্ দিয়া বেশী দাবী আছে। বিদেশী লোহা-ইস্পাতের জিনিষের উপর বাণিজ্যশুল্ক না থাকিলে কারখানাটা টিকিতে পারিত না। এই শুল্কটা বাস্তবিক যাহারা দেয় তাহারাই কারখানাটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। দেয় কাহারা? লোহা-ইস্পাতের বিদেশী যে জিনিষের উপর

বাণিজ্যশুল্ক না থাকিলে ভারতীয়েরা তাহা এক টাকায় কিনিতে পাইত, বাণিজ্যশুল্ক থাকায় তাহা, ধরুন, তাহারা পাঁচ সিকায় কিনে এবং সেই রকম জিনিষ টাটারাও পাঁচ সিকায় দেয়; এক টাকায় দিতে পারিত না। সুতরাং টাটাদের যত জিনিষ ভারতীয়েরা কেনে, তাহার মূল্যস্বরূপ তাহারা টাকায় চারি আনা বেশী দিয়া তাহারা তাহাদের কারখানাটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বাংলা দেশের লোকেরাই তাহাদের জিনিষ অন্য যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী কেনে। এই প্রকারে বাঙালীরা এ-পর্য্যন্ত অনেক কোটি টাকা তাহাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যস্বরূপ দিয়া তাহাদের কারখানা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিলে, এবং কাহারা অতিরিক্ত মূল্যস্বরূপ সাহায্যদান দ্বারা তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে বিবেচনা করিলে, সকলের চেয়ে বাঙালীদেরই তাহাদের কারখানায় বেশী কাজ পাওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালীরা সেরূপ কোন কারণে বেশী চাকরি চায় না। তাহারা চায় কেবলমাত্র সর্ব্বাধিক যোগ্যতা অনুসারে সকল প্রকার কাজে নিয়োগ। সকল প্রদেশের লোকেই এই কারখানার অংশ কিনিয়াছে এবং ইহার জিনিষ অতিরিক্ত দাম দিয়া কিনিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্য সকল প্রদেশেরই ইহার উপর যোগ্যতা অনুসারে দাবী আছে।

হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ বন্ধ হইল

আর্য্যসমাজী ও অন্য হিন্দুরা ব্রিটিশ ভারতে যতটা স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিতে পারে, নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ততটা স্বাধীনভাবে পারিত না, বিস্তর বাধা ছিল। এই জন্য আর্য্যসমাজী ও অন্য হিন্দুরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। অনেক হাজার সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড হয়, জেলে কয়েক জনের মৃত্যুও হয়। সম্প্রতি নিজাম নিজ রাজ্যের যে নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রচার করিয়াছেন, আর্য্যসমাজীদের ও অন্য হিন্দুদের নেতারা মনে করেন যে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য তাঁহারা সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়াছেন। যথেষ্ট স্বাধীনতা পাওয়া গিয়া থাকিলে সুখের বিষয়। সত্যাগ্রহে শত শত ব্যক্তি বহু দুঃখ পাইতেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তাহা একটা মনোমালিন্যের কারণও হইতেছিল। অতএব তাহা বন্ধ হওয়া সন্তোষের বিষয়। কিন্তু সত্যাগ্রহের চাপে নিজামের যে-সুবুদ্ধি হইয়াছে, আগে সে-সুবুদ্ধি কেন হয় নাই?

হায়দরাবাদের নূতন রাষ্ট্রবিধি অনুসারে যে ব্যবস্থা হইবে, তাহা ঐ রাজ্যের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী অপেক্ষা কিছু ভাল হইবে বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা প্রজাদের প্রতিনিধিদের হাতে একটুও যাইবে না। ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও সরকারমনোনীত সদস্যদের সংখ্যা অধিক থাকিবে।. ব্যবস্থাপক সভায় চূড়ান্ত কিছু হইবে না; যাহা হইবে তাহা নিজামের কাছে কেবল সুপারিশ বলিয়া গণ্য হইবে। হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যার আটগুণ; অথচ মুসলমানেরা হিন্দুদের সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে! নূতন রাষ্ট্রবিধিতে এই প্রকার যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা আছে!

—

আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Ray) প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বাঙালী প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের ও কলেজ-পরিদর্শকের কাজও করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল হইবার পূর্ব্বে তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নিজে দর্শনে ও বিজ্ঞানে গভীর পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে শুধু বেশী নম্বর পাইয়া পাস করিতে সমর্থ করা অপেক্ষা তাহাদের দার্শনিক মননশক্তির বিকাশে অধিক মন দিতেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার মননশক্তি, পবিত্র জীবন ও উচ্চ চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার আবক্ষমূর্ত্তি (bust) প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে পালন করিয়াছেন।

—

বঙ্গে অতিবৃষ্টি

এবার বাংলা দেশে যথাসময়ে বর্ষার বারিধারা পড়ে নাই; অনাবৃষ্টির পর কিন্তু এক সপ্তাহেরও অধিক কাল অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে বন্যা এবং মাঠে প্লাবন হয়। তাহাতে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, অনেকের ঘর পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে, গবাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে, মানুষ হতাহতও যে হয় নাই এমন নয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকদের আপাত দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেই হইবে। কিন্তু বন্যা ও অতিবৃষ্টির কুফল নিবারণের স্থায়ী প্রতিকারের চেষ্টা মানুষের সাধ্যানুসারে আমেরিকা ও ইয়োরোপের কোন কোন দেশে যেরূপ হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা করিতে হইবে। নদীসমূহের স্রোত বজায় রাখিয়া অথচ তাহাদিগকে বাগে আনিয়া তাহাদের দ্বারা লাভবান্ হইতে হইবে। এরূপ চেষ্টার প্রথম আয়োজন নদীসম্বন্ধীয় গবেষণাগার স্থাপন। সে-বিষয়ে বিবেচনা বাংলা সরকার করিতেছেন।

এরোপ্লেন-বিনাশী কামান

ফ্রান্সে সম্প্রতি অসামরিক লোকজনকে বিবোধী-দলের এরোপ্লেনের আক্রমণ হইতে রক্ষণাবেক্ষণের আয়োজনের একটি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার প্রত্যেকটি অঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখান হইয়াছে। কামান-স্থাপনা, গোলন্দাজদিগকে বোমার বিস্ফোরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বালিভরা থলের দেওয়াল, সুদূর হইতে এরোপ্লেন-আগমনের পথনির্ণয়ের যন্ত্রপাতি, দূর-শ্রবণ-যন্ত্র, সুড়ঙ্গের ভিতর গোলন্দাজ সেনানায়কের কামান-চালনার ব্যবস্থা এবং এরোপ্লেনের গতি-বিধি-নির্দ্ধারণের আপিস—সবই জনসাধারণকে দেখানো হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সামরিক আয়োজনের খুঁটিনাটি সাধারণের চক্ষের সম্মুখে এভাবে ধরা হয় নাই, কেননা ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বিপক্ষদল এইরূপ প্রদর্শনী হইতে অনেক সামরিক গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া ফেলিবে। জার্ম্মান সেনাধ্যক্ষেরা কিন্তু বহু দিন যাবৎ তাঁহাদের দেশে এই সব ব্যবস্থা সাধারণকে দেখাইতেছেন। প্রথমে লোকে ভাবিত যে, যাহা দেখানো হয় সে-সব হয় ফাঁকির ব্যাপার, নয়তো পুরানো অকেজো সরঞ্জাম। কিন্তু স্পেন-যুদ্ধে দেখা গেল যে জার্ম্মান বিশেষজ্ঞের দল ফ্রাঙ্কোর সপক্ষে ঐ সব ব্যবস্থাই চারি দিকে করিয়াছেন এবং তাহা বিশেষ ফলপ্রদও। এই সব দেখিয়া এবার এই প্রদর্শনী হয় এবং তাহাতে সাধারণকে অতি নিকট হইতে সমস্ত দেখিতে দেওয়া হয়।

১৯১৮ সালের বহু দিন পরেও এরোপ্লেন-বিনাশী কামানকে লোকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিত। কত হাজার গোলা দাগিলে একটি এরোপ্লেন পড়ে, তাহা শুনিলে ঐরূপ কামান যে খুব কাজের তাহা মনে হইতে না। উপরন্তু বহু যুদ্ধে অনেক সামরিক বৈমানিকের বিবরণে পড়া যাইত যে যুদ্ধের সময় তাঁহাদের হাজার হাজার ফুট নীচে গোলা

সুইডেনে প্রস্তুত এরোপ্লেন-নাশক ৪০ মি.-মি. রন্ধ্রের বোফোর্স যন্ত্র-কামান। ইহা সতের ছটাক ওজনের বিস্ফোরকপূর্ণ গোলা, ১২০০০ গজ দূরে, অথবা ১৬০০০ ফুট উচ্চে, মিনিটে ১৪০ বার দাগিতে পারে।

ফাটিত বা হাজার গজ তফাতে গোলা চলিত—অর্থাৎ এরোপ্লেন-বিনাশী গোলন্দাজ দলের গোলা চালানো পর্য্যন্তই সাব হইত।

এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ, বিগত মহাযুদ্ধের সময় কামান-অস্ত্রটি আকাশপথে চালাইবার মত জ্ঞান, আয়োজন বিধিব্যবস্থা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ করার মত,—বিশেষতঃ যেখানে লক্ষ্যবস্তুটি দ্রুতবেগে অনেক উপরে চলিতেছে—অর্থাৎ দ্রুতভাবে তাহার দিক্, দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয় করার মত যন্ত্রপাতি বিশেষ ছিল না এবং যাহা ছিল তাহার ব্যবহারে পটু লোকও গোলন্দাজ-বিভাগে প্রায় কেহ ছিল না। পরন্তু তখনকার কামানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রেও (৭৫ মিলিমিটার ফরাসী সমরক্ষেত্রের কামান) লক্ষ্য ঠিক করিতে এবং ঘুরাইয়া চালাইতে এত সময় যাইত এবং তাহার উঁচুর দিকের পাল্লা এতই কম ছিল যে তখনকার এরোপ্লেনের বিরুদ্ধেও তাহা চালনা করা প্রহসন মাত্র ছিল। তখন দ্রুততম এরোপ্লেনের গতি ছিল ঘণ্টায় ৯০ মাইল এবং তাহা ৫০০০ ফুট উপরে উঠিতে পারিত। এখন ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল গতি, এবং ৩৬০০০ ফুট ওঠা অনেক সামরিক বিমানের পক্ষে অসম্ভব নহে, অথচ ১৯১৮ সালের বহু পরেও ঐ ৭৫ মিলিমিটার কামানই ছিল প্রধান অস্ত্র।

১৯২৯ সালে এরোপ্লেনের (ও সাধারণ মোটরকারের) এঞ্জিনে পেট্রোলের বাষ্প ও হাওয়া চাপ দিয়া ঘন করার ব্যবস্থা হইল। ফলে এরোপ্লেনের গতি ও উপরে উড়িবার ক্ষমতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। এত দিন নানা রকমে ঐ ৭৫ মিলিমিটার কামানকেই অদলবদল করিয়া আকাশপথে ব্যবহারের বৃথা চেষ্টা চলিতেছিল। এবার হতাশ হইয়া অন্য ব্যবস্থা দেখিতে হইল। প্রথমতঃ পদাতিক সৈন্যের প্রধান অস্ত্র যন্ত্র-বন্দুক (মেশিনগান্) মোটা ও ভারি গুলিবহ করিয়া চেষ্টা চলিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাহাতে এরোপ্লেনের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ ফল হয় না। ইতিমধ্যে নৌ-বহরের সেনানীরা কামানের রন্ধ্র ছোট করিয়া এবং তাহাতে গোলা ভরিবার ও দাগিবার জন্য বিশেষ যন্ত্র যোগ করিয়া ভাল ফল পাইয়াছিলেন। সুতরাং সেই পথেই নূতন প্রচেষ্টা চলিল, যাহাতে এরূপ যন্ত্র-কামান তৈয়ারী করা যায় যাহার লক্ষ্যনিরূপণ ও গোলাচালনা দুইই অতি দ্রুত এবং প্রবল হয়।

স্পেনের যুদ্ধে এরোপ্লেনের ক্ষমতা ও তাহার বিরোধী অস্ত্রের যোগ্যতা ও ক্ষমতার বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে যে আধুনিক যুদ্ধে আকাশপথে চলন্ত যুদ্ধ-রথের বিরুদ্ধে ভূমিতলের অস্ত্রপাতি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী না হইলেও বিশেষ প্রতিবন্ধক। অতিআধুনিক কামানের মার হইতে বাঁচিতে হইলে এরোপ্লেনকে সাধারণত (দিনের আলোকে) পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার ফুট উপরে চলিতে হইবে এবং বোমা ফেলিবার সময় ক্ষণকালের জন্যও ছয়-সাত হাজার ফুটের অপেক্ষা নীচে নামিলে চলিবে না।

তবে এরোপ্লেনের গতিবেগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কামান ইত্যাদিরও বদল দরকার, অর্থাৎ যে-দেশ নিজের কলকারখানা, নগর, বন্দর ইত্যাদি দুই-এক দিনের বৈমানিক আক্রমণের ফলে ধ্বংস হইতে দিতে চাহে না এই অরাজকতার যুগে তাহাদের নূতন হইতে নূতনতর অস্ত্র-নির্ম্মাণে ও স্থাপনায় ক্রমাগত শত শত কোটি টাকা খরচ করিতেই হইবে।

ক. চ.

ব্রহ্মদেশীয় নাট্যকলা

ব্রহ্মদেশের অভিনয়-শিল্পের বয়স খুব বেশী দিনের নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নাট্যকলার খোঁজ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্যামদেশ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কিছু দিন ব্রহ্ম-দেশের অধীন ছিল। সেই সময় বন্দী অভিনেতাদের সাহায্যে শ্যামদেশের অভিনয়কলা ব্রহ্মদেশে আনীত হয়। এই সব নাটকের আখ্যানভাগ সাধারণতঃ রামায়ণী কথা। কিছুদিন শ্যামদেশীয় ভাষাতেই অভিনয় চলে। তাহার পরে বর্মী ভাষায় ইহাদের অনুবাদ হইতে আরম্ভ করে। ব্রহ্মদেশীয় অভিনয়কলা সম্বন্ধে ডক্টর জে. এ. ষ্টুয়াট রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের মুখপত্রে যে-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে সংকলিত হইল।

মৌলিক নাট্যকলা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুই জন নাট্যকারের হাতে গঠিত হইতে আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ ইঁহারাই ব্রহ্মের আদি নাট্যকার। এক জন উ চিন্ উ, আর এক জন উ পোনিয়া। উভয়েই ছিলেন রাজসভার নাট্যকার, এবং রাজ-পরিবারের মনোরঞ্জনের জন্যই ইঁহারা নাটক রচনা করিতেন। এই যুগকে বর্মী নাটকের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের পরেই আরও অনেক অজ্ঞাতনামা নাট্যকার নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও রচনা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ইহাই বর্মী নাটকের দ্বিতীয় যুগ।

এই সময়ের বর্মী নাটকের ও অভিনয়ের সহিত আমাদের দেশের যাত্রার মিল আছে। রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদির অস্তিত্ব তখন ছিল না, হয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে, অথবা অস্থায়ী পত্রাবরণের নীচে অভিনেতারা নৃত্যগীত করিত, এবং দর্শকবৃন্দ ঠিক আমাদের দেশের মতই গোল হইয়া তাহাদের ঘিরিয়া বসিত। অভিনয় চলিত সমস্ত রাত। ধনীগৃহের বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে এই ধরণের যাত্রার দল আনা হইত, এবং রবাহূত অনাহূত দল আসিয়া সারা রাত নাচগান ও ভাঁড়ের হাস্যরস দেখিয়া খুশী হইয়া রাত্রিশেষে বাড়ী ফিরিত।

আজকাল আমরা রঙ্গমঞ্চ বলিতে যাহা বুঝি, সেই ধরণের
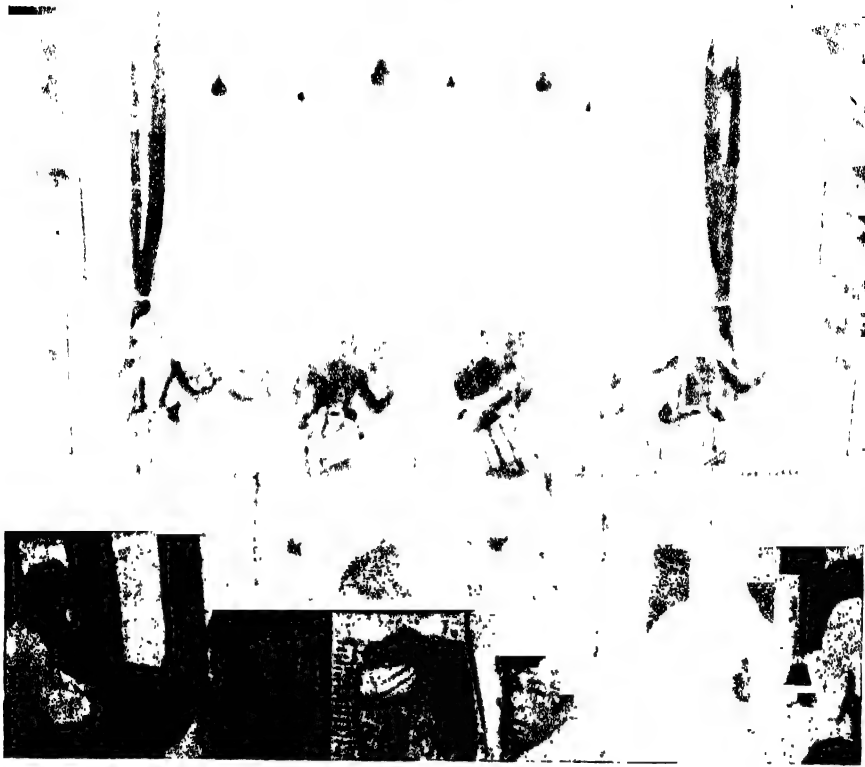
ব্রহ্মদেশের নৃত্যনাট্য

একটি জিনিষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রেঙ্গুনে খোলা হইয়াছিল। কিন্তু বিনা পয়সায় এবং সামান্য আয়াসে যেখানে যাত্রা শোনা সম্ভব, সেখানে পয়সা খরচ করিয়া তামাশা দেখার মত লোক খুব বেশী ছিল না, কাজেই এ উদ্যম কিছু কাল যাবৎ লাভজনক হয় নাই।

প্রথম যুগের বর্মী নাটক, অর্থাৎ উ চিন্ উ এবং উ পোনিয়ার রচনা প্রায় আগাগোড়াই পদ্যে। উভয়েই শক্তিশালী লেখক ছিলেন, মনোহারী ভাষায় তাঁহারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত; ইঁহাদের রচনায় উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা বিরল নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যাত্রায় যেমন গানই ছিল মুখ্য, এবং অভিনয় গৌণ, বর্মী অভিনয় সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। বর্মী নাটকের মধ্যযুগে যে-সব নাটক রচনা হইত, তাহাদেরও প্রায় আগাগোড়াই পদ্যে, এবং ছন্দ ও মিলের খাতিরে অর্থ বিসর্জ্জন দিতে এই সব নাট্যকারেরা একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্মী ভাষায় মিল দেওয়া বাংলার চেয়েও সহজ, কাজেই ছন্দ ও মিল খুব জমকালো হইত, অর্থ অনেক সময়ই খুব বেশী থাকিত না। উ চিন্ উ এবং উ পোনিয়ার প্রতিভা ইঁহাদের ছিল না। ফলে এই ধরণের পদ্য এই সময়ের বর্মী নাটকে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায়,

মিষ্টি যার
দৃষ্টি তার
বৃষ্টি ধার, ঠিক রাজী চাও ?
দিনের শেষে
চীনের দেশে
জিনের বেশে, ডিগ্ বাজী খাও :

অবশ্য এটি কোন বর্মী কবিতার অনুবাদ নহে। শুধু ছন্দ ও মিলের খাতিরে অর্থ বিসর্জ্জন দিলে কবিতার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহার উদাহরণমাত্র। তবে বাংলায় যেমন করিয়া অর্থকে বর্জ্জন করা হইয়াছে, বর্মী ভাষায় অতখানির প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভাষার কথা বাদ দিলে আখ্যানবস্তুর কথা আসিয়া পড়ে, এবং আখ্যানবস্তুর দিক দিয়া এ যুগের নাটক বিগত যুগের গুণী-দিগের নাটককে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই গল্প মামুলী, কিন্তু মামুলী গল্পের ভিতরেও মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। রাজা-রাণী, রাজকন্যা-রাজপুত্র, পাত্র-মিত্র, এসব যথাযথ ভাবেই বজায় আছে। না থাকিলে বর্মী দর্শকের মনোরঞ্জন করা সম্ভবও নয়। কিন্তু ইহাদের ছাড়া আরও অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ, রক্তমাংসে গড়া; যাহাদিগকে বিনা আয়াসে রেঙ্গুনের রাজপথে, মান্দালয়ের প্রান্তরে চোখ মেলিলেই দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশের অভিনয়মঞ্চে রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণ

এই মধ্যযুগে নাট্যকলা রামায়ণের মোহ কাটাইয়া উঠিয়া রূপকথার মায়ায় ধরা পড়িয়াছে। রূপকথা লইয়াই অধিকাংশ নাটকের আখ্যান রচিত। রূপকথার মতই মায়াদণ্ডস্পর্শে তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে মনকে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়। এক পরী-রাজকন্যার গল্প—পরীর দেশ, যেখানে কেহ মানুষের সুখদুঃখের খোঁজ রাখে না, সেখানকার এক রাজকুমারী ভালবাসিলেন মর্ত্ত্যলোকের এক রাজপুত্রকে। বিবাহ হইল, কিছু দিন সুখে কাটিল। তাহার পরে এক দিন রাজপুত্র শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন, দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্রে বধূর জীবনসংশয় হইল। রাজপুত্র অনুপস্থিত; শিশুপুত্রের মুখচুম্বন করিয়া রাণীর কাছে বিদায় লইয়া রাজকন্যা পলায়ন করিলেন পরীর রাজ্যে। পথে এক সন্ন্যাসীর কাছে অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন—অভিজ্ঞান।

রণজয়ী রাজপুত্র ফিরিয়া সব শুনিলেন। তিনি চলিলেন প্রিয়ার সন্ধানে। সন্ন্যাসীর নিকট অভিজ্ঞান মিলিল, অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া অবশেষে রাজকন্যাকে ফিরিয়া পাইলেন।

গল্পটি শিশুসুলভ মনে হইতে পারে। কিন্তু মানুষের মনে যে চিরন্তন শিশু রহিয়াছে, সে যান্ত্রিক প্রগতি, রাজনৈতিক বিবর্ত্তন এবং ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বয়সের ভিতর থাকিয়াও রূপকথার রসাস্বাদন করিতে পারে। তাই ঠাকুরমার ঝুলি শুধু শিশুদের জন্য নয়, খাস্ত অ্যাণ্ডারসনও নয়। লিউইস ক্যারল শিশুদের জন্য "অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" ও "সিল্‌ভি এণ্ড ব্রূনো" রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পাঠক-পাঠিকা যে শুধু শিশুসমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে শুধু প্রেমের "চিরন্তন ত্রিভুজ" ও আধুনিক মানুষের বৈচিত্র্যহীন বিবরণ লইয়া পড়িয়া থাকা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বর্মীরা এখনও ততখানি অত্যাধুনিক হইয়া উঠিতে পারে পারে নাই—তাহারা এখনও ফুল ভালবাসে, এবং রূপকথার রসগ্রহণ করিতে পারে।

উল্লিখিত নাটকটির নাম "রূপালী পাহাড"। ইহার অনেক রকম পরিবর্ত্তিত সংস্করণ অভিনীত হইয়াছে, নানা নূতন চরিত্রের সমাবেশে।

কিন্তু এ যুগের নাটকে সৌন্দর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও কতকগুলি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। নিছক হাসি অথবা নিছক অশ্রু দর্শকগণের মনঃপূত নয়, তাই গল্পের মধ্যে হাসি ও অশ্রু, দুইয়েরই সমাবেশ করিতে হয়। সাধারণ প্রণয়, বিচ্ছেদ-মিলন, মান-অভিমান সম্বলিত নাটকের ভিতরে হাস্যরস ঢুকানো হইয়াছে জোর করিয়া। তাহাতে গল্পের গতির ব্যাঘাত ঘটে যথেষ্ট, এবং অত্যন্ত করুণ পরিস্থিতি অযথা হাস্যকর হইয়া উঠে। বর্মী দর্শক কিসে হাসে বুঝিয়া উঠা কঠিন। পরী-রাজকন্যা মর্ত্ত্যলোকের প্রণয়ীর সঙ্গে পৃথিবীতে আসিতে ভয় পাইতেছেন, তখন রাজপুত্র গম্ভীরভাবে বুঝাইতেছেন, "ব্রিটিশশাসিত ব্রহ্মদেশে চল, সেখানে ইংরেজী শিখিবার সুবিধা আছে।"

অধিকাংশ সময়েই হাস্যরস জোগাইত ভাঁড়ের দল। আমাদের দেশের যাত্রায় চাপকান পরা, শামলা মাথায় জুড়ির দল থাকিত, তাহাদের গান ও অঙ্গভঙ্গি লোক হাসাইত বটে, কিন্তু সেটা অনেকটা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু বর্মী ভাঁড়ের কাজই

লোক হাসানো। সে যতই অপ্রত্যাশিত স্থানে ও অন্যায় ভাবে হউক না কেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যার করুণ প্রণয়দৃশ্য যখন দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া উপভোগ করিতেছে, তখন হয়ত সহসা এক জন ভাঁড় অভিনয়স্থলে উপস্থিত হইয়া এক মুহূর্ত্তে দর্শকদের অশ্রুকে অট্টহাস্যে পরিণত করিয়া তুলিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হয়। নাটকের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং নাট্যশালার মালিকেরা সহসা আবিষ্কার করিয়া বসেন, যে নাটকের জন্য নাট্যকার অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। সত্যকারের নাটকের অস্তিত্ব এই সময়েই লুপ্ত হয়।

এ-যুগের নাটকে গল্প থাকে, কিন্তু অভিনেতাদের কোনও ধরাবাঁধা কথা দেওয়া থাকে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য স্থির করা আছে, অভিনেতা নিজের ইচ্ছামত কথা বলিয়া গল্পাংশ ফুটাইয়া তুলেন। ফলে একই নাটকের বিভিন্ন দিনের অভিনয় বিভিন্নরূপ হইতে পারে, এবং হইয়া থাকেও। অভিনয়ের সময়েরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যেদিন দর্শক থাকে প্রচুর এবং তাহাদের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সেদিন নৃত্যগীতও চলে অবিকক্ষণ ধরিয়া। অভিনেতারা আবৃত্তিও করে অধিকতর আবেগের সহিত। এ-অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হয় না।

অভিনয় আরম্ভ হয় প্রথম রাত্রিতে, ভোরবেলা পর্য্যন্ত চলে। সকলে সারা রাত অভিনয় দেখিয়া ঘুম নষ্ট করিতে রাজী নয়, আবার এক দল আছে, যাহারা সমস্ত রাত্রিই নাট্যকলার রসাস্বাদন করিতে চায়। দুই দলের মনস্তুষ্টির জন্য অভিনয়ও দুই ভাগে ভাগ করা আছে, প্রথম ভাগের শেষ হয় রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে। রাত ন-টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত চলে পোয়ে নাচ, রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ প্রভৃতি লইয়া একটি ছোটখাট দৃশ্য এবং এক রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রণয়মিলন-সূচক নৃত্যগীত। এ-সব দৃশ্য অথবা পাত্রপাত্রী মূল নাটিকার আখ্যানভাগের সহিত অচ্ছেদ্য নহে, কোনরকমে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত দর্শকদের আনন্দ দেওয়া ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য ইহাদের নাই। তাহার পরে মধ্যরাত্রে প্রকৃত নায়ক-নায়িকা, অর্থাৎ আর এক রাজপুত্র ও রাজকন্যা, রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হন, এবং প্রণয়-কলহ, নৃত্যগীত, সবই চলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ভাঁড়ের দল আসিয়া লোক হাসাইয়া যায়। এমনি করিয়া আরও ঘণ্টা দুই চলে। যাহারা আর রাত জাগিতে রাজী নয়, তাহারা এই সময় প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে, এবং প্রকৃত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যেও নৃত্যগীত ও ভাঁড়ামি চলে, কিন্তু সে-সব নাটকের গল্পাংশের অঙ্গীভূত; প্রকৃত উচ্চাঙ্গের অভিনয়ও দেখা যায় এই সময়েই।

অনেক সময়েই এ-সব নাটকের আখ্যানভাগ অতি করুণ। রাজপুত্র ও রাজবধূর মিলনের আনন্দময় দিনের মধ্যে হঠাৎ বিচ্ছেদ আসিল, রাজবধূর মৃত্যু হইল। রাজপুত্র শোকে উন্মত্ত হইলেন। মৃত্যুর পরে বধূ হইলেন স্বর্গের দেবকন্যা। স্বামী পত্নীকে দেখিবার অনুমতি পাইলেন, স্তূপীকৃত মেঘের অবকাশ দিয়া। রাজপুত্রের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিতে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু হায়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এ-জীবনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, রাজপুত্রের হতশ্রী, তাঁহার কাতর প্রণয়বাণী, কিছুতেই রাজবধূর মনে রেখাপাত করিল না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কে আপনি?" প্রিয়তমার মুখে এ-ধরণের সম্ভাষণ শুনিয়া রাজপুত্র উন্মত্তপ্রায় হইলেন, এবং সেই সঙ্গেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

ব্রহ্মদেশের নাটক, বাচন এবং অভিনয়, সকলের মধ্যেই ব্রহ্মদেশীয় ভাব বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া কিছু কিছু বাহ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সত্তা হারায় নাই। হারায় নাই বলিয়াই ব্রহ্মদেশের নাটকে বৈদেশিকগণ এখনও অভিনবত্ব পাইয়া থাকে, এবং আধুনিক সভ্যতার বৈচিত্র্যবিহীন উপকরণ হইতে বর্মী রঙ্গমঞ্চে আসিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ খুঁজিয়া পায়, যাহাতে মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, বিচ্ছেদ-মিলন, প্রেম-ঘৃণা, সবই বর্ত্তমান আছে, শুধু এক অভিনব উপায়ে, যাহা সকল দেশের রঙ্গমঞ্চে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসীর গত শ্রাবণ সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের মিউনিসিপ্যাল বিল সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে উহার মলাট শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে। মলাটটি শিল্পী শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

—

দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত "মৌমাছির কথা" প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত ফটোগ্রাফগুলি শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক গৃহীত ও তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দেশ-বিদেশের কথা

যুদ্ধের ঘনঘটা ?

শ্রী গোপাল হালদার

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট, গ্রেট ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—পৃথিবীতে সমরানল জ্বলিয়া উঠে। পঁচিশ বৎসর পরে আজ এই আগষ্ট মাসে আবার কি তেমনি একটি দুর্য্যোগময় মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছে? সেদিন বেলজিয়মের বুকে জার্ম্মানীর আবির্ভাবে ব্রিটেন যেমন সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, আজ ডানজিগে হিটলারের পদার্পণ ঘটিলে গ্রেট ব্রিটেন কি তেমনি ভাবে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?—কেহই এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছে না। গ্রেট ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সত্যসত্যই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারে, যেন একথা অবিশ্বাস্য। অথচ, অবিশ্বাস করিবারই বা কারণ কি? প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহেই পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মান-আক্রমণ হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন; তখনই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, তাঁহার ফাশিস্ত-সন্তোষ-বিধানের নীতি এবার পরিবর্ত্তিত হইল, এবার তিনি সম্মিলিত শান্তি-শক্তি একত্র করিবেন, আক্রমণ-কারীদের আক্রমণ-প্রতিরোধের চেষ্টা করিবেন। তাহার পর এই সেইদিন জুলাই'র ৩০শে তিনি ও লর্ড হালিফ্যাক্স আবার পার্লামেণ্টে জানাইলেন, বলপূর্ব্বক ডানজিগ অধিকার তাঁহারা সহ্য করিবেন না। তাহা ছাড়া এই জার্ম্মান-বিভীষিকার বশেই তো তিনি টিয়েনশিনে ব্রিটেনের অপমান নীরবে সহিয়া চলিয়াছেন, চীনে জাপানের যুদ্ধ করিবার ও রাজ্য-গঠনের অধিকার মানিয়া লইয়াছেন, এমন কি, মস্কোতে ব্রিটিশ দূত বারবার সোভিয়েট মৈত্রীর খসড়া রচনা ও আলোচনা করিতেছেন, এবং এবার সেই বুঝাপড়া চেম্বারলেন এতটাও অগ্রসর হইতে দিলেন যে, আজ ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে বালটিক অঞ্চল রক্ষার ও সামরিক আলোচনা চলিবে—সোভিয়েটের সঙ্গে এতটা নৈকট্যও তিনি স্বীকার করিলেন। তথাপি কেন লোকে বিশ্বাস করে না—চেম্বারলেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে পারেন?

ডানজিগের দুয়ারে

অথচ সত্যসত্যই গ্রেট ব্রিটেন কি করিবে, তাহা হয়ত এবার স্বয়ং হের হিটলারও নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই ডানজিগের দুয়ারে হানা দিয়াও নাৎসী বাহিনী ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে না। স্লোভাকিয়ার মধ্য দিয়া পোল্যাণ্ডেব সীমান্তে দুই লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য যুদ্ধার্থে অপেক্ষা করিতেছে, ডানজিগ শহরের মধ্যে নাৎসী-যুদ্ধায়োজন সুসম্পূর্ণ। শহরের সেনেট সভা ১৯৩৬এর ১৮ই জুলাই তারিখেই নাৎসীরা করতলগত করিয়া ফেলে, সমস্ত শাসন-বিভাগই নাৎসী-অধিকৃত, জার্ম্মান 'তৃতীয় রাষ্ট্রে' পুনরন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য তাহারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে—কবে আসিবেন জার্ম্মান-জাতির ঐক্যবিধাতা, মুক্তি-দাতা, হের ফ্যুহ্বার, হের হিটলার? কিন্তু নেতৃবর এখনও মনে করিতেছেন, সে-দিন সমাগত হয় নাই,—এখনও সময় নয়। এদিকে, পোল্যাণ্ডও নিশ্চেষ্ট নাই,—তাহাব যুদ্ধবাহিনী সুসজ্জিত হইয়াছে, ডানজিগের চারিদিকে তাহার সমর বেষ্টনী দৃঢ়তর হইয়াছে, আত্মরক্ষার আয়োজনে সমস্ত শক্তি দিয়া পোল্যাণ্ডও নিয়োজিত। ডানজিগ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্কে দৃঢ়বদ্ধ—পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ বাধিতেছে এই সীমান্তের শুল্ক-কর্ম্মচারীদের উপলক্ষ করিয়া। ডানজিগের সেনেট-সভা পোলিশ শুল্ক-কর্ম্মচারীদের ৫ই আগষ্টের পরে কর্ম্মচ্যুতির নোটিশ দিল। পোলিশ সরকার কড়া উত্তর পাঠাইল—বাহিরের সঙ্গে ডানজিগের ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্র তাঁহারা ছেদ করিয়া ফেলিবেন। পোলিশ-কর্ম্মচারীদের আর কর্ম্মচ্যুত করা হইল না।

ওয়ার্-সর সংবাদে প্রকাশ যে, ক্যাকাও হইতে পিলসুদস্কির সৈন্যদলের প্রথম অভিযানের ২৫তম স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৬ই জুলাই ফিল্ড-মার্শাল স্মিগলি-রীজ বলেন, "পররাজ্য আক্রমণের কোন আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি না, তবে আমাদের রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা-বিঘ্ন দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব, আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব। মার্শাল স্মিগলি-রীজের বক্তৃতা শেষ হইলে সহস্র সহস্র নরনারী তুমুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে এবং বেতার-ঘাঁটিসমূহ হইতে পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এই বাণী প্রচারিত হয়। "ডানজিগ পোল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত অঞ্চল—এবং উহা পোল্যাণ্ডেরই থাকিবে" বলিয়া পিলসুদস্কি-বাহিনী উচ্চধ্বনি করিয়া উঠে।

ডানজিগের কর্ত্তৃত্বভার

কিন্তু কথাটার মধ্যে সময়োচিত দৃঢ়তার আভাস থাকিলেও, কথাটা যথার্থ নয়। "স্বাধীন নগরী ডানজিগ" মোটের উপর জার্ম্মানদের বাসভূমি। ডানজিগ ও তাহার উপকণ্ঠস্থ পল্লী-অঞ্চলে বাস করে প্রায় ৪ লক্ষ ৮ হাজার লোক, নিজ ডানজিগের বাসিন্দা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার। ইহার শতকরা ৯৬ জনই জার্ম্মান। বহু বার ডানজিগ হাত বদলাইয়াছে—তাহার অধিকার যাহারই হাতে যাউক, মধ্যযুগের টিউটনিক নাইট সম্প্রদায়ের শাসনকালে তাহার উপর যে জার্ম্মান ছাপ পড়িল তাহা পরবর্ত্তীকালের পোলিশ শাসনেও মুছিয়া গেল না। বরং ১৭৯৩তে পোল্যাণ্ডের পতনের পর, যখন ডানজিগ প্রুশিয়ার করতলগত হয়,—মধ্যে একবার মাত্র আট বৎসরের জন্য নেপোলিয়নের কালে সেই প্রুশ-শাসন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—না হইলে ১৯১৮ এর ভার্সেঈঁ সন্ধি পর্য্যন্ত এই একটানা প্রুশ কর্ত্তৃত্বই চলে,—সেই দীর্ঘ প্রুশীয় শাসনে ডানজিগ দেহমনে জার্ম্মানই হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৮ সালে জার্ম্মান-শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিবার চেষ্টায় পোল্যাণ্ড পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল, প্রয়োজন হইল তখন এই নূতন রাষ্ট্রের জন্য একটি বাণিজ্যঘাঁটি, একটি সমুদ্রপথের দ্বার। ডানজিগ বন্দর ছাড়া তাব তেমন দ্বার নাই। আবার সেই দ্বারে পৌঁছাইবার জন্য দরকার হইল 'ডানজিগ করিডর' বা 'ডানজিগের দ্বারপথের'। ডানজিগ অবশ্য জার্ম্মানদের শহব, কিন্তু দ্বারপথের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মাত্র জার্ম্মান, মোট ৬ লক্ষ অধিবাসীর ৪ লক্ষ পোল ও কাসুবে জাতীয়। অতএব, ভার্সেঈ সন্ধিতে দ্বারপথের অধিকার লইয়া গোল বাধিল না ; রাজ্য-ব্যবসায়ীরা চিন্তায় পড়িলেন ডানজিগ লইয়া—উহার জার্ম্মানদিগকে কি করিয়া পোল্যাণ্ডের হাতে তুলিয়া দিবেন? স্থির হইল ডানজিগ ও তাহার উপকণ্ঠস্থ পল্লী-অঞ্চল লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভিভাবকত্বে স্বতন্ত্র একটি 'স্বাধীন ডানজিগ নগরী' গঠিত হইবে, তাহার শাসন-কাঠামো হইবে গণতান্ত্রিক। এই ব্যবস্থায় ডানজিগ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্প্রীতি রাখিয়া চলিতেছিল, কিন্তু নাৎসী-অভ্যুদয়ের পরে ডানজিগের জার্ম্মানরা জাতিসঙ্ঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শহরের শাসনভার দখল করিল। আজ ডানজিগ পোল্যাণ্ডের অধিকারে নাই, সর্ব্বাংশেই নাৎসী-অধিকারে।

ডানজিগের গুরুত্ব

কিন্তু ক্রয়-বাণিজ্যে ডানজিগ ইতিমধ্যে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলিত, আজ বাণিজ্য তাহাব ছয় গুণ, রপ্তানির তুলনায় আমদানি হয় এক-পঞ্চমাংশ। পোল্যাণ্ডের মোট আমদানি-রপ্তানির শতকরা ত্রিশ ভাগই ডানজিগের ঘাঁটি দিয়া যায়। তাই, পোল্যাণ্ডের আর্থিক জীবনে ও ভৌগোলিক সংস্থিতিতে ডানজিগ যে কি স্থান জুড়িয়া আছে তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। তেমনি বুঝা সহজ, আজ পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে ডানজিগ কি স্থান দখল করিয়াছে। প্রথমত, বাল্‌টিক সমুদ্রে জার্ম্মান নৌ-বহর অন্য কোন জাতির নৌ-বহর হইতে খাটো নয়—ডানজিগে জার্ম্মান-রাষ্ট্রের অধিকার সংস্থাপিত হইলে বাল্‌টিক সমুদ্র জার্ম্মান-শাসনে আসিবে। তার পর, স্থলপথে ভিশ্চুলা নদীর মোহনায় ডানজিগ অবস্থিত, ডানজিগ পোল্যাণ্ডের হাতে না থাকিলে করিডোর বা 'দ্বারপথের' দ্বারে চাবি পড়িবে, আর পোল্যাণ্ডের পক্ষে বহির্দ্বার হইবে অর্গলবদ্ধ ; তখন বাধ্য হইয়াই পোল্যাণ্ড শরণ লইবে ডানজিগের মালিকের। তাই,

ডানজিগ যাহার হাতে, পোল্যাণ্ডের অধিকারী না হইলেও সে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে—কথাটা প্রুশীয় রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই যখন পোল্যাণ্ড বিখণ্ডিত হয় এবং ডানজিগ তিনি করতলগত করেন, তখন সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। তাহা জার্ম্মানরাও বিস্মৃত হয় নাই, পোল্যাণ্ডও বিস্মৃত হয় নাই।

পোল্যাণ্ডের প্রয়াস

যতদিন নাৎসী-উত্থান ঘটে নাই, ততদিন পোল্যাণ্ডের দুর্ভাবনা ছিল না—ডানজিগবাসী জার্ম্মানদের আত্মকর্তৃত্বদানে মোটের উপর পোলরা কার্পণ্যও করে নাই। তাহাদের চোখে তখন বিভীষিকা ছিল, পূর্ব্ব-সীমান্তের সাম্যবাদী রুশিয়া। সেই বিভীষিকার বিরুদ্ধে তখনকার দিনে যে ফরাসী-পোল মৈত্রীসূত্র গ্রথিত হয়, পূর্ব্ব-ইউরোপের বহু জাতিই ছিল তাহাতে আবদ্ধ। কিন্তু সেই ফরাসী-প্রতিপত্তির দিন শেষ হইয়া গেল নাৎসী-আবির্ভাবের (জানুয়ারী, ১৯৩৩) পরে। তখনও মার্শাল পিলসুদস্কি পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক। তিনি চেষ্টা করিলেন অঙ্কুরেই সেই নাৎসী-বীজকে বিনষ্ট করিতে; পারিলেন না লণ্ডন ও প্যারিসেরই বাধায়। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মসিয় বার্থুকে তিনি মনে করাইয়া দিলেন, "ফ্রান্স আপনার আসন ছাড়িয়া দিতেছে।" তার পর, বাস্তবের নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া পিলসুদস্কি ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী দশ বৎসরের মত জার্ম্মানীর সঙ্গে 'অনাক্রমণ-চুক্তি' স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পরে নাৎসী-অভিযান ইউরোপের উপর দিয়া বহিয়া চলিল—পোল্যাণ্ডও দেখিতেছিল, ডানজিগের উপরে ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে জোর করিয়া নাৎসী শাসন চাপিয়া বসিল; বুঝিতেছিল রাইনল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, মেমেলের মতই তাহারও দুর্ভাগ্যের সন্ধ্যা সমাসন্ন হইতেছে। সেই জন্তই পররাষ্ট্রসচিব কর্ণেল বেক্ বাল্‌টিক সমুদ্রের তীর হইতে ভূমধ্যসমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত বিভিন্ন শক্তির মৈত্রীবন্ধনের প্রয়াসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তাই বলিয়া রাষ্ট্রাভ্যন্তরে পোল্যাণ্ড এই বিশ বৎসরে যে বড় বেশী নিজেদের দক্ষতার বা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে তাহা বলা যায় না। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের অধিকাংশই দারিদ্র্যের চরমতম অবস্থায় নিপতিত; জন্মিতে-না-জন্মিতেই নূতন গণতন্ত্র প্রায় অচল হইয়া উঠে, তাহার কাঠামোটুকুই শুধু টিকিয়া আছে; শক্তি আসিয়া পড়িল মধ্যযুগীয় সামন্ত, ধনিক, সৈনিক নেতা ও রাষ্ট্রকর্ম্মচারীদের দলের হাতে। ইঁহাদেরই কেহ কেহ হন কর্ণধার। এখন তেমনি এক জন কর্ণধার অনেকাংশে মার্শাল রীজ-স্মিগলি—তিনি অনেকটা একনায়কত্বের পক্ষপাতী; দ্বিতীয় জন, মশ্‌চিকি—তিনি অনেকটা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী; আর তৃতীয় কর্ণেল বেক—যিনি বৈদেশিক দরবারে সতত উপস্থিত। কিন্তু দেশের সংগঠনে, কৃষির উন্নতিতে বা শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যমে-উদ্যোগে পোল্যাণ্ড এমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই যাহার জন্ত মন্দভাগ্য চেকোস্লোভাকিয়ার মত চিরস্মরণীয় হইয়া সে থাকিতে পারিবে। অবশ্য জার্ম্মানী ও

রুশিয়ার মত দুই প্রকাণ্ড শক্তির মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপথ অনেকাংশেই পররাষ্ট্রনীতির পথ হইতে বাধ্য—হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও পোল্যাণ্ডের নাম সুবিধাবাদের সঙ্গেই বিজড়িত। জন্মাবধিই এ বিষয়ে সে উদ্যোগী। যুদ্ধশেষে লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে সে ভিল্না শহরটি কাড়িয়া লয়; নিরুপায় লিথুয়ানিয়া আর কি করিবে? সীমান্ত বন্ধ করিয়াই নিজের বিরোধিতা জানাইতেছিল। হিট্‌লারী দুর্যোগের মধ্যে পোল্যাণ্ড এবার (মার্চ, ১৯৩৮) লিথুয়ানিয়াকে চরমপত্র দিয়া তাহার সেই সীমান্তদ্বার আবার খুলিতে বাধ্য করিল। এইরূপে চেকোস্লোভাকিয়ার পতনকালে স্লোভাকিয়ার খানিকটা অংশও পোল্যাণ্ড কবলিত করিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা ছিল তাহার সীমান্ত এদিকে রুমানিয়ার সীমান্ত ছুঁইবে। কিন্তু রুমানিয়ার সঙ্গে তাহার সংস্পৃষ্ট সীমান্ত স্থাপনের বাসনা হিটলারের নির্দ্দেশে আর সফল হইল না। বরং অন্য দিকে ডানজিগে তৎক্ষণে হিটলারী অভিযান সন্নিকট হইল। তখন পোল্যাণ্ড পূর্ব্বেকার সোভিয়েট শক্তির বন্ধুত্ব খুঁজিতে লাগিল—১৯৩৯ সালের নবেম্বরে সেই চুক্তি স্থিরও হইল। আর তার পরে পোল্যাণ্ড লাভ করিল এই মার্চ্চ মাসে চেম্বারলেনের ভরসা। ইহার ফলে জার্ম্মানী ১৯৩৪ সালের 'দশ বৎসরের অনাক্রমণ-চুক্তি' অস্বীকার করিয়াছে, হের ফন রিব্বেনট্রপ জানাইয়াছেন—জার্ম্মানী চায় ডানজিগকে তৃতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে; আর পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য সেই দিক দিয়া জার্ম্মানীর চাই একটি সদর রাস্তা।—ইহাই আপাতত পোল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মান দাবি। কিন্তু এই দাবির অর্থ ও গুরুত্ব পূর্ব্বেই সুবিদিত—পোল্যাণ্ডও তাই তাহা পূরণে অস্বীকৃত! যদি সে ব্রিটিশ-ফরাসী ভরসা পায়, যদি সোভিয়েট তাহাকে অভয় দেয়, তাহা হইলে জার্ম্মানীর পক্ষে আর বিনা যুদ্ধে ডানজিগ হরণ বা পোল্যাণ্ডকে দমন সম্ভব হইবে না। সত্যসত্যই কি চেম্বারলেন সেই ফাশিস্ত প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর?—এই কথাটিই এখন ইউরোপের ও এশিয়ার সকল শক্তি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

চেম্বারলেনের অসহায়তা

হয়ত চেম্বারলেন নিজেই জানেন না, তিনি শেষ পর্য্যন্ত কি করিবেন। সন্দেহ মাত্র নাই যে, ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় নাৎসীদের বন্ধু; বহু বার ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চেম্বারলেনও সাম্যবাদীদের প্রতি বিরূপ, এবং ফাশিস্তদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার নিজ শ্রেণীস্বার্থ আজ ইহাও বুঝিতেছে যে, পৃথিবী-জোড়া যে সাম্রাজ্যের ফাঁপানো মুনাফা তাঁহাদের সৌভাগ্যের কারণ, নাৎসী, ফাশিস্ত ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাহার সেই সাম্রাজ্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইতে বাধ্য। হইতেছেও তাহাই। অতএব চেম্বারলেনের পক্ষে কাম্য হওয়া উচিত সোভিয়েটের বন্ধুত্ব, তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন জাপানে রুশে একটা বিপুল সঙ্ঘর্ষ। কিন্তু এইরূপ সোভিয়েট-সংস্পর্শে ব্রিটেনের জনচিত্তে সাম্যবাদের স্পর্শ অবশ্যম্ভাবী—তাহাতে তাঁহার শ্রেণীস্বার্থ, সাম্রাজ্য, সবই বিপন্ন হইতে বাধ্য। কোন দিকেই আর বহুবিস্তৃত, বহুবর্দ্ধিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপদ পথ নাই—তাই চেম্বারলেন নিজের মত নিজেই স্থির জানেন না—ডানজিগে জার্ম্মানীকে বাধা দিতে হইলে, চীনে ব্রিটেনের অপমান ও জাপানের করালগ্রাস ঠেকাইতে হইলে, অবিলম্বে চাই মস্কৌতে ব্রিটিশ-ফরাসী-রুশ চুক্তি। কিন্তু সেদিকেও চেম্বারলেন সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক, বরং চতুরতার সহিত কালক্ষেপণেই নিরত। সাম্রাজ্য-বাদের মূলস্থ যে স্ববিরোধিতা আজ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারই মধ্যে পড়িয়া চেম্বারলেন এত দ্বিধাজড়িত এত অসহায়।

—

বিদেশে বাঙালী শিল্পীর সমাদর

কলিকাতা প্রাচ্যকলা সমিতির প্রাক্তন ছাত্র শিল্পী শ্রীপ্রভাত নিয়োগী গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া পাব্লিক স্কুলের শিল্প-শিক্ষক পদে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সিনক্লেয়ারের আমন্ত্রণে তথায় গিয়াছেন। সেখানে তিনি

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

আধুনিক ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন এবং তাঁহার নিজের ও তাঁহার ছাত্রদের অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করিবেন। আধুনিক বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের কিছু চিত্রের সংগ্রহও এই প্রদর্শনীতে থাকিবে।

ইউরোপে ভারতীয় বিদ্বানের সম্মান

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে গত এপ্রিল মাসে ইতালী গমন

করেন। ইতালীয় সরকারের প্রতিনিধি ব্যারণ রিচার্দি নেপ্‌লসে তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তথা হইতে আশি মাইল দূরে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া তথাকার ইতালীয় কৃষকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং ইতালীয় সরকার প্রত্যেক কৃষকের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থান করিয়া দিতেছেন ও চাষের যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে সরবরাহ করিতেছেন, তাহা জানান।

রোমে তিনি রোমের বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্যসভা ও সরকারের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় ২৪শে এপ্রিল এক বিশেষ সভায় ভারতীয় শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাহাকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন। উপাধি দান উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য "সামরিক সেলামে"র ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ তাঁহার সংবর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-পরিষৎ, প্রাচ্যসভা, পি. ই. এন. ক্লাব, সরকার প্রভৃতির আমন্ত্রণে তিনি মিলান, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্‌-স, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি বিশেষ সংবর্দ্ধনা লাভ করেন, এবং ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মসাধনা, শিল্পকলা, আয়ুর্ব্বেদ, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ "ক্ষণলেখা" হইতে কোন কোন কবিতা ও তাহার অনুবাদ তিনি নানা স্থানে পাঠ করেন, সেগুলি সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদর লাভ করে। অধ্যাপক তুচ্চি ইতালীয় ভাষায় "ক্ষণলেখা"র অনুবাদ করিয়াছেন, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পোলিশ অ্যাকাডেমিও ঐ গ্রন্থের পোলিশ অনুবাদ প্রকাশ করিবেন. স্থির করিয়াছেন।

রোমে ইতালীয় চিকিৎসকদের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলে, শীঘ্রই তথায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

প্যারিস হইতে ডক্টর দাসগুপ্ত কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা-গ্রন্থের (মাধব-কৃত "চিকিৎসা," গয়দাস-কৃত "সুশ্রুতটীকা", স্বামীকুমার-কৃত চরকটীকা ও ভোজনকুতূহল) ফোটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছেন। প্যারিসে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক "দুর্ঘটবৃত্তি" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদে নিযুক্ত আছেন, ও একজন চীনা ছাত্র "ধর্ম্মসমুচ্চয়" নামক একখানি বিশাল গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী আছেন; প্যারিসে অবস্থানকালে ডক্টর দাসগুপ্ত ইহাদের কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

ডক্টর দাসগুপ্ত সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

রেড ক্রশ সমিতির তত্ত্বাবধানে চীনের অনাথ বালকবালিকাগণ

যুদ্ধের ফলে অনাথ চীনা শিশুদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

চীনের জাতীয় রেড ক্রশ সমিতির বৈদেশিক বিভাগ হইতে প্রবাসী-সম্পাদক একটি আবেদন প্রচারার্থ পাইয়াছেন। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে বহু বালকবালিকা পিতৃমাতৃহীন ও গৃহহীন হইয়াছে। চীনের বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিঙে জাপান প্রথম যে তিন বার বোমাবর্ষণ করিয়াছে, শুধু তাহার ফলেই ১৫০০ বালকবালিকা অনাথ হইয়াছে। তাহাদের নিরাপদ অঞ্চলে লইয়া যাইবার জন্য ও আশ্রয় দিবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য চীন সকলদেশের হৃদয়বান নরনারীর নিকট অর্থসাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। টাকাকড়ি এই ঠিকানায় প্রেরণীয় Foreign Auxiliary to the National Red Cross Society of China, Bishop's House, Hong Kong.

কৃতী বাঙালী যুবক

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই বৎসর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি. এসসি. পরীক্ষায় অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বিষয়ে উত্তীর্ণ মোট ছয় জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি এবং এক জন ইংরেজ যুবকই অনার্স পাইয়াছেন।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতায় অবৈতনিক শিল্পশিক্ষালয়

কলিকাতা, ৫৭, হ্যারিসন রোড ভবনে অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্র নাগরমল বাজোরিয়া অবৈতনিক শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গত কয়েক বৎসরে বহু হিন্দু যুবক স্বাবলম্বী হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দর্জ্জির কাজ, সূচীশিল্প, বই বাঁধাই, গেঞ্জি প্রস্তুত প্রভৃতি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ওরিয়েণ্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানী

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানী ভারতের একটি প্রাচীন জীবনবীমা-প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি প্রকাশিত ইহার ৬৩তম বার্ষিক প্রতিবেদন পড়িলে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব্ববৎ সুপরিচালিত ছ। ইহার খরচের হার পূর্ব্ব হইতে কমানো হইয়াছে; ইহা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের সুব্যবস্থার নিদর্শন। এই বর্ষে যে-সকল জীবনবীমাকারী লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জনের কোন্ ব্যাধিতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একটি তালিকাও প্রতিবেদনে দেওয়া হইয়াছে।

ভাদ্রপূর্ণিমায় বৈদ্যনাথধাম

বৈদ্যনাথধাম হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ। পূর্ণিমার সময় এই স্থানে বহু পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় বৈদ্যনাথ যাইবার সপ্তাহান্তিক টিকেটের মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়া ই. আই. আর যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
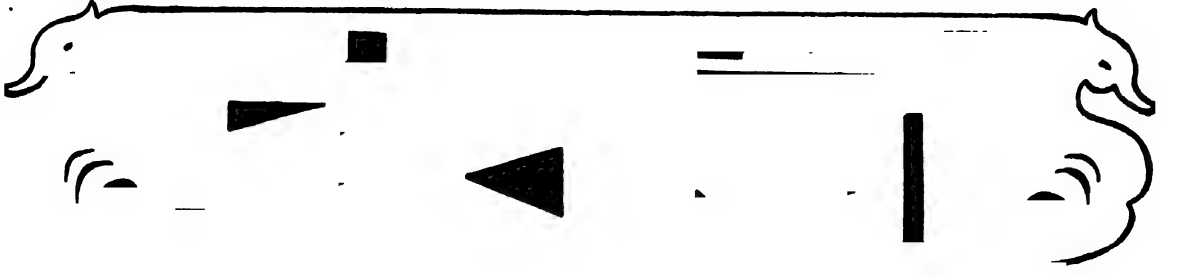
"শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাসা বদল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।
আকাশেতে পায়রাগুলো ওড়ে
ঘুরে ঘুরে চক্র বেঁধে।
চেয়ে দেখি দেয়ালে সেই লেখনখানি
গেল বছরের,
লালরঙা পেনসিলে লেখা,
—"এসেছিলুম; পাই নি দেখা; যাই তাহলে।
দোসরা ডিসেম্বর।"—
এ লেখাটি ধুলো ঝেড়ে রেখেছিলেম তাজা,
যাবার সময় মুছে দিয়ে যাব।

পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ
চায়ের ভোজে অলস ক্ষণের হিজিবিজি কাটা,
ভাঁজ ক'রে তাই নিলেম জামার নিচে।

প্যাক করতে গা লাগে না,
মেজের 'পরে বসে আছি পা ছড়িয়ে।
হাতপাখাটা ক্লান্ত হাতে
অন্যমনে দোলাই ধীরে ধীরে।
ডেস্কে ছিল মেডেন হেয়ার পাতায় বাঁধা
শুকনো গোলাপ,
কোলে নিয়ে ভাবছি বসে,
কী ভাবছি কে জানে।

অবিনাশের ফরিদপুরে বাড়ি ;
আনুকূল্য তার
বিশেষ কাজে লাগে
আমার এই দশাতেই।

কোথা থেকে আপনি এসে জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য ব'লেই মানে,
খাটে মুটের মতো।
জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে।
ময়লা মোজায় জড়িয়ে নিল এমোনিয়া।
ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে
হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুষ,
নখ চাঁচবার উখো,
সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।
ছেড়ে ফেলা সাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।

সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে সময়টা গেল
নেহাৎ সেটা বেশি।
বারে বারে ঘুরিয়ে আমার চটিজোড়া
কোঁচা দিয়ে যত্নে দিল মুছে,
ফুঁ দিয়ে সে উড়িয়ে দিল ধুলোটা কাল্পনিক
মুখের কাছে ধ'রে।
দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে।
একটা চিঠির খাম
হঠাৎ দেখি লুকিয়ে নিল
বুকের পকেটেতে।
দেখে যেমন হাসি পেল, পড়ল দীর্ঘশ্বাস।
কার্পেটটা গুটিয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে
জন্মদিনের পাওয়া
হোলো বছর সাতেক।
অবসাদের ভারে অলস মন,
চুল বাঁধতে গা লাগে নাই সারা সকাল বেলা,
আলগা আঁচল অন্যমনে বাঁধি নি ব্রোচ দিয়ে।
কুটি কুটি ছিঁড়তেছিলেম একে একে
পুরোনো সব চিঠি—
ছড়িয়ে রইল মেঝের 'পরে, ঝাঁট দেবে না কেউ
বোশেখ মাসের শুকনো হাওয়া ছাড়া।
ডাক আনল পাড়ার পিয়োন বুড়ো,
দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড ক'রে।
রাস্তা দিয়ে চলে গেল তপসি মাছের হাঁক,
চমকে উঠে হঠাৎ পড়ল মনে
নাই কোনো দরকার।
মোটর গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।

উজাড় হোলো ঘর,
দেয়ালগুলো অবুঝপারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।
সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে দিল অবিনাশ
ট্যাক্সি গাড়ি পরে।
এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ঐ ভক্তের মুখে,—
বললে, আমায় চিঠি লিখো।
রাগ হোলো তাই শুনে
কেন জানি বিনা কারণেই॥

মহাজাতি-সদন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্বযুগের অজগর-নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহা-মনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হোলো। আচার, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলা-দেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্প কালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবনসঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে, নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন ক'রে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণচক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হোলো। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন নবনবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হোতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না, যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নব-যুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায় নি, বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়। এ কথা কারো অগোচর নেই যে একদা রাষ্ট্রমুক্তিসাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশ,

এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারা-প্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধ-বন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে কখনোই এ রকম ঘটে নি। এ ঘটনাকেও ফলের দ্বারা বা শান্ত সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে। বাংলাদেশে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারা-নির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে, জানি সেই জন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে-মাটিতে এদের জন্ম, সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাংলাজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা, এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তরূপ গ্রহণ ক'রে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয়-মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হোতে থাক্‌ :—

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

সেই সঙ্গে এ কথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক্‌, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।

[গত ২রা ভাদ্র, ১৩৪৬, কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক "মহাজাতি-সদন"-এর ভিত্তিস্থাপন-উপলক্ষ্যে অভিভাষণ]
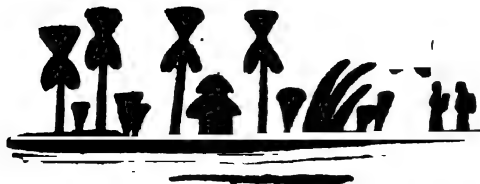
হলকর্ষণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবী এক দিন যখন সমুদ্র-স্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন, তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র, সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পযন্ত দণ্ডক, নৈমিষ, খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। আর্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন, এই সব অরণ্যে জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলেমূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ ক'রে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয়, অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। এক দল অন্য দলের প্রতি সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এই রকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সবচেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজো অবসান হয় নি। এই সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণভূমির অধিকার হোতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য, তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই ক'রে এসেছে। পৃথিবীতে যে সব জন্তু টিঁকে আছে তারা স্বজাতিহত্যার দ্বারা এ রকম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তারপর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার ক'রে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজো নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজো আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তারপর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এই জন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত ক'রে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেন না বহু লোক একত্র হোলে যা তাদের ধারণ ক'রে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন ক'রে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। এক দিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা বড়ো যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনায়। ধনসম্পদ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা ক'রে তারি সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান তখন গৌরব পেত। কিন্তু যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল বাহ্য ফল লাভ এই জন্যে এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্‌ ব'লে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ-রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই এক দিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাভূত ক'রে তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে উদ্ধার করতে বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় ক'রে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ ক'রে তাকে দিতে লাগল নগ্ন ক'রে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব ক'রে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছু দিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষ্যে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। এক দিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত, তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে; অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর এক তীর অধিকার ক'রে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহু শত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শত সংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংস-বন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা— সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়-নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেষণ করেছেন যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, যা এত বীভৎস রকমে উদ্বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জ ভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

[শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসবে ভাষণ। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।]

প্রদীপ

শ্রীকানাই সামন্ত

আমি সন্ধ্যাপ্রদীপশিখা
স্বষ্টির এই খর তরঙ্গে না জানি কে অনামিকা
সঁপিল কী কৌতুকে।
তখনো রাঙে নি এ চিরপ্রবাহ একটি রশ্মিস্মুখে ;
তখনো জাগে নি কেউ,
তখনো ভাঙে নি উচ্ছল গীতে একটি অধীর ঢেউ ;
সূর্য চন্দ্র তারা
সে অনামিকার স্বপ্নগহনে অমূর্ত নামহারা
শুধু ভাব-নীহারিকা!
অন্তর হ'তে বাহিরে এল রে তিমিরে দীপ্তিলিখা
প্রথম-উদিত আমার মুদিত শিখা।

হের সুচির এ শর্বরী
অম্বরে ভাসে তারার ভাসান ; মানব-ভুবন ভরি
একই লীলা অনুদিন—
কভু জ্বলোজ্বলো, কভু ছলোছলো, কভু বা
কুহেলিলীন,
কভু এ খদ্যোতিকা
এ কি ভুল, ভাবি শঙ্কাব্যাকুল, আমার অমৃতশিখা
অকূলে যদি এ নেবে!
কূল কই ওগো, কূল কই ওগো, কে আমারে
ব'লে দেবে,
উষসী মূর্তিমতী
কোন্ অলক্ষ্য ঘাটের সোপানে চিরপ্রতীক্ষাবতী ?—
কবে পৌছিবে এ আনন্দ-আরতি ?

আমি নিশীথপ্রদীপশিখা
কালান্তরীণ তিমিরের পটে ধেয়াই গো অনামিকা,
তোমারি মূর্তিখানি...
সে মধু-মূরতি জানি না যে হায়, ধেয়ে যায় শুধু
জানি
প্রদীপ অধীর স্রোতে ;
ধেয়ে যায় স্রোত প্রদীপ-আলোকে ঝলকিয়া কোথা
হ'তে
মুক্তা মাণিক হীরা—
বিষাদ-স্বখের অশ্রু ও হাসি : অশান্ত সে অধীরা
সঙ্গীতে ভঙ্গীতে
ডুবাল তোমার নাম ও মূরতি : হায়, এ বিরহী
চিতে
ভীরু আরাধনা জ্বলে ভীরু দীপ্তিতে।

হায় তব শ্রীচরণকূলে
কবে পৌছিব হে দেবী,—শ্রীকরে লবে এ প্রদীপ
তুলে ?
এ চিরতৃষিত আলো
অনিন্দ্য তব আননে ঝরিবে, অঙ্গে সাজিবে
ভালো।
বুঝিব কেন এ জ্বালা ?
বুঝিব কেন যে স্রোতে গেঁথে গেছে এই
মরীচিকামালা ?
কেন এ বিষাদ-স্বখ
বুঝিব কি, দেবী ? বুঝিব কি প্রাণে আলোগানে-
উৎসুক,
তুমি চিরঅকলুষা
শর্বরীশেষে শিরে পরিয়াছ শুকতারকার ভূষা—
সীমন্তদেশে আমায়, অনাদি উষা।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্য্য দ্রাবিড় হূণ মোঙ্গল—প্রত্যেক মৌলিক জাতির জীবনেই একটা সময় আসে যেটাকে তাহার নবীন যৌবন বলা চলে; যখন তপ্ত যৌবনের দুর্দ্দমনীয় অপরিণামদর্শিতায় তাহারা বহু অসম্ভব ও হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে—এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়ে।

যাহাদের আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনে এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধ হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত,—মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই।

আর্য্য বীরপুরুষগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া আদিম অনার্য্যদিগকে বিন্ধ্যাচলের পরপারে খেদাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তাহাদের রাক্ষস পিশাচ দস্যু প্রভৃতি নাম দিয়া কটূক্তি করিতেছিলেন। মনে হয়, সে-যুগেও শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাইবার প্রথা পুরাদস্তুর প্রচলিত ছিল।

তার পর একদা অগস্ত্য মুনি কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাক্ষস ও পিশাচগণ তাঁহাকে কাঁচা ভক্ষণ করিল কিনা পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। যাহোক, তদবধি অন্যান্য আর্য্য বীরগণও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দুই জন নবীন আর্য্য যোদ্ধা সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া-শুনিয়া খানিকটা উর্ব্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য্য বীরপুরুষ দুটির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।

আজকাল বন্ধুত্ব বস্তুটার তেমন তেজ নাই; ইয়ারকি দিবার জন্যই বন্ধুকে প্রয়োজন হয়। সেকালে দস্যু ও রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বন্ধুত্ব পুরামাত্রায় বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইত।

দুই বন্ধুর যৌথ বাহুবলে রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—রাজা হইবে কে?

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'মঘবা, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি হইব।'

মঘবা কহিলেন, 'উঁহু, তুই রাজা হ—আমি সেনাপতি।'

সমস্যার সমাধান হইল না; বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইতে কেহই ব্যগ্র নয়। এদিকে নবলব্ধ রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে ভাগাভাগি করিতে গেলে কিছুই থাকে না, চটকস্য মাংসং হইয়া যায়। প্রজা ভাগাভাগি করিলেও শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য—চারি দিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে। বন্ধুযুগল বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন।

এক দিন রাত্রিকালে আকাশে গোলাকৃতি চন্দ্র শোভা পাইতেছিল—অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ দুর্গের চূড়ায় দুই বন্ধু চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গটা অবশ্য বিতাড়িত অনার্য্য দস্যুদের নির্ম্মিত; আর্য্যেরা আদৌ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণের দুর্গ দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন।

মঘবা তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ির মধ্যে ঘনঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মুক্ত ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড ষণ্ডা চেহারা, নীল চক্ষু; মুদ্গরের

মত দৃঢ় ও নিরেট দেহ। চিন্তা করার অভ্যাস তাঁহার বিশেষ ছিল না, তাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলেই তিনি নিজের দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেন।

প্রদ্যুম্নের চেহারাখানা অপেক্ষাকৃত লঘু কিন্তু সমধিক নিরেট ও দৃঢ়। মাথায় সোনালি চুল, চোখের মণি গাঢ় নীল। দাড়ি নাই; গলা চুলকাইত বলিয়া তিনি তরবারির অগ্রভাগ দিয়া দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কেবল এক জোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ ছিল। এই গোঁফে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে প্রদ্যুম্ন প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঠেস দিয়া চাঁদের পানে ভ্রূকুটি করিতেছিলেন।

চাঁদ কিন্তু হাসিতেছিল। তাহার যে গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে, পঞ্জিকা না থাকায় সে তার পূর্ব্বাভাস পায় নাই।

সহসা মঘবা বলিলেন, 'একটা মৎলব মাথায় আসিয়াছে। প্রদ্যুম্ন, আয় পাঞ্জা লড়ি—যে হারিবে তাহাকেই রাজা হইতে হইবে।'

প্রদ্যুম্ন গোঁফের আড়ালে শ্লেষ হাস্য করিলেন, 'জুচ্চুরির মৎলব। গত যুদ্ধে আমার কব্জি মচকাইয়া গিয়াছে জানিস কি না!'

ব্যর্থ হইয়া মঘবা আবার দাড়ি টানিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে দোষ কি?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে কে কাহার হুকুম মানিবে? কে প্রজাদের হুকুম দিবে?'

'তা বটে।'

'তবে দু-জনে রাজা হওয়া যায়। পর পর।'

'সে কি রকম?'

'তুই কিছু দিন রাজা হইলি, আমি সেনাপতি। তার পর আমি রাজা হইলাম। এই আর কি।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। এক দিন তুই রাজা এক দিন আমি।'

'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি রাজা বদল করিলে গণ্ডগোল বাধিবে।'

'গণ্ডগোল কিসের?'

'মনে কর্, আমি রাজা হইয়া তোকে হুকুম দিলাম—সেনাপতি, শুনিয়াছি দক্ষিণে লম্বোদর নামক রাক্ষসদের রাজ্যে রসাল নামক এক প্রকার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তুমি দ্রুত গিয়া ঐ ফল আহরণ করিয়া আন—আমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।—তুই ফল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে দিন কাবার হইয়া গেল, তুই রাজা হইলি আমি সেনাপতি বনিয়া গেলাম। তখন কে ফল খাইবে?'

মঘবা বলিলেন, 'তাই ত। বড়ই ফ্যাসাদ দেখিতেছি।'

মনে রাখিতে হইবে, আর্য্যগণ তখনও স্থির হইয়া বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন নাই; দু-এক জন ঋষি হঠাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ এক-আধটা সূত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন এই পর্য্যন্ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এইরূপ ঋতুপরিবর্ত্তনের কথা মোটামুটি জানা থাকিলেও, সময়কে সপ্তাহ মাস বৎসরে বিভাজিত করিবার বুদ্ধি তখনও গজায় নাই।

সুতরাং প্রদ্যুম্ন ও মঘবা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

ওদিকে আকাশে চন্দ্রও ফাঁপরে পড়িয়াছিল। প্রদ্যুম্ন তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিবার জন্য চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে আরে, একি!'

মঘবাও দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন। দেখিলেন, আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

দুই বন্ধুর মনে সশঙ্ক উত্তেজনার উৎপত্তি হইল। ব্যাপারটা পূর্ব্বে কয়েক বার দেখা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, ভূকম্পের মত অপ্রত্যাশিত একটা মহাদুর্য্যোগ বলিয়াই বিবেচিত হইত। মঘবা দ্রুত আসিয়া প্রদ্যুম্নের হাত চাপিয়া ধরিলেন, গাঢ় স্বরে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ!'

প্রদ্যুম্ন পাংশুমুখে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু ভয় নাই। চাঁদ আবার মুক্ত হইবে।—ছেলেবেলায় বুড়া অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিদ্যা শিখিতে কয়েক বার গিয়াছিলাম, বুড়া এক দিন বলিয়াছিল আকাশে রাহু নামে একটা অদৃশ্য রাক্ষস আছে, সে মাঝে মাঝে চন্দ্র-

সূর্য্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

'হাঁ, আমিও চার-পাঁচ বার দেখিয়াছি।'

'আমিও। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া থাকে।'

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিপন্ন ম্রিয়মাণ চন্দ্র যেন একটা তাম্রবর্ণ অর্দ্ধস্বচ্ছ অজগরের পেটের ভিতর দিয়া পশ্চাদভিমুখে চলিয়াছে। দুর্গের নিম্নে ভয়ার্ত্ত জনগণ সমবেত হইয়া চীৎকার ও নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। দুষ্ট রাক্ষসগণ নাকি এইরূপ বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

দীর্ঘকাল পরে চাঁদের একটি চকচকে কোণ বাহির হইয়া পড়িল। তার পর দেখিতে দেখিতে চন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে সহাস্য মুখে রাক্ষসের কবল হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন।

সকলে উর্দ্ধস্বরে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঘবা প্রদ্যুম্নের হাত ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।'

'কিরূপ?'

'শুন। আজ হইতে তুমি রাজা হইলে। আবার যখন চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে তখন তোমার রাজত্বকাল শেষ হইবে, আমি রাজা হইব। এই ভাবে চলিতে থাকিবে।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়।—কিন্তু প্রথমেই আমি রাজা হইব কেন?'

'যেহেতু বুদ্ধিটা আমি বাহির করিয়াছি। এখন চলিলাম, কাল সকালে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব—সেনাপতির আর কাজ কি? মহারাজ ইতিমধ্যে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকুন। মহারাজের জয় হোক।'

মুচকি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গশিখর হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন। মঘবা অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িয়া নিজের দাড়ি টানিতে লাগিলেন।

মঘবার মাথায় বড় বেশী বুদ্ধি খেলে না, কিন্তু এখন সহসা তাঁহার মস্তিষ্করন্ধ্রে রাজবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সেনাপতি প্রদ্যুম্ন!'

প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়া জোড়করে দাঁড়াইলেন।

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

মহারাজ মঘবা মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতে আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরি, তুমি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এবার আমি রাজশয্যায় শয়ন করিতে চলিলাম।'

মুচ্‌কি হাসি হাসিতে মঘবা অভ্যস্ত নহেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি এক বার চোখ টিপিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বোকা বনিয়া গিয়া প্রদ্যুম্ন বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

২

নবযৌবনের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, সে জীবনটাকে গাম্ভীর্য্যের চশমার ভিতর দিয়া দেখে না; জগৎ তাহার কাছে খেলার মাঠ; যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক, প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা।

মহারাজ মঘবা মহানন্দে অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য্য জাতি আছে, উদ্দেশ্য তাহাদের উৎপীড়ন করা।

আধুনিক গণনায় যে-সময়টাকে তিন মাস বলা চলে, অনুমান তত দিন পরে মঘবা যুদ্ধযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিঙ্গল কেশ রুক্ষ, দেহে পশুচর্ম্মের আবরণ ছিন্নভিন্ন, মুখে পরিতৃপ্ত বাসনার হাসি।

আসিয়াই তিনি প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে বজ্রসম চপেটাঘাত করিলেন; বলিলেন, 'কি রে কেমন আছিস?'

দুই বন্ধু নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'রোগা হইয়া গিয়াছিস দেখিতেছি; রাক্ষসদের মুল্লুকে কিছু খাইতে পাস নাই বুঝি?' তার পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজের জয় হউক। আর্য্যের সমস্ত সংবাদ শুভ?'

মঘবা বলিলেন, 'মন্দ নয়। কোদণ্ড বেটাদের খুব ঠুকিয়াছি। শুধু তাই নয়, একটা মজার জিনিষ আনিয়াছি, দেখাইব চল।'

বিজিত জাতির নিকট হইতে অপহৃত বহু বিচিত্র বস্তু এক দল সৈনিকের রক্ষণায় ছিল, মঘবা তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া রাজভবন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পর, রাজ্য কেমন চলিতেছে? প্রজারা আনন্দে আছে?'

'প্রজাদের আনন্দ সম্প্রতি বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে।'

'কিরূপ?'

'আর্য্য যোদ্ধগণের প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা অনার্য্য মেয়ে ধরিয়া আনিয়া পটাপট বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই নাকি?— রোগ ছোঁয়াচে দেখিতেছি।'

প্রদ্যুম্ন মঘবার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিলেন। মঘবা বলিলেন, 'কিন্তু উপায় কি? এই দেশেই যখন বসবাস করিতে হইবে, তখন আর্য্য রক্ত নিষ্কলুষ রাখা অসম্ভব। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এত মেয়ে আমদানি করা চলে না, অথচ বংশরক্ষাও না করিলে নয়। এই যে রাজ্য জয় করিলাম —কাহাদের জন্য?'

প্রদ্যুম্ন শুধু বলিলেন, 'হুঁ।'

রাজা ও সেনাপতি মন্ত্রগৃহে গিয়া বসিলেন। সামন্ত সচিব শ্রেষ্ঠী বিদূষক কিছুই নাই, সুতরাং মন্ত্রণাগৃহ শূন্য। চারি জন সৈনিক একটা বৃহৎ বেত্র-নির্ম্মিত পেটারি ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। পেটারির মুখ ঢাকা, ভিতরে গুরুভার কোনও দ্রব্য আছে মনে হয়।

বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কি আছে ইহার মধ্যে? অজগর সাপ নাকি?'

মঘবা হস্তসঞ্চালনে সৈনিকদের বিদায় করিয়া, হাসিতে হাসিতে পেটারির ঢাকা খুলিয়া দিলেন।

সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।

প্রদ্যুম্ন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যাদিত মুখ হইতে বাহির হইল, 'আরে একি! এ যে একটি মেয়ে।'

মঘবা অট্টহাস্য করিলেন; তার পর বলিলেন, 'কেমন মেয়ে? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন নীরবে বন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন। মার্জ্জিত তাম্রফলকের ন্যায় দেহের বর্ণ; দলিতাঞ্জন দুটি চোখ, দলিতাঞ্জন চুল। বস্ত্র-অলঙ্কারের বাহুল্য নাই; গলায় একটি বীজের মালা, বাহুতে শঙ্খের অঙ্গদ; কবরী ও কর্ণে পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পট্টাংশু। কৃশাঙ্গী যুবতীর যৌবন-মেদুর দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন কৃশানুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মঘবা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হয়? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন চমকিয়া মঘবার দিকে ফিরিলেন, তার পর ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুই একটা আস্ত গোঁয়ার। যুদ্ধ করিতে গিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিলি। এখন ইহাকে লইয়া কি করিবি?'

ইহাকে দিয়া যে দাসীকিঙ্করীর কাজ চলিবে না তাহা এক বার দৃষ্টি করিয়াই আর সংশয় থাকে না।

মঘবা বলিলেন, 'ঠিক করিয়াছি বিবাহ করিব।'

প্রদ্যুম্ন সচকিতে বলিলেন, 'বিবাহ!'

'হাঁ। ও কে জানিস? কোদণ্ডরাজার মেয়ে।'

প্রদ্যুম্নের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মঘবা বলিতে লাগিলেন, 'কোদণ্ডদের রাজপুরী দখল করিয়া দেখিলাম সকলে পলাইয়াছে, কেবল মেয়েটা একা দাঁড়াইয়া আছে। ভারি ভাল লাগিল। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাই পেটারি বন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি। আর্য্য রাজার মহিষী হইবার যোগ্য মেয়ে বটে; কিন্তু উহাকে আগে আর্য্য-ভাষা শিখাইতে হইবে। তার পর আমার পট্টমহিষী করিব।'

প্রদ্যুম্ন আর এক বার যুবতীর পানে ফিরিয়া দেখিলেন। সে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কেবল তাহার চোখদুটি একের মুখ হইতে অন্যের মুখে যাতায়াত করিতেছে। তাহার মুখে ভয় বা আশঙ্কার

চিহ্ন কিছুই নাই ; আছে কেবল এই বর্ব্বরদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ গর্ব্বিত জিজ্ঞাসা।

ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রদ্যুম্ন মঘবার দিকে ফিরিলেন, 'অন্যায় করেছ মঘবা। হাজার হোক রাজার মেয়ে, তাহাকে এ ভাবে ধরিয়া আনা আর্য্য শিষ্টতা হয় নাই।'

মঘবা বলিলেন, 'বিবাহ করিবার জন্য কন্যা হরণ করিলে আর্য্য শিষ্টতা লঙ্ঘন হয় না।'

'হয়। অরক্ষিতা মেয়েকে ধরিয়া আনা তস্করের কাজ। এই দণ্ডে এই কন্যাকে ফেরত পাঠানো উচিত।'

তপ্তকণ্ঠে মঘবা বলিলেন, 'কখনই না—' তার পর আত্মসম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন, 'আমি মহারাজ মঘবা, তোমাকে আদেশ করিতেছি, সেনাপতি প্রদ্যুম্ন, তুমি এই কন্যার যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা কর—যাহাতে সুখে থাকে অথচ পলাইতে না পারে। —মনে থাকে যেন, কন্যা পলাইলে দায়িত্ব তোমার।'

প্রদ্যুম্ন এক বার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর যুক্তকরে মস্তক অবনত করিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

দুর্গচূড়ার কূটকক্ষে ভাবী রাজমহিষীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কোদণ্ডকন্যা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অকম্পিত পদে দুর্গ-শীর্ষের কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কার্য্যতঃ কারাগার হইলেও স্থানটি প্রশস্ত অলিন্দযুক্ত একটি মহল। সকল সুবিধাই আছে, শুধু পলাইবার অসুবিধা।

মঘবা সহর্ষে প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'রাণীর মত রাণী পাওয়া গিয়াছে—কি বলিস্?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'হুঁ।'

পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু গুরুতর সংবাদ আসিল। কোদণ্ডদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নিরতিশয় নিৰ্জ্জীব একটি ভগ্নদূত জানাইল যে, রাজকন্যাহরণের কথা জানিতে পারিয়া পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মঘবা যে অল্পসংখ্যক আর্য্যকটক থানা দিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শত্রুর অতর্কিত ক্ষিপ্রতায় তাহারা কচুকাটা হইয়াছে—কেবল ভগ্নদূত পদদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষিপ্রতা-বশতঃ প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। পরিস্থিতি অতিশয় ভয়াবহ।

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, অনুমতি দিন, শ্যালকদের ঢিট করিয়া আসি।'

মঘবা কিন্তু রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'তাহা হয় না। ঢিট করিতে হয় আমি করিব।'

সৈন্য সাজাইয়া আবার মঘবা বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'ইতিমধ্যে মেয়েটাকে তুই আর্য্যভাষা শেখাস্।'

মনের ক্ষুব্ধতা গোপন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আচ্ছা।'

* * *

দু-এক দিনের মধ্যেই প্রদ্যুম্ন বুঝিতে পারিলেন, অনার্য্য মেয়েটি অতিশয় মেধাবিনী। অষ্টাহমধ্যে সে ভাঙা ভাঙা কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

তাহার নাম এলা। অনার্য্য নাম বটে, কিন্তু শুনিতে ও বলিতে বড় মিষ্ট। প্রদ্যুম্ন কয়েক বার উচ্চারণ করিলেন, 'এলা। এলা! বাঃ। বেশ ত।'

কথা কহিতে শিখিয়াই এলা প্রথম প্রশ্ন করিল, 'ও লোকটা কে? যে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আমার বন্ধু।'

বন্ধু শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে এলার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে বুঝিতে পারিয়া সে নাক সিঁটকাইল, তীব্র অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা বর্ব্বর।'

প্রদ্যুম্ন অবাক্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য! আমরা বর্ব্বর!

ক্রমশঃ এলা আর্য্যভাষায় কথা কহিতে লাগিল—কোনও কথা বলিতে বা বুঝিতে তাহার বাধে না। এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন?'

প্রদ্যুম্ন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আর্য্যভাষা শিখাইবার জন্য।'

এলা বলিল, 'ছাই ভাষা। ইহা শিখিয়া কি হইবে?'

প্রদ্যুম্ন একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'প্রেমালাপ করিবার সুবিধা হইবে। মহারাজ মঘবা তোমাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।'

এলা বসিয়া ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে প্রদ্যুম্নের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর আবার বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত স্বরে বলিল, 'উহাকে আমি বিবাহ করিব না। বর্ব্বর!'

প্রদ্যুম্ন স্তোক দিবার জন্য বলিলেন, 'মঘবা দাড়ি রাখে বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়—'

এলা শুধু বলিল, 'বর্ব্বর।'

এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মঘবার দেখা নাই—তিনি কোদণ্ডদের টিট করিলেন অথবা কোদণ্ডেরা তাঁহাকে টিট করিল, কোনও সংবাদ নাই। প্রদ্যুম্ন উতলা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

এক দিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্ন এলার কুটগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এলা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেণী উন্মোচন করিতেছে। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে এক বার ঘাড় ফিরাইল, তার পর আবার বাহিরের দূর দৃশ্যের পানে তাকাইয়া বেণীর বিসর্পিল বয়ন মোচন করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন গলা ঝাড়া দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন তিনি বাতায়ন-সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, আকাশের দিকে তাকাইলেন, নিম্নে উঁকিঝুঁকি মারিলেন, তার পর পুনশ্চ গলাখাকারি দিয়া বলিলেন, 'শীত আর নাই; দিব্য গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এলা বলিল, 'হুঁ।'

উৎসাহ পাইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আজকাল দক্ষিণ হইতে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাকেই বুঝি তোমরা মলয় সমীরণ বলিয়া থাক? আর্য্যাবর্ত্তে এ হাওয়া নাই।'

এলা তাহার দিকে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'দু-দিন আসা হয় নাই কেন?'

প্রদ্যুম্ন থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম'—একটু থামিয়া 'তোমার তো আর আর্য্যভাষা শিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই আমাদের সকলের কান কাটিয়া লইতে পার।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না; এলা নতনেত্রে মুক্ত বেণী আবার বিনাইতে লাগিল। শেষে প্রদ্যুম্ন পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মঘবা আসিয়া পড়িলে বাঁচা যায়। অনেক দিন হইয়া গেল, এখনও তাহার কোনও খবর নাই।—দুর্ভাবনা হইতেছে।'

এলা তিলমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া নির্দ্দয়ভাবে হাসিল, বলিল, 'তোমার মঘবা আর ফিরিবে না, আমার স্বজাতিরা তাহাকে শেষ করিয়াছে।'

ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'মঘবাকে শেষ করিতে পারে এমন মানুষ দাক্ষিণাত্যে নাই। সে মহাবীর।'

তাচ্ছিল্যভরে এলা বলিল, 'বর্ব্বর।'

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'ঐ বর্ব্বরকেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া এলা বলিল, 'তাই নাকি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'তুমি তো বন্দিনী। তোমার আবার ইচ্ছা কি?'

প্রত্যেকটি শব্দ কাটিয়া কাটিয়া এলা উত্তর দিল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ করিতে পারে এমন পুরুষ তোমাদের আর্য্যাবর্ত্তে জন্মে নাই।—এই বীজের মালা দেখিতেছ?' এলা দুই অঙ্গুলে নিজ কণ্ঠের বীজমালা তুলিয়া দেখাইল—'একটি বীজ দাঁতে চিবাইতে যেটুকু দেরি—আর আমাকে পাইবে না।'

প্রদ্যুম্ন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ—বিষ দাও, শীঘ্র মালা আমায় দাও।'

এলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, 'এত দিন তোমাদের বন্দিনী হইয়া আছি, ভাবিয়াছ আমি অসহায়া? তোমাদের খেলার পুতুল? তাহা নহে। যখন ইচ্ছা আমি মুক্তি লইতে পারি।'

প্রদ্যুম্ন মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তবে লও নাই কেন?'

এলা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তার পর গর্ব্বিত স্বরে বলিল, 'সে আমার ইচ্ছা।'

এই সময় বাতায়নের বাহিরে দূর উপত্যকায় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ হইল। চমকিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে দৃষ্টি

প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের বনানীর ভিতর হইতে ধ্বজকেতনধারী আর্য্যসেনা ফিরিয়া আসিতেছে। ললাটের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল—মঘবা ফিরিয়াছে!'

প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। পিছন হইতে এলার শান্ত কণ্ঠস্বর আসিল, 'আমিও বাঁচিলাম, মুক্তির আর দেরি নাই।'

প্রদ্যুম্ন চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এলা তেমনি দাঁড়াইয়া বেণী বয়ন করিতেছে, তাহার মুখে সূচীবিদ্ধ মৃত প্রজাপতির মত একটুখানি হাসি।

প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'এলা, ছেলেমানুষি করিও না। মঘবাকে বুঝিতে সময় লাগে, বিবাহের পর বুঝিতে পারিবে তাহার মত মানুষ হয় না—মিনতি করিতেছি, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিও না।'

এলা বলিল, 'হঠাৎ কোনও কাজ করা আমার অভ্যাস নয়; আমি কোদণ্ড-কন্যা, বর্ব্বর নহি। যদি মঘবা বল-পূর্ব্বক আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, বিবাহের সভায় আমি মুক্তি লইব।'

মঘবা বলিলেন, 'কোদণ্ডদের ভাল রকম কাবু করিতে পারিলাম না। ক্ষেপিয়া গেলে ব্যাটারা ভীষণ লড়ে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি করিয়াছে।'

প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন, 'সন্ধির সর্ত্ত কিরূপ?'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন, 'চমৎকার। অদ্ভুত জাত এই কোদণ্ড, আশ্চর্য্য তাহাদের রীতিনীতি।—জানিস্ ওদের জাতে মেয়ে বাপের উত্তরাধিকারিণী হয়, ছেলে মামার সম্পত্তি পায়! শুনিয়াছিস কখনও?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'না। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত কিরূপ?'

সর্ত্ত এই—কোদণ্ডের রাজকন্যা অপহরণ করাতে তাহাদের মর্য্যাদায় বড় আঘাত লাগিয়াছে; এই কলঙ্ক-মোচনের একমাত্র উপায় কন্যাকে বিবাহ করা। বিবাহ না করিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, কিছুতেই শুনিবে না। আর যদি বিবাহ কর, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে কোদণ্ডদের রাজা হইব। গুরুতর সর্ত্ত নয়?' বলিয়া মঘবা গলা ছাড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রদ্যুম্ন কিয়ৎকাল হেঁটমুখে রহিলেন, তার পর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'গুরুতর বটে।'

মঘবা বলিলেন, 'সুতরাং আর বিলম্ব নয়, তাড়াতাড়ি কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলা দরকার।—মেয়েটা ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আর্য্যভাষা কেমন শিখিল?'

'বেশ।'

'তবে কালই বিবাহ করিব।'

কিছু কাল নীরব থাকিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কন্যার মতামত জানিবার প্রয়োজন নাই?'

'কিছুমাত্র না। এ রাজকীয় ব্যাপার, কথার নড়চড় চলিবে না। সন্ধির সর্ত্ত পালন করিতেই হইবে।'

* * *

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন চোরের মত এলার মহলে প্রবেশ করিলেন। আকাশে প্রায়-পূর্ণাবয়ব চন্দ্র গবাক্ষপথে কিরণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে; সেই জ্যোৎস্নার তলে মাটিতে পড়িয়া এলা ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রদীপ নাই।

নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে গেলেন, হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন; নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

এলা ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার চক্ষের কোণ বাহিয়া কিছু কিছু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নে এলা গদ্গদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—'প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!··আমি মরিতে চাহি না··তুমি কেমন মানুষ·· কিছু বুঝিতে পার না?···বর্ব্বর!··আমাকে উদ্ধার কর···প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!··'

যে-কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করা হইল না, বীজের মালা এলার কণ্ঠেই রহিল। প্রদ্যুম্ন চোরের মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মঘবা রাত্রির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন, এবার বিবাহের আয়োজন কর্।'

রাজভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধুনীর মত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবে। হোমাগ্নির পুরোভাগে বরবধূর কাষ্ঠাসন-পীঠিকা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাহের সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই প্রচারিত হইয়াছিল; উৎসুক জনমণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল।

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে অগ্নির পানে তাকাইয়া আছেন; একবার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মঘবা আসিয়া স্কন্ধে হাত রাখিতে তাঁহার চমক ভাঙিল, অগ্নি হইতে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। সম্মুখেই চন্দ্র, বৃক্ষশাখার অন্তরাল ছাড়াইয়া এইমাত্র উর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রদ্যুম্ন সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঘবা বলিলেন, 'রাত্রি হইয়াছে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তুই এবার গিয়া বধূকে লইয়া আয়।'

প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে মঘবার দিকে ফিরিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা!'

মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁহার প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তার পর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই চাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্ম্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে, করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা, আমি বধূকে আনিতে যাইতেছি; সন্ধির সর্ত্ত রক্ষার জন্য আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রজামণ্ডলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দাও।'

মঘবা কিয়ৎকাল স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তার পর তাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সহসা হাস্য থামাইয়া মঘবা করজোড়ে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

* * *

এলা বাতায়নের পাশে বসিয়া ছিল, প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমাকে লইতে আসিয়াছ?'

'হাঁ রাজকুমারী। কোদণ্ডের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে, তাহার সর্ত্ত এই যে, আর্য্যরাজা কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আমরা ধর্ম্মতঃ এই সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য।'

'আর কিছু বলিবার আছে?'

'সামান্য। ঘটনাক্রমে আমি এখন আর্য্যরাজা, মঘবা আমার সেনাপতি। সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে আমাকেই বিবাহ করিতে হইবে।'

এলা দীর্ঘকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'কি বলিলে?'

প্রদ্যুম্ন রাজকীয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। এখন চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেল, বিবাহ করিবে, না বীজ ভক্ষণ করিবে?'

স্বপ্নের অবরুদ্ধ আকুলতা এতক্ষণে বন্যার মত নামিয়া আসিল। দলিতাঞ্জন চক্ষু দুটি ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন বাতায়নের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'গ্রহণ ছাড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। ততক্ষণ তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম।'

বর্ষণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসি হাসিয়া এলা বলিল, 'বর্ব্বর।'

পোল্যাণ্ডের রণনায়ক স্মিগ্‌লি-রিজ ও তাঁহার পত্নী
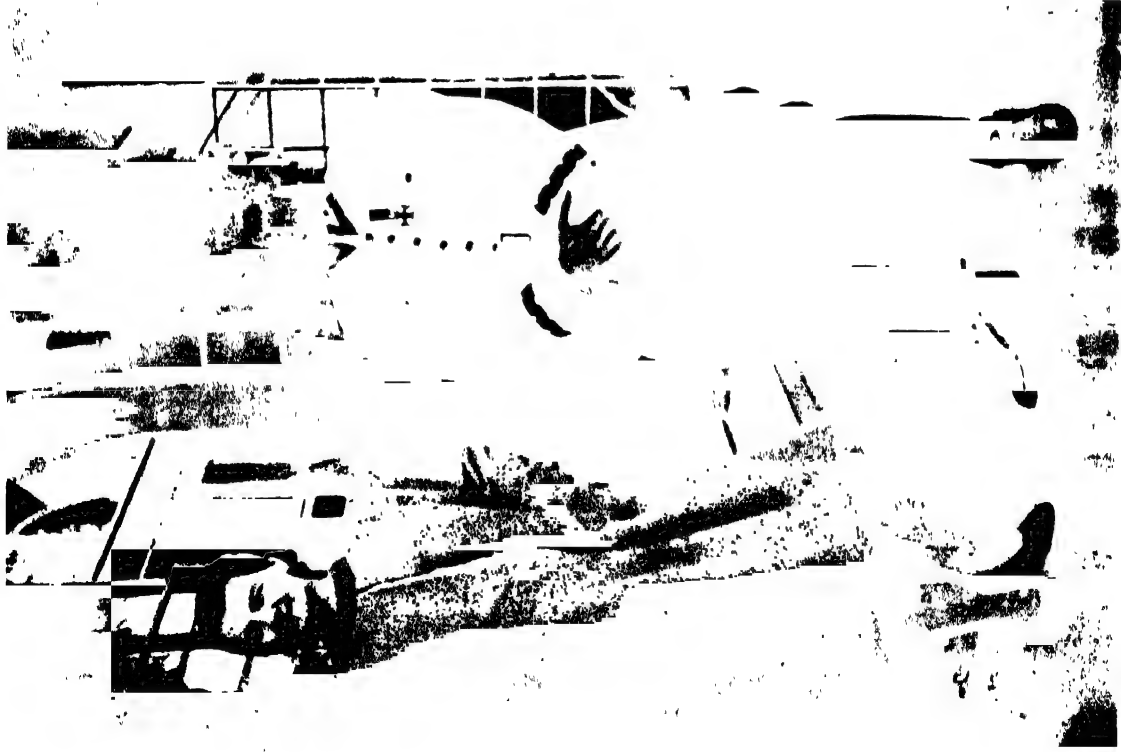
ফন রিব্বেনট্রপ ও মসিয় দালাদিয়ে

পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সমরসজ্জা

পোল্যাণ্ডের বোমা-বর্ষী বিমানপোত

ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সৈন্য

পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি মোসিকি ও কর্নেল বেক। রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার অবর্ত্তমানে মার্শ্যাল স্মিগ্‌লি-রিজ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।
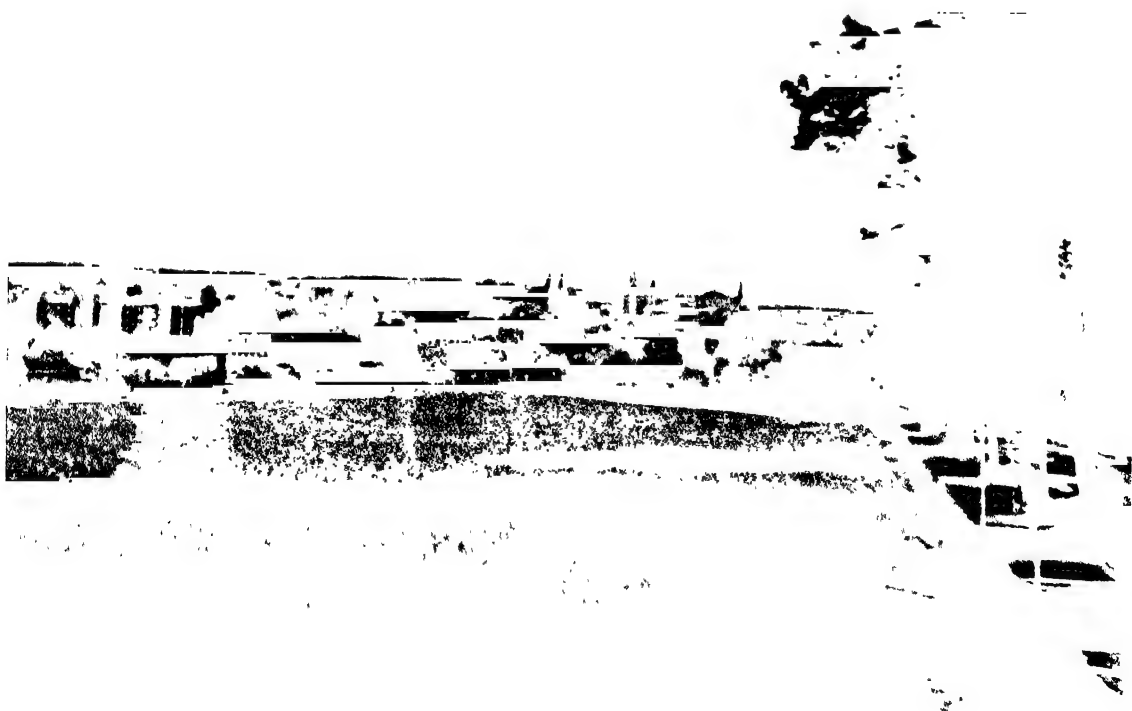
ডানজিগের নিকটবর্ত্তী পোলিশ শহর খোয়নিচ, Cl.ojnice

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ।
রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক নিবেদন জানাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

সুইট্জার্ল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার আয়োজন

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

ভোর বেলাতেই রংলাল পাল আসিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়াছিল। মানদার অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কাজ করার অভ্যাস চিরদিনের, সে কাজ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, কে গো তুমি? তুমি তো আচ্ছা নোক! এই ভোর বেলাতে কি ভদ্দরনোকে ওঠে নাকি? এ কি চাষার ঘর পেয়েছ না কি?

রংলাল বিরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরের মধ্যে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করিয়া সে বলিল, ডেকে দাও, ছোট দাদাবাবুকে ডেকে দাও। জরুরী কাজ আছে।

—কি কাজ কি?

—তুমি মেয়েছেলে নোক, তুমি সে বুঝবে না। জরুরি কাজ।

মানদার স্বর এবার রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, জরুরি কাজ আছে, তোমার আছে। আমার কি দায় পড়েছে যে এই ভোরবেলাতে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে বকুনি খাব। আর তুমি এমন করে চেঁচিয়ো না বলছি, ঘুম ভেঙে গেলে আমাকে বকুনি খেতে হবে।

রংলাল বুঝিল মানদা মিথ্যা কথা বলিতেছে, একটু মাতব্বরি করিবার চেষ্টা করিতেছে। অহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে, তিনি নিজেই তাহাকে ভোরবেলা ডাকিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছেন। মনে মনে একটু হাসিয়া সে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল—ছোটদাদাবাবু! ছোটদাদাবাবু! ছোটবাবু!

দোতলার উপর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রুক্ষ স্বরে কে উত্তর দিল—কে? কে তুমি?

সে কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্যে রুক্ষতায় রংলাল চমকিয়া উঠিল, বুঝিল কর্ত্তা রামেশ্বর অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছেন। ভয়ে সে শুকাইয়া গেল। তাহার সঙ্গে আরও কয়েক জন আসিয়াছিল—তাহারাও সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ীর ভিতরে উঠান হইতে উত্তর দিল মানদা, বলিল, আমি বার-বার বারণ করলাম দাদাবাবু, তা কিছুতেই শুনলে না। বলে, তুমি মেয়েছেলে নোক, বুঝবে না জরুরি কাজ।

এবার অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেশ বোঝা গেল, সে কণ্ঠস্বরে এখনও ঈষৎ অপ্রসন্নতার আভাস ছিল, অহীন্দ্র বলিল—ও। হ্যাঁ-হ্যাঁ। রংলাল বুঝি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই তো আসতে বলেছিলাম।

রংলাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, সে তখনও ভাবিতেছিল—সে কণ্ঠস্বর ছোটদাদাবাবুর? অহীন্দ্রের এই পরিবর্ত্তিত স্বাভাবিক কথার কোন উত্তর সে দিতে পারিল না।

অহীন্দ্র আবার বলিল—এই এই এলাম বলে রংলাল। একটু অপেক্ষা কর।

কিছুক্ষণ পরই হাসিমুখে সে ভিতর হইতে কাছারির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একা রংলাল নয়, তাহাদের পুরানো নগদী নবীন লোহার এবং আরও দুই-তিন জন রংলালের অন্তরঙ্গ চাষী অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নবীনের হাতে হাত-চারেক লম্বা খান-চারেক বাখারি রংলালের হাতে এক আটি বাবুই-দড়ি, অন্য এক জনের হাতে গোটা চারেক লাল কাপড়ের পতাকা। ওই চরটা আজ মাপ করিবার কথা। মাপিয়া সাঁওতালদের জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাদের বার্ষিক খাজনা ধার্য্য করিয়া বন্দোবস্ত পাকা হইবে। অহীন্দ্র নিজেই রংলালকে বলিয়াছিল, এবং খুব ভোরেই যাইবার কথাও হইয়াছিল। অহীন্দ্র দলটিকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—ওঃ তোমরা তো খুব ভোরে এসেছ

রংলাল! আমি আবার ভোরে উঠতে পারি নে। কিন্তু ও লাল পতাকা কি হবে রংলাল।

রংলাল একটু আহত হইয়াছিল, সে কোন উত্তর দিল না, উত্তর দিল নবীন লোহার, তাহাদের পুরানো নগ্দী—আজ্ঞে, আজ আমাদের কায়েমী দখল হবে কিনা, তাই চার কোণে পুঁতে দিতে হবে।

কল্পনাটা অহীন্দ্রের বড় ভাল লাগিল, সে বলিল—বাঃ সে বেশ হবে। চল এখন বেলা হয়ে যাচ্ছে।

রংলাল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—ঘুমটা আপনার এই সকালে ভাঙিয়ে দিলাম দাদাবাবু! ভারী ভুল হয়ে গেল মশাই, টুক্চে পরে ডাকলেই হ'ত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—না না, সে ভালই হয়েছে রংলাল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেই আমার মেজাজ আবার ভারী খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের কিছু বলি নি তো রংলাল?

রংলাল এইটুকুতেই যেন জল হইয়া গেল, বলিল—আজ্ঞে না। সে আমরা কিছু মনে করি নি। এখন চলুন, রোদ উঠলে তখন আবার ভারী কষ্ট হবে আপনার।

ক্ষুদ্র বাহিনীটি বাহির হইয়া পড়িল। রংলাল কিন্তু উসখুস করিতেছিল, তাহার কয়েকটা কথা এখনও বলা হয় নাই। প্রথমেই সেই কথাটা বলিবার সংকল্প তাহার ছিল, কিন্তু অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং রুক্ষতার আঘাতে সমস্তই কেমন উল্টাইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটার ভূমিকারূপেই সে হাসিয়া বলিল—বুঝলে লবীন, এই যে কথায় বলে, বাঘের প্যাটে বাঘ হয়, সিংগীর প্যাটে সিংগী হয়—এ কিন্তু মিথ্যে লয়।

নবীন অর্থও বুঝিল না, উদ্দেশ্যও বুঝিল না কিন্তু গম্ভীর ভাবে কথাটাকে সমর্থন করিয়া বলিল—নিচ্ছয়। অহীন্দ্র কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল বলিল—হাসবেন না দাদাবাবু। হাসির কথা লয়! আমার পিলুই বলে চমকে উঠেছিল। বুঝলে লবীন, দাদাবাবু হাঁকলেন—কে—কে তুমি? বললে না পেত্যয় যাবে ভাই—আমার ঠিক মনে হ'ল কর্ত্তাবাবু উঠে পড়েছেন। একেবারে অবিকল!

নবীন বলিল—এটি তুমি ঠিক বলেছ মোড়ল, অবিকল। আমি ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

রংলাল উৎসাহিত হইয়া বলিল—তাই তো বলছি হে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। আমি এক-এক সময় ভাবতাম, আঃ দাদাবাবু কি ক'রে আমাদের জমিদার সেজে বসবে! তা সে ভাবনা আজ আমার গেল।

অহীন্দ্র গম্ভীর ভাবে মাথাটি অল্প নীচু করিয়া নীরবে চলিতেছিল, মনে মনে লজ্জা অনুভব না করিয়া সে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, দেশ-বিদেশের কত মহাপুরুষের কথা। তাঁহাদের আদর্শের তুলনায় জমিদার! ছিঃ!

রংলাল আবার বলিল—সাঁওতালদের জমি আমি দেখেছি, মোটমাট তা তোমার বিঘে পঞ্চাশেক, তার বেশী হবে না। আর ধর আমাদের পাঁচ জনের দশ বিঘে ক'রে পঞ্চাশ বিঘে এক-শ বিঘে মাপতে আর কতক্ষণ লাগবে? পহরখানেক বেলা না হতেই হয়ে যাবে। এ্যাঁ ও লবীন!

নবীন বলিল—তা বইকি। আমি তোমার চারখানা দাঁড়া নিয়ে এসেছি। চার জনাতে মাপলে কতক্ষণ!

রংলাল বলিল—বুঝলেন দাদাবাবু, আমরা পাঁচ জনার জমি নেবার খবর এক বার ছড়ালে হয়, দেখবেন গাঁয়ের যত চাষী সব একেবারে হুত্যো দিয়ে পড়বে।

অহীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—তোমরাও জমি নেবে নাকি? কই সে কথা তো বল নি!

রংলাল বলিল—এই দেখেন ইয়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছেন দাদাবাবু? সেই দেখেন, পেথম দিনেই কাছারিতে আপনার সঙ্গে দেখা, আপুনি নিয়ে গেলেন বাড়ীতে গিন্নীমায়ের কাছে। আমাদের চাষীরা সব রব তুলেছিল জমি আমাদের জমি আমাদের। আমিই তো আজ্ঞে বলে দিলাম, চক আফজলপুরের সঙ্গে লাগাড় হয়ে যখন চর উঠেছে, তখন আজ্ঞে ও চর আপনকাদের, ই আইন আমার বেশ ভাল করে জানা আছে! তবে হ্যাঁ ধম্ম যদি ধরেন—ধরে না তো কেউ আজকাল—তাহলে অবিশ্যি আমরাই পাই। গিন্নীমাও কথা দিয়েছিলেন, মনে ক'রে দেখেন।

অহীন্দ্র অনেক কিছু ভাবিতেছিল। ইহারা যাহা

বলিতেছে তাহা সত্য, সে-সত্য সে অস্বীকার করিতেও চাহে নাই। সে বলিতে চাহিতেছিল আজই যে সেই কথা অনুযায়ী বিলিবন্দোবস্ত করা হইবে এ কথা তো হয় নাই। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে যে। সেলামী, খাজনা, পাট্টা-কবুলতি অনেক কথা। সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র। আজ তাহারা বসিয়াছে, দশ বৎসর, পনর বৎসর বা বিশ বৎসর পরে হয়তো তাহারা চলিয়া চাইবে। তখন তাহাদের জমি জমিদারের খাসে আসিবে। আর ইহাদের স্বত্ব কায়েমী স্বত্ব, বংশানুক্রমে দান-বিক্রয় সকল রকমের অধিকার ইহারা কায়েম করিয়া লইবে।

রংলাল বলিল—জুতো খুলতে হবে না দাদাবাবু, আসুন কাঁধে ক'রে আমি পার করে দিই।

কালিন্দীর ঘাটে সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অহীন্দ্র রংলালকে নিরস্ত করিয়া বলিল—থাক। বলিয়া জুতা জোড়াটি খুলিয়া নিজেই তুলিয়া লইতেছিল।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রংলাল খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া একরূপ মাথার উপর ধরিয়া বলিল—বাবা রে, আমরা থাকতে আপুনি জুতো বয়ে নিয়ে যাবেন। সব্বনাশ!

নদীর ওপারে চরের প্রবেশ-পথে সাঁওতালেরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাগ্রহে তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে। কিশোরবয়স্ক ছেলেগুলি পর্য্যন্ত আজ গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া লইয়া চরাইতে যায় নাই।

রংলাল বলিল—ওঃই যে—ছা-ছামুড়ি পর্য্যন্ত হাজির রে সব। আজ তোদের ভারি ধুম না কি রে মাঝি?

কমল মাঝি গম্ভীর ভাবে বলিল—তা বেটে বইকি গো। জমিগুলা আজ সব আমাদের হবে। রাজাকে সব খাজনা দিবো। বোঙ্গাকে পূজা দিবো!

নবীন রংলালের দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ, আমরা বলি সব বুনো বোঙার জাত! তা দেখ, বুদ্ধি দেখ। লক্ষণ-কল্যেনগুলি তো সব বোঝে ওরা!

মোড়ল-মাঝি আবার বলিল—হুঁ, বুদ্ধি আছে বইকি গো! নইলে ধরমটি আমাদের থাকবে কেনে? পাপ হবে যি!

নদীর জলে মুখ হাত ধুইবার জন্য অহীন্দ্র একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইতেই আলোচনাটা বন্ধ হইয়া গেল। অহীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা হ'লে তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ কর, নইলে রোদ্দুর হবে।

মোড়ল-মাঝি আপন ভাষায় কি বলিল। মিনিট-দুয়েকের মধ্যেই একটা ছেলে প্রকাণ্ড একটা ছাতা আনিয়া হাজির করিল। বাঁশের বাখারি ও শলা দিয়া তৈয়ারী কাঠামোর উপরে নিপুণ করিয়া গাঁথা শালপাতার ছাউনি, ছাউনির উপরে কোন গাছের বল্কলের সুতায় আল্পনার মত কারুকার্য্য—অহীন্দ্র ছাতাটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিল—বাঃ, ভারী সুন্দর ছাতা তো মাঝি! তোমরা তৈরি করেছ?

—হুঁ গো। আমরা সব কত পারি গো বাবু! অনে—ক পারি। ই ছাতাটি তুর করলে যেঁয়ে আমার মাঝিন। আমি খুব বড়ো মানুষ কি না, তাথেই ইটিও করলে এতো বড়ো।

* * *

প্রথমেই নবীন চরের চারিটা কোণ বাছিয়া চার কোণে লাল পতাকা চারিটা পুঁতিয়া দিয়া আসিল। তার পরই আরম্ভ হইল জরিপ। দেশীয় মতে চার হাত লম্বা বাঁশের দাঁড়া দিয়া মাপ আরম্ভ হইল।

রংলাল বলিল—মাঝি তুই নাম বলে যা; দাদাবাবু আপুনি লিখে লিখে যান। শেষকালে যার যত হবে হিসেব ক'রে জমি জমা ঠিক করা যাবে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সি কেনে গো, ইয়ার নাম উয়ার নাম—সি তুরা লিখে কি করবি? একবারে লিখে লে কেনে।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—তা হ'লে কাকে কত খাজনা লাগবে, কার কত জমি সে-সব কেমন ক'রে ঠিক হবে মাঝি?

কমল বলিল—সি আবার সব আমরা ঠিক ক'রে লিবো গো। আপন আপন মেপে ঠিক ক'রে লিবো। তুদের হিসেব আমরা যি বুঝতে লারব।

রংলাল নবীন ও তাহাদের সঙ্গীরা কিন্তু উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কাজ তাহাদের অনেক সহজ হইয়া যাইবে, টুকরা টুকরা জমি মাপিবার প্রয়োজন হইবে না, একেবারে

সাঁওতালদের অধিকৃত জায়গাটা মাপিয়া লইলেই খালাস। সে মাপ শেষ হইলেই তখন তাহারা আপন আপন জমি মাপিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। এটুকুর জন্য অকারণে তাহাদের মনে যেন উদ্বেগ জমিয়া উঠিয়াছে। রংলাল বলিল—সেই ভাল দাদাবাবু, ওরা আপনার ওদের ভাগ আপনারা ক'রে লেবে। আপনার ইষ্টেটে থাকুক এক নামে একটা মোটা জমা হয়ে। সে আপনার ভাল হবে।

কাঠের পুতুল নাচের ওস্তাদ আসিয়া মোড়ল-মাঝিকে কি বলিতেছিল। তাহার বক্তব্য শেষ হইতে না-হইতেই কমল যেন ফুলিয়া আয়তনে বড় হইয়া উঠিল—বার্দ্ধক্য-জনিত দেহচর্ম্মে যে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিয়াছিল দেহস্ফীতির আকর্ষণে সে কুঞ্চন কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ওস্তাদের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কমল তাহার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, মুখে বলিল সামান্য দুইটি কথা—কিন্তু সে কথা দুইটার মধ্যেও দুর্দ্দান্ত ক্রোধের সুর রণ রণ করিতেছিল। লোকটা চড় খাইয়া বসিয়া পড়িল, সমবেত সাঁওতালদের দলের মুখ দেখিয়া মনে হইল ভয়ে তাহারা সঙ্কুচিত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি তখন ক্রোধে ফুলিতেছিল। আকস্মিক এমন পরিণতিতে স্তম্ভিত হইয়া অহীন্দ্র নীরবেই কারণ অনুসন্ধানের জন্য চারি দিক একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কমল মাঝির ভয়ঙ্কর রূপ আর চারি দিকে সকলের মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ ভিন্ন কিছু দেখিতে পাইল না, রংলাল নবীন ও তাহাদের সঙ্গের লোকগুলি পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াছে। অহীন্দ্র কমল মাঝির দিকেই চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি কমল, হ'ল কি? ওকে মারলে কেন?

এই মূর্ত্তিতেও কমল যথাসাধ্য বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে রাজাবাবু, মানুষটা দুষ্টু করছে। বলছে, আমি মোড়ল-টোড়ল মানি না।

সবিস্ময়ে অহীন্দ্র বলিল, কেন?

এবার প্রহৃত ওস্তাদ হাত যোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে সভয়ে বলিল—আজ্ঞে রাজাবাবু, দোষ হইছে, দোষটি আমার হইছে। আমি বললাম—জমি সব আলা-দা আলা-দা করে দিতে। আমরা সব চ্যাক-লিব্ব্যাধি আলা-দা আলা-দা করে লিব। তাথেই আমি মোড়লের মানটি খারাপ করলাম। দোষটি আমার হ'ল।

কমল আপন ভাষায় গজ্‌গজ্‌ করিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, সুরে বোঝা গেল সে ঐ ওস্তাদকে তিরস্কার করিতেছে। কিন্তু তবুও সে দুর্দ্দান্ত কমল আর নাই। কমলের কথা শেষ হইতেই চারি পাশের মেয়ের দল কল কল করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল, সেও ঐ লোকটিকে তিরস্কার করিয়া, মোড়লকে সমর্থন করিয়া।

অহীন্দ্র বলিল—তা হ'লে তোমাদের সমস্ত জমি এক সঙ্গে জরিপ হবে তো?

—হুঁ, আমার নামে লিখে লে কাগজে, টিপ-ছাপ লিয়ে লে আগে। বলে দে খাজনা কত হবে—আমরা সব মিটায়ে দিব। তবে ঐ যে আপনারা কি বুলিস গো, সালামী না কি, উ আমরা লারব দিতে। আমি সব ইয়াদের কাছে আদায় ক'রে খাজনা আপনার কাছারিতে দিয়ে আসব।

নবীন এতক্ষণে সাহস পাইয়া হাসিয়া বলিল—তু তা হ'লে এদের জমিদার হলি, আবার তোর জমিদার হ'ল আমাদের দাদাবাবু—না কি?

—উঁ—হু। আমি মোড়ল হলাম, রাজা বেটে, জমিদার বেটে আমাদের রাঙাবাবু।

মাপ আরম্ভ হইল—রাম দুই তিন চার···আড়ে হ'ল গা—এক-শ চল্লিশ দাঁড়া।

নবীন ও রংলাল দুই জনে মিলিয়া জমিটার কালি করিয়া পরিমাণ খাড়া করিল, চল্লিশ বিঘা কয়েক কাঠা হইল। অহীন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়া হিসাবের পদ্ধতিটা দেখিয়া গেল। ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়া বিঘাকালির আর্য্যার সুরটা যেন অস্পষ্ট ভাবে কানে বাজিয়া উঠিল। 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে।'

রংলাল বলিল—তা হ'লে তোদের এখন এই জমি হ'ল মাঝি, চল্লিশ বিঘে, ক-কাঠা না হয় ছেড়েই দিলাম। লে এখন, দাদাবাবুর সঙ্গে খাজনা ঠিক ক'রে লে।

কমল অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—হাঁ রাঙাবাবু, তু এক বার হিসাব জুড়ে দেখ।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—ঠিক আছে মাঝি।

—না, তু এক বার দেখ।

—দেখেছি।

—না—তু এক বার লিখে দেখ।

অগত্যা অহীন্দ্রকে কাগজ-কলম লইয়া বসিতে হইল। তাহার চারি পাশে সাঁওতালরা গম্ভীর হইয়া বসিল, সকলেরই উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি অহীন্দ্রের উপর। ছেলেমেয়েরা কথা বলিতেছিল—মোড়ল-মাঝি গম্ভীর ভাবে আপন ভাষায় আদেশ করিল—চুপ চুপ সব চুপ। রাঙাবাবু হিসাব করিতেছেন, মাটির হিসাব—জরিপের হিসাব।

পাড়ার মধ্যে কয়টি তরুণী আঙিনায় বসিয়া মৃদুস্বরে গুন গুন করিয়া গান করিতেছিল—

চেতান দিশমবেণ্ অ্যামিন ব্যাবু,
লাতার দিশমবে আডগুএনা,
জমি-কিন্ সংইদা—
জমা কিন্ চ্যাপাওইদা
গরীব ৬৬ ও কাবে এ্যাম্—আঃ।

অর্থাৎ পাহাড়ের উপর হইতে আমিন বাবু আসিয়াছেন, জমি মাপ করিতেছেন, জমা বাড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা গরীব লোক—আমরা কোথায় পাইব!

একটি মেয়ে বলিল—ই গান বলতে হবে রাঙাবাবুকে।

কমলের নাতনী বলিল—হুঁ, বলব। উয়াকে বলব। বেশী ক'রে খাজনা লিবে কেনে রাঙাবাবু? যাব আমরা উয়ার কাছে।

—এখুনি?

—উঁ-হু। মোড়ল-মাঝি ক্ষেপে যাবে। বাবা রে!

—তবে?

—বিকালে আমরা ডাকব বাবুকে। হাঁড়িয়া জম করব, নাচব, উয়াকে আনব ডেকে।

নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই একটি মেয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—কেমন বরণ বল দেখি রাঙাবাবুর? রাঙা—লাল—ঝক ঝক্ করছে!

কমলের নাতনী বলিল—আগুনে-র পারা! রাঙা ঠাকুরের লাতি, উ ঠাকুর বটে।

একটি মেয়ে কি একটা উত্তর দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আবার মোড়ল-মাঝির ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক জনের উচ্চ কণ্ঠস্বর।

এবার বচসা হইতেছিল কমল মাঝির সহিত রংলাল এবং নবীনের দলের। সাঁওতালদের জমির পরই পূর্ব্ব দিকে প্রায় বিঘা পঞ্চাশেক জমি পতিত পড়িয়া আছে, সেই জমিটা পছন্দ করিয়া গোষ্ঠ এবং নবীন মাপিতে উদ্যত হইয়াছে। কমল মাঝি বলিল—উ জমি তুরা লিবি না মোড়ল, উ আমরা দিব না।

রংলাল বিরক্তির সহিত বলিল—দিবি না? কেন?

—আমরা তবে আর জমি কুথাকে পাব? আমাদের ছেলেগুলা কি করবে?

—তাদের আবার ছেলে হবে, তাদের ছেলে হবে, তাই ব'লে গোটা চরটাই তোরা আগলে থাকবি না কি? মাপ হে মাপ নবীন, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

নবীন মাপিতে উদ্যত হইবামাত্র কমল তাহার হাতের দাঁড়া চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ উচ্চ চীৎকারে বলিয়া উঠিল—না —দিব না।

রংলালও এবার যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এই পূর্ব্বদিকের চরের মাটি সকল দিকের মাটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—ভাঙিলে ভুরার মত গুঁড়া হইয়া যায়, ভিতরের বালির ভাগ ময়দার মত মিহি, আলু ও আখের উপযোগী এমন মাটি আর বুঝি হয় না। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—এই দেখ মাঝি ফাটাফাটি হয়ে যাবে বলছি! খবরদার, তুই দাঁড়া ধরিস না বললাম!

একটা ভয়াল হিংস্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল—তুকে ধ'রে আমি মাটিতে পুঁতে দিব।

বার-বার এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনার উদ্ভব হওয়ার জন্য অহীন্দ্রের মনে আর বিরক্তির সীমা রহিল না। সে এবার কিশোর কণ্ঠের তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ছাড়—ছাড় বলছি, ছাড়!

কমল এবং রংলাল দু-জনেই এবার সরিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র বলিল—অন্য দিকে জমি পছন্দ ক'রে মেপে নাও নবীন, এ জমি তোমরাও পাবে না, সাঁওতালরাও পাবে না! এদিকটা আমাদের খাসে থাকবে। খাসে চাষ হবে আমার।

জমির মাপ-জোক শেষ করিয়া অহীন্দ্র ফিরিবার সময় বলিল—দেখো আর যেন ঝগড়া ক'র না।

এক জন মাঝি ছাতাটা লইয়া তাহার সঙ্গে গেল, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে তখন আগুন ঝরিতে সুরু করিয়াছে। সেই রৌদ্রের মধ্যেই রংলাল নবীন এবং তাহার সঙ্গী কয়েক জন আপন আপন সীমানা চিহ্নিত করিয়া চারি কোণে চারিটা মাটির ঢিপি বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল। সাঁওতালেরা আবার দল বাঁধিয়া আপনাদের হিসাবমত জমি ভাগ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া জলহীন কঠিন মাটিতে কোপ মারিতে মারিতে রংলাল বলিল,—থাক শালারা, ক-দিন তোরা এখানে টিকে থাকিস, সেও তো আমি দেখছি!

১২

সেই দিনই অপরাহ্ণে সাঁওতালেরা খাজনার টাকা পাই পয়সা হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিল। কিন্তু গোল বাধাইল রংলাল-নবীনের দল। তাহারাও ধরিয়া বসিল, খাজনা ছাড়া সেলামী তাহারা দিতে পারিবে না। সাঁওতালেরা যখন সেলামী দিতে রেহাই পাইয়াছে তখন তাহারাই বা পাইবে না কেন? সাঁওতালদের চেয়েও কি তাহারা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পর? অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। রংলাল-নবীনের যুক্তি খণ্ডন করিবার মত বিপরীত যুক্তি খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল। অনেক ক্ষণ নীরবে উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রংলাল বলিল—দাদাবাবু, তা হ'লে হুকুমটা করে দেন আজ্ঞে!

অহীন্দ্র কিন্তু সে হুকুমও দিতে পারিল না। বিঘাপিছু পাঁচ টাকা সেলামী আদায় হইলেও পঞ্চাশ বিঘায় আড়াই শত টাকা আদায় হইবে। তাহাদের সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা সে শুধু চোখেই দেখিতেছে না, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। তাহার মা যখন রান্নাশালে বসিয়া আগুনের উত্তাপ ভোগ করেন, তখন সেও গিয়া উনানের কাছে বসিয়া উনানে কাঠ ঠেলিয়া দেয়। সে যে কি উত্তাপ সে তো তাহার অজানা নয়! উত্তাপ ও কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিয়াও তাহার মাকে নিজে হাতে রান্না করিতে হয়—ইহারই মধ্যে কোথায় আছে অসহনীয় অপরিসীম লজ্জা, যাহার ভারে তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। তাহার মা অবশ্য বলেন, 'যখন যেমন তখন তেমন। না পারলে হবে কেন?" অম্লান হাসিমুখেই তিনি বলেন। কিন্তু তাহার মনে পড়ে কালিন্দী নদীর বানের জল আটক দিবার জন্য ঘাসের চাপড়া বাঁধা বাঁধটার কথা; বাঁধটার ওপারে থাকে অথৈ জল—আর এপারে বাঁধের গায়ে সবুজ ঘাস যেমন হাসিতে থাকে তেমনই তাহার মায়ের মুখের অম্লান হাসির ওপারে আছে অথৈ দুঃখের বন্যা। কালিন্দীর বন্যায় ভাটা পড়ে, বর্ষার শেষে সে শুকাইয়া যায় কিন্তু মায়ের বুকের দুঃখের বন্যা শুকায় না, ও যেন শুকাইবার নয়। এ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া সে এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিবে!

নবীন বলিল—তা পাঁচ টাকা ক'রে জনাহি লজর কিন্তুক দিতে হবে মোড়ল। তা লইলে সেটা ধর আমাদেরও অপমান। সাঁওতালরা না হয় দেয় নাই, ওরা ছোট জাত। আমাদিগে তো রাজার সম্মান একটা করতে হবে।

রংলাল বার-বার ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল—এ তুমি একটা কথার মত কথা বলেছ লবীন। লেন, লেন, তাই হ'ল দাদাবাবু, পঞ্চাশ বিঘের খাজনা আপনার এক শ টাকা আর পাঁচ টাকা ক'রে পাঁচ জনের লজর পঁচিশ টাকা—এক-শ পঁচিশই আমরা দিছি। সেও আপনার এক খাবল টাকা গো!

অহীন্দ্রের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল—ইহাদের কথার ভঙ্গিতে সে যেন একটি ধারাবাহিক গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্র দেখিতে পাইল, ইহারা তাহাকে ঠকাইবার জন্যই আসিয়াছে। তাহার উপর শেষের কয়টি কথা—'এক খাবল টাকা'—অর্থাৎ দুই হাতের মুঠিভরা টাকা—এই কথা

কণ্ঠটির মধ্যে তাহাকে প্রলোভন দেখানোর সুস্পষ্ট সুরে তাঁহার ক্রোধ ও বিরক্তির আর সীমা রহিল না। সে দৃঢ় কঠোর স্বরে বলিল—জমি বন্দোবস্ত এখন হবে না, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু করতে পারব না।

রংলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ, তা হ'লে আমরা এখন ভেঙেচুরে জমি তৈরি করি—তার পর লেবেন খাজনা আপনারা!

—তার মানে?

কথাটার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, বন্দোবস্ত করা হউক বা না হউক, জমি তাহারা ছাড়িবে না। অকারণে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া লইয়া রংলাল বলিল—ওই যে বললাম গো, আমরা জমি-জেরাত হাসিল করি, তার পর লেবেন খাজনা! আর এখন যদি লেবেন তো তাও লেন, আমরা তো দিতেই রাজী রয়েছি।

অত্যন্ত ক্রোধে অহীন্দ্রের মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে ক্রোধ মনের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল একটি প্রণাম করিয়া বলিল—তা হ'লে আমরা চললাম দাদাবাবু। যখন ডাকবেন তখুনি আমরা খাজনার টাকা এনে হাজির ক'রে দেব। চল হে চল সব। সন্ধ্যে হয়ে এল চল।

অহীন্দ্র কথা বলিল না, হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জানাইয়া দিল—যাও, তোমরা চলিয়া যাও। ইহাদের উপস্থিতিও সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। রংলাল ও নবীনের দল একে একে প্রণাম সারিয়া চলিয়া গেল, অহীন্দ্র একাই নির্জ্জন শুদ্ধ কাছারি-বাড়ীর দাওয়ায় তক্তাপোষের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। কার্ণিসের মাথায় কড়িকাঠের উপরে বসিয়া সারি সারি পায়রার দল গুঞ্জন করিতেছে। সামনের খোলা মাঠটার উপর সারিবদ্ধ নারিকেলের গাছ—তাহারই কোন একটার মাথায় আত্মগোপন করিয়া একটা পেঁচা আসন্ন সন্ধ্যার আনন্দে কুক্-কুক্ করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্না বিধবার মত। এত বড় বাড়ীটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশেই দুই দিকে দুইটা সুদীর্ঘশীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সন্ সন্ শব্দ করিতেছে—সে শব্দ শুনিয়া মনে হয় যেন এই অনাথা বাড়ীটাই বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। অথচ এক দিন নাকি হাসিতে কোলাহলে আলোকে গাম্ভীর্য্যে বাড়ীখানা অহরহ গম্‌গম্ করিত। মাথা হেঁট করিয়া হাতজোড় করিয়া প্রজারা সভায় অপেক্ষা করিয়া থাকিত এ বাড়ীর মালিকের মুখের একটা কথার জন্য। আর আজ এক জন চাষী প্রজা বলিয়া গেল—সম্মতি দেওয়া হউক বা না-হউক জোর করিয়া তাহারা জমি দখল করিবেই! অহীন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তার পর তক্তাপোষটার উপরে নিতান্ত অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। সত্যসত্যই তাহার মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে।

কিছু ক্ষণ পর মানদা এক হাতে ধূপদানি ও প্রদীপ অন্য হাতে একটি জলের ঘটি লইয়া কাছারি-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দুয়ারের চৌকাঠে-চৌকাঠে জল ছিটাইয়া দিয়া ধূপ ও প্রদীপের আলো দেখাইতে দেখাইতে সে দেখিল অহীন্দ্র ছেঁড়া সতরঞ্চি-ঢাকা তক্তাপোষটার উপর চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এমন ভাবে এই নির্জ্জন কাছারির বারান্দায়, ঐ ময়লা ছেঁড়া সতরঞ্চির উপর—এই অসময়ে ছোটদাদাবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাও হইল, কোন অসুখবিসুখ করে নাই তো! গায়ে হাত দিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না, কি জানি, যদি ঘুম ভাঙিয়া যায় তো অনর্থ হইবে—হয়ত চীৎকার করিয়া উঠিবেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ত্রস্ত গতিতে বাড়ীতে গিয়া, ডাকিল—মা।

সুনীতি কাপড় কাচিয়া রামেশ্বরের ঘরে আলো জালিয়া দিবার জন্য উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মানদার ডাকে বাধা পাইয়া বিরক্তির সহিতই বলিলেন—যখন-তখন কেন পেছন ডাকিস মানদা? জানিস এখন এবার উপরে আলো জালতে যাব!

মানদা বলিল—ডাকি কি আর সাধ ক'রে মা! ছোট-

দাদাবাবু এই ভরসন্ধ্যে বেলা কাছারির বারান্দায়—সে-ই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে—অসুখ করেছে।

—অসুখ করেছে ?

—করবে না ? ওই দুধের ছেলে, এই জ্যষ্ঠি মাসের আগুনের হল্কা রোদ, এই রোদে চর মাপতে গেল। তার উপর এই সাঁওতালরা আসছে, এই তোমার সদগোপরা আসছে, কিচির-মিচির, চেঁচামিচি! যান বাপু আপনি গিয়ে উঠিয়ে বাড়ী নিয়ে আসুন। আমি বাপু ডাকতে পারলাম না ভয়ে।

সুনীতি বলিলেন—তুই আয় আমার সঙ্গে। আমি একলা কেমন ক'রে কাছারি-বাড়ীতে যাব ? তুলসী-মন্দিরের উপর প্রদীপ ও ধূপদানি রাখিয়া দিয়া নিত্য বলিল, ঘরের ভিতর দিয়ে চলুন, বাইরের রাস্তায় কি জানি যদি কেউ থাকে!

অহীন্দ্রের কপালে হাত দিয়া আশ্বস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন—কই না, জ্বর তো হয় নি। অহীন্দ্র স্পর্শেই বুঝিয়াছিল—এ তাহার মায়ের হাত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল—মা ? কি মা ?

—কিছু নয় অহি। তুই এমন ক'রে এই অসময়ে এখানে শুয়ে যে ?

—এমনি। মাথাটা একটু ধরেছে, কেমন মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল। তাই একটু শুয়েছিলাম।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সুনীতি বলিলেন—মাথা কেন ধরল রে, মনই বা খারাপ কেন হ'ল রে ?

সত্য গোপন করিয়া অহীন্দ্র বলিল—কি জানি! তার পর সে আবার বলিল, এই সন্ধ্যের অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, এত বড় বাড়ী, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অথচ গল্প শুনেছি, রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত না কি এখানে লোকে গিসগিস করত।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, নীরবে তিনিও এক বার অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ীখানার চারি দিক চাহিয়া দেখিয়া লইলেন। মানদা তাড়াতাড়ি বলিল—আমি আলো আনছি দাদাবাবু, আপনি আলো নিয়ে কাছারিতে বসুন কেনে! দু-চার জনা বন্ধু-টন্ধু নিয়ে দিব্যি গল্প-গুজব করুন।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু কথার কোন উত্তর দিল না।

সুনীতি বলিলেন—এই বাড়ীর মানমর্য্যাদা এখন সবই তোর উপর নির্ভর করছে বাবা! ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে তুই মানুষ হ'লে তবে এই দুঃখ ঘুচবে অহি।

মানদা সেই ভোরবেলা হইতেই আজ রংলাল নবীনের দলের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল—হ্যাঁ বাপু! তখন সেই ভোরবেলাতে ওই সব চাষার দল এসে ডাকুক দেখি, কই দেখব! গরম কত সব! ডাকছ কেনে গো, না, সে তুমি বুঝবে না! আমি আজ বলে বিশ বছর জমিদারের ঘরে চাকরি করছি, আমি বুঝব না! ওই ভোরে উঠেই আপনার মাথা ধরেছে—তার ওপর এই রোদ আর ঝলা।

সুনীতি বলিলেন—একটুখানি নদীর ধারে বাতাসে বেড়িয়ে আয় বরং। আকাশে চাঁদ উঠেছে, মনটাও ভাল হবে, খোলা বাতাসে মাথাও অনেক হাল্কা হবে। আমি যাই, বাবুর ঘরে আলো দেওয়া হয় নি। মানদা উনোনে আগুন দিয়ে দে মা।

অহীন্দ্রের মনের ভার অনেকটা হাল্কা হইয়াছিল, মায়ের ওই কথা কয়টিতে সে মনের মধ্যে একটা উৎসাহ অনুভব করিল, সে মানুষ হইলে তবে এই দুঃখ ঘুচিবে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দাদার কথা মনে পড়িল, তাহাকে এম-এ পর্য্যন্ত যেন পড়ানো য়। যেমন-তেমন ভাবে এম-এ পাস করিলে তো হইবে না, খুব ভাল ভাবে পাস করিতে হইবে। ফার্ষ্ট হইতে পারিলে কেমন হয়! ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট

নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে বাঁশী ও সাঁওতাল-মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ওপারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎসব চলিয়াছে। আজ তাহারা জমিদারকে খাজনা দিয়া রসিদ পাইয়াছে, জমি তাহাদের নিজের হইয়াছে—আজিকার দিন তাহাদের একটি পরম কাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগী—একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া না কি পূজা হইয়াছে—তাহার পর আকণ্ঠ পচুই

মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত্‌!

আকাশে আধখানা শুক্লপক্ষের চাঁদের প্রতিবিম্ব কালিন্দীর ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে অদ্ভুত খেলা খেলিতেছে—দূরে কালিন্দীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদ যেন গলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, ঝিকমিক্ করিয়া নাচিতেছে চাঁদ-গলানো জলের ঢেউ, এ পাশে দূরে কালিন্দীর জল যেন একখানা অখণ্ড রূপার পাত। সম্মুখেই পায়ের কাছে চাঁদ কালিন্দীর স্রোতের তলে ছেঁড়া একগাছি হারের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া লম্বা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সাদা সাদা টিটিভ পাখীগুলি জলস্রোতের ওপারে বালির উপর ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে—কখনও কখনও এক-একটা অন্যের তাড়ায় খানিকটা উড়িয়া আবার দূরে গিয়া বসিতেছে। দূর আকাশে একটা উড়িয়া চলিয়াছে আর ডাকিতেছে—হটি-টি—হটি-টি! নদীর বালুগর্ভের উপর অবাধ শূন্যতল স্বচ্ছ কুয়াশার মত জ্যোৎস্নায় মোহগ্রস্তের মত স্থির নিস্পন্দ। অহীন্দ্র নদীস্রোতের কিনারায় চুপ করিয়া বসিল। সহসা তাহার মনে হইল, কোথায় কাহারা যেন কথা কহিতেছে। স্বর ভাসিয়া আসিতেছে, ভাষার শব্দ ঠিক ধরা যায় না। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বেশ সাড়া দিয়াই প্রশ্ন করিল কে? উত্তর কেহ দিল না, উপরন্তু কথার শব্দও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহার নজরে পড়িল স্রোতের ওপারে বালির উপর দুইটি সচল মূর্ত্তি। আবার কথার শব্দ আরম্ভ হইল।

অহীন্দ্র কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না, অগভীর জলস্রোত পার হইয়া এপারে বালির উপর আসিয়া উঠিল। বালিতে বালিতে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সে কথার ভাষা বুঝিতে পারিল, সাঁওতালদের ভাষা এবং গলার স্বরে বুঝিল তাহারা দু-জনেই স্ত্রীলোক, সুরে মনে হইল কোন একটা বচসা চলিয়াছে। সে ডাকিল—কে?

যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা দু-জনেই ঈষৎ চকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। এক জন সবিস্ময়ে আপনাদের ভাষায় কি বলিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে একটি কথা অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল—রাঙাবাবু। তাহাকে চিনিতেও অহীন্দ্রের বিলম্ব হইল না, তাহার দীর্ঘ দেহখানিই তাহাকে চিনাইয়া দিল। সে কমল মাঝির নাতনী। অপর জন তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেই তাহাকেও অহীন্দ্র চিনিল—সে বৃদ্ধা, সর্দ্দার কমল মাঝির স্ত্রী। বৃদ্ধা অহীন্দ্রকে দেখিয়া যেন আশ্বস্ত হইয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় টানা টানা সুরে বলিল—দেখ রাঙাবাবু দেখ। মেয়েটি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আবার বলিতেছে—এ ঠাঁই ছাড়িয়া ও চলিয়া যাইবে।

তরুণী নাতনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কেনে, ঝগড়া করবে না কেনে? চলে যাবে না কেনে? তু বাবু বিচার ক'রে দে। বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্!

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—কি, হ'ল কি তোদের? ছি, মাঝিন, বুড়ী দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আছে?

বুড়ী খুব খুশী হইয়া উঠিল—দেখ্ বাবু আপুনি দেখ্।

অহীন্দ্র বলিল—যা মাঝিন, বাড়ী যা; নাচ হচ্ছে গান হচ্ছে পাড়াতে, যা নাচ-গান করগে।

—কেনে গান করবে? কেনে নাচ করবে? উয়ারা বুড়া-বুড়ীতে নাচ-গান করবে। উয়ারা জমি পেলে উয়ারা নাচবে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

অহীন্দ্র বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল—কি, হ'ল কি মাঝিন, তুই বল তো শুনি।

বৃদ্ধা যাহা বলিল তাহা এই। মেয়েটির শীঘ্রই বিবাহ হইবে। সর্দ্দার বলিতেছে তোমরা আমাদের কাছে থাক খাট, খাও, আমি তোমাদের ভরণপোষণ করিব। কিন্তু মেয়েটি সে-কথা কোন মতেই শুনিবে না। সে স্বতন্ত্র ঘর বাঁধিতে চায়, নিজস্ব জমি চায়। সেই জমি না পাইয়া সে এমন করিয়া রাগ করিয়াছে। ঝগড়া করিতেছে।

তরুণী নাতনীটি এইবার দুই হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল—তুরা জমি লিবি, তুদের ধান হবে, কোলাই হবে, ভুট্টা হবে, তুরা সব ঘরে ভরবি। আমরা কি করব তবে? আমাদের ঘর হবে না, বেটা-বিটি হবে না? উয়ারা কি খাবে তবে? কেনে আমরা তুদের জমিতে খাটব?

অহীন্দ্রের হাসি পাইল, আবার বেশ ভালও লাগিল;

এই তরুণী কিশোরী মেয়ে, এখনও বিবাহ হয় নাই, হইবে প্রত্যাশায় ঘর-দুয়ার সন্তান-সন্ততি সম্পত্তির আয়োজনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! মৃদু হাসিয়া সে বলিল—ওঃ, মাঝিন আমাদের পাকা গিন্নী হবে দেখছি! এখন থেকেই ঘরকন্নার ভাবনায় পাগল হয়ে উঠেছিস!

বৃদ্ধা অহীন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল—হ্যাঁ তাই দেখ্ কেনে আপুনি। উয়ার একেবারে সরম নাই।

তরুণীটি এবার আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তড়বড় করিয়া এক রাশ কথা বলিয়া গেল। অহীন্দ্র অনেক কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ যাহা বুঝিল তাহা এই—সরম তোমাদের নাই বুড়া-বুড়ী, তোমরা সকলকে জমি না দিয়া নিজেরা অধিক অংশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছ! বুঝিয়া অহীন্দ্র একটু বিস্ময় অনুভব করিল, কমল মাঝির নিজের নামে জমি লওয়ার মধ্যে এমন মতলবের কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে বৃদ্ধের স্ত্রীকেই বলিল—না না। ছি ছি, এমন কেন করলি তোরা মাঝিন?

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিল—জমি সকল বয়স্ক মাঝিকেই দেওয়া হইয়াছে, এই তরুণবয়স্কদের দেওয়া হয় নাই। উহারা এখন জমি লইয়া কি করিবে? উহাদের জোয়ান বয়স—এখন খাটিয়া পয়সা উপার্জ্জনের সময়। পরে উহারা সেই পয়সায় জমি কিনিবে, বুড়ারা মরিয়া গেলে পাইবে, এই তো নিয়ম তাহারা বুড়া-বুড়ী কিছু জমি বেশী লইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু রাঙাবাবু! তাহারা যে মোড়ল, সর্দ্দার, সকলের অপেক্ষা বেশী না পাইলে চলিবে কেন তাহাদের? সম্মান থাকিবে কেন? আর রাঙাবাবু যে অনেকটা জমি নিজের জন্য রাখিয়া দিলেন, নহিলে সকলকেই তাহারা দিত। এই সামান্য জমির ভাগ কেমন করিয়া এতগুলি লোককে দেওয়া যায়!

ঐ মেয়েটির এই গিন্নীপনার আগ্রহ অহীন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এক কাজ কর মাঝিন। তোর হবু বরকে পাঠিয়ে দিস, আমি যে জমিটা নিজের জন্যে রেখেছি, তারই খানিকটা তাকে ভাগে বিলি ক'রে দেব। আরও যে যে চায় দেব। তোরা চাষ করবি তার জন্যে তোরা অর্দ্ধেক ফসল নিবি, আমাদের জমি আমাদের অর্দ্ধেক দিবি। কেমন?

এবার দিদিমা ও নাতনী দু-জনেই আপনাদের ভাষায় কল্ কল্ করিয়া কি বলিয়া উঠিল, অর্থ না বুঝিলেও সুর হইতে আনন্দের আভাস অহীন্দ্র বেশ অনুভব করিল। হাসিয়া সে বলিল—কেমন, এইবার তোদের ঝগড়া মিটল তো?

বৃদ্ধা বলিল—হুঁ বাবু মিটল। সব মাঝি ভারী খুশী হবে। কাল সব যাবে তুর কাছে। উয়াদিকে তু জমি ভাগে দিবি, নাম লিখে নিবি।

তরুণীটি বলিল—আমাদিগে ভাগীদারের সর্দ্দার ক'রে দিবি বাবু। উ মরদটো তুর সব দেখে দিবে, আমি তুদের ঘরে পাট-কাম ক'রে দিবো। হোক্!

মেয়েটির আনন্দে আগ্রহে অহীন্দ্র খুশী হইয়া উঠিল, বলিল—তাই ক'রে দেব।

আনন্দে কলরব করিয়া মেয়েটি এবার হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল—যা এইবার ঘরে যা, নাচ-গান কর্ গিয়ে।

—আপুনি যাবিন না বাবু?

—না, অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল, আমি বাড়ী চললাম।

অহীন্দ্র জলের স্রোতটা পার হইয়া এপারে উঠিয়াছে, এমন সময় আবার পিছনে কে ডাকিল—বাবু! রাঙাবাবু! অহীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একটি মূর্ত্তি ছুটিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। সেই মেয়েটিই ছুটিয়া আসিতেছে।

—ফুল লিয়ে যা বাবু, তুর লেগে ফুল আনলাম। এক আঁচল কুরচির ফুল লইয়া মেয়েটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সরল অশিক্ষিত জাতির কৃতজ্ঞতায় অহীন্দ্রের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে দুই হাত পাতিয়া বলিল—দে। মেয়েটি আঁচল উজাড় করিয়া ফুল ঢালিয়া দিল—অহীন্দ্রের হাতের অঞ্জলিতে এত ফুল ধরিবার স্থান ছিল না, অঞ্জলি উপচিয়া ফুল বালির উপর পড়িয়া গেল।

মেয়েটি বলিল—ই গুলা পড়ে গেল যি?

অহীন্দ্র বলিল—ওগুলো তুই নিয়ে যা। খোঁপায় পরবি।

মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে মাথায় কয়েকটা গুচ্ছ গুঁজিয়া নাচিতে নাচিতে জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। টিট্টিভ পাখীর দল একটা গতিচাঞ্চল্যের আভাস পাইয়া চীৎকার করিয়া উড়িয়া খানিকটা দূরে গিয়া বসিল। [ক্রমশঃ

লেখাপড়া ও বৃত্তি

শ্রীঅনাথনাথ বসু

লেখাপড়া শেষ হ'লে আমাদের সকলকেই সংসারের ভার নিতে হয়; টাকা উপার্জন করতে হয়। সেজন্য আমাদের একটা-না-একটা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়, কেউ চাকরি করে, কেউ ডাক্তার হয় বা ওকালতি করে, কেউ অন্য কোন স্বাধীন ব্যবসা করে, কেউ আবার কারখানায় কাজ করে। সুতরাং লেখাপড়া শেখার সঙ্গে বৃত্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; অনেকে এই জন্য লেখাপড়ার সার্থকতার পরিমাপ করেন বৃত্তির উপযোগিতা দিয়ে; যদি লেখাপড়া শিখে কেউ উপার্জন করতে না পারে তবে আমরা সাধারণত তার লেখাপড়া শেখা ব্যর্থ হয়েছে ব'লে মনে করি। শিক্ষার সার্থকতার বিচার এরূপ সংকীর্ণভাবে আজ আর করা চলে না। কিন্তু একথা ঠিকই যে আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই জীবিকার উপায় করা শিক্ষার একমাত্র ও প্রধানতম না হলেও প্রধান উদ্দেশ্য বটেই। তা ছাড়া এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষা চিরকালই বৃত্তিমূলক ছিল এবং থাকবে। সুতরাং লেখাপড়া শেখার সঙ্গে জীবিকা-উপায়ের নিকট-সম্বন্ধ থাকবে এবং সেটা থাকা স্বাভাবিক।

এক কালে আমাদের দেশে জাতিগত বৃত্তির প্রচলন ছিল, তখন যে যার জাতব্যবসা তাই করত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে টোলে লেখাপড়া শেষ ক'রে অধ্যাপনা করত, চাষীর ছেলে পাঠশালে পড়া সাঙ্গ ক'রে চাষ করত, বৈদ্যের ছেলে বৈদ্য হ'ত, পটুয়ার ছেলে হ'ত পটুয়া; কুমোরের ছেলে কুমোর হ'ত, তাঁতীর ছেলে তাঁত বুনত, কামারের ছেলে হ'ত কামার। সেদিন জাতিগত বৃত্তি থাকাতে ছেলে বড় হ'লে কি করবে বাপমার মনে সে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকত না।

সে যুগের শিক্ষার আর একটা বিশেষত্ব ছিল; তখন লেখাপড়ার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে বৃত্তি শিক্ষা দেবার বিশেষ কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না; কারণ বৃত্তি-শিক্ষার জন্য তখন একমাত্র ব্যবস্থা ছিল শিক্ষানবিশী করা, হাতেকলমে কাজ করা। সেদিন তাঁতীর ছেলে বাপের তাঁতের কাজে সাহায্য করতে করতেই তাঁতী হ'ত, কুমোরের ছেলে বাপের কাছে কাজ শিখে কুমোর হ'ত। এমন কি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলেও যজমানির শাগরেদি বাপের কাছেই করত। তাই পাঠশালে তখন যে লেখাপড়া শেখান হ'ত তাতে শুধু লেখাপড়ার উপরই জোর দেওয়া হ'ত, তাতে বৃত্তি-শিক্ষার বিশেষ স্থান ছিল না।

আর একটা কথা, তখন জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল সরল, বৃত্তির সংখ্যাও ছিল কম। তার পর ক্রমে জীবন-যাত্রার প্রণালী জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল, জাতিগত বৃত্তির ব্যবস্থা গেল উঠে; যন্ত্রযুগের প্রবর্তন হ'ল; মানুষের নূতন নূতন প্রয়োজন মেটাবার জন্য নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হ'ল। এই নূতন অবস্থার দাবি মেটাবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থারও পরিবর্তন করতে হ'ল, বৃত্তি-শিক্ষার স্বতন্ত্র ও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হ'ল; এমন কি সাধারণ শিক্ষার মধ্যেও বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে করার দরকার হয়ে উঠল।

এখন আর চাষীর ছেলে চাষই করে না, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারই হয় না; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে অধ্যাপনা বা যজমানি করে না। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আজ-কাল জীবনসংগ্রাম এমন কঠিন হয়েছে যে, কোন্ বৃত্তি নিলে যে ভালভাবে জীবিকার উপায়, অর্থ উপার্জন করা যাবে তা এমন ভাবে ঠিক করা যায় না।

আগেকার দিনে উপার্জন হোক না হোক লোকে পৈতৃক বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করার কথাই ভাবতে পারত না। এরূপ ব্যবস্থার একটা সুবিধাও ছিল,

অসুবিধাও ছিল। সুবিধার কথা আগেই বলেছি; অসুবিধা ছিল এই যে, ছেলে সে বৃত্তির উপযোগী হোক না হোক তাকে পিতার বৃত্তি নিতেই হ'ত। পিতা হয়তো অধ্যাপনা করেন, ছেলের এদিকে হয়তো পটুয়ার কাজে স্বাভাবিক প্রতিভা আছে, কিন্তু পটুয়ার কাজ তার করা চলবে না, সে শিল্পী হ'তে পারবে না। সবাই এক রকম শক্তি ও মানসিক বৃত্তি নিয়ে আসে না। মনস্তত্ত্বের এই সত্যটি সকলেই জানেন। একই পিতার দুইটি ছেলের মধ্যে এক জন হয়তো লেখাপড়া করতে ভালবাসে, আর এক জন হয়তো হাতের কাজ করতে ভালবাসে, সেদিকে তার স্বাভাবিক প্রতিভা আছে, হয়তো লেখাপড়া তার ভাল লাগে না। সে অবস্থায় তাকে জোর ক'রে লেখাপড়া যাতে লাগে এমন বৃত্তি নিতে বাধ্য করলে তার ক্ষতিই হয়, কারণ তার শক্তির সদ্ব্যবহার হয় না এবং পরিণামে তাতে দেশের ও সমাজেরও ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় রুচি ও শক্তি অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নেবার অধিকার দিলে লোকের ও সমাজের দুয়েরই কল্যাণ হয়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রাচীন ব্যবস্থাতে শক্তির অনেক অপচয় ঘটত।

আজকাল সে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে এক দিক দিয়ে লোকের সুবিধা হয়েছে; কারণ এখন প্রত্যেকে নিজের নিজের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নেবার স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা সমস্যাও এসেছে; এক কালে বৃত্তি বেছে নেবার মধ্যে কোন সমস্যাই ছিল না; কিন্তু আজ কার কি বৃত্তি উপযুক্ত হবে, কার শক্তি কোন্ বৃত্তির উপযোগী, এ সমস্ত দেখা দরকার হয়ে পড়েছে। এই জন্য আজকাল কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি; কিন্তু আগে আর কয়েকটি কথা বলে নিই।

মানুষের শক্তির উপর তার বৃত্তি নির্ভর করে। তার বৃত্তির সঙ্গে যদি তার শক্তি খাপ না খায় তবে বৃত্তিরও ক্ষতি হয় তার নিজেরও ক্ষতি হয়। অনেক সময়ে দেখি ছেলেরা না বুঝে না শুনে বৃত্তি বেছে নেয়; যে-ছেলে সাহিত্য ভালবাসে সে বেছে নেয় অঙ্ক ও বিজ্ঞান, কারণ অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়া থাকলে হয়তো ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার সুবিধা হবে, তার বাবা হয়তো ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার। সুতরাং ছেলে অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়তে আরম্ভ করল; এবং কোন মতে আই. এস্‌সি. পাস করল। (আই. এস্‌সি. পাস করা যে খুব শক্ত নয় এটা সকলেই জানেন।) তার পর তার বাবা তাকে মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেন; সেখানে কিছুদিন পরেই ছেলে টের পেল, সে এখানকার কাজের যোগ্য নয়—এ কাজ তার ভাল লাগে না। তখন এক বিপদ হয়; এ-অবস্থায় হয় তাকে এ-কলেজ ছেড়ে সাহিত্য পড়তে যেতে হয়, না-হয় ভাল লাগুক বা না লাগুক তাকে এইখানেই থেকে যেতে হয়। নূতন ক'রে অন্য রকমের শিক্ষা নিতে গেলে বিপদ হয় এই যে এক তো সে-রকম শিক্ষা সে পায় নি, দ্বিতীয়ত, সময়ও অনেক চলে গেছে। সে-অবস্থায় যেখানে সে আছে সেখানে কোনও রকমে চালিয়ে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না। সময়ে সময়ে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ব'লেও আবার যেখানে সে আছে ভাল লাগুক বা না লাগুক, সেখানে তার কাজ করার যোগ্যতা পুরা থাকুক না থাকুক, সেখানটা সে ছাড়তে চায় না। ফলে উভয়সঙ্কটের কোন সমাধান ঘটে না।

আমি বহু ছাত্রকে জানি যারা এ-রকম উভয়-সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে, হয় তাদের মনের ক্ষতি ঘটেছে নয় তাদের বৃত্তি-শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার বৃত্তি-নির্বাচনে আর এক ধরণের ভাবনা কাজ করে; সাধারণ লোকের ধারণা কতকগুলি বৃত্তি সম্মানজনক, কতকগুলি সে রকম নয়; উকিল বা ডাক্তার হয়ে রোজগার করতে না পারা যায় সেও ভাল, কিন্তু চাষ করা বা কারখানায় কাজ করা কিছু পরিমাণে সম্মানহানিকর। ছেলের হয়তো গানের বা ছবি আঁকবার স্বাভাবিক প্রতিভা আছে, কিন্তু যে হেতু গায়কের বা শিল্পীর বৃত্তি এখনও আমাদের দেশে খুব সম্মানজনক ব'লে মনে করা হয় না, অতএব ছেলে এবং তাঁর অভিভাবক ছেলের স্বাভাবিক প্রতিভা অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। অবশ্য খুব বড় গায়ক

বা শিল্পীর কথা এখানে বলা হয় নি; কিন্তু সকলেই তো এক দিনে বড় গায়ক বা শিল্পী হয়ে ওঠে না। বস্তুত দেখতে পাই যে এখনও লোকে হাতের কাজকে ছোট ক'রে দেখে; তাই যারা কোন রকমের হাতের কাজকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার ভাব আছে; কিন্তু এ অবজ্ঞার কোনও যুক্তি আছে কি? দেশের কাজে সকল রকমের কর্মীর দরকার; তা না হ'লে দেশের অমঙ্গল হয়। আজ যদি রাতারাতি সব চাষী বা তাঁতী চাষের বা তাঁতের কাজ ছেড়ে উকিল বা ডাক্তার হ'তে লেগে যায়, এই ভ্রান্ত ধারণায় যে চাষের কাজ ছোট আর ওকালতি ডাক্তারি বড় তা হ'লে আমাদের সকলকেই না খেয়ে মরতে হবে। বস্তুত দেখতে পাই যে লোভের বশবর্তী হয়ে বহু ছেলে যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও ওকালতি করতে যায়; তাই দেশে উকিলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে—আর ওকালতিতে পয়সার অভাবও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর পিছনে আর একটা লোভও আছে; যে ওকালতি পড়তে যায় সে-ই স্বপ্ন দেখে রাসবিহারী ঘোষের। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাল—কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হ'তে পারে না যদি না যোগ্যতা থাকে; তাই যোগ্যতার বিচার ক'রে পথ বেছে নেওয়ার দরকার, নইলে উভয়-সঙ্কটের সৃষ্টি হয়; তার কথা আমি আগেই বলেছি।

সুতরাং বৃত্তি-নির্বাচনের আগে নিজের যোগ্যতা ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখা দরকার। যে লাজুক ছেলেটি বছরের পর বছর পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাচ্ছে, তার পিতাপিতামহ নিজেরা হয়তো উকিল, তাই পরীক্ষার ফল দেখে তাঁরা তাকে আইন পড়তে দিলেন; ছেলে আইন ভাল করেই পাস করল। তার পর সে হ'ল উকিল; কিন্তু তখন তার হ'ল বিপদ; ওকালতিতে ভাল করতে হ'লে চটপটে হ'তে হবে, লজ্জা থাকলে চলবে না; বক্তৃতা করতে হবে, লোককে বোঝাতে হবে; কিন্তু এদিকে সে লোক দেখলেই তার মুখ আর ফোটে না। সুতরাং তার ওকালতি করা চলে না। কাজেই তখন তাকে হয়তো অন্য কোন ব্যবসায় নিতে হয়—না-হয় চিরকাল পিছনেই পড়ে থাকতে হয়।

আর একটি ছেলে হয়তো হাতের কাজে ওস্তাদ, যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালবাসে, দৈবদুর্বিপাকে সে নিল এমন ব্যবসা যেখানে যন্ত্রের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই রইল না। ফলে তার মন ভরে উঠল না, তার স্বাভাবিক প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সে করতে পারে না।

এই রকম ক'রে প্রতিদিন কত যে শক্তির অপচয় ঘটছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

কথা উঠতে পারে কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা বাড়ে, কর্মক্ষমতা বাড়ে। এ-কথা সত্য; কিন্তু যদি স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে তাহলে শক্তি সার্থকতর হয় এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটলে যে কোনটাই পুরাপুরি ফুটে উঠতে পারে না একথাও ঠিক।

আমাদের দেশে দেখি এই সব সমস্যার একটা সহজ সমাধান বেছে নেওয়া হয়েছে কেরানীগিরির মধ্যে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের কেরানীর বিভিন্ন রকমের শক্তির প্রয়োজন হয়; যে ইঞ্জিনিয়ার-আপিসের কেরানী তার যদি ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রতি ঝোঁক না থাকে তাহলে সে সে-কাজেও দক্ষতা লাভ করতে পারে না।

মোটের উপর কর্মীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; এক যারা দিনমজুরি করে—আর যারা দক্ষ কারিগর হয়। শুধু যন্ত্রপাতির কাজে যে এই রকম ভাগ করা যায় তা নয়—জীবনের সকল প্রকার কর্মেও এই দুই শ্রেণীর কারিগর দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর কাজের মধ্যে আনন্দ ও শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ এই দুইয়েরই অভাব ঘটে। কিন্তু যারা দক্ষতা চায়—তারা শক্তির, বুদ্ধির ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগ ক'রে এক দিকে যেমন আনন্দ লাভ করে অন্য দিকে তেমনি কাজকেও সার্থক করে। জীবনে যারা দিনমজুরি না ক'রে দক্ষ কারিগর হ'তে চায়, তাদের নিজেদের স্বাভাবিক দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন ক'রে নিতে হবে।

পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় তাই বৃত্তি-নির্বাচনের জন্য নানা রকম পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সকলকেই এইভাবে পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই জন্য প্রত্যেক বৃত্তির জন্য কোন্ কোন্ বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয় আগে পরীক্ষা ও গবেষণা ক'রে সেইগুলি ঠিক করে নেওয়া হয়; অমুক বৃত্তির জন্য অমুক অমুক শক্তির প্রয়োজন। এই গবেষণা খুব তন্ন তন্ন ক'রে করা হয়েছে। তার ফলে সে দেশের এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা আজ অনেকখানি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন এই বৃত্তিতে সফলতা লাভ করতে হ'লে এই এই গুণগুলি থাকা চাই; যে কাপড়ের কলের ইঞ্জিনিয়ার হবে তাকে এই গুণগুলির অধিকারী হ'তে হবে; যে সেই কারখানার তাঁতশালায় কাজ করবে তার এই গুণগুলির অধিকারী হ'তে হবে; যে এরোপ্লেন চালাবে তার ভিতরে এই শক্তিগুলি চাই, আবার যে এরোপ্লেন তৈয়ারি করবে তার এই গুণগুলি চাই; যে মোটর চালাবে তার হাতের এই ধরণের নিপুণতা চাই, আবার যে মোটর বিক্রয় করবে তার এই ধরণের নিপুণতা চাই।

এই ভাবে গুণগুলি নির্ণয় ক'রে তাদের শ্রেণীবিভাগ করার ফলেই বৃত্তি-নির্বাচন সহজ হয়ে উঠেছে। কারণ তখন কার ভিতরে কোন্ গুণ আছে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেই কে কোন্ বৃত্তির উপযোগী সেটা অনেকখানি নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

ইংলণ্ডে ইস্কুলের ছেলেদেরও নিয়ে বৃত্তি-নির্বাচন পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাতে ছেলেদের ও ছেলেদের অভিভাবকদের খুব সুবিধা হয়েছে।

আমাদের দেশে এখনও এ-বিষয়ে বিশেষ কাজ হয় নি। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে কিছু গবেষণা সুরু হয়েছে। আশা করা যায় আমরাও ধীরে ধীরে বৃত্তি-পরীক্ষার উপায়গুলি নির্ধারণ করতে পারব।

যন্ত্রের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবন জটিলতর হয়ে উঠেছে, নূতন নূতন বৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে—সেই বৃত্তিগুলির জন্য শক্তিমান্ কর্মীর প্রয়োজনও বাড়ছে। সুতরাং বর্তমান সভ্যতা ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হ'লে বৃত্তি-নির্বাচন ঠিক ভাবে করা দরকার—না হ'লে শক্তির অপচয়ে মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটবে, সভ্যতার বিকাশ হ'তে পারবে না। তাই আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আজ একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

দেয়ালি

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেব
আমার প্রদীপগুলি একে একে—
আলোর এক-একটি ছোট ছোট আবর্ত তুলে
শান্ত স্রোতে তারা ভেসে যাবে।
যেমন ভাসে সময়ে নক্ষত্রদীপ,
যেমন ভাসি আমরা সময়ে
এক-একটি অতি অসহায় মানুষ-নক্ষত্র।

ভয়ঙ্করী,
তোমাকে আমার ভয় নেই।
আমি ভালবাসি তোমাকে।
আমার প্রদীপগুলি
যেন মালা হয়ে দোলে তোমার গলে।

অন্ধকারে
বয়ে চলেছে একটি রজত-ধারা—
আমি সেই শান্ত স্রোতে
ভাসিয়ে দেব একে একে
আমার প্রদীপগুলি।
জানি তারা নিবে যাওয়ার আগে
হবে সুন্দর—
সেইখানেই আমার আনন্দ।

অঙ্গার

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

টুণ্ডলা ষ্টেশনে আগ্রাযাত্রী গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া আছি। তাজমহল দেখিতে যাইব। সহসা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একটি মেয়ের মুখ চোখে পড়িল। খুব অপরিচিত বোধ হইল না।

এক-একটি লোককে দেখিয়া মনে হয় যেন আগে কোথাও দেখিয়াছি, অথচ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না। মনে হইল ইহাকেও যেন কোথাও দেখিয়াছি, একটু চিন্তা করিলেই মনে পড়িবে।

মেয়েটির বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। দেখিতে সুন্দরী, যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়াও রূপের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সঙ্গের পুরুষটিকেও অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়িতে লাগিল, যদিও ছেলেমেয়ে তিনটিকে চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না। পারার কথাও নয়। কারণ নিঃসন্দেহ ইহাদের দেখিয়াছি অনেক দিন আগে, যখন ছেলেমেয়ে তিনটির জন্ম হয় নাই।

অবশ্য মুখ চেনা হইলেও ইহারা যে পরিচিতই, এমন নাও হইতে পারে। কলিকাতার পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে, সিনেমায়—

এইবার যেন বিস্মৃতির মধ্যে একটু আলো দেখিতে পাইলাম। সিনেমাতেই বটে। চৌরঙ্গীতে, ইহারা দুই জনেই একসঙ্গে ছিল; অন্ততঃ দশ-এগার বছর আগের কথা।

ধীরে ধীরে সবটাই মনে পড়িল। মনে পড়িবার ফলে আর সে কামরায় চড়িবার প্রবৃত্তি রহিল না। পাশে আর একখানিতে উঠিলাম।

দশ-এগার বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বছর সাতাশ। সাত মাস কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া মাসখানেকের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছি।

সিনেমা দেখার অভিপ্রায় লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। এ সাত মাস যেখানে কাটাইয়াছি, সেখানে লোকে সিনেমার নামও শোনে নাই, দুই-এক জন ছাড়া। তাহারা আমারই মত অর্থের চেষ্টায় মধ্যপ্রদেশের এক করদ রাজ্যে পাহাড়ের ধারে জঙ্গল কাটাইয়া মাটির ভিতর খুঁড়িয়া দেখিতেছে কয়লা মেলে কিনা। নিজেদের জন্য নয়, বিত্তশালী মনিবের জন্য।

টিকেট-ঘরের পাশে জ্ঞানেন্দুর সহিত দেখা হইল। পাঁচ বছর আগে একই সঙ্গে এম্‌-এস্‌সি পাস করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। আমি যা হোক একটা কিছু চাকরি পাইয়াছিলাম, সে বেচারা এখনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

একই সঙ্গে সিনেমায় ঢুকিলাম। আলো নিবিবার মিনিট কয়েক আগে সহসা দুই-তিন সারি সামনে একটি মেয়ের মুখ চোখে পড়িল, সুন্দরী, বছর কুড়ি-একুশ বয়স। সঙ্গে একটি সুশ্রী সুবেশ যুবক।

পরিচিত মনে হওয়ায় কয়েক মুহূর্ত্ত সেদিকে তাকাইয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দু হাসিয়া বলিল, "চিনেছ দেখছি!"

বলিলাম, "ঠিক চিনি নাই, চিনি-চিনি করছি।"

"ওর নাম মৃণাল।"

"মৃণাল? ওঃ এইবার চিনেছি। বিয়ে হয়ে গেছে দেখছি! মাঝ থেকে দিলীপ বেচারার মনঃকষ্ট। দাদার জেদই বজায় রইল!"

জ্ঞানেন্দু আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া কহিল, "তুমি তো অনেক দিন বাইরে ছিলে, সব খবর জান?"

বলিলাম, "জানার যা কিছু, মোটামুটি সবই জানি। দিলীপের মধ্যে যে এত বড় 'দেবদাস' লুকিয়ে ছিল,

সেইটেই আগে জানতাম না। কেমন আছে সে ? বেঁচে, না সায়ানাইড, না বাহ্‌রিন্‌ আইল্যাণ্ডস্‌ ?”

অনেকটা ঠাট্টার ছলেই কথা কয়টা বলিলাম, যদিও নিজেও জানিতাম, জিনিষটা দিলীপের দিক্‌ দিয়া পুরাপুরি হাসি নহে। সম্ভবতঃ সামনের ঐ মেয়েটির দিক্‌ দিয়াও নহে।

জ্ঞানেন্দু উত্তর দিল একটু পরে। কহিল, “না। সায়ানাইড খাওয়ার অবস্থা দিন-কয়েক দাঁড়িয়েছিল, তবে তার পরে—”

ঠিক এমনি সময়েই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং চোখের সামনে একটি কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুর যে অভিনয় করিয়া চলিল, তাহার সহিত আমার একটি বন্ধুর জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই।

তখন এম্‌-এস্‌সি পাস করিয়া রাজা-উজীর হওয়ার স্বপ্ন ছাড়িয়া ডালভাতের চেষ্টায় মন দিয়াছি। ডালভাতের জোগাড় হইলেও, ভদ্রভাবে সভ্যসমাজে মিশিবার মত টাকা তখনও রোজগার করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে সময়ে দিলীপ সগর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীতে এম্‌-এস্‌সি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ল’ পাস করিয়া ওকালতির চেষ্টা দেখিতেছে।

দিলীপ চিরকালই সুপুরুষ। রং বাঙালী ছেলের পক্ষে অত্যন্ত ফরসা, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। মেয়েরা যে তাহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহলী, সে কথাটাও মধ্যে মধ্যে জানাইয়া দেয়, সত্য, মিথ্যা, এবং অর্দ্ধসত্য সম্বলিত কতকগুলি গল্প করিয়া। মোটের উপর দিলীপ যে চালিয়াৎ, সে বিষয়ে বন্ধুমহলে মতভেদ ছিল না, তবে তাহার রচিত আজগুবি গল্পের মধ্যে যে খানিকটা সত্য হওয়া সম্ভব, সে কথাও কেহ অস্বীকার করিত না। বন্ধু-মহলে তাহার খাতিরও ছিল না, অসম্মানও ছিল না।

এই দিলীপই যখন চুপি চুপি আমাকে জানাইল যে সে অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গিয়াছে, এবং বিপদটা ঠিক আধিভৌতিক নহে, তখন কৌতূহল হইল বেশ একটু। ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে বলিলাম।

দিলীপের দাদা কলিকাতার কাছাকাছি একটি ছোট শহরের একটি ততোধিক ছোট উকীল। তিনি যে আয় করিতেন, তাহা দিয়া স্ত্রীর, ভ্রাতার, এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে খোড়ো ঘর ছাড়া উপায় ছিল না। তবে পিতৃদত্ত সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার অঙ্ক বেশ একটু মোটা, এবং সেই জন্যই আদালত ও বাড়ীর মধ্যের রাস্তাটা গাড়ী করিয়া বেড়ান ছাড়া আর কোন লাভ না হইলেও উকীলবাবুর কোন অসুবিধা হয় নাই।

আমরা যেবারে বি-এস্‌সি পাস করিলাম সেই বারই দিলীপের দাদা বিবাহ করিলেন এবং সেই বিবাহের ফলেই বিবাহের বছর-চারেক পরে দিলীপের জীবনে চরম সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল।

কারণ অবশ্য ইহা নহে যে দিলীপের বউদি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ এবং দেবরবিদ্বেষী। দিলীপ নিজেই আমাদের কাছে বলিয়াছে বউদি তাহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখেন। অবশ্য দিলীপের বউদি দিলীপের অপেক্ষা বয়সে ছোট।

এমনি সময়ে এক দিন চুপি চুপি দিলীপ জানাইল, যে, বউদির দুই বোনকেই সে এক সঙ্গে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারাও যে তাহার সম্বন্ধে একটুও সচেতন নয়, তাহা নহে। মোটের উপর বড়টি, অর্থাৎ মৃণালই বেশী সুন্দরী, এবং তাহাকে বিবাহ করিতে দিলীপের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

কথাটা আগাগোড়া বিশ্বাস করিলাম না, কেন না এ-সব বিষয়ে লোকের কথা বিশ্বাস করার বয়স তখন পার হইয়া আসিয়াছি। তবু বলিলাম, “ভাল কথাই ত! ক’রে ফেল বিয়ে, নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে। তবে তুমি চাওয়ামাত্রই যে মেয়ে এবং মেয়ের বাপ রাজী হয়ে যাবে, তার স্থিরতা কি ?

সে খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, “তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করি নি। কারণ আমার সম্বন্ধে তোমার অবিশ্বাসের ভাব আমি জানি। তবে আমি জোর ক’রে বলতে পারি, আজ যদি এখনই গিয়ে মৃণালকে বলি, ‘মৃণাল, আমাকে বিয়ে কর’, ও রাজী হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত্তেই। নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস আমার আছে।”

বুঝিলাম, রাগ করিয়াছে। ঠাণ্ডা করিবার

উদ্দেশ্যে বলিলাম, "ভুল করছ, আমি সে-কথা বলি নি।"

"তবে কোন্ কথা বলেছ?"

"অনেক কথা। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের কথা ত জান! শুধু তোমার, আর মৃণালের মত হলেই বিয়ে হবে না, মৃণালের মা-বাবার মত চাই, তোমার দাদা-বউদির মত চাই—"

সে বাধা দিয়া কহিল, "মৃণালের মা-বাবার অমতের কোন কারণ নেই। আমার বংশ ভাল, চরিত্র ভাল, নিজে রোজগার না করলেও বাবা যা রেখে গেছেন, তার উপর দিয়েই একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। আর দাদা-বউদি? বউদির অমত কিছুতেই হবে না, তবে দাদার কথা বলা অবশ্য শক্ত। তবে এমনি ত অমতের কোন কারণ দেখি না।"

কারণ কিছু থাক বা না-থাক, দাদা অমত করিলেন। এক বাড়ীতে দুই ভাইয়ের বিবাহ না কি কোন রকমেই চলিতে পারে না, পৃথিবী উল্টাইয়া গেলেও না। অবশ্য এ ধরণের বিবাহ যে হয় না, তাহা নহে, কিন্তু ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ হয়। তাহা ছাড়া মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দিলীপের মাথায় বিবাহের চিন্তা ঢোকা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, এবং বাড়াবাড়ি দেখিলে তিনি এ রোগের চিকিৎসা নিজের হাতে গ্রহণ করিবেন।

মৃণালের বাবার কোন অমত ছিল না, মৃণালের ত ছিলই না। বউদি ছোট বোনকে জা হিসাবে পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বামীর আপত্তিতে মর্ম্মাহত হইলেন। অনেক অশ্রু, অনেক উপবাস, অনেক মান-অভিমান চলিল, মতের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

অথচ আপত্তির কারণ সম্ভবত: কোন দিক্ দিয়াই ছিল না। ছোট ভাইয়ের সহিত তাঁহার বয়সের এমন কোন তফাৎ ছিল না, যে দিক্ দিয়া তিনি শাসকের পদ লইতে পারেন। দিলীপ উপার্জ্জন করিতে শিখে নাই। এ কথাও অচল; কারণ উপার্জ্জন করিতে তিনিও শিখেন নাই। পৈতৃক অর্থ তাঁহার একার নহে, তাহাতে দিলীপের সমপরিমাণ ভাগ রহিয়াছে। তথাপি হুকুম টলিল না।

সে-সময়ে দিলীপের স্থলে নিজেকে বসাইয়া অনেক কথাই ভাবিয়াছি। আমি হইলে দাদার আপত্তিতে এক বিন্দুও কর্ণপাত করিতাম না, বিশেষ করিয়া যখন অর্থের জন্য দাদার দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই নাই, ইত্যাদি অনেক কথা।

পরে দেখিলাম মনে যাহা ভাবা যায় এবং কাগজ-কলম হাতের কাছে থাকিলে যাহা লেখা যায়, তাহার সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। এ-দিক্ দিয়া পৃথ্বীরাজ, লকিন্‌ভার প্রভৃতির রীতি বর্ত্তমান সময়ের ভারতবর্ষে তেমন করিয়া খাটে না। এখানে বিবাহের পূর্ব্বে বাপ-মা ছাড়া আরও অনেকগুলি লোকের মত উভয় পক্ষে লইতে হয়, —যথা মাতামহ, পিসীমা প্রভৃতি। এ-সব দিক্ না দেখিয়া আগুন লইয়া খেলা করিতে যাওয়া বুদ্ধিহীনতা, এবং পরিণামে পরিতাপ করিবার পূর্ব্বাভাস মাত্র।

দিলীপের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা গেল, দাদার সম্পূর্ণ অমতে বিবাহ করার সাহস দিলীপের বেশী নাই। দ্বিতীয়ত: জামাতার অমতে তাহারই ছোট ভাইয়ের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে মেয়ের বাপের আপত্তি এবং ইহা হইতেই স্বত:সিদ্ধ ভাবে মেয়েরও বিবাহে আপত্তি। দোষ দিবার মত কারণ তখন যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, এখন আর পাই না; কারণ মনে হয় মৃণাল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের মত কাজ করিয়াছিল। তবে যেখানে হৃদয় মস্তিষ্কের কাছে পরাভূত, সেখানে মস্তিষ্কের বাস্তবদর্শিতায় সুখ্যাতি করিলেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি রহিয়া যায়; মনে হয় বাস্তবকে এত বড় করিয়া না দেখিলেও বোধ হয় চলিত।

আদালতে দিলীপের মক্কেলের অস্তিত্ব ছিল না, তবু সে সাদা প্যাণ্ট, কালো কোট ও টাই পরিয়া আদালতে গিয়া দুপুরটা সিগারেট খাইয়া উড়াইয়া দিত। এখন কিছু দিন আদালতে যাওয়া বন্ধ করিল।

যাহাদের বুকে জোর নাই, তাহাদের কোন কিছু করিতে যাওয়াই বোকামি। দিলীপ যদি আর দশ জন সহপাঠী ও সহকর্ম্মীর মত, অর্থাৎ সুবোধ শিশুর মত, খাওয়া, ঘুম ও আদালতে সিগারেট খাওয়া লইয়া অক্লেশে সময় কাটাইতে পারিত, এবং যথাসময়ে দাদার পছন্দমত একটি কিশোরী বধূ ঘরে আনিতে পারিত,

তাহা হইলে আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু সহসা যখন একটি মেয়ে চোখে নেশা ধরাইয়াই দিল, তখন খানিকটা হৈচৈ করিয়া, সায়ানাইডের ভয় দেখাইয়া বন্ধুমহলে সোরগোল তুলিয়া লুপ্তবায়ু সোডার বোতলের মত নির্জ্জীব হইয়া গেল কেন? আমার আপত্তি এইখানেই; শুধু আমার নহে, জ্ঞানেন্দু, নৃপেন, কালীপদ প্রভৃতি সহপাঠীদেরও আপত্তি। খানিকটা সায়ানাইড খাইয়া এক মুহূর্ত্তে প্রাণটাকে অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইবার পক্ষপাতী আমরা কেহই নই, কিন্তু এতখানি ঝড়-তুফানের পরে এতটা শিষ্ট মূর্ত্তি আরও আপত্তিকর।

মোট কথা, দিলীপ আমাদের নিরাশ করিল। আমাদের তখন যে বয়স, তাহাতে স্থিরচিত্তে চারি দিক্ ভাবিয়া বিচার করিয়া রায় প্রদান করা সম্ভব নহে, উত্তেজনার বিষয়ই তখন আমাদের খোরাক। চোখের সামনে মানুষ মোটর চাপা পড়িলে দুঃখিত হই, তবু চিত্তের গভীরতম অঞ্চলে এই খুশিটুকু জাগিয়া উঠে যে, দিন-দুই ধরিয়া লোকের কাছে একটা গল্প করার মত বিষয় পাওয়া গেল। একথা স্বীকার করিতে লজ্জা পাই, যেমন লজ্জা পাই মনের বহু দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে। কিন্তু প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় বলিয়াই কথাটা মিথ্যা নহে।

দিলীপকে চালিয়াৎ বলিয়াই জানিতাম। চালিয়াৎ বলিয়া যে পরিষ্কার চিনিতে পারিয়াছিলাম, তাহার প্রধানতম কারণ আমরা সকলেই অল্পবিস্তর চালিয়াৎ ছিলাম। সেই চালিয়াৎ দিলীপের জীবনেই যখন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যেটা নিজের কাছে তখনও অপরিচিত, এবং কতকটা অবিশ্বাস্য, তখন একটা উত্তেজনার বিষয় পাইয়া খুশী হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে দিলীপকে যে উচ্চাসনে বসাইয়া ছিলাম, সেখান হইতে ভূপতিত হইতে তাহার এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগিল না।

এক দিন তিন-চার জন বন্ধুর সামনেই বলিলাম, "দাদু, এইবার সুবোধ ছেলের মত দাদার কথামত একটা বিয়ে ক'রে ফেল; অবশ্য দাদা যদি তোমার বিয়েটাকেই আপত্তিকর ব'লে ধরেন তাহলে বিপদ!"

সকলে হো হো করিয়া হাসিলাম। খুব উচ্চশ্রেণীর রসিকতা হইল বলিয়া নহে, দিলীপকে একটু আহত করার উত্তেজনা পাওয়া গেল বলিয়া। এ প্রবৃত্তি আমাদের দোষ নহে, বয়সের।

আশ্চর্য্য কথা, দিলীপ নিজেও হাসিল। সম্ভবতঃ অপ্রস্তুত ভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। কিন্তু দিলীপের হাসি দেখিয়া আমাদের হাসিটা থামিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দু বয়সে আমাদের মধ্যে সামান্য একটু বড়। সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কহিল, "কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? দিলীপ কিছু মনে করিস নে ভাই, ওটা একটা ইয়ে—"

অথচ সে-ই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী হাসিয়াছিল।

ইহার পরে কিছু দিন দিলীপের সঙ্গে দেখা হয় নাই। চাকরির চেষ্টা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। এক দিন জ্ঞানেন্দু বাড়ী আসিয়া খবর দিয়া গেল, ব্যাপার যতটা সহজে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহা মোটেই হয় নাই, কারণ দিন-চারেক আগেই দিলীপের সহিত তাহার দাদার তুমুল কলহ হইয়া গিয়াছে এবং বউদি দেবরের পক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন।

বলিলাম, "ঝগড়াটা যে মৃণালকে নিয়েই, তা কি ক'রে জানলে?"

"মৃণালকে নিয়েই। মৃণাল ওদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। ছাদের উপরে সন্ধ্যের সময়ে দু-জনে গল্প করছিল, বউদি ছিলেন নীচে। দাদা কোর্ট থেকে ফিরতেই লঙ্কাকাণ্ড।"

ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বলিলাম, "লঙ্কাকাণ্ডটা কি মৃণালের সামনেই হ'ল, না সেটুকু জ্ঞান তখনও ছিল?"

"দিলীপের ছিল, দাদার ছিল না। বউদি বুদ্ধি ক'রে তাড়াতাড়ি মৃণালকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন, সে নাকি পাশের ঘরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল।"

মৃণালের কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল, রাগও হইল। বাঙালী হিন্দুঘরের মেয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কি না করিলেই নয়! এটুকু অবমাননা বোধ হয় তাহার প্রাপ্যই ছিল।

তখন মোটামুটি সকলেই ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছি। দিলীপের অবস্থা যতই গুরুতর হোক, তাহার দু-বেলা

দু-মুঠা ভাতের ভাবনা নাই, আমাদের সে ভাবনাও কিছু পরিমাণে ছিল। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ানোর চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, যে দুটিকে পা বলিয়া মনে করিতাম, তাহারা শরীরের শোভাবর্দ্ধন করে মাত্র, সোজা হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই বলিলেই হয়।

পারস্য-উপসাগরের একটি ছোট দ্বীপের মধ্যে তেলের খনি। সহসা খবর পাইলাম, সেখানে শুদ্ধ ইংরেজীতে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিয়া দিলেই নাকি অবিলম্বে তিন-শত টাকা বেতনের চাকুরী হয় এবং তিন বছর চাকরি করিলেই দশ হাজার টাকার একটি নোটের তাড়া হাতে বোম্বাইয়ে অবতরণ করা যায়।

নানা প্রকার উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাও মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী রোজগার করিতে পারিতেছিলাম না। মনটা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। তিন বছর পরে দেশে ফিরিয়া কি করিব, তাহারও একটা হিসাব মনে মনে হইয়া গেল।

কিন্তু দেখা গেল দরখাস্ত করার নামেই সকলের আপত্তি। এখনও সাতাশ বৎসর বয়স হয় নাই, এই শিশুকালেই একটা গোটা দেশ, একটা মাঝারিগোছের সমুদ্র, এবং একটা উপসাগর পার হইয়া দূর দেশে যাওয়ার মত সময় আমার হয় নাই।

আমার অদৃষ্টে যাহাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল না, দেখিলাম তাঁহাদেরও বিশ্বাস আমি দরখাস্ত করিলেই চাকরি পাইব। বুঝাইলাম, দরখাস্ত শব্দভেদী বাণ নহে, একখানা কাগজ টাইপ করিয়া ডাকে ফেলিয়া দিতে দোষ কি?

এই সহজ সত্যটি তাঁহারা বুঝিলেন না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, এবং সম্ভবতঃ নিজের অদৃষ্টের উপর অনাস্থা-বশতই দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

এক দিন কথায় কথায় কথাটা দিলীপকে বলিয়াছিলাম। খুব বেশী উৎসাহ দেখায় নাই। দেশের মাটির 'পরে তাহার টান কিঞ্চিৎ উগ্র, শুধু অর্থোপার্জ্জনের খাতিরে বিদেশগমন সে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করে।

যেন সকলেরই পিতৃসঞ্চিত বিপুল অর্থ ব্যাঙ্কের খাতায় আটক হইয়া রহিয়াছে! যেন দেশের ভিজা মাটির সুমিষ্ট গন্ধ গ্রহণ করিয়া দুই বেলা পল্লী-অঞ্চলে কাক ও চড়ুই পাখীর ডাক, এবং কলিকাতায় ট্রাম ও বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনিলেই পেট ভরিয়া যাইবে!

নানা অপ্রয়োজনীয় কথার মত পারস্য-উপসাগরের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খবরের কাগজ স্পেন, চীন ও মধ্য-ইউরোপের দুর্য্যোগের কথাতেই বোঝাই, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত ইরানের কথা মনে ছিল না।

মনে এক দিন দিলীপই করাইয়া দিল। সন্ধ্যার দিকে এক বার বেড়াইতে বাহির হইব ভাবিতেছি, ঘরে আসিয়া প্রথমেই বলিল, "বাহ্‌রিন্ আইল্যাণ্ডের ঠিকানা দে।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "কি হবে?"

"দরকার আছে।"

"কার? তোমার নয় নিশ্চয়ই!"

সে আমাকে আরও বিস্মিত করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমারই দরকার।"

বলিলাম, "তোমার দেশের মাটির কি হ'ল?"

সে অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "দেশের মাটিতে মনের পেট ভরে, কিন্তু ডালভাতের চিন্তা যায় না।"

এই কথাকয়টি এক দিন আমিই তাহাকে বলিয়াছিলাম। মতপরিবর্ত্তনটা একটু দ্রুত বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, "দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? না বউদির সঙ্গে? না মৃণালের—"

আমি কথা শেষ না করিতেই সে চটিয়া উঠিল। তাহার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, রহস্য অকালে এবং অপাত্রে বর্ষিত হইতেছে। বলিলাম, "ঠিকানাটা ত ঠিক মনে নেই, তবে আছে বোধ হয়, খুঁজে দেখি।"

কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলাম আমার অযত্নরক্ষিত ঘরের টেবিলে স্তূপাকার কাগজপত্র ও বইখাতার বোঝার মধ্যে একটি দুই বর্গইঞ্চি পরিমাণ কাগজ খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। অনেক ক্ষণ ঘাঁটিয়া সাত-আট বছরের পুরানো একখানি চিঠি পাইলাম, কলেজে পড়ার সময়ের একখানা গ্রাফখাতা পাইলাম এবং আরও অনেক কিছুই পাইলাম, যাহাদের আমার টেবিলে অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না এবং তাহাদের একটি জিনিষও দরকারী নহে।

শুধু পাওয়া গেল না একখানি দুই বর্গইঞ্চি পরিমাণ

নীল রঙের কাগজ, যাহার উপর আজ সম্ভবতঃ একটা তুমুল ব্যাপার নির্ভর করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক খুঁজিয়া বলিলাম, "নাঃ, কোথাও নেই।"

সে বলিল, "নেই বললে হবে না, আমার চাই, কয়েক দিনের মধ্যেই।"

বলিলাম, "আচ্ছা ভূপেনকে জিজ্ঞেস ক'রে নেব এখন।"

সে আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু এইখানেই একটু বাধা ছিল। খবরটা ভূপেনের মারফতই পাইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি সামান্য কারণে ভূপেনের সহিত মনোমালিন্য চলিতেছে, পারতপক্ষে তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলি।

দুই-তিন দিন অন্তর দিলীপ তাড়া দেয়। বলি, "ঐ যাঃ, ভুলে গেছি! আচ্ছা কাল ঠিক—"

এমনি করিয়া দিন-পনর কাটিল। দেখা গেল, তাহার অধ্যবসায় ও আমার বিস্মৃতিপরায়ণতা দুই-ই প্রায় সমান। তাহার পরে দিন-কয়েক তাহার দেখা পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, আমার বিস্মৃতিই জয়লাভ করিয়াছে।

এই সময়ে বহু স্থানে নিক্ষিপ্ত বহু দরখাস্তের মধ্যে একটি দরখাস্তের উত্তর আসিল, মধ্যপ্রদেশ হইতে।

দেশীয় করদ রাজ্য। তিন বার তিনখানি রেলগাড়ীতে চড়িয়া একটি অখ্যাত স্টেশনে পৌছাইয়া মোটরে মাইল-ত্রিশ দূরে পাহাড়ের ধারে কয়লার অনুসন্ধান চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিলে মাসিক এক শত টাকার বিনিময়ে অনুসন্ধানে যোগ দিতে পারি।

পারস্য-উপসাগরের নামে যাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা এবারেও নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। দেশীয় করদ রাজ্যে নাকি কারণে-অকারণে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দেয়, সেখানে দিনে দুপুরে বাড়ীর উঠান দিয়া বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেখানে মাছ মোটেই পাওয়া যায় না, শুধু মুরগীর উপরে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এবং তরকারির মধ্যে শুধু বড় বড় পেয়াজ, টকটকে লাল রঙের।

এত নিরুৎসাহবাণী অগ্রাহ্য করিয়া এক দিন বি. এন্. আর্-এর বম্বে-মেল ধরিলাম, এবং সাত মাস স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন ভোগ করিলাম। দেখিলাম, এক ফাঁসিকাঠে ঝুলানো ছাড়া বাকী মন্তব্যগুলি অনেক অংশেই সত্য। অসুবিধা অনেক ছিল, সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা সিনেমার অস্তিত্বহীনতা। তাই সাত মাস পরে কলিকাতায় আসিয়াই সিনেমা দেখিতে আসিয়াছি।

মিকি মাউস্, দেশ-বিদেশের খবর, এবং দুই-একটি ছোটখাট ছবি দেখানর পরে ইণ্টারভ্যালের সময় আসিল। জ্ঞানেন্দুকে বলিলাম, "কি বল্‌ছিলে? সায়ানাইড্ খাওয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তবে তার পরে—"

জ্ঞানেন্দু একদৃষ্টিতে মৃণালের দিকে তাকাইয়া ছিল। একটা টিপ দিয়া বলিলাম, "ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই, যে কথা বলছি তার উত্তর দাও!"

সে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কি কথা?"

পুনরাবৃত্তি করিলাম।

"ওঃ তাই! মানে, হ'ল কি, পরে বেচারা দেখল, সায়ানাইডে দুঃখ বাড়বে ছাড়া কমবে না, তার চেয়ে ত্রেতাযুগের মত মা-বসুমতী যদি দ্বিধা হ'তে পারতেন, তাহ'লে কাজ দিত।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তত বড় কোন লজ্জা-অপমানের ব্যাপার হয়েছিল নাকি?"

"হয় নি? দিলীপ বেচারা সেণ্টিমেণ্টাল হ'লেও চামড়া বোধ হয় একটু মোটা; আমি হ'লে চীনে ভলাণ্টিয়ার হয়ে চলে যেতাম।"

"ব্যাপারটা কি?"

জ্ঞানেন্দু হাসিল। কথা ঘুরাইয়া বলিল, "সুলেখার খবর কি?"

আমি লাল হইয়া বলিলাম, "বাজে কথা ব'কো না। যা বলছি তার উত্তর দাও, না হয় স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন দেখ।"

সে বলিল, "বাজে কথা কে বললে, মনে কর সুলেখা যদি—"

এমনি সময় ঘণ্টা বাজিল, আসল ছবি আরম্ভ হইল। জ্ঞানেন্দুর কথা এবারেও শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল না।

সিনেমা ভাঙিল রাত্রি সাড়ে আটটায়। দরজার কাছেই ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইতে পারিলাম। রাস্তায় নামিবার আগেই জ্ঞানেন্দু বলিল, "দাঁড়া।"

দাঁড়াইলাম। একটু পরে মৃণাল ও তাহার স্বামী আসিয়া যে গাড়ীখানিতে উঠিল, তাহার দাম সম্ভবতঃ আমার ছয় বৎসর বাহ্‌রিন্‌-বাসেরও দেড়গুণ।

গাড়ী চলিয়া গেলে জ্ঞানেন্দু বলিল, "বুঝলি কিছু?"

"হয়ত বুঝলাম।"

সে বলিল, "ইন্টারভ্যালের সময় যা বলছিলাম—"

কোথা হইতে কেমন করিয়া যে জ্ঞানেন্দু পুরানো কথার খেই খুঁজিয়া পায়, সে-ই জানে। বলিলাম, "কি আবার বলছিলে?"

"তোমার আপত্তি আছে? তাহ'লে মৃণালের কথাই বলি। দিলীপের দাদার অমতের কথাটা জান ত?"

"খুব জানি।"

"শেষ পর্য্যন্ত যে মত হয়েছিল, তা জান?"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কই, না! আমি ত জানি দাদারই বরাবর অমত!"

"বরাবর নয়, তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত। এর মধ্যে একটা হিষ্ট্রি আছে।"

"হিষ্ট্রি?"

"হ্যাঁ।"

বলিলাম, "চল হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীমুখো এগনো যাক, ততক্ষণ দিলীপ-রাজার ইতিহাস শোনা যাবে।"

"তাই শোন। তুমি চলে যাওয়ার দিন-কয়েক আগে থেকে দিলীপ তোমার কাছে খুব হাঁটাহাঁটি করছিল, না?"

সলজ্জে কহিলাম, "হ্যাঁ, সেই ইরানের চাকরির ঠিকানার জন্যে। আমি দিয়ে উঠতে পারি নি।"

"জানি। তারও কিছু দিন আগে মৃণালরা গিয়েছিল আগ্রা বেড়াতে। সেখানে একটি পরম সুপাত্রের খোঁজ পাওয়া গেল। যাকে খানিক আগে দেখলে।

"ছেলেটি বিলেত থেকে কাগজ তৈরি না কি শিখে এসেছে, আগ্রায় কল বসাবে। বাপের অঢেল টাকা, ছেলের গাড়ী দেখেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ।

"দেখা গেল ছেলেটি মৃণাল সম্বন্ধে একটু ইণ্টারেস্ট নিচ্ছে। মৃণালের মা-বাবা একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কারণ ছেলে দিলীপের মত অ্যাডোনিস না হ'লেও বেশ সুপুরুষ, বিলেত-ফেরৎ এবং ছেলের বাবা টাকার আণ্ডিল, যার কাছে দিলীপকে গরিব বলা চলে।

"কথাটা পাড়বেন-পাড়বেন করছেন এবং পাড়লেই সুফল ফলবে এমন আশাও পাওয়া গিয়েছে, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত। দিলীপের দাদার চিঠি, সকল দিক্ বিবেচনা ক'রে তিনি নাকি দেখলেন যে মৃণালের সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হ'লে অত্যন্ত সুখের কথা হবে, অতএব ওঁরা যেন তাজমহল দেখে ফিরে এসেই দিন ঠিক ক'রে ফেলেন।

"মৃণালের বাবা ভয়ানক বিবেকী লোক। তিনি ঠিক করলেন, মৃণালের মতটা নেওয়া দরকার। অবশ্য সে দিলীপকেই বিয়ে করতে চাইবে, তবু যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত বদলান যায়।

"মৃণালকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল এবং তিনি সলজ্জ হেসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে জানালেন যে আগ্রাওয়ালা ছেলেটিই—

"অর্থাৎ আগ্রাওয়ালার বহু টাকা আছে, যার দশ ভাগের এক ভাগও দিলীপের নেই। মেয়েরা অঙ্কটা বোঝে ভাল, বিশেষ ক'রে ভাল্‌গার ফ্র্যাক্‌শন।"

অনেক ক্ষণ কথা না কহিয়া চলিয়াছিলাম। খেয়াল হইল ভবানীপুরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বলিলাম, "তুমি এবার যাও, আমি ট্রাম নিই।"

সে বলিল, "পাগল নাকি, চল দিলীপের বাড়ী ঘুরে আসা যাক, কাছাকাছিই।"

"দিলীপ কি আজকাল কলকাতাতেই নাকি?"

"হ্যাঁ, চল, দেখা হ'লে খুশী হবে।"

আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "রাত ন-টা বেজে গেছে কোন্ কালে, এখন ভদ্রলোকের বাড়ী-

"দিলীপ আবার ভদ্রলোক হ'ল কবে থেকে? চল্, ভোগাস নে।"

বাধ্য হইয়া চলিলাম

বুঝিলাম, সায়ানাইড অপেক্ষাও তীব্রতর বস্তুর প্রয়োজন কেন হইয়াছিল। দেশের মাটির উপর টান সহসা কেমন করিয়া লুপ্ত হইল, পারস্য-উপসাগরে যাওয়ার হাস্যকর ব্যস্ততা কোথা হইতে আসিল, সব এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিলাম।

আমি দূর মধ্যপ্রদেশের উত্তপ্ত মাটির ভিতরে যে-অঙ্গারের সন্ধান করিতেছি, সে বিনা-আয়াসে, বিনা-চেষ্টায়, সেই অঙ্গার খুঁজিয়া পাইয়াছি। খুঁজিয়াছিল হীরক, মিলিল অঙ্গার। একই জিনিষ, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকের কাছে।

মৃণালকে দোষ দিব কি করিয়া, সে ত শত-লক্ষ সমধর্ম্মীর এক জন মাত্র! অগ্নিদাহ করে বলিয়া তাহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আগুন লইয়া খেলা করিলে হাত ত পুড়িবেই!

খানিকটা হাটিয়া দিলীপের বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। দিলীপ দেখিয়া নিঃসন্দেহ খুশী হইল, এবং এক পেয়ালা চা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

রাত সাড়ে নয়টা ঠিক চায়ের সময় না হইলেও রাজি হইলাম। খুশী হইলাম এই ভাবিয়া যে, দিলীপ একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে নাই। অবশ্য সাত-আট মাস সময় হয়ত তাহার মনের উপর অনেকটা কাজ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা-বউদি কোথায়?"

সে বলিল, "শ্যামবাজারে গেছেন, থিয়েটার দেখতে।"

"তুই একা বাড়ীতে?"

সে যেন সবিস্ময়ে বলিল, "একা? না একা কেন হবে, আর এক জন আছে। জান্‌তিস্ না?"

জ্ঞানেন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

একটু চমকিত হইলে খুশী হইয়া বলিলাম, "বউ দেখাবি না?

বউ দেখানর প্রয়োজন হইল না। চাকর চায়ের ট্রে হাতে ঢুকিল, পিছনে একটি সুন্দরী বধূ।

এবারে এক মুহূর্ত্তেই চিনিলাম, মৃণালেরই ছোট বোন মানসী।

প্রেম

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

বেদনার ধূপ জ্বালি' পূজিনু তোমারে
বেদনা ধরিল মোর সুরময় রূপ,
হৃদয়-সর্ব্বস্ব দিনু অর্ঘ্য-উপহারে
শূন্যবক্ষে বাজে বাঁশি অপূর্ব্ব অনুপ।
দুঃখের প্রদীপ লয়ে করিনু বরণ
দুঃখদীপ ঝলি উঠে চন্দ্রকরোজ্জ্বল,
অশ্রুর মালিকা গাঁথি করিনু অর্পণ
অশ্রু মোর ফিরে এল মুকুতা ধবল।

এই তো প্রেমের রীতি,—সুধা-বিষে ভরা,
এ জগতে আর কিবা আছে তার আগে?
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে তবু মধুক্ষরা
মনোহরা নাম তব জপি অনুরাগে।
এরই লাগি যুগে যুগে জনম-জাঙাল
ঘুরিবারে চাহি আমি প্রেমের কাঙাল।

নির্ম্মোক

"বনফুল"

প্রথম পরিচ্ছেদ

যেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম সেদিনকার কথাটা এখনও আমার আবছা-ভাবে মনে আছে। মনে হইয়াছিল কি অদ্ভুত কৃতিত্বই না অর্জ্জন করিলাম, একটা দুর্জ্জয় দুর্গ যেন জয় করিয়া ফেলিয়াছি! আমাদের কালে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, দুর্ভেদ্য দুর্গজয়ের মতই কঠিন ব্যাপার ছিল। যদিও মনে মনে জানিতাম যে এই দুর্গজয় ব্যাপারে আমার বীরত্ব অপেক্ষা আমার পিতৃবন্ধু কর্ণেল —এর পৃষ্ঠপোষকতাটাই সমধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল, তথাপি কিন্তু আনন্দটা কিছু কম হয় নাই। আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র—এ যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার! জাঁদরেল কর্ণেলের জোরালো সুপারিশ-সত্ত্বেও কিন্তু খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব বলিয়াছিলেন যে পত্রটি লইয়া আমি যেন স্বয়ং বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। বড়সাহেবই ভর্ত্তি করিবার মালিক। পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড়-সাহেবের আপিসের দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি পাগড়ি লাগানো বেশ কায়দা-দুরস্ত দারোয়ান, অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। সে বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এ সঙ্কোচটুকু হইত না, কিন্তু আমি পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভনীয় হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিলে হয়ত বে-আইনী কিছু হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না, বসিয়া রহিলাম। কত ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত বলা যায় না, এমন সময় হঠাৎ অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লোক, এক কালে আমাদের পরিবারের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—আরে, তুমি হঠাৎ এখানে যে?

উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনিও বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন ও বলিলেন—এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ী কাছেই।

—আমাকে যে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—সেই জন্যেই তো বলছি এস আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

ভাবিলাম হয়ত অনাদিবাবুর সঙ্গে আপিসের কাহারও আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপারিশ-পত্র দিবেন। তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—উঠেছ কোথায়?

—একটা হোটেলে।

হোটেলের নাম-ঠিকানা বলিলাম।

—আমাদের বাড়ী উঠলেই পারতে?

—আপনি যে এখানে আছেন তা জানতাম না।

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—তুমি এই বেশে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলে, মাথা খারাপ না কি তোমার! এই আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তালি-লাগান জুতো—মাই গড্!

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম।

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল, তা না হ'লে হয়েছিল আর কি—, এস এই গলিটার ভেতর—

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমেই বাড়ীতে ঢুকিয়া চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুমার্জ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার করিয়া সাজান। প্রতিটি জিনিষে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। টেবিলের উপরে কাগজ-চাপা দিবার ছোট প্রস্তরখণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোণের শেল্‌ফে চমৎকার করিয়া বাঁধান বইগুলি, তাকের উপর ছোট টাইমপিসটি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন। "যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয় তবু, তৈরি হচ্ছিল যখন—" মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেল দিকি আগে! ওই যে নাপিতও এসে গেছে! ওরে বাবুর চুলটা বেশ ভাল ক'রে কেটে দে দিকি, বেশ দশ-আনা ছ-আনা ক'রে! নাও, চা-টা খেয়ে নাও তুমি—

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম, সে আবহাওয়ায় দশ-আনা-ছ-আনা চুলকাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-আনা-ছ-আনা চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্য্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় সুতরাং একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে বিস্মিতও কম হই নাই। আমার মুখ-ভাবে অনাদিবাবু মনের কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধ হয়, বলিলেন—অমন নোংরা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যাণ্ট আছে?

—না।

—আচ্ছা, আমি সে-সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি! অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত—দেখি—

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবিতেছিলাম ঐ টেড়িকাটা টিনের-বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব কিনা এমন সময় অনাদিবাবু একটি পত্র হস্তে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এই দেখ তোমার বাবারও চিঠি এসেছে!

দেখিলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফস্বলের কলেজ হইতে পাস করিয়াছি, বড় শহর সম্বন্ধে আমার তেমন ধারণা নাই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন, কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না, এদিকে ভর্ত্তি হওয়ার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না, জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর মুখে অনাদিবাবুর খবর পাইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি ক'রো না—

উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক ফিট করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত তাহা আমাকে ঠিক ফিট করিবেই বা কেন, জামাটা একটু ঢিলা এবং প্যাণ্টালুনটা একটু আঁট হইল। অনাদিবাবু তাহাতে কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং 'টাই'টা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—বাঃ চমৎকার হয়েছে—ফেমাস্!

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া! অনাদিবাবুর

আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতাজোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

—ফস্ ফস্ করছে না কি ?

ঠিক উলটা—ভয়ানক আঁট হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন—ফিতেগুলো একটু আলগা ক'রে দাও, হাঁটতে যদি লাগে একটা গাড়ী করেই যাই না হয় চল, পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার, দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল!

সত্য সত্যই গাড়ী করিয়া যাইতে হইল। অত আঁট জুতা পায়ে দিয়া বেশী দূর হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি-দেওয়া জুতা পরিয়া যাওয়া আরও অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়ীই একটা ডাকিতে হইল।

আপিসে গিয়া শুনিলাম সাহেব টিফিন খাইতেছেন, আধ ঘণ্টা পরে দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই একটা টাকা বকশিশ দিলেন এবং সাহেবের সহিত দেখা হইয়া গেলে আর একটা টাকা দিবেন আশ্বাস দিলেন।

দেখা হইয়া গেল। বড়সাহেব তাঁহার বাল্যবন্ধু কর্ণেল —এর চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে আমি দরখাস্ত করিয়াছি কি না। বলিলাম—করিয়াছি।

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। হেড ক্লার্ক সসম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব হুকুম করিলেন যে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। হেড ক্লার্ক চকিতে একবার আমার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই এক বোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর। দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং সভয়ে লক্ষ্য করিলাম যে আমার কলেজের প্রিন্সিপাল (অর্থাৎ যে কলেজ হইতে আমি আই. এসসি. পাস করিয়াছি তিনি) আমার দরখাস্তের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। নিয়ম অনুসারে প্রিন্সিপালের থ্রু দিয়াই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। বাইবেল ক্লাসে কামাই করিতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন, ভয় হইতে লাগিল তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া থাকেন! সে ভয় শীঘ্রই কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে প্রিন্সিপাল আমার খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রী প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিলটা লইয়া আমার দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—সিলেক্‌টেড্। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সহিত হেড ক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বড়সাহেবের বাল্যবন্ধু কর্ণেল —আমার পৃষ্ঠপোষক সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে আমি ভর্ত্তি হইয়া গেলাম।

দীর্ঘ ছয় বৎসরে অনেক কিছুই শিখিলাম।

অ্যামিবা হইতে সুরু করিয়া কেঁচো, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ, মাছ, খরগোস, গিনিপিগ এবং সর্ব্বশেষে মানুষ—মৃত এবং জীবন্ত মানুষ চিরিয়া জীবজগতের নানা বৈচিত্র্যের আভাস পাইলাম। সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর দেহে নানা প্রকার ঔষধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ব্যাধির নানা মূর্ত্তি, প্রসব করানো, অস্ত্র-চিকিৎসা, জীবাণু-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জুরিসপ্রুডেন্স শিখিবার আর বাকি কিছু রহিল না। সৎ এবং অসৎ উপায়ে পরীক্ষার গাঁটগুলিও একে একে পার হইলাম। অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম বই কি! সে কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ডিগ্রিলাভই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে নিখুঁত নীতি-পথে চলিলে সব সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোলটা টানিয়া রাখ—ইহাই ছিল সকলের সত্য মনোভাব। সুনীতির একটা মুখোস অবশ্যই ছিল, কিন্তু আজ একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে তাহা মুখোসই ছিল, আর কিছু ছিল না।

বিগত ছাত্রজীবনের কথা ভাবিতে গিয়া কয়েকটি

ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনেক ছবি মুছিয়া গিয়াছে, এই কয়টি কিন্তু এখনও বেশ উজ্জ্বল হইয়া আছে, হয়ত মনে বিশেষ ভাবে দাগ কাটিয়াছিল বলিয়া এখনও অবলুপ্ত হয় নাই।

নগেন বলিয়া একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। আমরা সংক্ষেপে তাহাকে 'নগা' বলিতাম। ছোটখাট মানুষটি, গলার স্বর কিন্তু ছিল বাজর্খাই। শুনিতাম সে গাঁজা খায়। ইহাই অবশ্য তাহার পূর্ণ পরিচয় নয়, সে রেস খেলিত এবং আরও অনেক কিছু করিত। সুতরাং পড়িবার সময় পাইত না। এক দিন আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দুই জন কাবুলিওয়ালা মেসে আসিয়া তাহার বাক্স-পেঁটরা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। নগেনের পক্ষ লইয়া আমরা কাবুলিওয়ালাদ্বয়কে হাঁকাইয়া দিবার জন্য দল বাঁধিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলাম। নগেন কিন্তু আমাদের নিবৃত্ত করিল। সে হাসিয়া বলিল যে, সুদে আসলে ধারের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে বাক্স-পেঁটরা বেচিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশও বেচারারা উশুল করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কাবুলিওয়ালা বাক্স-পেঁটরা লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় নগাও কোথায় অদৃশ্য হইল। শুনিলাম সে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন নগেনের দেখা নাই। তাহার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় দর্শন দিলেন। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছি, সার্জিক্যাল আউট-ডোরে আমাদের ডিউটি। হঠাৎ নজরে পড়িল, আউট-ডোরের বারান্দার এক ধারে দাঁড়াইয়া নগা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বলা বহুল্য, বিস্মিত হইলাম!

—কি রে নগা যে, এত দিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে?

বাজর্খাই কণ্ঠকে যতটা মৃদু করা সম্ভব ততটা মৃদু করিয়া নগা বলিল—ভাই বগলে একটা মাছের কাঁটা ফুটেছে বার ক'রে দে, বড় কষ্ট হচ্ছে।

—বগলে মাছের কাঁটা ফুটল কি ক'রে? সাধারণতঃ লোকের গলাতেই মাছের কাঁটা ফুটে থাকে।

—আমি যে আবার পরীক্ষা দিচ্ছি, জানিস না? আজ জুলজি প্র্যাকটিক্যাল ছিল।

নগা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তবু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বগলে কাঁটা ফুটল কি ক'রে!

—আচ্ছা বোকা ত তুই দেখছি! কাল সন্ধ্যের সময় ডোমটাকে আনা-আটেক বকশিশ দিয়ে জেনে গেলাম যে আজ কি পড়বে। ওই ব্যাটারাই তো সব জোগাড় করে। ব্যাটা আমাকে বললে আজ ভেটকি মাছ পড়বে। আমি বাজার থেকে একটা ছোট ভেটকি কিনে আমাদের মেসের হরিচরণকে দিয়ে সেটা ডিসেকৃট্ করিয়ে কামিজের তলায় বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেলাম। ভেটকি যদি দেয় ওই ডিসেকৃট্ করা মাছটা তাক-মাফিক বের করব। কিন্তু ভাই গিয়ে দেখি মাছ নয়, ব্যাঙ! কি করি সেই ডিসেকটেড ভেটকি বগলে ক'রে খানিকক্ষণ ঠায় ব'সে। তার পর আস্তে আস্তে সেটা পাচার ক'রে ব্যাঙটাই চিরলাম। কি হয়েছে ভগবানই জানেন। ডোমটার আক্কেল দেখ দিকি! কি করবে বেচারা, ওর দোষ নেই, ওই যে নতুন একজামিনারটা হয়েছে ও-ই লাস্ট মোমেণ্টে ভেটকির বদলে ব্যাঙ দিতে বললে। ডোম ব্যাটা তো তাই বলছে। তুই এখন কাঁটাটা বের কর দিকি—

কাঁটা বাহির করিয়া দিলাম, নগা চলিয়া গেল।

নগার কথা শুনিয়া আপনারা যেন মনে করিবেন না যে সব ছেলেই নগার মত। ভাল ছেলে ঢের ছিল, কিন্তু নগাও ছিল। সত্যিকার ভাল ছেলে ছিল, আবার নকল ভাল ছেলেও ছিল। অধ্যয়ন করিয়া এক দল ছেলে ভাল হয়, পরীক্ষকের মনোরঞ্জন করিয়া আর এক দল ছেলে ভাল হয়। পরীক্ষকদের 'হুইম্' ও 'হবি'র খবর রাখা আমাদের ছাত্র-জীবনের মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্য ছিল, এবং ভাল-মন্দ সকল ছেলেরই লক্ষ্য ছিল ডিগ্রী—বিদ্যা নয়।

আমাদের সময় এক জন সিনিয়ার হাউস-সার্জন ছিলেন। প্রাচীন লোক, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সদয় ব্যবহার। অমন আর দেখা যায় না। আমাদের কিসে ভাল হইবে ভদ্র-লোক অহরহ সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষ

ঢের বয়স কম ছোকরা এক আই. এম. এস. অফিসার হঠাৎ তাঁহার মনিব হইয়া আসিলেন। মিলিটারি সার্ভিসের লোক, মেজাজও মিলিটারি। কারণে-অকারণে সে মেজাজ দেখাইতেও তিনি কার্পণ্য করিতেন না। প্রাচীন হাউস-সার্জনটিকে এক দিন অকারণে সকলের সামনে তিনি অপমান করিয়া বসিলেন। আমি আজও তাঁহার সেই আর্ত্ত অপমানিত অসহায় মুখচ্ছবি ভুলিতে পারি নাই। তাঁহাকে একা পাইয়া বলিয়াছিলাম—সব্ চাকরি ছেড়ে দিন আপনি।

—তিন ফিগারের চাকরি ভাই, ছাড়া কি সহজ!

একটু হাসিলেন। হৃদয়বিদারক সেই হাসিটুকু আজও মনে আছে।

আর একটা ছবিও মনে পড়িতেছে। তখন ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে আমাদের ডিউটি। আমাদের কাজ ছিল আউটডোরে যে-সব রোগিণী আসে তাহাদের ব্যাধির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট কি, কত দিন হইতে ভুগিতেছে এই সকল বিবরণ জানিয়া এবং সম্ভবপর হইলে আন্দাজি একটা রোগ নির্ণয় করিয়া আমরা আউটডোর-টিকিট লিখিয়া রাখিতাম। অধ্যাপক মহাশয় আসিলে তিনি প্রত্যেক টিকিটখানি লইয়া রোগিণীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া এবং টিকিট-লেখক ছাত্রটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া রোগ ও রোগিণীর সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন। এক দিন এই ইডেন আউটডোরে আমার চতুর্থ রোগিণীটিকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার কি হয়েছে?

—জানি না।

—কোন কষ্ট নেই আপনার?

—না।

—এখানে এসেছেন কেন তাহ'লে?

—আমি আসি নি, উনি নিয়ে এসেছেন।

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, পেটে একটা কি যেন হয়েছে তাই দেখাতে এনেছি।

আউটডোর-টিকিটে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। একটু পরে আমাদের অধ্যাপক আসিয়া পড়িলেন এবং যথানিয়মে একের পর এক রোগিণীদের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এই রোগিণীটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তিনি সন্তানসম্ভবা। ইহার লক্ষণাদি লইয়া অধ্যাপক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলেন। তাহার পর আবার নূতন একটা রোগিণী আসিল, তাহার পর আবার একটা। বারোটা পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল, রোজ যেমন চলে।

আউটডোর শেষ করিয়া বাহির হইয়াছি হঠাৎ নজরে পড়িল সেই মেয়েটি গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। চারি দিকে চাহিয়া সেই ভদ্রলোকটির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অনেক ক্ষণ আগেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। এত ক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এইবার লক্ষ্য করিলাম মেয়েটির মাথায় সিঁদুর নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হিন্দু ঘরের বিধবা।

—এখানে কোন্ ঠিকানায় আপনি থাকেন?

মেয়েটি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—হ্যারিসন রোডের ওধারে কোথায় যেন—

—নম্বর জানেন?

—না।

একটা ক্লাস ছিল, সুতরাং বেশী ক্ষণ দাঁড়াইবার অবসর ছিল না। তাহাকে বলিলাম—আপনি এইখানে ব'সে থাকুন, আমি আসছি একটু পরেই আবার।

—আচ্ছা।

ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটিকে কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। তাহার বড় বড় সজল চোখ দুইটি কিন্তু মনের ভিতর আঁকা আছে।

আর একটা ছবিও আঁকা আছে।

ইমারজেন্সি-রুমে ডিউটি সেদিন। গভীর রাত্রি, টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেদিন যিনি ও. ডি. অর্থাৎ অফিসার-অন-ডিউটি ছিলেন, তিনি বসিয়া ছিলেন না, শুইয়া ছিলেন। বর্ষার রাত্রি, একটু মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। আমাদের বলিয়াছিলেন যে, খুব জরুরি কাজ না আসিলে

যেন তাঁহাকে না ওঠানো হয়। আমি এবং আর এক জন ছাত্র জাগিয়া বসিয়াছিলাম। সেই সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছি, ক্রমাগত সিগারেট খাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে দুই জন পুলিস একটি আহত গুণ্ডাকে লইয়া ইমারজেন্সি-রুমে প্রবেশ করিল। গুণ্ডার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। বাম চোখের ভ্রূর উপর হইতে সুরু করিয়া প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা, রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। ও. ডি. মহাশয়কে উঠাইতেই হইল—পুলিস-কেস। আমরা দুই জনে মিলিয়াই কিন্তু চিকিৎসাটা করিলাম, তিনি অবশ্য বলিয়া দিলেন। প্রচুর আইওডিন দিয়া প্যাট প্যাট করিয়া সেলাই করিয়া দিলাম। লোকটা ঠায় বসিয়া রহিল—হুঁ হাঁ কিছুই করিল না। রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া ও. ডি. মহাশয় আবার শুইতে গেলেন। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

—মারামারি করতে গেছলে কেন?

সে পরিষ্কার উর্দ্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা এই যে, প্রাণ থাকিতে সে তাহার স্ত্রীর অপমান সহ্য করিবে কি করিয়া! সূচ্যগ্র-দাড়ি, বলিষ্ঠ, দীপ্তচক্ষু সেই গুণ্ডার মুখখানা এখনও ভুলি নাই। তাহার উক্তি সত্য কি মিথ্যা, আচরণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে-সব বিচার করিবার অবসর ছিল না। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা উন্নতমস্তক গুণ্ডাটার মুখে সেদিন রাত্রে যে দুর্লভ মহিমা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের ওয়ার্ডে বুড়া-গোছের একটি রোগী আসিয়া এক দিন ভর্ত্তি হইল। তাহার লিভারের কাছটায় উঁচু, চক্ষু দুইটি হলুদ। সকলে ভাবিলাম, লোকটার নিশ্চয়ই কোনকালে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই এই দুর্গতি। বুড়া তারস্বরে অস্বীকার করিতে লাগিল তাহার ওসব কিছুই কোনকালে হয় নাই। আমরা কেহই সে-কথা বিশ্বাস করিলাম না; তাহার রক্ত পরীক্ষা করানো হইল। রক্তেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। তখনও কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হইল না, রক্তদুষ্টির চিকিৎসাই কিছু দিন ধরিয়া চলিল। অনেক দিন চিকিৎসার পর যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন মনে হইল লিভারে বোধ হয় ক্যানসার হইয়াছে। অবশেষে কিছু দিন পরে বুড়ার মৃত্যু হইল। তাহার তিন কুলে কেহ ছিল না, তাহাকে পোস্টমর্টেম করিবার সুযোগ আমরা পাইলাম। পেট চিরিয়া দেখা গেল লিভার ঠিক আছে, লিভারের ঠিক নীচেই একটা টিউমার হইয়াছে। চিকিৎসার দোষে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা নয়, সে মরিতই, পেটের ভিতর সারকোমা হইলে কেহ বাঁচে না।

কিন্তু আমাদের কত ভুল হয়!

আর মনে পড়িতেছে সেই মড়াগুলির কথা।

সেই মড়াগুলি, যাহারা স্বেচ্ছায় নয় অসহায় বলিয়া আমাদের ছুরির তলায় আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের চিরিয়া চিরিয়া আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, যাহারা ডাক্তারিবিদ্যারূপ মহাবজ্রনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াও দধীচির গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, যাহাদের সংসর্গে আমাদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়াছে অথচ যাহাদের আমরা চিনি নাই, সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত বিকৃত বীভৎস মড়াগুলির কথা এখনও ভুলি নাই। সেই প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে—সেই যেদিন অ্যানাটমি হলে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল সামনের টেবিলটার উপর রহিয়াছে মড়া নয়, একখানা কাটা হাত।

ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায় এম. বি বসিয়া বসিয়া আত্মজীবনচরিত লিখিতেছিল। ডাক্তারের পক্ষে কাজটা অদ্ভুতই। ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী লেখার কোন সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। বিমলের নিজের কাছে কিন্তু ইহার একটা সঙ্গত ওজুহাত ছিল। সময় কাটানো চাই ত! হাসপাতালে ছয় মাস হাউস-সার্জ্জনি করার পর হইতে সে একরূপ বেকার অবস্থাতেই বাড়ীতে চুপচাপ বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে একটা বৎসর কাটিয়া গেল, সুবিধামত কিছুই জুটিতেছে না। পিতামাতা মারা গিয়াছেন, বোনগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নাবালক ভাই নাই তথাপি কিন্তু

বিমল নির্ঝঞ্ঝাট নয়। পিতা তাহার স্কন্ধে কিছু ঋণ এবং একটি বধূ চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বধূ মণিমালা আপাতত বাপের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে বটে এবং এম. বি. ডাক্তারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও হয়ত নিজের এম. বি. স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে কিঞ্চিৎ মোহ পোষণ করিতেছে, কিন্তু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে এ মোহ কত দিন টিকিবে! কেবল মাত্র ডিগ্রিটা আস্ফালন করিয়া বেশী দিন তাহাকে মুগ্ধ রাখা যাইবে না। কিন্তু উপায় ত তেমন কিছু—

বিমল পুনরায় ঝুঁকিয়া আত্মজীবনচরিত সুরু করিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাজির হইল এবং একটি খামের চিঠি দিয়া গেল। বিমল উল্টাইয়া দেখিল, মণির চিঠি নয়—অত্যন্ত অপরিচিত হস্তাক্ষরে এ কাহার চিঠি! চিঠিখানা পড়িয়া কিন্তু তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লাগিয়া গিয়াছে তাহা হইলে! মাহিনা মাত্র পচাত্তর টাকা—তা হোক! ফ্রি কোয়ার্টার্স আছে, হাতে একটা হাসপাতাল আছে। আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটা মুড়িয়া রাখিয়া সে উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আধ ঘণ্টা লেট ছিল। পৌঁছিবার কথা সাড়ে ন-টায় দশটা বাজিয়া গেল। উদ্‌গ্রীব বিমল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিল, স্টেশনের চেহারাটা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইল না। অতি ছোট স্টেশন, এখানে ওখানে দুই-তিনটা কেরোসিনের আলো টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে, জাঁকজমক দূরের কথা একটা উঁচু প্লাটফর্ম পর্য্যন্ত নাই। বিমল মনে মনে দমিয়া গেল। কুলির সাহায্যে নিজের স্যুটকেস, বিছানা এবং মাইক্রস্‌কোপের বাক্সটা লইয়া সে নামিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল যদি সেক্রেটারি মহাশয় কোন লোক পাঠাইয়া থাকেন। নজরে পড়িল ওদিকের একটা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখে ভয়ানক ভিড়, একটা কলরব উঠিয়াছে। এমনই গাড়ীতে যথেষ্ট ভিড়, ইহার উপর আবার এতগুলি লোক চড়িবে! বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

—কোথা যাবেন বাবু আপনি,—কুলিটা প্রশ্ন করিল।

—হাসপাতালটা কত দূরে, জানিস? মিউনিসিপাল হাসপাতাল?

—কাছেই।

থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল।

—ওখানে কি হ'ল?

—কি জানি বাবু।

একটি লোক ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, প্রশ্নটা শুনিয়া বলিল—ও কিছু নয়, একটা বুড়ী পড়ে গেছে, এমন সব হুড়মুড়িয়ে উঠতে যায়!

গার্ডসায়েব হুইসল দিয়া নীল বাতি নাড়িতে লাগিলেন। স্টেশন-মাস্টার ভিড়ের কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—এই উঠে পড় সব, উঠে পড় সব, ট্রেন ছাড়ছে!

যে যেমন পারিল উঠিয়া পড়িল, বিমল একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল আহত বুড়ীটা তালগোল পাকাইয়া একটা পুঁটুলির মত স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া আছে। ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। বিমলের কৌতূহল হইল, একটু আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া সে বুড়িটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

—আরে মোলো এ মাগী এখানে পড়ে রইল যে।

একচক্ষু লণ্ঠনহস্তে বিব্রত স্টেশনমাস্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিমল বলিল—ওর লেগেছে। আপনার আলোটা দিন তো একটু দেখি—

দেখা গেল বুড়ীর আঘাত সত্যই গুরুতর; তাহার শতছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে বিমল একটু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিল, রক্তপাতের ফলে বেশ দ্রুত হইয়াছে। স্টেশনমাস্টার চীৎকার করিতে লাগিলেন—ভাগিয়া ভাগিয়া, এ ব্যাটা আবার কোথা গেল—চন্দু চন্দু—স্ট্রেচার নিকালকে এই বুড়িয়া কো হাসপাতাল মে লে যাও! যত ফ্যাসাদ জুটবে মশাই আমারই ডিউটির সময়! কাল হ'ল কি—

বিমল বলিল—কোন্ হাসপাতালে পাঠাবেন?

—আমাদের রেলওয়ে হাসপাতালে, গুপ্তবাবুর কাছে, আর কোথা—

—কতদূর এখান থেকে?

—তা বেশ দূর আছে, মাইল-দুই হবে—

বিমল হাসিয়া বলিল—এখুনি কিন্তু এর ব্যবস্থা করা দরকার। মিউনিসিপাল হাসপাতাল কত দূর?

—সে তো কাছেই—ঐ তো দেখা যাচ্ছে! কিন্তু ও হাসপাতালের বিলিব্যবস্থাই আজব রকম। ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকে না, ওষুধ থাকে তো ডাক্তার থাকে না! এক পাগলা ডাক্তার আছে—তারও শুনছি চাকরি গেছে—এই চন্দু—চন্দু—

—আমিই মিউনিসিপাল হাসপাতালের নতুন ডাক্তার, এই ট্রেনে এলাম—

—ও তাই নাকি—তা বেশ বেশ—পরেশ বাবুর কাছে শুনছিলাম বটে—বেশ বেশ! চন্দু—এই চন্দু—

—চন্দু দুধ দুইতে গেছে। ঘরের ভিতর হইতে কে যেন বলিল

—ও তাই নাকি,—ভাগিয়াটা গেল কোথা—

একটু ইতস্তত করিয়া স্টেশনমাস্টার মহাশয় বলিলেন—আপনার কাছেই পাঠিয়ে দি তাহলে বুড়ীটাকে—ভালই হ'ল!

—আমি এখনও হাসপাতালে পা-ই দিই নি, আচ্ছা বেশ দিন!

—আমি তাহ'লে এগিয়ে যাই, হাসপাতালটা কোন্ দিকে বলুন তো?

—আমি জানি বাবু, চলুন,—কাছেই।

যে-কুলিটা বিমলের জিনিষপত্র নামাইয়াছিল, সে-ই বলিল।

—পাঠিয়ে দিন তাহ'লে, আমি চললাম—নমস্কার! বেশী দেরি করবেন না যেন, বুড়ির অবস্থা সুবিধের নয়।

—এখুনি দিচ্ছি, আপনি এগোন।

কুলির পিছনে পিছনে বিমল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা পার হইয়া কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় একটা টর্চের তীব্র আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল

—আরে, বিমল যে এসে পড়েছ দেখছি—বাঃ!

—পরেশ-দা! আপনি কোথা থেকে?

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—আমি আজকাল এখানেই পোস্টমাস্টার—সম্প্রতি এসেছি। বদিবাবু সেদিন যখন বললেন যে এবার যে নতুন ডাক্তার আসছে তার নাম বিমল চাটুজ্যে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে এ আর কেউ নয় আমাদের সেই বিমল—ওরে উদিকে কোথা যাচ্ছিস্?

কুলি বলিল—বাবু বললেন যে হাসপাতালে যেতে।

বিমল বলিল—আমার কোয়ার্টার্সটা কোন্ দিকে বলুন তো?

চলিতে চলিতে পরেশ-দা বলিতে লাগিলেন—তোমার কোয়ার্টার্স এখন খালি নেই, আগেকার ডাক্তারবাবু এখনও আছেন, চার্জ দিয়ে তবে ছাড়বেন। তুমি ক-দিন আমার বাসাতেই থাকবে আপাতত, বদিবাবু তাই বলেছিলেন আমাকে। আমারই উপর ভার ছিল তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করবার। আমার ক্যাশ মেলাতে মেলাতে দেরি হয়ে গেল, ঠিক সময়ে আসতে পারলাম না। একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—ক্যাশও মিলনো না—অথচ—যাক তুমি ঘরের লোক তোমার কাছে নো ফরম্যালিটি—

পরেশ-দা স্মিতমুখে বিমলের পানে চাহিলেন।

বিমল বলিল—আমাকে কিন্তু হাসপাতালে এক বার যেতে হবে।

—এত রাত্রে কেন?

—একটা রুগী জুটেছে স্টেশনে।

—তাই নাকি!

পরেশ-দা কুলিটাকে বলিলেন—আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি, তুই জিনিষগুলো আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আয়—

—আচ্ছা বাবু। কুলি চলিয়া গেল। পরেশ-দা তখন বিমলকে বলিলেন—চল এইবার তোমার হাসপাতালে যাওয়া যাক। কি রুগী?

—একটা বুড়ী স্টেশনে পড়ে গেছে তাকেই নিয়ে আসবে।

—ও।

ক্ষণকাল থামিয়া পরেশ-দা বলিলেন—গুপিবাবু আছেন কি না সন্দেহ, চল দেখা যাক্

—গুপিবাবু কে?

—কম্পাউণ্ডার।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডেই তাঁর কোয়ার্টার্স, কিন্তু তিনি প্রায় এ সময়টা থাকেন না, পাশা খেলতে যান চৌধুরীদের বৈঠকখানায়।

কথাটা বিমলের ভাল লাগিল না। পাশা খেলিতে যান! জিজ্ঞাসা করিল—হাসপাতালে ইনডোর রুগী তো থাকে।

—কুড়িটা বেড আছে বটে, তবে থাকে না বিশেষ কেউ। হয়ত দুই-এক জন আছে, ঠিক জানি না আমি—এই এসে পড়েছি এবার—এই তোমার হাসপাতাল—

বিমল অন্ধকারের আবছা ভাবে যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতেই তাহার বেশ ভাল লাগিল—নিতান্ত ছোট তো নয়। চতুর্দ্দিকে কিন্তু অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়া নাই।

পরেশ-দা হাঁকিতে লাগিলেন—জান্‌কী, জান্‌কী—

গেটের পাশের ঘরটা হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। পরেশ-দা বলিলেন—এই হচ্ছে হাসপাতালের মেথর। তাহার পর জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইনি হচ্ছেন নূতন ডাক্তারবাবু।

জান্‌কী ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

পরেশ-দা প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর কোথা, ভৈরব কোথা?

ঠাকুর হাসপাতালের পাচক এবং ভৈরব চাকর। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে লাগিল পরেশ-দা অনেক খবর রাখেন তো হাসপাতালের! জানকী বলিল, তাহারা বাহিরে গিয়াছে।

—গুপিবাবু?

নিকটেই গুপিবাবুর বাসা, জান্‌কী খোঁজ লইয়া আসিল গুপিবাবু এখনও ফেরেন নাই।

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—বললাম তিনি চৌধুরীর ওখানে আছেন। ওরে, তুই বসবার ঘরটা খুলে দিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বেলে দে, আর গুপিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, বলগে যা নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন ডাকছেন। এক কাজ কর, তোর রুক্‌মিকে না-হয় পাঠা কম্পাউণ্ডার-বাবুকে ডেকে আনুক, তুই ঘরটরগুলো খোল—

হাসপাতালের ভিতর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কে যেন কাতরাইতেছে।

বিমল প্রশ্ন করিল—ও কিসের শব্দ!

জান্‌কী বলিল—ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী আছে।

বিমল না ভাবিয়া পারিল না, ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী গোঙাইতেছে অথচ আলো নাই, কম্পাউণ্ডার নাই, চাকর-ঠাকুর কেহ নাই, এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা।

স্ট্রেচার-বাহিত হইয়া স্টেশনের রোগীটিও আসিয়া পড়িল বিমল জান্‌কীকে বলিল—একটা আলো চাই।

—রুক্‌মি, রুক্‌মি, বাত্‌তি লেআ—

মেথরের বউ রুক্‌মি শশব্যস্ত হইয়া একটা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইল এবং বিমলকে একবার আড়চোখে দেখিয়া বাতিটা হাসপাতালের বারান্দার উপর নামাইয়া রাখিল।

পরেশ-দা রুক্‌মিকে বলিলেন—তুই কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় চট ক'রে—বল্‌ নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কম্পাউণ্ডারবাবু সন্ধ্যার সময় কোথায় থাকেন তাহা সকলেই জানে, সুতরাং রুক্‌মি কোন প্রশ্ন করিল না, চৌধুরী-বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল। যে-বাতিটা রুক্‌মি রাখিয়া গেল সেটা হাসপাতালেরই বাতি, ঐ কালাজ্বর রোগীটার কাছেই থাকিবার কথা, কিন্তু রুক্‌মিরাই ওটা রোজ ব্যবহার করে। রুক্‌মির রান্না তখনও সমাপ্ত হয় নাই, অসময়ে এই সব উপদ্রব তাহার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু নূতন ডাক্তারবাবু কি রকম মেজাজের লোক তাহা তো ঠিক জানা নাই। লক্ষ্য করিলে বিমল রুক্‌মির মুখের অপ্রসন্নতাটুকু দেখিতে পাইত। একটা জিনিষ কিন্তু বিমল লক্ষ্য করিল—জান্‌কীটি বেশ কাজের লোক, ইংরেজীতে যাহাকে বলে এক্‌সপার্ট। সে অল্প সময়ের মধ্যে কপাট খুলিল, আর একটা আলো জ্বালিল। স্টেশন হইতে আগত বুড়ীটাকে টেবিলের উপর শোয়াইল, একটি ক্ষুদ্র ধমক দিয়া কালাজ্বর রোগীর

গোঙানি বন্ধ করিল, টিঞ্চার আইওডিন, তুলা, ব্যাণ্ডেজ বাহির করিল এবং সাবানের কৌটাটা বিমলের হস্তে দিয়া জলপূর্ণ মগহস্তে বারান্দার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল বুড়ীর আঘাত গুরুতর।

হাতের কনুইয়ের কাছে একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছে এবং অবিরাম রক্ত পড়িতেছে। আইওডিন তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে এ-রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরও খানিকটা চিরিয়া আর্টারিটাকে বাঁধিয়া দিলে যদি কিছু হয়।

জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বিমল প্রশ্ন করিল—ছুরি-টুরি কোথায় আছে?

—আলমারিতে।

—চাবি কোথা?

—এখানেই আছে বাবু।

জান্‌কী চট্ করিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবির একটা গোলো আনিয়া বিমলের হস্তে দিল এবং সার্জিকাল আলমারির চাবি কোন্‌টা তাহাও দেখাইয়া দিল। ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই, অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে বুড়ীর শরীরে যতটুকু রক্ত আছে বাহির হইয়া যাইবে। বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া ছুরি, আর্টারি-ফরসেপ্‌স, কাঁচি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিল।

পরেশ-দা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—অপারেশন করবে নাকি?

বিমল একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—ও ছাড়া উপায় নেই—

বিধি অনুযায়ী ছুরি প্রভৃতি স্টেরিলাইজ করা উচিত, কিন্তু তাহা করিবার সময় নাই, খানিকটা লাইজল থাকিলেও হইত, কিন্তু তাহাও হাতের কাছে পাওয়া গেল না। টিঞ্চার আইওডিন দিয়া যতটা হয়।

জান্‌কী লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল, বিমল অপারেশন সুরু করিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে বেশী বেগ পাইতে হইল না, ছিন্ন শিরার মুখটা চট্ করিয়াই পাওয়া গেল।...অপারেশন শেষ করিয়া বিমল যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে তখন পরেশ-দা বলিলেন—এই যে গুপিবাবুও এসে গেছেন।

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রৌঢ় একটি লোক ঘাড়টি ঈষৎ নামাইয়া চশমার কাচের উপর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কাঁচাপাকা গোঁফ, গলদেশে একটি পাকানো চাদর। বিমলের সহিত চোখাচোখি হইতেই গুপিবাবু মুখে একটু হাসির ভাব টানিয়া আনিয়া নমস্কার করিবার মত একটা ভঙ্গী করিলেন।

বিমল প্রশ্ন করিল—অ্যাণ্টিটেটানাস সিরাম আছে?

গুপিবাবু মুখটা ফিরাইয়া মুচকি হাসিটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—ওসব কোথা পাবেন এখানে—

—হাসপাতালে নেই?

—না।

—বাজারে পাওয়া যাবে?

—জগদীশবাবুর দোকানে পাওয়া যেতে পারে বোধ হয়—উনি একটু আপ্‌টুডেট্।

—তাই একটা কিনে আনুন, কিনে এনে দিয়ে দিন এক্ষুনি।

গুপিবাবু দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। সাবান দিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বিমল বলিল—যান চট করে নিয়ে আসুন, আমি লিখে দিচ্ছি—কাগজ-কলম কোথা, হাত ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে বিমল পুনরায় বলিল—কই কাগজ-কলম দিন।

গুপিবাবু একটা তটস্থ ভাব দেখাইয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় জান্‌কী কাগজ-কলম আনিয়া হাজির করিল। বিমল প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিতেই গুপিবাবু সেটা লইলেন এবং চশমার কাচের উপর দিয়া মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—জগদীশবাবুর দোকানে নগদ দাম না দিলে—

—ও

বিমল ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দশ টাকার একখানা নোট গুপিবাবুর হাতে দিয়া বলিল—এই নিন, যান।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন

ফ্রান্সের দুর্দ্ধর্ষ সেনেগালি (কাফ্রী) যোদ্ধাদল। গত মহাযুদ্ধে ইহারা প্রচণ্ড শৌর্য্য দেখায়
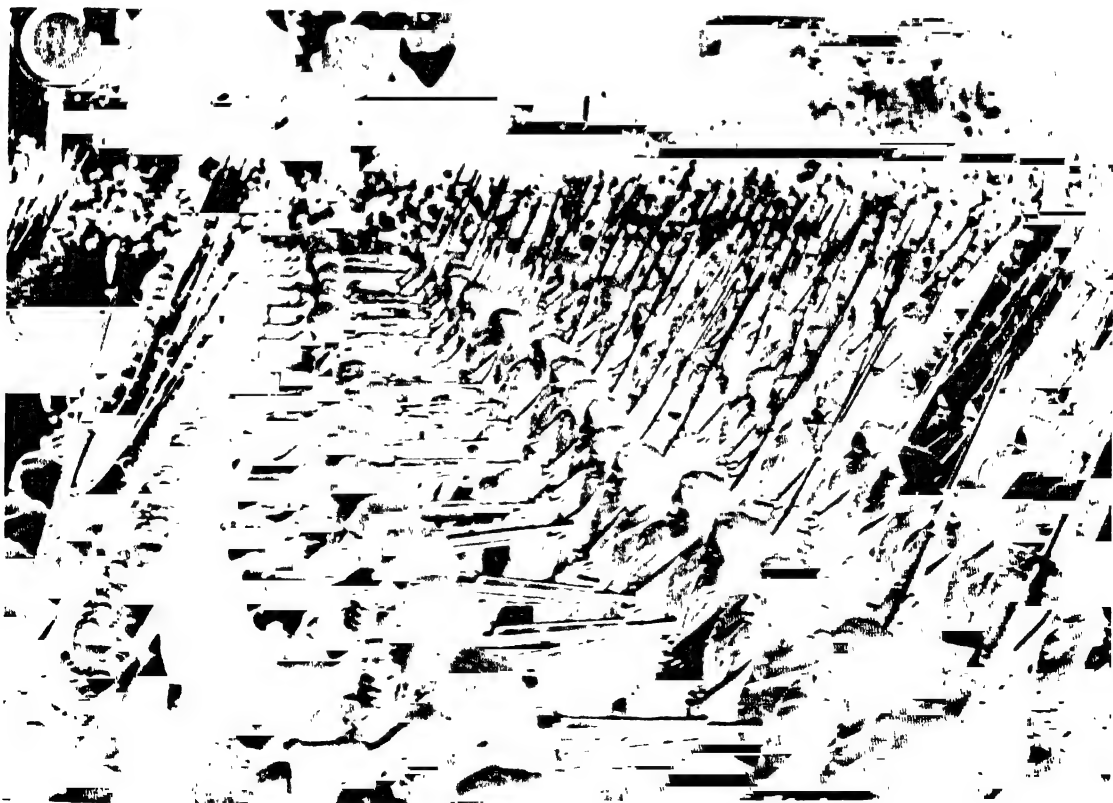
ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সৈন্য "পার্ব্বত্য শিকারী" দল। গত যুদ্ধে ভার্দাতে এই দলের পূর্ব্ববর্ত্তীদের বীরত্বের সম্মুখে জার্ম্মানীর অস্ত্রবল ব্যর্থ হয়।

চীন।
কুনমিং হইতে ব্রহ্মসীমান্ত পর্য্যন্ত নবনির্ম্মিত পথের সেতু
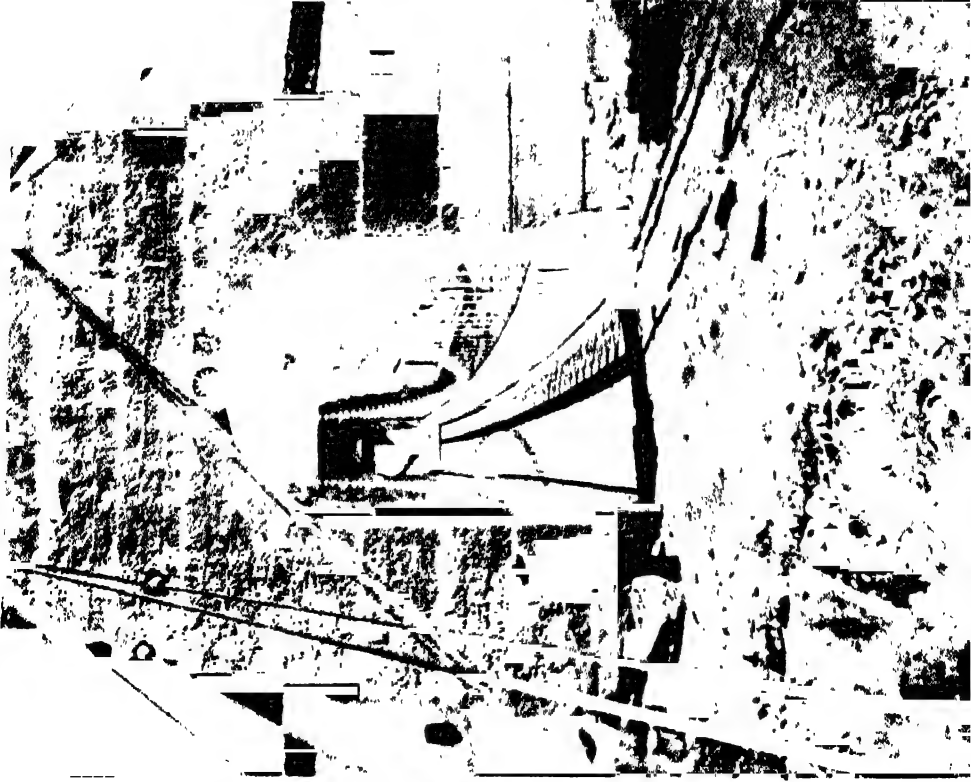
জাপান-অধিকৃত চীন।
জাপানী সান্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন তুলা বাহিরে যাইতেছে।

হঠাৎ বিমলের নজরে পড়িল সেই কালাজ্বর রোগীটাও উঠিয়া আসিয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড়গুলা গোনা যাইতেছে। হঠাৎ এই রাতদুপুরে অপারেশনের অস্বাভাবিকতা তাহাকেও বিচলিত করিয়াছে। বিস্মিত ভাবে সে বিমলকে দেখিতেছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

—আমি? কই না।

তাহার পর জান্‌কীর দিকে একবার মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া পুনরায় বিমলের দিকে ফিরিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল—আমি কেন চেঁচাতে যাব বাবু, দয়া ক'রে এখানে থাকতে দিয়েছেন সেই আমার ঢের—আমি মুখটি বুজে পড়ে আছি। মন্থর পদক্ষেপে সে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বেচারা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে।

জান্‌কী বুড়ীটাকে বিছানায় শোওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। বিমল উঠিয়া গিয়া তাহার নাড়ীটা একবার দেখিল। দেখিল খুব দুর্ব্বল। ব্র্যাণ্ডি দিয়া একটা ঔষধের প্রেসক্রপশন লিখিয়া সে জান্‌কীকে বলিল যে কম্পাউণ্ডার বাবু আসিলে এই ঔষধটা যেন বুড়ীকে খাওয়াইয়া দেন।

—আচ্ছা হুজুর।

– চল বিমল, এবার যাওয়া যাক্। পরেশ-দা বলিলেন।

—হাঁা চলুন।

—তোমার বৌদি নেই, নিজেদেরই গিয়ে রান্নাবাড়া করতে হবে। ক্যাশটাও মেলাতে হবে আমাকে—

বিমল অন্যমনস্ক ছিল। বলিল—চলুন

ঝুমুকি বারান্দার থামের কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল।

পরেশ-দা ও বিমল গেট হইতে বাহির হইতে-না-হইতে সে ছোঁ মারিয়া লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল

ক্রমশঃ

মেঘান্তর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এখন তাহার সময় হ'ল যাবার,
দেবার যাহা দিয়েছে ও পেয়েছে যা পাবার।
শুষ্ক নদী পূর্ণ কূলে কূলে,
অরণ্যানী পূর্ণ ফলে ফুলে,
রৌদ্রতপ্ত পাণ্ডু ভুবন
শ্যামায়মান আবার।

সার্থক হায় তাহার আগমন,
নিঃস্ব ধরা শস্যভরা, আর কি প্রয়োজন?
লাবণ্যময় আজকে চরাচর,
দীর্ঘিকাতে কমল বাঁধে ঘর,
নীলাম্বর ও ইন্দ্রধনুর
চল্‌ছে আলিঙ্গন।

গঙ্গা যখন ধরলো সাগরপথ—
ব্রত তাহার পূর্ণ,—কি আর করবে ভগীরথ?
আরম্ভ যে শান্তিপর্ব্ব-শ্লোক,
গাণ্ডীবের আর কিসের আবশ্যক?
কঠিন মহাপ্রস্থানেরি পথে
কি করিবে কপিধ্বজ রথ?

দীপক যারে করলে রে আহ্বান,
প্রস্থানে তার চৌদিকে মেঘমল্লারেরি গান।
ঝরণাধারা ঝরছে অবিরল,
সমীর কাতর বইতে পরিমল,
তৃপ্ত জগৎ শোভায় ঢলঢল
সফল তাহার সকল অবদান।

যায় যে ক'রে এমনি যুগবিশেষ
কর্ম্মধারার বিশিষ্টতার শেষ।
সুলভ কাছে আনে সুদুর্লভ,
মহিমাতে উজ্জ্বল করে সব,
বাড়ায় ধরার অনন্ত গৌরব
দিয়া অপার্থিবের পরিবেশ।

দ্বিধারা

সমুদ্ধ

বাগবাজার অঞ্চলে একটি বাড়ী।

দোতলার খোলা বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে চিৎ হইয়া শুইয়া গৃহস্বামী হরেন্দ্র ঘোষ। সদ্য আপিস হইতে ফিরিয়াছেন, এখনও কাপড় ছাড়া হয় নাই, তাই ভাদ্র-সন্ধ্যার ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও তাঁহার গায়ে একটি আদ্দির ফতুয়া।

হরেন্দ্র ঘোষের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একটু বেঁটে মোটা মতন, মাথার সামনে টাক। একটুতেই উত্তেজিত হন, তখন আর মুখের সংযম থাকে না। সম্প্রতি তিনি উত্তেজিত; কারণ তাঁহার পিসীমা গত কুড়ি মিনিটের মধ্যে এই চতুর্দ্দশ বার তাঁহাকে শুনাইয়া গেছেন, কন্যা লীলা বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই।

হরেন্দ্র ঘোষের হাতে খবরের কাগজ, কিন্তু একটুও পড়া হইতেছে না।

পিছন হইতে দ্বার ঠেলিয়া পিসীমা প্রবেশ করেন। বিধবা। বয়স সত্তর, কিন্তু শক্ত আছেন।

হরেন্দ্র ঘোষ মুখ তুলিয়া চান।

হরেন্দ্র। এল?

পিসীমা। না! একা একা, এই রাত, তায় সমত্থ মেয়ে—কি যে হবে ভেবে পাচ্ছি না।

হরেন্দ্র। হুঁ!

পিসীমা। আর তুই বা কি ব'লে এমন চুপ ক'রে ব'সে আছিস তাও তো বুঝি নে। রাত আটটা বেজে যায়, মেয়ে যার নিখোঁজ, সে কি ক'রে নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে খবরের কাগজ পড়তে পারে, আমার তো বাপু বুদ্ধিতে কুলোয় না।

হরেন্দ্র। কি করব? রাস্তার এক ধার থেকে আর এক ধার অবধি দৌড়ব খালি?

পিসীমা। তাই যেন বলছি। কিন্তু যাই হোক লোকে তো একটা খোঁজও নেয়। কোথায় গেল না-গেল—একটা বিপদ-আপদই ঘটল কি না তাই বা কে জানে।

হরেন্দ্র। কোথায় গেল জানলে তো ভাবতেও হ'ত না। আন্দাজি আমি কোথায় খুঁজব বল।

পিসীমা। এক বার ননীদের ওখানে গিয়ে দেখ না। এমনও তো হ'তে পারে সেইখানেই গেছে।

হরেন্দ্র। সেখানে নেই তারা তো স্পষ্টই বললে। এক্ষুনি তাদের ফোন্ করলাম, দেখলে না?

পিসীমা। তবু এক বার নিজে যেতে হয়। ও ফোন-টোনে কি আর সব কাজ হয়।

হরেন্দ্র। ন্যাঃ। নিজে গেলে কি হবে, তাই শুনি। টেলিফোনে তাদের ডাকলাম, তারা বললে ওখানে যায় নি। এখন আমি নিজে গেলেই অমনি তাদের বাড়ী ফুঁড়ে মেয়ে গজিয়ে উঠবে? না কি বলতে চাও, তারা মেয়েকে লুকিয়ে গুম্ ক'রে রেখেছে, আমার গিয়ে খুঁজে বার করতে হবে?

পিসীমা। তাই যেন আমি বললাম।

হরেন্দ্র। তবে কি বললে! তারা বলেছে তাদের বাড়ীতে যায় নি। এর পরে গিয়ে আর বেশী কি লাভ হবে সেটা বলতে পার?

পিসীমা। বলতে দিচ্ছিস কই। তাদের হ'ল গে ধর্ পাঁচ জনের সংসার। হয়ত এক জন বিভুলে কি ব'লে দিয়েছে! হয়ত পষ্ট ক'রে তোর কথা বুঝতে পারে নি। বা হয়ত তারা কি বলেছে তুইই পষ্ট শুনতে পাস নি।

হরেন্দ্র। জ্বালালে। সব সময় সব কথা শুনতে পাই, কখনও ভুল হয় না, আর এখনই সবাই সব কথা ভুল শুনছে, ভুল বকছে—তোমাদের মেয়েটি হারিয়ে যাবা

সময় দেশসুদ্ধ লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি সব সঙ্গে ক'রে সহমরণে নিয়ে গেছে, কেমন ?

পিসীমা। তোর সঙ্গে কথা ব'লে লাভ নেই।

হরেন্দ্র। (চটিয়া: উঠিয়া বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির মুখে গিয়া চীৎকার করেন,

কালী! কালী ?

ভৃত্য কালীচরণ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে।

কালীচরণ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসে।

হরেন্দ্র। দিদিমণি কখন বাইরে গেছে ?

কালী। (এ পর্যান্ত আরও বার-দশেক সে এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছে) আজ্ঞে, বিকেল বেলা।

হরেন্দ্র। বিকেল বেলা, সে আমিও জানি। সে-কথা শুধোবার জন্যে তোমায় ডাকা হয় নি। ঠিক ক'রে বল্— ক'টার সময়।

কালী। (ফাঁপরে পড়িয়া) আজ্ঞে তখন এই— পাঁচটা-ছ'টা হবে।

হরেন্দ্র। পাঁচটা-ছ'টা হবে! পাঁচটা আর ছ'টা এক কথা নয়। জানিস নে তাই বল্।

কালী। (মনিবকে সে চেনে) আজ্ঞে।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে! কেন দেখে রাখিস নি। যত সব হতভাগা—ধরে ধরে সব মার লাগাতে হয়। কোথায় গেছে জানিস ?

কালী। বললেন তো, বেড়াতে যাচ্ছি।

হরেন্দ্র। বললে। আর তুমি অমনি শুনে রাখলে। বেড়াতে গেল তো সঙ্গে যাস নি কেন ?

কালী। আজ্ঞে, বললেন দরকার নেই। আর এদানী তো একা-একাও বেরোন।

হরেন্দ্র। বেরোন, তবে আর কি—আমাকে রাজা করেন। কিসে ক'রে গেছেন ? ট্যাক্‌সিতে ?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে বললেন একটা ট্যাক্‌সি ডেকে দে।

হরেন্দ্র। আর তুমি অমনি ডেকে দিলে।

কালী। আজ্ঞে, বললেন!

হরেন্দ্র। হুঁ, বললেন। কোন্ দিকে যাবে কিছু বললে ?

কালী। তা তো বলেন নি। ট্যাক্‌সি এল, দিদিমণি চড়ে ব'সে বললেন, চালাও। আমাকে বললেন, বাবা এলে বলবি বেড়াতে যাচ্ছি।

হরেন্দ্র। উদ্ধার হয়ে গেলাম। তুমি বেটা কেন বললে না, আজ নাইবা গেলেন ?

কালী। আজ্ঞে, এমন অনেক দিনই তো যান।

হরেন্দ্র। যান, সে বাড়ীর গাড়ী ক'রে, বা আমার সঙ্গে। তাই ব'লে একা-একা ট্যাক্‌সি ক'রে যাবেন, কোথায় যাচ্ছেন ব'লে পর্য্যন্ত যাবেন না ? ট্যাক্‌সির নম্বর কত ?

কালী। তা তো দেখি নি।

হরেন্দ্র। দেখবে কেন।

পিসীমা। তাই না-হয় কোথায় দেরি হচ্ছে টেলিফোন্ ক'রে বল্।

হরেন্দ্র। হ্যাঃ, সে বুদ্ধি থাকলে তো হ'তই। আর কি, এবারে যাই, থানায় থানায় ফোন করি, কোথাও গাড়ী চাপা পড়তে পেরেছে কিনা।

পিসীমা। বালাই ষাট্, ও কি অলক্ষুণে কথা।

হরেন্দ্র। যাক তাই পড়ুক—আপদ যায়। এমন সব হতভাগা মেয়ে—সব ধরে ধরে মার লাগাতে হয়।

গেটের বাহিরে গাড়ী থামিবার শব্দ। শব্দে বোঝা যায় গাড়ীর দরজা খুলিয়া এক জন নামে। গাড়ীর আরোহীর সঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত নমস্কার বিনিময় হয়, তার পর আবার গাড়ী চলিয়া যায়। যে নামিয়াছিল সে বাড়ীতে প্রবেশ করে।

কালী রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দেখে। তারপর বলে,

কালী। এসেছেন।

বলিতে বলিতে নীচে সিঁড়ি হইতে লীলার গলা শোনা যায়— চীৎকার করিয়া সে গান ধরিয়াছে।

লীলা। "ওগো সুন্দর,
মনের গহনে তোমার মুরতি খানি—"

পিসীমা কপালে হাত ঠেকাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করেন। দেয়াল-ঘড়িতে আটটা বাজে।

হরেন্দ্র। (ক্রুদ্ধস্বরে ডাকেন) লীলা এসেছ ?

লীলা। (গান বন্ধ করিয়া, নেপথ্যে) যাই বাবা।

সিঁড়ি বহিয়া লীলা উঠিয়া আসে। হালকা ছিপছিপে সুন্দর মেয়েটি। পথশ্রমে ও গরমে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে,

একটু ক্লান্ত মুখে উজ্জ্বল আলো পড়িয়া তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। বাড়ীর সকলেরই আদরের মেয়ে, সেটা কথার ধরনে বোঝা যায়।

সোজা আসিয়া সে ধুপ্ করিয়া হরেন্দ্র ঘোষের পরিত্যক্ত ঈজি-চেয়ারটায় চিৎ হইয়া পড়ে:

লীলা। বাপ্!

হরেন্দ্র। (গম্ভীর কণ্ঠে) এত দেরি হ'ল কেন তোমার?

লীলা। কই দেরি (মুখ ফিরাইয়া ঘড়ি দেখিয়া)—ও বাবা, আট্টা!

হরেন্দ্র। কোথায় গিয়েছিলে?

লীলা। বেড়াতে। কিন্তু জান, যা কাণ্ড বাধিয়েছিলাম সে শুনলে—

হরেন্দ্র। কাণ্ড বাধাবে তার আর আশ্চর্য্য কি।

কালী। কি হ'ল!

পিসীমা। গোরা-টোরা নয় তো?

লীলা। প্রায়। এমন কেলেঙ্কারি—বাড়ী থেকে গেছি ট্যাক্সি নিয়ে,—

হরেন্দ্র। কেন? ট্যাক্সি নিয়ে যাবার দরকার ছিল কি?

লীলা। বা রে, ভীষণ মাথা ধরল যে। গাড়ী তো কারখানায় পড়ে আছে।

হরেন্দ্র। তাই একা-একা ট্যাক্সি ক'রে যেতে হবে। তার পর? মাথা-ধরা ছেড়েছে?

লীলা। হ্যাঁ।

পিসীমা। সেই গোরা না কি হয়েছিল বললি যে?

লীলা। বল্ছি। ট্যাক্সিটাকে বলেছি লেকে নিয়ে যেতে, যাচ্ছে যাচ্ছে লেকের একেবারে পূব দিকটাতে গিয়ে য্যা! গেল এঞ্জিন খারাপ হয়ে।

পিসীমা। তার পর? উল্টে যায় নি তো?

লীলা। উল্টে যাবে কেন। বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভারটা বললে, গাড়ী আর চলবে না, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অন্য গাড়ী ক'রে যান। ভাড়া দিতে গিয়ে দেখি, ও হরি! পার্স টাই ফেলে গেছি।

পিসীমা। কি সর্ব্বনাশ।

হরেন্দ্র। তার পর? টাকা কোথায় পেলে?

লীলা। কোথায় আর পাব। তাকে বললাম আমি নেমে বেড়াচ্ছি, তুমি ততক্ষণ গাড়ী ঠিক ক'রে নাও, বাড়ী ফিরে টাকা দেব। লোকটা কী পাজি, কিচ্ছু তে শুনবে না। এমন মুশকিলে পড়লাম।

পিসীমা। তা বাড়ীতে টেলিফোন করলি না কেন?

লীলা। টেলিফোন পাব কোথায় সেখানে। পেলে কি আর করতাম না।

হরেন্দ্র। তার পর?

লীলা। তার পর ড্রাইভারটা এমন হল্লা সুরু ক'রে দিলে, একেবারে ভিড় জমে গেল।

হরেন্দ্র। বাঙালী ড্রাইভার? না পঞ্জাবী?

লীলা। পঞ্জাবী।

হরেন্দ্র। হুঁ। তার গাড়ীর নম্বর কত, দেখেছ?

লীলা। গাড়ীর নম্বর দেখবার মত অবস্থা ছিল কিনা আমার। আমার বলে তখন কান্না পাচ্ছে।

হরেন্দ্র। কান্না পাচ্ছে ব'লে নম্বরটাও নিতে পারলে না। যাক তার পর?

লীলা। তার পর আর এক ভদ্রলোক এসে বাঁচিয়ে দিলেন।

হরেন্দ্র। কে ভদ্রলোক? চেনা কেউ?

লীলা। না। সেইখান দিয়ে গাড়ী ক'রে যাচ্ছিলেন, গোলমাল দেখে নেমে পড়লেন। ড্রাইভারটাকে খুব ক'রে ধমকে দিলেন, দিয়ে তার টাকা ফেলে দিলেন। ড্রাইভার বাবাজী মুখ চুন ক'রে স'রে পড়ল।

হরেন্দ্র। (মুখ অন্ধকার করিয়া) হুঁ। আর তুমি সেই টাকা নিলে?

লীলা। বা রে, না নিয়ে কি করব?

হরেন্দ্র। তা বটে। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, বেড়াতে যদি যাও, পার্স ফেলে যাচ্ছ সেটা খেয়াল থাকে না কেন?

[কালী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়।]

পিসীমা। বেশ বললি। খেয়াল থাকলে আর ফেলে যাবে কেন। এক দিন ভুল মানুষের হয় না?

হরেন্দ্র। কেন হবে? এমন ক'রে পার্স ফেলে যেখানে সেখানে যাওয়া আমি পছন্দ করি নে।

লীলা। আমিই যেন করি। আমি কি ইচ্ছে ক'রে ফেলে গেছি!

হরেন্দ্র। ইচ্ছে ক'রে না-ক'রের কথা হচ্ছে না। আমার কথা হচ্ছে, পার্স ফেলে যাওয়ার কোনই জাস্টিফিকেশন নেই। আর পথে বেরোতে যারা পার্স ভুলে যায়, তাদের দিয়ে কোন্ কাজ হবে জগতে? অপদার্থ বাঁদর যত—ধ'রে ধ'রে সব মার লাগাতে হয়।

লীলা। তাই লাগালেই তো পার। (তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসে)

পিসীমা। আহা, কাঁদাচ্ছিস কেন মেয়েটাকে! দেখ তো মিছিমিছি—(লীলাকে ধরিয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া দেন) তুই নিজে কখনও কিছু ভুল করিস নে?

হরেন্দ্র। ভুল করতে পারি, কিন্তু পার্স ফেলে বাইরে যাই নে তাই ব'লে।

পিসীমা। থাক থাক হয়েছে। (লীলাকে) তার পরে? বাড়ী ফিরলি কি ক'রে?

লীলা। (বকুনি খাইয়া সে মিতভাষী হইয়া যায়) কি ক'রে আর। সেই ভদ্রলোক পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

হরেন্দ্র। পৌঁছে দিয়ে গেলেন! আর তুমি এলে!

লীলা। আসব না তো কি করব? আট মাইল রাস্তা হেঁটে চ'লে আসব? না লেকের ধারেই ব'সে থাকব সারা রাত?

হরেন্দ্র। পৌঁছে দিয়ে গেলেন! এই জন্যেই আমি মেয়েদের রাস্তায় বেরোনো পছন্দ করি নে। যত হ্যাংলা ছোঁড়ার দল—পথে ঘাটে কোথাও মেয়ে দেখেছে কি অমনি শিভ্যাল্‌রি উপ্‌ছে পড়েছে।

পিসীমা। তুই তো ভাল সুরু করলি! ভদ্দর লোকের ছেলে বিপদে উপ্‌গার করেছে, সেটা হ'ল তার দোষ?

হরেন্দ্র। আহা, কি আমার উপ্‌গার করা রে।

পিসীমা। তা তো বলবেই। কোথায় গিয়ে বিপদে পড়েছে মেয়েটা—সে না থাকলে কি দশা হ'ত ভাব দিকি নি এক বার।

হরেন্দ্র। হুঁ।

পিসীমা। কে রে ছেলেটি?

লীলা। ছেলেটি বললে কে তোমাকে?

পিসীমা। তবে? এই যে বললি ভদ্দরলোক?

লীলা। ভদ্রলোক মানে কি ছেলে?

পিসীমা। ওই হ'ল। কত বয়স?

লীলা। পঁচানব্বুই বছর।

পিসীমা। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান) ও।

হরেন্দ্র। সেই একটা কে না কে, তার পাশে ব'সে সারাটা পথ চ'লে এলে তো?

লীলা। পাশে কেন বসব। পিছনের সীটে বসলাম। তিনি ত গাড়ীই চালাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র। পঁচানব্বুই বছর বয়স, রাত্তিরবেলা চিৎপুর দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন! তার গাড়ীর নম্বর কত?

লীলা। গাড়ীর নম্বর কে জানে।

হরেন্দ্র। সেটা দেখে রাখতে হয়, এটুকুনও মাথায় এল না?

লীলা। কি হবে নম্বর দিয়ে? তাঁর টাকা ফেরৎ দেবার জন্যে তো? ঠিকানা চেয়ে রেখেছি। (একটা সুদৃশ্য নামের কার্ড বাহির করিয়া দেয়)

হরেন্দ্র। হুঁ। (কার্ডটা হাতে নিয়া দেখেন, মুখ অন্ধকার হইয়া উঠে) অমরেশ মিত্তির, এম্. এ.। সাদার্ণ অ্যাভিনিউ। ...দাঁড়াও দাঁড়াও। এই ছেলেটা না গেল-বছর হিস্ট্রিতে ফার্ষ্ট-ক্লাস-ফার্ষ্ট হয়েছে?

লীলা। তা কে জানে।

পিসীমা। কি হয়েছে?

হরেন্দ্র। এম্. এ-তে ফার্ষ্ট হয়ে পাস করেছে।

পিসীমা। গেল-বছর পাস করেছে? তবে যে বললি তার বয়স পঁচানব্বুই বছর?

লীলা। কি জানি। বয়স আমি জিজ্ঞেস করেছি নাকি।

পিসীমা। (একটুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে দুষ্ট হাসি খেলিয়া যায়) অ। বুঝেছি।

লীলা। (অত্যন্ত ব্যগ্র এমন ভাব দেখাইয়া ; চাপা স্বরে) বুঝেছ ? কি বুঝেছ বল না, লক্ষ্মীটি।

হরেন্দ্র। হুঁ। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সে ছেলে তোমাকে নিজে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায় কেন ? আবার তোমাকে তার নামের কার্ড দিয়ে যায় কেন ?

লীলা। বা, নাম চেয়ে নেব না তো কি তাঁর টাকা ভিক্ষে নেব নাকি। টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে না ?

হরেন্দ্র। টাকা দিতে হয় দেওয়া যাবে। তাই ব'লে নামের কার্ড রাখবার দরকার ?

লীলা। কি আশ্চর্য্য ! নাম না রাখলে টাকা পাঠাবে কোথায় ?

হরেন্দ্র। হুঁ ! কিন্তু এ সব ভাল কথা নয়, বুঝলে ? এই সব ফাজ্‌লামো আজকালকার ছেলেদের দস্তুর—এ আমার একেবারে দু-চক্ষের বিষ।

পিসীমা। কেন, তার অপরাধটা কি হ'ল ?

হরেন্দ্র। হ'ল না ? কেন, আরও ত লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তোরই কেন মাথাব্যথা পড়ে—তুই নেমে তার ড্রাইভারকে ধমকাস, তার টাকা মিটিয়ে দিস, আবার নিজে সঙ্গে ক'রে বাড়ী পয্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাস—কি, ব্যাপার কি।

পিসীমা। কি আবার ব্যাপার হবে। পরের বাছা কষ্ট সয়ে আমার মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, সেটা হ'ল তার অপরাধ ?

হরেন্দ্র। এক-শ বার অপরাধ। কি দরকার ছিল তার মাথাব্যথার ? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলামো—যত নচ্ছার উল্লুকের দল। ধ'রে ধ'রে সব মার লাগাতে হয়।

পিসীমা। ছি ছি, এ বাপু তোমার অন্যায় কথা। ভাগ্যিস ছেলেটি ছিল—নইলে আজ কি দুর্দ্দশাই হ'ত কে জানে। হ্যাঁ রে লীলা, কেমন দেখতে রে ছেলেটি ?

লীলা। (ক্রুদ্ধ) জানি নে।

পিসীমা। তা তুই বা কি রকমের মেয়ে। এমন অসময়ে তোকে বাঁচালে, নিজে এসে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল, আর তাকে অমনি দোর থেকেই বিদেয় ক'রে দিলি ? তাকে বাড়ীতে বসিয়ে একটু চা খাইয়ে দিতে হয়, এটুকুনও বুদ্ধিতে কুলোল না ?

লীলা। থাক আর চা খায় না। বাড়ীতে ডাকতাম এই অপমানটা তাঁকে করবার জন্যে তো ?

হরেন্দ্র। অপমান কিসের ?

লীলা। কিচ্ছু নয়।

হরেন্দ্র। ও! সত্যি কথা বলেছি তাতে অপমান করা হয়েছে ? কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আমি কথা বললে তাঁর অপমান হয়, আর তিনি যে আমার মেয়েকে জানা নেই শোনা নেই গায়ে পড়ে টাকা ধার দেন, নিজে গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌঁছে দেন, তাকে নিজের নাম লেখা কার্ড দিয়ে যান, এতে আমার অপমান হয় না ?

লীলা। হয় জানলে দিতেন না। দিয়ে অন্যায় করেছেন।

হরেন্দ্র। (ফাটিয়া পড়েন) এক-শ বার অন্যায় করেছেন। হাজার বার করেছেন। আর সে-কথা বললে তাঁর অপমান করা হবে ! আসুক না এক বার টাকা নিতে আমার বাড়ীতে—আমি মুখের উপর শুনিয়ে দেব।

লীলা। দিতে হবে না। টাকা নিতে তিনি আসবেন না।

হরেন্দ্র। আসবেন না তার মানে ? তিন টাকা ট্যাক্‌সি ভাড়া তিনি আমাকে দান করবেন ? দান !

লীলা। না। কিন্তু টাকা নিতে এখানেও আসবেন না তিনি।

হরেন্দ্র। ব'লে গেলেন বুঝি ? কিন্তু আমি বলছি আসবেন, নির্ঘাৎ আসবেন। নইলে কার্ড রেখে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।

লীলা। তার মানে ?

হরেন্দ্র ! মানে, এ আর কিছুই নয়, স্রেফ ঘনিষ্ঠতা জমাবার মতলব। নইলে এখুনি তো বাড়ীতে ঢুকে টাকা নিয়ে যেতে পারতেন। ওই ক-টা টাকা দিতে কি আমাকে ব্যাঙ্কে দৌড়তে হ'ত ?

লীলা। থাক্। টাকা তোমায় দিতে হবে না।

হরেন্দ্র। দিতে হবে না মানে ?

লীলা। মানে টাকা তাঁকে তোমার দিতে হবে না। অপমানও করতে হবে না।

হরেন্দ্র। ফের বলে অপমান! আর ওই কটা টাকা তিনি ফেরৎ না নিলে আমার অপমান নয়?

লীলা। ফেরৎ নেবেন না কে বলেছে। তাঁর টাকা আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার স্কলারশিপ থেকে।

হরেন্দ্র। হুঁ। তার মানে তুমি এক বার তাঁকে টাকা পাঠাবে, তিনি আবার তার জবাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে চার পাতা চিঠি লিখবেন, কেমন? ও-সব হবে না। তার টাকা আমি আজই মিটিয়ে দেব। এক্ষুনি গিয়ে দিয়ে আসব টাকা। (কার্ডটা তখনও তাঁহার হাতে। সেটার দিকে তাকান। তার পর চেঁচাইয়া ডাকেন) কালী! টাকা দিয়ে আসব, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমার যা বলার আছে তাও ভাল করেই শুনিয়ে দিয়ে আসব। কালী!

কালী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসে।

কালী। আজ্ঞে।

হরেন্দ্র। একটা ট্যাক্সি ডাক্। শীগ্গির।

কালী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়; তাহাকে আবার ডাকিয়া থামান।

—হেই! থাক, আমিই মোড় থেকে নিয়ে নেব এখন।

সেই অবস্থাতেই দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া যান—সেই ধুতি ফতুয়া ও চটি পরিয়া। হাতে কার্ডখানা।

পিসীমা ও লীলা পরস্পরের মুখে তাকান। তার পর লীলা হঠাৎ ভ্রূ কপালে তুলিয়া কীর্ত্তনের সুর ধরে:

লীলা। "বাবাকে নিয়ে আর পারা গেল না—দিদিমা গো"......

চিতেন ধরিয়া ইজি-চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়ে। যবনিকা পড়িয়া যায়।

সাদার্ন অ্যাভিনিউ।

অমরেশ মিত্রের বসিবার ঘর। ঘরের সর্বত্র গৃহস্বামীর সচ্ছলতা ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বুক-কেস, সুন্দর সুন্দর ছবি ইত্যাদি।

অমরেশ সোফায় চিৎ হইয়া বই পড়িতেছে। রাত প্রায় ন'টা।

ঘরের দুইটি দরজা। বাঁ-দিকে দরজা খুলিলে বাহিরের বারান্দা। ডান দিকের দরজা ভিতরে যাইবার পথ।

হঠাৎ বাঁ-দরজায় কলিং-বেল ঘোর রবে বাজিয়া উঠে। বেলের শব্দে অধৈর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তার পর দরজায় ঠকাঠক্ আঘাত।

অমরেশ বই হাতেই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। দিতেই হরেন্দ্র ঘোষ প্রায় তাহাকে ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করেন। ফতুয়া গায়ে তাঁহাকে দেখিয়া অমরেশ একটু ঘাব্ড়াইয়া যায়।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই প্রশ্ন করেন:

হরেন্দ্র। অমরেশ মিত্তির এখানে থাকে?

অমরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

হরেন্দ্র। আছে বাড়ীতে?

অমরেশ। আজ্ঞে, আমারই নাম।

হরেন্দ্র। তুমি? ও। (একপেশে হইয়া দাঁড়াইয়া, কার্ডটা বাড়াইয়া ধরেন। খুব গম্ভীর কণ্ঠে) এই কার্ড তোমার?

অমরেশ। হ্যাঁ।

হরেন্দ্র। বেশ! এই কার্ড তুমি কাকে দিয়েছিলে?

অমরেশ। কাকে দিয়েছিলাম? তার মানে?

হরেন্দ্র। মানে আবার কি। বাংলা কথার মানে বোঝ না? (থামিয়া থামিয়া উচ্চারণ করিয়া) আজ··· খানিক ক্ষণ আগে··· তোমার এই কার্ড···একটি মেয়ের কাছে পাওয়া গেছে। সে বলেছে, কার্ড তুমিই তাকে দিয়েছ?···আমি জান্তে চাই, একথা সত্যি?

অমরেশ। (বুঝিয়া) হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম বটে; কিন্তু কেন বলুন তো?

হরেন্দ্র। এখুনি টের পাবে, কেন।

অমরেশ। আপনি—আপনি কি, মানে, পুলিসের লোক?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না। আমি তার বাবা।

অমরেশ ও! (হাত তুলিয়া নমস্কার করে)। তা, বসুন।

হরেন্দ্র। থাক আর অভ্যর্থনা করতে হবে না

আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। এই কার্ড তুমি তাকে দিয়েছ কেন?

অমরেশ। কেন, তাতে কি হয়েছে?

হরেন্দ্র। কি হয়েছে, বোঝ না! ন্যাকা! কোন্ সাহসে তুমি আমার মেয়েকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দাও, সঙ্গে ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাও, তাকে নিজের কার্ড দিয়ে এস?

অমরেশ। (এই অকৃতজ্ঞতায় তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠে) তিনি বিপদে পড়েছিলেন ব'লেই করেছিলাম। তাতে কিছু অপরাধ হয়েছে?

হরেন্দ্র। নিশ্চয় হয়েছে। তুমি মনে কর, তোমাদের এই সব শয়তানির প্যাঁচ আর কেউ বুঝতে পারে না? পৃথিবীসুদ্ধ লোক কানা, খালি তোমরাই বুদ্ধিমান?

অমরেশ। শয়তানির প্যাঁচ মানে?

হরেন্দ্র। মানে যা হয় তাই। বিশেষ একটা বয়সের মেয়ে দেখলেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠ তোমরা। যত হতভাগা বেল্লিক—ধ'রে ধ'রে সব মার লাগাতে হয়।

অমরেশ। (এত ক্ষণে সে অবস্থাটা বুঝিয়া নেয়। একটু হাসিয়া) আজ্ঞে তা ঠিক নয়। ব্যাপারটা যা হয়েছিল আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলছি।

হরেন্দ্র। বলবে আবার কি। বলাবলির কি আছে এর মধ্যে?

অমরেশ। তাহলে আর কি করব বলুন! আপনি যা ইচ্ছে হয় ব'লে যাবেন, আমাকে কিছু বলতেই দেবেন না—এ হ'লে তো আর কথা ক্লিয়ার-আপ করা যায় না।

হরেন্দ্র। কি আবার ক্লিয়ার-আপ করবে তাই শুনি বেশ, বলই না কি তুমি বলতে চাও।

অমরেশ। আপনি বসুন আগে।

হরেন্দ্র। থাক থাক বসবার দরকার নেই।

[নেপথ্যে মোটরের হর্ন বাজে।

অমরেশ। তাই কি হয়। বসুন, বলছি।

হরেন্দ্র। (দুম করিয়া একটা চেয়ারে বসেন) বেশ, বসলাম। বল এবারে কি বলবে

অমরেশ। দেখুন, আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় ভদ্রলোকমাত্রেই তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য।

হরেন্দ্র। হুঁ। বাধ্য! এত লোক থাকতে তুমিই কেন গেলে তাকে সাহায্য করতে?

অমরেশ। আর কেউ গেল না ব'লে। কিন্তু আমিই কেন গেলাম, আপনার এই প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হরেন্দ্র। বোঝাবুঝির কি আছে। বিপদে পড়েছে, কেউ সাহায্য করলেও করতে পারে। কিন্তু তুমি ইয়ং-ম্যান্, তুমি কি ব'লে রাত্তির বেলা একা মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাও?

[নেপথ্যে হর্ন।

অমরেশ। (মৃদু হাসিয়া) আজ্ঞে, একা নয়। গাড়ীতে আমার মাও ছিলেন কিনা।

হরেন্দ্র। (থতমত খাইয়া যান) তোমার মা ছিলেন! তা সে কথা এত ক্ষণ বল নি কেন?

অমরেশ। বলতে আপনি দিলেন কখন?

হরেন্দ্র। হুঁ। কিন্তু সেও তো বলে নি তোমার মা ছিলেন সঙ্গে। কেন বলে নি?

অমরেশ। তা আমি কি ক'রে বলব বলুন।

হরেন্দ্র। তা বটে, তুমি কি ক'রে বলবে। কিন্তু কী পাজি মেয়ে দেখেছ—এত গালাগাল খেলে, তবু এক বারটি বললে না তোমার মা সঙ্গে ছিলেন। তাই বললে কি আর সে-ই গালাগাল খায়, না আমাকেই এমন ক'রে ছুটে আসতে হয়।

অমরেশ। কিন্তু সেকথা আমাকে ব'লে কি লাভ। কেন বলেন নি বাড়ী গিয়ে তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।

[নেপথ্যে হর্ন।

হরেন্দ্র। জিজ্ঞেস ত করবই। আজ বাড়ী ফিরে তার কৈফিয়ৎ নিয়ে তবে কথা। দিনকের দিন মেয়ে ন্যাকা হচ্ছেন—বেড়াতে যাবেন তো পার্স ফেলে যাবেন, কথা বলবেন তার আধখানা বলবেন না—ধরে ধরে সব মার লাগাতে হয়। আরে, পার্সটা ফেলে যাচ্ছিস,
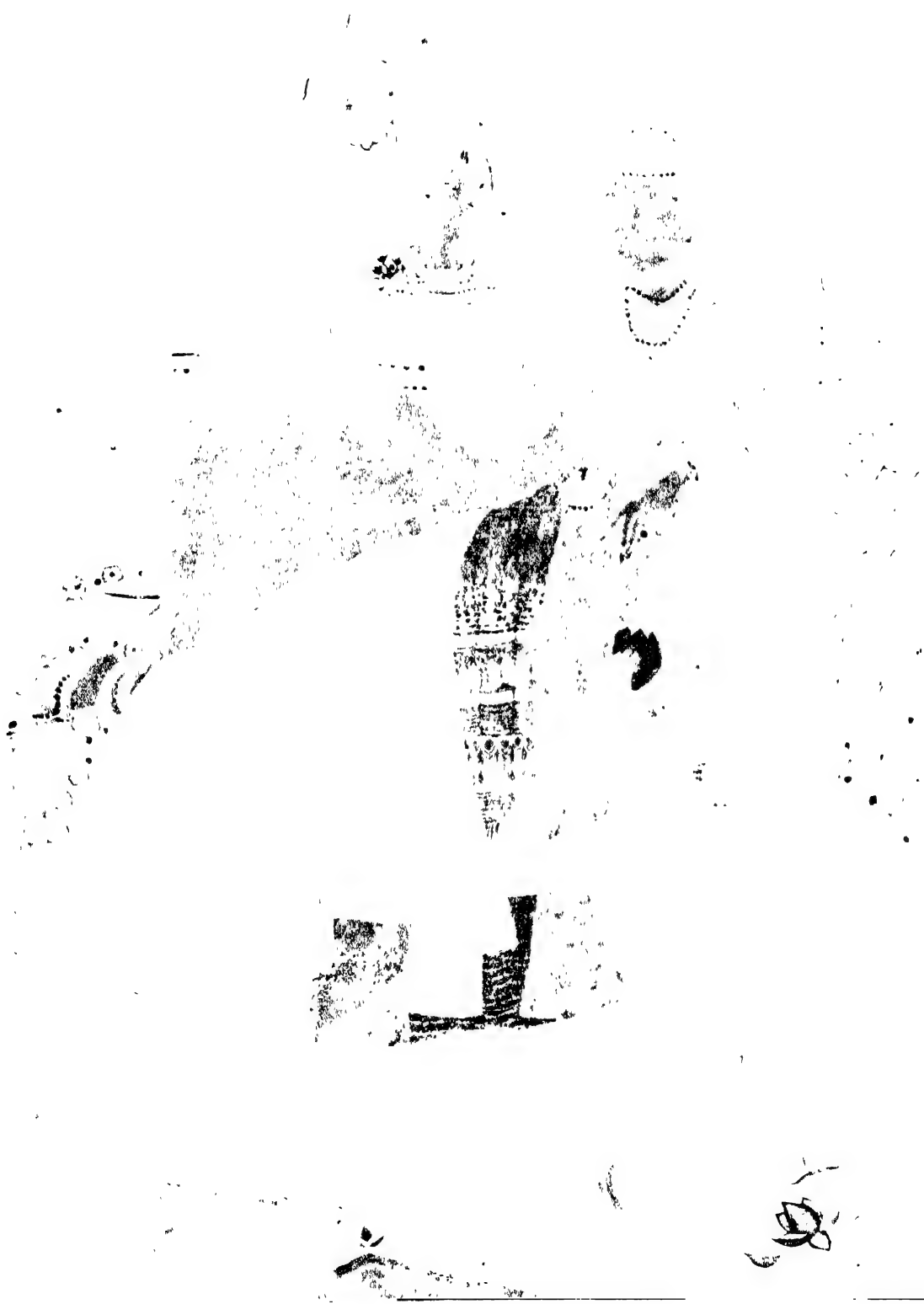
সেটা চৈতন্য থাকে না, এদের দিয়ে পৃথিবীতে কি হবে বলতে পার?

[নেপথ্যে হর্ন।

অমরেশ। মা ছিলেন সে কথা বলেন নি বুঝি?

হরেন্দ্র। না। আপিস থেকে সদ্য ফিরে এসেছি, এসেই শুনি বিকেল বেলায় মেয়ে বেরিয়েছেন, এখনও তাঁর পাত্তা নেই। কোথায় গেল কোথায় গেল ক'রে এখন পর্য্যন্ত হাতে মুখে জলটুকুন দিতে পারি নি মশাই।

অমরেশ। (ব্যস্ত হইয়া উঠে) বলেন কি! আপনি বসুন। (টেবিলে ঘণ্টা বাজায়, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাইয়া) ঠাকুর! একস্‌কিউজ মি—

ডান দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া যায়।

হরেন্দ্র বসিয়া বসিয়া এতক্ষণে ঘরের চারি দিকে তাকাইয়া দেখেন। মিনিট তিন-চার কাটে। তার পরে বাঁ দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। হরেন্দ্র মুখ ফিরান, তার পর উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেন। ট্যাক্‌সি-ড্রাইভার প্রবেশ করে।

ট্যাক্‌সি-ড্রাইভার বাঙালী, কিন্তু বিপুলকায়। ঘরে ঢুকিয়া সে একবার চারি দিকে তাকায়; তার পর হরেন্দ্রকে চিনিয়া ফেলে—

ড্রাইভার। আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন, স্যর্।

হরেন্দ্র। তোমার ভাড়া! ওহো, ট্যাকসির ভাড়া?

ড্রাইভার। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন টাকা দু-আনা।

হরেন্দ্র। দিচ্ছি।

পকেটে হাত পুরিতে গিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাঁহার ফতুয়ায় পকেটই নাই।

—এ কি! (চাহিয়া দেখেন)

ড্রাইভার। কি হ'ল!

হরেন্দ্র। মনিব্যাগ ফেলে এসেছি।

ড্রাইভার। তার মানে?

হরেন্দ্র। মানে আবার কি। ফেলে এসেছি, তার মানে এখন নেই। বাড়ী ফিরে গিয়ে দেব এখন।

ড্রাইভার। বাড়ী গিয়ে দেবেন! সে হবে না স্যর্। বৃষ্টি আসছে, আমি আজ আর খাটব না। আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন। দিয়ে অন্য গাড়ী ক'রে যান।

হরেন্দ্র। (তৎক্ষণাৎ চটিয়া) মাথা খারাপ নাকি তোমার। বলছি টাকা নেই, ভাড়া চুকিয়ে দেব কি ক'রে?

ড্রাইভার। (গালাগাল খাইয়া সেও গরম হইয়া উঠে) মাথা খারাপ আমার না আপনার। টাকা নেই ত ট্যাক্‌সি চড়ার সখ হয়েছিল কেন? বাসে ক'রে এলেই হ'ত, দিব্যি আট পয়সায় পৌঁছে যেতেন। গাড়ী নিয়ে এসে, আধ ঘণ্টা হাঁ ক'রে ফেলে রেখে—এখন বলছেন টাকা নেই।

হরেন্দ্র। নেই ত কি বলব, আছে?

ড্রাইভার। বেশ তো, না ছিল টাকা, আগে ভাবলেই পারতেন।

হরেন্দ্র। আগে কি ভাবব। বলছি ফেলে এসেছি—কেন, সেখানে গিয়ে টাকা নিতে তোমার মান ক্ষয়ে যাবে?

ড্রাইভার। বাজে কথা বলছেন কেন। বললাম ত আমি আজ আর ভাড়া খাটব না।

হরেন্দ্র। বেশ ত। না খাটো, আমার ঠিকানা নিয়ে যাও, কাল যখন হোক গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। আর না হয় ত আমাকেই তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও, কাল তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

ড্রাইভার। তা বটে। টাকা পৌঁছে দেবার মতই চেহারা। দেখুন, ও-সব চালাকি ছাড়ুন, ভালয় ভালয় টাকা বার ক'রে দিন।

এই সময়ে পিছন হইতে ডান দরজা খুলিয়া অমরেশ প্রবেশ করিল। ইহারা কেহ দেখিতে পাইল না।

হরেন্দ্র। ফের বলে টাকা বার ক'রে দিন। বলছি ব্যাগ ফেলে এসেছি, নেই টাকা ত কোত্থেকে দেব?

অমরেশ অবস্থাটা লক্ষ্য করে; তার পর তাড়াতাড়ি গিয়া ড্রয়ার খোলে।

ড্রাইভার। ব্যাগ ফেলে এসেছি! মশাই, এই ট্যাক্‌সি চালিয়ে চুল পাকালাম। জুচ্চুরি ফলাবার আর জায়গা পেলেন না!

হরেন্দ্র। জুচ্চুরি! এত বড় সাহস তোমার!

ড্রাইভার। ইঃ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের নাতি! তিন টাকা দু-আনা ট্যাক্‌সি-ভাড়া গাপ মারতে যান, আবার

ভদ্দর লোক! জোচ্চোর বাট্‌পার যত—ধরে ধরে সব মার লাগাতে হয়।

হরেন্দ্র। (শ্বেতবর্ণ হইয়া) কি!

ড্রাইভার। কি আবার। ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর ব'লে তাই। নেমে আস্থন না রাস্তায়, দেখিয়ে দিচ্ছি।

অমরেশ ইতিমধ্যে ড্রয়ার হইতে টাকা বাহির করিয়াছে। নিঃশব্দে পিছন হইতে আসিয়া সে ড্রাইভারের ঘাড়ে হাত রাখে। ড্রাইভার চমকিয়া মুখ ফিরায়। অমরেশ কঠিন মৃদু স্বরে বলে,

অমরেশ। চুপ। ঢের কথা বলেছ, আর নয়। এই তোমার টাকা।

ড্রাইভার হতবুদ্ধি হইয়া এক বার এর দিকে এক বার ওর দিকে চাহিতে থাকে। অমরেশ তাহার হাতে টাকা দিয়া বলে,

দেখে নাও।…ঠিক আছে?…এবার বেরোও।

ড্রাইভার। (টাকা গণিয়া) আজ্ঞে—

অমরেশ। (আঙুল দিয়া দ্বার দেখায়) একটি কথাও নয়। যাও।

ড্রাইভার একবার দু-জনের দিকে চাহিয়া দেখে, তার পর সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।

ডান দরজা খুলিয়া অমরেশের দুই জন চাকর ঘরে আসে। তাহাদের হাতে তোয়ালে সাবান, জলের জগ্‌ ও হাত-মুখ ধুইবার জন্য পাত্র।

হরেন্দ্র তখনও হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া আছেন। লজ্জা ও বিস্ময় তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

অমরেশ। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বস্থন।

হরেন্দ্র। (সচেতন হইয়া) তু—তুমি টাকা দিলে!

অমরেশ। তাতে কি হয়েছে। আমাকে পরে দিয়ে দেবেন। নিন মুখ-হাতটা ধুয়ে ফেলুন। না বাথরুমেই যাবেন?… তাই ভাল। বাবুকে বাথরুমে নিয়ে যা। একখানা কাপড় বার ক'রে দে।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে ভৃত্যের পিছনে বাহির হইয়া যান।

অমরেশ একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবে, তাহার ঠোঁটে মৃদু হাস্যের একটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।

মিনিট-খানেক পরে ভৃত্যদের এক জন ফিরিয়া আসে। তাহার হাতে টিপয় ও জলের গ্লাস। টিপয় বসাইয়া সে গ্লাসটা রাখে; তাহার পিছন পিছন খাবারের প্লেট হাতে ঠাকুর প্রবেশ করে। টিপয়ের উপরে প্লেট ক-টা সাজাইয়া, তরকারি প্রভৃতি দিয়া, ঢাকা দিয়া সে চলিয়া যায়। অমরেশ তদারক করিতে থাকে।

ভৃত্য আবার বাহিরে যায়। জল তোয়ালে সাবান আনিয়া ঘরের এক কোণে মজুত করিয়া রাখে।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে হরেন্দ্র ঘোষ ফিরিয়া আসেন। সদ্য-স্নাত, তোয়ালেটা দিয়া মুখ ঘষিতে ঘষিতেই চলিয়া আসিয়াছেন। ভৃত্য তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে তোয়ালেটা লয়।

অমরেশ। বস্থন।

হরেন্দ্র তন্দ্রাচ্ছন্নের মত খাবারের সম্মুখে বসিয়া পড়েন। গভীর ভাবে কি ভাবিতে থাকেন।

ভৃত্য ইতিমধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে; এ বার তাহার পিছনে ঠাকুর আবার আসে; তাহার হাতে প্লেটে লুচি। টিপয়ের ঢাকাটা তুলিয়া সে ডিশে লুচি সাজাইয়া দেয়। দিয়া সে চলিয়া যায়। ভৃত্য দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

অমরেশ। ও কি, খান!

হরেন্দ্র। (হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ান) খাব না।

অমরেশ। (ব্যস্ত হইয়া) সে কি কথা। এ যদি না খান বরং অন্য খাবার কিছু এনে দিক?

হরেন্দ্র। না। তুমি চল আমার বাড়ীতে খেয়ে আসবে।

অমরেশ। (মৃদু হাসিয়া) বেশ ত, সে যাব এখন। আপনি আগে দুটি খেয়ে নিন।

হরেন্দ্র। না না, আমি খাব না। আমি একটা জন্তু। জানোয়ার। চল।

অমরেশ। আমি এখন এই রাত্রে যাব কি। কাল যাব বরং।

হরেন্দ্র। বলছি এখুনি—আজকালকের ছেলেদের এই এক ফ্যাশন হয়েছে কথা বললেই অমনি--ধরে ধরে সব…মানে ইয়ে।

অমরেশের জামা খামচাইয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যান।

ভৃত্য একটু চাহিয়া দেখে। তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের আলো নিবাইয়া দিতে থাকে। যবনিকা পড়িয়া যায়।

[নাটিকার কাঠামোটি একটি ফরাসী নাটিকা হইতে গৃহীত]

কিশোর গামেলান-বাদ্যকরদল

জাভার চিঠি

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

…এদেশে গানের সঙ্গে গামেলান বাজনার পদ্ধতি গানের 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক' হিসেবে খুব উপযুক্ত, বিশেষতঃ আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে। বিলিতী সঙ্গীতের কোন ছাপ এতে নেই। গামেলান বাজনার মধ্যে দিয়ে মেলডি চমৎকার ভাবে তার নিজের বৈশিষ্ট্য রেখে চলে। গামেলানের কথা এখন একটু বুঝিয়ে বলি, এ আর কিছুই নয়, কতকগুলি বাঁধা সুরের কাঁসার প্লেট ও ঘণ্টা, ছোট বড় নানা রকমের। সাধারণতঃ এ দেশের গাইয়েরা যে সুরগুলি গায় ঠিক সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে এই কাঁসার প্লেট ও ঘণ্টাগুলি তৈরি হয়ে থাকে। সঙ্গে চামড়ার ঢোলকের মত দুটি বাদ্যযন্ত্র ও কাঠতরঙ্গ; একটি তারের যন্ত্র (যাকে এরা বলে, 'রবাব') ও বাঁশী থাকে। কিন্তু ঘণ্টা ও কাঁসার প্লেটের বাদ্যই এখানে প্রধান, কত রকমের কত আকারের যে ঘণ্টা আছে তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। সবগুলি একসঙ্গে তালে তালে বেজে ওঠে। আবোল-তাবোল যার যা খুশি বাজান চলবে না। গানের সঙ্গে তালের মিল রেখে বাজাতে হবে, এবং গানের সুরে যে-পর্দা ব্যবহৃত হয় সে-পর্দাগুলিই কেবল বাজাতে হবে। কোনটাতে কেবল একটা পর্দা পিটিয়ে যাওয়া হয় এক এক মাত্রায়, সেই সময়েই অন্য যন্ত্রগুলিতে ঠিক তার দ্বিগুণ লয়ে সেই ঠাটের উপরেই সুর বাজিয়ে যাওয়া হয়। বড় বড় ঘণ্টাগুলি এই বাজনার ফাঁকে ফাঁকে নির্দ্দিষ্ট তালে গুম গুম শব্দ ক'রে বেজে ওঠে। এই কাঁসার ঘণ্টাগুলিতে হরেক রকম আওয়াজ—বড় বড় ঘণ্টাগুলির শব্দ গুম গুম, তার পরে কোনটা ঢং ঢং, টং টং, টিং টিং, কড়া মোলায়েম যত রকম সম্ভব শব্দ।

কিশোর বাদ্যকরদলের প্রধানগণ

এ দেশের কণ্ঠসঙ্গীতে প্রধানতঃ দুটো প্রধান সুর। একটা আমাদের দেশের ঠিক ভূপালীর মত, "সা রা গা পা ধা সা" এই সুরের উপর চলে। তবে গাইয়েরা খাদে খুবই যায়, প্রায় 'ধা' পর্য্যন্ত, এবং গানের সময় গলার স্বরের ওঠা নামার কায়দাও আকস্মিক। আমাদের বাদী সুর 'গা' এদের কাছে 'পা'। আর একটি সুর আছে যাকে এরা বলে 'Pelok Barong' আমাদের কড়ি 'মা'-বর্জ্জিত বেহাগের মতন। কিন্তু এদের এই সুরে 'মা' বাদী। সুর শুনলে কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ হবে। আমাদের দেশী বেহাগ সুরে যাদের কান তৈরি, তাদের কাছে মনে হবে কেন 'গা'-তে এসে থামল না, কেন কেবল মধ্যমে থামে। তবে এ দেশের গানে সুরের ও তানের কোন বৈচিত্র্য নেই। শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

এ দেশীয় নৃত্যসঙ্গীতেও চার মাত্রার তাল ছাড়া আর কোন তালই নেই। ঝাঁপতাল, তেওড়া ইত্যাদি তো এদের কাছে স্বপ্ন—দাদ্‌রা তালটি পর্য্যন্ত এদের নৃত্য-সঙ্গীতের ধার দিয়ে যায় না। যারা এ দেশের নৃত্যসঙ্গীতে পটু, তাদের কাছে দাদ্‌রা তাল দিলে কাণ্ড ক'রে বসে। অনেক কষ্টে এখানে দু-এক জনকে কয়েকটা তাল শিখিয়েছি। রেডিও ও সভায় গান গাইতে হ'লে এই তাল-গুলি ব্যবহার করি। আমি ধীরে ধীরে গামেলান অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে গান গাইতে সুরু করেছি, এর মধ্যে দু-বার রেডিওতে গাইলাম। এই গামেলান অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে, বেশ ভাল লাগল। সঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্যে এরা অনেক পিছিয়ে আছে, চার-পাঁচটি শুদ্ধ সুরের উপরই এদের সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে; আমাদের মত এত কড়ি-কোমলের বালাই এদের নেই। কিন্তু পুরুষ ও মেয়েদের গানের সঙ্গে গামেলান-যন্ত্র যে-আবহাওয়া সৃষ্টি করে, তা ভুলবার নয়। আমার শুনতে শুনতে কেবল মনে হয় যেন সুরলোকে বাস করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্দনা-গানের মতন মানুষের কণ্ঠের শান্ত সুর যেন মনকে আরও উতলা ক'রে তোলে। এদের গাইয়ে মেয়েদের সুর খুবই মিষ্টি ও পরিষ্কার, যতখানি উপরে উঠুক কখনও সুরের ব্যতিক্রম হয় না; তেমনই আবার নীচুতেও পরিষ্কার চলে।

আমি যেখানে আছি এও একটা শান্তিনিকেতন। ছাত্র-ছাত্রীরা নাচগান খেলাধুলা ও লেখাপড়া নিয়ে বেশ আনন্দে আছে। ভারতবর্ষকে এরা শ্রদ্ধা করে, ভারতীয় সংস্কৃতির যথাযথ মূল্য এরা দিতে জানে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই

এঁরা উদ্বুদ্ধ। তাঁর প্রতি এদের অসীম শ্রদ্ধা ও

এই ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী মানুষদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলি। এরা স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা, নম্র ও অল্পে তুষ্ট জাত। খাওয়া-পরাটা কোন রকমে চলে গেলেই এরা খুশী। এরা বেশভূষায় যত দূর পারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। ঘর-বাড়ীতেও নোংরামি দেখা যায় না—প্রত্যেক লোকের বাড়ীর সম্মুখে বাগান আছে, বাড়ীর চারি দিক্ যত দূর সম্ভব পরিষ্কার রাখে। এখানে এসে আর-একটা জিনিষ দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়, তা হচ্ছে এদের 'বাটিকে'র কাজ। ঘরে ঘরে এই শিল্পচর্চ্চা হচ্ছে। সকলেই প্রায় 'বাটিকে'র নানা কারুকার্য্যখচিত লুঙ্গী প'রে। ওদের এই 'বাটিকে'র লুঙ্গী ও চাদরের দাম খুব সস্তাও হয়, আবার খুব বেশী দামেরও আছে। মোম লাগায় মেয়েরা, ছোট ছোট রং-করার দোকানে রং ক'রে আনে। অনেক সময় মেয়েরা বাড়ীতেই একাজ সম্পন্ন করে। এক-একটি হাতে-তৈরি 'বাটিকে'র লুঙ্গী সম্পূর্ণ শেষ হ'তে পাকা এক মাস সময় লাগে।

আগষ্ট মাসে বলিদ্বীপে যাচ্ছি। সেই সময় সেখানে নাচ-গানের একটি বিরাট্ মহড়া বসে। তাছাড়া বলিদ্বীপেও নাচ-গানের একটি বিশেষ ধারা বর্ত্তমান। সেইটাই আমি বিশেষ ক'রে আয়ত্ত করতে সেখানে যাব। সেই দ্বীপের বাসিন্দারা প্রায় সকলেই হিন্দু, আমাদের মত শিব দুর্গা সরস্বতী ও বিষ্ণুর উপাসক। শিল্পকলা যেন এই দুই দ্বীপের লোকের রক্তের সঙ্গে মিশেছে। অর্থের অনটন আমাদের মত এদেরও আছে। তবে তাতে তারা মুষড়ে পড়ে নি, সব রকম ভাবে তারা শিল্পের পূজো করে।

জোগ্‌জা,
জাভা

জাভার নর্ত্তকী

রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ার বাদুড়

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের নাম বোধ হয় সকলের নিকটই পরিচিত। মশা, ডাঁশ, ছারপোকা, জোঁক প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়, ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরাও সেইরূপ মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীদের রক্ত খাইয়া প্রাণধারণ করে। ইহারা ঘুমন্ত মানুষের শরীর হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, রক্ত মোক্ষণ করিবার পূর্ব্বে ভ্যাম্পায়ার ডানার হাওয়া দিয়া লোককে গভীর নিদ্রাভিভূত করে এবং সুবিধামত কোন স্থানের চামড়া কাটিয়া রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

দক্ষিণ- ও মধ্য- আমেরিকাই ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের বাসস্থান। সভ্য জগতের মানুষ রক্তশোষক বাদুড়ের অস্তিত্ব অবগত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভ্যাম্পায়ার কথাটা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 'মায়া'দের মধ্যে রক্তশোষণকারী প্রাণী সম্বন্ধে অদ্ভুত বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা রক্তশোষণকারী কল্পিত বাদুড়-দেবতাকে ভয় ও ভক্তি করিত। পূর্ব্ব-ইউরোপীয় লোকেরা রক্তশোষক অশরীরী কোন কল্পিত জীবকে 'ভ্যাম্পায়ার' বলিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, রাত্রির অন্ধকারে মৃত ব্যক্তির শরীর হইতে তাহার আত্মা বাহির হইয়া আসে এবং গরু, ঘোড়া, পাখী, সাপ এমন কি অগ্নিশিখা বা খড়কুটার আকার ধারণ করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির শরীর হইতে রক্ত চুষিয়া লয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও এ ধরণের অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত ছিল। আমেরিকার সহিত সভ্য জগতের সংস্রব ঘটিবার পর এই সব কিংবদন্তী নানা ভাবে রূপান্তরিত হইয়া ইউরোপীয় দেশসমূহে অবশেষে বাদুড়কেই রক্তশোষক প্রাণী বলিয়া ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তচোষা অর্থাৎ 'ভ্যাম্পায়ার' কথাটা বাদুড়ের নামের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী কালে প্রাণিতত্ত্ববিদেরা আমেরিকার নানা স্থানে বহু অনুসন্ধানের ফলে নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারিলেন

ভ্যাম্পায়ার বাদুড়

যে, দক্ষিণ- ও মধ্য- আমেরিকায় সত্য সত্যই এমন এক জাতীয় বাদুড় আছে যাহারা মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়। কিন্তু উহারা কোন্ জাতীয় বাদুড় এবং উহাদের বিশেষত্বই বা কি, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। কারণ বাদুড় নিশাচর প্রাণী; তদুপরি ইহারা এমন স্থানে বাস করে যে তখনকার দিনে বিদেশী মানুষের পক্ষে সেরূপ অপরিচিত দুর্গম স্থানে প্রবেশ করা এক রকম দুঃসাধ্য ছিল। কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছু না জানার ফলে লোকে নানা প্রকার ভয়মিশ্রিত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাছাড়া ফলভোজী কয়েক জাতীয়
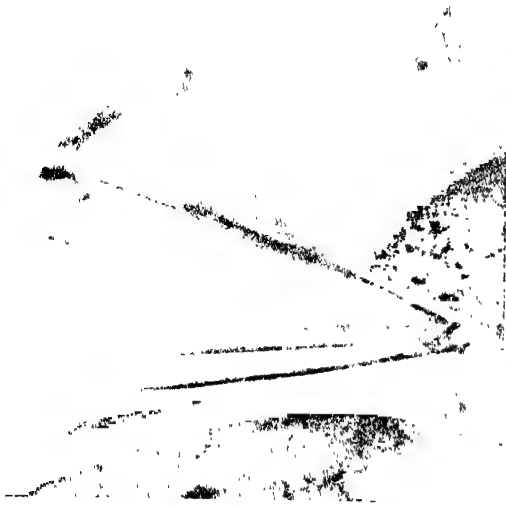
দিনের বেলায় রক্তশোষক বাদুড় বিশ্রাম করিতেছে

বৃহদাকার বাদুড়ের কথা বাদ দিলেও ইহারা পুরানো ভাঙাবাড়ী, শ্মশান বা পরিত্যক্ত নির্জ্জন স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্ধকারে ইহাদের গায়ের রং এমন বেমালুম মিশিয়া যায় যে, একমাত্র শব্দ ছাড়া সহজে তাহাদের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। এই অবস্থায় নির্জ্জন স্থান হইতে মাঝে মাঝে তাহাদের বিকট চীৎকার মানুষকে স্বভাবতঃই ভীতিবিহ্বল করিয়া তোলে এবং অশরীরী প্রেতাত্মার ধারণা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড় সম্বন্ধেও এই কারণেই ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার ভীতি-উৎপাদক কাহিনী ও আজগুবি গল্প প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করিত, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও বিদ্‌ঘুটে বাদুড়গুলিই ভ্যাম্পায়ার। এই সকল অদ্ভুত ধারণার ফলেই তৎকালীন গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল যে, ভ্যাম্পায়ার বাড়ড় মানুষ ও পশ্বাদির উপর উড়িয়া উড়িয়া ডানার হাওয়ায় তাহাদিগকে নিদ্রাভিভূত করিয়া ফেলে। অবশেষে শিরার মধ্যে লম্বা জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শুষিয়া লয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ ডিট্‌মার্‌স্‌ ও মিঃ গ্রিনহল নামক দুই জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালে মিঃ ডিট্‌মার্‌স্‌ প্রাণিসংগ্রহ-অভিযানে মধ্য-আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তখন পানামার এক গবেষণাগারে ডাঃ ক্লার্ক ভ্যাম্পায়ার বাদুড় সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। মশা যেমন রোগবীজাণু বহন করিয়া মনুষ্যদেহে ম্যালেরিয়া বিস্তার করিয়া থাকে, এই বাদুড়েরাও সেইরূপ 'ট্রাইপেনোসোম' নামক এক প্রকার জীবাণু বহন করিয়া এক প্রাণীর শরীর হইতে অন্য প্রাণীর শরীরে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ঘোড়া খচ্চর প্রভৃতি জন্তুর শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করিলে তাহারা এক প্রকার অবসাদক রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। গরু-বাছুরের রক্তের মধ্যে এই ট্রাইপেনোসোম প্যারাসাইট দেখিতে পাওয়া যায়।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড় একটি ছাগলের রক্তশোষণে উদ্যত।

আশ্চর্য্যের বিষয়, গরু-বাছুরের রক্তে এই অবসাদক রোগোৎপাদক জীবাণু থাকা সত্ত্বেও তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু ঘোড়া বা খচ্চরের রক্তে এই জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দিলে মারাত্মক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে পানামা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে প্রতি-বৎসর বহু ঘোড়া ও খচ্চর এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বর্ত্তমানে অবশ্য প্রতিষেধক আবিষ্কার হওয়ায়

ব্রেজিলের 'জাভেলিন' ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ঝুলিয়া আছে।

কারণ তখন বহুসংখ্যক ঘোড়া-গরু রাত্রিকালে এক আস্তানার মধ্যেই রাখা হইত। বাদুড়েরা নির্ব্বিচারে ঘোড়া ও গরুর রক্ত পান করিবার সময় তাহাদের মুখ-সংলগ্ন বীজাণুগুলি ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইত। ডাঃ ক্লার্ক এই সম্বন্ধেই গবেষণা করিতেছিলেন। মিঃ ডিট্‌মারস্‌ তাঁহার ভ্রমণাবসানে পানামায় ডাঃ ক্লার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এই অদ্ভুত বাদুড় সংগ্রহ করিতে উৎসাহিত হন। ডাঃ ক্লার্ক বিবিধ পরীক্ষা-কার্য্যের জন্য গবেষণাগারে কতকগুলি ভ্যাম্পায়ার বাদুড় পুষিতেছিলেন। নিকট-বর্ত্তী কসাইখানা হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে খাওয়াইতেন। তিনি দুই-একটি বাদুড়ও হস্তান্তর করিতে অসমর্থ হওয়ায় মিঃ ডিট্‌মারস্‌ নিজেই এই বাদুড় ধরিবার মনস্থ করিলেন। ১৯৩৩ সালে মিঃ গ্রিণহলকে সঙ্গে লইয়া বাদুড় ধরিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় তিনি পানামায় উপস্থিত হইলেন। কয়েক জন পথপ্রদর্শক

এই রোগের প্রকোপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। তখন কিন্তু ইহাই একটা মস্ত সমস্যা ছিল যে, গরুর রক্ত হইতে এই জীবাণুগুলি ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করে কেমন করিয়া? বিশেষ অনুসন্ধানের পর অনেকেরই সন্দেহ হইল যে, ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরাই এই জীবাণুগুলিকে বহন করিয়া ঘোড়ার রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ম্যালেরিয়া-মশার মত ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ই ট্রাইপেনোসোম জীবাণুর বাহক।

সঙ্গে দিয়া ডাঃ ক্লার্ক তাঁহাদিগকে চ্যাগ্রেস উপত্যকার ভ্যাম্পায়ার-অধ্যুষিত চিলিব্রিলো গুহা অনুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিলেন। এই গুহাগুলি সুড়ঙ্গের মত; চুনা পাথরের মধ্যে বরাবর শয়ান ভাবে অবস্থিত। স্থানে স্থানে চওড়া হইয়া সুড়ঙ্গগুলি বড় বড় কুঠরির আকার ধারণ করিয়াছে। কুঠরির পার্শ্ব হইতে অন্যান্য সুড়ঙ্গ নির্গত হইয়া পাহাড় অবধি চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানকারীরা

কোমরবন্ধে ব্যাটারি আঁটিয়া, মস্তক-বন্ধনীর সহিত বৈদ্যুতিক বাতি লাগাইয়া সেই দুর্গম পথের উদ্দেশে রওনা হইলেন। গুহার নিকটবর্ত্তী স্থানে একটা কুটীরের মধ্যে তাঁহারা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের অত্যাচারের একটি নিদর্শন দেখিতে পাইলেন। দশ বৎসর বয়স্ক একটি বালক সে-স্থানে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ বার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বারেই তাহাকে দংশন করিয়াছে ঘুমন্ত অবস্থায়, পায়ের আঙুলের নীচে। প্রত্যেক বারেই সে সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইত, প্রচুর রক্তপাতের ফলে তাহার বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহাদের অভিযান ব্যর্থ হইবে না। তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গুহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—গুহা পর্য্যন্ত যাইবার রাস্তা অতিশয় কদর্য্য। গরু বাছুর যাইবার সঙ্কীর্ণ জুলি-পথ। উপরের দিক্ কাঁটালতায় সমাচ্ছন্ন। বর্ষার দরুন নীচে হাঁটু অবধি কর্দ্দম। গুহার সম্মুখভাগ ভয়ানক খাড়াই এবং কাঁটালতায় পরিপূর্ণ। পথপ্রদর্শকেরা সেই কাঁটালতার মধ্য দিয়াই কোন রকমে পথ করিয়া একটি অপ্রশস্ত গর্ত্ত খুঁজিয়া বাহির করিল। সকলে মিলিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িলেন এবং কিছু দূর অগ্রসর হইয়া শয়ানভাবে অবস্থিত একটি লম্বা সুড়ঙ্গের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সুড়ঙ্গটি এতই অপ্রশস্ত যে, দুই জন লোকের পাশাপাশি খাড়া হইয়া অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, এক জনের পশ্চাতে আর এক জন, এই ভাবে কিছু দূর গিয়া দেখিতে পাইলেন—সুড়ঙ্গটি ক্রমেই চওড়া হইয়া গিয়াছে। এস্থলে সুড়ঙ্গের ছাতও খুব উঁচু; পায়ের তলায় পিচ্ছিল লাল কর্দ্দম। স্থানে স্থানে দেওয়ালের ফাটল হইতে তীরবেগে সরু সরু জলধারা নির্গত হইতেছিল। কোথাও হাঁটু পর্য্যন্ত জল জমিয়াছে। বেশীর ভাগ জলই নীচের ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নভূমিতে চলিয়া যাইতেছে। ছাতের দিকে আলো ফেলিবামাত্রই দেখা গেল—কতকগুলি বাদুড় দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। সুড়ঙ্গপথে আরও অনেক দূর আগাইয়া যাইবার পর আবার জল দেখা গেল। সম্মুখের দিক যেমনই প্রশস্ত তেমনই উঁচু। স্থানটা প্রকাণ্ড একটা কুঠরির আকার ধারণ করিয়াছে। দেওয়ালগুলি গ্যালারির আকারে সজ্জিত। গুহার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের অন্যান্য গুহার মত মোটেই নয়। বাতাস অত্যন্ত গরম এবং অসংখ্য বাদুড়ের গাত্রনিঃসৃত মিষ্ট মিষ্ট গন্ধে ভরপুর। দেওয়ালের গায়ে তাঁহারা অনেক রকমের ভীষণদর্শন রক্তশোষক কীটপতঙ্গ দেখিতে পাইলেন। এই স্থলে উপস্থিত হইয়া জালগুলি ঠিক করিয়া পথপ্রদর্শকেরা বাদুড় ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কিন্তু রক্তশোষক বাদুড়ের সাক্ষাৎ মিলিল না।

সুড়ঙ্গপথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা আরও একটি প্রকাণ্ড কুঠরি দেখিতে পাইলেন। এই কুঠরির ছাত প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু এবং অনেকটা মসৃণ দেখাইতেছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ততটা মসৃণ নহে। বিভিন্নজাতীয় অসংখ্য বাদুড় সেই ছাতের গায়ে নখ আটকাইয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতেছিল, কীটপতঙ্গভুক্ ও ফলভোজী ছোট ছোট বাদুড়গুলি দলে দলে বিভক্ত হইয়া ছাতের এক পাশে আশ্রয় লইয়াছে। সুচালো মুখ বাদুড়গুলি ছাতের মধ্যস্থল হইতে মাথা ঘুরাইয়া আগন্তুকদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বিজলী বাতির আলো তাহাদের উপর ফেলিবামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের ডানার ঝটপট শব্দে গুহাভ্যন্তর মুখরিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বাদুড়গুলির বিকট চীৎকার একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সেখানেও ভ্যাম্পায়ারের কোন সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা পাশের আর একটি গ্যালারির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্যালারির উপরিস্থিত ছাতে অনেকগুলি প্রকাণ্ড বাদুড় দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে আঠারটি বাদুড় বন্দী হইল। সেগুলিকে তারের খাঁচায় পুরিয়া তাঁহারা আবার ভ্যাম্পায়ারের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নজর রাখিয়াছিলেন কোথাও ভ্যাম্পায়ারের সাক্ষাৎ মিলে কি না? কিন্তু

ভ্যাম্পায়ারের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সহজেই ভ্যাম্পায়ারকে চিনিতে পারা যায়। ভয় পাইলে ইহারা অন্যান্য বাদুড়ের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওড়ে না। ইঁদুর বা কাঠবিড়ালীর মত খাড়া দেওয়ালের উপর দিয়া ছুটিয়া পালায় এবং চক্ষের নিমেষে কোন গর্ত্ত বা ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া আত্মগোপন করে। যাহা হউক, অনুসন্ধানকারীরা নিরুৎসাহ না হইয়া উক্ত কক্ষের পার্শ্বস্থিত অপর একটি গভীরতর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য অদ্ভুতাকৃতির বাদুড় দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল না। বিফলমনোরথ হইয়া অগত্যা তাঁহারা সেই অন্ধকূপ হইতে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কিছুক্ষণ দম লইবার পর তাঁহারা আর একটি গুহার দিকে অগ্রসর হইলেন। একটি ঢালু পথ ধরিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড একটি গোলাকার কক্ষে উপনীত হইলেন। কক্ষটি প্রশস্ত হইলেও ছাত আট ফুটের বেশী উঁচু নহে। এখানে সূচালো-নাসাবিশিষ্ট অসংখ্য ফলভোজী বাদুড় ঝুলিতেছিল। অন্যান্য বাদুড়েরা যেমন লোকজনের সাড়া পাইলে অথবা আলো দেখিবামাত্রই উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, এই বাদুড়গুলি অতটা ভীরু নহে। খুব কাছে গিয়া ধরিবার উপক্রম করিলে অথবা হাত-পা নাড়িলে ইহারা দলে দলে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। এস্থলেও তাঁহারা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কোন সন্ধান পাইলেন না।

এই গোলাকার গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা অপর একটি সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথটি ছিল একেবারে খাড়া, সরু মুখ পাতকুয়ার মত। জাল লইয়া এক জন লোকের পক্ষে নীচে নামা কষ্টকর ব্যাপার। একে একে অতিকষ্টে তাঁহারা নিম্নে অবতরণ করিয়া শয়ানভাবে অবস্থিত একটা লম্বা সুড়ঙ্গ পাইলেন। সুড়ঙ্গপথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আলো ফেলিবামাত্রই দেখিতে পাইলেন—মধ্যমাকৃতির কতকগুলি বাদুড় খাড়া দেওয়াল বাহিয়া ইঁদুরের মত ছুটিয়া পলাইতেছে। বাদুড়গুলির ছুটিবার অদ্ভুত ভঙ্গী দেখিয়াই তাঁহারা সেগুলিকে ভ্যাম্পায়ার বলিয়া চিনিতে পারিলেন। কিন্তু ধরিবার চেষ্টা করিতে-না-করিতেই তাহারা গর্ত্ত ও ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। এত কষ্টের পর এতগুলি ঈপ্সিত প্রাণী হাতের কাছে পাইয়াও কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহারা অনেকটা নিরুৎসাহ হইলেও একেবারে হতাশ হইলেন না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আলো দেখিয়া বাদুড়গুলি ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়া থাকিলেই আবার তাহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু বৃথা আশা। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর আলো নিবাইয়া নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু ভ্যাম্পায়ারেরা অদৃশ্য স্থান হইতে বাহির হইল না। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা পার্শ্বস্থিত ফাটলের মধ্য দিয়া অপর একটি কক্ষে ঢুকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রবেশ-পথটি এত সঙ্কীর্ণ যে, এক জন লোক অতিকষ্টে চাপিয়া ঢুকিতে পারে। সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া কেহই সেদিন আর উক্ত ফাটলের ভিতর ঢুকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

যেস্থানে ভ্যাম্পায়ার দেখা গিয়াছিল, পরদিন অতি প্রত্যূষে তাঁহারা নূতন জাল লইয়া সেস্থানে অগ্রসর হইলেন। আলো নিবাইয়া অতি সন্তর্পণে গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। একটি বাদুড়ও তাঁহাদের নজরে পড়িল না। এতগুলি বাদুড় তবে কোথায় গেল? সকলেরই ধারণা হইল—ঐ সঙ্কীর্ণ ফাটলের অপর দিকের গুহার মধ্যেই তাহারা লুকাইয়াছে। মিঃ গ্রিণহল সেই ফাটলের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন বাস্তবিকই বহুসংখ্যক ভ্যাম্পায়ার একটা প্রশস্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আলো জ্বলিবামাত্রই তাহারা সেই সরু গলিপথে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কোন প্রকারে তিনি দুইটি বাদুড়কে বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। ধরা পড়িবার কিছুক্ষণ বাদেই একটি বাদুড় মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বোধ হয় বেকায়দায় পড়িয়া জালের আঘাতে জখম হইয়াছিল। অপরটি কয়েক মাস অবধি জীবিত ছিল। সেটা ছিল স্ত্রী-বাদুড়। বন্দী-শালায় মাস-তিনেক পরে সে একটি হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা প্রসব করে। ইহাদের গর্ভধারণকাল কত দিন তাহা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় নাই, তবে ইহাদের মত ক্ষুদ্রকায় স্তন্য-

প্রাণীদের পক্ষে তিন মাসের অধিক সময় যে খুব দীর্ঘ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহারা এই একটি ভ্যাম্পায়ার বাদুড় লইয়াই নিউইয়র্কে রওনা হইলেন। পূর্ব্বধৃত সেই আঠারটি বাদুড়ও অবশ্য এই সঙ্গে ছিল। এই দশ দিনের রাস্তা বাদুড়টিকে জীবিতাবস্থায় লইয়া যাইতে পারিবেন কিনা এই হইল তাঁহাদের প্রধান সমস্যা। অপর বাদুড়গুলি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না, যেহেতু আস্ত মাংস পাইলেই তাহারা প্রচুর পরিমাণ উদরস্থ করিত। যাহা হউক, ডাঃ ক্লার্ক যন্ত্রসাহায্যে 'ফাইব্রিন' পৃথক করিয়া দুই বোতল রক্ত তাহাদের সঙ্গে দিলেন। 'ফাইব্রিন' পৃথক করিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে রক্ত জমাট বাঁধিবে না। ভ্যাম্পায়ারের খাঁচাটিকে কালো কাপড় মুড়িয়া সুবিধামত স্থানে রাখিয়া দিলেন যেন বাহিরের আলো-বাতাস ইহার কোন অনিষ্ট না করিতে পারে। বাদুড়টা খাঁচার মধ্যে মাথা নীচু করিয়া ঝুলিয়া থাকিত। খাইবার জন্য প্রত্যেক দিন প্রায় আধ গ্লাস করিয়া রক্ত খাঁচার মধ্যে দেওয়া হইত; কিন্তু লোকজন কাছে থাকিলে কিছুতেই সে খাইতে আসিত না, পরের দিন সকালে দেখা যাইত রক্তের পাত্রটি খালি পড়িয়া আছে। এই ভাবে অতি সতর্কতার সহিত বাদুড়টিকে সুস্থাবস্থায় নিউইয়র্কে আনিয়া পশুশালার সরীসৃপের ঘরে রাখা হইল। সেখানে ঘরের তাপ ও আবহাওয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইত। এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রক্ত খাইতে দিয়া বৈদ্যুতিক ফ্ল্যাশ-লাইটের সাহায্যে তাহার চালচলন প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কোন্ সময় সে যে রক্ত পান করিয়া যায় তাহা কাহারও নজরে পড়িল না।

অনেক দিনের অক্লান্ত চেষ্টার পর এক দিন পর্য্যবেক্ষক দেখিতে পাইলেন, ভ্যাম্পায়ার কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে খাঁচার গা বাহিয়া নামিয়া আসিল। ডানার সম্মুখস্থ বাহু ও পিছনের পায়ের সাহায্যে ভূমি হইতে উঁচু হইয়া ক্ষুদ্রাকায় চতুষ্পদ প্রাণীদের মত হাঁটিয়া ভোজনপাত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে হইল যেন একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়াছে। পাত্রটার কাছে উপস্থিত হইয়া মুখ নীচু করিয়া সে রক্তপানে ব্যাপৃত হইল। এই বাদুড়ের জিহ্বাটি বেশ লম্বা। বিড়াল যেমন করিয়া জল পান করে, ইহারাও সেইরূপ ভাবেই রক্তপান করিয়া থাকে। প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যেই ভ্যাম্পায়ার পাত্রের সমুদয় রক্ত নিঃশেষ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া চলিল। এত রক্ত পান করিবার দরুন পেটটি ফুলিয়া গোল হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায় তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে খাঁচায় উঠিয়া গেল এবং এক পায়ে ঝুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যে সে এমন পোষ মানিয়া ছিল যে, লোক-জন বা আলো দেখিলে আর ভয় পাইত না।

১৯৩৪ সালে মিঃ গ্রিণহল পুনরায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের সন্ধানে যাত্রা করেন। আরও কয়েক জন ভদ্রলোকের সহায়তায় তিনি ট্রিনিডাডের 'ডিয়েগো মার্টিন' নামক গুহা হইতে আটটি ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ধরিতে সমর্থ হন। ট্রিনিডাডে অধ্যাপক ইউরিকও ভ্যাম্পায়ারের রক্তশোষণ-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার একটি পোষা ভ্যাম্পায়ার ছিল। সেটির সাহায্যে তিনি ছাগল, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীর শরীর হইতে রক্তশোষণ-প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পর্য্যবেক্ষণের ফলে তিনি দেখিয়া-ছেন ভ্যাম্পায়ার রক্ত চুষিয়া খায় না; বিড়াল-কুকুরের মত জিহ্বার সাহায্যে রক্ত পান করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইহারা কয়েক বার বৃত্তাকারে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু অধ্যাপক ইউরিক সেরূপ কোন ব্যাপার দেখিতে পান নাই। ইহারা বিশ্রামস্থল হইতে হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে শিকারের শরীরের উপর অবতরণ করে এবং সুবিধামত স্থানের চামড়া কাটিয়া প্রায় আট-দশ মিনিট পর্য্যন্ত রক্ত পান করিয়া ফিরিয়া যায়। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীদের বেলায় ইহারা প্রায়ই পায়ের নিকট কোন স্থানে দংশন করিয়া রক্ত পান করে।

মিঃ গ্রিণহলের আটটি ভ্যাম্পায়ারকেই প্রোঃ ইউরিকের বাদুড়ের ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার পোষা বাদুড়টির নাম ছিল টমি। টমিকেও সেখানে রাখা

হইল। এখানেই তাঁহারা বাদুড়ের আহার-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মিঃ গ্রিণহল লিখিয়াছেন—অধ্যাপক ইউরিককে সঙ্গে লইয়া এক দিন আমরা সন্ধ্যা ছয়টার সময় বাদুড়গুলির অবস্থা তদারক করিতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, ভ্যাম্পায়ারের খাঁচার মধ্যে একটা ছাগল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাগলটার শরীর হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল দেখিয়াই বুঝিলাম, অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বাদুড়েরা তাহার শরীরে দংশন করিয়াছে। ছাগলটার ঘাড়ের কাছে একটি এবং বাম পার্শ্বে দুইটি তাজা ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল। আমরা যখন খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন ছাগলটা এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার শরীরের উপর কোথাও বাদুড় দেখিতে পাইলাম না। টমির দরজা খুলিয়া দেওয়া মাত্রই সে উড়িয়া আসিয়া বেড়ার জালের উপর পড়িল। সেখান হইতে ছাগলটা বেশী দূরে ছিল না। তথাপি সে তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সেই স্থানেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিল। তার পর জিব ও দাঁত বাহির করিয়া এদিক-ওদিক মাথা নাড়িতে নাড়িতে চক্ষের নিমেষে হঠাৎ উড়িয়া গিয়া ছাগলটার পিঠের উপর পড়িল। ছাগলটা কিন্তু একটুও নড়িল না। ভ্যাম্পায়ার তাহার গলা ও ঘাড়ের উপর কয়েক বার ঘুরিয়া ফিরিয়া এক স্থানে লোমের নীচে মাথা প্রবেশ করাইয়া দিল। মাথাটাকে বার-কয়েক উঠা-নামা করিতে দেখা গেল মাত্র। কিছুক্ষণ বাদেই ছাগলটা তাহার মাথাটাকে ডাইনে বাঁয়ে দোলাইয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ছুটাছুটিতে বাদুড়টা যে কিছুমাত্র ঘাবড়াইয়াছে এমন লক্ষণ দেখা গেল না। খানিকক্ষণ ছুটাছুটির পর সে আমার অতি নিকটেই চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহার ঘাড়ের উপর হইতে রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছে, এবং বাদুড়টা লম্বা জিব দিয়া সেই রক্ত চাটিয়া খাইতেছে। ছাগলটা আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিল এবং ঘুরিতে ঘুরিতে একটা নীচু টেবিলের তলায় ঢুকিয়া পড়িল। টেবিলের তলায় ঢুকিবার সময় তাহার ঘাড়টা কাঠের সঙ্গে ঘষড়াইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে বাদুরটা গা বাঁচাইবার জন্য সড়াক্ করিয়া এক পাশে সরিয়া পড়িল। ছাগলটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হইবামাত্রই টমি আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া রক্তপানে প্রবৃত্ত হইল। যত বার আমরা ছাগলটাকে টেবিলের নীচে যাইতে বাধ্য করিলাম, তত বারই বাদুড়টাকে কাঁকড়ার মত অদ্ভুত ভঙ্গীতে সরিয়া যাইতে দেখিলাম। কিছুক্ষণ রক্তপানের পর ছাগলটা যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। কতকগুলি ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারিলাম, যন্ত্রণা অপেক্ষা ছাগলটা আমাদের উপস্থিতিতেই ভয় পাইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবার সময়ও দেখিতে পাইলাম, বাদুড়টা তখনও রক্ত পান করিতেছে। কিছু দিন পরে ছাগলের ঘা শুকাইলে দেখা গেল ক্ষতের সিকি ইঞ্চি পরিমিত স্থান লোমশূন্য ও কিঞ্চিৎ উঁচু হইয়া রহিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, ভ্যাম্পায়ারের মুখনিঃসৃত লালার মধ্যে এমন কোন পদার্থ থাকে যাহাতে রক্ত জমাট বাঁধিতে পারে না। এই কারণেই ক্ষতস্থান হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সুবিধা পাইলে ভ্যাম্পায়ার ছাগল, ঘোড়া, গরু, শুকর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি কোন প্রাণীরই রক্ত পান করিতে ত্রুটি করে না। ভ্যাম্পায়ারের দংশনে প্রচুর রক্তপাতের ফলে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীরা প্রায়ই মারা পড়িয়া থাকে। প্রথম দংশনের সময় আক্রান্ত প্রাণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু পরে সে যাতনা-বোধ থাকে না। ঘুমন্ত প্রাণীরা তো মোটেই কিছু টের পায় না। ভ্যাম্পায়ার-আক্রান্ত অনেকেই বলিয়াছে যে, রক্ত দেখিবার পূর্ব্বে তাহারা মোটেই কিছু টের পায় নাই। ভ্যাম্পায়ারের আর একটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায় যে, ইহারা পুনঃ পুনঃ একই স্থানে দংশন করিয়া থাকে অথবা দিনের পর দিন পুরাতন ক্ষত হইতেই রক্ত পান করিয়া থাকে। ইহারা যেমন গরু-বাছুরের শরীর হইতে 'ট্রাইপেনোসোম্ প্যারাসাইট' বহন করিয়া ঘোড়ার রক্তে সঞ্চারিত করে, নিজেরাও তেমনই এই জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে ইহাদের শরীরে জীবাণুর প্রতিক্রিয়া হইতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড় দুই-তিন দিনের বেশী না খাইয়া থাকিতে পারে না। ইহাদের জঠরাগ্নি অতিশয় প্রবল, যতই রক্ত পান করুক না কেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে হজম হইয়া যায়। আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত 'ডেস্‌মোডাস্', 'ডিফাইলা' এবং 'ডায়ামাস্' নামক তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

হিণ্ডেনবার্গ ও হিটলার—১৯৩৩ সালে হিটলারের মন্ত্রীপদ লাভের পর উভয়ের সাক্ষাৎ। এক জন বিপুল নৈরাশ্যের মধ্যে দেশরক্ষার জন্য বৃদ্ধবয়সেও রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণ করেন। অন্য জন পাশব শক্তি দ্বারা দেশকে দ্রুত বিনাশের পথে লইতেছেন।

হিটলার ও গোয়েরিং। পৃথিবীর অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে ইঁহারা বদ্ধপরিকর। হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার অবর্তমানে গোয়েরিং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

পোল্যাণ্ডের মন্ত্রী জেনারাল সক্লাড্‌কভ্‌স্কি ও জার্মান অমাত্য ফন রিব্বেনট্রপ

জার্মান রাষ্ট্রসদনে হিটলারের কক্ষ—জগদ্ব্যাপী অশান্তি-সৃষ্টির কল্পনা এইখানেই প্রথম ধূমায়িত হয়।

মাতৃপূজা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

বৃদ্ধ সান্ন্যাল মহাশয় একলা বাহিরের বারান্দাটিতে একটা ঈজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত এই সময়টায় বাড়ীর হাতায় একটু হাঁটিয়া বেড়াইতেন, আর পারেন না, লাঠি ধরিয়া চলিতেও কষ্ট হয় এখন।

ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ হইতে বাড়ীর ভিতর গ্রামোফোন বাজাইতেছে। রাজবাড়ীর অম্বিকাদৎ তেওয়ারীর গান, আর বশীর খাঁর সুরবাহার শুনিয়া যাহার জীবন কাটিল, এই সব নিক্তিতে ওজন করা আড়াই-পৌনে তিন টাকার গানে তাহার মনের তন্ত্রীতে বেসুরা আঘাত দেয়।··· কোথায় অম্বিকাদৎ, কোথায়ই বা সুরবাহারী বশীর খাঁ! খেয়ার ওপারে যদি আবার দেখা হয়···

হঠাৎ আগমনীর সুর উঠিল, রেকর্ডেই। ওরা রেগুলেটার ঘুরাইয়া লয়টা বিলম্বিত করিয়া দিয়াছে। টানিয়া টানিয়া আনন্দে-কারুণ্যে-মেশা সুরটা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। যুগ-যুগ ধরিয়া প্রবাহিত কি যে অদ্ভুত একটা সুর!—যন্ত্রনিপীড়িত হইলেও যেন একেবারে প্রাণে গিয়া স্পর্শ করে।···পূজার আর একুশটি দিন দেরি। ···চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিতেছে,—সত্যই কি তবে আর একবার মাকে দেখাটা ঘটিল?··· মা, আর মাত্র একুশটি দিনের পরমায়ু ভিক্ষা,—এই তো শেষ দেখা···

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। কয়েকটি ছোকরা বারান্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আগে-পিছে হইয়া বৃদ্ধের চারি দিকে দাঁড়াইল। সবাই যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল, একটি ছোকরা ভক্তিভরে পদধূলি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধের শ্রুতির উপযোগী করিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আজকাল আছেন কেমন আপনি?"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কি রকম থাকা আশা কর আর?" তাহার পর একটু ঠাহর করিয়া বলিলেন, "অমরের নাতি না তুমি?···সব বড় হয়ে উঠেছ, বেরুতে তো আর পারি না, অনেককে আর চিনবই না বোধ হয়।···তা ব'সো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব?"

পাশের একটি ছোকরা চাপা গলায় বলিল, "আমরা সবাই বড় হয়েছি বলছে, এই তালে আসল কথাটা তোল্ না হীরেলাল।"

হীরালাল বলিল, "এই বসছি; বসার জন্মে তাড়াতাড়ি কি?—ইয়ে, আমরা এসেছিলাম এবারের পূজোর সম্বন্ধে···"

বৃদ্ধ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছ। পূজোর কথাই ভাবছিলাম, আর তো দেরি নেই। যতীন আর অনুপল এসেছিল সেদিন—বলছিল এবার মাকে চার দিন পাওয়া যাবে, একটু ভাল ক'রে পূজোটা করবার ইচ্ছে। অনুপম তার কোন্ মক্কেলকে ধ'রে প্রতিমার জন্যে একটা মোটা টাকা আদায় করেছে—বলে কেষ্টনগর থেকে কুমোর আনাব দাদামশাই,—ঠিকানা পাচ্ছি না···ওরা তো গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে—পেলে ঠিকানাটা?"

আগন্তুকদের মধ্যে মুখ-চাওয়াচাওয়ি হইতেছিল, একটু গা-টেপাটেপি হওয়ার পর হীরালাল বলিল, "আমরা ও-কথা নিয়ে ঠিক আসি নি। মানে, আমরা ভেবে দেখলাম পূজোটা আরম্ভ হওয়া অবধি ঠিক ডেমোক্র্যাটিক মেথডে হচ্ছে না। যাঁরা খাটছেন তাঁরা এমন ভাবে খাটছেন, এমন ভাবে চালাচ্ছেন যেন—যেন···"

হীরালাল বোধ হয় সাহায্যের জন্য এক বার পিছন দিকে চাহিল। সকলে সামনে একটু জায়গা করিয়া দিয়া এবং পিছন হইতে একটু একটু ঠেলিয়া একটি যুবককে সামনে আগাইয়া দিল।

ঠিক যুবক নয়, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইবে।

যুবকদের সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া এবং ক্ষৌরশিল্প ও বেশ-ভূষায় যুবকত্বের একটা প্রয়াস থাকায় যুবক বলিয়া প্রথমটা ভ্রম হয়। সামনে আসিয়া বেশ ঘটা করিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কই, তোমায় তো চিনতে পারলাম না বাপু।...আর বছর-দুই থেকে তো বেরুতেই পারি না এক রকম।

হীরালাল বলিল, "উনি এখানে নতুন এসেছেন, বছর-দেড়েক হবে; সাধনবাবুর ভাগ্নী-জামাই, গালা আর মধুর ব্যবসা করবেন।"

বৃদ্ধ কানের পিছনে হাতের আড়াল করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেমন চলছে ব্যবসা?"

ভাগ্নী-জামাই বলিল, "এখনও করি নি আরম্ভ, এইবার বসব ভাবছি·· পূজোর ব্যবস্থা নিয়ে সব এসেছি আপনার কাছে। গত বৎসর দেখলাম, এ বছরও দেখছি, শহরে যে পূজো হচ্ছে দু-দিন পরে—বাইরে দেখে-শুনে তো কিছুই বোধ হয় না। ঐ যে হীরালাল-বাবু বলছিলেন যাঁরা খাটছেন, তাঁরা এমন তদ্গত হয়ে লেগে পড়েছেন যে দেখলে মনে হয় পূজোটা তাঁদের ঘরের। গত বৎসরেও দেখলাম—এ-বছরেও দেখে যাচ্ছি—না আছে একটা মিটিং, না আছে ভোট, না আছে অফিস-বেয়ারারদের সিলেক্‌শ্যন—কেন ওঁরা খাটছেন, কে ওঁদের খাটবার অধিকার দিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারি না—তাই এঁদের বলছিলাম..."

বৃদ্ধ পাকা ভ্রূ কপালে তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না বাপু, মায়ের পূজো, মাকে ঘরে আনছ—আহ্লাদ ক'রে খাটবে না? অধিকার আর কে দেয় বাপু? —যিনি মা হয়ে আসেন তিনিই দেন অধিকার—শক্তি দেন, প্রাণ দেন।...তা সত্যিই ওদের দু-জনের মেহনৎটা বড্ড বেশী হয়ে পড়ে। তা হোক, মায়ের কাজ...আর তোমরাও তো রয়েছ, সামলে-সুমলে দাও..."

হীরালালের পাশে একটি ছোকরা কিছু বলিবার জন্য ক্রমাগত হাঁ করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিতেছিল, এ-সুযোগটা আর ছাড়িল না। মুখটা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কিন্তু সেটা কি অনধিকারচর্চ্চা হবে না?"—বলিয়া সমর্থনের জন্য ভাগ্নী-জামাইয়ের পানে চাহিল।

সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠিক তো, এক দিকে যেমন অনধিকারচর্চ্চা, অন্য দিকে আবার তেমনই আত্মসম্মানও তো আছে লোকের?"

বৃদ্ধ একটু বিমূঢ় এবং ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "যতী কি ডাকে না তোমাদের কাউকে?"

হীরালাল বলিল, "ডাকেন; কিন্তু ওসব আন্-কনস্‌টিটিউশ্যনাল্ ডাক আমরা শুনব কেন যতীন কাকাকে, অনুপমদা'কে এক জন প্রাইভেট লোক হিসেবে আমরা যথেষ্টই সম্মান করি; কিন্তু কথা হচ্ছে পাবলিক কাজে তো আর তাঁরা কাকা আর দাদা নন, তখন আমাদের দেখতে হবে—তিনি যে আমাদের আহ্বান দিচ্ছেন তার পিছনে জনমত রয়েছে কিনা।"

ভাগ্নী-জামাই বলিল, "আমি এঁদের বললাম, এখানে এই জনমত নেই বলেই পূজোটা যেন নিঃঝুমের ব্যাপার। দুটো লোক, কি চারটে লোক, কি ছ-টা লোক পুরুষানুক্রমে মুরুব্বিয়ানা করবে—যেন মৌরসী পাট্টা নিয়েছে—ছেলেছোকরারা মাথাটি নীচু ক'রে গাধার খাটুনি খাটবে—ব্যস্ হয়ে গেল পূজো! কাক-কোকিলে টের পেলে না।"

বৃদ্ধ বেশ একটু অধৈর্য্য হইয়া আঙুলে মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন, "বাপু, পূজোর হৈচৈ, হাঁকডাক, সে-সব পূজোর ক'টা দিনই হবে। তার আগে যতটা সুশৃঙ্খলায়, যতটা কম গোলমালে কাজ হয় ততই ভাল নয় কি?—আজ চল্লিশ বছর মাকে আনছি, আমরা তো এই জানি। সে যাক্, কিন্তু এখন তোমরা কি চাও বল দিকিন, শুনি।"

প্রায় সমস্ত দলটাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা চাই ডেমোক্র্যাটিক মেথড।"

ভাগ্নী-জামাই আর একটু টানিয়া বলিল, "পার্লামেণ্টে ওরা যে-মেথডটা চালাচ্ছে।"

বৃদ্ধ স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ওরাও দুর্‌গো-পূজো ধরেছে নাকি?'

হীরালালের পাশের ছোকরাটি বলিল, "আমরা চাই একটা জেনারেল মিটিং। সেই জন্যেই আপনার কাছে

এসেছিলাম। আমরা সবার সামনে জানতে চাই—যতী-কাকা আর অনুপম-দা কার হুকুমে কাজ করছেন

"তারা কাজ করছে ব'লে তাদের অপমান করাটা কি ঠিক হবে? তা ভিন্ন গোড়াতেই তো আমরা সব পরামর্শ করেছি একসঙ্গে ব'সে—প্রায় সব বুড়োরাই ছিল—রামসদয়, হরিবিলেস, হালদার, মন্মথ—যতীন আর-বছরের সব খরচপত্র দেখিয়ে-শুনিয়ে, কি ক'রতে হবে না-হবে ঠিক ক'রে নিলে··"

পিছন হইতে একটি লম্বাগোছের যুবক ডিঙি মারিয়া গলাটা আরও উঁচু করিয়া প্রশ্ন করিল, "কিন্তু আপনারা কি পরামর্শ দিতে অথরাইজ্‌ড্ হয়েছিলেন?"

কয়েক জন একটু উগ্রভাবে ফিরিয়া চাহিতে, ছেলেটি খপ্ করিয়া ভিড়ের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া লইল।

বৃদ্ধ শুনিতে পান নাই। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিলেন, "মিটিং জিনিষটাকে আমি ভয় করি বাপু, অন্য জায়গায় যা দু-একবার ওর রূপ দেখেছি!—তা বেশ, পরের বছর থেকে·

একটু ঠেলাঠেলি, টেপাটেপি পড়িয়া গিয়াছিল, হীরালাল বলিল, "আজ্ঞে, পরের বৎসরের জন্যে আমরা আর রাখতে পারলাম না; আমরা একটা মিটিঙের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি—আপনার নাম ক'রে।"

বৃদ্ধ অতিমাত্র বিস্ময়ে আরাম-চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "আমার নাম ক'রে! কিন্তু আমি তো বলি নি বাপু, তোমরা এ মিথ্যেটুকু কেন বলতে গেলে?"

সবাই একটু চুপ করিয়া রহিল। ভাগ্নী-জামাই বলিল, "ওরা সব ধ'রে নিয়েছিল আপনার মত হবেই। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি, আমরা তাহ'লে এখন আসি; মিটিংটা পরশু রবিবার সন্ধ্যে সাতটার সময় হবে রসময় কাকার বাড়ীতে। আপনাকে যেতেই হবে।"

যে-ছেলেটি অনধিকারচর্চ্চার কথা তুলিয়াছিল, বলিল, "আর মিথ্যের কথা যে বললেন—ন্যায় আর ধর্ম্মের জন্যে একটু মিথ্যে···"

পাশের একটি যুবক হাতটা টিপিয়া ইসারা করিতে থামিয়া গেল।

যাইবার সময় প্রায় সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধূলা লইল

সান্ন্যাল মহাশয় ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পরদিন বৈকালে যতীন, অনুপম, আরও দুই-তিন জন আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীন বলিল, "কুমোরের ঠিকানা জোগাড় করেছি দাদামশাই, লিখে দিলাম। এবার এখানে ব'সেই বাংলা দেশের প্রতিমা আপনাদের দেখাব।" মুখটা উৎসাহে দীপ্ত।

সান্ন্যাল মহাশয়েরও মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, গড়গড়ার নলে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "তা দেখলাম বোধ হয় তোমাদের কল্যাণে, আর কুড়িটা দিনও কি বাঁচব না? কিন্তু ভাল কথা,—ডেমোক্র্যাটিক্ পূজোটা কি বলতে পার? কথাটা অনেক কষ্টে মনে ক'রে রেখেছি—এক রকম জপমন্ত্র ক'রে; আন্দাজে মোটামুটি এক রকম বুঝলেও পুরো মানে ধরতে পারছি না।"

যতীন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আপনার কাছেও পৌঁছেছে কথাটা?···ও ঐ সাধন-কাকার ভাগ্নী-জামাইয়ের কাণ্ড। আজ দেড় বছর থেকে মামাশ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করছে। জিগ্যেস করলেই বলবে মধু আর গালা নিয়ে বসব এবার। কাজকর্ম্ম নেই, খালি ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে—কথায় কথায় পার্লামেণ্ট, কন্‌সটিটিউশন··· সেদিন আমার কাছে এসেছিল—ভাগিয়ে দিলাম। ঠোঁট-কাটা মানুষ তো?—বললাম, ছেলেগুলোকে হুজুগে না মাতিয়ে একটু কাজ করতে দিন তো?—সবাই তো আর চওড়া কাঁধওয়ালা মামাশ্বশুর পাবে না।···সেই থেকে ভয়ানক চটে আছে আমার ওপর। শুনছি খুব দল পাকাচ্ছে।"

অনুপম বলিল, "পাকাচ্ছে বইকি, সঙ্গে আবার রসময় বাবু যোগ দিয়েছেন,—ঐ যে সাধন-কাকার অন্নধ্বংস করছে, রসময় বাবুর আনন্দ রাখতে আর জায়গা নেই,—ক্রমাগত পিঠ ঠুকছে আর কুপরামর্শ দিচ্ছে—অমন কুচুটে লোক তো আর নেই।·· যখনই জামাইটা যাবার কথা তোলে, জঙ্গলে গালা আর মধুর ঠিকার সুবিধে ক'রে দেবে ব'লে আটকে রাখে।"

সান্ন্যাল মহাশয় বলিলেন, "তাই বুঝি রসময়ের

বাড়ীতেই কাল মিটিং করছে? আবার মিটিংটা করছে আমার নাম ক'রে অথচ আমায় জানায়ও নি আগে। কি অন্যায় দেখ, বলতে একটা ছেলে ফট ক'রে মুখের ওপর বললে—'ন্যায় আর ধর্ম্মের জন্যে মিথ্যা বলতে দোষ নেই।'...কি হ'ল গো কালে কালে? অথচ তোমরা এখনও মুখের ওপর একটা কথার জবাব দাও না।"

সান্যাল মহাশয় ক্লান্তভাবে ঘাড়টা ইজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। সকলেই চুপ করিয়া রহিল,—কথাটা সাধারণভাবে বলিলেও সান্যাল মহাশয়ের প্রাণে যে খুব লাগিয়াছে সেটা সকলে বুঝিতে পারিল। একটু পরে তিনিই বলিলেন, "যাক, তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম—যাতে পুজোটা ভালয় ভালয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো একটু। মিটিং করছে—একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলো সবাইকে, আমি তো আর যেতে পারছি না। আর তোমরা এই বছরটা কাটিয়ে দাও কোন রকমে বাপু—ঝগড়া-বিবাদ দেখে যেন না যেতে হয়—চল্লিশ বৎসর এক ভাবে ক'রে আসছি সবাই পুজোটা মিলে মিশে..."

কাজ করা অভ্যাস বলিয়া যতীনের চরিত্রই দাঁড়াইয়া গিয়াছে ছোট কথাগুলোকে আমল না দেওয়া। কর্ম্ম-প্রেরণায়, আশায়, আর সফলতার একটা উজ্জ্বল ছবিতে তাহার মনটা সর্ব্বদাই কানায় কানায় ভরিয়া থাকে। বলিল, "ওর জন্যে আপনি ভাবছেন কেন দাদামশাই, ওই ভাগ্নী-জামাইটাকে কষে একটা দাবড়ি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেগুলো তো এখানকার খুবই ভাল, একটু গায়ে হাত দিয়ে বুঝিয়ে বলুন—মাথাটি নীচু ক'রে নিজেদের ভুল মেনে নেবে। দিন-কতক বেশ চলল, প্রাণ দিয়ে কাজে মেতে উঠল সব,—তার পর আবার কি যে ভুজুং ভাজুং দেয়—, আবার দেখি ওই বুলি আওড়াচ্ছে—ডেমোক্র্যাসি কন্‌সটিটিউশ্যন, ভোট, ইলেকশ্যন,—ওটাকে না তাড়ালে আর ভদ্রস্থ নেই। 'গালা-গালা' করছে, জতুগৃহদাহ করতে পারতাম ওটাকে ভেতরে পুরে তো কতকটা ঝাল মিটত গায়ের।"

অনুপম বলিল, "এদিকেও কতকগুলো ছেলে বড় বেঁকে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাকে অনাদি হঠাৎ বললে—কাল রসময় বাবুর বাড়ীতে সব মিটিং করছে অনুপম-দা, আপনারা যেন যাবেন না।...জিগ্যেস করলাম—কেন রে?—বললে—ঐ মামাশ্বশুরের ঘরজামাইকে একচোট থুড়বো আমরা মিটিঙে, আপনারা গেলে মুখ খুলতে পারব না। দম ফুলে মরব।...অনেক ক'রে তো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি—বললাম—পরের বাড়ী অনাদি; সেখানে একটা গোলমাল করা ভাল হয় না—তোরা বরং যাসই নে। নিজেদের দু-চার জন নিয়ে মিটিং ক'রে আর কি করবে? তোরা ঐদিকে মাতলে আবার এদিককার কাজ পণ্ড হবে। বললে তো যাবে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সব যেন চটে আছে দেখলাম...

সোমবার সকালে অনাদি অনুপমের সঙ্গে দেখা করিল, হাসিয়া বলিল, "অনুপম-দা, সত্যি মা এবার দোলায়ই আসছেন, দুলিয়ে দিয়ে যাবেন।"

অনুপম জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিতে অনাদি বলিল, "কাল মিটিঙে ক্যাবিনেট ফরম্‌ হয়েছে—রসময়বাবু প্রেসিডেণ্ট, মোতিগঞ্জের সারদাবাবু ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট—"

অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সারদাবাবুকে কি ক'রে পাকড়াও করলে?"

অনাদি বলিল, "রসময় তাঁকে ভাগ্নী-জামাইয়ের সঙ্গে গালা আর মধু দিয়ে জুড়বে ঠিক করেছে..."

"বুঝলাম না।"

"বলেছে—ভাগ্নী-জামাই ব্যবসা সুরু করলেই সারদা-বাবুকে সাব-কনট্রাক্ট দেওয়াবে।...ও ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট, ভাগ্নী-জামাই সেক্রেটারি, হীরালাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি—ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকগুলো লোক জুটিয়েছে। রসময়বাবুর ছেলে খবর দিলে—বুড়ো গোবিন্দ আচার্য্যি পেটুক লোক, তাকে বলেছে আপনি ভোগের চার্জ্জে থাকবেন—সে রোগা হাতের ঘুসি নেড়ে মিটিঙে এস্তার 'ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি' ক'রে চেঁচাচ্ছিল—এই রকম ক'রে অনেককে হাত করেছে। একটা ফ্যাসাদ বাধাবে।'

অনুপম একটু উগ্রদৃষ্টিতে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে

ছিল, ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ক'রে?

"তা বলতে পারি না, তবে যতীনদার অতটা অসাবধান হওয়া ভাল হয় নি।"

দুই-তিন দিনের মধ্যে শহরের বাঙালী সমাজে বেশ একটা চঞ্চলতা লক্ষিত হইল এবং আরও দিন-দুয়েকের মধ্যে সত্তর-আশী ঘরের ক্ষুদ্র সমাজটি মাঝখানে একটা বেশ স্পষ্ট রেখা টানিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিল। এত তাড়াতাড়ি কি করিয়া ব্যাপারটা হইল অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঁধন দুই দিনে কি করিয়া ছিন্ন হইল—বোঝা গেল না, তবে হইল—বেশ নিঃসন্দেহ ভাবেই হইল। সেখানে পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আর কোন আলগা আবছায়া ভাব রহিল না। ভাবটা এই রকম,—'এ-পক্ষে, কি ও-পক্ষে? নাও, চটপট ঠিক ক'রে সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়ে পেছোও বা পা বাড়াও—চট্‌পট—মা আসতে আর মাত্র দিন-পনর বাকী, দোলায় আসবেন—জাতীয় চরিত্রের অঞ্জলি দিয়ে তাঁকে আবাহন করতে হবে।'

খোলার চালের চণ্ডীমণ্ডপ,—মাঝেরটি একটি বড় হল-গোছের, পাশে দুইটি ছোট ছোট কামরা। মাঝের হলে কৃষ্ণনগরের কুমোর প্রতিমা গড়িতেছিল, কয়েক জন কুলি চালচিত্রের কাঠামো-সমেত একটা প্রতিমা-গড়ার চৌকি ধরাধরি করিয়া আনিয়া পাশে রাখিল। বৈকালে খড়, সুতলি, বাখারি লইয়া দুই জন এদেশী কুমোর আসিয়া হাজির হইল। কৃষ্ণনগরের ভবানী পাল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—"ব্যাপার কি?"

"মাইকা মূর্ত্তি গোড়া হোবে।"

"মূর্ত্তি গড়া হবে! —কেন?"

"পূজা হোবে।"

"আর এ-মূর্ত্তি?"

"যে-মূর্ত্তিকা বেশী ক্ষেমতা হোবে তারই পূজা হোবে। হাম্ তোম্‌হার থেকে এক ফুট বড়া মূর্ত্তি বানাবে—বাবুরা বলিয়েসে—জবরদস্ত, এ রকোম মূর্ত্তি।"—হাত-দুইটা বাঁকাইয়া শরীরে একটা দোলা দিয়া মূর্ত্তির 'জবরদস্ত'-পনার একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। জবরদস্ত মূর্ত্তি খড়-কাঠে রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই তাহার কতকগুলা বাখারি তাহার স্রষ্টা-দুইটির পিঠে ভাঙিল।

রসময় ভাগ্নী-জামাইয়ের দল পরীক্ষা হিসাবে কুমোরদের আগাইয়া দিয়াছিল। নিজেরা আসে নাই। পুলিসে ডায়েরী করাইয়া দিল। পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্ত করিয়া গেল। মকদ্দমার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। পূজার দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, ব্যাপার ততই ঘোরাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রমেশ পণ্ডিতের খুড়া অন্নদা ঝগড়া জিনিষটা বড় ভালবাসিতেন। মাঝখানে নির্লিপ্ত থাকিবার ভান করিয়া দুই দিকেরই পিঠ ঠুকিয়া বেশ চালাইয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ মারা গেলেন। কিন্তু বসিয়া রহিলেন না; তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাজ আরও অগ্রসর হইল। বড়দের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হইতে হইতে থামিয়া গেল। ঠিক থামিয়া গেল বলিলে ভুল হয়, বড়দের ছোট সংস্করণেরা এক দিন সেটা ইস্কুলে সাধ মিটাইয়া পুরা করিয়া লইল।

এদিকে আবার একটা গুজব রটিয়াছে। অনাদি আসিয়া বলিল, "শুনছি প্রতিমা ওরা গড়াচ্ছে অনুপম-দা, কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারছি না।"

অনুপম বলিল, "খোঁজ নাও।"

"চেষ্টা করছি। কাল মা'র একটা ব্রত আছে, একটি বামুন খাওয়াবেন। ভাবছি গোবিন্দ আচায্যিকে নেমন্তন্ন করব। লুচি-সন্দেশ ঢুকছে জানলে ওর পেটের কথাগুলো জায়গা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবেই।"

অনাদির চালটা কিন্তু খাটিল না। নিমন্ত্রণ পাইয়া আচার্য্যি শ্যামা কবিরাজের কাছে অসুস্থতার অজুহাত করিয়া একটা হজমি চাহিতে গিয়াছিল। শ্যামা কবিরাজ জামাইয়ের দলের লোক কি করিয়া টের পাইয়া কড়া জোলাপ ঠুকিয়া দিয়াছে।...অনাদিকে শেষ মুহূর্ত্তে এক জন এদেশী ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মায়ের ব্রত রক্ষা করিতে হইল। সে একা পাঁচটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যের অধিকারী করিয়া গিয়াছে। কথাটা লইয়া ওদিকে খুব হাসি পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতিমার কথাটা সত্য নয়, কোন কুমোরই আর ঘেঁষিতে চাহিতেছে না। তবে এদিকে যেমন থিয়েটার হইবে, ওদিকের তরফ হইতে তেমনই একটা যাত্রাপার্টিকেও

বায়না দেওয়া হইয়াছে; পাঁঠা কেনাও তৈয়ার। জামাই সবাইকে স্তোক দিয়াছে—পূজোর আসল অংশ তো এইগুলোই, প্রতিমা তো ভক্তের মনেই রয়েছে।

সান্ন্যাল মহাশয় কপালের উপরের চুলগুলা মুঠায় করিয়া ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে বলিলেন, "কি ক'রে সম্ভব হ'ল এটা তাই ভাবছি যতীন। সোনার জায়গা ছিল—এই ক-টা দিনে চেহারা বদলে দিলে একেবারে!"

পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ঘটস্থাপন করিয়া। মূর্ত্তি শেষ হয় নাই। মুণ্ড বসাইবার পূর্ব্বেই ভবানী পালের বাড়ী হইতে জরুরি টেলিগ্রাম আসিল—তাহার স্ত্রীর ওলাউঠা। সে রাতারাতি তাহার ছেলেকে লইয়া, যতীন প্রভৃতিকে না বলিয়া পলাইল। সেখানে গিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল স্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া এক খোরা পান্তাভাতের সদ্গতি করিতেছে। বিদেশে অমন শাঁসাল কাজটা অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া আসায় সে ভবানীরই ওলাউঠার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ব্যাপারটা ভবানী বুঝিল, কিন্তু যা কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিবার প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না।

স্থানীয় কোনও কুমোর ভিড়িল না—তাহাদের এক জন 'জবরদস্ত' মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া যা দক্ষিণা লইয়া ফিরিয়াছে তাহাতে তাহারা সবাই অতিরিক্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন কাঠামোসুদ্ধ মুণ্ডহীন প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, পূজা সম্বন্ধে সবাই এত উদাসীন যে কাঠামোটাকে যে বাহিরে রাখিয়া দেওয়া দরকার, সে-কথাটাও কেহ ভাবে নাই। তাহারই সামনে ঘটস্থাপন করা হইয়াছে; রেকর্ডের সঙ্গীতের মত একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক পূজা হইতেছে।

যতীন আসে নাই। তাহার অত্যন্ত বেশী আশা লইয়া কাজ করা অভ্যাস বলিয়া একেবারে মুষড়াইয়া গিয়াছে। অনুপম আসিয়াছে, তাহার প্রকৃতিটা ঠিক উল্টা, উৎসাহের মুখে অযথা বাধা পাইলে সে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ক্ষতিবৃদ্ধি খতাইয়া দেখিতে পারে না, আরব্ধ কর্ম্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারে না, ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠে।

অনুপম আসিয়াছে; কিন্তু পূজা ভুলিয়া সে এখন অন্য দিকে। অন্য দিকের দৃশ্যটাও অন্য রকম।

দুই দল রোসনচৌকি বসিয়াছে। যাহারা এখানকার বাঁধা বাজিয়ে অর্থাৎ যাহারা যতীন অনুপমের নিয়মিত ফরমাইসে আসিয়াছে, তাহারা একটা করুণ ভৈরবীর সুর তুলিয়াছে। ভিতর দিকে বসিয়াছে রসময় ভায়ী-জামাইয়ের আহূত রোসনচৌকি—কতকগুলি ছেলে তাহাদের উস্‌কাইয়া দিয়াছে—"তোরা বেহাগ ধর, এসা বেহাগ ধরবি যেন ওদের ভৈরবীকে টুকরো টুকরো ক'রে ছেড়ে দেয়।" খুব আনাড়ি রোসনচৌকি,—এরা বেহাগকেও টুকরা টুকরা করিতেছে, ভৈরবীর তো কথাই নাই। সমস্ত জায়গাটা সঙ্গীতের মৃত্যু-নিনাদে বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

দুইটা দলকেই দুই দল ছেলে-যুবা ঘিরিয়া হাসি, হল্লা, চেঁচামেচির সঙ্গে প্রবল ভাবে উৎসাহিত করিতেছে। সুর-কাটাকাটির মাতনে বাজনদারদের মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এক দলের চেষ্টা পরিশ্রম আর অন্য দলের টিটকারির মধ্যে থিয়েটারের ষ্টেজ উঠিতেছে—বাঁধিবার দড়ি হারাইতেছে, কাটিবার কাটারি লুপ্ত হইতেছে—বচসা, গালাগালি, হুমকি—হাতের আঙুল বজ্রমুষ্টিতে কুণ্ডলিত হইয়া উঠিতেছে, উদ্যত মুষ্টি তীরের মত আগাইয়া ছুটিতেছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাহার কারণ প্রচুর লালপাগড়ি ঘোরাঘুরি করিতেছে। এটা প্রেসিডেণ্ট রসময়ের বন্দোবস্ত। বলিতেছে, "এই তো বাহার! তা নয় তো···বুকে কাপড়ের এক একটা ক'রে ফুল এঁটে সব ডিগডিগে ভলণ্টিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরে ছ্যাঃ।" এই সব হইল নগ্ন গুণ্ডামি। ওদিকে ভদ্রতাও হইয়া পড়িয়াছে মারাত্মক—নিমন্ত্রিতরা বেশীর ভাগই এদেশী ভদ্রলোক—উভয় পক্ষের অভ্যর্থনার টানাটানিতে নাজেহাল হইয়া উঠিতেছে।

শুধু পূজার কাছটাই নিষ্প্রভ, কেন না পূজাটা আজ অবান্তর। বাকী সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। ছেলে-যুবা সবার মুখেই একটা উল্লাসের দীপ্তি। ভাঙনের মধ্যেও একটা উল্লাস আছে তো?"

সকলে বিস্ময় মানিতেছে—শান্ত, সৌম্য, স্নিগ্ধ মাতৃপূজার মধ্যে এ উন্মাদনা কোথায় লুকান ছিল এত দিন! এ যেন আগাগোড়াই পাঁঠাবলির একটা ভৈরব আনন্দ!··· পূজাই যে আজ যূপকাষ্ঠে উঠিয়াছে এ-কথা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ কোথায় ?

একটু দূরে রসময় হুঁকা-হাতে, সস্মিত বদনে নিজের কীর্ত্তি উপভোগ করিতেছিল, ভাগ্নী-জামাই ব্যস্ততার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বলুন তো, মনে হচ্ছে না যে সবার পূজো, সবাই মায়ের সমান ছেলে ? তা নয় তো এক দিকে যতীন অনুপম ফোফরদালালি করছে, আর ছেলেগুলো ভেড়ার মত নিঃশব্দে খেটে যাচ্ছে, আরে ছ্যাঃ—এই যুগে!"

চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণটিতে, বিধবা আর মেয়েদের লইয়া যেখানে একটু ভীড় হইয়াছে তাহার পিছনে ছোট নাতিটির কাঁধে লঘু ভর দিয়া বৃদ্ধ সান্ন্যাল মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারি দিকে উন্মাদনা—তাঁহার রজতশুভ্র কেশ, আবক্ষ শ্মশ্রু, আয়ু-ম্যুব্জ দেহ আজ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। ললাটে ভূমিস্পর্শ করিয়া উঠিয়া মগ্নস্বরে বলিলেন, "বড় মুখ ক'রে একুশটা দিনের আয়ু চেয়েছিলাম মা, তা এমনি করেই কি দিতে হয় ?" আরও বলিবার ছিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠায় আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

আরও এক জন একটু অনুযোগ করিল।

অম্বিকা গাঙ্গুলী। নেশাখোর মানুষ, কোনও দলের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। টলিতে টলিতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল। তার পর ঘূর্ণ্যমাণ চক্ষু দুইটিকে সাধ্যমত অসমাপ্ত মূর্ত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "মুণ্ড নেই তাই দেখতে পেলে না মা—দোলায় এসে কি অনর্থটাই ক'রে গেলে।"

অম্বিকা গাঙ্গুলীর কথা কেহ বড় গ্রাহ্য করে না, তবুও আজকের এই কথাটুকুতে কি একটা ছিল, সকলে এক বার ফিরিয়া চাহিল।

আমার কি মৃত্যু নেই ?

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভুল হয়েছিল। এ ভুলের নেই কোনো ক্ষমা ?
সমুদ্রের শস্যক্ষেতে মুক্তার ফসল।
প্রবাল স্বপনে ঘেরা ঘুমে দূরে ছিল :
ভুল! কত রাতে ভুল হয়েছিল।

মৌমাছির স্বর্ণপাখা মধুগন্ধী পরাগে কোমল ;
স্বপ্নের সোপানগুলি লঘুপদে তুমি উঠেছিলে।
ক্ষয়িষ্ণু জরিষ্ণু কাল, নোনা তাতে দিয়েছ কেবল
এ ভুলের দুঃসাহস কেন দিয়েছিলে ?

কই সে বন্দর ?
স্মৃতির এ বোঝাগুলি নামাব কোথায় ?
মহাকাল! তোমার জাহাজ
কূল ছেড়ে দূরে সরে যায়!

আমার এ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি
তুমি তাতে দিয়েছিলে ভাষা :
দিনের মিছিল গেল
কত মৃত্যু দেখিলাম
তবুও দুরাশা!

সমুদ্রের শান্তি কোথা ? সে তো শুধু লবণ-উচ্ছ্বাস ;
ফুলের মুকুরে তুমি প্রজ্জ্বলিত, নেই তো নির্ব্বাণ।
ফাল্গুনের দিনগুলি দগ্ধ করে খেয়ালী তপন—
আমার কি মৃত্যু নেই ? গেয়ে যাব শেষহীন গান ?

আলোচনা

ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

প্রবাসীর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্যে লণ্ডন-প্রবাসী শ্রীমণীন্দ্র দাস মহাশয় এমন কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই, যাহা হইতে আমার মত যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত হয়। শুধু তিনি আমাদের ছাত্রদের বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয়তা সম্বন্ধে একটি কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে-সব কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহা পরীক্ষার পড়া-পুঁথির মত সুপরিচিত। আমাদের ছাত্রদের যত অবনতি, সবই কি আমাদের দীর্ঘ পরাধীনতার ফল? আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই দীর্ঘ পরাধীনতার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন। বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে ছাত্রদের মধ্যে যে-সব দোষ ছিল না, তাও আজকাল দেখা যায়। এখন ত দেশ স্বাধীনতার অনেক কাছে অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে তখন সে-দেশের জনসাধারণ ক্লেশ ও ত্যাগের মধ্য দিয়া এক উচ্চতর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান স্পেন, চীন ও রাশিয়া সে-সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আমরা কি স্বাধীনতা লাভ করিব শুধু চালাকির জোরে? লেখক যদি তাঁহার বক্তব্যের দ্বারা আমার লিখিত বিষয়ের ভ্রমনির্ণয় করিতেন তবে সুখের বিষয় হইত। তাহা না করিয়া, আমি যাহা লিখি নাই, তাহা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া তিনি আমাকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, তিনি আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এ-দেশীয় (অর্থাৎ বিলাতী) সভ্যতায় ও উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রায় তিনি মুগ্ধ এবং কল্পনার চোখে এ-দেশ সম্বন্ধে যে-স্বপ্ন দেখতেন, সে-স্বপ্ন সত্য হয়ে তাঁকে ততোধিক বিস্ময়াপন্ন ও শ্রদ্ধাশীল করেছে।" আমি লিখিয়াছিলাম, "ইউরোপ দেশটা এতকাল একটা লাল নীল হলদে মানচিত্র মাত্র ছিল। যত কথা পড়েছিলাম, সেগুলো যেন মনের কাচে রঙের ভাপের মত লেগে ছিল; অন্তরের রসকে রাঙিয়ে তোলে নি।" তাছাড়া আমি সব ভারতীয় ছাত্রের মুণ্ডপাত করি নাই। আমি লিখিয়াছিলাম, "আমাদের দেশেও এমন ছাত্র আছে যাদের সঙ্গে ইউরোপীয় 'ভাল' ছাত্রদের তুলনা করতে লজ্জা নেই, গৌরববোধ আছে।" তবে তাহাদের সংখ্যা বেশী নয় ও ইংলণ্ডের সব ছাত্রছাত্রীই আদর্শস্থানীয় নয়। লেখক ভারতবর্ষের কোন্ শহরে তাঁর বিদ্যা লাভ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু তিনি লণ্ডন সিটি গীল্ডস্ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বৃদ্ধ অধ্যাপকের লাঞ্ছনার যে উদাহরণ দিয়াছেন, কলিকাতার বহু কলেজে তার চেয়েও যে কদর্য্যতর ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তা তিনি বোধ হয় জানেন না। লেখক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমরা এখানে এসে 'দুঃখিত ও ধন্যবাদে'র আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে যাই।" তিনি ইউরোপীয়দের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। আন্তরিকতা হয়ত ইউরোপে খুব কম, কিন্তু তিনি কি ঐ সামগ্রীটি আমাদের দেশেই প্রচুর ভাবে পাইয়াছেন? তিনি মৌখিক ভদ্রতার খুব নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে সেটুকুও যদি যথেষ্ট থাকিত, বাঁচিয়া যাইতাম। ট্রামে, বাসে চড়িতে গিয়া যখন ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাই, যে-সীটের আশায় পনর মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, পিছন হইতে নবাগত ভদ্রলোকটি যখন তাহাতে বিনা সঙ্কোচে টুপ করিয়া বসিয়া পড়েন, মুখখানা একটু বেগুনেও হয় না, তখন কি সময় সময় ইউরোপের কথা মনে পড়ে না? যে-দেশে না আছে যথেষ্ট আন্তরিকতা, না আছে যথেষ্ট মৌখিক ভদ্রতা, সে-দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! আসল কথা, মৌখিক ভদ্রতাটাও জাতির সভ্যতার একটা বিশেষ স্তরে আসে। পঞ্জাবে এক জন জাঠ ও ও এক জন পাঠান একই বৃত্তি অনুসরণ করে। কিন্তু আপনাকে দেখিলে জাঠের মাথা একটুও নত হইবে না, হাত একটুও উঠিবে না। পাঠান সমানই দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু দেখা হইলেই সে একটা সালাম দিবে, হাতে হাত মিশাইয়া একটু হাসিয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

শেষকালে লেখক 'গোরা'র কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে তিনিই একমাত্র দেশকে ভালবাসেন, আর আমাদের মত ভ্রান্ত উৎকেন্দ্রীয় লোকেরা তাঁর কৃপাপাত্র। লেখক কি 'গোরা' উপন্যাসটি শুধু সিনেমাতেই দেখিয়াছেন, পড়েন নাই? যদি পড়িতেন তবে গোরার দোহাই দিতে লজ্জিত হইতেন। গোরার দেশপ্রীতি অন্ধ, তাই শেষকালে তাহার কাষ্ঠ-স্বাদেশিকতার স্ফীত চূড়া তাহার বালির ভিতের উপর ধসিয়া পড়িয়া গেল। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনের জানালা খুলিয়া দিয়া মনকে একটু সুস্থ করিয়া তোলা। যে দেশের সংস্কার চায়, সেও দেশকে ভালবাসে, হয়ত গতানুগতিকতার স্তাবকদের চেয়েও বেশী ভালবাসে।

[মূল প্রবন্ধ-লেখকের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইল। এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে না। প্র. স.]

বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলন

গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলন" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ জেলায় এরূপ সম্মেলন এই প্রথম হইল। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য মহিলা-সম্মেলন বাঁকুড়া জেলায় এই প্রথম নহে। ইং ১৯২৮ সালে সোনামুখীতে বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সময় জেলা মহিলা-সম্মেলন হয়। গত ইং ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন-চুক্তির পর কোতুলপুরে বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে জেলা মহিলা-সম্মেলন হয়। গত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সম্মেলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনের প্রথম দিবসে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভা-মণ্ডপে শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মহিলা-সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য জেলার প্রত্যেক থানা হইতে এত অধিকসংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শক আগমন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাসস্থানের ও আহারাদির ব্যবস্থা করিতে প্রাদেশিক সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই সম্মেলনের সভানেত্রীর ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণ ও সম্মেলনের কার্য্যবিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য মহিলা-সম্মেলন রাজনৈতিক মহিলা-সম্মেলন কিনা তাহা সম্মেলন উপলক্ষে বিতরিত প্রচার-পত্রিকা হইতে জানিবার উপায় নাই; কারণ, সেগুলির মধ্যে কোথাও 'রাজনৈতিক' বা 'কংগ্রেস' এইরূপ কথার উল্লেখ নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘটক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও
বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী
সমিতির সদস্য।

প্রত্যুত্তর

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘটক মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম।

তিনি প্রথম আপত্তি করিয়াছেন বাঁকুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশনকে প্রথম অধিবেশন বলায়। তিনি বেশ ভাল করিয়াই জানেন ইতিপূর্ব্বে এ জেলায় মহিলাগণের কোন কার্য্যকরী সঙ্ঘ বা সমিতি ছিল না। জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে জেলা কংগ্রেস কমিটি যেমন তাহার অধিবেশন নিয়ন্ত্রণ করেন সেইরূপ কোন কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিপূর্ব্বে মহিলাদের ছিল না ফলে ইতিপূর্ব্বে জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সহিত মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে তাহা একরূপ জেলা সম্মেলনের মহিলা-বিভাগই ছিল। কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত রীতিমত মহিলা-সম্মেলন বলিয়া সেগুলিকে কোন মতেই অভিহিত করা যায় না। সেই জন্য জেলা কংগ্রেস মহিলা-সঙ্ঘের উদ্যোগে এই অধিবেশনটিকে জেলা মহিলা-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনই বলিব।

ঘটক মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি, মহিলা-সম্মেলনটি "রাষ্ট্রীয়" কি না তাহা বুঝা যায় না। এ-সম্বন্ধে এইসঙ্গে প্রেরিত সম্মেলনের প্রচারপত্রটি দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় নিজেই বিচার করিবেন সম্মেলনটি যে রাষ্ট্রীয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি না। জেলা কংগ্রেস মহিলা-সঙ্ঘের জেলা সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর-সম্বলিত প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবেই জানান হইয়াছে যে, জেলা কংগ্রেস মহিলা-সঙ্ঘের উদ্যোগে সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি যদি জেলা সম্মেলন আহ্বান করেন—'রাষ্ট্রীয়' কথাটি না থাকিলেও তাহা 'রাষ্ট্রীয়' না হইয়া অন্য কোনরূপ হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় কথাটি না থাকার জন্যই যদি সম্মেলনটি 'অরাষ্ট্রীয়' হইয়া পড়ে, তবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের যত দূর স্মরণ হয় 'বর্দ্ধমান জেলা মহিলা-সম্মেলন' 'বগুড়া জেলা মহিলা-সম্মেলন' প্রভৃতি অনেক সম্মেলনই 'অরাষ্ট্রীয়' হইয়া পড়ে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে জেলার কোন মহিলার নিকট হইতে এ প্রতিবাদ-পত্র আসিলে বরং শোভন হইত। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা-সঙ্ঘের নিতান্তই শিশু অবস্থা—কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি পরিবর্জ্জন করিয়া চলাই এই সঙ্ঘের প্রাদেশিক কেন্দ্রের ও বিভিন্ন জেলার শাখাগুলির নীতি। বিভূতিবাবুর প্রতি আমাদের অনুরোধ—তাঁহাদের দলাদলি আমাদের মহিলা-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা না করেন।

শ্রীরাণী মণ্ডল
সম্পাদিকা, বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস
মহিলা-সঙ্ঘ।

ধ্যানভঙ্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজেষ্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন, মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান,
ভাঙন কিন্তু আর্টিষ্টিক, কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হ'ত দেবতাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হ'ত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া,
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা-রম্ভা
রিয়লিষ্টিক আধুনিকের এই মতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা,
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু জানি ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ,
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম।

বঙ্গলক্ষ্মী]

বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম. এ., ডি. লিট.

...উড়িষ্যাপ্রদেশে উদয়গিরি অঞ্চলে কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালেখ ব্যতীত প্রাচ্যদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন উল্লেখ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ উড়িষ্যাপ্রদেশে জৈনধর্ম্ম যে বঙ্গদেশ হ'তেই গিয়েছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। পাহাড়পুরে নূতন আবিষ্কৃত শিলালিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের; এ শিলালিপি হ'তে বোঝা যায় যে, পাহাড়পুরের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ের [নির্গ্রন্থ — জৈন]। বঙ্গদেশে জৈনদের অন্য কোন প্রাচীন শিলালিপি না পেলেও প্রাচীন জৈনসাহিত্যে বহু প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, জৈনধর্ম্ম বহু প্রাচীন কালেই সে প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

আচারাঙ্গসূত্র জৈনসাহিত্যের একখানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হ'তে আমরা জানতে পারি যে [জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক] মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করবার পূর্ব্বে কিছু কাল নানা স্থানে পর্য্যটন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচ্য দেশের সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। সে সব প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত, তারা মহাবীরের উপর ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল এবং নানা ভাবে অত্যাচার করেছিল। লাঢ় যে প্রাচীন রাঢ় প্রদেশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুব্বভূমি অনেকের মতে সুহ্মপ্রদেশ, বজ্জভূমি কোথায়, তা জানা যায় না। এ হ'তে বোঝা যায় যে, মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম্ম-প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত: জৈনসাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।

কল্পসূত্র জৈনসাহিত্যের চতুর্থ ছেদসূত্র 'আচারদশাঙ্গে'র অষ্টম দশাঙ্গ। জৈনদের মতে কল্পসূত্র ভদ্রবাহুর রচিত।...এই

কল্পসূত্রের দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রবাহুর চার জন শিষ্য ছিল, এই চার জন শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন গোদাস। গোদাস একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্ত্তন করেন, এই ধারার নাম ছিল 'গোদাসগণ'। গোদাসগণ হ'তে চারটি শাখার উদ্ভব হয়, এ চারটি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া এবং দাসীখর্বটিকা। দাসীখর্বটি কোন স্থানের নাম হ'লেও সে স্থান কোথায় ছিল, তা জানা যায় না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কোটিবর্ষ যে উত্তরবঙ্গের দু'টি প্রধান স্থান ছিল, তা প্রাচীন শিলালিপি হতেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক হ'তেই পাওয়া যায়, প্রথমতঃ বৌদ্ধ বিনয়পিটকে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অশোকীয় ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ লিপিতে লিখিত একখানি শিলালেখে। এ লিপি অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের। এ লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রনগর ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীর উপর যে সমস্ত ভিক্ষুদের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে পুঞ্রবঢনীয় (পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়) ভিক্ষুর নামও পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের শিলালিপি ও তাম্রপট্টে উল্লিখিত হয়েছে। বাণপুর নামক নগর কোটিবর্ষে অবস্থিত ছিল। প্রায় সকলের মতেই বাণপুর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বর্তমান বাণগড়। কোটিবর্ষ যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত স্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাম্রলিপ্তি সুপরিচিত। সুতরাং কল্পসূত্রের এই থেরাবলী হ'তে বোঝা যায় যে, ভদ্রবাহুর শিষ্যেরা যে চারটি ধারা ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে দুটি ছিল উত্তর-বঙ্গে, অন্যটি ছিল নিম্নবঙ্গে, তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে। ভদ্রবাহু খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং বঙ্গদেশের জৈনধর্ম্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

এ অনুমানের পক্ষে আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করা চলে। সে প্রমাণ পাওয়া যায় দিব্যাবদান হ'তে। দিব্যাবদান বৌদ্ধ বিনয়গ্রন্থের অংশবিশেষ। এ গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। এ গ্রন্থের একটি অবদানে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোকের ভ্রাতা বীতশোকের গল্প বর্ণিত হয়েছে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নিগ্রর্ন্থ-উপাসক এমন একটি পট এঁকেছিল, যাতে দেখান হয়েছিল যে, বুদ্ধ নিগ্রর্ন্থের পদবন্দনা করছেন। এ সংবাদ অশোককে দেওয়া হ'ল। অশোক অত্যন্ত কুপিত হয়ে নিগ্রর্ন্থদের হত্যা করবার জন্য যক্ষকে নিয়োজিত করলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের সমস্ত নিগ্রর্ন্থকে হত্যা করা হ'ল (এবং এই সঙ্গে ভুল ক'রে বীতশোককেও হত্যা করা হ'ল, কারণ, তিনি সেই সময়ে না জেনে নিগ্রর্ন্থদের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন)। এ হচ্ছে অশোকের প্রথম জীবনের কথা, তখন তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন, সেই কারণে তখন তাঁর নাম ছিল চণ্ডাশোক। যখন তাঁর শিলালেখ প্রচারিত হয়, তখন খুব সম্ভব তিনি ধর্ম্মের জন্য কাউকেই উৎপীড়ন করতেন না, এবং সেই সময়েই লিখেছিলেন—"নিগংথেসু পি মে কটে···।"

এ গল্প হ'তেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অশোকের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নিগ্রর্ন্থসম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর-বঙ্গে সে সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে প্রবল ছিল, তার প্রমাণ হিউয়ান্ সাংএর বিবরণী হ'তেই পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নিগ্রর্ন্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে অনেক বেশী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা]

ভারতীয় গণিতশাস্ত্র

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম. এ.

গণিতশাস্ত্রে অঙ্ককে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করিতে হইলে যে নয়টি সংখ্যা ও একটি শূন্যের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা প্রথমে হিন্দুগণ আবিষ্কার করেন। পূর্বকালে বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। ভারতে ও পাশ্চাত্য প্রদেশেও এইভাবে সংখ্যা প্রকাশ করা হইত। আর্য্যভট্টের সময়ে কি তাহার কিছু পূর্বে দশমিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আর্য্যভট্টের গ্রন্থে দুই প্রকার নিয়মেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে যে নয়টি সংখ্যা দ্বারা অঙ্ক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, সেই সংখ্যাচিহ্ন কয়টিই রূপান্তরিত হইয়া ইউরোপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব হইতে ভারতে সংখ্যার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। অশোকের শিলালিপিতে এই চিহ্নগুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ইউরোপে সংখ্যাচিহ্নগুলিকে আরবদেশ হইতে আগত বলিয়া মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ভারত হইতে আরবে গিয়াছিল, তৎপরে তথা হইতে ইউরোপে গৃহীত হয়।

আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ) ও ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রীঃ) উভয়ের নিকটেই দশমিক প্রণালী জানা ছিল, কিন্তু ভাস্করাচার্যই (১১১৪ খ্রীঃ) সম্পূর্ণরূপে ইহার আলোচনা করেন। ব্যাসভাষ্যের আলোচনাতে দেখা যায় যে তৎকালে সংখ্যার স্থানীয়মান (Local value) সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল।

সারাসেনদের নিকটে ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংখ্যা-লিখন-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান পৌঁছে। আলবেরুণী লিখিয়াছেন (১০৩৩ খ্রীঃ) "আমরা যে সকল সংখ্যা দ্বারা অঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকে, সে সকল হিন্দুদিগের ব্যবহৃত চিহ্নসমূহেরই রূপান্তর।"

প্রসিদ্ধ মুসলমান গণিতজ্ঞ মুষা ভারত হইতে বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহা পাশ্চাত্য প্রদেশকে শিক্ষা দেন।

খ্রীষ্টজন্মের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধগণ দশমিক প্রণালী ও অঙ্কলিখন-প্রণালী চীনদেশে প্রবর্তন করেন। চীনে উপর হইতে ক্রমে নীচে লিখিবার নিয়ম ছিল। তৎপরে তাঁহারা উহার পরিবর্তে ভারতীয়দের রীতি গ্রহণ করিয়া বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার প্রণালীর প্রবর্তন করেন।

শ্রীভারতী]

বাংলার গ্রামের আর্থিক দুর্গতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[এই প্রবন্ধে লেখক বিশেষ ভাবে বাখরগঞ্জ জেলার আর্থিক দুর্গতির প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পল্লী-অঞ্চলে আর্থিক দুর্গতির কারণে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও তাহার রূপ প্রায় সর্ব্বত্রই এক।]

···বাখরগঞ্জের জমিতে সোনা ফলে, সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রবাদ। আজ কিন্তু বাখরগঞ্জ তাহার এই গরিমা হারাইতে বসিয়াছে। আগে যেখানে বিঘাপ্রতি পঁচিশ-ত্রিশ মণ ধান জন্মিত, এখন সেখানে জন্মিতেছে বড় জোর পনর-বিশ মণ। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট জমিতেই এরূপ ফসল আগে হইত এবং বর্ত্তমানে কমিয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে; নিকৃষ্ট জমিতে ফসল খুবই কম হয়।···কতকটা স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু অনেকাংশেই লোকের অজ্ঞতার ফলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির স্বাভাবিক উপায়গুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। স্রোতস্বিনীর ধর্ম্মই এই যে, সোজা পথই সে নিয়ত খোঁজে। স্রোতস্বিনীর গতিবেগ যে কত বাঁক ভাঙ্গিয়া দিয়া আবহমানকাল জনপদ উচ্ছেদ করিয়া দিতেছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।···নদীর 'রোখ' বা গতিবেগ বদলাইয়া গেলে পূর্ব্ব স্থানে চর পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ওদিককার খালগুলিও ভরিয়া উঠে। জল সরবরাহের স্বাভাবিক উপায়গুলি এইরূপে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। আবার জমিতে রীতিমত জল ওঠা-নামা করিতে না পারিলে উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতে বাধ্য। আর একটি কারণেও এই স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আপাত লাভের মোহে জমির বা পল্লীর অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক নালা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীগুলি বুজাইয়া দিয়া লোকে জমি দুই চারি কাঠা বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দ্বারা নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছে তাহারা। দুই-চারি কাঠা জমি না বাড়াইয়া কিরূপে উর্ব্বরতা অটুট রাখিয়া জমিতে দুইটি ফসল জন্মান যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত।···

এক দিকে যেমন জমির উর্ব্বরতাশক্তি হ্রাস পাওয়ায় ধানের ফসল দ্রুত কমিয়া যাইতেছে তেমনি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একদা যে বিশেষ শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও আজ ধ্বংসিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ধান ঢেঁকিতে ভানিয়া চাউল করিবার রীতি বহুদিনের পুরাতন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দরিদ্রগণ এই শিল্পে লিপ্ত ছিল। তাঁহাদের নাম ঢেঁকিয়াল। চাউলের ব্যবসা যখন জোর চলিত তখন এই ঢেঁকিয়ালগণ ঘরে বসিয়া চাউল তৈরি করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিত।···পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে এক নূতন জিনিষের আমদানি হইয়াছে যাহার ফলে তাহাদের এই কার্য্য একরূপ ছাড়িয়াই দিতে হইয়াছে। আগে ঝালকাঠির বন্দরে একটি কি দুইটি ধানের কল ছিল। এখন দক্ষিণ বাখরগঞ্জের এই দিকে অন্যূন এক শত ধানের কল হইয়াছে। এক-একটি ধানের কলের দাম 'অশ্বশক্তি' হিসাবে দুই হাজার হইতে চারি হাজার টাকা। গ্রামের মহাজন বা অল্প পুঁজিদারগণ এই সব কল স্থাপন করিয়াছেন।···

চাউলের চালানী কারবার কিরূপ ছিল এক্ষণে তাহাই বলিব। এক সময় কলিকাতায় বরিশালের বালাম চাউলের খুবই আদর ছিল। এখন এই বালাম চাউল কলিকাতায় ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কলে ছাঁটা দেশী চাউল এখন ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। চাউল আগে কলিকাতা হইতে বিদেশেও কিছু কিছু চালান যাইত। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে চালানী কার্য্য কমিতে আরম্ভ হয়। বরিশালে বালাম চাউলের কাজ এক সময় অতি লাভজনক ব্যবসা ছিল। বাখরগঞ্জের বহু লোক এই ব্যবসায়ের দৌলতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত।···চাউলের চালানী কাজ যখন চালু ছিল তখন ধনী মহাজন বাদে আড়তদার, দালাল, কয়াল, ফড়িয়া, বেপারী, ঢেঁকিয়াল প্রভৃতি শ্রেণীর বেশ অর্থাগম হইতেছিল। বিস্তর লোক এই সব কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া পরিবার-পরিজনের অন্নের সংস্থান করিত।···

বাখরগঞ্জের আর দুইটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য নারিকেল ও সুপারি। চাউলের ন্যায় এ দুইটি জিনিষকে কেন্দ্র করিয়াও নানারূপ ব্যবসা গড়িয়া উঠে।···গৃহস্থ, বেপারী, ফড়িয়া, কয়াল, দালাল, আড়তদার সকলেই চাউলের কাজের সময় যেমন বেশ দু-পয়সা রোজগার করিত, নারিকেলের সময় তাহাদের অনুরূপ আয় হইত। বরিশালে এত নারিকেল-সুপারি উৎপন্ন হয় যে, স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইয়া একটি বৃহৎ অংশ অনায়াসে বিক্রয় করিয়া ফেলা চলে। আগে তাহা গৃহস্থেরা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই করিত। যশোহরের যে-সব অঞ্চল হইতে ধনী মহাজনগণ চাউলের ব্যবসা চালাইত, তাহারাই আবার নারিকেলের আমলে নারিকেলের কাজেও যোগ দিত। এক-একখানি ত্রিশ-হাজারী চল্লিশ-হাজারী নৌকায় মহাজনের প্রতিনিধি, গোমস্তা ও দশ-বার জন করিয়া পাকা মাঝি-মাল্লা থাকিত। এই মাঝি-মাল্লারা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। চাউলের সময় নৌকা যাইত কলিকাতার দিকে। নারিকেলের নৌকা কিন্তু অন্য দিকে গমন করিত। উত্তর-বঙ্গে নারিকেলের খুবই অভাব। পদ্মার উজান বাহিয়া বরাবর উত্তর-বঙ্গে এমন কি বিহার পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকায় নারিকেল চালান দেওয়া হইত। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলেও বরিশালের নারিকেলই পাওয়া যাইত। চাউলের কারবারের মত নারিকেলের কাজও এখন ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই কাজ একরূপ হয় না বলিলেও চলে। এই দুই ব্যবসা মাটি হইয়া যাওয়ায় কত লোক যে বেকার হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।···

মেশিন-গান আক্রমণ।

আধুনিক জার্ম্মানীতে শিল্পীকেও পাশব শক্তির পূজায় নিযুক্ত করা হইয়াছে, শিল্পীর স্বাধীন সত্তা নাই। ফলে শিল্পকলার ক্ষেত্রে জার্ম্মানী তাহার পূর্ব্বগৌরব হারাইয়াছে।

ট্যাঙ্কের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা।

এই চিত্রগুলিতে জার্ম্মান শিল্পী যুদ্ধবিগ্রহকে কৌশলে বীরধর্ম্ম বলিয়া প্রচারের চেষ্টা ও দেশবাসীকে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রণোদিত করিতেছেন।

পথপার্শ্বে যুদ্ধ

আধুনিক জার্মান শিল্পের নিদর্শন

সৈনিকের সমাধি

আধুনিক জার্মান শিল্পের নিদর্শন

চাউল এবং নারিকেলের ব্যবসায়ে বহুদিন পূর্ব্বেই ভাঁটা পড়িলেও সুপারির কাজ কিছুকাল পর্য্যন্তও বেশ ভালই চলিয়াছিল। সুপারিও আগে আমাদেরও অঞ্চল হইতে চালান হইয়া যাইত। চাউল ও নারিকেলের কাজ একেবারে কমিয়া যাওয়ায় সুপারির কারবার স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই করিতে আরম্ভ করে। সুপারির কারবারের সুবিধা এই যে অল্প পুঁজিতেই এই কাজ আরম্ভ করা যায়। গ্রামের ছোট ছোট মহাজনের নিকট হইতে লোকেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুপারির কাজ করিতে আরম্ভ করে। সুপারি রোদে শুকাইয়া 'ছোলদার' দ্বারা খোসা ছাড়াইয়া নিকট ও দূরের গঞ্জে গিয়া বেপারীরা বিক্রয় করিত দশ, বার, চৌদ্দ টাকা দরে হাজার (এক হাজার—সাড়ে দশ হাজারটা সুপারি) কিনিয়া শুকাইয়া মণদরে বিক্রয় করিয়া বেশ কিছু লাভ থাকিত। এই ব্যবসা চালু হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বিস্তর লোক জীবিকার সংস্থান করিতে পারিত। এই ব্যবসা কিরূপ অর্থকরী ছিল একটি কথাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এক-একটি গ্রামে ছোলদারগণই বৎসরে তের-শ চৌদ্দ-শ টাকা রোজগার করিত। হাজার (অর্থাৎ সাড়ে দশ হাজারটা) সুপারির খোসা ছাড়াইয়া দিতে পারিলে প্রতি ছোলদার আট আনা করিয়া পাইত। এইরূপে অতগুলি টাকা গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। পল্লীর নিষ্কর্ম্মা, বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা প্রভৃতিরাই প্রধানতঃ এই কাজে লিপ্ত হইত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই ছোলদার শ্রেণীভুক্ত ছিল। পনর-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ-বাখরগঞ্জে এই কারবার ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর জোর চলিবার পর ইহাতেও ভাটা পড়িয়া যায়। আজ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে লোককে কচিৎ দেখা যায়।

আগে কৃষিকর্ম্ম করিয়া উদ্বৃত্ত সময়ে মুসলমানগণ পুকুর-কাটা, বাঁধ-নির্ম্মাণ, ঘর ছাওয়া, করাতির কাজ, কাঠ কাটা প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইত। এখনও যে এই সব কাজে লিপ্ত হয় না তাহা নয়, তবে কৃষাণসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের মজুরিও কমিয়া গিয়াছে। যেখানে আগে দৈনিক আট ঘণ্টা খাটিয়া প্রতি জন আট আনা, দশ আনা আয় করিত এখন সেখানে দিনভর খাটিয়াও চার পয়সা দু-পয়সা বা আট পয়সা আয় করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পিতা-পুত্রে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও পাঁচ-ছয় জনের পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। এতদঞ্চলে নৌকা-মাঝিরা প্রায় সবই মুসলমান। তবে নমঃশূদ্র প্রভৃতি কিছু কিছু আছে। নৌকা-মাঝিদের আয়ও কমিয়া গিয়াছে। আগে যেখানে পনর মাইল জলপথ অতিক্রম করিতে এক টাকা দেড় টাকা লাগিত এখন সেখানে চার-পাঁচ আনার বেশী লাগে না, যেখায় নৌকা করিলে দু-পয়সা চার পয়সায়ও এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত করা যায়।...

বঙ্গশ্রী]

যোগ—জ্ঞানে ও অনুষ্ঠানে

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম.এ.

'যোগ' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিচার নিষ্প্রয়োজন। শব্দটি এত কাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ইহার চারি দিকে এত বড় একটা সাহিত্য রচিত হইয়াছে, যে, যদিও ইহার স্বরূপ লইয়া মতভেদ যথেষ্ট রহিয়াছে, তথাপি ইহার অর্থ লইয়া এখন আর তেমন মতদ্বৈধ নাই। কথাটির প্রচলন ভারতের সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চাত্য ভাষাসমূহেও এখন 'যোগ', 'যোগী' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার চলিয়া যাইতেছে। ভারতের ভিতরে প্রায় সমস্ত দর্শন ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা যে পদার্থকে বুঝায় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

যোগ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, যোগ বলিতে সাধারণতঃ দুইটি বিশিষ্ট অথচ পরস্পর-সম্পৃক্ত বস্তু বুঝায়। যোগ দর্শনও বটে, অনুষ্ঠানও বটে। দর্শন বলিতে আমরা একটা বিশিষ্ট জ্ঞানধারা বুঝি; পারমার্থিক পদার্থ সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট মতবাদ এবং এই পারমার্থিক জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য একটা বিশিষ্ট মানসিক প্রয়াসকেই সাধারণতঃ দর্শন বলা হইয়া থাকে। যোগও দর্শন; সুতরাং এই প্রকার কোনও একটি বিশিষ্ট চিন্তা-পদ্ধতিকেও যোগ বলা হইয়া থাকে। তা ছাড়া, যোগ বলিতে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও বুঝায়। শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নানা প্রকার ক্রিয়া-সম্বলিত একটা অনুষ্ঠান-ধারাকেও আমরা যোগ বলিয়া থাকি।

যোগ বলিতে একটা বিশিষ্ট রকমের ধ্যান-ধারণা যেমন বুঝায়, তেমনই আসন, মুদ্রা আহারাদির সংযম প্রভৃতি কতকগুলি শারীরিক ব্যাপারও বুঝায়। এক কথায়, যোগ একাধারে একটি কায়িক ও মানসিক ব্যাপার।

পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিব। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র। ন্যায়-বৈশেষিক কিংবা মীমাংসার ন্যায় ইহারও পারমার্থিক পদার্থ সম্বন্ধে একটা মত আছে। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, ইহাদের পরমার্থতা, পরস্পর সম্বন্ধ, প্রভৃতি যে-সব প্রশ্ন অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র বিচার করিয়া থাকে, সে-সব প্রশ্ন পতঞ্জলিও ভাবিয়াছেন এবং সে সব প্রশ্ন সম্বন্ধে পতঞ্জলিরও একটা উত্তর আছে। অবশ্যই, এই সব বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মধ্যে মূলতঃ ঐক্য রহিয়াছে।

কিন্তু শুধু সত্যের উপলব্ধিই পতঞ্জলির উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় দার্শনিকদের কাহারও কাছেই জ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র পুরস্কার নয়। পরমার্থের জ্ঞান আত্মার নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়, তাই এই জ্ঞানের প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধিই এই জ্ঞানের সার্থকতা। সুতরাং আত্মাকে দুঃখ-বিনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য এই পারমার্থিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে।

এই ভাবে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্ঞানের ব্যবহার সকল দার্শনিকই করিয়াছেন; পতঞ্জলি অন্যের চেয়ে একটু বেশী করিয়াছেন; কেন না তিনি জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের ব্যবহারের কথাটাই ভাবিয়াছেন বেশী। শুধু তাহাই নহে; যে-জ্ঞানদ্বারা আত্মার নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে তাহা লাভ করিবার জন্য দেহ ও মনকে একটা বিশিষ্ট অবস্থায় উন্নীত করিতে হয়; তাহার জন্য আবার দেহ ও মনকেও নিয়মের অধীন থাকিতে হয়। দৈহিক নিয়ম হিসাবে নানা প্রকার আসন, মুদ্রা ইত্যাদি এবং মনের জন্য বিবিধ ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির ব্যবস্থা এই জন্যই হইয়াছে। কি কি উপায়ে মনকে কি কি অবস্থায় লওয়া যায়, বিবিধ প্রকার সমাধির বিচারে পতঞ্জলি তাহা বলিয়াছেন। আর মনকে ঐ সব উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য দেহের নানা প্রকার আসন ইত্যাদির অভ্যাস করা দরকার। আবার দেহ যাহাতে ঐ রকম আসন মুদ্রা ইত্যাদি অভ্যাস করিতে পারে সেই জন্য তাহাকেও একটা বিশিষ্ট অবস্থায় রাখিতে হয়। সেটা আহার-বিহারের নিয়ম দ্বারা হইতে পারে; সুতরাং যোগের সাধন হিসাবে আহারাদির বিচারও প্রয়োজন; এবং কোন কোন যোগগ্রন্থে তাহাও করা হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, এই মত অনুসারে আহার হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মার নিঃশ্রেয়স-লাভ এবং এই উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী দেহ ও মনের বিভিন্ন অবস্থা—এ সমস্তই একই কার্য্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ।

পতঞ্জলির যোগসূত্র চারিটি ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ভাগে এই সব উপায়ের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য এই ভাগের নাম 'সাধন-পাদ'। সাধন ছাড়া সিদ্ধি হয় না; সেই জন্য পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানা দশুদ্ধিক্ষয়ে
জ্ঞানদীপ্তি রাবিবেকখ্যাতেঃ।—২।২৮

অর্থাৎ যোগের অঙ্গ হিসাবে যে-সব সাধনের কথা বলা হইয়াছে সে-সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়; এবং অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে পর জ্ঞান-দীপ্তি আসে; তাহার পর পূর্ণ-বিবেকের আবির্ভাব হয়। সুতরাং যোগশাস্ত্র অনুসারে যাহা নিঃশ্রেয়স, তাহা লাভ করার জন্য কতকগুলি সাধারণ অনুষ্ঠান প্রয়োজন। তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান আসিবে না। কাজেই জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য কতকগুলি সাধন দরকার।

এই সাধন কি কি? যে যোগাঙ্গের কথা বলা হইতেছে সেগুলি কি প্রকার? সূত্রকারই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান সমাধয়ঃ—অষ্টৌ অঙ্গানি।—২।২৯

তাহার পর সূত্রকার এই আটটির প্রত্যেকটির স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে যোগের 'বহিরঙ্গ' বলা হয়, আর শেষের তিনটিকে 'অন্তরঙ্গ' বলা হয়।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অর্থে কায়িক ও মানসিক ব্যাপার বুঝায় না। কারণ, 'যম' বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি বুঝায়; আর, 'নিয়ম' বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানও

একটি। এই দুই-ই মানস ব্যাপার; কেন না, দেহ দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান হয় না। কিন্তু আসন ও প্রাণায়াম ত স্পষ্টই শরীরের কাজ সুতরাং যেগুলিকে পতঞ্জলি বহিরঙ্গ মনে করিয়াছেন, সেগুলি সবই শরীরের কাজ নয়। আর, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নামক যে তিনটিকে তিনি যোগের অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন, সে তিনটিই নিরবচ্ছিন্ন মানসিক ব্যাপার নয়। কারণ,

দেশবন্ধ শ্চিত্তস্য ধারণা—৩।১

অর্থাৎ দেহের বিশিষ্ট অংশে—যেমন, নাভিচক্র, হৃৎপুণ্ডরীক, মূর্দ্ধা, নাসিকাগ্র প্রভৃতি স্থলে—অথবা কোন বাহ্য বিষয়ে চিত্তকে বদ্ধ করার নাম ধারণা। সুতরাং ধারণা একেবারে দেহ-নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়।

যোগাঙ্গসকলকে যে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সেটা অন্য অর্থে করা হইয়াছে। কারণ, যেগুলিকে এখানে অন্তরঙ্গ বলা হইয়াছে, সেগুলিই আবার 'নির্বীজ' যোগের বহিরঙ্গ মাত্র।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য—৩।৮।

যে-সব সাধন যোগের যতটুকু কাছে লইয়া যায়, সেগুলি সেই পরিমাণে তার অন্তরঙ্গ সাধন। আর যেগুলি অনুষ্ঠিত হইলেও যোগ-সিদ্ধি দূরে থাকিয়া যায়, সেগুলি বহিরঙ্গ।

যোগের এই যে সব সাধন বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলিকে অন্য ভাবে দেখিলে কায়িক ও মানসিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দেহটিকে যোগের উপযুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে; আবার মনের জন্যও সেইরূপ কতকগুলি বিধি রহিয়াছে।

এই সাধন-বিচারের মধ্যে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনকে কোন বিশিষ্ট অবস্থায় লইয়া যাইতে হইলে দেহকেও তদুপযোগী করিতে হয়; অর্থাৎ দেহে-মনে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একটিকে যোগোপযোগী না করিয়া অপরটি দ্বারা কিছু সাধন করা চলে না।

পাশ্চাত্য দর্শনে দেহ ও মনের সম্পর্ক লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকৃত নয় যে, মন ছাড়া দেহ একটি জড়পিণ্ড মাত্র এবং দেহের বাহিরে মনের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ কোন পরিচয় নাই। আর দেহের অবস্থা-বিশেষের সহিত মনেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, ইহাও সাধারণ স্বীকৃত সত্য।

যোগ-দর্শন এই সত্যটি ধরিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়াছে। দেহের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়ার ইহাই কারণ। শুধু তাই নয়; যে ভাবে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাধনের বিচার করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দেহ-মন মিলিয়া যেন একটি সত্তা। সেই জন্যই প্রাণায়ামাদি দৈহিক ব্যাপারকেও যোগের সাধন বলা হইয়াছে। অবশ্য দার্শনিক পতঞ্জলির নিকট যোগ চিত্তের ব্যাপার। সেই জন্য তাঁহার শাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির স্থান উপরে। তথাপি যোগের জন্য আসন-প্রাণায়ামাদিরও প্রয়োজন রহিয়াছে, এ-কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

যোগের অঙ্গ হিসাবে দৈহিক ও মানসিক এই দুই প্রকারের ব্যাপার যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ইতিহাসটি বড় চমৎকার। দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পতঞ্জলি মুদ্রার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—কোন আলোচনাও করেন নাই। আসন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি অতি সংক্ষিপ্ত—'স্থিরসুখমাসনম্' (২।৪৬), আরামে স্থির হইয়া বসার নামই আসন। অবশ্যই সূত্রের টীকায় টীকাকার মনে করাইয়া দিতেছেন যে, আসন নানা প্রকার—পদ্মাসন, বীরাসন ইত্যাদি। কিন্তু সূত্রকার সে-সব প্রকারভেদের বিচারে কিংবা বর্ণনায় অগ্রসর হন নাই। প্রাণায়াম সম্বন্ধেও পতঞ্জলির আলোচনা খুব বিস্তৃত নয়।

কিন্তু পতঞ্জলি ছাড়া আরও এক শ্রেণীর যোগগ্রন্থ রহিয়াছে যাহার ভিতর আসন ইত্যাদি দৈহিক ব্যাপারের অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়; আসন, প্রাণায়াম ছাড়া আরও অনেক রকম দৈহিক ব্যাপারের কথা সে সব গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে। এ-সবের কথা ভাবিবার আগে এখানে আমাদের একটা বিষয় মনে করা উচিত যে, এক হিসাবে হিন্দুদের সমস্ত দর্শনই সাধন-শাস্ত্র—কোনও পরমার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেই যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা অভ্যাস

করিতে হইবে; উহা নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায়; অভ্যস্ত হইলে পর নিঃশ্রেয়স আনয়ন করিবে। সুতরাং এই জ্ঞান অভ্যাস করিবার জন্য কি কি নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, শাস্ত্র তাহারও বিচার করিয়াছে। এই সব নিয়মের মধ্যে দেহের শাসন ও সংযম অন্যতম। সেই জন্য সাধারণ ভাবে যোগের উপদেশ প্রায় সব শাস্ত্রেই রহিয়াছে; এবং যোগের আনুষঙ্গিক আসন ইত্যাদির উপদেশও ঐ সব স্থলে পাওয়া যায়।

প্রায় সমস্ত দর্শনেরই আকর-গ্রন্থ উপনিষদের দিকে দৃক্‌পাত করিলেও দেখা যায় যে, সেখানেও যোগ উপেক্ষিত হয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগের উপদেশ স্পষ্ট। কিরূপ স্থানে বসিতে হইবে, কি ভাবে বসিতে হইবে, কি ভাবে শ্বাস টানিতে হইবে এবং কি কি বস্তু ধ্যান করিতে হইবে,—এ সব সেখানে বলা হইয়াছে। আর, যোগ অভ্যাস করিলে যে রোগ, জরা ও মৃত্যু জয় করা যায়, তাহাও সেখানে উক্ত হইয়াছে। যোগের অভ্যাস আরম্ভ করিলে অব্যবহিত পরেই কি কি ফল পাওয়া যায় তাহার তালিকা এই—

> লঘুত্ব-মারোগ্য-মলোলুপত্বং
> বর্ণ-প্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবং চ।
> গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
> যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।—২।১৩

ইহা ছাড়া, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য (২-৩ অঃ) প্রভৃতি উপনিষদেও যে-সব উপাসনা-বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহাও যোগ-বিশেষই; কিন্তু এ-সব স্থলে আসন ইত্যাদি শারীরিক ব্যাপার সম্বন্ধে তেমন কিছু উপদিষ্ট হয় নাই; শুধু ধ্যান-ধারণার কথাই বলা হইয়াছে।

বেদান্ত-সূত্রেও (৪।১।১১ ইত্যাদি স্থলে) যোগ-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও আসন কিংবা প্রাণায়াম ইত্যাদি কায়িক ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার কিছু করা হয় নাই। 'স্থিরসুখমাসনম্'—আসন সম্বন্ধে এই মাত্র বলা হইয়াছে। তার পর ধ্যানের কথা, জ্ঞানের কথা উত্থাপিত হইয়াছে।

আসন সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রের উক্তিও ঐ একই ধরণের—"স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ"—। (৬।২৪)। স্থির ভাবে, সুখে উপবেশন করার অর্থই আসন; সুতরাং এ বিষয়ে ইহার বেশী নিয়ম করা নিষ্প্রয়োজন।

ন্যায়-সূত্রও যোগের কথা ভাবিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন যে, ন্যায়ের বর্ণিত পদার্থসমূহের চিন্তা অরণ্য, গুহা ইত্যাদি জায়গায় করিতে হইবে এবং যম-নিয়ম ইত্যাদিও চিন্তাসৌকর্য্যের জন্য অভ্যাস করিতে হইবে।—(৪।২।৪২ ইত্যাদি)।

দর্শনশাস্ত্রে শুধু নয়, গীতার ন্যায় স্মৃতিতেও যোগের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনের আলোচনার মূল লক্ষ্য জ্ঞান। একটা বিশিষ্ট রকমের জ্ঞান-লাভই দর্শনের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য; আর, ঐ জ্ঞানের দৃষ্টিতে পারমার্থিক তত্ত্বের অনুভব করার নামই দর্শন। প্রত্যেক দর্শনই এইরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতির কথা বলে। অবশ্য, এই তত্ত্বানুভূতির সহায়তার জন্য আসন ইত্যাদিও অভ্যাস করিতে হয় এবং আহার-বিহারের সংযমও প্রয়োজন হয়। সেই জন্য আসন ইত্যাদির কথাও দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, দার্শনিক জ্ঞানে অধিকার যাহার আছে তাহার পক্ষে আসন ইত্যাদির কথা নিজে মীমাংসা করা অসম্ভব নয়।

কিন্তু যোগের আর এক শ্রেণীর বই আছে, যাহাতে আসন, মুদ্রা, আহার, ইত্যাদির শারীরিক কাজের উপরই পনর আনা, এমন কি, অনেক সময়ে ষোল আনা, দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই সব শারীরিক ব্যাপার-রূপ যে যোগ, তাহাকে অনেক সময় হঠযোগ বলা হয়। ঘেরণ্ড-সংহিতা, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য, শিব-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এই জাতীয় যোগ-সাহিত্য। এ-সব গ্রন্থে আসন ও মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপারের বর্ণনাও যে না-আছে, এমন নয়। এইগুলি নিতান্তই অশ্লীল ব্যাপার—এত অশ্লীল যে ইহার সংস্কৃত বর্ণনাটা উদ্ধৃত করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি। ইহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে বলিয়াও জানি না। শরীরের পক্ষে প্রয়োজন অথচ লজ্জাজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মানুষ করে; কিন্তু তাহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ করিয়া লওয়া স্বতন্ত্র কথা। এই সব মুদ্রার একমাত্র উপমা কোন কোন

তন্ত্রে পাওয়া যায়। যদিই বা তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহার মধ্যেও গূঢ় অর্থ নিহিত আছে, তথাপি এ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ও উপদেশ সভ্য সমাজে কল্পনা করা কঠিন; এবং গুহ্য আচরণ হিসাবেও ইহার অনুমোদন করা সহজ নয়।

দর্শনের জ্ঞানযোগ আর কায়িক হঠযোগ—এ দুইয়ের সমন্বয় অথবা এ দুইয়ের মাঝামাঝি আর এক প্রকার যোগের বর্ণনা আমরা পাই গীতাতে। সেখানে আহারাদির নিয়ম, আসন, যোগানুকূল স্থান ইত্যাদি কথার সঙ্গে জ্ঞানযোগের কথাও যথেষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু কায়িক ব্যাপারের আলোচনা সেখানে দর্শনের চেয়ে বেশী, আর, জ্ঞানের কথাও হঠযোগের বইয়ের চেয়ে বেশী; এই জন্য যোগ-গ্রন্থ হিসাবে ইহাকে দর্শন ও হঠযোগের মধ্যবর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে।

গীতায় উক্ত বিবিধ যোগের মধ্যে কর্ম্মযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা হঠযোগ-জাতীয় কায়িক ব্যাপার মাত্র নয়; অথচ, জ্ঞান-যোগ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও নহে। শাস্ত্রবিহিত, করণীয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ ফলে নিস্পৃহ হইয়া করার নামই কর্ম্মযোগ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা ছাড়া, যোগের সাধক বা অঙ্গ হিসাবে আসনাদি কায়িক ব্যাপার এবং আহারাদির নিয়মের কথাও গীতায় বিবেচিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, যোগাভ্যাস নির্জ্জনে করিতে হইবে (৬।১০)। পবিত্র স্থানে স্থির আসনে উপবিষ্ট হইতে হইবে; আসন বেশী উঁচু কিংবা অত্যন্ত নীচু হওয়া উচিত নয়; উহা কুশ ও চর্ম্মাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। বসিবার সময় দেহ, গ্রীবা ও মস্তক সোজা রাখিতে হইবে। দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিবিষ্ট থাকিবে এবং চারি দিকে চাহিতে হইবে না। (৬।২১-১৪)

দ্বিতীয়তঃ, আহারাদি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে অত্যন্ত আহার করে কিংবা একান্ত অনাহারে থাকে, আর যে অত্যন্ত ঘুমায় কিংবা একান্ত অনিদ্রায় কাটায়, তাহার যোগ করা হয় না। (৬।১৬)। সপ্তদশ অধ্যায়ে আবার এই আহারাদির আলোচনা হইয়াছে। সেখানে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয় অনুসারে আহার ত্রিবিধ কল্পিত হইয়াছে। (১৭।৭ ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য, সাত্ত্বিক আহারই যোগীর আহার।

'যোগ' শব্দ দ্বারা অভিহিত যে জ্ঞানের কথা—যে পরমার্থ-তত্ত্বের কথা, বিভিন্ন দর্শন ও ভ' ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, হঠযোগ-জাতীয় কায়িক ব্যাপার হইতে পৃথক্ করিয়াও তাহার বিচার হইতে পারে। আর, যোগের 'অঙ্গ' হিসাবে প্রাণায়াম ইত্যাদি যে-সব কায়িক ব্যাপারের উপদেশ রহিয়াছে, কোনও দার্শনিক মতবাদের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও সে সকলের আলোচনা, এমন কি, অনুষ্ঠানও, করা যাইতে পারে। ঘেরণ্ড-সংহিতার মত হঠযোগের বইয়ে জ্ঞানের কথা, তত্ত্বের কথা, দর্শনের বিচার, অতি সামান্যই পাওয়া যায়। কায়িক অনুষ্ঠানগুলির বিশদ বর্ণনা দেওয়াই এ-সব বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে ও-সব অনুষ্ঠানের উপকারিতা কি, তাহাও অবশ্যই আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কোনও দার্শনিক মত-বিশেষের অপেক্ষা না রাখিয়াও আসন, প্রাণায়ামাদির আলোচনা করা যাইতে পারে।

হঠযোগ-সাহিত্যে বর্ণিত অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিলেও যোগের অঙ্গ হিসাবে যে-সব আসন ও মুদ্রা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি বর্ত্তমান যুগেও একেবারে বিবেচনার অযোগ্য নহে। উপমাটা সকলের মনঃপূত হইবে কি না জানি না; তবে, ইহা সত্য যে, কুস্তির প্যাঁচ, জিম্ন্যাষ্টিক, যুযুৎসু, প্রভৃতি ব্যায়াম যেমন কষ্টসাধ্য, যোগের আসন ও মুদ্রাও অনেকগুলিই ঐ রকম কষ্টসাধ্য। শুধু তাহাই নহে, অনেকগুলির উপকারিতাও ঐ একই রকমের।

আসন ও মুদ্রা উভয়ই কায়িক ব্যাপার; উভয়ের ভিতর পার্থক্যও খুব বেশী নয়। সাধারণভাবে সমস্ত দেহের অবস্থান-বিশেষকে আসন বলা হয়, যেমন, পদ্মাসন; আর, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষের অবস্থান-বিশেষের নাম মুদ্রা, যেমন, অঙ্কুশ-মুদ্রা, কাকী-মুদ্রা; হস্তের অঙ্গুলি, ঠোঁট, প্রভৃতির ভঙ্গিবিশেষ দ্বারা এই সব মুদ্রা করিতে হয়। কোনও কোনও মুদ্রায় সমস্ত দেহটিরই ভঙ্গিবিশেষ আনয়ন

করিতে হয়, যেমন, 'মহামুদ্রা'। ইহাতে এক পা গুটাইয়া গুহ্যদেশে চাপিতে হয়, আর এক পা মেলিয়া দুই হাতে তাহার অঙ্গুলি ধরিতে হয় এবং চিবুক বুকের উপর স্থাপন করিতে হয়। আসন হইতে ইহার পার্থক্য তেমন কিছু নয়। কোন কোন আসনও ইহার মত—কিংবা ইহার চেয়েও কষ্টসাধ্য, যেমন, 'ময়ূরাসন'।

এই সব মুদ্রার স্বরূপ সম্বন্ধে সকলেই একমত এমন নয়। কখনও কখনও একই নামের মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ঘেরণ্ড-সংহিতার বজ্রোলী মুদ্রা শিব-সংহিতায় বর্ণিত ঐ নামের মুদ্রা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এই সমস্ত আসন ও মুদ্রার বর্ণনা ও আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। এগুলির বেশীর ভাগেরই আপাততঃ উদ্দেশ্য শরীরটাকে যোগ-পটু করিয়া তোলা। দেহটাকে নীরোগ করাও এই উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থ স্পষ্টতঃই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আসনাদির উপদেশ দিয়া তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই বলেন, এ সব অভ্যাস করিলে দেহ সুস্থ ও পটু হইবে।

সর্ব্বে চাভ্যন্তরা রোগা বিনশ্যন্তি বিষাণি চ।

দেহটিকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য এখনও যেমন নানা প্রকার ব্যায়াম ও দেহচর্চ্চার ব্যবস্থা রহিয়াছে ও হইতেছে, আসন প্রভৃতিও অনেকটা তাই। অন্ততঃ সেগুলিকে ব্যায়ামের সহিত তুলিত করিয়া বিচার করিলে কোন দোষ হইবে না। এখনও নিত্যনূতন গবেষণা হইতে আহারাদি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে এবং দেহের উন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা চিন্তিত হইতেছে। নূতন ব্যায়াম-প্রণালীর আবির্ভাবও যে না ঘটিতেছে এমন নয়। এই সব গবেষণার সঙ্গে যোগের আসন-মুদ্রা ইত্যাদির উপকারিতার কথাও বৈজ্ঞানিকেরা বিচার করিতে পারেন। এগুলি সত্যসত্যই উপকারী কিনা—এগুলির ভিতর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না—এবং কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপকার পাওয়া যাইতে পারে—বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক ছাড়া এ-বিচার আর কে করিবে? কতকগুলি সাধারণ কথা অবশ্য সকলেই জানে। গলার কিংবা নাসিকার ব্যারাম হইলে তাহা ধৌত করার ব্যবস্থা চিকিৎসকেরা দিয়া থাকেন। যোগের অঙ্গ হিসাবেও এইরূপ ধৌতির ব্যবস্থা আছে। যোগলভ্য আধ্যাত্মিক উপকারের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু দেহের উপকারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি হিসাবে এই সব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা চলে কিনা—এগুলি দ্বারা দেহের বাস্তবিকই উপকার হয় কি না, একথা বৈজ্ঞানিকদের ভাবিতে দোষ কি? ঘেরণ্ড-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দন্তশোধন হইতে আরম্ভ করিয়া মূলশোধন, বস্তি, নেতিযোগ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। এ সমস্ত অভ্যাস করিলে "জরা নৈব প্রজায়তে", আর "ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ"; অর্থাৎ এ সমস্ত দ্বারা দেহের ব্যাধি ও জরা নিবারণ করা যায়। বাস্তবিকই তাহা যায় কি না, বৈজ্ঞানিকদের বিচার করিতে দোষ কি?

আমরা এক স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকের নিকট শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে ঐ সব আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করাইয়া ভাল ফল পাইয়াছেন। কয়েকটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বালক এই সব অভ্যাস করিয়া প্লীহা-যকৃতের হাত হইতেও মুক্তি পাইয়াছে শুনিয়াছি। যদি সত্যই তাহা হয়, তবে আত্মার মুক্তি যাহারা না চায় তাহারাও দেহের শুদ্ধির জন্য ত এ-সব অভ্যাস করিতে পারেন।

যোগের অনেক বইয়েই দেখা যায়, অমুক ব্যাপার গুরুর কাছে শিখিবে এবং গোপনে শিখিবে—

গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ।

এবং "গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু।"

গুরুর নিকট অবশ্যই জিমন্যাষ্টিকও শিখিতে হয়; সুতরাং তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু যে-জিনিষটা সাধারণের উপকারে আসিতে পারে সে-জিনিষটা গোপন রাখার কি সার্থকতা? অবশ্যই কতকগুলি মুদ্রা আছে যাহা প্রকাশ্যে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, যেগুলির বিষয়ে প্রকাশ্যে বাচিক উপদেশ দেওয়াও শালীনতার বিরোধী। এগুলি যে বর্জ্জন করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক আসন মুদ্রা আছে, সেগুলিকে ব্যায়ামের অঙ্গ এবং প্রকার হিসাবে বিদ্যালয়েও শিক্ষা দেওয়া চলে।

প্রাচীনদের গুপ্ত বিদ্যার কথা অনেকেই বলেন—বিশেষ করিয়া 'থিয়োসফি'। প্রাচীনেরা অনেক বিষয়ে অজ্ঞও ছিলেন—আবার অনেক বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞও ছিলেন। তাঁহাদের উপার্জ্জিত জ্ঞান বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করায় দোষ ত কিছুই নাই! সেটা ত আমাদের উত্তরাধিকার।

প্রাচীনপন্থী কেহ হয়ত বলিবেন, যোগের কি অবশেষে এই পরিণতি হইবে যে বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক উহার শিক্ষক হইবেন? আমাদের মনে হয়, সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রযুক্ত হইলে যোগের কোন অগৌরব হইবে না। দেবকার্য্য সাধনের জন্য দধীচি তাঁহার অস্থি কয়খানাও দিয়াছিলেন; যোগের আসন ও মুদ্রা দ্বারা মানুষের দৈহিক উন্নতি যদি করা যায়, তবে সেটা ত অনীপ্সিত হওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমানে এই শাস্ত্র দ্বারা আধ্যাত্মিক উপকার কত জনের হইতেছে জানি না; বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে তাহার চেয়ে ঢের বেশী লোকের কায়িক উন্নতি হয়ত ইহার দ্বারা হইবে। অন্ততঃ সেটা হইতে পারে কি না, ভাবিতে দোষ কি?

মুরুং জাতি

শ্রীনীহারবিন্দু রুদ্র

পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মুরুং জাতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে লিখেছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাদের শিল্পরচনা, আতিথেয়তা, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে লিখছি।

মুরুং জাতি সভ্যতার মানদণ্ডে অনেক পিছনে পড়ে থাকলেও এদের ভিতর আজও যে শিল্পবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তা শিক্ষিত সমাজেরও ঈর্ষার বস্তু হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে বাঁশ ও বেতের সূক্ষ্ম কাজে এরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেক উন্নত। কাপড়ের উপর রঙীন সূতার ফুল, নানা প্রকার ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করতে এরা বিশেষ কুশলী।

অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে, অনেক বিষয়ের মত বিবাহ ব্যাপারেও এদের একটু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ গো-নাচের দিনে যুবক-যুবতী নিজেদের ইচ্ছামত পাত্রী বা পাত্র মনোনীত করে। কিন্তু এ মনোনয়নে এদের বিবাহ-ব্যাপার শেষ হয় না। প্রথমতঃ দেখতে হবে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কে ধনী। যদি পাত্র ধনী হয় এবং পাত্রীর উপযুক্ত নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে পারে তবে আর কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদি পাত্র দরিদ্র হয় অর্থাৎ মেয়ের উপযুক্ত মূল্য দেবার সামর্থ্য তার না থাকে, তাহলেই মুশকিল। পাত্রীর গায়ে যত গয়না আছে বা থাকে (গয়না অর্থে শুধু টাকা-আধুলি-সিকি প্রভৃতির মালা ও আংটি) তার সমান মূল্য পাত্রকে দিতে হবে মেয়ের বাপকে। যদি তা না দিতে পারে আর সে মেয়ের জন্য ছেলের বেশী আগ্রহ দেখা যায়, তাহলে ছেলেকে ঘরজামাই হ'তে হবে। ছেলেকে এই মুচলেকা দিতে হয় যে সে শ্বশুরকে দু-তিন বছরের জন্য ঘরে-বাহিরে যাবতীয় কাজে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে, তার হুকুমের বাইরে এক পাও যাবার ক্ষমতা তার থাকবে না। শ্বশুর ও জামাইকে ঐ নির্দ্ধারিত সময়ে ঘরে-বাইরে যাবতীয় কাজে কুলির মত খাটিয়ে নেয়। নির্দ্ধারিত কাল উত্তীর্ণ হ'লে ছেলে স্ত্রী নিয়ে ঘর করবে অথবা মা-বাপের কাছে ফিরে যাবে। যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সে জামাই মারা যায় বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিদায় নিতে বাধ্য হয়, তাহলে তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ ক'রে দেবে তারই বংশধরগণ। নিজের সমস্ত সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়েও, জামাই হয়ে

সে শ্বশুরের ঘরে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত সাধারণ কুলির মত থাকবে কাজ করবে। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সমস্ত উপার্জ্জন শ্বশুরের জন্য ব্যয় করবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লে ছেলেকে দলপতির কাছে মোটা জরিমানা দিতে হয়, স্ত্রীও স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়।

যাদের টাকা দেবার সামর্থ্য আছে তারা প্রথমে শ্বশুরের টাকা শোধ করে, তার পর বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে নিয়ে শ্বশুরের বাড়ীতে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় প্রায় এক-শ দেড়-শ মুরগী ও একটি বড় শূকর। বিবাহের পর তিন দিন ছেলে শ্বশুরের বাড়ীতে থাকবে। এ কয় দিন সে শ্বশুরের কোন জিনিষ স্পর্শও করবে না। তিন দিন পরে বিদায়-মুহূর্ত্তে শ্বশুর জামাতাকে একটি দা ও একটি বর্শা যৌতুক দেবে। কন্যা-জামাতা বিদায় হবার পর, শ্বশুর পাড়াপ্রতিবেশীদের নিয়ে মেয়ের বাড়ী যাবে। সেও যাবার আগে প্রায় এক-শ দেড়-শ মুরগী ও বড় একটি শূকর নিয়ে যাবে এবং তিন দিন জামাইয়ের বাড়ীতে থাকবে কিন্তু জামাতার দেওয়া কোন জিনিষ স্পর্শ করবে না। তিন দিন পরে শ্বশুরের বিদায়কালে জামাতা নিজের হাতে এক গ্লাস মদ শ্বশুরকে পান করতে দেবে, শ্বশুরও জামাতাকে এক গ্লাস দেবে। এই মদ খাওয়ার ভিতর শ্বশুরও জামাতার পূর্ব্বের সমস্ত বিরোধ চুকে গিয়ে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হয়। এই প্রথাটিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বাস্থ্য-আকাঙ্ক্ষায় পানের অনুরূপ বলা যেতে পারে।

এদের বিবাহ-সংক্রান্ত একটি কুপ্রথা আছে। যদি কোন মেয়ে বিয়ের আগে সসত্ত্বা হয়, সন্তানের মাতা হয়, তা হ'লে সমাজে তার মূল্য খুব বেড়ে যায়, সে মেয়ে তখন সমাজের অতি উচ্চে স্থান পায় এবং সে ছেলেকে তারা "আল্লাপোয়া" (God's son) নামে অভিহিত করে। এ প্রকারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে সমাজে খুব আদরণীয় হওয়া যায়।

বহুবিবাহ এদের মধ্যে প্রচলিত। স্বামীর মৃত্যুর পর বা জীবিতাবস্থায় অন্য স্বামী নির্ব্বাচন ও বিবাহ করাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বিবাহচ্ছেদ-প্রথার নিয়ম এই যে, যে পক্ষ বিবাহ ভাঙবে, তাকে বিবাহের যাবতীয় ব্যয় অন্য পক্ষকে দণ্ডস্বরূপ দিতে হবে ও বিবাহ-চুক্তি ভঙ্গের জন্য পনর টাকা জরিমানা দিতে হবে দলপতির কাছে।

মুরুংদের ভিন্ন ভাষা আছে। তারা কথা বলে নিজেদের ভাষায়, কিন্তু এদের কোন বই নেই বা লিপি নেই, কাজেই ভাষা থেকেও তার অস্তিত্ব নেই। তারা মুরুং ভাষায় কথা বলে বটে, কিন্তু লেখে মগ ভাষায়। এদের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নেই, মগ ধর্ম্মগ্রন্থই এদের ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মগ ভাষা ও মুরুং ভাষার কোন মিল নেই। মুরুংরা মগ ভাষায় কথা বলতে ও পড়তে জানে, কিন্তু মগরা মুরুং ভাষায় কথা বলতে জানে না।

এরা বৌদ্ধমঠে উপাসনা করে, শ্রমণ-ভিক্ষুর উপদেশ গ্রহণ করে এবং মগদের ধর্ম্মকে নিজেদের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করে। কিন্তু এরা যে গোহত্যাকে ধর্ম্ম ব'লে জানে, তা মগদের চোখেও বড় নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর। ধর্ম্ম এক হ'লেও মগ জাতির তুলনায় এরা অনেক পিছনে পড়ে আছে।

নবান্নের দিনে এরা যে কোন একটি জন্তু হত্যা করে "ফরাতরা"র (দেবতার) উদ্দেশে এবং সেই জন্তুর রক্তে তাদের জুমের মাটি রাঙিয়ে নেয়। এদের বিশ্বাস এতে ভগবান্ খুব সন্তুষ্ট হন এবং ফলে জমিতে বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু "ফরাতরা"র উদ্দেশে এত হত্যা করেও এরা অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় দরিদ্র।

নদীকে এরা সবচেয়ে বেশী ভয় করে ও বড় দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। কারণ জলদেবতা তুষ্ট না হ'লে সে বৎসর বৃষ্টি হবে না, জুমে ফসল হবে না। তাই বৈশাখের প্রথমেই এরা বৃষ্টিদেবতার উদ্দেশে নদীতে পূজা করে ও পশুপক্ষী হত্যা করে।

কৌতূহলের বিষয় এই, এরা নিজেদের নাম ক'রে প্রাণী-হত্যা করে না। দেবতার উদ্দেশে হত্যা ক'রে বলে, পাপ দেবতার, কারণ হত্যার উদ্দেশ্য দেবতাকে তুষ্ট করা। গৃহে অতিথির পরিতোষের জন্য যে হত্যা হয়, সে পাপ গৃহস্থের নয়, তা অতিথির। নিজেদের ভোগের জন্য কোন মুরুং কিছু হত্যা করে না। নিজের প্রয়োজন হ'লেও দেবতার উদ্দেশে পূজা ক'রে তবে হত্যা করে।

এদের একতা প্রশংসার যোগ্য—সকল কাজেই একে অন্যের জন্য প্রাণপণ সাহায্য ক'রে থাকে।

এরা বলে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চিত্রসেন ব'লে মুরুংদের এক রাজা ছিলেন। এদের অতীত দিনের পরিচয় দেয় এদের কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা। এই মুদ্রার উপরে যে লেখা আছে তার ভাষা বুঝা যায় না, ওজনে মাত্র চৌদ্দ আনা; মুরুংরা বলে অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা চিত্রসেন এ-টাকা প্রচলন করেছিলেন। এক জায়গায় একটি বিরাট্ সুড়ঙ্গ ও কয়েকটি পুকুর দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারি যে, রাজা চিত্রসেন নাকি তাঁর সৈন্যদের গোপন আড্ডার জন্য ঐ প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন। এখন শুধু ভগ্নাবশেষ

কর্ম্মরতা মুরুং রমণী

ছাড়া আর কিছু নেই। দু-একটা ভাঙা ইটও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

কোন প্রকার রোগে এরা ঔষধ খায় না, আর রোগের কথা গোপন করবেই।* যদি কোন পাড়ায় কলেরা বা

মুরুংরা কার্পাস বিক্রি করিতেছে

বসন্ত হয়, তাহ'লে সে পাড়ার কোন লোককে অন্য পাড়ায় ঢুকতে দেওয়া হয় না, অন্য পাড়ার লোক সে পাড়ায় যেতে পারে না। এই অসুবিধার জন্য এরা নিজেদের রোগের কথা কিছুতেই প্রকাশ করতে বা ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করতে চায় না। ভূতের ভয় এদের খুব বেশী। যদি এক পাড়ায় পর-পর দু-তিনটি লোক মরে, তো বাকী সব লোক সে-পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও পাহাড়ের গায়ে নূতন পাড়া তৈরি করবে। মুরুংদের একটি স্বভাব, এরা এক পাড়ায় খুব বেশী দিন বসতি করে না, কয়েক বছর পরেই অন্য পাড়ায় "পরম" (migrate) করে।

মৃত্যুর পর আত্মার পথপ্রদর্শক হবার জন্য এরা চিতায় একটি কুকুর-ছানা হত্যা করে। একমাত্র কুকুর ছাড়া কেউ নাকি আত্মাকে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। এই হত্যাই মৃতের উদ্দেশে তাদের শেষকৃত্য।

জুম চাষই এদের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। একই জুমে স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলে কাজ করে এবং বৎসরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন করে। কার্পাসই এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বৎসরে অনেক টাকার কার্পাস এ অঞ্চল থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। কার্পাসের সময় প্রায় সমস্ত পাহাড়ের দৃশ্য ধবধবে সাদা হয়, মাথায় "থুরুং" (ঝাঁকা) নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ সকলে কার্পাস-চয়নে ব্যস্ত থাকে। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে, বা বাজারে কার্পাস বিক্রি করে।
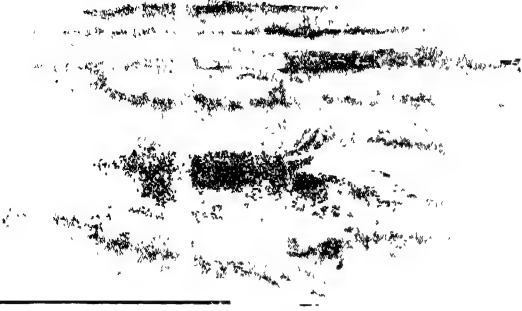
বরকল জলপ্রপাত—পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

এই সময় প্রায় সমস্ত পাহাড়ীরাই অত্যন্ত বিলাসী হয়ে ওঠে এবং অযথা টাকা-পয়সা নষ্ট করে, ফলে দারিদ্র্য ডেকে আনে।

অন্যান্য পাহাড়ীদের মত মুরুং জাতিও অত্যন্ত মদ্যপ্রিয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় মদ তৈরি করতে কোন বাধা নেই, কিন্তু বিক্রি করা চলে না। প্রত্যেক ছোট-বড় উৎসবে, অতিথি-সংকারে এদের মদ দরকার। স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে সকলেই অত্যন্ত মদ্যপান করে। আজকাল আর একটি নেশা দরিদ্র মুরুং জাতিকে আরও দারিদ্র্য ও ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে আফিঙের নেশা। স্বভাবতঃ কুড়ে মুরুং পুরুষ এর ফলে আরও বেশী কুড়ে হয়ে পড়ছে।

মুরুংরা চুরিডাকাতি করে না, কিন্তু প্রতিহিংসাগ্রহণে কঠোর ও নির্ম্মম।

পূর্ব্বেই বলেছি, এরা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। একই পাতে পরিবারের সকলে আহার করে, ভুক্তাবশিষ্ট তুলে রেখে দেয় বা সেই পাতেই কুকুরকে খেতে দেয়। ছোটবেলা থেকে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে এক প্রকার কালো রং দ্বারা নিজেদের দাঁত ভিতরে বাহিরে কালো ক'রে নেয়। কালো দাঁত না হ'লে এরা সৌন্দর্য্যের দাবি করতে পারে না।

এই জাতির প্রধান অস্ত্র দা ও বর্শা। দুর্গম জঙ্গলে শুধু দা ও বর্শা নিয়ে এরা বড় বাঘ প্রভৃতির সম্মুখীন হ'তে একটুও দ্বিধা করে না।

বহুদূর হ'তে পরিষ্কার পানীয় জল সংগ্রহ করা মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। মুরুংরা জল সংগ্রহ করে "ভুদুং" বা লাউয়ের খোলায় ক'রে। একটি মেয়ে এক-এক বারে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ "ভুদুং" জল ভর্ত্তি করে ও ঝাঁকায় বসিয়ে মাথায় বহন করে। পাহাড়ের সরু পথ বেয়ে যখন মুরুং যুবতীরা ঝাঁকা-মাথায় সারি সারি উপরে উঠতে থাকে তখন এক বিচিত্র দৃশ্য হয়। এরা অন্যান্য সব বিষয়ে অপরিচ্ছন্ন হ'লেও পানীয় জলের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক।

মুরুংদের মধ্যে বহু গান ও ছড়া প্রচলিত আছে। এদের গান বা ছড়া মগ গান বা ছড়ার মূল ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার অধিকাংশই মগ ভাষায়। গো-নাচের দিন সাধারণতঃ মুরুং যুবক-যুবতীরা এই একটি গান করে,

মংলে লাছায়, মেলে হিছায়
ম্যা রাই কি লুংখ্যু
রপা মাইমা থাচে ক্রংরে।

আমি বহু দূর হ'তে এসেছি। আজ ভগবানের কৃপায় তোমার আমার দেখা এখানে। তুমিও আমায় চিনতে না, আমিও তোমাকে চিনতাম না। আজ আমাদের এই মিলনক্ষণ বড় সৌভাগ্যের। এস আমরা গান করি।

কোন এক পাড়ায় বেড়াতে এসে যদি যুবক-যুবতীর মনের মিল হয়, তখন যুবক ভাবাবেগে এই গানটি করে,

আয়ং গাবাং মেরো থাইমা
লাফা রেগা ক্যয়জিরো
মরো লাথাছি, কোয়াংয়া লাফাতো
চাওতোয়া রি থ্যায় পিবালা।

—অনেক দিন হ'তে তোমার কথা আমি শুনে এসেছি। তোমার পাড়ায় এসে আজ তোমার দেখা পেলাম। তোমার আমার মনের মিল হোক। আমাকে তামাক দাও, পান দাও, আর প্রচুর মদ খেতে দাও।

এদের আর একটি ছড়া আছে,

মেরী দোলালে, দোলালে ছাগা পিওমে, আঙ্গি পিওমে, লাফা পিওমে, লাফা পিওমে, দোলালে, মেরী দোলালে।

—তুমি আমার কাছে এস। তোমাকে গয়না দেব, জামা দেব, তামাক দেব আর প্রচুর মদ খেতে দেব, আমার কাছে এস।

গান ও ছড়ার মধ্যে দিয়েও এদের মদ্যপ্রীতি প্রকাশ পায়।

ষ্টেশন ক্লাব, রাঙ্গামাটি

এক বার মফস্বল গিয়ে কতকগুলি মুরুং যুবককে এক জন বাঙালী মেয়ের ফটো দেখাই। সবাই ছবিটিকে ঘিরে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, তাদের মুখ থেকে শুধু একটি কথা বেরিয়েছিল "ফরাতরা" (দেবতা)। তার পর যা বলেছে বুঝি নি। জিজ্ঞাসা ক'রে বুঝতে পারি যে, এরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে কি ক'রে সাহেব "বেরী মানুষ" (স্ত্রীলোক) দিনরাত্রি সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে থাকে। আমাদের ও এদের অভিজ্ঞতায় আশ্চর্য্য পার্থক্য দেখে বিস্মিত হই নি।
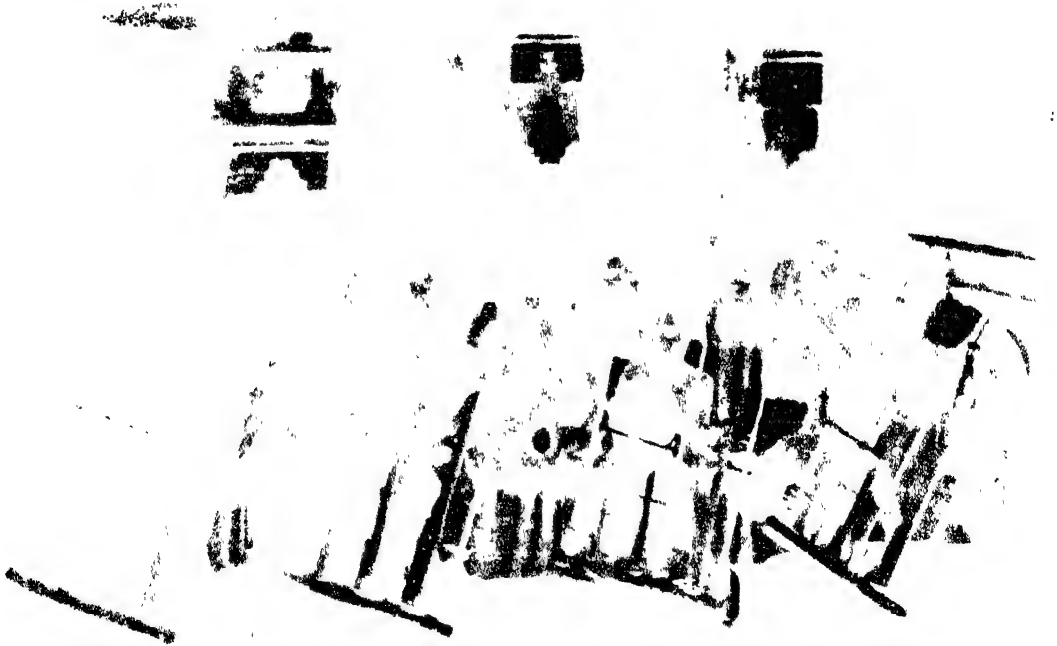
বলিদ্বীপের কিশোর বাদ্যকর দল। "জাভার চিঠি" (পৃ. ৮০১) দ্রষ্টব্য।

বিমানপোত হইতে বোমানিক্ষেপের কৌশল

বর্ত্তমান যুগে সামরিক শক্তি বলিতে প্রধানতঃ বিমান-বহরই বুঝায়। ১৯১৪-১৮ সালের মহাসমরে পদাতিকের স্থান ছিল সর্ব্বপ্রধান। আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ সে যুগেও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এ ধরণের যুদ্ধের তখনও নেহাৎ শৈশব।

কিন্তু যে মহাযুদ্ধের ছায়া আজ সমস্ত জগতের উপর পড়িয়াছে, সে যুদ্ধে পদাতিকের স্থান অনেক নিম্নে। এ যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বল জাতির বিমানশক্তি এবং নিভৃত গ্রামেও আজ এই বিপদের ছায়া পৌঁছিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে শুধু ক্রমাগত আত্মরক্ষা করিয়া গেলে চলিবে না, এ-ক্ষেত্রে জয়ের প্রধানতম উপকরণ আক্রমণ। কাজেই আক্রমণকারী বিমানকে বাধা দেওয়া অপেক্ষা বিমানবাহিনীর বড় কাজ হইতেছে বিপক্ষদলের উপর বোমাবর্ষণ।

ইহাদের একটি অংশ বিপক্ষ-শিবির ও প্রধান প্রধান স্থান-গুলির অবস্থান সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং অপর দল সেই সকল স্থানে বোমানিক্ষেপ করিয়া আসে।

বর্ত্তমান যুগে এরোপ্লেনের অনেক উন্নতি হইয়াছে। আগের তুলনায় ইহারা অনেক বেশী ওজনের বোমা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, ফলে সুবিধামত স্থানে বোমার গুদামের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসিতেছে। এ সব এরোপ্লেন অনেক অংশে স্বাবলম্বী।

বোমানিক্ষেপের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষের যতদূর সম্ভব ক্ষতি করা, সুতরাং লক্ষ্যবেধের উপযুক্ত শিক্ষা চালক-দিগের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এক ধার দিয়া বোমা ফেলিয়া যদি শত্রুপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি না করা যায়, তাহা হইলে অকারণ খরচ। এই অকারণ ব্যয় যতদূর সম্ভব কম হয়, সেই জন্য অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ-শিক্ষা বৈমানিক ছাত্রদিগকে সযত্নে দেওয়া হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বোমানিক্ষেপের জন্য এক সঙ্গে কয়েকটি বিমান শ্রেণীবদ্ধভাবে যাত্রা করে। এই শ্রেণীবদ্ধভাবে বিমান-চালনা শিক্ষা দুরূহ ব্যাপার, কারণ প্রপেলার ঘুরিবার বেগের একটু এদিক-ওদিক হইলেই দুইটি বিমানে সংঘর্ষ লাগিবার সম্ভাবনা আছে। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আক্রমণের একটি প্রধান উপযোগিতা এই যে একসঙ্গে অনেকগুলি বোমা ফেলিলে কয়েকটি ঠিক স্থানে পড়িবেই। তাহা ছাড়া শত্রুপক্ষীয় বিমান উল্টা আক্রমণ করিলে তাহাদের বাধা দেওয়া সুবিধা। অবশ্য যখন নীচে হইতে বিমান-বিধ্বংসী কামান গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, তখন এরোপ্লেনগুলিকে বাধ্য হইয়া অনেকটা তফাতে তফাতে থাকিতে হয়, কারণ একসঙ্গে বহু বিমানপোত জড় হইয়া থাকিলে নীচে হইতে শূন্যে লক্ষ্যবেধের সুবিধা।
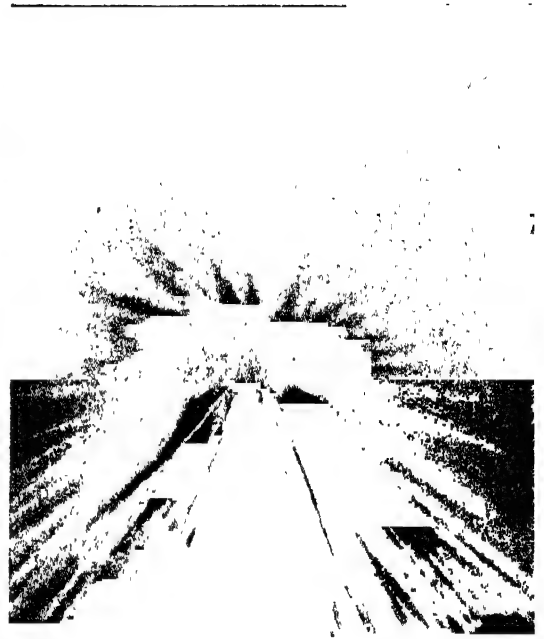
শত্রুপক্ষীয় জাহাজের উপর বোমা নিক্ষেপ

এরোপ্লেন হইতে যখন বোমা নিক্ষেপ করা হয় তখন এরোপ্লেনের গতির দরুন বোমা ঠিক নীচে না পড়িয়া অনেকখানি সম্মুখে গিয়া পড়ে। কাজেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার খানিকটা পূর্ব্বেই বোমা ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্তরে বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগের ফলেও বোমা অনেকখানি এদিক-ওদিক পড়িতে পারে। ঠিক কতখানি দূর হইতে কোন্ সময়ে বোমা নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য বিদ্ধ হইবে এ সব হিসাব করিবার জন্য নানা যন্ত্রপাতির সাহায্য লইতে হয়। কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত চালক ভিন্ন ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে বোমা ফেলা অসম্ভব বলিলেই হয়।

বোমানিক্ষেপের জন্য আর একরকম উপায় মধ্যে মধ্যে

আকাশ হইতে গৃহীত একটি কারখানার চিত্র। ফটোগ্রাফ ও ছায়া-সংস্থানের সাহায্যে এই কারখানাকে চিনিয়া লইয়া আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপে ধ্বংস করা সহজ ব্যাপার। যাহাতে এই কারখানাটিকে চিনিয়া লওয়া না যায়, এজন্য ইহাকে যে ছদ্মবেশ ধারণ করানো হইয়াছে, পরপৃষ্ঠায় তাহার চিত্র দ্রষ্টব্য।
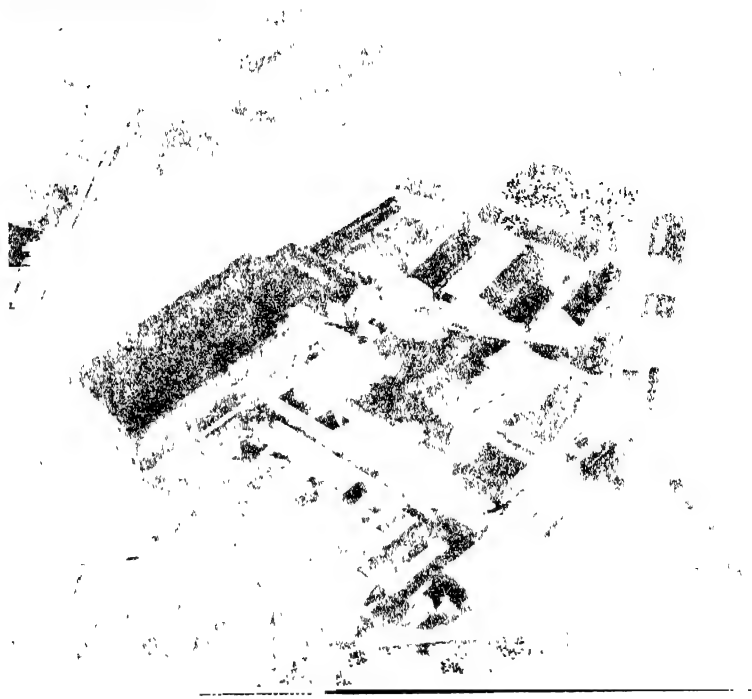
অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এখানে চালক লক্ষ্যের দিকে এরোপ্লেনের অগ্রভাগ রাখিয়া সহসা এক মাইল বা ততোধিক ডুব মারিয়া মাটি হইতে প্রায় হাজার গজ উর্দ্ধে আসিয়া বোমা ছাড়িয়া দেয়। এরোপ্লেন হইতে তীব্র গতিবেগের সহিত বোমা পড়ে বলিয়া অল্প উঁচু হইতে ছাড়া সত্ত্বেও বিস্ফোরণের কোন ব্যাঘাত হয় না। বোমানিক্ষেপের পর এরোপ্লেন আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করে।

এই সব বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেন লইয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের সমস্ত ক্ষণ প্রাণ হাতে লইয়া কাজ করিতে হয়। যন্ত্রপাতি খারাপ আজকালকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে তত বেশী হয় না। কিন্তু শত্রুপক্ষের বিমানের পাল্টা আক্রমণ আছে, নীচে বিমানধ্বংসী কামানের অগ্নিবর্ষণ আছে, এমন কি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উড়িবার সময়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ভয় আছে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আত্মবিশ্বাস এই যুদ্ধের প্রধানতম সহায়।

বোমারু বিমানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানধ্বংসী কামানেরও উন্নতি চলিয়াছে। গত সংখ্যায় তাহার নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আকাশ-পথে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিস্ফোরক মাইন্ রাখার বন্দোবস্ত চলিতেছে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এই অবিরাম পাল্লা কোথায় গিয়া শেষ হইবে কে জানে?

বিমান-আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ঘরবাড়ীর ছদ্মবেশ

মাটির কয়েক হাজার ফুট উপরে বিমানপোত হইতে নীচের ঘরবাড়ী প্রভৃতি সাধারণ মানুষের চোখ দিয়া দেখিলে চেনা চলে না। উপর হইতে নীচের জিনিষ চিনিবার জন্য বৈমানিকের চোখকে অভ্যস্ত করিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে আলোছায়া এক ভাবে দেখায়, উপরে সেই আলোছায়ার রূপই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণের জিনিষ উপর হইতে শুধু বর্ণের উপর নির্ভর করিয়া দেখিলে চলিবে না, বর্ণের গভীরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গত বিশ বৎসরে বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেনের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠস্থ ঘরবাড়ী, কলকারখানা, বিমানঘাঁটি প্রভৃতিকে ছদ্মবেশ পরানোর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ছদ্মবেশ আর কিছুই নহে, যাহাতে শূন্য হইতে ছায়ার সংস্থান দেখিয়া কারখানার ছাদের অস্তিত্ব, আশেপাশের জমির সহিত কারখানার বাড়ী প্রভৃতির প্রভেদ না বুঝা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা।

বিমান-আক্রমণকারীরা সাধারণতঃ আকাশ হইতে প্রস্তুত মানচিত্র দেখিয়া স্থান নির্ণয় করে; কাজেই যদি কোনোরকমে

বিমাণ-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্ব্বপৃষ্ঠার কারখানাটির ছদ্মবেশ। উহাকে এমনভাবে চিত্রবিচিত্র করা হইয়াছে যেন চতুষ্পার্শ্বের সহিত মিশিয়া থাকে, আকাশ হইতে চিনিয়া বাহির করা না যায়। বিমান-বিধ্বংসী কামানের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বোমানিক্ষেপকারীকে এত উর্দ্ধে (১৮।২০ হাজার ফুট) উঠিতে হইবে যে, সেখান হইতে এই ছদ্মবেশধারী কারখানা সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিবে।

বিমানঘাঁটিকে জঙ্গলের রূপ অথবা কারখানাকে সমতল ভূমির রূপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিমান-চালকের ধাঁধা লাগিয়া যায়, এবং বেশীক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া স্থান নির্ণয় করার উপায় নাই, কারণ বিমানবিধ্বংসী কামান ধারেকাছেই থাকিতে পারে।

ঠিক উল্টা উপায়ও অনেক সময়ে অবলম্বন করা হয়। খোলা জমির উপর গাছপালা প্রভৃতির ছায়ার রূপ এমন দক্ষতার সহিত পরিবর্ত্তিত করা হয়, যে শূন্য হইতে ছাউনী বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ফলে অযথা শত্রুপক্ষের কিছু পয়সা খরচ হইয়া যায়, যাহা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়।
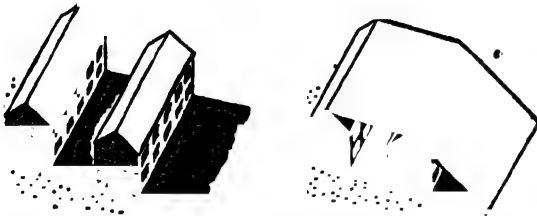
ঘরবাড়ীর ছায়া লক্ষ্য করিয়া বোমানিক্ষেপকারী উহা চিনিতে পারে। বিশেষভাবে প্রস্তুত আবরণদ্বারা এই ছায়াপাত বর্জ্জন করা চলে। ছবিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

সাবমেরিনের কথা

বিগত মহাসমরের সময়ে ডুবো-জাহাজের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। জুলে ভের্ন্যার্ণ এই জাতীয় জিনিষের কল্পনা করিয়াছিলেন বহুপূর্ব্বে, তাঁহার "সমুদ্রের তলদেশে ৬০,০০০ মাইল" নামক পুস্তকে তিনি "নটিলাস্" নামক এক ডুবো-জাহাজের বর্ণনা করিয়াছিলেন। অবশ্য সে ছিল নিছক কল্পনা, বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাতে গলদ ছিল অনেক।

শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির উড়ো-জাহাজের কল্পনাও বহুকাল পরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল, যদিও তাঁহার সময়ে তাহা বাতুলের খেয়াল ভিন্ন আর কোন নামে অভিহিত করা চলিত না।

গত যুদ্ধে জার্মান সাবমেরিন (U-boat)-সমূহ সমুদ্রচারী জাহাজের বিষম ভীতির বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানে সাবমেরিনের উন্নতি হইয়াছে অনেক, তবু এখনও কর্ম্মচারীদের প্রাণ হাতে লইয়া কাজ করিতে হয়। সাবমেরিনের তুলনায় এরোপ্লেনের নির্বিঘ্নতা অনেক গুণ বেশী।

কিছু কাল পূর্ব্বে ব্রিটিশ ডুবো-জাহাজ "থেটিসে"র দুর্ঘটনায় লোকের নজর এই দিকে পড়িয়াছে। কল বিগড়াইয়া "থেটিস" সমুদ্রের তলদেশে পড়িয়া যায়, নাবিকগণের মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়াছে, বাকী সকলেরই সলিল-সমাধি ঘটিয়াছে।

সাধারণ সৈন্যদল অথবা যুদ্ধজাহাজের নাবিকগণের জোর-করা নিয়মানুবর্ত্তিতা সাবমেরিনে প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকে

ব্রিটিশ সাবমেরিন 'য়ুনিটি'র অবতরণ

নীরবে নিজের কাজ করিয়া যায়; জানা আছে, এক জনের সামান্য ভুলে এক সঙ্গে সকলের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে।

প্রাণনাশ করাই যাহাদের পেশা, তাহাদের সব সময়ে নিজেদের প্রাণের দিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়। তাই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এবং সে দুর্ঘটনায় সাধারণত: দুই-এক জনের মৃত্যু হয় না, মরে অধিকাংশ লোকেই।

হয়ত এক সময়ে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ ডুবাইবার জন্য একখানি সাবমেরিনের দরকার হইল। প্রথমেই জাহাজের প্রত্যেকটি কলকব্জা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। টর্পেডো-ঘরে টর্পেডো ঠিকমত সজ্জিত আছে কি না দেখিয়া লওয়া হয়। এক চুল ভুল অথবা ত্রুটি হইলে চলিবে না, কারণ সমুদ্রের উপরে যে ভুল শোধরাইয়া লওয়ার সময় পাওয়া যায় সমুদ্রের নীচে তাহার অস্তিত্ব নাই।

জাহাজ বন্দর ছাড়িলে ওজন বৃদ্ধি করিয়া জলে ডুবাইবার চৌবাচ্চাগুলি জলে ভর্ত্তি করা হয়। শুধু পর্য্যবেক্ষণের জন্য উপরের খানিকটা শূন্যে জাগাইয়া রাখা হয়।

এক সঙ্গে সকল নাবিকের কাজে লাগিয়া থাকার প্রয়োজন হয় না, কারণ কাজ হয় পালা করিয়া। যাহারা বিশ্রামের সময় পাইয়াছে, তাহারা সে সময়টুকু সাধারণত: ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই, কারণ ডুবো-জাহাজের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর পরিমাণ পরিমিত; এবং জাগিয়া থাকিলে আমরা যতটুকু অক্সিজেন গ্রহণ করি, ঘুমাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম করি।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ডুবো-জাহাজের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে নিঃশ্বাসগ্রহণোপযোগী বায়ু প্রস্তুত করা হয়। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভুল। যে বায়ু জমানো থাকে, তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ ধূমপান করিলে সঞ্চিত বায়ুতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর অক্সিজেনের অস্তিত্ব থাকিবে না। রন্ধনাদির কাজ হয় বিদ্যুৎশক্তিতে, সে দিক্ দিয়া বায়ুর কোন প্রয়োজন নাই।

অবশ্য বায়ুর পরিমাণের স্বল্পতা নাবিকদের সব চেয়ে বড় চিন্তা নহে। কারণ বায়ু যে পরিমাণেই খরচ করা হউক না

ডুবো-জাহাজের পেরিস্কোপ

সাবমেরিনের টর্পেডো-টিউবে টর্পেডো ভরা হইতেছে

কেন, তাহা শেষ হওয়ার অনেক আগেই বিদ্যুৎশক্তির ব্যাটারি নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং সে সময়ে যে মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিবে, তাহা নিছক বায়ুর অভাবের জন্য নহে। কারণ তখন আর জাহাজের চলৎ-শক্তি রহিবে না।

নাবিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আজকালকার সাবমেরিনে নানা প্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এমন কি স্নান করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা এখনও রহিয়া গিয়াছে, স্থানাভাব। হাত-পা ছড়াইয়া খানিকক্ষণ আরাম করিবার উপায় সাবমেরিনে নাই। সকল নাবিকের জন্য পৃথক শয্যাও নাই, এক জনের ঘুম শেষ হইলে আর এক জন কর্মক্লান্ত দেহে সেই শয্যা অধিকার করিয়া ঘুমাইয়া লয়। সব সময়ে তাহাও জুটে না, তখন সামনে যাহা পাওয়া যায় তাহা দিয়াই বিছানার কাজ চালাইয়া লওয়া হয়।

সহসা হয়ত সতর্কীকরণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, চৌবাচ্চার মধ্যে সবেগে জল প্রবেশের শব্দ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ, বৈদ্যুতিক মোটরের শব্দে জাহাজ ভরিয়া যায়। চেঁচামেচি করিয়া কোন রকম আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সকলেরই নিজের নিজের কর্ত্তব্য জানা আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ জলের নীচে অদৃশ্য হইয়া যায়। শুধু দূর দিগন্ত পর্য্যবেক্ষণের জন্য পেরিস্কোপের নল জাগিয়া থাকে; এইটুকু না থাকিলে ডুবো-জাহাজ দৃষ্টিহীন।

সাবমেরিন-আক্রমণে সাবমেরিন বেগে শত্রুপক্ষের জাহাজের দিকে ছুটিয়া যায় না, জাহাজের আগমন-প্রতীক্ষা করে। কারণ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত গতিবেগ অতি অল্প, অথচ সেই গতিবেগ পাইতেই জাহাজের ব্যাটারী দ্রুতবেগে নিঃশেষিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া সে-সময়ে পেরিস্কোপ জলের উপর জাগাইয়া রাখা চলে না। কারণ সে ক্ষেত্রে সাবমেরিনে গতির সহিত পেরিস্কোপের পাশে যে চলমান ফেনার সৃষ্টি হইবে তাহা বহুদূর হইতে শত্রুপক্ষের জাহাজের চোখে পড়িতে পারে। কাজেই নিজে না নড়িয়া শিকারের উপযুক্ত স্থলে আগমন-প্রতীক্ষা করাই সহজ। শুধু মধ্যে মধ্যে এক-এক বার পেরিস্কোপ জলের উপর জাগাইয়া চট করিয়া দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

একমাত্র পেরিস্কোপের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণকারী ব্যতীত জলের উপরে কি হইতেছে সে বিষয়ে অন্য নাবিকগণের কোন ধারণাই থাকে না। কাজেই শুধু একটি লোকের দৃষ্টির উপরে সাবমেরিনের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করে।

টর্পেডো-আক্রমণের সময়ে সাবমেরিন বেশ খানিকটা নীচে নামাইয়া লওয়া হয়। এইখানে খানিকটা হিসাব ও খানিকটা আন্দাজের সাহায্যে শত্রুপক্ষীয় জাহাজের অবস্থিতি স্থির করা হয়। কারণ এত কাছে আসিয়া পেরিস্কোপ জলের উপরে জাগাইয়া রাখা মানে বিপদ ডাকিয়া আনা।

আক্রমণের আগের মুহূর্ত্তে এক সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য পেরিস্কোপ উপরে তুলিয়া দুই-এক বার দেখিয়া লওয়া হয়। তাহার পরেই হয়ত টর্পেডো ছুঁড়িবার আদেশ হয়।

একে একে গুটিকয়েক টর্পেডো ছুড়িবার পরের কাজ হইতেছে পলায়ন। যুদ্ধজাহাজ একা নহে, সঙ্গে ডেস্ট্রয়ার রহিয়াছে, কাজেই একে একে যখন শত্রুপক্ষের জাহাজের খোলের উপর টর্পেডো ফাটিতেছে, তখন কোন রকমে টাল সামলাইতে সামলাইতে সাবমেরিনের পলায়ন করিতে হয়।

এই শেষ কাজটিই সাবমেরিনের সব চেয়ে কঠিন কাজ।

স.
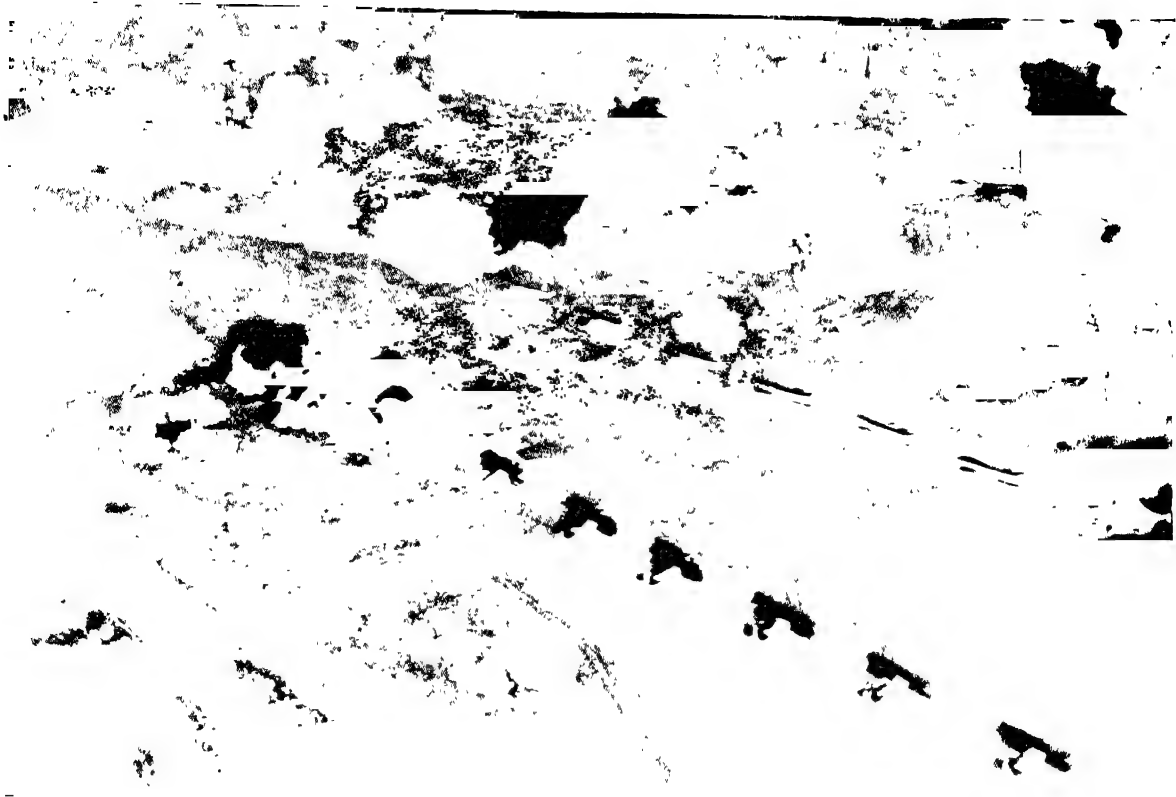
ভূমিস্থিত শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন-দল বোমা-চালনায় বিধ্বস্ত

বোমা-বিধ্বস্ত বার্সিলোনার দৃশ্য
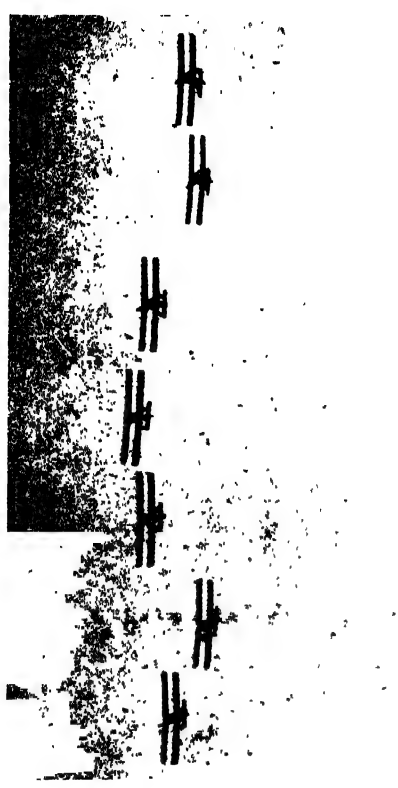
ব্রিটেনের সমর-শক্তি—আকাশে বোমা-নিক্ষেপকারী বিমান, জলে সাবমেরিন

সামরিক শ্রেণীবদ্ধ এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ

রুস-জার্ম্যান চুক্তি কি আকস্মিক ?

রাশিয়া ও জার্মেনীর মধ্যে যে অনাক্রমণাত্মক চুক্তি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বলেন যে, ঐ চুক্তির সংবাদ হঠাৎ বোমার মত তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক খবরের কাগজও ঐ সংবাদটাকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আকস্মিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু উহা সকলের কাছে আকস্মিক মনে হয় নাই—আমাদের উহা আকস্মিক মনে হয় নাই। ইহাতে আমাদের কোন বাহাদুরি নাই। বিদেশী কোন কোন খবরের কাগজে আমরা সংবাদ পড়িয়াছিলাম যে, হিট্‌লার স্টালিনের হৃদয় জয় করিবার বা বিশ্বাস অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ("Hitler is courting Stalin")। চীন দেশ হইতে "দি চায়না উঈকলি রিভিয়ু" নামক একটি সাপ্তাহিক কাগজ আসে। তাহার গত ৩রা জুনের সংখ্যায় "হিট্‌লার ইজ্ কোর্টিং স্টালিন" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে আমরা জুলাইয়ের মডার্ণ রিভিয়ুতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। রাশিয়া ও জার্মেনীর মধ্যে মৈত্রী হইলে জাপান, চীন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সুবিধা অসুবিধা কি হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাতে অনুমান ও আলোচনা ছিল। এই বাক্যগুলি সেপ্টেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতেও আবার উদ্ধৃত করিয়াছি।

চীন দেশের সাপ্তাহিকটি জুনের গোড়াতেই যাহা লিখিয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায়, মে মাসেই চীনের সাংবাদিক মহলের অনেকে জানিতেন স্টালিনের সহিত হিট্‌লারের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

বস্তুতঃ চীন দেশের সাংবাদিকেরাই যে এই খবর জানিতেন তাহা নহে। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী' ১৩ই মে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠায় আমরা লিটভিনফের পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিদেশী একখানি ইংরেজী কাগজে (বোধ হয় লণ্ডনের "নিউস্ রিভিয়ু"তে) লিটভিনফের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধীয় আলোচনা পড়িয়া আমরা মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। ঐ বিলাতী কাগজ নিশ্চয়ই গত এপ্রিলের শেষে লিখিত। তখনই ইংলণ্ডের অন্ততঃ কোন কোন সাংবাদিক হিট্‌লার ও স্টালিনের কথাবার্ত্তার বিষয় অবগত ছিলেন। কারণ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে আমাদের মন্তব্যের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি রহিয়াছে।

"রাশিয়ার যে পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনফ সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ইহুদী এবং তাঁহার স্ত্রী ইংরেজ। পুঁজিবাদের প্রধান বিরোধী এবং শ্রমিকতন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তক কার্ল মার্ক্‌সের মত অনুসারে রাশিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। এই মার্ক্‌স্ ইহুদী ছিলেন। রাশিয়ার ইহুদীদের অবস্থা ও মর্য্যাদা যেরূপ, জার্মেনীতে তাহার ঠিক্ বিপরীত। তদ্ভিন্ন, রাশিয়া গণতন্ত্র বলিয়া বিদিত, জার্মেনী তাহার বিপরীত। অথচ জাগতিক রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা বা বিরোধ হইতে পারেই না যখন বলা যায় না, তখন **এ-কথাটা অবিশ্বাস্য নহে, যে, জার্মেনী ও রাশিয়ার মধ্যে কোন এক রকম সন্ধি হইয়া যাইতে পারে।** উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দুটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং রাশিয়া যেমন বহু যুগ ধরিয়া ব্রিটেনের আতঙ্কের কারণ ছিল এবং এখনও আছে, জার্মেনীও সেইরূপ এখন বহু বৎসর হইতে ব্রিটেনের ভয়ের কারণ হইয়া আছে। ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার বন্ধুত্ব হইলে ব্রিটেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, কিন্তু সন্ধি এখনও হয় নাই। **এদিকে কথা রটিয়াছে, জার্মেনীতে-রাশিয়ায় মিতালীর বন্দোবস্ত ভিতরে ভিতরে হইতেছে।** কথাটা পাকা হইয়া গেলে জার্মেনীর মত রাশিয়াতেও ইহুদীদের দুর্গতি হইবে। লিটভিনফের পদত্যাগ (অথবা পদচ্যুতি?) তাহারই নাকি পূর্ব্বাভাস।"

অতএব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী রুস-জার্ম্যান চুক্তিকে কেন এত আকস্মিক মনে করিয়াছেন, বুঝা গেল না।

লিটভিনফের শীঘ্র বিচার হইবে, ও হিট্‌লারের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, রয়টার এইরূপ একটা খবর পাঠাইয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরোধী মুসলমান

ভারতীয় মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া বঙ্গের মুসলমানেরা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটার সমর্থক, তাঁহারা ইহার বিরোধী নহেন, মোটের উপর এই ধারণা সত্য হইলেও, ইহার বিরোধী মুসলমানও আছেন। গত ২৭শে আগস্টের নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা বিরোধী কন্‌ফারেন্সে মৌলবী রেজা-উল করীম ইহার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং অন্য কোন কোন মুসলমান ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। বাঙালী মুসলমান-দের "বাহাদুর" নামক একখানি বাংলা কাগজে ২রা ভাদ্র সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরুদ্ধে নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলানা জয়নোল আবেদিন লোদী এই সংবাদপত্রটির সম্পাদক।

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে দেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা আজ সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে টের পাইতেছি। দেশের বুকে ইহা জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে। দেশের ঐক্যের জন্য স্বাধীনতার জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ধ্বংস করা চাই। ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় যাহাতে ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে সেই জন্য ব্রিটিশের এই কূটনৈতিক চাল। আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে এই চাল ব্যর্থ করিতে হইবে। সবচেয়ে ইহার বিষময় ফল ফলিয়াছে বাঙ্গলায়। বাঁটোয়ারার বিষময় ফল-স্বরূপ আজ বাঙ্গলা দেখিতেছে তাহাদের রক্তের সমান যে পয়সা সেই পয়সা লইয়া কয়েক জন স্বার্থপর অযোগ্য লোক নবাবী আমলের লীলাখেলা করিতেছে, শ্বেতাঙ্গদের পদতলে নিজেদের বিকাইয়া দিয়াছে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, রোগজর্জ্জরিত বাঙ্গালী তাহাদের মুখপানে চাহিয়া আছে, মুখে ভাষা নাই। বাঙ্গালাকে বাঁচিতে হইলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অন্নবস্ত্রের সমস্যা শুধু হিন্দুদের নহে, মুসলমানদেরও। ব্রিটিশের কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ করিতে হইবে।"

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা ভারতের পারিবারিক ঝগড়া নহে

কেহ কেহ মনে করেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা ভারতীয়দের একটা পারিবারিক আভ্যন্তরীণ ঝগড়া মাত্র; তাহা আমরাই আপোষে মিটাইয়া লইতে পারিব।

ইহা মহা ভ্রম। হিন্দু বা মুসলমান এই ঝগড়া বাধায় নাই। এই পারিবারিক ঝগড়া যে বাধিয়াছে, তাহা ব্রিটেনের নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অনুসৃত কূটনীতির ফল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার সূত্রপাত হয় লর্ড মিণ্টোর আমলে তাঁহারই গবর্ন্মেণ্টের প্ররোচনায়। হিন্দু-মুসলমান তাহাদের মতভেদ মিটাইয়া লইতে চাহিলেও সাম্রাজ্যোপাসক ব্রিটনেরা তাহাতে বাধা দিবে। এই হেতু, বাঁটোআরাটার উচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রিটেনের উপর খুব চাপ দেওয়া আবশ্যক।

"নারীহরণের পুরস্কার"

গত ১০ই ভাদ্রের 'যুগান্তর' কাগজের "নারীহরণের পুরস্কার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে নীচের দুটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত হইল।

"ফরিদপুর জেলার পালংয়ের বীণাপাণি নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করার অপরাধে তত্রত্য ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং প্রেসিডেণ্ট আবদুল গফুর কোতয়ালকে গত ১৯৩৭ সালের ২২শে মার্চ্চ দায়রা জজ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ও পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে আপীল করায় কারাদণ্ড হ্রাস হইয়া দেড় বৎসরে দাঁড়ায়, কিন্তু অর্থদণ্ড যথারীতি বহাল থাকে। পূর্ণ দণ্ড ভোগ করার পর, উক্ত আবদুল গফুর কোতয়াল সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়া পুনরায় ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পদ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ১০ ক ও খ ধারা অনুসারে দুর্নীতিমূলক আচরণের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি দণ্ডমুক্তির পর পাঁচ বৎসর অতীত না হইলে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা ছাড়া, নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে হইলে এই শ্রেণীর প্রার্থীকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমা ও অনুমোদন লাভ করিতে হয়। যদি জেলা বোর্ড তাহাকে নির্ব্বাচনের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে চিরতরেই তাহার নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার লুপ্ত হয়।

"নারী-হরণের ন্যায় গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত আবদুল গফুর কোতয়ালকে জেলা বোর্ড গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের পূর্ব্ব ধারা অনুসারে এবং মাদারীপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশ ক্রমে পুনঃ নির্ব্বাচনের অযোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উক্ত আবদুল গফুর দেওয়ানী মামলা করে এবং জেলা বোর্ড, কি কারণে তাহা বলা কঠিন হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে, সহসা আপোষ করে এবং তাহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লয়। ইহার পর আর এক মাত্র সর্ত্ত, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ক্ষমা ও অনুমোদন লাভ—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল তাহাও এই ভাগ্যান্বেষীর ভাগ্যে অনায়াসেই জুটিয়াছে। এখন সে বিনা বাধায় এবং রীতিমতো গৌরবের সঙ্গেই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।"

এই সংবাদটি সত্য হইলে এখন বাকী পুরস্কার কাহাকে দিতে হইবে, আইনের মর্য্যাদার রক্ষকদিগকে তাহা স্থির করিতে হইবে। আইনে নারীহরণের পুরস্কার তিন রকম নির্দিষ্ট আছে—কারাবাস, অর্থদণ্ড, বেত্রদণ্ড। প্রথম দুই পুরস্কার এক ব্যক্তি পাইয়া গিয়াছে। এখন বেত্রদণ্ডটা

কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করা অবশ্যকর্ত্তব্য। নতুবা আইন লঙ্ঘিত হইবে। বঙ্গের মন্ত্রীদিগের তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে।

—

"ঔর দো ডাণ্ডা বাকী হ্যায়"

আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এক ন্যায়বান্ শিখের গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি নরহত্যার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তি গুরুজীর নিন্দা করায় তিনি তাহাকে এক ডাণ্ডা লাগান। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। অভিযুক্ত আঘাতকারীকে বিচারক জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছিলে? যদি করিয়া থাক, কেন করিয়াছিলে?" আসামী উত্তর করিল: "হুজুর, আমার উপর গুরুজীর হুকুম আছে, কেহ গুরুজীর নিন্দা করিলে, উস্কো তীন্ ডাণ্ডা লাগাও (তাহাকে তিন ডাণ্ডা লাগাও); এক্ ডাণ্ডা লাগায়া তো বেচারা মর্ গয়া; ঔর দো ডাণ্ডা বাকী হ্যায়। আব্ বাতাইয়ে কিস্কো লাগাউঁ।" ("এক ডাণ্ডা মারায় বেচারা মারা গিয়াছে, দু ডাণ্ডা বাকী আছে, এখন বলুন বাকী ঐ দু ডাণ্ডা কাহাকে লাগাইব।")

এই ন্যায়বান্ শিখের উক্তি হইতে বাল্যকালাবধি একটা ধারণা জন্মিয়া আছে, শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। নারীহরণের পুরস্কারও কাহারও পূর্ণ-মাত্রায় পাওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ'

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে শতবার্ষিক-সংস্করণ বাহির করিতেছেন, তাহার মধ্যে আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, সাম্য, ও বিজ্ঞান-রহস্য আগে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেগুলির পরিচয়ও 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা 'বিবিধ প্রবন্ধ' পাইয়াছি। আগেকার গ্রন্থগুলির মত এই পুস্তকটিও ভাল পুরু কাগজে ভাল অক্ষরে মুদ্রিত। যত্নপূর্ব্বক প্রুফ দেখা হইয়াছে।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র এই সংস্করণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি, দর্শন ও ধর্ম, এবং বিবিধ। এই শ্রেণী কয়টিতে উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, দ্রৌপদী, অনুকরণ, শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা, বাঙ্গালির বাহুবল, ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, প্রাচীনা এবং নবীনা, ধর্ম এবং সাহিত্য; চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, কাম, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, ত্রিবেদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, সঙ্গীত, বঙ্গদেশের কৃষক, বহুবিবাহ, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙ্গালাশাসনের কল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বাহুবল ও বাক্যবল, বাঙ্গালা ভাষা, মনুষ্যত্ব কি? লোকশিক্ষা, এবং রামধন পোদ, এই ৩৮টি প্রবন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন পরিশিষ্ট আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী না পড়িলে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঠিক্ ধারণা জন্মিতে পারে না। কিন্তু তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বলিয়া সাধারণ যে ধারণা আছে, কেবল তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িলে চলিবে না। অন্য যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তাহাও পড়িতে হইবে। পড়িলে বুঝা যাইবে তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতা কিরূপ ছিল, মননশক্তি কিরূপ বলবতী ছিল, প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী ছিল, এবং তাঁহার লেখনীচালনার উদ্দেশ্য কিরূপ উচ্চ ও মহৎ ছিল। তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক "প্রগতি"-সাহিত্য রচনা করিয়া সাহিত্যসম্রাট্ হন নাই।

—

গোসাবার ছাত্রদের ময়ূরভঞ্জে শিক্ষালাভ

য়ুনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সুন্দরবনে সর্ ডানিয়েল হামিণ্টনের গ্রাম গোসাবা হইতে ১৮ জন ছাত্র ও ৩ জন শিক্ষক কুটীরশিল্প

কৃষি প্রভৃতিতে শিক্ষালাভার্থ ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে দস্তুর মত সাহায্য পাইবেন। ব্রিটিশ-শাসিত বাংলা দেশ হইতে কৃষি ও শিল্প শিখিবার নিমিত্ত ছাত্র ও শিক্ষকেরা একটি দেশী রাজ্যে যাইতেছেন, ইহা সেই রাজ্যের পক্ষে অবশ্যই গৌরবজনক; কিন্তু বাংলা দেশের শিক্ষার্থীদিগকে বাংলা দেশই কেন এই সকল বিষয় শিখাইতে পারে না? বাংলা দেশে কুটীরশিল্প শিখাইবার সরকারী আয়োজন কিছু আছে জানি। কিন্তু তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরুদ্ধে যে সমগ্র-ভারতীয় বিরাট্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাহাতে উপস্থিত হইতে না পারিয়া তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে ইন্দ্রনারায়ণবাবু তাঁহাকে পত্র লেখেন। সেই পত্র হইতে বাঁটোআরা সম্বন্ধে কংগ্রেসের আধুনিকতম মনোভাবজ্ঞাপক কতকগুলি তথ্য নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কোনরূপ তর্কবিতর্কের উল্লেখ অনাবশ্যক, তথ্যগুলিই যথেষ্ট।

১৯৩৭ সালের ১৯শে মে তারিখে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃপালনী এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে:—"পরবর্ত্তী প্রস্তাবসমূহে যেরূপ কথার অদল-বদলই করা হউক না কেন, কংগ্রেসের মনোভাব (বাঁটোআরা না-গ্রহণ না-বর্জ্জন) অপরিবর্ত্তিতই আছে। ভুল করিয়াই হউক আর ঠিক ভাবেই হউক (কংগ্রেসের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে ভুল করিয়াই), মুসলমানেরা যে ব্যবস্থাকে তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে, কংগ্রেস তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন করিবে না।"

ইহাও যেন যথেষ্ট হয় নাই, সেই জন্য ১৯৩৭ সালের ২৯শে মে তারিখে জেনারেল সেক্রেটারী পুনরায় এই কথা বলেন:—

"কংগ্রেস কখনই একথা গোপন করেন নাই যে, এই সিদ্ধান্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহা নাকচ করিবার জন্য কংগ্রেস আন্দোলন করিতে প্রস্তুত নহেন। যুক্তি এবং জাতীয়তাবোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া কংগ্রেস এই না-গ্রহণ না-বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি মনে করি যে, এই প্রস্তাবের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সারমর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই আছে।"

গত ১৯৩৭ সালের ১০ই অক্টোবর বিহারের কংগ্রেসী শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মামুদ এই সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি এই বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বলবৎ আছে। কেহই ইহা স্পর্শ করে নাই এবং মুসলমানেরা যত দিন ইহা পছন্দ করিবে, তত দিন কেহই ইহা স্পর্শ করিবে না। কংগ্রেস নীতি হিসাবে ইহা না মানিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত ফল কংগ্রেস কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়াছেন এবং আমাদের (মুসলমান) সম্প্রদায়ের বাঁটোয়ারার ফল ভোগ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে এই সমস্ত মতামতের কথা বাদ দিলেও ১৯৩৭ সালের ৩১শে অক্টোবর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে (কংগ্রেসের হরিপুর অধিবেশনে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছে), তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবটি এইরূপ:—

"কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরোধী, কারণ ইহা জাতীয়তার পরিপন্থী। তথাপি কংগ্রেস এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই ইহার পরিবর্ত্তন বা ইহা নাকচ হওয়া উচিত। কংগ্রেস সর্ব্বদাই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-সমূহের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, উল্লিখিত প্রস্তাবে কেবলমাত্র তাহারই বাক্যান্তর করা হইয়াছে। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দল এই প্রকার সর্ত্তের নিন্দা করিয়াছেন, কারণ ইহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসার পথ প্রকৃত পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে।

কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। ১৯৩৭ সালের ১০ই অক্টোবর এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ যে কি জন্য পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। উক্ত পত্রে নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ বলেন:—"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সম্প্রতি আপনারা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে মুসলমান-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান অভিযোগ দূরীভূত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে বলবৎ রাখা হইবে।"

গত ৪।২।৩৮ তারিখে পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু মিঃ জিন্নাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অসন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে উহা বলবৎ আছে এবং যত দিন পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতি-ক্রমে উহা পরিবর্ত্তিত না হয় তত দিন পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

দেখা যাইতেছে, কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতি দ্বারাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তনের কংগ্রেস পক্ষপাতী। কিন্তু এইরূপ সম্মতি যাহাতে ঘটিতে পারে, তাহার নিমিত্ত কংগ্রেস কিছু করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

সম্মতি অকস্মাৎ, দৈবাৎ, লব্ধ হইবে, কংগ্রেস-নেতারা এরূপ মনে করেন কি না জানি না।

"সাময়িক-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা মুসলমান-সম্প্রদায় আপাততঃ লাভবান্ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থা দশ বৎসরের জন্য, চিরস্থায়ী নহে; দশ বৎসরের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সম্মতিক্রমে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষ দুই শ্রেণীর—প্রথম, যাহারা ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহারা লাভবান্ হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বাঁটোআরার উচ্ছেদে রাজী হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষ আপন সম্প্রদায়গত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া মহাজাতিগঠনের সুবিধার্থ উহার উচ্ছেদে রাজী হইবে, কংগ্রেস এইরূপ আশা করেন কি না জানি না।

যাঁহারা এরূপ আশা করেন না, যেমন সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটাকে "সাময়িক-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (A "Temporary" Permanent Arrangement) বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ নামের পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন:

I put a question to the Secretary of State (Q. 7223, p. 818 of the Proceedings of the (Second R. T. C.) Committee).

Q. 'I was going to ask the Secretary of State, if he will permit me: As the communal decision stands it means this: Assuming for the sake of argument, one party has got more than it ought to have, it must assent to that being given away *before there can be any change at any time. You have got to get the assent of somebody who has got more than he ought to have?*

Ans. If Sir N. Sircar makes that hypothesis, it is so.

তাঁহার প্রশ্নের যে উত্তর ভারতসচিব সর্ সামুয়েল হোর দিয়াছিলেন, তাহার উপর সর্ নৃপেন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন:

Purporting to make a decision, which holds good for ten years only, the authors have shown remarkable ingenuity in making it in effect, and in fact, good for all times.

পুস্তিকাটির শেষে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:-

If I were told that I was giving a temporary lease I would object to the expression, if it was a condition that the lease could not be terminated at any time unless the tenant agreed.

But then I am merely a lawyer and not a statesman having the destiny of a community of 22 millions in my hands.

Some British statesmen have succeeded in drafting a lease for Bengal for ten years to a community insisting on special electorates—and after ten years the lease cannot be terminated without magnanimous renunciation on their part.

Who can say this is not a remarkable achievement?

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা

কংগ্রেস এমন কথা বলেন না যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা ভাল বা তাহার উচ্ছেদ চাই না। তাহা যে মন্দ ও তাহার উচ্ছেদ যে আবশ্যক, তাহা কংগ্রেস স্বীকার করেন। বর্ত্তমান ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষকে যে কন্সটিটিউশ্যন দেওয়া হইয়াছে, কংগ্রেস-নেতারা সেই কন্সটিটিউশ্যনটাকেই ধ্বংস করিয়া তাহার ভিত্তীভূত সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ করিবেন, তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে ঐ শাসনবিধি ধ্বংস করিবেন, সেরূপ চেষ্টার বাহ্য লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না।

ঐ শাসনবিধি বা কন্সটিটিউশ্যনের দুটা অংশ। প্রথম অংশ প্রাদেশিক। প্রাদেশিক অংশ কংগ্রেস কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন, এগারটা প্রদেশের মধ্যে আটটা প্রদেশের মন্ত্রী হইয়াছেন কংগ্রেসীরা। তাহারা ঐ আটটি প্রদেশের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় কংগ্রেস বলিয়াছিলেন, কন্সটিটিউশ্যনটাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই কংগ্রেস তাঁহার কোন কোন সভ্যকে মন্ত্রী হইবার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু ধ্বংস করিবার কোন চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন না।

সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, সন্দেশভোজী কোন ব্যক্তি যে অর্থে সন্দেশ ধ্বংস করে

বলা যায়, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেই অর্থে কন্সটিটিউশ্যনের প্রাদেশিক অংশটা ধ্বংস করিতেছেন !

কন্সটিটিউশ্যনের প্রাদেশিক অংশটা চালু করার দ্বারা দেশের কিছু হিত যে হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে-যে প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় কিছু হিত হইয়াছে। সুতরাং চালু করার নিন্দা আমরা করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কন্সটিটিউশ্যনটাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হইয়াছেন এবং আটটা প্রদেশ শাসন করিতেছেন, ইহা সত্য নহে।

কন্সটিটিশ্যনটার দ্বিতীয় অংশ ফেডারেশ্যন। এ-বিষয়ে কংগ্রেস-নেতারা সবাই এক রকম কথা বলেন নাই। কংগ্রেসের পূরা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে অবশ্য ফেডারেশ্যন বর্জ্জন ও ধ্বংস করিবার কথাই বলা হইয়াছে বটে ; কিন্তু মান্দ্রাজ প্রভৃতি একাধিক প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভায় কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে ফেডারেশ্যন চালু করিবার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি কেহ কেহ এই ভাবে ফেডারেশ্যনের ওকালতীও করিয়া আসিতেছেন।

কংগ্রেসের কার্য্যতঃ ডিক্টেটার গান্ধীজী একথা একাধিক বার বলিয়াছেন বটে যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট দেশের উপর ফেডারেশ্যন চাপাইয়া দিলে কংগ্রেস তাহার বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু যদি তাহা চাপান না-হয়, তাহা হইলে ফেডারেশ্যন কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে কিনা তাহা তিনি আগে পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। সম্প্রতি তিনি ইংরেজী "হরিজন" পত্রিকায় স্বেচ্ছাকৃত ফেডারেশ্যনের সমর্থন ("Plea for voluntary federation") জ্ঞাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে :—

"Imposed Federation is likely to divide India more than it is to-day. It would be a great step if the British Government were to declare that they would not impose their federal structure on India. The Viceroy seems to be acting in that fashion if he is not saying so. If my surmise is correct, I suggest that a clear declaration will add grace to his action and will probably pave the way for real Federation and, therefore, real unity. That Federation can naturally never be of the Government of India Act brand. Whatever it is, it must be a product of the free choice of all India. But before that political and legalized Federation of free choice comes, there should be voluntary Federation of parts, to begin with, if not of the whole."

তাৎপর্য্য। "বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যেরূপ নানা ভাবে বিভক্ত, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহা আরও বেশী বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যদি ঘোষণা করেন যে, ভারতের উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে একটা বড় কাজ হইবে। বড়লাট মুখে কিছু না বলিলেও সেই ভাবে কাজ করিতেছেন বলিয়াই মনে হয়। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বড়লাট সুস্পষ্ট ঘোষণা করিলে তাঁহার কার্য্য শোভন হইবে এবং সম্ভবতঃ প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রকৃত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইবে। নূতন ভারতশাসন আইনে যেরূপ যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত যুক্তরাষ্ট্র সেই শ্রেণীর হইবে না। এই যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ভারতের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সেই রাজনৈতিক ও আইনানুগ যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইবার প্রারম্ভে, সমগ্র ভারতের না হইলেও, অংশসমূহের স্বেচ্ছামূলক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত।"

ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে গান্ধীজীর প্রতি অবিচার করা হইবে না যে, তিনি কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে ফেডারেশ্যন গ্রহণে সম্মতি দিবেন—কেবল বড়লাটকে বলিতে হইবে, "আপনারা আপনাদের পছন্দসই ফেডারেশ্যন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করুন, আমি উহা আপনাদের উপর চাপাইয়া দিতেছি না।"

কোন জজ মোকদ্দমার দুই পক্ষকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমার মতে মোকদ্দমাটার নিষ্পত্তি এই এই নির্দ্ধারণ অনুযায়ী হওয়া উচিত। আপনারা **স্বেচ্ছায়** এইরূপ কিছু নিষ্পত্তি আপোষে করিয়া ফেলুন। আমি ইহাতে হাত দিব না।"

স্বেচ্ছায় ফেডারেশ্যন গ্রহণটাও সম্ভবতঃ এই প্রকার স্বেচ্ছামূলক হইবে।

কোন প্রকার একটা ফেডারেশ্যন চালু করিবার কথা ইতিমধ্যে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ছোঁয়াইয়া রাখিয়াছে—খুব সম্ভব সিমলার সঙ্কেতে।

সিমলায় বড়লাটের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত গান্ধীজীর ডাক পড়িয়াছে। তাহার সেক্রেটরী মহাদেব দেশাই কিছু দিন আগে সিমলা গিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই ডাকের সম্বন্ধ আছে কি? অন্য নেতাদেরও ডাক পড়িবার কথা। ফেডারেশ্যনের একটা কিছু হেস্তনেস্ত এখন হইয়া যাইতে পারে। দেশী রাজন্যবর্গকে রাজী করা কঠিন

হইবে না। যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা ইতিমধ্যেই অনেকে সাম্রাজ্য রক্ষায় যথাসাধ্য সাহায্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন

সুতরাং সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটার উচ্ছেদের কথা এখন কে ভাবিবে? অভাগা বঙ্গদেশই প্রধানতঃ ভাবিতেছে বটে। তাহারও কংগ্রেসী দল উহার বিরুদ্ধে কিছু করিবেন না। কেবল কংগ্রেস জাতীয় দল নিজ কর্ত্তব্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার সম্বন্ধে হিন্দুদের কর্ত্তব্য

দেশের কল্যাণ করিতে পারা যায় নানা প্রকারে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া তাহা করা যায়, এবং যাহাকে সচরাচর সরকারী চাকরী বলে তাহা করা দ্বারা করা যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা জারি হইবার আগেই সমগ্রভারতীয় বহুবিধ চাকরী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হিন্দুরা যোগ্য হইলেও—এমন কি যোগ্যতম হইলেও কেবলমাত্র তাহাদের সংখ্যা অনুসারে যত চাকরী পাইবার তাহারা অধিকারী তাহা তাহারা পাইতে পারে না। অথচ রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ কাজ সেই নিয়মেই খুব ভাল করিয়া হইতে পারে যাহা অনুসারে জাতিধর্ম্মশ্রেণীনির্ব্বিশেষে যোগ্যতমেরাই সব কাজে নিযুক্ত হইতে পারে। সরকারী চাকরীর বণ্টন এরূপ ভাবে হইয়াছে যে, যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু তাহাদের সংখ্যা অনুসারেই হিন্দুরা যথেষ্ট কাজ পাইতেছে না। ফলে, তাহাদের মধ্যে অনেকে যোগ্যতম হইয়াও সরকারী চাকরী করার দ্বারা দেশের সেবা করিতে পারিতেছে না এবং জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে।

সমগ্রভারতীয় চাকরীতে যেরূপ, এক একটি প্রদেশের চাকরীতেও সেইরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় জাতি প্রভৃতি অনুসারে চাকরীর বণ্টন এ প্রকারে করা হইয়াছে যে তাহার ফলে রাজকার্য্য দ্বারা দেশের সেবা করিতে এবং তদ্দ্বারা উপার্জ্জন করিতে বহুসংখ্যক যোগ্য হিন্দু পারিতেছে না। তাহাদের চেয়ে অযোগ্য অ-হিন্দুরা অধিকতর সুবিধা পাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা অনুসারে সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধির পদগুলির বণ্টনে হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে তাহারা শতকরা ৭০ জনেরও উপর, অথচ ফেডার‍্যাল ব্যবস্থা-পরিষদে তাহাদিগকে শতকরা ৪২টি আসন দেওয়া হইয়াছে। যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রকারে সংখ্যালঘু করা হয় নাই বটে, কিন্তু সংখ্যা অনুসারে তাহাদের যত আসন প্রাপ্য হয় তাহা অপেক্ষা কম আসন তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং লোকসংখ্যা অনুসারে মুসলমানদের যত আসন প্রাপ্য হয় তাহাদিগকে তদপেক্ষা বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের প্রতি অবিচার বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। অতএব অন্য বহু প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু বলিয়া যেরূপ সংখ্যানুসারে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক আসন পাইয়াছে, বঙ্গে হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু বলিয়া সেইরূপ অধিক আসন দেওয়া উচিত ছিল তাহারা তাহা দূরে থাকুক, সংখ্যা অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহাও পায় নাই, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাইয়াছে।

সমগ্রভারতে এবং প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত দুই প্রকারে হিন্দুদিগের শক্তি হ্রাস করা হইয়াছে।

ভারতীয় মহাজাতি ("নেশ্যন") হিন্দু এবং একাধিক অহিন্দু সম্প্রদায় লইয়া গঠিত, ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু হিন্দুরাই এই মহাজাতির প্রধান অংশ। তাহারা যে সংখ্যাতেই প্রধান অংশ তাহা নহে। শিক্ষা, জ্ঞান, সার্ব্বজনিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ (অর্থাৎ "পাব্লিক স্পিরিট"), স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মোৎসর্গ, সার্ব্বজনিক কাজে দান, রাজকোষে ট্যাক্স দান, শিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ-করণ, সাহিত্য সুকুমার কলা প্রভৃতির অনুশীলন মূলক সংস্কৃতি ("কলচার") প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দুরা ভারতীয় মহাজাতির প্রধান অংশ। সর্ব্বোপরি, ভারতবর্ষের প্রতি একাগ্র ও একান্ত সর্ব্বান্তঃকরণিক অনুরাগে তাহারা ভারতীয় মহাজাতির

প্রধান অংশ। যে-কেহ ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোন ধর্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাকেই আমরা এখানে হিন্দু বলিতেছি। হিন্দুরা ভারতীয় মহাজাতির প্রধান অংশ বলিয়া ভারতীয় মহাজাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করিতে ও রাখিতে হইলে, হিন্দুদিগকে উন্নত ও শক্তিশালী করিতে ও রাখিতে হইবে। যাহা কিছু হিন্দুর দেশসেবার সুযোগ সুবিধা কমায়, তাহার শক্তি ও উপার্জ্জন কমায়, তাহা ভারতীয় মহাজাতির পক্ষে অনিষ্টকর। এই জন্য তাহার উচ্ছেদসাধন আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা অনিষ্টকর এইরূপ একটা ব্যবস্থা। অতএব তাহার এবং সম্প্রদায় অনুসারে সরকারী চাকরীর বণ্টনের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে।

আমরা হিন্দুদের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির কথা লিখিতেছি; কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আমরা অহিন্দুদিগকে অনুন্নত ও শক্তিহীন রাখিতে চাহিতেছি। তাঁহাদেরও উন্নতি হউক। কিন্তু হিন্দুদিগের ক্ষতি করিয়া তাহা করা উচিত হইবে না, এবং বাস্তবিক তাহা করা যাইবেও না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ সাধন যে আবশ্যক, তাহা আমরা সংক্ষেপে দেখাইলাম। তাহা করিতে হইলে তাহার অনিষ্টকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার নিমিত্ত পুস্তিকা রচনা ও প্রচার করিতে হইবে; সভা করিয়া আন্দোলন করিতে হইবে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। কংগ্রেস এই বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না। সুতরাং কংগ্রেসের উপর চাপ দিতে হইবে। তাহা দিতে হইলে কংগ্রেসের যত সভ্য আছে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরোধী দল গঠন করিয়া সেই দলে অন্ততঃ তাহার সমানসংখ্যক সভ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দলের সভ্যেরা ব্যবস্থাপক সভার বা অন্যান্য জন-প্রতিনিধি সভার পদপ্রার্থী এমন কাহাকেও ভোট দিবেন না যিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহেন। এ বিষয়ে যিনি প্রকাশ্য ও লিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন তাঁহাকেই ভোট দিতে হইবে।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকেও প্রভাবিত করিতে হইবে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরের আন্দোলন হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়; কিন্তু এখন তখনকার আন্দোলনের অবিকল নকল করা চলিবে না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল যে হিন্দুদেরই করা উচিত, তাহা নহে। ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে দেশহিতৈষী মাত্রেরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যেমন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় যোগ দিয়াছেন।

দেশে স্বরাজ স্থাপিত না হইলে কোন সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোকের আর্থিক উন্নতি বা অন্যবিধ উন্নতি হইতে পারে না, যদিও কোন কোন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের চাকরী হইতে পারে। বঙ্গে মুসলমান আছে আড়াই কোটির উপর। যদি বঙ্গের সমুদয় সরকারী চাকরী মুসলমানেরা পায়, যাহা কোন কালেই পাইবে না, তাহা হইলেও আড়াই লক্ষ মুসলমানেরও চাকরী হইবে না, অর্থাৎ শতকরা এক জন মুসলমানও চাকরী পাইবে না। যদি শতকরা এক জন পাইবে ধরা যায় এবং প্রত্যেকের পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক থাকে, তাহা হইলেও বাকী শতকরা ৯৪ জনের সাক্ষাৎভাবে আর্থিক উন্নতি হইবে না। সকলের হইতে পারিবে যদি দেশ স্বাধীন হয়।

সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের উন্নতির নিমিত্ত দেশের স্বাধীনতা আবশ্যক। দেশকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা হিন্দুরা যে পরিমাণে করিবে, অন্য কোন সম্প্রদায় সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। অতএব, দেশ-হিতৈষী স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই হউন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদ দ্বারা হিন্দুদিগকে (এবং তদ্দ্বারা সমগ্র মহাজাতিকে) শক্তিহীনতা হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

—

ভারতবর্ষে "বিদেশী"র সংখ্যা

যাহারা ভারতবর্ষজাত নহে কিংবা ভারতবর্ষজাত লোকদের বংশজাত নহে, ভারতবর্ষবাসী এরূপ সমুদয় লোকই বিদেশী। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশজাতীয় লোকদিগকে এবং ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ উপনিবেশের লোকদিগকে বিদেশী বলিয়া গণনা করেন

না, কিন্তু তাহারা, বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তিরা, তাহাদের দেশে আমাদিগকে বিদেশী মনে করে এবং তত্তদ্দেশপ্রবাসী ভারতীয়দিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচে!

গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে গবর্মেণ্টের সংজ্ঞানুযায়ী যত "বিদেশী"কে রেজিস্টারীভুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা ৯২৪১। তাহার মধ্যে জার্ম্যান ১৩২০, ইটালিয়ান ৭৪০, পোল ৬৩, রুমেনিয়ান ৩৪, রাশিয়ান ১৭৩, স্পেনিশ ১৮৪, হাঙ্গেরিয়ান ১০৪, যুগো-স্লেভিয়ান ২৪, বুলগেরিয়ান ২, আমেরিকান ১৯০৩, ফরাসী ৬৮৪, জাপানী ৮৯১। এই তালিকায় চৈনিক, আফগান, ইরানী, আরব, তুর্ক প্রভৃতিকে ধরা হয় নাই। বোম্বাই, বাংলা ও মান্দ্রাজে জার্ম্যানদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪১, ২৫৪, ও ১৮৯। মান্দ্রাজ, বাংলা ও বোম্বাইয়ে ইটালিয়ানদের সংখ্যা যথাক্রমে ২২৩, ১৯৩ ও ১২৭। বোম্বাই ও বাংলায় জাপানীদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫০ ও ২৭৫।

জাপানের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

জাপানের পুরাতন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ইহার ঠিক কারণ জানা যায় নাই, কিন্তু অনুমিত হইতে পারে।

জাপান যত সহজে চীনকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিবে ভাবিয়াছিল, তাহা পারে নাই। জাপান চীনের অনেক অংশ দখল করিয়াছে বটে, কিন্তু চীন যুদ্ধ করিয়া চলিতেছে এবং চীন-জাপান যুদ্ধের আরম্ভকাল অপেক্ষা চীনের শিক্ষিত সৈনিকদের সংখ্যা এখন বেশী, অর্থবলও আছে এবং জাপানী সৈন্যেরা চৈনিক সৈন্যদের নিকট মধ্যে মধ্যে পরাস্তও হইতেছে। তিয়েন্তসিনের প্রবাসী ইংরেজদের উপর বর্ব্বরবৎ ব্যবহার করিয়া জাপান সফল-কাম হয় নাই, অধিকন্তু ইংলণ্ডের শত্রুতাভাজন হইয়াছে। রাশিয়ার সহিত জাপানের সংঘর্ষও ঘটিতেছে। এই সব কারণে জাপানের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক নীতি ও পন্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে। তাহার উপর, সঙ্কটকালে আবশ্যক হইলে যে-জার্ম্মেনীর সাহায্য জাপান পাইবে তাহার এই দৃঢ় ধারণা ছিল, তাহার সহিত জাপানের শত্রু রাশিয়ার অনাক্রমণাত্মক চুক্তি হইয়া যাওয়ায় জাপানের রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন আরও আবশ্যক প্রতীত হইয়া থাকিবে। তাহার নূতন মন্ত্রিসভার নীতির আভাস অচিরে পাওয়া যাইবে।

—

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ ফণ্ড অব্যবহৃত

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা অনেক দিন হইল দিয়া রাখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এ-পর্য্যন্ত এই ফণ্ড অব্যবহৃত আছে, ইহার সাহায্যে কোন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই। আশা করি এ বিষয়ে শীঘ্রই কিছু সুব্যবস্থা হইবে।

—

ইয়োরোপে আবার যুদ্ধ বাধিল

ইয়োরোপে আবার যুদ্ধ বাধিল।

ডান্‌জিগ বন্দরের এবং পোল্যাণ্ড হইতে জার্মেনীর ভিতর দিয়া সেই বন্দরে যাইবার অপ্রশস্ত ভূখণ্ডের (ডানজিগ করিডরের) অধিকার লইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ডান্‌জিগ জার্মেনীর অন্তর্গত ও জার্মেনীর অধিকারভুক্ত শহর ছিল। যুদ্ধের অবসানে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে উহা ও উহার করিডর জার্মেনীর হস্তচ্যুত হয় এবং লীগ অব্ নেশ্যন্সের তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন নগর বলিয়া ঘোষিত হয়। জার্মেনী কিন্তু উহা ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা ও আশা কখনও পরিত্যাগ করে নাই। গত মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর জার্মেনীকে নানা প্রকার ক্ষতি ও হীনতা সহ্য করিতে হয়। এখন হিট্‌লারের নেতৃত্বে সেই দেশ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গর্হিত উপায়ে করিতেছে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স এইরূপ বলেন যে, হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত আলোচনা দ্বারা ডানজিগ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করুন। হিট্‌লার তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, কোন চরমপত্র না দিয়া, সতর্ক না করিয়া, পোল্যাণ্ড

আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের পরও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হিটলারকে পোল্যাণ্ড হইতে সমুদয় সৈন্য সরাইয়া লইতে, যুদ্ধ বন্ধ করিতে, এবং আপোষে আলোচনা দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত মিটমাট করিতে বলেন। হিটলার তাহা না শুনায় ব্রিটেন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স আগেই পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, জার্মেনী তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহারা তাহার সাহায্য করিবে।

এক সময়ে ডান্‌জিগ জার্মেনীর অংশ ছিল ইহা সত্য। কিন্তু যাহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছে, তাহা বলপূর্ব্বক দখল করার সমর্থন করা যায় না। ইয়োরোপের যেখানে যত জার্ম্যান আছে, তাহাদের সকলকে বলপূর্ব্বক জার্মেনীর অধীন করারও সমর্থন করা যায় না। তাহা করিলেও চেক্‌দিগকে জার্মেনীর অধীন করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। আফগানিস্থানের অনেক অংশ এক সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত ও অধীন ছিল, আবার অন্য এক সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনেক অংশ আফগানিস্থানের দখলে ছিল। তা বলিয়া এখন যুদ্ধ দ্বারা কোন পক্ষ নিজের পূর্ব্ব অধিকার স্থাপন করিতে চাহিলে তাহাতে মহা বিভ্রাট ঘটিবে। কানাডার একটা অংশ আগে ফরাসী উপনিবেশ ছিল; এখনও ফরাসীরা তাহার প্রধান অধিবাসী। তা বলিয়া জোর করিয়া সেই অংশ ফ্রান্স দখল করিতে চাহিলে তাহাতে বহু অমঙ্গলের সূচনা হইবে। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

হিটলারকে ত একথা বলা হয় নাই যে, জার্মেনী ডান্‌জিগ পাইবে না; আলোচনা দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছিল। সুতরাং হিট্‌লারের সে অনুরোধ রক্ষা করা উচিত ছিল।

যুদ্ধের কুফল

যুদ্ধের কুফল সকলেই জানে, বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে যে যুদ্ধ বাধে, তাহার কারণ বোসনিয়ার অন্তর্গত সারাজেভো শহরে গাব্রিলো প্রিন্সিপ নামক এক বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবকের দ্বারা অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যাণ্ড ও তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা। বোসনিয়ার লোকেরা আপনাদের অধীনতার জন্য অষ্ট্রিয়ার উপর অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। ঐ জোড়া খুন তাহারই ফল। ঐ খুন শুধু হত্যাকারী যুবকের কাজ নহে, তাহার পশ্চাতে ষড়যন্ত্র ছিল, ষড়যন্ত্রে কোন কোন "শক্তি" (Powers) লিপ্ত ছিল, ইত্যাকার নানা সন্দেহে ক্রমে ক্রমে বহুদেশ ও জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। প্রায় চারি বৎসর যুদ্ধ চলে। আশী লক্ষ লোকের প্রাণ যায়; আহতদের সংখ্যা ততোধিক। সম্পত্তিনাশ যে কত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত নারীর উপর কত বীভৎস অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত কেহ লেখে নাই। অগণিত বিধবা ও অনাথ বালকবালিকার আর্ত্তনাদে বহুদেশ পূর্ণ হইয়াছিল। অবিবাহিতা বহু মাতার বহু শিশু বহুদেশের একটা সমস্যা হইয়াছিল। জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সেই যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহা এখনও ধূমায়িত হইতেছে।

সেই যুদ্ধের এক পক্ষ ইংরেজ প্রভৃতি যুদ্ধের সময় বলিয়াছিল, পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত এবং চিরতরে যুদ্ধের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই যুদ্ধ করা হইতেছে। ফলে কিন্তু পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই, বহুদেশে ডিক্টেটরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং যুদ্ধ-প্রথার উচ্ছেদের পরিবর্ত্তে সেই যুদ্ধের পরোক্ষ ফলস্বরূপ আরও যুদ্ধ ঘটিয়াছে। এখন হিটলার যে যুদ্ধ বাধাইলেন, তাহাকেও গত মহাযুদ্ধের একটা পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধের সময় শুধু যে অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলিরই প্রয়োজন হয় এমন নহে। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড়, চটের থলি, ঔষধপত্র, নানাবিধ রাসায়নিক জিনিষ এবং কাঠের ও চামড়ার জিনিষ ইত্যাদি নানা প্রকার সামগ্রী আবশ্যক হয়। এইগুলি সরবরাহ করিয়া অনেক কারখানার মালিক ও ব্যাপারী লাভবান্ হয়। কিন্তু যুদ্ধ মোটের উপর সার্ব্বজাতিক বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহাতে জাতীয় ঋণ বাড়ে। গত মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াও ব্রিটেন এখনও

আমেরিকার ঋণ শোধ করিতে পারে নাই। আমেরিকা তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

—

ভারতবাসীদের প্রতি বড়লাটের বাণী

সিমলা হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর লর্ড লিনলিথগো ভারতবাসীদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত "বাণী" ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে গত শুক্রবার প্রাতঃকালে জার্ম্মেনীর সশস্ত্র বাহিনী পোলিশ রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে। জার্ম্মান গবর্মে'ণ্ট কোনও চরমপত্র দেন নাই, কিম্বা পোলিশ গবর্মে'ণ্টকে কোনও সতর্কীকরণের বাণীও প্রেরণ করেন নাই। প্রকাশ যে, জার্ম্মেনীর সামরিক বিমান অরক্ষিত শহরের উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে এবং অ-সামরিক জনসাধারণের মধ্যে বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

যাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে এক বৎসর পূর্ব্বে চেকোস্লোভাকিয়া যেরূপ হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল, পোলাণ্ডকেও তদ্রূপ হুমকির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নিজের রাষ্ট্র এবং প্রজাদের সম্পর্কে একটি বৈদেশিক শক্তির নির্দ্দেশ মানিতে হইবে পোল্যাণ্ডের নিকট এইরূপ দাবী করায়, পোল্যাণ্ড দৃঢ়তা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। এইরূপ সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহার সৈন্যগণ এমন একটি নির্ম্মম শক্তির বিরুদ্ধে সাহসের সহিত নিজ সীমান্তস্থান রক্ষা করিতেছে, যে-শক্তি তাহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য উন্মুখ। ব্রিটিশ এবং ফরাসী গবর্মে'ণ্ট স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিলে উক্ত আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ব্রিটিশ ও ফরাসী গবর্মে'ণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য হইবেন। এই সকল অবস্থাপ্রযুক্তই আমরা অদ্য আমাদিগকে জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত দেখিতেছি।

ইহা হইতে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি অতি সুস্পষ্ট। জার্ম্মেনী যে নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে জগতে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। ইহাতে আক্রমণাত্মক নীতির বিজয় এবং জোর-জবরদস্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় জগতের নিরাপত্তা থাকিতে পারিবে না, এবং কাহারও মনে শান্তি থাকিবে না। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া পোল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মেনীর নির্ম্মম আক্রমণ এই ব্যাপারে জার্ম্মেনীর অন্য সব আচরণের সহিত সুসঙ্গত। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার যাহা মূলনীতি, সার্ব্বজাতিক ন্যায়-নিষ্ঠা এবং নৈতিক জীবনের যাহা মূল আদর্শ, তাহা রক্ষা করার সমস্যার সম্মুখীন আমরা হইয়াছি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য সুসভ্য জাতিকে শক্তির আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্ত্তে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে অসভ্য সমাজের বিধি অর্থাৎ শক্তিমানের অধিকার ও ন্যায়বিবর্জ্জিত স্বৈরাচারকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, এই নীতির সমর্থনকল্পেই আমাদিগকে আজ এই সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ না করিলে মানবজাতির প্রকৃত উন্নতির সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইবে এবং যত দিন জগতে এই নির্ম্মম এবং নিষ্ঠুর ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে তত দিন মানবজাতির আত্মার স্বাধীনতা থাকিবে না।

ভারত অপেক্ষা অন্যত্র এই নীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নহে। ভারত এই নীতি যত মূল্যবান মনে করে, অন্য কোন দেশ তত করে না এবং এই নীতি সর্ব্বদা সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্য কোন দেশ অধিক আগ্রহান্বিত হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্মে'ণ্ট আত্মস্বার্থে এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতেছেন না। মানবসমাজের পক্ষে যাহা জীবনমরণতুল্য তাহার সংরক্ষণ, ব্রিটিশ সভ্যতার অগ্রগতি সুনিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধমীমাংসাক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের পরিবর্ত্তে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন দ্বারা ভবিষ্যতে নির্ব্বিঘ্নে সমাধান জন্যই ব্রিটিশ গবর্মে'ণ্টের এই সমরায়োজন। সম্প্রতি জগৎ যে দুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন, তাহা পরিহারকল্পে ব্রিটিশ গবর্মে'ণ্ট কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

আজ আমি দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা করি না। আজ আমি আপনাদের নিকট যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি—যাহার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হইতে পারে না,—তাহা এই যে, আপনারা প্রত্যেকে এই জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার ন্যায় আপনারাও এই বিষয়টি উপলব্ধি করিবেন যে, এই সঙ্কটের ও ঘোর পরীক্ষার দিনে একমাত্র অস্ত্রবলে বিজয়লাভ এবং ন্যায়ের ও শ্রেয়ের জয়, সম্ভব হইবে না। আমাদিগের সকলকে সেই আত্মিক এবং দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে, যাহা জীবনের সর্ব্বপ্রকার বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় অব্যর্থ শক্তির এবং সহিষ্ণুতার চিরপ্রবহমান উৎস উন্মোচন করে।

ভারতবাসীর প্রতি অনুরোধ

আমার বিশ্বাস, এই বিপৎসঙ্কুল অবস্থায়, ব্রিটিশ ভারতের এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের সকলের, জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী ও রাজনৈতিক দল নির্ব্বিশেষে, আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে দিনে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার অন্তর্নিহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পরমপ্রিয় সামগ্রী বিপন্ন, সেই দুর্দ্দিনে ভারত পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবজাতির স্বাধীনতার অনুকূলে তাহার কৃত্য করিবে এবং মহৎ জাতিসমূহের মধ্যে ও ইতিহাসবিশ্রুত সভ্যতাসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের যে স্থান তাহার যোগ্য আচরণ করিবে।

লর্ড লিনলিথগো যে সকল নীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা অনিন্দ্য। ব্রিটিশ গবর্মে'ণ্ট এবং অন্যান্য সমুদয় গবর্মে'ণ্ট এই সমুদয় নীতির অনুসরণ করিলে তাহার ফল ভালই হইবে। অরক্ষিত স্থানসমূহের অসামরিক লোকদের উপর বোমা-বর্ষণ যে অত্যন্ত গর্হিত, তাহা মনে রাখা সমুদয় জাতির পক্ষেই আবশ্যক।

পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বনে ব্রিটেনের সাক্ষাৎভাবে কোনই স্বার্থ নাই, ইহা সত্য।

ভারতবর্ষীয় ও রাশিয়ান্ কম্যুনিস্ট

ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টরা এত দিন তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি বুলিসমূহে রাশিয়ার কম্যুনিস্টদিগের অনুসরণ করিতেন। ফাসিস্ট ও নাৎসিদের মত ও আচরণ তাঁহাদের নিন্দার ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল। কম্যুনিস্ট রাশিয়া ও নাৎসি জার্মেনীর মধ্যে কিন্তু এখন

বন্ধুত্ব হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষীয় কম্যুনিস্টরা কাহার অনুসরণ করিবেন ?

বিদেশী সমুদয় মতই ভ্রান্ত ও অবজ্ঞেয় নহে। কিন্তু কোন দেশের কোন দলের মত সর্ব্বাংশে অন্য দেশের ঠিক্ উপযোগী না হইবার কথা। এই জন্য প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক দলের লোকদের স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত মত থাকা ভাল। স্বাধীন মত দেশকালপাত্র অনুসারে গঠিত হইতে পারে।

—

বিশ্বভারতীর "লোকশিক্ষা সংসদ"

বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মারফৎ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

আজকাল বাংলাদেশে সর্বত্র লোকের মধ্যে জ্ঞানলাভের একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সকলের পক্ষে বিদ্যালয়ে যোগ দিয়া সে-জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নহে। এই জন্য আচার্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন ও সেই সঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষাসচিব মহাশয়কে একখানি পত্রে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।—

'দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।' রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'একদা আমাদের দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষাকে কোনো উপায়ে এদেশে তেমন ক'রে যদি প্রসারিত ক'রে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানবসমাজে আমরা নিজের বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারব না; এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহুল্য।'

দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছি। যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কি না, এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া জানাইলে উপকৃত হইব।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষার্থিগণকে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত লোকশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি শতকরা ২৫ টাকা হার কম দামে বিক্রয় করিবেন। যে সকল পরীক্ষার্থী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের সম্পাদকের নিকট আগামী পরীক্ষার দক্ষিণার অর্দ্ধেক অংশ (প্রবেশিকা ও আদ্য পরীক্ষার জন্য) যথাক্রমে ॥০ এবং ১৷০ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে হইবে। সম্পাদক সেই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে রসিদ দিবেন তাহা পরীক্ষার্থিগণকে পুস্তকের অর্ডারের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :—

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী ফাল্গুন মাসের শেষাংশে লোকশিক্ষা সংসদের প্রবেশিকা ও আদ্য পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার নিয়মাবলী ও পাঠ্যপুস্তকের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, লোকশিক্ষা সংসদের বিবরণী পুস্তিকার জন্য দুই আনার ডাক টিকিট সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন। সম্পাদক লোকশিক্ষা সংসদ, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, বীরভূম।

—

ভারতবর্ষে হিন্দুর স্থান

ভারতীয় মহাজাতি যে কেবল হিন্দুদের দ্বারা গঠিত হইতে পারে না, ভারতবাসী অহিন্দু সম্প্রদায়গুলিকেও ইহার মধ্যে আনিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু এই মহাজাতির প্রধান অংশ, অপরিহার্য্য ও একান্ত আবশ্যক অংশ, হিন্দুরা, ইহা আমাদের বিশ্বাস। কেন তাহারা প্রধান অংশ তাহা আগে বলিয়াছি। এই প্রধান অংশকে তাহার ন্যায্য স্থান হইতে চ্যুত করিলে, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে দেশের কাজ করিবার সুযোগ ও অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বা অংশতঃ বঞ্চিত করিলে যে মহাজাতির মহা ও অপ্রতিকার্য্য অনিষ্ট করা হইবে. ভারতবর্ষ কখনও পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহের সমকক্ষ হইবে না, আমাদের বিশ্বাস এইরূপ হওয়ায় আমরা হিন্দুদিগের শক্তি হ্রাসের ও অধিকার হ্রাসের বিরোধী। আমরা যে হিন্দুদিগকে শক্তিশালী দেখিতে চাই, তাহা ভারতীয় অন্য কোন সম্প্রদায়ের সহিত দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে নহে; তাহা মহাজাতি গঠনের জন্য, মহাজাতির সেবার জন্যই আমরা চাই।

ভারতীয় মহাজাতির অন্য বৃহৎ অংশ মুসলমান। সংখ্যায় হিন্দুদের পরেই মুসলমানদের স্থান। তাঁহারা যদি মহাজাতিগঠনে ও মহাজাতির সেবায় তাঁহাদের সংখ্যা

অনুসারে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে ভারতীয় মহাজাতি এখন অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারিত। কিন্তু মুসলমানেরা তাহা করেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কালান্তর" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :—

"মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে,—তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগবিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না ক'রে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।"

আমাদিগকে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মনে করেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত নহেন। তিনি যে যোগবিয়োগ এবং গুণের অঙ্কফল ও ভাগের অঙ্কফলের কথা বলিয়াছেন, তাহার সামান্য কিছু আভাস অন্য প্রকারে দিতেছি।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার মোটামুটি বার আনা হিন্দু, পৌনে চার আনা মুসলমান। ভারতীয় মহাজাতিক কাজ হিন্দুরা সামান্য যতটা করে, মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যানুপাতে সেইরূপ করিলে কাজটার পনর আনা তিন পয়সা এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বারাই হইত। কিন্তু মুসলমানেরা তাহা না-করায়, হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার পনর আনা তিন পয়সা হইলেও মহাজাতিক ("national") কাজ হইতেছে কেবল বার আনা। ইহাও একটু বেশী বলা হইল। কারণ মুসলমানদের একটা খুব বৃহৎ অংশ মহাজাতিক (ন্যাশন্যাল) কাজ ত করেই না, বরং তাহার বিরুদ্ধ কাজ করে। তাহার ফলে হিন্দুদের কৃত বার আনা পরিশ্রমের কতক অংশ মুসলমানদের এই বিরোধিতার প্রতিকারের জন্য করিতে হয়।

এই জন্য, মহাজাতিক কাজের নিমিত্ত লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদের যত পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগ করিলে চলিত, তাহাদিগকে তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—বার আনার জায়গায় পনর আনা তিন পয়সা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে হিন্দুদের শক্তি আরও বাড়া চাই।

—

চ্যাটফীল্ড কমীটির সুপারিশ

সিমলা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর

ভারত-গবর্ণমেণ্ট চ্যাটফীল্ড কমীটির রিপোর্ট সম্পর্কে প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি অদ্য বিলাতী গবর্মেণ্টের নিকট হইতে বড়লাটের নিকট ডেসপ্যাচের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ডেসপ্যাচে ভারতের স্থলসৈন্য, বিমানবাহিনী ও নৌবহরের আধুনিক যুগোপযোগী যন্ত্রসজ্জা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, উহাতে ৪৫ কোটী টাকা লাগিবে। বিলাতী গবর্মেণ্ট ভারত-গবর্মেণ্টকে ৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা দান করিবেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরে বিনা সুদে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিবেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই তারিখে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সৈন্য ছিল, উহার এক-চতুর্থাংশ হ্রাস করা হইবে। হ্রাসের পরিমাণ দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, তিন রেজিমেণ্ট আন্দাজ গোলন্দাজ ও ছয় ব্যাটেলিয়ান পদাতিক।

বিলাতী গবর্মেণ্ট ভারত-গবর্মেণ্টকে ঐ টাকা এই সর্ত্তে দান করিবেন যে, ভারত-গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিবেন এবং বর্ত্তমান জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের সমস্ত সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। ভারতীয় সৈন্যদল এই কয় ভাগে ভাগ করা হইবে :—(১) সীমান্ত-রক্ষী (২) আভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষী, (৩) উপকূল-রক্ষী, (৪) সাধারণ রিজার্ভ ও (৫) বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধকারী সৈন্যদল।

বিলাতী গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষকে যে টাকা "দান" করিবেন ও "ঋণ" দিবেন বলিতেছেন তাহা উভয়ই বাস্তবিক শতাধিক বৎসর ধরিয়া ব্রিটেন যে অগণিত মুদ্রা ও অন্য ইয়ত্তাহীন সম্পত্তি ভারতবর্ষ হইতে নানা উপায়ে ও আকারে প্রকারে লইয়াছেন, তাহার আংশিক সামান্য পরিশোধ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে ব্রিটেনকে বাস্তবিক দাতা ও মহাজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

যে টাকা "দান" করা ও "ঋণ" দেওয়া হইতেছে, আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি থাকিলে আমরা তাহা দান ও ঋণ স্বরূপ লইতে রাজী হইতাম না। কারণ, আমাদের পূর্ণ-মাত্রায় স্বরাজ পাইবার তাহা একটি বাধা হইবে। ব্রিটেন বলিবে, "ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার ব্যয় আমরা আংশিক

বহন করিয়াছি বলিয়া উহার শাসন-কার্য্যের ও রাজস্বের উপর আমাদের কিছু কর্ত্তৃত্ব থাকা চাই।" বস্তুতঃ ভারতবর্ষের যে কয়েক শত কোটি টাকা সরকারী "ঋণ" আছে, সেই "ঋণের" অনেক অংশ ইংরেজরা দিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করে এবং কেহ কেহ বলিয়াছেও, যে, রাশিয়া যেমন বিপ্লবের পর সমুদয় বিদেশী ঋণ অস্বীকার করিয়াছে, পূর্ণ-স্বরাজ পাইলে ভারতবর্ষও সেইরূপ বিদেশীদের ঋণ অস্বীকার করিবে বা করিতে পারে; অতএব ভারতবর্ষকে পূর্ণ-স্বরাজ দেওয়া উচিত নয়; কিংবা যদি একান্ত দিতেই হয় তাহা হইলে ইংরেজদের দেওয়া ঋণটা শোধের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া তবে দিতে হইবে।

এই কারণে আমরা ইংরেজদের কাছে বা ব্রিটেনের কাছে ভারতবর্ষের সরকারী কোন প্রকার বাধ্যবাধকতার বা ঋণবৃদ্ধির বিরোধী।

ভারতীয় বিমানবাহিনীকে এই ভাবে পুনর্গঠন করা হইবে :—

বোমারু স্কোয়াড্রন ব্লেনহিম বিমান আর্মি কো-অপারেশন স্কোয়াড্রন লাইস্যাণ্ডার বিমান, বোমারু ট্রান্সপোর্ট স্কোয়াড্রন—ভ্যালেন্টিয়ান বিমান। ভারতীয় বিমান স্কোয়াড্রন গঠিত হইতেছে; ১৯৪০ সালের শেষ পর্য্যন্ত উহা শেষ হইবে।

ভারতীয় নৌ-বহরের জন্য নিম্নলিখিত জাহাজের অর্ডার দেওয়া হইবে :—

চারিখানা "বিটেন" শ্রেণীর জাহাজ ও চারিখানা "ম্যাষ্টিফ" শ্রেণীর জাহাজ।

ইণ্ডাস ও হিন্দুস্থান জাহাজ দুইখানা নূতন অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হইবে।

ভারতবর্ষেই যাহাতে ভারতীয় সৈন্যদলের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত গোলাবারুদ প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য বর্ত্তমান কারখানাগুলি বাড়ান হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে। —এ. পি.

বিমানবাহিনী ও নৌ-বহর ভারতের ব্যয়ে এবং (ব্রিটেনের জমিদারিরূপে) ভারতবর্ষের রক্ষার নিমিত্ত পুনর্গঠিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে কতগুলি ভারতীয় মানুষ কাজ পাইবে, এবং তাহাদের মধ্যে কয় জন নায়কত্ব করিতে পাইবে জানা আবশ্যক। নায়কত্ব একজনও করিবে কি? সাধারণ বিমানচালক ও বিমানসৈনিক এবং সাধারণ নৌ-সৈনিক শতকরা কয় জন হইবে?

চ্যাটফীল্ড কমীটির রিপোর্টের একটা প্রধান দোষ, উহাতে ভারতীয় সৈন্যদলের ভারতীয়তাপাদনের কোন সুপারিশ নাই।

গোলাবারুদের বর্ত্তমান কারখানাগুলিতে, সেগুলি বাড়াইলে তাহাদের বর্দ্ধিত অংশগুলিতে, এবং নূতন কারখানাগুলিতে ভারতীয় সাধারণ মিস্ত্রি কারিগর অনেকে কাজ পাইবে বটে; কিন্তু ভারতীয় কয় জনকে বিশেষজ্ঞের উচ্চপদগুলিতে নিযুক্ত করা হইবে? এক জনকেও হইবে কি? সেই রকম পদগুলির যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে যে রকম শিক্ষা আবশ্যক, ভারতীয় কাহাকেও সেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে কি না, ভারতবাসীদের তাহা জানিবার অধিকার আছে।

—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডক্টর অমরনাথ ঝার অনুকূলতায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডক্টর ঝা মহা-মহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের পুত্র ও সুপণ্ডিত। ইঁহারা মিথিলানিবাসী।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গীয় সাহিত্যিক য়ুনিয়নকে ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় প্রাচ্যভাষা বিভাগে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ সওয়া তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার নিমিত্ত নিয়মিত ক্লাস বসাইবার অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়াছেন। এই ক্লাসগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রাথমিক ভাগে অক্ষরপরিচয় ও প্রাথমিক কোন কোন পাঠ্যগ্রন্থ পড়ান হইবে। তাহার পরের ভাগে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক হইবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার চয়নিকা গ্রন্থ এবং তাড়াতাড়ি পড়িবার জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দুর ছেলে'। উচ্চতম ভাগের

পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। শ্রীযুক্ত সুকমল দাসগুপ্ত, এম. এ, শিক্ষা দান করিবেন। কোন বেতন লওয়া হইবে না।

যুক্তপ্রদেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে হইতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা হইলে অবৈতনিক শিক্ষকের অভাব হইবে না। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ বাংলা শিখিতে চাহিবে কিনা জানি না।

—

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ভাষা

সাহিত্য-বাসর নামক সমিতির উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় যে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল তাহার সংবাদপত্র শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু তাঁহার অভিভাষণে দৈনিক কাগজ হইতে দুটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করেন যে, যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহারা এরূপ ভাষায় লিখিত সংবাদ বুঝিতে পারিবেন কি না। না পারিবারই কথা।

বাস্তবিক আমরা সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে অনেক সময় এরূপ ভাষা ব্যবহার করি, যাহা ইংরেজী-না-জানা লোকেরা বুঝিতে পারেন না। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু দৈনিক কাগজের লেখকদিগকে খুব বেশী দোষও দেওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে এত তাড়াতাড়ি লিখিতে হয় যে, ইংরেজীর সহজবোধ্য বাংলা প্রতিশব্দ তাঁহারা অনেক সময় চট করিয়া খুঁজিয়া পান না। তথাপি, সহজবোধ্য ঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহারের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের ও আমাদের সকলেরই উচিত।

—

মেদিনীপুরের একটি দৃষ্টান্তস্থানীয় গ্রাম

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেখিলাম, মেদিনীপুর জেলার সকল গ্রামের মধ্যে গ্রামোন্নতিবিষয়ক প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সফল চেষ্টার জন্য শ্যামগঞ্জ নামক একটি গ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট হইতে ২৫০ টাকা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ২০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামটিকে একটি ঢাল দেওয়া হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জন, ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।

গত এক বৎসরে শ্যামগঞ্জ আটটি রাস্তা, এবং জলা জমি হইতে জল নিষ্কাশনের নিমিত্ত তিনটি উচ্চ রাস্তায় পাঁচটি সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়াছে। তা ছাড়া বড় ও ছোট মোট ৯২৫ ফুট লম্বা অনেকগুলি নর্দমা গ্রামের লোকেরা কাটিয়াছে। ১০টি পুকুর ও ২০টি ছোট ডোবা পরিষ্কার করা হইয়াছে। ১৫টি ডোবা বুজান হইয়াছে এবং তাহার উপর তরকারির ক্ষেত করা হইয়াছে।

একটি য়ুনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় খোলা হইয়াছে এবং গ্রামের লোকেরা স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি চালাইবার নিমিত্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৪০০ টাকা দিয়াছেন।

একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহা বেশ চলিতেছে। গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উহার গৃহ নির্ম্মাণ ও পুস্তক ক্রয়ের নিমিত্ত ২০০ টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে আবর্জনা নিক্ষেপ ও রক্ষার নিমিত্ত চালার দ্বারা আচ্ছাদিত সার-কুড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কয়েক রকম নূতন ফসল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দেশী ও বিলাতী শাকসব্জী আছে।

গোবংশের উন্নতির নিমিত্ত গ্রামে একটি হারিয়ানা ষাঁড় আনা হইয়াছে। নেপিয়ার ঘাসের চাষ হইতেছে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর তরকারির বাগান এবং কোন কোন বাড়ীতে ফুলবাগান আছে।

ফুটবল, লাঠিখেলা ও অন্য নানাবিধ খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে।

আলো ও বাতাসের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা যাহাতে থাকে ঐ প্রকার গৃহনির্ম্মাণের দিকে দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা পালা করিয়া রাস্তা মেরামত এবং জঙ্গল ও পুকুর পরিষ্কার করিবার কাজ

প্রত্যহ করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, প্রসূতির শুশ্রূষা ও শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে নারীদিগের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে।

গ্রামশিল্প শিখিবার নিমিত্ত দুই জন যুবা কর্ম্মীকে শ্রীনিকেতনে পাঠান হইয়াছে। তাঁহারা শিখিয়া ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবেন।

—

যুদ্ধের হিড়িকে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি

যে-সব জিনিষপত্র বিদেশে চালান হয় না, বিদেশ হইতে আমদানীও হয় না, যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় যাহাদের উৎপাদন হ্রাস পায় নাই—পাইবেও না, এরকম অনেক জিনিষের ব্যাপারীরা যুদ্ধের হিড়িকে দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত কড়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ফলপ্রদ হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে।

যুদ্ধ যদি অনেক দিন চলে, তাহা হইলে যে-সব জিনিষ সমস্তই বা অংশতঃ বিদেশ হইতে আসে তাহার আমদানী কমিবে, যাহা আসিবে তাহাও আনিবার ব্যয় অধিক হইবে। এই সকল জিনিষের ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

যোগান যথেষ্ট হইবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকায় ইতিমধ্যেই বিলাতী খবরের কাগজগুলা তাহাদের পৃষ্ঠা-সংখ্যা অর্দ্ধেক করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতার বড় দৈনিকগুলিরও পৃষ্ঠা অনেক কমিয়াছে। সাময়িক পত্রের ও পুস্তকাদির প্রকাশকদেরও অসুবিধা হইতেছে। যদি ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশে কাগজের কারখানা অনেক থাকিত, তাহা হইলে এত অসুবিধা হইত না।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সরকারী হুমকি

বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীরা যখন উপবাস ত্যাগ করে, তখন তাহারা বলিয়াছিল দুই মাসের মধ্যে তাহারা খালাস না পাইলে আবার উপবাস আরম্ভ করিবে। মিয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন যে সরকারী হুমকি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে তাহা পড়িয়া মনে হয়, মন্ত্রীরা বন্দীদের নির্দ্দিষ্ট দু-মাসের মধ্যে তাহাদিগকে খালাস দিবেন না।

ভয় দেখান হইয়াছে যে, অতঃপর বন্দীরা উপবাস দিলে জেল-আইন অনুসারে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে, এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইবে; ফলে যদি কাহারও বিশেষ অনিষ্ট বা মৃত্যু হয়, তাহার জন্য সরকার দায়ী হইবেন না।

আরও বলা হইয়াছে, রাজবন্দীরা উপবাস আরম্ভ করিলে তাহার খবর যাহাতে সংবাদপত্রে বাহির না-হয় এবং উপবাসীর মুক্তির নিমিত্ত আন্দোলন যাহাতে না-হয় তাহার ব্যবস্থাও সরকার করিবেন। ইত্যাদি

এই সমস্তই অবশ্য সরকার করিতে পারেন। কিন্তু ইহার গুণগ্রহণ আমরা করিতে পারিতেছি না। যখন বন্দীরা উপবাস করিয়াছিল তখন সরকার বলিয়াছিলেন, "তোমাদের উপবাসে আমরা ডরাই না। তোমরা উপবাস ত্যাগ না করিলে তোমাদের মুক্তির সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই হইবে না।" ভাল কথা। কিন্তু তাহারা উপবাস ছাড়িয়া দিবার এত দিন পরেও তাহাদের মুক্তি কেন হইল না? এই কারণে কি, যে, তাহারা বলিয়াছিল, দু-মাসের মধ্যে মুক্তি না দিলে তাহারা আবার উপবাস আরম্ভ করিবে? তাহাদের এই "ভয়প্রদর্শনে"র উত্তরে সরকারী "ভয়প্রদশন" কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে!

সুতরাং এখন ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, বাংলার মন্ত্রীরা ভয় পান নাই।

কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা যত বেশীই হউক না কেন, রাজবন্দীরা 'মরিয়া' হইয়া উঠিলে তাহাদের প্রায়োপবেশন তাঁহারা বন্ধ করিতে পারিবেন না। তাহাতে কয়েকটি মানুষের অনাহারে প্রাণ যাইতে পারে। তাহাতে কাহার লাভ? কাহারও না। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নহে, তাঁহাদের তাঁবেদার বঙ্গীয় মন্ত্রীদের নহে, রাজবন্দীদের নহে, কংগ্রেসের নহে, বঙ্গীয় জনসাধারণের নহে। বলা বাহুল্য আমরা সাধারণতঃ কাহারও প্রায়োপবেশনের সমর্থক নহি।

এক রকমের জেদ আছে, যাহা সাহসিকতার অভিনয় এবং ছেলেমানুষির নামান্তর।

—

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা প্রধানতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের প্রিয় কবিতার লেখক বলিয়াই জানিতাম বলিয়া যখন কাগজে দেখিলাম মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী পার হইয়াছিল, তখন বুঝিলাম তিনি আমাদের চেয়েও অনেক বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আগে তাহা অনুমান করি নাই। তিনি এক সময়ে সেকালের বালকবালিকাদের প্রসিদ্ধ মাসিক "সখা"র অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই তিনি এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, নববিভাকর প্রভৃতিতে কবিতা লিখিতেন। তিনি "পুষ্পাঞ্জলি", "ছেলেখেলা", "শিশুরঞ্জন রামায়ণ", "টুকটুকে রামায়ণ" প্রভৃতি বহি লিখিয়াছিলেন।

—

সমাজসেবক নিশিকান্ত বসু

পরলোকগত নিশিকান্ত বসু মহাশয় যৌবনে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজসেবক নিশিকান্ত বসু বলিয়াই সমধিক পরিচিত। তিনি বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার এই কর্ম্ম উপলক্ষে বঙ্গের ও আসামের নানা স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইত। তাঁহার জনহিতৈষণা, বাগ্মিতা ও চরিত্র তাঁহার জীবনের ব্রতের অনুরূপ ছিল।

—

পাট ও চট সম্বন্ধে অর্ডিন্যান্স

বাংলা-গবর্মেণ্ট পাটের ও চটের ফাটকা বাজারের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দুটি অডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। নিম্নতম দর যে বাঁধিয়া দেওয়া যায় এবং বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, ইহার সরকারী স্বীকৃতি সন্তোষের বিষয়। কিন্তু অডিন্যান্স দুটি হইতে এবং তাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম দর হইতে পাটের চাষীর বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। অথচ পাট-সংক্রান্ত সমুদয় সরকারী বিধিব্যবস্থার প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহাদের হিতসাধন; কারণ পাট-উৎপাদনের যত শ্রম ও দুঃখভোগ তাহারাই করে। যুদ্ধ যদি না-বাধিত, তাহা হইলেও পাটচাষীরা অর্ডিন্যান্স দুটি হইতে বিশেষ উপকার পাইত না। এখন যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় পাটের মূল্য বাড়িবে বই কমিবে না। এ অবস্থায় অডিন্যান্স দুটার বিশেষ কোন সার্থকতা থাকিবে না।

—

বঙ্গে জলপ্লাবন

এ-বৎসর বাংলা দেশে যথাসময়ে বর্ষার আরম্ভ হয় নাই। তাহার পর অতিবৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং অনেক অঞ্চলে বন্যা ও জলপ্লাবন হইয়াছে। ইহাতে শস্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার ঠিক্ পরিমাণ নির্ণীত হইবে না। গোরু মহিষ অনেক মারা পড়িয়াছে। মানুষের প্রাণহানি যে একেবারেই হয় নাই এমন নয়। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বিপন্ন লোকদের যাঁহারা সাহায্য করিতেছেন ও সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য।

ইহা সাময়িক প্রতিকার। কিন্তু বন্যার ও জল-প্লাবনের অনিষ্টকারিতা নিবারণের স্থায়ী উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন মানুষের বুদ্ধির অসাধ্য নহে, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। কোন কোন সভ্য দেশে এরূপ উপায় কিছু অবলম্বিত হইয়াছেও। সম্প্রতি বাংলা-গবর্মেণ্ট পঞ্জাবের সেচ-বিভাগের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ডক্টর নলিনীকান্ত বসুকে আনাইয়া যে-সকল বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত যে পরামর্শ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বাংলা দেশেও হয়ত ঐরূপ উপায় অবলম্বনের কিছু চেষ্টা ভবিষ্যতে হইতে পারে।

—

'সুলভ সমাচার' ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী

"শিশু ভারতী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "সুলভ সমাচার" হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলন করিয়া উপরিলিখিত নামে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেগুলি কেশবচন্দ্রের নিশ্চয়ই নিজের লেখা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, সেগুলির নাম তিনি ভূমিকায় দিয়াছেন।

এই পুস্তিকাটি প্রথম খণ্ড। পরে যোগেন্দ্র বাবু ইহারই মত মূল্যবান্ আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের মতের কিছু আভাস আমরা গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম। এই পুস্তিকায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতে কেশবচন্দ্রের অধুনা-বিস্মৃত বা অজ্ঞাত বিস্তর রচনা দেখিতে পাইবার আশা করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যান্য সাধারণ ও গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে সুলভ সমাচার, বালকবন্ধু, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির যে-সব পুরাতন ফাইল আছে, যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতে পাইলে তাঁহার প্রারব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ হইবে।

—

যুক্তপ্রদেশে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য

ভারতবর্ষের আটটি প্রদেশে আগেকার আমলাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অধীন আংশিক স্ব-রাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাকী তিনটির মধ্যে বঙ্গে আগেকার আমলাতান্ত্রিক রাজের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক রাজ স্থাপিত হইয়াছে। অন্য দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলা এখন আমাদের অভিপ্রেত নহে।

আগেকার আমলের আমলাতান্ত্রিক রাজের স্থানে যে-যে প্রদেশে আংশিক স্ব-রাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে সকল সরকারী বিভাগের কার্য্যকারিতা বাড়িবে এবং ন্যায়ের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইবে, এইরূপ আশা করা স্বাভাবিক। যুক্তপ্রদেশ এইরূপ একটি প্রদেশ। এখানকার শিক্ষা-বিভাগ সম্পর্কে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা তথাকার মন্ত্রীদিগের দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করি।

এই প্রদেশে অনেক পুরুষ ধরিয়া অনেক বাঙালী পরিবারের বাস। কোন কোন পরিবার আগ্রা প্রদেশ বা অযোধ্যা প্রদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইবার আগে হইতেও কোন কোন তীর্থস্থানে হয়ত ছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তথাকার বাঙালীদের সংখ্যা সামান্য হইলেও, বাঙালীদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমের শতকরা হার অন্য অধিবাসীদের হার অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা শিক্ষিত হিন্দুস্থানীদের সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্গের বাঙালী-দের ও যুক্তপ্রদেশের বাঙালীদের ভাষা ও সাহিত্য এক।

যুক্তপ্রদেশে আমলাতান্ত্রিক আমলে ইংরেজী বিদ্যালয়-গুলির উচ্চ পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর হিন্দুস্থানী বাঙালী প্রভৃতি সব ছাত্রছাত্রী ইংরেজীতে দিত। তাহারা শিক্ষা পাইত নীচের ক্লাসগুলিতে হিন্দু-উর্দ্দুর সাহায্যে, উপরের ক্লাসগুলিতে ইংরেজীর সাহায্যে। বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় শহরের কয়েকটি স্কুলে বাঙালী ছেলেমেয়েরা নীচের ক্লাসগুলিতে বাংলা পড়িত এবং বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইত; কিন্তু অন্য সকল বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের এ সুবিধা ছিল না—এখনও নাই।

কংগ্রেসী আমলে নূতন নিয়ম হইয়াছে, উচ্চবিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষা দেওয়া হইবে হিন্দী-উর্দ্দুর সাহায্যে, পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে হিন্দী-উর্দ্দুতে; কেবল বলা হইয়াছে, কোন কোন পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীতে উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে। বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম না-থাকায় যুক্তপ্রদেশের বাঙালীরা আপত্তি ও আন্দোলন করেন।

সম্প্রতি তথাকার সরকারী বিজ্ঞপ্তি-বিভাগের ডিরেক্টর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্ববৎ ইংরেজীতে লিখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ বাঙালী পরীক্ষার্থীদিগকে প্রশ্নের উত্তরদান বিষয়ে কংগ্রেস-রাজ আমলাতান্ত্রিক রাজ অপেক্ষা অধিক অসুবিধায় ফেলেন নাই।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি-বিভাগের ডিরেক্টর আরও জানাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ও পরীক্ষার ভাষা হিন্দী-উর্দ্দু হইবে বটে, তবে অন্য কোন বা কোন কোন দেশী ভাষাও হইবে কি না, তাহা বিবেচিত হইবে। বাঙালীদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাঙালী ছেলে-মেয়েদের নিমিত্ত বাংলা ভাষাও যেন শিক্ষা ও পরীক্ষার

অন্য ব্যবহৃত হইবার নিয়ম হয়। এই নিয়ম হইলে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ তাহার সুবিধা অবশ্য পাইবে। তদ্ভিন্ন যে-সকল সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী ছাত্রছাত্রী থাকিবে, সেখানেও বাংলার সাহায্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সাধারণতঃ এই নিয়ম হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে, যে-কোন বিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছা করিলে বাংলা ভাষায় দিতে পারিবে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি-বিভাগের ডিরেক্টর বলিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশের বাঙালীরা যখন তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা তখন তাহাদের হিন্দী-উর্দু জানা আবশ্যক। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াও বাঙালী ছেলেমেয়েরা অধিকন্তু হিন্দী-উর্দু শিখিতে পারে। আমি তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালী সেখানে এক জনও দেখি নাই যিনি হিন্দী-উর্দু বলিতে পারেন না—অনেকে ত খুব ভালই বলিতেন

যুক্তপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা

যুক্তপ্রদেশের বাঙালী ছেলেমেয়েদের কেন হিন্দী-উর্দু শেখা দরকার, তাহার এই একটি কারণ তথাকার বিজ্ঞপ্তি-ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, অচিরে হিন্দুস্থানী যুক্তপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাষা হইবে। কালক্রমে তাহা হওয়া উচিত ও অনিবার্য্য। তবে, "হিন্দুস্থানী" নামক যে আংশিক-নূতন ভাষা গড়িবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে-অনুশীলনযোগ্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কবে সৃষ্ট হইবে, কেহ বলিতে পারে না। সে যাহা হউক, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-যে প্রদেশে একাধিক ভারতীয় প্রধান ভাষা প্রচলিত আছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা একটি মাত্র হইতে পারে না। আমরা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, কিন্তু সব ভাষার নিঃশেষ তালিকা দিতেছি না। বোম্বাইয়ে মরাঠী ও গুজরাটী, মধ্যপ্রদেশে মরাঠী ও হিন্দী, মান্দ্রাজে তেলুগু ও তামিল, আসামে বাংলা ও অসমিয়া এবং বিহার প্রদেশে হিন্দী ও বাংলা চালাইতে হইবে। সেইরূপ যুক্তপ্রদেশে হিন্দী ও বাংলা চালান উচিত। ঐ প্রদেশে বাংলাভাষীর সংখ্যা কম বটে; কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বা অন্যতর ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া অনুচিত হইবে না,—বরং দিলে যুক্তপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য বাড়িবে।

—

যুক্তপ্রদেশে সংবাদপত্রসমূহের সরকারী পরামর্শদাতা

অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুক্তপ্রদেশের সরকারী বিজ্ঞপ্তি-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of Public Information)। তাঁহাকে সম্প্রতি তথাকার সংবাদপত্রসমূহের সরকারী পরামর্শদাতা (Adviser to the Press) নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কাজে আগে আগে ইংরেজ সিবিলিয়ানরাই নিযুক্ত হইতেন।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। বিহার প্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা যত বেশী, যুক্তপ্রদেশে তার অনেক গুণ কম। যুক্তপ্রদেশের মত বিহারেও খুব উচ্চশিক্ষিত ও যোগ্য বাসিন্দা বাঙালী বিস্তর আছেন। কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট তথাকার এক জন বাঙালীকেও মন্ত্রী করা বা কোন বিভাগের মাথায় স্থাপন করা দূরে থাকুক, বাঙালী বিতাড়নেই আগ্রহান্বিত।

—

নারীনিগ্রহবিষয়ক মোকদ্দমা ও আইনজীবিগণ

নারীনিগ্রহবিষয়ক মোকদ্দমা যত হয়, নারীহরণাদি ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঘটিয়া থাকে। মোকদ্দমা যত হয়, তাহাতেও অনেক স্থলে দুর্বৃত্ত লোকেরা খালাস পায়। কতক আসামী নিম্ন আদালতে, কতক আপীল করিয়া আপীল-আদালতে খালাস পায়। নির্দোষ লোকদের শাস্তি আমরা চাই না। কিন্তু ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, নিগৃহীতা নারীদের পক্ষে আবশ্যক-মত উকীল ব্যারিস্টর না থাকাতেই অনেক সময় আসামীদের

সাজা হয় না। নিগৃহীতাদের অর্থবল সকল স্থলেই খুব কম—নাই বলিলেও চলে; আসামীদের অর্থবল অধিক বলিয়া তাহারা সুদক্ষ আইনজীবীর সাহায্যে অনেক স্থলে খালাস পায়।

এরূপ অবস্থায় কলিকাতা ও মফঃসলের ব্যারিস্টরদের ও উকীলদের সভার নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করুন যাহাতে নারীনিগ্রহবিষয়ক মোকদ্দমা মাত্রেই, নিগৃহীতা টাকা দিতে না-পারিলেও, তাঁহাদের যথোপযুক্ত সাহায্য পায়।

—

শ্রমিক ধর্ম্মঘট

শ্রমিকদের যে-সকল দুঃখ ও অভিযোগের প্রতিকার হইতে পারে, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখ ও অভিযোগ তাহাদেরই থাকিতে পারে, কারখানার মালিকদের থাকিতে পারে না, ইহা মনে করা ভুল। ইহাও ভ্রম যে, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মতান্তর ও ঝগড়া হইলে মালিকরাই নিশ্চয়ই দোষী।

মালিকদের ত্রুটি এবং শ্রমিকদের অভিযোগ থাকিলেও ধর্ম্মঘট প্রতিকারের চরম উপায়। কথায় কথায় বা সামান্য কারণে ধর্ম্মঘট করা ভুল।

আমরা গত ১৩৪৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আমেরিকার অভিজ্ঞতার সাংখ্যিক তথ্য (statistics) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মঘট করিবার উদ্দেশ্য অধিকাংশ স্থলে সিদ্ধ হয় না, বহু ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটের ফল মন্দই হয়। ঐ সংখ্যার ৬২২-৬২৫ পৃষ্ঠাগুলি আমরা কারখানার পঠনক্ষম শ্রমিকদিগকে, শ্রমিক-নেতাদিগকে ও কারখানার মালিকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। এ দেশের অন্য কোন কাগজে এই সকল তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। ঐ সংখ্যার ঐ চারিটি পৃষ্ঠার একটি হইতে আমরা কয়েকটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমেরিকার হিসাব দেখিলে বলা যায় যে, ধর্ম্মঘট যত অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহাতে শ্রমিকের জয়ের সম্ভাবনা ততই কম হয়। ১৯২৭-৩৬, এই দশ বৎসরের ১২১৫৭টি ধর্ম্মঘটের চর্চ্চা হইতে দেখা যায় যে, ধর্ম্মঘট এক সপ্তাহ বা আরও অল্প কাল স্থায়ী হইলে ফলে শতকরা ৩৯·৭ বার শ্রমিকেরই লাভ হয় বেশী, ১৯·৩ লাভ লোকসান সমান সমান হয়, ৩৫·৫ বার লোকসান হয়, ও ৫·৫ বার ফল অজানা থাকিয়া যায়।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শ্রমিকরা অধিকাংশ স্থলে নিরক্ষর, তাহাদের হিতার্থ যাহা লেখা হয় তাহারা তাহা জানিতে পারে না, এবং অনেক স্থলে এমন শ্রমিক-নেতাদের দ্বারা তাহারা চালিত হয় যাঁহারা শ্রমিকদের কল্যাণ অপেক্ষা আপনাদের স্বার্থ বা কোন একটা রাষ্ট্রনৈতিক দলের জয়ের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখেন।

—

কানপুরের দুই হাজার শ্রমিকের অনুতাপ

সম্প্রতি কানপুরের নিউ ভিক্টোরিয়া মিলের দুই হাজার শ্রমিক যুক্তপ্রদেশের কৃষি-শিল্প-প্রসার (Development) বিভাগের মন্ত্রীর নিকট এই দরখাস্ত করিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে, মজ্‌দুর সভার (শ্রমিক সমিতির) উপর তাহাদের আর আস্থা নাই, তাহারা ধর্ম্মঘট চায় না, রোজগার করিতে চায়, অতএব তিনি যেন উক্ত মিলের কর্তৃপক্ষকে মিল বন্ধ না রাখিয়া পুনরায় মিল খুলিতে বলেন। যে-কানপুরে ধর্ম্মঘটের জন্য ধনিক ও শ্রমিকদের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে, সেই কুখ্যাত কানপুরের দু-হাজার শ্রমিকের এই সুবুদ্ধি সুলক্ষণ। অন্য সব জায়গার শ্রমিকদের এইরূপ সুবুদ্ধি হইলে এবং তাহারা কারখানার মালিকদের সহিত আলোচনার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিলে তাহাদের ও দেশের উপকার হয়। কারখানা-শিল্পের প্রসার আমাদের দেশে সামান্যই হইয়াছে। শ্রমিক-নেতারা সে বিষয়ে কিছুই করেন না, করিতে পারেন না; শ্রমিকদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। যাহা কিছু করেন, সবই কারখানার মালিকরা করেন। অথচ তাঁহাদিগকে শ্রমিকদের শত্রু এবং শ্রমিক নেতাদিগকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া চিত্রিত করা হয়! মালিকরা অবশ্য লাভ চান, কিন্তু সাধারণতঃ উৎপীড়ন বা অত্যাচার দ্বারা নহে। বর্ত্তমান সময়ে কোন সভ্য দেশেই শ্রমিকদের উপর আগেকার মত অত্যাচার হইতে পারে না; আইনে বাঁধা দেয়।

শ্রমিকরা স্বর্গসুখ ভোগ করে না, সত্য ; কিন্তু তাহাদের অবস্থা সাধারণ কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের চেয়ে ভাল।

—

মোহিনী মিলের ধর্ম্মঘট

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। স্থানাভাব বশতঃ, তাঁহার প্রবন্ধটি হইতে কয়েকটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

উল্লিখিত অসুবিধার উপর বর্ত্তমানে আর একটি নূতন বিপদ বস্ত্র-শিল্পকে আক্রমণ করিয়াছে—উহা হইতেছে শ্রমিক-আন্দোলন। কোন শিল্পই শ্রমিক ব্যতীত চলিতে পাবে না। শ্রমিকদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য আন্দোলন ও সংগঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু বাংলায় যে ভাবের শ্রমিক-আন্দোলন প্রসার লাভ করিতেছে—তাহা শুধু বাংলার শিশুশিল্পকেই বিনষ্ট করিবে না, পরন্তু বাংলার অর্থনৈতিক অধীনতাও চিরকালের জন্য কায়েমী করিয়া তুলিবে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। শিল্প-প্রধান দেশে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। শ্রমিকেরা এই সকল ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য। শ্রমিকদের কোন অভিযোগের প্রতিকারকল্পে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রথমতঃ ধনিক বা কল-মালিকের সহিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে প্রয়াস পায়, সে প্রয়াস ব্যর্থ হইলে যথোপযুক্ত নোটিশ প্রদান করিয়া মেয়াদ অন্তে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে। ধর্ম্মঘট হইল শেষ এবং চরম অস্ত্র। কিন্তু আমাদের দেশে, আজকাল, কথায় কথায় ধর্ম্মঘটের হিড়িক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। তাহার কারণ এতই নগণ্য যে, যাঁহারা ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধির ও সদিচ্ছার প্রশংসা করা চলে না। এই ধর্ম্মঘটের ফলে, কতকগুলি দরিদ্র লোক অন্নকষ্ট, মানসিক অশান্তি ও আরও নানা প্রকার কষ্টে যথা—মামলা-মোকদ্দমা, জেলখাটা প্রভৃতিতে—নিপতিত হয় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রসারের পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। বাংলার শিল্পের এই শৈশবকালে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করা দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। কারণ ইহাতে বাংলার বস্ত্র-শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার প্রাক্কালে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এ-দেশের শ্রমিক-আন্দোলন যে-ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে অনেক সময়েই দেখা যায়, শ্রমিকগণের কল্যাণ-কামনা অপেক্ষা দল-বিশেষের প্রভাব বিস্তার করাই থাকে ধর্ম্মঘটের মূল উদ্দেশ্য।

মোহিনী মিলের শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়া মিলের কাজে আবার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের, অন্য শ্রমিকদের ও সর্ব্বসাধারণের উপকার করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙালী হিন্দুদের মনের ভাব

ব্রিটেন জার্মেনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় ভারত-বর্ষের লোকদের সহানুভূতি ও সাহায্য চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশক্তি ব্রিটেনের হাতে আছে এবং সেই রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় সৈন্যদল ও ভারতীয় রাজকোষের অর্থ ব্রিটেন যুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহা যথেষ্ট না-হইতে পারে। কোন একটা কাজে সম্মতি থাকিলে মানুষ স্বেচ্ছায় সেই কার্য্য নির্বাহে যে রকম সাহায্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন ব্রিটেনের হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজকোষ হইতে ব্রিটেনকে দেড় শত কোটি টাকা দান করা হইয়াছিল। সৈন্য ব্যতীত যুদ্ধে শিবির-অনুচরও দরকার হয় অনেক। যুদ্ধ বেশী দিন চলিলে, এখন যত সৈন্য ও শিবির-অনুচর আছে তাহা অপেক্ষা অধিক সিপাহী ও শিবির-অনুচর আবশ্যক হইবে। আগেকার মত দান ভারতবর্ষ না করিলে গবর্মেণ্টকে ঋণ লইতে হইবে। ঋণদাতার আন্তরিক সম্মতি থাকিলে তবে ঋণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে-কোন বিদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। সেই জন্য এই যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্য করিতে ভারতবর্ষের আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু অন্যকে স্বাধীন রাখিবার জন্য ভারতের মানুষেরা প্রাণ দিতে ধন দিতে প্রস্তুত হইবে অথচ তাহারা নিজে অধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক নহে। এই জন্য আমরা চাই, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আক্রান্ত স্বাধীন বিদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত স্বাধীন ভারতীয়দিগকে স্বাধীন ভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ করুন, ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অনুরোধ করুন।

অনেকে উপদেশ দিতেছেন, ব্রিটেনের এই সঙ্কটের সময় কি সর্ত্তে ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে সাহায্য করিবে সে বিষয়ে কোন দরদস্তর না-করিয়া তাহাকে সাহায্য করুন। দরদস্তর করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু উপদেশে, অনুরোধে, বা হুকুমে মানব-প্রকৃতি বদলায় না। যে অধীন, তাহাকে অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আহ্বান করিলে সে মানবধর্ম্মের খাতিরে অনুরোধ রক্ষা

করিতে পারে, কিন্তু স্বভাবতই উৎসাহ বোধ না-করিতে পারে।

এই জন্য, এখন যে বড়লাট মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতাদিগকে ডাকিয়াছেন এবং প্রবাসীর এই সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবে, তাঁহাদের যে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কি বলা উচিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি বলিয়াছেন তাহা প্রকাশ পায় নাই—হয়ত পাইবেও না। কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটিতে বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা হইবে, সে বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হইবার কথা। তাহা কিরূপ হইবে জানি না। কিন্তু একটা কথা আমরা এখানে বলিতেছি। আমরা বঙ্গের হিন্দুদের প্রতিনিধি নহি, নেতা ত নহিই। কিন্তু তাঁহাদের মনের ভাব যতটা বুঝিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই :—

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা বাঙালী হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার ও তাহাদের যে-অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিকার যে-চুক্তিতে থাকিবে না, তাহাতে সায় দিতে আমাদের উৎসাহ হইবে না।"

[১৮ই ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর লিখিত।]

হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ২০শে ভাদ্র কলিকাতায় হিন্দুদের একটি সভার অধিবেশন হয়। সভামণ্ডপে কয়েক হাজার নরনারী সমবেত হন। বৃহৎ মণ্ডপেও স্থানাভাব-বশতঃ ফুটপাথে ও রাস্তাতেও ভিড় হইয়াছিল। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে তিনটি নীচে দেওয়া হইল।

বাঙ্গলার হিন্দু জনগণকে বীরভাবে সুগঠিত ও সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষণক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য মহারাষ্ট্র প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশে, কলিকাতায় ও মফস্বলের প্রত্যেক শহরে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী. গঠন ও সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, বিশেষতঃ দক্ষিণ-মালদহে নারী-নিগ্রহ যেরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, সভা তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং প্রতিকারার্থ সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সভা হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করেন।

বোম্বাইয়ে বাঙালী শিক্ষাসমিতি

বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীরা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা করা যে উচিত, ইহা প্রবাসী বাঙালীরা বুঝেন। বোম্বাইয়ের বাঙালীরা এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় চালাইতেছেন।

সমিতির পরিচালিত এংলো-বেঙ্গলী স্কুলে ৫২টি বালিকা ও ৪১টি বালক পাঠ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭ ও ৫৩ ছিল। স্কুলের ক্লাসগুলির মধ্যে পাঁচটি প্রাথমিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং উহা বোম্বাই মিউনিসিপালিটির অনুমোদিত এবং এজন্য কর্পোরেশনের অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। অপর পাঁচটি ক্লাস বোম্বাই সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুমোদিত।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটিতে "বিদ্রোহী"দিগকে আহ্বান

আমরা আজ ২২শে ভাদ্র এই কথাগুলি লিখিতেছি। আজ কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিবেশন হইবে। তাহাতে যোগ দিবার নিমিত্ত সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ কয়েক জন দণ্ডিত "বিদ্রোহী"কেও তাহার আলোচনায় যোগ দিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে। ঠিকই করা হইয়াছে। ওআর্কিং কমীটির প্রধান বিচার্য্য বিষয় বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ গবন্মে‍ণ্টের প্রতি কংগ্রেসের মনের ভাব ও ব্যবহার কি প্রকার হইবে। কংগ্রেস যদি গবন্মে‍ণ্টের সহযোগিতা করিতে রাজী হন, তাহা হইলে তাহা সর্ত্তহীন সহযোগিতা বা বিশেষ কোন সর্ত্তসাপেক্ষ সহযোগিতা হইবে, তাহাও সম্ভবতঃ আলোচিত হইবে।

আমাদের নিজের স্পষ্ট মত এই যে, এই যুদ্ধে আমরা

পোল্যাণ্ডের জয় ও জার্মেনীর পরাজয় চাই। ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের পক্ষে লড়িতেছে বলিয়া ব্রিটেনেরও জয় চাই।

—

ব্রিটেনকে সাহায্যদান

ব্রিটেন ভারতবর্ষের কাছে কি সাহায্য চান? যুদ্ধে প্রধানতঃ আবশ্যক হয় যোদ্ধা, অস্ত্রশস্ত্র ও নানা সামগ্রী কিনিবার টাকা, কিংবা ঐসব জিনিষ। সমর্থ বয়সের অধিকাংশ ভারতীয় পুরুষ অস্ত্রহীন এবং যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানে না। সুতরাং এ-রকম লোকদের মধ্য হইতে হঠাৎ সঙ্কটে যোদ্ধা পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? ব্রিটেন অবশ্য টাকা চান বটে; তাহা পাইবেন।

ন্যায়যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্য করিতে আপত্তি করা কাহারও উচিত নহে; কিন্তু তাহা সর্ত্তহীন বা সর্ত্তসাপেক্ষ সাহায্য হইবে, তাহা বিচার্য্য।

—

হিন্দুমহাসভার ওআর্কিং কমীটির অধিবেশন

যুদ্ধের সময় হিন্দুদের কর্ত্তব্য নিরূপণের নিমিত্ত হিন্দু-মহাসভার ওআর্কিং কমীটির অধিবেশন হইতেছে। তাহাতে যোগ দিবার নিমিত্ত কয়েক জন হিন্দু নেতা বাংলা দেশ হইতেও যাইতেছেন। তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তাঁহারা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় সফর আরম্ভ করিবেন। আশা করি কমীটির সভ্যেরা, অন্ততঃ বাঙালী সভ্যেরা, স্পষ্ট করিয়া ইহা জানাইবেন যে, হিন্দুদের আন্তরিক সহযোগিতা সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার উচ্ছেদের উপর নির্ভর করে।

—

বিনাসর্ত্তে ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতা

যাঁহারা বিনাসর্ত্তে ব্রিটেনের সহযোগিতা করিতে বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে দুই-একটি কথা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যখন শান্তি বিরাজ করে, সঙ্কটকালের কল্পনাও মনে আসে না, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যোপাসকেরা ভারতীয়দের মুখে সর্ত্তের কথা শুনিতে রাজী হন না। অতএব, অ-সঙ্কটের সময় সর্ত্তের কথা অনুত্থাপ্য। এখন বলা হইতেছে, সঙ্কটের সময়ে অনুত্থাপ্য। তাহা হইলে উত্থাপ্য কখন?

ইহা রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নের মত। মন্ত্রীরা রাজ-বন্দীদিগকে বলেন, "তোমাদের উপবাসের সময় তোমাদিগকে মুক্তি দিবার প্রশ্ন বিবেচিতই হইতে পারে না।" তাহারা উপবাস ভঙ্গ করিলে বলেন, "আরে, তোমাদিগকে কে বলিয়াছিল তোমরা খাইতে আরম্ভ করিলেই তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?"

—

পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন

বঙ্গের বাহিরে কোন কোন প্রদেশে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন হইতেছে। বঙ্গেও হওয়া উচিত।

—

সিন্ধুর ও বঙ্গের মুসলমান মন্ত্রী

সিন্ধুদেশ মুসলমানপ্রধান দেশ। সেখানে করাচী মিউনিসিপালিটিতে আলাদা আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে সম্মিলিত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলাও মুসলমানপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে!

—

বর্ত্তমান সঙ্কটে ভারতের ও ব্রিটেনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে য়ুনাইটেড প্রেস প্রচার করিয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "যুদ্ধ ও ভারতের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

"এই মহাসঙ্কটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্যতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যাণ্ডের সপক্ষে। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের যে সর্ব্বনাশী নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবে। নিজের দেশের স্বার্থের জন্যও কোন ভারতীয় এইরূপ কামনা করিবে না যে, ইংলণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হউক। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথে বাধা পড়িবে। তখন নূতন বৈদেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষকে যদি অন্যান্য দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে হইবে।

ভারতবর্ষ একান্ত অসহায়ভাবে নিরস্ত্র এবং সামরিক শিক্ষাবিহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ইহাই আজ ভারতীয় জীবনের অন্যতম সাতিশয় দুঃখকর অবস্থা। সুতরাং জাতি ধর্ম্ম ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে দেশের যুবকগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গলার জন্য একটি নিজস্ব পৌরসেনা-বিভাগ (militia) গঠন করিতে হইবে। সকলকেই, কথায় নহে, কার্য্যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে, তাহারা, যেমন অন্যদের, সেইরূপ তাহাদের নিজের দেশ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।

এই সঙ্কটকালে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলেই বাঙ্গলার হিন্দুগণ তাহাদের জন্মভূমিতেই দাস-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। দেশের সর্ব্বস্থান হইতে তাহারা সমস্বরে ন্যায়বিচার দাবী করিতেছে। ব্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক্ হইতে নূতন ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা নাই। যে জাতি পরাধীন, সে জাতি যদি একথা বুঝিতে না পারে যে, যুদ্ধ করিলে তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোনও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে আগ্রহবোধ করা স্বাভাবিক নহে। আমরা দর-কষাকষির হীন মনোভাব লইয়া অথবা যে সময়ে ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সময়ে বাদানুবাদ সৃষ্টির জন্য এই কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমরা এই কথা মনে করি যে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের পক্ষে কোনওরূপ সঙ্কোচ না রাখিয়া পরস্পরের মনোভাব অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যখন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার, প্রতি ন্যায় বিচারের কথা বলি, তখন আমরা এই কথাই বলি যে, আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড যে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, উহা রক্ষার নিমিত্ত আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ।

গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্ব-সাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।"

সমগ্র জগৎ ও ভারতের অবগতির নিমিত্ত মূল বিবৃতিটি ইংরেজীতে লিখিত। উপরে তাহার বাংলা তর্জমা দেওয়া হইল।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আমরা বিবিধ প্রসঙ্গে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাঙালী হিন্দুদের মনের ভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, এই বিবৃতিটিতেও সেইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

—

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি জীবনের দীর্ঘ কাল আমেরিকায় ও ইয়োরোপে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি কয়েক বৎসর এদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার মৃত্যুতে এক জন খ্যাতনামা ধর্ম্মোপদেষ্টার তিরোভাব ঘটিল।

—

পোল্যাণ্ডের জয়ে মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস

পোল্যাণ্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মঃ পাডেরেওস্কির পত্রোত্তরে মহাত্মা গান্ধী পোল্যাণ্ডের প্রতি সমবেদনা ও শেষ পর্য্যন্ত তাহার জয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন।

—

বিষ্ণুপুর কটন মিল্‌স্

বিষ্ণুপুরের সুতা ও কাপড়ের কল

বাংলা দেশে যত সুতা ও কাপড় বিক্রী হয়, তাহার অধিকাংশ তাহার বাহির হইতে আসে—কতক ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি বিদেশ হইতে, কতক ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে। বাঙালীর আবশ্যক সব সুতা ও কাপড়ই কিন্তু বঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা করিতে হইলে বাঙালীদের আরও অনেকগুলি সুতা ও কাপড়ের কল চাই। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরে এই জন্য একটি কারখানা নির্মিত হইতেছে।

ইহার কাজ যথাসম্ভব দ্রুত করা হইতেছে। গত ১৭ই এপ্রিল ইহা রেজিষ্টারী করা হয়। ১৯শে জুন ইহার পাকা কারখানা বাড়ীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্বেই ইট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত যথেষ্ট শেয়ারের টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কড়ি থাম প্রভৃতি সব লোহার জিনিষ টাটা কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং কতক বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহা ঠিক্‌মত ও যথাস্থানে লাগাইবার নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক তাহা বিষ্ণুপুরেরই লৌহশিল্পীরা করিতেছেন। বিষ্ণুপুরের শিল্পীরাই জ্যাকার্ড মেশিন ও তাঁত তৈয়ার করিবেন। বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট রেশমী শাড়ীর নানা রকম সুন্দর পাড় এই শিল্পীদের নির্ম্মিত জ্যাকার্ড তাঁতেও প্রস্তুত হইতেছে। অন্য সমুদয় বহুমূল্য যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে এবং বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র অনেক তাঁতীর বাস। তাঁহাদের হাতের তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য ভাল সুতা তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে পাইলে তাঁহাদের কৌলিক ব্যবসা ও রোজগার রক্ষা পাইতে পারে এবং দেশের কাপড়ের অভাবও কতকটা মোচন করা যাইতে পারে। এই জন্য এই তন্তুবায়-দিগকে ন্যায্য মূল্যে সুতা জোগাইবার চেষ্টা বিষ্ণুপুর কটন মিল্‌স্ করিবে।

সুতা ও কাপড়ের কলের জন্য বাংলা দেশকে অধিকাংশ তুলা বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। ইহাতে খরচ বেশী পড়ে। অথচ বাংলা দেশের অনেক জেলায় ভাল কাপাসের চাষ হইতে পারে। বাঁকুড়া সেইরূপ একটি জেলা। বিষ্ণুপুর কটন মিল্‌স্ কাপাসের চাষের উপযোগী ছয় শত বিঘা জমি খরিদ করিয়াছেন এবং অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দালাল আরও সাত শত বিঘা জমি মিলকে দান করিয়াছেন। কাপাসের চাষের উপযোগী আরও জমি লইবার চেষ্টা হইতেছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা এই মিলের টাকু ও তাঁতগুলি চালান হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা এরূপ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, মিলের প্রয়োজনসিদ্ধি ছাড়া কুটীরশিল্পের তন্তুবায়দিগকেও যাহাতে তাহা দেওয়া যায়।

বাঙালীর মিলের ও হাতের তাঁতের কাপড়

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে বহু লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রী হইবে। এই সময়ে বাঙালীদের মিলের ও বাঙালী তাঁতীদের হাতের তাঁতের কাপড় কেনা বাঙালীদের একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙালী বস্ত্রব্যবসায়ীদের এখন (এবং অন্য সময়েও) বাঙালীদের হাতের তাঁতের ও বাঙালীদের মিলের কাপড়ই বিক্রী করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

বাংলা দেশে মিহি সুতার উৎকৃষ্ট ধুতি ও শাড়ী এখন কয়েক জায়গায় হয়। এগুলি বঙ্গের এক প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা। যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের এই সব কাপড় কেনা নিশ্চয়ই উচিত। এগুলি ছাড়া অপেক্ষাকৃত অল্প দামের টেকসই সাধারণ ধুতি শাড়ীও বাংলা দেশে হাতের তাঁতে তৈরি হয়। যাঁহারা ধনী নহেন তাঁহারাও এই রকম কাপড় কিনিতে সমর্থ।

—

বাঙালী রেজিমেণ্ট

বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠন করিবার চেষ্টার আমরা সমর্থন করি। কতকগুলি বাঙালী এতদ্দ্বারা যুদ্ধক্ষম হইবে এবং আঘাত ও মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিবে। ইহাতে বেকার-সমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধান হইবে। পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করা কর্ত্তব্যও বটে। অবশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হইতে পারে বটে; কিন্তু সে মৃত্যু অনাহারে মৃত্যু বা আত্মহত্যা নহে, মানুষের মত মৃত্যু।

—

মান্দ্রাজে মন্দির-প্রবেশ আইন

হিন্দুসমাজের যে-সকল জাতির লোককে মান্দ্রাজে সাধারণতঃ মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, তাহাদিগকে মন্দিরে-প্রবেশের অধিকার দিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক-সভায় যে বিল পাস হইয়াছে, তাহা বড়লাটের সম্মতি লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্টের ইহা একটি সুকীর্ত্তি।

বঙ্গীয় তাঁতশিল্প প্রদর্শনী

বঙ্গীয় বয়নশিল্প সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার ওএলিংটন স্কোয়্যারের সম্মুখে বাংলার হাতের তাঁতের কাপড়ের অতি আবশ্যক প্রদর্শনী গত ২০শে ভাদ্র খোলা হয়। ইহা দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। আচার্য্য রায় ইহার দ্বারমোচন করেন। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের নেতা ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বহু তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ একটি ভাষণ পাঠ করেন। আচার্য্য রায় এবং অন্য অনেকে বক্তৃতা করেন। ডক্টর লাহা অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

বাংলা দেশে ৮৮ কোটি গজ কাপড়ের দরকার, তাহার সিকি ভাগ তাঁতে তৈয়ার হয়। বাংলার জন-সংখ্যার শতকরা ৯৩ জন গ্রামে বাস করে। সুতরাং পল্লীবেষ্টনের মধ্যে তাঁতশিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। বিদেশী সুতার উপর শুল্ক বসাইয়া প্রতিযোগিতা রোধ করিতে হইবে। জাপানের মত এদেশের বয়ন-শিল্পেও বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কম খরচে বেশী মাল তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাড়ের নূতন নূতন ডিজাইনের জন্য গ্রাম্য শিল্পীরা যাহাতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উন্নত ধরণের তাঁতের সাহায্যে বয়ন-শিল্পীরা মাসে ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেছে। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বাজারে মাল যোগানের অসুবিধা দূর হইতে পারে। মিলের পাশে বয়ন-শিল্প সগৌরবে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হউক—ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

বাংলার হাতের তাঁতের শিল্প সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়।

—

স্বদেশ কোথায় ?

ইংরেজ যোদ্ধা কবি রুপার্ট ব্রুকের বিদেশে রণক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। তিনি "দি সোল্‌জার" নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন :—

"If I should die, think only this of me,
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England."

"যদি আমি মরি, আমার সম্বন্ধে শুধু এই ভাবিও,
একটা বিদেশী ক্ষেত্রের এমন একটা কোণ আছে
যাহা চিরতরে ইংলণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ কোন দেশের মানুষ মানুষের মত নিজের কর্ত্তব্য করিতে গিয়া যেখানে দেহরক্ষা করে, তাহা বিদেশ হইলেও তাহা তাহার স্বদেশে পরিণত হয়।

[২৩শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর "বিবিধপ্রসঙ্গ" সমাপ্ত।]

বাঙালীর ধান্যলক্ষ্মী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

গুণরাজ খাঁ লক্ষ্মীচরিত্র লিখিয়াছিলেন। লক্ষ্মীচরিত্রে পতিব্রতা-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। লক্ষ্মীপূজা ধান্যের পূজা। এই পূজা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলার স্ত্রীলোকগণ লক্ষ্মী। বাঙ্গালীর আর এক লক্ষ্মী—অর্থ। যাঁহাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা আছে, তাঁহাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীর হাঁড়ি আছে। এই হাঁড়িতে ধান্য আছে, অর্থকড়িও আছে। পূর্ব্বে ধান্য বিনা বাঙালীর সংসার চলিত না। আজকাল অর্থ বিনা সংসার চলে না। যাঁহাদের ধান্য আছে, তাঁহাদিগকে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। ধান্যের মর্য্যাদা গৃহিণীদের কাছে। আজকালকার গৃহিণীরা ধান্য মাপিতে জানেন না। ধান্যের ধূলায় তাঁহাদের দেহ মলিন হয়। ধান সিদ্ধ, ধান ভানার কথা মুখে আনিলাম না। কোনও কর্ত্তা গৃহে উল্লেখ করিয়া দেখিতে পারেন। আজকাল অর্থেরও দুর্ভিক্ষ। ধান্যের সুভিক্ষের কথাও শুনিতে পাই না। আজকাল দেবতা নাকি সুবৃষ্টি দেন না। অর্থের সুভিক্ষ হইলেও বাঙালী অর্থ খাইয়া বাঁচিবে না। ঢেঁকিছাটা চাউল আজকাল বাঙালীর কল্পনার বস্তু হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কোনও নাটক-নভেল রচিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। আজকাল বাংলার স্কুলে পাঠশালায় ধান্যের হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয় না। শুভঙ্করের ধান্যের লেখা শুভঙ্করীতে নাই। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক জমিজমার উৎপন্নভোগী ছিলেন। এখন তাঁহাদের পেশা হইয়াছে—চাকরি আদি। মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক মাত্রেরই এখনও কিছু-না-কিছু জমিজমা আছে। তবুও সকলেই মরিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের উচ্চশিক্ষিত ছেলে কেহ পাগল হইয়া যাইতেছে—কেহ আত্মহত্যা করিতেছে। একটা সংসারের সারা বৎসর ভাত মুড়ি চলিয়া যাইবার জন্য যতখানি জমির দরকার তাহা অপেক্ষা অনেকের অনেক বেশী পরিমাণ জমি আছে। অবশ্য পশ্চিম-বঙ্গের কথা বলিতেছি। এই সব জমি হইতে সত্যই তাঁহারা কিছু পান না। বাংলার চাষী-সম্প্রদায় এখন আর চাষ করে না। এখন যাহারা চাষ করে তাহারাই চাষী, অর্থাৎ কুলিমজুরেরা। পূর্ব্বে বাংলার জমিতে যে-পরিমাণ ধান্য জন্মিত, এখন তাহার অর্দ্ধেকও জন্মে না। সুবৃষ্টি হইলেও না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া এ-কথা বলিতেছি। সময়োপযোগী বৃষ্টির অভাব পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। জমির সংস্থান দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিম-বঙ্গে ধান্যের ক্ষেত্রে এখনও অসংখ্য পুকুর এবং খাল দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মজিয়া গিয়া জমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল পুকুরে বা খালে যত জল ধরিত এখন তাহার সিকিও ধরে না। অনেক জমি অনেক পুকুরের জলস্বত্ হারাইয়াছে। জমির অধিকারিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরের জমিতে (স্বত্ব থাকিলেও) জোর করিয়া জলসেক করিতে দেন না। ডাক-পুরুষ পুকুর মুয়ানে জমি ক্রয় করিতে বলিয়াছেন। কালিদাস যে-বৎসর মেঘদূত লিখিয়াছিলেন, সে-বৎসর হয়ত ১লা আষাঢ় বাদল হইয়াছিল। এখনও কোন কোন বৎসর আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বর্ষা নামে। পূর্ব্বে সংসারনির্ব্বাহে ধান্যের প্রয়োজন হইত। ভূমধ্যকারিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি নিজ-চাষে রাখিতেন। জমি সব প্রচুর পরিমাণে সার পাইত। এখন অধিকাংশ জমিতেই ভাগে চাষ। সারাল জমিতে ভাদ্র মাসে ধান্য রোপণ করিলেও ধান আসে। সারবিহীন জমিতে আষাঢ়ে আবাদ হইলেও ধান আনিতে পারা যায় না। সারবিহীন জমিতে উৎপন্ন ধান্যের অন্ন সুস্বাদুও হয় না। জমি ভাগচাষে থাকিলে ভূম্যধিকারিগণ জমিতে সার দিতে পারেন না। তাঁহাদের সমূহ লোকসান।

পূর্ব্বে ভাগচাষীর জমিতে সার দিবার নিয়ম ছিল কিনা বলিতে পারি না। জমিতে সার দিলেও, এবং সময়োপযোগী বৃষ্টি হইলেও ধান্য আপনা হইতে আসে না। ধান্যকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়। ধান্যের চাষ করিতে হইলে প্রাকৃত অপ্রাকৃত নানারূপ জ্ঞান থাকা দরকার। বাঙালীর অন্নাভাব হইতে পারে না। এক বৎসর চার পোয়া ধান্য জন্মাইতে পারিলে চারি বৎসর ধান্য না জন্মিলেও চলিয়া যায়। পূর্ব্বে ধান্য সঞ্চয়ের বিধি ছিল। বাঙালীরা সযত্নে ধান্য রক্ষা করিতেন। বিশেষ বিশেষ মাসে, বিশেষ প্রয়োজনেও ধান্য খরচ করিতেন না। ধান্য বৃদ্ধি দিবার ব্যবস্থা ছিল। ধান্যলক্ষ্মী হইতেই তাঁহারা অর্থলক্ষ্মী এবং নারীলক্ষ্মী লাভ করিতেন। গো-জাতিকে সেকালের বাঙালী গৃহলক্ষ্মীদের পর্য্যায়ে ফেলিতে সাহস পান নাই। গরু ভগবতী। লক্ষ্মী ভগবতীর কন্যা। ভগবতীর কৃপা না হইলে ধান্যলক্ষ্মী লাভ হয় না। সেকালের গৃহলক্ষ্মীগণ গরুর সেবা করিতেন। নিজ হস্তে গোশালা মার্জ্জনা করিতেন। মেয়েছেলেরা দুগ্ধ দোহন করিত। কবিচন্দ্র 'কপিলা মঙ্গল' লিখিয়াছিলেন। সে পুস্তক শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গের গৃহে গৃহে পাঠ হইত। প্রকৃত পল্লীবাসীর এখনও ধান্য বিনা সংসার চলে না। পল্লী-গ্রামের মুদীকে এখনও ধান্যমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়। পল্লীগ্রামের মজুরেরা এখনও তিন পাই বেরুণে সারাদিন গতর খাটায়। ধান্যলক্ষ্মী অকর্ম্মাকে কর্ম্মী করেন। ধান্যলক্ষ্মী গৃহস্থ সৃষ্টি করেন। ধান্যলক্ষ্মী পল্লী রচনা করেন। এখনকার পল্লী-সংস্কার, পল্লীবাসের অর্থ পল্লীকে শহরে পরিণত করা। আধুনিক উপায়ে সংস্কৃত কোনও পল্লীবাসী যদি ধান্যলক্ষ্মীর সেবক হইতে চান, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন—তাঁহার গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারেও কতখানি ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন সেকালের বাঙালীকে গৃহরচনা করাইত। এখনকার বাঙালী গৃহরচনা করিয়া নানা প্রয়োজনের সৃষ্টি করেন। জমি-জায়গা দেখিয়া আজকাল আমরা কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে চাই। কন্যার গুণপনার পরিচয় দিতে গিয়া বলি —নাচতে জানে, গাইতে জানে, ইংরেজী লেখাপড়া জানে ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর কন্যাগণকে ধান্য সম্বন্ধীয় নানারূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিতে সামান্য মাত্র বুদ্ধির প্রয়োজন। ইহাতে পরিশ্রম কিছুই নাই। অবশ্য যে-পরিশ্রম সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে আজকাল বাংলার গৃহলক্ষ্মীগণকে করিতে হয় তাহার তুলনায়। এত করিয়াও গৃহলক্ষ্মীরা সকালবেলায় কচি কচি পুত্রকন্যার মুখে চারিটি মুড়ি দিতে পারেন না। এমনি দুর্দ্দশা। বাংলার বিধবাদের দুরবস্থার সীমা-পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে ভাচাভানা অন্তঃপুরিকাগণের একটা লাভজনক ব্যবসা ছিল। শুভঙ্করের ভাচাধান্য খুয়া দিবার আর্য্যা আছে। বিজ্ঞানের কৃপায় এখন ঐ ব্যবসা লুপ্ত হইয়াছে।

লক্ষ্মী বাঙালীকে ছাড়ে নাই। বাঙালী লক্ষ্মীকে ছাড়িয়াছে। খুব কম দিনের মধ্যেই বাঙালীর শিক্ষিত ছেলেদিগকে বাধ্য হইয়া চাষে নামিতে হইবে। বাধ্য হইয়া—কারণ যাঁহাদের জমি আছে তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভাগচাষী লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর আর এরূপ ভাগচাষীও মিলিবে না। এখনই মিলিতেছে না। বর্ষা চলিয়া যাইবে—জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে, ইহা কোনও ভূম্যধিকারীর পক্ষেই সহনীয় হইবে না। যাঁহাদের জমি নাই, এরূপ শিক্ষিত বেকারগণকেও চাষে নামিতে হইবে। অল্পকালমধ্যে তাঁহারা ধান্যের চাষে লাভ দেখিতে পাইবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদিগের জমি তাঁহারা ভাগে চাষ করিতে পাইবেন। মনে করিতাম ধান্যের চাষ খুব সহজ। কাজেকর্ম্মে দেখিতেছি ইহা সবচেয়ে কঠিন।

আবর্ত্ত—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতীভবন, কলিকাতা।

মাটির তলায় যে জলের ধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে বয়ে চলেছে সে-ধারা যখন ধরণীর উপরে আত্মপ্রকাশ করে তখন তার গতিতে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। উচ্ছল ঘাত-প্রতিঘাত ও অশান্ত সংঘাত তার বৈশিষ্ট্য। তারপর একদিন সে-ধারা আপনার তল খুঁজে পায়, তখন তার গতিবেগ শান্ত হয়ে আসে, স্তব্ধ গভীরতার মধ্যে নদী পরিপূর্ণতা লাভ করে।

'অন্তঃশীলা'র মধ্যে যে ঘটনাধারার সৃষ্টি হয়েছিল, 'আবর্ত্তে' সেই ধারা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসে পৌছেছে। অন্তঃশীলায় আমরা খগেন্দ্রের অন্তর্মুখী মনের পরিচয় পেয়েছি, যে মন ভাবজগৎ সৃষ্টি ক'রে কল্পনা-বিলাসে আত্মহারা হয়ে থাকে, যে-মন নিজেকে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে চায়। সে-মন পরিপূর্ণতার উপলব্ধি করতে পারে না। তাকে বাহিরে আসতে হবে, উদারতর জগতে মুক্তি খুঁজতে হবে। আবর্ত্তে খগেন্দ্রের জীবনের সেই পর্য্যায়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'ল। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে তার মনে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে, কথাশিল্পী সুনিপুণ হস্তে তারই ছবি এখানে এঁকেছেন। এ-ছবি স্বয়ং-সম্পূর্ণ; সুতরাং সেই হিসাবে 'আবর্ত্ত' একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু তাহলেও খগেন্দ্রের মনের মুক্তির কাহিনী এখানে শেষ হয় নি, হ'তে পারেও না। জানি না, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সে-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন কিনা, কিন্তু তার অপেক্ষায় আমরা থাকব।

পদ্মরাগ বুদ্ধ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক এস, সি, সরকার কলিকাতা।

বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষ হ'তে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহ ক'রে আনেন; তার ভিতরে অফুরন্ত গুপ্তধন ও পদ্মরাগমণির তৈয়ারী বুদ্ধের সন্ধান ছিল। সেই গুপ্তধনের সন্ধানে যে রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর সৃষ্টি হ'ল তাকে অবলম্বন ক'রে সুনিপুণ কথাশিল্পী যে বিচিত্র কাহিনী রচনা করেছেন তা যে কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত-আকর্ষণ করবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা হেমেন্দ্র কুমারের সৃষ্ট ডিটেকটিভ জয়ন্তের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এই উপন্যাসটিতে জয়ন্তের তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একবার পরিচয় পাবেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৫৯ দাম বার আনা।

১৯০৪ সালে উদ্বোধন পত্রিকায়, "তিব্বতে তিন বৎসর" শীর্ষক স্বামী অখণ্ডানন্দের যে নিবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমানে এই নামে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮৭ সালে পদব্রজে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া হৃষীকেশ লছমনঝোলা হইয়া তিনি দেরাদুনে উপস্থিত হন। সেখান হইতে মুসৌরী হইয়া টিহরী যান, পরে ধরাসুর পথে জামদগ্নি মোকাম হইয়া যমুনোত্তরী দর্শন করেন। তার পর ওখান হইতে উত্তর-কাশী হইয়া গঙ্গোত্তরী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে আবার টিহরীতে ফিরিতে হইয়াছিল, পার্ব্বত্য জঙ্গলে অতি প্রাচীন এক মহাপীঠে চন্দ্রবদনী দেবী দর্শনের জন্য। পরে সেখান হইতে সাধারণ পথে শ্রীনগর হইয়া রুদ্রপ্রয়াগে আসেন। পরে গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী নারায়ণ, শেষে গৌরীকুণ্ড হইয়া কেদারনাথে উপস্থিত হইলেন। এইখানেই গ্রন্থ শেষ। ইহার অধিক আর তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যদি পারিতেন তাহা হইলে আমরা হিমালয়ের আরও অনেক কিছুই, যেমন বদরিকাশ্রমের কথা, এবং যোশীমঠ হইয়া নিতির পথে তিনি যে তিব্বতে গিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিতাম যাহা তাঁহার মুখে অনেকেই তাঁহার জীবিতকালে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

বুদ্‌বুদ্—শ্রী অসিতকুমার হালদার। শ্রীঅভিজিৎকুমার হালদার কর্ত্তৃক বাদশাবাগ লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ওমর খৈয়ামের ছন্দে রচিত এই ছন্দ-স্ফুলিঙ্গগুলিতে উচ্ছ্বাসের অনুপাতে রোশনাই অনেক কম। তাহার প্রতি লেখকের আন্তরিক সততার পরিচয়ও সর্ব্বদা পাওয়া যায় না:

"তাইত এমন পরাণ সবার
যাবার বেলা তাই কাঁদে"
"ফিরচি মোরা পথে পথে
আপন পথে পথহারা"

ইত্যাদি বহু পংক্তিতে শব্দের নিরর্থক পুনরাবৃত্তি কানকে পীড়া দেয়।

ভাব ও কল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বলিতে হয় পুস্তিকাখানি ওমর খৈয়ামি অজ্ঞেয়তাবাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণের চেষ্টামাত্র। দেশীয় উপমার ও চিত্রের ইতস্তত রঙীন প্রলেপ ইহাতে না থাকিলে একটি ক্ষণভঙ্গুর লঘু বুদ্‌বুদের মূল্যমাত্রও ইহার থাকিত কি না সন্দেহ।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রীঅনিল-বরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গীতা-প্রচার কার্য্যালয়, ১০৮।১১ মনোহর-পুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৬০। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

এই গীতায় প্রত্যেক শ্লোকের প্রথমে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং তৎপরে বাংলা ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দের গীতাবিষয়ক প্রবন্ধাবলনে লিখিত।

শঙ্কর-ভাষ্যে জ্ঞানযোগেরই প্রাধান্য; কর্ম্মের চেয়ে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের উপর শঙ্করের ঝোঁক বেশী। অপর দিকে বালগঙ্গাধর তিলকের মতে কর্ম্মযোগের উপদেশই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। লেখক এই দুটি মতের কোনটিই সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে কর্ম্মযোগ,

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ পরস্পর সুসম্বদ্ধ; একটির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অপর দুইটিকে নিম্নে স্থান দেওয়া গীতাকারের নির্দ্দেশ নহে।

পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

সপ্তক—শ্রীসরযূলাল বসু প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সাতটি গল্প এই বইখানিতে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি পূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ গল্পই আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের গল্প। লেখকের এই জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাই গল্পগুলিও ভাল হইয়াছে। 'ছাড়াছাড়ি', 'বেকার' ও 'কেরাণী' এই তিনটি গল্প আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। 'বাঙালের দৌরাত্ম্যে'র মধ্যে কৌতুকহাস্যও বেশ লাগিল। 'নীলকুঠি' গল্পটি বড় thin, তবে আবহাওয়া বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। 'মরা নদী'কে ঠিক গল্প বলা চলে না; তাহার মধ্যে করুণ কাব্যাংশ একটি সুর জাগাইলেও কাব্যাংশ প্রবল বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর বইখানির মধ্যে লেখকের শক্তির পরিচয় আভাস দিতেছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ কামনা করি।

সুরহারা বাঁশী—শ্রীঅমিয়া সেন। পৃ. ১০৪, মূল্য এক টাকা। আর্য্য পাবলিশিং কোং, কলিকাতা।

একটি বন্ধ্যা রমণীর বেদনাকে অবলম্বন করিয়া ছোট উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। বন্ধ্যা মেয়েটির জীবনের গোপন বেদনা, তাহার সে বেদনা দূর করিবার জন্য তাহার স্বামীর ভালবাসার ব্যাকুলতা, অপর দিকে বন্ধ্যাত্বের জন্য শাশুড়ীর বিরূপতা, এই লইয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রটি লেখিকা দরদ দিয়া লিখিয়াছেন। কৃতী স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা সংসারের প্রাচুর্য্য কিছুতেই মেয়েটির দুঃখ ঘুচাইতে পারিল না; পরিশেষে তাহার মনের দুঃখ ব্যাধির আকারে তাহাকে আক্রমণ করিল। পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। লেখিকার প্রথম বইখানি পড়িয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। তাঁহার ভাষা মিষ্ট, গল্প বলিবার শক্তি আরও ভাল।

বাণীর দেউলে—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশক এস. কে, বিশ্বাস, ৪০ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মানকুমারী, নজরুল ইসলাম, বঙ্গবাণীর এই দশ জন মহাসাধক ও সাধকগণের জীবনকথা ও প্রতিভার পরিচয় স্বতন্ত্র ভাবে দশটি প্রবন্ধে লেখক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের সাহিত্যে নিষ্ঠা ও রসবোধ আছে এবং সাহিত্যিকগণের প্রতি শ্রদ্ধা গভীর। আলোচনায় সর্ব্বক্ষেত্রে লেখকের মতামতের সহিত একমত হইতে পারি নাই, তবুও প্রবন্ধগুলি ভাল লাগিয়াছে। এই ধারার বইয়ের প্রয়োজন আছে। বাংলা সাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রথম যাঁহারা প্রবেশে উৎসুক এ-বইখানি হইতে তাঁহারা উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

অন্ধের বাঁশী—শ্রীলাবণ্যকুমার চৌধুরী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। পৃ. ১৪৮, মূল্য এক টাকা চার আনা।

দুই জন প্রণয়ী এবং এক জন নারী এই সনাতন ত্রয়ীকে লইয়া। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে প্রণয়ীদের এক জন অন্ধ সুরশিল্পী। একটি তরুণ ও তরুণীতে যখন জীবনপথে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার আয়োজন করিতেছে, সেই সময়ে কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল গানের সুর। তরুণী মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার আয়োজনরত হাত শিথিল হইল। তার পর দেখা দিল অন্ধ গায়ক। এইখান হইতে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কিন্তু সে দ্বন্দ্বে তরুণী জয়লাভ করিল, তাহার মনোদেবতার নির্দ্দেশকেই সে মাথায় করিল, সে বরণ করিল অন্ধকে। শেষে নিয়তির বিচিত্র নিষ্ঠুর পরিহাস অন্ধ শিল্পী বৈদেশিক চিকিৎসায় দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া যখন তরুণীর কাছে ফিরিল, তখন তরুণীটি দৃষ্টি হারাইয়া বসিয়া আছে। গল্পাংশ সুন্দর, এবং স্বাভাবিক গতিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে। তবে শেষাংশটি নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে।

এইখানিই বোধ হয় লেখকের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। সে হিসাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ আছে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কশ্যপ ও সুরভী—শ্রীজগদীশ গুপ্ত। অন্নদা সাহিত্যভবন, কুষ্টিয়া। মূল্য এক টাকা পাঁচ আনা।

কবিতার বই—কিন্তু ভীত হইবার কারণ নাই—ইহা কাব্য নয় গদ্যকাব্য নয়, নিছক গল্পকাব্য—অচ্যুতানন্দ নামে এক ব্যক্তির জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী।

এক দল আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই; কথাটা মর্ম্মান্তিক ভাবে সত্য; তাঁহাদের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যলক্ষ্মী কাহারও প্রভাব নাই।

জগদীশ বাবুর কাব্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই—তবে কাব্যলক্ষ্মীর লঘু করস্পর্শ আছে। কাহিনীগুলি পড়িতে পড়িতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই জাতীয় কাহিনীকাব্যের কথা মনে পড়ে।

বিষয়োপযোগী ভাষা ও ছন্দ; জীবনের আটপৌরে অভিজ্ঞতার উপযুক্ত অত্যন্ত সাদাসিদে ভাষা—আর ছন্দও অনুরূপ; জীবনের যে সুরকে গদ্যময় বলা চলে—এই ছন্দ তাহারই বাহন; গদ্যের স্বাভাবিকতার সঙ্গে কাব্যের চমৎকারের অঙ্গাঙ্গী মিলন—ইহাকেই প্রকৃত গদ্য ছন্দ বলা উচিত। পড়িলে আনন্দ পাইবার কথা—তবে বাঙালী পাঠকের সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার সাহস আমার নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হরিদ্বার, কুম্ভমেলা, সাধুসঙ্গ ও মহাত্মাদিগের উপদেশ—শ্রীগোবিন্দশঙ্কর সর্ব্বাধ্যক্ষ। প্রকাশক দি মডার্ণ প্রিণ্টার্স, কদমতলা, জলপাইগুড়ি। মূল্য দেড় টাকা। পৃ. ৬০+১১৮

বইখানিতে হরিদ্বারের তীর্থযাত্রীদের উপযোগী অনেক দরকারী সংবাদ আছে। তাহা ছাড়া লেখক বহু সাধুসন্ন্যাসীকে যে-ভাবে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহাদের নিকট যে-সকল উপদেশলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনীও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভক্ত পাঠকবৃন্দ এবং হরিদ্বার-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণের পক্ষে ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র প্রণীত এবং কলিকাতা ৫৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

যে মনোভাব পাশ্চাত্যের অনুকরণে হিন্দু সমাজে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনিতে চায়, গ্রন্থকার সেই মনোভাবের বিরোধী। রক্ষণশীল মনোবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও আলোচনা সুচিন্তিত এবং রচনা যুক্তিবহুল। গ্রন্থকার তাঁহার বিষয়বস্তু নিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছেন এবং সমর্থনে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌গণের পুস্তক হইতে বহু যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থে উনিশটি প্রবন্ধ এবং পরিশিষ্টে তিনটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থকার প্রাচীনপন্থী। একটি মনোগত আদর্শের ছাঁচে প্রাচীন সমাজকে রূপায়িত করিয়া লেখক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের দোষ-ত্রুটির কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন সে সম্পর্কে কিছু বলিতেছি না, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু-সমাজ বলিতে কোন্ সমাজ বুঝায়? ইহা কি শতবর্ষ পূর্ব্বের সমাজ, বাদশাহী আমলের সমাজ, না হিন্দু-রাজত্বকালের সমাজ? হিন্দুত্বের একটি মূলধারা বর্ত্তমান আছে ইহা সত্য; কিন্তু সমাজের রূপের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন আমরা শত অথবা দ্বিশত বয ধরিয়া যে সমাজকে দেখিতেছি তাহা পৌরাণিক সমাজ নহে। পুরাণেও নানা কালের সমাজের নানা মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

বর্ত্তমানেও এক প্রদেশের সমাজের সহিত অন্য প্রদেশের সমাজের অনৈক্য অল্প নহে। গ্রন্থকার যৌথপরিবার, নারীর অধিকার ও বিবাহের বয়সের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দায়ভাগ-শাসিত বাংলার যৌথপরিবারের রূপ অবশিষ্ট ভারতের যৌথপরিবারের গঠন হইতে একান্ত স্বতন্ত্র। প্রাচীন সমাজের সহিত সেই সমাজের আচার, পদ্ধতি ও প্রথার একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। কালের বিবর্ত্তনে সমাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সমাজ নাই তাহার নিয়মে যে সমাজ বর্ত্তমান তাহার বিচার করিতে গেলে প্রতি পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। আজও কি বৈদিক সমাজ আছে, চতুর্ব্বর্ণ আছে, চারিটি আশ্রম আছে, আর্য্য রাজত্ব আছে, রাজসূয়-যজ্ঞ আছে? মুনির তপোবন কি দশ সহস্র শিষ্যের অধ্যয়নকোলাহলমুখর, কে এখন বেদপাঠ করে, কোন্ ঋষি মন্ত্র উচ্চারণ করে, কোন্ ক্ষত্রিয় আর্ত্তত্রাণের জন্য অস্ত্র ধারণ করে? তখন সালঙ্কারা কন্যা প্রদান চলিত, এখন বিবাহে যে পণপ্রথা প্রচলিত তাহা কি পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণের ফল? লেখক লিখিয়াছেন, পরাধীন অবস্থায় বিপ্লব যে সফল হইতে পারে না, তাহা তাঁহারা দেখেন না, তাহার উপর আমরা বহুধা বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে কি বিপ্লব স্বাধীন অবস্থার একটি পরিণতি? মনে রাখিতে হইবে, অনুকরণে কোন সমাজের সহজে পরিবর্ত্তন ঘটে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত সামাজিক পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সমাজের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক জীবন্ত ও অচ্ছেদ্যপ্রায়। সেই সম্পর্ক ছিন্ন হইলে সমাজ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। তার পর, সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। যে-সম্পর্ক পূর্ব্বে ছিল, সেকালে সেই সম্পর্কই ছিল সত্য। বর্ত্তমান সমাজের সহিত আধুনিক ব্যক্তির সম্পর্ক কি, তাহা পুনরায় নির্ণয় করিতে হইবে। বাস্তবকে অবহেলা করিয়া লাভ নাই। বহুধা-বিচ্ছিন্ন সমাজের বিচ্ছেদগুলি দূর করিতে হইবে। লেখক যাহা লইয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পরিমাপ করিয়াছেন, সেই পরিমাণ-দণ্ডটি এখন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কাজেই লেখকের বিচারফলের সহিত সকলে একমত হইবেন না। তৎসত্ত্বেও কুশলী তার্কিক হিসাবে লেখকের যুক্তিবিন্যাস প্রশংসার্হ। গ্রন্থখানি চিন্তার উদ্দীপক।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুভদৃষ্টি—শ্রীমমতা ঘোষ। প্রকাশক শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা, বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই, শেষের দিকের কয়েকটি কবিতা ছাড়া বাকী-গুলির বিষয় প্রেম। শুভদৃষ্টি দিয়া বইখানি সুরু করিয়া নানা প্রেমবৈচিত্র্য ও তাহার পরিণতির ভিতর দিয়া বইখানি শেষ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছাপ অনেকগুলি কবিতার উপর পড়িয়াছে। কবিতাগুলির ভাব মৌলিক না হইলেও মোটের উপর বেশ সুখপাঠ্য। ছন্দের বৈচিত্র্য আনিতে গিয়া কয়েকটি কবিতা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি কবিতা ভাল লাগিল। যেমন,

"অনেক দেরীতে—বহু প্রতীক্ষা-শেষে
বাসরঘরের উঠিল যে যবনিকা,
উগ্র মদিরা রক্তে আজিকে মেশে—
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণের পুলক লিখা।
বিগত দিনের রঙিন স্বপনরাজি
বহু বিলম্বে সফল হয়েছে আজি।"

অথবা,

"নবীন তুমি হে, তুমিই চিরন্তন,
উজ্জ্বল সাজে সেদিন ছিলে যে বর,
তোমার নয়নে মিলাইয়া দু'নয়ন
বধূ যে হলেম ভুলিয়া আত্মপর।
তোমারে পেয়েছি মাঝে আজি আপনার,
তব লাগি মোর উৎসবে অধিকার।"

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

সাহিত্য-কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, মূল্য আড়াই টাকা। পৃ. ৸৶০+২৯৯।

গত দশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে-সব সমস্যা লইয়া আলোচনা হইয়াছে, রসজ্ঞ ও রসানুসন্ধানী পাঠক-সমাজ যদি তাহার অনুধাবন করিয়া থাকেন তবে নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য যদি বাহ্য সুবিধার অধিকারী হইত, তাহা হইলে এই প্রবন্ধমালা হয়ত পৃথিবীর রসিক-সমাজেরই আলোচ্য বিষয় হইত, এবং কবি মোহিতলাল শুধু বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়াই পরিগণিত হইতেন না, তাঁহার 'সাহিত্য-কথা' মানুষের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-পিপাসার ক্ষেত্রেও এ কালের একটি শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় মোহিতলালের সে সৌভাগ্য লাভের আশা নাই; এমন কি বাঙালী পাঠকও সমালোচনা-সাহিত্যের সন্ধানে হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজীরই আশ্রয় লইবেন, এই গ্রন্থের কথা তাঁহাদের স্মরণেও পড়িবে না।

অথচ মোহিতলালের দৃষ্টি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারা অনুসরণ করিয়া রস-বিচারে ব্যস্ত নয়—তাহা আধুনিক রীতি-সম্মত। কারণ, তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে জানেন—"এ সাহিত্যে (আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে) জগৎ ও জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টি তাহার প্রেরণা আসিয়াছিল য়ুরোপ হইতে; এবং সেই দৃষ্টির যে সৃষ্টি তাহার কলা-কৌশল বা অলঙ্কার-পদ্ধতিও আধুনিক, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুরূপ, ইহা স্বীকার করিতে লজ্জা পাইলে চলিবে না।" তাঁহার সমালোচনা-পদ্ধতিও তাই য়ুরোপীয় কবি-মনীষার আধুনিকতম রসদৃষ্টিকে সহায় হিসাবে সাগ্রহে অবলম্বন করিয়াছে; এবং আমাদেরই জীবন ও সাহিত্যের বিশেষ সমস্যা যেমন বারে বারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তেমনি বারে বারে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গে তাহার মধ্য দিয়া সেই সাহিত্য-বিচার প্রকাশিত হইয়াছে।

মোহিতলালের প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যে যে একটি সাহিত্য-ধর্ম্মের ইঙ্গিত আছে, তাহা সুস্পষ্ট। উহা বাস্তব-বিমুখী নয়, অথচ উহা বাস্তব-আবদ্ধ নয়; মোহিতলাল কবি, তিনি প্রাণধর্ম্ম বা জীবন-ধর্ম্ম নামক এক রহস্যময় বাস্তবাতীত উপলব্ধিতে বিশ্বাসী। তাঁহার দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ নয়, বরং অন্তরে নিবিষ্ট—যে অন্তর বাস্তবকে স্বীকার করিয়া, সদর্থ-সমন্বিত (**significant**) করিয়া গ্রহণ করিতে জানে। তাঁহার মতে, এই **Perfection of Experience**ই সাহিত্য—জীবনের সত্যকার পরিচয়। সকল সাহিত্যেরই এই যে একটি ধর্ম্ম আছে বলিয়া কবি উপলব্ধি করেন এক দিকে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ, অন্য দিকে যে সাহিত্য আমাদেরই সম্মুখে জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে তাহারও একটি যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের আভাস, এই প্রবন্ধমালার মধ্য দিয়া লাভ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বা বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চতম ছাত্র ও গবেষকগণ নিশ্চয়ই বিদেশীয় ভাষাতেও ইহার অপেক্ষা উচ্চতর সমালোচনা-গ্রন্থ বেশী খুঁজিয়া পান না।

শ্রীগোপাল হালদার

সেনাপতি গান্ধী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, ৪৬এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য ।৶০। পৃ. ৫৫।

কবি বিজয়লাল মহাত্মা গান্ধীর মতামতের সম্বন্ধে বাংলায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহার মধ্যে কয়েকটির সমষ্টি। বিজয়লালের মতে গান্ধীজী বুর্জ্জোয়া অথবা ফাসিষ্ট নহেন, বস্তুতঃ তিনি জগতে সাম্যনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে চান, প্রভেদ হইল যে, তাঁহার অস্ত্র অহিংসার অস্ত্র। কিন্তু এই অহিংসা জড়তা অথবা ক্লৈব্যপ্রসূত নহে, সর্বতোভাবে কর্ম্মের ও উদ্যমের আধার। গান্ধীজীকে তিনি পুরুষসিংহরূপে, সেনাপতিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ২য় খণ্ড, দশম সংখ্যা। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। কলিকাতার ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট ভবনস্থিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'অধিবাস', 'অধিবেশন', 'অধ্যক্ষ', ও 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' এই সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধ। 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' (Psychic Science) পরবর্ত্তী সংখ্যায় শেষ হইবে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত।

এই বৃহৎ অভিধানের ৬০তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। শেষ পত্র-সংখ্যা ১৯০৮ এবং শেষ শব্দ "প্রমাতামহ"।

ভাদ্রের প্রবাসীতে ইহার পরিচয়ে "৬৯তম" স্থলে "৫৯তম" এবং "প্রলোকিন্" স্থলে "প্রচলাকিন্" হইবে।

ড.

জীবজগতের আজব কথা—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী। দেব-সাহিত্যকুটীর, ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। পৃ. ১০৮ মূল্য পাঁচ সিকা।

কথাচ্ছলে গ্রন্থকার বিভিন্ন জাতের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের অদ্ভুত আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদিগকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা ছবির প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে বেশী, এ বিষয়েও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। স্বর্গের পাখী ও বীণাপাখী নামক দুইখানি সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্রসমেত বইখানিতে শতাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হাতী-সীল, হাতী, লোমহীন মোটা চামড়ার পোষাক (আফ্রিকার হাতী?), বিড়াল-ছানার হাসি, বাসায় বসে নিরিবিলি, তিড়িকি মেজাজ, হংসচঞ্চু, বক্তা, বাঘ, জেব্রার জলপান প্রভৃতি কতকগুলি ছবি অতি উৎকৃষ্ট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প কথায় ছবির সাহায্যে জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে অনেক শিখিতে পারিবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

পোল্যাণ্ডের সমরসজ্জা

[এক জন ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী কর্ত্তৃক গত জুন মাসে লিখিত বিবরণ হইতে সংকলিত]

পোল্যাণ্ড এখন জগতে জাতিবৃন্দের লক্ষ্যকেন্দ্রে রহিয়াছে। সাময়িক পত্রের পাতায় তাহার নাম অহরহ ধ্বনিত, পথে ঘাটে বাজারে তাহার অবস্থা ও ব্যবস্থার সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। পোল্যাণ্ড ইংরেজ ও ফরাসীর মিত্রপক্ষ এবং ইহাদের মধ্যে সন্ধি এরূপ দৃঢ়ভাবে করা হইয়াছে যে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে পোল্যাণ্ড সে যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য। তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, অষ্ট্রীয়,

ট্রাক্টর বাহিত বৃহৎ কামান ব্যাটারি

জার্ম্মান ও রুশ এই তিন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যে জাতি শতাব্দীকালের উপর পরাধীন ছিল তাহার সংগ্রাম-শক্তি কত দৃঢ়, তাহার সেনাদলের সংখ্যা কিরূপ, কত কামান, সাঁজোয়া যুদ্ধরথ, ও এরোপ্লেন তাহাদের আছে, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী ও সরবরাহের ব্যবস্থা কিরূপ, যুদ্ধশিক্ষা কত লোকের হইয়াছে এ সম্বন্ধে কৌতূহল এখন সকলেরই।

পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে মাত্র বিশ বৎসর যাবৎ। কিন্তু ইহার স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে দল দেশে প্রাধান্য লাভ করেন তাঁহাদের নেতৃবর্গ, বিশেষতঃ
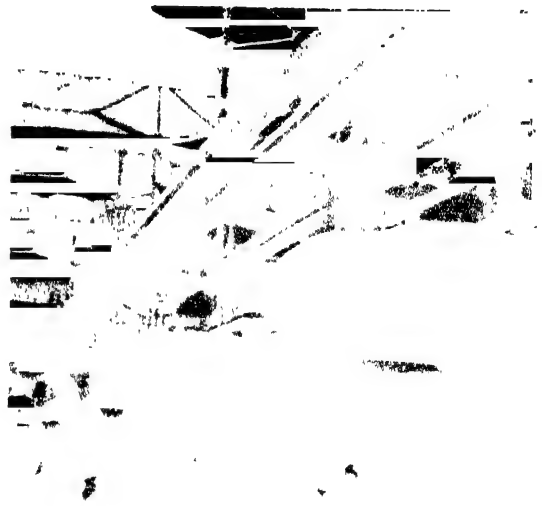
পোলিশ যুদ্ধরথ

দেশবিখ্যাত মার্শাল পিল্‌সুড্‌স্কি, স্থির করেন যে সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে দেশ আর কখনও পরাধীন না হয় এবং এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ঐ দল কোনও প্রকারে পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহেন নাই। এই দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে সমস্ত জাতি অশেষভাবে স্বার্থবর্জ্জন ও কষ্টভোগ করিয়াছে এবং দেশকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহার ফলে এখন পোলাণ্ড কয়েকটি প্রবলপরাক্রান্ত জাতির পরেই ক্ষমতা-

পোল্যাণ্ডের সমরসজ্জা। পদাতিক সৈন্যদের ব্যবহার্য্য ট্যাঙ্কভেদী ক্ষুদ্র কামান।

শালী জাতিদিগের মধ্যে গণ্য এবং তাহার সেনাদল বিশেষ যুদ্ধক্ষম। সমরসজ্জাতেও পোল্যাণ্ড এখন প্রস্তুত, সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে তাহার সেনাদলকে হটাইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার হইবে না।

বস্তুতঃ এই বিশ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পোল সেনাবাহিনী এখন এরূপ যুদ্ধক্ষম ও শক্তিশালী হইয়াছে যে তাহা ঐ জাতির পক্ষে গর্ব্বের বিষয়। অথচ আজ এই চার-পাঁচ বৎসর যাবৎ সারা জগৎময় যে "সাজ সাজ" সাড়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে পোল্যাণ্ডের নাম কচিৎ কদাচিৎ শোনা গিয়াছে। ইহার কারণ, প্রধানতঃ পোল জাতির স্বভাবসুলভ গোপনে ব্যবস্থা রক্ষার প্রবৃত্তি, যাহার ফলে পরের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবার কালেই তাহারা বিরাট্ "শোকোল" নামক জাতীয় সেনাদল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। যখন পোল্যাণ্ড স্বাধীন হয়, তখন ঐ দল প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করিয়া রাতারাতি বিরাট্ সেনাদলের সৃষ্টি করে, ইহার মধ্যে সাধারণ সিপাহী হইতে উচ্চতম সেনাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সবই প্রস্তুত ছিল। সেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে বিদেশী সেনাদলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং গত মহাযুদ্ধে মিত্রদলের পক্ষভুক্ত পোলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। অযথা চীৎকার ও গলাবাজি করিয়া দেশোদ্ধারের নামে সময় ও শক্তিক্ষয় না করিয়া নীরবে সঙ্কল্প সাধন করিবার সার্থকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ নবীন জাতির নূতন সৈন্যদল জগদ্বিখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত ছিল।

পোল্যাণ্ডের সমরসজ্জা—বৃহৎ কামান

স্বাধীনতালাভের পর সমস্ত জাতি দেশের সামরিক শক্তির বৃদ্ধি ও সুব্যবস্থার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া খাটিতে থাকে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, সমস্ত দেশের শ্রমিক দল এই বিশ বৎসর ধরিয়া প্রতি রবিবারে বিনা

পোলিশ সীমান্তে শুল্কবিভাগের পরীক্ষার জন্য মোটর-লরি আটক করা হইয়াছে

বেতনে কারখানায়, খনিতে ও অস্ত্রশালায় কাজ করিত, এখনও করে। সেই দিনটি কেবল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সামরিক উপকরণ সংগ্রহ, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী ও সেনাদলের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় তাহাদের কাটিত। এই কাজ তাহারা স্বেচ্ছায় করিয়াছে, আইনের ধমকে নহে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রের দল ছুটির সময় সেনাদলের যাতায়াত ও সুবন্দোবস্তের জন্য খাটিয়াছে—অন্য দেশের মত উন্মত্ততায় যোগ দিয়া নিজের ও পরের কাজে ক্ষতি করে নাই। এক কথায় সেনাদল যে সময়ে ও যে ভাবে সীমান্ত রক্ষা করিয়াছে, দেশের ভিতরের লোকও সেই সময় ও সেই ভাবেই দেশের শক্তিসামর্থ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে।

পোল জাতি প্রাচীন কাল হইতেই যুদ্ধক্ষম ও দুর্দ্ধর্ষ। মধ্যযুগে তুর্কদিগের দিগ্বিজয়ের অভিযান যখন ভিয়েনায় আসিয়া পড়ে তখন অষ্ট্রীয়দিগের এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সাহায্যকল্পে একমাত্র পোলগণই অগ্রসর হয় এবং প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তুর্কদিগকে পরাজিত করিয়া ভিয়েনা অবরোধের অবসান করে। নেপোলিয়নের সেনানায়কদিগের মধ্যে পোলিশ জেনারেল ডম্‌ব্রোভস্কি বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। ইহা ভিন্ন বহু পোল বিভিন্ন দেশের সেনাদলে যোগ দিয়া জাতির যুদ্ধক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

যুদ্ধের অস্ত্রসজ্জার দিক দিয়াও পোল্যাণ্ডের আয়োজন ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এখন সুবিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উরসুসের কারখানায় তাহাদের বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধরথ (মাঝারি ট্যাঙ্ক) প্রস্তুত হয়। কারখানা আমেরিকান প্রথায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিধিব্যবস্থায় সজ্জিত। যুদ্ধরথের প্রত্যেকটি অংশ পোল্যাণ্ডে প্রস্তুত হয়, একটি ক্ষুদ্রতম
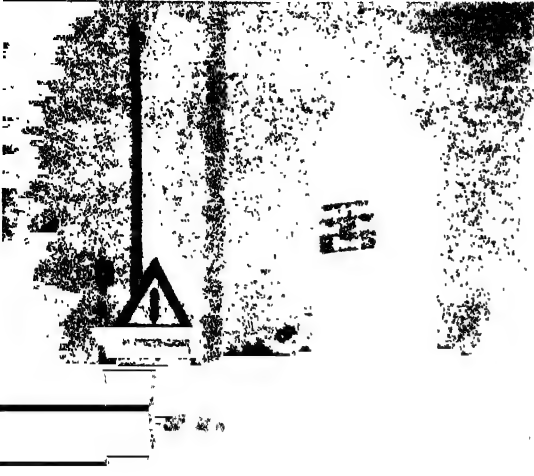
ডানজিগ নগরীর প্রবেশপথ

টুকরার জন্যও বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। ভারসোভির নিকটস্থ (প্রধান নগরী, ওরফে ওয়ার্-স) একটি কারখানায় এরোপ্লেন-নির্ম্মাণও ঠিক ঐরূপ সুব্যবস্থায় চলে। ঐ কারখানার অধ্যক্ষ এঞ্জিনীয়ার ফ্রান্সে বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সেখানকার বিরাট্ প্রতিষ্ঠানে একটির পর একটি যন্ত্রাগারে অসংখ্য বোমাক্ষেপী এরোপ্লেনের গঠন চলিয়াছে। ইহা ভিন্ন লুব্লিন, বিয়ালা এবং সি-ও-পি অঞ্চলের দুইটি কারখানাতেও এরোপ্লেন তৈয়ারী হয়। ঐ সি-ও-পি অঞ্চল পোল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ে ঘেরা প্রদেশে স্থিত। সেখানে বহু নূতন যন্ত্রশালা, লৌহ-ইস্পাতের কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্ম্মাণাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের প্রাচীন কলকারখানা প্রায় সবই জার্ম্মান-সীমান্তের নিকটস্থ সাইলেসিয়া প্রদেশে আছে। যুদ্ধের সময় সে অঞ্চল একেবারেই নিরাপদ নহে বলিয়া এই নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থায় পোল্যাণ্ডকে ক্রমে কৃষিপ্রধান দেশ হইতে যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা হইতেছে।

সি-ও-পি অঞ্চলের স্টালোভালোভার ২২০ মিঃ-মিঃ রন্ধ্রের কামান তৈয়ারী হয়। ইহা ভিন্ন অন্য অনেক অস্ত্রাগারে বন্দুক, কামান, হাল্কা ও ভারী যন্ত্রবন্দুক (মেশিনগান), ট্যাঙ্কভেদী কামান, এরোপ্লেনঘাতী কামান দিবারাত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের কারখানার কর্ম্মক্ষমতার আন্দাজ পাওয়া যায় এরোপ্লেন-নির্ম্মাণের পরিমাণ হইতে। মাসে ৪০০ সামরিক এরোপ্লেন এখন তৈয়ারী হইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং ঐ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাও অবিশ্রাম চলিয়াছে।

ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন। পোল্যাণ্ডের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে ব্রিটেন যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে ও তিন বৎসরকালব্যাপী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

পোলিশ সেনাবাহিনীতে পদাতিক, মোটরারোহী দল, গোলন্দাজ ইত্যাদি সকল প্রকার সৈন্যই সুশিক্ষিত এবং পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত। প্রতি রেজিমেণ্টের সঙ্গে এক শত কুড়িটি মেশিনগান, এক ব্যাটারি ৭৫ মিঃ-মিঃ কামান ও

.এক ব্যাটারি ট্যাঙ্কভেদী কামান আছে। সুতরাং অস্ত্র-সজ্জায় পোলিশ পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি বিশেষ শক্তিশালী।

পোল্যাণ্ডের স্থায়ী সেনাদলে এখন প্রায় ৪৫০,০০০ সৈন্য এবং প্রায় ২০,০০০ সেনাধ্যক্ষ আছে। ইহা ভিন্ন সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সক্ষম লোক প্রায় চল্লিশ লক্ষ আছে এবং যুদ্ধক্ষম কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পটু নহে এরূপ আরও পঁচিশ লক্ষ লোক আছে। সুতরাং যুদ্ধকালে পোল্যাণ্ডের সৈন্যের অভাব হইবে না। যুদ্ধাস্ত্রের বিষয়েও তাহাদের ব্যবস্থা কোন হিসাবেই হেয় নহে। তবে তাহাদের দুই পাশের দুই শত্রু পৃথিবীর বৃহত্তম দুইটি সামরিক শক্তি। বিশেষতঃ জার্মানীর রণসজ্জা অত্যাধুনিক অপরিসীম শক্তিশালী এবং যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ে প্রচণ্ডতম। শক্তিপরীক্ষায় পোল্যাণ্ড দ্রুত বাহিরের সাহায্য ভিন্ন কত দিন জার্মানীর আক্রমণ রোধ করিতে পারিবে তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

[ইতিমধ্যে যুদ্ধের যে-সংবাদ এ-দেশে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে জার্মান সেনা কর্ত্তৃক ওয়ার্-স প্রবেশের কথা প্রচারিত ও অস্বীকৃত হইয়াছে। তবে পোল সৈন্যগণ যে শেষ পর্য্যন্ত বীরের মত যুদ্ধ করিবে ও সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে না ইহা নিশ্চিত—পোলিশ সেনানায়ক বলিয়াছেন যে এক জন পোল সৈন্য জীবিত থাকা পর্য্যন্তও আত্মসমর্পণ করা হইবে না। ১৯২০ সালে মার্শ্যাল স্মিগলি-রিজ বলশেভিকদের সহিত সংঘর্ষে যে ৬০০ শত মাইল হটিয়া পরে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধেও তদনুরূপ রণকৌশল অবলম্বিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমানে হটিয়া আসাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই, এইরূপও অনুমিত হইয়াছে।]

২৫ ভাদ্র, ১৩৪৬ ক. চ.

জাপানী বোমানিক্ষেপের ফলে বিধ্বস্ত চীনের নগরী
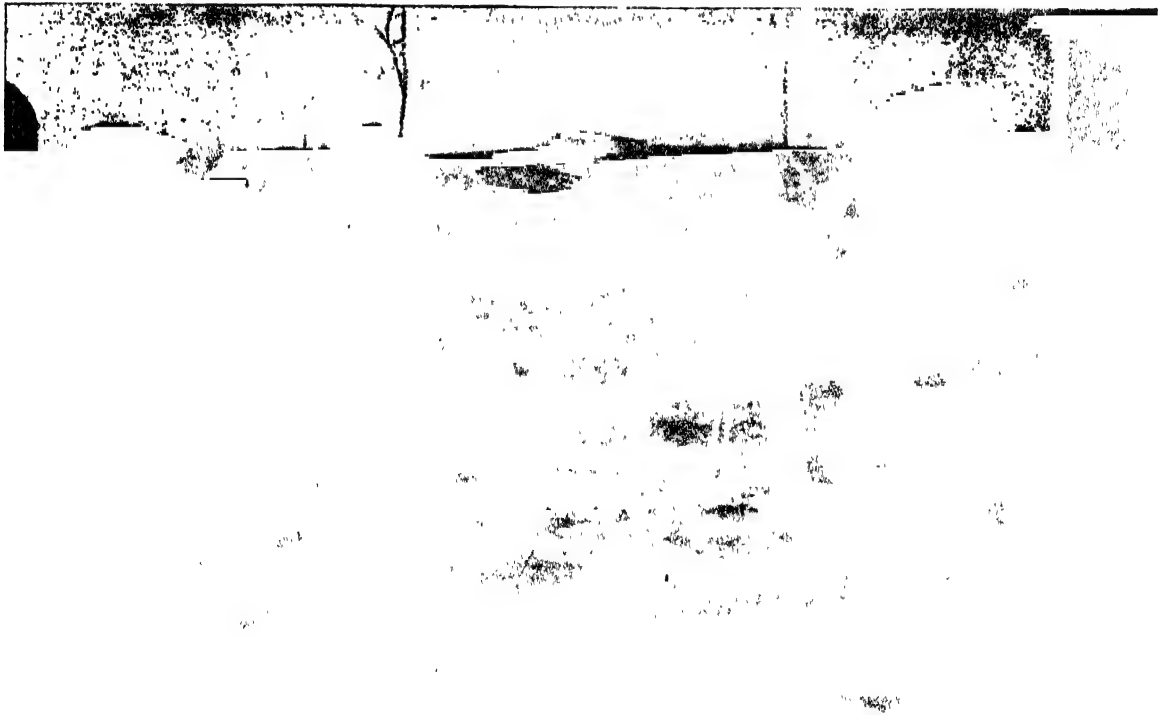
নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ

শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ (কেম্ব্রিজ)
অধ্যক্ষ, গণিতবিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

নির্ম্মেঘ অন্ধকার রাত্রে আকাশে ছায়াপথ বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষীণোজ্জ্বল মণ্ডলাকারে ইহাকে বিস্তৃত দেখা যায়। পুরাণে এই আলোক-পথকে আকাশগঙ্গা বা বৈতরণী নদী নাম দেওয়া হইয়াছে। কোনও উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, ছায়াপথ অগণনীয় তারকার সমষ্টি বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ এই তারকাগুলির সংখ্যা অগণ্য নহে। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আকাশগঙ্গায় মোটামুটি ভাবে প্রায় বিংশ সহস্র কোটি (২×১০^১১) তারকা আছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা দুই শত কোটি হইবে। অতএব আকাশগঙ্গায় তারকাসংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় এক শত গুণ। ছায়াপথের আকার অতি বৃহৎ হইলেও অসীম নহে। ছায়াপথের অভ্যন্তরে আছি বলিয়াই ইহার গঠন ও আকার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকা (Andromeda nebula) অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা ছায়াপথের বাহিরে অবস্থিত। মনে হয় যেন অসীম অনন্ত বিশালতার মধ্যে এই উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকা ক্ষুদ্র দ্বীপরূপে ভাসিতেছে। এই নীহারিকায় যদি কোনও মানব থাকে সেও আমাদের ছায়াপথটিকে শূন্যমধ্যে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে দেখিতে পাইবে। যদিও অসীম ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আকাশগঙ্গা ও উত্তরভাদ্রপদার আয়তন অদীর্ঘ কিন্তু আমাদের সৌরজগতের তুলনায় দুইটির আকার অতি বৃহৎ। প্রত্যেকটি নক্ষত্র ও নীহারিকা সমন্বিত এক-একটি বিশ্বলোক (super-galaxy) ইহাদের আয়তন নির্ণয় করিতে হইলে আমরা সাধারণতঃ যে মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকি, এই ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ বিশেষ অসুবিধাজনক। জ্যোতির্ব্বিদেরা সেই জন্য বিশাল দূরত্ব মাপিবার উপযোগী দুই প্রকার মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকেন। একটিকে "প্রকাশ বর্ষ" (light year) ও অন্যটিকে "লম্বন সেকেণ্ড" (par secs) বলা হয়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। এক বৎসরে আলোকরশ্মি যত দূর যাইতে পারে সেই দূরত্বকে এক প্রকাশবর্ষ বলা হয়। এক প্রকাশবর্ষ প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল (৬×১০^১২)। যে জ্যোতিষ্কের বা নক্ষত্রের লম্বন (parallax) এক সেকেণ্ড বা এক ডিগ্রীর $\frac{১}{৩৬০০}$ ভাগ তাহারই দূরত্বকে এক "লম্বন সেকেণ্ড" বলা হয়। এক লম্বন সেকেণ্ড প্রায় বিংশ লক্ষ কোটি মাইল (=২০×১০^১৩)।

হাব্‌ল ও ট্রামপ্লার সাহেব সম্প্রতি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ছায়াপথের ব্যাস (diameter) প্রায় ত্রিশ হাজার "লম্বন সেকেণ্ড"। লিণ্ডব্লাড্ সাহেব গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "আকাশগঙ্গার" ব্যাস প্রায় ২৬ হাজার "লম্বন সেকেণ্ড"। ছায়াপথ অণ্ডাকৃতি এবং ইহার কেন্দ্রস্থলের বেধ (thickness) প্রায় ৬ হাজার "লম্বন সেকেণ্ড"। এই বিশ্বলোকের কেন্দ্র হইতে সূর্য্য প্রায় ১০ হাজার "লম্বন সেকেণ্ড" দূরে অবস্থিত। ছায়াপথের কেন্দ্র ধনু ও বৃশ্চিক (Sagittarius and Scorpio) রাশির নিকট অবস্থিত। নিকট অবস্থিত। আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া ছায়াপথ ২২ কোটি বৎসরে এক বার আবর্ত্তন করে। এই আবর্ত্তন হেতু ইহার পৃষ্ঠে সমীপস্থ নক্ষত্রগুলির

বেগ প্রায় সেকেণ্ডে ২২০ মাইল। ছায়াপথের জড়মান সূর্য্যের জড়মানের প্রায় ষোড়শ সহস্র কোটি (১৬×১০^{১১}) গুণ। ব্রহ্মাণ্ডে বহু বিভিন্ন "বিশ্বলোক" দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক-একটি "বিশ্বলোক" বহু নীহারিকা ও নক্ষত্ররাশি দিয়া গঠিত। আমাদের বহিঃস্থ বিশ্বলোকগুলির মধ্যে উত্তর-ভাদ্রপদা নীহারিকার আয়তনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ব্যাসের দৈর্ঘ্য প্রায় বিশ হাজার "লম্বন সেকেণ্ড," মোটামুটি ভাবে ইহার বেধ এক সহস্র "লম্বন সেকেণ্ড"; কিন্তু কেন্দ্রস্থলে বেধের পরিমাণ বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছায়াপথ ও উত্তরভাদ্রপদা এই দুইয়ের মধ্যেই নক্ষত্র, তারকারাশি, উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ নীহারিকা, আকৃতিবিহীন নীহারিকা, গোলাকার তারকাগুচ্ছ, শৈবিক (Cepheid) ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনশীল জ্যোতিষ্ক, নোভা (Nova), বিশালকায় নক্ষত্র (giant stars), ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র (dwarf stars) সবই দেখিতে পাওয়া যায়।

যত দূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, এই নীহারিকার নির্ম্মাণপ্রণালী একই প্রকার। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকার গঠন কুণ্ডলাকার (spiral)। সেই জন্য ছায়াপথও যে একটি বিশাল কুণ্ডলিত নীহারিকা এই অনুমান বোধ হয় অমূলক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ছায়াপথও উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকা এক-একটি "বিশ্বলোক"। কয়েকটি "বিশ্বলোক" মিলিয়া এক একটি "মহা-লোক" (metagalaxy) হয়। ভূচিত্রের উপমা যদি লওয়া যায় তাহা হইলে "বিশ্বলোক"কে দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং "মহালোক"কে মহাদেশ বলা যায়।

নক্ষত্রগুলি একইরূপে রচিত হয় নাই; ইহাদের ভিতরে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা দশ সহস্রগুণ তাপ ও দীপ্তি বিকীরণ করে, আবার কোনও কোনও নক্ষত্রের বিকীরণ-শক্তি সূর্য্যের শত ভাগের এক ভাগ মাত্র। কোনও কোনও নক্ষত্রের উপরিতলের তাপমাত্রা (temperature) ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড, আবার কোন কোনটির পৃষ্ঠভাগের তাপ-মাত্রা তিন হাজার সেন্টিগ্রেড মাত্র। নক্ষত্রবিশেষে প্রতীয়-মান-ঔজ্জ্বল্য বা apparent brightness-এর বহু তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যমান উজ্জ্বলতার তারতম্য দুই কারণে ঘটিয়া থাকে—যথা (১) নক্ষত্রের দূরত্ব হিসাবে উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে; (২) ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের সহজাত উজ্জ্বলতা (intrinsic brightness) বিভিন্ন পরিমাণে থাকে।

কোনও কোনও তারকা কম্পনশীল (pulsating)। কয়েক দিবস কিংবা কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ইহা এক-এক বার স্ফীত বা সঙ্কুচিত হইতেছে। এই তারকাগুলি যেরূপ যেরূপ বর্দ্ধিত ও আকুঞ্চিত হয় সেরূপ বিবিধ পরিমাণে তাপ ও আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতে থাকে। নক্ষত্রসমূহের এক-তৃতীয়াংশ যুগ্মভাবে (in pairs) পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের "তারকাযুগ্ম" বা "যুগল-নক্ষত্র" (Binary stars) বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই সূর্য্যের ন্যায় অযুগল অবস্থায় একাকী পরিভ্রমণ করিতেছে।

কোনও কোনও নক্ষত্র অতীব ঘন এবং অতি দৃঢ়রূপে সংলগ্ন। আবার কোনও কোনও নক্ষত্র অতীব অঘন ও অনিবিড়। নক্ষত্রগুলির মধ্যে আয়তনের সাতিশয় বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহাদের জড়মান বিষয়ে এক প্রকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বিশেষ নক্ষত্র ছাড়া প্রত্যেকটির জড়মান সূর্য্যের জড়মানের পঞ্চ গুণ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পরিসরের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির আকৃতি বিভিন্ন কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের জড়মান এক মণ হইতে আড়াই মণের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। বিশালকায় নক্ষত্র বিমান কিংবা বেলুনের ন্যায় স্ফীত অবস্থায় আছে এবং ইহাদের জড়পরিমাণ সেই পরিমাণে অধিক নহে। কোনও কোনও নক্ষত্রের ঘনত্ব বাষ্প অপেক্ষাও অনিবিড়। অনেক ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্রের ঘনত্ব অত্যধিক এবং এইগুলি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। সূর্য্য মধ্যশ্রেণীর তারকা। সূর্য্যের জড়-মান ১.৯৯×১০^{৩৩} গ্রাম (gramme); ইহার ব্যাসার্দ্ধ ৬৯×১০^{১০} সেন্টিমিটর (cms.); ইহার ঘনত্ব গড়ে জলের ঘনত্বের ১.৪ গুণ। সূর্য্যের উপরিতলের তাপমাত্রা ৫০০০° সেন্টিগ্রেড এবং কেন্দ্রস্থলের উত্তাপ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

ব্রহ্মহৃদয় (Capella) ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের উজ্জ্বলতম তারকা। ইহা একটি "যুগলনক্ষত্র"। ইহার প্রভাময় অঙ্গটির জড়মান সূর্য্যের প্রায় ৪·১৮ গুণ অর্থাৎ ৮·৩ × ১০^৩৩ গ্রাম। ইহার ব্যাসার্দ্ধ সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধের ১৩·৭৪ গুণ অর্থাৎ ৯·৫০ × ১০^১১ সেন্টিমিটর। ইহার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের ·০০২২৭ অংশ। ব্রহ্মহৃদয়ের ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের সমান। ইহার উপরিতলের তাপমাত্রা ৫২০০° সেন্টিগ্রেড্ এবং কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা সত্তর লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ (৭০,০০,০০০°)।

আর্দ্রা নক্ষত্র (Betelguese) কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকা। ইহা বিশালকায় তারকা। আমাদের সূর্য্য যদি স্ফীত হইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ গ্রাস করিয়া মঙ্গলগ্রহের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সূর্য্যের আয়তন আর্দ্রা নক্ষত্রের আয়তনের সমান হইয়া পড়িবে। আর্দ্রা নক্ষত্রের ব্যাস সূর্য্যের ব্যাসের ৩৬০ গুণ অর্থাৎ ২·৫ × ১০^১৩ সেন্টিমিটর। ইহার ঘনত্ব মোটে ·০০০০০২। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই নক্ষত্রে জড়পদার্থের কণাগুলি অতীব বিরল বা অনিবিড় অবস্থায় আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় কার্য্যতঃ ইহাকে প্রায় রিক্ত বা শূন্যময় জ্যোতিষ্ক বলা যাইতে পারে। কিন্তু নক্ষত্রবিহীন শূন্যস্থানের (interstellar space-এর) তুলনায় অনিবিড় আর্দ্রা নক্ষত্রকেও জড়পদার্থের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। আমাদের পরীক্ষাগারেও আর্দ্রা নক্ষত্র অপেক্ষা বিরল ও অনিবিড় স্থান প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। আর্দ্রা নক্ষত্রের ঘনত্ব যদি সূর্য্যের ঘনত্বের সমান হইত তাহা হইলে কোনও আলোকরশ্মি ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিত না এবং ভূতলের প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পুনর্ব্বার নক্ষত্র মধ্যেই পতিত হইত। আমাদের পরীক্ষাগারে যে বায়ু-রহিত স্থান উৎপাদন করা যায় বাষ্পীয় নীহারিকাগুলি ইহা হইতেও আরও এক কোটি গুণ বিরল ও অনিবিড়। পৃথিবীর পরীক্ষাগারে আমরা ৫০০০° সেন্টিগ্রেডের অধিক উত্তাপ উৎপাদন করিতে পারি না। কিন্তু কোন কোন নক্ষত্রের তাপমাত্রা পাঁচ কোটি সেন্টিগ্রেড্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরীক্ষাগারে অত্যুচ্চ উত্তাপ ও অতিবিরল অনিবিড় স্থান, দুইই পাওয়া যায় এবং বিধাতাপুরুষ অতিবিশালভাবে বৃহৎ পরীক্ষাগুলি করিতেছেন।

ক্ষুদ্রকায় শ্বেত তারকা

আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে বিদ্যুৎযন্ত্রশিল্পীর (Electrical Engineer-এর) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এক জন বিদ্যুৎযন্ত্রবিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিবে কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আলোকিত করিতে হইলে কত বড় "তড়িৎপ্রবাহ কোষ" (dynamo) প্রয়োজন। সেইরূপ এক জন জ্যোতির্ব্বিদকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিবে যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিতে হইলে কোন নক্ষত্রের জড়মান কত হওয়া উচিত। এডিংটন সাহেব "জড়মান প্রকাশবিধি' (mass luminosity law) সর্ব্বপ্রথমে প্রণয়ন করেন। কোন নক্ষত্রের সহজাত প্রভা (intrinsic brightness) প্রধানতঃ ইহার জড়মানের উপর এবং অল্পমাত্রায় ইহার ব্যাসের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। এডিংটন প্রথমে যখন এই বিধি রচনা করেন তাঁহার ধারণা ছিল যে ইহা কেবল সেই সকল অনিবিড় নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাহাদের বাষ্পীয় উপাদান পূর্ণগুণসম্পন্ন-বাষ্পবিধিগুলি (laws of perfect gas) অবলম্বন করে। পরে দেখা গেল এই অনিবিড় নক্ষত্রগুলি পূর্ণভাবে "জড়মান প্রকাশ বিধি" অনুসরণ করিতেছে, উপরন্তু ঘন নিবিড় নক্ষত্রগুলিও এই বিধির অনুবর্ত্তী হইতেছে। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। এডিংটন্ সাহেব ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোন নক্ষত্রের ঘনত্ব জল কিংবা লৌহের সমান হইলেও ইহার আচরণ পূর্ণাঙ্গ বাষ্পীয় পদার্থের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়। এই বিষয়টি ভাল করিয়া অনুধাবন করাই প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা যাক, বায়ুকে আমরা কেন সঙ্কুচিত করিতে পারি কিন্তু জলকে পারি না। বায়ুকে যখন সঙ্কুচিত করা হয় তখন বায়ুকণাগুলির মধ্যে ব্যবধান কমিয়া যায় এবং বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন ও জমাট হইয়া পড়ে। তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যে কণা-গুলি পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় আছে এবং ইহাদের মধ্যে ব্যবধান আর হ্রাস করা যায় না। অতএব চাপের দ্বারা তরল ও কঠিন পদার্থকে ফলতঃ আর সঙ্কুচিত করা যায় না। সেই জন্য পার্থিব ক্ষেত্রে তরল ও কঠিন পদার্থের কণাগুলি

সঙ্কোচনের চরম অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলের প্রাকৃতিক অবস্থা ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। কোন কোনও নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা পাঁচ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই অগ্নিকুণ্ডের তাপে পরমাণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া তড়িৎকণায় রূপান্তরিত হয়। ভূমণ্ডলে সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে, যদি তাপমাত্রা বেশী না হয় তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি সৌরজগৎরূপে অবস্থিত। কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ ধনাণু ও জড়াণু (protons and neutrons) পিণ্ডীভূত অবস্থায় আছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে গোলাকার কিংবা অণ্ডাকার মার্গে ঋণাণুগুলি পরিভ্রম করিতেছে। ঋণাণুর কক্ষ বা orbit-এর ব্যাস পিণ্ডীভূত কেন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। উত্তাপ যখন অত্যধিক হয় ঋণাণুগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া অসংলগ্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অনুষ্ণ অবস্থায় তরল ও কঠিন পদার্থে যে পরমাণুগুলি সংলগ্ন অবস্থায় ছিল, অত্যুষ্ণ নক্ষত্রমণ্ডলে ঋণাণুগুলি কক্ষচ্যুত হওয়ায় সেই পরমাণুগুলি "কেন্দ্রপিণ্ড"তে (nucleus) পরিণত হয় এবং এই পিণ্ডগুলি আর পরস্পর সংস্পৃষ্ট অবস্থায় থাকে না। এইরূপে কেন্দ্রপিণ্ডগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান সম্ভবপর হয়। অতএব অত্যুষ্ণ নক্ষত্রমণ্ডলের জড়পদার্থ সঙ্কুচিত হইবার যথেষ্ট অবকাশ পায়। কেন্দ্রপিণ্ডের গুরুত্ব (weight) পরমাণুর গুরুত্ব হইতে অতি অল্প পরিমাণেই কম। সেই জন্য সঙ্কুচিত হইবার পর নাক্ষত্রিক জড়পদার্থের ঘনত্বের পক্ষে তরল ও কঠিন পদার্থের ঘনত্বের বহুগুণ অধিক হওয়া সম্ভবপর হয়। কেন্দ্রপিণ্ডগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকাতে নাক্ষত্রিক জড়পদার্থ পূর্ণগুণসম্পন্ন বায়বীয় পদার্থের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

লুব্ধক নক্ষত্র (Sirius) চাক্ষুষ দর্শনে গগনে উজ্জ্বলতম তারকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লুব্ধক এবং ইহার ক্ষুদ্র সঙ্গীটি লইয়া এক যুগল নক্ষত্র হইয়াছে। এই সঙ্গীটির ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র গুণ ও প্লাটিনাম ধাতুর ঘনত্বের প্রায় দুই সহস্র গুণ। এই ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র হইতে কিছু জড় পদার্থ লইয়া এক দেশলাইয়ের বাক্স পূর্ণ করা হইলে এই দেশলাইয়ের বাক্সের গুরুত্ব প্রায় আটাশ মণ হইবে। ও, এরিডানি বি (O_2 Eridani B) নামক আর একটি নক্ষত্রের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৯৮,০০০ গুণ। এই তারকাগুলিকে "ক্ষুদ্রকায় শ্বেত তারকা" বা white dwarf stars বলা হয়।

গ্রহ-রহস্য

এক কালে জ্যোতির্ব্বিদেরা অনুমান করিতেন যে প্রত্যেক তারকারই গ্রহ ও উপগ্রহ আছে। কিন্তু আধুনিক মতে "গ্রহ-সমবায়" বা Planetary System বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকস্মিক ব্যাপার। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রায় দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য এবং আরও একটি তারকা মহাশূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পরের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়ে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা পরস্পরকে স্পর্শও করে নাই, নতুবা উভয়ের সংঘাতে দুইটিই একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। এক্ষণে অবশ্য দ্বিতীয় তারকাটি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সূর্য্য ও নক্ষত্রটির মধ্যে সান্নিধ্য যতই বাড়িতে লাগিল পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পরস্পরের উপর ততই প্রবল হইতে লাগিল। নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্য্যের উপরিভাগে বাষ্পতরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং উভয়ের নিরন্তর আকর্ষণে বাষ্পপ্রবাহটি অবিচ্ছিন্ন হইল। সূর্য্য ও উক্ত নক্ষত্রটির চরম সান্নিধ্য কালে অবিভক্ত বাষ্প-বাহটি সুদীর্ঘ হইল। পরে নক্ষত্রটি ক্রমে বহুদূরে সরিয়া গেল এবং বাষ্পস্রোতটি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকারে আবর্ত্তন করিতে লাগিল। অবশেষে পূর্ব্বেকার বাষ্পবাহরাশি পিষ্টকাকারে (cigar-shaped) সূর্য্যদেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই বিচ্ছিন্ন বাষ্পপুঞ্জটি একত্র জমাট না বাঁধিয়া পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল। বিভিন্ন অংশগুলি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গ্রহে পরিণত হইল। মহাশূন্যে অপরিমেয় স্থান আছে। এডিংটন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে নক্ষত্রগুলির অবাধ ও অনবচ্ছিন্ন গতি সত্ত্বেও শূন্যমার্গে ইহাদের পরিভ্রমণ অতীব নিরাপদ এবং নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ অতি বিরল ব্যাপার। পণ্ডিতেরা ছায়াপথের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলির

সংখ্যাগণনাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অপরাপর নক্ষত্রগুলির সঙ্গে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ৬×১০¹¹ বৎসরে একবার। গড়ে যদি একটি নক্ষত্রের বয়স ৫×১০¹² বৎসর হয় তাহা হইলে প্রতি এক লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে সবেমাত্র একটিরই গ্রহ ও উপগ্রহ বেষ্টিত হওয়া সম্ভব

তারকাযুগ্ম বা যুগল নক্ষত্র

কোনও কোনও যুগল নক্ষত্রের তারকা দুটির সান্নিধ্য এত অধিক যে চাক্ষুষ দর্শনে ইহাদের প্রভেদ নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহাদের বর্ণচ্ছটা হইতেই কেবল বুঝিতে পারা পারা যায় যে দুইটিতে মিলিয়া যুগল নক্ষত্র হইয়াছে। ইহাদিগকে কিরণ-চিত্র প্রকটিত যুগল নক্ষত্র (spectroscopic binaries) বলা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে সর্ব্বাংশে সমান ঘনত্ব বিশিষ্ট আবর্ত্তনকারী নক্ষত্ররূপী বাষ্পীয় পদার্থের ঘূর্ণনবেগ যখন অতি দ্রুত হয় তখন ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কিরণ-চিত্রপ্রকটিত যুগল নক্ষত্রে পরিণত হয়। বিভক্ত হইবার পর দুই খণ্ড নক্ষত্র উভয়ে উভয়ের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

আবর্ত্তনকারী বায়বীয় পদার্থের আকার আদিতে গোলকের ন্যায় থাকে। অতঃপর ইহা সঙ্কুচিত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হয়। কুঞ্চনের মাত্রা অধিক হইলে ইহার আকার পীয়ার ফলের (pear) ফলের ন্যায় হয়। অবশেষে বাষ্পীয় পিণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং বর্ণচ্ছটাপ্রকটিত যুগল নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়।

বর্ণচ্ছটাপ্রকটিত যুগলনক্ষত্র ব্যতীত অনেক দৃশ্যমান যুগলনক্ষত্র (visual binaries) আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আদিম নীহারিকার দুই নিকট অংশ স্তূপীভূত হইয়া দৃশ্যমান যুগল নক্ষত্রে পরিণত হয়।

শৈবিক নক্ষত্র

শৈবিক জ্যোতিষ্কগুলি পরিবর্ত্তন ও স্পন্দনশীল নক্ষত্র অতি দূরবর্ত্তী তারকা ও নীহারিকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করিবার পক্ষে শৈবিক নক্ষত্রগুলি (Cepheid Variables) অতীব কার্য্যকরী। কোনও জ্যোতিষ্কের দূরত্ব যদি এক শত লম্বন সেকেণ্ডের অধিক হয় তাহা হইলে parallel method বা লম্বন-প্রণালী অনুসারে ইহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায় না। শৈবিক তারকার উজ্জ্বলতা নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এই হ্রাসবৃদ্ধির কালচক্র (period) শৈবিক বিশেষে কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত হয়। যে শৈবিক তারকাগুলির কালচক্র সমান সেইগুলির ঔজ্জ্বল্য, ব্যাস ও বর্ণচ্ছটা-শ্রেণীও সমান। কালচক্র ও উজ্জ্বলতার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা "তেজস্কালচক্রবিধি" (period-luminosity law) দ্বারা পরিচালিত। শৈবিক তারকার 'প্রকৃত দীপ্তি'র (intrinsic luminosity) পরিমাণ ইহার উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধির কালচক্রের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য শৈবিক তারকাগুলি "আদর্শ দীপ" (standard candles) রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে শৈবিকের কালচক্র চল্লিশ ঘণ্টা তাহার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সূর্য্যের উজ্জ্বলতার ২৫০ গুণ, এবং যে শৈবিকের কালচক্র দশ দিন তাহার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের ১৬০০ গুণ। যদি কোনও শৈবিক তারকার প্রকৃত ও দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য বিদিত থাকে তাহা হইতে "দূরত্বের বিপরীত বর্গ বিধি" (inverse square law) অনুসারে ইহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। 'ক' ও 'খ' দীপশিখার যদি সমান ঔজ্জ্বল্য থাকে এবং 'ক' যদি 'খ' অপেক্ষা চতুর্গুণ উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে 'খ' র দূরত্ব 'ক' র দূরত্বের দ্বিগুণ। সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকাতে শৈবিক জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য এই সকল নীহারিকা ও নক্ষত্র নিচয়ের দূরত্ব অতি সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়।

গ্রহরূপী ও আকৃতিবিহীন নীহারিকা

গ্রহরূপী নীহারিকাগুলির (Planetary nebulæ-র) সহিত গ্রহসৃষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু এইগুলি বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়াই উপরোক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এক একটি গ্রহরূপী নীহারিকায় বহুসংখ্যক তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নীহারিকা অতিশয়

অনিবিড়। এই সকল নীহারিকার পৃথিবীর সমায়তন এক খণ্ডের ওজন প্রায় ৬০০ মণ।

আকৃতিবিহীন নীহারিকার (diffuse nebulæ-র) গঠন-সৌষ্ঠববিহীন ও বিক্ষিপ্ত আকারের। ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে উপরোক্ত নীহারিকাগুলি নানারূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। ছায়াপথে গ্রহরূপী ও আকৃতিবিহীন দুই প্রকারের নীহারিকাই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের ব্যাস ন্যূনাধিক এক শত প্রকাশবর্ষ। পূর্ব্বেই ছায়াপথকে ভূচিত্রের "দেশে"র সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই তুলনা অনুসারে উপরোক্ত ক্ষুদ্র নীহারিকাগুলিকে "প্রদেশ" বলা যাইতে পারে।

গগনে নিষ্প্রভ নীহারিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নীহারিকা আলোক বিকীরণ করে না এবং ইহাদের পশ্চাতে যে নক্ষত্রনিচয় আছে তাহা আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকে।

কৃত্তিকা তারকাগুচ্ছ (Pleiades) ও বৃষরাশির তারক-পঞ্চক দুইটিই ছায়াপথের অন্তর্গত তারকাপুঞ্জ। এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় দশ প্রকাশবর্ষ। এই ক্ষুদ্র তারকাগুচ্ছগুলিকে মানচিত্রের প্রদেশীয় "বিভাগের" (divisional district) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অনুপাতে গ্রহবেষ্টিত সূর্য্যকে "উপনগর বেষ্টিত বৃহৎ শহর" বলা যাইতে পারে।

গোলাকার তারকাপুঞ্জ

গোলাকার তারকাপুঞ্জ বা globular clusters-এর অন্তর্গত তারকাগুলির সংখ্যা অন্যান্য গুচ্ছের নক্ষত্র সংখ্যা হইতে বহুগুণে অধিক।

ম্যাগেলনিক ধূমরাশি ও বহিঃস্থ নীহারিকা

ছায়াপথের পরিসীমার ঠিক বহির্ভাগে দুইটি বিশিষ্ট বৃহৎ তারকাগুচ্ছ অবস্থিত। স্পেনদেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক

ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলন নৌযোগে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণকালে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ আকাশ মেরুর (south celestial pole) সন্নিকটে এই দুইটি বৃহৎ তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। ম্যাগেলনের নামানুসারে এই দুইটি গুচ্ছকে "ম্যাগেলন ধূমরাশি" বা Magellanic Clouds বলা হয়। পৃথিবী হইতে ইহাদের দূরত্ব ৮৫,০০০ ও ৯৫,০০০ প্রকাশবর্ষ। ছায়াপথের বাহিরে মহাশূন্যে অনেক নীহারিকা দৃষ্ট হয়। মহাকাশে এইগুলি জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপের ন্যায় ভাসমান। অনেকগুলি নীহারিকার গঠন কুণ্ডলাকার (spiral form) এবং কতকগুলির আকৃতি অন্ডবৃত্তের (elliptical) ন্যায়। মহাকায়া উত্তরভাদ্রপদা নীহারিকা পৃথিবী হইতে আট লক্ষ প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত। বহু বহিঃস্থ নীহারিকার (extragalactic nebulæ) আয়তন অতি বৃহৎ। এই সকল বিশালকায়া নীহারিকা-গুলির আয়তন যদি হ্রাস করিতে পারা যায় এবং সঙ্কুচিত হইয়া যদি ইহাদের আয়তন এশিয়া মহাদেশের সমান হয় তাহা হইলে সেই অনুপাতে আমাদের পৃথিবী সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণা হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায়ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না।

বহিঃস্থ বৃহৎ নীহারিকাগুলিতে বহু শৈবিক জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্য সহজেই ইহাদের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই সকল নক্ষত্রের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা দেখা যায় যে, তিন-চারিটি নিকটতম নীহারিকা ব্যতিরেকে অন্য সকল নীহারিকার কিরণচিত্রের বিশিষ্ট আলোকরেখাগুলি বর্ণচ্ছটার লোহিতবর্ণের দিকে সরিয়া গিয়াছে। আলোকরেখার স্থানপরিবর্ত্তন নীহারিকার দূরত্বের সমানু-পাতেই হইয়া থাকে (directly proportional)। ডপ্‌লার নীতি (Doppler's Principle) অনুসারে পণ্ডিতেরা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারে, দূরগামী জ্যোতিষ্মান পদার্থ হইতে যে আলোক নির্গত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছে তাহার স্পন্দনসংখ্যা (frequency) হ্রাস হইয়া যায় এবং নিকটে আগমনশীল স্বয়ম্প্রভ বস্তু হইতে যে আলোক আসে তাহার স্পন্দনসংখ্যা বাড়িয়া যায়। দৃশ্যমান বর্ণচ্ছটার (visible

spectrum) লোহিত বর্ণ আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও স্পন্দনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বার্ত্তাকুবর্ণ (violet) আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অল্পতম এবং স্পন্দনসংখ্যা সেই অনুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই জন্য দূরগামী জ্যোতিষ্কগুলি হইতে আগত আলোকরেখাগুলির স্থানপরিবর্ত্তন লোহিতবর্ণের অভিমুখেই হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সেই হেতু অনুমান করেন যে বহিঃস্থ নীহারিকাগুলি আমাদের নিকট হইতে দূরে অপসরণ করিতেছে। ইহাদের গতির বেগ দূরত্বের সমানুপাতে হইয়া থাকে। যে জ্যোতিষ্ক এক্ষণে এক কোটি প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত তাহার অপসরণশীল বেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক সহস্র মাইল। যে জ্যোতিষ্ক পঞ্চ কোটি প্রকাশবর্ষ দূরে অবস্থিত তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চ সহস্র মাইল। যতগুলি নীহারিকার গতি আপাততঃ নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দ্রুততম অপসরণশীল জ্যোতিষ্কের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ সহস্র মাইল বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার দূরত্ব এক্ষণে ত্রিশ কোটি প্রকাশবর্ষ। মাইলের হিসাবে গণনা করিলে ইহার দূরত্ব $১৮^{২০}$ মাইল অর্থাৎ ১৮০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল।

নক্ষত্রের বর্ণচ্ছটা যেরূপ সুস্পষ্ট নীহারিকার কিরণ-চিত্র সেইরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক-একটি নীহারিকা অগণিত নক্ষত্রে পরিপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণচ্ছটা আছে। অগণিত বর্ণচ্ছটা একের উপর আর একটি স্থাপিত হইলে, নীহারিকার সমগ্র কিরণ-চিত্রটি অস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু এই অস্পষ্ট কিরণ-চিত্রের দুইটি বিশেষত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ক্যালসিয়াম ধাতুর 'হ' এবং 'খ' রেখা দুইটির (H and K lines) স্পষ্টই দেখা যায়। এই রেখা দুইটির স্থান পরিবর্ত্তন অবধারিত হয় এবং ইহার পরিমাণ হইতে নীহারিকার অপসরণ-বেগ নির্দ্ধারিত হয়।

সাপেক্ষবাদ বা Theory of Relativity অনুগামী পণ্ডিতেরা দূরস্থ জ্যোতিষ্কগুলির অপসরণশীল গতির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। আইন্স্টাইন্ তাঁহার

"আকর্ষণবিধি"তে (law of gravitation) দূরত্বানুপাতিক বিকর্ষণশক্তির (repulsion) পরিচায়ক একটি পদ (term) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেইজন্য আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় শক্তিরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দূরত্ব হিসাবে বিকর্ষণশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শক্তিকে "ভৌতিক বিকর্ষণশক্তি"র (cosmic repulsion) বলা হয়। অল্প দূরে ইহার প্রভাব খুবই কম দৃষ্ট হয়। অতিবিশাল ও অতিবিস্তৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই সৌরজগৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। সৌরজগতের সীমার মধ্যে "ভৌতিক বিকর্ষণ শক্তি" প্রভাব অত্যল্প ও উপেক্ষণীয়। কিন্তু বহুদূরস্থ নীহারিকাগুলির উপর সাপেক্ষিকভাবে ইহার প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সাপেক্ষবাদ মতানুসারে নীহারিকাগুলির দূরত্ব এক শত ত্রিশ কোটি (১৩×১০৮) বৎসর পরে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে।

একটি বিষয় এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক নীহারিকার অতিপুরাতন ইতিহাস আমরা জানিতে পারি। যে-জ্যোতিষ্কটির দূরত্ব এক কোটি প্রকাশবর্ষ নির্ণীত হইয়াছে তাহা এক কোটি বর্ষ আগে এই পরিমাণ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহার দূরত্ব এক কোটি পঞ্চাশ সহস্র আলোকবর্ষ, এবং ইহার অপসরণ-শীল বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৫০ মাইল। সেইরূপ যে নীহারিকার দূরত্ব ত্রিশ কোটি প্রকাশবর্ষ নির্ণীত হইয়াছে তাহা ত্রিশ কোটি বর্ষ পূর্ব্বে এই পরিমাণ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহার দূরত্ব পঁয়ত্রিশ কোটি প্রকাশবর্ষ এবং ইহার অপসরণশীল গতি প্রতি সেকেণ্ডে পঁয়ত্রিশ সহস্র মাইল।

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব

কর্ম্মবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীসুনীলকুমার সেন, এম.এ., বি.এল.

পরিশ্রম ও অধ্যবসায়—আমাদের বাঙালীর ভিতর এ দুইটি গুণ পূর্ণমাত্রায় না থাকাতে অনেক সময় আমরা আশানুরূপ ফল পাই না। এই গুণ না থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা মোটেই সম্ভবপর হয় না। বিশ্ববিখ্যাত ফোর্ড অথবা এডিসনের জীবন আলোচনা করিলে পর আমরা ইহারই প্রমাণ পাই, আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী মাড়োয়ারীদের জীবন আলোচনা করিলেও ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাই। ইহারা যে কত পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী তাহা অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথের নাম প্রত্যেক বাঙালীই জানেন—তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। আর এক জন কৃতী বাঙালী ব্যবসায়ীর কথা বলিতেছি যিনি রাজেন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের জন্য প্রত্যেক বাঙালীর আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। বিখ্যাত এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতা এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধেই এ প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তাঁহার জীবন-ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে।

১২৬৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার ত্রিপুরা জেলার বিটঘর গ্রামে মহেশবাবুর জন্ম হয়। মহেশবাবুর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার মা রামমালা দেবী খুব ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। অল্প বয়সেই মহেশবাবুর পিতৃবিয়োগ হয়, সেজন্য শৈশব হইতেই তাঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। কিন্তু এত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও ছোটবেলা হইতে তাঁহার মনে এক দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি বড়লোক হইতে পারিবেন এবং ব্যবসায় দ্বারাই হইবেন। বোধ হয় এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই তিনি ব্যবসাতে উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁহার লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রামের লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি কুমিল্লা শহরে পড়িতে আসেন। কুমিল্লা শহরে মহেশবাবুর নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকাতে এবং অর্থের অভাবে তাঁহাকে লোকের বাড়ীতে রান্না করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। অল্প বয়সেই মহেশবাবু ভাগ্য-অন্বেষণে ব্রহ্মদেশ, আকিয়াব প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসেন। ব্যবসায়ী শ্রীআলামোহন দাসের জীবনেও আমরা এইরূপ দারিদ্র্যের কঠোরতা এবং জীবন-সংগ্রামের তীব্রতার নিদর্শন পাই। এই সকল কর্ম্মবীরের কঠোর সাধনার ফলেই বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে।

লেখাপড়ায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারায় এবং কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অর্থাগমের চিন্তাই ছোটবেলা হইতে মহেশবাবুর মাথায় চাপিয়া বসে এবং কিরূপে অর্থাগম হইবে ইহাই সর্ব্বদা তাঁহার একমাত্র চিন্তা হয়। এ অবস্থায় বেশী দূর লেখাপড়া করা একরূপ অসম্ভব। হয়ত বেশী লেখাপড়া করেন নাই বলিয়াই আমরা ব্যবসায়ী মহেশবাবুকে দেখিতেছি—তাহা না হইলে মসীজীবীই অন্য এক মহেশবাবুকে দেখিতে পাইতাম। মহেশবাবু চাকুরীর সন্ধানে দুই বার কলিকাতা আসেন; কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না দেখিয়া বরিশাল ও পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বহু দিন চাকুরীর চেষ্টা করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত কোন চাকুরীর সুবিধা করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরেই তাহা ছাড়িয়া দিলেন এবং এইখানেই তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হইল। তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল কি করিয়া ব্যবসা দ্বারা অবস্থার উন্নতি করা যায়—কাজেই লেখাপড়ার দিকে বেশী ঝোঁক রহিল না। তিনি কিছু দিন কুমিল্লার একটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী পড়াইবার কাজ পাইলেন। কিন্তু এ কাজও তিনি বেশী দিন করিলেন না। পুনরায় তিনি কাজের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিলেন এবং কিছু দিনের

জন্য একটা দোকানে কাজও পাইলেন। তার পর তিনি নিজেই মাত্র ৫১৲ টাকা পুঁজি লইয়া একটি মুদি-দোকান খোলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ব্যবসায়ের চেষ্টা। প্রথম দুই মাস দোকান বেশ ভালই চলিতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দোকানের কর্ম্মচারীর সততার অভাবের জন্য তাঁহাকে লোকসান দিতে হয় এবং বাধ্য হইয়া তিনি দোকান ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি কয়েকটি দোকানে কাজ করেন, কিন্তু কোন চাকুরীই বেশী দিন স্থায়ী না হওয়ার দরুন তিনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় করিতে থাকেন। এ সময় তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহেশবাবু স্টেশনারী ও বইয়ের দোকান খোলেন। স্টেশনারী দোকানে লাভ না হওয়ায় তিনি এ দোকান তুলিয়া দিয়া পুস্তক-প্রকাশকের এবং কাগজ বিক্রির ব্যবসায় করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার বেশ লাভ হইতে থাকে। ১২৯৬ সালে মহেশবাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান খোলেন—তখন হইতেই তাঁহার জীবনে উন্নতির সূত্রপাত হয়। হোমিওপ্যাথিক দোকান যখন ভাল চলিতে থাকে তখন তিনি অর্ডার সাপ্লাইয়েরও স্টেশনারী দোকান বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ 'পারিবারিক চিকিৎসা' প্রকাশ করেন—এই হোমিওপ্যাথিক বইয়ের কাট্‌তি বর্ত্তমানে খুবই বেশী এবং ইহা এখন প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরেই আছে। মহেশবাবুই প্রথম ম্যাঙ্গালোরের ফাদার মূলারের দেখাদেখি পাঁচ পয়সা দরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর মহেশবাবু তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ইকনমিক ফার্ম্মেসী' প্রতিষ্ঠা করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা খুব ব্যয়সাধ্য নয় এবং আমাদের গরিব দেশের পক্ষে খুবই উপযোগী বলিয়া বর্ত্তমানে ইহার বেশ প্রসার হইতেছে। সস্তা অথচ ভাল ঔষধ বিক্রয় করিয়া মহেশবাবু যে এদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মহেশবাবু ১২৯৯ সালে একটি এলোপ্যাথিক ষ্টোর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর আটটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান এবং ঢাকা শহরেও একটি দোকান আছে। তাহা ছাড়া এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানও কলিকাতায় দুইটি আছে। অধুনা মহেশবাবুকে একজন কৃতী ব্যবসায়ী বলিয়াই সকলে জানেন। কিন্তু তিনি যে দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মহেশবাবুর আর একটি কীর্ত্তি হইতেছে যে তিনিই দেশী হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল প্রথম এদেশে প্রস্তুত করাইতে যত্নবান হন। মহেশবাবুর পক্ষে ইহা খুবই গৌরবের কথা যে, যিনি প্রথমে প্রায় কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই ব্যবসায়ে তিন-চার শত লোক কাজ করিতেছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহাতে ব্যবসায়ী মহেশবাবুর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু এ মানুষটির অন্তর যে কত দয়ার্দ্র সে-কথা বলা হয় নাই। ছোটবেলায় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া যিনি অনবরত সংগ্রামের পথে চলিয়াছেন, মানুষের দুঃখ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই কুমিল্লা শহরে মহেশবাবু তাঁহার মাতার নামে রামমালা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্রাবাসে বহু গরিব ছেলে বিনা পয়সায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া পড়াশুনা করিতেছে। এখানে যে-সব ছেলে থাকে তাহাদিগকে নিজ হাতে সব কাজই করিতে হয়। মহেশবাবুর এই নিয়ম করিবার উদ্দেশ্য, যে-সব ছাত্র এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে তাহারা যেন প্রত্যেকে স্বাবলম্বী ও কর্ম্মঠ হইয়া বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইহা ছাড়া মহেশবাবু তাঁহার পিতার নামে কুমিল্লা শহরে 'ঈশ্বর পাঠশালা' নামে এক উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কুমিল্লা শহরে মহেশবাবুর যে বাড়ী আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের সভা-সমিতির জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা মফঃস্বলে অনেক শহরেই নাই। শহরের যাবতীয় সভা-সমিতি এখানেই প্রায় হইয়া থাকে। কিছুদিন হইল মহেশবাবু কাশীধামে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। মহেশবাবুর ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ করিবার কথা ছাড়াও আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, মাড়োয়ারীরা ব্যবসা করিয়া যেমন অর্থ উপার্জ্জন করে তদ্রূপ সদ্ব্যয়ও করে। এখানে আমরা এমন একটি লোকের পরিচয় দিতেছি যিনি প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাহাতে কৃতিত্ব লাভ করেন ও অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিতেছেন। মহেশবাবু ছোট একটি আত্মজীবনী লিখিয়াছেন—তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি কখনও অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন না, সর্ব্বদা সততার সহিত কাজ করিয়া যান এবং তিনি কোন দিন কাহাকেও ঠকান নাই। এই নিরলস নিরহঙ্কার ও সাধুচরিত্র লোকটির জীবন হইতে বাঙালী জাতির বহু মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিবার আছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ও যুদ্ধকালীন সঙ্কট অবস্থা

জানা গিয়াছে যে, ২৪শে ভাদ্র পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ওআর্কিং কমীটি ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। [২৫শে ভাদ্র লিখিত।]

—

যুদ্ধকালীন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমীটি বোম্বাই অধিবেশনে ২৪শে ভাদ্র "ভারতবর্ষ ও যুদ্ধ" সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে যে,

ভারতবর্ষকে সামরিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করার সহিত ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও ভারতীয়দিগের উভয়েরই স্বার্থ জড়িত; কিন্তু শেষোক্তেরা বিনা সাহায্যে তাহাদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে সহযোগিতার যথেষ্ট অবসর আছে। এই সহযোগিতা কার্য্যকর করিবার নিমিত্ত মহাসভা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে দায়িত্ব প্রবর্ত্তন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার সংশোধন, অস্ত্র-আইন ইংলণ্ডের মত করিবার নিমিত্ত সংশোধন, এবং টেরিটোরিয়্যাল ফৌজ ("পৌর-জানপদ-বাহিনী") সম্প্রসারণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।

প্রস্তাবটিতে আরও নিম্নলিখিত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হইয়াছে:—

যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধা শ্রেণীভেদ দূরীকরণ, যথাসম্ভব শীঘ্র সৈন্যদলের সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ, যাহাতে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম দেশ-রক্ষীদল হাতের কাছে প্রস্তুত থাকে তাহার নিমিত্ত ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয়ে ("ইণ্ডিয়ান মিলিটরি একাডেমি"তে) যুদ্ধের সকল শাখায় প্রগাঢ় ও ত্বরান্বিত শিক্ষা দান।

যাহাতে ভারতবর্ষের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন নিজের আবশ্যক অনুযায়ী হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতবর্ষে এরোপ্লেনের এঞ্জিন, মোটর এঞ্জিন, ও আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতিতে ভারতীয় কারখানাগুলিকে উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা করিতে গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাব দ্বারা মহাসভা সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগকে ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের পুরুষদের একটি হিন্দু ভারতীয় পৌরবাহিনী ("মিলিশিয়া") গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। মহাজাতির ক্ষতি করিয়া কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রিটেনের বর্ত্তমান সঙ্কটের সুযোগ লইয়া দরদস্তুর করিবার প্রবৃত্তির নিন্দাও এই প্রস্তাবে করা হইয়াছে; এবং হিন্দুদিগকে তাহাদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধাগুলি রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাব দ্বারা বড়লাটকে সম্মানসহকারে জানান হইয়াছে যে, কংগ্রেস হিন্দুদিগের প্রতিনিধি নহে, এবং যদি হিন্দু মহাসভার অগোচরে ও অসম্মতিতে এক পক্ষে গবর্মেণ্ট ও অপর পক্ষে মুসলীম লীগ বা কংগ্রেসের মধ্যে কোন চুক্তি বা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হিন্দুদিগের গ্রহণযোগ্য বা স্বীকার্য্য হইবে না।

হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমীটির এই অধিবেশনে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় এক শত নেতৃস্থানীয় হিন্দু উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য যদিও হিন্দু এবং তাহার কার্য্যকারিতা ও মর্য্যাদা যদিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের শক্তি ও গুণের ফল, তথাপি কংগ্রেস হিন্দুদের শক্তি, দেশ-সেবার সুযোগ ও অধিকার রক্ষায় অবহেলা করায়, উহা যে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নহে, হিন্দু মহাসভার ইহা বলিবার ন্যায্য কারণ ঘটিয়াছে। ইহাও ঠিক্ কথা যে, যাহা কংগ্রেসের অনুমোদিত তাহা হিন্দু সমাজেরও নিশ্চয়ই অনুমোদিত, এরূপ মনে করা ভুল। [২৫শে ভাদ্র লিখিত।]

—

যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবে ?

যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবে, এইরূপ অনুমান করিয়া ব্রিটেন তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। [২৫শে ভাদ্র।]

—

ভিক্ষু উত্তম

ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু উত্তম স্বদেশের ও ভারতবর্ষের চির-সংযোগ রক্ষার অভিলাষী ছিলেন। উভয়ের জন্য তিনি কারারোধ ও অন্য বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মাতৃভাষা ভিন্ন বাংলা ও হিন্দী জানিতেন ও তাহাতে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। [২৫শে ভাদ্র।]

—

কলিকাতায় পৌরজনের দাবী

গত রবিবার ২৪শে ভাদ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিল-চেম্বারে শহরের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের এক সভা হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে ও ভারতে হিটলারের প্রভাব প্রতিহত করিতে জনসাধারণকে আহ্বান

করিয়া এবং বাঙালী সৈন্যদল গঠনের জন্য ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সভা আহূত হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, দুই দল বাঙ্গালী সৈন্য ও একটি মোটরবাহী সেনাদল গঠনের দাবী জানাইবার জন্য তাঁহারা সভায় সমবেত হইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য সেনাদলের ন্যায় বাঙ্গালীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে সমান শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারে। এবারকার যুদ্ধক্ষেত্র ভারতেও বিস্তৃত হইতে পারে। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ ভারতবর্ষ মোটেই সজ্জিত ও প্রস্তুত হয় নাই। বঁটি ও দা ভিন্ন ভারতবাসীর হাতে অন্য কোনও অস্ত্র নাই। বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কোনও ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। দেশরক্ষার জন্য আজ ভারতবাসী উৎসুক হইয়াছে। যে মহান্ আদর্শের জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী তাহার পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। আজ যদি ভারতবাসীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে তাহারা দলে দলে সৈন্যদলে যোগ দিবে।

মিঃ বি এন রায় চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মেজর টি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লর্ড সিংহ, মাননীয় মন্ত্রী নবাব মোসারফ হোসেন, মিঃ জে এন বসু, মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, খান বাহাদুর মাননীয় আজিজুল হক, মিঃ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, মিঃ ডি সি ঘোষ, কলিকাতার শেরিফ, মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, রায় বাহাদুর রাঘব ব্যানার্জ্জি, মিঃ পি কে ভট্টাচার্য্য, স্যার নীলরতন সরকার, মিঃ আবদুল আলী, মিঃ এস কে সেন এবং নসীপুরের রাজা বাহাদুর নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া এবং যুদ্ধে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন :—

এই সভা দেশরক্ষাকল্পে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে এবং মানবজাতির সভ্যতা ও স্বাধীনতাধ্বংসকারী নাৎসি মতবাদ প্রতিরোধ করিতে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে।

অন্ততঃ দুই দল বাঙ্গালী সৈন্য গঠনের প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে এই সভা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

বাঙ্গালীর দ্বারা গঠিত আধুনিক ধরণের একটি মেকানাইজড্ ইউনিট গঠন করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে এই সভা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাননীয় লর্ড সিংহকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিতে এই সভা অবসরপ্রাপ্ত বাঙ্গালী সৈনিক সমিতিকে অনুরোধ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে কিনা, তাঁহারা তাহাও বিবেচনা করিবেন। উক্ত প্রস্তাবসমূহের প্রতিলিপি বড়লাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি, বাঙ্গালার গবর্ণর এবং আসাম প্রেসিডেন্সী বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা হউক।

[২৫শে ভাদ্র]

—

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়

তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ও তাহার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। তিনি হিন্দু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতেন। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। [২৫শে ভাদ্র]

—

বড়লাটের বক্তৃতা ;—ফেডারেশ্যন স্থগিত

কেন্দ্রীয় আইন-সভার দুই কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশনে বড়লাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন আপাততঃ ফেডারেশ্যন চালু করিবার চেষ্টা ও আয়োজন স্থগিত থাকিবে। ইহাতে সম্প্রদায় ও দল অনুসারে হর্ষ ও বিষাদ মিশ্রিত ভাবের উদ্রেক হইবে। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার স্থান ও সময় নাই।

বড়লাট (অধীন) ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু স্বরাজ আর এক ধাপও অগ্রসর হইবার কোন আশা দেন নাই। [২৬শে ভাদ্র।]

—

যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির নির্দ্ধারণ

২৫শে ভাদ্রও যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। [২৬শে ভাদ্র।]

চিত্র-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদর্শন চিত্রে পুরীর মন্দিরের বহিরঙ্গণ হইতে জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ চিত্রিত হইয়াছে।

দেবগণের বুদ্ধ-বন্দনা চিত্রটি বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ ললিত-বিস্তরের একটি কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। রাজা শুদ্ধোদন কুমার সিদ্ধার্থকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গৃহদেবতাগণের মন্দিরে প্রণাম করাইবার জন্য মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। সিদ্ধার্থ যে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া মানবসমাজকে মুক্তির পথ দেখাইবেন, দেবতাগণ এ-কথা জানিতে পারিয়া সিদ্ধার্থের প্রণাম গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

প্রসাধন-চিত্রে সখীগণ কর্ত্তৃক শাহাজাদীর প্রসাধনের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। এক জন সখী শাহারজাদীর চরণে অলক্তক লেপন করিতেছেন, অন্য এক সখী পুষ্প-মাল্য ও গন্ধদ্রব্যের থালা ধারণ করিয়া আছেন। শাহারজাদী দর্পণে আপনার মুখশ্রী অবলোকন করিতেছেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত